বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ

প্রবন্ধ খণ্ড
শেষ অংশ

॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥

সভাপতি
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন

প্রধান সম্পাদক
শ্রীগোপাল হালদার

সহযোগী সম্পাদক
শ্রীঅশোক ঘোষ

সাক্ষরতা প্রকাশন
পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি

প্রথম প্রকাশ
৭ জুন, ১৯৭০

প্রকাশক
শ্রীপ্রণব ঘোষ
সাক্ষরতা প্রকাশন
৬০ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীমদন সিংহ
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ট প্রেস
১৭৩ রমেশ দত্ত স্ট্রীট
কলকাতা-৬

বাঁধাই
শ্রীঅরুণ মুখোপাধ্যায়
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ট প্রেস
১৭৩ রমেশ দত্ত স্ট্রীট
কলকাতা-৬

বর্ণলিপি
শ্রীমানব বন্দ্যোপাধ্যায়

সমগ্র খণ্ডের মূল্য আঠারো টাকা

Bankim Rachana Samgraha
Writings of Bankim Chandra Chatterji
Vol. 1, Part II —Essays.

ভূমিকা

বঙ্কিমের সাহিত্য-জীবন

সাহিত্যজীবনকে সমগ্র জীবনের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, এ কথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বঙ্কিমের শুধু রচনাপঞ্জীকে জেনে নেওয়াও যথেষ্ট নয়; বঙ্কিমের সাহিত্যজীবনের একটা মূল রূপ মনের সম্মুখে রাখা প্রয়োজন।

অবশ্য বঙ্কিম-সাহিত্যের দুটি প্রধান অঙ্গ সুপরিচিত। একটি বঙ্কিমের 'কারয়িত্রী প্রতিভা'র দান—অর্থাৎ বঙ্কিমের উপন্যাস, বড় গল্প প্রভৃতি সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য ('পরিষদ' সংস্করণ-এর প্রথম খণ্ড)। অন্যটি বঙ্কিমের 'ভাবয়িত্রী প্রতিভা'র দান—বঙ্কিমের চিন্তা-ভাবনা-মূলক মনন-ধর্মী সাহিত্য; 'লোক-রহস্য', বিশেষতঃ 'কমলাকান্ত', 'মুচিরাম গুড়' প্রভৃতি লেখা এবং কোনো কোনো 'এসে'-জাতীয় রস-নিবন্ধ অনেক স্থানেই সৃষ্টিধর্মী। কিন্তু সাধারণভাবে, এবং অনেকটা মুদ্রণ-সুবিধার জন্য, এসব বিবিধ রচনাকে প্রবন্ধ-সাহিত্যের সঙ্গে মননধর্মী রচনার মধ্যে ('পরিষদ' সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড) স্থান দেওয়া হয়। আবার, বাল্যরচনা, কিছু কিছু কবিতা ও অন্যান্য বিষয়কেও সেই সঙ্গেই ধরা চলে—আসলে এসব 'পরিশিষ্ট' রূপেই গণ্য। যেমন, 'সংবাদ প্রভাকরে' ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ প্রকাশিত বঙ্কিমের কবিতা "কামিনীর উক্তি। তোমাতে লো ষড়ঋতু।" কিংবা সাধারণভাবে বলা যায়—'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্যত্বের কালের রচনা প্রথম পুস্তক 'ললিতা', 'মানস' (১৮৫৬) প্রভৃতি। বঙ্কিমের এসব গদ্য পদ্য রচনা লুপ্ত হলেও কোনো ক্ষতি হত না। ওসবে বঙ্কিম-প্রতিভার কোনো আভাস নেই। এসবকে 'পূর্বাভাস' শুধু এই কারণেই বলা যায়—লেখকের মনে রচনার ঝোঁক দেখা দিয়েছে। তের-চৌদ্দ বছরেই দেখি বঙ্কিম সাহিত্য-রচনায় প্রবৃত্ত। সেই ১৮৫৩ খ্রী থেকে ১৮৫৬ পর্যন্ত কালটা (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায়) বঙ্কিমের 'ঈশ্বরগুপ্তের নিকট বাঙ্গলা শেখার শিক্ষানবিশী'র কাল। এজন্যই তাকে পূর্বাভাস বলা—তাতে প্রতিভার আভাস না থাক, প্রকাশের প্রয়াস ছিল। আর প্রয়াস না থাকলে প্রতিভার স্ফুরণও হত না। অবশ্য প্রতিভার একটা ধর্ম,—সে নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না।

১৮৫৬-র পরে ১৮৬৪ খ্রী-এর 'দুর্গেশনন্দিনী'র রচনা (১৮৬৩-৬৪) ও প্রকাশ (খ্রী ১৮৬৫) কালের মধ্যে বঙ্কিমের যা চেষ্টা তা ইংরেজি গদ্য উপন্যাস Rajmohan's Wife (তা ১৮৬৪ থেকে কিশোরীচাঁদ মিত্রের Indian Field-এ ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়); বঙ্কিম তার প্রথম সাত অধ্যায়ের অনুবাদও করেছিলেন—'বারিবাহিনী'তে তার সে অংশ এখনো পড়তে পাওয়া যায়। সে নমুনা থেকে ওই দীর্ঘ আট বৎসরের প্রচেষ্টা যা দেখা যায় তাতে

একথা মানতেও দ্বিধা হয় যে, তা 'সন্দিগ্ধ ব্রীড়াবনতা প্রতিভার প্রথম লজ্জারুণ বিকাশ' ('সাহিত্যসাধক চরিতমালা'র অন্তর্ভুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'সাহিত্যজীবন', পৃ. ৪২-৪৪); উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন। সে বাঙলা পড়লে সন্দেহ থাকে না, বঙ্কিম 'সর্বজনকথিত এবং প্রচলিত' বাঙলা ভাষার গুণাগুণ সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন। কিন্তু সংস্কৃত-আড়ম্বরে আচ্ছন্ন উৎকট বাঙলা লেখার অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেন নি। সত্যসত্যই সে অভ্যাস ত্যাগ করতে বঙ্কিমের আরও বেশ কয়েক বৎসর লেগেছিল; অন্তত 'বঙ্গদর্শনে'র (১৮৭২) প্রকাশ পর্যন্ত বঙ্কিমের সে অভ্যাস কাটে নি। তারপরে, ক্রমেই বিদ্যাসাগরীয় রীতির গম্ভীর মহিমার ধারার সঙ্গে 'আলালের ঘরের দুলালের' প্রচলিত রূপ সমন্বিত হয়ে বঙ্কিমের ভাষারীতি মর্যাদা ও প্রাঞ্জলতা লাভ করেছে। তবু ভবিষ্যৎ বঙ্কিমের প্রতিভার স্ফূরণ অনুবাদের 'রাজমোহনের স্ত্রী'র এক-আধ স্থলে পাওয়া যায়, তাতে সন্দেহ নেই (দ্রষ্টব্য ঐ, দ্বিতীয় উদ্ধৃতি, পৃ. ৪৪)। তাই এ কালটাকে 'পূর্বাভাস' বলা চলে। আসলে তার অপেক্ষাও এ সময়ে (১৮৫৬-১৮৬৩ খ্রী) জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বঙ্কিমের আত্মপ্রস্তুতি চলছিল; সাহিত্যচিত্তের অনেক গভীর ও বিস্তৃত বনিয়াদ রচিত হচ্ছিল। কলেজে বঙ্কিমচন্দ্রের যা পাঠ্য ছিল, আজ তা আমরা জানি (ব্রজেন্দ্রনাথ, ঐ, পৃ. ১৪); তা সামান্য নয়। কিন্তু আরও জানি বঙ্কিমের আগ্রহ ক্লাশ পাঠ্য বইতে আবদ্ধ থাকত না। ইংরেজি সাহিত্য ও সংস্কৃত সাহিত্য দুয়েরই রস তাঁকে পরিপ্লুত করেছিল। সেই সঙ্গে ছিল তাঁর ইতিহাসের প্রতি আকর্ষণ। শেক্‌সপীয়র, বায়রন, স্কট আর কালিদাস-ভবভূতি তাঁর পরম প্রিয়। এবং অনুমান করা যায়, ইংরেজি ভাষার তৎকালীন বিপুল চিন্তাসম্পদের প্রতিও ছিল তাঁর শ্রদ্ধা।—আর ছিল সেই প্রশ্ন—'এ জীবন লইয়া কি করিব?' এই দুর্নিবার্য প্রশ্নের উত্তর-সন্ধান এ সময়েও বঙ্কিমের মনকে নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু নাড়া দিচ্ছিল। তথাপি 'দুর্গেশনন্দিনী'র পূর্ব পর্যন্ত বঙ্কিমের রসপিপাসাই প্রবলতর। রোমান্স ও ইতিহাস আশ্রয়েই তা বাঙালী-জীবনকে অনুভব করতে চাইল। দ্বিতীয় কথা, Rajmohan's Wife-এর লেখক, Captive Ladyর লেখকের মতই, ইংরেজি সাহিত্যের রসে মুগ্ধ। মাতাল না হোন, সে সাহিত্যে বঙ্কিম মেতেছিলেন। ইংরাজি লেখায়ও নেমেছিলেন। সেই ইংরেজি লেখা থেকে তিনি ফিরলেন বাঙলার দিকে—'রাজমোহনের স্ত্রী'র অনুবাদ-চেষ্টায় তার সূচনা। স্বভাবতই অনুবাদে তিনি তৃপ্তি পেলেন না—তাঁর 'চিত্তরঞ্জনী বৃত্তি' তখন আরও নতুন কিছুতে এগিয়ে যেতে চাইছে—যাতে রোমান্স ও ইতিহাস দুয়েরই সম্মেলন, এমন রসসৃষ্টির আশায় তিনি উন্মুখ। তার চেয়েও বড় কথা,—এই কথাও তিনি বুঝেছেন—ইংরাজি তাঁর স্বভাষা নয়—যদিও বঙ্কিম ইংরেজি ভালো লিখতেন এবং পরেও শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বলেছিলেন, "বরাবর বাঙ্গলা অপেক্ষা ইংরাজী লেখা ও বলা তাঁর (বঙ্কিমের) পক্ষে অধিক সহজসাধ্য।" অর্থাৎ ইংরেজি ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা শুধু নয়, ইংরেজি ভাষার ওপর নিজের অধিকার সম্বন্ধেও বঙ্কিম মনে মনে গর্ব পোষণ করতেন। তথাপি, বুঝেছিলেন—ইংরেজি তাঁর কাজের ভাষা, আত্মপ্রকাশের ভাষা নয়। এ চেতনা

বঙ্কিমের মাঝে উদ্ভূত হয়ে থাকবে আরও দুটি কারণে—চাকরিতে নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে যশোরে (১৮৫৮-১৮৬০) দীনবন্ধুর সাহচর্য ও বন্ধুত্বলাভ ; এবং প্রায় সেই সময়ে বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মাইকেলের অভাবনীয় আত্মপ্রকাশ—নাটক ছাড়িয়ে মাইকেলের কাব্য সৃষ্টি। আর, তার একটু পরেই একান্ত সুহৃদ দীনবন্ধুরও বাঙলা নাটকের ক্ষেত্রে প্রবেশ (নীলদর্পণ, ১৮৬০ ঢাকা থেকে প্রকাশিত)। এই দুটি বাহ্য ঘটনা নিতান্ত বাহ্য নয়। তবে মুখ্য কারণ বঙ্কিমের নিজের সচেতনতা। তাঁর আত্মপ্রকাশের পক্ষে 'তাঁর স্বভাষা' তাঁর জন্মগত ভাষা ; তাঁর স্বজন, স্বজাতির ভাষাতেই তাঁর মুক্তি।

প্রথম পর্ব

'দুর্গেশনন্দিনী'তেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত আবির্ভাব। সে গ্রন্থ রচনা শেষ হয় খুলনায় (১৮৬৩)। কিন্তু 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশ ১৮৬৫ সালে—বঙ্কিমচন্দ্র তখন বারুইপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। পাণ্ডুলিপি পাঠে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা তা প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনা করেছিলেন (শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বঙ্কিমজীবনী") ; এ যেমন শোনা যায়, কেউ কেউ কাঁঠালপাড়ার বাড়িতে 'দুর্গেশনন্দিনী' পাঠ শুনে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন, তাও দেখা যায় (পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বঙ্কিম-প্রসঙ্গ")। প্রকাশের পরে দুর্গেশনন্দিনীর ভাষা নিয়ে তর্ক ওঠে। পণ্ডিতেরাও কেউ কেউ সে ভাষার সুখ্যাতি করলেন। আবার ("সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের মত") কেউ কেউ সে ভাষাকে "শবপোড়া মড়াদাহ" বা গুরুচণ্ডালী ভাষা বলে বিদ্রূপ করতেন। কিন্তু অচিরেই যা স্পষ্ট হলো তা উল্লেখ করেছেন আরেকজন শ্রেষ্ঠ গদ্য-লেখক—দ্বারিকানাথের ভাগিনেয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী,

> আমরা সেদিনের কথা ভুলিব না। দুর্গেশনন্দিনী বঙ্গসমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল। এ জাতীয় উপন্যাস বাঙ্গলাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই।
>
> . . . দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা, সকল বিষয়ে বোধ হইল যেন বঙ্কিম বাবু দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত রোধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন ("রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ")।

পণ্ডিতদের মধ্যে এই নবীনতা সম্বন্ধে বিতর্ক ওঠাই স্বাভাবিক। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষিতদের মনে বাঙলা ভাষায় রোমান্সরসের স্বাদলাভ তেমনি আনন্দের কারণ। রমেশচন্দ্র দত্তের মতো ঐতিহাসিকের পরবর্তীকালের লেখায়ও (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, শ্রাবণ, ১৩০১) সে উচ্ছ্বাসের ঝলক লেগে আছে দেখতে পাই।

> "কলিকাতা ও ঢাকা এবং পশ্চিম ও পূর্বদেশ হইতে আনন্দরব উত্থিত হইল। বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটি নূতন যুগের আরম্ভ হইয়াছে। একটি নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে,—নূতন চিন্তা ও নূতন কল্পনা বঙ্কিম-চন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে।"

অথচ 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম সংস্করণের (১৮৬৫) সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালীন শেষ সংস্করণের (১৩শ, ১৮৯৩) পাঠভেদ তুলনা করলে বুঝতে পারি (ব. সা. প. সংস্করণ 'পাঠভেদ' দ্রষ্টব্য) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা সেই ১৮৬৫ এর সময়ে কত কাঁচা। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গ্রন্থের প্রতি নতুন সংস্করণেই সংস্কার করতেন (সেজন্যই প্রতি গ্রন্থের জীবিতকালীন সেই শেষ সংস্করণই এখন পাঠকসমাজে গ্রাহ্য); সেই সংস্কারগুলি পর পর আলোচনা করলে বঙ্কিম-মানসের পরিণতির রূপরেখাও দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে প্রসঙ্গের এখানে প্রয়োজন নেই। আবির্ভাবেই যে বঙ্কিমচন্দ্র অভিনন্দিত ও সর্বস্বীকৃত হয়েছিলেন, তাই এখানে আমাদের লক্ষণীয়।

'আবির্ভাবপর্বে' 'দুর্গেশনন্দিনী'র পরে খ্রী ১৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয় 'কপালকুণ্ডলা'—এক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রোমান্স ও কাব্যসম্পদ 'কপালকুণ্ডলা'। তারপর খ্রী ১৮৬৯ সালে 'মৃণালিনী'র প্রকাশ—দেশপ্রীতির আভাস তাতে প্রত্যক্ষ, আর সাহিত্যদৃষ্টির না হোক, বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার ও সাহিত্য-উদ্দেশ্যের সূচনাও তাতে স্পষ্ট। বোঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র পর্বান্তরের জন্য প্রস্তুত, "শুধু রোমান্স নয়,"—'জীবন লইয়া কি করিব' এই জিজ্ঞাসা অনুরূপ উত্তরের দিকে তাঁকে ঠেলে দিচ্ছে। স্বদেশচিন্তা বা পরাধীনতার চেতনা ও ভাবনা তাঁকে পেয়েছে,—বৃহত্তর দায়িত্বচেতনা দেখা দিচ্ছে। কিন্তু তা সম্পূর্ণ উত্তর নয়। সে উত্তর খুঁজতে হবে। এই খোঁজা, এই অন্বেষণ, এই পরীক্ষা, এই বিচার—জীবন নিয়ে কিছু করতে হলে অপরিহার্য আয়োজন। আত্ম-বিকাশেরও তা আবশ্যিক উদ্যোগ।

সাহিত্যজীবন—দ্বিতীয় পর্ব

বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রকাশ (এপ্রিল, ১৮৭২ খ্রী) থেকে প্রচারের সূচনা (জুলাই, ১৮৮৪ খ্রী) পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের পূর্ণ বিকাশের কাল। তার পরেও সে প্রতিভার বিকাশ খর্বিত হয় নি, মৃত্যু (১৮৯৪, ৮ই এপ্রিল) পর্যন্ত তা অক্ষয় ছিল। শুধু ১৮৮৪ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মজীবন তাঁর সাহিত্যজীবনকে ছাইয়ে দিতে থাকে, সেই ধর্মভাবনাও বাঙলা ভাষায় তখন দাবি করে অসামান্য গদ্য-সাহিত্য—চিন্তাসম্পদ অপেক্ষা শিল্পসম্পদ রূপেও তার গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়। তথাপি বলা যায়—'প্রচার' (১৮৮৪) থেকে প্রধানত ভাবয়িত্রী প্রতিভার প্রাধান্য : কারয়িত্রীর প্রতিভার বিকাশ ১৮৮৪'র পর গৌণ। তখনকার 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) 'দেবী চৌধুরাণী' (১৮৮৪), 'সীতারাম' (১৮৮৭), এই তিন উপন্যাস তাঁর 'অনুশীলনতত্ত্ব প্রচারের ফল'রূপে তিনি গণ্য করেছেন—সৃষ্টির বাহনরূপে নয়। অথচ ১৮৯৩-এর সংস্করণ 'ইন্দিরা' ও সে সময়ের রাজসিংহের সংস্করণ বঙ্কিমের সৃষ্টিপ্রতিভার অক্ষয় স্বাক্ষর। বোঝা যায়—মতবাদ যত প্রবল হোক, প্রতিভা তখন (১৮৯৩) সর্বাধিক সুপরিণত।

বিকাশের পর্বের ঔপন্যাসিক কীর্তিগুলোর কথা এখানে আলোচ্য নয়। কিন্তু তা মনের সামনে রাখা দরকার (রচনাপঞ্জী দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয় পর্বের প্রথম

স্তরে গিয়েছে—(১) 'দুর্গেশনন্দিনী', (২) 'কপালকুণ্ডলা', (৩) 'মৃণালিনী'—এই তিনখানা। এখন (৪) 'বিষবৃক্ষ', (৫) 'ইন্দিরা', (ছোট) (৬) 'যুগলাঙ্গুরীয়', (৭) 'চন্দ্রশেখর', (৮) 'রাধারাণী', (৯) 'রজনী', (১০) 'কৃষ্ণকান্তের উইল', (১১) 'রাজসিংহ' (ছোট) এই আটখানা উপন্যাসের প্রথম প্রকাশ।

দ্বিতীয় স্তরে উপন্যাস আসে (১২) 'আনন্দমঠ', (১৩) 'দেবীচৌধুরাণী', (১৪) 'সীতারাম' এই 'ত্রয়ী'। পরেকার বড় 'ইন্দিরা' ও বড় 'রাজসিংহ' ছোট 'ইন্দিরা' ও ছোট 'রাজসিংহকে' বাতিল করে দিয়েছে—তাই বঙ্কিমের মোট ১৪খানা উপন্যাসের মধ্যে ছয়খানা বিকাশের প্রথম স্তরের সম্পদ। সৃষ্টিমূলক বা উপন্যাস সাহিত্য হিসাবে ১৪খানাই স্বতন্ত্র আলোচ্য। কিন্তু বিকাশকালের প্রধান কীর্তি—শুধু (ছয় বা আট খানা) উপন্যাস নয়। প্রধান কীর্তি বঙ্গদর্শন (এপ্রিল ১৮৭২)—বঙ্কিম-প্রতিভার বিকাশের প্রথম বাহন।

বঙ্গদর্শনের সূচনা বঙ্কিমজীবনের মাহেন্দ্রক্ষণ আর বঙ্গদর্শন বাঙলা সাহিত্যের যে কী, তা তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মনীষীরা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জানিয়ে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কথায়,

> "বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালীর হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল" (জীবনস্মৃতি)। "পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম" (বঙ্কিম-চন্দ্র—প্রবন্ধ)। বঙ্কিম সাহিত্যের 'সব্যসাচী', 'বঙ্কিম সাহিত্যের কর্মযোগী' 'দণ্ডবিধাতা', 'দর্পহারী', 'খড়্গধারী', মহারথী—রবীন্দ্রনাথ লিখিত বঙ্কিমের এসব সার্থক বিশেষণ আজ সুবিদিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ না পড়লেই নয়।

বঙ্কিম অন্তত ১৮৬৫ থেকে বৃহৎ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। ১৮৬৯-৭০ সালে ইংরেজীতে On the Origin of Hindu Festivals. ও A Popular Literature in Bengal নামক প্রবন্ধ পঠিত ও প্রকাশিত হয়, ১৮৭১-এ বেনামীতে প্রকাশিত হয় Bengali Literature প্রভৃতি। 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদনাসূত্রে সেই প্রস্তুতি গভীরতর ও ব্যাপকতর হয়ে ওঠে। তাঁর প্রতিভা জগৎ ও জীবনের নানাদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে; সর্বদিকে আত্মপ্রকাশের তাড়না অনুভব করে; এবং বহুদিকে আপনাকে মেলে দেয়। সেই স্বাতন্ত্র্যধর্মী প্রবল ব্যক্তিচরিত্রকেও সেই তাড়না সুস্থ সবল পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে। বঙ্গদর্শনের নিকট বাঙালীর ঋণ অপ্রতিশোধ্য; কিন্তু বঙ্কিমের কি ঋণ সামান্য? একথা অত্যন্ত সত্য "বঙ্গদর্শন প্রকাশের উন্মাদনায় অসামাজিক বঙ্কিম সামাজিক হইয়া উঠিলেন।" ("বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়," সা. সা. চ.) 'বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা'য় দেখি তিনি সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাঙালীর পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্য ও নৈকট্য স্থাপনে আগ্রহী। বঙ্কিম তখন চাকরি-সূত্রে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয়—এইখানেই ১৮৭৪ সালের প্রথমদিকে স্থানীয় ক্যান্টনমেন্টের কর্ণেল ডাফিনের দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র প্রহৃত হলে মামলা ওঠে। ডাফিন প্রকাশ্য আদালতে ক্ষমা চাইলে সে বিরোধের সমাপ্তি ঘটে।

ব্যাপারটায় বঙ্গসমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ, ১৮৭৪-এ বঙ্কিমচন্দ্র শুধু চাকরিতে উচ্চপদস্থ নন, সমাজে সাহিত্যে সর্বসম্মানিত। বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে (ছুটিছাটা ও পীড়া ছাড়া) চাকরিতে প্রায় পুরো ৪ বৎসরকাল ছিলেন (১৮৬৯, ১৫ই ডিসেম্বর থেকে অন্তত ১৮৭৪ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)। বহরমপুরে তখন সৌভাগ্যক্রমে ঘটছে অভাবনীয় সুধীসমাবেশ—'রীতিমত সাহিত্যের আসর।' ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন, লালবিহারী দে, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে হাইকোর্টের জজ) প্রভৃতি লেখক ও মনীষীদের সঙ্গ তখন বঙ্কিমচন্দ্রকে তৃপ্ত ও উদ্দীপ্ত করে থাকবে। বঙ্গদর্শন প্রকাশে উদ্যোগী হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এঁদের সহায়তালাভ করলেন, আপন উৎসাহে ও প্রভাবে লেখকরূপে এঁদের টেনে আনলেন, নতুন লেখকগোষ্ঠী সৃষ্টি করলেন, 'বঙ্গদর্শনে'র প্রয়োজনমত তাঁদেরও লেখাতে লাগলেন। এইখানেই রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্কিমের আগ্রহে বাঙলা লিখতে প্রতিশ্রুতি দেন। অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র, অগ্রজ বন্ধু জগদীশনাথ রায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি বঙ্গদর্শনে এখন উদিত হলেন। কবি হেমচন্দ্র, কবি নবীনচন্দ্র, 'পজিটিভিস্ট' যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষও তাতে লেখেন। বঙ্কিমের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে এইরূপে বাঙলা সাহিত্য আত্ম-বিশ্বাস লাভ করলে।

'বঙ্গদর্শনে'র উদ্দেশ্য 'পত্র-সূচনা'য় বিবৃত হয়েছে, তা এ ভূমিকায় সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করলেও অন্যায় হত না, তবে তা সম্ভব নয়। (দ্রষ্টব্য, বিবিধ প্রবন্ধ, দ্বিতীয় খণ্ড)। কিন্তু যেকোনো শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে 'বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা' অবশ্যপাঠ্য। বঙ্কিমের উদ্দেশ্য যতটাই সিদ্ধ হোক, 'বঙ্গদর্শনে'র দ্বারা বঙ্কিম মনে করতেন অধিকাংশ সিদ্ধ হয়েছে—দ্রষ্টব্য : 'বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ', (চৈত্র ১২৮২)। বঙ্কিমের প্রয়াস ও কৃতিত্ব অভাবনীয়। 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা', 'চন্দ্রশেখর', যুগলাঙ্গুরীয়' প্রভৃতি রস-সাহিত্য একদিকে ; অন্যদিকে যে একা বঙ্কিমই কী অসাধ্য সাধন করেন, তা বঙ্কিম-সাহিত্যের এ খণ্ডের পাঠকেরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাবেন—এ বিষয়ে বিস্তারিত বলা তাই নিষ্প্রয়োজন। তবে মনে রাখা উচিত—সুপণ্ডিত অন্যান্য লেখকদের নাম ও লেখা স্বভাবতই এখানে উল্লেখিত হয়নি। দেখি—সাহিত্য, সাহিত্য-সমালোচনা, পুস্তক-সমালোচনা, সংগীত, দর্শন, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি এবং ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি মানববিদ্যার ও জ্ঞানবিজ্ঞানের তাবৎ বিষয়ই 'বঙ্গদর্শনে'র আলোচ্য ছিল। এবং সকল প্রসঙ্গেই দেখতে পাই লিপি-কুশলতা, বঙ্কিমের সুবিস্তৃত ও সুগভীর মনস্বিতার, এবং সম্পাদনা-নৈপুণ্যেরও সাফল্য। বঙ্কিম এ কারণেই কর্মযোগী, সব্যসাচী, দণ্ডধারী, মন্ত্ররক্ষী।

চার বৎসর (বৈশাখ, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ, এপ্রিল, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে চৈত্র ১২৮২ বঙ্গাব্দ, মার্চ, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) বঙ্কিম 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনা করেন। যতদূর জানা যায়, 'বন্দেমাতরম্' গানটিও এই পর্যায়েই (আনুমানিক ১৮৭৫) রচিত হয়েছিল—পরে আনন্দমঠে (১৮৮৪) তা অন্তর্ভুক্ত হয়। সম্ভবত বঙ্কিম শ্রান্ত হয়েছিলেন—মাসের পর মাস এরূপ পরিশ্রম ও দায়িত্ব পালনে শ্রান্ত হওয়া

অস্বাভাবিক নয়। অবশ্য তাঁর জীবনজিজ্ঞাসা তখন গভীরতর। সাহিত্য থেকে বিশ্রামের প্রশ্নই ছিল না। হয়তো পারিবারিক দুর্যোগও 'বঙ্গদর্শন' বন্ধের কারণ। তবে 'বঙ্গদর্শন' একেবারে লুপ্ত হলো না। দু বৎসর পরে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' দ্বিতীয় জন্ম লাভ করেছিলো—বঙ্গাব্দ ১২৮৪ থেকে বঙ্গাব্দ ১২৮৯; নবম খণ্ড প্রকাশের পর তা আবার বন্ধ হয়। অর্থাৎ সঞ্জীবচন্দ্রের হাতে চার বৎসর কাল অনিয়মিতভাবে 'বঙ্গদর্শন' চলে।

দায়িত্ব না নিলেও বঙ্কিম সে চার বৎসরও লেখা থেকে নিষ্কৃতি পান নি; তিনি দ্বিতীয়বারের বঙ্গদর্শনেরও প্রধান লেখক। বঙ্কিম-প্রতিভার প্রকাশ ও ক্রমপরিবর্তনের চিহ্নও যে পর্যায়ের বঙ্গদর্শনে দেখা যায়। বঙ্গদর্শনের তৃতীয় জন্ম হয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায়। বঙ্কিম তখন চিন্তার জগতে ধর্মজিজ্ঞাসার দিকে অগ্রসর হয়েছেন। বঙ্গদর্শনের বাহনত্বে আর উৎসাহ নেই, শ্রীশচন্দ্রের সম্পাদনায় বঙ্গদর্শনেরও অচিরেই বিলুপ্তি ঘটে।

দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসাদি রচনার কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে—রচনা-সংগ্রহের যথাস্থানে (দ্বিতীয় খণ্ডে) বঙ্কিমের সৃষ্টিসম্পদের ও তাঁর সৃষ্টিপ্রতিভার পরিচয় গ্রহণ করা হবে। এ খণ্ডে বঙ্কিমের চিন্তাসম্পদের ও ভাবয়িত্রী প্রতিভার পরিচয় গ্রহণ আমাদের প্রয়োজন। বঙ্গদর্শনের সম্পাদনারম্ভ (১৮৭২) থেকেই বঙ্কিমের সেদিকে আহ্বান এসেছিল। শুধু রোমান্স-রসে আর তৃপ্তি নেই—বাঙালী শিক্ষিতদের জ্ঞানবিজ্ঞানে এবং জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে নতুনভাবে সচেতন করতে না পারলে বঙ্কিমের তখন শান্তি নেই। আবার মাসিকপত্র পরিচালনার প্রয়োজনে লঘু রচনা না লিখলে চলে না। সে উপলক্ষে মার্জিত হাস্যরসও যেমন বঙ্কিমকে যোগাতে হত, তেমনি আবার সে লঘু রচনার মধ্যেও তাঁর গভীরতর মনন ও চিন্তার স্পর্শও আপনি এসে জুটতো। এসব অনেক লেখা ক্রমে বঙ্কিম কিছু মার্জনা করে সংযোজিত ও বর্ধিত করে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেন (১৮৭৪) আবার, প্রথম সংস্করণের পরেও তাতে লেখার যোগবিয়োগও চলে। সেসব তথ্য গ্রন্থগুলির 'বিজ্ঞাপন' থেকে আমরা জানতে পারি। এসব গ্রন্থের পরিচয়-গ্রহণকালে সেসব বিজ্ঞাপন প্রভৃতির কথা আমাদের আলোচ্য।

এ পর্বের প্রথম সংস্করণ ধরে প্রকাশিত গ্রন্থাদির হিসাব (১৮৭২ থেকে ১৮৮৪ খ্রী) গ্রন্থপঞ্জীতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরে ভাঙাগড়া অনেক হয়েছে। তাই এসব রচনা কালানুক্রমে না সাজিয়ে এখানে বিষয়ানুক্রমে ভাগ বিভাগ করা অন্যায় হয়। আমরা সম্পূর্ণ না হোক সাধ্যমত সাহিত্য পরিষদ সংস্করণের অনুসরণের চেষ্টা করেছি। পরবর্তীকালের পরিবর্তনের জন্য বঙ্গদর্শনে বা প্রচারে প্রথম প্রকাশকালের উল্লেখ তাই ততটা আবশ্যিক নয়।

মোটামুটি এসব গ্রন্থের প্রকাশকাল (১) 'লোকরহস্য', (১ম সং, ১৮৭৪), (২) 'বিজ্ঞান রহস্য' (১ম সং, ১৮৭৫), (৩) 'কমলাকান্ত' (১ম সংস্করণে নাম 'কমলাকান্তের দপ্তর,' ১৮৭৬, ২য় সংস্করণে 'কমলাকান্ত' ১৮৮৫) (৪) 'বিবিধ প্রবন্ধ' (১ম ভাগ ও ২য় ভাগ), (৫) 'সাম্য' (১৮৭৯, কিন্তু ৩য় ও ৪র্থ পরিচ্ছেদ, বঙ্গদর্শনে ১৮৭২-এ, এবং বাকি পরিচ্ছেদ বঙ্গদর্শনে ১২৮০-১২৮২, খ্রী ১৮৭৩-

১৮৭৫ সালে প্রকাশিত), (৬) 'মুচিরাম গুড়ের জীবনী' (১৮৮৪) ভাবে রূপে এই দ্বিতীয় পর্বের রচনা, সম্ভবত এ জানাই যথেষ্ট। ভাঙাগড়ার যথাযথ উল্লেখ গ্রন্থগুলির পরিচয়কালে প্রয়োজনমত উল্লেখিত এখন হচ্ছে।

ভাবমূলক লেখার মধ্যে প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে 'কৃষ্ণচরিত্র', ১ম ভাগ (১ম সং ১৮৮৬ খ্রী), 'ধর্মতত্ত্ব', ১ম ভাগ (অনুশীলন, ১ম সং, ১৮৮৮)। অবশ্য শ্রীমদ্ভাগবদ্‌-গীতা (মৃত্যুর পরে, ১৯০২ খ্রী প্রকাশিত)। দ্বিতীয় পর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ মুচিরাম গুড়ের জীবনী পর্যন্ত বঙ্কিমের মননসাহিত্য আমাদের 'রচনাসংগ্রহের' প্রবন্ধ খণ্ডের প্রথম অংশে প্রকাশিত হয়েছে।

তৃতীয় পর্ব—অস্তচ্ছটা

এ পর্ব প্রধানত ধর্মচিন্তার পর্ব এবং কতকাংশে একত্রে স্রষ্টা বঙ্কিমের 'অনুশাসন' ও 'মহাপ্রস্থান' পর্ব। উপন্যাসত্রয়েও সেই ধর্মনীতিক উদ্দেশ্য প্রকট, অথচ সৃষ্টিশক্তি যে স্তিমিত হয় নি, তাও বোঝা যায় ('রাজসিংহ' 'ইন্দিরা'র সংস্কার ও পরিবর্ধনের কথা উল্লেখিত হয়েছে)। জীবন লইয়া কি করিব, এ চিন্তা তরুণ বয়স হতেই মনে ছিল। কোনো সময়ই বঙ্কিমের ধর্মবোধ দুর্বল ছিল না। তবে প্রথম দিকে জীবনবোধে ও জগৎবোধে তিনি ছিলেন মুগ্ধ-প্রবুদ্ধ, সৌন্দর্যসৃষ্টির রসসৃষ্টির আনন্দে মশগুল। জীবনজিজ্ঞাসাও সে অনুপাতে তখন বাস্তবমুখী, তাকেও 'ধর্মবোধ' বলতে হয়,—তবে বাস্তবমুখী ধর্মবোধ ও নীতি-বোধ। অন্তত অনেকটা সামাজিক বাস্তবচেতনায় ও বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে সেই ধর্মবোধ পরিচালিত। যেমন জন স্টুয়ার্ট মিলের 'হিতবাদ' (Utilitarianism) ও অগস্ত কোঁৎ-এর প্রত্যক্ষবাদের (Positivism)-এর প্রভাব তখন সচেতনভাবে বঙ্কিম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ভারতীয় নীতি-ভাবনা ও অধ্যাত্মদর্শনাদির প্রতি অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধার আভাসও সেইসঙ্গে দেখা যায়। ক্রমেই এই 'ধর্মবোধ' সেই বাস্তবমুখী দিক থেকে ভাবমুখী দিকে মোড় ফিরতে থাকে, মিলের প্রভাব যেতে থাকে, না গেলেও গৌণ হয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে শোভাবাজার রাজবাটীর একটি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান উপলক্ষ করে স্টেটসম্যান পত্রে প্রিন্সিপাল (পাদ্রী) হেষ্টি সাহেবের হিন্দু ধর্মের প্রতি আক্রমণ ও 'রামচন্দ্র' নামে সেই পত্রে বঙ্কিমচন্দ্রর পাদ্রী সাহেবকে উত্তরদান—এ থেকে বঙ্কিমের এই তৃতীয় পর্বের সূচনাকাল বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু ধর্মবোধের এই ভাববাদী মূল বঙ্কিমের জীবন থেকে কখনও উৎপাতিত হয়নি, তা আমরা পূর্বেই বলেছি। যাই হোক পজিটিভিস্ট সুহৃদ যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষকে লেখা Letters on Hinduismও এ বিতর্কের ফল। বঙ্কিমের ধর্মবোধ ১৮৮২-৮৪ থেকে প্রধানত হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব উদ্ধারে নিবিষ্ট হল। নিজের পরিচালিত 'প্রচার' ও অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'নবজীবন' প্রায় একই সময় প্রকাশিত হয় (১৮৮৪)। এই পত্র দুটি বঙ্কিমের এই ধর্মতত্ত্ব সন্ধানের প্রধান বাহন হয়, 'ধর্মতত্ত্ব' নামে 'নবজীবন'-এ বের হতে থাকে, পরে (১৮৮৮) পরিবর্তিত আকারে গ্রন্থ হয়ে ওঠে। কৃষ্ণচরিত্র 'প্রচার'-এ চলে। তা গ্রন্থাকারে

প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ খ্রী। 'শ্রীমদ্ভগবদগীতার' (অসম্পূর্ণ) ব্যাখ্যা ও দেবতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনা বঙ্কিমের মৃত্যুকাল (১৮৯৪) পর্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল। এই তৃতীয় পর্বের বঙ্কিমের মননশক্তি এই রচনাসংগ্রহের এই প্রবন্ধ খণ্ডের ২য় ভাগে অন্তর্ভুক্ত হল।

মৃত্যুর পূর্বে বঙ্কিম বৈদিক ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেন, ইংরাজীতে বৈদিক সাহিত্য বিষয়ে দুটি বক্তৃতাও 'সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ং ম্যান' (এখনকার ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের তখনকার নাম)-এর সাহিত্য বিভাগের সভাপতিরূপে দেন। বৈদিক যুগ অবলম্বন করে তাঁর উপন্যাস রচনারও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন —শেষ পর্বে বঙ্কিমের উপন্যাসক্ষেত্রে দান—'ইন্দিরা' ও 'রাজসিংহে'র পরিবর্ধিত (এবং বর্তমানে সুপ্রচলিত) সংস্করণ।

প্রসঙ্গত একটি কথা মনে রাখতে পারি—বঙ্কিম ইংরাজী বয়কট করেন নি, এমনকি দেশীয় লোকেদের নিকটে চিঠিপত্র ও বক্তৃতা পাঠ ইংরেজীতে করতে তাঁর আপত্তি ছিল না। বঙ্কিমের এসব ইংরেজী রচনা সাহিত্য পরিষদ ও সাহিত্য সংসদের Bankim Rachanava*li*তে সংগৃহীত হয়েছে। তবে মাতৃভাষাই ছিল বঙ্কিমের সৃষ্টির ভাষা, রচনার প্রধান ভাষা; বঙ্কিমের প্রতিভার স্বাক্ষর তাতেই সুরক্ষিত।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের কর্মযোগী (রবীন্দ্রনাথ)। সে কর্মযোগ লেখাতেই প্রধানত উদ্‌যাপিত হয়েছিল। বাঙলা সাহিত্যে সৃষ্টির ও চিন্তার প্রাণপ্রদ ক্ষেত্র রচনা করার সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর আনুষঙ্গিক হিসাবে দু-একটি কর্ম তাঁকে করতে হয়েছে। রমেশচন্দ্র দত্ত, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখদের সাহিত্য ক্ষেত্রে আকর্ষণ করার কথা আমরা বলেছি। দ্বিতীয় কলেজ ইউনিয়নের (১৮৭৬?) মিলনসভায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম বঙ্কিমদর্শন; রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যার বিবাহে তরুণ রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সস্নেহ অভিনন্দন, এসবও বঙ্কিমজীবনে স্মরণীয় তথ্য। বিশেষত শেষ জীবনে দেখি সেই রাশভারী (সুরেশচন্দ্র সমাজপতি. 'বঙ্কিমচন্দ্র') বঙ্কিম নতুন সাহিত্যিকদের সঙ্গে সাক্ষাতে, আলাপে-আলোচনায় অনেকটা স্বচ্ছন্দ, সহৃদয়, এবং সাহিত্য বিষয়ে নানা উপদেশদানেও অকৃপণ। রবীন্দ্রনাথ, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি বঙ্কিম-চরিতের এদিককার উপাদেয় তথ্য রেখে গিয়েছেন। বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় খণ্ডে, 'বাঙালার নব্য লেখকগণের প্রতি নিবেদন' (প্রচার, ১২৯১ মাঘ—১৮৮৫, ফেব্রুয়ারি) এই সাহিত্যিক পিতামহের উপদেশরূপে বাঙালী লেখকের প্রত্যেকের তা চিরগ্রাহ্য পাথেয়।

সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রশ্ন ('পাবলিক অ্যাফেয়ার্স' থেকে বঙ্কিম দূরে থাকতে চেয়েছেন। তবু নানাসূত্রে প্রায় অনন্যকর্মা এই কর্মযোগীরও দু-একটি সাধারণ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। যেমন স্যার জর্জ ক্যাম্বেলের দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের (নিয়মনের ?) চেষ্টা (১৮৭৩) বঙ্কিমচন্দ্র সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু কেন, তা এখনও অজ্ঞাত। অমৃতবাজার পত্রিকার

তৎকালীন কশাঘাত শুধু জানায় একাজে দেশের লোক তাঁকে সমর্থন করে নি। ওইরূপই বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক সামাজিক আন্দোলনের প্রতি বিরাগ, ও রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে নিস্পৃহতা, মাত্রাতিরিক্ত বলে মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশভক্তি তর্কাতীত; তাঁর রাষ্ট্রীয় চিন্তা স্বতন্ত্র আলোচ্য। কিন্তু ১৮৫৭-৫৮-এর সিপাহি যুদ্ধ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাঙালীর মনে সহানুভূতির সৃষ্টি করে নি; তখনকার কলেজীয় যুবক বঙ্কিমের মনেও তা রেখাপাত না করার কথা। পরন্তু হিন্দুমেলায় তাঁর উৎসুক্য দেখি না। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এবং কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সহানুভূতি থাকলেও তিনি এসব সংগঠনে যোগদান করেন নি। তবে কংগ্রেস বিষয়ে তাঁর মন্তব্য অত্যন্ত খাঁটি। "উহা (কংগ্রেস) সাধারণ লোকের সাধারণ সম্পত্তি হয় নাই" (বিজয়লাল দত্ত—বঙ্কিমচন্দ্র)। বঙ্কিমের কালে অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'সাধারণী' নামে পত্রিকা এদেশে প্রকাশিত করলেও সাধারণ মানুষের গুরুত্ব মধ্যবিত্ত শিক্ষিতদের দ্বারা বিশেষ স্বীকৃত হত না। শিক্ষায় দীক্ষায়, জীবনযাত্রায় বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সম্পন্নমধ্যবিত্ত, উচ্চবর্ণের ভদ্রলোক এলিট। তাঁর উদ্দিষ্ট বাঙালী পাঠকও সে শ্রেণীর। এদেশে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা ডিমোক্র্যাসির কথা ভাবতেন কিনা তাও সন্দেহ। প্রথম থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু লোকশিক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি করেছেন। প্রচলিত শিক্ষার ফিল্‌ট্রেশন থিওরি বা 'উপর থেকে চুঁইয়ে পড়া' শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষানীতির ব্যর্থতা তিনি বুঝেছিলেন, এবং উচ্চশিক্ষা অপেক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার আপেক্ষিক গুরুত্বও উপলব্ধি করেছিলেন। এই কথাগুলি তাঁর শিক্ষাবিষয়ক দূরদৃষ্টির প্রমাণ। তবে অন্যান্য বিষয়ের মতো শিক্ষা-বিস্তারেও কার্যক্ষেত্রে কিছু করেন নি—একান্তভাবেই তিনি ছিলেন 'সাহিত্যের কর্মযোগী'—অবশ্য শেষ জীবনে নিছক গীতার নিষ্কাম কর্মের ব্যাখ্যাতা।

বঙ্কিমের চিন্তা-সম্পদ

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনে 'কারয়িত্রী প্রতিভা' ও 'ভাবয়িত্রী প্রতিভা' দুয়েরই সমান প্রকাশ দেখা যায়। প্রথম পর্বে (মৃণালিনী রচনা পর্যন্ত) রসসৃষ্টিতে তিনি নিবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু, 'এ জীবন লইয়া কি করিব?'—বঙ্কিম-জীবনের এই মূল জিজ্ঞাসা রস-মুগ্ধতায়ও চাপা পড়বার নয়। তখনো এ জিজ্ঞাসা তাঁকে জীবন সম্বন্ধে ভাবিয়েছে। রোমান্টিক মোহ ছাড়িয়ে জীবনের বাস্তব রূপ—সমাজ-জীবন, জাতীয় জীবন, সাংস্কৃতিক জীবন, এবং তাঁর নিজের অধ্যাত্মজীবন—সব সম্বন্ধেই ভাবিয়েছে এবং ভাবিয়েছে—যুগ-জীবনের প্রেক্ষাপটে জীবনের এসব বিবিধ রূপের মূল্য বুঝতে; আবার সমগ্রভাবে জীবনের মূল্যায়নে। ভাবনা যে কী ধারায় বাহিত হচ্ছিল তাঁর তখনকার লিখিত ইংরেজী প্রবন্ধ কয়টিতে সে চিহ্ন দেখি—প্রথম ও দ্বিতীয় প্রবন্ধ On the Origin of Hindu Festival ও A Popular Literature for Bengal (বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনে পঠিত, সমিতির ট্রান্‌জেক্‌শান্‌স-এ ১৮৬৯ ও ১৮৭০-এ যথাক্রমে প্রকাশিত); তৃতীয় ও চতুর্থ প্রবন্ধ Bengali Literature ও Buddhism and

Sankhya Philosophy (ত্রৈমাসিক ক্যালকাটা রিভিয়্যু, ১৮৭১)। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের (১৮৭২ এপ্রিলে) সংকল্পেই পরিষ্কার—তাঁর ভাবনা তিনি বাঙলায় প্রকাশ ও পরীক্ষা করা স্থির করেছেন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ ইংরেজী প্রবন্ধ, The Confessions of a Young Bengali (১৮৭২, ডিসেম্বর) ও The study of Hindu Philosophy (১৮৭৩, মে) 'মুখার্জিস ম্যাগাজিন'-এ 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের পরে প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা'য় তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন—তাঁর ভাবনা কোন্ বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত :—দেশের শিক্ষিতশ্রেণীকে উন্নত জ্ঞান ও রসবোধে উন্নত করে দেশের সামগ্রিক মঙ্গলসাধন ; সে উদ্দেশ্যে বাঙলা ভাষায় সেই শ্রেষ্ঠ চিন্তার ও ভাবনার পরিবেশন।

বঙ্কিমের মনন-শক্তি ও সৃজন-শক্তি দুই-ই বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের সঙ্গে উজান বইতে থাকে। ত্রিশ বৎসরের সাহিত্য জীবনে (১৮৬৫-১৮৯৪) ক্রমে দেখতে পাই—ভাবয়িত্রী প্রতিভা মুখ্য হয়ে উঠল, কারয়িত্রী প্রতিভা গৌণ হয়ে গেল। জীবন-জিজ্ঞাসা বঙ্গদর্শনে সন্ধানী যুগ পার হতে থাকে, 'প্রচার' ও 'নবজীবনে' ধর্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যায় ও গীতার ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ করে। ভাবয়িত্রী প্রতিভা স্বদেশের জাতির বাস্তব সমস্যা ও জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, শিক্ষাদীক্ষা, এবং আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নানা দান ও আধুনিক ('পাশ্চাত্য') সভ্যতার ভাবাদর্শ (idelogy) প্রভৃতি বিচার করতে করতে শেষ অবধি গীতার নিষ্কাম কর্মে ও ভগবদ্ভক্তিতে এসে জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর পেল। বঙ্কিম নিজে জানিয়েছেন,

> "আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত পরিবর্তন করিয়াছি—কে না করে ?"

কৃষ্ণ বিষয়ে তাঁর মতের বিপুল পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে কৃষ্ণচরিত্রে (বিজ্ঞাপন, ১৮৯২ খ্রী) তিনি বলেছেন,

> মত পরিবর্তন বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল। যাঁহার কখনো মত পরিবর্তন হয় না, তিনি হয় অভ্রান্ত দৈবজ্ঞানবিশিষ্ট, নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন।"

কথাটা মিথ্যা নয়—পরিবর্তন সাধারণত স্বাভাবিক। কিন্তু বিচার্য হল—পরিবর্তন কি ইতিহাসের সঙ্গে তাল রেখে ইতিহাসের দাবি অনুযায়ী পরিবর্তন, না, ইতিহাসের গতির বিরুদ্ধে পরিবর্তন ? যুগাদর্শের থেকে পিছিয়ে পড়া, না এগিয়ে যাওয়া ? কারণ, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মানুষের মনের স্থির পরিণতি যেমন স্বাভাবিক, সময়ে সময়ে দেহমনের নিস্তেজতাও তেমনি স্বাভাবিক। তাতে কর্মে পৌরুষের ও চিন্তায় সাহসের ক্রমক্ষয় সম্ভব, তাও মিথ্যা নয়। অবশ্য দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতেই এ বিচার সম্ভব। ইতিহাসের প্রয়োজন সম্বন্ধেও নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। তার পূর্বে সাধারণভাবে বোঝা দরকার—বঙ্কিমের নিজস্ব বক্তব্য কী। তাঁর বহুমুখী আলোচনার কোনো বিশেষ উক্তি বা উদ্ধৃতি দ্বারা সে বক্তব্য স্থির করা ঠিক নয়। প্রথমত, সাধারণভাবে, তাঁর বিশিষ্ট বিশিষ্ট রচনার পরিচয় গ্রহণ প্রয়োজন। সেই সূত্রে চিন্তার গতিধারা বা পরিবর্তনের মূল ধারাটি জানা হলে অনুভব করা সহজ হয়—

কোথা থেকে আরম্ভ করে কোথায় লেখক যাচ্ছেন ; সেই মতবাদে পৌঁছুবার জন্য কোন্ কোন্ ভাবনা তিনি ত্যাগ করছেন, কোন্ কোন্ ভাবনা গ্রহণ করছেন, কোন্ কোন্ ভাবনাকে আপন মতের অনুরূপে মণ্ডিত করছেন ; এবং কেন সেইসব বর্জন-গ্রহণ ? বঙ্কিম-মানসের কোন্ গভীর প্রেরণার বশে ?

জিজ্ঞাসা-বৈচিত্র্য

বঙ্কিমের সাহিত্য-জীবনের প্রকাশপর্বে যে দুটি কালানুক্রমিক ভাগ আমরা দেখেছি অনেকটা তারই সঙ্গে ভাবনাধারারও কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মূলত একটিকে বলা যায় বহুমুখী জিজ্ঞাসার পর্ব (রচনাসংগ্রহের প্রবন্ধ খণ্ড প্রথম অংশে প্রকাশিত), অন্যটিকে (বর্তমান প্রবন্ধ খণ্ডের দ্বিতীয় অংশে প্রকাশিত) ধর্মজিজ্ঞাসার পর্ব। পর্বদুটি বিচ্ছিন্ন নয়, তা বলাই বাহুল্য ; জিজ্ঞাসা কখনই থামে নি, ধর্মভাবনাও বরাবরই ছিল। প্রথম পর্বের ভাবনার বাহন বঙ্কিমের প্রবন্ধ-পুস্তকগুলি ; দ্বিতীয় পর্বের ভাবনার বাহন 'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রভৃতি ধর্মসাহিত্য। অনেকটা মুদ্রণ ও আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা এখানে দুই ভাগে বঙ্কিমের চিন্তাসম্পদের পরিচয় গ্রহণ করেছি। এই মননসাহিত্যের (পূর্বপ্রকাশিত) প্রথমভাগে দেখতে পাই অজস্র বিষয় ও নানা প্রকাশভঙ্গি। ভাবের ও ভঙ্গির এই বৈচিত্র্য অবশ্য মাসিকপত্র পরিচালনায় প্রয়োজনীয়। কিন্তু তা ছাড়াও বুঝি—বঙ্কিমের জিজ্ঞাসু মন বহু বিষয়ে আকৃষ্ট হত ; তাঁর সৃষ্টি-কুশল মন ভঙ্গির বৈচিত্র্য ছাড়া তৃপ্ত হত না—এ কথাও অনুভব করা যায়। স্বদেশের প্রাচীন কীর্তি, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, ইতিহাস, সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা একদিকে, অন্যদিকে বিদেশের প্রাচীন কীর্তি, সাহিত্য, দর্শন, সমাজনীতি এবং সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বসমূহ—সবই বঙ্গদর্শনের আলোচ্য ও বিচার্য, সে আলোচনার প্রায় সবই আবার বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত। 'উত্তরচরিত', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'সাংখ্য-দর্শন', 'মনুষ্যত্ব কি ?' ('হিন্দু ধর্মের নৈসর্গিক মূল বা ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে') 'বঙ্গদেশের কৃষক', 'সাম্য' এবং 'ভারত-কলঙ্ক', 'বাঙ্গালার ইতিহাস', 'বাঙ্গালার উৎপত্তি' প্রভৃতি ঐতিহাসিক গবেষণা—শুধু প্রবন্ধের নামগুলি দেখলেও বিস্মিত হতে হয়। তা ছাড়া, প্রসঙ্গক্রমে প্রথম আন্তর্জাতিকের তত্ত্ব, সঙ্গে সঙ্গে রুশো, ভোলতের, ফুরিয়র, সাঁ সিমোঁ, লুই ব্ল্যা, ওয়েন্ প্রভৃতির মতবাদ, ডার্বিন, কোঁৎ, হার্বার্ট স্পেনসার প্রভৃতি সমাজ-বিজ্ঞানীদের ভাবনা—কিছুই বঙ্কিম বাদ দেন না। 'বিজ্ঞান রহস্যে,' বিবিধ প্রবন্ধে' গম্ভীর আলোচনায় ও প্রবন্ধাকারে এসব বিষয় যেমন পরিবেশিত হচ্ছে, তেমনি 'লোক-রহস্যে'র লঘু হাস্যে, রঙ্গ ও ব্যঙ্গের আড়ালেও তা উঁকি দিচ্ছে। আবার কখনো 'কমলাকান্তে' কল্পনায় হৃদয়াবেগ মিলিয়ে সে ভাবনা অপূর্ব রসসম্পদে পরিণত হচ্ছে। এসব গ্রন্থে বঙ্কিমের চিন্তাসম্পদ 'বঙ্গদর্শন' ও 'প্রচার' থেকে সংকলিত হয়ে নিবদ্ধ হয়েছে।

নানা প্রসঙ্গে এইসব গ্রন্থে কয়েকটি বিষয় ও ভাবনা বারে বারে দেখা

দেয়। যেমন, ভারতের ইতিহাস, বাঙলার ইতিহাস, জাতীয় কলঙ্ক, ভারতের দর্শন, ধর্ম-চেতনা আর সর্বোপরি জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত নানা কথা—এইসব একদিকে। অন্যদিকে, আধুনিক সভ্যতার প্রধান বাহন বিজ্ঞান ও আধুনিক সমাজদর্শনের আলোচনা। সকলে মিলে বঙ্কিমের চিত্তের প্রবণতার ও জটিলতার সন্ধানও তাতে পাওয়া যায়। তার কারণ বুঝবার মতো।

স্মরণ করতে পারি, বংশগত ও পরিবেশগত উত্তরাধিকারে বঙ্কিম হিন্দু সনাতন সমাজের ঐতিহ্যের অধিকারী। হিন্দুধর্ম, হিন্দুসমাজ ও হিন্দুসংস্কৃতিতে তাঁর জীবনমূল প্রোথিত। দ্বিতীয়ত, বঙ্কিম নিজস্ব যে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তাও আমরা জানি—ভাবুকতা, কল্পনা-কুশলতা এবং আত্মাভিমান—বঙ্কিমের স্বভাবগত গুণ। এই বংশগত ও স্বভাবগত প্রবণতার সঙ্গে পরে যোগ হয় তাঁর আহরিত শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রসৃত জীবন-জিজ্ঞাসা। এই তিন প্রবণতার যোগাযোগে তিনি যে ভাবে গঠিত হয়ে উঠেছিলেন, তাতে দেখি বঙ্কিমের ব্যক্তিগত আত্মাভিমান জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধে (সমষ্টিগত রূপে) পরিণত ও পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাই প্রায় প্রথম থেকেই বঙ্কিম-মানসের প্রধান এক ধর্ম স্বাজাত্যবোধ।

প্রধান প্রবণতা॥ জন্ম ও পরিবেশগত উত্তরাধিকারে এ 'জাতীয়তা' বঙ্কিমের পক্ষে হিন্দু জাতীয়তা। 'স্বদেশপ্রীতি' ও 'হিন্দু-জাতীয়তা' বঙ্কিমের সত্তার সঙ্গে মিশে এক হয়েছিল।—পৃথক না থেকে এ দুই জিনিস তাঁর লেখায়ও প্রায়ই এক; 'স্বাজাত্য' তাঁর পক্ষে প্রায়ই 'হিন্দু জাতীয়ত্ব'। তার একটা কারণ—'ভারতীয় জাতীয়তা'র স্বরূপ তখনো অপরিস্ফুট ছিল—তা কতটা 'হিন্দু ভারতীয়' (বা প্রাচীন ভারতীয়) সংস্কৃতির ওপর স্থাপিত হতে পারে; কতটা আবার 'বাঙালী', 'মরাঠী', 'তামিল' প্রভৃতি মধ্যযুগ থেকে উন্মেষিত বিভিন্ন 'জাতীয় সত্তা'র বিকাশ হবে, কিম্বা, কতটা ব্রিটিশ শাসন-বন্ধনে একত্রিত 'নিখিল ভারতীয় জাতীয়তা'রূপে সংহত 'এক-জাতীয়তা' হয়ে উঠবে, তখনো কেন, এখনো তা স্পষ্ট হয় নি। বঙ্কিমের চিন্তায় এইরূপে হিন্দু জাতীয়তা, বাঙালী জাতীয়তা ও ভারতীয় জাতীয়তা প্রভৃতি তিন ধারণারই চিহ্ন দেখা যায়। কিন্তু প্রাধান্য দেখা যায় 'হিন্দু জাতীয়তা'র ধারণার। তাই প্রাচীন ভারতীয়ত্ব বিষয়ে বঙ্কিমের জিজ্ঞাসা প্রবল ছিল; এবং আদি ও মধ্যযুগীয় বাঙালীত্বের স্বরূপ সন্ধানেও তাঁর ছিল দুর্বার আগ্রহ—এই দুই স্বাজাত্যবোধে প্রধান জিজ্ঞাসা হয়ে ওঠে।

এই স্বাজাত্যাভিমান ও স্বদেশপ্রীতি বিষয়ে প্রসঙ্গত আরও দু-একটি কথা বুঝবার মতো। বঙ্কিম বাঙলা ভাষায় লিখেছেন, বাঙালী পাঠকের জন্য লিখেছেন। স্বভাবতই বাঙালী জাতি ও বাঙালী ঐতিহ্যের স্বরূপ তাঁদেরও বিশেষ জিজ্ঞাস্য। সমস্ত ভারতবাসীর জন্য লিখতে হলে ইংরেজি ভাষাতেই লিখতে হবে—এই ছিল তাঁর সুচিন্তিত মত ('বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনা' দ্রষ্টব্য)। এই কথাটাও মনে রাখা প্রয়োজন। তাই বঙ্কিমের লেখায় বাঙালী ও বাঙলার কথা ভারতবাসী ও ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেক বেশি। কিন্তু বঙ্কিমের মনে

কোনো সন্দেহ ছিল না, 'বাঙালীত্বে' ও 'ভারতীয়ত্বে' কোনো বিরোধ নেই। বাঙালী জাতি ভারতীয় মহাজাতির অঙ্গ, বাঙালী সংস্কৃতির ঐতিহ্য ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার এক বিশেষ প্রকাশ। একথা তখন স্পষ্ট করে বলা বঙ্কিমের প্রয়োজন হয় নি—কিন্তু একালে কথাটা আমাদের পক্ষে বোঝা প্রয়োজন। যদিও তার স্পষ্ট উক্তি নেই, তথাপি বঙ্কিমও অনুভব করতেন, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই ভারত-জীবন ও ভারত-পথ। তাঁর 'বন্দেমাতরম্' বঙ্গ-মাতার ধ্যানে উদ্‌বুদ্ধ, সমভাবেই ভারতমাতারও বন্দনা। এমনকি বিশ্বমাতার বন্দনাও হতে পারে।

এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় কথা: ভারতীয় জাতি, বিশেষ করে আবার হিন্দু জাতি—বাস্তব পৃথিবীতে পরাজিত জাতি। পরাজয়ের বেদনা ও গ্লানি পরাজিত জাতিকে স্বস্তি দেয় না। একই কালে তা তাকে আত্মমর্যাদাবোধে প্রবুদ্ধ ও প্রবল করে তোলে ('জাতিবৈরিতা' পরাজিতের স্বাভাবিক আশ্রয়, বঙ্কিমও মনে করতেন।) আবার বাস্তব-বিচারের ক্ষেত্রেও নানাভাবে পরাজিতের মনকে—জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে—বেঁকেচুরে তার ভাবনা ও যুক্তিধারাকেও জটিল ও বিভ্রান্ত করতে থাকে। বঙ্কিমের বেলাও তাই ঘটে। বঙ্কিমের প্রতিভা বলিষ্ঠ; তথাপি, কি সাহিত্যসৃষ্টিতে কি ভাবনাক্ষেত্রে, ভারতের অস্বাভাবিক জাতীয় পরিস্থিতিতে এবং আপনার তীক্ষ্ণ জাতীয় মর্যাদাবোধে সে প্রতিভা নিজের প্রতি অনেক সময়ে সুবিচার করতে পারে নি।

জটিল মানসিকতা ॥ কিন্তু স্বাজাত্যবোধ ও হিন্দু চেতনায় জটিলতা ঘটায় বঙ্কিমের আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত মন। আধুনিক সভ্যতার শক্তি ও সম্পদের দ্বারা বঙ্কিম আকৃষ্ট ও প্রভাবিত। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করতেন—এ সভ্যতা তাঁর দেশের আপনার নয়। বঙ্কিমের জাত্যভিমান তাই এ সভ্যতায় সম্পূর্ণ স্বস্তিবোধ করতে পারে না।

এদিকে উনবিংশ শতকে আপনার চক্ষের সম্মুখে বঙ্কিম দেখছেন এই আধুনিক সভ্যতার জয়-জয়কার। এমনকি, বঙ্কিমের রসবোধ, সংস্কৃত কাব্যের মতোই, ইংরেজি সাহিত্যেও মুগ্ধ। বরং, তাঁর কারয়িত্রী প্রতিভা 'পাশ্চাত্য' (আধুনিক) সাহিত্যাদর্শকে নিজের সাহিত্যাদর্শরূপে স্বীকার করে নিয়েছে, কাদম্বরী, কুমারসম্ভবে তা আর ফিরে যেতে পারে না। তাঁর ভাবনা-চিন্তাও এই আধুনিক শিক্ষায় শাণিত ও প্রবুদ্ধ। তিনি অন্তরে অন্তরে বোঝেন—আধুনিক বিজ্ঞানের দান, প্রযুক্তিবিদ্যা, যন্ত্রশিল্প ও বাস্তব কর্মোদ্যম মানবজাতির এক অভূতপূর্ব সম্পদ, ইতিহাসের নবলব্ধ সত্য। সে সবকে যে জাতি অস্বীকার করবে সে জাতি নিজেই পৃথিবীতে অস্বীকৃত হবে। তাই মহেন্দ্রলাল সরকারের ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভার প্রস্তাবে বঙ্কিমের অকুণ্ঠ উৎসাহ ও সমর্থন। কারণ তিনি জানেন—এবং শিক্ষিত বাঙালীকে তা জানাতেও চান—

> "বিজ্ঞানের সেবা করিলে বিজ্ঞান তোমার দাস, যে বিজ্ঞানকে ভজে, বিজ্ঞান তাহাকে ভজে। কিন্তু যে বিজ্ঞানের অবমাননা করে বিজ্ঞান তাহার কঠোর শত্রু।...

"...যে বিজ্ঞান স্বদেশী হইলে আমাদের দাস হইত, বিদেশী হইয়া সে আমাদের প্রভু হইয়াছে। আমরা **দিন দিন নিরুপায় হইতেছি।**" ইত্যাদি (দ্রষ্টব্য—বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ১২৭৯; এবং ১৮৭৫ সালের বিজ্ঞান-রহস্যের বিজ্ঞাপন)।

মনুষ্যত্বের স্বরূপ-সন্ধান ॥ শুধু বিজ্ঞান নয়, বুর্জোয়া সভ্যতার ও সাহিত্যের যা মূল সত্য তা humanism—মানুষের মনুষ্যত্ববোধ, 'মরজীবনের প্রত্যক্ষ সম্ভাব্যতায় ও মহিমায় বিশ্বাস'—মানবিকতা বা মানবধর্মবাদ। বঙ্কিম মনে-প্রাণে তার দ্বারা প্রবুদ্ধ—তাঁর সৃষ্টি-চেতনায় তা প্রথম থেকেই রসরূপ লাভ করেছে। যতই হিন্দু ঐতিহ্যে বঙ্কিম বর্ধিত হোন, এই মানবতাবোধের জন্য উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় মানবধর্মবাদী, নিরীশ্বর চিন্তাগুরুদের জ্ঞান ও মানবিকতা বঙ্কিমের নিকট তখন বিশেষ শ্রদ্ধেয়, তিনি মানেন, ফরাসী বিপ্লবের পরে ইউরোপে তাঁরা মানব-উন্নতির নূতন পথ সন্ধান করছেন।

জেরেমি বেন্থামের (১৭৪৮-১৮৩২) স্থান রুশো, দিদেরোর পরেই। বেন্থামের 'হিতবাদ', (Utilitarianism—'প্রভূততম লোকের প্রচুরতম সুখ সাধনে'র তত্ত্ব) রামমোহনের সময় থেকে বাঙালীদের পরিচিত। ইংরেজি শিক্ষিত জগতে তার বিশেষ প্রভাব। জন স্টুয়ার্ট মিল-এর (১৮০৬-১৮৭৩) হাতে সেই 'হিতবাদী' ধারা আরও উৎকর্ষ লাভ করেছে। মিলের যুক্তিবাদেও (Rationalism) বঙ্কিমের মন বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছে। অনেকটা মিলের সহায়তায় বেন্থামের 'হিতবাদ' বঙ্কিমের জিজ্ঞাসু মনে একটা সুপরিণত রূপ গ্রহণ করে। সুখের ইতরবিশেষ নেই—বেন্থামের এই মর্মের বক্তব্যে মিলের সায় ছিল না, বঙ্কিমেরও না। সুখের ইতরবিশেষ আছে—সতরঞ্জ খেলার সুখ ও শেক্‌স্‌পীয়র পাঠের সুখ এক নয়, সমানও নয়, তাই বেন্থামের মতো শুধু 'প্রচুরতম সুখ' (Quantitative Pleasure) মানুষের কাম্য বললে মিলের (ও বঙ্কিমের) বিবেচনায় যথেষ্ট হয় না। প্রকৃষ্ট সুখ (Qualitative Pleasure) অনেক উন্নত সুখ,—তা-ই প্রকৃত সুখ। বঙ্কিমের বিচারে—প্রকৃত সুখ ক্ষণিক সুখ নয়,—স্থায়ী কল্যাণ, স্বার্থপরতার সুখ নয়,—পরার্থপরতাই প্রকৃত সুখ। মানব-প্রীতিতেই সুখ; এই সুখই জীবনে অভিপ্রেত। তাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব। আবার আরেকটি কথা—ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে খর্ব না করে মিল সমাজ সাম্যের ('সোশ্যালিজম'-এর) তত্ত্ব স্বীকার ও প্রচার করেছিলেন। বোঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রও সাম্যতত্ত্বকে একটা মহৎ তত্ত্ব বলে অনুভব করতেন। কিন্তু সে তত্ত্ব সম্পূর্ণ মানতেন না। মিলের নাস্তিকতাতেও নিশ্চয়ই তিনি অস্বস্তিবোধ করতেন। তাছাড়া, মিলের অনুসরণে বঙ্কিমচন্দ্র অগস্ত কোঁৎকেও (১৭৯৮-১৮৫৭) মোটেই পরিহাস করতে চান নি। কোঁৎও নিরীশ্বরবাদী, তাঁর নীতি 'প্রত্যক্ষবাদ' (Positivism-এর বাঙলায় এই নামই আমরাও রক্ষা করছি)। এই তত্ত্ব অবলম্বন করেও কোঁৎ দেখেন—মানুষ কিছু একটা আদর্শকে পূজা করতে চায়। তাই তিনি মানব-দেবীর (Religion of Humanity) পূজার বিধান দেন, ও সমাজ-ভক্তির পরামর্শ দেন। বঙ্কিমের নিকট কোঁৎ-এর নিরীশ্বরবাদ

অগ্রাহ্য ; তথাপি কোঁৎ-এর উপরোক্ত কথা দুটি আদরণীয়—বঙ্কিমের মতে শুধু প্রভূততম মানুষ নয়, সমাজের এক অংশের নয়,—সমগ্র মানবসমাজের সুখই হওয়া উচিত জীবনের লক্ষ্য। এবং সমাজকে বৈষম্যের জন্য, অন্যায় উৎপীড়কদের জন্য অগ্রাহ্য করাও উচিত নয়, সমাজকে মান্য করাই হচ্ছে সাধনার পদ্ধতি। কোঁৎ অবশ্য প্রত্যক্ষজ্ঞান ও বিজ্ঞানকে জীবন-জিজ্ঞাসার আশ্রয় বলে নির্ভর করেছেন—অপ্রত্যক্ষ ভাববাদী ভাবনাকে (metaphysics-কে) মনে করেছেন নিরর্থক। প্রত্যক্ষ সত্যই সত্য, 'পজিটিভিজম'এর এই মূল তত্ত্ব। বাঙালী অগ্রগামী শিক্ষিত সমাজের নিকট (যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জস্টিস দ্বারকানাথ মিত্র) সে সময়ে পজিটিভিজম্ বিশেষ সমাদৃত। তাঁরা কলিকাতায় 'পজিটিভিস্ট গোষ্ঠী'ও গঠন করেছিলেন। তাঁরা কেউ কেউ (যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য) বঙ্কিমের বন্ধুস্থানীয় ; বঙ্কিমও কোঁৎ-এর বিশেষ অনুরাগী, 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম থেকেই তা স্পষ্ট (বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষে শ্রাবণ সংখ্যায় কোঁৎ বিষয়ক আলোচনা তারই নিদর্শন)। আমরা অবশ্য জানি শেষে মিলকে বঙ্কিম ত্যাগ করেন। কিন্তু কোঁৎকে তিনি একেবারে উড়িয়ে দেন নি (ধর্মতত্ত্ব, ১৫শ অধ্যায়), আমরা তা দেখতে পাব।

দ্বৈত প্রবণতা ॥ এই আধুনিক সভ্যতার বাস্তববাদীদের মানববাদ, জীবনবাদী চিন্তা ও যুক্তিধারার প্রতি শ্রদ্ধা বঙ্কিম-মানসের প্রধান অন্য একটা প্রবণতা। কিন্তু সেই সঙ্গেই দেখতে পাই—তিনি সম্পূর্ণ তা গ্রহণ করেন না। বঙ্কিম আজন্ম হিন্দু সংস্কারে বর্ধিত। নাস্তিকতা ও জড়বাদে কেন, মিল-কোঁৎদের ঐহিক দর্শনে বা বস্তুবাদেও কখনো তাঁর বিশ্বাস নিরঙ্কুশ নয়। তিনি ঐতিহ্যাশ্রয়ী, সনাতন সমাজের মানুষ—সমাজকে ভক্তি করেন। তিনি বুঝছেন, আধুনিক সভ্যতা ভারতের চিরাগত ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সবকিছু ভেঙেচুরে যুগ-সম্মত রূপান্তরের দিকে ভারতীয় সমাজকে এগিয়ে না দিয়ে ছাড়বে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে বাঙালী হিন্দু তাতে তাই প্রায় বিপর্যস্ত। কাজেই বঙ্কিম আপনার জন্মগত সংস্কারে ও জাত্যভিমানে এই আধুনিক সভ্যতাকে সর্বাংশে গ্রহণ করতে অক্ষম। রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জাতিরা আমাদের পরাজিত করেছে ; কিন্তু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমরা অপরাজেয়—আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি এই পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠ চিন্তার মানদণ্ডেও উৎকৃষ্ট, অধ্যাত্মসম্পদে এ সংস্কৃতি বহুগুণ ঐশ্বর্যশালী—এই জাতীয় মর্যাদাবোধ বঙ্কিম-মানসে দৃঢ়মূল। বঙ্কিমের ভাবয়িত্রী প্রতিভা তাই শিক্ষাপ্রভাবে যেমন এই সভ্যতার সম্পদ, বিজ্ঞানের দান ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি-পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট, এই জগৎ ও জীবনকে মায়া বলে উড়িয়ে দিতে অস্বীকৃত, —সংস্কারবশে ও জাত্যভিমানে তেমনি বিজয়ী ও বিজয়োদ্ধত জাতির সভ্যতার বিষয়ে সন্দিহান।

প্রথম থেকেই এই দ্বৈত-প্রবণতার (ambivalence) মধ্য দিয়ে পথ সন্ধান করতে করতে বঙ্কিমের জীবন-জিজ্ঞাসা অগ্রসর হয়। আমরা দেখি—কখনো গম্ভীর প্রবন্ধ, কখনো লঘুহাস্য, কখনো বক্রব্যঙ্গ, কখনো শুধু সংশয়মিশ্রিত উক্তি—নানা ভঙ্গিতে তাঁর এই দ্বিধা ব্যক্ত হয়েছে। আবার, ভাবয়িত্রী প্রতিভা

গম্ভীর ও সরস নানা ভঙ্গিতেই চেয়েছে জাতীয় ঐতিহ্যকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে। বঙ্কিমের প্রবন্ধ-পুস্তকগুলিতে সেই চেষ্টাই প্রবল। কিন্তু ক্রমেই বঙ্কিমের মন ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অধিকতর পক্ষপাতী হয়ে উঠছে, তাও দেখা যায়। বিশেষ করে দেখা যায়, হিন্দুধর্মের মধ্যে তিনি দেখতে পান সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপথ।

পুস্তক-পরিচয়

বঙ্কিম-মানসের এই মূলসূত্র মনে রেখে এবার আমরা (আমাদের রচনাসংগ্রহের প্রথম খণ্ডের প্রথম অংশে মুদ্রিত) প্রবন্ধ-পুস্তকগুলির পরিচয় গ্রহণ করতে পারি। (প্রতি গ্রন্থের বিজ্ঞাপনাংশের প্রয়োজনীয় তথ্য এই 'সংগ্রহ'মালার প্রতি পুস্তকের শেষে উল্লেখিত হয়েছে, তা অবশ্য দ্রষ্টব্য)।

লোকরহস্য ॥ 'বঙ্গদর্শনে'র পাঠককে গুরুগম্ভীর রচনার ভার থেকে কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে দিতে হবে, বঙ্কিম তা অনুভব করতেন। প্রথম সংখ্যা থেকেই ব্যবস্থাও করেছিলেন। 'লোকরহস্যে' সেসব লঘু রচনা সংকলিত হয়। প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিম জানিয়েছেন (১৷১ পৃ. ৬৫) কি রকমের 'কৌতুক' বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এ গ্রন্থে পাওয়া যাবে—'এ গ্রন্থে শ্রেণীবিশেষ বা সাধারণ মনুষ্য ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কোন ইঙ্গিত নাই।'

'লোকরহস্য' বঙ্কিমের ভাবয়িত্রী প্রতিভা অপেক্ষা সরস মনের ও উদ্ভাবনা-ক্ষমতারই পরিচায়ক। বঙ্কিমের প্রধান রচনার মধ্যে এখনকার দিনে 'লোক-রহস্যে'র কেউ স্থান দেবে না। কিন্তু মনে রাখা দরকার—যখন এসব লেখা রচিত হয় তখনো বাঙলা সাহিত্যে এ ধরনের হাস্যরসের অভিনবত্ব ছিল। বাঙালী পাঠক বরাবর হাস্যরস পছন্দ করত, তা সত্য। কিন্তু তার যে বিশেষ ধারার সঙ্গে বাঙালীর এতকাল পরিচয় ছিল, তা হয় গোপাল ভাঁড়ের ভাঁড়ামি, নয় বাঙালী জীবনযাত্রার ছোঁয়াচে 'গ্রাম্য', আরও একটু উচ্চ স্তরে ভারতচন্দ্রীয় বৈদগ্ধ্য, অথবা সংস্কৃত পণ্ডিতদের আদিরস-ঘেঁষা বাক্-চাতুর্য ও রঙ্গ-চাতুর্য। আধুনিক সাহিত্যাদর্শে কৌতুকরস (humour) যে কত বিচিত্র ও কত মনোহর হতে পারে, আজ তা আমরা জানি। বঙ্কিমের থেকেই বাঙলা সাহিত্যেও আমরা তার আগমন দেখতে পাই—অবশ্য মাইকেল, দীনবন্ধু থেকেই সূচনা, তবে 'হুতোম' থেকে নয়। বঙ্কিম প্রথম দিকে পুরাতন স্থূল হাস্যরসের প্রভাব একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি (যেমন, দুর্গেশনন্দিনীতে), কিন্তু শীঘ্রই তিনি সেই স্তর কাটিয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলেছেন—বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙলা সাহিত্যে শুভ্র সংযত কৌতুকরসের স্রষ্টা। (দীনবন্ধুর হাস্যরসে রবীন্দ্রনাথ স্বস্তি বোধ করতেন না)। আধুনিক যুগে সাহিত্যে বিরাট রুচিপরিবর্তন ঘটেছে। সেই মানদণ্ডেও বঙ্কিমের রুচি উত্তীর্ণ। অথচ, তাঁর রসিকতা নীরক্ত ও নিষ্প্রভ নয়। বঙ্কিমের উদ্দেশ্য ছিল হাল্‌কা হাসিতে পাঠকের মনকে জীইয়ে তোলা। কিন্তু সেই হাল্‌কা হাসি আর স্থূল হাসি নেই।—তবু 'ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল' পুরনো হয় না—মানুষ-পশুকে ব্যাঘ্রদের চোখ দিয়ে দেখে হাসতে-হাসতেও পাঠকের একটু-না-একটু

ভাবতে হয়। এই ভাবনা ও কল্পনা বঙ্কিমের লঘু হাসিতেও গভীরতা ও শ্রী দান করে। তৃতীয়ত, শ্রেষ্ঠ হিউমারিস্টের একটা লক্ষণ—নিজের অসংগতি নিয়েও সে পরিহাস করতে অকুণ্ঠিত ;—বঙ্কিমের লেখায় তা চমৎকার প্রস্ফুট। 'ইংরেজ-স্তোত্রে' (১।১, পৃ. ১২) ও 'বাবু'তে (১।১, পৃ. ১৪) জাত্যভিমানের সেই জ্বালা তাই দাহ না খুইয়েও সার্থকতায় এত অমোঘ। যথা,

> "(হে ইংরেজ) আমার স্পীচ্ শুন, আমার এসে পড়, আমায় বাহবা দাও—আমি তাহা হইলে সমগ্র হিন্দু সমাজের নিন্দাও গ্রাহ্য করিব না। আমি তোমাকেই প্রণাম করি।"

কিংবা 'বাবু'তে

> "বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহাদিগেরও (বাবুদের) দশাবতার। . . . কেরানী অবতারে বধ্য অসুর দপ্তরী, মাস্টার অবতারে বধ্য ছাত্র···উকিল অবতারে বধ্য মোয়াকেল ; হাকিম অবতারে বধ্য বিচারার্থী, জমিদার অবতারে বধ্য প্রজা, সম্পাদক অবতারে বধ্য ভদ্রলোক এবং নিষ্কর্মাবতারে বধ্য পুষ্করিণীর মৎস্য।"

মনের জ্বালা উড়ে যায় না, আত্ম-সন্তুষ্টির কোনো স্থান নেই। তবে আত্মগ্লানি সত্ত্বেও বুঝি—আমরা সকলেই জীবনে নানা অসংগতিতে ভরা মানুষ।

কমলাকান্ত ॥ 'কমলাকান্তে'র এখন তিনটি অংশ—'কমলাকান্তের দপ্তর' (১৪টি নিবন্ধ), 'কমলাকান্তের পত্র' (৫টি) ও 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' (১)। মোট ২০টি রচনার সমষ্টি। এ বইয়ের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় খ্রী ১৮৭৫ সালে, নাম ছিল শুধু 'কমলাকান্তের দপ্তর, প্রথম ভাগ।' পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬২। বঙ্গদর্শনের সেই প্রথম দিকের (১২৮০-৮২ বঙ্গাব্দ) কমলাকান্ত-পরিচয়ের ১১টি প্রবন্ধ তাতে সংকলিত হয়। (দ্রষ্টব্য 'সম্পাদকের নিবেদন'—১।১, পৃ. ৯৯৩) কমলাকান্তের দপ্তর উৎসর্গীকৃত হয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য রামদাস সেন মহাশয়কে প্রণয়োপহারস্বরূপ। পরিবর্ধিত আকারে সেই পুস্তকখানির নামকরণ হয় 'কমলাকান্ত'—তখন 'দপ্তরে'র সঙ্গে সংযোজিত হয় 'কমলাকান্তের পত্র' ও 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী'। 'ঢেঁকি' নামক লেখাটি নতুন সংযোজিত হয়। এখনকার 'কমলাকান্ত' তখন সম্পূর্ণ হল।

'কমলাকান্তে'র এসব গঠনের কথা বাহ্য। 'কমলাকান্তে'র মূল খুঁজে যাঁরা De Quincey'র Confessions of An Opium-eater-এর দিকে তাকান, তাঁরা আফিমের কথাই বড় মনে করেন। Addison-এর Coverly Papers-এর Essays‌ও সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়। Pickwick Papers-এর মামলার অংশের Sam Waller-এর জবানবন্দীর সঙ্গে 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী'র তুলনা করাও নিরর্থক। এ সবের সঙ্গে যদি বা কোনো দূর সম্পর্ক থেকে থাকে, তাহলেও প্রকৃত পক্ষে 'কমলাকান্তে'র পূর্বজ কেউ নেই।

কমলাকান্তের জন্মের ইতিহাস দুর্বোধ্য নয়। 'এ জীবন লইয়া কি করিব ?'—এই যাঁর জিজ্ঞাসা, শুধু 'লোকরহস্যে'র লেখায় তাঁর রহস্যপ্রিয়তাও তৃপ্ত হয় না, তাঁর ভাবনাও মুক্তিপথ পায় না। পরিষদ সংস্করণের সম্পাদকদ্বয় সত্যই অন্তর্দৃষ্টি ও রসানুভূতি দিয়ে তার মর্ম উদ্ঘাটিত করেছেন,

"প্রবহমান সংসারস্রোতের উপরিভাগে আপাত মনোহর তরঙ্গভঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে তীক্ষ্ণধী বঙ্কিমচন্দ্র কখনো গভীর রহস্যগহনে তলাইয়া যাইতেন, এবং মরণশীল মানবের, এবং যেসব হতভাগ্য জীব তাঁহার আশে-পাশে চিন্তাহীন নিঃশঙ্কতায় ভাসমান তাহাদের, ভয়াবহ পরিণতির কথা আপন অন্তরে অনুভব করিয়া হাল্কা হাসির বুদ্‌বুদ বিলাসে তাঁহার মন সায় দিত না। অর্ধোন্মাদ নেশাখোর কমলাকান্তের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তাঁহার উপায় ছিল না। সোজাসুজি সজ্ঞানে যে সকল কথা বলিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেন, কমলাকান্তের মুখ দিয়া সে সকল কথা তিনি অসঙ্কোচে বলিতে পারিবেন।"

সম্পাদক ও প্রচারক বঙ্কিম অন্তরেরও অন্তরে ভাবুক বঙ্কিম; সেই সঙ্গে, প্রবল জীবন-জিজ্ঞাসায় জিজ্ঞাসু বঙ্কিম। এই মর্মকথা উপরের উদ্ধৃতিতে সুন্দর ব্যক্ত হয়েছে। শুধু 'অনুভূতি' নয়, মননশীল জীবন-জিজ্ঞাসার দিকটিও কমলাকান্তের পাগলামির সূত্রে বারে বারে আভাসিত হয়ে উঠেছে। আসলে দুটি পৃথক দিক নয়,—পরোক্ষে একই বঙ্কিমের আত্মান্বেষণ। কমলাকান্তের নিবন্ধগুলির মধ্যে-তখনকার বঙ্কিমের সমগ্র জীবনবোধই তাই বিদ্যুচ্ছটায় হাসিতে অশ্রুতে চমক দিতে দিতে ফুটে ওঠে, আবার উঠতে-না-উঠতেই খেয়ালিপনার মধ্যে মিলিয়ে যায়। এ জন্যই কমলাকান্ত ভাবুক ও স্রষ্টা বঙ্কিমের অভিনব সাহিত্যকর্ম—তার পূর্বজ কেউ নেই।

খোশনবিশ-বিবৃত কমলাকান্তের 'যথার্থ পে-বিল' রচনা, কমলাকান্তের 'সুখ' সম্পর্কিত ভাবুকতা ('প্রথম সংখ্যা'—'একা'), পরাধীন স্বদেশের বেদনা দিয়ে তার সূচনা, তারপর, সুখবাদ (বেন্থাম মিলের 'হিতবাদ'), কোঁৎ-এর মানব-পূজা—মনুষ্যত্বের স্বরূপসন্ধান, সেই কারণেই বাহ্যসম্পদের অত্যাধিক্যে অবিশ্বাস—মানুষের বিচিত্র আকাঙ্ক্ষার পরিণাম-ভাবনা এইসব কমলাকান্তকে এগিয়ে দেয় ঈশ্বরমুখিতার দিকে।

"প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি—প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার সংগীত। অনন্তকাল সেই মহাসংগীত সহিত মনুষ্য হৃদয়তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।" (১ম সংখ্যা, 'একা—')

লঘু দৃষ্টিতে মনুষ্যফলের বর্ণনা, রঙ্গদৃষ্টিতে 'ইউটিলিটি'র ব্যাখ্যা, চিরন্তন তৃষ্ণা, গভীর জিজ্ঞাসা—চমক দেয়।

"মনুষ্যমাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে, বহ্নি কি আমরা জানি না।…ঈশ্বর কি, ধর্ম কি, জ্ঞান কি, স্নেহ কি? তাহা কি কিছু জানি না। তবু সেই অলৌকিক অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ নয় ত কি?" (৪র্থ সংখ্যা, 'পতঙ্গ')

সেই সুখ-জিজ্ঞাসার উত্তর (৫ম সংখ্যা, 'আমার মন')—

"আমি চিরকাল আপনার রহিলাম পরের হইলাম না এই জন্যই পৃথিবীতে

আমার সুখ হইল না।…আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন, পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোনো মূল নাই।…"

এর মধ্যেই কবিমন হালকা সুরে 'বসন্তের কোকিল', 'ফুলের বিবাহ' দিয়ে আবার ব্যঙ্গদৃষ্টিতে 'বড়বাজারে' মনুষ্যসমাজের বাজার-দর কষতে থাকে— 'Experimental Indolgy,' 'সাহিত্যের বাজার,' 'যশের ময়রাপটি' পার হতে হতে দেখে একখানি দোকান—একমাত্র যেখানে সুযশ বিক্রয় হয়—'বিক্রেতা কাল. মূল্য জীবন।'

বিষয়ের দিক হতে বঙ্কিমের যাবতীয় চিন্তাই কমলাকান্তের দপ্তরে ভেসে ভেসে দেখা দিচ্ছে, সকলের মধ্যে আছে এক নিগূঢ় ভাবাবেগের সুর। এমন কি, 'বিড়ালে'র মতো সুতীক্ষ্ণ শ্রেণী-বৈষম্যের ব্যাখ্যাও তিনি সংরক্ষণ করে গিয়েছেন ('সাম্যের' মতো বাদ দেন নি); তবু একটি ভাবনা,—বঙ্কিমের জীবনের যা অনির্বাণ ভাবনা—তা 'কমলাকান্তে' শীর্ষস্থানীয়—এ ভাবনা স্বদেশভাবনা। (১১শ সংখ্যা, আমার দুর্গোৎসব, ১২শ সংখ্যা, একটি গীত, ১ম পত্র পলিটিকস তাতে দীপ্তিময়।) একটি লক্ষ্য সুস্থির—না, একান্ত ভাবে পরহিত নয়—বঙ্কিমের জীবন-ভাবনায় স্বদেশপ্রীতি পরম প্রেরণা। বঙ্কিমচন্দ্রের 'মাতৃমূর্তি' কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসবে' প্রথম প্রস্ফুট হয়, 'আনন্দমঠে' নয়,—'আমার দুর্গোৎসব' ও 'বন্দেমাতরম্-'এ বঙ্কিমের স্বদেশপ্রীতির apotheosis পরিপূর্তি। অথচ সমস্ত বেদনা আকুলতা ভাবনা সত্ত্বেও কমলাকান্তের হাসি ফুরোয় না—'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' তাই এখনো সকলের প্রিয়। অবশ্য হাসিও শেষ নয়, সব নয়। জীবনের গম্ভীর ভয়াবহ পরিণতির ভাবনায় আকুলিত 'বুড়ো বয়সের কথা'ও (৪র্থ পত্র) তবু সেই আকস্মিক হাসির ছটায় প্রসন্ন সরস, চিরদিনের কথা। বঙ্কিম কৌতুক-দৃষ্টিতে যেন আপনার ভাবীরূপও তাতে দেখতে পাচ্ছেন। কমলা-কান্তের প্রিয়বন্ধু দাসু মিত্রর মতোই তাঁরও এই পরিণতিই অনিবার্য—

> আমার প্রিয় বন্ধু দাসু মিত্র, যৌবনের রূপে স্ফীতকণ্ঠ কপোতের ন্যায় সগর্বে বেড়াইত—কত মাগী গঙ্গার ঘাটে স্নান কালে তাহাকে দেখিয়া নমঃ শিবায় বলিয়া ফুল দিতে, 'দাসু মিত্রায় নমঃ' বলিয়া ফুল দিয়াছে। এখন সেই দাসু মিত্র শুষ্ক কণ্ঠ, পলিত কেশ, দন্তহীন, লোলচর্ম, শীর্ণকায়। দাসুর একটা ব্রাণ্ডি আর তিনটা মুর্গী জলপানের মধ্যে ছিল—এখন দাসু নামাবলীর ভরে কাতর, পাতে মাছের ঝোল দিলে, পাত মুছিয়া ফেলে।…"

তখনো বঙ্কিম পাত মুছে ফেলেন নি। তাই "কমলাকান্ত হাসির সঙ্গে করুণের, অদ্ভুতের সঙ্গে সত্যের, তরলতার সঙ্গে মর্মদাহিনী জ্বালার, নেশার সঙ্গে তত্ত্ববোধের, ভাবুকতার সঙ্গে বস্তুতন্ত্রতার, শ্লেষের সহিত উদারতার" (অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত—'বঙ্কিমচন্দ্র') এক অদ্ভুত সমন্বয়।

কমলাকান্ত সত্যই কবি, দার্শনিক, সমাজশিক্ষক, রাজনীতিজ্ঞ ও স্বদেশ-প্রেমিক। এক কথায়, কমলাকান্ত বঙ্কিমচন্দ্র। এবং এ গ্রন্থ বহুমুখী বঙ্কিম-' প্রতিভার representative রচনা। কমলাকান্ত নাম নিয়ে সে ভঙ্গির সার্থক-

অসার্থক অনুকরণে কেউ কেউ লিখেছেন। হয়তো আরও কেউ কেউ লিখবেন। তাঁরা এই সত্যটাই ভুলে যান—কমলাকান্ত বিশ্বসাহিত্যের unique সৃষ্টি, কারণ এক unique প্রতিভার সে প্রতিভূ। দ্বিতীয় বঙ্কিম হয় নি, দ্বিতীয় কমলাকান্তও হতে পারে না। কমলান্তের পূর্বজ নেই, 'আত্মজও' কমলাকান্তের নেই।

বিজ্ঞানরহস্য (দ্রষ্টব্য: সংগ্রহ 'সম্পাদকের নিবেদন'—১। ১। পৃ. ১০৬) ॥ বঙ্কিমের যৌবনেই পাশ্চাত্য জগতে ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ বিপ্লব ঘটায়। হাক্সলী টিণ্ডলে, হার্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি জ্ঞানের জগতে বিজ্ঞানকে বিজয়ী করে তুলতে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। বিশেষ করে অগস্ট কোঁৎ তাঁর সর্বাধিক শ্রদ্ধেয় লেখক। কোঁৎ বিজ্ঞানকেই একমাত্র স্থির-লভ্য (পজিটিভ্) ভিত্তি করে 'প্রত্যক্ষবাদ' বা পজিটিভিজমের দর্শন প্রচার করেছিলেন। বঙ্কিম তা সম্পূর্ণ না মানলেও বুঝেছেন—জগৎ মিথ্যা নয়, জীবন মিথ্যা নয়, ঐহিক জীবনযাত্রায় বিজ্ঞানকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে হবে। এ বোধ নিশ্চয়ই গতানুগতিক জীবনে সম্ভব নয়। বাঙলাদেশের শিক্ষিতদের মধ্যে তখন কিন্তু এই বোধ দেখা দিয়েছে—তত্ত্ববোধিনীর অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সে পথে পূর্বেই পদার্পণ করেছেন।

মহেন্দ্রলাল সরকারের 'ভারতীয় বিজ্ঞানসভা' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব (১৮৭২) ও আয়োজন তাই সমাদৃত হয়। প্রায় একই সময়ে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ ও 'বিজ্ঞানসভা'র আয়োজন বাঙালী জাগরণের পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র ২য় সংখ্যাতেই (জ্যৈষ্ঠ, ১২৭৯) বিজ্ঞান আলোচনার সূচনা করেছিলেন। পরে (ভাদ্র, ১২৭৯) 'বিজ্ঞানসভা'র প্রস্তাবকে অভিনন্দিত করেন। বিজ্ঞানের নতুন নতুন তত্ত্বগুলির সঙ্গে বাঙালী শিক্ষিত স্ত্রী-পুরুষ ও শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া 'বঙ্গদর্শনের' একটা কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

এসব প্রবন্ধ 'মৌলিক' নয়—বঙ্কিমচন্দ্র 'বিজ্ঞাপনে' তাদের মূল নির্দেশ করেছেন; নিজের ভ্রান্তি-সম্ভাবনাও স্বীকার করেছেন, তাঁর অভিমানে তা বাধে নি। কালক্রমে নতুন আবিষ্কারের ফলে অনেক কথা এখন অসম্পূর্ণ মনে হবে, তাও সুনিশ্চিত। কিন্তু কথাটা তা নয়—বিজ্ঞানরহস্যের গুরুত্ব এই যে, সাহিত্যের রসবোধের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম জাগ্রত করতে চেয়েছেন বাঙালী পাঠকের বিজ্ঞান-চেতনা।

বিবিধ প্রবন্ধ ॥ বিবিধ প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শনে'র ব্রত উদ্‌যাপনের সার্থক প্রমাণ,—অবশ্য 'প্রচার' ও 'নবজীবনে'র কালেও বঙ্কিমের বহুমুখী দৃষ্টি ও জিজ্ঞাসার জের চলেছিল। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র বিষয়সূচীর দিকে তাকালেও দেখতে পাই—কত বিচিত্র বিষয়ে বঙ্কিমের আগ্রহ। নানা প্রশ্ন ও তত্ত্ব আলোচনার সূত্রে সাময়িক পত্রে এসব প্রবন্ধ রচিত হয় (দ্রষ্টব্য, সংগ্রহ সম্পাদকের মন্তব্য: ১।১, পৃ ৪৯৪)। এমন কি, সংকলনকালেও কোনো বিশেষ ধারা অনুযায়ী বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধগুলি গ্রথিত করেন নি। তথাপি,—হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বঙ্কিমের বিচারশীল মনের জিজ্ঞাসা এবং হিন্দু ভাবধারা, ইতিহাস-দর্শনের প্রতি তাঁর অন্তর্নিহিত অনুরাগ যে প্রথমাবধিই কত প্রবল,—এবং ইউরোপীয়

দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের অভিনব চিন্তাকে কবলিত করে নিয়ে সেই অনুরাগই যে ক্রমশ তাঁর মনে পরিপুষ্টি লাভ করছে,—ধর্মতত্ত্বে, কৃষ্ণচরিত্রে ও গীতার ব্যাখ্যায় যে তার পরিণতি এক হিসাবে প্রায় অনিবার্য,—বিবিধ প্রবন্ধের প্রবন্ধসমূহ থেকে সেই সত্য অনুধাবন করা যায়। একটা কারণ—প্রবন্ধগুলি লেখা আগে হলেও পুস্তকে গ্রথিত হয়েছে 'কৃষ্ণচরিত্রে'র পরে।

নানা ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে 'বিবিধ প্রবন্ধ' বর্তমান আকার লাভ করেছে। 'বিজ্ঞাপন'সমূহে বঙ্কিম সে বিবরণ দিয়েছেন।

'বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় ভাগে'র মধ্যে আছে 'বঙ্গদেশের কৃষক'। তার কিয়দংশ 'সাম্যে'র অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'সাম্য' বিলুপ্ত করে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশের কৃষক' 'বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় ভাগে' অন্তর্ভুক্ত করেন। লেখাটির মুখবন্ধে তখন জানান, 'যে অবস্থা (বঙ্গদেশের কৃষকে) বর্ণিত হইয়াছে তাহা আর নাই' (দ্রষ্টব্য : উক্ত মুখবন্ধাংশ), তবে সব উৎপাত এখনো 'সবস্থানে অন্তর্হিত হয় নাই।' 'মনুষ্যত্ব কি ?' প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তা 'বঙ্গদর্শনে' (আশ্বিন, ১২৮৪ সালে) প্রকাশিত জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবনচরিতের কিয়দংশ। বঙ্কিম জানিয়েছেন—ধর্মতত্ত্বের অনুশীলনধর্মের বীজ 'মনুষ্যত্ব কি ?' প্রবন্ধটিতে আছে। মিলকে তখনো বাতিল করার কথা বঙ্কিম ভাবেন নি।

'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থনে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো প্ল্যান ছিল না, তা দেখেছি। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের বিষয়-বিভাগানুযায়ী (ব. সা. প. সংস্করণ) দেখি এখন তাতে ৭টি সাহিত্য-বিষয়ক, প্রত্নতত্ত্ব ৪টি, ইতিহাস ও অর্থনীতি ১০টি, দর্শন ও ধর্ম ১০টি এবং বিবিধ ৭টি প্রবন্ধ। বেশ বোঝা যায়—একদিকে ইতিহাস, অন্যদিকে দর্শন ও ধর্ম—বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান আলোচ্য এই দুটি বিষয়। বিশ্লেষণ করলে আরও অনুভব করা যায়—বিবিধ বিষয়ে আগ্রহ সত্ত্বেও স্বাজাত্য-প্রেরণা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে জাতীয় সংস্কৃতি ও (হিন্দু) ধর্মজিজ্ঞাসা—লেখকের মনের প্রধান আগ্রহ এইসবে। প্রবন্ধগুলিতে 'ধর্মতত্ত্বে'র ও 'কৃষ্ণ-চরিত্রে'র বক্তব্য বীজাকারে প্রচুর—সেসবের উদ্ধৃতি প্রায় অসম্ভব।

অন্য দু-একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমের সাহিত্যালোচনা ক্রমে কমে এসেছিল, কিন্তু সাহিত্যসমালোচনার স্থির ভিত্তি বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা সাহিত্যে তৎপূর্বে পত্তন করে ফেলেছেন। স্থির চিত্তে সরস গ্রন্থবিচার, এবং ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যের তুলনামূলক সমালোচনা, পুরাতন সাহিত্যের তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা—গভীর অধ্যয়ন, অভ্রান্ত ও তেমনি গভীর রসবোধের ফলেই তা সম্ভব। এইখানেই বাঙলা সাহিত্যের সেই দণ্ডধারী, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা বঙ্কিমকে আমরা সব্যসাচীরূপে দণ্ডায়মান দেখতে পাই।

'বিবিধ প্রবন্ধে' ধর্ম-আলোচনার তুল্যই গুরুতর বঙ্কিমের ইতিহাসবিষয়ক প্রবন্ধসমূহ—বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসা, অনুসন্ধান, গবেষণা, বিচার এবং সিদ্ধান্ত। ভারতের এবং বাঙলার ইতিহাস নির্ণয়ের জন্য তাঁর আগ্রহ ছিল দুর্নিবার। নিশ্চয়ই তার বড় একটা কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবল জাত্যভিমান। কিন্তু জাত্যভিমান এ ক্ষেত্রে ভয়াবহ নয়, ভ্রান্তও নয়, বরং অত্যন্ত সুসংগত।

অবশ্য একটা কথা—বঙ্কিমের ইতিহাসজিজ্ঞাসার পূর্বে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস পুনরাবিষ্কৃত হচ্ছিল। জেম্‌স্‌ প্রিন্সেপ্‌, ওল্ডেনবুর্গ প্রভৃতির চেষ্টায় বুদ্ধ, অশোক ও সাধারণভাবে বৌদ্ধ পুরাকীর্তিসমূহের সম্বন্ধে শিক্ষিত শ্রেণী তখন অবহিত হচ্ছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতো পুরাতাত্ত্বিক বাঙালী সমাজ থেকে উত্থিত হয়েছেন। কিন্তু বঙ্কিমের আগ্রহ বৌদ্ধ কীর্তিতে ততটা নয়—একদিকে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মে ও হিন্দু কীর্তিতে, অন্যদিকে বাঙলার ও বাঙালীর অতীতে; "ভারত-কলঙ্ক" ও "বাঙ্গালার কলঙ্ক" অপনোদন তাঁর প্রধানতম উদ্দেশ্য। বঙ্কিমের সময় এই দুদিকেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যা ইতিহাস বলে তুলে ধরতেন তা মোটেই ঐতিহাসিক যুক্তিপদ্ধতির প্রয়োগের ফলে তাঁরা লাভ করেন নি। সেরূপ যুক্তিপ্রণালীর সঙ্গে তাঁদের পরিচয়ও গভীর ছিল না (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২১)। বঙ্কিম অন্তত দুটি কলঙ্ক ক্ষালনে সার্থকভাবেই যত্নপর হন। "ভারত-কলঙ্ক" ও সে-জাতীয় প্রবন্ধগুলি তাঁর বিচারবুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টিরও পরিচায়ক। স্মরণ করিয়ে দেয়—গ্রীক্‌, আরব, এবং তৎপরবর্তী (তুর্ক, মুঘল) মুসলমানদের পক্ষে ভারত বিজয় সহজসাধ্য হয় নাই। বঙ্কিমের মতে—হিন্দু জাতির বলবীর্যের অভাব ছিল না, অভাব ছিল "স্বাতন্ত্র্যে"র, "অনুরাগে"র, "জাতীয় চেতনা"র, "ঐক্যবোধে"র। এ মত 'জাতীয়তাবাদী' হলেও নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক যুক্তিসঙ্গত। আরো সার্থক বাঙালী জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসন্ধান ও অভিমত। বঙ্কিম—এবং বোধহয় বঙ্কিমই প্রথম—ঐতিহাসিক যুক্তি ও বিচারের দ্বারা "বাঙ্গালার কলঙ্ক" অপনোদন করেন। সপ্তদশ মুসলমান অশ্বারোহীর বাঙলা জয় তখনো সুপ্রচলিত কিংবদন্তীরূপে গ্রাহ্য ছিল। তা যে বাস্তবে অসম্ভব, সে কথা কেউ ভেবে দেখত না। বঙ্কিম মনে করিয়ে দেন—১২০৩-এর পরে গৌড় অধিকৃত হলেও বঙ্গদেশের অধিকাংশ প্রদেশ স্বাধীন ছিল।—সেনবংশ আরো এক শতাব্দী পূর্ববঙ্গেও রাজত্ব করেছিল। তুর্ক বিজয়ের পূর্বে পাল ও সেন বংশের শাসন উত্তরাপথেও বিস্তীর্ণ ছিল। তুর্ক বিজয়ের পরে গৌড়ের স্বাধীন সুলতানরা,—মুসলমান হলেও, বাঙালীরূপে বাঙলার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। এসব কোনো কথাই নিছক বাঙালীয়ানা নয়। এইরূপই বঙ্কিমের সার্থক আর একটি গবেষণা—"বাঙ্গালীর উৎপত্তি"। বাঙালী অবিমিশ্র আর্য নয়, আমরা অধিকাংশ বাঙালীই দ্রাবিড়, কোল প্রভৃতি অনার্য জাতির বংশধর, আর্যীকৃত বাঙালী। একথা নৃ-বিজ্ঞানের নানাবিধ অনুসন্ধানে আজ সর্বস্বীকৃত। কিন্তু ম্যাক্সমূলরের সমকালে তখন এদেশে এসেছিল "আর্যামির" যুগ, তাই এ তত্ত্ব স্বীকার করতে শিক্ষিতরা অনেকে চাইতেন না; বুঝতেও চাইতেন না। বঙ্কিমের এই প্রবন্ধ সেদিনের পক্ষে নিঃসন্দেহে সার্থক গবেষণা—অবশ্য, এদিনের তুলনায় তা সম্পূর্ণ যুক্তিসহ নয়। যেমন, বাঙলার অম্বষ্ঠ, কায়স্থ, কেন, বাঙলার ব্রাহ্মণরাও সত্যই কয় আনা আর্য, তা তাদের চোখ মুখ নাক কান দেখলেই অনুমান করা যায়। এ ভুলই বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার" প্রবন্ধেও দেখা যায়। (অবশ্য যে পৌরাণিক হিন্দুধর্মে বঙ্কিমের বিশ্বাস, সেই

হিন্দুধর্মের কয় আনা 'আর্য', কয় আনা 'অনার্য', তাও বিচার্য)। সেসব সত্ত্বেও সে প্রবন্ধও বঙ্কিমের যুক্তিপরায়ণতার পরিচায়ক।

আসল কথাটা এই—ঐতিহাসিক যুক্তিবিচার ও প্রমাণপদ্ধতি বঙ্কিমের যেন স্বভাব-আয়ত্ত ছিল। পরে কৃষ্ণচরিত্র আলোচনায় তার পরাকাষ্ঠা দেখা যায়। এই হিসাবে বঙ্কিম ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রেও বাঙালীর একজন পথিকৃৎ।

সমসাময়িক সমাজসমস্যা আলোচনায় বঙ্কিম সত্যই প্রথম জীবনে উৎসাহিত হয়েছিলেন—'বঙ্গদেশের কৃষক' তার প্রমাণ। লোকশিক্ষা, বহুবিবাহ প্রভৃতি প্রবন্ধে বোঝা যায়, তিনি হিন্দু সমাজের সংস্কারের প্রশ্নে সংরক্ষণশীল যুক্তিকে গুরুত্ব দিতেন। ইতিহাস তাঁর মতামতকে বাতিল করে দিয়েছে। যুক্তি হলেও বঙ্কিমের সেসব তর্ক নিশ্চয়ই সুযুক্তি নয়। "বঙ্গদেশের কৃষক" কিন্তু বাস্তব তথ্যসমৃদ্ধ রচনা। ১৭৯৩-এর পর থেকে দিনের পর দিন 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে' জমিদার শ্রেণীর লাভ বেড়েছে, কৃষকরা বঞ্চিত ও উৎপীড়িত হয়েছে, তখন বঙ্কিমের পূর্বেই অক্ষয়কুমার দত্ত সক্রিয় হয়েছেন, কৃষক আন্দোলনও চারিদিকে দেখা দিয়েছে। কৃষকের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে বঙ্কিমের পরিচয় প্রত্যক্ষ। জমিদার, নায়েব, গোমস্তা, গবর্নমেণ্ট, আইন-আদালত সকলেই মিলে কার্যত কৃষকের যে কোথাও বিন্দুমাত্র বাঁচবার মতো অবকাশ রাখে নি, তীক্ষ্ণ, তীব্র মর্মদাহের সঙ্গে বঙ্কিম সে কথা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় বর্ণনাতে উদ্ঘাটন করে দেখিয়েছেন। কৃষকের কথা বোধ হয় তখনকার দিনে এত জ্বালা দিয়ে আর কেউ ব্যক্ত করেন নি। তথাপি বঙ্কিম যে বঙ্গদেশের কৃষকদের প্রতি শেষ অবধি কেন যথার্থ সুবিচার করতে কুণ্ঠিত, তা তাই আরও বেশি প্রণিধানযোগ্য। তিনি দেখছেন—"জমিদারী প্রথা ভুল, কিন্তু সেই ভ্রান্তির উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নির্মিত হইয়াছে।" জমিদারী প্রথার বিলোপে সেই বাঙালী সমাজে তাই বিপ্লব অনিবার্য—তাতে ভূমির উপস্বত্বভোগী বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভাগ্যবিপর্যয়ও ঘটতে বাধ্য। নিঃসন্দেহ বঙ্কিম তা চাইতে পারেন না। বঙ্কিম চাইলেন, বঞ্চিত কৃষকশ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখার মতো ব্যবস্থাই জমিদারেরা করুক। বঙ্গদেশের জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী ভদ্রলোকরা মূল বঞ্চনার লাভ ভোগ করুক। কৃষক অত্যাচারিত না হয়ে মূলত বঞ্চিত থাকবে।

'লোকশিক্ষা' আকারে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ, কিন্তু ভাবে, ভাষায় ও আন্তরিকতায় বঙ্গদেশের কৃষকের সগোত্র। বাঙ্গালীর দ্বারা কোন কাজ সিদ্ধ হচ্ছে না; তার প্রধান কারণ বাঙালী জনসাধারণকে শিক্ষার দ্বারা তৈরী করা হচ্ছে না—সেরূপ শিক্ষাও নেই; অথচ আমাদের সমাজে কথকতা প্রভৃতি লোকশিক্ষার স্বাভাবিক ব্যবস্থা আবহমান কাল ছিল—তা লুপ্ত হচ্ছে—বঙ্কিমের এ নির্ণয় সত্য। এজন্য ইংরাজী শিক্ষিতদের তিনি দায়ী করে তীব্র কশাঘাত করেছেন। তা কিন্তু পুরো সুসংগত নয়। বরং বেশী সংগত তাঁর এই অভিযোগ,

> "শিক্ষিত, অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া বুঝাইলে কিছু কিছু লোক শিক্ষিত হয়।"

কিন্তু বোঝানো কি এতই সহজ? "রামধন পোদ"কে ম্যালথেসিয়ান তত্ত্ব বোঝানো সহজ হয় না। বোঝানো যায় না—খাদ্যের ব্যবস্থা না হতে পুত্রকে বিয়ে দিয়ে "সংসার বাড়ানো সঙ্গত নয়।" "ছোট পরিবারই সুখী পরিবার"—শত বৎসর পরে টাকা ঘুষ দিয়েও তো কথাটা আজ বোঝানো এত সহজ হচ্ছে না। বঙ্কিমের বেদনার কারণ "বাঙলার লোক যে শিখিল না।" একশত বৎসর পরেও তা সমান সত্য।

সাম্য ॥ বঙ্কিমের বাতিল-করা গ্রন্থ। কিন্তু বঙ্কিমের চিন্তাধারার এক বিশিষ্ট চিহ্ন; এবং বঙ্কিমমানসের বিবর্তনধারার এক বিশেষ চিহ্ন—যে চিহ্ন তিনি মুছে ফেলতে চান। কারণ, তাঁর পরিণত বিবেচনায় সাম্যটা "সব ভুলে ভরা"। কিন্তু কী কী মত বা যুক্তি ভুল; না, মূল দৃষ্টিভঙ্গীটাই ভুল, স্পষ্টভাবে বঙ্কিম বলেন নি। সাম্যের অন্তর্ভুক্ত "বঙ্গদেশের কৃষক" পুনঃপ্রকাশকালে যা বলেছেন তাতে মনে হয় "বঙ্গদেশের কৃষক" সবটা ভুল নয়। "সাম্য" প্রথমে 'বঙ্গদর্শনে'র তিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়—বঙ্গাব্দ ১২৮০র জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ও ১২৮২র কার্ত্তিক সংখ্যায় (১৮৭৪, ১৮৭৫)। "বঙ্গদেশের কৃষক" ধারাবাহিক বের হয়েছিল তার পূর্বে ১২৭৯র (১৮৭২ খ্রী) থেকে বঙ্গদর্শনে। বঙ্গদেশের কৃষকের একটি প্রধান অংশ "সাম্যে" (প্রধানত সাম্যের তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে) অন্তর্ভুক্ত করে "সাম্য" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। তা-ই প্রথম প্রকাশ ও তা-ই শেষ প্রকাশ। মোটের উপর, দুইটি লেখাই বঙ্গদর্শনে প্রথম দিককার। বঙ্গদর্শনের প্রকাশকালে যে এইসব সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা বঙ্কিমকে ভাবিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই, মনে করা চলে বঙ্গদর্শন প্রকাশেরও তা অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল (প্রকৃত তুলনীয় বঙ্গদেশের কৃষক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, 'জমিদার' অন্তর্গত ২য় প্যারা—"যদি মানুষের দুঃখ দেখিয়া তা নিবারণের ভরসায় একবার বাক্য ব্যয় না করিলাম···তবে যত শীঘ্র বঙ্গদর্শন বঙ্গভূমি হইতে লুপ্ত হয়, ততই ভালো।" ইত্যাদি)। কিন্তু ক্রমে এসব সমস্যা বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টির পরিবর্তন ঘটে। সামাজিক প্রশ্ন আলোচনার আগ্রহও কমে যায়। ১৮৮৪র কাছাকাছি সময়ে তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বলেন—"সাম্য সব ভুলে ভরা আর ছাপাবো না।"

সাম্যে কি ছিল?

প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে—মনুষ্যে মনুষ্যে বৈষম্য আছে; কতকগুলি বৈষম্য প্রাকৃত নিয়মে, কতকগুলি অপ্রাকৃত নিয়মে। সামাজিক বৈষম্য অপ্রাকৃতিক বৈষম্য। অপ্রাকৃত বৈষম্যের দূরীকরণে সামাজিক উন্নতি। পৃথিবীতে সাম্যের শ্রেষ্ঠ অবতার তিনজন—শাক্যসিংহ, যীশুখৃষ্ট এবং রুশো। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রুশোর মতবাদ ও ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) ফলাফলের কথাও বলা হয়েছে। রুশোর মতে প্রকৃতির কাছে সকলেই সমান অধিকারী। অর্থাৎ ভূমিরও সকলেই মালিক। তার 'ল্য কঁত্রাত্ সোশ্যাল' (সামাজিক চুক্তির) মূল বক্তব্য এই—সমাজ সমাজভুক্তদের সম্মতিসৃষ্ট। প্রজার সম্মতিতেই রাজা সমাজকর্তা। রাজা সেই চুক্তি ভঙ্গ করলে প্রজা রাজাকে বিতাড়িত

করবে। ফরাসী বিপ্লবে (১৭৮৯) তাই ঘটল—কিন্তু "ভূমি সাধারণের" এই কথা সেই বিপ্লবেও গ্রাহ্য হল না। তার ফলে "কমিউনিজম", সাম্যবাদী আন্তর্জাতিক (১৮৬৪) প্রভৃতির উদ্ভব হয়েছে। শুধু ভূমি নয়, সম্পত্তিমাত্র সর্বসাধারণের, এই মর্মের তত্ত্ব নানা সমাজ-সাম্যবাদী পণ্ডিতেরা প্রচার করেছেন ;—ওয়েন, লুই ব্ল্যাঁ প্রভৃতির মত ; ফ্যুরিয়েরের তত্ত্ব, সর্বশেষে চিরস্মরণীয় মহাত্মা জন স্টুয়ার্ট মিলের সোস্যালিজমের তত্ত্ব, বঙ্কিম একে-একে উল্লেখ ও বিবৃত করেছেন। মোটামুটি বোঝা যায় রাজনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের সংশোধন না হলে মানবজাতির উন্নতি নেই—একথা তিনিও বুঝেছেন। 'সাম্যের' তৃতীয় পরিচ্ছেদে "পরাণ মণ্ডলের কথা",—বঙ্গদেশের কৃষকের কথা, জমিদার ও কৃষকের বৈষম্যের দুঃসহ বর্ণনা।—চতুর্থ পরিচ্ছেদে—সমাজের শ্রমোৎপাদন, ধনসঞ্চয়, শ্রেণীবিভাগ, লোকসংখ্যা-বৃদ্ধি, শ্রমজীবীদের ক্রমদারিদ্র্য প্রভৃতি অর্থনৈতিক-সামাজিক তত্ত্বের আলোচনা। জানতে পাই—ভারতের শ্রমবিভাগেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতির বর্ণগত বৈষম্যের ও অধিকারগত বৈষম্যের সৃষ্টি। বঙ্কিম জানান—এই বৈষম্যের বিষে ভারতীয় সমাজের অধঃপতন ; শোনান প্রজাদের দুর্দশারই ব্যাখ্যা। পঞ্চম পরিচ্ছেদে তাঁর আলোচ্য—স্ত্রীপুরুষে বৈষম্য। প্রাকৃতিক বৈষম্য থাকলেও এখানে বক্তব্য, স্ত্রীপুরুষে অধিকারগত বৈষম্য ন্যায়-সঙ্গত নয়। বিদ্যাশিক্ষা, বিধবার বিবাহ, অবরোধ-প্রথা, পুরুষের বহুবিবাহ প্রভৃতি উত্তরাধিকার বিষয়ে এদেশের স্ত্রীলোকদের অধিকারহীনতার বঙ্কিম বিচার করেছেন। স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য কিছু করা যায় না কি ? এইটা ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা—"কে অগ্রসর হইবে ?"—এই প্রসঙ্গের রচয়িতা যেন সমাজ-বিবর্তনের জন্য উদ্‌গ্রীব। উপসংহারে আছে রাজার জাতি (ইংরেজ) ও প্রজার জাতির (ভারতীয়) মধ্যে বৈষম্যের উল্লেখ। উল্লেখই মাত্র, তার বেশী আলোচনার প্রয়োজন লেখক দেখেন নি। তাঁর শেষ কথা—মানুষ বুদ্ধি, শক্তি, শিক্ষায় বিভিন্ন রূপের ; সে সবে তারতম্য আছে ও থাকবে। তবে "অধিকারে সাম্য আবশ্যক—কাহারও শক্তি থাকিলে অধিকার নাই বলিয়া বিমুখ না হয়। সকলের উন্নতির পথ মুক্ত চাই।"

আসলে দাবিটা এই equality of rights and opportunities। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি (private property) কি সাধারণীকৃত হবে, শ্রেণী-বৈষম্য কি বাতিল হবে, না হবে না, তা স্পষ্ট করে 'সাম্যে'ও বঙ্কিম আলোচনা করেন নি। সাম্যবাদের কিন্তু সেসব মূল কথা।

যাই হোক, সাম্যের সবটাই যখন ভুল তখন এর আলোচনারও এখানে প্রয়োজন নেই। পরবর্তীকালে (ধর্মতত্ত্বে) তাই বঙ্কিমচন্দ্র 'স্ত্রীপুরুষের সমান অধিকার' কথাটাকে স্থূল তর্ক তুলে উপহাস করেছেন।

হিন্দুর জাতিভেদ ও অধিকারভেদ প্রভৃতি ব্যবস্থাও তিনি নানা দুর্বল যুক্তিতে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। অন্তর্মুখী জীবনজিজ্ঞাসার বশে সেই পরিণত জীবনে সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্যা আলোচনায় ও সমাধানচিন্তায় তিনি আর

উৎসাহ বোধ করেন নি। কারণ, অন্তর্মুখিতায় সেসব সামাজিক প্রশ্ন সকলই বাহ্য—সকল প্রশ্ন মীমাংসিত হয়ে যায় এক অন্তর্মুখী সিদ্ধান্তে (ধর্মতত্ত্বে)—ব্যক্তির বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশে প্রীতি সর্বব্যাপী হবে ;—মানবপ্রীতিতে ঈশ্বরভক্তিতে সবই যখন সামঞ্জস্যময়, তখন সামঞ্জস্য ঘটলে বৈষম্য কোথায় ? তাই সামাজিক-রাজনৈতিক প্রশ্ন নিতান্তই বাহ্য বিষয়।

'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' ব্যঙ্গপ্রধান রচনা, লোক-রহস্যাদির সগোত্র। বলা বাহুল্য, এ গ্রন্থ মনন-সাহিত্যের মধ্যে পড়ে না। বঙ্কিম স্বয়ং নাকি সরকারী মহলে সম্মানিত কর্মচারী ছিলেন। দেশীয় চাকুরে হিসাবে পদোন্নতি তাঁর মন্দ হয় নি। রায় বাহাদুর ও সি. আই. ই. প্রভৃতি উপাধি লাভ ঘটেছিল। তাঁকে গবর্নমেণ্টের সেক্রেটারির পদে তবু পাকা করা হয় নি। আত্মাভিমানী বঙ্কিম নিজের মর্যাদা রক্ষা করেই চলতেন, বেশ জানতেন তাঁর উপরওয়ালা ইংরেজরা প্রতিভার অধিকারী না হলেও, গাত্রবর্ণের গুণে উপরওয়ালা। একজন নেটিভের মেধা, কর্মদক্ষতা ও আত্মমর্যাদাবোধ বরং সাহেবদের সকলকে স্বস্তি দিত না। কী পদ্ধতিতে যে দেশী মানুষেরা চাকরিতে উন্নতি করে, বঙ্কিম তা যথেষ্ট দেখেছেন, দেখে হয়তো বিদ্রূপ ও ঘৃণায় হেসেছেন। মুচিরাম গুড় সেইরূপ বিদ্রূপমূলক কাহিনী। স্যাটায়ার হলেও ব্যক্তিবিশেষের ব্যঙ্গচিত্র নয় বলেই মনে হয়, একটা টাইপের চরিত্র। এবং বিদ্রূপের জ্বালাও গল্পটিতে ততটা নেই। হয়তো প্রৌঢ় বঙ্কিম তখন দেশের সর্বত্র প্রতিভা বলে সম্মানিত ; এবং গভীরতর জীবন-ভাবনায় নিরত। মুচিরামদের উন্নতিতে ক্ষোভ অনুভব করা দূরের কথা, ব্যঙ্গই বেশী বোধ করতেন। তাই লঘু হাস্যে মুচিরামদের বিদায় দিয়ে বলেন, 'আর একবার হরি বল।' মুচিরাম গুড় পড়ে আমরাও তাই জ্বালা অনুভব করি না—ব্যঙ্গ উপভোগ করি। বলতে পারি—'ধন্য ইংরেজ রাজত্ব।'

চিন্তাসম্পদ—ধর্মচিন্তা

বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত জীবন প্রধানত ধর্মচিন্তায়, বিশেষ করে হিন্দুধর্মের চিন্তায়, উৎসর্গীকৃত হয়। গ্রন্থাকারে তার নিদর্শন প্রধানত 'কৃষ্ণচরিত্র,' 'ধর্মতত্ত্ব' এবং 'শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা'-র (অসম্পূর্ণ) ব্যাখ্যা এবং এখনকার 'দেবতত্ত্বে ও হিন্দুধর্মে' গ্রথিত প্রবন্ধসমূহ। ধর্মভাবনার আরম্ভ অবশ্য এইসব গ্রন্থরচনার অনেক পূর্বে। তার কারণও ছিল।

পটভূমি: বঙ্কিম-ভাবনার এই পরিণতি ১৮৮৪তে প্রিন্সিপাল হেষ্টি সাহেবের সঙ্গে হিন্দুধর্মবিষয়ক পত্রগত বিতর্কে আরব্ধ হয়েছিল, এমনও নয়। প্রথম থেকেই বঙ্কিমের মনে ধর্মজিজ্ঞাসা ছিল। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম, কৃষ্ণভক্তি এবং পৌরাণিক হিন্দুসমাজের প্রতি মমতা বঙ্কিমের পরিবারগত। আবার, 'জীবন লইয়া কি করিব ?'—অতি তরুণ বয়স থেকে এ প্রশ্ন তাঁর মনে। আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায় সে প্রশ্ন আরও শাণিত হয়। হিন্দুধর্মের নানা 'জঞ্জাল' ও 'বখামি' তাঁর শিক্ষিত মনে অগ্রাহ্য হতে থাকে। এমন কি, মনে হয় কৃষ্ণের রাসলীলা,

বস্ত্রহরণ প্রভৃতি কাহিনী এক সময়ে সংগতিহীন বলে বঙ্কিম সংশয়ান্বিত হন—ভক্তিভাজন পণ্ডিত হলধর তর্কচূড়ামণিকে এ বিষয়ে তাই বিড়ম্বনাকর প্রশ্নও করেছিলেন। (পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—'বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষা' থেকে এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়)। অন্যদিকে, শিক্ষাপ্রভাবেই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দান, 'পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও শিল্প' তাঁর নিকট গ্রাহ্য। বঙ্গদর্শনেও দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাতত্ত্বের নানা আলোচনায় ধর্মজিজ্ঞাসার চিহ্ন বারে বারে দেখা যায়।

একদিক থেকে ধর্ম-জিজ্ঞাসা উনবিংশ শতকের ভারতবর্ষের জাগরণের একটি অঙ্গ। ইতিহাসের ঘটনাপরম্পরায় সে জাগরণ (বা রিনাসেন্স) বঙ্গদেশে ও বাঙ্গালী হিন্দুদের প্রথম আয়ত্ত হয়। আধুনিক যুগ ও আধুনিক সভ্যতার এই আঘাত বাঙালী হিন্দুচিন্তায় প্রথম ভাঙাগড়ার সূচনা করে। রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে বঙ্কিমের কাল পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলনে হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম আলোড়িত হয়। 'ধর্মসভা'র কর্তাদের সময় থেকে বঙ্কিমের সময় পর্যন্ত এ আক্রমণ সনাতন হিন্দুসমাজের পক্ষে বরাবর ক্ষোভ ও দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। হিন্দুধর্ম-হিন্দুসমাজ যেন বেওয়ারিশ মাল—পাঁচশত বৎসর ধরে মুসলমান আধিপত্যের যুগে তা সম্মান পায় নি—মাঝে মাঝে উপদ্রবেও ভুগেছে। ইংরেজ আমলে ডফ্-হেস্টিরাও যদৃচ্ছা হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করেছে। ইয়ং বেঙ্গল বিদ্রোহ করে তাকেই অবজ্ঞা করছে বেশি, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও মধুসূদন দত্তরা তো সে ধর্ম ত্যাগ করতেও দ্বিধা করেন নি। আবার, ব্রাহ্মনেতা ও বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সংস্কারকেরা তিরস্কারেই হিন্দু সমাজকে পুরস্কৃত করেছেন। যে কোনো মর্যাদাবান্ হিন্দুর পক্ষেই তাই হিন্দুসমাজ তখন রক্ষণীয়। যে কোনো স্বসমাজ ও স্বধর্মের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হিন্দুর পক্ষে হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্মের স্বরূপ তাই তখন জিজ্ঞাস্য হয়ে ওঠা স্বাভাবিক—হিন্দুধর্ম কী? হিন্দুসমাজের মধ্যে সত্য কোথায়?

'হিতবাদ' থেকে 'অনুশীলন ধর্ম'॥ এই বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবয়িত্রী প্রতিভা মানবধর্ম, সমাজধর্ম প্রভৃতির সহিত ধর্মচিন্তায় উদ্‌বুদ্ধ হয়। ক্রমশই বিশেষ করে হিন্দুধর্মের ভাবনায় কেন্দ্রিত হতে থাকে। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই দেখা যায় তাঁর এক পরম শ্রদ্ধাভাজন 'হিতবাদী' সমাজ-বৈজ্ঞানিক জন স্টুয়ার্ট মিলের প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্র কাটিয়ে উঠছেন, 'সাম্য' আর পুনঃপ্রকাশ করবেন না, স্থির করেছেন। (দ্রষ্টব্য শ্রীশচন্দ্র মজুমদার—বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ ১ম প্রস্তাব) তথাপি পরিণত ভাবনায়ও (ধর্মতত্ত্বে) বেন্থাম-মিলের 'হিতবাদ'কে তিনি একেবারে বর্জন করেন নি। "হিতবাদ মতটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বস্তু নহে" (ধর্মতত্ত্ব—২২ অধ্যায়, আত্মপ্রীতি)। 'সাম্য' অগ্রাহ্য করেছেন, কিন্তু 'হিতবাদ' যথেষ্ট পরিমাণে স্বীকার করেছেন। যথা,

> "হিতবাদীদিগের ভ্রম এই যে, তাঁহারা বিবেচনা করেন যে সমস্ত ধর্মতত্ত্বটা এই হিতবাদ মতের ভিতরই আছে। তাহা না হইয়া ইহা ধর্ম-

তত্ত্বের অংশমাত্র।...তত্ত্বটা সত্যমূলক, কিন্তু ধর্মতত্ত্বের সমস্ত ক্ষেত্র আবৃত করে না।...হিতবাদ ধর্ম—অধর্ম নহে।" (ধর্মতত্ত্ব, ২২ অধ্যায়)

অবশ্য কোঁৎ-এর 'পজিটিভিজম্'-এর মূল বক্তব্যকে তিনি শেষ অবধিও যথেষ্ট স্বীকৃতি দিলেন,—তা আমরা 'ধর্মতত্ত্বে' দেখতে পাই। বঙ্কিম মানেন—জগৎ সত্য, সংসার মিথ্যা নয়, মানব-হিত শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি;—কিন্তু কোঁৎ-এর মানব-পূজা অচল। প্রত্যক্ষ-মূলক গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এই চার বিদ্যা বিজ্ঞানের প্রাথমিক সুনিশ্চিত বিদ্যা;—কোঁৎ-এর এই বক্তব্য বঙ্কিম মানেন। মানেন না প্রত্যক্ষ জ্ঞানই একমাত্র সত্যজ্ঞান, অন্য পদ্ধতিতে জ্ঞান অসম্ভব, অর্থাৎ অধ্যাত্মচিন্তা নিরর্থক। মানেন নি, কোঁৎ-এর নিরীশ্বরতা। কিন্তু মেনেছেন পজিটিভিস্টদের সমাজের প্রতি আনুগত্যের উপদেশ:

> "সমাজকে ভক্তি করিবে।...সমাজই রাজা সমাজই শিক্ষক। ভক্তি-ভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান হইবে। এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ করিয়া ওগুস্ত কোমত্ 'মানবদেবী'র পূজার বিধান করিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে আর বেশি বলিবার প্রয়োজন নাই।" (ধর্মতত্ত্ব—১০ম অধ্যায়, মনুষ্যে ভক্তি)

বলবার প্রয়োজন নাই—এই দৃষ্টিতে সমাজবিপ্লব সর্বথা পরিত্যাজ্য। কারণ, সমাজে যা পরিবর্তন তা স্বাভাবিকভাবেই হয়—সংস্কারকের চেষ্টা প্রায়ই অবাঞ্ছনীয় বাড়াবাড়ি—সমাজের প্রতি অবজ্ঞা-সূচক।

এইভাবে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজকে যুগোপযোগী যে প্রতিষ্ঠা বঙ্কিম দান করতে চান—ইংরেজিতে সংক্ষেপে তার নাম দেওয়া যায় বঙ্কিমের Rediscovery of Hinduism এবং Reconstruction of Hindu Culture। বঙ্কিমের তত্ত্বটা খুব সংক্ষেপে বললে অবশ্য তার বক্তব্যের প্রতি অবিচার করা হতে পারে। তবু সংক্ষেপে বলা যায় না, এমন নয়। কারণ, সৌভাগ্যক্রমে বঙ্কিমের জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর তিনি স্বয়ং সংক্ষেপে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জ্ঞাপন করেছেন। তাঁর সেই উক্তি উদ্ধৃত করে আমরা তাঁর ধর্মচিন্তার সূত্রসন্ধান দিতে পারি।

অনুশীলন-তত্ত্ব॥ বঙ্কিমচন্দ্র বহির্জীবন ও অন্তর্জীবন (অধ্যাত্মজীবন) স্পষ্ট করে দু এলাকায় এ জন্য জীবনকে ভাগ করেন। 'ভূত, আমি ও ঈশ্বরের' পরস্পর সম্বন্ধ প্রথম বুঝিয়েছেন; পরে—শিষ্যের মুখ দিয়ে নিজের বক্তব্য আবার বের করিয়ে এনে সকল সন্দেহের অবকাশ দূর করেছেন:—জীবনবাদের ও মানববাদের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন অধ্যাত্মবাদ,

> গুরু। ভূতকে জানিবে কোন শাস্ত্রে?
>
> শিষ্য। বহির্বিজ্ঞানে।
>
> গুরু। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর কোম্‌তের প্রথম চারি—Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব ও রসায়ন। এই জ্ঞানের জন্য আজিকার দিনে পাশ্চাত্ত্যদিগকে গুরু করিবে। তারপর আপনাকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে?
>
> শিষ্য। বহির্বিজ্ঞানে ও অন্তর্বিজ্ঞানে।

গুরু। অর্থাৎ কোম্‌তের শেষ দুই—Biology, Sociology, এ জ্ঞানও পাশ্চাত্যের নিকট যাচ্‌ঞা করিবে।

শিষ্য। তারপর ঈশ্বর জানিব কিসে ?

গুরু। হিন্দুশাস্ত্রে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায়। (ধর্মতত্ত্ব, ১৫শ অধ্যায়, 'ভক্তি')

বঙ্কিমের 'ধর্মতত্ত্বে'র মতবাদের সম্পূর্ণ রূপ এই উক্তিতে দেখতে পাওয়া যায়। মিলকে ছাড়লেও, 'সাম্য' বন্ধ করে দিলেও, বেন্থাম ও মিলের উন্নত সুখবাদকে (Hedonism) এরূপ বঙ্কিম পরোক্ষে ধর্মান্তর্ভুক্ত করেছেন। কোঁৎকে কিন্তু প্রত্যক্ষেই স্থান দিলেন ; কেবল জানালেন—কোঁৎ-এর তত্ত্ব অসম্পূর্ণ—তা নিরীশ্বর। হয় তা নিরীশ্বর বলেই অসম্পূর্ণ, নয় অসম্পূর্ণ বলে নিরীশ্বর। বঙ্কিমের মতে যা সম্পূর্ণ মতবাদ, তা ধর্মতত্ত্বের উপসংহারে (২৮তম অধ্যায় শিষ্য গুরুর কথা থেকে যা বুঝেছে,) সেই অনুশীলন ধর্মের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন পাশ্চাত্ত্য মনীষী সমাজ তখন প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস অপেক্ষাও খ্রীষ্টীয় কালচার বা সংস্কৃতিতে নিজেদের আশ্রয় খুঁজছেন। বঙ্কিমও সেই কালচার তত্ত্বই ভারতীয় (হিন্দু) দৃষ্টিতে স্থির করছেন—

১। মানুষের কতকগুলি শক্তি আছে। আপনি সেগুলির বৃত্তি নাম দিয়াছিলেন, সেগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২। তাহাই মানুষের ধর্ম।

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই সুখ।

৫। এই সকল বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হইলে ইহারা সকলেই ঈশ্বরমুখী হয়। ঈশ্বরমুখিতাই উপযুক্ত অনুশীলন। সেই অবস্থাই ভক্তি।

৬। ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন ; এইজন্য সর্বভূতে প্রীতি, ভক্তির অন্তর্গত, এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই।

৭। আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, স্বদেশপ্রীতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত। এই সকল স্থূল কথা।

গুরু। কই, শারীরিকী বৃত্তি, জ্ঞানার্জনী বৃত্তি, কার্যকারিণী, বৃত্তি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি, এ সকলের ত তুমি নামও করিলে না ?

শিষ্য। নিষ্প্রয়োজন। অনুশীলন তত্ত্বের স্থূল মর্মে এ সকল বিভাগ নাই। এক্ষণে বুঝিয়াছি, আমাকে অনুশীলন তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য এ সকল নামের সৃষ্টি করিয়াছেন।

গুরু। তবে, তুমি অনুশীলনতত্ত্ব বুঝিয়াছ। এক্ষণে আশীর্বাদ করি, ঈশ্বরে ভক্তি তোমার দৃঢ় হউক। সকল ধর্মের উপর স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না। (ধর্মতত্ত্ব—২৮ অধ্যায়, উপসংহার)

"সকল ধর্মের উপরে…" ॥ বোঝা যায়, বঙ্কিমের নিজের বিস্মৃত হবার উপায় ছিল না—'সকল ধর্মের উপর স্বদেশপ্রীতি।' বঙ্কিমের জীবন-দর্শনে মিল ও তাঁর সমাজতন্ত্র ইতিপূর্বেই নাকচ হয়ে গিয়েছিল। 'বঙ্গদেশের কৃষকে'র সমস্যা কেন, বাস্তব জীবনের কোনো সমস্যারই তখন আর তাঁর কাছে তেমন গুরুত্ব নেই। এমন কি, সাহিত্যেরও মহিমা নেই। 'প্রচারে' (১২৯২, পৌষ) 'ধর্ম এবং সাহিত্যে'র আলোচনায় তিনি সাহিত্যকে প্রায় সরিয়ে রাখতেই চেষ্টা করলেন; অবশ্য শেষে ধর্মের মধ্যে সাহিত্যকে স্থান দিলেন, কিন্তু সে স্থান গৌণ—'সৌন্দর্যসৃষ্টিই সাহিত্য'—প্রথম জীবনের এই সাহিত্যতত্ত্বে আর জোর দিলেন না:

> "সাহিত্যও ধর্মছাড়া নহে। কেন না, সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম। . . . কিন্তু সাহিত্যে যে সত্য ও যে ধর্ম, সমস্ত ধর্মের তাহা এক অংশ মাত্র। . . . সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্মের মঞ্চে আরোহণ কর।"

প্রথম জীবনের সাহিত্য-মোহ আর তত তীব্র নেই। কিন্তু প্রথম জীবনের একটি মর্মজ্বালা বোধহয় অতটা নিবে যায় নি। পরাধীনতার গ্লানি, স্বাদেশিকতার দুরন্ত আবেগ, এক অনুগ্র আলোকশিখায় পরিণত। তার নাম স্বদেশপ্রীতি—'সকল ধর্মের উপর' সেই স্বদেশপ্রীতি।

এই স্বদেশপ্রীতি ধর্মসমথিত স্বদেশপ্রীতি; এই স্বদেশপ্রীতির স্বরূপ বঙ্কিম (ধর্মতত্ত্ব, ২৪শ অধ্যায়) আগেই জানিয়েছেন—তা "ইউরোপীয় Patriotism নয়।"

> "ইউরোপীয় Patriotism ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পরের সমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিবে। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে।"

ধর্মহীন 'স্বদেশপ্রীতি' আসলে predatory nationalism, তা ইম্পীরিয়ালিজম-এর মূল। ধর্মসম্মত এই স্বদেশপ্রীতিই এদেশে ভাবে ও কর্মে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পরম পরিণতি লাভ করে।

অবশ্য বঙ্কিমের মতে পূর্বকালীন ভারতবর্ষীয়দের মতো "দেশপ্রীতিকে সার্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দেওয়া" অন্যায়। সেরূপ মূলহীন সার্বলৌকিক প্রীতি ভারতবর্ষীয়দের অবনতির কারণ।

> "দেশপ্রীতি ও সার্বলৌকিক প্রীতি, উভয়ের অনুশীলন ও পরস্পরের সামঞ্জস্য চাই। তাহা ঘটিলে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবে।"

নিছক ধর্মতত্ত্বের বা অনুশীলন-তত্ত্বের দিকে থেকে অবশ্য স্বদেশপ্রীতির ওপর এত গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজন ছিল না। বলা বাহুল্য, হর্বর্ট স্পেনসর, মাথু আর্নল্ড তা করেনও নি। কিন্তু বঙ্কিম নিজের দেশ-কালের অবস্থা সব বিস্মৃত হন না; পরাধীনতার গ্লানিতে তার হৃদয় বিদীর্ণ। বঙ্কিমের অনুশীলনধর্মে ও জীবনদর্শনে 'স্বদেশপ্রীতি' তাই মূলস্থানীয়—উদ্ধৃত কথা থেকে তা বেশ অনুভব করা যায়।

অনুশীলনের উদাহরণ ॥ স্বদেশপ্রীতির মতো আরেকটি বিষয়ও বঙ্কিমের মনে সেইরূপ কেন্দ্রস্থানীয়—কৃষ্ণচরিত্র। অনুশীলনধর্ম ব্যাখ্যাত হলে মনে হয়—এই অনুশীলনধর্ম তখনকার পাশ্চাত্ত্য "ক্যলচর"-তত্ত্বের সমতুল্য, বা নামান্তর। প্রথমে তাই বলতে হল—

> "এরূপ ধর্ম পরিবর্ধক আদর্শ—যেরূপ হিন্দুশাস্ত্রে আছে এমন আর পৃথিবীর কোনো ধর্মপুস্তকে নাই।"

গীতাতে সেই অনুশীলনধর্ম ব্যাখ্যাত হয়েছে—পাশ্চাত্ত্যদর্শনে তার ছায়াও নাই। তারপরে দেখাতে হবে—অনুশীলন-তত্ত্ব শুধু অবাস্তব তত্ত্ব নয়,—তা জীবনে উদ্‌যাপনীয় দর্শন—হিন্দুজীবনে তার সার্থক উদ্‌যাপনের দৃষ্টান্ত আছে। কারণ, হিন্দুধর্মই সম্পূর্ণ ধর্ম, অন্য সকল ধর্ম অসম্পূর্ণ ধর্ম। কৃষ্ণ সেই অনুশীলন-ধর্মের মূর্ত আদর্শ। সীলি, রেঁণা প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা মানবীয় অনুশীলনধর্মের (ক্যলচর অব্ হিউম্যানিটি) ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, যীশুই আদর্শ মানব। বৌদ্ধরা বুদ্ধকেই বলেন আদর্শ মানব। (রিস ডেভিস-এর মতো বুদ্ধভক্তরা সে সময়ে বুদ্ধকে বলেছেন ভারতের শ্রেষ্ঠ মানুষ)। কিন্তু বঙ্কিমের মতে সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাস মোটেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম নয়। এবং যীশু ও শাক্যসিংহ 'কৌপীনধারী ধর্মবেত্তা'—সেই কারণে অসম্পূর্ণ। কৃষ্ণ সংসারের সর্বক্ষেত্রে, সর্ব কর্তব্য পালনে সংযুক্ত—তিনি জীবন-সত্য ও মানব-সত্যকে সর্বভাবে স্বীকার করেছেন—তাই তিনিই আদর্শ মানুষ। তাই যীশু নন, কৃষ্ণই *Ecce Homo*। বঙ্কিমের অবশ্য আজন্ম বিশ্বাস "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং", কৃষ্ণ ভগবান্। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বঙ্কিম মানব-বাদীর বিচার-দৃষ্টি অবলম্বন করে বল্‌ছেন—কৃষ্ণ মানুষ হিসাবে আদর্শ মানুষ, আর সেই আদর্শ মানবের মধ্য দিয়ে তাঁর অবতারত্বই প্রতিপন্ন হয়। বঙ্কিমের বিচারে কৃষ্ণ সম্বন্ধে শেষ বক্তব্য এই :

> "যিনি বাহুবলে দুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, জ্ঞানবলে অপূর্ব নিষ্কাম ধর্মের প্রচার করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।···যিনি একাধারে শাক্যসিংহ, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র, যিনি সর্ববলাধার, সর্বগুণাধার, সর্বধর্মবেত্তা, সর্বত্র প্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন্, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।" (ধর্মতত্ত্ব, ৪র্থ অধ্যায়,)

'কৃষ্ণচরিত্রে' এই 'মহাভারত', 'হরিবংশ' প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত কৃষ্ণবিষয়ক যাবতীয় তথ্য বঙ্কিম নিজের অভিপ্রায়ানুযায়ী বিচার-বিশ্লেষণ করে সেই আদর্শ মানব কৃষ্ণকে উদ্ধার করলেন। পরে 'ভগবদ্গীতা'র তদনুরূপ ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন। সে বিচারে তিনি কৃষ্ণভক্তদের গতানুগতিক বিশ্বাসকে বা পুরাতন শাস্ত্রবাদীদের পাণ্ডিত্যরীতিকে আঁকড়িয়ে থাকেন নি। বরং নিজের অসামান্য মনীষা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক গবেষণার যুক্তিপদ্ধতি। তাতে বহুখ্যাত শাস্ত্রের ও নানা কৃষ্ণভক্ত সম্প্রদায়ের কৃষ্ণসম্বন্ধীয় মতামত তিনি সবলে খণ্ডিত করেছেন, বর্জন করেছেন। তাঁর চিরারাধ্য কৃষ্ণেই তিনি এরূপ অভিপ্রেত 'আদর্শ মানুষ' আবিষ্কার করেছেন ;—

আজন্মলব্ধ বিশ্বাসকে প্রমাণিত করেছেন। কৃষ্ণোক্ত নিষ্কাম ধর্মেরও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন। এই যুক্তিসম্পদের তুলনা নেই। (রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্ণচরিত্রের' সমালোচনায় বঙ্কিমের এই যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনাপদ্ধতির প্রভূত প্রশংসা করেছেন; মুক্ত মন নিয়ে শাস্ত্র ও সুপ্রচলিত বিশ্বাস অগ্রাহ্য করে—হিন্দুধর্ম বিচারের সমর্থন করেছেন)। কিন্তু সে যুক্তি কতটা আদর্শ আবিষ্কারের সহায় হয়েছে, আর যুক্তি কতটা আসলে অভিপ্রেত আদর্শের অনুসরণমাত্র—কতটা সুযুক্তি, কতটা মতবাদ-সমর্থক তার্কিক বুদ্ধি—সেই সন্দেহ দূর হয় না। বিশেষত, আলোচনাকালে তুচ্ছ বিষয়ে বঙ্কিমের ক্ষোভ ও অন্য মতবাদের প্রতি বঙ্কিমের অসহিষ্ণুতা চাপা থাকে নি।

বঙ্কিমের ভাবয়িত্রী প্রতিভার সম্বন্ধে তাই এই কথা স্পষ্ট:—শিল্প-সমালোচনা, সাহিত্য, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি এবং বেদ, উপনিষদ, মহাভারত, স্মৃতিশাস্ত্র, সাংখ্যবেদান্তাদি অজস্র দেশীয় ও বিদেশীয়, পুরাতন ও আধুনিক প্রায় সর্ব বিষয়ে বঙ্কিমের সেই প্রতিভা বহুমুখী জিজ্ঞাসার ও অপূর্ব মনীষার পরিচয় রেখে গিয়েছে। বঙ্কিমের ভাবয়িত্রী প্রতিভা সেই সব আলোচনায় সমস্ত বাঙালী পাঠকের সম্মুখে এক শত বৎসর পূর্বে মনের সকল দুয়ার খুলে দেয়; বাঙলা সাহিত্যে গভীর চিন্তারীতির (high seriousness-এর) একটি ঐতিহ্য নির্মাণ করে; এবং—যা আরও অবিস্মরণীয়—বাঙলা গদ্যসাহিত্যে সত্যকারের প্রাঞ্জল, যুক্তিনিষ্ঠ, স্বচ্ছন্দ, অপূর্ব-শ্রীমণ্ডিত আদর্শ গদ্যরীতি (style) স্থাপন করে যায়। বাঙলা প্রবন্ধ ও আলোচনামূলক সাহিত্যে বঙ্কিমের গদ্যরীতিই আদর্শ গদ্যরীতি—পরবর্তী শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকাররাও অবনত শিরে তাঁর অনুসরণ করেছেন।

পুস্তক-পরিচয়

বঙ্কিমের ধর্মচিন্তায় বঙ্কিমের ভাবয়িত্রী প্রতিভার দান সূত্রাকারে নির্দেশ করা হল। (এখন আমরা তাঁর রচনা-নিদর্শনগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রহণ করতে পারি। এই 'সংগ্রহে' বঙ্কিমের 'লোকরহস্য' প্রভৃতি সাতখানা গ্রন্থ প্রবন্ধ খণ্ড, ১ম অংশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; প্রবন্ধ খণ্ড, ২য় অংশে এখন ধর্মালোচনার গ্রন্থগুলি স্থান লাভ করছে। প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত রচনাসমূহের কথা তারপর সংক্ষেপে শেষ করা যাবে।)

'কৃষ্ণচরিত্র—প্রথম ভাগ' নামক গ্রন্থ প্রথম গ্রথিত হয় খ্রী ১৮৮৬ সালে। খ্রী ১৮৮৪ সাল (বাং ১২৯১ আশ্বিন সংখ্যা) থেকে তা ধারাবাহিক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'নবজীবনে' প্রকাশিত হচ্ছিল। ধর্মতত্ত্ব তারও একটু পূর্বে (বাং ১২৯১ শ্রাবণ সংখ্যা থেকে) 'প্রচারে' আরম্ভ হয়েছিল ('প্রচারে' তখনই 'দেবতত্ত্বের' লেখাগুলির আরম্ভ)। 'কৃষ্ণচরিত্রে' তখনকার বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন, আগে অনুশীলনধর্ম পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত হলে ভালো হত—কারণ 'আগে তত্ত্ব, পরে উদাহরণ; কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ।' তবে

'কৃষ্ণচরিত্রে'র উপক্রমণিকাভাগে তত্ত্বের সারাংশ দিয়ে বঙ্কিম পাঠকের অসুবিধা দূর করে দিয়েছেন। বঙ্গদর্শনে 'কৃষ্ণচরিত্র' (পুস্তকে গ্রথিত হয় নি) পরিবর্তিত হচ্ছে। এর পরেও তা আরো পরিবর্তিত হলো। 'কৃষ্ণচরিত্র' সম্পূর্ণ আকারে (বর্তমানে গৃহীত রূপে) তৎপর প্রকাশিত হয় খ্রী ১৮৯২ সালে। সেই বিজ্ঞাপনে বঙ্কিম নিজের মত পরিবর্তনের কথা বলেন (পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে)।

'কৃষ্ণচরিত্র' পুরাতত্ত্ববিষয়ক অসামান্য গবেষণার পুস্তক। যে কোন শ্রেষ্ঠ গবেষকের পক্ষেও তা গৌরবজনক হত। অবশ্য বঙ্কিমের প্রধান উদ্দেশ্য—কৃষ্ণকে আদর্শ মানুষ (অনুশীলন-তত্ত্বের জীবন্ত বিগ্রহ) রূপে প্রতিষ্ঠিত করা, তাই প্রয়োজনে মনুষ্য হিসাবে তাঁকে প্রথম আবিষ্কার (উপক্রমণিকা), সেই জন্যই তাঁর প্রয়োজন কৃষ্ণসম্বন্ধীয় অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত বা সামঞ্জস্যহীন উপকথা প্রভৃতি বিচার করা এবং বর্জন করা। যেমন, প্রথমত, মহাভারতের ঐতিহাসিকতা প্রতিপাদন করে কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি প্রমাণিত করা, সেজন্য 'মহাভারত', 'হরিবংশ', তারপর 'ভগবত', 'বিষ্ণুপুরাণ', ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' প্রভৃতিতে উল্লিখিত কৃষ্ণসম্বন্ধীয় প্রতিটি তত্ত্ব ও কাহিনী ঐতিহাসিকের যুক্তিসিদ্ধ দৃষ্টিতে বিচার করা ; যা বিচার-সহনীয় নয় সেসব কৃষ্ণ-আখ্যায়িকা বর্জন ও খণ্ডন করে কৃষ্ণের সত্যকার জীবন-বৃত্তান্ত উদ্ধার করা। এইরূপে শৈশব থেকেই মরণ পর্যন্ত 'কৃষ্ণচরিত্র'—কৃষ্ণের বৃন্দাবন, মথুরা-দ্বারকা, ইন্দ্রপ্রস্থ, উপপ্লব্য, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস এই সপ্তপর্বের প্রতিটি পর্বের প্রকৃত কৃষ্ণচরিত্র—বঙ্কিম অতুলনীয় যত্নে প্রত্যক্ষ করে তোলেন। ফলে দেখা যায় সত্যিই 'অনুশীলন তত্ত্বে'র পরিপূর্ণ বিগ্রহ—স্বাভাবিক, মানসিক, জ্ঞানার্জ্জনী ও চিত্তরঞ্জনী বৃত্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ ও পরিপূর্ণ বিকাশে কৃষ্ণ আদর্শ মানুষ। বঙ্কিম স্বয়ং (পারিবারিক-সূত্রে) মনে করতেন কৃষ্ণ ভগবানের অবতার। কিন্তু সে বিশ্বাস বাহ্যত সরিয়ে রেখে মানবতাবাদীর দৃষ্টিতে প্রথমে তিনি কৃষ্ণকে প্রমাণ করলেন আদর্শ মনুষ্য, এবং সেই হিসাবে কৃষ্ণ শক্তিতে অমানুষ। তাতেই তাঁর 'অবতারত্ব'। এবং জানান,—"এইপ্রকার মানুষ শক্তির দ্বারা অতিমানুষ চরিত্রের বিকাশ হইতে তাহার মনুষ্যত্ব বা ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদন করা বিধেয় কিনা তা পাঠক আপন বুদ্ধি বিবেচনায় স্থির করিবেন"।

কথাটিতে বঙ্কিমের নিজের যথার্থ প্রবণতা,—বঙ্কিম পূর্বেই যে সিদ্ধান্ত স্থির করে রেখেছেন—তা বোঝা দুঃসাধ্য নয়—বঙ্কিমের মানবতাবাদ 'অবতারবাদের আশ্রিত'।

'ধর্মতত্ত্ব—প্রথম ভাগ—অনুশীলন।' এই নামে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়—১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে। অনুশীলনবিষয়ক ধারাবাহিক আলোচনা 'নবজীবনে' আরম্ভ হয় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। সে পত্রিকার প্রথম সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৯১ বঙ্গাব্দ) থেকে মাঝে মাঝে দু-এক সংখ্যা বাদ গিয়েছে, বঙ্গাব্দ ১২৯২ চৈত্র পর্যন্ত 'জিজ্ঞাসা', 'মনুষ্যত্ব', 'অনুশীলন', 'সুখ', 'প্রীতি', 'দায়' প্রভৃতি বিভিন্ন নামে প্রবন্ধাকারে আলোচনা চলেছে। সেসব লেখার কিছু পরিবর্তন করে ও আরো নতুন কিছু লেখা যোগ করে 'ধর্মতত্ত্ব পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের নামে

বলা হয়েছিল ‘প্রথম ভাগ’। স্পষ্টই বোঝা যায়, আরো দু-এক ভাগ রচনার সংকল্প ছিল, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের আয়ুতে আর কুলোয় নি। বঙ্কিমের জীবিতকালে ‘ধর্মতত্ত্বের’ আর নতুন সংস্করণও হয় নি।

‘ধর্মতত্ত্ব’ ‘বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বোত্তম দার্শনিক অবদান’—‘কৃষ্ণচরিত্র’ যেমন ‘প্রত্নতত্ত্ব’ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান অবদান—(হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—‘দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র’—পৃঃ ১৫৮, ১৭০)। গুরু-শিষ্য-সংবাদরূপে সমগ্র আলোচনা চলেছে—এ পদ্ধতি ডায়ালেকৃটিক্ বা পক্ষ-প্রতিপক্ষের প্রশ্নোত্তর ; দার্শনিক আলোচনা ও তত্ত্ব প্রতিপাদন ভারতীয় দর্শনে ঐতিহ্যগত, পাশ্চাত্ত্য দর্শনে ‘ডায়েলেকৃটিক্’ সুপরিচিত। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝে-সুঝেই এ পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। ‘বঙ্গদর্শনে’ বঙ্গাব্দ ১২৮৪, আশ্বিন সংখ্যায় জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবনচরিত আলোচনাতে এই তত্ত্বের সৃষ্টি সূচিত হয়েছিল ; ‘বিবিধ প্রবন্ধ’—দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত ‘মনুষ্যত্ব কি ?’ নামক প্রবন্ধ তারই ভগ্নাংশ। বঙ্কিমের মতে ধর্মতত্ত্বে অনুশীলন-ধর্ম যা তিনি বুঝিয়েছেন, “তাহার বীজ ইহাতে (‘মনুষ্যত্ব কি ?’) আছে”। “মনুষ্যত্ব কি”-র সে অংশের এখানে উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন। ‘ধর্ম-তত্ত্বে’র মূল প্রতিপাদ্য বঙ্কিমের ভাষাতেই ইতিপূর্বে (‘বঙ্কিমের চিন্তাসম্পদ’ ‘জিজ্ঞাসা-বৈচিত্র্য’) উদ্ধৃত হয়েছে। তবু তার কিছু উল্লেখ এখানেও করা প্রয়োজন। তাতে দেখি বীজ যখন বৃক্ষাকারে বর্ধিত, তখন আর জন স্টুয়ার্ট মিলের চিহ্ন নাই। পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার যথেষ্ট প্রভাব ধর্মতত্ত্বে আছে, কিন্তু সে অগস্ট কোঁৎ-এর—উপন্যাসে পর্যন্ত বঙ্কিম কোঁৎকে মান্য করেছেন। অবশ্য সাংখ্য দর্শনে (বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ও ‘কমলাকান্তের দপ্তরে’ ১ম সংখ্যায় তার আভাস আছে আমরা জানি) শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী,—এই চার ধারার সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলন তার প্রধান সোপান। গীতায় সাধারণভাবে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি বলেও এই harmonious development-এরই কথা বলা হয়েছে। অবশ্য এইরূপ বৃত্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশেরই সঙ্গে চলে কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি ‘পাশব বৃত্তি’গুলিরও ‘দমন’। ‘দমন’ অর্থ ধ্বংস নয়, অনুশীলন বা সংযম ও উন্নয়ন (হীরেন্দ্রনাথ দত্তের মতে sublimation) এসবেই অনুশীলনের প্রারম্ভ। সংগত কারণেই মনে হবে—বঙ্কিমের অনুশীলনও পাশ্চাত্ত্য অনুশীলন-তত্ত্বের (Doctrine of Culture) প্রেরণায় প্রণীত। (Substance of religion is culture—সীলির এই মত বঙ্কিমের বিশেষ অনুমোদিত) বঙ্কিম একবারও সংসারকে অসার মানেন নি, বরং বাস্তব জগৎকে সত্য বলে মেনেছেন। এবং সন্ন্যাস অপেক্ষা গৃহস্থাশ্রমকে ধর্মের শ্রেয়তর পথ বলে সবলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য অনুশীলন-তত্ত্ব নাস্তিকের মত। পারমার্থিক তত্ত্বের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রায় নেই। বঙ্কিমের নিকট কোম্‌ত-ধর্ম (পজিটিভিজম্) অনুশীলনের পদ্ধতিমাত্র বলে বোধ হয় (ধর্মতত্ত্ব, ১ম পঃ)

• বিলাতি অনুশীলন তত্ত্ব নিরীশ্বর,—এজন্য উহা অসম্পূর্ণ ও অপরিণত, অথবা উহা অসম্পূর্ণ ও অপরিণত বলিয়াই নিরীশ্বর,—ঠিক বুঝি না।”

কারণ, কোঁৎ-তত্ত্ব ('পজিটিভিজম্‌বাদ') যে অপরোক্ষ অনুভূতিকে নিরর্থক মনে করে ; কিন্তু সেই অপরোক্ষ অনুভূতিই ঈশ্বরানুভূতিদায়ক অনুশীলনের আসল অবলম্বন ; এই অধ্যাত্মবাদের অনুগামী হলেই বহির্বিজ্ঞানের আসল সাফল্য। বিলিতি অনুশীলনের উদ্দেশ্য 'সুখ',—বঙ্কিম যদিও সুখ মেনেছেন কিন্তু তা মহত্তর 'সুখ'—সর্বজীবে প্রীতি ও ঈশ্বরপ্রীতি—(আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, মনুষ্যপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া এবং ঈশ্বরপ্রীতি···এই সেই 'সুখের' ক্রম)। এবং বঙ্কিমের মতে অনুশীলনের সেই প্রীতির উৎকর্ষেই ভক্তি :—আর অনুশীলনের সম্পূর্ণতাই মোক্ষ। (এই ভক্তির ব্যাখ্যাই ধর্মতত্ত্বের বহু প্রসঙ্গ ব্যাপী পরিব্যাপ্ত) তাই বলতে পারি বঙ্কিমের অনুশীলনের উদ্দেশ্য 'সুখ' নয়, মোক্ষ। ঐশ্বরিক আদর্শনীত স্বভাবপ্রাপ্তি। এইজন্য ঈশ্বর ভিন্ন ধর্ম নাই ও অনুশীলন নাই। (হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—ঐ, ১১০)।

> "যদি কেহ মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া ধর্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান এবং মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে শ্রীমদ্ভাগবত-গীতাকার।"

তিনি অবশ্য কৃষ্ণ বটে, কিন্তু হিন্দুর অধিকাংশ সম্প্রদায়ের উপাস্য কৃষ্ণ নন।" এমনকি চৈতন্যদেবের প্রেমময় কৃষ্ণও নন, এ তত্ত্ব (চৈতন্যের) প্রেমধর্মও নয়—

> "অনুশীলন তত্ত্বের সহিত সে ভক্তিবাদের (চৈতন্যের প্রেমধর্মের) সম্বন্ধ তাদৃশ ঘনিষ্ঠ নহে—বরং একটুখানি বিরোধ আছে।" (ধর্মতত্ত্ব—২১শ প)।

বঙ্কিমের কৃষ্ণ হয়তো বা গুপ্ত সাম্রাজ্যের কৃষ্ণ বাসুদেব, অথবা (বঙ্কিমের অনুপ্রাণিত) বিংশ শতাব্দীর হিন্দুসভার পার্থসারথি।

যাই হোক, শুধু ধর্মের ব্যাখ্যাই নয়, হিন্দু ধর্মের নানা প্রসঙ্গ 'ধর্মতত্ত্বে' আলোচিত হয়েছে, যথা সগুণ-নির্গুণ তত্ত্ব, সাকার-নিরাকার তত্ত্ব, 'অধিকারভেদ' ও ধর্মের বিবিধ সোপানের অস্তিত্ব—এবং পরকাল, জন্মান্তর প্রভৃতির প্রশ্ন। অবশ্য তার পূর্বে হিন্দুধর্মের "বখামি"গুলি ত্যাগ করতে হবে। "জঞ্জাল" সাফ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই নির্দেশ করেছেন বঙ্কিমের এই সনাতন-ধর্ম তথাকথিত সনাতন ধর্ম ও সমাজকে প্রায় যুক্তিযুক্ত ও উদার ধর্মে রূপান্তরিত করার প্রয়াস। বঙ্কিম কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেছেন হিন্দুজাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ; "যেদিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এই (গীতোক্ত) নিষ্কাম কর্ম একত্র হইবে, সেইদিন মনুষ্য দেবতা হইবে। তখন ঐ (ইউরোপীয়) বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম প্রয়োগ হইবে না।"

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা : এ গ্রন্থে আছে চতুর্থ অধ্যায়ের ২৯শ শ্লোক পর্যন্ত গীতার ব্যাখ্যা ;—বঙ্কিমের জীবনকালে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচারে' গীতার ব্যাখ্যান আরম্ভ করেছিলেন ১২৯৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে, ১২৯৫ ফাল্গুনের 'প্রচার'-এ দ্বিতীয় অধ্যায় পর্যন্ত ব্যাখ্যাত হয়েছিল, চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোক অবধি বাকীটা পাণ্ডুলিপিতে ছিল। অর্থাৎ বঙ্কিমের ব্যাখ্যাও অসমাপ্ত। ১৯০২ সালে (মুদ্রিত ও পাণ্ডুলিপি সহ) সমাপ্ত ব্যাখ্যা অংশের সঙ্গে কালীপ্রসন্ন সিংহের মূল ও অনুবাদিত মহাভারত থেকে

বাকী গীতাংশ জুড়ে প্রথম গ্রন্থাকারে তা প্রকাশ করা হয়। যা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা সেই অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যাই এখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদাদি সংস্করণে গৃহীত—আর তাই সংগত। কারণ, যা বঙ্কিমের লেখা নয়, বঙ্কিমের রচনায় তার স্থান দেওয়া চলে না। কেন এই গীতার ব্যাখ্যা, ভূমিকায় স্বয়ং বঙ্কিমই তা নিবেদন করেছেন :—ইংরেজি শিক্ষিত পাঠকদের পক্ষে পুরাতন ভাষ্যাদি দুর্গম ; তাই তাদের বোধগম্য করে গীতার ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, সেরূপ আধুনিক শিক্ষিত মনে গীতা অধ্যয়নে যেসব বিশেষ সংশয় জাগে, তার নিরসন প্রয়োজন। পুরাতন ব্যাখ্যাকার এসব জানতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে কৃষ্ণোক্ত নিষ্কাম ধর্ম সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। তা উপলক্ষ করে তিনি ধর্মতত্ত্ব, 'কৃষ্ণচরিত্রের' বক্তব্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বহু কথার অবতারণা ও আলোচনা করেছেন। তাতে পাণ্ডিত্য, বিচারবুদ্ধির কিছুরই অভাব নেই। যথা,

> "গীতায় যাহা কিছু আছে, তাহাই যে ভগবদুক্তি এমন কথা বিশ্বাস করা উচিত নহে।"

মূল গীতা, বঙ্কিমের মতে, শেষ হয়েছিল বিশ্বরূপ-দর্শনে—শেষের ছয় অধ্যায় গীতার অংশ নয়। তাঁর কথায় "সংযতেন্দ্রিয় ও নিষ্কাম হইয়া যে ঈশ্বরে চিত্তার্পণ, তাহাই প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠা। গীতায় আর যাহা কিছু আছে তাহা এই কথার সম্প্রসারণ মাত্র—অধিকারভেদে পদ্ধতি নির্বাচন মাত্র।"

> "পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যাহাকে Thought, Action, Feeling বলিয়াছেন—ঐ তিনকেই ঈশ্বরমুখী করা যাইতে পারে—Thought ঈশ্বরমুখী হইলে জ্ঞানযোগ ; Action ঈশ্বরমুখী হইলে কর্মযোগ ; এবং Feeling ঈশ্বরমুখী হইলে ভক্তিযোগ।"

অধিকারভেদে সবই সুপথ। তবে গীতায় জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের সামঞ্জস্য আছে। অনুশীলন-তত্ত্বেও সকল বৃত্তির সামঞ্জস্য উদ্দিষ্ট ; কিন্তু সেখানে প্রতিটি বৃত্তির পূর্ণ বিকাশে তা সম্ভব, এরূপ মনে হয়। গীতায় কিন্তু মনে হয় ভক্তির (বা জ্ঞানের) পূর্ণ বিকাশই উদ্দিষ্ট, অন্য দুইটির তদনুযায়ী পূর্ণ নয়—প্রয়োজনীয় বিকাশই যথেষ্ট। নিশ্চয়ই কর্ম বর্জনীয় নয়—কারণ গীতা তো যুদ্ধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করার জন্যই কথিত।

দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম ॥ এই নাতিক্ষুদ্র গ্রন্থখানি এ নাম ও এ আকারে প্রকাশ লাভ করেছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ থেকে (শতবার্ষিকী সংস্করণ), তার আগে এর অস্তিত্ব ছিল না। অবশ্য গ্রন্থের অন্তর্গত প্রসঙ্গগুলি ভিন্ন ভিন্ন নামে 'প্রচারে' প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরে প্রকাশিত হয়েছিল। 'কৃষ্ণচরিত্রে'র প্রথমবারের 'বিজ্ঞাপনে' দেবতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধটির উল্লেখও ছিল। কিন্তু সে পুনরুদ্ধার করা, একসঙ্গে অবলোকন করা, একত্রে গ্রথিত করা এবং পুস্তকাকারে রূপদান ও সে পুস্তকের নামকরণ—সবই পরিষদ সংস্করণের অন্যতম সম্পাদক সজনীকান্ত দাস মহাশয়ের কীর্তি (সম্ভবত বঙ্কিম সম্বন্ধে এতবড় গুরুতর আবিষ্কার আর হয় নি)। বঙ্কিমের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধীয় অনেক উল্লেখযোগ্য উক্তি (অন্যত্রও অবশ্য ওরূপ উক্তি আছে) এ গ্রন্থে লাভ করা যায়।—যথা :

"সর্বাংশে শাস্ত্রসম্মত যে হিন্দুধর্ম তাহা কোনোরূপে এক্ষণে পুনঃ সংস্থাপিত হইতে পারে না।"

'কোনকালে হইয়াছিল কিনা'—বঙ্কিমের এই সন্দেহের তাৎপর্যও বোঝা উচিত। বঙ্কিমও বুঝতেন—হিন্দুশাস্ত্রে যা পাওয়া যায় সব সময়ে তা হিন্দুর বাস্তব অবস্থা ও ব্যবস্থার কথা নয় ;—অনেক সময়ে কাল্পনিক বা বাঞ্ছনীয় অবস্থা ও ব্যবস্থারই কৃত্রিম চিত্র। তার উদ্দেশ্য লোকোপদেশ—সনাতন ব্যবস্থার নাম করে লোকের আনুগত্য-অর্জন। বৈদিক দেবতা, যাগযজ্ঞ, ও সেই দেবতাদের উপাসনাদির ক্রমবিকাশের পরে বৈদিক ধর্ম ঈশ্বর উপাসনায় গিয়া পৌঁছে, এই তত্ত্বের যুক্তিযুক্ত আলোচনা, অনুসন্ধান ও যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত স্থির করা এই প্রবন্ধগুলির উদ্দেশ্য।

আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে বঙ্কিমের প্রথমাবধি পরিচয়। এই বৈদিক দেবতত্ত্বের বিচারে বঙ্কিম যথাসম্ভব তৎকালীন সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের (Cultural Anthropology'র) দৃষ্টিই গ্রহণ করেছেন।

সাহিত্যিক জীবনী ও সমালোচনা॥ এই বিভাগে রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা (উক্ত নামের গ্রন্থাবলীর ভূমিকা ১২৮৩ পুস্তকাকারে প্রকাশিত), ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব, 'বাংলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র', 'সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী'—বঙ্কিমের এই চারিটি সাহিত্য রচনা অন্তর্ভুক্ত হল। এই সব রচনা কখনো কখনো স্বতন্ত্র প্রকাশিত হয়েছে, বিভিন্ন উপলক্ষে রচিত হয়েছে ; কিন্তু বঙ্কিমের নিজের কোন গ্রন্থে তিনি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন নি। এই সব সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা বাংলা সাহিত্যের সমালোচনার ক্ষেত্রে ক্ল্যাসিক। সেই সঙ্গেই পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত বঙ্গদর্শনে লিখিত গ্রন্থ সমালোচনা প্রভৃতির স্থান হওয়া উচিত।

(২) পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত আরও কিছু রচনাও যথাসম্ভব "রচনা-সংগ্রহে" সংগৃহীত হচ্ছে (বাকী রচনাগুলি পরবর্তী খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হবে)।

বঙ্কিমের জীবন-দর্শনের তাৎপর্য

বঙ্কিমের চিন্তাসম্পদ ও বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা গ্রহণ করলাম। ভাবয়িত্রী প্রতিভার রূপরেখা তাতে সাধারণভাবে দেখা হলো। স্বল্প পরিসরে এখানে তাঁর জীবন-দর্শনের আলোচনা অসম্ভব। অতবড় বিশ্ববীক্ষক (encyclopaedic) প্রতিভার পরিমাপ আমাদের পক্ষে অসাধ্য। তবে চিন্তা-সম্পদের আলোচনায় বঙ্কিমের জীবন-দর্শন মোটামুটি প্রতিভাত হবার কথা। কারণ উপন্যাস বা কাব্য সাহিত্যে লেখকের ভাবাদর্শ দুর্নিরীক্ষ হওয়া প্রায়ই স্বাভাবিক। কিন্তু ভাবয়িত্রী রচনায় তা পরোক্ষ না থাকাই নিয়ম। বিশেষত্, বঙ্কিম তাঁর পরিণত জীবনের উপলব্ধি বা ভাবাদর্শ 'ধর্মতত্ত্বে' পরিষ্কার করে তুলতে ত্রুটি করেন নি, তা আমরা দেখেছি। বঙ্কিমের কর্মজীবনের প্রায় একশত বৎসর পরে আজ সেই পরিপ্রেক্ষিত কালের নিয়মেই অনেকটা স্পষ্ট। তাতে বঙ্কিমের

জীবনদর্শনের তাৎপর্যও মোটামুটি অনুধাবন করা সম্ভব। আমাদের এ চেষ্টা স্পর্ধা নয়, এ কালের বঙ্কিম-পাঠের আবশ্যকীয় অঙ্গ।

শোনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেব নাকি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "বঙ্কিম বাঁকা কেন?"—আর বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন, "জুতোর চোটে।" জ্ঞানী ও ভক্ত দুজনেরই একটা বিষয়ে মিল দেখা যায়—তাঁরা রসিক। কী ভেবে তাঁরা নিজ নিজ উক্তি করেছিলেন, জানি না, কিন্তু এখনকার দিনে আমরা তা অনুমান করতে পারি। ভক্ত পুরুষ বোধ হয় বলতে চেয়েছিলেন—ঈশ্বরভক্তি যখন (বঙ্কিমের মতে) বঙ্কিমের জীবনজিজ্ঞাসার যথার্থ উত্তর, অন্য সকল উত্তর অযথার্থ—তা হলে তখন অত কোঁৎ-বেন্থামের চর্চাই বা কেন? আর বিজ্ঞানের দর্শনের অত কচকচিই বা কেন? ওসব তো বাঁকা পথ। বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্বের পথটা সত্যই সরল নয়, বাঁকা। বঙ্কিম বোধ হয় উত্তরে বলতে চেয়েছিলেন—পরাধীন ভারতবর্ষে চাকরির জুতো এবং মূঢ় প্রাচীন শাস্ত্রের জুতো বহন করে কারও মন ও মত না বেঁকে গিয়ে পারে না। সত্য মিথ্যা কথাটা যাই হোক, এ ব্যাখ্যা সংগতিহীন নয়।

নিজের জীবন-দর্শনের সরলীকৃত সূত্র বঙ্কিম 'ধর্মতত্ত্বে' লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা তা দেখেছি। বলতে পারি—বঙ্কিম এক অর্থে উপনিষদের একটি উপদেশেরই তাতে পুনরাবৃত্তি করেছেন "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমাপ্নুতে"। 'বহির্বিজ্ঞানে'র জন্য অবলম্বন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ('অবিদ্যা'), আর 'অন্তর্বিজ্ঞানে'র জন্য হিন্দুশাস্ত্র, প্রধানত গীতা (বিদ্যা)।

দার্শনিক তত্ত্ব ॥ দার্শনিকরা বলবেন এ dualism, দ্বৈতবাদ;—শেষ অবধি রামানুজ-শ্রীধরস্বামীর ধারার আধুনিক সংস্করণ। ইউরোপীয় দর্শনের দিকে তাকিয়ে দার্শনিকরা বলেন,* Altruistic Hedonism ('সুখবাদ')-এর ধারায় Utilitarianism বা 'হিতবাদ' জন্মে। তাতে বেন্থামের Quantitative pleasure ছাড়িয়ে আসে মিলের Qualitative pleasure-এর তত্ত্ব। প্রথম দিককার বঙ্কিমের নিকট এই উন্নত 'সুখবাদ' প্রধান সত্য। কিন্তু 'Egotistic Hedonism'এর কিছু চিহ্নও তাতে ছিল। তার ফলে ক্রমে ব্যক্তি-মানুষের আত্মানুশীলন হয়ে ওঠে বঙ্কিমের উদ্দেশ্য:—সামাজিক ভাবনা বঙ্কিমচিন্তায় সে তুলনায় হয়ে যায় গৌণ। অবশ্য একেবারে Egotistic-ও নয়, কারণ ব্যক্তিমানুষের সেই আত্মপ্রীতি নিষ্কাম হয়ে স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি ইত্যাদি সোপান দিয়ে শুদ্ধ প্রীতিতে উন্নীত হবে, একথাই বঙ্কিমের প্রকৃত বক্তব্য। তবে সেই বেন্থামের 'হিতবাদে'র সগোত্র কোঁৎ-এর Positivism বা 'প্রত্যক্ষবাদ' প্রথম থেকেই বঙ্কিমের বিশেষ স্বীকৃত। কিন্তু এসব (লক্, হিউম প্রভৃতি) বেকনীয় পাশ্চাত্য যুক্তিবাদীরাও বস্তু ও চৈতন্যের (Matter and Mind) দ্বৈত তত্ত্বকে যুক্তির সহায়ে বাতিল করতে পারেন নি—মিলও না, কোঁৎও না। মানুষের কিছু

* শ্রীযুক্তা অরুণা দেবী হালদারের থেকে মুখে মুখে শোনা কথার সংক্ষিপ্তসার।

আন্তরিক ক্ষুধা থেকে যায়। কোঁৎ তা মেটাবার জন্য 'প্রত্যক্ষবাদে'রও এক নতুন উপাস্য স্থাপন করলেন—Goddess of Humanity, মানবদেবী। আর বঙ্কিম? কোঁৎ-এর সমাজ-প্রীতি, মানব-প্রীতি, কখনো তাঁর পক্ষে যথেষ্ট নয়, বরাবরই তাঁর চাই—প্রকৃতির উপরে অতি-প্রকৃতি, (ঈশ্বর, পরকাল, পুনর্জন্ম ইত্যাদি)। কেউ ওসবকে না মানলে তার সঙ্গে বঙ্কিমের কথা ফুরোলো। অর্থাৎ বঙ্কিমের দৃষ্টিতে অতি-প্রাকৃত শুধু সত্য নয়—'আরো সত্য'—'ধর্মতত্ত্ব' থেকে এ ধারণাই জন্মে। তথাপি বঙ্কিমের অধ্যাত্মবাদ বিজ্ঞানকে শেষ অবধি স্বীকার করত; বিজ্ঞান ও ভারতীয় অধ্যাত্মশাস্ত্র দুইকে বঙ্কিম-দর্শন মেলাতে চেয়েছে—অথবা, দুয়ের সংযোগ-রক্ষা করেছে গীতার নিষ্কাম কর্ম—এ যেন নিষ্কাম সুখ, নিষ্কামপ্রীতি প্রভৃতির মই লাগিয়ে, বিজ্ঞানের স্থির মাটি বর্জন না করে, অধ্যাত্মাকাশে আরোহণ। মাটি ও আকাশে ঠিক মিল হয় না—দ্বৈতই থাকে। একমাত্র dialectics বা দ্বন্দ্বসমন্বয়ের পদ্ধতিতে এই Matter-Mind-এর দ্বৈত-সমস্যা মেটানো যায়। হেগেল তা করেন ভাববাদী পথে। মার্কস সেই দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের পদ্ধতিতেই মেটান হেগেলের ভাববাদী জট—বস্তুই মূল, আইডিয়া তার প্রমাণ। বঙ্কিম বিজ্ঞানগ্রাহ্য প্রাকৃত বস্তুকে মানেন। কিন্তু অতিপ্রাকৃত চৈতন্যকেও মানেন। দুইকে মিলিত করতেও চান। দ্বন্দ্বসমন্বয়ের পদ্ধতিতে দুইকে সমন্বিত করে তৃতীয় কিছু প্রণয়ন করতে তিনি চান নি। তিনি হেগেলিয়ান নন, আর মার্কসিস্টও নন। মার্কসবাদের (যদি সেই তত্ত্ব তিনি জেনে থাকেন) নাম শুনলেও তাঁর বিক্ষুব্ধ হবার কথা। হার্বার্ট স্পেন্সারের তিনি নাম করেছেন, কিন্তু স্পেন্সারের Evolutionary Hedonism-এর পদ্ধতি বঙ্কিম ঠিক জানতেন কিনা সন্দেহ। বঙ্কিম-কথিত সকল বৃত্তিসমূহের 'সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলনে'র অর্থ Evolution বা 'অভিব্যক্তি' নয়, Harmonious Developement বা দুয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলন। ঈশ্বরভক্তিতে সেই অনুশীলনের সম্পূর্ণতা—বঙ্কিমের এই মতবাদ এক ধরনের modified অধ্যাত্মবাদ।

যুগের দাবি ॥ এই দার্শনিক বিচার ভুল না শুদ্ধ জানি না। আমাদের তাতে এখানে প্রয়োজন নেই। কারণ, এই দার্শানিক তাৎপর্য 'উপরতলার' জিনিস। আমাদের জ্ঞাতব্য—বঙ্কিমের জীবনদর্শনের বস্তুগত তাৎপর্য কী? দর্শনের দিক থেকে নয়—যুগ ও সমাজের দিক থেকে—বিশেষ করে ভারতের তথা বাঙলার ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে।*

উনবিংশ শতক ধনিক সভ্যতার মধ্যাহ্নকাল। সে সভ্যতার বিজ্ঞানের (থিওরি) জ্ঞান ও শিল্পের দানে (আর্থিক আয়োজনে) চিন্তার জগতে দেখা দিয়েছে 'যান্ত্রিক বস্তুবাদ' (Mechanical Materialism) এবং মার্কস-এঙ্গেল্‌স-এর দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ী বস্তুবাদ বা বিপ্লবী বস্তুবাদ (Dialectical Materialism)। দুইয়ের মাঝখানে বেন্থাম-মিল-কোঁৎ-হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখেরা তাঁদের উন্নত-উদার

* এই বিষয়ে একটি সুযোগ্য আলোচনা—শ্রীযুক্ত অসিতকুমার ভট্টাচার্য রচিত "বাঙলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা"—গ্রন্থজগৎ, ১৯৬৪ খ্রী

(radical) সমাজ-আদর্শ, মানবিক প্রীতি প্রভৃতি নিয়ে বুর্জোয়া যুক্তিবাদের (rationalist) ধারায় সমাজ-সমস্যার উত্তর খুঁজছেন। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত বঙ্কিম এসব মনস্বীদের চিন্তাধারায় অবগাহন করেছেন। আধুনিক বস্তু-মুখী জ্ঞান-বিজ্ঞান (বহির্বিজ্ঞান) বিষয়ে মনে মনে (subjectively) বঙ্কিম তাঁদেরই শিষ্য ; কিন্তু কার্যত (objectively) ভারতবর্ষে ও বাঙলাদেশে তখনও ধনিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক (কলোনিয়াল) ব্যবস্থায় এদেশের পুরাতন সামন্তব্যবস্থা ভেঙেও ভাঙছে না। ঔপনিবেশিক শোষণের প্রয়োজনে একদিকে রেল, খনি, তাঁতশিল্প প্রভৃতি ধনিক-তন্ত্রের উদ্যোগগুলি কিছু কিছু প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, আবার ঔপনিবেশিক শোষণের দায়েই অন্যদিকে এদেশে ধনিকতন্ত্রী বিকাশের পথও রুদ্ধ থাকৃছে—বিলাতের মালিকদের মুনাফা অব্যাহত রাখার জন্যই দেশের ধনিকপ্রয়াস ব্যাহত। বিশেষ করে, ১৭৯৩-এর জমিদারি প্রথাতে এই বঙ্গ-বিহার-ওড়িশায় এই আধা-সামন্ততান্ত্রিক আর্থিক রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করা হয়েছে। সেই ঔপনিবেশিক ভূমিব্যবস্থার আওতায় বাঙলায় জমির উপস্বত্বভোগী জমিদার ও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণী দিনে দিনে পুষ্ট ও বলশালী হয়েছে ; তারা আধা-সামন্তব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে থেকে উদ্যোগহীন হয়ে আছে। বঙ্কিমের যুগে তাঁর স্বদেশে (বাঙলায়) সেই সব কারণে প্রধান ঐতিহাসিক দাবি ছিল (১) রাষ্ট্রে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা মিটিয়ে দেশীয়দের আত্ম-শাসন প্রতিষ্ঠা ; (২) আর্থিক ক্ষেত্রে জমিদারি প্রথা চুকিয়ে ধনিকতন্ত্রী কলকারখানা ব্যবস্থাপত্র গঠন, আর সামাজিক ক্ষেত্রে প্রাচীন সমাজ চুকিয়ে ও ১৭৯৩-র জমিদারি ব্যবস্থা মিটিয়ে অবিলম্বে দেশের কৃষক-চাষীকে জমির মালিক করা। তার অর্থ—শুধু জমিদারির মুনাফা বাতিল করা নয়, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীরও মধ্যস্বত্বাদি লোপ করা, শুধু চাকরিতে নয়, নতুন নতুন বৈষয়িক উদ্যোগ-আয়োজনের ক্ষেত্রে এই উচ্চ ও মধ্য-শ্রেণীকে লিপ্ত করে তাদের সত্যকারের বুর্জোয়া এণ্টারপ্রেনিওরে (উদ্যোগী পুরুষে) পরিণত করা। এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব (জাতীয় স্বাধীনতা, জাতীয় ধনিক-ব্যবস্থা প্রভৃতি) পালন করার মতো শক্তি তখন ভারতীয় সমাজে কার আছে ? মূলশক্তি নিশ্চয়ই বঞ্চিত কৃষকশ্রেণী ও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। কিন্তু প্রথমে এই অনুন্নত জনসমাজের পরিচালক হওয়ার কথা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। জাতীয়তার উদ্বোধন করে প্রথম দিকে মধ্যবিত্তরাই—বুর্জোয়া নির্মাণের উপযোগী বস্তুনিষ্ঠ ভাবনার ধারা তারা প্রণয়ন করে, প্রচলিত করে, প্রচারিত করে ; জাতীয় ঐক্য গঠন করে ; তদনুযায়ী ফিউডাল (ভৌমিক) স্বার্থের বিরুদ্ধে মানবাধিকারের (Rights of Man) দাবিতে দেশের জনশক্তিকে তারা জাগিয়ে তোলে ; মধ্যবিত্ত শ্রেণীই বঞ্চিত দরিদ্র শ্রেণীদের সেই ভাবনায় ও কর্মে পরিচালিত করে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রয়োজনীয় রূপান্তর সম্ভবপর করে। সম্পূর্ণ বিপ্লব মধ্যবিত্তরা করতে না চাইলেও এরূপই তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা—মধ্যবিত্ত শিক্ষিতরা এইভাবেই নির্মাণ করে বুর্জোয়া আন্দোলন-আয়োজনের পথ। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত

এ দায়িত্ব ১৯৪৭-এও সম্পূর্ণরূপে পালন করতে পারে নি, বা করতে চায় নি। তাই ভারতে আধুনিক যুগের বিকাশ বিলম্বিত হয়েছে; কারণ ১৯৪৭-এও জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হয় নি, অথচ তা সম্পন্ন করা প্রয়োজন ছিল এক শতাব্দী পূর্বে।

মানসিক দ্বন্দ্ব ও জটিলতা ॥ বঙ্কিমের জীবনদর্শন এই জাতীয় দায়িত্ব পালনে কতটা সহায়তা করেছে? বঙ্কিমের প্রধান ক্ষেত্র ভাবাদর্শের জগৎ; সেখানে কতটা তিনি ভাবনায় অন্তত বস্তুনিষ্ঠ জীবনদৃষ্টির উদ্বোধন করেছেন? বঙ্কিম-মানসের গঠন লক্ষ্য করতে গিয়ে আমরা দেখেছি—তাতে একটা দ্বন্দ্ব পূর্বাপর ছিল। একদিকে ঐতিহ্যের প্রতি মমতা, অন্যদিকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য আগ্রহ; একদিকে অন্তর্বিষয়ে ভাববাদীর ধর্মগত faith, অন্যদিকে বহির্বিষয়ে reason এ আস্থা। একদিকে প্রবল জাত্যভিমান, অন্যদিকে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও কর্মদক্ষতায় শ্রদ্ধা; একদিকে অতীত ভারতীয় সংস্কৃতিতে নিষ্ঠা, অন্যদিকে আধুনিক (পাশ্চাত্ত্য) সংস্কৃতির (সাহিত্য, শিল্প, আইন-আদালত প্রভৃতির) উন্নত নীতি ও রীতিতে আগ্রহ। এই অন্তর্দ্বন্দ্বে বঙ্কিমের জীবন-দর্শন আরও জটিলতর হয়। কারণ, জন্মগতভাবে তিনি সুসম্পন্ন ভদ্রলোক—জমিদারি ব্যবস্থাতেই ভদ্রলোকদের উন্নতি, এদেশের ঐতিহ্যে যারা জাতিভেদের জন্য নিম্নবর্ণীয় চাষাভূষোর প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ, যারা চিরদিনই জ্ঞানে সংস্কৃতিতে, ধর্মে, সমাজে 'অধিকারভেদ' আছে, সে 'অধিকারভেদ' প্রকৃতির নিয়ম, তাই তা সামাজিক নিয়মও—সমাজ-নেতা হিসাবে এই উচ্চবর্ণের ভদ্রলোক পরিচালক-গোষ্ঠীর দায়িত্ব হল সমাজরক্ষা—সমাজ-বিপ্লবের বিরোধিতা। অবশ্য, আধুনিক শিক্ষাদীক্ষায় আবার বঙ্কিমের এই চেতনাও এসেছে—আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার বলেই আত্মোন্নতি; সমাজকে রক্ষা করবারও পথ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দান সমাজের অঙ্গীভূত করা। তা সত্ত্বেও দেশের সমাজ ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করবার জন্যই শাসক সভ্যতার ('পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার') বিরুদ্ধে জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ রচনাই শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর দায়িত্ব—সামন্তব্যবস্থা ও সামন্ত ধ্যানধারণা এদের শ্রেণীগত ভিত্তিভূমি—তা সে ব্যবস্থা যতটা সম্ভব কায়েম রেখেই তাদের প্রয়োজন সমাজপালন।

বঙ্কিমের স্বদেশপ্রীতি ॥ বঙ্কিমের জীবন-দর্শনেরও প্রধান কীর্তি—স্বদেশপ্রীতি, তা দেখেছি। কিন্তু এ স্বদেশপ্রীতির স্বরূপ আরও স্পষ্ট করে বোঝা দরকার। নিজের অজ্ঞাত মনে বঙ্কিম স্বাধীনতা চাইতেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের অনিবার্যতাও স্বীকার না করতেন, তা নয়। স্বীকার করতেন বলেই 'আনন্দমঠে'র আখ্যানবস্তু সন্ন্যাসী বিদ্রোহ—সাধারণ পাঠক ছত্রে ছত্রে লেখকের অজ্ঞাত মনের সেই উদ্দেশ্য দেখে 'আনন্দমঠ'কে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী বলেই গ্রহণ করেছে। তারা একেবারে ভুল করেছে, বলা যায় না। এখানে উপন্যাস হিসাবে আনন্দমঠ আমাদের আলোচ্য নয়। সজ্ঞানে বঙ্কিম সেই 'আনন্দমঠে' কী প্রতিপাদন করেছেন তা স্মরণ করা

প্রয়োজন। সজ্ঞানে বঙ্কিম জানিয়েছেন—ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ অর্থ ডাকাতি, দস্যুবৃত্তি, অমঙ্গল। ইংরেজ ধর্মাচরণে বাধা দেয় না, অতএব ফিউডাল সমাজ যতই ক্ষতিগ্রস্ত হোক, ফিউডাল ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা দেশবাসীর পক্ষে আবশ্যিক নয়। অবশ্য, উপন্যাস-লেখকের গ্রন্থোক্ত সকল কথা ও ভাবনা তাঁর প্রকৃত মতামত না হতে পারে। এমন কি, 'আনন্দমঠে' হয়তো ইংরেজকে না চটাবার জন্য লেখকের কিছু ডিপ্লোমাসিরও প্রয়োজন ছিল—শাসকদের চোখে ধূলি দেওয়া দরকার। ইংরেজ রাজত্বের ভূমিকা সম্বন্ধে বঙ্কিমের ধারণা 'আনন্দমঠে' যা ব্যক্ত হয়েছে, তা কিন্তু মিথ্যা বা সর্বাংশে diplomatic মনে করবার কারণ নেই। কিছুটা ধোঁয়ার ছল করে কাঁদা, কিন্তু সবটা তা নয়। 'ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে'—'নিষ্কণ্টক ধর্মাচরণ করিবে'—ইংরেজের তৈরী করা এই Pax Britannica-র (মহারানীর রাজত্বের সুখশান্তির প্রশস্তি) বঙ্কিমের আমলে হিন্দু শিক্ষিত ভদ্রলোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সে ধারণা সর্বাংশে সকলের গ্রাহ্য ছিল, তাও নয়। তখনকার পত্র-পত্রিকায়ও সেরূপ প্রমাণ প্রচুর। বঙ্কিম যদি সত্যই ইতিহাসের ছাত্র হতেন, তাহলে তিনি বেশ জানতেন, 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' 'যবন' (মুসলমান) রাজত্বের ফল নয়। 'পলাশীর লুঠ' ও ভূমি-বন্দোবস্তের বেপরোয়া নিলাম-ডাক প্রভৃতিই মন্বন্তরের মূল। আর সে মন্বন্তর ইংরেজ শাসকদের কীর্তি। ইংরেজকে বড় জোর বুর্জোয়া শিক্ষাদীক্ষার বাহন রূপে 'unconscious instrument of history' ভাবা চলে।

"আনন্দমঠে'র শেষ পরিচ্ছেদে বঙ্কিমের (মহাপুরুষের) বক্তব্য তাই বিভ্রান্তি-কর। তা ছেড়ে দিলেও ভোলা সম্ভব নয়—গ্রন্থের সর্বত্র ছড়ানো 'নেড়ে' ও 'যবনে'র উল্লেখ—এসব শব্দের অর্থ পরিষ্কার। শুধু বিশেষ চরিত্রের মুখের স্বাভাবিক বুলি বলে তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আনন্দমঠকে তাই 'স্বাধীনতা সংগ্রামের উৎস' বলা দুঃসাধ্য। আর, 'জাতীয়তার প্রেরণাস্থল' বলা অসম্ভব। বঙ্কিম মনে করতেন, ইংরেজের অধীনতা ভারতবাসীর অধ্যাত্ম-জীবনের পরিপন্থী নয়, তাই 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' যে এই শাসনব্যবস্থায় ভারত-বাসীর অবশ্য-কর্তব্য, তা নয়।

'আনন্দমঠ' ব্যতীত, বঙ্কিমের স্বাজাত্যের প্রধান দুই কীর্তি তাঁর 'বন্দেমাতরম্' ও কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসব'। বঙ্কিমকে 'বন্দেমাতরম্'-এর ঋষি বলা চলে; দেশমাতৃকার কল্পনা-মূর্তির উদ্ভাবক ও উদ্গাতা বলা নিশ্চয়ই সম্ভব। কিন্তু বঙ্কিম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের উদ্বোধক নন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীঅরবিন্দের (ইন্দুপ্রকাশে—খ্রী ১৮৯৪) ভাবদৃষ্টিতে 'ঋষি বঙ্কিমের' ভাবমূর্তি প্রথম আবিষ্কৃত হয়। পরে স্বদেশী যুগের আবেগ-কল্পনায় সেই কল্পিত "ঋষি"-রূপ ১৯০৫-এর সময় থেকে বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অপেক্ষা বরং সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে জাতীয় সংস্কৃতির প্রতিরোধ রচনাই বঙ্কিমের মুখ্য স্বাদেশিক কর্ম। সেদিকেও দেখা যায়—জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রবুদ্ধ বাস্তববাদী (realist) জাতীয় সংস্কৃতি গঠনে

তাঁর যতটা দৃষ্টি, তদপেক্ষা জাতীয় জীবনকে অধ্যাত্মবাদী সাংস্কৃতিক ধারায় বাহিত করে দেওয়াতেই তাঁর বেশি প্রয়াস। এমন কি, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বোধের সমষ্টিগত উদ্বোধন অপেক্ষা বঙ্কিম-সংস্কৃতির উদ্দিষ্ট—ব্যষ্টি-কেন্দ্রিক সাধনা—ব্যক্তির বৃত্তিসমূহের অনুশীলন।

আদর্শ হিসাবে বঙ্কিমের স্বদেশপ্রীতির আদর্শ সংকীর্ণ বা তুচ্ছ ছিল না। তা বাঙালীয়ানা বা সংকীর্ণ বাঙালী patriotism ছিল না; এমন কি, সংকীর্ণ ভারতীয় স্বাজাত্যও ছিল না। তা predatory nationalism বা 'রাক্ষসী ইউরোপীয় patriotism' নয়—'স্বদেশপ্রীতি', 'patriotism', 'জাতীয় ভাব' বা 'স্বাজাত্য', 'nationalism' প্রভৃতি কথাগুলি প্রায় সমার্থবাচক শব্দরূপেই তখন ব্যবহৃত হত। স্বজাতীয়তার ধারণাটা তখনো পরিষ্কার হয়ে ওঠে নি, আমরা তা দেখেছি। কিন্তু বঙ্কিমের স্বদেশপ্রীতির বা স্বাজাত্যবোধের গোড়ায় আরও গলদ—তাকে স্বদেশপ্রীতিই বলি বা জাতীয়তাই বলি। বঙ্কিমের এই জাতীয়তা মূলত হিন্দুজাতীয়তা। যে জাতীয় সংস্কৃতি তাঁর মুখ্যসাধনা, তাও মূলত হিন্দু সংস্কৃতি। এ বিষয়ে যত তর্ক উঠুক, এ ধারণাটাই বঙ্কিমপাঠে ভারতের অ-হিন্দুর মনে বদ্ধমূল হতে বাধ্য। বঙ্কিম-কথিত জাতীয় সংস্কৃতিতে অ-হিন্দু ভারতীয়ের স্থান নগণ্য—অ-হিন্দুদের অস্তিত্বই যেন অজ্ঞাত। অবশ্য ত্রুটি বঙ্কিমের একার নয়। ভারতের ইতিহাসের মধ্যেই এই বীজ লুক্কায়িত ছিল। ভারতবাসী 'এক জাতি' হয় নি। হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি নানা ধর্মগোষ্ঠী ও জাতি 'সহাবস্থান' (co-existence) করেছে—অখণ্ড ভারতসত্তায় মিলিয়ে যায় নি। এই বীজ ইতিহাসের মধ্যে ছিল—ক্রমে নির্বীর্য হয়ে যেতে পারত। কিন্তু, বিদেশী শাসনে তা জীইয়ে রাখার মতো কারণ জুটল। উনবিংশ শতাব্দীতে সে বীজ ঘরের ও বাইরের নানা ব্যাপারে অঙ্কুরিত হবার সুযোগ পেল। 'বিষবৃক্ষ অঙ্কুরিত হল'। মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিকাশ বিলম্বিত হওয়াতে বিংশ শতাব্দীতে মধ্যবিত্তের এই দুই অংশের বৈষম্য ও বিরোধে (১৯৪৭-এ) দেশ-বিভাগ পর্যন্ত হয়ে গেল। বিষবৃক্ষ ফল প্রসব করল।

অবশ্য মনে রাখতে হবে—বঙ্কিমের কাল ও পরিবেশ। প্রায় এক শতাব্দী কালের (১৮১৭-১৯২০-২১) যে বাঙালী জাগরণ, তা হিন্দু মধ্যবিত্তের (ভদ্রলোকের) প্রাধান্যেরও যুগ। বিশেষ করে এই হিন্দু মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে তা 'হিন্দু-জাগরণ' হতে চলল। কারণ, আধুনিক সভ্যতার সংঘাতে হিন্দুধর্ম, হিন্দুসংস্কৃতি, হিন্দুসমাজ, এসবের ভাঙাগড়া উনিশ শতকের প্রথম পাদ থেকেই আরম্ভ হয়। রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, ইয়ংবেঙ্গল, তত্ত্ববোধিনী সভার অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মসমাজ—সকলেরই উদ্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ। যেন ভারতবর্ষে হিন্দু ছাড়া অন্য ধর্ম নেই, অন্য সম্প্রদায় নেই; এবং হিন্দুসংস্কৃতিই একমাত্র ভারতসংস্কৃতি। বঙ্কিমের ভাবনায় ও বঙ্কিমের সৃষ্টিতে যথাকালে সেই হিন্দু মধ্যবিত্তের সংস্কৃতির একান্ত ও বিশিষ্ট প্রকাশ ঘটে। পরোক্ষে, সাম্রাজ্যবাদ-বাঞ্ছিত বিষাঙ্কুর তাঁরা সকলেই পুষ্ট করেছেন, বঙ্কিমও তাতে জলসিঞ্চন করেছেন।

একথা বলা আমাদের অভিপ্রেত নয় যে, বঙ্কিম অন্য ভারতীয়দের অস্তিত্ব জানতেন না। প্রবন্ধে কেন, উপন্যাসেও (রাজসিংহের উপসংহারে, সীতারামের চাঁদশা ফকিরের কথায়) মনস্বী বঙ্কিম এই সত্য জানাতে ত্রুটি করেন নি। তিনি বেশ জানেন—ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলমানের দেশ। প্রবন্ধেও ইতস্তত ('ভারত কলঙ্ক', 'বাঙ্গালার কলঙ্ক') তার আভাস প্রচুর। মধ্যবিত্তের জগতের নিম্নস্তরে তাকালে 'পরাণ মণ্ডল' ও 'হাসেম শেখ' 'রামা কৈবর্ত' যে একই বঙ্গদেশের কৃষক, এ বিষয়ে বঙ্কিমের মনে কোনো সন্দেহ থাকত না। তথাপি, প্রবন্ধে-উপন্যাসে তিনি মুসলমান বিজয় থেকেই জাতির পরাধীনতার কাল গণনা করেছেন—অর্থাৎ মুসলমান রাজত্বকে পরাধীনতার কাল বলেই বঙ্কিম মনে করেছেন—বাঙ্গলার পাঠান সুলতানদের যদিও বাঙালী বলেই মনে করতেন। পরিণত জীবনের শেষে বঙ্কিমের আলোচ্য হয় একমাত্র হিন্দুধর্ম, তাঁর চোখে জাতীয় গৌরব, হিন্দুর কীর্তি, তাঁর উপন্যাসেরও প্রধান আলোচ্য হিন্দুনিয়তি। হয়তো এসব ধুঁয়ার ছল করে কাঁদা, প্রকাশ্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার যখন বে-আইনি—তখন মধ্যযুগের মুসলমান ও হিন্দু সংঘাতের নাম করে আক্রান্ত বনাম আক্রমণকারীর—বিদেশী বিজয়ী বনাম পরাজিত স্বদেশীর কথা প্রচার করা। কিন্তু বঙ্কিম-সাহিত্যে অতি অল্প মুসলমান চরিত্রই লেখকের শ্রদ্ধা ও সহৃদয়তায় অভিষিক্ত, অধিকাংশই মসীলিপ্ত। উপন্যাস অবশ্য এ দৃষ্টিতে কারও আলোচ্য হওয়া ঠিক নয়। মতামত তাতে গৌণ জিনিস। মুসলমান পাঠক এদিকে বঙ্কিমের প্রতিভার প্রতি অবিচারও কতকাংশে করেন। কিন্তু মুসলমান পাঠক কী করে এই কঠিন অনুভূতি দূর করবে, এই মর্মপীড়া বিস্মৃত হবে, বঙ্কিম মুসলমান-চরিত্রের প্রতি প্রায়ই সহৃদয় নন? এরূপ কারণেই—'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী' প্রভৃতি কথা, সহজে যত হিন্দুর আবেগ-অভিনন্দন লাভ করুক, মুসলমানদের নিকট অস্বস্তিকর হয়। মুসলমানদের নিকট পূর্ণাঙ্গ 'বন্দেমাতরম্' জাতীয় সংগীত হিসাবে এই জন্যই অরুচিকর (আনন্দমঠে 'যবনের' বিরুদ্ধে তা সংগ্রাম-সঙ্গীত ; কী করে মুসলমানকে এ সঙ্গীত তৃপ্ত করবে ?)। এই কারণেই কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসব'ও মুসলমান দেশপ্রেমিকের নিকট আরও অগ্রাহ্য থাকতে বাধ্য। বঙ্কিম নির্বোধ নন। তাঁর যুগে তিনি শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। অন্যেরা না বুঝুন, তাঁর তো বুঝবার কথা, আদর্শের দিক থেকে তাঁর স্বদেশপ্রীতি যত মহান্ হোক, তা বড় বেশি রকমের ধর্মাশ্রয়ী ও হিন্দুধর্মাশ্রয়ী। কার্যত এই বহু ধর্মের দেশে ধর্মাশ্রিত স্বদেশপ্রীতি এক জাতীয়তার পথে বিঘ্নোৎপাদন করে। এমন কি, 'হিন্দু সংস্কৃতি' 'মুসলমান সংস্কৃতি' প্রভৃতি কোনো গোষ্ঠীর সংস্কৃতির একপেশে গৌরবমহিমা ঘোষণা ভারতবর্ষের সম্মেলিত সংস্কৃতির (composite culture) মূলরূপকে পরোক্ষে আচ্ছন্ন করে। 'যবন', 'ম্লেচ্ছ' প্রভৃতি ঘৃণাব্যঞ্জক শব্দপ্রয়োগে প্রত্যক্ষেই মুসলমানদের আঘাত করা হয়—একথা কিছুতেই অ-প্রমাণিত করা যায় না।

বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ দান স্বদেশপ্রীতি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা হিন্দু স্বাজাত্যবোধ, তার ফল ভারতবাসীর স্বাজাত্যবোধ ও জাতীয় ঐক্যের সহায়ক হয়নি। তাই

বঙ্কিমকে 'জাতীয়তার ঋষি' বলা সম্ভব নয়। এ দুর্ভাগ্য বঙ্কিমেরও যে, এত বড় প্রতিভা আবাল্য হিন্দু মানসিকতার প্রভাবে খণ্ডিত থেকে গিয়েছে; এবং মধ্যবিত্ত হিন্দু ভদ্রলোকের ঊনবিংশ শতকের মনোভাব কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তিনি হাসেম শেখ-পরাণ মণ্ডলদেরকে তাঁর জাতীয় চিন্তার মুখ্যাবলম্বন করে অগ্রসর হলে যে বিষবৃক্ষের বীজ আমাদের ইতিহাসের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল তা হয়তো এত উগ্র হয়ে উঠত না।

বঙ্কিমের হিন্দুধর্ম ॥ বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য বিশিষ্ট কীর্তি—হিন্দুধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠা। বারে বারে তিনি জানিয়েছেন হিন্দুধর্মের মতো এমন মহৎ ধর্ম আর নাই। ধর্মসম্বন্ধীয় আলোচনা আমাদের মতে নিষ্ফল। প্রত্যেকেই তাঁর নিজের ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ মনে করে, সেজন্যে যুক্তিও দিতে পারে,—তাতে নতুন কিছু নেই। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রয়াসের একটু তাৎপর্য বোঝা প্রয়োজন—বিশেষত হিন্দু-ধর্মের ব্যাপারে। কারণ, কী যে হিন্দুধর্ম, আর কী যে তা নয়, তার মীমাংসা অসম্ভব, এবং নিষ্প্রয়োজন। একটা কথা বোঝা যায়, যুগধর্মের মতো করে সঞ্জীবিত না হতে পারলে মানুষকে দেবার মতো দান কোনো ধর্মেরই থাকে না। বঙ্কিমের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধীয় প্রয়াসের তাৎপর্য এই দৃষ্টিতে দেখেই স্থির করা উচিত। সম্ভবত বঙ্কিমের প্রতি তাতে অবিচার হবে না।

মনে রাখা দরকার—হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের আনুগত্য জন্মগত। হিন্দু-অভিমানও তাঁর মতো প্রবল ব্যক্তিত্ববান্ লোকের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। যুগশিক্ষায় বঙ্কিম সুশিক্ষিত—যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহায়তায় তিনি হিন্দুধর্মের স্বপক্ষে যা করলেন, তাঁর ভাবয়িত্রী প্রতিভার তা এক অদ্ভুত কীর্তি: হিন্দুধর্মের সমস্ত শাস্ত্রকে আপন অভিপ্রায়ানুযায়ী পরীক্ষা করে, বিচার করে, যুক্তির পরে যুক্তির সহায়ে গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্মকেই একমাত্র হিন্দুধর্মরূপে ব্যাখ্যা ও কৃষ্ণকে আদর্শ মনুষ্যরূপে স্থাপন, জন্মগত বিশ্বাসকে যুগসংগত যুক্তির ধারাতেই পুষ্ট করা, একদিকে এই সেই প্রতিভার কাজ। অন্যদিকে, তার কাজ পরিষ্কার ভাষায় আধুনিক বিজ্ঞান ও শিল্পকে জীবনের বহির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্থাপন করা; গীতার নিষ্কাম ধর্মের সঙ্গে সর্ববৃত্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলনকে যুক্ত করে হিন্দুসাধনাকে একটা যুগোচিত আত্মগঠনে নিযুক্ত করা। বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্প এবং গীতার নিষ্কাম কর্ম—এক সঙ্গে সম্মিলিত করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা—এই তাঁর উদ্দেশ্য।

বলা বাহুল্য, বঙ্কিমের এ চেষ্টা সমন্বয় নয়—যুক্তি ও বিশ্বাসের একটা সংমিশ্রণ—আধুনিক চিন্তা ও ভাবধারা অপেক্ষা ভাবগত বিশ্বাসই তাতে প্রবল। তথাপি, রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্কিমের হিন্দুধর্মের যে বিশেষ তাৎপর্য নির্দেশ করেছেন—তা মিথ্যা নয়। যুগের আবর্তনে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ ক্রমেই উদার ও উন্নীত হতে চাইছে। রমেশচন্দ্রের মতে সেই আধুনিক-যুগ-গ্রাহ্য হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ গঠনের চেষ্টায় প্রথম বঙ্কিমই অগ্রণী হন—রমেশ-চন্দ্রের এ মর্মের কথা আংশিক সত্য। এ মতের বিরুদ্ধে একথাও বলা

চলে—বঙ্কিম হিন্দুধর্মের 'বখামি' ও 'জঞ্জাল' কী কী তা নির্দেশ করেন নি—সে জঞ্জালের বিরুদ্ধে তাঁর শাণিত অস্ত্রও ধরেন নি। অস্পৃশ্যতা, নারীর প্রতি অবজ্ঞা প্রভৃতি হিন্দুসমাজের যুগ-যুগ-আগত কলঙ্কের বিরুদ্ধে কথা বলেন নি। এমন কি, হিন্দুসাধনার বেদ, উপনিষদ, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, বৌদ্ধ, জৈন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম, তান্ত্রিক সাধনা প্রভৃতিকেও তিনি তাঁর সনাতন ধর্মের মধ্যে বিশেষ স্থান দিতে চান নি। তা হলে গীতোক্ত বঙ্কিমী হিন্দুধর্ম কয়জন হিন্দুর ধর্ম? বিশেষত, 'নিষ্কাম কর্ম' কোনো দিন সমাজে কার্যত গ্রাহ্য হয়েছিল, মনে হয় না। গীতার ভাবাদর্শ হিন্দু শোষকদের শোষণ-প্রথার এক হাতিয়ার হয়েই ছিল। এই কথাও স্মরণীয়—কার্যত বঙ্কিমের 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'কৃষ্ণচরিত্র' তাঁর কালেও তাঁর উদ্দিষ্ট শিক্ষিত হিন্দুসমাজে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তাঁর কালে বোধহয় তিন কোটি বাঙালীর ত্রিশ জনও এ তত্ত্বকে সাধনমার্গ করে নি; তিন শত জনও তা তত্ত্ব হিসাবে স্বীকার করে নি। বঙ্কিমের 'ধর্মতত্ত্ব' প্রতিভার একটা অদ্ভুত তুর-দি-ফোর্স—আতসবাজি হিসাবেই গণ্য। বঙ্কিমের কালেও তাঁর নিজের শ্রেণীর শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা তাঁর গীতাব্যাখ্যা ও কৃষ্ণচরিত্রের কথায় কান দেন নি। বরং ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রভাব হ্রাস পেতেই প্রায়-নিরক্ষর রামকৃষ্ণদেবের চরণতলে তাঁরা জুটতেন। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের থেকে পেল একই কালে যুগোচিত ধর্মবিশ্বাসের রস, আর হিন্দু হিসেবেও বঙ্কিমের আকাঙ্ক্ষিত আত্মমর্যাদা—এ প্রসঙ্গে সে কথা অবশ্য অবান্তর।

এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বলা উচিত—বঙ্কিমের মধ্য দিয়ে হিন্দু পুনর্জীবনের (Hindu Revivalism) আভাস দেখা যায়, তা সত্য। সমাজসংস্কার অপেক্ষা সংরক্ষণেই তাঁর ঝোঁক, এ কথা ঠিক। বঙ্কিম তথাপি 'অর্থোডক্স্' নন। সত্যকারের 'হিন্দু পুনর্জীবনের' চেষ্টা করেন শশধর তর্কচূড়ামণি ও স্বামী দয়ানন্দ—অতীতের পুনরাবৃত্তির চেষ্টা। বঙ্কিম অন্ধ নন, সেরূপ পুনরাবৃত্তির চেষ্টা তাঁর মোটেই উদ্দেশ্য ছিল না। পজিটিভিস্ট কোঁৎ তাঁকে সেই পরিণতি থেকে রক্ষা করেছেন। বিজ্ঞান ও শিল্পকে 'বহির্জীবনে' বা জীবনযাত্রায় এত সুস্থির-ভাবে যিনি স্বীকার করেন, তাঁকে—এ দেশের তৎকালীন অবস্থায়—নিতান্ত প্রতিক্রিয়াশীল বলাও ঠিক নয়। বিশেষত যে বঙ্কিম এই জীবননিষ্ঠ,—মানবতা-বাদী, মানবীয় বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়ে সর্বাঙ্গীণ পুরুষার্থ লাভের কথা প্রচার করেছেন, জীবনের অনিত্যতা, সন্ন্যাস, সংসারত্যাগ প্রভৃতিকে বারেবারে ভ্রান্ত পথ বলে ঘোষণা করেছেন,—হিন্দু সমাজের দিক থেকে তাঁকে প্রগতিবাদীও বলতে হবে। ধর্মের নামে ভারসাম্যহীন বাড়াবাড়ি নিশ্চয়ই বঙ্কিমের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে বেশ-কিছু পরিমাণে খণ্ডিত করেছে, তা সত্য, কিন্তু তাঁকে অন্ধ করে নি।

বঙ্কিমের স্বদেশপ্রীতি ও বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্বের এই স্ববিরোধী রূপ ও তাৎপর্য আরও দু-একটি বিষয় মনে রাখলে আরও পরিষ্কার হয়। সমগ্রভাবে বঙ্কিমের

মূল্য, তাঁর মতপরিবর্তনের তাৎপর্য, তাতে আরও উপলব্ধি করা যায়। একটি বিষয়—বঙ্কিমের রাজনৈতিক দৃষ্টি ; অন্যটি বঙ্কিমের সমাজদৃষ্টি। বিশদ করা নিষ্প্রয়োজন—কিন্তু এই দুই দিকে বঙ্কিম যেভাবে জীবন আরম্ভ করেছিলেন, সেভাবে জীবন শেষ করেন নি। মূল জীবন-দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাও পরিবর্তিত হয়েছে।

রাজনৈতিক দৃষ্টি ॥ বঙ্কিমের জীবন-দর্শনে রাজনীতির স্থান কী? বঙ্কিম সরকারী বড় চাকুরের সন্তান, নিজেও সেদিনের বড় চাকুরে। সে শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সরকারী কর্মচারীদের পক্ষে রাজনীতিক কর্ম নিষিদ্ধ ছিল না, পরে নিষিদ্ধ হয়। বঙ্কিম প্রথম দিকে রাজনৈতিক লেখায় ও আলোচনায় যথেষ্ট আগ্রহশীল ছিলেন। পূর্বে বঙ্কিম ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসো-সিয়েশনের সদস্য ছিলেন। সে অ্যাসোসিয়েশন উচ্চবিত্তেরই সংগঠন। উচ্চশিক্ষা অপেক্ষা নিম্নশিক্ষায় অর্থব্যয় সরকার প্রস্তাব করলে, ঐ উচ্চবিত্তরা স্বভাবতই সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। কিন্তু বঙ্কিম লোকশিক্ষার পক্ষে ছিলেন ; স্যর জর্জ ক্যাম্বেলের সে চেষ্টার সমর্থন করেন। সম্ভবত এই মতান্তরের জন্য তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যপদ ছেড়ে দেন। আর কোনো রাজ-নৈতিক সমিতিতেই তিনি কখনো যোগদান করেন নি—হিন্দুমেলায় নয় ; ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েশন-এ সহানুভূতি থাকলেও নয় ; ন্যাশনাল কংগ্রেসের বিরোধী না হলেও যোগদানে উৎসাহও তাঁর ছিল না—তার সংগত কারণ ছিল। কেন যে বঙ্কিমচন্দ্র 'ভার্ন্যাকুলার প্রেস অ্যাক্টের' সমর্থন করেন, তা এখনো পরিষ্কার নয়। তৎকালীন বাঙলা সংবাদপত্র রুচি ও নীতিতে সর্বাংশে নির্দোষ ছিল কিনা সন্দেহ। তবে সরকারের এই দুষ্ট অভিপ্রায় সমর্থন করে বঙ্কিম দেশীয় সংবাদপত্রের কঠিন কশাঘাত লাভ করেছিলেন। তখন বাঙলায় 'অ্যাজিটেশনে'র 'রাজনীতির' প্রথম পর্ব, 'বক্তৃতাবাগীশদের প্রতি' বঙ্কিমের ব্যঙ্গোক্তিই বেশি—রাজনীতির প্রতি বঙ্কিমের কোনো শ্রদ্ধা দেখা যায় না। তবে এসব গৌণ ব্যাপার। কারণ, বঙ্কিম 'সাহিত্যের কর্মযোগী'। তিনি সক্রিয় রাজনীতি না করলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টি ছিল, আর তা কতটা দেশের রাজনৈতিক ভাবনার সহায়ক হয়েছে, তা দেখাই যথেষ্ট।

'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম দিকে তাঁকে রাজনৈতিক বিষয়ে বিমুখ দেখি না। তবে তা অনেকটা ঐতিহাসিক তাড়নায় ও স্বদেশচিন্তায় প্রণোদিত। যেমন, 'বাঙ্গালীর বাহুবল', 'ভারত-কলঙ্ক', 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' 'প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি', 'বাঙ্গালার ইতিহাস', 'বাঙ্গালার কলঙ্ক', 'জাতিবৈর' ইত্যাদি রচনা রাজনৈতিক ; কতকগুলি সমাজতাত্ত্বিক চিন্তায় ও পরোক্ষে স্বদেশ-চিন্তায় উদ্বুদ্ধ (যেমন, 'সাম্য, 'বঙ্গদেশের কৃষক', 'কমলাকান্তে'র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উক্তি প্রভৃতি)। এই দ্বিতীয় ধরনের লেখাগুলি বিশেষ করে সমাজদৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত,—সে প্রসঙ্গেই তা পরে আলোচ্য। কিন্তু প্রথম ধরনের লেখাগুলিতে মূল রাজনীতি-ভাবনার ও চেতনার সূত্রপাত বঙ্কিম

করেছিলেন, তা শিক্ষিত শ্রেণীকে তার স্বদেশ-বিষয়ে সচেতন করার কথা,—পরাজিত বাঙালী ও ভারতবাসীকে কিছুটা উৎসাহদানেরও কথা। কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসব' সেই হিসাবে চিরস্মরণীয়। অন্যান্য অনেক লেখাই জাতীয়তার উদ্বোধন হিসাবে রাজনীতি-সম্পর্কিত। 'কমলাকান্তের পত্রে'র পলিটিক্স বিশ্লেষণ, কুক্কুর-জাতীয় ও বৃষ-জাতীয় পলিটিক্স্-এর ব্যাখ্যা—উপভোগ্য; এবং বাস্তব রাজনৈতিক বোধেরও প্রমাণ। কিন্তু বঙ্কিমের রাজনৈতিক দৃষ্টি এ সবেও স্পষ্ট হয় না। ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯) পর থেকে পৃথিবীতে জাতীয়-গণতন্ত্রের রাজনৈতিক আদর্শ ক্রমশ বিস্তৃত হয়; ম্যাৎসিনি-গ্যারিবল্ডি বঙ্কিমের সময়ে সুপরিচিত নাম। কাভুর, বিসমার্কও চমৎকৃত করে। ইতালীয় রাজতন্ত্র, ফরাসী প্রজাতন্ত্র (১৮৭১), ব্রিটেনের পার্লামেণ্টারি শাসন—এসবের সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উদাসীন থাকবার কথা নয়। তিনি প্রথম আন্তর্জাতিকেও (১৮৬৪) আগ্রহ বোধ করেছিলেন। কিন্তু ক্রমে দেখা যায়—বঙ্কিম রাজনীতিতে একটা কথাকেই গুরুত্ব দেন—সুশাসন; আর প্রজার সুখবিধানই সুশাসন—দেশী শাসন, বিদেশী শাসন সে তুলনায় তাঁর নিকট গৌণ বিষয়; সাধারণ রাজনৈতিক অধিকার, মানবাধিকার (Rights of Man), প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন—এসব প্রশ্ন নিরর্থক। ধর্মাচরণের সুযোগ ও প্রজার কিছুটা গ্রাসাচ্ছাদনের সুযোগ—প্রজার পক্ষে তাই যথেষ্ট। National Democratic Revolution অবশ্য তখনো অকল্পনীয়—কথাটাও শোনা যেত না। কিন্তু স্বাধীনতা যদি বা কল্পনীয় হয়, গণতান্ত্রিক বিকাশের জন্য উন্মুখতা দেশের কোথাও বিশেষ দেখা যায় না। বঙ্কিম লোকশিক্ষা চান; বাঙালী শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা তারও প্রতিকূল ছিল। 'জনসাধারণ', 'জনশক্তি' বিষয়ে সাধারণভাবে দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর ও বঙ্কিমের সমান উপেক্ষা। 'লর্ড রিপণের উৎসবের জমা খরচে' ('প্রচার', পৌষ, ১২৯১) বঙ্কিমের রাজনীতিক দৃষ্টির একটা পরিচয় পাওয়া যায়,

> "এখন হইতে বাঙ্গালায় ধনবানেরা আর কেহই নহেন। শিক্ষিত-সম্প্রদায়ই কর্তা।···এখনকার নূতন সমাজ-নেতৃগণের নিকট আমাদের নিবেদন, তাঁহারা সমাজ ধীরে ধীরে চালাইলে, বিপ্লব না ঘটে।"

চাই মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব, কিন্তু বিপ্লব না ঘটে,—এইটিই প্রধান কথা।

ব্রিটিশের অধীনে সুশাসন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব ও বিপ্লব-বিভীষিকা—এই তিনটি বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক দৃষ্টির মূল লক্ষ্য, তা বুঝতে পারি। জীবনের শেষ দিকে অবশ্য ধর্মবিষয়ক অধ্যাত্মভাবনায় এইটুকু রাজনীতিও আর তাঁর লক্ষীভূত রইল না—ক্রমবর্ধিত অন্তর্মুখিতায় পূর্বেকার 'বহির্ভাবনা' তখন প্রায় বিলুপ্ত।

সমাজদৃষ্টি ॥ সমাজ-বিপ্লব—গীতার শ্রীকৃষ্ণ থেকে বর্ণাশ্রমভিত্তিক হিন্দু সভ্যতার উচ্চবর্ণের সকলেরই পক্ষে বিভীষিকা। কিন্তু আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত বঙ্কিম দেখেছেন—পরিবর্তন জগতের নিয়ম, ইতিহাসেরও তাই সাক্ষ্য। প্রথমদিকে পাশ্চাত্ত্য সমাজ-দর্শনের শ্রেষ্ঠ মনস্বীদের চিন্তা বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে—'বঙ্গদর্শনে'র পাতায় পাতায় তা দেখি। তার প্রধান

প্রমাণ—'বঙ্গদেশের কৃষক'। ১৮৫০-এর সময় থেকে অক্ষয়কুমার দত্ত, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি এ সমস্যা সম্বন্ধে জমিদারি প্রথার স্পষ্টভাষী সমালোচক। সরকার ও জমিদার সমস্যাটা নিয়ে তখন খেলা করছে। ১৮৫৮-৫৯এ কৃষকের নেতৃত্বে নীলবিদ্রোহ শিক্ষিতদের আলোড়িত করে। নীলবিদ্রোহ কৃষকসমস্যাকে আরও একটু তীব্র করে তোলে। পরের তিন দশক জুড়ে মাঝে মাঝে পাবনায় ও বাঙলার সর্বত্র প্রজাবিদ্রোহ চলেছে। এই পরিমণ্ডলে (১৮৫৮-১৮৭২) 'বঙ্গদেশের কৃষক' লিখিত—'সাম্যে'র প্রবন্ধগুলিও এ সময়কারই রচনা। তাতে রুসো থেকে মিল পর্যন্ত মনস্বীদের তত্ত্ব ব্যাখ্যায় বাঙলার পরাণ মণ্ডলের সমস্যাটা বঙ্কিম স্পষ্ট করে তোলেন। কিন্তু সমাধানে পৌঁছতে গিয়ে বঙ্কিম থমকে দাঁড়ালেন—

> "১৭৯৩ সালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহার সংশোধন সম্ভবে না। সেই ভ্রান্তির উপর আধুনিক বঙ্গসমাজ নির্মিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি।"

অতএব, সামাজিক অন্যায়েরই অনুমোদক হওয়া ছাড়া বাঙালী-ভদ্রলোকের শ্রেষ্ঠ মনস্বীর আর উপায় কী? তাই জমিদারের কাছেই বঙ্কিমের অনুনয়—প্রজার উপর অত্যাচার বন্ধ হোক, কিন্তু মূল 'অন্যায়' বজায় থাক। কৃষককে জমিদারের শোষণের যন্ত্র রূপে টিঁকিয়ে রাখার জন্যই কি বঙ্কিমের এই অনুরোধ? এরূপ অনুরোধে পৌরুষ কোথায়? কোথায় courage of conviction? সমস্ত লেখাটির তথ্যাংশ ও সুরের সঙ্গে এই শেষাংশের প্রস্তাবের বিষম অসঙ্গতি। আসলে, একদিকে সমাজ-বৈষম্যের ফলাফল সম্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানের সাক্ষ্য—নিজেরও জ্ঞানযুক্তির নির্দেশ,—অন্যদিকে সমাজবিপ্লবের বিভীষিকা, অস্পষ্টভাবে হলেও জমিদারি-প্রথার সঙ্গে বাঙালী ভদ্রলোকের শ্রেণীস্বার্থের যোগ,—দুয়ের মধ্যে পড়ে বঙ্কিমের ভাবনা সমাধানের কথায় সম্পূর্ণ লক্ষ্যভ্রষ্ট, তাঁর সমাজদৃষ্টিও বিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন।

'সাম্যে'র প্রশ্ন তাই আর তোলা নিরর্থক। প্রথমদিকে রুসো, সঁা সিমেঁা, ওয়েন, মিল প্রভৃতির সমাজতাত্ত্বিক ভাবনায় যতই বঙ্কিমের উৎসাহ থাক, তাঁর কাছে কোঁৎ-এর পজিটিভিজম্ আংশিকভাবে গ্রাহ্য থাকে। কারণও বোঝা যায়—পজিটিভিজম্ মানব-পূজা চায়, মানব-সাম্যের দাবি করে নি।—রুসো থেকে ওয়েন, মিল পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞানীরাও ইউটোপিয়ান বা 'কাল্পনিক' সাম্যবাদী ছিলেন; কোঁৎ তা নন। তিনি কাল্পনিক মনুষ্য-পূজারী—মানুষে-মানুষে বৈষম্য থাকলেই বা কী? সামাজিক-বৈষম্যেশোষিত বাস্তব মানুষের কথা আবার ভাবা কেন? এ যেন সব নরনারায়ণ—তা হলে শোষিতের আর আপত্তি কী? শুধু তা নয়, পজিটিভিজম্ সমাজ-বিপ্লবে আগ্রহশূন্য।—সমাজকে একটা রহস্যময় সত্তা রূপেই পজিটিভিস্টরা দেখে। শতকরা পাঁচ জনের সম্পত্তির অধিকারের চাপে সমাজের শতকরা পঁচানব্বই জন মানুষ অধিকার-বঞ্চিত। তা হলেও সেই সমাজ মান্য,—তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অকর্তব্য।

বঙ্কিম পজিটিভিজম্-এর এই উপদেশে স্বভাবতই স্বস্তিবোধ করেন। বিশেষত, পজিটিভিজম্ বিজ্ঞান-নিষ্ঠ। এবং বঙ্কিম জানেন—বিজ্ঞানের প্রসার বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আর্থিক উন্নতির সহায়ক হবে, তারই লাভ। সমাজ-ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ তখনো অভাবনীয় ছিল। এইরূপেই বঙ্কিমের বয়োবৃদ্ধি, অভিজ্ঞতার প্রসার, ভাবনার ব্যাপ্তির সঙ্গে 'সাম্যে'র তত্ত্বগুলি 'ভুল' হয়ে গেল; কোঁৎ-এর তত্ত্বগুলি কতকাংশে (বহির্বিষয়ে) গ্রাহ্য থেকে গেল। ক্রমেই সমষ্টির চিন্তা অপেক্ষা ব্যক্তির চিন্তা, বহির্মুখী সমাজতত্ত্ব ছেড়ে ধর্মতত্ত্বের আত্মমুখিতা বঙ্কিমের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠল। সাম্য থাক্, সমাজের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ অপেক্ষা মানুষের বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলন ও গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মে মোক্ষলাভ—এই হয়ে গেল বঙ্কিমের নিজস্ব জীবন-দর্শন। ভাবনার আর অবকাশও রইল না,—বৈষম্যগ্রস্ত সমাজের শতকরা নব্বই জন মানুষের পক্ষে শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী, চিত্তরঞ্জিনী—কোন্ বৃত্তির কতটুকু অনুশীলনের অধিকার বা সুযোগ মেলে? কৃষ্ণের গীতোক্ত ধর্ম, শাসক ও শোষকের 'নিষ্কাম শোষণ' (গান্ধীজীর ট্রাস্টিশিপের মতো) ও শোষিত শ্রমোপজীবীর 'নিষ্কাম' উৎপাদন একত্র মিলিয়ে দিয়ে, যুগ যুগ ধরে ভারতে সমাজবিপ্লব ঠেকাতে ঠেকাতে, হিন্দু-সমাজকে কোথায় নামিয়ে দিয়েছে, তাও বঙ্কিমের চোখে পড়ে না। কেন বঙ্কিমের হিন্দুসমাজ এই গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্মের ফলে 'দারিদ্র্য, মূর্খতা ও দাসত্বের' কবলিত হয়ে থেকে গেল? রেখে দিয়ে গেল হিন্দুধর্মকে 'বখামি' আর 'জঞ্জালে'র ভারে অভিশপ্ত করে? নিষ্কাম কর্ম, এমন কি, মানববৃত্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলন—শুনতে ভালো। কিন্তু সমাজে শ্রেণীবৈষম্য থাকতে,—ব্যক্তিগত মুনাফার মৃগয়ার মধ্যে,—নিষ্কাম কর্ম কার্যত পালন করে কার সাধ্য? বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলনও তাই সম্ভব 'মানুষের অধিকার' (Rights of Man) আয়ত্ত হবার পর, শোষণ-বিলোপের পরে। কারণ, বৈষম্য অর্থই স্বার্থান্ধ প্রয়াস। নিষ্কাম জীবন-যাত্রার কথাটা বৈষম্যগ্রস্ত সমাজে কার্যত পরিহাস।

বঙ্কিমভাবনার মূল্য॥ নিশ্চয়ই বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনা তাঁর যুগে কিছু কিছু ঐতিহাসিক প্রয়োজন মেটাতে চেয়েছে। সংক্ষেপে তা এই—হিন্দু মধ্যবিত্তকে বঙ্কিমের চিন্তা স্বাজাত্যের প্রেরণা দিয়েছে; ভারতীয় জাতির এক বৃহদংশে জাতীয় মর্যাদাবোধ জাগিয়েছে; বাস্তব জগৎ ও জীবনকে সত্য বলে জানতে শিখিয়েছে; বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ সঞ্চার করেছে; বিশেষত এক আশ্চর্য সাহিত্য সৃষ্টি করে সকল ভারতবাসীকেই আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। সাম্রাজ্যবাদের শাসনের মধ্যে জাতীয় আত্মপ্রকাশের এই অবদান—ইতিহাসের দাবি মিটিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রেরণা ও জাতীয় আত্মশাসনের আশাকে শক্তিশালী করেছে। কিন্তু সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিবর্তনে বঙ্কিমের প্রতিভা মধ্যবিত্তের শ্রেণীগত চিন্তা-ভাবনা ও স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে বহু পরিমাণে নিজেকে সঙ্কীর্ণ ও খণ্ডিত করেছে। বঙ্কিম-মানসের জটিলতা তাই

একদিকে যেমন জাতীয় চিত্তকে এগিয়ে দিয়েছে বিজ্ঞানের স্বপক্ষে, সেই চিত্তকে আবার বিজড়িত করেছে যত রকমের স্ববিরোধী ভাবনায়। প্রতিভা যখন জটিলতায় পীড়িত হয় তখন জাতির দুর্ভাগ্য। কারণ, জাতিও প্রতিভার প্রভাবে সে জটিলতায় কিছু না কিছু বিভ্রান্ত হয়। ১৯৪৭-এ এসে তা দেখা গেল।

কালের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তাশীল বঙ্কিমকে রামকৃষ্ণদেবের ভাষাতেই আবার বলতে হয়—সখেদে, বেদনায়—'বঙ্কিম, বাঁকা কেন?' বঙ্কিমের ভাবয়িত্রী প্রতিভা বলিষ্ঠ, গভীর, বহুমুখী ; কিন্তু বঙ্কিম।

গোপাল হালদার

সূচীপত্র

কৃষ্ণচরিত্র

প্রথম খণ্ড—উপক্রমণিকা

মহতস্তমসঃ পারে পুরুষং হ্যতিতেজসম্‌।
যং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমত্যেতি তস্মৈ জ্ঞেয়াত্মনে নমঃ॥

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৪৭ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ—গ্রন্থের উদ্দেশ্য

ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুর, বাঙ্গালা দেশের সকল হিন্দুর বিশ্বাস যে, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। কৃষ্ণস্তু ভগবান্‌ স্বয়ং—ইহা তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বাঙ্গালা প্রদেশে, কৃষ্ণের উপাসনা প্রায় সর্ব্বব্যাপক। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পূজা, প্রায় মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, উৎসবে উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্ণগীতি, সকল মুখে কৃষ্ণনাম। কাহারও গায়ে দিবার বস্ত্রে কৃষ্ণনামাবলি, কাহারও গায়ে কৃষ্ণনামের ছাপ। কেহ কৃষ্ণনাম না করিয়া কোথাও যাত্রা করেন না; কেহ কৃষ্ণনাম না লিখিয়া কোন পত্র বা কোন লেখাপড়া করেন না; ভিখারী "জয় রাধে কৃষ্ণ" না বলিয়া ভিক্ষা চায় না। কোন ঘৃণার কথা শুনিলে "রাধে কৃষ্ণ!" বলিয়া আমরা ঘৃণা প্রকাশ করি; বনের পাখী পুষিলে তাহাকে "রাধে কৃষ্ণ" নাম শিখাই। কৃষ্ণ এদেশে সর্ব্বব্যাপক।

কৃষ্ণস্তু ভগবান্‌ স্বয়ং। যদি তাহাই বাঙ্গালীর বিশ্বাস, তবে সর্ব্বসময়ে কৃষ্ণারাধনা, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা ধর্ম্মেরই উন্নতিসাধক। সকল সময়ে ঈশ্বরকে স্মরণ করার অপেক্ষা মনুষ্যের মঙ্গল আর কি আছে? কিন্তু ইঁহারা ভগবান্‌কে কি রকম ভাবেন? ভাবেন, ইনি বাল্যে চোর—ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন; কৈশোরে পারদারিক—অসংখ্য গোপনারীকে পাতিব্রত্যধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন; পরিণত বয়সে বঞ্চক ও শঠ—বঞ্চনার দ্বারা দ্রোণাদির প্রাণহরণ করিয়াছিলেন। ভগবচ্চরিত্র কি এইরূপ? যিনি কেবল শুদ্ধসত্ত্ব, যাঁহা হইতে সর্ব্বপ্রকার শুদ্ধি, যাঁহার নামে অশুদ্ধি অপুণ্য দূর হয়, মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া সমস্ত পাপাচরণ কি সেই ভগবচ্চরিত্রসঙ্গত?

ভগবচ্চরিত্রের এইরূপ কল্পনায় ভারতবর্ষের পাপস্রোত বৃদ্ধি পাইয়াছে, সনাতনধর্ম্ম-দ্বেষিগণ বলিয়া থাকেন। এবং সে কথার প্রতিবাদ করিয়া জয়শ্রী লাভ করিতেও কখনও কাহাকে দেখি নাই। আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাণেতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য, আমার যতদূর সাধ্য, আমি পুরাণ ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছি। তাহার ফল এই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণসম্বন্ধীয় যে সকল পাপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, এবং উপন্যাসকারকৃত কৃষ্ণসম্বন্ধীয় উপন্যাস সকল বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে, তাহা অতি বিশুদ্ধ, পরমপবিত্র, অতিশয় মহৎ ইহাও জানিতে পারিয়াছি। জানিয়াছি—ঈদৃশ সর্ব্বগুণান্বিত, সর্ব্বপাপসংস্পর্শশূন্য আদর্শ চরিত্র আর কোথাও নাই। কোন দেশীয় ইতিহাসেও না, কোন দেশীয় কাব্যেও না।

কি প্রকার বিচারে আমি এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা বুঝান এই গ্রন্থের একটি উদ্দেশ্য। কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দিলেও এই গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমার নিজের যাহা বিশ্বাস, পাঠককে তাহা গ্রহণ করিতে বলি না, এবং কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। এ গ্রন্থে আমি তাঁহার কেবল মানবচরিত্রেরই সমালোচনা করিব। তবে এখন হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা কিছু প্রবলতা লাভ করিয়াছে। ধর্ম্মান্দোলনের প্রবলতার এই সময়ে কৃষ্ণচরিত্রের সবিস্তারে সমালোচনা প্রয়োজনীয়। যদি পুরাতন বজায় রাখিতে হয়, তবে এখানে বজায় রাখিবার কি আছে না আছে, তাহা দেখিয়া লইতে হয়। আর যদি পুরাতন উঠাইতে হয়, তাহা হইলেও কৃষ্ণচরিত্রের সমালোচনা চাই; কেন না, কৃষ্ণকে না উঠাইয়া দিলে পুরাতন উঠানা যাইবে না।

ইহা ভিন্ন আমার এক গুরুতর উদ্দেশ্য আছে। ইতিপূর্ব্বে* "ধর্ম্মতত্ত্ব" নামে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে যে কয়টি কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা এই :—

"১। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম।

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই সুখ।"

এক্ষণে আমি স্বীকার করি যে, সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ অনুশীলন, প্রস্ফুরণ, চরিতার্থতা ও সামঞ্জস্য একাধারে দুর্লভ। এ সম্বন্ধে ঐ গ্রন্থেই যাহা বলিয়াছি, তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি :—

"শিষ্য।...জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্য্যে তৎপরতা, চিত্তে ধর্ম্মাত্মতা এবং সুরসে রসিকতা, এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি আছে, অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ, এবং সর্ব্ববিধ শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই।

* * *

এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? এরূপ মনুষ্য ত দেখি না।

গুরু। মনুষ্য না দেখ, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ।" পুনশ্চ :—

"অনন্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ যাঁহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা যাঁহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এই জন্য যীশুখৃষ্ট খ্রীষ্টীয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ। কিন্তু এরূপ ধর্ম্মপরিবর্দ্ধক আদর্শ যেরূপ হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্ম্মপুস্তকে নাই—কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি

* ধর্ম্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণের পরে এবং এই দ্বিতীয় সংস্করণের পূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল।

রাজর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি, সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ। তাহার উপর শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ আরও সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ। খ্রীষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন, কৌপীনধারী নির্ম্মল ধর্ম্মবেত্তা। কিন্তু ইঁহারা তা নয়। ইঁহারা সর্ব্বগুণবিশিষ্ট—ইঁহাদিগেতেই সর্ব্ববৃত্তি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। ইঁহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন; কার্ম্মুকহস্তেও ধর্ম্মবেত্তা; রাজা হইয়াও পণ্ডিত; শক্তিমান্ হইয়াও সর্ব্বজনে প্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, যাঁহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়—যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্ম্ম শিক্ষা করেন স্বয়ং অর্জ্জুন যাঁহার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ যাঁহার অংশমাত্র, যাঁহার তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখন মনুষ্যভাষায় কীর্ত্তিত হয় নাই।”

এই তত্ত্বটা প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার জন্যেও শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণের চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার উপায় কি?

আদৌ এখান দুইটি গুরুতর আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে। যাঁহারা দৃঢ় বিশ্বাস করেন, যে কৃষ্ণ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা এখন ছাড়িয়া দিই। আমার সকল পাঠক সেরূপ বিশ্বাসযুক্ত নহেন। যাঁহারা সেরূপ বিশ্বাসযুক্ত নহেন, তাঁহারা বলিবেন, কৃষ্ণচরিত্রের মৌলিকতা কি? কৃষ্ণ নামে কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে কখনও বিদ্যমান ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? যদি ছিলেন, তবে তাঁহার চরিত্র যথার্থ কি প্রকার ছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় আছে কি?

আমরা প্রথমে এই দুই সন্দেহের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব।

কৃষ্ণের বৃত্তান্ত নিম্নলিখিত প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়;—

(১) মহাভারত।
(২) হরিবংশ।
(৩) পুরাণ।

ইহার মধ্যে পুরাণ আঠারখানি। সকলগুলিতে কৃষ্ণবৃত্তান্ত নাই। নিম্নলিখিত-গুলিতে আছে;—

(১) ব্রহ্মপুরাণ।
(২) পদ্মপুরাণ।
(৩) বিষ্ণুপুরাণ।
(৪) বায়ুপুরাণ।
(৫) শ্রীমদ্ভাগবত।
(১০) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।
(১৩) স্কন্দপুরাণ।
(১৪) বামনপুরাণ।
(১৫) কূর্ম্মপুরাণ।

মহাভারত, আর উপরিলিখিত অন্য গ্রন্থগুলির মধ্যে কৃষ্ণজীবনী সম্বন্ধে একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। যাহা মহাভারতে আছে, তাহা হরিবংশে ও পুরাণগুলিতে নাই। যাহা হরিবংশ ও পুরাণে আছে, তাহা মহাভারতে নাই। ইহার একটি কারণ এই যে, মহাভারত পাণ্ডবদিগের ইতিহাস ; কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের সখা ও সহায় ; তিনি পাণ্ডবদিগের সহায় হইয়া বা তাঁহাদের সঙ্গে থাকিয়া যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহাই মহাভারতে আছে, ও থাকিবার কথা। প্রসঙ্গক্রমে অন্য দুই একটা কথা আছে মাত্র। তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ মহাভারতে নাই বলিয়াই হরিবংশ রচিত হইয়াছিল, ইহা হরিবংশে আছে। ভাগবতেও ঐরূপ কথা আছে। ব্যাস নারদকে মহাভারতের অসম্পূর্ণতা জানাইলেন। নারদ ব্যাসকে কৃষ্ণচরিত্র রচনার উপদেশ দিলেন। অতএব মহাভারতে যাহা আছে, এই ভাগবতে বা হরিবংশে বা অন্য পুরাণে তাহা নাই ; মহাভারতে, যাহা নাই—পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাই আছে।

অতএব মহাভারত সর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী। হরিবংশাদি ইহার অভাব পূরণার্থ মাত্র। যাহা সর্ব্বাগ্রে রচিত হইয়াছিল, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক, ইহাই সম্ভব। কথিত আছে যে, মহাভারত, হরিবংশ, এবং অষ্টাদশ পুরাণ একই ব্যক্তি রচিত। সকলই মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত ; এ কথা সত্য কি না, তাহার বিচারে এক্ষণে প্রয়োজন নাই। আগে দেখা যাউক, মহাভারতের কোন ঐতিহাসিকতা আছে কি না। যদি তাহা না থাকে, তবে হরিবংশে ও পুরাণে কোন ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান বৃথা।

এক্ষণে যে বিচারে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে দুই দিকে দুই ঘোর বিপদ্। এক দিকে, এ দেশীয় প্রাচীন সংস্কার যে, সংস্কৃতভাষায় যে কিছু রচনা আছে, যে কিছুতে অনুস্বার আছে, সকলই অভ্রান্ত ঋষি-প্রণীত ; সকলই প্রতিবাদ বা সন্দেহের অতীত যে সত্য, তাহাই আমাদিগের কাছে আনিয়া উপস্থিত করে। বেদবিভাগ, লক্ষশ্লোকাত্মক মহাভারত, হরিবংশ অষ্টাদশ পুরাণ, সকল একজনে করিয়াছেন ; সকলই কলিযুগের আরম্ভে হইয়াছে ; সেও পাঁচ হাজার বৎসর হইল ; আর এই সকল বেদব্যাস যেমন করিয়াছিলেন, ঠিক তেমনই আছে। অনেক লোকে, এ সংস্কারের প্রতিবাদ শুনা দূরে যাউক, যে প্রতিবাদ করিবে, তাহাকে মহাপাতকী নারকী এবং দেশের সর্ব্বনাশে প্রস্তুত মনে করেন।

এই এক দিকের বিপদ্। আর দিকে গুরুতর বিপদ্, বিলাতী পাণ্ডিত্য। ইউরোপ ও আমেরিকার কতকগুলি পণ্ডিত সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধৃত করিতে নিযুক্ত, কিন্তু তাঁহাদের এ কথা অসহ্য যে, পরাধীন দুর্ব্বল হিন্দুজাতি, কোন কালে সভ্য ছিল, এবং সেই সভ্যতা অতি প্রাচীন। অতএব দুই চারি জন ভিন্ন তাঁহারা সচরাচর প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরব খর্ব্ব করিতে নিযুক্ত। তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক ইহাই প্রমাণ করিতে চাহেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থ সকলে যাহা কিছু আছে—হিন্দুধর্ম্মবিরোধী বৌদ্ধগ্রন্থ ছাড়া—সকলই আধুনিক, আর হিন্দুগ্রন্থে যাহাই আছে, তাহা হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা, নয় অন্য দেশ হইতে চুরি করা। কোন মহাত্মা বলেন, রামায়ণ হোমরের কাব্যের অনুকরণ ; কেহ বা বলেন, ভগবদ্গীতা বাইবেলের ছায়ামাত্র। হিন্দুর জ্যোতিষ চীন, যবন বা

কাল্‌ডিয় হইতে প্রাপ্ত; হিন্দুর গণিতও পরের কাছে পাওয়া; লিখিত অক্ষরও কোন সীমীয় জাতীয় হইতে প্রাপ্ত। এ সকল কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহাদের বিচারপ্রণালীর মূল সূত্র এই যে, ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে ভারতপক্ষে যাহা পাওয়া যায়, তাহা মিথ্যা বা প্রক্ষিপ্ত, যাহা ভারতবর্ষের বিপক্ষে পাওয়া যায়, তাহাই সত্য। পাণ্ডবদিগের ন্যায় বীরচরিত্র ভারতবর্ষীয় পুরুষের কথা মিথ্যা, পাণ্ডব কবিকল্পনা মাত্র, কিন্তু পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীর পঞ্চ পতি সত্য, কেন না, তদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, প্রাচীন ভারতবাসীয়েরা চূয়াড় জাতি ছিল, তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। ফর্গুসন্ সাহেব অট্টালিকার ভগ্নাবশেষে কতকগুলা বিবস্ত্রা স্ত্রীমূর্ত্তি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকেরা কাপড় পরিত না; এ'দকে মথুরা প্রভৃতি স্থানের অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য দেখিয়া বিলাতী পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, এ শিল্প গ্রীক্ মিস্ত্রীর। বেবর (Weber) সাহেব, কোন মতে হিন্দুদিগের জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রাচীনতা উড়াইয়া দিতে না পারিয়া স্থির করিলেন, হিন্দুরা চান্দ্র নক্ষত্রমণ্ডল বাবিলনীয়দিগের নিকট হইতে পাইয়াছে। বাবিলনীয়দিগের যে চান্দ্র নক্ষত্রমণ্ডল আদৌ কখনও ছিল না, তাহা চাপিয়া গেলেন। প্রমাণের অভাবেও Whitney সাহেব বলিলেন, তাহা হইতে পারে, কেন না, হিন্দুদের মানসিক স্বভাব তেমন তেজস্বী নয় যে, তাহারা নিজবুদ্ধিতে এত করে।

এই সকল মহাপুরুষগণের মতের সমালোচনায় আমার কোন প্রয়োজন ছিল না। কেন না, আমি স্বদেশীয় পাঠকের জন্য লিখি, হিন্দুদ্বেষীদিগের জন্য লিখি না। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, আমার স্বদেশীয় শিক্ষিতসম্প্রদায়মধ্যে অনেকে তাঁহাদের মতের অনুবর্ত্তী। অনেকেই নিজে কিছু বিচার আচার না করিয়াই, কেবল ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মত বলিয়াই, সেই সকল মতের অনুবর্ত্তী। আমার দুরাকাঙ্ক্ষা যে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও কেহ কেহ এই গ্রন্থ পাঠ করেন। তাই, আমি ইউরোপীয় মতেরও প্রতিবাদে প্রবৃত্ত। যাঁহাদের কাছে বিলাতী সবাই ভাল, যাঁহারা ইস্তক বিলাতী পণ্ডিত, লাগায়েৎ বিলাতী কুকুর, সকলেরই সেবা করেন, দেশী গ্রন্থ পড়া দূরে থাক, দেশী ভিখারীকেও ভিক্ষা দেন না, তাহাদের আমি কিছু করিতে পারিব না। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সত্যপ্রিয় এবং দেশবৎসল। তাঁহাদের জন্য লিখিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—মহাভারতের ঐতিহাসিকতা

বলিয়াছি যে, কৃষ্ণচরিত্র যে সকল গ্রন্থে পাওয়া যায়, মহাভারত তাহার মধ্যে সর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু মহাভারতের উপর কি নির্ভর করা যায়? মহাভারতের ঐতিহাসিকতা কিছু আছে কি? মহাভারতকে ইতিহাস বলে, কিন্তু ইতিহাস বলিলে কি Historyই বুঝাইল? ইতিহাস কাহাকে বলে? এখনকার দিনে শৃগাল কুকুরের গল্প লিখিয়াও লোকে তাহাকে "ইতিহাস" নাম দিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ যাহাতে পুরাবৃত্ত, অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আবৃত্তি আছে, তাহা ভিন্ন আর কিছুকেই ইতিহাস বলা যাইতে পারে না—

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্ ।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে ॥"

এখন, ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ সকলের মধ্যে কেবল মহাভারতই অথবা কেবল মহাভারত ও রামায়ণ ইতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যেখানে মহাভারত ইতিহাস পদে বাচ্য, যখন অন্তত: রামায়ণ ভিন্ন আর কোন গ্রন্থই এই নাম প্রাপ্ত হয় নাই, তখন বিবেচনা করিতে হইবে যে, ইহার বিশেষ ঐতিহাসিকতা আছে বলিয়াই এরূপ হইয়াছে।

সত্য বটে যে, মহাভারতে এমন বিস্তর কথা আছে যে, তাহা স্পষ্টতঃ অলীক, অসম্ভব, অনৈতিহাসিক। সেই সকল কথাগুলি অলীক ও অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু যে অংশে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে ঐ অংশ অলীক বা অনৈতিহাসিক বিবেচনা করা যায়, সে,অংশগুলি অনৈতিহাসিক বলিয়া কেন পরিত্যাগ করিব? সকল জাতির মধ্যে, প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ ঐতিহাসিকে ও অনৈতিহাসিকে, সত্যে ও মিথ্যায়, মিশিয়া গিয়াছে। রোমক ইতিহাসবেত্তা লিবি প্রভৃতি, যবন ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটস্ প্রভৃতি, মুসলমান ইতিহাসবেত্তা ফেরেশ্‌তো প্রভৃতি এইরূপ ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সঙ্গে অনৈসর্গিক এবং অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত মিশাইয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থ সকল ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে—মহাভারতই অনৈতিহাসিক বলিয়া একেবারে পরিত্যক্ত হইবে কেন?

আমি জানি যে, আধুনিক ইউরোপীয়েরা এই সকল ইতিহাসবেত্তাদিগকে (Livy, Herodotus প্রভৃতিকে) আদর করেন না। কিন্তু তাঁহারা এমন বলেন না যে, ইঁহাদের গ্রন্থ অনৈসর্গিক ব্যাপারে পরিপূর্ণ, এই জন্যই ইঁহারা পরিত্যাজ্য। তাঁহারা বলেন যে, ইঁহারা যে সকল সময়ের ইতিহাস লিখিয়াছেন, সে সকল সময়ে ইঁহারা নিজেও বর্ত্তমান ছিলেন না, কোন সমসাময়িক লেখকেরও সাহায্য পান নাই; অতএব তাঁহাদের গ্রন্থের উপর, প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া নির্ভর করা যায় না। এ কথা যথার্থ, লিবি বা হেরোডোটস অপেক্ষা মহাভারতের সমসাময়িকতা সম্বন্ধে দাবি দাওয়া কিছু বেশী, তাহা এই গ্রন্থে সময়ান্তরে প্রমাণীকৃত হইবে। এই পর্য্যন্ত এখন বলিতে ইচ্ছা করি যে, আধুনিক ইউরোপীয় সমালোচকেরা যাহাই বলুন, প্রাচীন রোমক বা গ্রীক্ লিপি বা হেরোডোটসের গ্রন্থকে কখন অনৈতিহাসিক বলিতেন না। পক্ষান্তরে এমন দিনও উপস্থিত হইতে পারে যে Giffon বা Froude অসমসাময়িক বলিয়া পরিত্যক্ত হইবেন। আর আধুনিক সমালোচকের দল যাই বলুন, লিবি বা হেরোডোটস্‌কে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া রোম বা গ্রীসের কোন ইতিহাস আজিও লিখিত হয় না।

পাঠক মনে রাখিবেন যে, অনৈসর্গিকতার বাহুল্যঘটিত যে দোষ, তাহারই বিচার হইতেছে। এ বিষয়ে ইউরোপীয়দিগের পদচিহ্নানুসরণই যদি বিদ্যাবুদ্ধির পরাকাষ্ঠার পরিচয় হয়, তবে আমরা এখানে সে গৌরবে বঞ্চিত নহি। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন অবস্থা জানিবার জন্য দেশীয় গ্রন্থ সকল হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, কেন না, সে সকল অতিশয় অবিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু গ্রীক্ লেখক

Megasthenes এবং Ktesias-এ বিষয়ে অতিশয় বিশ্বাসযোগ্য,—সে জন্য ইঁহারাই সে বিষয়ে ইউরোপীয় লেখকদিগের অবলম্বন। কিন্তু এই লেখকদিগের ক্ষুদ্র গ্রন্থগুলিতে যে রাশি রাশি অদ্ভুত, অলীক, অনৈসর্গিক উপন্যাস পাওয়া যায়, তাহা মহাভারতের লক্ষ শ্লোকের ভিতরও পাওয়া যায় না। এ গ্রন্থগুলি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস, আর মহাভারত অবিশ্বাসযোগ্য কাব্য !! কি অপরাধে ?

এখন ইহাও স্বীকার করা যাউক যে, ঐ সকল ভিন্নদেশীয় ইতিহাসগ্রন্থের অপেক্ষা মহাভারতে অনৈসর্গিক ঘটনার বাহুল্য অধিক। তাহাতেও, যেটুকু নৈসর্গিক ও সম্ভব ব্যাপারের ইতিবৃত্ত, সেটুকু গ্রহণ করিবার কোন আপত্তি দেখা যায় না। মহাভারতে যে অন্য দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অপেক্ষা কিছু বেশী কাল্পনিক ব্যাপারের বাহুল্য আছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে। ইতিহাসগ্রন্থে দুই কারণে অনৈসর্গিক বা মিথ্যা ঘটনা সকল স্থান পায়। প্রথম, লেখক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া, সেই সকলকে সত্য বিবেচনা করিয়া তাহা গ্রন্থভুক্ত করেন। দ্বিতীয়, তাঁহার গ্রন্থ প্রচারের পর, পরবর্তী লেখকেরা আপনাদিগের রচনা পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের রচনামধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে। প্রথম কারণে সকল দেশের প্রাচীন ইতিহাস কাল্পনিক ব্যাপারের সংস্পর্শে দূষিত হইয়াছে—মহাভারতেও সেইরূপ ঘটিয়া থাকিবে।

কিন্তু দ্বিতীয় কারণটি অন্য দেশের ইতিহাসগ্রন্থে সেরূপ প্রবলতা প্রাপ্ত হয় নাই—মহাভারতকেই বিশেষ প্রকারে অধিকার করিয়াছে। তাহার তিনটি কারণ আছে।

প্রথম কারণ এই যে, অন্যান্য দেশে যখন ঐ সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণীত হয় তখন প্রায়ই সে সকল দেশে গ্রন্থ সকল লিখিত করিবার প্রথা চলিয়াছে। গ্রন্থ লিখিত হইলে, তাহাতে পরবর্ত্তী লেখকেরা স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিবার বড় সুবিধা পান না—লিখিত গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত রচনা শীঘ্র ধরা পড়ে। কেন না, প্রাচীন একখানা কাপির দ্বারা অন্য কাপির শুদ্ধাশুদ্ধি নিশ্চিত করা যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষে গ্রন্থ সকল প্রণীত হইয়া মুখে মুখে প্রচারিত হইত, লিপিবিদ্যা প্রচলিত হইলে পরেও গ্রন্থ সকল পূর্ব্বপ্রথানুসারে গুরু-শিষ্য-পরম্পরা মুখে মুখেই প্রচারিত হইত। তাহাতে প্রক্ষিপ্ত রচনা প্রবেশ করিবার বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, রোম, গ্রীস বা অন্য কোন দেশে কোন ইতিহাসগ্রন্থ মহাভারতের ন্যায় জনসমাজে আদর বা গৌরব প্রাপ্ত হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষীয় লেখকদিগের পক্ষে মহাভারতে স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত করিয়া যে লাভ ছিল, অন্য কোন দেশীয় লেখকদিগের সেরূপ ঘটে নাই।

তৃতীয় কারণ এই যে, অন্য দেশের লেখকেরা আপনার যশ বা তাদৃশ অন্য কোন কামনার বশীভূত হইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন। কাজেই আপনার নামে আপনার রচনা প্রচার করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল, পরের রচনার মধ্যে আপনার রচনা ডুবাইয়া দিয়া আপনার নাম লোপ করিবার অভিপ্রায় তাঁহাদের কখনও ঘটিত না। কিন্তু ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণেরা নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম হইয়া রচনা করিতেন। লোকহিত ভিন্ন আপনাদিগের যশ তাঁহাদিগের অভিপ্রেত ছিল না। অনেক গ্রন্থে তৎপ্রণেতার নামমাত্র নাই। অনেক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এমন আছে যে, কে তাহার প্রণেতা, তাহা আজি পর্য্যন্ত কেহ জানে

না। ঈদৃশ নিষ্কাম লেখক, যাহাতে মহাভারতের ন্যায় লোকায়ত গ্রন্থের সাহায্যে তাঁহার রচনা লোকমধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রচারিত হইয়া লোকহিত সাধন করে, সেই চেষ্টায় আপনার রচনা সকল তাদৃশ গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত করিতেন।

এই সকল কারণে মহাভারতে কাল্পনিক বৃত্তান্তের বিশেষ বাহুল্য ঘটিয়াছে। কিন্তু কাল্পনিক বৃত্তান্তের বাহুল্য আছে বলিয়া এই প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থে যে কিছুই ঐতিহাসিক কথা নাই, ইহা বলা নিতান্ত অসঙ্গত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—মহাভারতের ঐতিহাসিকতা
ইউরোপীয়দিগের মত

অসঙ্গতই হউক আর সঙ্গতই হউক, মহাভারতের ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করেন, এমন অনেক আছেন। বলা বাহুল্য যে, ইঁহারা ইউরোপীয় পণ্ডিত, অথবা তাঁহাদিগের শিষ্য। তাঁহাদিগের মতের সংক্ষেপতঃ উল্লেখ করিব।

বিলাতী বিদ্যার একটা লক্ষণ এই যে, তাঁহারা স্বদেশে যাহা দেখেন, মনে করেন বিদেশে ঠিক তাই আছে। তাঁহারা Moor ভিন্ন অগৌরবর্ণ কোন জাতি জানিতেন না, এজন্য এদেশে আসিয়া হিন্দুদিগকে "Moor" বলিতে লাগিলেন। সেইরূপ স্বদেশে Epic কাব্য ভিন্ন পদ্যে রচিত আখ্যানগ্রন্থ দেখেন নাই, সুতরাং ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মহাভারত ও রামায়ণের সন্ধান পাইয়াই ঐ দুই গ্রন্থ Epic কাব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। যদি কাব্য, তবে আর উহার ঐতিহাসিকতা কিছু রহিল না, সব এক কথায় ভাসিয়া গেল।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এ বোল কিয়ৎ পরিমাণে ছাড়িয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের দেশী শিষ্যেরা ছাড়েন নাই।

কেন, মহাভারতকে সাহেবরা কাব্যগ্রন্থ বলেন, তাহা তাঁহারা ঠিক বুঝান নাই। উহা পদ্যে রচিত বলিয়া এরূপ বলা হয়, এমত হইতে পারে না, কেন না সর্ব্বপ্রকার সংস্কৃত গ্রন্থই পদ্যে রচিত ;—বিজ্ঞান, দর্শন, অভিধান, জ্যোতিষ, চিকিৎসা শাস্ত্র, সকলই পদ্যে প্রণীত হইয়াছে। তবে এমত হইতে পারে, মহাভারতে কাব্যাংশ বড় সুন্দর ;— ইউরোপীয়েরা যে প্রকার সৌন্দর্য্য Epic কাব্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই জাতীয় সৌন্দর্য্য উহাতে বহুল পরিমাণে আছে বলিয়া, উহাকে Epic বলেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ জাতীয় সৌন্দর্য্য অনেক ইউরোপীয় মৌলিক ইতিহাসেও আছে। ইংরেজের মধ্যে মেকলে, কার্লাইল্ ও ফ্রুদের গ্রন্থে, ফরাসীদিগের মধ্যে লামার্তীন্ ও মিশালার গ্রন্থে, গ্রীকদিগের মধ্যে থুকিদিদিসের গ্রন্থে, এবং অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থে আছে। মানব-চরিত্রই কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান ; ইতিহাসবেত্তাও মনুষ্যচরিত্রের বর্ণন করেন ; ভাল করিয়া তিনি যদি আপনার কার্য্য সাধন করিতে পারেন, তবে কাজেই তাঁহার ইতিহাসে কাব্যের সৌন্দর্য্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। সৌন্দর্য্যহেতু ঐ সকল গ্রন্থ অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যক্ত হয় নাই—মহাভারতও হইতে পারে না। মহাভারতে যে সে সৌন্দর্য্য অধিক পরিমাণে ঘটিয়াছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে।

মূর্খের মতের বিশেষ আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। কিন্তু পণ্ডিতে যদি মূর্খের মত কথা কয়, তাহা হইলে কি কর্ত্তব্য? বিখ্যাত Weber সাহেব পণ্ডিত বটে, কিন্তু আমার বিবেচনায় তিনি যে ক্ষণে সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের পক্ষে সে অতি অশুভক্ষণ। ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব সেদিনকার জর্ম্মনির অরণ্য-নিবাসী বর্ব্বরদিগের বংশধরের পক্ষে অসহ্য। অতএব প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা অতি আধুনিক, ইহা প্রমাণ করিতে তিনি সর্ব্বদা যত্নশীল। তাঁহার বিবেচনায় যিশুখ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্বে যে মহাভারত ছিল, এমন বিবেচনা করিবার মুখ্য প্রমাণ কিছু নাই। এতটুকু প্রাচীনতার কথা স্বীকার করিবারও একমাত্র কারণ এই যে, Chrysostom নামা একজন ইউরোপীয় ভারতবর্ষে আসিয়া দাঁড়ী-মাঝির মুখে মহাভারতের কথা শুনিয়া গিয়াছিলেন। পাণিনির সূত্রে মহাভারত শব্দও আছে, যুধিষ্ঠিরাদিরও নাম আছে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হয় না, কেন না, পাণিনিও তাঁহার মতে "কালকের ছেলে"। তবে একজন ইউরোপীয়ের পবিত্র কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট নাবিকবাক্যের কোন প্রকার অবহেলা করিতে তিনি সক্ষম নহেন। অতএব মহাভারত যে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ছিল, ইহা তিনি কায়ক্লেশে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু আর একজন ইউরোপীয় লেখক (Megasthenes) যিনি খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর লোক, এবং ভারতবর্ষে আসিয়া চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে বাস করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার গ্রন্থে মহাভারতের কথা লেখেন নাই। কাজেই বেবর সাহেবের বিবেচনায় তাঁহার সময় মহাভারত ছিল না।* এখানে জর্ম্মান পণ্ডিতটি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক জুয়াচুরি করিয়াছেন। কেন না, তিনি বেশ জানেন যে, মিগাস্থেনিসের ভারতসম্বন্ধীয় গ্রন্থ বিদ্যমান নাই, কেবল গ্রন্থকার তাহা হইতে যে সকল অংশ তাঁহাদিগের নিজ নিজ পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহাই সঙ্কলনপূর্ব্বক ডাক্তার শ্বানেক (Dr. Schwanbeck) নামক একজন আধুনিক পণ্ডিত একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন; তাহাই এখন মিগাস্থেনিসকৃত ভারতবৃত্তান্ত বলিয়া প্রচলিত। তাঁহার গ্রন্থের অধিকাংশ বিলুপ্ত; সুতরাং তিনি মহাভারতের কথা বলিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। ইহা জানিয়া শুনিয়াও কেবল ভারতবর্ষের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃ বেবর সাহেব এরূপ কথা লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত ভারত-সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-বিষয়ক গ্রন্থে আদ্যোপান্ত ভারতবর্ষের গৌরব লাঘবের চেষ্টা ভিন্ন, অন্য কোন উদ্দেশ্য দেখা যায় না। ইহার পর বলা বাহুল্য যে, মিগাস্থেনিস্ মহাভারতের নাম করেন নাই, ইহা হইতেই এমন বুঝায় না যে, তাঁহার সময়ে মহাভারত ছিল না। অনেক হিন্দু জর্ম্মানি বেড়াইয়া আসিয়াছেন, গ্রন্থও লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও গ্রন্থে ত বেবর সাহেবের নাম দেখিলাম না। সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি যে, বেবর সাহেব কখনও ছিলেন না?

*** Since Megasthenes says nothing of this epic, it is not an improbable hypothesis that its origin is to be placed in the interval between his time and that of Chrysostom; for what ignorant sailors took note of would hardly have escaped his observation. *History of Sanskrit Literature*, English Translation, P. 186. Trubner & Co., 882.**

অন্যান্য পণ্ডিতেরা, বেবর সাহেবের মত, সব উঠাইয়া দিতে চাহেন না। তাঁহারা যে আপত্তি করেন, তাহা দুই প্রকার ;—

(১) মহাভারত প্রাচীন গ্রন্থ বটে, কিন্তু খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীতে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার পূর্ব্বে এরূপ গ্রন্থ ছিল না।

(২) আদিম মহাভারতে পাণ্ডবদিগের কোন কথা ছিল না। পাণ্ডব ও কৃষ্ণ প্রভৃতি কবিকল্পনা মাত্র।

দেশী মত আবার বিপরীত সীমান্তে গিয়াছে। দেশীয়েরা বলেন, কলির আরম্ভের ঠিক পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। সে সময় বেদব্যাস বর্ত্তমান ছিলেন। কলির প্রবৃত্তিমাত্রে পাণ্ডবেরা স্বর্গারোহণ করেন। অতএব কলির আরম্ভেই অর্থাৎ অদ্য হইতে ৪৯৯২ বৎসর পূর্ব্বে, মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল।

দুটি মতই ঘোরতর ভ্রমপরিপূর্ণ। দুই দলের মতেরই খণ্ডন আবশ্যক। তজ্জন্য প্রথম প্রয়োজনীয় তত্ত্ব এই যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল, ইহার নির্ণয়। তাহা নির্ণীত হইলেই কতক বুঝিতে পারিব, মহাভারত কবে প্রণীত হইয়াছিল, এবং পাণ্ডবাদি কবিকল্পনা মাত্র কি না? তাহা হইলেই জানিতে পারিব, মহাভারতের উপর নির্ভর করা যায় কি না?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল

প্রথমে, দেশী মতেরই সমালোচনা আবশ্যক। ৪৯৯২ বৎসর পূর্ব্বে যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল, এ কথাটা সত্য নহে; ইহা আমি দেশী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই প্রমাণ করিব। রাজতরঙ্গিণীকার বলেন, কলির ৬৫৩ বৎসর গতে গোনর্দ্দ কাশ্মীরে রাজা হইয়াছিলেন। আরও বলেন, গোনর্দ্দ যুধিষ্ঠিরের সমকালবর্ত্তী রাজা। তিনি ৩৫ বৎসর রাজত্ব করেন। অতএব প্রায় সাত শত বৎসর আরও বাদ দিতে হয়। তাহা হইলে ২৪০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দ পাওয়া যায়।

কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে আছে—

> সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্ব্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
> তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি॥
> তেন সপ্তর্ষয়ো যুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্।
> তে তু পারিক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম॥
> তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ।—৪ অংশ, ২৪ অ, ৩৩-৩৪

অর্থ। সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে যে দুইটি তারা আকাশে পূর্ব্বদিকে উদিত দেখা যায়, ইহাদের সমসূত্রে যে মঘানক্ষত্র দেখা যায়, সেই নক্ষত্রে সপ্তর্ষি শত বৎসর অবস্থান করেন।* সপ্তর্ষি পরীক্ষিতের সময়ে মঘা নক্ষত্রে ছিলেন, তখন কলির দ্বাদশ শত বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

অতএব এই কথা মতে কলির দ্বাদশ শত বর্ষের পর পরীক্ষিতের সময়; তাহা হইলে উপরি উদ্ধৃত ৩৪ শ্লোক অনুসারে ১৯০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল।

---

* নক্ষত্র এখানে অশ্বিন্যাদি।

কিন্তু ৩৩ শ্লোকে যাহা পাওয়া যায়, তাহার সঙ্গে এ গণনা মিলে না। ঐ ৩৩ শ্লোকের তাৎপর্য্য অতি দুর্গম—সবিস্তারে বুঝাইতে হইল। সপ্তর্ষিমণ্ডল কতকগুলি স্থিরনক্ষত্র, উহার বিলাতী নাম Great Bear বা Ursa Major. মঘা নক্ষত্রও কতকগুলি স্থিরতারা। সকলেই জানেন, স্থিরতারার গতি নাই। তবে বিষুবের একটু সামান্য গতি আছে—ইংরেজ জ্যোতির্ব্বিদেরা তাহাকে বলেন "Precession of the Equinoxes." এই গতি হিন্দুমতে প্রতি বৎসর ৫৪ বিকলা। এক এক নক্ষত্রে ১৩$\frac{১}{৩}$° অংশ। এ হিসাবে কোন স্থিরতারার এক নক্ষত্রপরিভ্রমণ করিতে সহস্র বৎসর লাগে—শত বৎসর নয়। তাহা ছাড়া, সপ্তর্ষিমণ্ডল কখনও মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না। কারণ মঘা নক্ষত্র সিংহরাশিতে। দ্বাদশ রাশি রাশিচক্রের ভিতর। সপ্তর্ষিমণ্ডল রাশিচক্রের বাহিরে। যেমন ইংলণ্ড ভারতবর্ষে কখনও থাকিতে পারে না, তেমনি সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তবে পুরাণকার ঋষি কি গাঁজা খাইয়া এই সকল কথা লিখিয়াছিলেন? এমন কথা আমরা বলিতেছি না, আমরা কেবল ইহাই বলিতেছি যে, এই প্রাচীন উক্তির তাৎপর্য্য আমাদের বোধগম্য নহে। কি ভাবিয়া পুরাণকার লিখিয়াছিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেন্ট্‌লি সাহেব তাহা এইরূপ বুঝিয়াছেন:—

"The notion originated in a contrivance of the astronomers to show the quantity of the precession of the equinoxes: This was by assuming an imaginary line, or great circle, passing through the poles of the ecliptic and the beginning of the fixed Magha, which circle was supposed to cut some of the stars in the Great Bear.*** The seven stars in the Great Bear being ealled the Rishis, the circle so assumed was called the line of the Rishis; and being invariably fixed to the beginning of the lunar asterism Magha, the precession would be noted by stating the degree &c. of any moveable lunar mansion cut by that fixed line or circle as an index."

Historical View of the Hindu Astronomy, p. 65.

এইরূপ গণনা করিয়া বেন্ট্‌লি যুধিষ্ঠিরকে ৫৭৫ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে আনিয়া ফেলিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে যুধিষ্ঠির শাক্যসিংহের অল্প পূর্ব্ববর্ত্তী। আমেরিকার পণ্ডিত Whitney সাহেব বলেন, হিন্দুদিগের জ্যোতিষিক গণনা এত অশুদ্ধ যে, তাহা হইতে কোন কালাবধারণচেষ্টা বৃথা। কিন্তু যে কোন প্রকারে হউক, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কালাবধারণ হইতে পারে, দেখাইতেছি।

প্রথমতঃ পুরাণকার ঋষির অভিপ্রায় অনুসারেই গণনা করা যাউক। তিনি বলেন যে, যুধিষ্ঠিরের সময়ে সপ্তর্ষি মঘায় ছিলেন, নন্দ মহাপদ্মের সময় পূর্ব্বাষাঢ়ায়।

প্রযাস্যন্তি যদা চৈতে পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি। ৪। ২৪। ৩৯

তার পরে, শ্রীমদ্ভাগবতেও ঐ কথা আছে—

যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢ়াং মহর্ষয়ঃ।
তদা নন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি॥ ১২। ২। ৩২

মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়া দশম নক্ষত্র ; যথা—মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া। অতএব যুধিষ্ঠির হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া। অতএব যুধিষ্ঠির হইতে নন্দ ১০ × ১০০= সহস্র বৎসর অন্তর।

এখন, আর এক প্রকার গণনা যাহা সকলেই বুঝিতে পারে, তাহা দেখা যাউক। বিষ্ণুপুরাণের যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার পূর্ব্বশ্লোক এই :—

যাবৎ পরিক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্‌বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥ ৪।২৪। ৩২

নন্দের পুরা নাম নন্দ মহাপদ্ম। বিষ্ণুপুরাণে ঐ ৪ অংশের ২৪ অধ্যায়েই আছে—
"মহাপদ্মঃ তৎপুত্রাশ্চ একবর্ষশতমবনীপতয়ো ভবিষ্যন্তি। নবৈব তান্ নন্দান্ কোটিল্যো ব্রাহ্মণঃ সমুদ্ধরিষ্যতি। তেষামভাবে মৌর্য্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যন্তি। কৌটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তং রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।"

ইহার অর্থ—মহাপদ্ম এবং তাঁহার পুত্রগণ একশতবর্ষ পৃথিবীপতি হইবেন। কৌটিল্য* নামে ব্রাহ্মণ নন্দবংশীয়গণকে উন্মূলিত করিবেন। তাঁহাদের অভাবে মৌর্য্যগণ পৃথিবী ভোগ করিবেন। কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যাভিষিক্ত করিবেন।

তবেই যুধিষ্ঠির হইতে চন্দ্রগুপ্ত ১১১৫ বৎসর। চন্দ্রগুপ্ত অতি বিখ্যাত সম্রাট্—ইনিই মাকিদনীয় যবন আলেক্‌জন্দর ও সিলিউকস্ নৈকটরের সমসাময়িক। ইনি বাহুবলে মাকিদনীয় যবনদিগকে ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত করিয়াছিলেন, এবং প্রবলপ্রতাপ সিলিউকস্‌কে পরাভূত করিয়া তাঁহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার মত দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ তখন কেহই পৃথিবীতে ছিলেন না। কথিত আছে তিনি অকুতোভয়ে আলেক্‌জন্দরের শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আলেক্‌জন্দর ৩২৫ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

চন্দ্রগুপ্ত ৩১৫ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে রাজ্যপ্রাপ্ত হয়েন। অতএব ঐ ৩১৫ অঙ্কের সহিত উপরিলিখিত ১১১৫ যোগ করিলেই যুধিষ্ঠিরের সময় পাওয়া যাইবে। ৩১৫ + ১১১৫= ১৪৩০ খ্রীঃ পূঃ তবে মহাভারতের যুদ্ধের সময়।

অন্যান্য পুরাণেও ঐরূপ কথা আছে। তবে মৎস্য ও বায়ু পুরাণে ১১১৫ স্থানে ১১৫০ লিখিত আছে। তাহা হইলে ১৪৬৫ পাওয়া যায়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ যে ইহার বড় বেশি পূর্ব্বে হয় নাই, বরং কিছু পরেই হইয়াছিল, তাহার এক অখণ্ডনীয় প্রমাণ পাওয়া যায়। সকল প্রমাণ খণ্ডন করা যায়—গণিত জ্যোতিষের প্রমাণ খণ্ডন করা যায় না—"চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ।"

সকলেই জানে যে, বৎসরের দুইটি দিনে দিবারাত্র সমান হয়। সেই দুইটি দিন একের ছয় মাস পরে আর একটি উপস্থিত হয়। উহাকে বিষুব বলে। আকাশের যে

---

* বিখ্যাত চাণক্য

যে স্থানে ঐ দুই দিনে সূর্য্য থাকেন, সেইস্থান দুইটিকে ক্রান্তিপাতবিন্দু (Equinoctial point) বলে। উহার প্রত্যেকটির ঠিক ৯০ অংশ (90 degrees) পরে অয়ন পরিবর্ত্তন হয় (Solstice)। ঐ ৯০ অংশে উপস্থিত হইলে সূর্য্য দক্ষিণায়ন হইতে উত্তরায়ণে বা উত্তরায়ণ হইতে দক্ষিণায়নে যান।

মহাভারতে আছে, ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু। তিনি শরশয্যাশায়ী হইলে বলিয়াছিলেন যে, আমি দক্ষিণায়নে মরিব না, (তাহা হইলে সদ্গতির হানি হয়); অতএব শরশয্যায় শুইয়া উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইলে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রাণত্যাগের পূর্ব্বে ভীষ্ম বলিতেছেন,—

"মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।"

তবে, তখন মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন, এখনও মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হয়, কেন না, ১লা মাঘকে উত্তরায়ণ দিন এবং তৎপূর্ব্বদিনকে মকর-সংক্রান্তি বলে। কিন্তু তাহা আর হয় না। যখন অশ্বিনী নক্ষত্রের প্রথম অংশে ক্রান্তিপাত হইয়াছিল তখন অশ্বিনী প্রথম নক্ষত্র বলিয়া গণিত হইয়াছিল; তখন আশ্বিন মাসে বৎসর আরম্ভ করা হইত, এবং তখনই ১লা মাঘে উত্তরায়ণ হইত। এখনও গণনা সেইরূপ চলিয়া আসিতেছে, এখন ফসলী সন ১লা আশ্বিনে আরম্ভ হয়, কিন্তু এখন আর অশ্বিনী নক্ষত্রে ক্রান্তিপাত হয় না; এবং এখন ১লা মাঘে পূর্ব্বের মত উত্তরায়ণ হয় না। এখন ৭ই পৌষ বা ৮ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর) উত্তরায়ণ হয়। ইহার কারণ এই যে, ক্রান্তিপাতবিন্দুর একটা গতি আছে, ঐ গতিতে ক্রান্তিপাত, সুতরাং আয়নপরিবর্ত্তন-স্থানও, বৎসর বৎসর পিছাইয়া যায়। ইহাই পূর্ব্বকথিত Precession of the Equinoxes—হিন্দুনাম "অয়নচলন"। কত পিছাইয়া যায়, তাহারও পরিমাণ স্থির আছে। হিন্দুরা বলেন, বৎসরে ৫৪ বিকলা, ইহাও পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে সামান্য ভুল আছে। ১৭২ খ্রীঃ-পূর্ব্বাব্দে হিপার্কস্‌নামা গ্রীক জ্যোতির্ব্বিদ্ ক্রান্তিপাত হইতে ১৭৪ অংশে চিত্রা নক্ষত্রকে দেখিয়াছিলেন। মাস্কেলাইন্ ১৮০২ খ্রীঃ অব্দে চিত্রাকে ২০১ অংশে ৪ কলা ৪ বিকলায় দেখিয়াছিলেন। ইহা হইতে হিসাব করিয়া পাওয়া যায়, ক্রান্তিপাতের বার্ষিক গতি সাড়ে পঞ্চাশ বিকলা। বিখ্যাত ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ Leverrier ঐ গতি অন্য কারণ হইতে ৫০·২৪ বিকলা স্থির করিয়াছেন, এবং সর্ব্বশেষে Stockwell গণিয়া ৫০.৪৩৮ বিকলা পাইয়াছেন। এই গণনা প্রথম গণনার সঙ্গে মিলে। অতএব ইহাই গ্রহণ করা যাউক।

ভীষ্মের মৃত্যুকালেও মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, কিন্তু সৌর মাঘের* কোন্ দিনে, তাহা লিখিত নাই। পৌষ মাসে সচরাচর ২৮ কি ২৯ দিন দেখা যায়। এই দুই মাসে ৫৭ দিনের বেশী প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু এমন হইতে পারে না যে, তখন মাঘ মাসের শেষ দিনেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল। কেন না, তাহা হইলে "মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তঃ" কথাটি বলা হইত না। ২৮শে মাঘে উত্তরায়ণ ধরিলেও এখন হইতে ৪৮ দিন তফাৎ। ৪৮ দিনে রবির গতি মোটামুটি ৪৮ অংশ ধরা যাইতে পারে; কিন্তু ইহা ঠিক

* সে কালেও সৌর মাসের নামই প্রচলিত ছিল, ইহা আমি প্রমাণ করিতে পারি। ছয় ঋতুর কথা মহাভারতেই আছে। বার মাস নহিলে ছয় ঋতু হয় না।

বলা যায় না, কেন না, রবির শীঘ্রগতি ও মন্দগতি আছে। ৭ই পৌষ হইতে ২৯শে মাঘ পর্য্যন্ত রবিস্ফুট বাঙ্গালা পঞ্জিকা ধরিয়া গণিলে ৪৪ অংশ ৪ কলা মাত্র গতি পাওয়া যায়। ঐ ৪৪ অংশ ৪ কলা হইলে খ্রীঃ পূঃ ১২৬৩ বৎসর পাওয়া যায়। ৪৮ অংশ পূরা লইলে খ্রীঃ পূঃ ১৫৩০ বৎসর পাওয়া যায়। ইহা কোন মতেই হইতে পারে না যে, ইহার পূর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। বিষ্ণুপরাণ হইতে যে খ্রীঃ পূঃ ১৪৩০ পাওয়া গিয়াছে, তাহাই ঠিক বোধ হয়। ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর আর কেহই বলিবেন না যে, মহাভারতের যুদ্ধ দ্বাপরের শেষে, পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল। তাহা যদি হইত, তবে সৌর চৈত্রে উত্তরায়ণ হইত। চান্দ্র মাঘও কখনও সৌর চৈত্রে হইতে পারে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—পাণ্ডবদিগের ঐতিহাসিকতা
ইউরোপীয় মত

মহাভারতের যুদ্ধকাল সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে আমাদিগের কোন মারাত্মক মতভেদ হইতেছে না। কোলব্রুক্ সাহেব গণনা করিয়াছেন, খ্রীঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। উইল্‌সন সাহেবও সেই মতাবলম্বী। এলফিন্‌ষ্টোন্ তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। উইলফোর্ড সাহেব বলেন, খ্রীঃ পূঃ ১৩৭০ বৎসরে ঐ যুদ্ধ হয়। বুকাননের মত ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। প্রাট সাহেব গণনা করিয়াছেন, খ্রীঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। প্রতিবাদের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। কিন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ইউরোপীয়দিগের মত এই যে, মহাভারত খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। এবং আদিম মহাভারতে পাণ্ডবদিগের কোন কথা ছিল না—ও সব পশ্চাদ্বর্ত্তী কবিদিগের কল্পনা, এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত।

যদি এই দ্বিতীয় কথাটা সত্য হয়, তবে মহাভারত কবে প্রণীত হইয়াছিল, সে কথা মীমাংসার কিছু প্রয়োজন থাকে না। তাহা হইলে, যবেই মহাভারত প্রণীত হউক না কেন—কৃষ্ণঘটিত কথা যাহা কিছু এখন মহাভারতে পাওয়া যায়, সবই মিথ্যা। কেন না, কৃষ্ণঘটিত মহাভারতীয় সমস্ত কথাই প্রায় পাণ্ডবদিগের সঙ্গে সম্বন্ধবিশিষ্ট। অতএব আগে দেখা উচিত যে, এই শেষোক্ত আপত্তির কোন প্রকার ন্যায্যতা আছে কি না।

প্রথমতঃই লাসেন্ সাহেবকে ধরিতে হয়—কেন না, তিনি বড় লব্ধপ্রতিষ্ঠ জর্ম্মান পণ্ডিত। মহাভারত যবেই প্রণীত হউক, তিনি স্বীকার করেন যে, ইহার কিছু ঐতিহাসিকতা আছে। কিন্তু তিনি যেটুকু স্বীকার করেন সেটুকু এই মাত্র যে, মহাভারতে যে যুদ্ধ বর্ণিত আছে, তাহা কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ—পাণ্ডবগণকে অনৈতিহাসিক কবিকল্পনাপ্রসূত বলিয়া উড়াইয়া দেন। বেবর সাহেবও সে মত গ্রহণ করেন। সর মনিয়র উইলিয়ম্‌স্, বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি অনেকেই সেই মতের অবলম্বী। মতটা কি, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইতেছি।

কুরু নামে এক জন রাজা ছিলেন। আমরা পুরাণেতিহাসে শুনি, তদ্বংশীয় রাজগণকে কুরু বা কৌরব বলা যায়। তাঁহাদিগের অধিকৃত দেশবাসিগণকেও ঐ নামে

অভিহিত করা যাইতে পারে। তাহা হইলে কুরু শব্দে কৌরবাধিকৃত জনপদ-বাসীদিগকে বুঝাইল। পাঞ্চালেরা দ্বিতীয় জনপদবাসী। এই অর্থেই পাঞ্চাল শব্দ মহাভারতে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই দুই জনপদ পরস্পর সন্নিহিত। উত্তর পশ্চিমে যে সকল জনপদ ছিল, মহাভারতীয় যুদ্ধের পূর্ব্বে এই দুই জনপদ তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বোধ হয়, এককালে এই দুই জনপদবাসিগণ মিলিতই ছিল। কেন না, কুরু-পাঞ্চাল পদ বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়। পরে তাহাদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। বিরোধের পরিণাম মহাভারতের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে কুরুগণ পাঞ্চাল-গণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিল।

এতদূর পর্য্যন্ত আমরা কোন আপত্তি করি না, এবং এ কথায় আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। বস্তুতঃ কুরুগণের প্রকৃত বিপক্ষগণ পাঞ্চালগণই বটে। মহাভারতে কৌরবদিগের প্রতিযুদ্ধকারী সেনা পাঞ্চাল সেনা, অথবা পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ* বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিল। পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নই সেই সেনার সেনাপতি। পাঞ্চালরাজপুত্র শিখণ্ডীই কৌরবপ্রধান ভীষ্মকে নিপাতিত করেন। পাঞ্চালরাজপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরবাচার্য্য দ্রোণকে নিপাতিত করেন। যদি এ যুদ্ধ প্রধানতঃ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ও পাণ্ডুপুত্রদিগের যুদ্ধ হইত, তাহা হইলে ইহাকে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ কখনই বলিত না, কেন না, পাণ্ডবেরাও কুরু; তাহা হইলে ইহাকে ধার্ত্তরাষ্ট্র-পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ বলিত। ভীষ্ম, এবং কৌরবাচার্য্য দ্রোণ ও কৃপের সঙ্গে ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের যে সম্বন্ধ, পাণ্ডবদিগের সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ, স্নেহও তুল্য। যদি এ যুদ্ধ ধার্ত্তরাষ্ট্র-পাণ্ডবের যুদ্ধ হইত, তবে তাঁহারা কখনই দুর্য্যোধনপক্ষ অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদিগের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইতেন না—কেন না, তাঁহারা ধর্ম্মাত্মা ও ন্যায়পর। কুরুপাঞ্চালের বিরোধ পাণ্ডবগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল, ইহা মহাভারতেই আছে। মহাভারতেই আছে যে, পাণ্ডব ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ প্রভৃতি সকল কৌরব মিলিত এবং দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া পাঞ্চালরাজ্য আক্রমণ করেন। এবং পাঞ্চালরাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার অতিশয় লাঞ্ছনা করেন।

অতএব এই যুদ্ধ যে প্রধানতঃ কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ, স্বীকার করি। স্বীকার করিয়া, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ, যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারি না। তাঁহারা বলেন যে, যুদ্ধটা কুরুপাঞ্চালের, পাণ্ডবেরা কেহ নহেন, পাণ্ডু বা পাণ্ডব কেহ ছিলেন না। এ সিদ্ধান্তের অন্য হেতুও তাঁহারা নির্দ্দেশ করেন। সে সকল হেতুর সমালোচনা আমি পশ্চাৎ করিব। এখন ইহা বুঝাইতে চাই যে, কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ বলিয়া যে পাণ্ডবদিগের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে, ইহা সঙ্গত নহে। পাণ্ডবের শ্বশুর পাঞ্চালাধিপতি ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের উপর আক্রমণ করিলে, পাণ্ডবেরা তাঁহার সহায় হইয়া, তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহাই সম্ভব। পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্তান্ত এই; —কৌরবাধিপতি বিচিত্রবীর্য্যের দুই পুত্র, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু।† ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ, কিন্তু অন্ধ। অন্ধ বলিয়া রাজ্যশাসনে অনধিকারী বা অক্ষম। রাজ্য পাণ্ডুর হস্তগত হইল। পরিশেষে পাণ্ডুকেও রাজ্যচ্যুত ও অরণ্যচারী দেখি—ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য আবার ধৃতরাষ্ট্রের হাতে গেল।

* সৃঞ্জয়েরা পাঞ্চালভুক্ত—তাহাদিগের জ্ঞাতি।

† বিদুর বৈশ্যাজাত।

তাহার পর পাণ্ডুপুত্রেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, রাজ্য পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিল, কাজেই ধৃতরাষ্ট্র ও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ তাঁহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিলেন। তাঁহারা বনে বনে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে পাঞ্চালরাজের কন্যা বিবাহ করিয়া পাঞ্চালদিগের সাহত আত্মীয়তা সংস্থাপন করিলেন। পাঞ্চালরাজের সাহায্যে এবং তাঁহাদিগের মাতুলপুত্র ও প্রবলপ্রতাপ যাদব-দিগের নেতা কৃষ্ণের সাহায্যে তাঁহারা ইন্দ্রপ্রস্থে নূতন রাজ্য সংস্থাপিত করিলেন। পরিশেষে সে রাজ্যও ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের করকবলিত হইল।

পাণ্ডবেরা পুনর্ব্বার বনচারী হইলেন। এই অবস্থায় বিরাটের সঙ্গে সখ্য ও সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। পরে পাঞ্চালেরা কৌরবদিগকে আক্রমণ করিল। পূর্ব্ববৈর প্রতিশোধজন্য এ আক্রমণ, এবং পাণ্ডবদিগের রাজ্যাধিকার উপলক্ষ মাত্র কি না, স্থির করিয়া বলা যায় না। যাই হৌক, পাঞ্চালেরা যুদ্ধে বদ্ধপরিকর হইলে পাণ্ডবেরা তাঁহাদের পক্ষ থাকিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সহিত যুদ্ধ করাই সম্ভব।

বলিয়াছি যে, পাণ্ডব ছিল না, এ সব কথা বলিবার উপরিলিখিত পণ্ডিতেরা অন্য কারণ নির্দ্দেশ করেন। একটি কারণ এই যে, সমসাময়িক কোন গ্রন্থে পাণ্ডব নাম পাওয়া যায় না। উত্তরে হিন্দু বলিতে পারেন, এই মহাভারতই ত সমসাময়িক গ্রন্থ—আবার চাই কি? সে কালে ইতিহাস লেখার প্রথা ছিল না যে, কতকগুলা গ্রন্থে তাঁহাদের নাম পাওয়া যাইবে। তবে ইউরোপীয়েরা বলিতে পারেন যে, শতপথব্রাহ্মণ একখানি অনল্পপরবর্ত্তী গ্রন্থ। তাহাতে ধৃতরাষ্ট্র, পরিক্ষিৎ এবং জনমেজয়ের নাম আছে, কিন্তু পাণ্ডবদিগের নামগন্ধ নাই—কাজেই পাণ্ডবেরাও ছিল না।

এরূপ সিদ্ধান্ত ভারতবর্ষীয় প্রাচীন রাজগণ সম্বন্ধে হইতে পারে না। কোন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে মাকিদনের আলেক্জন্দরের নামগন্ধ নাই—অথচ তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া যে কাণ্ডটা উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা কুরুক্ষেত্রের ন্যায় গুরুতর ব্যাপার। সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি, আলেক্জন্দর নামে কোন ব্যক্তি ছিলেন না, এবং গ্রীক ইতিহাসবেত্তা তদ্বৃত্তান্ত যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কবিকল্পনামাত্র? কোন ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে গজনবী মহম্মদের নামগন্ধ নাই—সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, ইনি মুসলমান লেখক-দিগের কল্পনাপ্রসূত ব্যক্তি মাত্র? বাঙ্গালার সাহিত্যে বখ্‌তিয়ার খিলজির নামমাত্র নাই—সিদ্ধান্ত করিতে হইবে কি যে, ইনি মিন্‌হাজদ্দিনের কল্পনাপ্রসূত মাত্র? যদি তাহা না হয়, তবে একা মিন্‌হাজদ্দিনের বাক্য বিশ্বাসযোগ্য হইল কিসে, আর মহাভারতের কথা অবিশ্বাসযোগ্য কিসে?

বেবর সাহেব বলেন, শতপথব্রাহ্মণে অর্জ্জুন শব্দ আছে, কিন্তু ইহা ইন্দ্রার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—কোন পাণ্ডবকে বুঝায়, এমন অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। এজন্য তিনি বুঝিয়াছেন যে, পাণ্ডব অর্জ্জুন মিথ্যাকল্পনা, ইন্দ্রস্থানে ইনি আদিষ্ট হইয়াছেন মাত্র। এ বুদ্ধির ভিতর প্রবেশ করিতে আমরা অক্ষম। ইন্দ্রার্থে অর্জ্জুন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এজন্য অর্জ্জুন নামে কোন মনুষ্য ছিল না, এ সিদ্ধান্ত বুঝিতে আমরা অক্ষম।

কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলে চলিত, কিন্তু বেবর সাহেব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, বেদ ছাপাইয়াছেন; আর আমরা বাঙ্গালী, তাতে গণ্ডমূর্খ, তাঁহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া বড় ধৃষ্টতার কাজ হয়। তবে, কথাটা একটু বুঝাই। শতপথব্রাহ্মণে, অর্জ্জুন

নাম আছে, ফাল্গুন নামও আছে। যেমন অর্জ্জুন ইন্দ্র ও মধ্যম পাণ্ডব উভয়ের নাম, ফাল্গুনও তেমনই ইন্দ্র ও মধ্যম পাণ্ডব উভয়ের নাম। ইন্দ্রের নাম ফাল্গুন, কেন না, ইন্দ্র ফল্গুনী নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা ;* অর্জ্জুনের নাম ফাল্গুন, কেন না, তিনি ফল্গুনী নক্ষত্রে জন্মিয়াছিলেন। হয়ত ইন্দ্রাধিষ্ঠিত নক্ষত্রে জন্ম বলিয়াই তিনি ইন্দ্রপুত্র বলিয়া খ্যাত ; ইন্দ্রের ঔরসে তাঁহার জন্ম, এ কথা কোন শিক্ষিত পাঠক বিশ্বাস করিবেন না। আবার অর্জ্জুন শব্দে শুক্ল। মেঘদেবতা ইন্দ্রও শুক্ল নহে, মেঘবর্ণ অর্জ্জুনও শুক্লবর্ণ নহে। উভয়ে নির্ম্মলকর্ম্মকারী শুদ্ধ, পবিত্র ; এজন্য উভয়েই অর্জ্জুন। ইন্দ্রের নাম যে অর্জ্জুন, শতপথব্রাহ্মণে সে কথাটা এইরূপে আছে—"অর্জ্জুনো বৈ ইন্দ্রো যদস্য গুহ্যনাম" ; অর্জ্জুন ইন্দ্র ; সেটি ইঁহার গুহ্য নাম। ইহাতে কি বুঝায় না যে, অর্জ্জুন নামে অন্য ব্যক্তি ছিল, তাঁহার মহিমাবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার ঐক্যস্থাপনজন্য, অর্জ্জুনের নাম, ইন্দ্রের একটা লুকানো নাম বলিয়া প্রচারিত করিতেছেন? বেবর সাহেব "গুহ্য" অর্থে "mystic" বুঝিয়া, লোককে বোকা বুঝাইয়াছেন।

আর একটি রহস্যের কথা বলি। কুরচি গাছের নামও অর্জ্জুন। আবার কুরচি গাছের নামও ফাল্গুন। এ গাছের নাম অর্জ্জুন, কেন না, ফুল শাদা ; ইহার নাম ফাল্গুন, কেন না, ইহা ফাল্গুন মাসে ফুটে। এখন আমার বিনীত নিবেদন যে, ইন্দ্রের নামও অর্জ্জুন ও ফাল্গুন বলিয়া আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, কুরচি গাছ নাই, ও কখনও ছিল না? পাঠকেরা সেইরূপ অনুমতি করুন, আমি মহামহোপাধ্যায় Weber সাহেবের জয় গাই।

এই সকল পণ্ডিতেরা বলেন যে, কেবল ললিতবিস্তরে, পাণ্ডবদিগের নাম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে পাণ্ডবেরা পার্ব্বত্য দস্যু মাত্র। আমাদের বিবেচনা, তাহা হইতে এমন বুঝা যায় না যে, পাণ্ডুপুত্র পাণ্ডব পাঁচজন কখন জগতে বর্ত্তমান ছিলেন না। বাঙ্গালা সাহিত্যে "ফিরিঙ্গী" শব্দ যে দুই একখানা গ্রন্থে পাওয়া যায়, সে সকল গ্রন্থে ইহার অর্থ হয়, "Eurasian", নয় "European"—"Frank" শব্দ কোথাও পাওয়া যায় না, বা এ অর্থে "ফিরিঙ্গী" শব্দ কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা হইতে যদি আমরা সিদ্ধ করি যে "Frank" জাতি কখন ছিল না, তাহা হইলে ইউরোপীয় পণ্ডিত ও তাঁহাদের শিষ্যগণ যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আমরাও সেই ভ্রমে পতিত হইব।†

* এখনকার দৈবজ্ঞেরা এ কথা বলেন না, কিন্তু শতপথব্রাহ্মণেই এ কথা আছে। ২ কাণ্ড, ১ অধ্যায়, ২ ব্রাহ্মণ, ১১, দেখ।

† "বৌদ্ধ-গ্রন্থকারেরা পাণ্ডব নামে পর্ব্বতবাসী একটি জাতির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন ; তাহারা উজ্জয়িনী ও কোশলবাসীদের শত্রু ছিল। (Weber's H. I. Literature, 1878, P. 185.) মহাভারতে পাণ্ডবদিগকে হস্তিনাপুরবাসী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থেরও স্থলবিশেষে লিখিত আছে, প্রথমে তাঁহারা হিমালয় পর্ব্বতে থাকিয়া পরিবর্দ্ধিত হন।

এবং পাণ্ডোঃ সুতাঃ পঞ্চ দেবদত্তা মহাবলাঃ।**
** বিবর্দ্ধমানাস্তে তত্র পুণ্যে হৈমবতে গিরৌ॥
আদিপর্ব্ব। ১২৪।২৭-২৯।

এখনও লাসেন সাহেবের মতের সমালোচনা বাকি আছে। তিনি বলেন, কুরু-পাঞ্চালের যুদ্ধ ঐতিহাসিক ব্যাপার ; মহাভারতের ততটুকু ঐতিহাসিকতা আছে। কিন্তু তিনি পাণ্ডব প্রভৃতি নায়কনায়িকাদিগের প্রতি অবিশ্বাসযুক্ত। তিনি বলেন, অর্জ্জুনাদি সব রূপকমাত্র। যথা—অর্জ্জুন শব্দের অর্থ শ্বেতবর্ণ, এজন্য যাহা আলোকময়, তাহাই অর্জ্জুন। যিনি অন্ধকার, তিনি কৃষ্ণ। কৃষ্ণাও তদ্রূপ। পাণ্ডবদিগের অবস্থানকালে যিনি রাজ্যধারণ করিয়াছিলেন, তিনি ধৃতরাষ্ট্র। পঞ্চ পাণ্ডব পাঞ্চালের পাঁচটি জাতি, এবং পাঞ্চালীর সহিত তাঁহাদিগের বিবাহ ঐ পঞ্চ জাতির একীকরণ-সূচক মাত্র। যিনি ভদ্র অর্থাৎ মঙ্গল আনয়ন করেন, তিনি সুভদ্রা। অর্জ্জুনের সঙ্গে যাদবদিগের সৌহার্দ্যই এই সুভদ্রা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি স্বীকার করি, হিন্দুদিগের শাস্ত্রগ্রন্থ সকলে—বেদে, ইতিহাসে, পুরাণে, কাব্যেও রূপকের অতিশয় প্রাবল্য। অনেক রূপক আছে। এই গ্রন্থে আমাদিগকেও অনেক-গুলি রূপকের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া এমন স্বীকার করিতে পারি না যে, হিন্দুশাস্ত্রে যাহা কিছু আছে, সবই রূপক—যে রূপক ছাড়া শাস্ত্র-গ্রন্থে আর কিছুই নাই।

এইরূপে পাণ্ডুর দেব-দত্ত পাঁচটি মহাবল পুত্র *** সেই পবিত্র হিমালয় পর্ব্বতে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকেন।

প্লিনি ও সলিনস্ নামে গ্রীক গ্রন্থকারেরা ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর দিকে বাহ্লীক দেশের উত্তরাংশে সোগ্‌ডিয়েনা দেশের একটি নগরের নাম পাণ্ড্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং সিন্ধু নদীর মুখ সমীপস্থ জাতিবিশেষকেও পাণ্ড্য বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ভূগোলবিৎ টলেমি পাণ্ড্য-নাম লোকবিশেষকে বিতস্তা নদীর সমীপস্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কাত্যায়ন একটি পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিকে পাণ্ডু হইতে পাণ্ড্য শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন।* লক্ষ্মীধর স্বকৃত ষড়্‌ভাষাচন্দ্রিকার মধ্যে কেকয় বাহ্লীকাদি উত্তরদিকৃস্থ কতকগুলি জনপদের সহিত পাণ্ড্য দেশের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং সে সমুদয়কে পিশাচ অর্থাৎ অসভ্য দেশবিশেষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

"পাণ্ড্যকেকয়বাহ্লীক *** এতে পৈশাচদেশাঃ স্যু।"

হরিবংশে দক্ষিণদিকৃস্থ চোল কেরলাদির সহিত পাণ্ড্য দেশের নাম উল্লিখিত আছে। (হরিবংশ, ৩২ অ, ১২৪ শ্লো।) অতএব উহা দক্ষিণাপথের অন্তর্গত পাণ্ড্য দেশ। শ্রীমান্ উইলসন্ বিবেচনা করেন, ঐ জাতীয় লোক প্রথমে সোগ্‌ডিয়েনা দেশের অধিবাসী ছিল ; তথা হইতে ক্রমশঃ ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করে এবং উত্তরোত্তর ঐ সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অধিবাস করিয়া পশ্চাৎ হস্তিনাপুর-বাসী হয়, ও অবশেষে দক্ষিণাপথে গিয়া পাণ্ড্যরাজ্য সংস্থাপন করে। Asiatic Researches, Vol. XV., Pp. 95 and 96.

রাজতরঙ্গিণীর মতে, কাশ্মীর রাজ্যের প্রথম রাজারা কুরুবংশীয়। অতএব তৎপ্রদেশ হইতে পাণ্ডবদের হস্তিনায় আসিয়া উপনিবেশ করা সম্ভব। তাঁহারা মধ্যদেশবাসী

* পাণ্ডোর্ড্যণ্ বক্তব্যঃ—বার্ত্তিক।

আমরা ইহাও জানি যে, সংস্কৃত সাহিত্যে বা শাস্ত্রে যাহা কিছু আছে, তাহা রূপক হউক বা না হউক, রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিতে অনেকেই ভালবাসেন। রামের নামের ভিতর 'রম্' ধাতু পাওয়া, এবং সীতার নামের ভিতর 'সি' ধাতু পাওয়া যায়, এই জন্য রামায়ণ কৃষিকার্য্যের রূপকে পরিণত হইয়াছে। জর্ম্মন্ পণ্ডিতেরা এমনই দুই চারিটা ধাতু আশ্রয় করিয়া ঋগ্বেদের সকল সূক্তগুলিকে সূর্য্য ও মেঘের রূপক করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। চেষ্টা করিলে, বোধ করি, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, তাহা এইরূপে উড়াইয়া দেওয়া যায়। আমাদিগের মনে পড়ে, এক সময় রহস্যচ্ছলে আমরা বিখ্যাত নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রকে এইরূপ রূপক করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম। তোমরা বলিবে, তিনি সে দিনের মানুষ—তাঁহার রাজধানী, রাজপুরী, রাজবংশ, সকলই আজিও বিদ্যমান আছে, তিনিও ইতিহাসে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তাহার উত্তরে বলা যায় যে, কৃষ্ণ অর্থে অন্ধকার, তমোরূপী। কৃষ্ণনগরে অর্থাৎ অন্ধকারপূর্ণ স্থানে তাঁহার রাজধানী। তাঁহার ছয় পুত্র, অর্থাৎ তমোগুণ হইতে ছয় রিপুর উৎপত্তি। একজন বালক পলাসির যুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ রূপক করিয়াছিল যে, পলমাত্র উদ্ভাসিত যে অসি, তাহা ক্লীবগুণযুক্ত ক্লৈব (Clive) কর্ত্তৃক প্রযুক্ত হওয়ায় সুরাজা অর্থাৎ যিনি উত্তম রাজা ছিলেন, তিনি পরাভূত হইয়াছিলেন। অতএব রূপকের অভাব নাই। আর এই বালকরচিত রূপকের সঙ্গে লাসেন্‌রচিত রূপকের বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না। আমরা ইচ্ছা করিলে, 'লস্' ধাতু খোদ লাসেন্ সাহেবের নামের ব্যুৎপত্তি সিদ্ধ করিয়া, তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণা ক্রীড়াকৌতুক বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসলেখক Talboys Wheeler সাহেবেরও একটা মত আছে। যখন হস্তী অশ্ব তলগামী, তখন মেষের জলপরিমাপেচ্ছার প্রতি বেশী শ্রদ্ধা করা যায় না। তিনি বলেন,—হাঁ, ইহার কিছু ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বটে, কিন্তু তাহা অতি সামান্য মাত্র—

"The adventures of the Pandavas in the jungle, and their encounters with Asuras and Rakshasas are all palpable fictions, still they are valuable as traces which have been left in the minds of the people of the primitive wars of the Aryans against the Aborigines."

অথচ কিরূপে পাণ্ডব বলিয়া পরিচিত হইলেন, এই সমস্যা পূরণার্থেই কি পাণ্ডুপুত্র পাণ্ডব বলিয়া ক্রমশঃ একটি জনপ্রবাদ প্রচারিত হইল? তাঁহাদের জন্মবৃত্তান্তঘটিত গোলযোগ প্রসিদ্ধই আছে। লোকেও তাহাতে সংশয় প্রকাশ করিয়াছিল, তাহারও নিদর্শন পাওয়া যায়।

যদা চিরমৃতঃ পাণ্ডু কথং তস্যেতি চাপরে।

আদিপর্ব্ব। ১।১১৭।

অন্য অন্য লোকে বলিল, "বহুকাল অতীত হইল, পাণ্ডু প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; অতএব ইঁহারা কিরূপে তদীয় পুত্র হইতে পারেন?"—ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়, অক্ষয়কুমার দত্ত-প্রণীত, দ্বিতীয় ভাগ, উপক্রমণিকা, ১০৫ পৃঃ। অক্ষয় বাবু সচরাচর ইউরোপীয়দিগের মতের অবলম্বী।

টল্‌বয়স্‌ হুইলর সাহেব সংস্কৃত জানেন না, মহাভারত কখনও পড়েন নাই। তাঁহার অবলম্বন বাবু অবিনাশচন্দ্র ঘোষ নামে কোন ব্যক্তি। তিনি অবিনাশ বাবুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, মূল মহাভারত অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে দেন। অবিনাশ বাবু রহস্য-প্রিয় লোক সন্দেহ নাই, কাশীদাসের মহাভারত হইতে কত দূর অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু হুইলর সাহেব চন্দ্রহাস ও বিষয়ার উপাখ্যান প্রভৃতি সামগ্রী মূল মহাভারতের অংশ বলিয়া পাচার করিয়াছেন। যে বর্ষীয়সী মাণিকপীরের গান শুনিয়া রামায়ণভ্রমে অশ্রুমোচন করিতেছিল, বোধ হয়, সেও এই পণ্ডিতবরের অপেক্ষা উপহাসাস্পদ নহে। ঈদৃশ লেখকের মতের প্রতিবাদ করা পাঠকের সময় বৃথা নষ্ট করা বিবেচনা করি। ফলে, মহাভারতের যে অংশ মৌলিক, তাহার লিখিত বৃত্তান্ত ও পাণ্ডবাদি নায়ক সকল কল্পনাপ্রসূত, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন উপযুক্ত কারণ এ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার সকলই এইরূপ অকিঞ্চিৎকর। সকলগুলির প্রতিবাদ করিবার এ গ্রন্থে স্থান হয় না। মহাভারতের অনেক ভাগ প্রক্ষিপ্ত, ইহা আমি স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু পাণ্ডবাদির সকল কথা প্রক্ষিপ্ত নহে। ইহা প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। তাঁহারা ঐতিহাসিক, ইহা বিবেচনা করিবার কারণ যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি যথেষ্ট না হয়, তবে পরপরিচ্ছেদে আরও কিছু বলিতেছি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—পাণ্ডবদিগের ঐতিহাসিকতা

পাণিনি সূত্র করিয়াছেন,—

মহান্‌ ব্রীহ্যপরাহ্ণগৃষ্টীষ্বাসজাবালভারভারতহৈলিহিলরৌরবপ্রবৃদ্ধেষু। ৬। ২। ৩৮

অর্থাৎ ব্রীহি ইত্যাদি শব্দের পূর্ব্বে মহৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। তাহার মধ্যে একটি শব্দ 'ভারত'। অতএব পাণিনিতে মহাভারত শব্দ পাওয়া গেল। প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থ ভিন্ন আর কোন বস্তু "মহাভারত" নামে কখনও অভিহিত হইয়াছিল, এমন প্রমাণ নাই। Weber সাহেব বলেন, এখানে মহাভারত অর্থে ভরতবংশ। এটা কেবল তাঁহার গায়ের জোর। এমন প্রয়োগ কোথাও নাই।

পুনশ্চ, পাণিনিসূত্র—

"গবিযুধিভ্যাং স্থিরঃ।" ৮।৩।৯৫

গবি ও যুধি শব্দের পর স্থির শব্দের স স্থানে ষ হয়। যথা—গবিষ্ঠিরঃ, যুধিষ্ঠিরঃ।

পুনশ্চ,—

"বহ্বচ ইঞঃ প্রাচ্যভরতেষু।" ২।৪।৬৬

ভরতগোত্রের উদাহরণ "যুধিষ্ঠিরাঃ।"*

পুনশ্চ,—

"স্ত্রিয়ামবন্তিকুন্তিকুরুভ্যশ্চ।" ৪।১।১৭৬

পাওয়া গেল "কুন্তী"।

* উদাহরণটি সিদ্ধান্তকৌমুদীর, ইহা বলা কর্ত্তব্য।

পুনশ্চ,—

"বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্।" ৪।৩।৯৮

অর্থাৎ, বাসুদেব ও অর্জ্জুন শব্দের পর ষষ্ঠ্যর্থে বুন্ হয়।

পুনশ্চ,—

"নভ্রাণ্‌নপান্নবেদানাসত্যানমুচিনকুলনখনপুংসকনক্ষত্রনক্রনাকেষু।" ৬।৩।৭৫

ইহাতে "নকুল" পাওয়া গেল।

দ্রোণপর্ব্বতজীবন্তাদন্যতরস্যাম্। ৪।১।১০৩

"দ্রোণায়ন" শব্দ পাওয়া গেল। ইহাতে অশ্বত্থামা ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। এইরূপ পাঁচটি পাণ্ডবের নামই এবং কুন্তী, দ্রোণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতির নাম পাণিনিসূত্রে পাওয়া যায়।

যদি মহাভারত গ্রন্থের নাম এবং সেই গ্রন্থের নায়কদিগের নাম পাওয়া গেল, তবে পাণিনির সময়েও মহাভারত পাণ্ডবদিগের ইতিহাস। এখন দেখিতে হইবে, পাণিনি কবেকার লোক।

ভারতদ্বেষী Weber সাহেব তাঁহাকেও আধুনিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এখানে তাঁহার মত চলে নাই,—স্বয়ং গোল্ড্‌ষ্টুকর পাণিনির অভ্যুদয়কাল নিণীত করিয়াছেন। তিনি যাহা বলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিবার স্থান এ নহে; কিন্তু বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত তাঁহার গ্রন্থের সারাংশ বাঙ্গালায় সঙ্কলন করিয়াছেন, অতএব না বলিলেও চলিবে। যাঁহারা বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িতে ঘৃণা করেন, তাঁহারা গোল্ডষ্টুকরের গ্রন্থই ইংরাজিতে পড়িতে পারেন। তাঁহার বিচারে পাণিনি অতি প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, এজন্য Weber সাহেব অতিশয় দুঃখিত। তিনি গোল্ডষ্টুকরের প্রতিবাদও করিয়াছেন, এবং লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বলিয়াছেন, জয়পতাকা আমিই উড়াইয়াছি। কিন্তু আর কেহ তাহা বলে না।

গোল্ড্‌ষ্টুকর প্রমাণ করিয়াছেন যে, পাণিনির সূত্র যখন প্রণীত হয়, তখন বুদ্ধদেবের* আবির্ভাব হয় নাই। তবেই পাণিনি অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। কিন্তু কেবল তাহাই নহে, তখন ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ প্রভৃতি বেদাংশ সকলও প্রণীত হয় নাই। ঋক্, যজুঃ, সামসংহিতা ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। আশ্বলায়ন, সাংখ্যায়ন প্রভৃতি অভ্যুদিত হন নাই। মক্ষমূলর বলেন, ব্রাহ্মণ-প্রণয়ন-কাল খ্রীঃ পূঃ সহস্র বৎসর হইতে আরম্ভ। ডাক্তার মার্টিন হোগ বলেন, ঐ শেষ; খ্রীঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আরম্ভ। অতএব পাণিনির সময় খ্রীঃ পূঃ দশম বা একাদশ শতাব্দী বলিলে বেশী বলা হয় না।

Max Muller. Weber, প্রভৃতি অনেকেই এ বিচারে প্রবৃত্ত, কিন্তু কাহারও কথায় গোল্ড্‌ষ্টুকরের মত খণ্ডিত হইতেছে না। অতএব আচার্য্যের এ মত গ্রহণ করা যাইতে পারে। তবে ইহা স্থির যে খ্রীষ্টের সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাদির বৃত্তান্তসংযুক্ত

* মহাভারতে 'বৌদ্ধ' শব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ অংশ যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাও অনায়াসে প্রমাণ করা যাইতে পারে।

মহাভারত গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। এমন প্রচলিত যে, পাণিনিকে মহাভারত ও যুধিষ্ঠিরাদির ব্যুৎপত্তি লিখিতে হইয়াছে। আর ইহাও সম্ভব যে, তাঁহার অনেক পূর্ব্বেই মহাভারত প্রচলিত হইয়াছিল। কেন না, "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্" এই সূত্রে 'বাসুদেবক' ও 'অর্জ্জুনক' শব্দ এই অর্থে পাওয়া যায়, বাসুদেবের উপাসক, অর্জ্জুনের উপাসক। অতএব পাণিনিসূত্রপ্রণয়নের পূর্ব্বেই কৃষ্ণার্জ্জুন দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। অতএব মহাভারতের যুদ্ধের অনল্প পরেই আদিম মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে, তাহার উচ্ছেদ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

এক্ষণে ইহাও বক্তব্য যে, কেবল পাণিনির নয়, আশ্বলায়ন ও সাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রেও মহাভারতের প্রসঙ্গ আছে। অতএব মহাভারতের প্রাচীনতা সম্বন্ধে বড় গোলযোগ করার কাহারও অধিকার নাই।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা

কৃষ্ণের নাম পাণিনির কোন সূত্রে থাক না থাক, তাহাতে আসিয়া যায় না। কেন না, ঋগ্বেদসংহিতায় কৃষ্ণ* শব্দ অনেকবার পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তের ২৩ ঋকে এবং ১১৭ সূক্তের ৭ ঋকে এক কৃষ্ণের নাম আছে। সে কৃষ্ণ কে, তাহা জানিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি বসুদেবনন্দন নহেন। তাহার পর দেখিতে পাই ঋগ্বেদসংহিতার অনেকগুলি সূক্তের ঋষি একজন কৃষ্ণ। তাঁহার কথা পরে বলিতেছি। অথর্ব্বসংহিতায় অসুর কৃষ্ণকেশীর নিধনকারী কৃষ্ণের কথা আছে। তিনি বসুদেবনন্দন সন্দেহ নাই। কেশিনিধনের কথা আমি পশ্চাৎ বলিব।

পাণিনির সূত্রে 'বাসুদেব' নাম আছে—সে সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছি। কৃষ্ণ মহাভারতে বাসুদেব নামে সচরাচর অভিহিত হইয়াছেন। বসুদেবের পুত্র বলিয়াই বাসুদেব নাম নহে, সে কথা স্থানান্তরে বলিব। বসুদেবের পুত্র না হইলেও বাসুদেব নাম হয়। এই মহাভারতেই পাওয়া যায়—পুণ্ড্রাধিপতিরও নাম ছিল বাসুদেব। বসুদেবকে কবি-কল্পনা বলিতে হয়, বল—কিন্তু বাসুদেব কবিকল্পনা নহেন।

ইউরোপীয়দিগের মত এই যে, কৃষ্ণ আদৌ মহাভারতে ছিলেন না, পরে মহাভারতে তাঁহাকে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এরূপ বিবেচনা করিবার যে সকল কারণ তাঁহারা নির্দ্দেশ করেন, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কেহ বলেন, কৃষ্ণকে মহাভারত হইতে উঠাইয়া দিলে মহাভারতের কোন ক্ষতি হয় না। এক হিসাবে নয় বটে। গত ফরাসী-

---

* কৃষ্ণ শব্দ আমি পাণিনির অষ্টাধ্যায় খুঁজিয়া পাই নাই—আছে কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু কৃষ্ণ শব্দ যে পাণিনির পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। কেন না, ঋগ্বেদসংহিতায় কৃষ্ণ শব্দ পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায়। কৃষ্ণনামা বৈদিক ঋষির কথা পশ্চাৎ বলিতেছি। ঋগ্বেদ অষ্টম মণ্ডলে ৯৬ সূক্তে কৃষ্ণনামা একজন অনার্য্য রাজার কথা পাওয়া যায়। এই অনার্য্য কৃষ্ণ অংশুমতী-নদীতীরনিবাসী; সুতরাং ইনি যে বাসুদেব কৃষ্ণ নহেন, তাহা নিশ্চিত। পাঠক ইহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, পাণিনির কোন সূত্রে "কৃষ্ণ" শব্দ থাকিলে তাহা বাসুদেব কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতার প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু পাণিনিসূত্রে "বাসুদেব" নাম যদি পাওয়া যায়, তবে তাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য। ঠিক তাহাই আছে।

প্রুসের যুদ্ধ হইতে মোল্‌টকেকে উঠাইয়া দিলে কোন ক্ষতি হয় না। Gravelotte, Woerth Metz, Sedan, Paris প্রভৃতি রণজয় সবই বজায় থাকে ; কেন না, Moltke হাতে হাতিয়ারে এ সকলের কিছুই করেন নাই। তাঁহার সেনাপতিত্ব তারে তারে বা পত্রে পত্রে নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। মহাভারত হইতে কৃষ্ণকে উঠাইয়া দিলে সেরূপ ক্ষতি হয় না। তাহার বেশী ক্ষতি হয় কি না, এ গ্রন্থ পাঠ করিলেই পাঠক জানিতে পারিবেন।

হুইলর সাহেবেরও এ বিষয়ে একটা মত আছে। তাঁহার যেরূপ পরিচয় দিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, তাঁহার মতে প্রতিবাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তথাপি মতটা কিয়ৎপরিমাণে চলিয়াছে বলিয়া, তাঁহার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলাম। তিনি বলেন, দ্বারকা হস্তিনাপুর হইতে সাত শত ক্রোশ ব্যবধান। কাজেই কৃষ্ণের সঙ্গে পাণ্ডবদিগের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ মহাভারতে কথিত হইয়াছে, তাহা অসম্ভব। কেন অসম্ভব আমরা তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কাজেই উত্তর করিতে পারিলাম না। বাঙ্গালার মুসলমান রাজপুরুষদিগের সঙ্গে দিল্লীর পাঠান মোগল রাজপুরুষদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যিনিই স্মরণ করিবেন, তিনিই বোধ হয়, হুইলর সাহেবের এই অশ্রাব্য কথায় কর্ণপাত করিবেন না।

বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত Bournouf বলেন যে, বৌদ্ধশাস্ত্রে কৃষ্ণ নাম না পাইলে, ঐ শাস্ত্রপ্রচারের উত্তরকালে কৃষ্ণোপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়, বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রের মধ্যে ললিতবিস্তরে কৃষ্ণের নাম আছে। বৌদ্ধশাস্ত্র মধ্যে সূত্রপিটক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। তাহাতেও কৃষ্ণের নাম আছে। ঐ গ্রন্থে কৃষ্ণকে অসুর বলা হইয়াছে। কিন্তু নাস্তিক ও হিন্দুধর্ম্মবিরোধী বৌদ্ধেরা কৃষ্ণকে যে অসুর বিবেচনা করিবে, ইহাও বিচিত্র নয়। আর ইহাও বক্তব্য, বেদাদিতে ইন্দ্রাদি দেবগণকে মধ্যে মধ্যে অসুর বলা হইয়াছে। বৌদ্ধেরা ধর্ম্মের প্রধান শত্রু যে প্রবৃত্তি, তাহার নাম দিয়াছেন "মার"। কৃষ্ণপ্রচারিত অপূর্ব্ব নিষ্কামধর্ম্ম, তৎকৃত সনাতন ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সংস্কার, স্বয়ং কৃষ্ণের উপাসনা বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের প্রধান বিঘ্ন ছিল সন্দেহ নাই। অতএব তাঁহারা কৃষ্ণকেই অনেক সময় মার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

এ সকল কথা থাক। ছান্দোগ্যোপনিষদে একটি কথা আছে ; সেইটি উদ্ধৃত করিতেছি। কথাটি এই—

"তদ্ধৈতদ্‌ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উক্ত্বা, উবাচ। অপিপাস এব স বভূব। সোঽন্তবেলায়ামেতত্রয়ং প্রতিপদ্যেত অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি, প্রাণসংশিতমসীতি।"

ইহার অর্থ। আঙ্গিরসবংশীয় ঘোর (নামে ঋষি) দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া বলিলেন, (শুনিয়া তিনিও পিপাসাশূন্য হইলেন) যে অন্তকালে এই তিনটি কথা অবলম্বন করিবে, "তুমি অক্ষিত, তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাণসংশিত।"

এই ঘোর ঋষির পুত্র কণ্ব*। ঘোরপুত্র কণ্ব ঋগ্বেদের কতকগুলি সূক্তের ঋষি।

* এই কণ্ব শকুন্তলার পালকপিতা কণ্ব নহেন। সে কণ্ব কাশ্যপ ; ঘোরপুত্র কণ্ব আঙ্গিরস।

যথা, প্রথম মণ্ডলে ৩৬ সূক্ত হইতে ৪৩ সূক্ত পর্য্যন্ত ; এবং কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঐ মণ্ডলের ১২শ হইতে ২৩শ পর্য্যন্ত সূক্তের ঋষি। এবং কণ্বের অন্য পুত্র প্রস্কণ্ব ঐ মণ্ডলের ৪৪ হইতে ৫০ পর্য্যন্ত সূক্তের ঋষি। এখন নিরুক্তকার যাস্ক বলেন, "যস্য বাক্যং স ঋষিঃ।" অতএব ঋষিগণ সূক্তের প্রণেতা হউন বা না হউন, বক্তা বটে। অতএব ঘোরের পুত্র এবং পৌত্রগণ ঋগ্বেদের কতকগুলি সূক্তের বক্তা। তাহা যদি হয়, তবে ঘোরশিষ্য কৃষ্ণ তাঁহাদিগের সমসাময়িক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন আগে বেদের সূক্তগুলি উক্ত হইয়াছিল, তাহার পর বেদবিভাগ হইয়াছিল, এ সিদ্ধান্তের কোনও মতেই প্রতিবাদ করা যায় না। অতএব কৃষ্ণ বেদবিভাগকর্ত্তা বেদব্যাসের সমসাময়িক লোক, উপন্যাসের বিষয়মাত্র নহেন, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় করা যায় না।

ঋগ্বেদসংহিতায় অষ্টম মণ্ডলে ৮৫। ৮৬। ৮৭ সূক্ত এবং দশম মণ্ডলের ৪২। ৪৩। ৪৪ সূক্তের ঋষি কৃষ্ণ। এই কৃষ্ণ দেবকীনন্দন কৃষ্ণ কি না, তাহার নির্ণয় করা দুরূহ। কিন্তু কৃষ্ণ ক্ষত্রিয় বলিয়াই বলা যাইতে পারে না যে, তিনি এই সকল সূক্তের ঋষি নহেন ; কেন না, ত্রসদস্যু, ত্র্যরুণ, পুরুমীঢ়, অজমীঢ়, সিন্ধুদ্বীপ, সুদাস, মান্ধাতা, সিবি, প্রতর্দন, কক্ষীবান্ প্রভৃতি রাজর্ষি যাঁহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাও ঋগ্বেদ-সূক্তের ঋষি, ইহা দেখা যায়। দুই এক স্থানে শূদ্র ঋষির উল্লেখও পাওয়া যায়। কবষ নামে দশম মণ্ডলে একজন শূদ্র ঋষি আছেন ; অতএব ক্ষত্রিয় বলিয়া কৃষ্ণের ঋষিত্বে আপত্তি হইতে পারে না। তবে ঋগ্বেদসংহিতার অনুক্রমণিকায় শৌনক·কৃষ্ণ আঙ্গিরস ঋষি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

উপনিষদ্ সকল বেদের শেষভাগ, এইজন্য উপনিষদ্‌কে বেদান্তও বলে। বেদের যে সকল অংশকে ব্রাহ্মণ বলে, তাহা উপনিষদ্ হইতে প্রাচীনতর বলিয়া বোধ হয়। অতএব ছান্দোগ্যোপনিষদ্ হইতে কৌষীতকিব্রাহ্মণ আরও প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। তাহাতেও এই আঙ্গিরস ঘোরের নাম আছে, এবং কৃষ্ণেরও নাম আছে। কৃষ্ণ তথায় দেবকীপুত্র বলিয়া বর্ণিত হয়েন নাই ; আঙ্গিরস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু কতকগুলি ক্ষত্রিয়ও আঙ্গিরস বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তদ্বিষয়ে বিষ্ণুপুরাণে একটি প্রাচীন শ্লোক ধৃত হইয়াছে।

এতে ক্ষত্রপ্রসূতা বৈ পুনশ্চাঙ্গিরসঃ স্মৃতাঃ।
রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষাত্রোপেতো দ্বিজাতয়ঃ ॥—৪ অংশ, ২। ২

কিন্তু এই রথীতর রাজা সূর্য্যবংশীয়। কৃষ্ণের পূর্ব্বপুরুষ যদু, যযাতির পুত্র, কাজেই চন্দ্রবংশীয়। এই কথাই সকল পুরাণেতিহাসে লেখে, কিন্তু হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বে পাওয়া যায় যে, মথুরার যাদবেরা ইক্ষাকুবংশীয়।

এবং ইক্ষাকুবংশাদ্ধি যদুবংশো বিনিঃসৃতঃ।—৯৫ অধ্যায়ে, ৫২৯ শ্লোকঃ।

কথাটা খুব সম্ভব, কেন না, রামায়ণে পাওয়া যায় যে, ইক্ষাকুবংশীয় রামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন মধুরাজয় করিয়াছিলেন।

সে যাহাই হউক, "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাং বুন্" এই সূত্র আমরা পাণিনি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। কৃষ্ণ এত প্রাচীন কালের লোক যে, পাণিনির সময়ে উপাস্য বলিয়া আর্য্য-সমাজে গৃহীত হইয়াছিলেন। ইহাই যথেষ্ট।

নবম পরিচ্ছেদ—মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহার স্থূলমর্ম্ম এই যে, মহাভারতের ঐতিহাসিকতা আছে, এবং মহাভারতে কৃষ্ণপাণ্ডব সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মহাভারতের কৃষ্ণপাণ্ডব সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাই কি ঐতিহাসিক তত্ত্ব?

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা, বা মহাভারতের কথিত কৃষ্ণপাণ্ডবসম্বন্ধীয় বৃত্তান্তের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে ইউরোপীয়গণের যে প্রতিকূল ভাব, তাহার মূলে এই কথা আছে যে, প্রাচীন কালে মহাভারত ছিল বটে, কিন্তু সে এ মহাভারত নহে। ইহার অর্থ যদি এমন বুঝিতে হয় যে, প্রচলিত মহাভারতে সেই প্রাচীন মহাভারতের কিছুই নাই, তাহা হইলে আমরা তাঁহাদের কথা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করি না; এবং এরূপ স্বীকার করি না বলিয়াই, তাঁহাদের কথার এত প্রতিবাদ করিয়াছি। আর তাঁহাদের কথার মর্ম্মার্থ যদি এই হয় যে, সে প্রাচীন মহাভারতের উপর অনেক প্রক্ষিপ্ত উপন্যাসাদি চাপান হইয়াছে, প্রাচীন মহাভারত তাহার ভিতর ডুবিয়া আছে, তবে তাঁহাদের সঙ্গে আমার কোন মতভেদ নাই।

আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি যে, পরবর্ত্তী প্রক্ষিপ্তকারদিগের রচনাবাহুল্যে আদিম মহাভারত প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিকতা যদি কিছু থাকে, তবে সে আদিম মহাভারতের। অতএব বর্ত্তমান মহাভারতের কোন্ অংশ আদিমমহাভারতভুক্ত, তাহাই প্রথমে আমাদের বিচার্য্য বিষয়। তাহাতে কৃষ্ণকথা যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহারই কিছু ঐতিহাসিক মূল্য থাকিলে থাকিতে পারে। তাহাতে যাহা নাই, অন্য গ্রন্থে থাকিলেও, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প। কেন না, মহাভারতই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ।

প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই বলিবেন, মহাভারতের কোন অংশই যে প্রক্ষিপ্ত, তাহারই বা প্রমাণ কি? এই পরিচ্ছেদে তাহার কিছু প্রমাণ দিব।

আদিপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়। মহাভারতে যে যে বিষয় বর্ণিত বা বিবৃত আছে, ঐ পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে তাহার গণনা করা হইয়াছে। উহা এখনকার গ্রন্থের সূচিপত্র বা Table of Contents সদৃশ; অতি ক্ষুদ্র বিষয়ও ঐ পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ের গণনাভুক্ত হইয়াছে। এখন যদি দেখা যায় যে, কোন একটা গুরুতর বিষয় ঐ পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ভুক্ত নহে, তবে অবশ্য বিবেচনা করিতে হইবে যে, উহা প্রক্ষিপ্ত। একটা উদাহরণ দিতেছি। আশ্বমেধিক পর্ব্ব অনুগীতা ও ব্রাহ্মণগীতা পর্ব্বাধ্যায় পাওয়া যায়। এই দুইটি ক্ষুদ্র বিষয় নয়, ইহাতে ছত্রিশ অধ্যায় গিয়াছে। কিন্তু পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে উহার কিছু উল্লেখ নাই, সুতরাং বিবেচনা করিতে হইবে যে, অনুগীতা ও ব্রাহ্মণগীতা সমস্তই প্রক্ষিপ্ত।

২য়,—অনুক্রমণিকাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, মহাভারতের লক্ষ শ্লোক, এবং পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে কোন্ পর্ব্বে কত শ্লোক, তাহা লিখিত হইয়াছে। যথা—

আদি	...	...	...	৮৮৮৪
সভা	...	...	...	২৫১১

বন	...	...	...	১১৬৬৪
বিরাট	...	...	...	২০৫০
উদ্যোগ	...	...	...	৬৬৯৮
ভীষ্ম	...	...	...	৫৮৮৪
দ্রোণ	...	...	...	৮৯০৯
কর্ণ	...	...	...	৪৯৬৪
শল্য	...	...	...	৩২২০
সৌপ্তিক	...	...	...	৮৭০
স্ত্রী	...	...	...	৭৭৫
শান্তি	...	...	...	১৪৭৩২
অনুশাসন	...	...	...	৮০০০
আশ্বমেধিক	...	...	...	৩৩২০
আশ্রমবাসিক	...	...	...	১৫০৬
মৌসল	...	...	...	৩২০
মহাপ্রস্থানিক	...	...	...	৩২০
স্বর্গারোহণ	...	...	...	২০৯

ইহাতে কিন্তু লক্ষ শ্লোক হয় না; মোট ৮৪,৮৩৬ হয়। অতএব লক্ষ শ্লোক পূরাইবার জন্য পর্ব্বাধ্যায়সংগ্রহকার লিখিলেন ;—

"অষ্টাদশৈবমুক্তানি পর্ব্বাণ্যেতান্যশেষতঃ।
খিলেষু হরিবংশঞ্চ ভবিষ্যঞ্চ প্রকীর্ত্তিতম্॥
দশশ্লোকসহস্রাণি বিংশশ্লোকশতানি চ।
খিলেষু হরিবংশে চ সংখ্যাতানি মহর্ষিণা॥"

অর্থাৎ "এইরূপে অষ্টাদশপর্ব্ব সবিস্তারে উক্ত হইয়াছে। ইহার পর হরিবংশ ভবিষ্যপর্ব্ব কথিত হইয়াছে। মহর্ষি হরিবংশে দ্বাদশ সহস্র শ্লোকসংখ্যা করিয়াছেন।" পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে এইটুকু ভিন্ন হরিবংশের আর কোন প্রসঙ্গ নাই। ইহাতে ৯৬,৯৩৬ শ্লোক হইল। এক্ষণে প্রচলিত মহাভারতের শ্লোক গণনা করিয়া নিম্নলিখিত সংখ্যা সকল পাওয়া যায় :—

আদি	...	...	...	৮৪৭৯
সভা	...	...	...	২৭০৯
বন	...	...	...	১৭,৪৭৮
বিরাট	...	...	...	২৩৭৬
উদ্যোগ	...	...	...	৭৬৫৬॥
ভীষ্ম	...	...	...	৫৮৫৬
দ্রোণ	...	...	...	৯৬৪৯
কর্ণ	...	...	...	৫০৪৬
শল্য	...	...	...	৩৬৭৯

সৌপ্তিক	...	...	...	৮১১
স্ত্রী	...	...	...	৮২৭।
শান্তি	...	...	...	১৩,৯৪৩
অনুশাসন	...	...	...	৭৭৯৬
আশ্বমেধিক	...	...	...	২৯০০
আশ্রমবাসিক	...	...	...	১১০৫
মৌসল	...	...	...	২৯২
মহাপ্রস্থানিক	...	...	...	১০৯
স্বর্গারোহণ	...	...	...	৩১২
খিল হরিবংশ	...	...	...	১৬,৩৭৪

মোট ১০৭৩৯০। ইহাতে দেখা যায় যে, প্রথমতঃ মহাভারতে লক্ষ শ্লোক কখনই ছিল না। পর্ব্বসংগ্রহের পর হরিবংশ লইয়া মোটের উপর প্রায় হাজার শ্লোক বাড়িয়াছে, অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

৩য়,—এইরূপ হ্রাসবৃদ্ধির উদাহরণস্বরূপ অনুক্রমণিকাধ্যায়কে গ্রহণ করা যাইতে পারে। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ১০২ শ্লোকে লিখিত আছে যে, ব্যাসদেব সার্দ্ধশত শ্লোকময়ী অনুক্রমণিকা লিখিয়াছেন।

'ততোঽধ্যর্দ্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষিঃ।
অনুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপর্ব্বণাম্ ॥"

এক্ষণে বর্ত্তমান মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ২৭২ শ্লোক পাওয়া যায়। অতএব পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে লিখিত হওয়ার পরে এই অনুক্রমণিকাতেই ১২২ শ্লোক বেশী পাওয়া যায়।

৪র্থ,—পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে ৮৪,৮৩৬ শ্লোক পাওয়া যায়। কিন্তু সহজেই বুঝা যাইতে পারে যে, পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় আদিম মহাভারতকার কর্ত্তৃক সঙ্কলিত নয় এবং আদিম মহাভারত রচিত হইবার সময়েও সঙ্কলিত হয় নাই। মহাভারতেই আছে যে, মহাভারত বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের নিকট কহিয়াছিলেন। তাহাই উগ্রশ্রবাঃ নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণের নিকট কহিতেছেন। পর্ব্বাধ্যায়সংগ্রহকার এই সংগ্রহ উগ্রশ্রবার উক্তি বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। বৈশম্পায়নের উক্তি নহে, কাজেই ইহা আদিম বা বৈশম্পায়নের মহাভারতের অংশ নহে। অনুক্রমণিকাধ্যায়েই আছে যে কেহ কেহ প্রথমাবধি, কেহ বা আস্তীকপর্ব্বাবধি, কেহ বা উপরিচর রাজার উপাখ্যানাবধি মহাভারতের আরম্ভ বিবেচনা করেন। সুতরাং যখন এই মহাভারত উগ্রশ্রবাঃ ঋষিদিগকে শুনাইতেছিলেন, তখনই পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় দূরে থাক, প্রথম ৬২ অধ্যায়, সমস্ত* প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রবাদ ছিল। এই পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় পাঠ করিলেই বিবেচনা করা যায় যে, প্রক্ষিপ্তাংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়াতে ভবিষ্যতে তাহার নিবারণের জন্য এই পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলনপূর্ব্বক অনুক্রমণিকাধ্যায়ের পর কেহ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। অতএব এই পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলিত হইবার পূর্ব্বেও যে অনেক অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাই অনুমেয়।

---

* অবশ্য অনুক্রমণিকাধ্যায়ের ১৫০ শ্লোক ভিন্ন।

৫ম,—ঐ অনুক্রমণিকাধ্যায়ে আছে যে, মহাভারত প্রথমতঃ উপাখ্যান ত্যাগ করিয়া চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকে বিরচিত হয় এবং বেদব্যাস তাহাই প্রথমে স্বীয় পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান।

চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্।
উপাখ্যানৈর্ব্বিনা তাবদ্ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥
ততোঽধ্যর্দ্ধশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কৃতবানৃষি।
অনুক্রমণিকাধ্যায়ং বৃত্তান্তানাং সপর্ব্বণাম্॥
ইদং দ্বৈপায়নঃ পূর্ব্বং পুত্রমধ্যাপয়ং শুকম্।
ততোঽন্যেভ্যোঽনুরূপেভ্যঃ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ বিভুঃ॥—আদিপর্ব্ব, ১০১-১০৩।

শুকদেবের নিকট বৈশম্পায়ন মহাভারতশিক্ষা করিয়াছিলেন। অতএব এই চতুর্ব্বিংশতিসহস্রশ্লোকাত্মক মহাভারতই জনমেজয়ের নিকট পঠিত হইয়াছিল। এবং আদিম মহাভারতে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র মাত্র শ্লোক ছিল। পরে ক্রমে নানা ব্যক্তির রচনা উহাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া মহাভারতের আকার চারিগুণ বাড়িয়াছে। সত্য বটে, ঐ অনুক্রমণিকাতেই লিখিত আছে যে, তাহার পর বেদব্যাস ষষ্টিলক্ষশ্লোকাত্মক মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন, এবং তাহার কিয়দংশ দেবলোকে, কিয়দংশ পিতৃলোকে, কিয়দংশ গন্ধর্ব্বলোকে ও এক লক্ষ মাত্র মনুষ্যলোকে পঠিত হইয়া থাকে। এই অনৈসর্গিক ব্যাপারঘটিত কথাটা যে আদিম অনুক্রমণিকাধ্যায়ের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। দেবলোকে বা পিতৃলোকে বা গন্ধর্ব্বলোকে মহাভারতপাঠ, অথবা বেদব্যাসই হউন বা যেই হউন, ব্যক্তিবিশেষের ষষ্টি লক্ষ শ্লোক রচনা করা আমরা সহজেই অবিশ্বাস করিতে পারি। আমি পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, ২৭২ শ্লোকাত্মক উপক্রমণিকার মধ্যে ১২২ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত। এই ষষ্টি লক্ষ শ্লোক এবং লক্ষ শ্লোকের কথা প্রক্ষিপ্তের অন্তর্গত, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

দশম পরিচ্ছেদ—প্রক্ষিপ্তনির্ব্বাচনপ্রণালী

আমাদিগের বিচার্য্য বিষয় যে, মহাভারতের কোন কোন অংশ প্রক্ষিপ্ত। ইহা পূর্ব্বপরিচ্ছেদে স্থির হইয়াছে। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, এই বিচার সম্পন্ন করিবার কোন উপায় আছে কি না। অর্থাৎ কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত এবং কোন্ অংশ প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহা স্থির করিবার কোন লক্ষণ পাওয়া যায় কি না?

মনুষ্যজীবনে যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়, সকলই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া নির্ব্বাহ করা যায়। তবে বিষয়ভেদে প্রমাণের অল্প বা অধিক বলবত্তা প্রয়োজনীয় হয়। যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা সচরাচর জীবনযাত্রার কার্য্য নির্ব্বাহ করি, তাহার অপেক্ষা গুরুতর প্রমাণ ব্যতীত আদালতে একটা মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হয় না, এবং আদালতে যেরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বিচারক একটা নিষ্পত্তিতে উপস্থিত হইতে পারেন, তাহার অপেক্ষা বলবান্ প্রমাণ ব্যতীত বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন না। এই জন্য বিষয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণশাস্ত্র সৃষ্ট

হইয়াছে। যথা,—আদালতের জন্য প্রমাণসম্বন্ধীয় আইন (Law of Evidence), বিজ্ঞানের জন্য অনুমানতত্ত্ব (Logic বা Inductive Philosophy) এবং ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিরূপণ জন্য এইরূপ একটি প্রমাণশাস্ত্রও আছে। উপস্থিত তত্ত্ব নিরূপণ জন্য সেইরূপ কতকগুলি প্রমাণের নিয়ম সংস্থাপন করা যাইতে পারে ; যথা—

১ম,—আমরা পূর্ব্বে পূর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ের কথা বলিয়াছি। যাহার প্রসঙ্গ সেই পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে নাই, তাহা যে নিশ্চিত প্রক্ষিপ্ত, ইহাও বুঝাইয়াছি। এইটিই আমাদিগের প্রথম সূত্র।

২য়,—অনুক্রমণিকাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, মহাভারতকার ব্যাসদেবই হউন, আর যিনিই হউন, তিনি মহাভারত রচনা করিয়া সার্দ্ধশত শ্লোকময়ী অনুক্রমণিকায় ভারতীয় নিখিল বৃত্তান্তের সার সঙ্কলন করিলেন। ঐ অনুক্রমণিকাধ্যায়ের ৯৩ শ্লোক হইতে ২৫১ শ্লোক পর্য্যন্ত এইরূপ একটি সারসঙ্কলন আছে। যদিও ইহাতে সার্দ্ধশতের অপেক্ষা ৯টি শ্লোক বেশী হইল, তাহা না ধরিলেও চলে। এমনও হইতে পারে যে, ৯টি শ্লোক ইহারই মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এখন এই ১৫৯ শ্লোকের মধ্যে যাহার প্রসঙ্গ না পাইব, তাহা আমরা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে বাধ্য।

৩য়,—যাহা পরস্পর বিরোধী, তাহার মধ্যে একটি অবশ্য প্রক্ষিপ্ত। যদি দেখি যে, কোন ঘটনা দুই বার বা ততোধিক বার বিবৃত হইয়াছে, অথচ দুটি বিবরণ ভিন্নপ্রকার বা পরস্পরবিরোধী, তবে তাহার মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করা উচিত। কোন লেখকই অনর্থক পুনরুক্তি, এবং অনর্থক পুনরুক্তি দ্বারা আত্মবিরোধ উপস্থিত করেন না। অনবধানতা বা অক্ষমতাবশতঃ যে পুনরুক্তি বা আত্মবিরোধ হয়, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহাও অনায়াসে নির্ব্বাচন করা যায়।

৪র্থ,—সুকবিদিগের রচনাপ্রণালীতে প্রায়ই কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকে। মহাভারতের কতকগুলি এমন অংশ আছে যে, তাহার মৌলিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না—কেন না, তাহার অভাবে মহাভারতে মহাভারতত্ব থাকে না, দেখা যায় যে, সেগুলির রচনাপ্রণালী সর্ব্বত্র এক প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট। যদি আর কোন অংশের রচনা এরূপ দেখা যায় যে, সেই সেই লক্ষণ তাহাতে নাই, এবং এমন সকল লক্ষণ আছে যে, তাহা পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ সকলের সঙ্গে অসঙ্গত, তবে সেই অসঙ্গতলক্ষণযুক্ত রচনাকে প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কারণ উপস্থিত হয়।

৫ম,—মহাভারতের কবি একজন শ্রেষ্ঠ কবি, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্ণিত চরিত্রগুলির সর্ব্বাংশ পরস্পর সুসঙ্গত হয়। যদি কোথাও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে। মনে কর, যদি কোন হস্তলিখিত মহাভারতের কাপিতে দেখি যে, স্থানবিশেষে ভীষ্মের পরদারপরায়ণতা বা ভীমের ভীরুতা বর্ণিত হইতেছে, তবে জানিবে যে, ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত।

৬ষ্ঠ,—যাহা অপ্রাসঙ্গিক, তাহা প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে, না হইলেও হইতে পারে। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে যদি পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি লক্ষণের মধ্যে কোন লক্ষণ দেখিতে পাই, তবে তাহা প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কারণ আছে।

৭ম,—যদি দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণের মধ্যে একটিকে তৃতীয় লক্ষণের দ্বারা প্রক্ষিপ্ত

বোধ হয়, যেটি অন্য কোন লক্ষণের অন্তর্গত হইবে, সেইটিকেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে।

এখন এই পর্য্যন্ত বুঝান গেল। নির্ব্বাচনপ্রণালী ক্রমশঃ স্পষ্টতর করা যাইবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ—নির্ব্বাচনের ফল

মহাভারত পুনঃ পুনঃ পড়িয়া এবং উপরিলিখিত প্রণালীর অনুবর্ত্তী হইয়া বিচার-পূর্ব্বক আমি এইটুকু বুঝিয়াছি যে, এই গ্রন্থের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। প্রথম, একটি আদিম কঙ্কাল; তাহাতে পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত এবং আনুষঙ্গিক কৃষ্ণকথা ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহা বড় সংক্ষিপ্ত। বোধ হয়, ইহাই সেই চতুর্ব্বিংশতিসহস্র-শ্লোকাত্মিকা ভারতসংহিতা। তাহার পর আর এক স্তর আছে, তাহা প্রথম স্তর হইতে ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত; অথচ তাহার অংশ সমুদায় এক লক্ষণাক্রান্ত। আমরা দেখিব যে, মহাভারতের কোন কোন অংশের রচনা অতি উদার, বিক্লাতিশূন্য, অতি উচ্চ কবিত্বপূর্ণ। অন্য অংশ অনুদার, কিন্তু পরমার্থিক দার্শনিকতত্ত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত, সুতরাং কাব্যাংশে কিছু বিকৃতিপ্রাপ্ত; কবিত্বশূন্য নহে, কিন্তু যে কবিত্ব আছে, সে কবিত্বের প্রধান অংশ অঘটনঘটনকৌশল, তদ্বিষয়ে সৃষ্টিচাতুর্য্য। প্রথম শ্রেণীর লক্ষণাক্রান্ত যে সকল অংশ, সেগুলি একজনের রচনা; দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট যে সকল রচনা, তাহা দ্বিতীয় ব্যক্তির রচনা বলিয়া বোধ হয়। প্রথম শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশই প্রাথমিক, বা আদিম; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণযুক্ত অংশগুলি পরে রচিত হইয়া, তাহার উপর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। কেন না, প্রথম কথিত অংশ উঠাইয়া লইলে, মহাভারত থাকে না; যাহা থাকে, তাহা কঙ্কালবিচ্যুত-মাংসপিণ্ডের ন্যায় বন্ধনশূন্য এবং প্রয়োজনশূন্য নিরর্থক বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট যাহা, তাহা উঠাইয়া লইলে, মহাভারতের কিছু ক্ষতি হয় না, কেবল কতকগুলি নিষ্প্রয়োজনীয় অলঙ্কার বাদ যায়; পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত অখণ্ড থাকে। অতএব প্রথম শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট অংশগুলিকে আমি প্রথম স্তর, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণবিশিষ্ট রচনাগুলিকে দ্বিতীয় স্তর বিবেচনা করি। প্রথম স্তরে, ও দ্বিতীয় স্তরে, আর একটা গুরুতর প্রভেদ এই দেখিবে যে, প্রথম স্তরে কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বা বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সচরাচর পরিচিত নহেন; নিজে তিনি আপনার দেবত্ব স্বীকার করেন না; এবং মানুষী ভিন্ন দৈবী শক্তি দ্বারা কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করেন না। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরে তিনি স্পষ্টতঃ বিষ্ণুর অবতার বা নারায়ণ বলিয়া পরিচিত এবং অর্চ্চিত; নিজেও নিজের ঈশ্বরত্ব ঘোষিত করেন; কবিও তাঁহার ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষ প্রকারে যত্নশীল।

ইহা ভিন্ন মহাভারতে আরও এক স্তর আছে। তাহাকে তৃতীয় স্তর বলিতেছি।

তৃতীয় স্তর অনেক শতাব্দী ধরিয়া গঠিত হইয়াছে। যে যাহা যখন রচিয়া "বেশ রচিয়াছি" মনে করিয়াছে, সে তাহাই মহাভারতে পূরিয়া দিয়াছে। মহাভারত পঞ্চম বেদ। এ কথার একটি গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। চারি বেদে শূদ্র এবং স্ত্রীলোকের

অধিকার নাই কিন্তু Mass Education লইয়া তর্কবিতর্ক আজ নূতন ইংরেজের আমলে হইতেছে না। অসাধারণ প্রতিভাশালী ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, বিদ্যা ও জ্ঞানে স্ত্রীলোকের ও ইতর লোকের, উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে সমান অধিকার; তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, আপামর সাধারণ সকলেরই শিক্ষা ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই। কিন্তু তাঁহারা আধুনিক হিন্দুদিগের মত প্রতিভাশালী পূর্ব্বপুরুষদিগকে অবজ্ঞা করিতেন না। তাঁহারা "অতীতের সহিত বর্ত্তমানের বিচ্ছেদকে" বড় ভয় করিতেন। পূর্ব্বপুরুষেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, বেদে শূদ্র ও স্ত্রীলোকের অধিকার নাই—ভাল, সে কথা বজায় রাখা যাউক। তাঁহারা ভাবিলেন, যদি এমন কিছু উপায় করা যায় যে, যাহা শিখিবার, তাহা স্ত্রীলোকে ও শূদ্রে বেদ অধ্যয়ন না করিয়াও এক স্থানে পাইবে, তবে সে কথা বজায় রাখিয়া চলা যায়। বরং যাহা সর্ব্বজনমনোহর, এমন সামগ্রীর সঙ্গে যুক্ত হইয়া সর্ব্বলোকের নিকট সে শিক্ষা বড় আদরণীয় হইবে। তিন স্তরে সম্পূর্ণ যে মহাভারত এখন আমরা পড়ি, তাহা ব্রাহ্মণদিগের লোক-শিক্ষার উদ্দেশে অক্ষয় কীর্ত্তি।* কিন্তু এই কারণে ভালমন্দ অনেক কথাই ইহার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছে। শান্তিপর্ব্ব ও অনুশাসনিক পর্ব্বের অধিকাংশ, ভীষ্মপর্ব্বের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পর্ব্বাধ্যায়, বনপর্ব্বের মার্কণ্ডেয়সমস্যা পর্ব্বাধ্যায়, উদ্যোগপর্ব্বের প্রজাগর পর্ব্বাধ্যায়, এই তৃতীয় স্তর-সঞ্চয় কালে রচিত বলিয়া বোধ হয়। পক্ষান্তরে আদিপর্ব্বের শকুন্তলোপাখ্যানের পূর্ব্বের যে অংশ এবং বনপর্ব্বের তীর্থযাত্রা পর্ব্বাধ্যায় প্রভৃতি অপকৃষ্ট অংশও এই স্তর-গত।

এই তিন স্তরের, নিম্ন অর্থাৎ প্রথম স্তরই প্রাচীন, এই জন্যই তাহাই মৌলিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। যাহা সেখানে নাই, তাহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরে দেখিলে, তাহা কবিকল্পিত অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত বলিয়া আমাদিগের পরিত্যাগ করা উচিত।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—অনৈসর্গিক বা অতিপ্রকৃত

এতদূরে আমরা যে কথা পাইলাম, তাহা স্থূলত: এই :—যে সকল গ্রন্থে কৃষ্ণকথা আছে, তাহার মধ্যে মহাভারত সর্ব্বপূর্ব্ববর্ত্তী। তবে, আমাদিগের মধ্যে যে মহাভারত প্রচলিত, তাহার তিন ভাগ প্রক্ষিপ্ত; এক ভাগমাত্র মৌলিক। সেই এক ভাগের কিছু ঐতিহাসিকতা আছে। কিন্তু, সেই ঐতিহাসিকতা কতটুকু?

এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ বলিবেন যে, সে বিচারে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। কেন না, মহাভারত ব্যাসদেবপ্রণীত; ব্যাসদেব মহাভারতের যুদ্ধের সমকালিক ব্যক্তি; মহাভারত সমসাময়িক আখ্যান,—Contemporary History, ইহার মৌলিক অংশ অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য।

এখন যে মহাভারত প্রচলিত, তাহাকে ঠিক সমসাময়িক গ্রন্থ বলিতে পারি না। আদিম মহাভারত ব্যাসদেবের প্রণীত হইতে পারে, কিন্তু আমরা কি তাহা পাইয়াছি?

---

* স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতং।—শ্রীমদ্ভাগবত। ১ স্ক। ৪অ। ২৫।

প্রক্ষিপ্ত বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহা কি ব্যাসদেবের রচনা? যে মহাভারত এখন প্রচলিত, তাহা উগ্রশ্রবাঃ সৌতি নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিদিগের নিকট বলিতেছেন। তিনি বলেন যে, জনমেজয়ের সর্পসত্রে বৈশম্পায়নের নিকট যে মহাভারত শুনিয়াছিলেন,তাহাই তিনি ঋষিদিগের শুনাইবেন। স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে যে, উগ্রশ্রবাঃ সৌতি তাঁহার পিতার কাছেই বৈশম্পায়ন-সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এক্ষণে মহাভারতে ব্যাসের জন্মবৃত্তান্তের পর, ৬৩ অধ্যায়ে, বৈশম্পায়ন কর্ত্তৃকই কথিত হইয়াছে যে—

বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্।
সুমন্তুং জৈমিনিং পৈলং শুকঞ্চৈব স্বমাত্মজম্॥
প্রভুর্ব্বরিষ্ঠো বরদো বৈশম্পায়নমেব চ।
সংহিতাস্তৈঃ পৃথক্‌ত্বেন ভারতস্য প্রকাশিতাঃ॥—আদিপর্ব্ব। ৬৩অ। ৯৫-৯৬।

অর্থাৎ ব্যাসদেব, বেদ এবং পঞ্চম বেদ মহাভারত সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, স্বীয় পুত্র শুক, এবং বৈশম্পায়নকে শিখাইলেন। তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ ভারতসংহিতা প্রকাশিতা করিলেন।"*

তাহা হইলে, প্রচলিত মহাভারত বৈশম্পায়ন প্রণীত ভারতসংহিতা। ইহা জনমেজয়ের সভায় প্রথম প্রচারিত হয়। জনমেজয়, পাণ্ডবদিগের প্রপৌত্র।

সে যাহা হউক, উপস্থিত মহাভারত আমরা বৈশম্পায়নের নিকটও পাইতেছি না। উগ্রশ্রবাঃ বলিতেছেন যে, আমি ইহা বৈশম্পায়নের নিকট পাইয়াছি। অথবা তাঁহার পিতা বৈশম্পায়নের নিকট পাইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার পিতার নিকট পাইয়াছিলেন। উগ্রশ্রবাঃ যাহা বলিতে.ছন, তাহা আমরা আর এক ব্যক্তির নিকট পাইতেছি। সেই ব্যক্তিই বর্ত্তমান মহাভারতের প্রথম অধ্যায়ের প্রণেতা, এবং মহাভারতের অনেক স্থানে তিনিই বক্তা।

তিনি বলিতেছেন, নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষি উপস্থিত; সেখানে উগ্রশ্রবাঃ আসিলেন, এবং ঋষিগণের সঙ্গে উগ্রশ্রবাঃর এই ভারত সম্বন্ধে ও অন্যান্য বিষয়ে যে কথোপকথন হইল, তাহাও তিনি বলিতেছেন।

তবে ইহা স্থির যে, (১) প্রচলিত মহাভারত আদিম বৈয়াসিকী সংহিতা নহে। (২) ইহা বৈশম্পায়ন-সংহিতা বলিয়া পরিচিত, কিন্তু আমরা প্রকৃত বৈশম্পায়ন-সংহিতা পাইয়াছি কি না, তাহা সন্দেহ। তার পর প্রমাণ করিয়াছি যে, (৩) ইহার প্রায় তিন ভাগ প্রক্ষিপ্ত। অতএব আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক যে, মহাভারতকে কৃষ্ণচরিত্রের ভিত্তি করিতে গেলে অতি সাবধান হইয়া এই গ্রন্থের ব্যবহার করিতে হইবে।

সেই সাবধানতার জন্য আবশ্যক যে, যাহা অতিপ্রাকৃত বা অনৈসর্গিক, তাহাতে আমরা বিশ্বাস করিব না।

* জৈমিনিভারতের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার অশ্বমেধ-পর্ব্ব বেবর সাহেব দেখিয়াছেন। আর সকল বিলুপ্ত হইয়াছে। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে আছে—"সুমন্তুজৈমিনিবৈশম্পায়ন-পৈল-সূত্র-ভারত-মহাভারত-ধর্ম্মাচার্য্যাঃ। তাহা হইলে সুমন্তু সূত্রকার, জৈমিনি ভারতকার, বৈশম্পায়ন মহাভারতকার, এবং পৈল ধর্ম্মশাস্ত্রকার।

আমি এমন বলি না যে, আমরা যাহাকে অনৈসর্গিক বলি, তাহা কাজে কাজেই মিথ্যা। আমি জানি যে, এমন অনেক নৈসর্গিক নিয়ম আছে, যাহা আমরা অবগত নহি। যেমন একজন বন্যজাতীয় মনুষ্য, একটা ঘড়ি, কি বৈদ্যুতিক সংবাদতন্ত্রীকে অনৈসর্গিক ব্যাপার মনে করিতে পারে, আমরাও অনেক ঘটনাকে সেইরূপ ভাবি। আপনাদিগের এরূপ অজ্ঞতা স্বীকার করিয়াও বিশেষ প্রমাণ ব্যতীত, কোন অনৈসর্গিক ঘটনায় বিশ্বাস করিতে পারি না। কেন না, আপনার জ্ঞানের অতিরিক্ত কোন ঐশিক নিয়ম প্রমাণ ব্যতীত কাহারও স্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে। যদি তোমাকে কেহ বলে, আমগাছে তাল ফলিতেছে দেখিয়াছি, তোমার তাহা বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। তোমাকে বলিতে হইবে, হয় আমগাছে তাল দেখাও, নয় বুঝাইয়া দাও কি প্রকারে ইহা হইতে পারে। আর যে ব্যক্তি বলিতেছে যে, আমগাছে তাল ফলিয়াছে, সে ব্যক্তি যদি বলে, 'আমি দেখি নাই—শুনিয়াছি', তবে অবিশ্বাসের কারণ আরও গুরুতর হয়। কেন না, এখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া গেল না। মহাভারতও তাই। অতিপ্রকৃতের প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাইতেছি না।

বলিয়াছি যে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলেও অতিপ্রকৃত হঠাৎ বিশ্বাস করা যায় না। নিজে চক্ষে দেখিলেও হঠাৎ বিশ্বাস করা করা যায় না। কেন না, বরং আমাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ভ্রান্তি সম্ভব, তথাপি প্রাকৃতিক নিয়মলঙ্ঘন সম্ভব নহে। বুঝাইয়া দাও যে, যাহাকে অতিপ্রকৃত বলিতেছি, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মসঙ্গত, তবে বুঝিব। বন্য-জাতীয়কে ঘড়ি বা বৈদ্যুতিক সংবাদতন্ত্রী বুঝাইয়া দিলে, সে ইহা অনৈসর্গিক ব্যাপার বলিয়া বিশ্বাস করিবে না।

আর ইহাও বক্তব্য যে, যদি শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করা যায় (আমি তাহা করিয়া থাকি), তাহা হইলে, তাঁহার ইচ্ছায় যে কোন অনৈসর্গিক ব্যাপার সম্পাদিত হইতে পারে না, ইহা বলা যাইতে পারে না। তবে যতক্ষণ না শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়, এবং যতক্ষণ না এমন বিশ্বাস করা যায় যে, তিনি মনুষ্য-দেহ ধারণ করিয়া ঐশী শক্তি দ্বারা তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন করিতেন, ততক্ষণ আমি অনৈসর্গিক ঘটনা তাঁহার ইচ্ছা দ্বারা সিদ্ধ বলিয়া পরিচিত করিতে পারি না বা বিশ্বাস করিতে পারি না।

কেবল তাহাই নহে। যদি স্বীকার করা যায় যে, কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার, তিনি স্বেচ্ছাক্রমে অতিপ্রকৃত ঘটনাও ঘটাইতে পারেন, তাহা হইলেও গোল মিটে না। যাহা তাঁহার দ্বারা সিদ্ধ, তাহাতে যেন বিশ্বাস করিলাম, কিন্তু যাহা তাঁহার সিদ্ধ নহে, এমন সকল অনৈসর্গিক ব্যাপারে বিশ্বাস করিব কেন? সাল্ব অসুর অন্তরীক্ষে সৌভনগর স্থাপিত করিয়া যুদ্ধ করিল; বাণের সহস্র বাহু; অশ্বত্থামা ব্রহ্মশিরা অস্ত্র ত্যাগ করিলে তাহাতে ব্রহ্মাণ্ড দগ্ধ হইতে লাগিল; এবং পরিশেষে অশ্বত্থামার আদেশানুসারে, উত্তরার গর্ভস্থ বালককে গর্ভমধ্যে নিহত করিল, ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাস করিব কেন?

তার পর কৃষ্ণের নিজ-কৃত অনৈসর্গিক কর্ম্মেও অবিশ্বাস করিবার কারণ আছে। তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করিলেও অবিশ্বাস করিবার কারণ আছে। তিনি

মানবশরীর ধারণ করিয়া যদি কোন অনৈসর্গিক কর্ম্ম করেন, তবে তাহা তাঁহার দৈবী বা ঐশী শক্তির দ্বারা। কিন্তু দৈবী বা ঐশী শক্তি দ্বারা যদি কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন, তবে তাঁহার মানব-শরীরধারণের প্রয়োজন কি? যিনি সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বশক্তিমান্, ইচ্ছাময়—যাঁহার ইচ্ছায় এই সমস্ত জীবের সৃষ্টি ও ধ্বংস হইয়া থাকে, তিনি মনুষ্যশরীর ধারণ না করিয়াও কেবল তাঁহার ঐশী শক্তির প্রয়োগের দ্বারা, যে কোন অসুরের বা মানুষের সংহার বা অন্য যে কোন অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। যদি দৈবী শক্তি দ্বারা বা ঐশী শক্তি দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, তবে তাঁহার মনুষ্যশরীর-ধারণের প্রয়োজন নাই। যদি ইচ্ছাময় ইচ্ছাপূর্ব্বক মনুষ্যের শরীর ধারণ করেন, তবে দৈবী বা ঐশী শক্তির প্রয়োগ তাঁহার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রেত হইতে পারে না।

তবে শরীরধারণের প্রয়োজন কি? এমন কোন কর্ম্ম আছে কি যে, জগদীশ্বর শরীরধারণ না করিলে সিদ্ধ হয় না?

ইহার উত্তরের প্রথমে এই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, জগদীশ্বরের মানবশরীরধারণ কি সম্ভব?

প্রথমে ইহার মীমাংসা করা যাইতেছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব?

বস্তুতঃ কৃষ্ণচরিত্রের আলোচনার প্রথমেই কাহারও কাহারও কাছে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় যে, ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া কি সম্ভব? এ দেশের লোকের বিশ্বাস, কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। শিক্ষিতের বিশ্বাস যে, কথাটা অতিশয় অবৈজ্ঞানিক, এবং আমাদিগের খ্রীষ্টান উপদেশকদিগের মতে অতিশয় উপহাসের যোগ্য বিষয়।

এখানে একটা নহে, দুইটি প্রশ্ন হইতে পারে—(১) ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব কি না, (২) তাহা হইলে কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার কি না। আমি এই দ্বিতীয় প্রশ্নের কোন উত্তর দিব না। প্রথম প্রশ্নের কিছু উত্তর দিতে ইচ্ছা করি।

সৌভাগ্যক্রমে আমাদিগের খ্রীষ্টীয়ান গুরুদিগের সঙ্গে আমাদিগের এই স্থূল কথা লইয়া মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহাদিগকে ঈশ্বরের অবতার সম্ভব বলিয়া মানিতে হয়, নহিলে যিশু টিকেন না। আমাদিগের প্রধান বিবাদ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে।

ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকে এই আপত্তি করিবেন, যেখানে আদৌ ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, সেখানে আবার ঈশ্বরের অবতার কি? যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, আমরা তাঁহাদিগের সঙ্গে কোন বিচার করি না। তাঁহাদের ঘৃণা করিয়া বিচার করি না, এমত নহে। তবে জানা আছে যে, এ বিচারে কোন পক্ষের উপকার হয় না। তাঁহারা আমাদের ঘৃণা করেন, তাহাতে আপত্তি নাই।

তাহার পর আর কতকগুলি লোক আছেন যে, তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহারা বলিবেন, ঈশ্বর নিগুর্ণ। সগুণেরই অবতার সম্ভব। ঈশ্বর নিগুর্ণ, সুতরাং তাঁহার অবতার অসম্ভব।

এ আপত্তিরও আমাকে বড় সোজা উত্তর দিতে হয়। নির্গুণ ঈশ্বর কি, তাহা আমি বুঝিতে পারি না, সুতরাং এ আপত্তির মীমাংসা করিতে সক্ষম নহি। আমি জানি যে, বিস্তর পণ্ডিত ও ভাবুক ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিয়াই মানেন। আমি পণ্ডিতও নহি, ভাবুকও নহি, কিন্তু আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, এই ভাবুক পণ্ডিতগণও আমার মত, নির্গুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারেন না, কেন না, মনুষ্যের এমন কোন চিত্তবৃত্তি নাই, যদ্দ্বারা আমরা নির্গুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারি। ঈশ্বর নির্গুণ হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমরা নির্গুণ বুঝিতে পারি না, কেন না, আমাদের সে শক্তি নাই।* মুখে বলিতে পারি বটে যে, ঈশ্বর নির্গুণ, এবং এই কথার উপর একটা দর্শনশাস্ত্র গড়িতে পারি, কিন্তু যাহা কথায় বলিতে পারি, তাহা যে মনে বুঝি, ইহা অনিশ্চিত। "চতুষ্কোণ গোলক" বলিলে আমাদের রসনা বিদীর্ণ হয় না বটে, কিন্তু "চতুষ্কোণ গোলক" মানে ত কিছুই বুঝিলাম না। তাই হর্বর্ট স্পেন্সর এত কাল পরে নির্গুণ ঈশ্বর ছাড়িয়া দিয়া সগুণেরও অপেক্ষা যে সগুণ ঈশ্বর ("Something higher than personality") তাহাতে আসিয়া পড়িয়াছেন। অতএব আইস, আমরাও নির্গুণ ঈশ্বরের কথা ছাড়িয়া দিই। ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিলে স্রষ্টা, বিধাতা, পাতা, ত্রাণকর্ত্তা কাহাকেও পাই না। এমন ঝক্‌মারিতে কাজ কি?

যাঁহারা সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করেন, তাঁহাদেরও ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা স্বীকার পক্ষে অনেকগুলি আপত্তি আছে। এক আপত্তি এই যে, ঈশ্বর সগুণ হউন, কিন্তু নিরাকার। যিনি নিরাকার, তিনি আকার ধারণ করিবেন কি প্রকারে?

উত্তরে, জিজ্ঞাসা করি, যিনি ইচ্ছাময় এবং সর্ব্বশক্তিমান্‌, তিনি ইচ্ছা করিলে নিরাকার হইলেও আকার ধারণ করিতে পারেন না কেন? তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার এ সীমানির্দ্দেশ কর কেন? তবে কি তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্‌ বলিতে চাও না? যিনি এই জড় জগৎকে আকার প্রদান করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে নিজে আকার গ্রহণ করিতে পারেন না কেন?

যাঁহারা এ আপত্তি না করেন, তাঁহারা বলিতে পারেন ও বলেন যে, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্‌, তাঁহার জগৎ-শাসনের জন্য, জগতের হিত জন্য, মনুষ্যকলেবর ধারণ করিবার প্রয়োজন কি? যিনি ইচ্ছাক্রমেই কোটি কোটি বিশ্ব সৃষ্ট ও বিধ্বস্ত করিতেছেন, রাবণ কুম্ভকর্ণ কি কংস শিশুপাল-বধের জন্য তাঁহাকে নিজে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, বালক হইয়া মাতৃস্তন্য পান করিতে হইবে, ক, খ, গ, ঘ শিখিয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে হইবে, তাহার পর দীর্ঘ মনুষ্য জীবনের অপার দুঃখ ভোগ করিয়া শেষে স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়া, আহত বা কখন পরাজিত হইয়া, বহ্বায়াসে দুরাত্মাদের বধসাধন করিতে হইবে, ইহা অতি অশ্রদ্ধেয় কথা।

যাঁহারা এইরূপ আপত্তি করেন, তাঁহাদের মনের ভিতর এমনি একটা কথা আছে যে, এই মনুষ্য-জন্মের যে সকল দুঃখ—গর্ভে অবস্থান, জন্ম, স্তন্যপান, শৈশব,

* "Our conception of the Deity is then bounded by the conditions which bound all human knowledge and therefore we cannot represent the Deity as he is, but as he appears to us."—Mansel, Metaphysics, P. 384.

শিক্ষা, জয়, পরাজয়, জরা, মরণ, এ সকলে আমরাও যেমন কষ্ট পাই, ঈশ্বরও বুঝি সেইরূপ। তাঁহাদিগের স্থূল বুদ্ধিতে এটুকু আসে না যে, তিনি সুখদুঃখের অতীত,—তাঁহার কিছুতেই দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। জগতের সৃজন, পালন, লয়, যেমন তাহার লীলা (Manifestation), এ সকল তেমনি তাঁহার লীলামাত্র হইতে পারে। তুমি বলিতেছ, তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে যাহাদিগকে ইচ্ছাক্রমে সংহার করিতে পারেন, তাহাদের ধ্বংসের জন্য তিনি মনুষ্য-জীবন-পরিমিত কাল ব্যাপিয়া আয়াস পাইবেন কেন? তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে, যাঁহার কাছে অনন্ত কালও পলক মাত্র, তাঁহার কাছে মুহূর্ত্তে ও মনুষ্য জীবন-পরিমিত কালে প্রভেদ কি?

তবে এই যে অসুরবধ কথাটা আমরা বিষ্ণুর অবতার সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে পুরাণাদিতে শুনিয়া আসিতেছি, এ কথা শুনিয়া অনেকের সম্বন্ধে অনাস্থা হইতে পারে বটে। কেবল কংস বা শিশুপাল মারিবার জন্য যে স্বয়ং ঈশ্বরকে ভূতলে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, ইহা অসম্ভব কথা বটে। যিনি অনন্তশক্তিমান্, তাঁহার কাছে কংস শিশুপালও যে, এক ক্ষুদ্র পতঙ্গও সে। বাস্তবিক যাহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারে, তাহারাই মনে করে যে, অবতারের উদ্দেশ্য দৈত্য বা দুরাত্মাবিশেষের নিধন। আসল কথাটা, ভগবদ্গীতায় অতি সংক্ষেপে বলা হইতেছে;—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

এ কথাটা অতি সংক্ষিপ্ত। "ধর্ম্মসংরক্ষণ" কি কেবল দুই একটা দুরাত্মা ব করিলেই হয়? ধর্ম্ম কি? তাহার সংরক্ষণ কি কি প্রকারে হইতে পারে?

আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম অনুশীলনসাপেক্ষ, এবং অনুশীলন কর্ম্মসাপেক্ষ।* অতএব কর্ম্মই ধর্ম্মের প্রধান উপায়। এই কর্ম্মকে স্বধর্ম্মপালন (Duty) বলা যায়।

মনুষ্য কতকটা নিজ রক্ষা, ও বৃত্তি সকলের বশীভূত হইয়া স্বতঃই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যে কর্ম্মের দ্বারা সকল বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতা ঘটে, তাহা দুরূহ। যাহা দুরূহ, তাহার শিক্ষা কেবল উপদেশে হয় না—আদর্শ চাই। সম্পূর্ণ ধর্ম্মের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্তু নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। কেন না, তিনি প্রথমতঃ অশরীরী, শারীরিকবৃত্তিশূন্য; আমরা শরীরী, শারীরিক বৃত্তি আমাদের ধর্ম্মের প্রধান বিঘ্ন। দ্বিতীয়তঃ তিনি অনন্ত, আমরা সান্ত, অতি ক্ষুদ্র। অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্ম্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন। মনুষ্য কর্ম্ম জানে না; কর্ম্ম কিরূপে করিলে ধর্ম্মে পরিণত হয়, তাহা জানে না; ঈশ্বর স্বয়ং অবতার হইলে সেই শিক্ষা হইবার বেশী সম্ভাবনা। এমত স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া শরীর ধারণ করিবেন, ইহার অসম্ভাবনা কি?

---

* মৎকৃত এই ধর্ম্মের ব্যাখ্যা ধর্ম্মতত্ত্বে দেখ।

এ কথা আমি গড়িয়া বলিতেছি না। ভগবদ্গীতায় ভগবদুক্তির তাৎপর্য্যও এই প্রকার।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ১৯।
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০।
যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১।
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২।
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩।
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪। গীতা, ৩ অ।

"পুরুষ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মোক্ষলাভ করেন; অতএব তুমি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর, জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তিরা তাহা করিয়া থাকে, এবং তিনি যাহা মান্য করেন, তাহারা তাহারই অনুষ্ঠান অনুবর্ত্তী হয়। অতএব তুমি লোকদিগের ধর্ম্ম রক্ষণার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান কর। দেখ, ত্রিভুবনে আমার কিছুই অপ্রাপ্য নাই, সুতরাং আমার কোন প্রকার কর্ত্তব্যও নাই, তথাপি আমি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি।* যদি আমি আলস্যহীন হইয়া কখন কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে, সমুদায় লোকে আমার অনুবর্ত্তী হইবে, অতএব আমি কর্ম্ম না করিলে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে, এবং আমি বর্ণসঙ্কর ও প্রজাগণের মলিনতার হেতু হইব।"—কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

সেশ্বর বৈজ্ঞানিকদিগের শেষ ও প্রধান আপত্তির কথা এখনও বলি নাই তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর আছেন সত্য, এবং তিনি স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, ইহাও সত্য। কিন্তু তিনি গাড়ীর কোচম্যানের মত স্বহস্তে রাশ ধরিয়া বা নৌকার কর্ণধারের মত স্বহস্তে হাল ধরিয়া এই বিশ্বসংসার চালান না। তিনি কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, জগৎ তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছে। এই নিয়মগুলি অচলও বটে, এবং জগতের স্থিতিপক্ষে যথেষ্টও বটে। অতএব ইহার মধ্যে ঈশ্বরের স্বয়ং হস্তক্ষেপণ করিবার স্থানও নাই, প্রয়োজনও নাই। সুতরাং ঈশ্বর মানব-দেহ ধারণ করিয়া যে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন, ইহা অশ্রদ্ধেয় কথা।

ঈশ্বর যে কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, জগৎ তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া চলে, এ কথা মানি। সেইগুলি জগতের রক্ষা ও পালন পক্ষে

* কৃষ্ণ অর্থাৎ যিনি শরীরধারী ঈশ্বর, তিনি এই কথা বলিতেছেন।

যথেষ্ট, এ কথাও মানি। কিন্তু সেগুলি আছে বলিয়া যে ঈশ্বরের নিজের কোন কাজের স্থান ও প্রয়োজন নাই, এ কথা কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, বুঝিতে পারি না। জগতের কিছুই এমন উন্নত অবস্থায় নাই যে, যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি ইচ্ছা করিলেও তাহার আর উন্নতি হইতে পারে না। জাগতিক ব্যাপারে আলোচনা করিয়া, বিজ্ঞানশাস্ত্রের সাহায্যে ইহাই বুঝিতে পারি যে, জগৎ ক্রমে অসম্পূর্ণ ও অপরিণতাবস্থা হইতে সম্পূর্ণ ও পরিণতাবস্থায় আসিতেছে। ইহাই জগতের গতি এবং এই গতিই জগৎকর্ত্তার অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয়। তার পর, জগতের বর্ত্তমান অবস্থাতে এমন কিছু দেখি না যে, তাহা হইতে বিবেচনা করিতে পারি যে, জগৎ চরম উন্নতিতে পৌঁছিয়াছে। এখন জীবের সুখের অনেক বাকি আছে, উন্নতির বাকি আছে। যদি তাই বাকি আছে, তবে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপণের বা কার্য্যের স্থান বা প্রয়োজন নাই কেন? সৃজন, রক্ষা, পালন, ধ্বংস ভিন্ন জগতের আর একটা নৈসর্গিক কার্য্য আছে,—উন্নতি। মনুষ্যের উন্নতির মূল, ধর্ম্মের উন্নতি। ধর্ম্মের উন্নতিও ঐশিক নিয়মে সাধিত হইতে পারে, ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু কেবল নিয়মফলে যত দূর তাহার উন্নতি হইতে পারে, ঈশ্বর কোন কালে স্বয়ং অবতীর্ণ হইলে তাহার অধিক উন্নতি সিদ্ধ হইতে পারে না, এমত বুঝিতে পারি না। এবং এরূপ অধিক উন্নতি যে তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তাহাই বা কি প্রকারে বলিব?

আপত্তিকারকেরা বলেন যে, নৈসর্গিক যে সকল নিয়ম, তাহা ঈশ্বরকৃত হইলেও তাহা অতিক্রমপূর্ব্বক জগতে কোন কাজ হইতে দেখা যায় নাই। এজন্য এ সকল অতিপ্রকৃত ক্রিয়া (Miracle) মানিতে পারি না। ইহার ন্যায্যতা স্বীকার করি; তাহার কারণও পূর্ব্বপরিচ্ছেদে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি। আমাকে ইহাও বলিতে হয় যে, এরূপ অনেক ঈশ্বরাবতারের প্রবাদ আছে যে, তাহাতে অবতার অতিপ্রকৃতের সাহায্যেই স্বকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। খ্রীষ্ট অবতারের এরূপ অনেক কথা আছে। কিন্তু খ্রীষ্টের পক্ষসমর্থনের ভার খ্রীষ্টানদিগের উপরই থাকুক। আরও, বিষ্ণুর অবতারের মধ্যে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতির এইরূপ কার্য্য ভিন্ন অবতারের উপাদান আর কিছুই নাই। এখন, বুদ্ধিমান্ পাঠককে ইহা বলা বাহুল্য যে, মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি উপন্যাসের বিষয়ীভূত পশুগণের, ঈশ্বরাবতারত্বের যথার্থ দাবি দাওয়া কিছুই নাই। গ্রন্থান্তরে দেখাইব যে, বিষ্ণুর দশ অবতারের কথাটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এবং সম্পূর্ণরূপে উপন্যাস-মূলক। সেই উপন্যাসগুলিও কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহাও দেখাইব। সত্য বটে, এই সকল অবতার পুরাণে কীর্ত্তিত আছে, কিন্তু পুরাণে যে অনেক অলীক উপন্যাস স্থান পাইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। প্রকৃত বিচারে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কাহাকেও ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

কৃষ্ণের যে বৃত্তান্তটুকু মৌলিক, তাহার ভিতর অতিপ্রকৃতের কোন সহায়তা নাই। মহাভারত ও পুরাণসকল, প্রক্ষিপ্ত ও আধুনিক নিষ্কর্ম্মা ব্রাহ্মণদিগের নিরর্থক রচনায় পরিপূর্ণ, এজন্য অনেক স্থলে কৃষ্ণের অতিপ্রকৃতের সাহায্য গ্রহণ করা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, সেগুলি মূল গ্রন্থের কোন অংশ নহে।

আমি ক্রমে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইব, এবং যাহা বলিতেছি, তাহা সপ্রমাণ করিব। দেখাইব যে, কৃষ্ণ অতিপ্রকৃত কার্য্যের দ্বারা, বা নৈসর্গিক নিয়মের বিলঙ্ঘন দ্বারা, কোন কার্য্য সম্পন্ন করেন নাই। অতএব সে আপত্তি কৃষ্ণ সম্বন্ধে খাটিবে না।

আমরা যাহা বলিলাম, কেবল তাহা আমাদের মত, এমন নহে। পুরাণকার ঋষিদিগেরও সেই মত, তবে লোকপরম্পরাগত কিম্বদন্তীর সত্যমিথ্যানির্ব্বাচন-পদ্ধতি সে কালে ছিল না বলিয়া অনেক অনৈসর্গিক ঘটনা পুরাণেতিহাসভুক্ত হইয়াছে।

বিষ্ণুপুরাণে আছে,—

মনুষ্যধর্ম্মশীলস্য লীলা সা জগতঃ পতেঃ।
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি যদরাতিষু মুঞ্চতি॥
মনসৈব জগৎসৃষ্টিং সংহারঞ্চ করোতি যঃ।
তস্যারিপক্ষক্ষপণে কোঽয়মুদ্যমবিস্তরঃ॥
তথাপি যো মনুষ্যাণাং ধর্ম্মস্তমনুবর্ত্ততে।
কুর্ব্বন্ বলবতা সন্ধিং হীনৈর্যুদ্ধং করোত্যসৌ॥
সাম চোপপ্রদানঞ্চ তথা ভেদং প্রদর্শয়ন্।
করোতি দণ্ডপাতঞ্চ কচিদেব পলায়নম্॥
মনুষ্যদেহিনাং চেষ্টামিত্যেবমনুবর্ত্ততঃ।
লীলা জগৎপতেস্তস্য ছন্দতঃ সংপ্রবর্ত্ততে॥—৫ অংশ, ২২ অধ্যায়, ১৪-১৮

"জগৎপতি হইয়াও যে তিনি শত্রুদিগের প্রতি অনেক অস্ত্রনিক্ষেপ করিলেন, ইহা তিনি মনুষ্যধর্ম্মশীল বলিয়া তাঁহার লীলা। নহিলে যিনি মনের দ্বারাই জগতের সৃষ্টি ও সংহার করেন, অরিক্ষয় জন্য তাঁহার বিস্তর উদ্যম কেন? তিনি মনুষ্যদিগের ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী, এজন্য তিনি বলবানের সঙ্গে সন্ধি এবং হীনবলের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, সাম, দান, ভেদ প্রদর্শনপূর্ব্বক দণ্ডপাত করেন, কখনও পলায়নও করেন। মনুষ্যদেহীদিগের ক্রিয়ার অনুবর্ত্তী সেই জগৎপতির এইরূপ লীলা তাঁহার ইচ্ছানুসারে ঘটিয়াছিল।"

আমি ঠিক এই কথাই বলিতেছিলাম। ভরসা করি, ইহার পর কোন পাঠক বিশ্বাস করিবেন না যে, কৃষ্ণ মনুষ্যদেহে অতিমানুষশক্তির দ্বারা কোন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।*

অতএব বিচারের তৃতীয় নিয়ম সংস্থাপিত হইল।

বিচারের নিয়ম তিনটি পুনর্ব্বার স্মরণ করাই;—

১। যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণ করিব, তাহা পরিত্যাগ করিব।

২। যাহা অতিপ্রকৃত, তাহা পরিত্যাগ করিব।

৩। যাহা প্রক্ষিপ্ত নয়, বা অতিপ্রকৃত নয়, তাহা যদি অন্য প্রকারে মিথ্যার লক্ষণযুক্ত দেখি, তবে তাহাও পরিত্যাগ করিব।

*"It is true that in the Epic poems Rama and Krishna appear as incarnations of Vishnu, but they at the same time come before us as human heroes, and these two characters (the divine and the human) are so far from being inseparably blended together, that both of

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ—পুরাণ

মহাভারতের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তার পর পুরাণ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে।

পুরাণ সম্বন্ধেও দুই রকম ভ্রম আছে,—দেশী ও বিলাতী। দেশী ভ্রম এই যে, সমস্ত পুরাণগুলিই এক ব্যক্তির রচনা। বিলাতী ভ্রম এই যে, এক একখানি পুরাণ এক ব্যক্তির রচনা। আগে দেশী কথাটার সমালোচনা করা যাউক।

অষ্টাদশ পুরাণ যে এক ব্যক্তির রচিত নহে, তাহার কতকগুলি প্রমাণ দিতেছি ;—

১ম,—এক ব্যক্তি এক প্রকার রচনাই করিয়া থাকে। যেমন এক ব্যক্তির হাতের লেখা পাঁচ রকম হয় না, তেমনই এক ব্যক্তির রচনার গঠন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয় না। কিন্তু এই অষ্টাদশ পুরাণের রচনা আঠার রকম। কখনও তাহা এক ব্যক্তির রচনা নহে। যিনি বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতপুরাণ পাঠ করিয়া বলিবেন, দুইই একই ব্যক্তির রচনা হইতে পারে, তাঁহার নিকট কোন প্রকার প্রমাণ প্রয়োগ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

২য়,—এক ব্যক্তি এক বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ লেখে না। যে অনেকগুলি গ্রন্থ লেখে, সে এক বিষয়ই পুনঃ পুনঃ গ্রন্থ হইতে গ্রন্থান্তরে বর্ণিত বা বিবৃত করিবার জন্য গ্রন্থ লেখে না। কিন্তু অষ্টাদশ পুরাণে দেখা যায় যে, এক বিষয়ই পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে সবিস্তারে কথিত হইয়াছে। এই কৃষ্ণচরিত্রই ইহার উদাহরণ স্বরূপ লওয়া যাইতে পারে। ইহা ব্রহ্মপুরাণের পূর্ব্বভাগে আছে, আবার বিষ্ণুপুরাণের ৫ম অংশে আছে, বায়ুপুরাণে আছে, শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ম ও ১১শ স্কন্ধে আছে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ৩য় খণ্ডে আছে, এবং পদ্ম ও বামনপুরাণে ও কূর্ম্মপুরাণে সংক্ষেপে আছে। এইরূপ অন্যান্য বিষয়েরও বর্ণনা

---

these heroes are for the most part exhibited in no other light than other highly gifted men—acting according to human motives and taking no advantage of their divine superiority. It is only in certain sections which have been added for the purpose of enforcing their divine character that they take the character of Vishnu. It is impossible to read either of these two poems with attention, without being reminded of the later interpolation of such sections as ascribe a divine character to the heroes, and of the unskilful manner in which these passages are often introduced and without observing how loosely they are connected with the rest of the narrative, and how unnecessary they are for its progress." Lassen's *Indian Antiquities* quoted by Muir.

"In other places (অর্থাৎ ভগবদ্গীতা পর্ব্বাধ্যায় ভিন্ন) the divine nature of Krishna is less decidedly affirmed, in some it is disputed or denied ; and in most of the situations he is exhibited in action, as a prince and warrior, not as a divinity. He exercises no superhuman faculties in defence of himself, or his friends, or in the defeat and destruction of his foes. The Mahabharata, however, is the work of various periods, and requires to be read through carefully and critically, before its weight as an authority can be accurately appreciated." **Wilson, *Preface to the Vishnu Purana.***

পুনঃ পুনঃ কথন ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে আছে। এক ব্যক্তির লিখিত ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের এরূপ ঘটনা অসম্ভব।

৩য়,—আর যদি এক ব্যক্তি এই অষ্টাদশ পুরাণ লিখিয়া থাকে, তাহা হইলে, তন্মধ্যে গুরুতর বিরোধের সম্ভাবনা কিছু থাকে না। কিন্তু অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে, মধ্যে মধ্যে, এইরূপ গুরুতর বিরুদ্ধ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এই কৃষ্ণচরিত্র ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে ভিন্ন প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকল বর্ণনা পরস্পর সঙ্গত নহে।

৪র্থ—বিষ্ণুপুরাণে আছে ;—

আখ্যা নৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশুদ্ধিভিঃ।
পুরাণসংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ॥
প্রখ্যাতো ব্যাসশিষ্যোঽভূৎ সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ।
পুরাণসংহিতাং তস্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ॥
সুমতিশ্চাগ্নিবর্চ্চাশ্চ মিত্রয়ুঃ শাংশপায়নঃ।
অকৃতব্রণোঽথ সাবর্ণিঃ ষট্ শিষ্যাস্তস্য চাভবন্॥
কাশ্যপঃ সংহিতাকর্ত্তা সাবর্ণিঃ শাংশপায়নঃ।
লোমহর্ষণিকা চান্যা তিসৃণাং মূলসংহিতা॥

বিষ্ণুপুরাণ, ৩ অংশ, ৬ অধ্যায়, ১৬-১৯ শ্লোক।

পুরাণার্থবিৎ (বেদব্যাস) আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধি দ্বারা পুরাণসংহিতা করিয়াছিলেন। লোমহর্ষণ নামে সূত বিখ্যাত ব্যাসশিষ্য ছিলেন। ব্যাস মহামুনি তাঁহাকে পুরাণসংহিতা দান করিলেন। সুমতি, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রয়ু, শাংশপায়ন, অকৃতব্রণ, সাবর্ণি—তাঁহার এই ছয় শিষ্য ছিল। (তাহার মধ্যে) কাশ্যপ, সাবর্ণি ও শাংশপায়ন সেই লোমহর্ষণিকা মূল সংহিতা হইতে তিনখানি সংহিতা প্রস্তুত করেন।

পুনশ্চ ভাগবতে আছে ;—

ত্রয্যারুণিঃ কশ্যপশ্চ সাবর্ণিরকৃতব্রণঃ।
শিংশপায়নহারীতৌ ষড়্বৈ পৌরাণিকা ইমে॥
অধীয়ন্ত ব্যাসশিষ্যাৎ সংহিতাং মৎপিতুর্মুখাৎ।*
একৈকামহমেতেষাং শিষ্যঃ সর্ব্বাঃ সমধ্যগাম্॥
কশ্যপোঽহঞ্চ সাবর্ণী রামশিষ্যোঽকৃতব্রণঃ।
অধীমহি ব্যাসশিষ্যাচ্চত্বারো মূলসংহিতাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১২ স্কন্ধ, ৭ অধ্যায়, ৪-৬ শ্লোক।

ত্রয্যারুণি, কাশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, শিংশপায়ন, হারীত, এই ছয় পৌরাণিক।

বায়ুপুরাণে নামগুলি কিছু ভিন্ন,—

আত্রেয়ঃ সুমতির্ধীমান্ কাশ্যপোঽহং কৃতব্রণঃ।

* ভাগবতের বক্তা ব্যাসপুত্র শুকদেব। "বৈশম্পায়নহারীতৌ" ইতি পাঠান্তরও আছে।

পুনশ্চ অগ্নিপুরাণে ;—

প্রাপ্য ব্যাসাৎ পুরাণাদি সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ।
সুমতিশ্চাগ্নিবর্চ্চাশ্চ মিত্রায়ুঃ শাংসপায়নঃ॥
কৃতব্রতোহথ সাবর্ণিঃ ষট্ শিষ্যাস্তস্য চাভবন্।
শাংসপায়নাদয়শ্চক্রুঃ পুরাণানান্তু সংহিতাঃ॥

এই সকল বচনে জানিতে পারা যাইতেছে যে, এক্ষণকার প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণ বেদব্যাসপ্রণীত নহে। তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ পুরাণ-সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাও এক্ষণে প্রচলিত নাই। যাহা প্রচলিত আছে, তাহা কাহার প্রণীত, কবে প্রণীত হইয়াছিল, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

এক্ষণে ইউরোপীয়দিগের যে সাধারণ ভ্রম, তাহার বিষয়ে কিছু বলা যাউক। ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের ভ্রম এই যে, তাঁহারা মনে করেন যে, একও খানি পুরাণ একও ব্যক্তির লিখিত এই ভ্রমের বশীভূত হইয়া তাঁহারা বর্ত্তমান পুরাণ সকলের প্রণয়নকাল নিরূপণ করিতে বসেন। বস্তুতঃ কোনও পুরাণান্তর্গত সকল বৃত্তান্তগুলি এক ব্যক্তির প্রণীত নহে। বর্ত্তমান পুরাণ সকল সংগ্রহ মাত্র। যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচনা। কথাটা একটু সবিস্তারে বুঝাইতে হইতেছে।

'পুরাণ' অর্থে আদৌ পুরাতন; পশ্চাৎ পুরাতন ঘটনার বিবৃতি। সকল সময়েই পুরাতন ঘটনা ছিল, এই জন্য সকল সময়েই পুরাণ ছিল। বেদেও পুরাণ আছে। শতপথব্রাহ্মণে, গোপথব্রাহ্মণে, আশ্বলায়ন সূত্রে, অথর্ব্বসংহিতায়, বৃহদারণ্যকে, ছান্দোগ্যোপনিষদে, মহাভারতে, রামায়ণে, মানবধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বত্রই পুরাণ প্রচলিত থাকার কথা আছে। কিন্তু ঐ সকল কোনও গ্রন্থেই বর্ত্তমান কোনও পুরাণের নাম নাই। পাঠকের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে লিপিবিদ্যা অর্থাৎ লেখা পড়া প্রচলিত থাকিলেও গ্রন্থ সকল লিখিত হইত না; মুখে মুখে রচিত, অধীত এবং প্রচারিত হইত। প্রাচীন পৌরাণিক কথা সকল ঐরূপ মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া অনেক সময়েই কেবল কিম্বদন্তী মাত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। পরে সময়বিশেষে ঐ সকল কিম্বদন্তী এবং প্রাচীন রচনা একত্রে সংগৃহীত হইয়া এক একখানি পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল। বৈদিক সূক্ত সকল ঐরূপে সঙ্কলিত হইয়া ঋক যজুঃ সাম সংহিতাত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছিল, ইহা প্রসিদ্ধ। যিনি বেদবিভাগ করিয়াছিলেন, তিনি এই বিভাগজন্য 'ব্যাস' এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'ব্যাস' তাঁহার উপাধিমাত্র—নাম নহে। তাঁহার নাম কৃষ্ণ এবং দ্বীপে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বলিত। এ স্থানে পুরাণসঙ্কলনকর্ত্তার বিষয়ে দুইটি মত হইতে পারে। একটি মত এই যে, যিনি বেদবিভাগকর্ত্তা, তিনিই যে পুরাণসঙ্কলনকর্ত্তা ইহা না হইতে পারে, কিন্তু যিনি পুরাণসঙ্কলনকর্ত্তা, তাঁহারও উপাধি ব্যাস হওয়া সম্ভব। বর্ত্তমান অষ্টাদশ পুরাণ এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক অথবা এক সময়ে যে বিভক্ত ও সঙ্কলিত হইয়াছিল, এমন বোধ হয় না। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সঙ্কলিত হওয়ার প্রমাণ ঐ সকল পুরাণের মধ্যেই আছে। তবে যিনিই কতকগুলি পৌরাণিক বৃত্তান্ত বিভক্ত করিয়া একখানি সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনিই ব্যাস নামের অধিকারী। হইতে পারে যে, এই জন্যই কিম্বদন্তী আছে যে, অষ্টাদশ পুরাণই

ব্যাসপ্রণীত। কিন্তু ব্যাস যে এক ব্যক্তি নহেন, অনেক ব্যক্তি ব্যাস উপাধি পাইয়াছিলেন, এরূপ বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে। বেদবিভাগকর্ত্তা ব্যাস, মহাভারত-প্রণেতা ব্যাস, অষ্টাদশপুরাণপ্রণেতা ব্যাস, বেদান্তসূত্রকার ব্যাস, এমন কি—পাতঞ্জল দর্শনের টীকাকার একজন ব্যাস। এ সকলই এক ব্যাস হইতে পারেন না। সে দিন কাশীতে ভারত মহামণ্ডলের অধিবেশন হইয়াছিল, সংবাদপত্রে পড়িলাম, তাহাতে দুই জন ব্যাস উপস্থিত ছিলেন। এক জনের নাম হরেকৃষ্ণ ব্যাস, আর এক জনের নাম শ্রীযুক্ত অম্বিকা দত্ত ব্যাস। অনেক ব্যক্তি যে ব্যাস উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ বেদবিভাগকর্ত্তা ব্যাস, মহাভারতপ্রণেতা ব্যাস, এবং অষ্টাদশ পুরাণের সংগ্রহকর্ত্তা আঠারটি ব্যাস যে এক ব্যক্তি নয়, ইহাই সম্ভব বোধ হয়।

দ্বিতীয় মত এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়নই প্রাথমিক পুরাণসঙ্কলনকর্ত্তা। তিনি যেমন বৈদিক সূক্তগুলি সঙ্কলিত করিয়াছিলেন, পুরাণ সম্বন্ধেও সেইরূপ একখানি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিষ্ণু, ভাগবত, অগ্নি প্রভৃতি পুরাণ হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে সেইরূপই বুঝায়। অতএব আমরা সেই মতই অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তাহাতেও প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, বেদব্যাস একখানি পুরাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আঠারখানি নহে। সেখানি নাই। তাঁহার শিষ্যেরা তাহা ভাঙ্গিয়া তিনখানি পুরাণ করিয়াছিলেন, তাহাও নাই। কালক্রমে, নানা ব্যক্তির হাতে পড়িয়া তাহা আঠারখানি হইয়াছিল।

ইহার মধ্যে যে মতই গ্রহণ করা যাউক, পুরাণবিশেষের সময় নিরূপণ করিবার চেষ্টায় কেবল এই ফলই পাওয়া যাইতে পারে যে, কবে কোন্ পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহারই ঠিকানা হয়। কিন্তু তাও হয় বলিয়াও আমার বিশ্বাস হয় না। কেন না, সকল গ্রন্থের রচনা বা সঙ্কলনের পর নূতন রচনা প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে ও পুরাণ সকলে তাহা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। অতএব কোন্ অংশ ধরিয়া সঙ্কলনসময় নিরূপণ করিব? একটা উদাহরণের দ্বারা ইহা বুঝাইতেছি।

মৎস্যপুরাণে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ সম্বন্ধে এই দুইটি শ্লোক আছে;—

"রথন্তরস্য কল্পস্য বৃত্তান্তমধিকৃত্য যৎ।
সাবর্ণিনা নারদায় কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংযুতম্॥
যত্র ব্রহ্মবরাহস্য চরিতং বর্ণ্যতে মুহুঃ।
তদষ্টাদশসাহস্রং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ যে পুরাণে রথন্তর কল্পবৃত্তান্তাধিকৃত কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংযুক্ত কথা নারদকে সাবর্ণি বলিতেছেন এবং যাহাতে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মবরাহচরিত্র কথিত হইয়াছে, সেই অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকসংযুক্ত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

এক্ষণে যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রচলিত আছে, তাহা সাবর্ণি নারদকে বলিতেছেন না। নারায়ণ নামে অন্য ঋষি নারদকে বলিতেছেন। তাহাতে রথন্তরকল্পের প্রসঙ্গমাত্র নাই, এবং ব্রহ্মবরাহচরিতের প্রসঙ্গমাত্র নাই। এখনকার প্রচলিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ড ও গণেশখণ্ড আছে, যাহার কোন প্রসঙ্গ দুই শ্লোকে নাই। অতএব প্রাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ এক্ষণে আর বিদ্যমান নাই। যাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত নামে চলিত আছে, তাহা নূতন

গ্রন্থ। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-সঙ্কলনসময় নিরূপণ করা অপূর্ব্ব রহস্য বলিয়াই বোধ হয়।

উইল্‌সন সাহেব পুরাণ সকলের এইরূপ প্রণয়নকাল নিরূপিত করিয়াছেন ;—

ব্রহ্মপুরাণ	খ্রীষ্টীয়	ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ শতাব্দী।
পদ্মপুরাণ	"	ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে।*
বিষ্ণুপুরাণ	"	দশম শতাব্দী।
বায়ুপুরাণ		সময় নিরূপিত হয় নাই, প্রাচীন বলিয়া লিখিত হইয়াছে।
ভাগবত পুরাণ	খ্রীষ্টীয়	ত্রয়োদশ শতাব্দী।
নারদপুরাণ	"	ষোড়শ কি সপ্তদশ শতাব্দী, অর্থাৎ দুই শত বৎসরের গ্রন্থ।
মার্কণ্ডেয় পুরাণ	"	নবম কি দশম শতাব্দী।
অগ্নিপুরাণ	"	অনিশ্চিত ; অতি অভিনব।
ভবিষ্যপুরাণ		ঠিক হয় নাই।
লিঙ্গপুরাণ	খ্রীষ্টীয়	অষ্টম কি নবম শতাব্দীর এদিক্ ওদিক্।
বরাহপুরাণ	"	দ্বাদশ শতাব্দী।
স্কন্দপুরাণ		ভিন্ন ভিন্ন সময়ের পাঁচখানি পুরাণের সংগ্রহ।
বামনপুরাণ		৩। ৪ শত বৎসরের গ্রন্থ।
কূর্ম্মপুরাণ		প্রাচীন নহে।
মৎস্যপুরাণ		পদ্মপুরাণেরও পর।
গারুড় পুরাণ		
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ		প্রাচীন পুরাণ নাই ; বর্ত্তমান গ্রন্থ পুরাণ নয়।
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ		

পাঠক দেখিবেন, ইঁহার মতে (এই মতই প্রচলিত) কোনও পুরাণই সহস্র বৎসরের অধিক প্রাচীন নয়, বোধ হয়, ইংরাজি পড়িয়া যাঁহার নিতান্ত বুদ্ধিবিপর্য্যয় না ঘটিয়াছে, তিনি ভিন্ন এমন কোন হিন্দুই নাই, যিনি এই সময়নির্দ্ধারণ উপযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিবেন। দুই একটা কথার দ্বারাই ইহার অযৌক্তিকতা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

এ দেশের লোকের বিশ্বাস যে, কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক লোক এবং বিক্রমাদিত্য খ্রীঃ পূঃ ৫৬ বৎসরে জীবিত ছিলেন। কিন্তু সে সকল কথা এখন উড়িয়া গিয়াছে। ডাক্তার ভাও দাজি স্থির করিয়াছেন যে, কালিদাস খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক। এখন ইউরোপ শুদ্ধ এবং ইউরোপীয়দিগের দেশী শিষ্যগণ সকলে উচ্চৈঃস্বরে সেই ডাক ডাকিতেছেন। আমরাও এ মত অগ্রাহ্য করি না। অতএব কালিদাস ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক হউন। সকল পুরাণই তাঁহার অনেক পরে প্রণীত হইয়াছিল, ইহাই

* তাহা হইলে, এই পুরাণ দুই, তিন, কি চারি শত বৎসরের গ্রন্থ।

উইল্‌সন্‌ সাহেবের উপরিলিখিত বিচারে স্থির হইয়াছে। কিন্তু কালিদাস মেঘদূতে লিখিয়াছেন—

"যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমালপ্স্যতে তে
বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ।"—১৫ শ্লোকঃ।

যে পাঠক সংস্কৃত না জানেন, তাঁহাকে শেষ ছত্রের অর্থ বুঝাইলেই হইবে। ময়ূরপুচ্ছের দ্বারা উজ্জ্বল বিষ্ণুর গোপবেশের সহিত ইন্দ্রধনুশোভিত মেঘের উপমা হইতেছে। এখন, বিষ্ণুর গোপবেশ নাই, বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণের গোপবেশ ছিল। ইন্দ্রধনুর সঙ্গে উপমেয় কৃষ্ণচূড়াস্থিত ময়ূরপুচ্ছ। আমি বিনীতভাবে ইউরোপীয় মহামহোপাধ্যায়দিগের নিকট নিবেদন করিতেছি, যদি ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে কোন পুরাণই ছিল না, তবে কৃষ্ণের ময়ূরপুচ্ছচূড়ার কথা আসিল কোথা হইতে? এ কথা কি বেদে আছে, না মহাভারতে আছে, না রামায়ণে আছে?—কোথাও না। পুরাণ বা তদনুবর্ত্তী গীতগোবিন্দাদি কাব্য ভিন্ন আর কোথাও নাই। আছে, হরিবংশে বটে; কিন্তু হরিবংশও ত উইলসন্‌ সাহেবের মতে বিষ্ণুপুরাণেরও পরবর্ত্তী। অতএব ইহা নিশ্চিত যে, কালিদাসের পূর্ব্বে অর্থাৎ অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দী পূর্ব্বে হরিবংশ অথবা কোন বৈষ্ণব পুরাণ প্রচলিত ছিল।

আর একটা কথা বলিয়াই এ বিষয়ের উপসংহার করিব। এখন যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ প্রচলিত, তাহা প্রাচীন ব্রহ্মবৈবর্ত্ত না হইলেও, অন্ততঃ একাদশ শতাব্দীর অপেক্ষাও প্রাচীন গ্রন্থ। কেন না, গীতগোবিন্দকার জয়দেব গোস্বামী গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত। লক্ষ্মণ সেন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশের লোক। ইহা বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রমাণীকৃত, এবং ইংরেজদিগের দ্বারাও স্বীকৃত। আমরা পরে দেখাইব যে, এই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ তখন চলিত ও অতিশয় সম্মানিত না থাকিলে, গীতগোবিন্দ লিখিত হইত না, এবং বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায় তখন প্রচলিত না থাকিলে গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক "মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্" ইত্যাদি কখনও রচিত হইত না। অতএব এই ভ্রষ্ট ব্রহ্মবৈবর্ত্তও একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বগামী। আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত না জানি আরও কত কালের। অথচ উইল্‌সন সাহেবের বিবেচনায় ইহা দুই শত মাত্র বৎসরের গ্রন্থ হইতে পারে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—পুরাণ

আঠারখানি পুরাণ মিলাইলে অনেক সময়ই ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেকগুলি শ্লোক কতকগুলি পুরাণে একই আছে। কোনখানে কিঞ্চিৎ পাঠান্তর আছে। কোনখানে তাহাও নাই। এই গ্রন্থে এইরূপ কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে বা হইবে। নন্দ মহাপদ্মের সময়-নিরূপণ জন্য যে কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা এ কথার উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহার অপেক্ষা আর একটা গুরুতর উদাহরণ দিতেছি। ব্রহ্মপুরাণের উত্তরভাগে শ্রীকৃষ্ণচরিত বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, ও বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে শ্রীকৃষ্ণচরিত বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। উভয়ে কোন প্রভেদ নাই; অক্ষরে অক্ষরে এক। এই পঞ্চম অংশে আটাশটি অধ্যায়।

বিষ্ণুপুরাণের এই আটাশ অধ্যায়ে যতগুলি শ্লোক আছে, ব্রহ্মপুরাণের কৃষ্ণচরিতে সে সকলগুলিই আছে, এবং ব্রহ্মপুরাণের কৃষ্ণচরিতে যে শ্লোকগুলি আছে, বিষ্ণুপুরাণের কৃষ্ণচরিতে সে সকলগুলিই আছে। এই দুই পুরাণে এই সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রভেদ বা তারতম্য নাই। নিম্নলিখিত তিনটি কারণের মধ্যে কোন একটি কারণে এরূপ ঘটা সম্ভব।

১ম,—ব্রহ্মপুরাণ হইতে বিষ্ণুপুরাণ চুরি করিয়াছেন।

২য়,—বিষ্ণুপুরাণ হইতে ব্রহ্মপুরাণ চুরি করিয়াছেন।

৩য়,—কেহ কাহারও নিকট চুরি করেন নাই; এই কৃষ্ণচরিতবর্ণনা সেই আদিম বৈয়াসিকী পুরাণসংহিতার অংশ। ব্রহ্ম ও বিষ্ণু উভয় পুরাণেই এই অংশ রক্ষিত হইয়াছে।

প্রথম দুইটি কারণ যথার্থ কারণ বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। কেন না, এরূপ প্রচলিত গ্রন্থ হইতে আটাশ অধ্যায় স্পষ্ট চুরি অসম্ভব, এবং অন্য কোনও স্থলেও এরূপ দেখাও যায় না। যে এরূপ চুরি করিবে, সে অন্ততঃ কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে পারে এবং রচনাও এমন কিছু নয় যে, তাহার কিছু পরিবর্ত্তন হয় না। আর কেবল এই আটাশ অধ্যায় দুইখানি পুরাণে একরূপ দেখিলেও, না হয়, চুরির কথা মনে করা যাইত, কিন্তু বলিয়াছি যে, অনেক ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের অনেক শ্লোক পরস্পরের সহিত ঐক্যবিশিষ্ট। এবং অনেক ঘটনা সম্বন্ধে পুরাণে পুরাণে বিরোধ থাকিলেও অনেক ঘটনা সম্বন্ধে আবার পুরাণে পুরাণে বিশেষ ঐক্য আছে। এ স্থলে, পূর্ব্বকথিত একখানি আদিম পুরাণসংহিতার অস্তিত্বই প্রমাণীকৃত হইয়াছে। সেই আদিম সংহিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসরচিত না হইলেও হইতে পারে। তবে সে সংহিতা যে অতি প্রাচীন কালে প্রণীত হইয়াছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কেন না, আমরা পরে দেখিব যে, পুরাণকথিত অনেক ঘটনার অখণ্ডনীয় প্রমাণ মহাভারতে পাওয়া যায়, অথচ সে সকল ঘটনা মহাভারতে বিবৃত হয় নাই। সুতরাং এমন কথা বলা যাইতে পারে না যে, পুরাণকার তাহা মহাভারত হইতে লইয়াছেন।

যদি আমরা বিলাতী ধরণে পুরাণ সকলের সংগ্রহসময় নিরূপণ করিতে বসি, তাহা হইলে কিরূপ ফল পাই দেখা যাউক। বিষ্ণুপুরাণে চতুর্থাংশে চতুর্ব্বিংশাধ্যায়ে মগধ রাজাদিগের বংশাবলী কীর্ত্তিত আছে। বিষ্ণুপুরাণে যে সকল বংশাবলী কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা ভবিষ্যদ্বাণীর আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ বিষ্ণুপুরাণ বেদব্যাসের পিতা পরাশরের দ্বারা কলিকালের আরম্ভসময়ে কথিত হইয়াছিল বলিয়া পুরাণকার ভূমিকা করিতেছেন। সে সময়ে নন্দবংশীয়াদি আধুনিক রাজগণ জন্মগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু উক্ত রাজগণের সমকাল বা পরকালবর্ত্তী প্রক্ষেপকারকের ইচ্ছা যে, উক্ত রাজগণের নাম ইহাতে থাকে। কিন্তু তাঁহাদিগের নামের উল্লেখ করিতে গেলে, ভবিষ্যদ্বাণীর আবরণ রচনার উপর প্রক্ষিপ্ত না করিলে, পরাশর-কথিত বলিয়া পাচার করা যায় না। অতএব সংগ্রহকার বা প্রক্ষেপকারক এই সকল রাজার কথা লিখিবার সময় বলিয়াছেন, অমুক রাজা হইবেন, তাহার পর অমুক রাজা হইবেন, তাহার পর অমুক রাজা হইবেন। তিনি যে সকল রাজাদিগের নাম করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেকেই ঐতি-

হাসিক ব্যক্তি এবং তাঁহাদিগের রাজত্ব সম্বন্ধে বৌদ্ধগ্রন্থ, যবনগ্রন্থ, সংস্কৃতগ্রন্থ, প্রস্তরলিপি ইত্যাদি বহুবিধ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

যথা ;—নন্দ, মহাপদ্ম, মৌর্য্য, চন্দ্রগুপ্ত, বিন্দুসার, অশোক, পুষ্পমিত্র, পুলিমান্, শকরাজগণ, অন্ধ্ররাজগণ, ইত্যাদি ইত্যাদি। পরে লেখা আছে,—"নব নাগাঃ পদ্মাবত্যাং কান্তিপুর্য্যাং মথুরায়ামনুগঙ্গাপ্রয়াগং মাগধা গুপ্তাশ্চ ভোক্ষ্যন্তি।"* এই গুপ্তবংশীয়দিগের সময় Fleet সাহেবের কল্যাণে নিরূপিত হইয়াছে। এই বংশের প্রথম রাজাকে মহারাজগুপ্ত বলে। তার পর ঘটোৎকচ ও চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। তার পর সমুদ্রগুপ্ত। ইঁহারা খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীর লোক। তার পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত, বুদ্ধগুপ্ত—ইঁহারা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক। এই সকল গুপ্তগণ রাজা হইয়াছিলেন বা রাজত্ব করিতেছেন, ইহা না জানিলে, পুরাণসংগ্রহকার কখনই এরূপ লিখিতে পারিতেন না। অতএব ইনি গুপ্তদিগের সমকাল বা পরকালবর্ত্তী। তাহা হইলে, এই পুরাণ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত বা প্রণীত হইয়াছিল। কিন্তু এমন হইতে পারে যে, এই গুপ্তরাজাদিগের নাম বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। অথবা এমনও হইতে পারে যে. এই চতুর্থাংশ এক সময়ের রচনা, এবং অন্যান্য অংশ অন্যান্য সময়ে রচনা; সকলগুলিই কোনও অনির্দ্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হইয়া বিষ্ণুপুরাণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আজিকার দিনেও কি ইউরোপে, কি এদেশে, সচরাচর ঘটিতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচনা একত্রিত হইয়া একখানি সংগ্রহগ্রন্থে নিবদ্ধ হয়, এবং ঐ সংগ্রহের একটি বিশেষ নাম দেওয়া হয়। যথা, "Percy Reliques," অথবা "রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত ফলিত জ্যোতিষ।" আমার বিবেচনায় সকল পুরাণই এইরূপ সংগ্রহ। উপরি-উক্ত দুইখানি পুস্তকই আধুনিক সংগ্রহ; কিন্তু যে সকল বিষয় ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রাচীন। সংগ্রহ আধুনিক বলিয়া সেগুলি আধুনিক হইল না।

তবে এমন অনেক সময়েই ঘটিয়া থাকিতে পারে যে, সংগ্রহকার নিজে অনেক নূতন রচনা করিয়া সংগ্রহের মধ্যে প্রবেশিত করিয়াছেন অথবা প্রাচীন বৃত্তান্ত নূতন কল্পনা-সংযুক্ত এবং অত্যুক্তি অলঙ্কারে রঞ্জিত করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণ সম্বন্ধে একথা বলা যায় না, কিন্তু ভাগবত সম্বন্ধে ইহা বিশেষ প্রকারে বক্তব্য।

প্রবাদ আছে যে, ভাগবত পুরাণ বোপদেবপ্রণীত। বোপদেব দেবগিরির রাজা হেমাদ্রির সভাসদ্। বোপদেব ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। কিন্তু অনেক হিন্দুই উহা বোপদেবের রচনা বলিয়া স্বীকার করেন না। বৈষ্ণবেরা বলেন, ভাগবতদ্বেষী শাক্তেরা এইরূপ প্রবাদ রটাইয়াছে।

বাস্তবিক ভাগবতের পুরাণত্ব লইয়া অনেক বাদবিতণ্ডা ঘটিয়াছে। শাক্তেরা বলেন, ইহা পুরাণই নহে,—বলেন, দেবীভাগবতই ভাগবত পুরাণ। তাঁহারা বলেন, "ভগবত ইদং ভাগবতং" এইরূপ অর্থ না করিয়া "ভগবত্যা ইদং ভাগবতং" এই অর্থ করিবে।

কেহ কেহ এইরূপ শঙ্কা করে বলিয়া শ্রীধর স্বামী ইহার প্রথম শ্লোকের টীকায়ে

* বিষ্ণুপুরাণ, ৪ অংশ, ২৪ অ—১৮।

লিখিয়াছেন—"ভাগবতং নামান্যদিত্যপি নাশঙ্কনীয়ম্"। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ইহা পুরাণ নহে—দেবীভাগবতই প্রকৃত পুরাণ, এরূপ আশঙ্কা শ্রীধর স্বামীর পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল; এবং তাহা লইয়া বিবাদও হইত। বিবাদকালে উভয় পক্ষে যে সকল পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নামগুলি বড় মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক। একখানির নাম "দুর্জ্জনমুখচপেটিকা," তাহার উত্তরের নাম "দুর্জ্জনমুখমহাচপেটিকা" এবং অন্য উত্তরের নাম "দুর্জ্জনমুখপদ্মপাদুকা"। তার পর "ভাগবত-স্বরূপ-বিষয়শঙ্কানিরাস-ত্রয়োদশঃ" ইত্যাদি অন্যান্য পুস্তকও এ বিষয়ে প্রণীত হইয়াছিল। আমি এই সকল পুস্তক দেখি নাই, কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন এবং Bournouf সাহেব "চপেটিকা", "মহাচপেটিকা" এবং "পাদুকা"র অনুবাদও করিয়াছেন। Wilson সাহেব তাঁহার বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদে ভূমিকায় এই বিবাদের সারসংগ্রহ লিখিয়াছেন। আমাদের সে কথায় কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহার কৌতূহল থাকে তিনি Wilson সাহেবের গ্রন্থ দেখিবেন। আমার মতের স্থূল মর্ম্ম এই যে, ভাগবত পুরাণেও অনেক প্রাচীন কথা আছে। কিন্তু অনেক নূতন উপন্যাসও তাহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এবং প্রাচীন কথা যাহা আছে, তাহাও নানাপ্রকার অলঙ্কারবিশিষ্ট এবং অত্যুক্তি দ্বারা অতিরঞ্জিত হইয়াছে। এই পুরাণখানি অন্য অনেক পুরাণ হইতে আধুনিক বোধ হয়, তা না হইলে ইহার পুরাণত্ব লইয়া এত বিবাদ উপস্থিত হইবে কেন?

পুরাণের মধ্যে যে সকল পুরাণে কৃষ্ণচরিত্রের প্রসঙ্গ নাই, সে সকলের আলোচনায় আমাদিগের কোনও প্রয়োজন নাই। যে সকল গ্রন্থে কৃষ্ণচরিত্রের কোনও প্রসঙ্গ আছে, তাহার মধ্যে ব্রহ্ম, বিষ্ণু, ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, এই চারিখানিতেই বিস্তারিত বৃত্তান্ত আছে। তাহার মধ্যে আবার ব্রহ্মপুরাণ বিষ্ণুপুরাণে একই কথা আছে। অতএব এই গ্রন্থে বিষ্ণু, ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ভিন্ন অন্য কোন পুরাণের ব্যবহার প্রয়োজন হইবে না। এই তিন পুরাণ সম্বন্ধে যাহা আমাদিগের বক্তব্য, তাহা বলিয়াছি। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ সম্বন্ধে আরও কিছু সময়ান্তরে বলিব। এক্ষণে কেবল আমাদের হরিবংশ সম্বন্ধে কিছু বলিতে বাকি আছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ—হরিবংশ

হরিবংশেই আছে যে, মহাভারত কথিত হইলে পর উগ্রশ্রবাঃ সৌতি শৌনকাদি ঋষির প্রার্থনানুসারে হরিবংশ কীর্ত্তন করিতেছেন। অতএব উহা মহাভারতের পরবর্ত্তী গ্রন্থ। কিন্তু মহাভারতের কত পরে এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, ইহা নিরূপণ আবশ্যক। মহাভারতের পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে হরিবংশের প্রসঙ্গ কেবল শেষ শ্লোকে আছে, তাহা ২৯।৩০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্বের অন্তর্গত বিষয় সকল ঐ পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে সংক্ষেপে যেরূপ কথিত হইয়াছে, হরিবংশের অন্তর্গত বিষয় সম্বন্ধে সেখানে সেরূপ কিছু কথিত হয় নাই। ঐ শ্লোক পাঠ করিয়া এমনই বোধ হয় যে, যখন প্রথম ঐ পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলিত হইয়াছিল, তখন হরিবংশের কোন প্রসঙ্গই ছিল না। পরিশেষে লক্ষ শ্লোক মিলাইবার জন্য কেহ ঐ শ্লোকটি যোজনা করিয়া দিয়াছেন। হরিবংশে এক্ষণে তিন পর্ব্ব পাওয়া যায়;—হরিবংশপর্ব্ব, বিষ্ণুপর্ব্ব ও

ভবিষ্যপর্ব্ব। কিন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত মহাভারতের শ্লোকে কেবল হরিবংশপর্ব্ব ভবিষ্যপর্ব্বের নাম আছে, বিষ্ণুপর্ব্বের নাম মাত্র নাই, হরিবংশপর্ব্বে ও ভবিষ্যপর্ব্বে ১২,০০০ শ্লোক ইহাই লিখিত আছে। এক্ষণে তিন পর্ব্বে ১৬,০০০ শ্লোকের উপর পাওয়া যায়। অতএব নিশ্চিতই মহাভারতে ঐ শ্লোক প্রবিষ্ট হইবার পরে বিষ্ণুপর্ব্ব হরিবংশে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত অনুবাদ করিয়া হরিবংশের অনুবাদ সেই সঙ্গে প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছিলেন। তাহার কারণ তিনি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারতের অতিরিক্ত হরিবংশ নামক গ্রন্থকে অনেকে ভারতের অন্তর্ভূত একটী পর্ব্ব বলিয়া গণনা করিয়া থাকেন এবং উহাকে আশ্চর্য্য পর্ব্ব বা ঊনবিংশ পর্ব্ব বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু বস্তুতঃ হরিবংশ ভারতান্তর্গত একটী পর্ব্ব নহে। উহা মূল মহাভারত রচনার বহুকাল পরে পরিশিষ্টরূপে উহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। হরিবংশের রচনাপ্রণালী ও তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বিচক্ষণ ব্যক্তি অনায়াসেই উহার আধুনিকত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন। যদিও মূল মহাভারতের স্বর্গারোহণপর্ব্বে হরিবংশশ্রবণের ফলশ্রুতি বর্ণিত আছে, কিন্তু তাহাতে হরিবংশের প্রাচীনত্ব প্রমাণ না হইয়া বরং ঐ ফলশ্রুতিবর্ণনেরই আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হয়। মূল মহাভারত গ্রন্থের সহিত হরিবংশ অনুবাদিত করিলে লোকের মনে পূর্ব্বোক্ত ভ্রম দৃঢ়ীভূত হইবে, আশঙ্কা করিয়া উহা এক্ষণে অনুবাদ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম।"

হরেস্ হেমন্ উইল্‌সন্ সাহেবও হরিবংশের সম্বন্ধে ঐ কথা বলেন। তিনি বলেন ;—

"The internal evidence is strongly indicative of a date considerably subsequent to that of the major portion of the Mahabharat."*

আমারও সেইরূপ বিবেচনা হয়। আর হরিবংশ মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্বের অল্পকালপরবর্ত্তী হইলেও এমন সন্দেহ করিবার কারণও আছে যে, বিষ্ণুপর্ব্ব তাহাতে অনেক পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এ সকল কথার নিশ্চয়তা সম্পাদন অতি দুঃসাধ্য।

সুবন্ধুকৃত বাসবদত্তায় হরিবংশের পুষ্করপ্রাদুর্ভাব নামক বৃত্তান্তের উল্লেখ আছে। ইউরোপীয় বিচারে স্থির হইয়াছে, সুবন্ধু খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীর লোক। অতএব তখনও হরিবংশ প্রচলিত গ্রন্থ। কিন্তু কবে ইহা প্রণীত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণের পরবর্ত্তী, এবং ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তের পূর্ব্ববর্ত্তী।

কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এ কথা বলিতে সাহসী হই, সেটি অতি গুরুতর কথা, এবং এই কৃষ্ণচরিত্রবিচারের মূলসূত্র বলিলেও হয়। আমরা পরপরিচ্ছেদে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

* Horace Hayman Wilson's *Essays Analytical, Critical and Philosophical on subjects connected with Sanskrit Literature*, Vol. I. Dr. Reinhold Rost's Edition.

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ—ইতিহাসাদির পৌর্ব্বাপর্য্য

উপনিষদে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, জগদীশ্বর এক ছিলেন, বহু হইতে ইচ্ছা করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন। * ইহা প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাদের স্থূলকথা। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকেরা অনেক সন্ধানের পর, সেই অদ্বৈতবাদের নিকটে আসিতেছেন। তাঁহারা বলেন, জগতের সমস্তই আদৌ এক, ক্রমশঃ বহু হইয়াছে। ইহাই প্রসিদ্ধ Evolution বাদের স্থূলকথা। এক হইতে বহু বলিলে, কেবল সংখ্যায় বহু বুঝায় না—একাঙ্গিত্ব এবং বহ্বঙ্গিত্ব বুঝিতে হইবে। যাহা অভিন্ন ছিল, তাহা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে পরিণত হয়। যাহা 'Homogeneous' ছিল, তাহা পরিণতিতে "Heterogeneous" হয়। যাহা Uniform" ছিল, তাহা "Multifarious" হয়। কেবল জড়জগৎ সম্বন্ধে এই নিয়ম সত্য, এমন নহে। জড়জগতে, জীবজগতে, মানসজগতে, সমাজজগতে সর্ব্বত্র ইহা সত্য। সমাজজগতের অন্তর্গত যাহা, সে সকলেরই পক্ষে ইহা খাটে। সাহিত্য ও বিজ্ঞান সমাজজগতের অন্তর্গত, তাহাতেও খাটে। উপন্যাস বা আখ্যান সাহিত্যের অন্তর্গত, তাহাতেও ইহা সত্য। এমন কি, বাজারের গল্প সম্বন্ধে ইহা সত্য। রাম যদি শ্যামকে বলে, "আমি কাল রাত্রে অন্ধকারে শুইয়াছিলাম, কি একটা শব্দ হইল, আমার বড় ভয় করিতে লাগিল" তবে নিশ্চয়ই শ্যাম যদুর কাছে গিয়া গল্প করিবে, "রামের ঘরে কাল রাত্রে ভূতে কি রকম শব্দ করিয়াছিল।" তারপর ইহাই সম্ভব যে, যদু গিয়া মধুর কাছে গল্প করিবে যে, "কাল রাত্রে রাম ভূত দেখিয়াছিল," এবং মধুও নিধুর কাছে বলিবে যে, "রামের বাড়ীতে বড় ভূতের দৌরাত্ম্য হইয়াছে।" এবং পরিশেষে বাজারে রাষ্ট্র হইবে যে, ভূতের দৌরাত্ম্যে রাম সপরিবারে বড় বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

এ গেল বাজারে গল্পের কথা। প্রাচীন উপাখ্যান সম্বন্ধে এরূপ পরিণতির একটা বিশেষ নিয়ম দেখিতে পাই। প্রথমাবস্থায় নামকরণ,—যেমন বিষ্‌ ধাতু হইতে বিষ্ণু। দ্বিতীয়াবস্থায়, রূপক—যেমন বিষ্ণুর তিন পাদ, কেহ বলেন, সূর্য্যের উদয়, মধ্যাহ্নস্থিতি, এবং অস্ত ; কেহ বলেন, ঈশ্বরের ত্রিলোকব্যাপিতা, কেহ বলেন, ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ। তারপর তৃতীয়াবস্থায় ইতিহাস—যেমন বলিবামনবৃত্তান্ত। চতুর্থাবস্থায় ইতিহাসের অতিরঞ্জন। পুরাণাদিতে তাহা দেখা যায়।

এ কথার উদাহরণান্তর স্বরূপ, আমরা উর্ব্বশী-পুরুরবার উপাখ্যান লইতে পারি। ইহার প্রথমাবস্থা, যজুর্ব্বেদসংহিতায়। তথায় উর্ব্বশী, পুরূরবা, দুইখানি অরণিকাষ্ঠমাত্র। বৈদিক কালে দিয়াশলাই ছিল না ; চকমকি ছিল না ; অন্ততঃ যজ্ঞাগ্নি জন্য এ সকল ব্যবহৃত হইত না। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া যাজ্ঞিক অগ্নির উৎপাদন করিতে হইত। ইহাকে বলিত "অগ্নিচয়ন"। অগ্নিচয়নের মন্ত্র ছিল। যজুর্ব্বেদসংহিতার (মাধ্যান্দিনী শাখায়) পঞ্চম অধ্যায়ের ২ কণ্ডিকায় সেই মন্ত্র আছে। উহার তৃতীয় মন্ত্রে একখানি অরণিকে, পঞ্চমে অপরখানিকে পূজা করিতে হয়। সেই দুই মন্ত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ এই ;—

"হে অরণে! অগ্নির উৎপত্তির জন্য আমরা তোমাকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করিলাম। অদ্য হইতে তোমার নাম উর্ব্বশী"। ৩।

---

* সোঽকাময়ত। বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়েতি।—তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌, ২ বল্লী, ৬ অনুবাক্‌।

(উৎপত্তির জন্য, কেবল স্ত্রী নহে, পুরুষও চাই। এজন্য উক্ত স্ত্রীকল্পিত অরণির উপর দ্বিতীয় অরণি স্থাপিত করিয়া বলিতে হইবে)

"হে অরণে! অগ্নির উৎপত্তির জন্য আমরা তোমাকে পুরুষরূপে কল্পনা করিলাম। অদ্য হইতে তোমার নাম পুরুরবা"। ৫।*

চতুর্থ মন্ত্রে অরণিস্পৃষ্ট আজ্যের নাম দেওয়া হইয়াছে আয়ু।

এই গেল প্রথমাবস্থা। দ্বিতীয়াবস্থা ঋগ্বেদসংহিতার † ১০ মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে। এখানে উর্ব্বশী পুরুরবা আর অরণিকাষ্ঠ নহে; ইহারা নায়ক নায়িকা। পুরুরবা উর্ব্বশীর বিরহশঙ্কিত। এই রূপকাবস্থা। রূপকে উর্ব্বশী (৫ম ঋকে) বলিতেছেন, "হে পুরুরবা, তুমি প্রতিদিন আমাকে তিন বার রমণ করিতে।" যজ্ঞের তিনটি অগ্নি ইহার দ্বারা সূচিত হইতেছে।‡ পুরুরবাকে উর্ব্বশী "ইলাপুত্র" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। ইলা শব্দের অর্থ পৃথিবী। § পৃথিবীরই পুত্র অরণিকাষ্ঠ।

মহাভারতে পুরুরবা ঐতিহাসিক চন্দ্রবংশীয় রাজা। চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র ইলা, ইলার পুত্র পুরুরবা। উর্ব্বশীর গর্ভে ইহার পুত্র হয়; তাহার নাম আয়ু।@ যজুর্মন্ত্র যাহা উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা দেখিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন, আয়ু সেই অরণিস্পৃষ্ট আজ্য। মহাভারতে এই আয়ুর পুত্র বিখ্যাত নহুষ। নহুষের পুত্র বিখ্যাত যযাতি। যযাতির পুত্রের মধ্যে দুই জনের নাম যদু ও পুরু। যদু, যাদবদিগের আদিপুরুষ; পুরু, কুরুপাণ্ডবের আদিপুরুষ। এই তৃতীয়াবস্থা। তৃতীয়াবস্থায় অরণিকাষ্ঠ ঐতিহাসিক সম্রাট্।

* সত্যব্রত সামশ্রমী কৃত অনুবাদ।

† সাহেবেরা বলেন, ঋগ্বেদসংহিতা আর সকল সংহিতা হইতে প্রাচীন। ইহার অর্থ এমন নয় যে, ঋক্‌সংহিতার সকল সূক্তগুলি সাম ও যজুঃসংহিতার সকল মন্ত্র হইতে প্রাচীন। যদি এ অর্থে এ কথা কেহ বলিয়া থাকেন বা বুঝিয়া থাকেন, তবে তিনি অতিশয় ভ্রান্ত। এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, ঋক্‌সংহিতায় এমন কতকগুলি সূক্ত আছে যে, সেগুলি সকল বেদমন্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন। নচেৎ ঋক্‌সংহিতায় এমন অনেক সূক্ত পাওয়া যায় যে, তাহা স্পষ্টতঃ আধুনিক বলিয়া সাহেবেরাই স্বীকার করেন। অনেকগুলি ঋক্ সামবেদসংহিতাতেও আছে ঋগ্বেদসংহিতাতেও আছে। সংহিতা কেহ কাহারও অপেক্ষা প্রাচীন নহে, তবে কোন মন্ত্র অন্য মন্ত্রের অপেক্ষা প্রাচীন। এরূপ প্রাচীন মন্ত্র ঋক্‌সংহিতায় বেশী আছে, কিন্তু ঋক্ সংহিতায় এমন অনেক মন্ত্রও আছে যে, তাহা যজুঃ সামের অনেক মন্ত্রের অপেক্ষা আধুনিক। দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্ত ইহার একটি উদাহরণ।

‡ মক্ষমূলর প্রভৃতি এই রূপকের অর্থ করেন, উর্ব্বশী ঊষা, পুরুরবা সূর্য্য। Solar myth এই পণ্ডিতেরা কোন মতেই ছাড়িতে পারেন না। যজুর্মন্ত্র যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে এবং তিন বার সংসর্গের কথায় পাঠক বুঝিবেন যে, এই রূপকের প্রকৃত অর্থ উপরে লিখিত হইল।

§ সর্পমাংসাৎ পশূ ব্যাড়ৌ গোভূবাচস্ত্বিড়া ইলা ইত্যমরঃ।

@ কখন কখন এই নাম "আয়ুঃ" লিখিত হইয়াছে।

চতুর্থ অবস্থা, বিষ্ণু, পদ্ম প্রভৃতি পুরাণে। পুরাণ সকলে তৃতীয় অবস্থার ইতিহাস নূতন উপন্যাসে রঞ্জিত হইয়াছে, তাহার দুইটি নমুনা দিতেছি। একটি এই,—

উর্ব্বশী ইন্দ্রসভায় নৃত্য করিতে করিতে মহারাজ পুরুরবাকে দেখিয়া মোহিত হওয়ায় নৃত্যের তালভঙ্গ হওয়াতে ইন্দ্রের অভিশাপে পঞ্চপঞ্চাশৎ বর্ষ স্বর্গভ্রষ্টা হইয়া পুরুরবার সহিত বাস করিয়াছিলেন।

আর একটি এইরূপ :—

পূর্ব্বকালে কোন সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু ধর্ম্মপুত্র হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিপুল তপস্যা করিয়াছিলেন। ইন্দ্র তাঁহার উগ্র তপস্যায় ভীত তাঁহার বিঘ্নার্থ কতিপয় অপ্সরার সহিত বসন্ত ও কামদেবকে প্রেরণ করেন। সেই সকল অপ্সরা যখন তাঁহার ধ্যানভঙ্গে অশক্তা হইল, তখন কামদেব অপ্সরাগণের উরু হইতে ইঁহাকে সৃজন করিলেন। ইনিই তাঁহার তপোভঙ্গে সমর্থা হন। ইহাতে ইন্দ্র অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ইঁহার রূপে মোহিত হইয়া ইহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ইনিও সম্মতা হইলেন। পরে মিত্র ও বরুণ তাঁহাদিগের ঐরূপ মনোভাব জ্ঞাপন করিলে ইনি প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাতে তাঁহাদের শাপে ইনি মনুষ্যভোগ্যা (অর্থাৎ পুরুরবার পত্নী) হন।

এই সকল কথার আলোচনায় আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, যজুর্ব্বেদসংহিতার ৫ অধ্যায়ের সেই মন্ত্রগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাহার পর, ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্ত। তারপর মহাভারত। তারপর পদ্মাদি পুরাণ।

আমরা যে সকল গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণচরিত্র বুঝিতে চেষ্টা করিব, তাহারও পৌর্ব্বাপর্য্য এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া নির্দ্ধারিত করা যাইতে পারে। দুই একটা উদাহরণের দ্বারা ইহা বুঝাইতেছি।

প্রথম উদাহরণ স্বরূপ পূতনাবধবৃত্তান্ত দেওয়া যাউক।

ইহার প্রথমাবস্থা কোন গ্রন্থে নাই, কেবল অভিধানেই আছে, যেমন বিষ্ ধাতু হইতে বিষ্ণু। পরে দেখি, পূতনা যথার্থতঃ সূতিকাগারস্থ শিশুর রোগ। কিন্তু পূতনা শকুনিকেও বলে; অতএব মহাভারতে পূতনা শকুনি। বিষ্ণুপুরাণে আর এক সোপান উঠিল; রূপকে পরিণত হইল। পূতনা "বালঘাতিনী" অর্থাৎ বালহত্যা যাহার ব্যবসায়; "অতিভীষণা"; তাহার কলেবর "মহৎ"; নন্দ দেখিয়া ত্রাসযুক্ত ও বিস্মিত হইলেন। তথাপি এখনও সে মানবী।* হরিবংশে দুইটা কথাই মিলান হইল। পূতনা মানবী বটে, কংসের ধাত্রী। কিন্তু সে কামরূপিণী পক্ষিণী হইয়া ব্রজে আসিল। রূপকত্ব আর নাই; এখন আখ্যান বা ইতিহাস; তৃতীয়াবস্থা এইখানে প্রথম প্রবেশ করিল। পরিশেষে ভাগবতে ইহার চূড়ান্ত হইল। পূতনা রোগও নয়, পক্ষিণীও নয়, মানবীও নহে। সে ঘোররূপা রাক্ষসী। তাহার শরীর ছয় ক্রোশ বিস্তৃত হইয়া পতিত হইয়াছিল, দাঁতগুলা একটা লাঙ্গল-দণ্ডের মত, নাকের গর্ত্ত গিরিকন্দরের তুল্য, স্তন দুইটা গণ্ডশৈল অর্থাৎ ছোট রকমের পাহাড়, চক্ষু অন্ধকূপের তুল্য, পেটটা জলশূন্য হ্রদের সমান, ইত্যাদি ইত্যাদি। একটা পীড়া ক্রমশঃ এত বড় রাক্ষসীতে পরিণত হইল, দেখিয়া পাঠক আনন্দ লাভ করিবেন আমরা ভরসা করি, কিন্তু মনে রাখেন যে, ইহা চতুর্থ অবস্থা।

* কোন অনুবাদকার অনুবাদে "রাক্ষসী" কথাটা বসাইয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের মূলে এমন কথা নাই।

ইহাতে পাই, অগ্রে মহাভারত ; তারপর বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশ ; তারপর হরিবংশ; তারপর ভাগবত।

আর একটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাউক। কাল শব্দের পর ইয় প্রত্যয় করিলে কালিয় শব্দ পাওয়া যায়। কালিয়ের নাম মহাভারতে নাই। বিষ্ণুপুরাণে কালিয়বৃত্তান্ত পাই। পড়িয়া জানিতে পারা যায় যে, ইহা কাল, এবং কালভয়নিবারণ কৃষ্ণপাদপদ্ম সম্বন্ধীয় একটি রূপক। সাপের একটি মাত্র ফণা থাকে, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে "মধ্যম ফণার" কথা আছে। মধ্যম বলিলে তিনটি বুঝায়। বুঝিলাম যে, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানাভিমুখী কালিয়ের তিনটি ফণা। কিন্তু হরিবংশকার রূপকের প্রকৃত তাৎপর্য্য নাই বুঝিতে পারুন, বা তাহাতে নূতন অর্থ দিবার অভিপ্রায় রাখুন, তিনি দুইটি ফণা বাড়াইয়া দিলেন। ভাগবতকার তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন—একেবারে সহস্র ফণা করিয়া দিলেন।

এখন বলিতে পারি কি না যে, আগে মহাভারত, পরে বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশ, পরে হরিবংশ, পরে ভাগবত।

এখন আর উদাহরণ বাড়াইবার প্রয়োজন নাই, কৃষ্ণচরিত্র লিখিতে লিখিতে অনেক উদাহরণ আপনি আসিয়া পড়িবে। স্থূল কথা এই যে, যে গ্রন্থে অমৌলিক, অনৈসর্গিক, উপন্যাসভাগ যত বাড়িয়াছে, সেই গ্রন্থ তত আধুনিক। এই নিয়মানুসারে, আলোচ্য গ্রন্থ সকলের পৌর্ব্বাপর্য্য এইরূপ অবধারিত হয়।

প্রথম। মহাভারতের স্তর।

দ্বিতীয়। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশ।

তৃতীয়। হরিবংশ।

চতুর্থ। শ্রীমদ্ভাগবত।

ইহা ভিন্ন আর কোন গ্রন্থের ব্যবহার বিধেয় নহে। মহাভারতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর অমৌলিক বলিয়া অব্যবহার্য্য, কিন্তু তাহার অমৌলিকতা প্রমাণ করিবার জন্য, ঐ সকল অংশের কোথাও কোথাও সমালোচনা করিব। ব্রহ্মপুরাণ ব্যবহারের প্রয়োজন নাই, কেন না, বিষ্ণুপুরাণে যাহা আছে, ব্রহ্মপুরাণেও তাহা আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ পরিত্যাজ্য, কেন না, মৌলিক ব্রহ্মবৈবর্ত্ত লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। তথাপি শ্রীরাধার বৃত্তান্ত জন্য একবার ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ব্যবহার করিতে হইবে। অন্যান্য পুরাণে কৃষ্ণকথা অতি সংক্ষিপ্ত, এজন্য সে সকলের ব্যবহার নিষ্ফল। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশ ভিন্ন চতুর্থাংশও কদাচিৎ ব্যবহার করার প্রয়োজন হইবে—যথা স্যমন্তক মণি, সত্যভামা, ও জাম্ববতীবৃত্তান্ত।

পুরাণ সকলের প্রক্ষিপ্তবিচার দুর্ঘট। মহাভারতে যে সকল লক্ষণ পাইয়াছি, তাহা হরিবংশে ও পুরাণে লক্ষ্য করা ভার। কিন্তু মহাভারত সম্বন্ধে আর যে দুইটা* নিয়ম করিয়াছি যে, যাহা অনৈসর্গিক, তাহা অনৈতিহাসিক ও অতিপ্রকৃত বলিয়া পরিত্যাগ করিব ; আর যাহা নৈসর্গিক, তাহাও যদি মিথ্যার লক্ষণাক্রান্ত হয়, তবে তাহাও পরিত্যাগ করিব ; এই দুইটি নিয়ম পুরাণ সম্বন্ধেও খাটিবে।

এক্ষণে আমরা কৃষ্ণচরিত্রকথনে প্রবৃত্ত।

---

* ৪৬ পৃষ্ঠা দেখ।

দ্বিতীয় খণ্ড—বৃন্দাবন

যো মোহয়তি ভূতানি স্নেহপাশানুবন্ধনৈঃ।
সর্গস্য রক্ষণার্থায় তস্মৈ মোহাত্মনে নমঃ॥
—শান্তিপর্ব্ব, ৪৭ অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ—যদুবংশ

প্রথম খণ্ডে আমরা পুরূরবার পুত্র আয়ুর কথা বলিয়াছি। আয়ু যজুর্ব্বেদে যজ্ঞের ঘৃত মাত্র। কিন্তু ঋগ্বেদসংহিতার ১০ম মণ্ডলে তিনি ঐতিহাসিক রাজা। ১০ম মণ্ডলের ৪৯ সূক্তের ঋষি বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র। ইন্দ্র বলিতেছেন, "আমি বেশকে আয়ুর বশীভূত করিয়া দিয়াছি।"

আয়ুর পুত্র নহুষ। নহুষের পুত্র যযাতি। এই নহুষ ও যযাতির নামও ঋগ্বেদ-সংহিতায় আছে। যযাতির পাঁচ পুত্র ইতিহাস পুরাণে কথিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ যদু, কনিষ্ঠ পুরু। আর তিন জনের নাম তুর্ব্বসু, দ্রহ্যু, অণু। ইহার মধ্যে পুরু, যদু, এবং তুর্ব্বসুর নাম ঋগ্বেদসংহিতায় আছে (১০ম, ৪৮।৪৯ সূক্ত)। কিন্তু ইঁহারা যে যযাতির পুত্র বা পরস্পরের ভাই, এমন কথা ঋগ্বেদসংহিতায় নাই।

কথিত আছে, যযাতির জ্যেষ্ঠ চারি পুত্র তাঁহার আজ্ঞাপালন না করায় তিনি ঐ চারি পুত্রকে অভিশপ্ত করিয়া, কনিষ্ঠ পুরুকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। এই পুরুর বংশে দুষ্মন্ত, ভরত, কুরু, এবং অজমীঢ় ইত্যাদি ভূপতিরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরাদি কৌরবেরা এই পুরুর বংশ। এবং কৃষ্ণ প্রভৃতি যাদবেরা যদুর বংশ। অন্ততঃ পুরাণে ইতিহাসে সচরাচর ইহাই পাওয়া যায় যে, যযাতিপুত্র যদু হইতে মথুরবাসী যাদবদিগের উৎপত্তি।

কিন্তু হরিবংশে আর এক কথা পাওয়া যায়। হরিবংশের হরিবংশপর্ব্বে যে যদুবংশকথন আছে, তাহাতে যযাতিপুত্র যদুরই বংশকথন। কিন্তু বিষ্ণুপর্ব্বে ভিন্ন প্রকার আছে। তথায় আছে যে, হর্য্যশ্ব নামে একজন ইক্ষ্বাকুবংশীয়, অযোধ্যায় রাজা ছিলেন। তিনি মধুবনাধিপতি মধুর কন্যা মধুমতীকে বিবাহ করেন। এই মধুবনই মথুরা। হর্য্যশ্ব অযোধ্যা হইতে কোন কারণে বিদূরিত হইলে শ্বশুরবাড়ী আসিয়া বাস করেন; ইঁহারই পুত্র যদু। হর্য্যশ্বের লোকান্তরে ইনি রাজা হয়েন। যদুর পুত্র মাধব, মাধবের পুত্র সত্ত্বত, সত্ত্বতের পুত্র ভীম। মধুর পুত্র লবণকে রামের ভ্রাতা শত্রুঘ্ন বিজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য হস্তগত করিয়া মথুরানগর নির্ম্মাণ করেন। হরিবংশে বলে, রাঘবেরা মথুরা ত্যাগ করিয়া গেলে, ভীম তাহা পুনর্ব্বার অধিকার করেন, এবং এই যদুসম্ভূত বংশই মথুরাবাসী যাদবগণ।

ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ৬২ সূক্তে যদু ও তুর্ব্বা (তুর্ব্বসু) এই দুই জনের নাম আছে (১০ ঋক্), কিন্তু তথায় ইঁহাদিগকে দাসজাতীয় রাজা বলা হইয়াছে।

কিন্তু ঐ মণ্ডলের ৪৯ সূক্তে ইন্দ্র বলিতেছেন, "তুর্ব্বসু ও যদু এই দুই ব্যক্তিকে আমি বলবান্ বলিয়া খ্যাতাপন্ন করিয়াছি (৮ ঋক্)"। ঐ সূক্তের ৩ ঋকে আছে,

"আমি দস্যুজাতিকে 'আর্য্য' এই নাম হইতে বঞ্চিত করিয়াছি।"* তবে দাসজাতীয় রাজাকে যে তিনি খ্যাতাপন্ন করিয়াছিলেন, ইহাতে কি বুঝিতে পারা যায়? এই যদু আর্য্য, না অনার্য্য? ইহা ঠিক বুঝা গেল না।

পুনশ্চ, প্রথম মণ্ডলের ৩৬ সূক্তে ১৮ ঋকের অর্থ এইরূপ—"অগ্নির দ্বারা তুর্ব্বসু, যদু ও উগ্রদেবকে দূর হইতে আমরা আহ্বান করি।" অনার্য্য রাজ সম্বন্ধে আর্য্য ঋষির এরূপ উক্তি সম্ভব কি?

যাহা হউক, তিন জন যদুর কথা পাই।

(১) যযাতিপুত্র।

(২) ইক্ষাকুবংশীয়।

(৩) অনার্য্য রাজা।

কৃষ্ণ, কোন্ যদুর বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা মীমাংসা করা দুর্ঘট। যখন তাঁহাদের মথুরায় ভিন্ন পাই না, এবং ঐ মথুরা ইক্ষাকুবংশীয়দিগের নির্ম্মিত, তখন এই যাদবেরা ইক্ষাকুবংশীয় নহে, ইহা জোর করিয়া বলা যায় না।

যে যদুবংশেই কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করুন, তদ্বংশে মধু সত্বত বৃষ্ণি, অন্ধক, কুকুর ও ভোজ প্রভৃতি রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বৃষ্ণি অন্ধক কুকুর ও ভোজবংশীয়েরা, একত্রে মথুরায় বাস করিতেন। কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশীয়, কংস ও দেবকী ভোজবংশীয়। কংস ও দেবকীর এক পিতামহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণের জন্ম

কংসের পিতা উগ্রসেন যাদবদিগের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কৃষ্ণের পিতা বসুদেব, দেবকীর স্বামী।

বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করিয়া যখন গৃহে আনিতেছিলেন, তখন কংস প্রীতিপূর্ব্বক, তাঁহাদের রথের সারথ্য গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগকে লইয়া যাইতেছিলেন। এমন সময়ে দৈববাণী হইল যে, ঐ দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত পুত্র কংসকে বধ করিবে। তখন আপদের শেষ করিবার জন্য কংস দেবকীকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। বসুদেব তাঁহাকে শান্ত করিয়া অঙ্গীকার করিলেন যে, তাঁহাদের যতগুলি পুত্র হইবে, তিনি স্বয়ং সকলকে কংসহস্তে সমর্পণ করিবেন। ইহাতে আপাততঃ দেবকীর প্রাণরক্ষা হইল, কিন্তু কংস বসুদেব ও দেবকীকে অবরুদ্ধ করিলেন। এবং তাঁহাদের প্রথম ছয় সন্তান বধ করিলেন। সপ্তমগর্ভস্থ সন্তান গর্ভেই বিনষ্ট হইয়াছিল। পুরাণে কথিত হইয়াছে বিষ্ণুর আজ্ঞানুসারে যোগনিদ্রা সেই গর্ভ আকর্ষণ করিয়া বসুদেবের অন্যা পত্নীর গর্ভে স্থাপিত করিয়াছিলেন।

সেই অন্যা পত্নী রোহিণী। মথুরার অদূরে, ঘোষপল্লীতে নন্দ নামে গোপব্যবসায়ীর বাস। তিনি বসুদেবের আত্মীয়। রোহিণীকে বসুদেব সেই নন্দের গৃহে রাখিয়া গিয়াছিলেন। সেইখানে রোহিণী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। এই পুত্র, বলরাম।

* এই কয়টি ঋকের অনুবাদ রমেশ বাবুর অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত করা গেল।

দেবকীর অষ্টমগর্ভে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন। এবং যথাকালে রাত্রে ভূমিষ্ঠ হইলেন। বসুদেব তাঁহাকে সেই রাত্রেই নন্দালয়ে লইয়া গেলেন। সেই রাত্রে নন্দপত্নী যশোদা একটি কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, ইনি সেই বৈষ্ণবী শক্তি যোগনিদ্রা। ইনি যশোদাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিলেন, ইত্যবসরে বসুদেব পুত্রটিকে সূতিকাগারে রাখিয়া কন্যাটি লইয়া স্বভবনে আসিলেন। সেই কন্যাকে তিনি কংসকে আপন কন্যা বলিয়া সমর্পণ করিলেন। কংস তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে পারিলেন না। যোগনিদ্রা আকাশপথে চলিয়া গেলেন, এবং বলিয়া গেলেন যে, কংসের নিধনকারী কোন স্থানে জন্মিয়াছেন। কংস তারপর ভগিনীকে কারামুক্ত করিলেন। কৃষ্ণ নন্দালয়ে রহিলেন।

এ সকল অনৈসর্গিক ব্যাপার; আমরা পূর্ব্বকৃত নিয়মানুসারে ত্যাগ করিতে বাধ্য। তবে ইহার মধ্যে একটু ঐতিহাসিক তত্ত্বও পাওয়া যায়। কৃষ্ণ মথুরায় যদুবংশে, দেবকীর গর্ভে, বসুদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি শৈশবে তাঁহাকে তাঁহার পিতা নন্দালয়ে* রাখিয়া আসিয়াছিলেন। নন্দালয়ে পুত্রকে লুকাইয়া রাখার জন্য তাঁহাকে কংসনাশবিষয়িণী দৈববাণীর বা কংসের প্রাণভয়ের আশ্রয় লইতে হয় নাই। ভাগবত পুরাণে এবং মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তিতেই আছে যে, কংস এই সময়ে অতিশয় দুরাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। সে ঔরঙ্গজেবের মত, আপনার পিতা উগ্রসেনকে পদচ্যুত করিয়া আপনি রাজ্যাধিকার করিয়াছিল। যাদবদিগের উপর এরূপ পীড়ন আরম্ভ করিয়াছিল যে, অনেক যাদব ভয়ে মথুরা হইতে পলায়ন করিয়া অন্য দেশে গিয়া বাস করিতেছিলেন। বসুদেবও আপনার অন্যা পত্নী রোহিণীকে ও তাঁহার পুত্রকে নন্দালয়ে রাখিয়াছিলেন। এখন কৃষ্ণকেও কংসভয়ে নন্দালয়ে লুকাইয়া রাখিলেন। ইহা সম্ভব এবং ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—শৈশব

কৃষ্ণের শৈশব সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ অনৈসর্গিক কথা পুরাণে কথিত হইয়াছে। একে একে তাহার পরিচয় দিতেছি।

১। পূতনাবধ। পূতনা কংসপ্রেরিতা রাক্ষসী। সে পরমরূপবতীর বেশ ধারণ করিয়া নন্দালয়ে কৃষ্ণবধার্থ প্রবেশ করিল। তাহার স্তনে বিষ বিলেপিত ছিল। সে শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপান করাইতে লাগিল। কৃষ্ণ তাহাকে এরূপ নিপীড়িত করিয়া স্তন্যপান করিলেন যে, পূতনার প্রাণ বহির্গত হইল। সে তখন নিজ রূপ ধারণ করিয়া ছয় ক্রোশ ভূমি ব্যাপিয়া নিপতিত হইল।

মহাভারতেও শিশুপালবধ পর্ব্বাধ্যায়ে পূতনাবধের প্রসঙ্গ আছে। শিশুপাল,

* কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে আমি কৃষ্ণের নন্দালয়ে বাসের কথা অবিশ্বাস করিয়াছিলাম। এবং তাহার পোষকতায় মহাভারত হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। সেই সকল কথা আমি পুনশ্চ উপযুক্ত স্থানে উদ্ধৃত করিব। এক্ষণে আমার ইহাই বক্তব্য যে, এক্ষণে পুনর্ব্বার বিশেষ বিচার করিয়া সে মত কিয়দংশে পরিত্যাগ করিয়াছি। আপনার ভ্রান্তি স্বীকার করিতে আমার আপত্তি নাই—ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তির ভ্রান্তি সচরাচরই ঘটিয়া থাকে।

পূতনাকে শকুনি বলিতেছেন। শকুনি বলিলে, গৃধ্র, চীল এবং শ্যামপক্ষীকেও বুঝায়। বলবান্ শিশুর একটা ক্ষুদ্র পক্ষী বধ করা বিচিত্র নহে।

কিন্তু পূতনার আর একটা অর্থ আছে। আমরা যাহাকে "পেঁচোয় পাওয়া" বলি, সূতিকাগারস্থ শিশুর সেই রোগের নাম পূতনা। সকলেই জানে যে, শিশু বলের সহিত স্তন্যপান করিতে পারিলে এ রোগ আর থাকে না। বোধ হয়, ইহাই পূতনাবধ।

২। শকটবিপর্য্যয়। যশোদা, কৃষ্ণকে একখানা শকটের নীচে শুয়াইয়া রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণের পদাঘাতে শকট উল্টাইয়া পড়িয়াছিল। ঋগ্বেদসংহিতায় ইন্দ্রকৃত উষার শকটভঞ্জনের একটা কথা আছে। এই কৃষ্ণকৃত শকটভঞ্জন, সে প্রাচীন রূপকের নূতন সংস্কারমাত্র হইতে পারে। অনেকগুলি বৈদিক উপাখ্যান কৃষ্ণলীলান্তর্গত হইয়াছে, এমন বিবেচনা করিবার কারণ আছে।

৩। তাহার পর মাতৃক্রোড়ে কৃষ্ণের বিশ্বম্ভরমূর্ত্তিধারণ, এবং স্বীয় ব্যাদিতানন-মধ্যে যশোদাকে বিশ্বরূপ দেখান। এটা প্রথম ভাগবতে দেখিতে পাই। ভাগবতকারেরই রচিত উপন্যাস বোধ হয়।

৪। তৃণাবর্ত্ত। তৃণাবর্ত্ত নামে অসুর কৃষ্ণকে একদা আকাশমার্গে তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল। ইহার যেরূপ বর্ণনা দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয়, ইহা চক্রবায়ু মাত্র। চক্রবায়ুর রূপ ধরিয়াই অসুর আসিয়াছিল, ভাগবতে এইরূপ কথিত হইয়াছে। এই উপাখ্যানও প্রথম ভাগবতেই দেখিতে পাই। সুতরাং ইহাও অমৌলিক সন্দেহ নাই। চক্রবায়ুতে ছেলে তুলিয়া ফেলাও বিচিত্র নহে।

৫। কৃষ্ণ একদা মৃত্তিকা ভোজন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ সে কথা অস্বীকার করায়, যশোদা তাঁহার মুখের ভিতর দেখিতে চাহিলেন। কৃষ্ণ হাঁ করিয়া বদনমধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখাইলেন। এটিও কেবল ভাগবতীয় উপন্যাস।

৬। ভাগবতকার আরও বলেন, কৃষ্ণ হাঁটিয়া বেড়াইতে শিখিলে তিনি গোপীদিগের গৃহে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতেন। অন্যান্য দৌরাত্ম্যমধ্যে, ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন। বিষ্ণুপুরাণেও এ কথা নাই; মহাভারতেও নাই।

হরিবংশে ননী মাখন চুরির কথা প্রসঙ্গক্রমে আছে। ভাগবতেই ইহার বাড়াবাড়ি। যে শিশুর ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান জন্মিবার সময় হয় নাই, সে খাদ্য চুরি করিলে কোন দোষ হইল না। যদি বলি যে, কৃষ্ণকে তোমরা ঈশ্বরাবতার বল; তাঁহার কোন বয়সেই জ্ঞানের অভাব থাকিতে পারে না। তাহার উত্তরে কৃষ্ণোপাসকেরা বলিতে পারেন যে, ঈশ্বরের চুরি নাই। জগতই যাঁহার—সব ঘৃত নবনীত মাখন যাঁহার সৃষ্ট—তিনি কার ধন লইয়া চোর হইলেন? সবই ত তাঁহার। আর যদি বল, তিনি মানবধর্ম্মাবলম্বী—মানবধর্ম্মে চুরি অবশ্য পাপ, তাহার উত্তর এই যে, মানবধর্ম্মাবলম্বী শিশুর পাপ নাই, কেন না, শিশুর ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান নাই। কিন্তু এ সকল বিচারে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই—কেন না, কথাটাই অমূলক। যদি মৌলিক কথা হয়, তবে ভাগবতকার, এ কথা যে ভাবে বলিয়াছেন, তাহা বড় মনোহর।

ভাগবতকার বলিয়াছেন যে, ননী মাখন ভগবান্ নিজের জন্য বড় চুরি করিতেন না; বানরদিগকে খাওয়াইতেন। বানরদিগকে খাওয়াইতে না পাইলে শুইয়া পড়িয়া

কাঁদিতেন। ভাগবতকার বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণ সর্ব্বভূতে সমদর্শী ; গোপীরা যথেষ্ট ক্ষীর নবনীত খায়,—বানরেরা পায় না, এজন্য গোপীদিগের লইয়া বানরদিগকে দেন। তিনি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, গোপী ও বানর তাঁহার নিকট ননী মাখনের তুল্যাধিকারী।

এই শিশু সর্ব্বজনের জন্য সহৃদয়তাপরবশ, সর্ব্বজনের দুঃখমোচনে উদ্যুক্ত। তির্য্যক্-জাতি বানরদিগের জন্য তাঁহার কাতরতার ভাগবতকার এই পরিচয় দিয়াছেন। আর একটি দুঃখিনী ফলবিক্রেত্রীর কথা বলিয়াছেন। কৃষ্ণের নিকট সে ফল লইয়া আসিলে কৃষ্ণ অঞ্জলি ভরিয়া তাহাকে রত্ন দিলেন। কথাগুলির ভাগবত ব্যতীত প্রমাণ কিছু নাই ; কিন্তু আমরা পরে দেখিব, পরহিতই কৃষ্ণের জীবনের ব্রত।

৭। যমলার্জ্জুনভঙ্গ। একদা কৃষ্ণ বড় "দুরন্তপনা" করিয়াছিলেন বলিয়া, যশোদা তাঁহার পেটে দড়ি বাঁধিয়া, একটা উদূখলে বাঁধিয়া রাখিলেন। কৃষ্ণ উদূখল টানিয়া লইয়া চলিলেন। যমলার্জ্জুন নামে দুইটা গাছ ছিল। কৃষ্ণ তাহার মধ্য দিয়া চলিলেন। উদূখল, গাছের মূলে বাধিয়া গেল। কৃষ্ণ তথাপি চলিলেন। গাছ দুইটা ভাঙ্গিয়া গেল।

এ কথা বিষ্ণুপুরাণে এবং মহাভারতের শিশুপালের তিরস্কারবাক্যে আছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি ? অর্জ্জুন বলে কুরচি গাছকে ; যমলার্জ্জুন অর্থে জোড়া কুরচি গাছ। কুরচি গাছ সচরাচর বড় হয় না, এবং অনেক গাছ ছোট দেখা যায়। যদি চারাগাছ হয়, তাহা হইলে বলবান্ শিশুর বলে ঐরূপ অবস্থায় তাহা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

কিন্তু ভাগবতকার পূর্ব্বপ্রচলিত কথার উপর, অতিরঞ্জন চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। গাছ দুইটি কুবেরপুত্র ; শাপনিবন্ধন গাছ হইয়াছিল, কৃষ্ণস্পর্শে মুক্ত হইয়া স্বধামে গমন করিল। কৃষ্ণকে বন্ধন করিবার কালে গোকুলে যত দড়ি ছিল, সব যোড়া দিয়াও কচি ছেলের পেট বাঁধা গেল না। শেষে কৃষ্ণ দয়া করিয়া বাঁধা দিলেন।

বিষ্ণুর একটি নাম দামোদর। বহিরিন্দ্রিয়নিগ্রহকে দম বলে। উদ্ উপর, ঋ গমনে, এজন্য উদর অর্থে উৎকৃষ্ট গতি। দমের দ্বারা যিনি উচ্চস্থান পাইয়াছেন, তিনিই দামোদর। বেদে আছে, বিষ্ণু তপস্যা করিয়া বিষ্ণুত্ব লাভ করিয়াছেন, নহিলে তিনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ মাত্র। শঙ্করাচার্য্য দামোদর শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "দমাদিসাধনেন উদরা উৎকৃষ্টা গতির্যা তয়া গম্যত ইতি দামোদরঃ।" মহাভারতেও আছে, "দমাদ্দামোদরং বিদুঃ।"

কিন্তু দামন্ শব্দে গোরুর দড়িও বুঝায়। যাহার উদর, গোরুর দড়িতে বাঁধা হইয়াছিল, সেও দামোদর। গোরুর দড়ির কথাটা উঠিবার আগে দামোদর নামটা প্রচলিত ছিল। নামটি পাইয়া ভাগবতকার দড়ি বাঁধার উপন্যাসটি গড়িয়াছেন, এই বোধ হয় নাকি ?

এক্ষণে নন্দাদি গোপগণ পূর্ব্ববাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিলেন। কৃষ্ণ নানাবিধ বিপদে পড়িয়াছিলেন, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই তাঁহারা বৃন্দাবন গেলেন, এইরূপ পুরাণে লিখিত আছে। বৃন্দাবন অধিকতর সুখের স্থান, এজন্যও হইতে পারে। হরিবংশে পাওয়া যায়, এই সময়ে ঘোষনিবাসে বড় বৃকের ভয় হইয়াছিল। গোপেরা তাই সেই স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—কৈশোরলীলা

এই বৃন্দাবন কাব্যজগতে অতুল্য সৃষ্টি। হরিৎপুষ্পশোভিত পুলিনশালিনী কলনাদিনী কালিন্দীকূলে কোকিল-ময়ূর-ধ্বনিত-কুঞ্জবনপরিপূর্ণা, গোপবালকগণের শৃঙ্গবেণুর মধুর রবে শব্দময়ী, অসংখ্যকুসুমামোদসুবাসিতা, নানাভরণভূষিতা বিশালায়ত-লোচনা ব্রজসুন্দরীগণসমলঙ্কৃতা বৃন্দাবনস্থলী, স্মৃতিমাত্র হৃদয় উৎফুল্ল হয়। কিন্তু কাব্যরস আস্বাদন জন্য কালবিলম্ব করিবার আমাদের সময় নাই। আমরা আরও গুরুতর তত্ত্বের অন্বেষণে নিযুক্ত।

ভাগবতকার বলেন, বৃন্দাবনে আসার পর কৃষ্ণ ক্রমশঃ তিনটি অসুর বধ করিলেন,—(১) বৎসাসুর, (২) বকাসুর, (৩) অঘাসুর। প্রথমটি বৎসরূপী, দ্বিতীয়টি পক্ষিরূপী, তৃতীয়টি সর্পরূপী। বলবান্ বালক, ঐ সকল জন্তু গোপালগণের অনিষ্টকারী হইলে, তাহাদিগকে বধ করা বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহার একটিরও কথা বিষ্ণুপুরাণে বা মহাভারতে, এমন কি, হরিবংশেও পাওয়া যায় না। সুতরাং অমৌলিক বলিয়া তিনটি অসুরের কথাই আমাদের পরিত্যাজ্য।

এই বৎসাসুর, বকাসুর এবং অঘাসুরবধোপাখ্যান মধ্যে সেরূপ তত্ত্ব খুঁজিলে না পাওয়া যায়, এমত নহে। বদ্ ধাতু হইতে বৎস; বন্ক্ ধাতু হইতে বক, এবং অঘ্ ধাতু হইতে অঘ। বদ্ ধাতু প্রকাশে, বন্ক্ কৌটিল্যে, এবং অঘ্ পাপে। যাহারা প্রকাশ্যবাদী বা নিন্দক, তাহারা বৎস, কুটিল শত্রুপক্ষ বক, পাপীরা অঘ। কৃষ্ণ অপ্রাপ্তকৈশোরেই এই ত্রিবিধ শত্রু পরাস্ত করিলেন। যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখার একাদশ অধ্যায়ে অগ্নিচয়নমন্ত্রের ৮০ কণ্ডিকায় যে মন্ত্র, তাহাতেও এইরূপ শত্রুদিগের নিপাতনের প্রার্থনা দেখা যায়। মন্ত্রটি এই ;—

"হে অগ্নে! যাহারা আমাদের অরাতি, যাহারা দ্বেষী, যাহারা নিন্দক এবং যাহারা জিঘাংসু, এই চারি প্রকার শত্রুকেই ভস্মসাৎ কর।"*

এই মন্ত্রের বেশির ভাগ অরাতি অর্থাৎ যাহারা ধন দেয় না (ভাষায় জুয়াচোর), তাহাদের নিপাতেরও কথা আছে। কিন্তু ভাগবতকার এই রূপক রচনাকালে এই মন্ত্রটি যে স্মরণ করিয়াছিলেন, এমত বোধ হয়। অথবা ইহা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, ঐ রূপকের মূল ঐ মন্ত্রে আছে।

তার পর ভাগবতে আছে যে, ব্রহ্মা, কৃষ্ণকে পরীক্ষা করিবার জন্য একদা মায়ার দ্বারা সমস্ত গোপাল ও গোবৎসগণকে হরণ করিলেন। কৃষ্ণ আর এক সেট্ রাখাল ও গোবৎসের সৃষ্টি করিয়া পূর্ব্ববৎ বিহার করিতে লাগিলেন। কথাটার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মাও কৃষ্ণের মহিমা বুঝিতে অক্ষম। তার পর একদিন, কৃষ্ণ দাবানলের আগুন সকলই পান করিলেন। শৈবদিগের নীলকণ্ঠের বিষপানের উপন্যাস আছে। বৈষ্ণবচূড়ামণি তাহার উত্তরে কৃষ্ণের অগ্নিপানের কথা বলিলেন।

এই বিখ্যাত কালিয়দমনের কথা বলিবার স্থান। কালিয়দমনের কথাপ্রসঙ্গমাত্র মহাভারতে নাই। হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে আছে। ভাগবতে বিশিষ্টরূপে সম্প্রসারিত

* সামশ্রমীকৃত অনুবাদ

হইয়াছে। ইহা উপন্যাসমাত্র—অনৈসর্গিকতায় পরিপূর্ণ। কেবল উপন্যাস নহে—রূপক। রূপকও অতি মনোহর।

উপন্যাসটি এই। যমুনার এক হ্রদে বা আবর্ত্তে কালিয় নামে এক বিষধর সর্প সপরিবারে বাস করিত। তাহার বহু ফণা। বিষ্ণুপুরাণের মতে তিনটি,* হরিবংশের মতে পাঁচটি, ভাগবতে সহস্র। তাহার অনেক স্ত্রী পুত্র পৌত্র ছিল। তাহাদিগের বিষে সেই আবর্ত্তের জল এমন বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল যে, তজ্জন্য নিকটে কেহ তিষ্ঠিতে পারিত না। অনেক ব্রজবালক ও গোবৎস সেই জল পান করিয়া প্রাণ হারাইত। সেই বিষের জ্বালায়, তীরে কোন তৃণলতা বৃক্ষাদিও বাঁচিত না। পক্ষিগণও সেই আবর্ত্তের উপর দিয়া উড়িয়া গেলে বিষে জর্জ্জরিত হইয়া জলমধ্যে পতিত হইত। এই মহাসর্পের দমন করিয়া বৃন্দাবনস্থ জীবগণের রক্ষাবিধান, শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত হইল। তিনি উল্লম্ফনপূর্ব্বক হ্রদমধ্যে নিপতিত হইলেন। কালিয় তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তাহার ফণার উপর আরোহণ করিয়া, বংশীধর গোপবালক নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভুজঙ্গ সেই নৃত্যে নিপীড়িত হইয়া রুধিরবমনপূর্ব্বক মুমূর্ষু হইল। তখন তাহার বণিতাগণ কৃষ্ণকে মনুষ্যভাষায় স্তব করিতে লাগিল। ভাগবতকার তাহাদিগের মুখে যে স্তব বসাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ভুজঙ্গমাঙ্গনাগণকে দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা বলিয়া বোধ হয়। বিষ্ণুপুরাণে তাহাদের মুখনির্গত স্তব বড় মধুর; পড়িয়া বোধ হয়, মনুষ্যপত্নীগণকে কেহ গরলোদ্গারিণী মনে করেন করুন, নাগপত্নীগণ সুধাবর্ষিণী বটে। শেষ কালিয় নিজেও কৃষ্ণস্তুতি আরম্ভ করিল। শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া কালিয়কে পরিত্যাগ করিয়া, যমুনা পরিত্যাগপূর্ব্বক সমুদ্রে গিয়া বাস করিতে তাহাকে আদেশ করিলেন। কালিয় সপরিবারে পলাইল। যমুনা প্রসন্নসলিলা হইলেন।

এই গেল উপন্যাস। ইহার ভিতর যে রূপক আছে, তাহা এই। এই কলবাহিনী কৃষ্ণসলিলা কালিন্দী অন্ধকারময়ী ঘোরনাদিনী কালস্রোতস্বতী। ইহার অতি ভয়ঙ্কর আবর্ত্ত আছে। আমরা যে সকলকে দুঃসময় বা বিপৎকাল মনে করি, তাহাই কালস্রোতের আবর্ত্ত। অতি ভীষণ বিষময় মনুষ্যশত্রু সকল এখানে লুক্কায়িত ভাবে বাস করে। ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাদের নিভৃত বাস, ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাদের কুটিল গতি, এবং ভুজঙ্গের ন্যায় অমোঘ বিষ। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, এবং আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধবিশেষে এই ভুজঙ্গের তিন ফণা। আর যদি মনে করা যায় যে, আমাদের ইন্দ্রিয়রতিই সকল অনর্থের মূল, তাহা হইলে, পঞ্চেন্দ্রিয়ভেদে ইহার পাঁচটি ফণা, এবং আমাদের অমঙ্গলের অসংখ্য কারণ আছে, ইহা ভাবিলে, ইহার সহস্র ফণা। আমরা ঘোর বিপদাবর্ত্তে এই ভুজঙ্গমের বশীভূত হইলে জগদীশ্বরের পাদপদ্ম ব্যতীত, আমাদের উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। কৃপাপরবশ হইলে তিনি এই বিষধরকে পদদলিত করিয়া মনোহর মূর্ত্তিবিকাশপূর্ব্বক অভয়বংশী বাদন করেন, শুনিতে পাইলে জীব আশান্বিত হইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। করালনাদিনী কালতরঙ্গিণী প্রসন্নসলিলা হয়। এই কৃষ্ণসলিলা ভীমনাদিনী কালস্রোতস্বতীর আবর্ত্ত-

* "মধ্যমং ফণং" ইহাতে তিনটি বুঝায়।

মধ্যে অমঙ্গলভুজঙ্গমের মস্তকারূঢ় এই অভয়বংশীধর মূর্ত্তি, পুরাণকারের অপূর্ব্ব সৃষ্টি! যে গড়িয়া পূজা করিবে, কে তাহাকে পৌত্তলিক বলিয়া উপহাস করিতে সাহস করিবে?

আমরা ধেনুকাসুর (গর্দ্দভ) এবং প্রলম্বাসুরের বধবৃত্তান্ত কিছু বলিব না, কেন না, উহা বলরামকৃত—কৃষ্ণকৃত নহে। বস্ত্রহরণ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহা আমরা অন্য পরিচ্ছেদে বলিব, এখন কেবল গিরিযজ্ঞবৃত্তান্ত বলিয়া এ পরিচ্ছেদের উপসংহার করিব।

বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন নামে এক পর্ব্বত ছিল, এখনও আছে। গোঁসাই ঠাকুরেরা এক্ষণে যেখানে বৃন্দাবন স্থাপিত করিয়াছেন, সে এক দেশে, আর গিরিগোবর্দ্ধন আর এক দেশে। কিন্তু পুরাণাদিতে পড়ি, উহা বৃন্দাবনের সীমান্তস্থিত। ঐ পর্ব্বত এক্ষণে যে ভাবে আছে, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যে, উহা কোন কালে, কোন প্রাকৃতিক বিপ্লবে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পুনঃস্থাপিত হইয়াছিল। বোধ হয়, অনেক সহস্র বৎসর ঐ ক্ষুদ্র পর্ব্বত ঐ অবস্থাতেই আছে, এবং ইহার উপর সংস্থাপিত হইয়া উপন্যাস রচিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ঐ গিরি তুলিয়া সপ্তাহ ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

উপন্যাসটা এই। বর্ষান্তে নন্দাদি গোপগণ বৎসর বৎসর একটা ইন্দ্রযজ্ঞ করিতেন। তাহার আয়োজন হইতেছিল। দেখিয়া কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কেন ইহা হইতেছে? তাহাতে নন্দ বলিলেন, ইন্দ্র বৃষ্টি করেন, বৃষ্টিতে শস্য জন্মে, শস্য খাইয়া আমরা ও গোপগণ জীবন ধারণ করি, এবং গোসকল দুগ্ধবতী হয়। অতএব ইন্দ্রের পূজা করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণ বলিলেন, আমরা কৃষী নহি। গাভীগণই আমাদের অবলম্বন, অতএব গাভীগণের পূজা, অর্থাৎ তাহাদিগকে উত্তম ভোজন করানই আমাদের বিধেয়। আর আমরা এই গিরির আশ্রিত, ইহার পূজা করুন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষুধার্ত্ত-গণকে উত্তমরূপে ভোজ করান। তাহাই হইল। অনেক দীনদরিদ্র ক্ষুধার্ত্ত এবং ব্রাহ্মণগণ (তাঁহারা দরিদ্রের মধ্যে) ভোজন করিলেন। গাভীগণ খুব খাইল। গোবর্দ্ধনও মূর্ত্তিমান হইয়া রাশি রাশি অন্নব্যঞ্জন খাইলেন। কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ নিজেই এই মূর্ত্তিমান্ গিরি সাজিয়া খাইয়াছিলেন।

ইন্দ্রযজ্ঞ হইল না। এখন পাঠক জানিতে পারেন যে, আমাদের পুরাণেতিহাসোক্ত দেবতা ও ব্রাহ্মণ সকল ভারি বদ্‌রাগী। ইন্দ্র বড় রাগ করিলেন। মেঘগণকে আজ্ঞা দিলেন, বৃষ্টি করিয়া বৃন্দাবন ভাসাইয়া দাও। মেঘসকল তাহাই করিল। বৃন্দাবন ভাসিয়া যায়। গোবৎস ও ব্রজবাসিগণের দুঃখের আর সীমা রহিল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন উপাড়িয়া বৃন্দাবনের উপর ধরিলেন। সপ্তাহ বৃষ্টি হইল, সপ্তাহ তিনি পর্ব্বত এক হাতে তুলিয়া ধরিয়া রাখিলেন। বৃন্দাবন রক্ষা পাইল। ইন্দ্র হার মানিয়া, কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ ও সন্ধি স্থাপন করিলেন।

মহাভারতে শিশুপালবাক্যে এই গিরিযজ্ঞের কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ আছে। শিশুপাল বলিতেছে যে, কৃষ্ণ যে বল্মীকতুল্য গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিল, তাই কি একটা বিচিত্র কথা? কৃষ্ণের প্রভূত অন্নব্যঞ্জনভোজন সম্বন্ধেও একটু ব্যঙ্গ আছে। এই পর্য্যন্ত। কিন্তু গোবর্দ্ধন আজিও বিদ্যমান,—বল্মীক নয়, পর্ব্বত বটে। কৃষ্ণ কি এই পর্ব্বত সাত দিন এক হাতে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন? যাঁহারা তাহাকে ঈশ্বরাবতার বলেন, তাঁহারা বলিতে পারেন ঈশ্বরের অসাধ্য কি? স্বীকার করি—কিন্তু সেই সঙ্গে

জিজ্ঞাসাও করি, ঈশ্বরাবতারের পর্ব্বতধারণের প্রয়োজন কি? যাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত মেঘ এক ফোঁটাও বৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না, সাত দিন পাহাড় ধরিয়া বৃষ্টি হইতে বৃন্দাবন রক্ষা করিবার তাঁহার প্রয়োজন কি? যাঁহার ইচ্ছামাত্রে সমস্ত মেঘ বিদূরিত, বৃষ্টি উপশান্ত, এবং আকাশ নির্ম্মল হইতে পারিত, তাঁহার পর্ব্বত তুলিয়া ধরিয়া সাত দিন খাড়া থাকিবার প্রয়োজন কি?

ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন, ইহা ভগবানের লীলা। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিব কি? ইহাও সত্য, কিন্তু আগে বুঝিব যে, ইনি ভগবান্, তাহার পর গিরিধারণ তাঁহার ইচ্ছাবিস্তারিত লীলা বলিয়া স্বীকার করিব। এখন, ইনি ভগবান্ ইহা বুঝিব কি প্রকারে? ইঁহার কার্য্য দেখিয়া। যে কার্য্যের অভিপ্রায় বা সুসঙ্গতি বুঝিতে পারিলাম না, সেই কার্য্যের কর্ত্তা ঈশ্বর, এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় কি? না বুঝিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় কি? যদি তাহা না যায়, তবে অনৈসর্গিক পরিত্যাগের যে নিয়ম আমরা সংস্থাপন করিয়াছি, তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া এই গিরিধারণবৃত্তান্তও উপন্যাসমধ্যে গণনা করাই বিধেয়। তবে এতটুকু সত্য থাকিতে পারে যে, কৃষ্ণ গোপগণকে ইন্দ্রযজ্ঞ হইতে বিরত করিয়া গিরিযজ্ঞে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। তার পর বাকি অনৈসর্গিক ব্যাপারটা গোবর্দ্ধনের উৎখাত ও পুনঃস্থাপিত অবস্থা অনুসারে গঠিত হইয়াছে।

এরূপ কার্য্যের একটা নিগূঢ় তাৎপর্য্যও দেখা যায়। যেমন বুঝিয়াছি, তেমনই বুঝাইতেছি।

এই জগতের একই ঈশ্বর। ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই। ইন্দ্র বলিয়া কোন দেবতা নাই। ইন্দ্ ধাতু বর্ষণে, তাহার পর রক্ প্রত্যয় করিলে ইন্দ্র শব্দ পাওয়া যায়। অর্থ হইল যিনি বর্ষণ করেন। বর্ষণ করে কে? যিনি সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বত্র বিধাতা, তিনিই বৃষ্টি করেন,—বৃষ্টির জন্য একজন পৃথক্ বিধাতা কল্পনা করা বা বিশ্বাস করা যায় না। তবে ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞ বা সাধারণ যজ্ঞে ইন্দ্রের ভাগ প্রচলিত ছিল বটে। এরূপ ইন্দ্রপূজার একটা অর্থও আছে। ঈশ্বর অনন্ত প্রকৃতি, তাঁহার গুণ সকল অনন্ত, কার্য্য অনন্ত, শক্তি সকলও সংখ্যায় অনন্ত। এরূপ অনন্তের উপাসনা কি প্রকারে করিব? অনন্তের ধ্যান হয় কি? যাহাদের হয় না, তাহারা তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা করে। এরূপ শক্তি সকলের বিকাশস্থল জড়জগতে বড় জাজ্বল্যমান। সকল জড়পদার্থে তাঁহার শক্তির পরিচয় পাই। তৎ-সাহায্যে অনন্তের ধ্যান সুসাধ্য হয়। এই জন্য প্রাচীন আর্য্যগণ তাঁহার জগৎপ্রসবিতৃত্ব স্মরণ করিয়া সূর্য্যে, তাঁহার সর্ব্বাবরকতা স্মরণ করিয়া বরুণে, তাঁহার সর্ব্বতেজের আধারভূতি স্মরণ করিয়া অগ্নিতে, তাঁহাকে জগৎপ্রাণ স্মরণ করিয়া বায়ুতে, এবং তদ্রূপে অন্যান্য জড়পদার্থে তাঁহার আরাধনা করিতেন।*

---

* যখন আমি প্রথম "প্রচার" নামক পত্রে এই মত প্রকাশিত করি, তখন অনেকে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। অনেকে ভাবিয়াছিলেন, আমি একটা নূতন মত প্রচার করিতেছি। তাঁহারা জানেন না যে, এ আমার মত নহে, স্বয়ং নিরুক্তকার যাস্কের মত। আমি যাস্কের বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"মাহাত্ম্যাদ্ দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে। একস্যাত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি।** আত্মা এব এষাং রথো ভবতি, আত্মা অশ্বাঃ, আত্মা আয়ুধম্, আত্মা ইষবঃ, আত্মা সর্ব্বদেবস্য।"

ইন্দ্রে এইরূপ তাঁহার বর্ষণকারিণী শক্তির উপাসনা করিতেন। কালে, লোকে উপাসনার অর্থ ভুলিয়া গেল, কিন্তু উপাসনার আকারটা বলবান্ রহিল। কালে এইরূপই ঘটিয়া থাকে; ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যা সম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছে; ভগবদ্গীতায় এবং মহাভারতের অন্যত্র দেখিব যে, কৃষ্ণ ধর্ম্মের এই মৃতদেহের সংকারে প্রবৃত্ত—তৎপরিবর্ত্তে অতি উচ্চ ঈশ্বরোপাসনাতে লোককে প্রবৃত্ত করিতে যত্নবান্। যাহা পরিণত বয়সে প্রচারিত করিয়াছিলেন, এই গিরিযজ্ঞ তাহার প্রবর্ত্তনায় তাঁহার প্রথম উদ্যম। জগদীশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন; মেঘেও যেমন আছেন, পর্ব্বতে ও গোবৎসেও সেইরূপ আছেন। যদি মেঘের বা আকাশের পূজা করিলে তাঁহার পূজা করা হয়, তবে পর্ব্বত বা গোগণের পূজা করিলেও তাঁহারই পূজা করা হইবে। বরং আকাশাদি জড়পদার্থের পূজা অপেক্ষা দরিদ্রদিগের এবং গোবৎসের সপরিতোষ ভোজন করান অধিকতর ধর্ম্মানুমত। গিরি-যজ্ঞের তাৎপর্য্যটা এইরূপ বুঝি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—ব্রজগোপী—বিষ্ণুপুরাণ

কৃষ্ণদ্বেষীদিগের নিকট যে কথা কৃষ্ণচরিত্রের প্রধান কলঙ্ক, এবং আধুনিক কৃষ্ণ-উপাসকদিগের নিকট যাহা কৃষ্ণভক্তির কেন্দ্রস্বরূপ, আমি এক্ষণে সেই তত্ত্বে উপস্থিত। কৃষ্ণের সহিত ব্রজগোপীদিগের সম্বন্ধের কথা বলিতেছি। কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনায় এই তত্ত্ব অতিশয় গুরুতর। এই জন্য এ কথা আমরা অতিশয় বিস্তারের সহিত কহিতে বাধ্য হইব।

মহাভারতে ব্রজগোপীদিগের কথা কিছুই নাই। সভাপর্ব্বে শিশুপালবধ-পর্ব্বাধ্যায়ে শিশুপালকৃত সবিস্তার কৃষ্ণনিন্দা আছে। যদি মহাভারতপ্রণয়নকালে ব্রজগোপীগণঘটিত কৃষ্ণের এই কলঙ্ক থাকিত, তাহা হইলে, শিশুপাল অথবা যিনি শিশুপালবধবৃত্তান্ত প্রণীত করিয়াছেন, তিনি কখনই কৃষ্ণনিন্দাকালে তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। অতএব নিশ্চিত যে, আদিম মহাভারত প্রণয়নকালে এ কথা চলিত ছিল না—তাহার পরে গঠিত হইয়াছে।

মহাভারতে কেবল ঐ সভাপর্ব্বে দ্রৌপদীবস্ত্রহরণকালে, দ্রৌপদীকৃত কৃষ্ণস্তবে 'গোপী-জনপ্রিয়' শব্দটা আছে, যথা—

"আকৃষ্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্যা চিন্তিতো হরিঃ।
গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়! ॥"

বৃন্দাবনে গোপীদিগের বাস। গোপ থাকিলেই গোপী থাকিবে। কৃষ্ণ অতিশয় সুন্দর, মাধুর্য্যময় এবং ক্রীড়াশীল বালক ছিলেন, এজন্য তিনি গোপ গোপী সকলেরই প্রিয় ছিলেন। হরিবংশে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ বালিকা যুবতী বৃদ্ধা সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। এবং যমলার্জ্জুনভঙ্গ প্রভৃতি উৎপাতকালে শিশু কৃষ্ণকে বিপন্ন দেখিয়া গোপরমণীগণ রোদন করিত এরূপ লেখা আছে। অতএব এই 'গোপীজনপ্রিয়' শব্দে সুন্দর শিশুর প্রতি স্ত্রীজনসুলভ স্নেহ ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না।

আমরা পূর্ব্বে যে নিয়ম করিয়াছি, তদনুসারে মহাভারতের পর বিষ্ণুপুরাণ দেখিতে হয়, এবং পূর্ব্বে যেমন দেখিয়াছি, এখনও তেমনই দেখিব যে, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ এবং

ভাগবত পুরাণে উপন্যাসের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এই ব্রজগোপীতত্ত্ব মহাভারতে নাই, বিষ্ণুপুরাণে পবিত্রভাবে আছে, হরিবংশে প্রথম কিঞ্চিৎ বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহার পর ভাগবতে আদিরসের অপেক্ষাকৃত বিস্তার হইয়াছে, শেষ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে তাহার স্রোত বহিয়াছে।

এই সকল কথা সবিস্তারে বুঝাইবার জন্য আমরা বিষ্ণুপুরাণে যতটুকু গোপীদিগের কথা আছে, তাহা সমস্ত উদ্ধৃত করিতেছি। দুই একটা শব্দ এরূপ আছে যে, তাহার দুই রকম অর্থ হইতে পারে, এজন্য আমি মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত করিয়া পশ্চাৎ তাহা অনুবাদিত করিলাম।

"কৃষ্ণস্তু বিমলং ব্যোম শরচ্চন্দ্রস্য চন্দ্রিকাম্।
তথা কুমুদিনীং ফুল্লামামোদিতদিগন্তরাম্॥ ১৪॥
বনরাজিং তথা কূজদ্‌ভৃঙ্গমালাং মনোরমাম্।
বিলোক্য সহ গোপীভির্ম্মনশ্চক্রে রতিং প্রতি॥ ১৫॥
সহ রামেণ মধুরমতীব বনিতাপ্রিয়ম্।
জগৌ কলপদং শৌরির্নানাতন্ত্রী কৃত-ব্রতম্॥ ১৬॥
রম্যং গীতধ্বনিং শ্রুত্বা সন্ত্যজ্যাবসথাংস্তদা।
আজগ্মুস্ত্বরিতা গোপ্যো যত্রাস্তে মধুসূদনঃ॥ ১৭॥
শনৈঃ শনৈর্জগৌ গোপী কাচিৎ তস্য লয়ানুগম্।
দত্তাবধানা কাচিত্তু তমেব মনসা স্মরন্॥ ১৮॥
কাচিৎ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রোক্ত্বা লজ্জামুপাগতা।
যযৌ চ কাচিৎ প্রেমান্ধা তৎপার্শ্বমবিলজ্জিতা॥ ১৯॥
কাচিদাবসথস্যান্তঃস্থিতা দৃষ্ট্বা বহির্গুরুন্।
তন্ময়ত্বেন গোবিন্দং দধ্যৌ মীলিতলোচনা॥ ২০॥
তচ্চিন্তাবিপুলাহ্লাদ-ক্ষীণপুণ্যচয়া তথা।
তদপ্রাপ্তিমহাদুঃখবিলীনাশেষপাতকা॥ ২১॥
চিন্তয়ন্তী জগৎসূতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্।
নিরুচ্ছ্বাসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপকন্যকা॥ ২২॥
গোপীপরিবৃতো রাত্রিং শরচ্চন্দ্রমনোরমাম্।
মানয়ামাস গোবিন্দো রাসারম্ভরসোৎসুকঃ॥ ২৩॥
গোপ্যশ্চ বৃন্দশঃ কৃষ্ণচেষ্টাস্বায়ত্তমূর্ত্তয়ঃ।
অন্যদেশং গতে কৃষ্ণে চেরুর্বৃন্দাবনান্তরম্॥ ২৪॥
কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়া ইদমূচুঃ পরস্পরম্।
কৃষ্ণোঽহমেতল্ললিতং ব্রজাম্যালোক্যতাং গতিঃ।
অন্যা ব্রবীতি কৃষ্ণস্য মম গীতির্নিশাম্যতাম্॥ ২৫॥
দুষ্ট কালিয়! তিষ্ঠাত্র কৃষ্ণোঽহমিতি চাপরা।
বাহুমাস্ফোট্য কৃষ্ণস্য লীলাসর্ব্বস্বমাদদে॥ ২৬॥

অন্যা ব্রবীতি ভো গোপা নিঃশঙ্কৈঃ স্থীয়তামিহ।
অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধৃতো গোবর্দ্ধনো ময়া॥ ২৭॥
ধেনুকোঽয়ং ময়া ক্ষিপ্তো বিচরন্তু যথেচ্ছয়া।
গোপী ব্রবীতি বৈ চান্যা কৃষ্ণলীলানুকারিণী॥ ২৮॥
এবং নানাপ্রকারাসু কৃষ্ণচেষ্টাসু তাস্তদা।
গোপ্যো ব্যগ্রাঃ সমঞ্চেরু রম্যং বৃন্দাবনং বনম্॥ ২৯॥
বিলোক্যৈক ভুবং প্রাহ গোপী গোপবরাঙ্গনা।
পুলকাঞ্চিতসর্ব্বাঙ্গী বিকাশিনয়নোৎপলা॥ ৩০॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাব্জাঙ্ক-রেখাবন্ত্যালি! পশ্যত।
পদান্যেতানি কৃষ্ণস্য লীলালঙ্কৃতগামিনঃ॥ ৩১॥
কাপি তেন সমং যাতা কৃতপুণ্যা মদালসা।
পদানি তস্যাশ্চৈতানি ঘনান্যল্পতনূনি চ॥ ৩২॥
পুষ্পাবচয়মত্রোচ্চৈশ্চক্রে দামোদরো ধ্রুবম্।
যেনাগ্রাক্রান্তিমাত্রাণি পদান্যত্র মহাত্মনঃ॥ ৩৩॥
অত্রোপবিশ্য সা তেন কাপি পুষ্পৈরলঙ্কৃতা।
অন্যজন্মনি সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুরভ্যর্চ্চিতো যয়া॥ ৩৪॥
পুষ্পবন্ধনসম্মান-কৃতমানামপাস্য তাম্।
নন্দগোপসুতো যাতো মার্গেণানেন পশ্যত॥ ৩৫॥
অনুযানেঽসমর্থান্যা নিতম্বভরমন্থরা।
যা গন্তব্যে দ্রুতং যাতি নিম্নপাদাগ্রসংস্থিতিঃ॥ ৩৬॥
হস্তন্যস্তাগ্রহস্তেয়ং তেন যাতি তথা সখি।
অনায়ত্তপদন্যাসা লক্ষ্যতে পদপদ্ধতিঃ॥ ৩৭॥
হস্তসংস্পর্শমাত্রেণ ধূর্ত্তেনৈষা বিমানিতা।
নৈরাশ্যমন্দগামিন্যা নিবৃত্তং লক্ষ্যতে পদম্॥ ৩৮॥
নূনমুক্তা ত্বরামীতি পুনরেষ্যামি তেঽন্তিকম্।
তেন কৃষ্ণেন যেনৈষা ত্বরিতা পদপদ্ধতিঃ॥ ৩৯॥
প্রবিষ্টো গহনং কৃষ্ণঃ পদমত্র ন লক্ষ্যতে।
নিবর্ত্তধ্বং শশাঙ্কস্য নৈতদ্দীধিতিগোচরে॥ ৪০॥
নিবৃত্তাস্তাস্ততো গোপ্যো নিরাশাঃ কৃষ্ণদর্শনে।
যমুনাতীরমাগত্য জগুস্তচ্চরিতং তদা॥ ৪১॥
ততো দদৃশুরায়ান্তং বিকাশি-মুখপঙ্কজম্।
গোপ্যস্ত্রৈলোক্যগোপ্তারং কৃষ্ণমক্লিষ্ট-চেষ্টিতম্॥ ৪২॥
কাচিদালোক্য গোবিন্দমায়ান্তমতিহর্ষিতা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রাহ নান্যদুদৈরয়ৎ॥ ৪৩॥
কাচিদ্ভ্রূভঙ্গুরং কৃত্বা ললাটফলকং হরিম্।
বিলোক্য নেত্রভৃঙ্গাভ্যাং পপৌ তন্মুখপঙ্কজম্॥ ৪৪॥

কাচিদালোক্য গোবিন্দং নিমীলিত-বিলোচনা।
তস্যৈব রূপং ধ্যায়ন্তী যোগারূঢ়েব চাবভৌ ॥ ৪৫ ॥
ততঃ কাশ্চিৎ প্রিয়ালাপৈঃ কাশ্চিদ্‌ভ্রূভঙ্গ-বীক্ষণৈঃ।
নিন্যেঽনুনয়মন্যাশ্চ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥ ৪৬ ॥
তাভিঃ প্রসন্নচিত্তাভির্গোপীভিঃ সহ সাদরম্‌।
ররাম-রাসগোষ্ঠীভিরুদার-চরিতো হরিঃ ॥ ৪৭ ॥
রাসমণ্ডল-বন্ধোঽপি কৃষ্ণপার্শ্বমনুজ্‌ঝতা।
গোপীজনেন নৈবাভূদেকস্থানস্থিরাত্মনা ॥ ৪৮ ॥
হস্তে প্রগৃহ্য চৈকৈকাং গোপিকাং রাসমণ্ডলীম্‌।
চকার তৎকরস্পর্শনিমীলিতদৃশাং হরিঃ ॥ ৪৯ ॥
ততঃ স ববৃতে রাসশ্চলদ্বলয়নিস্বনঃ।
অনুযাতশরৎকাব্য-গেয়গীতিরনুক্রমাৎ ॥ ৫০ ॥
কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীং কুমুদাকরম্‌।
জগৌ গোপীজনস্ত্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃ পুনঃ ॥ ৫১ ॥
পরিবর্ত্তশ্রমেণৈকা চলদ্বলয়লাপিনীম্‌।
দদৌ বাহুলতাং স্কন্ধে গোপী মধুনিঘাতিনঃ ॥ ৫২ ॥
কাচিৎ প্রবিলসদ্বাহুঃ পরিরভ্য চুচুম্ব তম্‌।
গোপী গীতস্তুতিব্যাজ নিপুণা মধুসূদনম্‌ ॥ ৫৩ ॥
গোপীকপোলসংশ্লেষমভিপত্য হরের্ভুজৌ।
পুলকোদ্গমশস্যায় স্বেদাম্বু ঘনতাং গতৌ ॥ ৫৪ ॥
রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণো যাবৎ তারতরধ্বনিঃ।
সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবৎ তা দ্বিগুণং জগুঃ ॥ ৫৫ ॥
গতে তু গমনং চক্রুর্বলনে সংমুখং যয়ুঃ।
প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং ভেজুর্গোপাঙ্গনা হরিম্‌ ॥ ৫৬ ॥
স তথা সহ গোপীভী ররাম মধুসূদনঃ।
যথাব্দকোটিপ্রমিতঃ ক্ষণস্তেন বিনাভবৎ ॥ ৫৭ ॥
তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃভিস্তথা।
কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়াঃ ॥ ৫৮ ॥
সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্‌ মধুসূদনঃ।
রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ ॥" ৫৯ ॥

বিষ্ণুপুরাণম্‌, পঞ্চমাংশ, ১৩ অঃ

"নির্ম্মলাকাশ, শরচ্চন্দ্রের চন্দ্রিকা, ফুল্লকুমুদিনী, দিক্‌ সকল গন্ধামোদিত, ভৃঙ্গমালাশব্দে বনরাজি মনোরম, দেখিয়া কৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে মানস করিলেন। বলরামের সহিত সৌরি অতীব মধুর স্ত্রীজনপ্রিয় নানাতন্ত্রীসম্মিলিত অস্ফুটপদ সঙ্গীত গান করিলেন। রম্য গীতধ্বনি শুনিয়া তখন গৃহপরিত্যাগপূর্ব্বক যথা মধুসূদন আছেন, সেইখানে গোপীগণ ত্বরান্বিতা হইয়া আসিল। কোন গোপী তাঁহার

লয়ানুগমনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে গায়িতে লাগিল। কেহ বা কৃষ্ণকে মনোমধ্যে স্মরণপূর্ব্বক তাঁহাতে একমনা হইল। কেহ বা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া লজ্জিতা হইল। কেহ বা লজ্জাহীনা ও প্রেমান্ধা হইয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিল। কেহ বা গৃহমধ্যে থাকিয়া বাহিরে গুরুজনকে দেখিয়া নিমীলিতলোচনা হইয়া গোবিন্দকে তন্ময়ত্বের সহিত ধ্যান করিতে লাগিল। অন্যা গোপকন্যা কৃষ্ণচিন্তাজনিত বিপুলাহ্লাদে ক্ষীণপুণ্যা হইয়া এবং কৃষ্ণকে অপ্রাপ্তিহেতু যে মহাদুঃখ, তদ্দ্বারা তাহার অশেষ পাতক বিলীন হইলে, পরব্রহ্মস্বরূপ জগৎকারণকে চিন্তা করিয়া পরোক্ষার্থ জ্ঞানহেতু মুক্তিলাভ করিল। গোবিন্দ শরচ্চন্দ্রমনোরম রাত্রিতে গোপীজন কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া রাসারম্ভরসে* সমুৎসুক হইলেন। কৃষ্ণ অন্যত্র চলিয়া গেলে গোপীগণ কৃষ্ণচেষ্টার অনুকারিণী হইয়া দলে দলে বৃন্দাবনমধ্যে ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল; এবং কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়া হইয়া পরস্পরকে এইরূপ বলিতে লাগিল, 'আমি কৃষ্ণ, এই ললিতগতিতে গমন করিতেছি, তোমরা আমার গমন অবলোকন কর।' অন্যা বলিল, আমি কৃষ্ণ, আমার গান শ্রবণ কর।' অপরা বলিল, 'দুষ্ট কালিয়! এইখানে থাক, আমি কৃষ্ণ', এবং বাহু আস্ফোটন-পূর্ব্বক কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিল। আর কেহ বলিল, 'হে গোপগণ! তোমরা নির্ভয়ে এইখানে থাক, বৃথা বৃষ্টির ভয় করিও না, আমি এইখানে গোবর্দ্ধন ধরিয়া আছি।' অন্যা কৃষ্ণলীলানুকারিণী গোপী বলিল, 'এই ধেনুককে আমি নিক্ষিপ্ত করিয়াছি, তোমরা যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ কর।' এইরূপে সেই সকল গোপী তৎকালে নানাপ্রকার কৃষ্ণচেষ্টানুবর্ত্তিনী হইয়া ব্যগ্রভাবে রম্য বৃন্দাবন বনে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। এক গোপবরাঙ্গনা গোপী ভূমি দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গ পুলকরোমাঞ্চিত হইয়া এবং নয়নোৎপল বিকশিত করিয়া বলিতে লাগিল, 'হে সখি! দেখ, এই ধ্বজবজ্রাঙ্কুশরেখাবন্ত পদচিহ্নসকল লীলালঙ্কৃতগামী কৃষ্ণের। কোন পুণ্যবতী মদালসা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে; তাহারই এই সকল ঘন এবং ক্ষুদ্র পদচিহ্নগুলি। সেই মহাত্মার (কৃষ্ণের) পদচিহ্নের অগ্রভাগ মাত্র এখানে দেখা যাইতেছে, অতএব নিশ্চিত দামোদর এইখানে উচ্চ পুষ্পসকল অবচিত করিয়াছেন। তিনি কোনও গোপীকে এইখানে বসিয়া পুষ্পের দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সে জন্মান্তরে সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুকে অর্চ্চিত করিয়া থাকিবে। পুষ্পবন্ধনসম্মানে সে গর্ব্বিতা হইয়া থাকিবে, তাই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নন্দগোপসুত এই পথে গমন করিয়াছেন দেখ। আর এই পাদাগ্রচিহ্ন সকলের নিম্নতা দেখিয়া (বোধ হইতেছে) নিতম্বভার-মন্থরা কেহ তাঁহার সঙ্গে গমনে অসমর্থা হইয়া গন্তব্যে দ্রুত গমনের চেষ্টা করিয়াছিল। হে সখি, আর এইখানে পদচিহ্ন সকল দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, সেই অনায়ত্তপদন্যাসা গোপীকে তিনি হস্তে গ্রহণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সে হস্তসংস্পর্শ পরেই সেই ধূর্ত্তের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল; কেন না, এ পদচিহ্ন দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, সে নৈরাশ্যহেতু মন্দগামিনী হইয়া প্রতিনিবৃত্তা হইয়াছিল! আর সেই কৃষ্ণ নিশ্চিত ইহাকে বলিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই গিয়া আমি তোমার নিকট

* রাস অর্থে নৃত্যবিশেষ:—"অন্যোন্যব্যতিষক্তহস্তানাং স্ত্রীপুংসাং গায়তাং মণ্ডলীরূপেণ ভ্রমতাং নৃত্যবিনোদঃ রাসো নাম'' ইতি শ্রীধরঃ।

পুনর্ব্বার আসিতেছি। সেই জন্য ইহার পদপদ্ধতি আবার ত্বরিত হইয়াছে। এখন গহনে কৃষ্ণ প্রবেশ করিয়াছেন বোধ হয়, কেন না, আর পদচিহ্ন দেখা যায় না। এখানে আর চন্দ্রকিরণ প্রবেশ করে না। আইস ফিরিয়া যাই।

"অনন্তর গোপীগণ দেখিল, বিকাশিতমুখপঙ্কজ ত্রৈলোক্যের রক্ষাকর্ত্তা অক্লিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণ আসিলেন। কেহ গোবিন্দকে আগত দেখিয়া অত্যন্ত হর্ষিত হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে লাগিল, আর কিছুই বলিতে পারিল না। কোন গোপী ললাটফলকে ভ্রূভঙ্গ করিয়া, হরিকে দেখিয়া, তাঁহারা মুখপঙ্কজ নেত্রভৃঙ্গদ্বয়ের দ্বারা পান করিতে লাগিল; কেহ গোবিন্দকে দেখিয়া নিমীলিত লোচনে যোগারূঢ়ার ন্যায় শোভিত হইয়া তাঁহার রূপ ধ্যান করিতে লাগিল। অনন্তর মাধব তাহাদিগকে অনুনয়নীয় বিবেচনায় কাহাকে বা প্রিয়ালাপের দ্বারা, কাহাকে বা ভ্রূভঙ্গবীক্ষণের দ্বারা, কাহাকে বা করস্পর্শের দ্বারা সান্ত্বনা করিলেন। পরে উদারচরিত হরি প্রসন্নচিত্ত গোপীদিগের সহিত সাদরে রাসমণ্ডলমধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা কৃষ্ণের পার্শ্ব ছাড়ে না, এক স্থানে স্থির থাকে, এজন্য সেই গোপীদিগের সহিত রাসমণ্ডলবন্ধও হইল না। পরে একে একে গোপীদিগকে হস্তের দ্বারা গ্রহণ করিলে তাহারা তাঁহার করস্পর্শে নিমীলিতচক্ষু হইলে কৃষ্ণ রাসমণ্ডলী প্রস্তুত করিলেন। অতঃপর গোপীদিগের চঞ্চলবলয়শব্দিত এবং গোপীগণগীত শরৎকাব্যগানের দ্বারা অনুযাত রাসক্রীড়ায় তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণ শরচ্চন্দ্র ও কৌমুদী ও কুমুদ সম্বন্ধীয় গান করিলেন। গোপীগণ পুনঃ পুনঃ এক কৃষ্ণনামই গায়িতে লাগিল। এক গোপী নর্ত্তনজনিত শ্রমে শ্রান্ত হইয়া চঞ্চলবলয়ধ্বনিবিশিষ্ট বাহুলতা মধুসূদনের স্কন্ধে স্থাপিত করিল। কপটতায় নিপুণা কোন গোপী কৃষ্ণগীতের স্তুতিচ্ছলে বাহুদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া মধুসূদনকে চুম্বিত করিল। কৃষ্ণের ভুজদ্বয় কোন গোপীর কপোলসংশ্লেষপ্রাপ্ত হইয়া পুলকোদ্গমরূপ শস্যোৎপাদনের জন্য স্বেদাম্বুমেঘত্ব প্রাপ্ত হইল। তারতর ধ্বনিতে কৃষ্ণ যাবৎকাল রাসগীত গায়িতে লাগিলেন, তাবৎকাল গোপীগণ 'সাধু কৃষ্ণ, সাধু কৃষ্ণ' বলিয়া দ্বিগুণ গায়িল। কৃষ্ণ গেলে তাহারা গমন করিতে লাগিল, কৃষ্ণ আবর্ত্তন করিলে তাহারা সম্মুখে আসিতে লাগিল, এইরূপ প্রতিলোম অনুলোম গতির দ্বারা গোপাঙ্গনাগণ হরিকে ভজনা করিল। মধুসূদন গোপীদিগের সহিত সেইখানে ক্রীড়া করিলেন। তাহারা তাঁহাকে বিনা, ক্ষণমাত্রকে কোটি বৎসর মনে করিতে লাগিল। ক্রীড়ানুরাগিণী গোপাঙ্গনাগণ পতির দ্বারা, পিতার দ্বারা, ভ্রাতার দ্বারা নিবারিত হইয়াও রাত্রিকালে কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিল। শত্রুধ্বংসকারী অমেয়াত্মা মধুসূদনও আপনাকে কিশোরবয়স্ক জানিয়া, রাত্রে তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিলেন।"

এই অনুবাদ সম্বন্ধে একটি কথা বক্তব্য এই যে, "রম্"-ধাতুনিষ্পন্ন শব্দের অর্থে আমি ক্রীড়ার্থে "রম্" ধাতু বুঝিয়াছি; যথা, "রতিপ্রিয়া" অর্থে আমি 'ক্রীড়ানুরাগিণী' বুঝিয়াছি। আদৌ "রম্" ধাতু ক্রীড়ার্থেই ব্যবহৃত। উহার যে অর্থান্তর আছে, তাহা ক্রীড়ার্থ হইতেই পশ্চাৎ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'রতি' ও 'রতিপ্রিয়' শব্দ এই অর্থে যে কৃষ্ণলীলায় সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার অনেক উদাহরণ আছে। পাঠক

হরিবংশের সপ্তষষ্টিতম পুস্তকান্তরে অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ে এইরূপ প্রয়োগ দেখিবেন।* তথায় ক্রীড়াশীল গোপালগণকে 'রতিপ্রিয়' গোপাল বলা হইয়াছে। আর এই অর্থই এখানে সঙ্গত, কেন না, 'রাস' একটি ক্রীড়াবিশেষ। অদ্যাপি ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে ঐরূপ ক্রীড়া বা নৃত্য প্রচলিত আছে। রাসের অর্থ কি, তাহা শ্রীধর স্বামী বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন—

"অন্যোন্যব্যতিষক্তহস্তানাং স্ত্রীপুংসাং গায়তাং মণ্ডলীরূপেণ ভ্রমতাং নৃত্যবিনোদো রাসো নাম।"

অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষে পরস্পরের হাত ধরিয়া গায়িতে গায়িতে এবং মণ্ডলীরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে যে নৃত্য করে, তাহার নাম রাস। বালকবালিকায় এরূপ নৃত্য করে আমরা দেখিয়াছি, এবং যাহারা বাল্য অতিক্রম করিয়াছে, তাহারাও দেশবিশেষে এরূপ নৃত্য করে শুনিয়াছি। ইহাতে আদিরসের নামগন্ধও নাই।

'রাস' একটা খেলা, এবং 'রতি' শব্দে খেলা। অতএব রাসবর্ণনে 'রতি' শব্দ ব্যবহৃত হইলে অনুবাদকালে তৎপ্রতিশব্দস্বরূপ 'ক্রীড়া' শব্দই ব্যবহার করিতে হয়।

এই রাসলীলাবৃত্তান্ত কিয়ৎপরিমাণে দুর্ব্বোধ্য। ইহার ভিতরে যে গূঢ় তাৎপর্য্য আছে, তাহা আমি গ্রন্থান্তরে পরিস্ফুট করিয়াছি। কিন্তু এখানে এ তত্ত্ব অসম্পূর্ণ রাখা অনুচিত, এজন্য যাহা বলিয়াছি, তাহা পুনরুক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি।

আমি "ধর্ম্মতত্ত্ব" গ্রন্থে বলিয়াছি যে, মনুষ্যত্বই মনুষ্যের ধর্ম্ম। সেই মনুষ্যত্ব বা ধর্ম্মের উপাদান আমাদের বৃত্তিগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতা। সেই বৃত্তিগুলিকে শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জিনী এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্য্যাদির পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা নির্ম্মল এবং অতুলনীয় আনন্দ অনুভূত করি, সেই সকলের নাম দিয়াছি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। তাঁহার সম্যক্ অনুশীলনে, সচ্চিদানন্দময় জগৎ এবং জগন্ময় সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপানুভূতি হইতে পারে। চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির অনুশীলন অভাবে ধর্ম্মের হানি হয়। যিনি আদর্শ মনুষ্য, তাঁহার কোন বৃত্তিই অননুশীলিত বা স্ফূর্ত্তিহীন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এই রাসলীলা কৃষ্ণ এবং গোপীগণ-কৃত সেই চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি অনুশীলনের উদাহরণ।

কৃষ্ণপক্ষে ইহা উপভোগমাত্র, কিন্তু গোপী-পক্ষে ইহা ঈশ্বরোপাসনা। এক

* "স তত্র বয়সা তুল্যৈর্বৎসপালৈঃ সহানঘঃ।
রেমে বৈ দিবসং কৃষ্ণং পুরা স্বর্গগতো যথা॥
তং ক্রীড়মানং গোপালাঃ কৃষ্ণং ভাণ্ডীরবাসিনম্।
রময়ন্তি স্ম বহবো বন্যৈঃ ক্রীড়নকৈস্তদা॥
অন্যে স্ম পরিগায়ন্তি গোপামুদিতমানসাঃ।
গোপালাঃ কৃষ্ণমেবান্যে গায়ন্তি স্ম রতিপ্রিয়া॥"

এই তিন শ্লোকে "রম্"-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্দ তিন বার ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা, "রেমে", "রময়ন্তি" "রতিপ্রিয়া"; তিন বারই ক্রীড়ার্থে, অর্থান্তর কোন মতেই ঘটান যায় না। কেন না, গোপালদিগের কথা হইতেছে।

দিকে অনন্তসুন্দরের সৌন্দর্য্যবিকাশ, আর একদিকে অনন্তসুন্দরের উপাসনা। চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির চরম অনুশীলন সেই বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা। প্রাচীন ভারতে স্ত্রীগণের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ; কেন না, বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের পক্ষে কর্ম্মমার্গ কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভক্তিতে তাহাদের বিশেষ অধিকার। ভক্তি, কথিত হইয়াছে, "পরানুরক্তিরীশ্বরে"। অনুরাগ নানা কারণে জন্মিতে পারে। কিন্তু সৌন্দর্য্যের মোহঘটিত যে অনুরাগ,, তাহা মনুষ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। অতএব অনন্তসুন্দরের সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই স্ত্রীজাতির জীবনসার্থকতার মুখ্য উপায়। এই তত্ত্বাত্মক রূপকই রাসলীলা। জড়প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য তাহাতে বর্ত্তমান। শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র, শরৎপ্রবাহপরিপূর্ণা শ্যামলসলিলা যমুনা প্রস্ফুটিতকুসুমসুবাসিত কুঞ্জবিহঙ্গমকূজিত বৃন্দাবন-বনস্থলী, এবং তন্মধ্যে অনন্তসুন্দরের স্বশরীরে বিকাশ। তাহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী কৃষ্ণগীতি। এইরূপ সর্ব্বপ্রকার চিত্তরঞ্জনের দ্বারা গোপীগণের ভক্তি উদ্রিক্তা হইলে, তাহারা কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়া আপনাদিগকেই কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল, কৃষ্ণের কথিতব্য কথা কহিতে লাগিল, এবং কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্য্যের অনুবাগিণী হইয়া জীবাত্মা পরমাত্মায় যে অভেদ জ্ঞান, যাহা যোগীর যোগের এবং জ্ঞানীর জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য, তাহা প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন্ হইল।

ইহাও আমাকে স্বীকার করিতে হয়, যুবক যুবতী একত্র হইয়া নৃত্যগীত করা আমাদিগের আধুনিক সমাজে নিন্দনীয়। অন্যান্য সমাজে—যথা ইউরোপে—নিন্দনীয় নহে। বোধ হয়, যখন বিষ্ণুপুরাণ প্রণীত হইয়াছিল, তখনও সমাজের এইরূপ অবস্থা ছিল, এবং পুরাণকারেরও মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, কার্য্যটা নিন্দনীয়। সেই জন্যই তিনি লিখিয়া থাকিবেন যে,—

"তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃভিস্তথা।"

এবং সেই জন্যই অধ্যায়শেষে কৃষ্ণের দোষক্ষালন জন্য লিখিয়াছেন,—

"তদ্ভর্ত্তৃষু তথা তাসু সর্ব্বভূতেষু চেশ্বরঃ।
আত্মস্বরূপরূপোঽসৌ ব্যাপ্য বায়ুরিব স্থিতঃ॥
যথা সমস্তভূতেসু নভোঽগ্নিঃ পৃথিবী জলম্।
বায়ুশ্চাত্মা তথৈবাসৌ ব্যাপ্য সর্ব্বমবস্থিতঃ॥"

তিনি তাহাদিগের ভর্ত্তৃগণে এবং তাহাদিগেতে ও সর্ব্বভূতেতে, ঈশ্বর ও আত্মস্বরূপ-রূপে সকলই বায়ুর ন্যায় ব্যাপিয়া আছেন। যেমন সমগ্র ভূতে, আকাশ, অগ্নি, পৃথিবী, জল এবং বায়ু, তেমনি তিনিও সর্ব্বভূতে আছেন।

এইরূপ দোষক্ষালনের কোন প্রয়োজন ছিল না। যুবক যুবতীর একত্রে নৃত্য করায় ধর্ম্মতঃ কোন দোষ ঘটে না, কেবল এই সমাজে সামাজিক দোষ ঘটে এবং কৃষ্ণের সময়ে, বোধ হয়, সে সামাজিক দোষও ছিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—ব্রজগোপী

হরিবংশ

বিষ্ণুপুরাণ হইতে পূর্ব্বপরিচ্ছেদে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা পঞ্চম অংশের ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে। ঐ অধ্যায় ব্যতীত ব্রজগোপীদিগের কথা বিষ্ণুপুরাণে আর কোথাও নাই। কেবল কৃষ্ণ মথুরাগমনকালে তাঁহাদের খেদোক্তি আছে।

সেইরূপ হরিবংশেও ব্রজগোপীদিগের কথা বিষ্ণুপর্ব্বের ৭৭ অধ্যায়, গ্রন্থান্তরে ৭৬ অধ্যায় ভিন্ন আর কোথাও নাই। যাহা আছে, সে সমস্তই উদ্ধৃত করিতেছি। কিন্তু উদ্ধৃত করিবার আগে বক্তব্য যে, "রাস" শব্দ হরিবংশে ব্যবহৃত হয় নাই। তৎপরিবর্ত্তে "হল্লীষ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের নাম "হল্লীষক্রীড়নম্"। যথা—"ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি হল্লীষক্রীড়নে সপ্তসপ্ততোঽধ্যায়ঃ।" হেমচন্দ্রাভিধানে, "হল্লীষ" অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"মণ্ডলেন তু যন্নৃত্যং স্ত্রীণাং হল্লীষকন্তু তৎ।"

বাচস্পত্যে তারানাথ লিখিয়াছেন—

"স্ত্রীণাং মণ্ডলিকাকারনৃত্যে।"

অতএব, 'হল্লীষ' এবং 'রাস' একই কথা—নৃত্যবিশেষ।

এক্ষণে হরিবংশের কথা তুলিতেছি।

কৃষ্ণস্তু যৌবনং দৃষ্ট্বা নিশি চন্দ্রমসো নবং।
শারদীঞ্চ নিশাং রম্যাং মনশ্চক্রে রতিম্প্রতি॥
স করীষাঙ্গরাগাসু ব্রজরথ্যাসু বীর্য্যবান্।
বৃষাণাং জাতদর্পাণাং যুদ্ধানি সমজোজয়ৎ॥
গোপালাংশ্চ বলোদগ্রান্ যোধয়ামাস বীর্য্যবান্।
বনে স বীরো গাশ্চৈব জগ্রাহ গ্রাহবদ্বিভুঃ॥
যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সঙ্কাল্য কালবিৎ।
কৈশোরকং মানয়ন্ বৈ সহ তাভির্মুমোদ হ॥
তাস্তস্য বদনং কান্তং কান্তা গোপস্ত্রিয়ো নিশি।
পিবন্তি নয়নাক্ষেপৈর্গাঙ্গতং শশিনং যথা॥
হরিতালাদ্র্পীতেন সকৌষেয়েন বাসসা।
বসানো ভদ্রবসনং কৃষ্ণঃ কান্ততরোঽভবৎ॥
স বদ্ধাঙ্গদনির্যূহশ্চিত্রয়া বনমালয়া।
শোভমানো হি গোবিন্দঃ শোভয়ামাস তং ব্রজং॥
নাম দামোদরেত্যেবং গোপকন্যাস্তদাহব্রুবন্।
বিচিত্রং চরিতং ঘোষে দৃষ্ট্বা তত্তস্য ভাসতঃ॥
তাস্তং পয়োধরোত্তানৈরুরোভিঃ সমপীড়য়ন্।
ভ্রামিতাক্ষৈশ্চ বদনৈর্নিরৈক্ষন্ত বরাঙ্গনাঃ॥

তা বার্য্যমাণাঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃভির্ম্মাতৃভিস্তথা।
কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ মৃগয়ন্তে রতিপ্রিয়াঃ॥
তাস্তু পংক্তীকৃতাঃ সর্ব্বা রময়ন্তি মনোরমং।
গায়ন্ত্য কৃষ্ণচরিতং দ্বন্দ্বশো গোপকন্যকাঃ॥
কৃষ্ণলীলানুকারিণ্যঃ কৃষ্ণপ্রণিহিতেক্ষণাঃ।
কৃষ্ণস্য গতিগামিন্যস্তরুণ্যস্তা বরাঙ্গনাঃ॥
বনেষু তালহস্তাগ্রৈঃ কুট্টয়ন্তস্তথাহপরাঃ।
চেরুর্বৈ চরিতং তস্য কৃষ্ণস্য ব্রজযোষিতঃ॥
তাস্তস্য নৃত্যং গীতঞ্চ বিলাসস্মিতবীক্ষিতম্।
মুদিতাশ্চানুকুর্ব্বন্ত্যঃ ক্রীড়ন্ত্যো ব্রজযোষিতঃ॥
ভাবনিস্যন্দমধুরং গায়ন্ত্যস্তা বরাঙ্গনাঃ।
ব্রজং গতাঃ সুখং চেরুর্দামোদরপরায়ণাঃ॥
করীষপাংশুদিগ্ধাঙ্গাস্তাঃ কৃষ্ণমনুবব্রিরে।
রময়ন্ত্যো যথা নাগং সম্প্রমত্তং করেণবঃ॥
তমন্যা ভাববিকচৈর্নেত্রৈঃ প্রহসিতাননাঃ।
পিবন্ত্যতৃপ্তা বনিতাঃ কৃষ্ণং কৃষ্ণমৃগেক্ষণাঃ।
মুখমস্যাব্জসঙ্কাশং তৃষিতা গোপকন্যকাঃ।
রত্যন্তরগতা রাত্রৌ পিবন্তি রতিলালসাঃ॥
হাহেতি কুর্ব্বতস্তস্য প্রহৃষ্টাস্তা বরাঙ্গনাঃ।
জগৃহুর্নিঃসৃতাং বাণীং সাম্না দামোদরেরিতাং॥
তাসাং গ্রথিতসীমন্তা রতিশ্রান্ত্যাকুলীকৃতাঃ।
চারু বিস্রংসিরে কেশাঃ কুচাগ্রে গোপযোষিতাম্॥
এবং স কৃষ্ণো গোপীনাং চক্রবালৈরলঙ্কৃতঃ।
শারদীষু সচন্দ্রাসু নিশাসু মুমুদে সুখী॥"—হরিবংশে, ৭৭ অধ্যায়ঃ।

"কৃষ্ণ রাত্রে চন্দ্রমার নবযৌবন (বিকাশ) দেখিয়া এবং রম্যা শারদীয়া নিশা দেখিয়া ক্রীড়াভিলাষী হইলেন। কখনও ব্রজের শুষ্কগোময়াকীর্ণ রাজপথে জাতদর্প বৃষগণকে বীর্য্যবান্ কৃষ্ণ যুদ্ধে সংযুক্ত করিতেন, কখনও বলদৃপ্ত গোপালগণকে যুদ্ধ করাইতেন, এবং কুম্ভীরের ন্যায় গোগণকে বনমধ্যে গ্রহণ করিতেন। কালজ্ঞ কৃষ্ণ আপনার কিশোর বয়সের সম্মানার্থ যুবতী গোপকন্যাগণের জন্য কাল নির্ণীত করিয়া রাত্রে তাহাদিগের সহিত আনন্দানুভব করিলেন। সেই গোপসুন্দরীগণ নয়নাক্ষেপ দ্বারা ধরাগত চন্দ্রের মত তাঁহার সুন্দর মুখমণ্ডল পান করিল। সুবসন কৃষ্ণ, হরিতালার্দ্র পীত কৌষেয় বসন পরিহিত হইয়া কান্ততর হইলেন। অঙ্গদসমূহ ধারণপূর্ব্বক বিচিত্র বনমালা দ্বারা শোভিত হইয়া গোবিন্দ সেই ব্রজ শোভিত করিতে লাগিলেন। সেই বাক্যালাপী কৃষ্ণের বিচিত্র চরিত্র দেখিয়া ঘোষমধ্যে গোপকন্যাগণ তখন তাঁহাকে দামোদর বলিত; পয়োধরস্থিতিহেতু ঊর্দ্ধমুখ হৃদয়ের দ্বারা নিপীড়িত করিয়া সেই বরাঙ্গনাগণ ভ্রামিতচক্ষু বদনের দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে লাগিল।

ক্রীড়ানুরাগিণী গোপাঙ্গনাগণ পিতা, ভ্রাতা ও মাতা কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও রাত্রে কৃষ্ণের নিকটে গমন করিল। তাহারা সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সাজিয়া, মনোহর ক্রীড়া করিল; এবং যুগ্মে যুগ্মে কৃষ্ণচরিত গান করিল। বরাঙ্গনা তরুণীগণ কৃষ্ণলীলানুকারিণী, কৃষ্ণে প্রণিহিতলোচনা, এবং কৃষ্ণের গমনানুগামিনী হইল। কোন কোন ব্রজবালা হস্তাগ্রে তালকুট্টনপূর্ব্বক কৃষ্ণচরিত আচরিত করিতে লাগিল। ব্রজযোষিদ্গণ, কৃষ্ণের নৃত্য, গীত, বিলাসস্মিতবীক্ষণ অনুকরণপূর্ব্বক, সানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিল। কৃষ্ণপরায়ণা বরাঙ্গনাগণ ভাবনিস্যন্দমধুর গান করত ব্রজে গিয়া সুখে বিচরণ করিতে লাগিল। সম্প্রমত্ত হস্তীকে করেণুগণ যেরূপ ক্রীড়া করায়, শুষ্ক গোময় দ্বারা দিগ্ধাঙ্গ সেই গোপীগণ সেইরূপ কৃষ্ণের অনুবর্ত্তন করিল। সহাস্যবদনা কৃষ্ণমৃগলোচনা অন্যা বনিতাগণ ভাবোৎফুল্ল লোচনের দ্বারা কৃষ্ণকে অতৃপ্ত হইয়া পান করিতে লাগিল। ক্রীড়ালালসা-তৃষিতা গোপকন্যাগণ রাত্রিতে অনন্যক্রীড়াসক্ত হইয়া অব্জসঙ্কাশ কৃষ্ণমুখমণ্ডল পান করিতে লাগিল। কৃষ্ণ হা হা ইতি শব্দ করিয়া গান করিলে কৃষ্ণমুখনিঃসৃত সেই বাক্য, বরাঙ্গনাগণ আহ্লাদিত হইয়া গ্রহণ করিল। সেই গোপযোষিদ্গণের ক্রীড়াশ্রান্তিপ্রযুক্ত আকুলীকৃত সীমন্তগ্রথিত কেশদাম কুচাগ্রে বিস্রস্ত হইতে লাগিল। চক্রবালালঙ্কৃত শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ সচন্দ্রা শারদী নিশাতে সুখে গোপীদিগের সহিত আনন্দ করিতে লাগিলেন।"

বিষ্ণুপুরাণ হইতে রাসলীলাতত্ত্ব অনুবাদ কালে 'রম্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্দ সকলের যেরূপ ক্রীড়ার্থে অনুবাদ করিয়াছি, এই অনুবাদেও সেই সকল কারণে ঐ সকল শব্দের ক্রীড়ার্থ প্রতিশব্দ ব্যবহার করিয়াছি। জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, অন্য কোনরূপ প্রতিশব্দ ব্যবহার হইতেই পারে না। যথা—

"তাস্তু পংক্তীকৃতাঃ সর্ব্বা রময়ন্তি মনোরমম্।"

এখানে ক্রীড়ার্থে ভিন্ন রত্যর্থে 'রময়ন্তি' শব্দ কোন রকমেই বুঝা যায় না। যাঁহারা অনুরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্বপ্রচলিত কুসংস্কারবশতঃই করিয়াছেন।

এই হল্লীষক্রীড়াবর্ণনা বিষ্ণুপুরাণকৃত রাসবর্ণনার অনুগামী। এমন কি, এক একটি শ্লোক উভয় গ্রন্থে প্রায় একই। যথা, বিষ্ণুপুরাণে আছে—

"তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃভিস্তথা।
কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ মৃগয়ন্তে রতিপ্রিয়াঃ॥"

হরিবংশে আছে—

"তা বার্য্যমাণাঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃভিঃ মাতৃভিস্তথা।
কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়াঃ॥"

তবে বিষ্ণুপুরাণের অপেক্ষা হরিবংশের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। অন্যান্য বিষয়ে সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না। সচরাচর দেখা যায়, বিষ্ণুপুরাণে যাহা সংক্ষিপ্ত, হরিবংশে তাহা বিস্তৃত এবং নানা প্রকার নূতন উপন্যাস ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। হরিবংশে রাসলীলার এইরূপ সংক্ষেপবর্ণনার একটু কারণও আছে। উভয় গ্রন্থ সবিস্তারে তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, কবিত্বে, গাম্ভীর্য্যে, পাণ্ডিত্যে এবং ঔদার্য্যে হরিবংশকার বিষ্ণু-পুরাণকারের অপেক্ষা অনেক লঘু। তিনি বিষ্ণুপুরাণের রাসবর্ণনার নিগূঢ় তাৎপর্য্য

এবং গোপীগণকৃত ভক্তিযোগ দ্বারা কৃষ্ণে একাত্মতা প্রাপ্তি বুঝিতে পারেন নাই। তাহা না বুঝিতে পারিয়াই সেখানে বিষ্ণুপুরাণকার লিখিয়াছেন,—

"কাচিৎ প্রবিলসদ্বাহুঃ পরিরভ্য চুচুম্ব তম্ ।"

সেখানে হরিবংশকার লিখিয়া বসিয়াছেন,

"তাস্তং পয়োধরোত্তানৈরুরোভিঃ সমপীড়য়ন্ ।" ইত্যাদি।

প্রভেদটুকু এই যে, বিষ্ণুপুরাণের চপলা বালিকা আনন্দে চঞ্চলা, আর হরিবংশের এই গোপীগণ বিলাসিনীর ভাব প্রকাশ করিতেছে। হরিবংশকারের অনেক স্থলে বিলাসপ্রিয়তার মাত্রাধিক্য দেখা যায়।

আর আর কথা বিষ্ণুপুরাণে রাসলীলা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, হরিবংশের এই হল্লীষক্রীড়া সম্বন্ধেও বর্ত্তে।

উপরিলিখিত শ্লোকগুলি ভিন্ন হরিবংশে ব্রজগোপীদের সম্বন্ধে আর কিছুই নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—ব্রজগোপী—ভাগবত

বস্ত্রহরণ

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রজগোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ কেবল রাসনৃত্যে পর্য্যাপ্ত হয় নাই। ভাগবতকার গোপীদিগের সহিত কৃষ্ণলীলার বিশেষ বিস্তার করিয়াছেন। সময়ে সময়ে তাহা আধুনিক রুচির বিরুদ্ধ। কিন্তু সেই সকল বর্ণনার বাহ্যদৃশ্য এখনকার রুচিবিগর্হিত হইলেও, অভ্যন্তরে অতি পবিত্র ভক্তিতত্ত্ব নিহিত আছে। হরিবংশকারের ন্যায় ভাগবতকার বিলাসপ্রিয়তা-দোষে দূষিত নহেন। তাঁহার অভিপ্রায় অতিশয় নিগূঢ় এবং অতিশয় বিশুদ্ধ।

দশম স্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে প্রথমতঃ গোপীদিগের পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের বেণুরব শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়া পরস্পরের নিকট কৃষ্ণানুরাগ ব্যক্ত করিতেছে। সেই পূর্ব্বানুরাগ বর্ণনায় কবি অসাধারণ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তার পর তাহা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য একটি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। সেই উপন্যাস "বস্ত্রহরণ" বলিয়া প্রসিদ্ধ। বস্ত্রহরণের কোন কথা মহাভারতে, বিষ্ণুপুরাণে বা হরিবংশে নাই, সুতরাং উহা ভাগবতকারের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। বৃত্তান্তটা আধুনিক রুচিবিরুদ্ধ হইলেও আমরা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না, কেন না, ভাগবতব্যাখ্যাত রাসলীলাকথনে আমরা প্রবৃত্ত, এবং সেই রাসলীলার সঙ্গে ইহার বিশেষ সম্বন্ধ।

কৃষ্ণানুরাগবিবশা ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণকে পতিভাবে পাইবার জন্য কাত্যায়নীব্রত করিল। ব্রতের নিয়ম এক মাস। এই এক মাস তাহারা দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া প্রত্যূষে যমুনাসলিলে অবগাহন করিত। স্ত্রীলোকদিগের জলাবগাহন বিষয়ে একটা কুৎসিত প্রথা এ কালেও ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে প্রচলিত আছে। স্ত্রীলোকেরা অবগাহনকালে নদীতীরে বস্ত্রগুলি ত্যাগ করিয়া, বিবস্ত্রা হইয়া জলমগ্না হয়। সেই প্রথানুসারে এই ব্রজাঙ্গনাগণ কূলে বসন রক্ষা করিয়া বিবস্ত্রা হইয়া অবগাহন করিত।

মাসান্তে যে দিন ব্রত সম্পূর্ণ হইবে, সে দিনও তাহারা ঐরূপ করিল। তাহাদের কর্ম্মফল (উভয়ার্থে) দিবার জন্য সেই দিন শ্রীকৃষ্ণ সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি পরিত্যক্ত বস্ত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া তীরস্থ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন।

গোপীগণ বড় বিপন্না হইল। তাহারা বিনাবস্ত্রে উঠিতে পারে না; এ দিকে প্রাতঃসমীরণে জলমধ্যে শীতে প্রাণ যায়। তাহারা কণ্ঠ পর্য্যন্ত নিমগ্না হইয়া, শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে, কৃষ্ণের নিকট বস্ত্রভিক্ষা করিতে লাগিল। কৃষ্ণ সহজে বস্ত্র দেন না—গোপীদিগের "কর্ম্মফল" দিবার ইচ্ছা আছে। তার পর যাহা ঘটিল, তাহা আমরা স্ত্রীলোক বালক প্রভৃতির বোধগম্য বাঙ্গালা ভাষায় কোন মতেই প্রকাশ করিতে পারি না। অতএব মূল সংস্কৃতই বিনানুবাদে উদ্ধৃত করিলাম।

ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণকে বলিতে লাগিল ;—

মাহনয়ং ভো কৃথাস্ত্বাস্ত নন্দগোপসুতং প্রিয়ম্।
জানীমোহঙ্গ ব্রজশ্লাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ॥
শ্যামসুন্দর তে দাস্য করবাম তবোদিতম্।
দেহি বাসাংসি ধর্ম্মজ্ঞ নোচেদ্রাজ্ঞে ব্রুবাম হে॥

শ্রীভগবানুবাচ॥

ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তঞ্চ করিষ্যথ।
অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ।
নোচেন্নাহং প্রদাস্যে কিং ক্রুদ্ধো রাজা করিষ্যতি॥
ততো জলাশয়াৎ সর্ব্বা দারিকাঃ শীতবেপিতাঃ।
পাণিভ্যাং * * আচ্ছাদ্য প্রোত্তেরুঃ শীতকর্শিতাঃ॥
ভগবানাহ তা বীক্ষ্য শুদ্ধভাবপ্রসাদিতঃ।
স্কন্ধে নিধায় বাসাংসি প্রীতঃ প্রোবাচ সস্মিতম্॥
যূয়ং বিবস্ত্রা যদপো ধৃতব্রতা ব্যগাহতৈতত্তদু দেবহেলনম্।
বদ্ধাঞ্জলিং মূর্দ্ধ্ন্যপনুত্তয়েঽংহসঃ কৃত্বা নমো* বসনং প্রগৃহ্যতাম্॥
ইত্যুচ্যুতেনাভিহিতং ব্রজাবলা মত্বা বিবস্ত্রাপ্লবনং ব্রতচ্যুতিম্।
তৎপূর্ত্তিকামাস্তদশেষকর্ম্মণাং সাক্ষাৎকৃতং নেমুরবদ্যমৃগ্ যতঃ॥
তাস্তথাবনতা দৃষ্ট্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
বাসাংসি তাভ্যঃ প্রাযচ্ছৎ করুণস্তেন তোষিতঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০ম স্কন্দঃ, ২২ অধ্যায়।

অন্তর্নিহিত ভক্তিতত্ত্বটা এই। ঈশ্বরকে ভক্তি দ্বারা পাইবার প্রধান সাধনা, ঈশ্বরে সর্ব্বার্পণ। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বার্পণ করিল। স্ত্রীলোক, যখন সকল পরিত্যাগ করিতে পারে, তখনও লজ্জা ত্যাগ করিতে পারে না। ধন ধর্ম্ম কর্ম্ম ভাগ্য—সব যায়, তথাপি স্ত্রীলোকের লজ্জা যায় না। লজ্জা স্ত্রীলোকের শেষ রত্ন। যে স্ত্রীলোক,

অপরের জন্য লজ্জা পরিত্যাগ করিল, সে তাহাকে সব দিল। এই স্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণে লজ্জাও অর্পিত করিল। এ কামাতুরার লজ্জার্পণ নহে—লজ্জাবিবশার লজ্জার্পণ। অতএব তাহারা ঈশ্বরে সর্ব্বস্বার্পণ করিল। কৃষ্ণও তাহা ভক্ত্যুপহার বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমাতে যাহাদের বুদ্ধি আরোপিত হইয়াছে, তাহাদের কামনা কামার্থে কল্পিত হয় না। যব ভর্জিত এবং কাথিত হইলে, বীজত্বে সমর্থ হয় না।" অর্থাৎ যাহারা কৃষ্ণকামিনী তাহাদিগের কামাবশেষ হয়। আরও বলিলেন, "তোমরা যে জন্য ব্রত করিয়াছ, আমি তাহা রাত্রে সিদ্ধ করিব।"

এখন গোপীগণ কৃষ্ণকে পতিস্বরূপ পাইবার জন্যই ব্রত করিয়াছিল। অতএব কৃষ্ণ, তাহাদের কামনাপূরণ করিতে স্বীকৃত হইয়া, তাহাদের পতিত্ব স্বীকার করিলেন। কাজেই বড় নৈতিক গোলযোগ উপস্থিত। এই গোপাঙ্গনাগণ পরপত্নী, তাহাদের পতিত্ব স্বীকার করায়, পরদারাভিমর্ষণ স্বীকার করা হইল। কৃষ্ণে এ পাপারোপণ কেন?

ইহার উত্তর আমার পক্ষে অতি সহজ। আমি ভূরি ভূরি প্রমাণের দ্বারা বুঝাইয়াছি যে, এ সকল পুরাণকারকল্পিত উপন্যাসমাত্র, ইহার কিছু মাত্র সত্যতা নাই। কিন্তু পুরাণকারের পক্ষে উত্তর তত সহজ নহে। তিনিও পরিক্ষিতের প্রশ্নানুসারে শুকমুখে একটা উত্তর দিয়াছেন। যথাস্থানে তাহার কথা বলিব। কিন্তু আমাকেও এখানে বলিতে হইবে যে, হিন্দুধর্ম্মের ভক্তিবাদানুসারে, কৃষ্ণকে এই গোপীগণপতিত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ নিজে বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

"যে যেভাবে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবে অনুগ্রহ করি।" অর্থাৎ যে আমার নিকট বিষয়ভোগ কামনা করে, তাহাকে আমি তাহাই দিই। যে মোক্ষ কামনা করে, তাহাকে মোক্ষ দিই। বিষ্ণুপুরাণে আছে, দেবমাতা অদিতি কৃষ্ণ (বিষ্ণু)কে বলিতেছেন যে, আমি তোমাকে পুত্রভাবে কামনা করিয়াছিলাম, এজন্য তোমাকে পুত্রভাবেই পাইয়াছি। এই ভাগবতেই আছে যে, বসুদেব দেবকী জগদীশ্বরকে পুত্রভাবে কামনা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে পুত্রভাবে পাইয়াছেন। অতএব গোপীগণ তাঁহাকে পতিভাবে পাইবার জন্য যথোপযুক্ত সাধনা করিয়াছিল বলিয়া, কৃষ্ণকে তাহারা পতিভাবে পাইল।

যদি তাই হইল, তবে তাহাদের অধর্ম্ম কি? ঈশ্বরপ্রাপ্তিতে অধর্ম্ম আবার কি? পাপের দ্বারা, পুণ্যময়, পুণ্যের আদিভূত স্বরূপ জগদীশ্বরকে কি পাওয়া যায়? পাপ-পুণ্য কি? যাহার দ্বারা জগদীশ্বরের সন্নিধি উপস্থিত হইতে পারি, তাহাই পুণ্য—তাহাই ধর্ম্ম; তাহার বিপরীত যাহা, তাহাই পাপ—তাহাই অধর্ম্ম।

পুরাণকার এই তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্য পাপসংস্পর্শের পথমাত্র রাখেন নাই। তিনি ২৯ অধ্যায়ে বলিয়াছেন, যাহারা পতিভাবে কৃষ্ণকে কামনা না করিয়া উপপতিভাবে তাঁহাকে কামনা করিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে সশরীরে পাইল না; তাহাদের পতিগণ তাহাদিগকে আসিতে দিল না; কৃষ্ণচিন্তা করিয়া তাহারা প্রাণত্যাগ করিল।

"তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥" ১০।২৯।১০

কৃষ্ণপতি ভিন্ন অন্য পতি যাহাদের স্মরণ মাত্রে ছিল, কাজেই তাহারা কৃষ্ণকে উপপতি ভাবিল। কিন্তু অন্য পতি স্মৃতিমাত্রে থাকায়, তাহারা কৃষ্ণ সম্বন্ধে অনন্যচিন্তা হইতে পারিল না। তাহারা সিদ্ধ, বা ঈশ্বরপ্রাপ্তির অধিকারিণী হইল না। যতক্ষণ জারবুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ পাপবুদ্ধি থাকিবে, কেন না, জারানুগমন পাপ। যতক্ষণ জারবুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ কৃষ্ণে ঈশ্বরজ্ঞান হইতে পারে না—কেন না, ঈশ্বরে জারজ্ঞান হয় না—ততক্ষণ কৃষ্ণকামনা, কামকামনা মাত্র। ঈদৃশী গোপী কৃষ্ণপরায়ণা হইলেও সশরীরে কৃষ্ণকে পাইতে অযোগ্যা।

অতএব এই পতিভাবে জগদীশ্বরকে পাইবার কামনায় গোপীদিগের পাপমাত্র রহিল না। গোপীদিগের রহিল না, কিন্তু কৃষ্ণের? এই কথার উত্তরে বিষ্ণুপুরাণকার যাহা বলিয়াছেন, ভাগবতকারও তাহাই বলিয়াছেন। ঈশ্বরের আবার পাপপুণ্য কি? তিনি আমাদের মত শরীরী নহেন, শরীরী ভিন্ন ইন্দ্রিয়পরতা বা তজ্জনিত দোষ ঘটে না। তিনি সর্ব্বভূতে আছেন, গোপীগণেও আছেন, গোপীগণের স্বামীতেও আছেন। তাঁহার কর্ত্তৃক পরদারাভিমর্ষণ সম্ভবে না।

এ কথায় আমাদের একটা আপত্তি আছে। ঈশ্বর এখানে শরীরী, এবং ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট। যখন ঈশ্বর ইচ্ছাক্রমে মানবশরীর গ্রহণ করিয়াছেন, তখন মানবধর্ম্মাবলম্বী হইয়া কার্য্য করিবার জন্যই শরীর গ্রহণ করিয়াছেন। মানবধর্ম্মীর পক্ষে গোপবধূগণ পরস্ত্রী, এবং তদভিগমন পরদারপাপ। কৃষ্ণই গীতায় বলিয়াছেন, লোকশিক্ষার্থ তিনি কর্ম্ম করিয়া থাকেন। লোকশিক্ষক পারদারিক হইলে, পাপাচারী ও পাপের শিক্ষক হইলেন। অতএব পুরাণকারকৃত দোষক্ষালন খাটে না। এইরূপ দোষক্ষালনের কোন প্রয়োজনও নাই। ভাগবতকার নিজেই কৃষ্ণকে এই রাসমণ্ডলমধ্যে জিতেন্দ্রিয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। যথা—

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০ স্ক, ৩৩ অঃ, ২৬।

তবে, বিষ্ণুপুরাণকারের অপেক্ষাও ভাগবতকার প্রগাঢ়তায় এবং ভক্তিতত্ত্বের পারদর্শিতায় অনেক শ্রেষ্ঠ। স্ত্রীজাতি, জগতের মধ্যে পতিকেই প্রিয়বস্তু বলিয়া জানে; যে স্ত্রী, জগদীশ্বরে পরমভক্তিমতী, সে সেই পতিভাবেই তাঁহাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিল—ইংরেজি পড়িয়া আমরা যাই বলি—কথাটা অতি রমণীয়।—ইহাতে কত মনুষ্যহৃদয়াভিজ্ঞতার এবং ভগবদ্ভক্তির সৌন্দর্য্যগ্রাহিতার পরিচয় দেয়। তারপর যে পতিভাবে তাঁহাকে দেখিল, সেই পাইল,—যাহার জারবুদ্ধি রহিল, সে পাইল না, এ কথাও ভক্তির ঐকান্তিকতা বুঝাইবার কি সুন্দর উদাহরণ! কিন্তু আর একটা কথায় পুরাণকার বড় গোলযোগের সূত্রপাত করিয়াছেন। পতিত্বে একটা ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ আছে। কাজে কাজেই সেই ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ ভাগবতোক্ত রাসবর্ণনের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। ভাগবতোক্ত রাস, বিষ্ণুপুরাণের ও হরিবংশের রাসের

ন্যায় কেবল নৃত্যগীত নয়। যে কৈলাসশিখরে তপস্বী কপর্দ্দীর রোষানলে ভস্মীভূত, সে বৃন্দাবনে কিশোর রাসবিহারীর পদাশ্রয়ে পুনর্জ্জীবনার্থ ধূমিত। অনঙ্গ এখানে প্রবেশ করিয়াছেন। পুরাণকারের অভিপ্রায় কদর্য্য নয়; ঈশ্বরপ্রাপ্তিজনিত মুক্ত জীবের যে আনন্দ, যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ইতি বাক্য স্মরণ রাখিয়া, তাহাই পরিস্ফুট করিতে গিয়াছেন। কিন্তু লোকে তাহা বুঝিল না। তাঁহার রোপিত ভগবদ্ভক্তিপঙ্কজের মূল, অতল জলে ডুবিয়া রহিল—উপরে কেবল বিকশিত কামকুসুমদাম ভাসিতে লাগিল। যাহারা উপরে ভাসে—তলায় না, তাহারা কেবল সেই কুসুমদামের মালা গাঁথিয়া, ইন্দ্রিয়পরতাময় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রস্তুত করিল। যাহা ভাগবতে নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব, জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা মদনধর্ম্মোৎসব। এত কাল, আমাদের জন্মভূমি সেই মদনধর্ম্মোৎসবভারাক্রান্ত। তাই কৃষ্ণচরিত্রের অভিনব ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়াছে। কৃষ্ণচরিত্র, বিশুদ্ধতায়, সর্ব্বগুণময়ত্বে জগতে অতুল্য। আমার ন্যায় অক্ষম, অধম ব্যক্তি সেই পবিত্র চরিত্র গীত করিলেও লোকে তাহা শুনিবে, তাই এই অভিনব কৃষ্ণগীতি রচনায় সাহস করিয়াছি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—ব্রজগোপী—ভাগবত

ব্রাহ্মণকন্যা

বস্ত্রহরণের নিগূঢ় তাৎপর্য্য আমি যেরূপ বুঝাইয়াছি, তৎসম্বন্ধে একটা কথা বাকি আছে।

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

ইতি বাক্যের অনুবর্ত্তী হইয়া যে জগদীশ্বরে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারে, সেই ঈশ্বরকে পাইবার অধিকারী হয়। বস্ত্রহরণকালে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বস্বার্পণ ক্ষমতা দেখাইল, এজন্য তাহারা কৃষ্ণকে পাইবার অধিকারিণী হইল। আর একটি উপন্যাস রচনা করিয়া ভাগবতকার এই তত্ত্ব আরও পরিষ্কৃত করিয়াছেন। সে উপন্যাস এই,—

একদা গোচারণকালে বনমধ্যস্থ গোপালগণ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কৃষ্ণের নিকট আহার্য্য প্রার্থনা করিল। অদূরবর্ত্তী কোন স্থানে কতকগুলি ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিতেছিলেন। কৃষ্ণ গোপালগণকে উপদেশ করিলেন যে, সেইখানে গিয়া আমার নাম করিয়া অন্নভিক্ষা চাও। গোপালেরা যজ্ঞস্থলে গিয়া কৃষ্ণের নাম করিয়া অন্নভিক্ষা চাহিল। ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে কিছু না দিয়া তাড়াইয়া দিল। গোপালগণ কৃষ্ণের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া সেই সকল কথা জানাইল। কৃষ্ণ তখন বলিলেন যে, তোমরা পুনর্ব্বার যজ্ঞস্থলে গিয়া অন্তঃপুরবাসিনী ব্রাহ্মণকন্যাদিগের নিকট আমার নাম করিয়া অন্নভিক্ষা চাও। গোপালেরা তাহাই করিল। ব্রাহ্মণকন্যাগণ কৃষ্ণের নাম শুনিয়া গোপালদিগকে প্রভূত অন্নব্যঞ্জন প্রদান করিল, এবং কৃষ্ণ অদূরে আছেন শুনিয়া তাঁহার দর্শনে আসিল। তাহারা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানিয়াছিল। তাহারা কৃষ্ণকে দর্শন করিলে কৃষ্ণ তাহাদিগকে গৃহে যাইতে অনুমতি করিলেন। ব্রাহ্মণকন্যাগণ বলিলেন, "আমরা

আপনার ভক্ত, আমরা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি—তাঁহারা আর আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন না। আমরা আপনার পাদাগ্রে পতিত হইতেছি, আমাদিগের অন্যা গতি আপনি বিধান করুন।" কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন না, বলিলেন, "দেখ, অঙ্গসঙ্গই কেবল অনুরাগের কারণ নহে। তোমরা আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট কর, আমাকে অচিরে প্রাপ্ত হইবে। আমার শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান, অনুকীর্ত্তনে আমাকে পাইবে—সন্নিকর্ষে সেরূপ পাইবে না। অতএব তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও।" তাহারা ফিরিয়া গেল।

এখন এই ব্রাহ্মণকন্যাগণ কৃষ্ণকে পাইবার যোগ্য কি করিয়াছিলেন? কেবলমাত্র পিত্রাদি-স্বজন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। কুলটাগণ সামান্য জারানুগমনার্থেও তাহা করিয়া থাকে। ভগবানে সর্ব্বস্বার্পণ তাঁহাদিগের হয় নাই, সিদ্ধ হইবার তাঁহারা অধিকারিণী হন নাই। অতএব সিদ্ধ হইবার প্রথম সোপান শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদির জন্য তাঁহাদিগকে উপদিষ্ট করিয়া কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। পবিত্র-ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূতা সাধনাভাবে যাহাতে অধিকারিণী হইল না, সাধনাপ্রভাবে গোপকন্যাগণ তাহাতে অধিকারিণী হইল। পূর্ব্বরাগবর্ণনস্থলে, ভাগবতকার গোপকন্যাদিগের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন সবিস্তারে বুঝাইয়াছেন।

এক্ষণে আমরা ভাগবতে বিখ্যাত রাসপঞ্চাধ্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু এই রাসলীলাতত্ত্ব বস্ত্রহরণোপলক্ষে আমি এত সবিস্তারে বুঝাইয়াছি যে, এই রাস পঞ্চাধ্যায়ের কথা অতি সংক্ষেপে বলিলেই চলিবে।

নবম পরিচ্ছেদ—ব্রজগোপী—ভাগবত

রাসলীলা

ভাগবতের দশম স্কন্ধে ২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩ এই পাঁচ অধ্যায় রাসপঞ্চাধ্যায়। প্রথম অর্থাৎ ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে শারদপূর্ণিমা-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ মধুর বেণুবাদন করিলেন। পাঠকের স্মরণ হইবে যে, বিষ্ণুপুরাণে আছে, তিনি কলপদ অর্থাৎ অস্ফুটপদ গীত করিলেন। ভাগবতকার সেই 'কল' শব্দ রাখিয়াছেন, যথা "জগৌ কলম্"। টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই 'কল' শব্দ হইতে কৃষ্ণমন্ত্রের 'ক্লীং' শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তিনি উহাকে কামগীত বলিয়াছেন। টীকাকারদিগের মহিমা অনন্ত! পুরাণকার স্বয়ং ঐ গীতকে 'অনঙ্গবর্দ্ধনম্' বলিয়াছেন।

বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপাঙ্গনাগণ কৃষ্ণদর্শনে ধাবিতা হইল। পুরাণকার তাঁহাদিগের ত্বরা এবং বিভ্রম যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কালিদাসকৃত পুরস্ত্রীগণের ত্বরা এবং বিভ্রমবর্ণনা মনে পড়ে। কে কাহার অনুকরণ করিয়াছে, তাহা বলা যায় না।

গোপীগণ সমাগত হইলে, কৃষ্ণ যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে তাহাদিগকে বলিলেন, "তোমাদিগের মঙ্গল ত? তোমাদিগের প্রিয় কার্য্য কি করিব? ব্রজের কুশল ত? তোমরা কেন আসিয়াছ?" এই বলিয়া আবার বলিতে লাগিলেন যে, "এই রজনী ঘোররূপা, ভীষণ পশু সকল এখানে আছে, এ স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার যোগ্য স্থান নয়। অতএব তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাও। তোমাদের মাতাপিতা পুত্র ভ্রাতা

পতি তোমাদিগকে না দেখিয়া তোমাদিগের অন্বেষণ করিতেছে। বন্ধুগণের ভয়োৎপত্তির কারণ হইও না। রাকাচন্দ্রবিরঞ্জিত যমুনাসমীরণলীলাকম্পিত তরুপল্লবশোভিত কুসুমিত বন দেখিলে ত? এখন হে সতীগণ, অচিরে প্রতিগমন করিয়া পতিসেবা কর। বালক ও বৎস সকল কাঁদিতেছে, তাহাদিগকে দুগ্ধপান করাও। অথবা আমার প্রতি স্নেহ করিয়া, স্নেহের বশীভূতবুদ্ধি হইয়া আসিয়া থাকিবে। সকল প্রাণীই আমার প্রতি এইরূপ প্রীতি করিয়া থাকে। কিন্তু হে কল্যাণীগণ! পতির অকপট শুশ্রূষা এবং বন্ধুগণের ও সন্তানগণের অনুপোষণ, ইহাই স্ত্রীলোকদিগের প্রধান ধর্ম্ম। পতি দুঃশীলই হউক, দুর্ভগই হউক, জড় হউক, রোগী বা অধনী হউক, যে স্ত্রীগণ অপাতকী হইয়া উভয় লোকের মঙ্গল কামনা করে, তাহাদিগের দ্বারা সে পতি পরিত্যাজ্য নয়। কুলস্ত্রীদিগের ঔপপত্য অস্বর্গ্য, অযশস্কর, অতি তুচ্ছ, ভয়াবহ এবং সর্ব্বত্র নিন্দিত। শ্রবণে, দর্শনে, ধ্যানে, অনুকীর্ত্তনে মদ্ভাবোদয় হইতে পারে, কিন্তু সন্নিকর্ষে নহে। অতএব তোমরা ঘরে ফিরিয়া যাও।"

কৃষ্ণের মুখে এই উক্তি সন্নিবিষ্ট করিয়া পুরাণকার দেখাইতেছেন যে, পাতিব্রত্যধর্ম্মের মাহাত্ম্যের অনভিজ্ঞতা অথবা তৎপ্রতি অবজ্ঞাবশতঃ তিনি কৃষ্ণগোপীর ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় বর্ণনে প্রবৃত্ত নহেন। তাঁহার অভিপ্রায় পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। কৃষ্ণ ব্রাহ্মণকন্যাদিগকে ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন। শুনিয়া তাহারা ফিরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু গোপীগণ ফিরিল না। তাহারা কাঁদিতে লাগিল। তাহারা বলিল, "এমন কথা বলিও না, তোমার পাদমূলে সর্ব্ববিষয় পরিত্যাগ করিয়াছি। আদিপুরুষদেব যেমন মুমুক্ষুকে পরিত্যাগ করেন না, তেমনি আমরা দুরবগ্রহ হইলেও, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না। তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, পতি অপত্য সুহৃৎ প্রভৃতির অনুবর্ত্তন স্ত্রীলোকদিগের স্বধর্ম্ম বলিয়া যে উপদেশ দিতেছ, তাহা তোমাতেই বর্ত্তিত হউক। কেন না, তুমি ঈশ্বর। তুমি দেহধারীদিগের প্রিয় বন্ধু এবং আত্মা। হে আত্মন্! যাহারা কুশলী, তাহারা নিত্যপ্রিয় যে তুমি, সেই তোমাতেই রতি (আত্মরতি) করিয়া থাকে। দুঃখদায়ক পতিসুতাদির দ্বারা কি হইবে?" ইত্যাদি। এই সকল বাক্যে পুরাণকার বুঝাইয়াছেন যে, গোপীগণ কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া ভজনা করিয়াছিল, এবং ঈশ্বরার্থেই স্বামিত্যাগ করিয়াছিল। তারপর আরও কতকগুলি কথা আছে, যাহা দ্বারা কবি বুঝাইতেছেন যে, কৃষ্ণের অনন্ত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই, গোপীগণ কৃষ্ণানুসারিণী। তাহার পরে পুরাণকার বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম অর্থাৎ আপনাতে ভিন্ন তাঁহার রতি বিরতি আর কিছুতেই নাই, তথাপি এই গোপীগণের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিলেন; এবং তাহাদিগের সহিত গান করতঃ যমুনাপুলিনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ভাগবতোক্ত রাসলীলায় ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ কিছু নাই। যদি এ কথা প্রকৃত হইত, তাহা হইলে আমি এ রাসলীলার অর্থ যেরূপ করিয়াছি, তাহা কোন রকমেই ঘটিত না। কিন্তু এই কথা যে প্রকৃত নহে, ইহার প্রমাণার্থ এই স্থান হইতে একটা শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি:—

"বাহুপ্রসারপরিরম্ভ-করালকোরুনীবীস্তনালভননর্ম্মনখাগ্রপাতৈঃ।
ক্ষ্বেল্যাবলোকহসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণামুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার॥" ৪১॥

অন্যান্য স্থান হইতেও আরও দুই চারিটি এরূপ প্রমাণ উদ্ধৃত করিব। এ সকলের বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া অবিধেয় হইবে।

তার পর কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়া ব্রজগোপীগণ অত্যন্ত মানিনী হইলেন। তাঁহাদিগের সৌভাগ্যমদ দেখিয়া তদুপশমনার্থে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। এই গেল উনত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রিংশ অধ্যায়ে গোপীগণকৃত কৃষ্ণান্বেষণবৃত্তান্ত আছে। তাহা স্থূলতঃ বিষ্ণুপুরাণের অনুকরণ। তবে ভাগবতকার কাব্য আরও ঘোরাল করিয়াছেন। অতএব এই অধ্যায় সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। একত্রিংশ অধ্যায়ে গোপীগণ কৃষ্ণবিষয়ক গান করিতে করিতে তাঁহাকে ডাকিতেছেন। ইহাতে ভক্তিরস এবং আদিরস দুইই আছে। বুঝাইবার কথা বেশি কিছু নাই। দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ পুনরাবির্ভূত হইলেন। এইখানে গোপীদিগের ইন্দ্রিয়প্রণোদিত ব্যবহারের প্রমাণার্থ একটি কবিতা উদ্ধৃত করিব।

"কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্লাৎ তন্বী তাম্বূলচর্ব্বিতম্।
একা তদঙ্ঘ্রি কমলং সন্তপ্তা স্তনয়োর্ন্যধাৎ॥"

এই অধ্যায়ের শেষে কৃষ্ণ ও গোপীগণের মধ্যে কিছু আধ্যাত্মিক কথোপকথন আছে। আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি না। তাহার পর ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে রাসক্রীড়া ও বিহারবর্ণন। রাসক্রীড়া বিষ্ণুপুরাণোক্ত রাসক্রীড়ার ন্যায় নৃত্যগীত মাত্র। তবে গোপীগণ এখানে শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিল, এজন্য কিঞ্চিন্মাত্র ইন্দ্রিয়সম্বন্ধও আছে। যথা,—

কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্তকুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতম্।
গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যাঃ প্রাদাত্তাম্বূলচর্ব্বিতম্॥ ১৩॥
নৃত্যন্তী গায়তী কাচিৎ কূজন্নূপুরমেখলা।
পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাব্জং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবম্॥ ১৪॥

* * *

তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ কেশান্ দুকূলং কুচপট্টিকাং বা।
নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢ়ুমলং ব্রজস্ত্রিয়ো বিস্রস্তমালাভরণাঃ কুরূদ্বহ॥ ১৮॥

এইরূপ কথা ভিন্ন বেশি আর কিছু নাই। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পুরাণকার জিতেন্দ্রিয়স্বরূপ বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং তাহার প্রমাণও দিয়াছি।

দশম পরিচ্ছেদ—শ্রীরাধা

ভাগবতের এই রাসপঞ্চাধ্যায়ের মধ্যে 'রাধা' নাম কোথাও পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবাচার্য্যদিগের অস্থিমজ্জার ভিতর রাধা নাম প্রবিষ্ট। তাঁহারা টীকাটিপ্পনীর ভিতর পুনঃ পুনঃ রাধাপ্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু মূলে কোথাও রাধার নাম নাই। গোপীদিগের অনুরাগাধিক্যজনিত ঈর্ষ্যার প্রমাণ স্বরূপ কবি লিখিয়াছেন যে, তাহারা পদচিহ্ন দেখিয়া অনুমান করিয়াছিল যে, কোন এক জন গোপীকে লইয়া কৃষ্ণ বিজনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাও গোপীদিগের ঈর্ষ্যাজনিত ভ্রমমাত্র। শ্রীকৃষ্ণ

অন্তর্হিত হইলেন এই কথাই আছে, কাহাকেও লইয়া অন্তর্হিত হইলেন, এমন কথা নাই এবং রাধার নামগন্ধও নাই।

রাসপঞ্চাধ্যায়ে কেন, সমস্ত ভাগবতে কোথাও রাধার নাম নাই। ভাগবতে কেন, বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে বা মহাভারতে কোথাও রাধার নাম নাই। অথচ এখনকার কৃষ্ণ উপাসনার প্রধান অঙ্গ রাধা। রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণনাম নাই। রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণের মন্দির নাই বা মূর্ত্তি নাই। বৈষ্ণবদিগের অনেক রচনায় কৃষ্ণের অপেক্ষাও রাধা প্রাধান্য-লাভ করিয়াছেন। যদি মহাভারতে, হরিবংশে, বিষ্ণুপুরাণে বা ভাগবতে 'রাধা' নাই, তবে এ 'রাধা' আসিলেন কোথা হইতে?

রাধাকে প্রথম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে দেখিতে পাই। উইল্‌সন্ সাহেব বলেন যে, ইহা পুরাণগণের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ বলিয়াই বোধ হয়। ইহার রচনাপ্রণালী আজিকালিকার ভট্টাচার্য্যদিগের রচনার মত। ইহাতে ষষ্ঠী মনসারও কথা আছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বিলোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছি। যাহা এখন আছে, তাহাতে এক নূতন দেবতত্ত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাই পূর্ব্বাবধি প্রসিদ্ধ যে, কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার। ইনি বলেন, কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার হওয়া দূরে থাকুক, কৃষ্ণই বিষ্ণুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। বিষ্ণু থাকেন বৈকুণ্ঠে, কৃষ্ণ থাকেন গোলোকে রাসমণ্ডলে,—বৈকুণ্ঠ তাহার অনেক নীচে। ইনি কেবল বিষ্ণুকে নহে, ব্রহ্মা, রুদ্র, লক্ষ্মী, দুর্গা প্রভৃতি সমস্ত দেবদেবী এবং জীবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইঁহার বাসস্থান গোলোকধামে, বলিয়াছি। তথায় গো, গোপ ও গোপীগণ বাস করে। তাহারা দেবদেবীর উপর। সেই গোলোকধামের অধিষ্ঠাত্রী কৃষ্ণবিলাসিনী দেবীই রাধা। রাধার আগে রাসমণ্ডল, রাসমণ্ডলে ইনি রাধাকে সৃষ্টি করেন। রাসের রা এবং ধা ধাতুর ধা, ইহাতে রাধা নাম নিষ্পন্ন করিয়াছেন।* সেই গোপগোপীর বাসস্থান রাধাধিষ্ঠিত গোলকধাম পূর্ব্বকবিদিগের বর্ণিত বৃন্দাবনের বজনীষ নকল। এখনকার কৃষ্ণযাত্রায় যেমন চন্দ্রাবলী নামে রাধার প্রতিযোগিনী গোপী আছে, গোলোকধামেও সেইরূপ বিরজা নাম্নী রাধার প্রতিযোগিনী গোপী ছিল। মানভঞ্জন যাত্রায় যেমন যাত্রাওয়ালারা কৃষ্ণকে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে লইয়া যায়, ইনিও তেমনি কৃষ্ণকে গোলকধামে বিরজার কুঞ্জে লইয়া গিয়াছেন। তাহাতে যাত্রার রাধিকার যেমন ঈর্ষ্যা ও কোপ উপস্থিত হয়, ব্রহ্মবৈবর্তের রাধিকারও সেইরূপ ঈর্ষ্যা ও কোপ উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে আর একটা মহা গোলযোগ ঘটিয়া যায়। রাধিকা কৃষ্ণকে বিরজার মন্দিরে ধরিবার জন্য রথে চড়িয়া বিরজার মন্দিরে গিয়া উপস্থিত। সেখানে বিরজার দ্বারবান্ ছিলেন শ্রীদামা বা শ্রীদাম। শ্রীদামা রাধিকাকে দ্বার ছাড়িয়া দিল না। এ দিকে রাধিকার ভয়ে বিরজা গলিয়া জল হইয়া নদীরূপ ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে দুঃখিত হইয়া তাহাকে পুনর্জীবন এবং পূর্ব্ব রূপ প্রদান করিলেন।

* রাসে সম্ভূয় গোলোকে, সা দধাব হরেঃ পুরঃ।
তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরাবিদ্ভির্দ্বিজোত্তম ॥—ব্রহ্মখণ্ডে ৫ অধ্যায়ঃ।

কিন্তু আবার স্থানান্তরে,—

* * * রাকারো দানবাচকঃ।
ধা নির্ব্বাণঞ্চ তদ্দাত্রী তেন রাধা প্রকীর্ত্তিতা ॥—শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ২৩ অধ্যায়ঃ।

বিরজা গোলোকনাথের সহিত অবিরত আনন্দানুভব করিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহার সাতটি পুত্র জন্মিল। কিন্তু পুত্রগণ আনন্দানুভবের বিঘ্ন, এ জন্য মাতা তাহাদিগকে অভিশপ্ত করিলেন, তাঁহারা সাত সমুদ্র হইয়া রহিলেন। এ দিকে রাধা, কৃষ্ণবিরজাবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া, কৃষ্ণকে অনেক ভৎ‍‍র্সনা করিলেন, এবং অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, তুমি গিয়া পৃথিবীতে বাস কর। এ দিকে কৃষ্ণকিঙ্কর শ্রীদামা রাধার এই দুর্ব্যবহারে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকেও ভৎ‍র্সনা করিলেন। শুনিয়া রাধা শ্রীদামাকে তিরস্কার করিয়া শাপ দিলেন, তুমি গিয়া অসুর হইয়া জন্মগ্রহণ কর। শ্রীদামাও রাধাকে শাপ দিলেন, তুমিও গিয়া পৃথিবীতে মানুষী হইয়া রায়াণপত্নী (যাত্রার আয়ান ঘোষ) এবং কলঙ্কিনী হইয়া খ্যাত হইবে।

শেষ দুই জনেই কৃষ্ণের নিকট আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন। শ্রীদামাকে কৃষ্ণ বর দিয়া বলিলেন যে, তুমি অসুরেশ্বর হইবে, যুদ্ধে তোমাকে কেহ পরাভব করিতে পারিবে না। শেষে শঙ্করশূলস্পর্শে মুক্ত হইবে। রাধাকেও আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন, 'তুমি যাও; আমিও যাইতেছি।' শেষ পৃথিবীর ভারাবতরণ জন্য, তিনি পৃথিবীতে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন।

এ সকল কথা নূতন হইলেও, এবং সর্ব্বশেষে প্রচারিত হইলেও এই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্মের উপর অতিশয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। জয়দেবাদি বাঙ্গালী বৈষ্ণবকবিগণ, বাঙ্গালার জাতীয় সঙ্গীত, বাঙ্গালার যাত্রা মহোৎসবাদির মূল ব্রহ্মবৈবর্ত্তে। তবে ব্রহ্মবৈবর্ত্তকারকথিত একটা বড় মূল কথা বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা গ্রহণ করেন নাই, অন্ততঃ সেটা বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্ম্মে তাদৃশ পরিস্ফুট হয় নাই—রাধিকা রায়াণপত্নী বলিয়া পরিচিতা, কিন্তু ব্রাহ্মবৈবর্ত্তের মতে তিনি বিধিবিধানানুসারে কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী। সেই বিবাহবৃত্তান্তটা সবিস্তারে বলিতেছি, বলিবার আগে গীত-গোবিন্দের প্রথম কবিতাটা পাঠকের স্মরণ করিয়া দিই।

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ॥"

অর্থ। হে রাধে! আকাশ মেঘে স্নিগ্ধ হইয়াছে, তমাল দ্রুম সকলে বনভূমি অন্ধকার হইয়াছে, অতএব তুমিই ইহাকে গৃহে লইয়া যাও, নন্দ এইরূপ আদেশ করায়, পথিস্থ কুঞ্জদ্রুমাভিমুখে চলিত রাধামাধবের যমুনাকূলে বিজনকেলি সকলের জয় হউক।

এ কথার অর্থ কি? টীকাকার কি অনুবাদকার কেহই বিশদ করিয়া বুঝাইতে পারেন না। এক জন অনুবাদকার বলিয়াছেন, "গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটি কিছু অস্পষ্ট; কবি নায়ক-নায়িকার কোন্ অবস্থা মনে করিয়া লিখিয়াছেন, ঠিক বলা যায় না। টীকাকারের মত, ইহা রাধিকাসখীর উক্তি। তাহাতে ভাব এক প্রকার মধুর হয় বটে, কিন্তু শব্দার্থের কিছু অসঙ্গতি ঘটে।" বস্তুতঃ ইহা রাধিকাসখীর উক্তি নহে; জয়দেব গোস্বামী ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-লিখিত এই বিবাহের সূচনা স্মরণ করিয়াই এ শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন। এক্ষণে আমি ঠিক এই কথাই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি;

তবে বক্তব্য এই যে, রাধা শ্রীদামশাপানুসারে শ্রীকৃষ্ণের কয় বৎসর আগে পৃথিবীতে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া, কৃষ্ণের অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন। তিনি যখন যুবতী, শ্রীকৃষ্ণ তখন শিশু।

"একদা কৃষ্ণসহিতো নন্দো বৃন্দাবনং যযৌ।
তত্রোপবনভাণ্ডীরে চারয়ামাস গোকুলম্ ॥ ১ ।
সরঃসুস্বাদুতোয়ঞ্চ পায়য়ামাস তং পপৌ।
উবাস বটমূলে চ বালং কৃত্বা স্ববক্ষসি ॥ ২ ॥
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো মায়াবালকবিগ্রহঃ।
চকার মায়য়াকস্মান্মেঘাচ্ছন্নং নভো মুনে ॥ ৩ ॥
মেঘাবৃতং নভো দৃষ্ট্বা শ্যামলং কাননান্তরম্।
ঝঞ্ঝাবাতং মেঘশব্দং বজ্রশব্দঞ্চ দারুণম্ ॥ ৪ ॥
বৃষ্টিধারামতিস্থূলাং কম্পমানাংশ্চ পাদপান্।
দৃষ্ট্বৈবং পতিতস্কন্ধান্ নন্দো ভয়মবাপ হ ॥ ৫ ॥
কথং যাস্যামি গোবৎসং বিহায় স্বাশ্রমং প্রতি।
গৃহং যদি ন যাস্যামি ভবিতা বালকস্য কিম্ ॥ ৬ ॥
এবং নন্দে প্রবদতি রুরোদ শ্রীহরিস্তদা।
মায়াভিয়া ভয়েভ্যশ্চ পিতুঃ কণ্ঠং দধার সঃ ॥ ৭ ॥
এতস্মিন্নন্তরে রাধা জগাম কৃষ্ণসন্নিধিম্।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে, ১৫ অধ্যায়ঃ।

অর্থ। "একদা কৃষ্ণসহিত নন্দ বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তথাকার ভাণ্ডীরবনে গোগণকে চরাইতেছিলেন। সরোবরে স্বাদু জল তাহাদিগকে পান করাইলেন, এবং পান করিলেন। এবং বালককে বক্ষে লইয়া বটমূলে বসিলেন। হে মুনে! তার পর মায়াতে শিশুশরীরধারণকারী কৃষ্ণ অকস্মাৎ মায়ার দ্বারা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করিলেন, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং কাননান্তর শ্যামল; ঝঞ্ঝাবাত, মেঘশব্দ, দারুণ বজ্রশব্দ, অতিস্থূল বৃষ্টিধারা, এবং বৃক্ষসকল কম্পমান হইয়া পতিতস্কন্ধ হইতেছে, দেখিয়া নন্দ ভয় পাইলেন। 'গোবৎস ছাড়িয়া কিরূপেই বা আপনার আশ্রমে যাই, যদি গৃহে না যাই, তবে এই বালকেরই বা কি হইবে,' নন্দ এইরূপ বলিতেছেন, শ্রীহরি তখন কাঁদিতে লাগিলেন; মায়াভয়ে ভীতিযুক্ত হইয়া বাপের কণ্ঠ ধারণ করিলেন। এই সময়ে রাধা কৃষ্ণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।"

রাধার অপূর্ব্ব লাবণ্য দেখিয়া নন্দ বিস্মিত হইলেন, তিনি রাধাকে বলিলেন, "আমি গর্গমুখে জানিয়াছি, তুমি পদ্মারও অধিক হরির প্রিয়া; আর ইনি পরম নির্গুণ অচ্যুত মহাবিষ্ণু; তথাপি আমি মানব, বিষ্ণুমায়ায় মোহিত আছি। হে ভদ্রে! তোমার প্রাণনাথকে গ্রহণ কর; যথায় সুখী হও, যাও। পশ্চাৎ মনোরথ পূর্ণ করিয়া আমার পুত্র আমাকে দিও।"

এই বলিয়া নন্দ রাধাকে কৃষ্ণসমর্পণ করিলেন। রাধাও কৃষ্ণকে কোলে করিয়া লইয়া গেলেন। দূরে গেলে রাধা রাসমণ্ডল স্মরণ করিলেন, তখন মনোহর বিহারভূমি

সৃষ্ট হইল। কৃষ্ণ সেইখানে নীত হইলে কিশোরমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তিনি রাধাকে বলিলেন, "যদি গোলোকের কথা স্মরণ হয়, তবে যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহা পূর্ণ করিব।" তাঁহারা এরূপ প্রেমালাপে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে ব্রহ্মা সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি রাধাকে অনেক স্তবস্তুতি করিলেন। পরিশেষে নিজে কন্যাকর্ত্তা হইয়া, যথাবিহিত বেদবিধি অনুসারে রাধিকাকে কৃষ্ণে সম্প্রদান করিলেন। তাঁহাদিগকে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ করিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। রায়াণের সঙ্গে রাধিকার যথাশাস্ত্র বিবাহ হইয়াছিল কি না, যদি হইয়া থাকে, তবে পূর্ব্বে কি পরে হইয়াছিল, তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে পাইলাম না। রাধাকৃষ্ণের বিবাহের পর বিহার-বর্ণন। বলা বাহুল্য যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তের রাসলীলাও ঐরূপ।

যাহা হউক, পাঠক দেখিবেন যে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার সম্পূর্ণ নূতন বৈষ্ণবধর্ম্ম সৃষ্ট করিয়াছেন। সে বৈষ্ণবধর্ম্মের নামগন্ধমাত্র বিষ্ণু বা ভাগবত বা অন্য পুরাণে নাই। রাধাই এই নূতন বৈষ্ণবধর্ম্মের কেন্দ্রস্বরূপ। জয়দেব কবি, গীতগোবিন্দ কাব্যে এই নূতন বৈষ্ণবধর্মাবলম্বন করিয়াই, গোবিন্দগীতি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্তানুসরণে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই শ্রীচৈতন্যদেব কান্তরসাশ্রিত অভিনব ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন। বলিতে গেলে, সকল কবি, সকল ঋষি, সকল পুরাণ, সকল শাস্ত্রের-অপেক্ষা ব্রহ্মবৈবর্ত্তকারই বাঙ্গালীর জীবনের উপর অধিকতর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। এখন দেখা যাউক, এই নূতন ধর্ম্মের তাৎপর্য্য কি এবং কোথা হইতে ইহা উৎপন্ন হইল।

ভারতবর্ষে যে সকল দর্শনশাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ছয়টি দর্শনের প্রাধান্য সচরাচর স্বীকৃত হয়। কিন্তু ছয়টির মধ্যে দুইটিরই প্রাধান্য বেশী—বেদান্তের ও সাঙ্খ্যের। সচরাচর ব্যাসপ্রণীত ব্রহ্মসূত্রে বেদান্তদর্শনের সৃষ্টি বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। বস্তুতঃ বেদান্তদর্শনের আদি ব্রহ্মসূত্রে নহে, উপনিষদে। উপনিষদ্‌কেও বেদান্ত বলে। উপনিষদ-উক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব, সংক্ষেপতঃ ঈশ্বর ভিন্ন কিছু নাই। এই জগৎ ও জীবগণ ঈশ্বরেরই অংশ। তিনি এক ছিলেন, সিসৃক্ষাপ্রযুক্ত বহু হইয়াছেন। তিনি পরমাত্মা। জীবাত্মা সেই পরমাত্মার অংশ, ঈশ্বরের মায়া হইতেই জীবাত্মা প্রাপ্ত; এবং সেই মায়া হইতে মুক্ত হইলেই আবার ঈশ্বরে বিলীন হইবে। ইহা অদ্বৈতবাদে পরিপূর্ণ।

প্রাথমিক বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিত্তি এই বৈদান্তিক ঈশ্বরবাদের উপর নির্ম্মিত। বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ, বৈদান্তিক ঈশ্বর। বিষ্ণুপুরাণে এবং ভাগবতে এবং তাদৃশ অন্যান্য গ্রন্থে যে সকল বিষ্ণুস্তোত্র বা কৃষ্ণস্তোত্র আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বা অসম্পূর্ণরূপে অদ্বৈতবাদাত্মক। কিন্তু এ বিষয়ের প্রধান উদাহরণ শান্তিপর্ব্বের ভীষ্মকৃত কৃষ্ণস্তোত্র।

কিন্তু অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদও অনেক রকম হইতে পারে। আধুনিক সময়ে শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য মধ্বাচার্য্য এবং বল্লভাচার্য্য, এই চারি জনে অদ্বৈতবাদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ—এই চারি প্রকার মত প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীনকালে এত ছিল না। প্রাচীন-কালে ঈশ্বর, এবং ঈশ্বরস্থিত জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে দুই রকম ব্যাখ্যা দেখা যায়। প্রথম

এই যে, ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নাই। ঈশ্বরই জগৎ, তদ্ভিন্ন জাগতিক কোন পদার্থ নাই। আর এক মত এই যে, জগৎ ঈশ্বর বা ঈশ্বর জগৎ নহেন, কিন্তু ঈশ্বরে জগৎ আছে— "সূত্রে মণিগণা ইব।". ঈশ্বরও জাগতিক সর্ব্বপদার্থে আছেন, কিন্তু ঈশ্বর তদতিরিক্ত। প্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম্ম এই দ্বিতীয় মতেরই উপর নির্ভর করে।

দ্বিতীয় প্রধান দর্শনশাস্ত্র সাঙ্খ্য। কপিলের সাঙ্খ্য ঈশ্বরই স্বীকার করে না। কিন্তু পরবর্ত্তী সাঙ্খ্যেরা ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। সাঙ্খ্যের স্থূলকথা এই, জড়জগৎ বা জড়জগন্ময়ী শক্তি পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। পরমাত্মা বা পুরুষ সম্পূর্ণরূপে সঙ্গশূন্য; তিনি কিছুই করেন না, এবং জগতের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ নাই। জড়জগৎ এবং জড়জগন্ময়ী শক্তিকে ইঁহারা 'প্রকৃতি' নাম দিয়াছেন। এই প্রকৃতিই সর্ব্বসৃষ্টিকারিণী, সর্ব্বসঞ্চারিণী, সর্ব্বসঞ্চালিনী, এবং সর্ব্বসংহারিণী। এই প্রকৃতিপুরুষতত্ত্ব হইতে প্রকৃতিপ্রধান তান্ত্রিকধর্ম্মের উৎপত্তি। এই তান্ত্রিকধর্ম্মে প্রকৃতিপুরুষের একত্ব অথবা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সম্পাদিত হওয়াতে প্রকৃতিপ্রধান বলিয়া এই ধর্ম্ম লোকরঞ্জন হইয়াছিল। যাহারা বৈষ্ণবদিগের অদ্বৈতবাদে অসন্তুষ্ট, তাঁহারা তান্ত্রিকধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সেই তান্ত্রিকধর্ম্মের সারাংশ এই বৈষ্ণবধর্ম্মে সংলগ্ন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মকে পুনরুজ্জ্বল করিবার জন্য ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার এই অভিনব বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন অথবা বৈষ্ণবধর্ম্মের পুনঃসংস্কার করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টা রাধা সেই সাঙ্খ্যদিগের মূলপ্রকৃতিস্থানীয়া। যদিও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে আছে যে, কৃষ্ণ মূলপ্রকৃতিকে সৃষ্টি করিয়া, তাহার পর রাধাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ স্বয়ংই রাধাকে পুনঃ পুনঃ মূলপ্রকৃতি বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। যথা—

"মমার্দ্ধাংশস্বরূপা ত্বং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী॥"

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে, ১৫ অধ্যায়, ৬৭ শ্লোকঃ।

পরমাত্মার সঙ্গে প্রকৃতির বা কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার কি সম্বন্ধ, তাহা পুরাণকার এইরূপে বুঝাইতেছেন। ইহা কৃষ্ণোক্তি।

"যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ ভেদো হি নাবয়োর্ধ্রুবম্॥ ৫৭॥
যথা ক্ষীরে চ ধাবল্যং যথাগ্নৌ দাহিকা সতি।
যথা পৃথিব্যাং গন্ধশ্চ তথাহং ত্বয়ি সন্ততম্॥ ৫৮॥
বিনা মৃদা ঘটং কর্ত্তুং বিনা স্বর্ণেন কুণ্ডলম্।
কুলালঃ স্বর্ণকারশ্চ ন হি শক্তঃ কদাচন॥ ৫৯॥
তথা ত্বয়া বিনা সৃষ্টিং ন চ কর্ত্তুমহং ক্ষমঃ।
সৃষ্টেরাধারভূতা ত্বং বীজরূপোহহমচ্যুতঃ॥ ৬০॥

*   *   *   *

কৃষ্ণং বদন্তি মাং লোকাস্ত্বয়ৈব রহিতং যদা।
শ্রীকৃষ্ণঞ্চ তদা তে হি ত্বয়ৈব সহিতং পরম্॥ ৬২॥
ত্বঞ্চ শ্রীস্ত্বঞ্চ সম্পত্তিস্ত্বমাধারস্বরূপিণী।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপাসি সর্ব্বেষাঞ্চ মমাপি চ॥ ৬৩॥

ত্বং স্ত্রী পুমানহং রাধে নেতি বেদেষু নির্ণয়ঃ।
ত্বঞ্চ সর্ব্বস্বরূপাসি সর্ব্বরূপোঽহমক্ষরে॥ ৬৪॥
যদা তেজঃস্বরূপোঽহং তেজোরূপাসি ত্বং তদা।
ন শরীরী যদাহঞ্চ তদা ত্বমশরীরিণী॥ ৬৫॥
সর্ব্ববীজস্বরূপোঽহং যদা যোগেন সুন্দরি।
ত্বঞ্চ শক্তিস্বরূপাসি সর্ব্বস্ত্রীরূপধারিণী॥ ৬৬॥"

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে, ১৫ অধ্যায়ঃ।

"তুমি যেখানে, আমিও সেখানে, আমাদিগের মধ্যে নিশ্চিত কোন ভেদ নাই। দুগ্ধে যেমন ধবলতা, অগ্নিতে যেমন দাহিকা, পৃথিবীতে যেমন গন্ধ, তেমনই আমি তোমাতে সর্ব্বদাই আছি। কুম্ভকার বিনা মৃত্তিকায় ঘট করিতে পারে না, স্বর্ণকার স্বর্ণ বিনা কুণ্ডল গড়িতে পারে না, তেমনই আমিও তোমা ব্যতীত সৃষ্টি করিতে পারি না। তুমি সৃষ্টির আধারভূতা, আমি অচ্যুতবীজরূপী। আমি যখন তোমা ব্যতীত থাকি, তখন লোকে আমাকে 'কৃষ্ণ' বলে, তোমার সহিত থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ বলে। তুমি শ্রী, তুমি সম্পত্তি, তুমি আধারস্বরূপিণী, সকলের এবং আমার সর্ব্বশক্তিস্বরূপা। হে রাধে! তুমি স্ত্রী, আমি পুরুষ, বেদও ইহা নির্ণয় করিতে পারে না। হে অক্ষরে! তুমি সর্ব্বস্বরূপা, আমি সর্ব্বরূপ। আমি যখন তেজঃস্বরূপ, তুমি তখন তেজোরূপা। আমি যখন শরীরী নই, তখন তুমিও অশরীরিণী। হে সুন্দরি! আমি যখন যোগের দ্বারা সর্ব্ববীজস্বরূপ হই, তখন তুমি শক্তিস্বরূপা সর্ব্বস্ত্রীরূপধারিণী হও।"

পুনশ্চ,

যথাহঞ্চ তথা ত্বঞ্চ যথা ধাবল্যদুগ্ধয়োঃ।
ভেদঃ কদাপি ন ভবেন্নিশ্চিতঞ্চ তথাবয়োঃ॥ ৫৬॥

*   *   *   *

ত্বৎকলাংশাংশকলয়া বিশ্বেষু সর্ব্বযোষিতঃ।
যা যোষিৎ সা চ ভবতী যঃ পুমান্ সোঽহমেব চ॥ ৬৮॥
অহঞ্চ কলয়া বহ্নিস্ত্বং স্বাহা দাহিকা প্রিয়া।
ত্বয়া সহ সমর্থোঽহং নালং দগ্ধুঞ্চ তাং বিনা॥ ৬৯॥
অহং দীপ্তিমতাং সূর্য্যঃ কলয়া ত্বং প্রভাত্মিকা।
সংভতশ্চ ত্বয়া ভাসে ত্বাং বিনাহং ন দীপ্তিমান্॥ ৭০॥
অহঞ্চ কলয়া চন্দ্রস্ত্বঞ্চ শোভা চ রোহিণী।
মনোহরস্ত্বয়া সার্দ্ধং ত্বাং বিনা চ ন সুন্দরি॥ ৭১॥
অহমিন্দ্রশ্চ কলয়া স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ ত্বং সতি।
ত্বয়া সার্দ্ধং দেবরাজো হতশ্রীশ্চ ত্বয়া বিনা॥ ৭২॥
অহং ধর্ম্মশ্চ কলয়া ত্বঞ্চ মূর্ত্তিশ্চ ধর্ম্মিণী।
নাহং শক্তো ধর্ম্মকৃত্যে ত্বাঞ্চ ধর্ম্মক্রিয়াং বিনা॥ ৭৩॥
অহং যজ্ঞশ্চ কলয়া ত্বঞ্চ স্বাংশেন দক্ষিণা।
ত্বয়া সার্দ্ধঞ্চ ফলদোঽপ্যসমর্থস্ত্বয়া বিনা॥ ৭৪॥

কলয়া পিতৃলোকোঽহং স্বাংশেন ত্বং স্বধা সতি।
ত্বয়ালং কব্যদানে চ সদা নালং ত্বয়া বিনা ॥ ৭৫ ॥
ত্বঞ্চ সম্পৎস্বরূপাহমীশ্বরশ্চ ত্বয়া সহ।
লক্ষ্মীযুক্তস্ত্বয়া লক্ষ্ম্যা নিশ্রীকশ্চাপি ত্বাং বিনা ॥ ৭৬ ॥
অহং পুমাংস্ত্বং প্রকৃতির্ন স্রষ্টাহং ত্বয়া বিনা।
যথা নালং কুলালশ্চ ঘটং কর্ত্তুং মৃদা বিনা ॥ ৭৭ ॥
অহং শেষশ্চ কলয়া স্বাংশেন ত্বং বসুন্ধরা।
ত্বাং শস্যরত্নাধারাঞ্চ বিভর্ম্মি মূর্দ্ধ্নি সুন্দরি ॥ ৭৮ ॥
ত্বঞ্চ শান্তিশ্চ কান্তিশ্চ মূর্ত্তির্মূর্ত্তিমতী সতি।
তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষমা লজ্জা ক্ষুত্তৃষ্ণা চ পরা দয়া ॥ ৭৯ ॥
নিদ্রা শুদ্ধা চ তন্দ্রা চ মূর্চ্ছা চ সন্ততিঃ ক্রিয়া।
মুক্তিরূপা ভক্তিরূপা দেহিনাং দুঃখরূপিণী ॥ ৮০ ॥
মমাধারা সদা ত্বঞ্চ তবাত্মাহং পরস্পরম্।
যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ সমৌ প্রকৃতিপুরুষৌ।
ন হি সৃষ্টির্ভবেদ্দেবি দ্বয়োরেকতরং বিনা ॥ ৮১ ॥

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে, ৬৭ অধ্যায়।*

"যেমন দুগ্ধ ও ধবলতা, তেমনই যেখানে আমি, সেইখানে তুমি। তোমাতে আমাতে কখনও ভেদ হইবে না, ইহা নিশ্চিত। এই বিশ্বের সমস্ত স্ত্রী তোমার কলাংশের অংশকলা; যাহাই স্ত্রী, তাহাই তুমি; যাহাই পুরুষ, তাহাই আমি। কলা দ্বারা আমি বহ্নি, তুমি প্রিয়া দাহিকা স্বাহা; তুমি সঙ্গে থাকিলে, আমি দগ্ধ করিতে সমর্থ হই, তুমি না থাকিলে হই না। আমি দীপ্তিমান্‌দিগের মধ্যে সূর্য্য, তুমি কলাংশে প্রভা; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি দীপ্তিমান্ হই, তুমি না থাকিলে হই না। কলা দ্বারা আমি চন্দ্র, তুমি শোভা ও রোহিণী; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি মনোহর; হে সুন্দরি! তুমি না থাকিলে নই। হে সতি! আমি কলা দ্বারা ইন্দ্র, তুমি স্বর্গলক্ষ্মী; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি দেবরাজ, না থাকিলে আমি হতশ্রী। আমি কলা দ্বারা ধর্ম্ম, তুমি ধর্ম্মিণীমূর্ত্তি; ধর্ম্মক্রিয়ার স্বরূপা তুমি ব্যতীত আমি ধর্ম্মকার্য্যে ক্ষমবান্ হই না। কলাদ্বারা আমি যজ্ঞ, তুমি আপনার অংশে দক্ষিণা; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি ফলদ হই, তুমি না থাকিলে তাহাতে অসমর্থ। কলা দ্বারা আমি পিতৃলোক, হে সতি! তুমি আপনার অংশে স্বধা; তোমা ব্যতীত পিণ্ডদান বৃথা। তুমি সম্পৎস্বরূপা, তুমি সঙ্গে থাকিলেই আমি প্রভু; তুমি লক্ষ্মী, তোমার সহিত আমি লক্ষ্মীযুক্ত, তুমি ব্যতীত নিঃশ্রীক। আমি পুরুষ, তুমি প্রকৃতি; তোমা ব্যতীত আমি স্রষ্টা নহি; মৃত্তিকা ব্যতীত কুম্ভকার যেমন ঘট করিতে পারে না, তোমা ব্যতীত আমি তেমনই সৃষ্টি করিতে পারি না। আমি কলা দ্বারা শেষ, তুমি আপনার অংশে বসুন্ধরা; হে সুন্দরি! শস্যরত্নাধার স্বরূপ তোমাকে আমি মস্তকে বহন করি। হে

* বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত সংস্করণ হইতে ইহা উদ্ধৃত করা গেল। মূলে কিছু গোলযোগ আছে বোধ হয়।

সতি! তুমি শান্তি, কান্তি, মূর্ত্তি, মূর্ত্তিমতী, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষমা, লজ্জা, ক্ষুত্তৃষ্ণা এবং তুমি পরা দয়া, শুদ্ধা নিদ্রা, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, সন্ততি, ক্রিয়া, মূর্ত্তিরূপা, ভক্তিরূপা, এবং জীবের দুঃখরূপিণী। তুমি সদাই আমার আধার, আমি তোমার আত্মা; যেখানে তুমি, সেইখানেই আমি, তুল্য প্রকৃতি পুরুষ; হে দেবি! দুইএর একের অভাবে সৃষ্টি হয় না।"

এইরূপ আরও অনেক কথা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ইহাতে যাহা পাই, তাহা ঠিক সাঙ্খ্যের প্রকৃতিবাদ নহে। সাঙ্খ্যের প্রকৃতি তন্ত্রে শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। প্রকৃতিবাদ এবং শক্তিবাদে প্রভেদ এই যে, প্রকৃতি পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধ সাঙ্খ্যপ্রবচনকার স্ফাটিক পাত্রে জবাপুষ্পের ছায়ার উপমা দ্বারা বুঝাইয়াছেন। স্ফাটিক পাত্র এবং জবাপুষ্প পরস্পর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্; তবে পুষ্পের ছায়া স্ফাটিকে পড়ে, এই পর্য্যন্ত ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু শক্তির সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ এই যে, আত্মাই শক্তির আধার। যেমন আধার হইতে আধেয় ভিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না, তেমনই আত্মা ও শক্তিতে পার্থক্য নাই। এই শক্তিবাদ যে কেবল তন্ত্রেই আছে, এমত নহে। বৈষ্ণব পৌরাণিকেরাও সাঙ্খ্যের প্রকৃতিকে বৈষ্ণবী শক্তিতে পরিণত করিয়াছেন। বুঝাইবার জন্য বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী।
যথা সর্ব্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম ॥ ১৫ ॥
অর্থো বিষ্ণুরিয়ং বাণী নীতিরেষা নয়ো হরিঃ।
বোধো বিষ্ণুরিয়ং বুদ্ধির্ধর্ম্মোঽসৌ সৎক্রিয়া ত্বিয়ম্ ॥ ১৬ ॥
স্রষ্টা বিষ্ণুরিয়ং সৃষ্টিঃ শ্রীর্ভূমির্ভূধরো হরিঃ।
সন্তোষো ভগবান্ লক্ষ্মীস্তুষ্টির্মৈত্রেয়! শাশ্বতী ॥ ১৭ ॥
ইচ্ছা শ্রীর্ভগবান্ কামো যজ্ঞোঽসৌ দক্ষিণা তু সা।
আজ্যাহুতিরসৌ দেবী পুরোডাশো জনার্দ্দনঃ ॥ ১৮ ॥
পত্নীশালা মুনে! লক্ষ্মীঃ প্রাগ্বংশো মধুসূদনঃ।
চিতির্লক্ষ্মীর্হরির্যূপ ইধ্মা শ্রীর্ভগবান্ কুশঃ ॥ ১৯ ॥
সামস্বরূপো ভগবান্ উদ্গীতিঃ কমলালয়া।
স্বাহা লক্ষ্মীর্জগন্নাথো বাসুদেবো হুতাশনঃ ॥ ২০ ॥
শঙ্করো ভগবান্ শৌরির্ভূতির্গৌরী দ্বিজোত্তম।
মৈত্রেয়! কেশবঃ সূর্য্যস্তৎপ্রভা কমলালয়া ॥ ২১ ॥
বিষ্ণুঃ পিতৃগণঃ পদ্মা স্বধা শাশ্বততুষ্টিদা।
দ্যৌঃ শ্রীঃ সর্ব্বাত্মকো বিষ্ণুরবকাশোঽতিবিস্তরঃ ॥ ২২ ॥
শশাঙ্কঃ শ্রীধরঃ কান্তিঃ শ্রীস্তস্যৈবানপায়িনী।
ধৃতির্লক্ষ্মীর্জগচ্চেষ্টা বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো হরিঃ ॥ ২৩ ॥
জলধির্দ্বিজ! গোবিন্দস্তদ্বেলা শ্রীর্মহামতে!
লক্ষ্মীস্বরূপমিন্দ্রাণী দেবেন্দ্রো মধুসূদনঃ ॥ ২৪ ॥

যমশ্চক্রধরঃ সাক্ষাদ্ ধূমোর্ণা কমলালয়া।
ঋদ্ধিঃ শ্রীঃ শ্রীধরো দেবঃ স্বয়মেব ধনেশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥
গৌরী লক্ষ্মীর্মহাভাগা কেশবো বরুণঃ স্বয়ম্ ।
শ্রীর্দেবসেনা বিপ্রেন্দ্র ! দেবসেনাপতির্হরিঃ ॥ ২৬ ॥
অনষ্টম্ভো গদাপাণিঃ শক্তির্লক্ষ্মীর্দ্বিজোত্তম ! ।
কাষ্ঠা লক্ষ্মীর্নিমেষোঽসৌ মুহূর্ত্তোঽসৌ কলা তু সা।
জ্যোৎস্না লক্ষ্মীঃ প্রদীপোঽসৌ সর্ব্বঃ সর্ব্বেশ্বরো হরিঃ ॥ ২৭ ॥
লতাভূতা জগন্মাতা শ্রীর্বিষ্ণুর্দ্রুমসংস্থিতঃ ॥ ২৮ ॥
বিভাবরী শ্রীর্দিবসো দেবশ্চক্রগদাধরঃ ।
বরপ্রদো বরো বিষ্ণুর্বধূঃ পদ্মবনালয়া ॥ ২৯ ॥
নদস্বরূপো ভগবান্ শ্রীর্নদীরূপসংস্থিতিঃ ।
ধ্বজশ্চ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পতাকা কমলালয়া ॥ ৩০ ॥
তৃষ্ণা লক্ষ্মীর্জ্জগৎস্বামী লোভো নারায়ণঃ পরঃ ।
রতিরাগৌ চ ধর্ম্মজ্ঞ ! লক্ষ্মীর্গোবিন্দ এব চ ॥ ৩১ ॥
কিঞ্চাতিবহুনোক্তেন সংক্ষেপেণেদমুচ্যতে ।
দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদৌ পুংনাম্নি ভগবান্ হরিঃ ।
স্ত্রীনাম্নি লক্ষ্মীর্মৈত্রেয় ! নানয়োর্বিদ্যতে পরম্ ॥ ৩২ ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

"বিষ্ণুর শ্রী সেই জগন্মাতা অক্ষয় এবং নিত্য। হে দ্বিজোত্তম ! বিষ্ণু সর্ব্বগত, ইনিও সেইরূপ। ইনি বাক্য, বিষ্ণু অর্থ ; ইনি নীতি, হরি নয় ; ইনি বুদ্ধি, বিষ্ণু বোধ ; ইনি ধর্ম্ম, ইনি সংক্রিয়া ; বিষ্ণু স্রষ্টা, ইনি সৃষ্টি ; শ্রী ভূমি, হরি ভূধর ; ভগবান্ সন্তোষ, হে মৈত্রেয় ! লক্ষ্মী শাশ্বতী তুষ্টি ; শ্রী ইচ্ছা, ভগবান্ কাম ; তিনি যজ্ঞ, ইনি দক্ষিণা ; জনার্দ্দন পুরোডাশ, দেবী আজ্যাহুতি ; হে মুনে ! লক্ষ্মী পত্নীশালা, মধুসূদন, প্রাগ্বংশ ; হরি যুপ, লক্ষ্মী চিতি ; ভগবান্ কুশ, শ্রী ইধ্মা ; ভগবান্ সাম, কমলালয়া উদ্গীতি ; লক্ষ্মী স্বাহা, জগন্নাথ বাসুদেব অগ্নি ; ভগবান্ শৌরি শঙ্কর, হে দ্বিজোত্তম ! লক্ষ্মী গৌরী ; হে মৈত্রেয় ! কেশব সূর্য্য, কমলালয়া তাঁহার প্রভা ; বিষ্ণু পিতৃগণ, পদ্মা নিত্যতুষ্টিদা স্বধা ; শ্রী স্বর্গ, সর্ব্বাত্মক বিষ্ণু অতিবিস্তৃত আকাশস্বরূপ ; শ্রীধর চন্দ্র, শ্রী তাঁহার অক্ষয় কান্তি ; লক্ষ্মী জগচ্চেষ্টা ধৃতি, বিষ্ণু সর্ব্বত্রগ বায়ু ; হে দ্বিজ ! গোবিন্দ জলধি, হে মহামতে ! শ্রী তাঁহার বেলা ; লক্ষ্মী ইন্দ্রাণীস্বরূপা, মধুসূদন দেবেন্দ্র ; চক্রধর সাক্ষাৎ যম, কমলালয়া ধূমোর্ণা ; শ্রী ঋদ্ধি, শ্রীধর স্বয়ং দেব ধনেশ্বর ; কেশব স্বয়ং বরুণ, মহাভাগা লক্ষ্মী গৌরী ; হে বিপ্রেন্দ্র ! শ্রী দেবসেনা, হরি দেবসেনাপতি ; গদাধর পুরুষকার, হে দ্বিজোত্তম ! লক্ষ্মী শক্তি ; লক্ষ্মী কাষ্ঠা, ইনি নিমেষ ; ইনি মুহূর্ত্ত, তিনি কলা ; লক্ষ্মী আলোক, সর্ব্বেশ্বর হরি সর্ব্বপ্রদীপ ; জগন্মাতা শ্রী লতাভূতা, বিষ্ণু দ্রুমরূপে সংস্থিত ; শ্রী বিভাবরী, দেবচক্রগদাধর দিবস ; বিষ্ণু বরপ্রদ বর, পদ্মবানলয়া বধূ ; ভগবান্ নদস্বরূপী, শ্রী নদীরূপা ; পুণ্ডরীকাক্ষ ধ্বজ, কমলালয়া পতাকা ; লক্ষ্মী তৃষ্ণা, জগৎস্বামী নারায়ণ

পরম লোভ; হে ধর্ম্মজ্ঞ! লক্ষ্মী রতি, গোবিন্দ রাগ; অধিক উক্তির প্রয়োজন নাই, সংক্ষেপে বলিতেছি, দেব তির্য্যক্ মনুষ্যাদিতে পুংনামবিশিষ্ট হরি, এবং স্ত্রীনামবিশিষ্টা লক্ষ্মী। হে মৈত্রেয়! এই দুই ভিন্ন আর কিছুই নাই।"

বেদান্তের যাহা মায়াবাদ সাঙ্খ্যে তাহা প্রকৃতিবাদ। প্রকৃতি হইতে শক্তিবাদ। এই কয়টি শ্লোকে শক্তিবাদ এবং অদ্বৈতবাদ মিলিত হইল। বোধ হয়, ইহাই স্মরণ রাখিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার লিখিয়াছেন যে, কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন যে, তুমি না থাকিলে, আমি কৃষ্ণ, এবং তুমি থাকিলে আমি শ্রীকৃষ্ণ। বিষ্ণুপুরাণকথিত এই শ্রী লইয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণ। পাঠক দেখিবেন, বিষ্ণুপুরাণে যাহা শ্রী সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তে রাধা সম্বন্ধে ঠিক তাহাই কথিত হইয়াছে। রাধা সেই শ্রী। পরিচ্ছেদের উপর আমি শিরোনাম দিয়াছি, "শ্রীরাধা"। রাধ ঈশ্বরের শক্তি, উভয়ের বিধিসম্পাদিত পরিণয়, শক্তিমানের শক্তির স্ফূর্ত্তি, এবং শক্তিরই বিকাশ উভয়ের বিহার।

যে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ এক্ষণে বিদ্যমান আছে, তৎকথিত 'রাধাতত্ত্ব' কি, তাহ বোধ করি এতক্ষণে পাঠককে বুঝাইতে পারিলাম। কিন্তু আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে 'রাধাতত্ত্ব' ছিল কি? বোধ হয় ছিল; কিন্তু এ প্রকার নহে। বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্তে রাধা শব্দের ব্যুৎপত্তি অনেক প্রকার দেওয়া হইয়াছে। তাহার দুইটি পূর্ব্বে ফুটনোটে উদ্ধৃত করিয়াছি, আর একটি উদ্ধৃত করিতেছি:—

"রেফো হি কোটিজন্মাঘং কর্ম্মভোগং শুভাশুভম্।
আকারো গর্ব্ভবাসঞ্চ মৃত্যুঞ্চ রোগমুৎসৃজেৎ ॥ ১০৬ ॥
ধকার আয়ুষো হানিমাকারো ভববন্ধনম্।
শ্রবণস্মরণোক্তিভ্যঃ প্রণশ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১০৭ ॥
রাকারো নিশ্চলাং ভক্তিং দাস্যং কৃষ্ণপদাম্বুজে।
সর্ব্বেপ্সিতং সদানন্দং সর্ব্বসিদ্ধৌঘমীশ্বরম্ ॥ ১০৮ ॥
ধকারঃ সহবাসঞ্চ তত্তুল্যকালমেব চ।
দদাতি সার্ষ্টিং সারূপ্যং তত্ত্বজ্ঞানং হরেঃ সমম্ ॥ ১০৯ ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে, ১৩ অঃ।

ইহার একটিও রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি নয়। রাধ্ ধাতু আরাধনার্থে, পূজার্থে। যিনি কৃষ্ণের আরাধিকা, তিনিই রাধা বা রাধিকা। বর্ত্তমান ব্রহ্মবৈবর্ত্তে এ ব্যুৎপত্তি কোথাও নাই। যিনি এই রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি গোপন করিয়া কতকগুলা অবৈয়াকরণিক কল কৌশলের দ্বারা ভ্রান্তি জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং ভ্রান্তির প্রতিপোষণার্থ মিথ্যা করিয়া সামবেদের দোহাই দিয়াছেন,* তিনি কখনও 'রাধা' শব্দের সৃষ্টিকারক নহেন। যিনি রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তির অনুযায়িক হইয়া রাধা-রূপক রচনা করেন নাই, তিনি কখনও রাধার সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। সেই জন্য বিবেচনা করি যে, আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত্তেই রাধার প্রথম সৃষ্টি। এবং সেখানে রাধা কৃষ্ণরাধিকা আদর্শরূপিণী গোপী ছিলেন, সন্দেহ নাই।

* রাধাশব্দস্য ব্যুৎপত্তিঃ সামবেদে নিরূপিতা।—১৩ অঃ, ১৫৩।

রাধা শব্দের আর একটি অর্থ আছে—বিশাখানক্ষত্রের* একটি নাম রাধা। কৃত্তিকা হইতে বিশাখা চতুর্দ্দশ নক্ষত্র। পূর্ব্বে কৃত্তিকা হইতে বৎসর গণনা হইত। কৃত্তিকা হইতে রাশি গণনা করিলে বিশাখা ঠিক মাঝে পড়ে। অতএব রাসমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তিনী হউন বা না হউন, রাধা রাশিমণ্ডলের বা রাশমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী বটেন। এই 'রাশ-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী' রাধার সঙ্গে 'রাসমণ্ডলে' রাধার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা আসল ব্রহ্মবৈবর্ত্তের অভাবে স্থির করা অসাধ্য।

একাদশ পরিচ্ছেদ—বৃন্দাবনলীলার পরিসমাপ্তি

ভাগবতে বৃন্দাবনলীলা সম্বন্ধীয় আর কয়েকটা কথা আছে।

১ম, নন্দ এক দিন স্নান করিতে যমুনায় নামিলে, বরুণের অনুচর আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া বরুণালয়ে যায়। কৃষ্ণ সেখানে গিয়া নন্দকে লইয়া আসেন। শাদা কথায় নন্দ এক দিন জলে ডুবিয়াছিলেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

২য়, একটা সাপ আসিয়া এক দিন নন্দকে ধরিয়াছিল। কৃষ্ণ সে সর্পের মুখ হইতে নন্দকে মুক্ত করিয়া সর্পকে নিহত করিয়াছিলেন। সর্পটি বিদ্যাধর। কৃষ্ণস্পর্শে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া স্বস্থানে গমন করে। শাদা কথা কৃষ্ণ একদিন নন্দকে সর্পমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

৩য়, শঙ্খচূড় নামে একটা অসুর আসিয়া ব্রজাঙ্গনাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়। কৃষ্ণ বলরাম তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ব্রজাঙ্গনাদিগকে মুক্ত করেন এবং শঙ্খচূড়কে বধ করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শঙ্খচূড়ের কথা ভিন্নপ্রকার আছে, তাহার কিয়দংশ পূর্ব্বে বলিয়াছি।

৪র্থ, এই তিনটা কথা বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে বা মহাভারতে নাই। কিন্তু কৃষ্ণকৃত অরিষ্টাসুর ও কেশী অসুরের বধবৃত্তান্ত হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে আছে এবং মহাভারতে শিশুপালকৃত কৃষ্ণনিন্দায় তাহার প্রসঙ্গও আছে। অরিষ্ট বৃষরূপী এবং কেশী অশ্বরূপী। শিশুপাল ইহাদিগকে বৃষ ও অশ্ব বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতেছেন।

অতএব প্রথমোক্ত তিনটি বৃত্তান্ত ভাগবতকারপ্রণীত উপন্যাস বলিয়া উড়াইয়া দিলে অরিষ্টবধ ও কেশিবধকে সেরূপে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বিশেষ এই কেশিবধবৃত্তান্ত অথর্ব্বসংহিতায় আছে বলিয়াছি। সেখানে কেশীকে কৃষ্ণকেশী বলা হইয়াছে। কৃষ্ণকেশী অর্থে যার কাল চুল। ঋগ্বেদসংহিতাতেও একটি কেশিসূক্ত আছে (দশম মণ্ডল, ১৩৬ সূক্ত)। এই কেশী দেব কে, তাহা অনিশ্চিত। ইহার চতুর্থ ও পঞ্চম ঋক্ হইতে এমন বুঝা যায় যে, হয়ত মুনিই কেশী-দেবতা। মুনিগণ লম্বা লম্বা চুল রাখিতেন। ঐ দুই ঋকে মুনিগণেরই প্রশংসা করা হইতেছে। Muir সাহেবও সেইরূপ বুঝিয়াছেন। কিন্তু প্রথম ঋকে, অন্যপ্রকার বুঝান হইয়াছে। প্রথম ঋক্ রমেশ বাবু এইরূপ বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন :—

"কেশী নামক যে দেব, তিনি অগ্নিকে, তিনিই জলকে, তিনি ভূলোক ও দ্যুলোককে

* রাধা বিশাখা পুষ্যে তু সিধ্যতিষ্যৌ শ্রবিষ্ঠয়া—অমরকোষ।

ধারণ করেন। সমস্ত সংসারকে কেশীই আলোকের দ্বারা দর্শনযোগ্য করেন। এই যে জ্যোতি, ইহার নাম কেশী।”

তাহা হইলে, জগদ্ব্যঞ্জক যে জ্যোতি, তাহাই কেশী। এবং জগদাবরক যে জ্যোতি, তাহাই কৃষ্ণকেশী। কৃষ্ণ তাহারই নিধনকর্ত্তা, অর্থাৎ কৃষ্ণ জগদাবরক তমঃ প্রতিহত করিয়াছিলেন।

এইখানে বৃন্দাবনলীলার পরিসমাপ্তি। এক্ষণে আলোচ্য যে, আমরা ইহার ভিতর পাইলাম কি? ঐতিহাসিক কথা কিছুই পাইলাম না বলিলেই হয়। এই সকল পৌরাণিক কথা অতিপ্রকৃত উপন্যাসে পরিপূর্ণ। তাহার ভিতর ঐতিহাসিক তত্ত্ব অতি দুর্লভ। আমরা প্রধানতঃ ইহাই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ আছে—চৌরবাদ এবং পরদারবাদ—সে সকলই অমূলক ও অলীক। ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমরা এত সবিস্তারে ব্রজলীলার সমালোচনা করিয়াছি। ঐতিহাসিক তত্ত্ব যদি কিছু পাইয়া থাকি, তবে সেটুকু এই,—অত্যাচারকারী কংসের ভয়ে বসুদেব আপন পত্নী রোহিণী এবং পুত্রদ্বয় রাম ও কৃষ্ণকে নন্দালয়ে গোপনে রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণ শৈশব ও কৈশোর সেইখানে অতিবাহিত করেন। তিনি শৈশবে রূপলাবণ্যে এবং শিশুসুলভ গুণসকলে সর্ব্বজনের প্রিয় হইয়াছিলেন। কৈশোরে তিনি অতিশয় বলশালী হইয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনের অনিষ্টকারী পশু প্রভৃতি হনন করিয়া গোপালগণকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেন। তিনি শৈশবাবধিই সর্ব্বজন এবং সর্ব্বজীবে কারুণ্যপরিপূর্ণ—সকলের উপকার করিতেন। গোপালগণ প্রতি এবং গোপবালিকাগণ প্রতি তিনি স্নেহশালী ছিলেন। সকলের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিতেন এবং সকলকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেন, এবং কৈশোরেই প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্বও তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এতটুকু ঐতিহাসিক তত্ত্বও যে পাইয়াছি, ইহাও সাহস করিয়া বলিতে পারি না। তবে ইহাও বলিতে পারি যে, ইহার বেশি আর কিছু নয়।

তৃতীয় খণ্ড

মথুরা-দ্বারকা

যস্তনোতি সতাং সেতুমৃতেনামৃতযোনিনা।
ধর্ম্মার্থব্যবহারাঙ্গৈস্তস্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ॥
শান্তিপর্ব্বণি, ৪৭ অধ্যায়ঃ।

প্রথম পরিচ্ছেদ—কংসবধ

এদিকে কংসের নিকট সংবাদ পঁহুছিল যে, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বলরাম অতিশয় বলশালী হইয়াছেন। পূতনা হইতে অরিষ্ট পর্য্যন্ত কংসানুচর সকলকে নিহত করিয়াছেন। দেবর্ষি নারদ গিয়া কংসকে বলিলেন, কৃষ্ণ-রাম বসুদেবের পুত্র। দেবকীর অষ্টম-গর্ভজা বলিয়া যে কন্যাকে কংস নিহত করিয়াছিলেন, সে নন্দ-যশোদার কন্যা। বসুদেব সন্তান পরিবর্ত্তিত করিয়া কৃষ্ণকে নন্দালয়ে গোপনে রাখিয়াছেন। ইহা শুনিয়া কংস ভীত ও ক্রুদ্ধ হইয়া বসুদেবকে তিরস্কৃত করিলেন, এবং তাঁহার বধে উদ্যত হইলেন; এবং রাম-কৃষ্ণকে আনিবার জন্য অক্রূরনামা এক জন যাদবপ্রধানকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। এ দিকে কংস আপনার বিখ্যাত বলবান্ মল্লদিগের দ্বারা রাম-কৃষ্ণের বধসাধনের অভিপ্রায়ে ধনুর্ম্মখ নামে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। রাম-কৃষ্ণ অক্রূর কর্ত্তৃক তথায় আনীত হইয়া* রঙ্গভূমিতে প্রবেশপূর্ব্বক কংসের শিক্ষিত হস্তী কুবলয়াপীড়কে ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ মল্ল চাণূর ও মুষ্টিককে নিহত করিলেন। ইহা দেখিয়া কংস নন্দকে লৌহময় নিগড়ে অবরুদ্ধ করিবার এবং বসুদেবকে বিনাশ করিবার জন্য আদেশ করিয়া কৃষ্ণ-বলরামকে তাড়াইয়া দিবার আজ্ঞা করিলেন। তখন যে মঞ্চে মল্লযুদ্ধ দেখিবার জন্য অন্যান্য যাদবের সহিত কংস উপবিষ্ট ছিলেন, কৃষ্ণ লম্ফপ্রদান-পূর্ব্বক তদুপরি আরোহণ করিয়া কংসকে ধরিলেন এবং তাঁহাকে কেশের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া রঙ্গভূমে নিপাতিত ও তাঁহাকে নিহত করিলেন। পরে বসুদেব দেবকী প্রভৃতি গুরুজনকে যথাবিহিত বন্দনা করিয়া কংসের পিতা উগ্রসেনকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন। নিজে রাজা হইলেন না।

* পথিমধ্যে কুব্জা-ঘটিত ব্যাপারটা আছে। বিষ্ণুপুরাণে নিন্দনীয় কথা কিছু নাই। কুব্জা আপনাকে সুন্দরী হইতে দেখিয়া কৃষ্ণকে নিজ মন্দিরে যাইতে অনুরোধ করিলেন, কৃষ্ণ হাসিয়াই অস্থির। বিষ্ণুপুরাণে এই পর্য্যন্ত। কৃষ্ণের এ ব্যবহার মানবোচিত ও সজ্জনোচিত। কিন্তু ভাগবত-কার ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার তাহাতে সন্তুষ্ট নহেন, কুব্জার হঠাৎ ভক্তির হঠাৎ পুরস্কার দিয়াছেন, শেষ যাত্রার কুব্জা পাটরাণী।

আমরা এইখান হইতে ভাগবতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। তাহার কারণ, ভাগবতে ঐতিহাসিক কথা কিছুই পাওয়া যায় না; যাহা পাওয়া যায়, তাহা বিষ্ণুপুরাণেও আছে। তদতিরিক্ত যাহা পাওয়া যায়, তাহা অতিপ্রকৃত উপন্যাস মাত্র। তবে ভাগবতকথিত বাল্যলীলা অতি প্রসিদ্ধ বলিয়া, আমরা ভাগবতের সে অংশের পরিচয় দিতে বাধ্য হইয়াছি। এক্ষণে ভাগবতের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে পারি।

হরিবংশ ও পুরাণ সকলে এইরূপ কংসবৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে। কংসবধ ঐতিহাসিক ঘটনা বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ক এই বিবরণ ঐতিহাসিকতাশূন্য। ইহাতে বিশ্বাস করিতে গেলে, অতিপ্রকৃত ব্যাপারে বিশ্বাস করিতে হয়। প্রথমতঃ দেবর্ষি নারদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হয়। তার পর সেই দৈববাণীতে বিশ্বাস করিতে হয়, কেন না, কংসের ভয় সেই দৈববাণীস্মৃতি হইতে উৎপন্ন। তাহা ছাড়া, দুইটি গোপবালক আসিয়া বিনা যুদ্ধে সভামধ্যে মথুরাধিপতিকে বিনষ্ট করিবে, ইহা ত সহজে বিশ্বাস করা যায় না। অতএব দেখা যাউক যে, সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ মহাভারতে এই বিষয় কি আছে। মহাভারতের সভাপর্ব্বে জরাসন্ধবধ-পর্ব্বাধ্যায়ে কৃষ্ণ নিজে নিজের পূর্ব্ববৃত্তান্ত যুধিষ্ঠিরের নিকট বলিতেছেন :—

"কিয়ৎকাল অতীত হইল, কংস* যাদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেব ও অনুজা নামে বার্হদ্রথের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। ঐ দুরাত্মা স্বীয় বাহুবলে জ্ঞাতি-বর্গকে পরাজয় করত সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ মূঢ়মতি কংসের দৌরাত্ম্যে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি তৎকালে অক্রূরকে আহুক-কন্যা প্রদান করিয় জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনার্থ বলভদ্র সমভিব্যাহারে কংস ও সুনামাকে সংহার করিলাম।"

ইহাতে কৃষ্ণ বলরাম বৃন্দাবন হইতে আনীত হওয়ার কথা কিছুমাত্র নাই। বরং এমন বুঝাইতেছে যে, কংসবধের পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণ বলরাম মথুরাতে বাস করিতেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, বৃদ্ধ যাদবেরা জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তাহা না করিয়া জ্ঞাতিদিগের মঙ্গলার্থ কংসকেই বধ করিলেন। ইহাতে বলরাম ভিন্ন আর কেহ তাঁহার সহায় ছিল কি না, ইহা প্রকাশ নাই। কিন্তু ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারিতেছে যে, অন্যান্য যাদবগণ প্রকাশ্যে তাঁহাদের সাহায্য করুন বা না করুন, কংসকে কেহ রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন নাই। কংস তাঁহাদের সকলের উপর অত্যাচার করিত, এজন্য বরং, বোধ হয়, তাঁহারাই রাম-কৃষ্ণের বলাধিক্য দেখিয়া তাঁহাদিগকে নেতৃত্বে সংস্থাপন করিয়া কংসের বধসাধন করিয়াছিলেন। এইটুকু ভিন্ন আর কিছু ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায় না।

আর ঐতিহাসিক তত্ত্ব ইহা পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণ কংসকে নিহত করিয়া কংসের পিতা উগ্রসেনকেই যাদবদিগের আধিপত্যে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। কেন না, মহাভারতেও উগ্রসেনকে যাদবদিগের অধিপতি স্বরূপ বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। এ দেশের চিরপ্রচলিত রীতি ও নীতি এই যে, যে রাজাকে বধ করিতে পারে, সেই তাহার রাজ্যভোগী হয়। কংসের বিজেতা কৃষ্ণ অনায়াসেই মথুরার সিংহাসন অধিকৃত করিতে

---

* কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করিলাম, কিন্তু বলিতে বাধ্য, এই অনুবাদে আছে "দানবরাজ কংস।" মূলে তাহা নাই, যথা—

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য কংসো নির্ম্মথ্য যাদবান্।

সুতরাং "দানবরাজ" শব্দ তুলিয়া দিয়াছি।

পারিতেন : কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না, কেন না, ধর্ম্মতঃ সে রাজ্য উগ্রসেনের। উগ্রসেনকে পদচ্যুত করিয়াই কংস রাজা হইয়াছিল। ধর্ম্মই কৃষ্ণের নিকট প্রধান, তিনি শৈশবাবধিই ধর্ম্মাত্মা। অতএব যাহার রাজ্য, তাহাকেই তিনি রাজ্য প্রদান করিলেন। তিনি ধর্ম্মানুরুদ্ধ হইয়াই কংসকে নিহত করিয়াছিলেন। আমরা পরে দেখিব যে, তিনি প্রকাশ্যে বলিতেছেন যে, যাহাতে পরহিত, তাহাই ধর্ম্ম। এখানে ঘোরতর অত্যাচারী কংসের বধে সমস্ত যাদবগণের হিতসাধন হয়, এই জন্য তিনি কংসকে বধ করিয়াছিলেন—ধর্ম্মার্থ মাত্র। বধ করিয়া করুণহৃদয় আদর্শপুরুষ কংসের জন্য বিলাপ করিয়াছিলেন, এমন কথাও গ্রন্থে লিখিত আছে। এই কংসবধে আমরা প্রথমে প্রকৃত ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাই এবং এই কংসবধেই দেখি যে, কৃষ্ণ পরম বলশালী, পরম কার্য্যদক্ষ, পরম ন্যায়পর, পরম ধর্ম্মাত্মা, পরহিতে রত, এবং পরের জন্য কাতর। এইখান হইতে দেখিতে পাই যে, তিনি আদর্শ মানুষ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—শিক্ষা

পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, কংসবধের পর কৃষ্ণ বলরাম কাশীতে সান্দীপনি ঋষির নিকট শিক্ষার্থে গমন করিলেন, এবং চতুঃষষ্টিদিবসমধ্যে শস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া গুরুদক্ষিণা প্রদানান্তে মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন।

কৃষ্ণের শিক্ষা সম্বন্ধে ইহা ছাড়া আর কিছু পুরাণেতিহাসে পাওয়া যায় না। নন্দালয়ে তাঁহার কোন প্রকার শিক্ষা হওয়ার কোন প্রসঙ্গ কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অথচ নন্দ জাতিতে বৈশ্য ছিলেন, বৈশ্যদিগের বেদে অধিকার ছিল। বৈশ্যালয়ে তাঁহাদিগের কোনও প্রকার বিদ্যাশিক্ষা না হওয়া বিচিত্র বটে। বোধ হয়, শিক্ষার সময় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি নন্দালয় হইতে মথুরায় পুনরানীত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে মহাভারত হইতে যে কৃষ্ণবাক্য উদ্ধৃত করা গিয়াছে, তাহা হইতে এরূপ অনুমানই সঙ্গত যে, কংসবধের অনেক পূর্ব্ব হইতেই তিনি মথুরায় বাস করিতেছিলেন, এবং মহাভারতের সভাপর্ব্বে শিশুপালকৃত কৃষ্ণনিন্দায় দেখা যায় যে, শিশুপাল তাঁহাকে কংসের অন্নভোজী বলিতেছে—

> "যস্য চানেন ধর্ম্মজ্ঞ ভুক্তমন্নং বলীয়সঃ।
> স চানেন হতঃ কংস ইত্যেতন্ন মহাদ্ভুতং॥"
>
> মহাভারতম্, সভাপর্ব্ব, ৪০ অধ্যায়ঃ।

অতএব বোধ হয়, শিক্ষার সময় উপস্থিত হইতে না হইতেই কৃষ্ণ মথুরায় আনীত হইয়াছিলেন। বৃন্দাবনের গোপীদিগের সঙ্গে প্রথিত কৈশোরলীলা যে উপন্যাস মাত্র, ইহা তাহার অন্যতর প্রমাণ।

মথুরাবাসকালেও তাঁহার কিরূপ শিক্ষা হইয়াছিল, তাহারও কোন বিশিষ্ট বিবরণ নাই। কেবল সান্দীপনি মুনির নিকট চতুঃষষ্টি দিবস অস্ত্রশিক্ষার কথাই আছে। যাঁহারা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে পারেন, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের আবার শিক্ষার প্রয়োজন কি? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তবে চতুঃষষ্টি দিবস সান্দীপনিগৃহে শিক্ষারই বা প্রয়োজন কি? ফলতঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার

হইলেও মানবধর্ম্মাবলম্বী এবং মানুষী শক্তি দ্বারাই সকল কার্য্য সম্পন্ন করেন, এ কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এক্ষণেই তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখাইব। মানুষী শক্তি দ্বারা কর্ম্ম করিতে গেলে, শিক্ষার দ্বারা সেই মানুষী শক্তিকে অনুশীলিত এবং স্ফুরিত করিতে হয়। যদি মানুষী শক্তি সেই স্বতঃস্ফুরিত হইয়া সর্ব্বকার্য্যসাধনক্ষম হয়, তাহা হইলে সে ঐশী শক্তি—মানুষী শক্তি নহে। কৃষ্ণের যে মানুষী শিক্ষা হইয়াছিল, তাহা এই সান্দীপনিবৃত্তান্ত ভিন্ন আরও প্রমাণ আছে। তিনি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মহাভারতের সভাপর্ব্বে অর্ঘাভিহরণ-পর্ব্বাধ্যায়ে কৃষ্ণের পূজ্যতা বিষয়ে ভীষ্ম একটি হেতু এই নির্দ্দেশ করিতেছেন যে, কৃষ্ণ নিখিল বেদবেদাঙ্গপারদর্শী। তাদৃশ বেদবেদাঙ্গজ্ঞানসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি দুর্লভ।

"বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞানং বলং চাপ্যধিকং তথা।
নৃণাং লোকে হি কোঽন্যোঽস্তি বিশিষ্টঃ কেশবাদৃতে॥"

মহাভারতম্, সভাপর্ব্ব, ৩৮ অধ্যায়ঃ।

মহাভারতে কৃষ্ণের বেদজ্ঞতা সম্বন্ধে এইরূপ আরও ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বেদজ্ঞতা তাঁহার স্বতঃলব্ধও নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রমাণ পাইয়াছি যে, তিনি আঙ্গিরসবংশীয় ঘোর ঋষির নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

সে সময়ে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের উচ্চশিক্ষার উচ্চাংশকে তপস্যা বলিত। শ্রেষ্ঠ রাজর্ষিগণ কোন সময়ে না কোন সময়ে তপস্যা করিয়াছিলেন, এইরূপ কথা প্রায় পাওয়া যায় আমরা এক্ষণে তপস্যা অর্থে যাহা বুঝি, বেদের অনেক স্থানেই দেখা যায় যে, তপস্যার প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। আমরা বুঝি, তপস্যা অর্থে বনে বসিয়া চক্ষু বুজিয়া নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া পানাহার ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করা। কিন্তু দেবতাদিগের মধ্যে কেহ কেহ এবং মহাদেবও তপস্যা করিয়াছিলেন, ইহাও কোন কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ শতপথব্রাহ্মণে আছে যে, স্বয়ং পরব্রহ্ম সিসৃক্ষু হইলে তপস্যার দ্বারাই সৃষ্টি করিলেন, যথা—

সোঽকাময়ত। বহুঃ স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্‌ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত।* অর্থ,—"তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি প্রজাসৃষ্টির জন্য বহু হইব। তিনি তপস্যা করিলেন। তপস্যা করিয়া এই সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন।"

এ সকল স্থানে তপস্যা অর্থে এই রকমই বুঝিতে হয় যে, চিত্ত সমাহিত করিয়া আপনার শক্তি সকলের অনুশীলন ও স্ফুরণ করা। মহাভারতে কথিত আছে যে, কৃষ্ণ দশ বৎসর হিমালয় পর্ব্বতে তপস্যা করিয়াছিলেন। মহাভারতের ঐশিক পর্ব্বে লিখিত আছে যে, অশ্বত্থামাপ্রযুক্ত ব্রহ্মশিরা অস্ত্রের দ্বারা উত্তরার গর্ভপাতের সম্ভাবনা হইলে, কৃষ্ণ সেই মৃতশিশুকে পুনরুজ্জীবিত করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন, এবং তখন অশ্বত্থামাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি আমার তপোবল দেখিবে।

আদর্শ মনুষ্যের শিক্ষা আদর্শ শিক্ষাই হইবে। ফলও সেইরূপ দেখি। কিন্তু সেই প্রাচীন কালের আদর্শ শিক্ষা কিরূপ ছিল, তাহা কিছু জানিতে পারা গেল না, ইহা বড় দুঃখের বিষয়।

---

* ২ ষষ্ঠী, ৩ অনুবাক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—জরাসন্ধ

সকল সময়েই দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে, অন্ততঃ ভারতবর্ষের উত্তরার্দ্ধে এক এক জন সম্রাট্ ছিলেন, তাঁহার প্রাধান্য অন্য রাজগণ স্বীকার করিত। কেহ বা করদ, কেহ বা আজ্ঞানুবর্ত্তী, এবং যুদ্ধকালে সকলেই সহায় হইত। ঐতিহাসিক সময়ে চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, অশোক, মহাপ্রতাপশালী গুপ্তবংশীয়েরা, হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য, এবং আধুনিক সময় পাঠান ও মোগল—ইঁহারা এইরূপ সম্রাট ছিলেন। হিন্দুরাজ্যকালে অধিকাংশ সময়ই এই আধিপত্য মগধাধিপতিরই ছিল। আমর যে সময়ের বর্ণনায় উপস্থিত, সে সময়েও মগধাধিপতি উত্তরভারতে সম্রাট্। এই সম্রাট্ বিখ্যাত জরাসন্ধ। তাঁহার বল ও প্রতাপ মহাভারতে, হরিবংশে ও পুরাণ সকলে অতিশয় বিস্তারের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ একত্র হইয়াছিল। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও উভয় পক্ষের মোটে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা উপস্থিত ছিল, লেখা আছে। একা জরাসন্ধের বিংশতি অক্ষৌহিণী সেনা লিখিত হইয়াছে।

কংস এই জরাসন্ধের জামাতা। কংস তাঁহার দুই কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। কংসবধের পর তাঁহার বিধবা কন্যাদ্বয় জরাসন্ধের নিকটে গিয়া পতিহন্তার দমনার্থ রোদন করেন। জরাসন্ধ কৃষ্ণের বধার্থ মহাসৈন্য লইয়া আসিয়া মথুরা অবরোধ করেন। জরাসন্ধের অসংখ্য সৈন্যের তুলনায় যাদবদিগের সৈন্য অতি অল্প। তথাপি কৃষ্ণের সেনাপতিত্বগুণে যাদবেরা জরাসন্ধকে বিমুখ করিয়াছিলেন। কিন্তু জরাসন্ধের বলক্ষয় করা তাঁহাদের অসাধ্য। কেন না, জরাসন্ধের সৈন্য অগণ্য। অতএব জরাসন্ধ পুনঃপুনঃ আসিয়া মথুরা অবরোধ করিতে লাগিল। যদিও সে পুনঃপুনঃ বিমুখীকৃত হইল, তথাপি এই পুনঃপুনঃ আক্রমণে যাদবদিগের গুরুতর অশুভ উৎপাদনের সম্ভাবনা হইল। যাদব-দিগের ক্ষুদ্র সৈন্য পুনঃপুনঃ যুদ্ধে ক্ষয় হইতে লাগিলে তাঁহারা সৈন্যশূন্য হইবার উপক্রম হইলেন। কিন্তু সমুদ্রে জোয়ার ভাটার ন্যায় জরাসন্ধের অগাধ সৈন্যের ক্ষয়বৃদ্ধি কিছু জানিতে পারা গেল না। এইরূপ সপ্তদশ বার আক্রান্ত হওয়ার পর, যাদবেরা কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে মথুরা ত্যাগ করিয়া দুরাক্রম্য প্রদেশে দুর্গনির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিবার অভিপ্রায় করিলেন। অতএব সাগরদ্বীপ দ্বারকায় যাদবদিগের জন্য পুরী নির্ম্মাণ হইতে লাগিল এবং দুরারোহ রৈবতক পর্ব্বতে দ্বারকা রক্ষার্থে দুর্গশ্রেণী সংস্থাপিত হইল। কিন্তু তাঁহারা দ্বারকা যাইবার পূর্ব্বেই জরাসন্ধ অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ করিতে আসিলেন।

এই সময়ে জরাসন্ধের উত্তেজনায় আর এক প্রবল শত্রু কৃষ্ণকে আক্রমণ করিবার জন্য উপস্থিত হইল। অনেক গ্রন্থেই দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে যবনদিগের রাজত্ব ছিল। এক্ষণকার পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচীন গ্রীকদিগকেই ভারতবর্ষীয়েরা যবন বলিতেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ কি না, তদ্বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। বোধ হয়, শক, হূণ, গ্রীক প্রভৃতি অহিন্দু সভ্য জাতিমাত্রকেই যবন বলিতেন। যাহাই হউক, ঐ সময়ে, কালযবন নামে একজন যবন রাজা ভারতবর্ষে অতি প্রবলপ্রতাপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া সসৈন্যে মথুরা অবরোধ করিলেন। কিন্তু পরমসমররহস্যবিৎ কৃষ্ণ তাঁহার সহিত সসৈন্যে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা

করিলেন না। কেন না, ক্ষুদ্র যাদবসেনা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বিমুখ করিলেও, সংখ্যায় বড় অল্প হইয়া যাইবে। হতাবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহারা জরাসন্ধকে বিমুখ করিতে সক্ষম হইতে না পারে। আর ইহাও পশ্চাৎ দেখিব যে, সর্ব্বভূতে দয়াময় কৃষ্ণ প্রাণিহত্যা পক্ষে ধর্ম্ম্য প্রয়োজন ব্যতীত অনুরাগ প্রকাশ করেন না। যুদ্ধ অনেক সময়েই ধর্ম্মানুমোদিত, সে সময়ে যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত হইলে, ধর্ম্মের হানি হয়, গীতায় কৃষ্ণ এই মতই প্রকাশ করিয়াছেন। এবং এখানেও কালযবন এবং জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ। আত্মরক্ষার্থ এবং স্বজনরক্ষার্থ, প্রজাগণের রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা ঘোরতর অধর্ম্ম। কিন্তু যদি যুদ্ধ করিতেই হইল, তবে যত অল্প মনুষ্যের প্রাণহানি করিয়া কার্য্য সম্পন্ন করা যায়, ধার্ম্মিকের তাহাই কর্ত্তব্য। আমরা মহাভারতের সভাপর্ব্বে জরাসন্ধবধ-পর্ব্বাধ্যায়ে দেখিব যে, যাহাতে অন্য কোন মনুষ্যের জীবন হানি না হইয়া জরাসন্ধবধ সম্পন্ন হয়, কৃষ্ণ তাহার সদুপায় উদ্ভূত করিয়াছিলেন। কালযবনের যুদ্ধেও তাহাই করিলেন। তিনি সসৈন্যে কালযবনের সম্মুখীন না হইয়া কালযবনের বধার্থ কৌশল অবলম্বন করিলেন। একাকী কালযবনের শিবিরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কালযবন তাঁহাকে চিনিতে পারিল। কৃষ্ণকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল, কৃষ্ণ ধরা না দিয়া পলায়ন করিলেন। কালযবন তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। কৃষ্ণ যেমন বেদে বা যুদ্ধবিদ্যায় সুপণ্ডিত, শারীরিক ব্যায়ামেও তদ্রূপ সুপারগ। আদর্শ মনুষ্যের এইরূপ হওয়া উচিত, আমি "ধর্ম্মতত্ত্বে" দেখাইয়াছি। অতএব কালযবন কৃষ্ণকে ধরিতে পারিলেন না। কৃষ্ণ কালযবন কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া এক গিরিগুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কথিত আছে, সেখানে মুচুকুন্দ নামে এক ঋষি নিদ্রিত ছিলেন। কালযবন গুহান্ধকারমধ্যে কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া, সেই ঋষিকেই কৃষ্ণভ্রমে পদাঘাত করিল। পদাঘাতে উন্নিদ্র হইয়া ঋষি কালযবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র কালযবন ভস্মীভূত হইয়া গেল।

এই অতিপ্রকৃত ব্যাপারটাকে আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। স্থূল কথা এই বুঝি যে, কৃষ্ণ কৌশলাবলম্বনপূর্ব্বক কালযবনকে তাহার সৈন্য হইতে দূরে লইয়া গিয়া, গোপন স্থানে তাহার সঙ্গে দ্বৈরথ্য যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন। কালযবন নিহত হইলে, তাহার সৈন্য সকল ভঙ্গ দিয়া মথুরা পরিত্যাগ করিয়া গেল। তাহার পর জরাসন্ধের অষ্টাদশ আক্রমণ—সে বারও জরাসন্ধ বিমুখ হইল।

উপরে যেরূপ বিবরণ লিখিত হইল, তাহা হরিবংশে ও বিষ্ণ্বাদিপুরাণে আছে। মহাভারতে জরাসন্ধের যেরূপ পরিচয় কৃষ্ণ স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের কাছে দিয়াছেন, তাহাতে এই অষ্টাদশ বার যুদ্ধের কোন কথাই নাই। জরাসন্ধের সঙ্গে যে যাদবদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল, এমন কথাও স্পষ্টতঃ নাই। যাহা আছে, তাহাতে কেবল এইটুকু বুঝা যায় যে, জরাসন্ধ মথুরা একবার আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু হংস নামক তাঁহার অনুগত কোন বীর বলদেব কর্ত্তৃক নিহত হওয়ায় জরাসন্ধ দুঃখিত মনে স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন। সেই স্থান আমরা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কিয়ৎকাল অতীত হইল, কংস যাদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেবা ও অনুজা নামে বার্হদ্রথের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। ঐ দুরাত্মা স্বীয় বাহুবলে জ্ঞাতিবর্গকে পরাজয় করত সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ মূঢ়মতি

কংসের দৌরাত্ম্যে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি তৎকালে অক্রূরকে আহুককন্যা প্রদান করিয়া জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনার্থ বলভদ্র সমভিব্যাহারে কংস ও সুনামাকে সংহার করিলাম। তাহাতে কংসভয় নিবারিত হইল বটে, কিন্তু কিছুদিন পরেই জরাসন্ধ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তখন আমরা জ্ঞাতি বন্ধুগণের সহিত একত্র হইয়া পরামর্শ করিলাম যে, যদি আমরা শত্রুনাশক মহাস্ত্র দ্বারা তিন শত বৎসর অবিশ্রামে জরাসন্ধের সৈন্য বধ করি, তথাপি নিঃশেষিত করিতে পারিব না। দেবতুল্য তেজস্বী মহাবলপরাক্রান্ত হংস ও ডিম্বক নামক দুই বীর তাহার অনুগত আছে; উহারা অস্ত্রাঘাতে কদাচ নিহত হইবে না। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এই দুই বীর এবং জরাসন্ধ এই তিন জন একত্র হইলে ত্রিভুবন বিজয় করিতে পারে। হে ধর্ম্মরাজ! এই পরামর্শ কেবল আমাদিগের অভিমত হইল এমত নহে, অন্যান্য ভূপতিগণও উহাতে অনুমোদন করিবেন।

হংস নামে সুবিখ্যাত এক নরপতি ছিলেন। বলদেব তাঁহাকে সংগ্রামে সংহার করেন। ডিম্বক লোকমুখে হংস মরিয়াছে, এই কথা শ্রবণ করিয়া নামসাদৃশ্যপ্রযুক্ত তাহার সহচর হংস নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া স্থির করিল। পরে হংস বিনা আমার জীবন ধারণে প্রয়োজন নাই, এই বিবেচনা করতঃ যমুনায় নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এ দিকে তৎ-সহচর হংসও পরম প্রণয়াস্পদ ডিম্বকে আপন মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিতে শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া যমুনাজলে আত্মসমর্পণ করিল। জরাসন্ধ এই দুই বীর পুরুষের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও শূন্যমনা হইয়া স্বনগরে প্রস্থান করিলেন। জরাসন্ধ বিমনা হইয়া স্বপুরে গমন করিলে পর আমরা পরমাহ্লাদে মথুরায় বাস করিতে লাগিলাম।

কিয়দ্দিনান্তর পতিবিয়োগ-দুঃখিনী জরাসন্ধনন্দিনী স্বীয় পিতার সমীপে আগমন পূর্ব্বক 'আমার পতিহন্তাকে সংহার কর' বলিয়া বারংবার তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমরা পূর্ব্বেই জরাসন্ধের বলবিক্রমের বিষয় স্থির করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা স্মরণ করতঃ সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলাম। তখন আমরা আমাদের বিপুল ধনসম্পত্তি বিভাগ করত সকলে কিছু কিছু লইয়া প্রস্থান করিব এই স্থির করিয়া স্বস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশ্চিমদিকে পলায়ন করিলাম। ঐ পশ্চিম দেশে রৈবতোপশোভিত পরম রমণীয় কুশস্থলীনাম্নী পুরীতে বাস করিতেছি—তথায় এরূপ দুর্গসংস্কার করিয়াছি যে, সেখানে থাকিয়া বৃষ্ণিবংশীয় মহারথদিগের কথা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। হে রাজন্! এক্ষণে আমরা অকুতোভয়ে ঐ নগরীমধ্যে বাস করিতেছি। মাধবগণ সমস্ত মগধদেশব্যাপী সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রৈবতক পর্ব্বত দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন। হে কুরুকুলপ্রদীপ! আমরা সামর্থ্যযুক্ত হইয়াও জরাসন্ধের উপদ্রবভয়ে পর্ব্বত আশ্রয় করিয়াছি। ঐ পর্ব্বত দৈর্ঘ্যে তিন যোজন, প্রস্থে এক যোজনের অধিক এবং একবিংশতি শৃঙ্গযুক্ত। উহাতে এক এক যোজনের পর শত শতদ্বার এবং অত্যুৎকৃষ্ট উন্নত তোরণ সকল আছে। যুদ্ধদুর্ম্মদ মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ উহাতে সর্ব্বদা বাস করিতেছেন। হে রাজন্! আমাদের কুলে অষ্টাদশ সহস্র ভ্রাতা আছে। আহুকের একশত পুত্র, তাহারা সকলেই অমরতুল্য। চারুদেষ্ণ ও তাঁহার ভ্রাতা, চক্রদেব,

সাত্যকি, আমি, বলভদ্র, যুদ্ধবিশারদ শাম্ব—আমরা এই সাত জন রথী ; কৃতবর্ম্মা, অনাধৃষ্টি, সমীক, সমিতিঞ্জয়, কঙ্ক, শঙ্কু ও কুন্তি এই সাত জন মহারথ, এবং অন্ধক-ভোজের দুই বৃদ্ধ পুত্র ও রাজা এই মহাবলপরাক্রান্ত দৃঢ়কলেবর দশ জন মহাবীর,—ইঁহারা সকলেই জরাসন্ধাধিকৃত মধ্যম দেশ স্মরণ করিয়া যদুবংশীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন।”

এই জরাসন্ধবধ-পর্ব্বাধ্যায় প্রধানতঃ মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়া আমার বিশ্বাস। দু-একটা কথা প্রক্ষিপ্ত থাকিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশই মৌলিক। যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে, কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের বিরোধ-বিষয়ে উপরি উক্ত বৃত্তান্তই প্রামাণিক বলিয়া আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। কেন না, পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি যে, হরিবংশ এবং পুরাণ সকলের অপেক্ষা মহাভারতের মৌলিকাংশ অনেক প্রাচীন। যদি এ কথা যথার্থ হয়, তবে জরাসন্ধকৃত অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ এবং অষ্টাদশ বার তাহার পরাভব, এ সমস্তই মিথ্যা গল্প। প্রকৃত বৃত্তান্ত এই হইতে পারে যে, একবারমাত্র সে মথুরা আক্রমণে আসিয়াছিল এবং নিষ্ফল হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। দ্বিতীয়বার আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু কৃষ্ণ দেখিলেন যে, চতুর্দ্দিকে সমতল ভূমির মধ্যবর্ত্তী মথুরা নগরীতে বাস করিয়া জরাসন্ধের অসখ্যংসৈন্যকৃত পুনঃপুনঃ অবরোধ নিষ্ফল করা অসম্ভব। অতএব যেখানে দুর্গনির্ম্মাণপূর্ব্বক দুর্গাশ্রয়ে ক্ষুদ্র সেনা রক্ষা করিয়া জরাসন্ধকে বিমুখ করিতে পারিবেন, সেইখানে রাজধানী তুলিয়া লইয়া গেলেন। দেখিয়া জরাসন্ধ আর সে দিকে ঘেঁষিলেন না। জয়-পরাজয়ের কথা ইহাতে কিছুই নাই। ইহাতে কেবল ইহাই বুঝা যায় যে, যুদ্ধকৌশলে কৃষ্ণ পারদর্শী, তিনি পরম রাজনীতিজ্ঞ এবং অনর্থক মনুষ্যহত্যার নিতান্ত বিরোধী। আদর্শ মনুষ্যের সমস্ত গুণ তাঁহাতে ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণের বিবাহ

কৃষ্ণের প্রথম ভার্য্যা রুক্মিণী। ইনি বিদর্ভরাজ্যের অধিপতি ভীষ্মকের কন্যা। তিনি অতিশয় রূপবতী এবং গুণবতী শুনিয়া কৃষ্ণ ভীষ্মকের নিকট রুক্মিণীকে বিবাহার্থ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। রুক্মিণীও কৃষ্ণের অনুরক্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু ভীষ্মক কৃষ্ণশত্রু জরাসন্ধের পরামর্শে রুক্মিণীকে কৃষ্ণে সমর্পণ করিতে অসম্মত হইলেন। তিনি কৃষ্ণদ্বেষক শিশুপালের সঙ্গে রুক্মিণীর বিবাহ স্থির করিয়া দিনাবধারণপূর্ব্বক সমস্ত রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। যাদবগণের নিমন্ত্রণ হইল না। কৃষ্ণ স্থির করিলেন, যাদবদিগকে সঙ্গে লইয়া ভীষ্মকের রাজধানীতে যাইবেন এবং রুক্মিণীকে তাঁহার বন্ধুবর্গের অসম্মতিতেও গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিবেন।

কৃষ্ণ তাহাই করিলেন। বিবাহের দিনে রুক্মিণী দেবারাধনা করিয়া দেবমন্দির হইতে বাহির হইলে পর, কৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া রথে তুলিলেন। ভীষ্মক ও তাঁহার পুত্রগণ এবং জরাসন্ধ প্রভৃতি ভীষ্মকের মিত্ররাজগণ কৃষ্ণের আগমনসংবাদ শুনিয়াই এইরূপ একটা কাণ্ড উপস্থিত হইবে বুঝিয়াছিলেন। অতএব তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন। সৈন্য

লইয়া সকলে কৃষ্ণের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। কিন্তু কেহই কৃষ্ণকে ও যাদবগণকে পরাভূত করিতে পারিলেন না। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে দ্বারকায় লইয়া গিয়া যথাশাস্ত্র বিবাহ করিলেন।

ইহাকে ‘হরণ’ বলে। হরণ অর্থে কন্যার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার বুঝায় না। কন্যার যদি পাত্র অভিমত হয়, এবং সে বিবাহে সে সম্মত থাকে, তবে তাহার প্রতি কি অত্যাচার? রুক্মিণীহরণেও সে দোষ ঘটে নাই, কেন না, রুক্মিণী কৃষ্ণে অনুরক্তা, এবং পরে দেখাইব যে, কৃষ্ণানুমোদিত অর্জ্জুনকৃত সুভদ্রাহরণেও সে দোষ ঘটে নাই। তবে এরূপ কন্যাহরণে কোন প্রকার দোষ আছে কি না, তাহার বিশেষ বিচার আবশ্যক, এ কথা আমরা স্বীকার করি। আমরা সে বিচার সুভদ্রাহরণের সময় করিব। কেন না, কৃষ্ণ নিজেই সে বিচার সেই সময় করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে সে বিষয়ে কোন কথা বলিব না।

তবে ইহার ভিতর আর একটা কথা আছে। সে কালে ক্ষত্রিয়রাজগণের বিবাহের দুইটি পদ্ধতি প্রশস্ত ছিল;—এক স্বয়ংবর বিবাহ, আর এক হরণ। কখনও কখনও এক বিবাহে দুই রকম ঘটিয়া যাইত, যথা—কাশিরাজকন্যা অম্বিকাদির বিবাহে। ঐ বিবাহে স্বয়ংবর হয়। কিন্তু আদর্শ ক্ষত্রিয় দেবব্রত ভীষ্ম, স্বয়ংবর না মানিয়া, তিনটি কন্যাই কাড়িয়া লইয়া গেলেন। আর কন্যার স্বয়ংবরই হউক, আর হরণই হউক, কন্যা একজন লাভ করিলে, উদ্ধতস্বভাব রণপ্রিয় ক্ষত্রিয়গণ একটা যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত করিতেন। ইতিহাসে দ্রৌপদীস্বয়ংবরে এবং কাব্যে ইন্দুমতীস্বয়ংবরে দেখিতে পাই যে, কন্যা হৃতা হয় নাই, তথাপি যুদ্ধ উপস্থিত। মহাভারতের মৌলিক অংশে রুক্মিণী যে হৃতা হইয়াছিলেন, এমন কথাটা পাওয়া যায় না। শিশুপালবধ-পর্ব্বাধ্যায়ে কৃষ্ণ বলিতেছেন:—

> রুক্মিণ্যামস্য মূঢ়স্য প্রার্থনাসীন্মুমূর্ষতঃ।
> ন চ তাং প্রাপ্তবান্ মূঢ়ঃ শূদ্রো বেদশ্রুতীমিব॥
>
> শিশুপালবধপর্ব্বাধ্যায়ে, ৪৫ অঃ, ১৫ শ্লোকঃ।

শিশুপাল উত্তর করিলেন:—

> মৎপূর্ব্বাং রুক্মিণীং কৃষ্ণ সংসৎসু পরিকীর্ত্তয়ন্।
> বিশেষতঃ পার্থিবেষু ব্রীড়াং ন কুরুষে কথম্॥
> মন্যমানো হি কঃ সৎসু পুরুষঃ পরিকীর্ত্তয়েৎ।
> অন্যপূর্ব্বাং স্ত্রিয়ং জাতু ত্বদন্যো মধুসূদন॥
>
> শিশুপালবধপর্ব্বাধ্যায়ে, ৪৫ অঃ, ১৮-১৯ শ্লোকঃ।

ইহাতে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে বুঝিতে পারিব যে, রুক্মিণী হৃতা হইয়াছিলেন, বা তজ্জন্য কোন যুদ্ধ হইয়াছিল। তার পর উদ্যোগপর্ব্বে আর এক স্থানে আছে,—

> যো রুক্মিণীমেকরথেন ভোজান্ উৎসাদ্য রাজ্ঞঃ সমরে প্রসহ্য।
> উবাহ ভার্য্যাং যশসা জ্বলন্তীং যস্যাং জজ্ঞে রৌক্মিণেয়ো মহাত্মা॥

ইহাতে যুদ্ধের কথা আছে, কিন্তু হরণের কথা নাই।

আর এক স্থানে রুক্মিণীহরণবৃত্তান্ত আছে। উদ্যোগপর্ব্বে সৈন্যনির্য্যাণ সময়ে রুক্মিণীর ভ্রাতা রুক্মী পাণ্ডবদিগের শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তদুপলক্ষে কথিত হইতেছে :—

"বাহুবলগর্ব্বিত রুক্মী পূর্ব্বে ধীমান্ বাসুদেবের রুক্মিণীহরণ সহ্য করিতে না পারিয়া, 'আমি কৃষ্ণকে বিনষ্ট না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না', এইরূপ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক প্রবৃদ্ধ ভাগীরথীর ন্যায় বেগবতী বিচিত্র আয়ুধধারিণী চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার সন্নিহিত হইবামাত্র পরাজিত ও লজ্জিত হইয়া প্রতিগমন করিলেন। কিন্তু যে স্থানে বাসুদেবকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, তথায় ভোজকট নামক প্রভূত সৈন্য ও গজবাজিসম্পন্ন সুবিখ্যাত এক নগর সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই নগর হইতে ভোজরাজ রুক্মী এক অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে সত্বরে পাণ্ডবগণের নিকট আগমন করিলেন এবং পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত কবচ, ধনু, তলবার, খড়্গ ও শরাসন ধারণ করিয়া আদিত্যসঙ্কাশ ধ্বজের সহিত পাণ্ডবসৈন্যমণ্ডলী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।"

এই কথা উদ্যোগপর্ব্বে ১৫৭শ অধ্যায়ে আছে। ঐ অধ্যায়ের নাম রুক্মিপ্রত্যাখ্যান। মহাভারতের যে পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাতে লিখিত আছে যে, উদ্যোগপর্ব্বে ১৮৬ অধ্যায়, এবং ৬৬৯৮ শ্লোক আছে।

"উদ্যোগপর্ব্বনির্দ্দিষ্টং সন্ধিবিগ্রহমিশ্রিতম্।
অধ্যায়ানাং শতং প্রোক্তং ষড়শীতির্মহর্ষিণা॥
শ্লোকানাং ষট্সহস্রাণি তাবন্ত্যেব শতানি চ।
শ্লোকাশ্চ নবতিঃ প্রোক্তাস্তথৈবাষ্টৌ মহাত্মনা॥

মহাভারতম্, আদিপর্ব্ব।

এক্ষণে মহাভারতে ১৯৭ অধ্যায় পাওয়া যায়। অতএব ১১ অধ্যায় পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলিত হওয়ার পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে উদ্যোগপর্ব্বে ৭৬৫৭ শ্লোক পাওয়া যায়। অতএব প্রায় এক হাজার শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রক্ষিপ্ত এই একাদশ অধ্যায় ও সহস্র শ্লোক কোন্গুলি? প্রথমেই দেখিতে হয় যে, উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত কোন্ বৃত্তান্তগুলি পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে ধৃত হয় নাই। এই রুক্মিসমাগম বা রুক্মিপ্রত্যাখ্যান পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে ধৃত হয় নাই। অতএব ঐ ১৫৭ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত একাদশ অধ্যায়ের মধ্যে একটি, ইহা বিচারসঙ্গত। এই রুক্মিপ্রত্যাখ্যান-পর্ব্বাধ্যায়ের সঙ্গে মহাভারতের কোন সম্বন্ধ নাই। রুক্মী সসৈন্যে আসিলেন এবং অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন, পশ্চাৎ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃকও পরিত্যক্ত হইলেন, পশ্চাৎ স্বস্থানে চলিয়া গেলেন, ইহা ভিন্ন মহাভারতের সঙ্গে তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ নাই। এই দুইটি লক্ষণ একত্রিত করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে, অবশ্য বুঝিতে হইবে যে, ১৫৭ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত, কাজেই রুক্মিণীহরণ বৃত্তান্ত মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত। ইহার অন্যতর প্রমাণ এই যে, বিষ্ণুপুরাণে আছে যে, মহাভারতের যুদ্ধের পূর্ব্বেই রুক্মী বলরাম কর্ত্তৃক অক্ষক্রীড়াজনিত বিবাদে নিহত হইয়াছিলেন। রুক্মিণীকে শিশুপাল কামনা করিয়াছিলেন, ইহা সত্য এবং তিনি রুক্মিণীকে বিবাহ করিতে পান নাই—কৃষ্ণ তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহাও সত্য। বিবাহের পর একটা

যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু 'হরণ' কথাটা মৌলিক মহাভারতে কোথাও নাই। হরিবংশে ও পুরাণে আছে।

শিশুপাল ভীষ্মকে তিরস্কারের সময় কাশিরাজের কন্যাহরণ জন্য তাঁহাকে গালি দিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকে তিরস্কারের সময় রুক্মিণীহরণের কোন কথাও তুলেন নাই। অতএব বোধ হয় না যে, রুক্মিণী হৃতা হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত কথোপকথনে ইহাই সত্য বোধ হয় যে, শিশুপাল রুক্মিণীকে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীষ্মক রুক্মিণীকে কৃষ্ণকেই সম্প্রদান করিয়াছিলেন। তার পর তাঁহার পুত্র রুক্মী শিশুপালের পক্ষ হইয়া বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিলেন। রুক্মী অতিশয় কলহপ্রিয় ছিলেন। অনিরুদ্ধের বিবাহকালে দ্যূতোপলক্ষে বলরামের সঙ্গে কলহ উপস্থিত করিয়া নিজেই নিহত হইয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—নরকবধাদি

কথিত হইয়াছে, নরকাসুর নামে পৃথিবীর এক পুত্র ছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষে তাহার রাজধানী। সে অত্যন্ত দুর্ব্বিনীত ছিল। ইন্দ্র স্বয়ং দ্বারকায় আসিয়া তাহার নামে কৃষ্ণের নিকট নালিশ করিলেন। অন্যান্য দুষ্কর্ম্মের মধ্যে নরক ইন্দ্র বিষ্ণু প্রভৃতি আদিত্যদিগের মাতা দিতির কুণ্ডল চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল। কৃষ্ণ ইন্দ্রের নিকট নরকবধে প্রতিশ্রুত হইয়া প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গিয়া নরককে বধ করিলেন। নরকের ষোল হাজার কন্যা ছিল, তাহাদিগের সকলকে লইয়া আসিয়া বিবাহ করিলেন। নরকমাতা পৃথিবী নরকাপহৃত দিতিকুণ্ডল লইয়া আসিয়া কৃষ্ণকে উপহার দিলেন; এবং বলিয়া গেলেন যে, কৃষ্ণ যখন বরাহ অবতার হইয়াছিলেন, তখন পৃথিবীর উদ্ধারজন্য বরাহের যে স্পর্শ, সেই স্পর্শে পৃথিবী গর্ভবতী হইয়া নরককে প্রসব করিয়াছিলেন।

সমস্তই অতিপ্রকৃত এবং সমস্তই অতি মিথ্যা। বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ করেন নাই, প্রজাপতি পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ইহাই বেদে আছে। কৃষ্ণের সময়ে, নরক প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা ছিলেন না—ভগদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা ছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জ্জুনহস্তে নিহত হন। ফলতঃ ইন্দ্রের দ্বারকা গমন, পৃথিবীর গর্ভাধান এবং এক জনের ষোড়শ সহস্র কন্যা ইত্যাদি সকলই অতিপ্রকৃত উপন্যাস মাত্র। কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষী থাকাও এই উপন্যাসের অংশমাত্র এবং মিথ্যা গল্প, ইহা পাঠককে আর বলিতে হইবে না।

এই নরকাসুরবধ হইতে বিষ্ণুপুরাণের মতে পারিজাত হরণের সূত্রপাত। কৃষ্ণ দিতির কুণ্ডল লইয়া দিতিকে দিবার জন্য সত্যভামা সমভিব্যাহারে ইন্দ্রালয়ে গমন করিলেন। সেখানে সত্যভামা পারিজাত কামনা করায় পারিজাত বৃক্ষ লইয়া ইন্দ্রের সঙ্গে কৃষ্ণের যুদ্ধ বাধিল। ইন্দ্র পরাস্ত হইলেন। হরিবংশে ইহা ভিন্নপ্রকারে লিখিত আছে। কিন্তু যখন আমরা বিষ্ণুপুরাণকে হরিবংশের পূর্ব্বগামী গ্রন্থ বিবেচনা করি, তখন এখানে বিষ্ণুপুরাণেরই অনুবর্ত্তী হইলাম। উভয় গ্রন্থকথিত বৃত্তান্তই অত্যদ্ভুত ও অতিপ্রকৃত। যখন আমরা ইন্দ্র, ইন্দ্রালয় এবং পারিজাতের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অবিশ্বাসী, তখন এই সমস্ত পারিজাতহরণবৃত্তান্তই আমাদের পরিহার্য্য।

ইহার পর বাণাসুরবধবৃত্তান্ত। তাহাও ঐরূপ অতিপ্রকৃত অদ্ভুতব্যাপারপরিপূর্ণ, এজন্য তাহাও আমরা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য। তাহার পর পৌণ্ড্র বাসুদেববধ এবং বারাণসীদাহ। ইহার কতকটা ঐতিহাসিকতা আছে বোধ হয়। পৌণ্ড্রদিগের রাজা ঐতিহাসিক, এবং পৌণ্ড্র জাতির কথা ঐতিহাসিক এবং অনৈতিহাসিক সময়েও বিবিধ দেশী বিদেশী গ্রন্থে পাওয়া যায়। রামায়ণে তাহাদিগকে দাক্ষিণাত্যে দেখা যায়, কিন্তু মহাভারতের সময়ে তাহারা আধুনিক বাঙ্গালার পশ্চিমভাগবাসী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পৌণ্ড্রেরা উপস্থিত ছিল, মহাভারতে তাহারা অনার্য্য জাতির মধ্যে গণিত হইয়াছে। দশকুমারচরিতেও তাহাদিগের কথা আছে এবং এক জন চৈনিক পরিব্রাজক তাহাদিগকে বাঙ্গালা দেশে স্থাপিত দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি তাহাদিগের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনেও গিয়াছিলেন, কৃষ্ণের সময়ে যিনি পৌণ্ড্রদিগের রাজা ছিলেন, তাঁহারও নাম বাসুদেব। বাসুদেব শব্দের অনেক অর্থ হয়। যিনি বসুদেবের পুত্র, তিনি বাসুদেব। এবং যিনি সর্ব্বনিবাস অর্থাৎ সর্ব্বভূতের বাসস্থান, তিনিও বাসুদেব।* অতএব যিনি ঈশ্বরের অবতার, তিনিই প্রকৃত বাসুদেব নামের অধিকারী। এই পৌণ্ড্রক বাসুদেব প্রচার করিলেন যে, দ্বারকানিবাসী বাসুদেব, জাল বাসুদেব; তিনি নিজেই প্রকৃত বাসুদেব—ঈশ্বরাবতার। তিনি কৃষ্ণকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তুমি আমার নিকটে আসিয়া, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মাদি যে সকল চিহ্নে আমারই প্রকৃত অধিকার, তাহা আমাকেই দিবে। কৃষ্ণ 'তথাস্তু' বলিয়া পৌণ্ড্ররাজ্যে গমন করিলেন এবং চক্রাদি অস্ত্র পৌণ্ড্রকের প্রতি ক্ষিপ্ত করিয়া তাহাকে নিহত করিলেন। বারাণসীর অধিপতিগণ পৌণ্ড্রকের পক্ষ হইয়াছিল, এবং পৌণ্ড্রকের মৃত্যুর পরেও কৃষ্ণের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া, যুদ্ধ করিতেছিল। এজন্য তিনি বারাণসী আক্রমণ করিয়া শত্রুগণকে নিহত করিলেন এবং বারাণসী দগ্ধ করিলেন।

এ স্থলে শত্রুকে নিহত করা অধর্ম্ম নহে, কিন্তু নগরদাহ ধর্ম্মানুমোদিত নহে। পরম ধর্ম্মাত্মা কৃষ্ণের দ্বারা এরূপ কার্য্য কেন হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ কিছু পাওয়া যায় না। বিষ্ণুপুরাণে লেখা আছে যে, কাশিরাজ কৃষ্ণহস্তে নিহত হইলে, তাঁহার পুত্র মহাদেবের তপস্যা করিয়া কৃষ্ণের বধের নিমিত্ত "কৃত্যা উৎপন্ন হউক", এই বর প্রার্থনা করিলেন। কৃত্যা অভিচারকে বলে। অর্থাৎ যজ্ঞ হইতে শরীরবিশিষ্টা অমোঘ কোন শক্তি উৎপন্ন হইয়া শত্রুর বধসাধন করে। মহাদেব প্রার্থিত বর দিলেন। কৃত্যা উৎপন্ন হইয়া ভীষণ মূর্ত্তিধারণপূর্ব্বক কৃষ্ণের বধার্থ ধাবমান হইল। কৃষ্ণ সুদর্শন চক্রকে আজ্ঞা করিলেন যে, তুমি এই কৃত্যাকে সংহার কর। বৈষ্ণবচক্রের প্রভাবে মাহেশ্বরী কৃত্যা বিধ্বস্তপ্রভাবা হইয়া পলায়ন করিল। চক্রও পশ্চাদ্ধাবিত হইল। কৃত্যা বারাণসী নগর মধ্যে প্রবেশ করিল। চক্রানলে সমস্ত পুরী দগ্ধ হইয়া গেল। ইহা অতিশয় অনৈসর্গিক ও অবিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার। হরিবংশে পৌণ্ড্রকবধের কথা আছে, কিন্তু বারাণসীদাহের কথা নাই। কিন্তু ইহার কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ মহাভারতে আছে। অতএব বারাণসীদাহ অনৈতিহাসিক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। তবে

* "বসুঃ সর্ব্বনিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু।
স চ দেবঃ পরং ব্রহ্ম বাসুদেব ইতি স্মৃতঃ॥"

কি জন্য বারাণসীদাহ করিতে কৃষ্ণ বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য কারণ কিছু জানা যায় না।

যে সকল যুদ্ধের কথা বলা গেল, তদ্ভিন্ন উদ্যোগপর্ব্বে ৪৭ অধ্যায়ে অর্জ্জুনবাক্যে কৃষ্ণকৃত গান্ধারজয়, পাণ্ড্যজয়, কলিঙ্গজয়, শাল্বজয় এবং একলব্যের সংহারের প্রসঙ্গ আছে। ইহার মধ্যে শাল্বজয়বৃত্তান্ত মহাভারতের বনপর্ব্বে আছে। ইহা ভিন্ন আর কয়টির কোন বিস্তারিত বিবরণ আমি কোন গ্রন্থে পাইলাম না। বোধ হয়, হরিবংশ ও পুরাণ সকল সংগ্রহের পূর্ব্বে এই সকল যুদ্ধ-বিষয়ক কিম্বদন্তী বিলুপ্ত হইয়াছিল। হরিবংশে ও ভাগবতে অনেক নূতন কথা আছে, কিন্তু মহাভারতে বা বিষ্ণুপুরাণে তাহার কোন প্রসঙ্গ নাই বলিয়া আমি সে সকল পরিত্যাগ করিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—দ্বারকাবাস—স্যমন্তক

দ্বারকায় কৃষ্ণ রাজা ছিলেন না। যত দূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে, ইউরোপীয় ইতিহাসে যাহাকে Oligarchy বলে, যাদবেরা দ্বারকায় তাহাই ছিলেন। অর্থাৎ তাঁহারা সমাজের অধিনায়ক ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা পরস্পর সকলে সমানস্পর্দ্ধী। বয়োজ্যেষ্ঠকে আপনাদিগের মধ্যে প্রধান বিবেচনা করিতেন, সেই জন্য উগ্রসেনের রাজা নাম। কিন্তু এরূপ প্রধান ব্যক্তির কার্য্যতঃ বড় কর্ত্তৃত্ব থাকিত না। যে বুদ্ধিবিক্রমে প্রধান, নেতৃত্ব তাহারই ঘটিত। কৃষ্ণ যাদবদিগের মধ্যে বলবীর্য্য বুদ্ধিবিক্রমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই জন্যই তিনি যাদবদিগের নেতৃস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার অগ্রজ বলরাম এবং কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ যাদবগণও তাঁহার বশীভূত ছিলেন। কৃষ্ণও সর্ব্বদা তাঁহাদিগের মঙ্গলকামনা করিতেন। কৃষ্ণ হইতেই তাঁহাদিগের রক্ষা সাধিত হইত এবং কৃষ্ণ বহু-রাজ্যবিজেতা হইয়াও জ্ঞাতিবর্গকে না দিয়া আপনি কোন ঐশ্বর্য্যভোগ করিতেন না। তিনি সকলের প্রতি তুল্যপ্রীতিসম্পন্ন ছিলেন। সকলেরই হিতসাধন করিতেন। জ্ঞাতিদিগের প্রতি আদর্শ মনুষ্যের যেরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহা তিনি করিতেন। কিন্তু জ্ঞাতিভাব চিরকালই সমান। তাঁহার বলবিক্রমের ভয়ে জ্ঞাতিরা তাঁহার বশীভূত ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি দ্বেষশূন্য ছিল না। এ বিষয়ে কৃষ্ণ স্বয়ং যাহা নারদের কাছে বলিয়াছিলেন, ভীষ্ম তাহা নারদের মুখে শুনিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন। কথাগুলি সত্য হউক, মিথ্যা হউক, লোকশিক্ষার্থে আমরা তাহা মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব হইতে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"জ্ঞাতিদিগকে ঐশ্বর্য্যের অর্দ্ধাংশ প্রদান ও তাহাদিগের কটুবাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের দাসের ন্যায় অবস্থান করিতেছি। বহ্নিলাভার্থী ব্যক্তি যেমন অরণি কাষ্ঠকে মথিত করিয়া থাকে, তদ্রূপ জ্ঞাতিবর্গের দুর্ব্বাক্য নিরন্তর আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। বলদেব বল, গদ সুকুমারতা এবং আমার আত্মজ প্রদ্যুম্ন সৌন্দর্য্য-প্রভাবে জনসমাজে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। আর অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরাও মহাবল-পরাক্রান্ত, উৎসাহসম্পন্ন ও অধ্যবসায়শালী; তাঁহারা যাহার সহায়তা না করেন, সে বিনষ্ট হয় এবং যাহার সহায়তা করেন, সে অনায়াসে অসামান্য ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। ঐ সকল ব্যক্তি আমার পক্ষ থাকিতেও আমি অসহায় হইয়া কালযাপন

করিতেছি। আহুক ও অক্রূর আমার পরম সুহৃৎ, কিন্তু ঐ দুই জনের মধ্যে এক জনকে স্নেহ করিলে অন্যের ক্রোধোদ্দীপন হয়; সুতরাং আমি কাহারও প্রতি স্নেহ প্রকাশ করি না। আর নিতান্ত সৌহার্দ্দ বশতঃ উঁহাদিগকে পরিত্যাগ করাও সুকঠিন। অতঃপর আমি এই স্থির করিলাম যে, আহুক ও অক্রূর যাহার পক্ষ, তাহার দুঃখের পরিসীমা নাই, আর তাঁহারা যাহার পক্ষ নহেন, তাহা অপেক্ষাও দুঃখী আর কেহই নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি দ্যূতকারী সহোদরদ্বয়ের মাতার ন্যায় উভয়েরই জয় প্রার্থনা করিতেছি। হে নারদ! আমি ঐ দুই মিত্রকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত এইরূপ কষ্ট পাইতেছি।"

এই কথার উদাহরণস্বরূপ স্যমন্তক মণির বৃত্তান্ত পাঠককে উপহার দিতে ইচ্ছা করি। স্যমন্তক মণির বৃত্তান্ত অতিপ্রকৃত পরিপূর্ণ। অতিপ্রকৃত অংশ বাদ দিলে যেটুকু থাকিবে, তাহাও কত দূর সত্য, বলা যায় না। যাহা হউক, স্থূল বৃত্তান্ত পাঠককে শুনাইতেছি।

সত্রাজিত নামে এক জন যাদব দ্বারকায় বাস করিতেন। তিনি একটি অতি উজ্জ্বল সর্ব্বজনলোভনীয় মণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মণির নাম স্যমন্তক। কৃষ্ণ সেই মণি দেখিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ইহা যাদবাধিপতি উগ্রসেনেরই যোগ্য। কিন্তু জ্ঞাতিবিরোধ-ভয়ে সত্রাজিতের নিকট মণি প্রার্থনা করেন নাই; কিন্তু সত্রাজিত মনে ভয় করিলেন যে, কৃষ্ণ এই মণি চাহিবেন। চাহিলে তিনি রাখিতে পারিবেন না, এই ভয়ে মণি তিনি নিজে ধারণ না করিয়া আপনার ভ্রাতা প্রসেনকে দিয়াছিলেন। প্রসেন সেই মণি ধারণ করিয়া এক দিন মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। বনমধ্যে একটা সিংহ তাঁহাকে হত করিয়া সেই মণি মুখে করিয়া লইয়া চলিয়া যায়। জাম্ববান্ সিংহকে হত করিয়া সেই মণি গ্রহণ করে। জাম্ববান্ একটা ভল্লুক। কথিত আছে যে, সে দ্বাপরযুগে রামের বানরসেনার মধ্যে থাকিয়া রামের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল।

এ দিকে প্রসেন নিহত এবং মণি অন্তর্হিত জানিতে পারিয়া দ্বারকাবাসী লোকে এইরূপ সন্দেহ করিল যে, কৃষ্ণের যখন এই মণি লইবার ইচ্ছা ছিল, তখন তিনিই প্রসেনকে মারিয়া মণি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। এইরূপ লোকাপবাদ কৃষ্ণের অসহ্য হওয়ায় তিনি মণির সন্ধানে বহির্গত হইলেন। যেখানে প্রসেনের মৃতদেহ দেখিলেন, সেইখানে সিংহের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তাহা সকলকে দেখাইয়া আপনার কলঙ্ক অপনীত করিলেন। পরে সিংহের পদচিহ্নানুসরণ করিয়া ভল্লুকের পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। সেই পদচিহ্ন ধরিয়া গর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় জাম্ববানের পুত্রপালিকা ধাত্রীর হস্তে সেই স্যমন্তক মণি দেখিতে পাইলেন। পরে জাম্ববানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাভব করিলেন। তখন জাম্ববান্ তাঁহাকে স্যমন্তক মণি দিল, এবং আপনার কন্যা জাম্ববতীকে কৃষ্ণে সম্প্রদান করিল। কৃষ্ণ মণি লইয়া দ্বারকায় আসিয়া মণি সত্রাজিতকেই প্রত্যর্পণ করিলেন। তিনি পরস্ব কামনা করিতেন না। কিন্তু সত্রাজিত, কৃষ্ণের উপর অভূতপূর্ব্ব কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছিলেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া, কৃষ্ণের তুষ্টিসাধনার্থ আপনার কন্যা সত্যভামাকে কৃষ্ণে সম্প্রদান করিলেন। সত্যভামা সর্ব্বজনপ্রার্থনীয় রূপবতী কন্যা ছিলেন। এজন্য তিন জন প্রধান যাদব,

অর্থাৎ শতধন্বা, মহাবীর কৃতবর্ম্মা এবং কৃষ্ণের পরম ভক্ত ও সুহৃৎ অক্রূর ঐ কন্যাকে কামনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সত্যভামা কৃষ্ণে সম্প্রদত্তা হওয়ায় তাঁহারা আপনাদিগকে অত্যন্ত অপমানিত বিবেচনা করিলেন এবং সত্রাজিতের বধের জন্য ষড়্‌যন্ত্র করিলেন। অক্রূর ও কৃতবর্ম্মা শতধন্বাকে পরামর্শ দিলেন যে, তুমি সত্রাজিতকে বধ করিয়া তাহার মণি চুরি কর। কৃষ্ণ তোমাদের যদি বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাহা হইলে, আমরা তোমার সাহায্য করিব। শতধন্বা সম্মত হইয়া কদাচিৎ কৃষ্ণ বারণাবতে গমন করিলে, সত্রাজিতকে নিদ্রিত অবস্থায় বিনাশ করিয়া মণি চুরি করিলেন।

সত্যভামা পিতৃবধে শোকাতুরা হইয়া কৃষ্ণের নিকট নালিশ করিলেন। কৃষ্ণ তখন দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিয়া, বলরামকে সঙ্গে লইয়া, শতধন্বার বধে উদ্যোগী হইলেন। শুনিয়া শতধন্বা কৃতবর্ম্মা অক্রূরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণ বলরামের সহিত শত্রুতা করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন শতধন্বা অগত্যা অক্রূরকে মণি দিয়া দ্রুতগামী ঘোটকে আরোহণপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন। কৃষ্ণ বলরাম রথে যাইতেছিলেন, রথ ঘোটককে ধরিতে পারিল না। শতধন্বার অশ্বিনীও পথক্লান্তা হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। শতধন্বা তখন পাদচারে পলায়ন করিতে লাগিল। ন্যায়যুদ্ধপরায়ণ কৃষ্ণ তখন রথে বলরামকে রাখিয়া স্বয়ং পাদচারে শতধন্বার পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। কৃষ্ণ দুই ক্রোশ গিয়া শতধন্বার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। কিন্তু মণি তাঁহার নিকট পাইলেন না। ফিরিয়া আসিয়া বলরামকে এই কথা বলিলে বলরাম তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। ভাবিলেন, মণির ভাগে বলরামকে বঞ্চিত করিবার জন্য কৃষ্ণ মিথ্যা কথা বলিতেছেন। বলরাম বলিলেন, "ধিক্ তোমায়! তুমি এমন অর্থলোভী! এই পথ আছে, তুমি দ্বারকায় চলিয়া যাও; আমি আর দ্বারকায় যাইব না।" এই বলিয়া তিনি কৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া বিদেহ নগরে গিয়া তিন বৎসর বাস করিলেন। এদিকে অক্রূরও দ্বারকা ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। পরে যাদবগণ তাঁহাকে অভয় দিয়া পুনর্ব্বার দ্বারকায় আনাইলেন। কৃষ্ণ তখন এক দিন সমস্ত যাদবগণকে সমবেত করিয়া অক্রূরকে বলিলেন যে, স্যমন্তক মণি তোমার নিকট আছে, আমরা তাহা জানি। সে মণি তোমারই থাক্, কিন্তু সকলকে একবার দেখাও। অক্রূর ভাবিলেন, আমি যদি অস্বীকার করি, তাহা হইলে সন্ধান করিলে, আমার নিকট মণি বাহির হইবে। অতএব তিনি অস্বীকার না করিয়া মণি বাহির করিলেন। তাহা দেখিয়া বলরাম এবং সত্যভামা সেই মণি লইবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু সত্যপ্রতিজ্ঞ কৃষ্ণ সেই মণি বলরাম বা সত্যভামা কাহাকেও দিলেন না, আপনিও লইলেন না, অক্রূরকেই প্রত্যর্পণ করিলেন।*

এই স্যমন্তকমণিবৃত্তান্তেও কৃষ্ণের ন্যায়পরতা, স্বার্থশূন্যতা, সত্যপ্রতিজ্ঞতা এবং কার্য্যদক্ষতা অতি পরিস্ফুট। কিন্তু উপন্যাসটা সত্যমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

* এইরূপ বিষ্ণুপুরাণে আছে। হরিবংশ বলেন, কৃষ্ণ আপনিই মণি ধারণ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণের বহুবিবাহ

এই স্যমন্তক মণির কথায় কৃষ্ণের বহুবিবাহের কথা আপনা হইতেই আসিয়া পড়িতেছে। তিনি রুক্মিণীকে পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে এক স্যমন্তক মণির প্রভাবে আর দুটি ভার্য্যা, জাম্ববতী এবং সত্যভামা, লাভ করিলেন। ইহাই বিষ্ণুপুরাণ বলেন, হরিবংশ এক পৈঠা উপর গিয়া থাকেন,—তিনি বলেন, দুইটি না, চারিটি। সত্রাজিতের তিনটি কন্যা ছিল,—সত্যভামা, প্রস্বাপিনী এবং ব্রতিনী। তিনটিই তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিলেন। কিন্তু দুই চারিটায় কিছু আসিয়া যায় না—মোট সংখ্যা নাকি ষোল হাজারের উপর। এইরূপ লোকপ্রবাদ। বিষ্ণুপুরাণে ৪ অংশে আছে, "ভগবতোঽপ্যত্র মর্ত্ত্যলোকেঽবতীর্ণস্য ষোড়শসহস্রাণ্যেকোত্তরশতাধিকানি স্ত্রীণামভবন্।"* কৃষ্ণের ষোল হাজার এক শত এক স্ত্রী। কিন্তু ঐ পুরাণের ৫ অংশের ২৮ অধ্যায়ে প্রধানাদিগের নাম করিয়া পুরাণকার বলিতেছেন, রুক্মিণী ভিন্ন "অন্যাশ্চ ভার্য্যাঃ কৃষ্ণস্য বভূবুঃ সপ্ত শোভনাঃ।" তার পর, "ষোড়শাসন্ সহস্রাণি স্ত্রীণামন্যানি চক্রিণঃ।" তাহা হইলে, দাঁড়াইল ষোল হাজার সাত জন। ইহার মধ্যে ষোল হাজার নরককন্যা। সেটা আষাঢ়ে গল্প বলিয়া আমি ইতিপূর্ব্বেই বাদ দিয়াছি।

গল্পটা কত বড় আষাঢ়ে, আর এক রকম করিয়া বুঝাই। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের ঐ পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে যে, এই সকল স্ত্রীর গর্ভে কৃষ্ণের এক লক্ষ আশী হাজার পুত্র জন্মে। বিষ্ণুপুরাণেই কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ এক শত পঁচিশ বৎসর ভূতলে ছিলেন। হিসাব করিলে, কৃষ্ণের বৎসরে ১৪৪০টি পুত্র, ও প্রতিদিন চারিটি পুত্র জন্মিত। এ স্থলে এইরূপ কল্পনা করিতে হয় যে, কেবল কৃষ্ণের ইচ্ছায় কৃষ্ণমহিষীরা পুত্রবতী হইতেন।

এই নরকাসুরের ষোল হাজার কন্যার আষাঢ়ে গল্প ছাড়িয়া দিই। কিন্তু তদ্ভিন্ন আরও আট জন "প্রধানা" মহিষীর কথা পাওয়া যাইতেছে। এক জন রুক্মিণী। বিষ্ণুপুরাণকার বলিয়াছেন, আর সাত জন। কিন্তু ৫ অংশের ২৮ অধ্যায়ে নাম দিতেছেন আট জনের, যথা—

"কালিন্দী মিত্রবিন্দা চ সত্যা নাগ্নজিতী তথা।
দেবী জাম্ববতী চাপি রোহিণী কামরূপিণী॥
মদ্ররাজসুতা চান্যা সুশীলা শীলমণ্ডনা।
সাত্রাজিতী সত্যভামা লক্ষ্মণা চারুহাসিনী॥"

১। কালিন্দী
২। মিত্রবিন্দা
৩। নগ্নজিৎকন্যা সত্যা
৪। জাম্ববতী
৫। রোহিণী (ইনি কামরূপিণী)
৬। মদ্ররাজসুতা সুশীলা
৭। সত্রাজিতকন্যা সত্যভামা
৮। লক্ষ্মণা

* বিষ্ণুপুরাণ, ৪ অং, ১৫ অ, ১৯।

রুক্মিণী লইয়া নয় জন হইল। আবার ৩২ অধ্যায়ে আর এক প্রকার। কৃষ্ণের পুত্রগণের নামকীর্ত্তন হইতেছে :—

প্রদ্যুম্নাদ্যা হরেঃ পুত্রা রুক্মিণ্যাঃ কথিতাস্তব।
ভানুং ভৈমরিকঞ্চৈব সত্যভামা ব্যজায়ত ॥ ১ ॥
দীপ্তিমান্ তাম্রপক্ষাদ্যা রোহিণ্যাং তনয়া হরেঃ।
বভূবুর্জাম্ববত্যাঞ্চ শাম্বাদ্যা বাহুশালিনঃ ॥ ২ ॥
তনয়া ভদ্রবিন্দাদ্যা নাগ্নজিত্যাং মহাবলাঃ।
সংগ্রামজিৎপ্রধানাস্তু শৈব্যায়াস্ত্বভবন্ সুতাঃ ॥ ৩ ॥
বৃকাদ্যাস্তু সুতা মাদ্র্যাং গাত্রবৎপ্রমুখান্ সুতান্।
অবাপ লক্ষ্মণা পুত্রাঃ কালিন্দ্যাঞ্চ শ্রুতাদয়ঃ ॥ ৪ ॥

এই তালিকায় পাওয়া গেল, রুক্মিণী ছাড়া,

১। সত্যভামা (৭)
২। রোহিণী (৫)
৩। জাম্ববতী (৪)
৪। নাগ্নজিতী (৩)
৫। শৈব্যা (২)
৬। মাদ্রী (৬)
৭। লক্ষ্মণা (৮)
৮। কালিন্দী (১)

কিন্তু ৪র্থ অংশের ১৫ অধ্যায়ে আছে, "তাসাঞ্চ রুক্মিণী-সত্যভামাজাম্ববতী-জালহাসিনী-প্রমুখা অষ্টৌ পত্ন্যঃ প্রধানাঃ।" এখানে আবার সব নাম পাওয়া গেল না, নূতন নাম "জালহাসিনী" একটা পাওয়া গেল। এই গেল বিষ্ণুপুরাণে। হরিবংশে আরও গোলযোগ।

হরিবংশে আছে ;—

মহিষীঃ সপ্ত কল্যাণীস্ততোঽন্যা মধুসূদনঃ।
উপযেমে মহাবাহুর্গুণোপেতাঃ কুলোদ্গতাঃ ॥
কালিন্দীং মিত্রবিন্দাঞ্চ সত্যাং নাগ্নজিতীং তথা।
সুতাং জাম্ববতশ্চাপি রোহিণীং কামরূপিণীম্ ॥
মদ্ররাজসুতাঞ্চাপি সুশীলাং ভদ্রলোচনাম্।
সাত্রাজিতীং সত্যভামাং লক্ষ্মণাং জালহাসিনীম্।
শৈব্যস্য চ সুতাং তন্বীং রূপেণাপ্সরসাং সমাং ॥

১১৮ অধ্যায়ঃ, ৪০-৪৩ শ্লোকঃ।

এখানে পাওয়া যাইতেছে যে, লক্ষ্মণাই জালহাসিনী। তাহা ধরিয়াও পাই,—

(১) কালিন্দী।
(২) মিত্রবিন্দা।
(৩) সত্যা।
(৪) জাম্ববৎ-সুতা।
(৫) রোহিণী।
(৬) মাদ্রী সুশীলা।
(৭) সত্রাজিতকন্যা সত্যভামা।
(৮) জালহাসিনী লক্ষ্মণা।
(৯) শৈব্যা।

ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি—রুক্মিণী ছাড়া নয় জন হইল। এ গেল ১১৮ অধ্যায়ের তালিকা। হরিবংশে আবার ১৬২ অধ্যায়ে আর একটি তালিকা আছে, যথা—

অষ্টৌ মহিষ্যঃ পুত্রিণ্য ইতি প্রাধান্যতঃ স্মৃতাঃ।
সর্ব্বা বীরপ্রজাশ্চৈব তাস্বপত্যানি মে শৃণু॥
রুক্মিণী সত্যভামা চ দেবী নাগ্নজিতী তথা।
সুদত্তা চ তথা শৈব্যা লক্ষ্মণা জালহাসিনী॥
মিত্রবিন্দা চ কালিন্দী জাম্ববত্যথ পৌরবী।
সুভীমা চ তথা মাদ্রী * * *

ইহাতে পাওয়া গেল, রুক্মিণী ছাড়া,

(১) সত্যভামা।
(২) নাগ্নজিতী।
(৩) সুদত্তা।
(৪) শৈব্যা।
(৫) লক্ষ্মণা জালহাসিনী।
(৬) মিত্রবিন্দা।
(৭) কালিন্দী।
(৮) জাম্ববতী।
(৯) পৌরবী।
(১০) সুভীমা।
(১১) মাদ্রী।

হরিবংশকার ঋষি ঠাকুর, আট জন বলিয়া রুক্মিণী সমেত বার জনের নাম দিলেন। তাহাতেও ক্ষান্ত নহেন। ইহাদের একে একে সন্তানগণের নামকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন আবার বাহির হইল—

(১২) সুদেবা।
(১৩) উপাসঙ্গ।
(১৪) কৌশিকী।
(১৫) সুতসোমা।
(১৬) যৌধিষ্ঠিরী।*

এ ছাড়া পূর্ব্বে সত্রাজিতের আর দুই কন্যা ব্রতিনী এবং প্রস্বাপিনীর কথা বলিয়াছেন।

এ ছাড়া মহাভারতের নূতন দুইটি নাম পাওয়া যায়,—গান্ধারী ও হৈমবতী।+ সকল নামগুলি একত্র করিলে, প্রধানা মহিষী কতকগুলি হয় দেখা যাউক। মহাভারতে আছে,—

(১) রুক্মিণী।
(২) সত্যভামা।
(৩) গান্ধারী।
(৪) শৈব্যা।
(৫) হৈমবতী।
(৬) জাম্ববতী।

* ইহারাও প্রধানা অষ্টের ভিতর গণিত হইয়াছেন। 'তাসামপত্যান্যষ্টানাং ভগবন্ প্রব্রবীত মে।' ইহার উত্তরে এ সকল মহিষীর অপত্য কথিত হইতেছে।

+ রুক্মিণী ত্বথ গান্ধারী শৈব্যা হৈমবতীত্যপি।
দেবী জাম্ববতী চৈব বিবিশুর্জাতবেদসম্॥
মৌসলপর্ব্ব, ৭ অধ্যায়।

মহাভারতের আর নাম নাই, কিন্তু "অন্যা" শব্দটা আছে। তার পর বিষ্ণুপুরাণের ২৮ অধ্যায়ে ১, ২, ৩, ছাড়া এই কয়টা নামও পাওয়া যায়।

(৭) কালিন্দী। (১০) রোহিণী।
(৮) মিত্রবিন্দা। (১১) মাদ্রী।
(৯) সত্যা নাগ্নজিতী। (১২) লক্ষ্মণা জালহাসিনী।

বিষ্ণুপুরাণের ৩২ অধ্যায়ে তদতিরিক্ত পাওয়া যায়, শৈব্যা। তাঁহার নাম উপরে লেখা আছে। তার পর হরিবংশের প্রথম তালিকা ১১৮ অধ্যায়ে, ইহা ছাড়া নূতন নাম নাই, কিন্তু ১৬২ অধ্যায়ে নূতন পাওয়া যায়।

(১৩) সুদত্তা। (১৪) পৌরবী। (১৫) সুভামা

এবং ঐ অধ্যায়ে সন্তানগণনায় পাই,

(১৬) সুদেবা। (১৮) কৌশিকী।
(১৭) উপাসঙ্গ। (১৯) সুতসোমা।
(২০) যৌধিষ্ঠিরী।

এবং সত্যভামার বিবাহকালে কৃষ্ণে সম্প্রদত্তা,

(২১) ব্রতিনী। (২২) প্রস্বাপিনী।

আট জনের জায়গায় ২২ জন পাওয়া গেল। উপন্যাসকারদিগের খুব হাত চলিয়াছিল, এ কথা স্পষ্ট। ইহার মধ্যে ১৩ হইতে ২২ কেবল হরিংবশে আছে। এই জন্য ১০ জনকে ত্যাগ করা যাইতে পারে। তবু থাকে ১২ জন। গান্ধারী ও হৈমবতীর নাম মহাভারতের মৌসলপর্ব্ব ভিন্ন আর কোথাও পাওয়া যায় না। মৌসলপর্ব্ব যে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত, তাহা পরে দেখাইব। এজন্য এই দুই নামও পরিত্যাগ করা যাইতে পারে। বাকি থাকে ১০ জন।

জাম্ববতীর নাম বিষ্ণুপুরাণের ২৮ অধ্যায়ে এইরূপ লেখা আছে,—

"দেবী জাম্ববতী চাপি রোহিণী কামরূপিণী।"

হরিবংশে এইরূপ,—

"সুতা জাম্ববতশ্চাপি রোহিণী কামরূপিণী।"

ইহার অর্থে যদি বুঝা যায়, জাম্ববৎসুতাই রোহিণী, তাহা হইলে অর্থ অসঙ্গত হয় না, বরং সেই অর্থই সঙ্গত বোধ হয়। অতএব জাম্ববতী ও রোহিণী একই। বাকি থাকিল ৮ জন।

সত্যভামা ও সত্যাও এক। তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।

সত্রাজিতবধের কথার উত্তরে

"কৃষ্ণঃ সত্যভামামমর্ষতাম্রলোচনঃ প্রাহ, সত্যে, মমৈষাবহাসনা।"

অর্থাৎ কৃষ্ণ ক্রোধারক্ত লোচনে সত্যভামাকে বলিলেন, "সত্যে! ইহা আমারই অবহাসনা।" পুনশ্চ পঞ্চমাংশের ৩০ অধ্যায়ে, পারিজাতহরণে কৃষ্ণ সত্যভামাকে বলিতেছেন,—

"সত্যে! যথা ত্বমিত্যুক্তং ত্বয়া কৃষ্ণাসকৃৎপ্রিয়ম্।"

আবশ্যক হইলে, আরও ভূরি ভূরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা যথেষ্ট।

অতএব এই দশ জনের মধ্যে, সত্যা সত্যভামারই নাম বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইল। এখন আট জন পাই। যথা—

১। রুক্মিণী
২। সত্যভামা
৩। জাম্ববতী
৪। শৈব্যা
৫। কালিন্দী
৬। মিত্রবিন্দা
৭। মাদ্রী
৮। জালহাসিনী লক্ষ্মণা

ইহার মধ্যে পাঁচ জন—শৈব্যা, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা, লক্ষ্মণা ও মাদ্রী সুশীলা—ইঁহারা তালিকার মধ্যে আছেন মাত্র। ইঁহাদের কখনও কার্য্যক্ষেত্রে দেখিতে পাই না। ইঁহাদের কবে বিবাহ হইল, কেন বিবাহ হইল, কেহ কিছু বলে না। কৃষ্ণজীবনে ইঁহাদের কোন সংস্পর্শ নাই। ইঁহাদের পুত্রের তালিকা কৃষ্ণপুত্রের তালিকার মধ্যে বিষ্ণুপুরাণকার লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগকে কখনও কর্ম্মক্ষেত্রে দেখি না। ইঁহারা কাহার কন্যা, কোন্ দেশসম্ভূতা, তাহার কোন কথা কোথাও নাই। কেবল, সুশীলা মদ্ররাজকন্যা, ইহাই আছে। কৃষ্ণের সমসাময়িক মদ্ররাজ, নকুল সহদেবের মাতুল, কুরুক্ষেত্রের বিখ্যাত রথী শল্য। তিনি ও কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে সপ্তদশ দিন, পরস্পরের শত্রুসেনা মধ্যে অবস্থিত। অনেক বার তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে। কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অনেক কথা শল্যকে বলিতে হইয়াছে, শল্য সম্বন্ধীয় কথা কৃষ্ণকে বলিতে হইয়াছে। কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অনেক কথা শল্যকে শুনিতে হইয়াছে, শল্য সম্বন্ধীয় অনেক কথা কৃষ্ণকেও শুনিতে হইয়াছে। এক পলক জন্য কিছুতেই প্রকাশ নাই যে, কৃষ্ণ শল্যের জামাতা, বা ভগিনী-পতি, বা তাদৃশ কোন সম্বন্ধবিশিষ্ট। সম্বন্ধের মধ্যে এইটুকু পাই যে, শল্য কর্ণকে বলিয়াছেন, 'অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে এখনই বিনাশ কর'। কৃষ্ণও যুধিষ্ঠিরকে শল্যবধে নিযুক্ত করিয়া তাহার যমস্বরূপ হইলেন। কৃষ্ণ যে মাদ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়াই বোধ হয়। শৈব্যা, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা এবং লক্ষ্মণার কুলশীল, দেশ, এবং বিবাহবৃত্তান্ত কিছুই কেহ জানে না। তাঁহারাও কাব্যের অলঙ্কার, সে বিষয়ে আমার সংশয় হয় না।

কেন না, কেবল মাদ্রী নয়, জাম্ববতী রোহিণী ও সত্যভামাকেও ঐরূপ দেখি। জাম্ববতীর সঙ্গে কালিন্দী প্রভৃতির প্রভেদ এই যে, তাঁহার পুত্র শাম্বের নাম, আর পাঁচ জন যাদবের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু শাম্ব কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ, কেবল এক লক্ষ্মণাহরণে। লক্ষ্মণা দুর্য্যোধনের কন্যা। মহাভারত যেমন পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্ত, তেমান কৌরবদিগেরও জীবনবৃত্ত। লক্ষ্মণাহরণে যদি কিছু সত্য থাকিত, তবে মহাভারতে লক্ষ্মণাহরণ থাকিত। তাহা নাই। জাম্ববতী নিজে ভল্লুককন্যা, ভল্লুকী। ভল্লুকী কৃষ্ণভার্য্যা বা কোন মানুষের ভার্য্যা হইতে পারে না। এই জন্য রোহিণীকে কামরূপিণী বলা হইয়াছে। কামরূপিণী কেন, না ভল্লুকী হইয়াও মানবরূপিণী হইতে পারিতেন। কামরূপিণী ভল্লুকীতে আমি বিশ্বাসবান্ নহি, এবং কৃষ্ণ ভল্লুককন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাও বিশ্বাস করিতে পারি না।

সত্যভামার পুত্র ছিল শুনি, কিন্তু তাঁহারা কখনও কোন কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন। তাঁহার প্রতি সন্দেহের এই প্রথম কারণ। তবে সত্যভামা নিজে রুক্মিণীর ন্যায় মধ্যে

মধ্যে কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত বটে। তাঁহার বিবাহবৃত্তান্তও সবিস্তারে আলোচনা করা গিয়াছে।

মহাভারতের বনপর্ব্বের মার্কণ্ডেয়সমস্যা-পর্ব্বাধ্যায়ে সত্যভামাকে পাওয়া যায়। ঐ পর্ব্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত; মহাভারতের বনপর্ব্বের সমালোচনাকালে পাঠক তাহা দেখিতে পাইবেন। ঐখানে দ্রৌপদীসত্যভামাসংবাদ বলিয়া একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বাধ্যায় আছে, তাহাও প্রক্ষিপ্ত। মহাভারতীয় কথার সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। উহা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কিরূপ আচরণ কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধমাত্র। প্রবন্ধটার লক্ষণ আধুনিক।

তার পর উদ্যোগপর্ব্বেও সত্যভামাকে দেখিতে পাই—যানসন্ধি-পর্ব্বাধ্যায়ে সে স্থানও প্রক্ষিপ্ত, যানসন্ধি-পর্ব্বাধ্যায়ের সমালোচনা কালে দেখাইব। কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বরণ হইয়া উপপ্লব্য নগরে আসিয়াছিলেন—যুদ্ধযাত্রায় সত্যভামাকে সঙ্গে আনিবার সম্ভাবনা ছিল না, এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যে সত্যভামা সঙ্গে ছিলেন না, তাহা মহাভারত পড়িলেই জানা যায়। যুদ্ধপর্ব্ব সকলে এবং তৎপরবর্ত্তী পর্ব্ব সকলে কোথাও আর সত্যভামার কথা নাই।

কেবল কৃষ্ণের মানবলীলাসম্বরণের পর, মৌসলপর্ব্বে সত্যভামার নাম আছে। কিন্তু মৌসলপর্ব্বও প্রক্ষিপ্ত, তাহাও পরে দেখাইব।

ফলতঃ মহাভারতের যে সকল অংশ নিঃসন্দেহে মৌলিক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে, তাহার কোথাও সত্যভামার নাম নাই। প্রক্ষিপ্ত অংশ সকলেই আছে। সত্যভামা সম্বন্ধীয় সন্দেহের এই দ্বিতীয় কারণ।

তার পর বিষ্ণুপুরাণ। বিষ্ণুপুরাণে ইঁহার বিবাহবৃত্তান্ত স্যমন্তক মণির উপাখ্যানমধ্যে আছে। যে আষাঢ়ে গল্পে কৃষ্ণের সঙ্গে জাম্বুকসুতার পরিণয়, ইঁহার সঙ্গে পরিণয় সেই আষাঢ়ে গল্পে। তার পর কথিত হইয়াছে যে, এই বিবাহের জন্য দ্বেষবিশিষ্ট হইয়া শতধন্বা সত্যভামার পিতা সত্রাজিতকে মারিয়াছিলেন। কৃষ্ণ তখন বারণাবতে, জতুগৃহ-দাহপ্রবাদ জন্য পাণ্ডবদিগের অন্বেষণে গিয়াছিলেন। সেইখানে সত্যভামা তাঁহার নিকট নালিশ করিয়া পাঠাইলেন। কথাটা মিথ্যা। কৃষ্ণ কখন বারণাবতে যান নাই—গেলে মহাভারতে থাকিত। তাহা নাই। এই সকল কথা সন্দেহের তৃতীয় কারণ।

তার পর, বিষ্ণুপুরাণে সত্যভামাকে কেবল পারিজাতহরণবৃত্তান্তে পাই। সেটা অনৈসর্গিক অলীক ব্যাপার; প্রকৃত ও বিশ্বাসযোগ্য ঘটনায় তাঁহাকে বিষ্ণুপুরাণে কোথাও পাই না। সন্দেহের এই চতুর্থ কারণ।

মহাভারতে আদিপর্ব্বে সম্ভব-পর্ব্বাধ্যায়ের সপ্তষষ্টি অধ্যায়ের নাম 'অংশাবতরণ'। মহাভারতের নায়কনায়িকাগণ কে কোন্ দেব দেবী অসুর রাক্ষসের অংশে জন্মিয়াছিল, তাহাই ইহাতে লিখিত হইয়াছে। শেষভাগে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ নারায়ণের অংশ, বলরাম শেষ নাগের অংশ, প্রদ্যুম্ন সনৎকুমারের অংশ, দ্রৌপদী শচীর অংশ, কুন্তী ও মাদ্রী সিদ্ধি ও ধৃতির অংশ। কৃষ্ণমহিষীগণ সম্বন্ধে লেখা আছে যে, কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র মহিষী অপ্সরোগণের অংশ এবং রুক্মিণী লক্ষ্মী দেবীর অংশ। আর কোনও কৃষ্ণ-মহিষীর নাম নাই। সন্দেহের এই পঞ্চম কারণ। সন্দেহের এ কারণ কেবল সত্যভামা সম্বন্ধে নহে। রুক্মিণী ভিন্ন কৃষ্ণের সকল প্রধানা মহিষীদিগের প্রতি বর্ত্তে। নরকের

ষোড়শ সহস্র কন্যার অনৈসর্গিক কথাটা ছাড়িয়া দিলে, রুক্মিণী ভিন্ন কৃষ্ণের আর কোনও মহিষী ছিল না ইহাই মহাভারতের এই অংশের দ্বারা প্রমাণিত হয়।

ভদ্রক দৌহিত্র শাম্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা বাদ দিলে, রুক্মিণী ভিন্ন আর কোনও কৃষ্ণমহিষী পুত্র পৌত্র কাহাকেও কোন কর্ম্মক্ষেত্রে দেখা যায় না। রুক্মিণীবংশই রাজা হইল—আর কাহারও বংশের কেহ কোথাও রহিল না।

এই সকল কারণে আমার খুব সন্দেহ যে, কৃষ্ণের একাধিক মহিষী ছিল না। এমন হইতেও পারে, ছিল। তখনকার এই রীতিই ছিল। পঞ্চ পাণ্ডবের সকলেই একাধিক মহিষী ছিল। আদর্শ ধাম্মিক ভীষ্ম, কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য কাশিরাজের তিনটি কন্যা হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। একাধিক বিবাহ যে কৃষ্ণের অনভিমত এ কথাটাও কোথাও নাই; আমিও বিচারে কোথাও পাই নাই যে, পুরুষের একাধিক বিবাহ সকল অবস্থাতেই অধর্ম্ম। ইহা নিশ্চিত বটে যে, **সচরাচর অকারণে পুরুষের একাধিক বিবাহ অধর্ম্ম।** কিন্তু সকল অবস্থাতে নহে। যাহার পত্নী কুষ্ঠগ্রস্ত বা এরূপ রুগ্ন যে, সে কোন মতেই সংসারধর্ম্মের সহায়তা করিতে পারে না, তাহার যে দারান্তরপরিগ্রহ পাপ, এমন কথা আমি বুঝিতে পারি না। যাহার স্ত্রী ধর্ম্মভ্রষ্টা কুলকলঙ্কিনী, সে যে কেন আদালতে না গিয়া দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে পারিবে না, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আসে না। আদালতে যে গৌরববৃদ্ধি হয়, তাহার উদাহরণ আমরা সভ্যতর সমাজে দেখিতে পাইতেছি। যাহার উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন, কিন্তু স্ত্রী বন্ধ্যা, সে যে কেন দারান্তর গ্রহণ করিবে না, তা বুঝিতে পারি না। ইউরোপ যিহুদার নিকট শিখিয়াছিল যে, কোন অবস্থাতেই দারান্তর গ্রহণ করিতে নাই। যদি ইউরোপের এ কুশিক্ষা না হইত, তাহা হইলে, বোনাপার্টিকে জসেফাইনের বর্জ্জন রূপ অতি ঘোর নারকী পাতকে পতিত হইতে হইত না; অষ্টম হেন্‌রীকে কথায় কথায় পত্নীহত্যা করিতে হইত না। ইউরোপে আজি কালি সভ্যতার উজ্জ্বলালোকে এই কারণে অনেক পত্নীহত্যা, পতিহত্যা হইতেছে। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, যাহাই বিলাতী, তাহাই চমৎকার, পবিত্র, দোষশূন্য, ঊর্দ্ধাধঃ চতুর্দ্দশ পুরুষের উদ্ধারের কারণ। আমার বিশ্বাস, আমরা যেমন বিলাতের কাছে অনেক শিখিতে পারি, বিলাতও আমাদের কাছে অনেক শিখিতে পারে। তাহার মধ্যে এই বিবাহতত্ত্ব একটা কথা।

কৃষ্ণ একাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে কোন গণনীয় প্রমাণ নাই, ইহা দেখিয়াছি। যদি করিয়া থাকেন, তবে কেন করিয়াছিলেন, তাহারও কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিবৃত্ত নাই। যে যে তাঁহাকে স্যমন্তক মণি উপহার দিল, সে সঙ্গে সঙ্গে অমনি একটি কন্যা উপহার দিল, ইহা পিতামহীর উপকথা। আর নরকরাজার ষোল হাজার মেয়ে, ইহা প্রপিতামহীর উপকথা। আমরা শুনিয়া খুসী—বিশ্বাস করিতে পারি না।

চতুর্থ খণ্ড

ইন্দ্রপ্রস্থ

অকুণ্ঠং সর্ব্বকার্য্যেষু ধর্ম্মকার্য্যার্থমুদ্যতম্‌ ।
বৈকুণ্ঠস্য চ যদ্রূপং তস্মৈ কার্য্যাত্মনে নমঃ ॥

শান্তিপর্ব্বণি, ৪৭ অধ্যায়ঃ ।

প্রথম পরিচ্ছেদ—দ্রৌপদীস্বয়ংবর

মহাভারতে কৃষ্ণকথা যাহা আছে, তাহার কোন্‌ অংশ মৌলিক এবং বিশ্বাসযোগ্য, তাহার নির্ব্বাচন জন্য প্রথম খণ্ডে যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছি, এক্ষণে আমি পাঠককে সেই সকল স্মরণ করিতে অনুরোধ করি ।

মহাভারতে কৃষ্ণকে প্রথম দ্রৌপদীস্বয়ংবরে দেখিতে পাই । আমার বিবেচনায় এই অংশের মৌলিকতায় সন্দিহান হইবার কারণ নাই । লাসেন্‌ সাহেব, দ্রৌপদীকে পাঞ্চালের পঞ্চ জাতির একীকরণস্বরূপ পাঞ্চালী বলিয়া, দ্রৌপদীর মানবীত্ব উড়াইয়া দিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি । আমিও বিশ্বাস করি না যে, যজ্ঞের অগ্নি হইতে দ্রুপদ কন্যা পাইয়াছিলেন, অথবা সেই কন্যার পাঁচটি স্বামী ছিল । তবে দ্রুপদের ঔরস-কন্যা থাকা অসম্ভব নহে, এবং তাহার স্বয়ংবর বিবাহ হইয়াছিল, এবং সেই স্বয়ংবরে অর্জ্জুন লক্ষ্যবেধ করিয়াছিলেন, ইহা অবিশ্বাস করিবারও কারণ নাই । তার পর, তাঁহার পাঁচ স্বামী হইয়াছিল, কি এক স্বামী হইয়াছিল, সে কথার মীমাংসায় আমাদের কোন প্রয়োজন নাই ।*

কৃষ্ণকে মহাভারতে প্রথম দ্রৌপদীস্বয়ংবরে দেখি । সেখানে তাঁহার দেবত্ব কিছুই সূচিত হয় নাই । অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় তিনি ও অন্যান্য যাদবেরা নিমন্ত্রিত হইয়া পাঞ্চালে আসিয়াছিলেন । তবে অন্যান্য ক্ষত্রিয়েরা দ্রৌপদীর আকাঙ্ক্ষায় লক্ষ্যবেধে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু যাদবেরা কেহই সে চেষ্টা করে নাই ।

পাণ্ডবেরা এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন । কিন্তু নিমন্ত্রিত হইয়া নহে । দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের প্রাণহানি কারবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । তাঁহারা আত্মরক্ষার্থে ছদ্মবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন । এক্ষণে দ্রৌপদীস্বয়ংবরের কথা শুনিয়া ছদ্মবেশে এখানে উপস্থিত ।

* পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মহাভারতের পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ব্যাসদেব ১৫০ শ্লোকে মহাভারতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রচিত কারয়াছেন । ঐ অনুক্রমণিকার সংক্ষিপ্ত বিবরণে দ্রৌপদীস্বয়ংবরের কথা আছে, কিন্তু পঞ্চ পাণ্ডবের সঙ্গে যে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল, এমন কথা নাই । অর্জ্জুনই তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন, এই কথাই আছে ।

"সমবায়ে ততো রাজ্ঞাং কন্যাং ভর্ত্তৃস্বয়ংবরাম্‌ ।
প্রাপ্তবানর্জ্জুনঃ কৃষ্ণাং কৃত্বা কর্ম্ম সুদুষ্করম্‌ ॥ ১২৫ ॥"

এই সমবেত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-মণ্ডল মধ্যে কেবল কৃষ্ণই ছদ্মবেশযুক্ত পাণ্ডবদিগকে চিনিয়াছিলেন। ইহা যে তিনি দৈবশক্তির প্রভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন, এমন ইঙ্গিত মাত্র নাই। মনুষ্যবুদ্ধিতেই তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার উক্তিতেই ইহা প্রকাশ। তিনি বলদেবকে বলিতেছেন, "মহাশয়! যিনি এই বিস্তীর্ণ শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন, ইনিই অর্জ্জুন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর যিনি বাহুবলে বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক নির্ভয়ে রাজমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইতেছেন, ইঁহার নাম বৃকোদর।" ইত্যাদি। ইহার পরে সাক্ষাৎ হইলে যখন তাঁহাকে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কি প্রকারে তুমি আমাদিগকে চিনিলে?" তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি কি লুকান থাকে?" পাণ্ডবদিগকে সেই ছদ্মবেশে চিনিতে পারা অতি কঠিন; আর কেহ যে চিনিতে পারে নাই, তাহা বিস্ময়কর নহে; কৃষ্ণ যে চিনিতে পারিয়াছিলেন—স্বাভাবিক মানুষবুদ্ধিতেই চিনিয়াছিলেন—ইহাতে কেবল ইহাই বুঝায় যে, অন্যান্য মনুষ্যাপেক্ষা তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন। মহাভারতকার এ কথাটা কোথাও পরিষ্কার করিয়া বলেন নাই; কিন্তু কৃষ্ণের কার্য্যে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই যে, তিনি মনুষ্যবুদ্ধিতে কার্য্য করেন বটে, কিন্তু তিনি সর্ব্বাপেক্ষা তীক্ষ্ণবুদ্ধি মনুষ্য। এই বুদ্ধিতে কোথাও ছিদ্র দেখা যায় না। অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় তিনি বুদ্ধিতেও আদর্শ মনুষ্য।

অনন্তর অর্জ্জুন লক্ষ্য বিঁধিলে সমাগত রাজাদিগের সঙ্গে তাঁহার বড় বিবাদ বাধিল। অর্জ্জুন ভিক্ষুকব্রাহ্মণবেশধারী। একজন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বড় বড় রাজাদিগের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া যাইবে, ইহা তাঁহাদিগের সহ্য হইল না। তাঁহারা অর্জ্জুনের উপর আক্রমণ করিলেন। যত দূর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে অর্জ্জুনই জয়ী হইয়াছিলেন। এই বিবাদ কৃষ্ণের কথায় নিবারণ হইয়াছিল। মহাভারতে এইটুকু কৃষ্ণের প্রথম কাজ। তিনি কি প্রকারে বিবাদ মিটাইয়াছিলেন, সেই কথাটা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য। বিবাদ মিটাইবার অনেক উপায় ছিল। তিনি নিজে বিখ্যাত বীরপুরুষ, এবং বলদেব, সাত্যকি প্রভৃতি অদ্বিতীয় বীরেরা তাঁহার সহায় ছিল। অর্জ্জুন তাঁহার আত্মীয়—পিতৃস্বসার পুত্র। তিনি যাদবদিগকে লইয়া সমরক্ষেত্রে অর্জ্জুনের সাহায্যে নামিলে, তখনই বিবাদ মিটিয়া যাইতে পারিত। ভীম তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ আদর্শ ধার্ম্মিক, যাহা বিনা যুদ্ধে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার জন্য তিনি কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। মহাভারতের কোন স্থানেই ইহা নাই যে, কৃষ্ণ ধর্ম্মার্থ ভিন্ন অন্য কারণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আত্মরক্ষার্থ ও পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম্ম, আত্মরক্ষার্থ বা পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা পরম অধর্ম্ম। আমরা বাঙ্গালি জাতি, আজি সাত শত বৎসর সেই অধর্ম্মের ফলভোগ করিতেছি। কৃষ্ণ কখনও অন্য কারণে যুদ্ধ করেন নাই। আর ধর্ম্মস্থাপনজন্য তাঁহার যুদ্ধে আপত্তি ছিল না। যেখানে যুদ্ধ ভিন্ন ধর্ম্মের উন্নতি নাই, সেখানেও যুদ্ধ না করাই অধর্ম্ম। কেবল কাশীরাম দাস বা কথকঠাকুরদের কথিত মহাভারতে যাঁহাদের অধিকার, তাঁহাদের বিশ্বাস, কৃষ্ণই সকল যুদ্ধের মূল; কিন্তু মূল মহাভারত বুদ্ধিপূর্ব্বক পড়িলে এরূপ বিশ্বাস থাকে না। তখন বুঝিতে পারা যায় যে, ধর্ম্মার্থ ভিন্ন কৃষ্ণ কখনও কাহাকেও যুদ্ধে প্রবৃত্তি দেন নাই। নিজেও ধর্ম্মার্থ ভিন্ন যুদ্ধ করেন নাই।

এখানেও কৃষ্ণ যুদ্ধের কথা মনেও আনিলেন না। তিনি বিবদমান ভূপালবৃন্দকে বলিলেন, "ভূপালবৃন্দ! ইঁহারাই রাজকুমারীকে ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছিলেন, তোমরা ক্ষান্ত হও, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।" 'ধর্ম্মতঃ'। ধর্ম্মের কথাটা ত এতক্ষণ কাহারও মনে পড়ে নাই। সে কালের অনেক ক্ষত্রিয় রাজা ধর্ম্মভীত ছিলেন, রুচিপূর্ব্বক কখন অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু এ সময়ে রাগান্ধ হইয়া ধর্ম্মের কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি প্রকৃত ধর্ম্মাত্মা, ধর্ম্মবৃদ্ধিই যাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য, তিনি এ বিষয়ের ধর্ম্ম কোন্ পক্ষে তাহা ভুলেন নাই। ধর্ম্মবিস্মৃতদিগের ধর্ম্মস্মরণ করিয়া দেওয়া, ধর্ম্মানভিজ্ঞদিগকে ধর্ম্ম বুঝাইয়া দেওয়াই, তাঁহার কাজ।

ভূপালবৃন্দকে কৃষ্ণ বলিলেন, "ইঁহারাই রাজকুমারীকে ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছেন, অতএব আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।" শুনিয়া রাজারা নিরস্ত হইলেন। যুদ্ধ ফুরাইল। পাণ্ডবেরা আশ্রমে গেলেন।

এক্ষণে ইহা বুঝা যায় যে, যদি একজন বাজে লোক দৃপ্ত রাজগণকে ধর্ম্মের কথাটা স্মরণ করিয়া দিত, তাহা হইলে দৃপ্ত রাজগণ কখনও যুদ্ধ হইতে বিরত হইতেন না। যিনি ধর্ম্মের কথাটা স্মরণ করিয়া দিলেন, তিনি মহাবলশালী এবং গৌরবান্বিত। তিনি জ্ঞান, ধর্ম্ম, ও বাহুবলে সকলের প্রধান হইয়াছিলেন। সকল বৃত্তিগুলিই সম্পূর্ণরূপে অনুশীলিত করিয়াছিলেন, তাহারই ফল এই প্রাধান্য। সকল বৃত্তিগুলি অনুশীলিত না হইলে, কেহই তাদৃশ ফলদায়িনী হয় না। এইরূপ কৃষ্ণচরিত্রের দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্ব পরিস্ফুট হইতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদ

অর্জ্জুন লক্ষ্য বিঁধিয়া, রাজগণের সহিত যুদ্ধ সমাপন করিয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে আশ্রমে গমন করিলেন। রাজগণও স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। এক্ষণে কৃষ্ণের কি করা কর্ত্তব্য ছিল? দ্রৌপদীর স্বয়ংবর ফুরাইল, উৎসব যাহা ছিল তাহা ফুরাইল, কৃষ্ণের পাঞ্চালে থাকিবার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। এক্ষণে স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেই হইত। অন্যান্য রাজগণ তাহাই করিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ তাহা না করিয়া, বলদেবকে সঙ্গে লইয়া, যেখানে ভার্গবকর্ম্মশালায় ভিক্ষুকবেশধারী পাণ্ডবগণ বাস করিতেছিলেন, সেইখানে গিয়া যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন।

সেখানে তাঁহার কিছু কাজ ছিল না—যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তাঁহার পূর্ব্বে কখন সাক্ষাৎ বা আলাপ ছিল না, কেন না মহাভারতকার লিখিয়াছেন যে, "বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের নিকট অভিগমন ও চরণবন্দন পূর্ব্বক আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন।" বলদেবও ঐরূপ করিলেন। যখন আপনার পরিচয় প্রদান করিতে হইল, তখন অবশ্য ইহা বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বে পরস্পরের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ বা আলাপ ছিল না। কৃষ্ণ-পাণ্ডবে এই প্রথম সাক্ষাৎ। কেবল পিতৃষ্বসার পুত্র বলিয়া কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া লইয়া তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। কাজটা সাধারণ-লৌকিক-ব্যবহার-অনুমোদিত হয় নাই। লোকের প্রথা আছে বটে যে, পিসিত বা মাসিত ভাই যদি একটা রাজা বা বড়লোক হয়, তবে উপযাচক হইয়া তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া

আইসে। কিন্তু পাণ্ডবেরা তখন সামান্য ভিক্ষুক মাত্র; তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃষ্ণের কোন অভীষ্টই সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। আলাপ করিয়া কৃষ্ণও যে কোন লৌকিক অভীষ্ট সিদ্ধ করিলেন, এমন দেখা যায় না। তিনি কেবল বিনয়-পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সদালাপ করিয়া তাঁহার মঙ্গলকামনা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। এবং তার পর পাণ্ডবদিগের বিবাহসমাপ্তি পর্য্যন্ত পাঞ্চালে আপন শিবিরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিবাহ সমাপ্ত হইয়া গেলে, তিনি "কৃতদার পাণ্ডবদিগের যৌতুক স্বরূপ বিচিত্র বৈদূর্য্য মণি, সুবর্ণের আভরণ, নানা দেশীয় মহার্ঘ বসন, রমণীয় শয্যা, বিবিধ গৃহসামগ্রী, বহুসংখ্যক দাসদাসী, সুশিক্ষিত গজবৃন্দ, উৎকৃষ্ট ঘোটকাবলী, অসংখ্য রথ এবং কোটি কোটি রজত কাঞ্চন শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিলেন।" এ সকল পাণ্ডবদিগের তখন ছিল না; কেন না, তখন তাঁহারা ভিক্ষুক এবং দুরবস্থাপন্ন। অথচ এ সকলে তখন তাঁহাদের বিশেষ প্রয়োজন; কেন না, তাঁহারা রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া গৃহী হইয়াছেন। সুতরাং যুধিষ্ঠির "কৃষ্ণপ্রেরিত দ্রব্যসামগ্রী সকল আহ্লাদ পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন।" কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহাদিগের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। তার পর তিনি পাণ্ডবদিগকে আর খোঁজেন নাই। পাণ্ডবেরা রাজ্যার্দ্ধ প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে নগরনির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। যে প্রকারে পুনরায় পাণ্ডবদিগের সহিত তাঁহার মিলন হইল, তাহা পরে বলিব।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যিনি এইরূপ নিঃস্বার্থ আচরণ করিতেন, যিনি দুরবস্থাগ্রস্ত-মাত্রেরই হিতানুসন্ধান করা নিজ জীবনের ব্রতস্বরূপ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য মূর্খেরা এবং তাঁহাদের শিষ্যগণ সেই কৃষ্ণকে কুকর্ম্মানুরত, দুরভিসন্ধিযুক্ত, ক্রূর এবং পাপাচারী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ঐতিহাসিক তত্ত্বের বিশ্লেষণের শক্তি বা তাহাতে শ্রদ্ধা এবং যত্ন না থাকিলে, এইরূপ ঘটাই সম্ভব। স্থূল কথা এই, যিনি আদর্শ মনুষ্য, তাঁহার অন্যান্য সদ্বৃত্তির ন্যায় প্রীতিবৃত্তিও পূর্ণবিকশিত ও স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হওয়াই সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরের প্রতি যে ব্যবহার করিলেন, তাহা অনেকেরই পূর্ব্ববর্দ্ধিত সখ্যস্থলে করা সম্ভব। যুধিষ্ঠির কুটুম্ব; যদি কৃষ্ণের সঙ্গে পূর্ব্ব হইতে তাঁহার আলাপ প্রণয় এবং আত্মীয়তা থাকিত, তাহা হইলে তিনি যে ব্যবহার করিলেন, তাহা কেবল ভদ্রজনোচিত বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারিতাম—বেশী বলিবার অধিকার থাকিত না। কিন্তু যিনি অপরিচিত এবং দরিদ্র ও হীনাবস্থাপন্ন কুটুম্বকে খুঁজিয়া লইয়া, আপনার কার্য্য ক্ষতি করিয়া, তাহার উপকার করেন, তাঁহার প্রীতি আদর্শ প্রীতি। কৃষ্ণের এই কার্য্যটি ক্ষুদ্র কার্য্য বটে, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যেই মনুষ্যের চরিত্রের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। একটা মহৎ কার্য্য বদ্মায়েসেও চেষ্টাচরিত্র করিয়া করিতে পারে, এবং করিয়াও থাকে। কিন্তু যাঁহার ছোট কাজগুলিও ধর্ম্মাত্মতার পরিচায়ক, তিনি যথার্থ ধর্ম্মাত্মা। তাই, আমরা মহাভারতের আলোচনায়* কৃষ্ণকৃত ছোট বড় সকল কার্য্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আমরা এ প্রণালীতে কখন কৃষ্ণকে বুঝিবার চেষ্টা করি নাই। তাহা না করিয়া কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে কেবল "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" এই কথাটি শিখিয়া রাখিয়াছি। অর্থাৎ যাহা সত্য এবং ঐতিহাসিক, তাহার

* হরিবংশ ও পুরাণ সকলে বিশ্বাসযোগ্য কথা পাওয়া যায় না বলিয়া পূর্ব্বে ইহা পারি নাই।

কোন অনুসন্ধান না করিয়া, যাহা মিথ্যা এবং কল্পিত, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া আছি। "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ"* কথার ব্যাপারটা যে মিথ্যা, তাহা দ্রোণবধ-পর্ব্বাধ্যায় সমালোচনাকালে আমরা প্রমাণীকৃত করিব।

বৈবাহিক পর্ব্বে কৃষ্ণ সম্বন্ধে একটা বড় তামাসার কথা ব্যাসোক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহা আমাদিগের সমালোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত না হইলেও, তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলাম। দ্রুপদরাজ, কন্যার পঞ্চ স্বামী হইবে শুনিয়া তাহাতে আপত্তি করিতেছেন। ব্যাস তাঁহার আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। খণ্ডনোপলক্ষে তিনি দ্রুপদকে একটি উপাখ্যান শ্রবণ করান। উপন্যাসটি বড় অদ্ভুত ব্যাপার। উহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্র একদা গঙ্গাজলে একটি রোরুদ্যমানা সুন্দরী দর্শন করেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, "তুমি কেন কাঁদিতেছ?" তাহাতে সুন্দরী উত্তর করে যে, "আইস, দেখাইতেছি।" এই বলিয়া সে ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া দেখাইয়া দিল যে, এক যুবা এক যুবতীর সঙ্গে পাশক্রীড়া করিতেছে। তাহারা ইন্দ্রের যথোচিত সম্মান না করায় ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু যে যুবা পাশক্রীড়া করিতেছিলেন, তিনি স্বয়ং মহাদেব। ইন্দ্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া তিনিও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ইন্দ্রকে এক গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ করিতে বলিলেন। ইন্দ্র গর্ত্তের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে তাঁহার মত আর চারিটি ইন্দ্র আছেন! শেষ মহাদেব পাঁচ জন ইন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "তোমরা গিয়া পৃথিবীতে মনুষ্য হও।" সেই ইন্দ্রেরাই আবার মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করিলেন যে, "ইন্দ্রাদি পঞ্চদেব গিয়া আমাদিগকে কোন মানুষীর গর্ভে উৎপন্ন করুন" !!! সেই পাঁচ জন ইন্দ্র ইন্দ্রাদির ঔরসে পঞ্চ পাণ্ডব হইলেন। বিনাপরাধে মেয়েটাকে মহাদেব হুকুম দিলেন যে, "তুমি গিয়া ইহাদিগের পত্নী হও।" সে দ্রৌপদী হইল। সে যে কেন কাঁদিয়াছিল, তাহার আর কোন খবরই নাই। অধিকতর রহস্যের বিষয় এই যে, নারায়ণ এই কথা শুনিবামাত্রই আপনার মাথা হইতে দুইগাছি চুল উপড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন। একগাছি কাঁচা, একগাছি পাকা। পাকা-গাছটি বলরাম হইলেন, কাঁচা-গাছটি কৃষ্ণ হইলেন !!!

বুদ্ধিমান্ পাঠককে বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না যে, এই উপাখ্যানটি, আমরা যাহাকে মহাভারতের তৃতীয় স্তর বলিয়াছি, তদন্তর্গত। অর্থাৎ ইহা মূল মহাভারতের কোন অংশ নহে। প্রথমতঃ, উপাখ্যানটির রচনা এবং গঠন এখনকার বাঙ্গালার সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর উপন্যাসলেখকদিগের প্রণীত উপন্যাসের রচনা ও গঠন অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। মহাভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের প্রতিভাশালী কবিগণ এরূপ উপাখ্যানসৃষ্টির মহাপাপে পাপী হইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, মহাভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে ইহার কোন প্রয়োজনীয় সম্বন্ধ নাই। এই উপাখ্যানটির সমুদায় অংশ উঠাইয়া দিলে, মহাভারতের কোন কথাই অস্পষ্ট, অথবা কোন প্রয়োজনই অসিদ্ধ থাকিবে না। দ্রুপদরাজের আপত্তিখণ্ডনজন্য ইহার কোন প্রয়োজন নাই; কেন না, ঐ আপত্তি ব্যাসোক্ত দ্বিতীয় একটি উপাখ্যানের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। দ্বিতীয় উপাখ্যান ঐ অধ্যায়েই আছে। তাহা সংক্ষিপ্ত এবং

* পরে দেখিব, "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" এই বুলিটাই মহাভারতে নাই। ইহা কথকঠাকুরের সংস্কৃত।

সরল এবং আদিম মহাভারতের অন্তর্গত হইলে হইতে পারে। প্রথমোক্ত উপাখ্যানটি ইহার বিরোধী। দুইটিতে দ্রৌপদীর পূর্ব্বজন্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পরিচয় আছে। সুতরাং একটি যে প্রক্ষিপ্ত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এবং যাহা উপরে বলিয়াছি, তাহাতে প্রথমোক্ত উপাখ্যানটিই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হয়। তৃতীয়তঃ, এই প্রথমোক্ত উপাখ্যান মহাভারতের অন্যান্য অংশের বিরোধী। মহাভারতের সর্ব্বত্রই কথিত আছে, ইন্দ্র এক। এখানে ইন্দ্র পাঁচ। মহাভারতের সর্ব্বত্রই কথিত আছে যে, পাণ্ডবেরা ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদিগের ঔরসপুত্র মাত্র। এখানে সকলেই এক একজন ইন্দ্র। এই বিরোধের সামঞ্জস্যের জন্য উপাখ্যানরচনাকারী গর্দ্দভ লিখিয়াছেন যে, ইন্দ্রেরা মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন, "ইন্দ্রাদিই আসিয়া আমাদিগকে মানুষীর গর্ভে উৎপন্ন করুন।" জগদ্বিজয়ী গ্রন্থ মহাভারত এরূপ গর্দ্দভের লেখনীপ্রসূত নহে, উহা নিশ্চিত।

এই অশ্রদ্ধেয় উপাখ্যানটির এ স্থলে উল্লেখ করার আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া আমরা মহাভারতের তিনটি স্তর ভাগ করিতেছি ও করিব, তাহা উদাহরণের দ্বারা পাঠককে বুঝাই। তাছাড়া একটা ঐতিহাসিক তত্ত্বও ইহা দ্বারা স্পষ্টীকৃত হয়। যে বিষ্ণু, বেদে সূর্য্যের মূর্ত্তিবিশেষ মাত্র, পুরাণেতিহাসের উচ্চস্তরে যিনি সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বর, তিনি কি প্রকারে পরবর্ত্তী হতভাগ্য লেখকদিগের হস্তে দাড়ি, গোঁপ, কাঁচা চুল, পাকা চুল প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেন, এই সকল প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানের দ্বারা তাহা বুঝা যায়। এই সকল প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানে হিন্দুধর্ম্মের অবনতির ইতিহাস পড়িতে পাই। তাই এই স্থানে ইহার উল্লেখ করিলাম। কোন কৃষ্ণদ্বেষী শৈব দ্বারা এই উপাখ্যান রচিত হইয়া মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এমন বিবেচনাও করা যাইতে পারে। কেন না, এখানে মহাদেবই সর্ব্বনিয়ন্তা এবং কৃষ্ণ নারায়ণের একটি কেশ মাত্র। মহাভারতের আলোচনায় কৃষ্ণবাদী এবং শৈবদিগের মধ্যে এইরূপ অনেক বিবাদের চিহ্ন দেখিতে পাই। এবং যে সকল অংশে সে চিহ্ন পাই, তাহার অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ করিবার কারণ পাই। যদি এ কথা যথার্থ হয়, তবে ইহাই উপলব্ধি করিতে হইবে যে, এই বিবাদ আদিম মহাভারতের প্রচারের অনেক পরে উপস্থিত হইয়াছিল। অর্থাৎ যখন শিবোপাসনা ও কৃষ্ণোপাসনা উভয়ই প্রবল হয়, তখন বিবাদও ঘোরতর হইয়াছিল। মহাভারতপ্রচারের সময়ে বা তাহার পরবর্ত্তী প্রথম কালে এতদুভয়ের মধ্যে কোন উপাসনাই প্রবল ছিল না। সে সময়টা বেদের দেবতার প্রবলতার সময়। যত উভয়েই প্রবল হইল, তত বিবাদ বাধিল—তত মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। উভয় পক্ষেরই অভিপ্রায়, মহাভারতের দোহাই দিয়া আপনার দেবতাকে বড় করেন। এই জন্য শৈবেরা শিবমাহাত্ম্যসূচক রচনা সকল মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন।* তদুত্তরে বৈষ্ণবেরা বিষ্ণু বা কৃষ্ণমাহাত্ম্যসূচক সেইরূপ রচনা সকল গুঁজিয়া দিতে লাগিলেন। অনুশাসন-পর্ব্বে এই কথার কতকগুলি উত্তম উদাহরণ পাওয়া যায়।

* সেইগুলি অবলম্বন করিয়া মূর প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কৃষ্ণকে শৈব বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

ইচ্ছা করিলে, পাঠক পড়িয়া দেখিবেন। প্রায় সকলগুলিতেই একটু একটু গর্দ্দভের গাত্রসৌরভ আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—সুভদ্রাহরণ

দ্রৌপদীস্বয়ংবরের পর, সুভদ্রাহরণে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাই। সুভদ্রার বিবাহে কৃষ্ণ যাহা করিয়াছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর নীতিজ্ঞেরা তাহা বড় পছন্দ করিবেন না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর নীতিশাস্ত্রের উপর, একটা জগদীশ্বরের নীতিশাস্ত্র আছে—তাহা সকল শতাব্দীতে, সকল দেশে খাটিয়া থাকে। কৃষ্ণ যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা সেই চিরস্থায়ী অভ্রান্ত জাগতিক নীতির দ্বারাই পরীক্ষা করিব। এ দেশে অনেকেই একব্বরি গজের মাপে লাখেরাজ বা জোত জমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; জমীদারেরা এখনকার ছোট সরকারি গজে মাপিয়া তাহাদিগের অনেক ভূমি কাড়িয়া লইয়াছে। তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর যে ছোট মাপকাটি হইয়াছে, তাহার জ্বালায় আমরা ঐতিহাসিক পৈতৃক সম্পত্তি সকলই হারাইতেছি, ইহা অনেক বার বলিয়াছি। আমরা এক্ষণে সেই একব্বরি গজ চালাইব।

কৃষ্ণভক্তেরা বলিতে পারেন, এরূপ একটা বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে, স্থির কর যে, এই সুভদ্রাহরণবৃত্তান্ত মূল মহাভারতের অন্তর্গত কি প্রক্ষিপ্ত। যদি ইহা প্রক্ষিপ্ত এবং আধুনিক বলিয়া বোধ করিবার কোন কারণ থাকে, তবে সেই কথা বলিলেই সব গোল মিটিল—এত বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। অতএব আমরা বলিতে বাধ্য যে, সুভদ্রাহরণ যে মূল মহাভারতের অংশ, ইহা যে প্রথম স্তরের অন্তর্গত, তদ্বিষয়ে আমাদের কোন সংশয় নাই। ইহার প্রসঙ্গ অনুক্রমণিকাধ্যায়ে এবং পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে আছে। ইহার রচনা অতি উচ্চশ্রেণীর কবির রচনা। দ্বিতীয় স্তরের রচনাও সচরাচর অতি সুন্দর। তবে প্রথম স্তর ও দ্বিতীয় স্তরে রচনাগত একটা প্রভেদ এই যে, প্রথম স্তরের রচনা সরল ও স্বাভাবিক, দ্বিতীয় স্তরের রচনায় অলঙ্কার ও অত্যুক্তির বড় বাহুল্য। সুভদ্রাহরণের রচনাও সরল ও স্বাভাবিক, অলঙ্কার ও অত্যুক্তির তেমন বাহুল্য নাই। সুতরাং ইহা প্রথমস্তর-গত—দ্বিতীয় স্তরের নহে। আর আসল কথা এই যে, সুভদ্রাহরণ মহাভারত হইতে তুলিয়া লইলে, মহাভারত অসম্পূর্ণ হয়। সুভদ্রা হইতে অভিমন্যু, অভিমন্যু হইতে পরিক্ষিৎ, পরিক্ষিৎ হইতে জনমেজয়। ভদ্রার্জ্জুনের বংশই বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতে সাম্রাজ্য শাসিত করিয়াছিল—দ্রৌপদীর বংশ নহে। বরং দ্রৌপদীস্বয়ংবর বাদ দেওয়া যায়, তবু সুভদ্রা নয়।

দ্রৌপদীর ন্যায় সুভদ্রাকেও সাহেবরা উড়াইয়া দিয়াছেন। লাসেন্ বলেন,—যাদবসম্প্রীতিরূপ যে মঙ্গল, তাহাই সুভদ্রা। বেবর সাহেবের আপত্তি ইহার অপেক্ষা গুরুতর। তিনি কেন কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রার মানবীত্ব অস্বীকৃত করেন, তজ্জন্য যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনীশাখা ২৩ অধ্যায়ের ১৮ কণ্ডিকার ৪র্থ মন্ত্রটি উদ্ধৃত করিতে হইতেছে।

"হে অম্বে! হে অম্বিকে! হে অম্বালিকে! দেখ, এই অশ্ব এক্ষণে চিরকালের জন্য নিদ্রিত হইয়াছে, আমি কাম্পিলবাসিনী সুভদ্রা হইয়াও স্বয়ং ইহার সমীপে

(পতিত্বে বরণ করণার্থ) সমাগত হইয়াছি, এ বিষয়ে আমাকে কেহই নিয়োগ করে নাই।"*

ইহাতে বেবর সাহেব সিদ্ধান্ত করিতেছেন,—

"Kampila is a town in the country of the Panchalas. Subhadra, therefore, would seem to be the wife of the King of that district." &c.

সায়নাচার্য্য কাম্পিলবাসিনীর এইরূপ অর্থ করেন—"কাম্পিলশব্দেন শ্লাঘ্যো বস্ত্র-বিশেষ উচ্যতে" কিন্তু বেবর সাহেবের বিশ্বাস যে, তিনি সায়নাচার্য্যের অপেক্ষা সংস্কৃত বুঝেন ভাল, অতএব তিনি এ ব্যাখ্যা গ্রাহ্য করেন না। তাহা না-ই করুন, কিন্তু কাম্পিলবাসিনী কোন স্ত্রীর নাম সুভদ্রা ছিল বলিয়া কৃষ্ণভগিনীর নাম কেন সুভদ্রা হইতে পারে না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। যে রাজাই অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন, তাঁহারই মহিষীকে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে, তাঁহাকেই বলিতে হইবে, "আমি কাম্পিল-বাসিনী সুভদ্রা।" সুভদ্রা শব্দে সামশ্রমী মহাশয় এই অর্থ করেন,—কল্যাণী অর্থাৎ সৌভাগ্যবতী। মহীধর বলেন,—কাম্পিলনগরীর মহিলাগণ অতিশয় রূপলাবণ্যবতী। অতএব এই মন্ত্রের অর্থ এই যে, "আমি সৌভাগ্যবতী ও রূপলাবণ্যবতী হইয়াও এই অশ্বের নিকট সমাগত হইয়াছি।" অতএব বুঝিতে পারি না যে, এই মন্ত্রের বলে কৃষ্ণভগিনী অর্জ্জুনপত্নী সুভদ্রার পরিবর্ত্তে কেন এক জন পাঞ্চালী সুভদ্রাকে কল্পনা করিতে হইবে। যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার বহুপূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ইহাই মহাভারতে এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। অতএব ইহাই সম্ভব যে, অশ্বমেধ যজ্ঞের এই যজুর্মন্ত্র কৃষ্ণ-পাণ্ডবের অপেক্ষা প্রাচীন। এখন যেমন লোকে আধুনিক লেখকদিগের কাব্যগ্রন্থ হইতে পুত্রকন্যার নামকরণ করিতেছে, † তেমনি সে কালেও বেদ হইতে লোকের পুত্রকন্যার নাম রাখা অসম্ভব নহে। এই মন্ত্র হইতেই কাশিরাজ আপনার তিনটি কন্যার নাম অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা রাখিয়া থাকিবেন, এবং এইরূপেই কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রারও নামকরণ হইয়া থাকিবে। এই মন্ত্রে এমন কিছু দেখি না যে, তজ্জন্য কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রা কেহ ছিলেন না, এমন কথা অনুমান করা যায়। অতএব আমরা সুভদ্রাহরণের বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

এক্ষণে, সুভদ্রাহরণের নৈতিক বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে পাঠকের নিকট একটা অনুরোধ আছে। তিনি কাশীদাসের গ্রন্থে অথবা কথকের নিকট, অথবা পিতামহীর মুখে, অথবা বাঙ্গালা নাটকাদিতে যে সুভদ্রাহরণ পড়িয়াছেন বা শুনিয়াছেন, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক ভুলিয়া যাউন। অর্জ্জুনকে দেখিয়া সুভদ্রা অনঙ্গশরে ব্যথিত হইয়া উন্মত্ত হইলেন, সত্যভামা মধ্যবর্ত্তিনী দূতী হইলেন, অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে যাদবসেনার সঙ্গে তাঁর ঘোরতর যুদ্ধ হইল, সুভদ্রা তাঁহার সারথি হইয়া গগনমার্গে তাঁহার রথ চালাইতে লাগিলেন—সে সকল কথা ভুলিয়া যান। এ সকল অতি মনোহর কাহিনী বটে, কিন্তু মূল মহাভারতে ইহার কিছুই নাই। ইহা কাশীরাম দাসের গ্রন্থেই প্রথম দেখিতে পাই, কিন্তু এ সকল তাঁহার সৃষ্টি, কি তাঁহার পরবর্ত্তী কথকদিগের

* শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী কৃত অনুবাদ।

† যথা—প্রমীলা, মৃণালিনী ইত্যাদি।

সৃষ্টি, তাহা বলা যায় না। সংস্কৃত মহাভারতে যে প্রকার সুভদ্রাহরণ কথিত হইয়াছে, তাহার স্থূলমর্ম্ম বলিতেছি।

দ্রৌপদীর বিবাহের পর পাণ্ডবেরা ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে রাজ্য করিতেছিলেন। কোন কারণে অর্জ্জুন দ্বাদশ বৎসরের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদেশে ভ্রমণ করেন। অন্যান্য দেশপর্য্যটনানন্তর শেষে তিনি দ্বারকায় উপস্থিত হয়েন। তথায় যাদবেরা তাঁহার বিশেষ সমাদর ও সৎকার করেন। অর্জ্জুন কিছু দিন সেখানে অবস্থিতি করেন। একদা যাদবেরা রৈবতক পর্ব্বতে একটা মহান্ উৎসব আরম্ভ করেন। সেখানে যদুবীরেরা ও যদুকুলাঙ্গনাগণ সকলেই উপস্থিত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করেন। অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সুভদ্রাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি কুমারী ও বালিকা। অর্জ্জুন তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, "সখে! বনচর হইয়াও অনঙ্গশরে চঞ্চল হইলে?" অর্জ্জুন অপরাধ স্বীকার করিয়া, সুভদ্রা যাহাতে তাঁহার মহিষী হন, তদ্বিষয়ে কৃষ্ণের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ যে পরামর্শ দিলেন, তাহা এই :—

"হে অর্জ্জুন! স্বয়ংবরই ক্ষত্রিয়দিগের বিধেয়, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রবৃত্তির কথা কিছুই বলা যায় না, সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার সংশয় জন্মিতেছে। আর ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা কহেন, বিবাহোদ্দেশে বলপূর্ব্বক হরণ করাও মহাবীর ক্ষত্রিয়দিগের প্রশংসনীয়। অতএব স্বয়ংবরকাল উপস্থিত হইলে তুমি আমার ভগিনীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইবে; কারণ, স্বয়ংবরকালে সে কাহার প্রতি অনুরক্ত হইবে, কে বলিতে পারে?"

এই পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া অর্জ্জুন প্রথমতঃ যুধিষ্ঠির ও কুন্তীর অনুমতি আনিতে দূত প্রেরণ করেন। তাঁহাদিগের অনুমতি পাইলে, একদা, সুভদ্রা যখন রৈবতক পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া রথে তুলিয়া অর্জ্জুন প্রস্থান করিলেন।

এখন, আজিকালিকার দিনে যদি কেহ বিবাহোদ্দেশে কাহারও মেয়ে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করে, তবে সে সমাজে নিন্দিত এবং রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য সন্দেহ নাই। এবং এখনকার দিনে কেহ যদি অপর কাহাকে বলে, "মহাশয়! যখন আমার ভগিনীকে বিবাহ করিতে আপনার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন আপনি উহাকে কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করুন, ইহাই আমার পরামর্শ," তবে সে ব্যক্তিও জনসমাজে নিন্দনীয় হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব প্রচলিত নীতিশাস্ত্রানুসারে (সে নীতিশাস্ত্রের কিছুমাত্র দোষ দিতেছি না), কৃষ্ণার্জ্জুন উভয়েই অতিশয় নিন্দনীয় কার্য্য করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। লোকের চক্ষে ধূলা দিয়া কৃষ্ণকে বাড়ান যদি আমার উদ্দেশ্য হইত, তবে সুভদ্রাহরণপর্ব্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া, কিম্বা এমনই একটা কিছু জুয়াচুরি করিয়া, এ কথাটা বাদ দিয়া যাইতাম। কিন্তু সে সকল পথ আমার অবলম্বনীয় নহে। সত্য ভিন্ন মিথ্যা প্রশংসায়, কাহারও মহিমা বাড়িতে পারে না এবং ধর্ম্মের অবনতি ভিন্ন উন্নতি হয় না।

কিন্তু কথাটা একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। কেহ কাহারও মেয়ে কাড়িয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করিলে, সেটা দোষ বলিয়া গণিতে হয় কেন? তিন কারণে। প্রথমতঃ,

অপহৃতা কন্যার উপর অত্যাচার হয়। দ্বিতীয়তঃ, কন্যার পিতা মাতা ও বন্ধুবর্গের উপর অত্যাচার। তৃতীয়তঃ, সমাজের উপর অত্যাচার। সমাজরক্ষার মূলসূত্র এই যে, কেহ কাহারও উপর অবৈধ বলপ্রয়োগ করিতে পারিবে না। কেহ কাহারও উপর অবৈধ বলপ্রয়োগ করিলেই সমাজের স্থিতির উপর আঘাত করা হইল। বিবাহার্থিকৃত কন্যা-হরণকে নিন্দনীয় কার্য্য বিবেচনা করিবার এই তিনটি গুরুতর কারণ বটে, কিন্তু তদ্ভিন্ন আর চতুর্থ কারণ কিছু নাই।

এখন দেখা যাউক, কৃষ্ণের এই কাজে এই তিন জনের মধ্যে কে কতদূর অত্যাচার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ, অপহৃতা কন্যার উপর কতদূর অত্যাচার হইয়াছিল দেখা যাক। কৃষ্ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং বংশের শ্রেষ্ঠ। যাহাতে সুভদ্রার সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হয়, তাহাই তাঁহার কর্ত্তব্য—তাহাই তাঁহার ধর্ম্ম—উনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় তাহাই তাঁহার "Duty"। এখন স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রধান মঙ্গল—সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল বলিলেও হয়—সৎপাত্রস্থা হওয়া। অতএব সুভদ্রার প্রতি কৃষ্ণের প্রধান "ডিউটি"—তিনি যাহাতে সৎপাত্রস্থা হয়েন, তাহাই করা। এখন, অর্জ্জুনের ন্যায় সৎপাত্র কৃষ্ণের পরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ছিল না, ইহা বোধ হয় মহাভারতের পাঠকদিগের নিকট কষ্ট পাইয়া প্রমাণ করিতে হইবে না। অতএব তিনি যাহাতে অর্জ্জুনের পত্নী হইবেন, ইহাই সুভদ্রার মঙ্গলার্থ কৃষ্ণের করা কর্ত্তব্য। তাঁহার যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই তিনি দেখাইয়াছেন, বলপূর্ব্বক হরণ ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে এই কর্ত্তব্য সাধন হইতে পারিত কি না, তাহা সন্দেহস্থল। যেখানে ভাবিফল চিরজীবনের মঙ্গল, সেখানে যে পথে সন্দেহ সে পথে যাইতে নাই। যে পথে মঙ্গলসিদ্ধি নিশ্চিত, সেই পথেই যাইতে হয়। অতএব কৃষ্ণ, সুভদ্রার চিরজীবনের পরম শুভ সুনিশ্চিত করিয়া দিয়া, তাহার প্রতি পরমধর্ম্মানুমত কার্য্যই করিয়াছিলেন—তাহার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই।

এ কথার প্রতি দুইটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। প্রথম আপত্তি এই যে, আমার যে কাজে ইচ্ছা নাই, সে কাজ আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইলেও, আমার উপর বলপ্রয়োগ করিয়া সে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার কাহারও অধিকার নাই। পুরোহিত মহাশয় মনে করেন যে, আমি যদি আমার সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণকে দান করি, তবে আমার পরম মঙ্গল হইবে। কিন্তু তাঁহার এমন কোন অধিকার নাই যে, আমাকে মারপিট করিয়া সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণকে দান করান। শুভ উদ্দেশ্যের সাধন জন্য নিন্দনীয় উপায় অবলম্বন করাও নিন্দনীয়। উনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় ইহার অনুবাদ এই যে, "The end does not sanctify the means."

এ কথার দুইটি উত্তর আছে। প্রথম উত্তর এই যে, সুভদ্রার যে অর্জ্জুনের প্রতি অনিচ্ছা বা বিরক্তি ছিল, এমত কিছুই প্রকাশ নাই। ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই প্রকাশ নাই। প্রকাশ থাকিবার সম্ভাবনা বড় অল্প। হিন্দুর ঘরের কন্যা—কুমারী এবং বালিকা—পাত্রবিশেষের প্রতি ইচ্ছা বা অনিচ্ছা বড় প্রকাশ করে না। বাস্তবিক, তাহাদের মনেও বোধ হয়, পাত্রবিশেষের প্রতি ইচ্ছা অনিচ্ছা বড় জন্মেও না, তবে ধেড়ে মেয়ে ঘরে পুষিয়া রাখিলে জন্মিতে পারে। এখন, যদি কোন কাজে আমার

ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই নাই থাকে, যদি সেই কাজ আমার পক্ষে পরম মঙ্গলকর হয়, আর কেবল বিশেষ প্রবৃত্তির অভাবে বা লজ্জাবশতঃ বা উপায়াভাব বশতঃ আমি সে কার্য্য স্বয়ং করিতেছি না, এমন হয়, আর যদি আমার উপর একটু বলপ্রয়োগের ভাণ করিলে সেই পরম মঙ্গলকর কার্য্য সুসিদ্ধ হয়, তবে সে বলপ্রয়োগ কি অধর্ম্ম? মনে কর, এক জন বড় ঘরের ছেলে দুরবস্থায় পড়িয়াছে, তোমার কাছে একটি চাকরি পাইলে খাইয়া বাঁচে, কিন্তু বড় ঘর বলিয়া তাহাতে তেমন ইচ্ছা নাই, কিন্তু তুমি তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া চাকরিতে বসাইয়া দিলে আপত্তি করিবে না, বরং সপরিবারে খাইয়া বাঁচিবে। সে স্থলে তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া দুটো ধমক দিয়া তাহাকে দফতরখানাতে বসাইয়া দেওয়া কি তোমার অধর্ম্মাচরণ বা পীড়ন করা হইবে? সুভদ্রার অবস্থাও ঠিক তাই। হিন্দুর ঘরের কুমারী মেয়ে, বুঝাইয়া বলিলে, কি "এসো গো" বলিয়া ডাকিলে, বরের সঙ্গে যাইবে না। কাজেই ধরিয়া লইয়া যাওয়ার ভাণ ভিন্ন তাহার মঙ্গলসাধনের উপায়ান্তর ছিল না।

"আমার যে কাজে ইচ্ছা নাই, সে কাজ আমার পক্ষে পরম মঙ্গলকর হইলেও, আমার প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়া সে কাজে প্রবৃত্ত করিবার কাহারও অধিকার নাই।" এই আপত্তির দুইটি উত্তর আছে, আমরা বলিয়াছি। প্রথম উত্তর, উপরে বুঝাইলাম। প্রথম উত্তরে আমরা ঐ আপত্তির কথাটা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া উত্তর দিয়াছি। দ্বিতীয় উত্তর এই যে, কথাটা সকল সময়ে যথার্থ নয়। যে কার্য্যে আমার পরম মঙ্গল, সে কার্য্যে আমার অনিচ্ছা থাকিলেও বলপ্রয়োগ করিয়া আমাকে তাহাতে প্রবৃত্ত করিতে যে কাহারও অধিকার নাই, এ কথা সকল সময়ে খাটে না। যে রোগীর রোগপ্রভাবে প্রাণ যায়, কিন্তু ঔষধে রোগীর স্বভাবসুলভ বিরাগবশতঃ সে ঔষধ খাইবে না, তাহাকে বলপূর্ব্বক ঔষধ খাওয়াইতে চিকিৎসকের এবং বন্ধুবর্গের অধিকার আছে। সাংঘাতিক বিস্ফোটক সে ইচ্ছাপূর্ব্বক কাটাইবে না,—জোর করিয়া কাটিবার ডাক্তারের অধিকার আছে। ছেলে লেখাপড়া শিখিবে না, জোর করিয়া লেখাপড়া শিখাইবার অধিকার শিক্ষক ও পিতা মাতা প্রভৃতির আছে। এই বিবাহের কথাতেই দেখ, অপ্রাপ্তবয়ঃ কুমার কি কুমারী যদি অনুচিত বিবাহে উদ্যত হয়, বলপূর্ব্বক তাহাকে নিবৃত্ত করিতে কি পিতা মাতার অধিকার নাই? আজিও সভ্য ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে কন্যার বিবাহে জোর করিয়া সৎপাত্রে কন্যাদান করার প্রথা আছে। যদি পনের বৎসরের কোন হিন্দুর মেয়ে কোন সুপাত্রে আপত্তি উপস্থিত করে, তবে কোন্ পিতা মাতা জোর করিয়া তাহাকে সৎপাত্রস্থ করিতে আপত্তি করিবেন? জোর করিয়া বালিকা কন্যা সৎপাত্রস্থ করিলে তিনি কি নিন্দনীয় হইবেন? যদি না হন, তবে সুভদ্রাহরণে কৃষ্ণের অনুমতি নিন্দনীয় কেন?

এই গেল প্রথম আপত্তির দুই উত্তর। এখন দ্বিতীয় আপত্তির বিচারে প্রবৃত্ত হই।

দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, ভাল, স্বীকার করা গেল যে, কৃষ্ণ সুভদ্রার মঙ্গলকামনা করিয়াই, এই পরামর্শ দিয়াছিলেন—কিন্তু বলপূর্ব্বক হরণ ভিন্ন কি তাঁহাকে অর্জ্জুনমহিষী করিবার অন্য উপায় ছিল না? স্বয়ংবরে যেন ভয় ছিল, যেন

মূঢ়মতি বালিকা কেবল মুখ দেখিয়া ভুলিয়া গিয়া কোন অপাত্রে বরমাল্য দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু উপায়ান্তর কি ছিল না? কৃষ্ণ কি অর্জ্জুন, বাসুদেব প্রভৃতি কর্ত্তৃপক্ষের কাছে কথা পাড়িয়া রীতিমত সম্বন্ধ স্থির করিয়া তাঁহাদিগকে বিবাহে সম্মত করিয়া কন্যা সম্প্রদান করাইতে পারিতেন। যাদবেরা কৃষ্ণের বশীভূত; কেহই তাঁহার কথায় অমত করিত না। এবং অর্জ্জুনও সুপাত্র, কেহই আপত্তি করিত না। তবে না হইল কেন?

এখনকার দিনকাল হইলে, এ কাজ সহজে হইত। কিন্তু ভদ্রার্জ্জুনের বিবাহ চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, তখনকার বিবাহপ্রথা এখনকার বিবাহপ্রথার মত ছিল না। সেই বিবাহপ্রথা না বুঝিলে কৃষ্ণের আদর্শ বুদ্ধি ও আদর্শ প্রীতি আমরা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিব না।

মনুতে আছে, বিবাহ অষ্টবিধ, (১) ব্রাহ্ম, (২) দৈব, (৩) আর্ষ, (৪) প্রাজাপত্য, (৫) আসুর, (৬) গান্ধর্ব্ব, (৭) রাক্ষস ও (৮) পৈশাচ। এই ক্রমান্বয়টা পাঠক মনে রাখিবেন।

এই অষ্টপ্রকার বিবাহে সকল বর্ণের অধিকার নাই। ক্ষত্রিয়ের কোন্ কোন্ বিবাহে অধিকার, দেখা যাউক। তৃতীয় অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে কথিত হইয়াছে,

ষড়ানুপূর্ব্ব্যা বিপ্রস্য ক্ষত্রস্য চতুরোঽবরান্।

ইহার টীকায় কুল্লূকভট্ট লেখেন, "ক্ষত্রিয়স্য অবরানুপরিতনানাসুরাদীংশ্চতুরঃ।" তবেই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে, কেবল আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ, এই চারি প্রকার বিবাহ বৈধ। আর সকল অবৈধ।

কিন্তু ২৫ শ্লোকে আছে—

পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব ন কর্ত্তব্যৌ কদাচন॥

পৈশাচ ও আসুর বিবাহ সকলেরই অকর্ত্তব্য। অতএব ক্ষত্রিয় পক্ষে কেবল গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস, এই দ্বিবিধ বিবাহই বিহিত রহিল।

তন্মধ্যে, বরকন্যার উভয়ে পরস্পর অনুরাগ সহকারে যে বিবাহ হয়, তাহাই গান্ধর্ব্ব বিবাহ। এখানে সুভদ্রার অনুরাগ অভাবে সে বিবাহ অসম্ভব, এবং সেই বিবাহ "কামসম্ভব," সুতরাং পরম নীতিজ্ঞ কৃষ্ণার্জ্জুনের তাহা কখনও অনুমোদিত হইতে পারে না। অতএব রাক্ষস বিবাহ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বিবাহ শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম্য নহে ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত নহে; অন্য প্রকার বিবাহেরও সম্ভাবনা এখানে ছিল না। বলপূর্ব্বক কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করাকে রাক্ষস বিবাহ বলে। বস্তুতঃ শাস্ত্রানুসারে এই রাক্ষস বিবাহই ক্ষত্রিয়ের পক্ষে একমাত্র প্রশস্ত বিবাহ। মনুর ৩ অ, ২৪ শ্লোকে আছে—

চতুরো ব্রাহ্মণস্যাদ্যান্ প্রশস্তান্ কবয়ো বিদুঃ।
রাক্ষসং ক্ষত্রিয়স্যৈকমাসুরং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ॥

যে বিবাহ ধর্ম্ম্য ও প্রশস্ত, আপনার ভগিনীর ও ভগিনীপতির গৌরবার্থ ও নিজকুলের গৌরবার্থ, কৃষ্ণ সেই বিবাহের পরামর্শ দিতে বাধ্য ছিলেন। অতএব কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পরম শাস্ত্রজ্ঞতা, নীতিজ্ঞতা, অভ্রান্তবুদ্ধি এবং সর্ব্বপক্ষের মানসম্ভ্রম রক্ষার অভিপ্রায় ও হিতেচ্ছাই দেখা যায়।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, এখানে মনুর দোহাই দিলে চলিবে না। মহাভারতের যুদ্ধের সময়ে মনুসংহিতা ছিল, ইহার প্রমাণ কি? কথা ন্যায্য বটে, তত প্রাচীনকালে মনুসংহিতা সঙ্কলিত হইয়াছিল কি না, সে বিষয়ে বাদ প্রতিবাদ হইতে পারে। তবে মনুসংহিতা পূর্ব্বপ্রচলিত রীতিনীতির সঙ্কলন মাত্র, ইহা পণ্ডিতদিগের মত। যদি তাহা হয়, তবে যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে ঐরূপ বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত ছিল, ইহা বিবেচনা করা যাইতে পারে। নাই পারুক—মহাভারতেই এ বিষয়ে কি আছে, তাহাই দেখা যাউক। এই সুভদ্রাহরণ-পর্ব্বাধ্যায়েই সে বিষয়ে কি প্রমাণ পাওয়া যায়, দেখা যাউক। বড় বেশী খুঁজিতে হইবে না। আমরা পাঠকদিগের নিকট যে উত্তর দিতেছি, কৃষ্ণ নিজেই সেই উত্তর বলদেবকে দিয়াছিলেন। অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, শুনিয়া যাদবেরা ক্রুদ্ধ হইয়া রণসজ্জা করিতেছিলেন। বলদেব বলিলেন, অত গণ্ডগোল করিবার আগে, কৃষ্ণ কি বলেন শুনা যাউক। তিনি চুপ করিয়া আছেন। তখন বলদেব কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া, অর্জ্জুন তাঁহাদের বংশের অপমান করিয়াছে বলিয়া রাগ প্রকাশ করিলেন, এবং কৃষ্ণের অভিপ্রায় কি, জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ উত্তর করিলেন—

"অর্জ্জুন আমাদিগের কুলের অবমাননা করেন নাই, বরং সমধিক সম্মান রক্ষাই করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে অর্থলুব্ধ মনে করেন না বলিয়া অর্থ দ্বারা সুভদ্রাকে গ্রহণ করিতে চেষ্টাও করেন নাই। স্বয়ংবরের করা লাভ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার, এই জন্যই তাহাতে সম্মত হন নাই, এবং পিতা মাতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক প্রদত্তা কন্যার পাণিগ্রহণ করা তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের প্রশংসনীয় নহে। অতএব আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় উক্ত দোষ সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া বলপূর্ব্বক সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধ আমাদের কুলোচিত হইয়াছে, এবং কুলশীল বিদ্যা ও বুদ্ধিসম্পন্ন পার্থ বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছেন, বলিয়া সুভদ্রাও যশস্বিনী হইবেন, সন্দেহ নাই।"

এখানে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়ের চারি প্রকার বিবাহের কথা বলিয়াছেন,—

১। অর্থ (বা শুল্ক) দিয়া বিবাহ করা যায় (আসুর)।

২। স্বয়ংবর।

৩। পিতা মাতা কর্ত্তৃক প্রদত্তা কন্যার সহিত বিবাহ (প্রাজাপত্য)।

৪। বলপূর্ব্বক হরণ (রাক্ষস)।

ইহার মধ্যে প্রথমটিতে কন্যাকুলের অকীর্ত্তি ও অযশ, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। দ্বিতীয়ের ফল অনিশ্চিত। তৃতীয়ে, বরের অগৌরব। কাজেই চতুর্থই এখানে একমাত্র বিহিত বিবাহ। ইহা কৃষ্ণোক্তিতেই প্রকাশ আছে।*

* মহাভারতের অনুশাসন-পর্ব্বে যে বিবাহতত্ত্ব আছে, তাহার আমরা কোন উল্লেখ করিলাম না, কেন না, উহা প্রক্ষিপ্ত। সেখানে রাক্ষস বিবাহ ভীষ্ম কর্ত্তৃক নিন্দিত ও নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ভীষ্ম স্বয়ং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা স্থির করিয়া, কাশিরাজের তিনটি কন্যা হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। সুতরাং ভীষ্মের রাক্ষস বিবাহকে নিন্দিত ও নিষিদ্ধ বলা সম্ভব নহে। ভীষ্মের চরিত্র এই যে, যাহা নিষিদ্ধ ও নিন্দিত, তাহা তিনি প্রাণান্তেও করিতেন না। যে কবি তাঁহার চরিত্র সৃষ্ট করিয়াছেন, সে কবি কখনই তাঁহার মুখ দিয়া এ কথা বাহির করেন নাই।

ভরসা করি, এমন নির্ব্বোধ কেহই নাই যে, সিদ্ধান্ত করেন যে, আমি রাক্ষস বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিতেছি। রাক্ষস বিবাহ অতি নিন্দনীয়, সে কথা বলিয়া স্থান নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন। তবে সে কালে যে ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে ইহা প্রশংসিত ছিল, কৃষ্ণ তাহার দায়ী নহেন। আমাদিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, "রিফর্ম্মর্‌ই" আদর্শ মনুষ্য. এবং কৃষ্ণ যদি আদর্শ মনুষ্য, তবে মালাবারি ধরণের রিফর্ম্মর্ হওয়াই তাঁহার উচিত ছিল, এবং এই কুপ্রথার প্রশ্রয় না দিয়া দমন করা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা মালাবারি ঢংটাকে আদর্শ মনুষ্যের গুণের মধ্যে গণি না, সুতরাং এ কথার কোন উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করি না।

আমরা বলিয়াছি যে, বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া যে বিবাহ, তাহা তিন কারণে নিন্দনীয়; (১) কন্যার প্রতি অত্যাচার, (২) তাহার পিতৃকুলের প্রতি অত্যাচার, (৩) সমাজের প্রতি অত্যাচার। কন্যার প্রতি যে কোন অত্যাচার হয় নাই, বরং তাহার পরম মঙ্গলই সাধিত হইয়াছিল, তাহা দেখাইয়াছি। এক্ষণে তাঁহার পিতৃকুলের প্রতি কোন অত্যাচার হইয়াছে কি না, দেখা যাউক। কিন্তু আর স্থান নাই, সংক্ষেপে কথা শেষ করিতে হইবে। যাহা বলিয়াছি, তাহাতে সকল কথাই শেষ হইয়া আসিয়াছে।

কন্যাহরণে তৎপিতৃকুলের উপর দুই কারণে অত্যাচার ঘটে। (১) তাঁহাদিগের কন্যা অপাত্রে বা অনভিপ্রেত পাত্রের হস্তগত হয়। কিন্তু এখানে তাহা ঘটে নাই। অর্জ্জুন অপাত্রও নহে, অনভিপ্রেত পাত্রও নহে। (২) তাঁহাদিগের নিজের অপমান। কিন্তু পূর্ব্বে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, ইহাতে যাদবেরা অপমানিত হইয়াছেন বিবেচনা করিবার কোন কারণ ছিল না। এ কথা যাদবশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণই প্রতিপন্ন করিয়াছেন. এবং তাঁহার সেকথা ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিয়া অপর যাদবেরা অর্জ্জুনকে ফিরাইয়া আনিয়া সমারোহপূর্ব্বক তাঁহার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার হইয়াছিল, ইহা বলিবার আমাদের আর আবশ্যকতা নাই।

(৩) সমাজের প্রতি অত্যাচার। যে বলকে সমাজ অবৈধ বল বিবেচনা করে, সমাজমধ্যে কাহারও প্রতি সেই বল প্রযুক্ত হইলেই সমাজের প্রতি অত্যাচার হইল। কিন্তু যখন তাৎকালিক আর্য্যসমাজ ক্ষত্রিয়কৃত এই বলপ্রয়োগকে প্রশস্ত ও বিহিত বলিত, তখন সমাজের আর বলিবার অধিকার নাই যে, আমার প্রতি অত্যাচার হইল। যাহা সমাজসম্মত, তদ্দ্বারা সমাজের উপর কোন অত্যাচার হয় নাই।

আমরা এই তত্ত্ব এত সবিস্তারে লিখিলাম, তাহার কারণ আছে। সুভদ্রাহরণের জন্য কৃষ্ণদ্বেষীরা কৃষ্ণকে কখনও গালি দেন নাই। তজ্জন্য কৃষ্ণপক্ষসমর্থনের কোন আবশ্যকতা ছিল না। আমার দেখাইবার উদ্দেশ্য এই যে, বিলাত হইতে যে ছোট মাপকাটিটি আমরা ধার করিয়া আনিয়াছি, সে মাপকাটিতে মাপিলে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষাগত অতুল সম্পত্তি অধিকাংশই বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। আমাদিগের সেই একব্বরি গজ বাহির করা চাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—খাণ্ডবদাহ

সুভদ্রাহরণের পরে খাণ্ডবদাহে কৃষ্ণের দর্শন পাই। পাণ্ডবেরা খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতেন। তাঁহাদিগের রাজধানীর নিকট খাণ্ডব নামে এক বৃহৎ অরণ্য ছিল। কৃষ্ণার্জ্জুন তাহা দগ্ধ করেন। তাহার বৃত্তান্তটি এই। গল্পটা বড় আষাঢ়ে রকম।

পূর্ব্বকালে শ্বেতকি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বড় যাজ্ঞিক ছিলেন। চিরকালই যজ্ঞ করেন। তাঁহার যজ্ঞ করিতে করিতে ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণেরা হয়রাণ হইয়া গেল। তাহারা আর পারে না—সাফ জবাব দিয়া সরিয়া পড়িল। রাজা তাহাদিগকে পীড়াপীড়ি করিলেন—তাহারা বলিল, "এ রকম কাজ আমাদের দ্বারা হইতে পারে না—তুমি রুদ্রের কাছে যাও।" রাজা রুদ্রের কাছে গেলেন—রুদ্র বলিলেন, "আমরা যজ্ঞ করি না—এ কাজ ব্রাহ্মণের। দুর্ব্বাসা এক জন ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি আমারই অংশ—আমি তাঁহাকে বলিয়া দিতেছি।" রুদ্রের অনুরোধে, দুর্ব্বাসা রাজার যজ্ঞ করিলেন। ঘোরতর যজ্ঞ—বার বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত অগ্নিতে ঘৃতধারা। ঘি খাইয়া অগ্নির Dyspepsia উপস্থিত। তিনি ব্রহ্মার কাছে গিয়া বলিলেন, "ঠাকুর। বড় বিপদ্,—খাইয়া খাইয়া শরীরের বড় গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, এখন উপায় কি?" ব্রহ্মা যে রকম ডাক্তারি করিলেন, তাহা *Similia Similibus Curanter* হিসাবে। তিনি বলিলেন, "ভাল, খাইয়া যদি পীড়া হইয়া থাকে, তবে আরও খাও। খাণ্ডব বনটা খাইয়া ফেল—পীড়া আরাম হইবে।" শুনিয়া অগ্নি খাণ্ডব বন খাইতে গেলেন। চারি দিকে হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু বনে অনেক জীবজন্তু বাস করিত—হাতীরা শুঁড়ে করিয়া জল আনিল, সাপেরা ফণা করিয়া জল আনিল, এই রকম বনবাসী পশুপক্ষিগণ মিলিয়া আগুন নিবাইয়া দিল। আগুন সাতবার জ্বলিলেন, সাতবার তাহারা নিবাইল। অগ্নি তখন ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, "আমি বড় পেটুক, বড় বেশী খাই, তোমরা আমাকে খাওয়াইতে পার?" তাঁহারা স্বীকৃত হইলেন। তখন তিনি আত্মপরিচয় দিয়া ছোট রকমের প্রার্থনা জানাইলেন—"খাণ্ডব বনটি খাব। খাইতে গিয়াছিলাম, কিন্তু ইন্দ্র আসিয়া বৃষ্টি করিয়া আমাকে নিবাইয়া দিয়াছে—খাইতে দেয় নাই।" তখন কৃষ্ণার্জ্জুন অস্ত্র ধরিয়া বন পোড়াইতে গেলেন। ইন্দ্র আসিয়া বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অর্জ্জুনের বাণের চোটে বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেল। সেটা কি রকমে হয়, আমরা কলিকালের লোক তাহা বুঝিতে পারি না। পারিলে, অতিবৃষ্টিতে ফসল রক্ষার একটা উপায় করা যাইতে পারিত। যাই হোক—ইন্দ্র চটিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। সব দেবতা অস্ত্র লইয়া তাঁহার সহায় হইলেন। কিন্তু অর্জ্জুনকে আঁটিয়া উঠিবার যো নাই। ইন্দ্র পাহাড় ছুঁড়িয়া মারিলেন—অর্জ্জুন বাণের চোটে পাহাড় কাটিয়া ফেলিলেন। (বিদ্যাটা এখনকার দিনে জানা থাকিলে রেইল্‌ওয়ে টনেল্ করিবার বড় সুবিধা হইত।) শেষ ইন্দ্র বজ্রপ্রহারে উদ্যত—তখন দৈববাণী হইল যে, ইহারা নরনারায়ণ প্রাচীন ঋষি।*

* পাঠক দেখিয়াছেন, এক স্থানে কৃষ্ণ বিষ্ণুর কেশ; এখানে প্রাচীন ঋষি, আবার দেখিব তিনি বিষ্ণুর অবতার। এ কথার সামঞ্জস্যচেষ্টায় বা খণ্ডনে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণচরিত্রই আমাদের সমালোচ্য।

দৈববাণীটা বড় সুবিধা—কে বলিল তার ঠিকানা নাই—কিন্তু বলিবার কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়ে। দৈববাণী শুনিয়া দেবতারা প্রস্থান করিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন স্বচ্ছন্দে বন পোড়াইতে লাগিলেন। আগুনের ভয়ে পশু পক্ষী পলাইতেছিল, সকলকে তাঁহারা মারিয়া ফেলিলেন। তাহাদের মেদ মাংস খাইয়া অগ্নির মন্দাগ্নি ভাল হইল—বিষে বিষক্ষয় হইল—তিনি কৃষ্ণার্জ্জুনকে বর দিলেন। পরাভূত দেবতারা আসিয়াও বর দিলেন। সকল পক্ষ খুসী হইয়া ঘরে গেলেন।

এরূপ আষাঢ়ে গল্পের উপর বুনিয়াদ খাড়া করিয়া ঐতিহাসিক সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, কেবল হাস্যাস্পদ হইতে হয়—অন্য লাভ নাই। আর আমাদের যাহা সমালোচ্য—অর্থাৎ কৃষ্ণচরিত্র,—তাহার ভালমন্দ কোন কথাই ইহাতে নাই। যদি ইহার কোন ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য থাকে, তবে সেটুকু এই যে, পাণ্ডবদিগের রাজধানীর নিকটে একটা বড় বন ছিল, সেখানে অনেক হিংস্র পশু বাস করিত, কৃষ্ণার্জ্জুন তাহাতে আগুন লাগাইয়া, হিংস্র পশুদিগকে বিনষ্ট করিয়া জঙ্গল আবাদ করিবার যোগ্য করিয়াছিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন যদি তাই করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐতিহাসিক কীর্ত্তি বা অকীর্ত্তি কিছুই দেখি না। সুন্দরবনের আবাদকারীরা নিত্য তাহা করিয়া থাকে।

আমরা স্বীকার করি যে, এ ব্যাখ্যাটা নিতান্ত টাল্‌বয়স হুইলরি ধরণের হইল। কিন্তু আমরা যে এরূপ একটা তাৎপর্য্য সূচিত করিতে বাধ্য হইলাম, তাহার কারণ আছে। খাণ্ডবদাহটা অধিকাংশ তৃতীয় স্তরান্তর্গত হইতে পারে, কিন্তু স্থূল ঘটনার কোন সূচনা যে আদিম মহাভারতে নাই, এ কথা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে এবং অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ইহার প্রসঙ্গ আছে। এই খাণ্ডবদাহ হইতে সভাপর্ব্বের উৎপত্তি। এই বনমধ্যে ময়দানব বাস করিত। সেও পুড়িয়া মরিবার উপক্রম হইয়াছিল। সে অর্জ্জুনের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়াছিল; অর্জ্জুনও শরণাগতকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই উপকারের প্রত্যুপকার জন্য ময়দানব পাণ্ডবদিগের অত্যুৎকৃষ্ট সভা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। সেই সভা লইয়া সভাপর্ব্বের কথা।

এখন সভাপর্ব্ব অষ্টাদশ পর্ব্বের এক পর্ব্ব। মহাভারতের যুদ্ধের বীজ এইখানে। ইহা একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। যদি তা না যায়, তবে ইহার মধ্যে কতটুকু ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত থাকিতে পারে, তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত। সভা এবং তদুপলক্ষে রাজসূয় যজ্ঞকে মৌলিক এবং ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করার প্রতি কোনই আপত্তি দেখা যায় না। যদি সভা ঐতিহাসিক হইল, তবে তাহার নির্ম্মাতা এক জন অবশ্য থাকিবে। মনে কর, সেই কারিগর বা এঞ্জিনিয়রের নাম ময়। হয়ত সে অনার্য্যবংশীয়—এজন্য তাহাকে ময়দানব বলিত। এমন হইতে পারে যে, সে বিপন্ন হইয়া অর্জ্জুনের সাহায্যে জীবন লাভ করিয়াছিল, এবং কৃতজ্ঞতাবশতঃ এই এঞ্জিনিয়রী কাজটুকু করিয়া দিয়াছিল। যদি ইহা প্রকৃত হয়, তবে সে যে কিরূপে বিপন্ন হইয়া অর্জ্জুনকৃত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে কথা কেবল খাণ্ডবদাহেই পাওয়া যায়। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, এ সকলই কেবল অন্ধকারে ঢিল মারা। তবে অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক তত্ত্বই এইরূপ অন্ধকারেও ঢিল।

হয়ত, ময়দানবের কথাটা সমুদায়ই কবির সৃষ্টি। তা যাই হোক, এই উপলক্ষে কবি

যে ভাবে কৃষ্ণার্জ্জুনের চরিত্র সংস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা বড় মনোহর। তাহা না লিখিয়া থাকা যায় না। ময়দানব প্রাণ পাইয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, "আপনি আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছেন, অতএব আজ্ঞা করুন, আপনার কি প্রত্যুপকার করিব?" অর্জ্জুন কিছুই প্রত্যুপকার চাহিলেন না, কেবল প্রীতি ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু ময়দানব ছাড়ে না; কিছু কাজ না করিয়া যাইবে না। তখন অর্জ্জুন তাঁহাকে বলিলেন,—

"হে কৃতজ্ঞ! তুমি আসন্নমৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছ বলিয়া আমার প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা করিতেছ, এই নিমিত্ত তোমার দ্বারা কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া লইতে ইচ্ছা হয় না।"

ইহাই নিষ্কাম ধর্ম্ম; খ্রীষ্টান ইউরোপে ইহা নাই। বাইবেলে যে ধর্ম্ম অনুজ্ঞাত হইয়াছে, স্বর্গ বা ঈশ্বর-প্রীতি তাহার কাম্য। আমরা এ সকল পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য গ্রন্থ হইতে যে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা করিতে যাই, আমাদের বিবেচনায় সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। অর্জ্জুনবাক্যের অপরার্দ্ধে এই নিষ্কাম ধর্ম্ম আরও স্পষ্ট হইতেছে। ময় যদি কিছু কাজ করিতে পারিলে মনে সুখী হয়, তবে সে সুখ হইতে অর্জ্জুন তাহাকে বঞ্চিত করিতে অনিচ্ছুক। অতএব তিনি বলিতে লাগিলেন,—

"তোমার অভিলাষ যে ব্যর্থ হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। অতএব তুমি কৃষ্ণের কোন কর্ম্ম কর, তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার করা হইবে।"

অর্থাৎ, তোমার দ্বারা যদি কাজ লইতেই হয়, তবে সেও পরের কাজ। আপনার কাজ লওয়া হইবে না।

তখন ময় কৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন—কিছু কাজ করিতে আদেশ কর। ময় "দানবকুলের বিশ্বকর্ম্মা"—বা চীফ্ এঞ্জিনিয়র। কৃষ্ণও তাঁহাকে আপনার কাজ করিতে আদেশ করিলেন না। বলিলেন, "যুধিষ্ঠিরের একটি সভা নির্ম্মাণ কর। এমন সভা গড়িবে, মনুষ্যে যেন তাহার অনুকরণ করিতে না পারে।"

ইহা কৃষ্ণের নিজের কাজ নহে—অথচ নিজের কাজ বটে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কৃষ্ণ স্বজীবনে দুইটি কার্য্য উদ্দিষ্ট করিয়াছিলেন—ধর্ম্মপ্রচার এবং ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপন। ধর্ম্মপ্রচারের কথা এখনও বড় উঠে নাই। এই সভা নির্ম্মাণ ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপনের প্রথম সূত্র। এইখানেই তাঁহার এই অভিসন্ধির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের সভা নির্ম্মাণ হইতে যে সকল ঘটনাবলী হইল, শেষে তাহা ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপনে পরিণত হইল। ধর্ম্মরাজ্যসংস্থাপন, জগতের কাজ; কিন্তু যখন তাহা কৃষ্ণের উদ্দেশ্য, তখন এ সভাসংস্থাপন তাঁহার নিজের কাজ।

গত অধ্যায়ে সমাজসংস্করণের কথাটা উঠিয়াছিল। আমরা বলিয়াছি যে, তিনি সমাজসংস্থাপক বা Social Reformer হইবার প্রয়াস পান নাই। দেশের নৈতিক এবং রাজনৈতিক পুনর্জ্জীবন (Moral and Political Regeneration), ধর্ম্মপ্রচার এবং ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ইহা ঘটিলে সমাজসংস্কার আপনি ঘটিয়া উঠে—ইহা না ঘটিলে সমাজসংস্কার কোন মতেই ঘটিবে না। আদর্শ মনুষ্য তাহা জানিতেন,—জানিতেন, গাছের পাট না করিয়া কেবল একটা ডালে জল সেচিলে ফল ধরে না। আমরা তাহা জানি না—আমরা তাই সমাজসংস্করণকে একটা পৃথক্ জিনিষ

বলিয়া খাড়া করিয়া গণ্ডগোল উপস্থিত করি। আমাদের খ্যাতিপ্রিয়তাই ইহার এক কারণ। সমাজসংস্কারক হইয়া দাঁড়াইলে হঠাৎ খ্যাতিলাভ করা যায়—বিশেষ সংস্করণ-পদ্ধতিটা যদি ইংরেজি ধরণের হয়। আর যার কাজ নাই, হুজুক তার বড় ভাল লাগে। সমাজসংস্করণ আর কিছুই হউক না হউক, একটা হুজুক বটে। হুজুক বড় আমোদের জিনিষ। এই সম্প্রদায়ের লোকদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম্মের উন্নতি ব্যতীত সমাজসংস্কার কিসের জোরে হইবে। রাজনৈতিক উন্নতিরও মূল ধর্ম্মের উন্নতি। অতএব সকলে মিলিয়া ধর্ম্মের উন্নতিতে মন দাও। তাহা হইলে আর সমাজসংস্করণের পৃথক্ চেষ্টা করিতে হইবে না। তাহা না করিলে, কিছুতেই সমাজসংস্কার হইবে না। তাই আদর্শ মনুষ্য মালাবারি হইবার চেষ্টা করেন নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণের মানবিকতা

কৃষ্ণচরিত্রের এই সমালোচনায় আমি কৃষ্ণের কেবল মানুষী প্রকৃতিরই সমালোচনা করিতেছি। তিনি ঈশ্বর কি না, তাহা আমি কিছু বলিতেছি না। সে কথার সঙ্গে পাঠকের কোন সম্বন্ধ নাই। কেন না, আমার যদি সেই মত হয়, তবু আমি পাঠককে সে মত গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। গ্রহণ করা না করা, পাঠকের নিজের বুদ্ধি ও চিত্তের উপর নির্ভর করে, অনুরোধ চলে না। স্বর্গ জেলখানা নহে—তাহার যে একটি বৈ ফটক নাই, এ কথা আমি মনে করি না। ধর্ম্ম এক বস্তু বটে, কিন্তু তাহার নিকটে পৌঁছিবার অনেক পথ আছে—কৃষ্ণভক্ত এবং খ্রীষ্টীয়ান উভয়েই সেখানে পৌঁছিতে পারে।* অতএব কেহ কৃষ্ণধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে, আমি তাঁহাকে পতিত মনে করিব না, এবং ভরসা করি যে, কৃষ্ণদ্বেষী বা প্রাচীন বৈষ্ণবের দল আমাকে নিরয়গামী বলিয়া ভাবিবেন না।

আমাদের এখন বলিবার কথা এই, আমরা তাঁহার মানুষী প্রকৃতির মাত্র সমালোচন করিতেছি। আমরা তাঁহাকে আদর্শ মনুষ্য বলিয়াছি। ইহাতে তাঁহার মনুষ্যাতীত কোন প্রকৃতি থাকিলেও তাহার বিকাশ মাত্র প্রতিষিদ্ধ হইল। বলিয়াছি এমন হইতে পারে যে, ঈশ্বর লোকশিক্ষার্থ আদর্শ মনুষ্য স্বরূপ লোকালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। যদি তাই হয়, তবে তিনি কেবল মানুষিক শক্তিতে, জগতে কেবল মানুষিক কার্য্য করিবেন। তিনি কখনও কোন লোকাতীত শক্তির দ্বারা কোন লৌকিক বা অলৌকিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন না। কেন না, মনুষ্যের কোন অলৌকিক শক্তি নাই। যিনি তাহার আশ্রয় করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিলেন, তিনি আর মনুষ্যের আদর্শ হইতে পারিলেন না। যে শক্তি মনুষ্যের নাই, তাহার অনুকরণ মনুষ্য করিবে কি প্রকারে?†

* "ধর্ম্মের অসংখ্য দ্বার। যে কোন প্রকারে হউক ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে উহা কদাপি নিষ্ফল হয় না।" মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৭৪ অ।

† "We forget that Christ incarnate was such as we are, and some of us are putting him where he can be no example to us at all. Let no fear of losing the dear great truth of the divinity of Jesus make

অতএব, শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার হইলেও তাঁহার কোন অলৌকিক শক্তির বিকাশ বা অমানুষী কার্য্যসিদ্ধি সম্ভবে না। মহাভারতের যে সকল অংশে কৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির আরোপ আছে, তাহা অমূলক এবং প্রক্ষিপ্ত কি না, সে কথার বিচার আমরা যথাস্থানে করিব। এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, কৃষ্ণ কোথাও আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় দেন না।* কোথাও এমন প্রকাশ করেন নাই যে, তাঁহার কোন প্রকার অমানুষিক শক্তি আছে। কেহ তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিলে, তখন তিনি সে কথার অনুমোদন করেন নাই, বা এমন কোন আচরণ করেন নাই, যাহাতে তাহাদের সেই বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইতে পারে। বরং এক স্থানে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু দৈবের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।"†

তিনি যত্নপূর্ব্বক মনুষ্যোচিত আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান করেন। যাহার মনে থাকে যে, আমি একটা দেবতা বলিয়া পরিচিত হইব, সে একটু মনুষ্যোচিত আচারের উপর চড়ে, কৃষ্ণে সে ভাব কোথাও লক্ষিত হয় না। এই সকল কথায় উদাহরণস্বরূপ তিনি খাণ্ডবদাহের পর যুধিষ্ঠিরাদির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, যখন দ্বারকা যাত্রা করেন, তখন তিনি যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি। উহা অত্যন্ত মানুষিক।

"বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভগবান্ বাসুদেব পরম প্রীত পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক অভিপূজিত হইয়া কিয়দ্দিন খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিলেন। পরিশেষে পিতৃদর্শনে সাতিশয় উৎসুক হইয়া স্বভবনে গমন করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইলেন। তিনি প্রথমতঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে

you lose the dear great truth of the humanity of Jesus. He took upon himself our nature ; as a man of the like passions, he fought that terrible fight in the wilderness ; year by year, as an innocent man, was he persecuted by narrow-hearted Jews ; and his was a humanity whose virtue was pressed by all the needs of the multitude and yet kept its richness of nature ; a humanity which, though given up to death on the cross, expressed all that is within the capacity of our own humanity ; and if we really follow him we shall be holy even as he is holy." Sermon by Dr. Brookly. delivered at Trinity Church, Boston, March 29th, 1885.

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমি ঠিক এই কথা বলি।

* যে দুই এক স্থানে এরূপ কথা আছে, সে সকল অংশ যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাও যথাস্থানে আমরা প্রমাণীকৃত করিব।

† অহং হি তৎ করিষ্যামি পরং পুরুষকারতঃ।
দৈবং তু ন ময়া শক্যং কর্ম্ম কর্ত্তুং কথঞ্চন॥
উদ্যোগপর্ব্ব, ৭৮ অধ্যায়।

আমন্ত্রণ করিয়া পশ্চাৎ স্বীয় পিতৃষ্বসা কুন্তী দেবীর চরণবন্দন করিলেন। তখন বাসুদেব, সাক্ষাৎকরণমানসে স্বীয় ভগিনী সুভদ্রার সমীপে উপস্থিত হইয়া, অর্থযুক্ত যথার্থ হিতকর অল্পাক্ষর ও অখণ্ডনীয় বাক্যে তাঁহাকে নানাপ্রকার বুঝাইলেন। ভদ্রভাষিণী ভদ্রাও তাঁহাকে জননী প্রভৃতি স্বজনসমীপে বিজ্ঞাপনীয় বাক্য সমুদায় কহিয়া দিয়া বারংবার পূজা ও অভিবাদন করিলেন। বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া দ্রৌপদী ও ধৌম্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ধৌম্যকে যথাবিধি বন্দন ও দ্রৌপদীকে সম্ভাষণ ও আমন্ত্রণ করিয়া অর্জ্জুনসমভিব্যাহারে তথা হইতে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তথায় ভগবান্ বাসুদেব পঞ্চপাণ্ডবকর্তৃক বেষ্টিত হইয়া অমরগণ-পরিবৃত মহেন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

"তৎপরে কৃষ্ণ যাত্রাকালোচিত কার্য্য করিবার মানসে স্নানান্তে অলঙ্কার পরিধান করিয়া মাল্য জপ, নমস্কার ও নানাবিধ গন্ধদ্রব্য দ্বারা দেব ও দ্বিজগণের পূজা সমাধা করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে তৎকালোচিত সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া স্বপুর গমনোদ্যোগে বহিঃকক্ষায় বিনির্গত হইলেন। স্বস্তিবাচক ব্রাহ্মণগণ দধিপাত্র ফলপুষ্প ও অক্ষত প্রভৃতি মাঙ্গল্য বস্তু হস্তে করিয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন। বাসুদেব তাঁহাদিগকে ধনদানপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে অত্যুৎকৃষ্ট তিথিনক্ষত্রযুক্ত মুহূর্ত্তে গদা চক্র অসি শার্ঙ্গ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রপরিবৃত গরুড়কেতন বায়ুবেগগামী কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া স্বপুরে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির স্নেহপরতন্ত্র হইয়া সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক দারুক সারথিকে তৎস্থান হইতে স্থানান্তরে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং সারথি হইয়া বল্গা গ্রহণ করিলেন। মহাবাহু অর্জ্জুনও তাহাতে আরোহণ করিয়া স্বর্ণদণ্ডবিরাজিত শ্বেত চামর গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে বীজন করতঃ প্রদক্ষিণ করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন নকুল এবং সহদেব, ঋত্বিক্ ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। শত্রুবলান্তক বাসুদেব যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ কর্তৃক অনুগম্যমান হইয়া শিষ্যগণানুগত গুরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে আমন্ত্রণ ও গাঢ় আলিঙ্গন, যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে পূজা এবং নকুল ও সহদেবকে সম্ভাষণ করিলেন। যুধিষ্ঠির ভীমসেন ও অর্জ্জুন তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং নকুল ও সহদেব তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে অর্দ্ধ যোজন গমন করিয়া শত্রুনিসূদন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করতঃ প্রতিনিবৃত্ত হউন বলিয়া তাঁহার পাদদ্বয় গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চরণপতিত পতিতপাবন কমললোচন কৃষ্ণকে উত্থাপিত করিয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক স্বভবনে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। তখন ভগবান্ বাসুদেব পাণ্ডবগণের সহিত যথাবিধি প্রতিজ্ঞা করতঃ অতি কষ্টে তাঁহা-দিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া অমরাবতীপ্রস্থিত মহেন্দ্রের ন্যায় দ্বারাবতী প্রতিগমন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ যতক্ষণ কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ তাঁহারা নিমেষশূন্য নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ ও মনে মনে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহাদিগের মন পরিতৃপ্ত না হইতে হইতেই তিনি তাঁহাদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ কৃষ্ণদর্শনে নিতান্ত নিরাশ হইয়া তদ্বিষয়িণী চিন্তা করিতে করিতে স্বপুরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। দেবকীনন্দন কৃষ্ণও অনুগামী মহাবীর

সাত্বত এবং দারুক সারথির সহিত বেগবান্ গরুড়ের ন্যায় সত্বরে দ্বারকাপুরে সমুপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সুহৃজ্জনপরিবৃত হইয়া স্বপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং ভ্রাতা পুত্র ও বন্ধুদিগকে বিদায় দিয়া দ্রৌপদীর সহিত আমোদ প্রমোদে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে কৃষ্ণও পরম আহ্লাদিতচিত্তে দ্বারকাপুরে প্রবেশ করিলেন। উগ্রসেন প্রভৃতি যদুশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। বাসুদেব পুরপ্রবেশ করিয়া অগ্রে বৃদ্ধ পিতা, আহুক ও যশস্বিনী মাতাকে, পরে বলভদ্রকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর তিনি প্রদ্যুম্ন শাম্ব নিশঠ চারুদেষ্ণ গদ অনিরুদ্ধ ও ভানুকে আলিঙ্গন করিয়া বৃদ্ধগণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক রুক্মিণীর ভবনে উপস্থিত হইলেন।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—জরাসন্ধবধের পরামর্শ

এ দিকে সভানির্ম্মাণ হইল। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ করিবার প্রস্তাব হইল। সকলেই সে বিষয়ে মত করিল, কিন্তু যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের মত ব্যতীত তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে অনিচ্ছুক—কেন না, কৃষ্ণই নীতিজ্ঞ। অতএব তিনি কৃষ্ণকে আনিতে পাঠাইলেন। কৃষ্ণও সংবাদপ্রাপ্তিমাত্র খাণ্ডবপ্রস্থে উপস্থিত হইলেন।

রাজসূয়ের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলিতেছেন :—

"আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছি। ঐ যজ্ঞ কেবল ইচ্ছা করিলেই সম্পন্ন হয় এমত নহে। যে রূপে উহা সম্পন্ন হয়, তাহা তোমার সুবিদিত আছে। দেখ, যে ব্যক্তিতে সকলই সম্ভব, যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র পূজ্য, এবং যিনি সমুদায় পৃথিবীর ঈশ্বর, সেই ব্যক্তিই রাজসূয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র।"

কৃষ্ণকে যুধিষ্ঠিরের এই কথাই জিজ্ঞাস্য। তাঁহার জিজ্ঞাস্য এই যে—"আমি কি সেইরূপ ব্যক্তি? আমাতে কি সকলই সম্ভব? আমি কি সর্ব্বত্র পূজ্য, এবং সমুদয় পৃথিবীর ঈশ্বর?" যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের ভুজবলে এক জন বড় রাজা হইয়া উঠিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি এমন একটা লোক হইয়াছেন কি যে রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করেন? আমি কত বড় লোক, তাহার ঠিক মাপ কেহই আপনা আপনি পায় না। দাম্ভিক ও দুরাত্মগণ খুব বড় মাপকাঠিতে আপনাকে মাপিয়া আপনার মহত্ত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে বসিয়া থাকে, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সাবধান ও বিনয়সম্পন্ন ব্যক্তির তাহা সম্ভব নহে। তিনি মনে মনে বুঝিতেন বটে যে, আমি খুব বড় রাজা হইয়াছি, কিন্তু আপনার কৃত আত্মমানে তাঁহার বড় বিশ্বাস হইতেছে না। তিনি আপনার মন্ত্রিগণ ও ভীমার্জ্জুনাদি অনুজগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"কেমন, আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারি কি?" তাঁহারা বলিয়াছেন—"হাঁ, অবশ্য পার। তুমি তার যোগ্য পাত্র।" ধৌম্য দ্বৈপায়নাদি ঋষিগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কেমন, আমি কি রাজসূয় পারি?" তাঁহারাও বলিয়াছিলেন, "পার। তুমি রাজসূয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র।" তথাপি সাবধান* যুধিষ্ঠিরের মন নিশ্চিন্ত হইল না। অর্জ্জুন হউন, ব্যাস

* পাণ্ডব পাঁচ জনের চরিত্র বুদ্ধিমান্ সমালোচকে সমালোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, যুধিষ্ঠিরের প্রধান গুণ, তাঁহার সাবধানতা। ভীম দুঃসাহসী, "গোঁয়ার", অর্জ্জুন আপনার বাহুবলের

হউন,—যুধিষ্ঠিরের নিকট পরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহার কাছে এ কথার উত্তর না শুনিলে, যুধিষ্ঠিরের সন্দেহ যায় না। তাই "মহাবাহু সর্ব্বলোকোত্তম" কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিতে স্থির করিলেন। ভাবিলেন, "কৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকৃৎ, তিনি অবশ্যই আমাকে সৎপরামর্শ দিবেন।" তাই তিনি কৃষ্ণকে আনিতে লোক পাঠাইয়াছিলেন, এবং কৃষ্ণ আসিলে তাই, তাঁহাকে পূর্ব্বোদ্ধৃত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। কেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহাও কৃষ্ণকে খুলিয়া বলিতেছেন।

"আমার অন্যান্য সুহৃদগণ আমাকে ঐ যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু আমি তোমার পরামর্শ না লইয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে নিশ্চয় করি নাই। হে কৃষ্ণ! কোন কোন ব্যক্তি বন্ধুতার নিমিত্ত দোষোদ্ঘোষণ করেন না। কেহ কেহ স্বার্থপর হইয়া প্রিয়বাক্য কহেন। কেহ বা যাহাতে আপনার হিত হয়, তাহাই প্রিয় বলিয়া বোধ করেন। হে মহাত্মন্! এই পৃথিবী মধ্যে উক্ত প্রকার লোকই অধিক, সুতরাং তাহাদের পরামর্শ লইয়া কোন কার্য্য করা যায় না। তুমি উক্ত দোষরহিত ও কাম-ক্রোধ-বিবর্জ্জিত; অতএব আমাকে যথার্থ পরামর্শ প্রদান কর।"

পাঠক দেখুন, কৃষ্ণের আত্মীয়গণ যাঁহারা প্রত্যহ তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিতেন, তাঁহারা কৃষ্ণকে কি ভাবিতেন।* আর এখন আমরা তাঁহাকে কি ভাবি। তাঁহারা জানিতেন, কৃষ্ণ কাম-ক্রোধ-বিবর্জ্জিত, সর্ব্বাপেক্ষা সত্যবাদী, সর্ব্বদোষরহিত, সর্ব্বলোকোত্তম, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকৃৎ,—আমরা জানি, তিনি লম্পট, ননীমাখনচোর, কুচক্রী, মিথ্যাবাদী, রিপুবশীভূত, এবং অন্যান্য দোষযুক্ত। যিনি ধর্ম্মের চরমাদর্শ বলিয়া প্রাচীন গ্রন্থে পরিচিত, তাঁহাকে যে জাতি এ পদে অবনত করিয়াছে, সে জাতির মধ্যে যে ধর্ম্মলোপ হইবে, বিচিত্র কি?

যুধিষ্ঠির যাহা ভাবিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিল; যে অপ্রিয় সত্যবাক্য আর কেহই যুধিষ্ঠিরকে বলে নাই, কৃষ্ণ তাহা বলিলেন। মিষ্ট কথার আবরণ দিয়া যুধিষ্ঠিরকে তিনি বলিলেন, "তুমি রাজসূয়ের অধিকারী নও, কেন না সম্রাট্‌ ভিন্ন রাজসূয়ের অধিকার হয় না, তুমি সম্রাট্‌ নও। মগধাধিপতি জরাসন্ধ এখন সম্রাট্‌। তাহাকে জয় না করিলে তুমি রাজসূয়ের অধিকারী হইতে পার না ও সম্পন্ন করিতে পারিবে না।"

যাঁহারা কৃষ্ণকে স্বার্থপর ও কুচক্রী ভাবেন, তাঁহারা এই কথা শুনিয়া বলিবেন, "এ কৃষ্ণের মতই কথাটা হইল বটে। জরাসন্ধ কৃষ্ণের পূর্ব্বশত্রু, কৃষ্ণ নিজে তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই; এখন সুযোগ পাইয়া বলবান্ পাণ্ডবদিগের দ্বারা তাহার বধ-সাধন করিয়া আপনার ইষ্টসিদ্ধির চেষ্টায় এ পরামর্শটা দিলেন।"

গৌরব জানিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত, যুধিষ্ঠির সাবধান। এ জগতে সাবধানতাই অনেক স্থানে ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত হয়। কথাটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, বড় গুরুতর কথা বলিয়াই এখানে ইহার উত্থাপন করিলাম। এই সাবধানতার সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের দ্যূতানুরাগ কতটুকু সঙ্গত, তাহা দেখাইবার এ স্থান নহে।

* যুধিষ্ঠিরের মুখ হইতে বাস্তবিক এই কথাগুলি বাহির হইয়াছিল, আর তাহাই কেহ লিখিয়া রাখিয়াছে, এমত নহে। মৌলিক মহাভারতে তাঁহার কিরূপ চরিত্র প্রচারিত হইয়াছিল, ইহাই আমাদের আলোচ্য।

কিন্তু আরও একটু কথা বাকি আছে। জরাসন্ধ সম্রাট্, কিন্তু তৈমুরলঙ্গ্ বা প্রথম নেপোলিয়নের ন্যায় অত্যাচারকারী সম্রাট্। পৃথিবী তাহার অত্যাচারে প্রপীড়িত। জরাসন্ধ রাজসূয়যজ্ঞার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া, "বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়া সিংহ যেমন পর্ব্বতকন্দর-মধ্যে করিগণকে বদ্ধ রাখে, সেইরূপ তাঁহাদিগকে গিরিদুর্গে বদ্ধ রাখিয়াছে।" রাজগণকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখার আর এক ভয়ানক তাৎপর্য্য ছিল। জরাসন্ধের অভিপ্রায়, সেই সমানীত রাজগণকে যজ্ঞকালে সে মহাদেবের নিকট বলি দিবে। পূর্ব্বে যে যজ্ঞকালে কেহ কখনও নরবলি দিত, তাহা ইতিহাসজ্ঞ পাঠককে বলিতে হইবে না।* কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,

"হে ভরতকুলপ্রদীপ! বলিপ্রদানার্থ সমানীত ভূপতিগণ প্রোক্ষিত ও প্রমৃষ্ট হইয়া পশুদিগের ন্যায় পশুপতির গৃহে বাস করত অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন। দুরাত্মা জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে অচিরাৎ ছেদন করিবে, এই নিমিত্ত আমি তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেছি। ঐ দুরাত্মা ষড়শীতি জন ভূপতিকে আনয়ন করিয়াছে, কেবল চতুর্দ্দশ জনের অপ্রতুল আছে; চতুর্দ্দশ জন আনীত হইলেই ঐ নৃপাধম উহাদের সকলকে এককালে সংহার করিবে। হে ধর্ম্মাত্মন্! এক্ষণে যে ব্যক্তি দুরাত্মা জরাসন্ধের ঐ ক্রুর কর্ম্মে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবেন, তাঁহার যশোরাশি ভূমণ্ডলে দেদীপ্যমান হইবে, এবং যিনি উহাকে জয় করিতে পারিবেন, তিনি নিশ্চয় সাম্রাজ্য লাভ করিবেন।"

অতএব জরাসন্ধবধের জন্য যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণ যে পরামর্শ দিলেন, তাহার উদ্দেশ্য, কৃষ্ণের নিজের হিত নহে;—যুধিষ্ঠিরেরও যদিও তাহাতে ইষ্টসিদ্ধি আছে, তথাপি তাহাও প্রধানতঃ ঐ পরামর্শের উদ্দেশ্য নহে; উহার উদ্দেশ্য কারারুদ্ধ রাজমণ্ডলীর হিত—জরাসন্ধের অত্যাচারপ্রপীড়িত ভারতবর্ষের হিত—সাধারণ লোকের হিত। কৃষ্ণ নিজে তখন রৈবতকের দুর্গের আশ্রয়ে, জরাসন্ধের বাহুর অতীত এবং অজেয়; জরাসন্ধের বধে তাঁহার নিজের ইষ্টানিষ্ট কিছুই ছিল না। আর থাকিলেও, যাহাতে লোকহিত সাধিত হয়, সেই পরামর্শ দিতে তিনি ধর্ম্মতঃ বাধ্য—সে পরামর্শে নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধি থাকিলেও সেই পরামর্শ দিতে বাধ্য। এই কার্য্যে লোকের হিত সাধিত হইবে বটে, কিন্তু ইহাতে আমারও কিছু স্বার্থসিদ্ধি আছে,—এমন পরামর্শ দিলে লোকে আমাকে স্বার্থপর মনে করিবে—অতএব আমি এমন পরামর্শ দিব না;—যিনি এইরূপ ভাবেন, তিনিই যথার্থ স্বার্থপর এবং অধার্ম্মিক, কেন না তিনি আপনার মর্য্যাদাই ভাবিলেন, লোকের হিত ভাবিলেন না। যিনি সে কলঙ্ক সাদরে মস্তকে বহন করিয়া লোকের হিত-সাধন করেন, তিনিই আদর্শ ধার্ম্মিক। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বত্রই আদর্শ ধার্ম্মিক।

যুধিষ্ঠির সাবধান ব্যক্তি, সহজে জরাসন্ধের সঙ্গে বিবাদে রাজি হইলেন না। কিন্তু ভীমের দৃপ্ত তেজস্বী ও অর্জ্জুনের তেজোগর্ভ বাক্যে, ও কৃষ্ণের পরামর্শে তাহাতে শেষে সম্মত হইলেন। ভীমার্জ্জুন ও কৃষ্ণ এই তিন জন জরাসন্ধ-জয়ে যাত্রা করিলেন। যাহার অগণিত সেনার ভয়ে প্রবল পরাক্রান্ত বৃষ্ণিবংশ রৈবতকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন,

---

* কেহ কদাচিৎ দিত—সামাজিক প্রথা ছিল না। কৃষ্ণ এক স্থানে বলিতেছেন, "আমরা কখন নরবলি দেখি নাই।" ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা এ ভয়ানক প্রথার দিক্ দিয়া যাইতেন না।

তিন জন মাত্র জয় করিতে যাত্রা করিলেন, এ কিরূপ পরামর্শ ? এ পরামর্শ কৃষ্ণের, এবং এ পরামর্শ কৃষ্ণের আদর্শচরিত্রানুযায়ী। জরাসন্ধ দুরাত্মা, এজন্য সে দণ্ডনীয়, কিন্তু তাহার সৈনিকেরা কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহার সৈনিকদিগকে বধের জন্য সৈন্য লইয়া যাইতে হইবে? এরূপ সসৈন্য যুদ্ধে কেবল নিরপরাধীদিগের হত্যা, আর হয়ত অপরাধীরও নিষ্কৃতি; কেন না জরাসন্ধের সৈন্যবল বেশী, পাণ্ডবসৈন্য তাহার সমকক্ষ না হইতে পারে। কিন্তু তখনকার ক্ষত্রিয়গণের এই ধর্ম্ম ছিল যে, দ্বৈরথ্য যুদ্ধে আহূত হইলে কেহই বিমুখ হইতেন না।* অতএব কৃষ্ণের অভিসন্ধি এই যে, অনর্থক লোকক্ষয় না করিয়া, তাঁহারা তিন জন মাত্র জরাসন্ধের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে দ্বৈরথ্য যুদ্ধে আহূত করিবেন—তিন জনের মধ্যে এক জনের সঙ্গে যুদ্ধে সে অবশ্য স্বীকৃত হইবে। তখন যাহার শারীরিক বল, সাহস ও শিক্ষা বেশী, সেই জিতিবে। এ বিষয়ে চারি জনেই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু যুদ্ধসম্বন্ধে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তাঁহারা স্নাতক ব্রাহ্মণবেশে গমন করিলেন। এ ছদ্মবেশ কেন, তাহা বুঝা যায় না। এমন নহে যে গোপনে জরাসন্ধকে ধরিয়া বধ করিবার তাঁহাদের সঙ্কল্প ছিল। তাঁহারা শত্রুভাবে, দ্বারস্থ ভেরী সকল ভগ্ন করিয়া প্রাকার চৈত্য চূর্ণ করিয়া জরাসন্ধসভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। অতএব গোপন উদ্দেশ্য নহে। ছদ্মবেশ কৃষ্ণার্জ্জুনের অযোগ্য। ইহার পর আরও একটি কাণ্ড, তাহাও শোচনীয় ও কৃষ্ণার্জ্জুনের অযোগ্য বলিয়াই বোধ হয়। জরাসন্ধের সমীপবর্ত্তী হইলে ভীমার্জ্জুন "নিয়মস্থ" হইলেন। নিয়মস্থ হইলে কথা কহিতে নাই। তাঁহারা কোন কথাই কহিলেন না। সুতরাং জরাসন্ধের সঙ্গে কথা কহিবার ভার কৃষ্ণের উপর পড়িল। কৃষ্ণ বলিলেন, "ইঁহারা নিয়মস্থ, এক্ষণে কথা কহিবেন না; পূর্ব্বরাত্র অতীত হইলে আপনার সহিত আলাপ করিবেন।" জরাসন্ধ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাদিগকে যজ্ঞালয়ে রাখিয়া স্বীয় গৃহে গমন করিলেন, এবং অর্দ্ধরাত্র সময়ে পুনরায় তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

ইহাও একটা কল কৌশল। কল কৌশলটা বড় বিশুদ্ধ রকমের নয়—চাতুরী বটে। ধর্ম্মাত্মার ইহা যোগ্য নহে। এ কল কৌশল ফিকির ফন্দীর উদ্দেশ্যটা কি? যে কৃষ্ণার্জ্জুনকে এত দিন আমরা ধর্ম্মের আদর্শের মত দেখিয়া আসিতেছি, হঠাৎ তাঁহাদের এ অবনতি কেন? এ চাতুরীর কোন যদি উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলেও বুঝিতে পারি যে, হাঁ, অভীষ্টসিদ্ধির জন্য, ইঁহারা এই খেলা খেলিতেছেন, কল কৌশল করিয়া শত্রুনিপাত করিবেন বলিয়াই এ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে ইহাও বলিতে বাধ্য হইব যে, ইঁহারা ধর্ম্মাত্মা নহেন, এবং কৃষ্ণচরিত্র আমরা যেরূপ বিশুদ্ধ মনে করিয়াছিলাম, সেরূপ নহে।

যাঁহারা জরাসন্ধ-বধ-বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত পাঠ করেন নাই, তাঁহারা মনে করিতে পারেন, কেন, এরূপ চাতুরীর উদ্দেশ্য ত পড়িয়াই রহিয়াছে। নিশীথকালে, যখন জরাসন্ধকে নিঃসহায় অবস্থায় পাইবেন, তখন, তাহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বধ করাই এ চতুরীর উদ্দেশ্য। তাই ইঁহারা যাহাতে নিশীথকালে তাহার সাক্ষাৎলাভ হয়, এমন

* কালযবন ক্ষত্রিয় ছিল না।

একটা কৌশল করিলেন। বাস্তবিক, এরূপ কোন উদ্দেশ্য তাঁহাদের ছিল না, এবং এরূপ কোন কার্য্য তাঁহারা করেন নাই। নিশীথকালে তাঁহারা জরাসন্ধের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখন জরাসন্ধকে আক্রমণ করেন নাই—আক্রমণ করিবার কোন চেষ্টাও করেন নাই। নিশীথকালে যুদ্ধ করেন নাই—দিনমানে যুদ্ধ হইয়াছিল। গোপনে যুদ্ধ করেন নাই—প্রকাশ্যে সমস্ত পৌরবর্গ ও মগধবাসীদিগের সমক্ষে যুদ্ধ হইয়াছিল। এমন এক দিন যুদ্ধ হয় নাই, চৌদ্দ দিন এমন যুদ্ধ হইয়াছিল। তিন জনে যুদ্ধ করেন নাই, এক জনে করিয়াছিলেন। হঠাৎ আক্রমণ করেন নাই—জরাসন্ধকে তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে বিশেষ অবকাশ দিয়াছিলেন—এমন কি, পাছে যুদ্ধে আমি মারা পড়ি, এই ভাবিয়া যুদ্ধের পূর্ব্বে জরাসন্ধ আপনার পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করিলেন, তত দূর পর্য্যন্ত অবকাশ দিয়াছিলেন। নিরস্ত্র হইয়া জরাসন্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। লুকাচুরি কিছুই করেন নাই, জরাসন্ধ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র কৃষ্ণ আপনাদিগের যথার্থ পরিচয় দিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে জরাসন্ধের পুরোহিত যুদ্ধজাত অঙ্গের বেদনা উপশমের উপযোগী ঔষধ সকল লইয়া নিকটে রহিলেন, কৃষ্ণের পক্ষে সেরূপ কোন সাহায্য ছিল না, তথাপি "অন্যায় যুদ্ধ" বলিয়া তাঁহারা কোন আপত্তি করেন নাই। যুদ্ধকালে জরাসন্ধ ভীমকর্তৃক অতিশয় পীড্যমান হইলে, দয়াময় কৃষ্ণ ভীমকে তত পীড়ন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। যাঁহাদের এইরূপ চরিত্র, এই কার্য্যে তাঁহারা কেন চাতুরী করিলেন? এ উদ্দেশ্যশূন্য চাতুরী কি সম্ভব? অতি নির্ব্বোধে, যে শঠতার কোন উদ্দেশ্য নাই, তাহা করিলে করিতে পারে; কিন্তু কৃষ্ণার্জ্জুন, আর যাহাই হউন, নির্ব্বোধ নহেন, ইহা শত্রুপক্ষও স্বীকার করেন। তবে এ চাতুরীর কথা কোথা হইতে আসিল? যাহার সঙ্গে এই সমস্ত জরাসন্ধ-পর্ব্বাধ্যায়ের অনৈক্য, সে কথা ইহার ভিতরে কোথা হইতে আসিল। ইহা কি কেহ বসাইয়া দিয়াছে? এই কথাগুলি কি প্রক্ষিপ্ত? এই বৈ এ কথার আর কোন উত্তর নাই। কিন্তু সে কথাটা আর একটু ভাল করিয়া বিচার করিয়া দেখা উচিত।

আমরা দেখিয়াছি যে, মহাভারতে কোন স্থানে কোন একটি অধ্যায়, কোন স্থানে কোন একটি পর্ব্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত। যদি একটি অধ্যায়, কি একটি পর্ব্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে, তবে একটি অধ্যায় কি একটি পর্ব্বাধ্যায়ের অংশবিশেষ বা কতক শ্লোক তাহাতে প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না কি? বিচিত্র কিছুই নহে। বরং প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকলেই এইরূপ ভূরি ভূরি হইয়াছে, ইহাই প্রসিদ্ধ কথা। এই জন্যই বেদাদির এত ভিন্ন ভিন্ন শাখা, রামায়ণাদি গ্রন্থের এত ভিন্ন ভিন্ন পাঠ, এমন কি শকুন্তলা মেঘদূত প্রভৃতি আধুনিক (অপেক্ষাকৃত আধুনিক) গ্রন্থেরও এত বিবিধ পাঠ। সকল গ্রন্থেরই মৌলিক অংশের ভিতর এইরূপ এক একটা বা দুই চারিটা প্রক্ষিপ্ত শ্লোক মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়—মহাভারতের মৌলিক অংশের ভিতর তাহা পাওয়া যাইবে, তাহার বিচিত্র কি?

কিন্তু যে শ্লোকটা আমার মতের বিরোধী সেইটাই যে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আমি বাদ দিব, তাহা হইতে পারে না। কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত—কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহার নিদর্শন দেখিয়া পরীক্ষা করা চাই। যেটাকে আমি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিব,

আমাকে অবশ্য দেখাইয়া দিতে হইবে যে, প্রক্ষিপ্তের চিহ্ন উহাতে আছে, চিহ্ন দেখিয়া আমি উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিতেছি।

অতি প্রাচীন কালে যাহা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা ধরিবার উপায়, আভ্যন্তরিক প্রমাণ ভিন্ন আর কিছুই নাই। আভ্যন্তরিক প্রমাণের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ—অসঙ্গতি, অনৈক্য। যদি দেখি যে কোন পুঁথিতে এমন কোন কথা আছে যে, সে কথা গ্রন্থের আর সকল অংশের বিরোধী, তখন স্থির করিতে হইবে যে, হয় উহা গ্রন্থকারের বা লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদবশতঃ ঘটিয়াছে, নয় উহা প্রক্ষিপ্ত। কোন্‌টি ভ্রমপ্রমাদ, আর কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত, তাহাও সহজে নিরূপণ করা যায়। যদি রামায়ণের কোন কাপিতে দেখি যে, লেখা আছে যে, রাম ঊর্ম্মিলাকে বিবাহ করিলেন, তখনই সিদ্ধান্ত করিব যে, এটা লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদ মাত্র। কিন্তু যদি দেখি যে এমন লেখা আছে যে, রাম ঊর্ম্মিলাকে বিবাহ করায় লক্ষ্মণের সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হইল, তার পর রাম, লক্ষ্মণকে ঊর্ম্মিলা ছাড়িয়া দিয়া মিটমাট্ করিলেন, তখন আর বলিতে পারিব না যে এ লিপিকার বা গ্রন্থকারের ভ্রমপ্রমাদ—তখন বলিতে হইবে যে এটুকু কোন ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ রসে রসিকের রচনা, ঐ পুঁথিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এখন, আমি দেখাইয়াছি যে জরাসন্ধবধ-পর্ব্বাধ্যায়ের যে কয়টা কথা আমাদের এখন বিচার্য্য, তাহা ঐ পর্ব্বাধ্যায়ের আর সকল অংশের সম্পূর্ণ বিরোধী। আর ইহাও স্পষ্ট যে, ঐ কথাগুলি এমন কথা নহে যে, তাহা লিপিকারের বা গ্রন্থকারের ভ্রমপ্রমাদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা যায়। সুতরাং ঐ কথাগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিবার আমাদের অধিকার আছে।

ইহাতেও পাঠক বলিতে পারেন যে, যে এই কথাগুলি প্রক্ষিপ্ত করিল, সেই বা এমন অসংলগ্ন কথা প্রক্ষিপ্ত করিল কেন? তাহারই বা উদ্দেশ্য কি? এ কথাটার মীমাংসা আছে। আমি পুনঃপুনঃ বুঝাইয়াছি যে, মহাভারতের তিন স্তর দেখা যায়। তৃতীয় স্তর নানা ব্যক্তির গঠিত। কিন্তু আদিম স্তর, এক হাতের এবং দ্বিতীয় স্তরও এক হাতের। এই দুই জনেই শ্রেষ্ঠ কবি, কিন্তু তাঁহাদের রচনাপ্রণালী স্পষ্টতঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির, দেখিলেই চেনা যায়। যিনি দ্বিতীয় স্তরের প্রণেতা তাঁহার রচনার কতকগুলি লক্ষণ আছে, যুদ্ধপর্ব্বগুলিতে তাঁহার বিশেষ হাত আছে—ঐ পর্ব্বগুলির অধিকাংশই তাঁহার প্রণীত, সেই সকল সমালোচন কালে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এই কবির রচনার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইনি কৃষ্ণকে চতুরচূড়ামণি সাজাইতে বড় ভালবাসেন। বুদ্ধির কৌশল, সকল গুণের অপেক্ষা ইঁহার নিকট আদরণীয়। এরূপ লোক এ কালেও বড় দুর্লভ নয়। এখনও বোধ হয় অনেক সুশিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর লোক আছেন যে কৌশলবিদ্ বুদ্ধিমান্ চতুরই তাঁহাদের কাছে মনুষ্যত্বের আদর্শ। ইউরোপীয় সমাজে এই আদর্শ বড় প্রিয়—তাহা হইতে আধুনিক Diplomacy বিদ্যার সৃষ্টি। বিস্মার্ক্ এক দিন জগতের প্রধান মনুষ্য ছিলেন। থেমিষ্টক্লিসের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত যাঁহারা এই বিদ্যায় পটু, তাঁহারাই ইউরোপে মান্য—"Francis d' Assisi বা Imitation of Christ" গ্রন্থের প্রণেতাকে কে চিনে? মহাভারতের দ্বিতীয় কবিরও মনে সেইরূপ চরমাদর্শ ছিল। আবার কৃষ্ণের

ঈশ্বরত্বে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। তাই তিনি পুরুষোত্তমকে কৌশলীর শ্রেষ্ঠ সাজাইয়াছেন। তিনি মিথ্যা কথার দ্বারা দ্রোণহত্যা সম্বন্ধে বিখ্যাত উপন্যাসের প্রণেতা। জয়দ্রথবধে সুদর্শনচক্রে রবি আচ্ছাদন, কর্ণার্জ্জুনের যুদ্ধে অর্জ্জুনের রথচক্র পৃথিবীতে পুতিয়া ফেলা, আর ঘোড়া বসাইয়া দেওয়া, ইত্যাদি কৃষ্ণকৃত অদ্ভুত কৌশলের তিনিই রচয়িতা। এক্ষণে ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, জরাসন্ধবধ-পর্ব্বাধ্যায়ে এই অনর্থক এবং অসংলগ্ন কৌশলবিষয়ক প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির প্রণেতা তাঁহাকেই বিবেচনা হয়, এবং তাঁহাকে এ সকলের প্রণেতা বিবেচনা করিলে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর বড় অন্ধকার থাকে না। কৃষ্ণকে কৌশলময় বলিয়া প্রতিপন্ন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কেবল এইটুকুর উপর নির্ভর করিতে হইলে হয়ত আমি এত কথা বলিতাম না। কিন্তু জরাসন্ধবধ-পর্ব্বাধ্যায়ে তাঁর হাত আরও দেখিব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণ-জরাসন্ধ-সংবাদ

নিশীথকালে যজ্ঞাগারে জরাসন্ধ স্নাতকবেশধারী তিন জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগের পূজা করিলেন। এখানে কিছুই প্রকাশ নাই যে, তাঁহারা জরাসন্ধের পূজা গ্রহণ করিলেন কি না। আর এক স্থানে আছে। মূলের উপর আর একজন কারিগরি করায় এই রকম গোলযোগ ঘটিয়াছে।

তৎপরে সৌজন্য-বিনিময়ের পর জরাসন্ধ তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, "হে বিপ্রগণ! আমি জানি, স্নাতকব্রতচারী ব্রাহ্মণগণ সভাগমন সময় ভিন্ন কখন মাল্য* বা চন্দন ধারণ করেন না। আপনারা কে? আপনাদের বস্ত্র রক্তবর্ণ; অঙ্গে পুষ্পমাল্য ও অনুলেপন সুশোভিত; ভুজে জ্যাচিহ্ন লক্ষিত হইতেছে, আকার দর্শনে ক্ষত্রতেজের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু আপনারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, অতএব সত্য বলুন, আপনারা কে? রাজসমক্ষে সত্যই প্রশংসনীয়। কি নিমিত্ত আপনারা দ্বার দিয়া প্রবেশ না করিয়া, নির্ভয়ে চৈতক পর্ব্বতের শৃঙ্গ ভগ্ন করিয়া প্রবেশ করিলেন? ব্রাহ্মণেরা বাক্য দ্বারা বীর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আপনারা কার্য্য দ্বারা উহা প্রকাশ করিয়া নিতান্ত বিরুদ্ধানুষ্ঠান করিতেছেন। আরও, আপনারা আমার কাছে আসিয়াছেন, আমিও বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়াছি, কিন্তু কি নিমিত্ত পূজা গ্রহণ করিলেন না? এক্ষণে কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন বলুন।"

তদুত্তরে কৃষ্ণ স্নিগ্ধগম্ভীরস্বরে (মৌলিক মহাভারতে কোথাও দেখি না যে কৃষ্ণ চঞ্চল বা রুষ্ট হইয়া কোন কথা বলিলেন, তাঁহার সকল রিপুই বশীভূত) বলিলেন, "হে রাজন্! তুমি আমাদিগকে স্নাতক ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ করিতেছ, কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই

* লিখিত আছে যে, মাল্য তাঁহারা একজন মালাকারের নিকট বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছিলেন। যাঁহাদের এত ঐশ্বর্য্য যে রাজসূয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের তিন ছড়া মালা কিনিবার যে কড়ি জুটিবে না, ইহা অতি অসম্ভব। যাঁহারা কপটদ্যূতাপহৃত রাজ্যই ধর্ম্মানুরোধে পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহারা যে ডাকাতি করিয়া তিন ছড়া মালা সংগ্রহ করিবেন, উহা অতি অসম্ভব। এ সকল দ্বিতীয় স্তরের কবির হাত। দৃপ্ত ক্ষত্রতেজের বর্ণনায় এ সকল কথা বেশ সাজে।

তিন জাতিই স্নাতক-ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের বিশেষ নিয়ম ও অবিশেষ নিয়ম উভয়ই আছে। ক্ষত্রিয় জাতি বিশেষ নিয়মী হইলে সম্পত্তিশালী হয়। পুষ্পধারী নিশ্চয়ই শ্রীমান্ হয় বলিয়া আমরা পুষ্পধারণ করিয়াছি। ক্ষত্রিয় বাহুবলেই বলবান্, বাগ্বীর্য্যশালী নহেন ; এই নিমিত্ত তাঁহাদের অপ্রগল্‌ভ বাক্য প্রয়োগ করা নির্দ্ধারিত আছে।"

কথাগুলি শাস্ত্রোক্ত ও চতুরের কথা বটে, কিন্তু কৃষ্ণের যোগ্য নহে, সত্যপ্রিয় ধর্ম্মাত্মার কথা নহে। কিন্তু যে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে, তাহাকে এইরূপ উত্তর কাজেই দিতে হয়। ছদ্মবেশটা যদি দ্বিতীয় স্তরের কবির সৃষ্টি হয়, তবে এ বাক্যগুলির জন্য তিনিই দায়ী। কৃষ্ণকে যে রকম চতুরচূড়ামণি সাজাইতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন, এই উত্তর তাহার অঙ্গ বটে। কিন্তু যাহাই হউক, দেখা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণ বলিয়া ছলনা করিবার কৃষ্ণের কোন উদ্দেশ্য ছিল না। ক্ষত্রিয় বলিয়া আপনাদিগকে তিনি স্পষ্টই স্বীকার করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা শত্রুভাবে যুদ্ধার্থে আসিয়াছেন, তাহাও স্পষ্ট বলিতেছেন।

"বিধাতা ক্ষত্রিয়গণের বাহুতেই বল প্রদান করিয়াছেন। হে রাজন্! যদি তোমার আমাদের বাহুবল দেখিতে বাসনা থাকে, তবে অদ্যই দেখিতে পাইবে, সন্দেহ নাই। হে বৃহদ্রথনন্দন! ধীর ব্যক্তিগণ শত্রুগৃহে অপ্রকাশ্যভাবে এবং সুহৃদ্‌গৃহে প্রকাশ্যভাবে প্রবেশ করিয়া থাকেন। হে রাজন্! আমরা স্বকার্য্যসাধনার্থ শত্রুগৃহে আগমন করিয়া তদ্দত্ত পূজা গ্রহণ করি না ; এই আমাদের নিত্যব্রত।"

কোন গোল নাই—সব কথাগুলি স্পষ্ট। এইখানে অধ্যায় শেষ হইল, আর সঙ্গে সঙ্গে ছদ্মবেশের গোলযোগটা মিটিয়া গেল। দেখা গেল যে, ছদ্মবেশের কোন মানে নাই। তার পর, পর-অধ্যায়ে কৃষ্ণ যে সকল কথা বলিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন প্রকার। তাঁহার যে উন্নত চরিত্র এ পর্য্যন্ত দেখিয়া আসিয়াছি, সে তাঁহারই যোগ্য। পূর্ব্ব অধ্যায়ে এবং পর-অধ্যায়ে বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রে এত গুরুতর প্রভেদ যে, দুই হাতের বর্ণন বলিয়া বিবেচনা করিবার আমাদের অধিকার আছে।

জরাসন্ধের গৃহকে কৃষ্ণ তাঁহাদের শত্রুগৃহ বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে, জরাসন্ধ বলিলেন, "আমি কোন সময়ে তোমাদের সহিত শত্রুতা বা তোমাদের অপকার করিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হয় না। তবে কি নিমিত্ত নিরপরাধে তোমরা আমাকে শত্রু জ্ঞান করিতেছ।"

উত্তরে, জরাসন্ধের সঙ্গে কৃষ্ণের যথার্থ যে শত্রুতা, তাহাই বলিলেন। তাঁহার নিজের সঙ্গে জরাসন্ধের যে বিবাদ, তাহার কিছুমাত্র উত্থাপন করিলেন না। নিজের সঙ্গে বিবাদের জন্য কেহ তাঁহার শত্রু হইতে পারে না, কেন না তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী, শত্রুমিত্র সমান দেখেন। তিনি পাণ্ডবের সুহৃদ্ এবং কৌরবের শত্রু, এইরূপ লৌকিক বিশ্বাস। কিন্তু বাস্তবিক মৌলিক মহাভারতের সমালোচনে আমরা ক্রমশঃ দেখিব যে, তিনি ধর্ম্মের পক্ষ, এবং অধর্ম্মের বিপক্ষ ; তদ্ভিন্ন তাঁহার পক্ষাপক্ষ কিছুই নাই। কিন্তু সে কথা এখন থাক। আমরা এখানে দেখিব যে, কৃষ্ণ উপযাচক হইয়া জরাসন্ধকে আত্মপরিচয় দিলেন, কিন্তু নিজের সঙ্গে বিবাদের জন্য তাঁহাকে শত্রু বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন না।

তবে যে মনুষ্যজাতির শত্রু, সে কৃষ্ণের শত্রু। কেন না আদর্শ পুরুষ সর্ব্বভূতে আপনাকে দেখেন, তদ্ভিন্ন তাঁহার অন্য প্রকার আত্মজ্ঞান নাই। তাই তিনি জরাসন্ধের প্রশ্নের উত্তরে, জরাসন্ধ তাঁহার যে অপকার করিয়াছিল, তাহার প্রসঙ্গ মাত্র না করিয়া সাধারণের যে অনিষ্ট করিয়াছে, কেবল তাহাই বলিলেন। বলিলেন যে, তুমি রাজগণকে মহাদেবের নিকট বলি দিবার জন্য বন্দী করিয়া রাখিয়াছ। তাই, যুধিষ্ঠিরের নিয়োগক্রমে, আমরা তোমার প্রতি সমুদ্যত হইয়াছি। শত্রুতাটা বুঝাইয়া দিবার জন্য কৃষ্ণ জরাসন্ধকে বলিতেছেন :—

"হে বৃহদ্রথনন্দন! আমাদিগকেও ত্বৎকৃত পাপে পাপী হইতে হইবে, যেহেতু আমরা ধর্ম্মচারী এবং ধর্ম্মরক্ষণে সমর্থ।"

এই কথাটার প্রতি পাঠক বিশেষ মনোযোগী হইবেন, এই ভরসায় আমরা ইহা বড় অক্ষরে লিখিলাম। এখন, পুরাতন বলিয়া বোধ হইলেও, কথাটা অতিশয় গুরুতর। যে ধর্ম্মরক্ষণে ও পাপের দমনে সক্ষম হইয়াও তাহা না করে, সে সেই পাপের সহকারী। অতএব ইহলোকে সকলেরই সাধ্যমত পাপের নিবারণের চেষ্টা না করা অধর্ম্ম। "আমি ত কোন পাপ করিতেছি না, পরে করিতেছে, আমার তাতে দোষ কি?" যিনি এইরূপ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তিনিও পাপী। কিন্তু সচরাচর ধর্ম্মাত্মারাও তাই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। এই জন্য জগতে যে সকল নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা এই ধর্ম্মরক্ষা ও পাপনিবারণব্রত গ্রহণ করেন। শাক্যসিংহ, যিশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। এই বাক্যই তাঁহাদের জীবনচরিতের মূলসূত্র। শ্রীকৃষ্ণেরও সেই ব্রত। এই মহাবাক্য স্মরণ না রাখিলে তাঁহার জীবনচরিত বুঝা যাইবে না। জরাসন্ধ কংস শিশুপালের বধ, মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে কৃষ্ণকৃত সহায়তা, কৃষ্ণের এই সকল কার্য্য এই মূলসূত্রের সাহায্যেই বুঝা যায়। ইহাকেই পুরাণকারেরা "পৃথিবীর ভারহরণ" বলিয়াছেন। খ্রীষ্টকৃত হউক, বুদ্ধকৃত হউক, কৃষ্ণকৃত হউক, এই পাপনিবারণ ব্রতের নাম ধর্ম্মপ্রচার। ধর্ম্মপ্রচার দুই প্রকারে হইতে পারে ও হইয়া থাকে; এক, বাক্যতঃ অর্থাৎ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় উপদেশের দ্বারা; দ্বিতীয়, কার্য্যতঃ অর্থাৎ আপনার কার্য্যসকলকে ধর্ম্মের আদর্শে পরিণত করণের দ্বারা। খ্রীষ্ট, শাক্যসিংহ ও শ্রীকৃষ্ণ এই দ্বিবিধ অনুষ্ঠানই করিয়াছিলেন। তবে শাক্যসিংহ ও খ্রীষ্টকৃত ধর্ম্মপ্রচার, উপদেশপ্রধান; কৃষ্ণকৃত ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যপ্রধান। ইহাতে কৃষ্ণেরই প্রাধান্য, কেন না, বাক্য সহজ, কার্য্য কঠিন এবং অধিকতর ফলোপধায়ক। যিনি কেবল মানুষ, তাঁহার দ্বারা ইহা সুসম্পন্ন হইতে পারে কি না, সে কথা এক্ষণে আমাদের বিচার্য্য নহে।

এইখানে একটা কথার মীমাংসা করা ভাল। কৃষ্ণকৃত কংস-শিশুপালাদির বধের উল্লেখ করিলাম, এবং জরাসন্ধকে বধ করিবার জন্যই কৃষ্ণ আসিয়াছেন বলিয়াছি; কিন্তু পাপীকে বধ করা কি আদর্শ মনুষ্যের কাজ? যিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, তিনি পাপাত্মাকেও আত্মবৎ দেখিয়া, তাহারও হিতাকাঙ্ক্ষী হইবেন না কেন? সত্য বটে, পাপীকে জগতে রাখিলে জগতের মঙ্গল নাই, কিন্তু তাহার বধসাধনই কি জগৎ উদ্ধারের একমাত্র উপায়? পাপীকে পাপ হইতে বিরত করিয়া, ধর্ম্মে প্রবৃত্তি দিয়া, জগতের এবং পাপীর উভয়ের মঙ্গল এক কালে সিদ্ধ করা তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় নয় কি? আদর্শ পুরুষের

তাহাই অবলম্বন করাই কি উচিত ছিল না ? যিশু, শাক্যসিংহ ও চৈতন্য এইরূপে পাপীর উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এ কথার উত্তর দুইটি। প্রথম উত্তর এই যে, কৃষ্ণচরিত্রে এ ধর্ম্মেরও অভাব নাই। তবে ক্ষেত্রভেদে ফলভেদও ঘটিয়াছে। দুর্য্যোধন ও কর্ণ, যাহাতে নিহত না হইয়া ধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক জীবনে ও রাজ্যে বজায় থাকে, সে চেষ্টা তিনি বিধিমতে করিয়াছিলেন, এবং সেই কার্য্য সম্বন্ধেই বলিয়াছিলেন, পুরুষকারের দ্বারা যাহা সাধ্য, তাহা আমি করিতে পারি; কিন্তু দৈব আমার আয়ত্ত নহে। কৃষ্ণ মানুষী শক্তির দ্বারা কার্য্য করিতেন, তজ্জন্য যাহা স্বভাবতঃ অসাধ্য তাহাতে যত্ন করিয়াও কখন কখন নিষ্ফল হইতেন। শিশুপালেরও শত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন। সেই ক্ষমার কথাটা অলৌকিক উপন্যাসে আবৃত হইয়া আছে। যথাস্থানে আমরা তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করিব। কংসবধের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

পাইলেট্‌কে খ্রীষ্টিয়ান্ করা, খ্রীষ্টের পক্ষে যত দূর সম্ভব ছিল, কংসকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করা কৃষ্ণের পক্ষে তত দূর সম্ভব। জরাসন্ধ সম্বন্ধেও তাই বলা যাইতে পারে। তথাপি জরাসন্ধ সম্বন্ধে কৃষ্ণের সে বিষয়ের একটু কথোপকথন হইয়াছিল। জরাসন্ধ কৃষ্ণের নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সে কৃষ্ণকেই ধর্ম্মবিষয়ক একটি লেক্‌চর শুনাইয়া দিল, যথা—

"দেখ, ধর্ম্ম বা অর্থের উপঘাত দ্বারাই মনঃপীড়া জন্মে; কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও নিরপরাধে লোকের ধর্ম্মার্থে উপঘাত করে, তাহার ইহকালে অমঙ্গল ও পরকালে নরকে গমন হয়, সন্দেহ নাই।" ইত্যাদি।

এ সব স্থলে ধর্ম্মোপদেশে কিছু হয় না। জরাসন্ধকে সৎপথে আনিবার জন্য উপায় ছিল কি না, তাহা আমাদের বুদ্ধিতে আসে না। অতিমানুষকীর্ত্তি একটা প্রচার করিলে, যা হয়, একটা কাণ্ড হইতে পারিত। তেমন অন্যান্য ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মধ্যে অনেক দেখি, কিন্তু কৃষ্ণচরিত্র অতিমানুষী শক্তির বিরোধী। শ্রীকৃষ্ণ ভূত ছাড়াইয়া, রোগ ভাল করিয়া, বা কোন প্রকার বুজ্‌রুকি ভেল্‌কির দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার বা আপনার দেবত্বস্থাপন করেন নাই।

তবে ইহা বুঝিতে পারি যে, জরাসন্ধের বধ কৃষ্ণের উদ্দেশ্য নহে; ধর্ম্মের রক্ষা অর্থাৎ নির্দ্দোষী অথচ প্রপীড়িত রাজগণের উদ্ধারই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি জরাসন্ধকে অনেক বুঝাইয়া পরে বলিলেন, "আমি বসুদেবনন্দন কৃষ্ণ, আর এই দুই বীরপুরুষ পাণ্ডুতনয়। আমরা তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, এক্ষণে হয় সমস্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ কর, না হয় যুদ্ধ করিয়া যমালয়ে গমন কর।" অতএব জরাসন্ধ রাজগণকে ছাড়িয়া দিলে, কৃষ্ণ তাহাকে নিষ্কৃতি দিতেন। জরাসন্ধ তাহাতে সম্মত না হইয়া যুদ্ধ করিতে চাহিলেন, সুতরাং যুদ্ধই হইল। জরাসন্ধ যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোনরূপ বিচারে যাথার্থ্য স্বীকার করিবার পাত্র ছিলেন না।

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, যিশু বা বুদ্ধের জীবনীতে যতটা পতিতোদ্ধারের চেষ্টা দেখি, কৃষ্ণের জীবনে ততটা দেখি না, ইহা স্বীকার্য্য। যিশু বা শাক্যের ব্যবসায়ই ধর্ম্মপ্রচার। কৃষ্ণ ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মপ্রচার তাঁহার ব্যবসায় নহে; সেটা আদর্শ

পুরুষের আদর্শজীবননির্ব্বাহের আনুষঙ্গিক ফল মাত্র। কথাটা এই রকম করিয়া বলাতে কেহই না মনে করেন যে, যিশুখ্রীষ্ট বা শাক্যসিংহের, বা ধর্ম্মপ্রচার ব্যবসায়ের কিছুমাত্র লাঘব করিতে ইচ্ছা করি। যিশু এবং শাক্য উভয়কে আমি মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বলিয়া ভক্তি করি, এবং তাঁহাদের চরিত্র আলোচনা করিয়া তাহাতে জ্ঞানলাভ করিবার ভরসা করি। ধর্ম্মপ্রচারকের ব্যবসায় (ব্যবসায় অর্থে এখানে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমরা সর্ব্বদা প্রবৃত্ত) আর সকল ব্যবসায় হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি। কিন্তু যিনি আদর্শ মনুষ্য, তাঁহার সে ব্যবসায় হইতে পারে না। কারণ, তিনি আদর্শ মনুষ্য, মানুষের যত প্রকার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আছে, সকলই তাঁহার অনুষ্ঠেয়। কোন কর্ম্মই তাঁহার "ব্যবসায় নহে", অর্থাৎ অন্য কর্ম্মের অপেক্ষা প্রধানত্ব লাভ করিতে পারে না। যিশু বা শাক্যসিংহ আদর্শ পুরুষ নহেন, কিন্তু মনুষ্যশ্রেষ্ঠ। মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যবসায় অবলম্বনই তাঁহাদের বিধেয়, এবং তাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা লোকহিতসাধন করিয়া গিয়াছেন।

কথাটা যে আমার সকল শিক্ষিত পাঠক বুঝিয়াছেন, এমন আমার বোধ হয় না। বুঝিবার একটা প্রতিবন্ধক আছে। আদর্শ পুরুষের কথা বলিতেছি। অনেক শিক্ষিত পাঠক "আদর্শ" শব্দটি "Ideal" শব্দের দ্বারা অনুবাদ করিবেন। অনুবাদও দূষ্য হইবে না। এখন, একটা "Christian Ideal" আছে। খ্রীষ্টিয়ানের আদর্শ পুরুষ যিশু। আমরা বাল্যকাল হইতে খ্রীষ্টিয়ান জাতির সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া সেই আদর্শটি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। আদর্শ পুরুষের কথা হইলেই সেই আদর্শের কথা মনে পড়ে। যে আদর্শ সেই আদর্শের সঙ্গে মিলে না, তাহাকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। খ্রীষ্ট পতিতোদ্ধারী ; কোন দুরাত্মাকে তিনি প্রাণে নষ্ট করেন নাই, করিবার ক্ষমতাও রাখিতেন না। শাক্যসিংহ বা চৈতন্যে আমরা সেই গুণ দেখিতে পাই, এজন্য ইঁহাদিগকে আমরা আদর্শ পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কৃষ্ণ পতিতপাবন নাম ধরিয়াও, প্রধানতঃ পতিত-নিপাতী বলিয়াই ইতিহাসে পরিচিত। সুতরাং তাঁহাকে আদর্শ পুরুষ বলিয়াই আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না। কিন্তু আমাদের একটা কথা বিচার করিয়া দেখা উচিত। এই Christian Ideal কি যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ ? সকল জাতির জাতীয় আদর্শ কি সেইরূপই হইবে ?

এই প্রশ্নে আর একটা প্রশ্ন উঠে—হিন্দুর আবার জাতীয় আদর্শ আছে না কি ? Hindu Ideal আছে না কি ? যদি থাকে, তবে কে ? কথাটা শিক্ষিত হিন্দুমণ্ডলী-মধ্যে জিজ্ঞাসা হইলে অনেকেই মস্তককণ্ডূয়নে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা। কেহ হয়ত জটাবল্কলধারী শুভ্রশ্মশ্রুগুম্ফবিভূষিত ব্যাস বশিষ্ঠাদি ঋষিদিগকে ধরিয়া টানাটানি করিবেন, কেহ হয়ত বলিয়া বসিবেন, "ও ছাই ভস্ম নাই।" নাই বটে সত্য, থাকিলে আমাদের এমন দুর্দ্দশা হইবে কেন ? কিন্তু এক দিন ছিল। তখন হিন্দু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। সে আদর্শ হিন্দু কে ? ইহার উত্তর আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। রামচন্দ্রাদি ক্ষত্রিয়গণ সেই আদর্শপ্রতিমার নিকটবর্ত্তী, কিন্তু যথার্থ হিন্দু আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ—খ্রীষ্ট প্রভৃতিতে সেরূপ আদর্শের সম্পূর্ণতা পাইবার সম্ভাবনা নাই।

কেন, তাহা বলিতেছি। মনুষ্যত্ব কি, ধর্ম্মতত্ত্বে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছি।

মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্যে মনুষ্যত্ব। যাঁহাতে সে সকলের চরম স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্য পাইয়াছে, তিনিই আদর্শ মনুষ্য। খ্রীষ্টে তাহা নাই—শ্রীকৃষ্ণে তাহা আছে। যিশুকে যদি রোমক সম্রাট্ য়িহুদার শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত করিতেন, তবে কি তিনি সুশাসন করিতে পারিতেন? তাহা পারিতেন না—কেন না, রাজকার্য্যের জন্য যে সকল বৃত্তিগুলি প্রয়োজনীয়, তাহা তাঁহার অনুশীলিত হয় নাই। অথচ এরূপ ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি রাজ্যের শাসনকর্ত্তা হইলে সমাজের অনন্ত মঙ্গল। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ, তাহা প্রসিদ্ধ। শ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ বলিয়া তিনি মহাভারতে ভূরি ভূরি বর্ণিত হইয়াছেন, এবং যুধিষ্ঠির বা উগ্রসেন শাসনকার্য্যে তাঁহার পরামর্শ ভিন্ন কোন গুরুতর কাজ করিতেন না। এইরূপে কৃষ্ণ নিজে রাজা না হইয়াও প্রজার অশেষ মঙ্গলসাধন করিয়াছিলেন—এই জরাসন্ধের বন্দীগণের মুক্তি তাহার এক উদাহরণ। পুনশ্চ, মনে কর, যদি য়িহুদীরা রোমকের অত্যাচারপীড়িত হইয়া স্বাধীনতার জন্য উত্থিত হইয়া, যিশুকে সেনাপতিত্বে বরণ করিত, যিশু কি করিতেন? যুদ্ধে তাঁহার শক্তিও ছিল না, প্রবৃত্তিও ছিল না। "কাইসরের পাওনা কাইসরকে দাও" বলিয়া তিনি প্রস্থান করিতেন। কৃষ্ণও যুদ্ধে প্রবৃত্তিশূন্য—কিন্তু ধর্ম্মার্থ যুদ্ধও আছে। ধর্ম্মার্থ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অগত্যা প্রবৃত্ত হইতেন। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তিনি অজেয় ছিলেন। যিশু অশিক্ষিত, কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ। অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও ঐরূপ। উভয়েই শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক ও ধর্ম্মজ্ঞ। অতএব কৃষ্ণই যথার্থ আদর্শ মনুষ্য—"Christian Ideal" অপেক্ষা "Hindu Ideal" শ্রেষ্ঠ।

ঈদৃশ সর্ব্বগুণসম্পন্ন আদর্শ মনুষ্য কার্য্যবিশেষে জীবন সমর্পণ করিতে পারেন না। তাহা হইলে, ইতর কার্য্যগুলি অননুষ্ঠিত, অথবা অসামঞ্জস্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। লোক চরিত্রভেদে, অবস্থাভেদে, শিক্ষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম ও ভিন্ন ভিন্ন সাধনের অধিকারী; আদর্শ মনুষ্য, সকল শ্রেণীরই আদর্শ হওয়া উচিত। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের, শাক্যসিংহ, যিশু বা চৈতন্যের ন্যায় সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচার ব্যবসায়স্বরূপ অবলম্বন করা অসম্ভব। কৃষ্ণ সংসারী, গৃহী, রাজনীতিজ্ঞ, যোদ্ধা, দণ্ডপ্রণেতা, তপস্বী, ধর্ম্মপ্রচারক; সংসারী ও গৃহীদিগের, রাজাদিগের, যোদ্ধাদিগের, রাজপুরুষদিগের, তপস্বীদিগের, ধর্ম্মবেত্তাদিগের এবং একাধারে সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শ। জরাসন্ধাদির বধ আদর্শ-রাজপুরুষ ও দণ্ডপ্রণেতার অবশ্য অনুষ্ঠেয়। ইহাই Hindu Ideal। অসম্পূর্ণ যে বৌদ্ধ বা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম, তাহার আদর্শ পুরুষকে আদর্শ স্থানে বসাইয়া, সম্পূর্ণ যে হিন্দুধর্ম্ম, তাহার আদর্শ পুরুষকে আমরা বুঝিতে পারিব না।

কিন্তু বুঝিবার বড় প্রয়োজন হইয়াছে, কেন না, ইহার ভিতর আর একটা বিস্ময়কর কথা আছে। কি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপে, কি হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ভারতবর্ষে, আদর্শের ঠিক বিপরীত ফল ফলিয়াছে। খ্রীষ্টীয় আদর্শ পুরুষ, বিনীত, নিরীহ, নির্ব্বিরোধী সন্ন্যাসী; এখনকার খ্রীষ্টিয়ান ঠিক বিপরীত। ইউরোপ এখন ঐহিক সুখরত সশস্ত্র যোদ্ধৃবর্গের বিস্তীর্ণ শিবির মাত্র। হিন্দুধর্ম্মের আদর্শ পুরুষ সর্ব্বকর্ম্মকৃৎ—এখনকার হিন্দু সর্ব্ব কর্ম্মে অকর্ম্মা। এরূপ ফলবৈপরীত্য ঘটিল কেন? উত্তর সহজ,—লোকের চিত্ত হইতে উভয় দেশেই সেই প্রাচীন আদর্শ লুপ্ত হইয়াছে। উভয় দেশেই এককালে সেই আদর্শ এক দিন প্রবল ছিল—প্রাচীন খ্রীষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্মপরায়ণতা ও সহিষ্ণুতা, ও

প্রাচীন হিন্দু রাজগণ ও রাজপুরুষগণের সর্ব্বগুণবত্তা তাহার প্রমাণ। যে দিন সে আদর্শ হিন্দুদিগের চিত্ত হইতে বিদূরিত হইল—যে দিন আমরা কৃষ্ণচরিত্র অবনত করিয়া লইলাম, সেই দিন হইতে আমাদিগের সামাজিক অবনতি। জয়দেব গোঁসাইয়ের কৃষ্ণের অনুকরণে সকলে ব্যস্ত—মহাভারতের কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ করে না।

এখন আবার সেই আদর্শ পুরুষকে জাতীয় হৃদয়ে জাগরিত করিতে হইবে। ভরসা করি, এই কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যায় সে কার্য্যের কিছু আনুকূল্য হইতে পারিবে।

জরাসন্ধবধের ব্যাখ্যায় এ সকল কথা বলিবার তত প্রয়োজন ছিল না, প্রসঙ্গতঃ এ তত্ত্ব উত্থাপিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু এ কথাগুলি এক স্থানে না এক স্থানে আমাকে বলিতে হইত। আগে বলিয়া রাখায় লেখক পাঠক উভয়ের পথ সুগম হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—ভীম-জরাসন্ধের যুদ্ধ

আমরা এ পর্য্যন্ত কৃষ্ণচরিত্র যত দূর সমালোচনা করিয়াছি, তাহাতে মহাভারতে কৃষ্ণকে কোথাও বিষ্ণু বলিয়া পরিচিত হইতে দেখি নাই। কেহ তাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়া সম্বোধন বা বিষ্ণুজ্ঞানে তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন করে নাই। তাঁহাকেও এ পর্য্যন্ত মনুষ্যশক্তির অতিরিক্ত শক্তিতে কোন কার্য্য করিতে দেখি নাই। তিনি বিষ্ণুর অবতার হউন বা না হউন, কৃষ্ণচরিত্রের স্থূল মর্ম্ম মনুষ্যত্ব, দেবত্ব নহে, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়াছি।

কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, ইহার পরে মহাভারতের অনেক স্থানে তাঁহাকে বিষ্ণু বলিয়া সম্বোধিত এবং পরিচিত হইতে দেখি। অনেকে বিষ্ণু বলিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছে দেখি; এবং কদাচ কখনও তাঁহাকে লোকাতীতা বৈষ্ণবী শক্তিতে কার্য্য করিতেও দেখি; এ পর্য্যন্ত তাহা দেখি নাই, কিন্তু এখনই দেখিব। এই দুইটি ভাব পরস্পর বিরোধী কি না?

যদি কেহ বলেন যে, এই দুইটি ভাব পরস্পর বিরোধী নহে, কেন না, যখন দৈব শক্তির বা দেবত্বের কোন প্রকার বিকাশের কোন প্রয়োজন নাই, তখন কাব্যে বা ইতিহাসে কেবল মনুষ্যভাব প্রকটিত হয়, আর যখন তাহার প্রয়োজন আছে, তখন দৈবভাব প্রকটিত হয়; তাহা হইলে আমরা বলিব যে, এই উত্তর যথার্থ হইল না। কেন না, নিষ্প্রয়োজনেই দৈবভাবের প্রকাশ অনেক সময়ে দেখা যায়। এই জরাসন্ধবধ হইতেই দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

জরাসন্ধবধের পর কৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুন জরাসন্ধের রথখানা লইয়া তাহাতে আরোহণপূর্ব্বক নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দেবনির্ম্মিত রথ, তাহাতে কিছুরই অভাব নাই। তবু খানখাই কৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করিলেন, স্মরণমাত্র গরুড় আসিয়া রথের চূড়ায় বসিলেন। গরুড় আসিয়া আর কোন কাজ করিলেন না, তাঁহাতে আর কোন প্রয়োজনও ছিল না। কথাটারও আর কোন প্রয়োজন দেখা যায় না, কেবল মাঝে হইতে কৃষ্ণের বিষ্ণুত্ব সূচিত হয়। জরাসন্ধকে বধ করিবার সময় কোন দৈব শক্তির প্রয়োজন হইল না, কিন্তু রথে চড়িবার বেলা হইল।

আবার যুদ্ধের পূর্ব্বে, অমনি একটা কথা আছে। জরাসন্ধ যুদ্ধে স্থিরসংকল্প হইলে কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,

"হে রাজন্! আমাদের তিন জনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা হয় বল? কে যুদ্ধ করিতে সজ্জীভূত হইবে?" জরাসন্ধ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অথচ ইহার দুই ছত্র পূর্ব্বেই লেখা আছে যে, কৃষ্ণ জরাসন্ধকে যাদবগণের অবধ্য স্মরণ করিয়া ব্রহ্মার আদেশানুসারে স্বয়ং তাঁহার সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন না।

ব্রহ্মার এই আদেশ কি, তাহা মহাভারতের কোথাও নাই। পরবর্ত্তী গ্রন্থে আছে। এখন পাঠকের বিশ্বাস হয় না কি যে, এইগুলি আদিম মহাভারতের মূলের উপর পরবর্ত্তী লেখকের কারিগরি? আর কৃষ্ণের বিষ্ণুত্ব ভিতরে ভিতরে খাড়া রাখা ইহার উদ্দেশ্য? আদিম স্তরের মূলে কৃষ্ণবিষ্ণুতে কোনরূপ সম্বন্ধ স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দেওয়া হয় নাই, কেন না কৃষ্ণচরিত্র মনুষ্যচরিত্র; দেবচরিত্র নহে। যখন ইহাতে কৃষ্ণোপাসক দ্বিতীয় স্তরের কবির হাত পড়িল, তখন এটা বড় ভুল বলিয়া বোধ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী কবিকল্পনাটা তাঁহার জানা ছিল, তিনি অভাব পূরণ করিয়া দিলেন।

এইরূপ, যেখানে বন্ধনবিমুক্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ কৃষ্ণকে ধর্ম্মরক্ষার জন্য ধন্যবাদ করিতেছেন, সেখানেও, কোথাও কিছু নাই, খানকা তাঁহারা কৃষ্ণকে "বিষ্ণো" বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। এখন ইতিপূর্ব্বে কোথাও দেখা যায় না যে, তিনি বিষ্ণু বা তদর্থক অন্য নামে সম্বোধিত হইয়াছেন। যদি এমন দেখিতাম যে, ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণ এরূপ নামে মধ্যে মধ্যে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন, তাহা হইলে বুঝিতাম যে ইহাতে অসঙ্গত বা অনৈসর্গিক কিছুই নাই, লোকের এমন বিশ্বাস আছে বলিয়াই ইহা হইল। যদি এমন দেখিতাম যে, এই সময়ে কৃষ্ণ কোন অলৌকিক কাজ করিয়াছেন, তাহা দেবতা ভিন্ন মনুষ্যের সাধ্য নহে, তাহা হইলেও হঠাৎ এ "বিষ্ণো!" সম্বোধনের উপযোগিতা বুঝিতে পারিতাম। কিন্তু কৃষ্ণ তেমন কিছুই কাজ করেন নাই। তিনি জরাসন্ধকে বধ করেন নাই—সর্ব্বলোকসমক্ষে ভীম তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন। সে কার্য্যের প্রবর্ত্তক কৃষ্ণ বটে, কিন্তু কারাবাসী রাজগণ তাহার কিছুই জানেন না। অতএব কৃষ্ণে অকস্মাৎ রাজগণ কর্ত্তৃক এই বিষ্ণুত্ব আরোপ কখন ঐতিহাসিক বা মৌলিক হইতে পারে না। কিন্তু উহা ঐ গরুড় স্মরণ ও ব্রহ্মার আদেশ স্মরণের সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গত, জরাসন্ধবধের আর কোন অংশের সঙ্গে সঙ্গত নহে। তিনটি কথা এক হাতের কারিগরি —আর তিনটা কথাই মূলাতিরিক্ত। বোধ হয়, ইহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

যাঁহারা বলিবেন, তাহা হয় নাই, তাঁহাদিগের এ কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনের অনুবর্ত্তী হইবার আর কোন ফল দেখি না। কেন না, এ সকল বিষয়ে অন্য কোন প্রকার প্রমাণ সংগ্রহের সম্ভাবনা নাই। আর এই সমালোচনায় যাঁহাদের এমন বিশ্বাস হইয়াছে যে, জরাসন্ধবধ মধ্যে কৃষ্ণের এই বিষ্ণুত্বসূচনা পরবর্ত্তী কবি প্রণীত ও প্রক্ষিপ্ত, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি, তবে কৃষ্ণের ছদ্মবেশ ও কপটাচারবিষয়ক যে কয়েকটি কথা এই জরাসন্ধ-বধ-পর্ব্বাধ্যায়ে আছে, তাহাও ঐরূপ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিব না কেন? দুই বিষয়ই ঠিক একই প্রমাণের উপর নির্ভর করে।

বস্তুতঃ এই দুই বিষয় একত্র করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে যে, এই জরাসন্ধবধ-

পর্ব্বাধ্যায়ে পরবর্ত্তী কবির বিলক্ষণ কারিগরি আছে, এবং এই সকল অসঙ্গতি তাহারই ফল। দুই কবির যে হাত আছে, তাহার আর এক প্রমাণ দিতেছি।

জরাসন্ধের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কাছে বিবৃত করিলেন, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই সঙ্গে, কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের কংসবধজনিত যে বিরোধ তাহারও পরিচয় দিলেন তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃতও করিয়াছি। তাহার পরেই মহাভারতকার কি বলিতেছেন, শুনুন।

"বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরপতি বৃহদ্রথ ভার্য্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে তপোবনে বহুদিবস তপোঽনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। তাঁহারা জরাসন্ধ ও চণ্ডকৌশিকোক্ত সমুদায় বর লাভ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে ভগবান্ বাসুদেব কংস নরপতিকে সংহার করেন। কংসনিপাত নিবন্ধন কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের ঘোরতর শত্রুতা জন্মিল।"

এ সকলই ত কৃষ্ণ বলিয়াছেন—আরও সবিস্তার বলিয়াছেন—আবার সে কথা কেন? প্রয়োজন আছে। মূল মহাভারতপ্রণেতা অদ্ভুতরসে বড় রসিক নহেন—কৃষ্ণ অলৌকিক ঘটনা কিছুই বলিলেন না। সে অভাব এখন পূরিত হইতে চলিল। বৈশম্পায়ন বলিতেছেন,—

"মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ গিরিশ্রেণী মধ্যে থাকিয়া কৃষ্ণের বধার্থে এক বৃহৎ গদা একোনশত বার ঘূর্ণায়মান করিয়া নিক্ষেপ করিল। গদা মথুরাস্থিত অদ্ভুত কর্ম্মঠ বাসুদেবের একোনশত যোজন অন্তরে পতিত হইল। পৌরগণ কৃষ্ণসমীপে গদাপতনের বিষয় নিবেদন করিল। তদবধি সেই মথুরার সমীপবর্ত্তী স্থান গদাবসান নামে বিখ্যাত হইল।"

এখনও যদি কোন পাঠকের বিশ্বাস থাকে যে, বর্ত্তমান জরাসন্ধবধ-পর্ব্বাধ্যায়ের সমুদায় অংশই মূল মহাভারতের অন্তর্গত এবং একব্যক্তি প্রণীত, এবং কৃষ্ণাদি যথার্থই ছদ্মবেশে গিরিব্রজে আসিয়াছিলেন, তবে তাঁহাকে অনুরোধ করি হিন্দুদিগের পুরাণেতিহাস মধ্যে ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া অন্য শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন। এদিগে কিছু হইবে না।

অতঃপর, জরাসন্ধবধের অবশিষ্ট কথাগুলি বলিয়া এ পর্ব্বাধ্যায়ের উপসংহার করিব; সে সকল খুব সোজা কথা।

জরাসন্ধ যুদ্ধার্থ ভীমকে মনোনীত করিলে, জরাসন্ধ "যশস্বী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক কৃত-স্বস্ত্যয়ন হইয়া ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে বর্ম্ম ও কিরীট পরিত্যাগ পূর্ব্বক" যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। "তখন যাবতীয় পুরবাসী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বনিতা ও বৃদ্ধগণ তাঁহাদের সংগ্রাম দেখিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্র জনতা দ্বারা সমাকীর্ণ হইল।" "চতুর্দ্দশ দিবস যুদ্ধ হইল।" (যদি সত্য হয়, বোধ হয় তবে মধ্যে মধ্যে অবকাশমত যুদ্ধ হইত) চতুর্দ্দশ দিবসে "বাসুদেব জরাসন্ধকে ক্লান্ত দেখিয়া ভীমকর্ম্মা ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কৌন্তেয়! ক্লান্ত শত্রুকে পীড়ন করা উচিত নহে; অধিকতর পীড্যমান হইলে জীবন পরিত্যাগ করে। অতএব ইনি তোমার পীড়নীয় নহেন। হে ভরতর্ষভ, ইঁহার সহিত বাহুযুদ্ধ কর।" (অর্থাৎ যে শত্রুকে ধর্ম্মতঃ বধ করিতে হইবে, তাহাকেও

পীড়ন কর্ত্তব্য নহে।) ভীম জরাসন্ধকে পীড়ন করিয়াই বধ করিলেন। ভীমের ধর্ম্মজ্ঞান কৃষ্ণের তুল্য হইতে পারে না।

তখন কৃষ্ণার্জ্জুন ও ভীম কারাবদ্ধ মহীপালগণকে বিমুক্ত করিলেন। তাহাই জরাসন্ধবধের একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব রাজগণকে মুক্ত করিয়া আর কিছুই করিলেন না, দেশে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা Annexationist ছিলেন না—পিতার অপরাধে পুত্রের রাজ্য অপহরণ করিতেন না, তাঁহারা জরাসন্ধকে বিনষ্ট করিয়া জরাসন্ধপুত্র সহদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। সহদেব কিছু নজর দিল, তাহা গ্রহণ করিলেন। কারামুক্ত রাজগণ কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"এক্ষণে এই ভৃত্যদিগকে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন।"

কৃষ্ণ তাঁহাদিকে কহিলেন,

"রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, আপনারা সেই সাম্রাজ্য-চিকীর্ষু ধার্ম্মিকের সাহায্য করেন, ইহাই প্রার্থনা।"

যুধিষ্ঠিরকে কেন্দ্রস্থিত করিয়া ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করা, কৃষ্ণের এক্ষণে জীবনের উদ্দেশ্য। অতএব প্রতি পদে তিনি তাহার উদ্যোগ করিতেছেন।

এই জরাসন্ধবধে কৃষ্ণচরিত্রের বিশেষ মহিমা প্রকাশমান—কিন্তু পরবর্ত্তী লেখকদিগের দৌরাত্ম্যে ইহা বড় জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পর শিশুপালবধ। সেখানে আরও গণ্ডগোল।

নবম পরিচ্ছেদ—অর্ঘাভিহরণ

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ হইল। নানাদিক্‌দেশ হইতে আগত রাজগণ, ঋষিগণ, এবং অন্যান্য শ্রেণীর লোকে রাজধানী পূরিয়া গেল। এই বৃহৎ কার্য্যের সুনির্ব্বাহ জন্য পাণ্ডবেরা আত্মীয়বর্গকে বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। দুঃশাসন ভোজ্য দ্রব্যের তত্ত্বাবধানে, সঞ্জয় পরিচর্য্যায়, কৃপাচার্য্য রত্নরক্ষায় ও দক্ষিণাদানে, দুর্য্যোধন উপায়নপ্রতিগ্রহে, ইত্যাদি রূপে সকলকেই নিযুক্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন? দুঃশাসনাদির নিয়োগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিয়োগের কথাও লেখা আছে। তিনি ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন।

কথাটা বুঝা গেল না। শ্রীকৃষ্ণ কেন এই ভৃত্যোপযোগী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন? তাঁহার যোগ্য কি আর কোন ভাল কাজ ছিল না? না, ব্রাহ্মণের পা ধোয়াই বড় মহৎ কাজ? তাঁহাকে আদর্শপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়া কি পাচক ব্রাহ্মণঠাকুরদিগের পাদপ্রক্ষালন করিয়া বেড়াইতে হইবে? যদি তাই হয়, তবে তিনি আদর্শপুরুষ নহেন, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব।

কথাটার অনেক রকম ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মণগণের প্রচারিত এবং এখনকার প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের গৌরব বাড়াইবার জন্যই সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এইটিতে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এ ব্যাখ্যা অতি অশ্রদ্ধেয় বলিয়া আমাদিগের বোধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগের ন্যায় ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য সম্মান করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে কোথাও ব্রাহ্মণের গৌরব প্রচারের

জন্য বিশেষ ব্যস্ত দেখি না। বরং অনেক স্থানে তাঁহাকে বিপরীত পথ অবলম্বন করিতে দেখি। যদি বনপর্ব্বে দুর্ব্বাসার আতিথ্য বৃত্তান্তটা মৌলিক মহাভারতের অন্তর্গত বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তিনি রকম সকম করিয়া ব্রাহ্মণঠাকুরদিগকে পাণ্ডবদিগের আশ্রম হইতে অর্দ্ধচন্দ্র প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি ঘোরতর সাম্যবাদী। গীতোক্ত ধর্ম্ম যদি কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম হয়, তবে

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ৫ ॥ ১৭

তাঁহার মতে ব্রাহ্মণে, গোরুতে, হাতিতে, কুকুরে ও চণ্ডালে সমান দেখিতে হইবে। তাহা হইলে ইহা অসম্ভব যে, তিনি ব্রাহ্মণের গৌরব বৃদ্ধির জন্য তাঁহাদের পদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইবেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কৃষ্ণ যখন আদর্শ পুরুষ, তখন বিনয়ের আদর্শ দেখাইবার জন্যই এই ভৃত্যকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। জিজ্ঞাস্য, তবে কেবল ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালনেই নিযুক্ত কেন? বয়োবৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণেরও পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত নহেন কেন? আর ইহাও বক্তব্য যে, এইরূপ বিনয়কে আমরা আদর্শ বিনয় বলিতে পারি না। এটা বিনয়ের বড়াই।

অন্যে বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণচরিত্র সময়োপযোগী। সে সময়ে ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তি বড় প্রবল ছিল; কৃষ্ণ ধূর্ত্ত, পশার করিবার জন্য এইরূপ অলৌকিক ব্রহ্মভক্তি দেখাইতেছিলেন।

আমি বলি, এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত। কেন না, আমরা এই শিশুপালবধ-পর্ব্বাধ্যায়ের অন্য অধ্যায়ে (চৌয়াল্লিশে) দেখিতে পাই যে, কৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত না থাকিয়া, তিনি ক্ষত্রিয়োচিত ও বীরোচিত কার্য্যান্তরে নিযুক্ত ছিলেন। তথায় লিখিত আছে, "মহাবাহু বাসুদেব শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ পূর্ব্বক সমাপন পর্য্যন্ত ঐ যজ্ঞ রক্ষা করিয়াছিলেন।" হয়ত দুইটা কথাই প্রক্ষিপ্ত। আমরা এ পরিচ্ছেদে এ কথার বেশী আন্দোলন আবশ্যক বিবেচনা করি না। কথাটা তেমন গুরুতর কথা নয়। কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে মহাভারতীয় উক্তি অনেক সময়েই পরস্পর অসঙ্গত, ইহা দেখাইবার জন্যই এতটা বলিলাম। নানা হাতের কাজ বলিয়া এত অসঙ্গতি।

এই রাজসূয় যজ্ঞের মহাসভায় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক শিশুপাল নামে প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজা নিহত হয়েন। পাণ্ডবদিগের সংশ্লেষ মাত্রে থাকিয়া কৃষ্ণের এই এক মাত্র অস্ত্র ধারণ বলিলেও হয়। খাণ্ডবদাহের যুদ্ধটা আমরা বড় মৌলিক বলিয়া ধরি নাই, ইহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে।

শিশুপালবধ-পর্ব্বাধ্যায়ে একটা গুরুতর ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। বলিতে গেলে, তেমন গুরুতর ঐতিহাসিক তত্ত্ব মহাভারতের আর কোথাও নাই। আমরা দেখিয়াছি যে, জরাসন্ধবধের পূর্ব্বে, কৃষ্ণ কোথাও মৌলিক মহাভারতে, দেবতা বা ঈশ্বরাবতার-স্বরূপ অভিহিত বা স্বীকৃত নহেন। জরাসন্ধবধে, সে কথাটা অমনি অস্ফুট রকম আছে। এই শিশুপালবধেই প্রথম কৃষ্ণের সমসাময়িক লোক কর্ত্তৃক তিনি জগদীশ্বর বলিয়া স্বীকৃত। এখানে কুরুবংশের তাৎকালিক নেতা ভীষ্মই এই মতের প্রচারকর্ত্তা।

এখন ঐতিহাসিক স্থূল প্রশ্নটা এই যে, যখন দেখিয়াছি যে কৃষ্ণ তাঁহার জীবনের প্রথমাংশে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকৃত নহেন, তখন জানিতে হইবে, কোন্ সময়ে তিনি প্রথম ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইলেন? তাঁহার জীবিতকালেই কি ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন? দেখিতে পাই বটে যে এই শিশুপালবধে, এবং তৎপরবর্ত্তী মহাভারতের অন্যান্য অংশে তিনি ঈশ্বর বলিয়া স্বীকৃত হইতেছেন। কিন্তু এমন হইতে পারে যে, শিশুপালবধ-পর্ব্বাধ্যায় এবং সেই সেই অংশ প্রক্ষিপ্ত। এ প্রশ্নের উত্তরে কোন্ পক্ষ অবলম্বনীয়?

এ কথার আমরা এক্ষণে কোন উত্তর দিব না। ভরসা করি ক্রমশঃ উত্তর আপনিই পরিস্ফুট হইবে। তবে ইহা বক্তব্য যে, শিশুপালবধ-পর্ব্বাধ্যায়, যদি মৌলিক মহাভারতের অংশ হয়, তবে এমন বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, এই সময়েই কৃষ্ণ ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিলেন। এবং এ বিষয়ে তাঁহার স্বপক্ষ বিপক্ষ দুই পক্ষ ছিল। তাঁহার পক্ষীয়দিগের প্রধান ভীষ্ম, এবং পাণ্ডবেরা। তাঁহার বিপক্ষদিগের এক জন নেতা শিশুপাল। শিশুপালবধ বৃত্তান্তের স্থূল মর্ম্ম এই যে, ভীষ্মাদি সেই সভামধ্যে কৃষ্ণের প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা পান। শিশুপাল তাহার বিরোধী হন। তাহাতে তুমুল বিবাদের যোগাড় হইয়া উঠে। তখন কৃষ্ণ শিশুপালকে নিহত করেন, তাহাতে সব গোল মিটিয়া যায়। যজ্ঞের বিঘ্ন বিনষ্ট হইলে, যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে নির্ব্বাহ হয়।

এ সকল কথার ভিতর যথার্থ ঐতিহাসিকতা কিছুমাত্র আছে কি না তাহার মীমাংসার পূর্ব্বে বুঝিতে হয় যে, এই শিশুপালবধ-পর্ব্বাধ্যায় মৌলিক কি না? এ কথাটার উত্তর বড় সহজ নহে। শিশুপালবধের সঙ্গে মহাভারতের স্থূল ঘটনাগুলির কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু তা না থাকিলেই যে প্রক্ষিপ্ত বলিতে হইবে, এমন নহে। ইহা সত্য বটে যে, ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থানে শিশুপাল নামে প্রবল পরাক্রান্ত এক জন রাজার কথা দেখিতে পাই। পরভাগে দেখি, তিনি নাই। মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। পাণ্ডবসভায় কৃষ্ণের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল, ইহার বিরোধী কোন কথা পাই না। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে এবং পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে শিশুপালবধের কথা আছে। আর রচনাপ্রণালী দেখিলেও শিশুপালবধ-পর্ব্বাধ্যায়কে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াই বোধ হয় বটে। মৌলিক মহাভারতের আর কয়টি অংশের ন্যায়, নাটকাংশে ইহার বিশেষ উৎকর্ষ আছে। অতএব ইহাকে অমৌলিক বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

তা না পারি, কিন্তু ইহাও স্পষ্ট বোধ হয় যে, যেমন জরাসন্ধবধ-পর্ব্বাধ্যায়ে দুই হাতের কারিগরি দেখিয়াছি, ইহাতেও সেই রকম। বরং জরাসন্ধবধের অপেক্ষা সে বৈচিত্র্য শিশুপালবধে বেশী। অতএব আমি এই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য যে, শিশুপালবধ স্থূলতঃ মৌলিক বটে, কিন্তু ইহাতে দ্বিতীয় স্তরের কবির বা অন্য পরবর্ত্তী লেখকের অনেক হাত আছে।

এক্ষণে শিশুপালবধ বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিব।

আজিকার দিনেও আমাদিগের দেশে একটি প্রথা প্রচলিত আছে যে, কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়ীতে সভা হইলে সভাস্থ সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তিকে স্রক্‌চন্দন দেওয়া হইয়া থাকে।

ইহাকে "মালাচন্দন" বলে। ইহা এখন পাত্রের গুণ দেখিয়া দেওয়া হয় না, বংশমর্য্যাদা দেখিয়া দেওয়া হয়। কুলীনের বাড়ীতে গোষ্ঠীপতিকেই মালাচন্দন দেওয়া হয়। কেন না, কুলীনের কাছে গোষ্ঠীপতি বংশই বড় মান্য। কৃষ্ণের সময়ে প্রথাটা একটু ভিন্ন প্রকার ছিল। সভাস্থ সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তিকে অর্ঘ প্রদান করিতে হইত। বংশমর্য্যাদা দেখিয়া দেওয়া হইত না, পাত্রের নিজের গুণ দেখিয়া দেওয়া হইত।

যুধিষ্ঠিরের সভায় অর্ঘ দিতে হইবে—কে ইহার উপযুক্ত পাত্র? ভারতবর্ষীয় সমস্ত রাজগণ সভাস্থ হইয়াছেন, ইহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে? এই কথা বিচার্য্য। ভীষ্ম বলিলেন, "কৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহাকে অর্ঘ প্রদান কর।"

প্রথম যখন এই কথা বলেন, তখন ভীষ্ম যে কৃষ্ণকে দেবতা বিবেচনাতেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থির করিয়াছিলেন, এমন ভাব কিছুই প্রকাশ নাই। কৃষ্ণ "তেজঃ বল ও পরাক্রম বিষয়ে শ্রেষ্ঠ" বলিয়াই তাঁহাকে অর্ঘদান করিতে বলিলেন। ক্ষত্রগুণে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়গণের শ্রেষ্ঠ, এই জন্যই অর্ঘ দিতে বলিলেন। এখানে দেখা যাইতেছে, ভীষ্ম কৃষ্ণের মনুষ্যচরিত্রই দেখিতেছেন।

এই কথানুসারে কৃষ্ণকে অর্ঘ প্রদত্ত হইল। তিনিও তাহা গ্রহণ করিলেন। ইহা শিশুপালের অসহ্য হইল। শিশুপাল ভীষ্ম, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদিগকে এককালীন তিরস্কার করিয়া যে বক্তৃতা করিলেন, বিলাতে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় উহা উক্ত হইলে উচিত দরে বিকাইত। তাঁহার বক্তৃতার প্রথম ভাগে তিনি যাহা বলিলেন, তাঁহার বাগ্মিতা বড় বিশুদ্ধ অথচ তীব্র। কৃষ্ণ রাজা নহেন, তবে এত রাজা থাকিতে তিনি অর্ঘ পান কেন? যদি স্থবির বলিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাক, তবে তাঁর বাপ বাসুদেবকে পূজা করিলে না কেন? তিনি তোমাদের আত্মীয় এবং প্রিয়চিকীর্ষু বলিয়া কি তাঁর পূজা করিয়াছ? শ্বশুর দ্রুপদ থাকিতে তাঁকে কেন? কৃষ্ণকে আচার্য্য* মনে করিয়াছ? দ্রোণাচার্য্য থাকিতে কৃষ্ণের অর্চ্চনা কেন? ঋত্বিক্ বলিয়া কি তাঁহাকে অর্ঘ দাও? বেদব্যাস থাকিতে কৃষ্ণ কেন?† ইত্যাদি।

মহারাজ শিশুপাল কথা কহিতে কহিতে অন্যান্য বাগ্মীর ন্যায় গরম হইয়া উঠিলেন, তখন লজিক ছাড়িয়া রেটরিকে উঠিলেন, বিচার ছাড়িয়া দিয়া গালি দিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবদিগকে ছাড়িয়া কৃষ্ণকে ধরিলেন। অলঙ্কারশাস্ত্র বিলক্ষণ বুঝিতেন,—প্রথমে "প্রিয়চিকীর্ষু" "অপ্রাপ্তলক্ষণ" ইত্যাদি চুট্‌কিতে ধরিয়া, শেষ "ধর্ম্মভ্রষ্ট" "দুরাত্মা" প্রভৃতি বড় বড় গালিতে উঠিলেন। পরিশেষে Climax—কৃষ্ণ ঘৃতভোজী কুকুর, দারপরিগ্রহকারী ক্লীব, ‡ ইত্যাদি। গালির একশেষ করিলেন।

শুনিয়া, ক্ষমাগুণের পরমাধার, পরমযোগী আদর্শ পুরুষ কোন উত্তর করিলেন না। কৃষ্ণের এমন শক্তি ছিল যে, তদ্দণ্ডেই তিনি শিশুপালকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম—পরবর্ত্তী ঘটনায় পাঠক তাহা জানিবেন। কৃষ্ণও কখন যে এরূপ পরুষবচনে তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, এমন দেখা যায় না। তথাপি তিনি এ তিরস্কারে ভ্রূক্ষেপও করিলেন

---

* কৃষ্ণ, অভিমন্যু, সাত্যকি প্রভৃতি মহারথীর, এবং কদাপি স্বয়ং অর্জ্জুনেরও যুদ্ধবিদ্যার আচার্য্য।

† অতএব কৃষ্ণ বিখ্যাত বেদজ্ঞ, ইহা স্বীকৃত হইল।

‡ কৃষ্ণ অনপত্য নহেন—তবে ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিরা জিতেন্দ্রিয়কে এইরূপ গালি দেয়।

না। ইউরোপীয়দিগের মত ডাকিয়া বলিলেন না, "শিশুপাল! ক্ষমা বড় ধর্ম্ম, আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম।" নীরবে শত্রুকে ক্ষমা করিলেন।

কর্ম্মকর্ত্তা যুধিষ্ঠির আহূত রাজার ক্রোধ দেখিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে গেলেন—যজ্ঞবাড়ীর কর্ম্মকর্ত্তার যেমন দস্তুর। মধুরবাক্যে কৃষ্ণের কুৎসাকারীকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বুড়া ভীষ্ম লৌহনির্ম্মিত—তাঁহার সেটা বড় ভাল লাগিল না। বুড়া স্পষ্টই বলিল, "কৃষ্ণের অর্চ্চনা যাহার অনভিমত, এমন ব্যক্তিকে অনুনয় বা সান্ত্বনা করা অনুচিত।"

তখন কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, সদর্থযুক্ত বাক্যপরম্পরায়, কেন তিনি কৃষ্ণের অর্চ্চনার পরামর্শ দিয়াছেন, তাহার কৈফিয়ৎ দিতে লাগিলেন। আমরা সেই বাক্যগুলির সারভাগ উদ্ধৃত করিতেছি, কিন্তু তাহার ভিতর একটা রহস্য আছে, আগে দেখাইয়া দিই। কতকগুলি বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, আর সকল মনুষ্যের বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের যে সকল গুণ থাকে, সে সকল গুণে কৃষ্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইজন্য তিনি অর্ঘের যোগ্য। আবার তারই মাঝে কতকগুলি কথা আছে, তাহাতে ভীষ্ম বলিতেছেন যে, কৃষ্ণ স্বয়ং জগদীশ্বর, এই জন্য কৃষ্ণ সকলের অর্চ্চনীয়। আমরা দুই রকম পৃথক্ পৃথক্ দেখাইতেছি, পাঠক তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করুন। ভীষ্ম বলিলেন, "এই মহতী নৃপসভায় একজন মহীপালও দৃষ্ট হয় না, যাহাকে কৃষ্ণ তেজোবলে পরাজয় করেন নাই।"

এ গেল মনুষ্যত্ববাদ—তার পরেই দেবত্ববাদ—

"অচ্যুত কেবল আমাদিগের অর্চ্চনীয় এমত নহে, সেই মহাভুজ ত্রিলোকীর পূজনীয়। তিনি যুদ্ধে অসংখ্য ক্ষত্রিয়বর্গের পরাজয় করিয়াছেন, এবং অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।"

পুনশ্চ, মনুষ্যত্ব—

"কৃষ্ণ জন্মিয়া অবধি যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, লোকে মৎসন্নিধানে পুনঃ পুনঃ তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিয়াছে। তিনি অত্যন্ত বালক হইলেও আমরা তাঁহার পরীক্ষা করিয়া থাকি। কৃষ্ণের শৌর্য্য, বীর্য্য, কীর্ত্তি ও বিজয় প্রভৃতি সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া"—

পরে, সঙ্গে সঙ্গে দেবত্ববাদ,

"সেই ভূতসুখাবহ জগদর্চ্চিত অচ্যুতের পূজা বিধান করিয়াছি।"

পুনশ্চ, মনুষ্যত্ব, পরিষ্কার রকম—

"কৃষ্ণের পূজ্যতা বিষয়ে দুটী হেতু আছে; তিনি নিখিল বেদবেদাঙ্গ-পারদর্শী ও সমধিক বলশালী। ফলতঃ **মনুষ্যলোকে তাদৃশ বলবান্ এবং বেদবেদাঙ্গ-সম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রত্যক্ষ হওয়া সুকঠিন।** দান, দাক্ষ্য, শ্রুত, শৌর্য্য, লজ্জা, কীর্ত্তি, বুদ্ধি, বিনয়, অনুপম শ্রী, ধৈর্য্য ও সন্তোষ প্রভৃতি সমুদায় গুণাবলী কৃষ্ণে নিয়ত বিরাজিত রহিয়াছে। অতএব সেই সর্ব্বগুণসম্পন্ন আচার্য্য, পিত., ও গুরুস্বরূপ পূজার্হ কৃষ্ণের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন তোমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তিনি ঋত্বিক্, গুরু, সম্বন্ধী, স্নাতক, রাজা এবং প্রিয়পাত্র। এই নিমিত্ত অচ্যুত অর্চ্চিত হইয়াছেন।"*

---

* প্রথম অধ্যায়ে যাহা বলিয়াছি—অনুশীলনধর্ম্মের চরমাদর্শ শ্রীকৃষ্ণ, এই ভীষ্মোক্তিতে তাহা পরিস্ফুট হইতেছে।

পুনশ্চ দেবত্ববাদ,

"কৃষ্ণই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, তিনিই অব্যক্ত প্রকৃতি, সনাতন, কর্ত্তা, এবং সর্ব্বভূতের অধীশ্বর, সুতরাং পরমপূজনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বুদ্ধি, মন, মহত্ত্ব, পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূত, সমুদায়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, দিক্‌বিদিক্ সমুদায়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছে। ইত্যাদি।"

ভীষ্ম বলিয়াছেন, কৃষ্ণের পূজার দুইটি কারণ—(১) যিনি বলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, (২) তাঁহার তুল্য বেদবেদাঙ্গপারদর্শী কেহ নহে। অদ্বিতীয় পরাক্রমের প্রমাণ এই গ্রন্থে অনেক দেওয়া গিয়াছে। কৃষ্ণের অদ্বিতীয় বেদজ্ঞতার প্রমাণ গীতা। যাহা আমরা ভগবদ্গীতা বলিয়া পাঠ করি, তাহা কৃষ্ণ-প্রণীত নহে। উহা ব্যাস-প্রণীত বলিয়া খ্যাত—"বৈয়াসিকী সংহিতা" নামে পরিচিত। উহার প্রণেতা ব্যাসই হউন আর যেই হউন, তিনি ঠিক কৃষ্ণের মুখের কথাগুলি নোট করিয়া রাখিয়া ঐ গ্রন্থ সঙ্কলন করেন নাই। উহাকে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াও আমার বোধ হয় না। কিন্তু গীতা কৃষ্ণের ধর্ম্মমতের সঙ্কলন, ইহা আমার বিশ্বাস। তাঁহার মতাবলম্বী কোন মনীষী কর্ত্তৃক উহা এই আকারে সঙ্কলিত, এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। এখন বলিবার কথা এই যে, গীতোক্ত ধর্ম্ম যাঁহার প্রণীত, তিনি স্পষ্টতঃই অদ্বিতীয় বেদবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি বেদকে সর্ব্বোচ্চ স্থানে বসাইতেন না—কখন বা বেদের একটু একটু নিন্দা করিতেন। কিন্তু তথাপি অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ ব্যতীত অন্যের দ্বারা গীতোক্ত ধর্ম্ম প্রণীত হয় নাই, ইহা যে গীতা ও বেদ উভয়ই অধ্যয়ন করে, সে অনায়াসেই বুঝিতে পারে।

যিনি এইরূপ পরাক্রমে ও পাণ্ডিত্যে, বীর্য্যে ও শিক্ষায়, কর্ম্মে ও জ্ঞানে, নীতিতে ও ধর্ম্মে, দয়ায় ও ক্ষমায়, তুল্যরূপেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই আদর্শ পুরুষ।

দশম পরিচ্ছেদ—শিশুপালবধ

ভীষ্ম কথা সমাপ্ত করিয়া, শিশুপালকে নিতান্ত অবজ্ঞা করিয়া বলিলেন, "যদি কৃষ্ণের পূজা শিশুপালের নিতান্ত অসহ্য বোধ হইয়া থাকে, তবে তাঁহার যেরূপ অভিরুচি হয়, করুন।" অর্থাৎ "ভাল না লাগে, উঠিয়া যাও।"

পরে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"কৃষ্ণ অর্চ্চিত হইলেন দেখিয়া সুনীথনামা এক মহাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষ ক্রোধে কম্পান্বিতকলেবর ও আরক্তনেত্র হইয়া সকল রাজগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, 'আমি পূর্ব্বে সেনাপতি ছিলাম, সম্প্রতি যাদব ও পাণ্ডবকুলের সমূলোন্মূলন করিবার নিমিত্ত অদ্যই সমরসাগরে অবগাহন করিব।' চেদিরাজ শিশুপাল, মহীপালগণের অবিচলিত উৎসাহ সন্দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মাইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, যাহাতে যুধিষ্ঠিরের অভিষেক এবং কৃষ্ণের পূজা না হয়, তাহা আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রাজারা নির্ব্বেদ প্রযুক্ত ক্রোধপরবশ হইয়া মন্ত্রণা করিতেছেন দেখিয়া কৃষ্ণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহারা যুদ্ধার্থ পরামর্শ করিতেছেন।"

রাজা যুধিষ্ঠির সাগরসদৃশ রাজমণ্ডলকে রোষপ্রচলিত দেখিয়া প্রাজ্ঞতম পিতামহ ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে পিতামহ! এই মহান্ রাজসমুদ্র সংক্ষোভিত হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, অনুমতি করুন।"

শিশুপালবধের ইহাই যথার্থ কারণ। শিশুপালকে বধ না করিলে তিনি রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিতেন।

শিশুপাল আবার ভীষ্মকে ও কৃষ্ণকে কতকগুলা গালিগালাজ করিলেন।

ভীষ্মকে ও কৃষ্ণকে এবারেও শিশুপাল বড় বেশি গালি দিলেন। "দুরাত্মা," "যাহাকে বালকেও ঘৃণা করে," "গোপাল," "দাস" ইত্যাদি। পরম যোগী শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার তাহাকে ক্ষমা করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। কৃষ্ণ যেমন বলের আদর্শ, ক্ষমার তেমনি আদর্শ। ভীষ্ম প্রথমে কিছু বলিলেন না, কিন্তু ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শিশুপালকে আক্রমণ করিবার জন্য উত্থিত হইলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া শিশুপালের পূর্ব্ববৃত্তান্ত তাঁহাকে শুনাইতে লাগিলেন। এই বৃত্তান্ত অত্যন্ত অসম্ভব, অনৈসর্গিক ও অবিশ্বাসযোগ্য। সে কথা এই—

শিশুপালের জন্মকালে তাঁহার তিনটি চক্ষু ও চারিটি হাত হইয়াছিল, এবং তিনি গর্দ্দভের মত চীৎকার করিয়াছিলেন। এরূপ দুর্লক্ষণযুক্ত পুত্রকে তাঁহার মাতাপিতা পরিত্যাগ করাই শ্রেয় বিবেচনা করিল। এমন সময়ে, দৈববাণী হইল। সে কালে যাঁহারা আষাঢ়ে গল্প প্রস্তুত করিতেন, দৈববাণীর সাহায্য ভিন্ন তাঁহারা গল্প জমাইতে পারিতেন না। দৈববাণী বলিল, "বেশ ছেলে, ফেলিয়া দিও না, ভাল করিয়া প্রতিপালন কর; যমেও ইহার কিছু করিতে পারিবে না। তবে যিনি ইহাকে মারিবেন, তিনি জন্মিয়াছেন।" কাজেই বাপ মা জিজ্ঞাসা করিল, "বাছা দৈববাণী, কে মারিবে নামটা বলিয়া দাও না?" এখন দৈববাণী যদি এত কথাই বলিলেন, তবে কৃষ্ণের নামটা বলিয়া দিলেই গোল মিটিত। কিন্তু তা হইলে গল্পের Plot-interest হয় না। অতএব তিনি কেবল বলিলেন, "যার কোলে দিলে ছেলের বেশী হাত দুইটা খসিয়া যাইবে, আর বেশী চোখটা মিলাইয়া যাইবে, সেই ইহাকে মারিবে।"

কাজে কাজেই শিশুপালের বাপ দেশের লোক ধরিয়া কোলে ছেলে দিতে লাগিলেন। কাহারও কোলে গেলে ছেলের বেশী হাত বা চোখ ঘুচিল না। কৃষ্ণকে শিশুপালের সমবয়স্ক বলিয়াই বোধ হয়; কেন না, উভয়েই এক সময়ে রুক্মিণী-বিবাহ করিবার উমেদার ছিলেন, এবং দৈববাণীর 'জন্মগ্রহণ করিয়াছেন' কথাতেও ঐরূপ বুঝায়। কিন্তু তথাপি কৃষ্ণ দ্বারকা হইতে চেদিদেশে গিয়া শিশুপালকে কোলে করিলেন। তখনই শিশুপালের দুইটা হাত খসিয়া গেল, আর একট চোখ মিলাইয়া গেল।

শিশুপালের মা কৃষ্ণের পিসীমা। পিসীমা কৃষ্ণকে জবরদস্তী করিয়া ধরিলেন, "বাছা! আমার ছেলে মারিতে পারিবে না।" কৃষ্ণ স্বীকার করিলেন, শিশুপালের বধোচিত শত অপরাধ তিনি ক্ষমা করিলেন।

যাহা অনৈসর্গিক, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। বোধ করি পাঠকেরাও

করেন না। কোন ইতিহাসে অনৈসর্গিক ব্যাপার পাইলে তাহা লেখকের বা তাঁহার পূর্ব্বগামীদিগের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন। ক্ষমাগুণের মাহাত্ম্য বুঝে না, এবং কৃষ্ণচরিত্রের মাহাত্ম্য বুঝে না, এমন কোন কবি, কৃষ্ণের অদ্ভুত ক্ষমাশীলতা বুঝিতে না পারিয়া, লোককে শিশুপালের প্রতি ক্ষমার কারণ বুঝাইবার জন্য এই অদ্ভুত উপন্যাস প্রস্তুত করিয়াছেন। কাণা কাণাকে বুঝায়, হাতী কুলোর মত। অসুরবধের জন্য যে কৃষ্ণ অবতীর্ণ, তিনি যে অসুরের অপরাধ পাইয়া ক্ষমা করিবেন, ইহা অসঙ্গত বটে। কৃষ্ণকে অসুরবধার্থ অবতীর্ণ মনে করিলে, এই ক্ষমাগুণও বুঝা যায় না, তাঁহার কোন গুণই বুঝা যায় না। কিন্তু তাঁহাকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া ভাবিলে, মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ জন্যই অবতীর্ণ, ইহা ভাবিলে, তাঁহার সকল কার্য্যই বিশদরূপে বুঝা যায়। কৃষ্ণচরিত্র স্বরূপ রত্নভাণ্ডার খুলিবার চাবি এই আদর্শপুরুষতত্ত্ব।

শিশুপালের গোটাকতক কটূক্তি কৃষ্ণ সহ্য করিয়াছিলেন বলিয়াই যে কৃষ্ণের ক্ষমাগুণের প্রশংসা করিতেছি, এমত নহে। শিশুপাল ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিল। কৃষ্ণ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করিলে, সে সময় পাইয়া, দ্বারকা দগ্ধ করিয়া পলাইয়াছিল। কদাচিৎ ভোজরাজ রৈবতক বিহারে গেলে সেই সময়ে আসিয়া শিশুপাল অনেক যাদবকে বিনষ্ট ও বদ্ধ করিয়াছিল। বসুদেবের অশ্বমেধের ঘোড়া চুরি করিয়াছিল। এটা তাৎকালিক ক্ষত্রিয়দিগের নিকট বড় গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য। এ সকলও কৃষ্ণ ক্ষমা করিয়াছিলেন। আর কেবল শিশুপালেরই যে তিনি বৈরাচরণ ক্ষমা করিয়াছিলেন, এমত নহে। জরাসন্ধও তাঁহাকে বিশেষরূপে পীড়িত করিয়াছিল। স্বতঃ হৌক, পরতঃ হৌক, কৃষ্ণ যে জরাসন্ধের নিপাত সাধনে সক্ষম, তাহা দেখাইয়াছি। কিন্তু যত দিন না জরাসন্ধ রাজমণ্ডলীকে আবদ্ধ করিয়া পশুপতির নিকট বলি দিতে প্রস্তুত হইল, তত দিন তিনি তাহার প্রতি কোন প্রকার বৈরাচরণ করিলেন না। এবং পাছে যুদ্ধ হইয়া লোকক্ষয় হয় বলিয়া, নিজে সরিয়া গিয়া রৈবতকে গড় বাঁধিয়া রহিলেন। সেইরূপ যত দিন শিশুপাল কেবল তাঁহারই শত্রুতা করিয়াছিল, তত দিন কৃষ্ণ তাহার কোন প্রকার অনিষ্ট করেন নাই। তার পর যখন সে পাণ্ডবের যজ্ঞের বিঘ্ন ও ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের বিঘ্ন করিতে উদ্যুক্ত হইল, কৃষ্ণ তখন তাহাকে বধ করিলেন। আদর্শ পুরুষের ক্ষমা, ক্ষমাপরায়ণতার আদর্শ, এজন্য কেহ তাঁহার অনিষ্ট করিলে তিনি তাহার কোন প্রকার বৈরসাধন করিতেন না, কিন্তু আদর্শ পুরুষ দণ্ডপ্রণেতারও আদর্শ, এজন্য কেহ সমাজের অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হইলে, তিনি তাহাকে দণ্ডিত করিতেন।

কৃষ্ণের ক্ষমাগুণের প্রসঙ্গ উঠিলে কর্ণ দুর্য্যোধন প্রতি তিনি যে ক্ষমা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। সে উদ্যোগপর্ব্বের কথা, এখন বলিবার নয়। কর্ণ দুর্য্যোধন যে অবস্থায় তাঁহাকে বন্ধন করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, সে অবস্থায় আর কাহাকে কেহ বন্ধনের উদ্যোগ করিলে বোধ হয় যিশু ভিন্ন অন্য কোন মনুষ্যই শত্রুকে মার্জ্জনা করিতেন না। কৃষ্ণ তাহাদের ক্ষমা করিলেন, পরে বন্ধুভাবে কর্ণের সঙ্গে কথোপকথন করিলেন, এবং মহাভারতের যুদ্ধে তাহাদের বিরুদ্ধে কখন অস্ত্র ধারণ করিলেন না।

ভীষ্মে ও শিশুপালে আরও কিছু বকাবকি হইল। ভীষ্ম বলিলেন, "শিশুপাল কৃষ্ণের তেজেই তেজস্বী, তিনি এখনই শিশুপালের তেজে হরণ করিবেন।" শিশুপাল জ্বলিয়া উঠিয়া ভীষ্মকে অনেক গালাগালি দিয়া শেষে বলিল, "তোমার জীবন এই ভূপালগণের অনুগ্রহাধীন, ইঁহারা মনে করিলেই তোমার প্রাণসংহার করিতে পারেন।" ভীষ্ম তখনকার ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধ—তিনি বলিলেন, "আমি ইহাদিগকে তৃণতুল্য বোধ করি না।" শুনিয়া সমবেত রাজমণ্ডলী গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল, "এই ভীষ্মকে পশুবৎ বধ কর অথবা প্রদীপ্ত হুতাশনে দগ্ধ কর।" ভীষ্ম উত্তর করিলেন, 'যা হয় কর, আমি এই তোমাদের মস্তকে পদার্পণ করিলাম।"

বুড়াকে জোরেও আঁটিবার যো নাই, বিচারেও আঁটিবার যো নাই। ভীষ্ম তখন রাজগণকে মীমাংসার সহজ উপায়টা দেখাইয়া দিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই ;—"ভাল, কৃষ্ণের পূজা করিয়াছি বলিয়া তোমরা গোল করিতেছ ; তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব মানিতেছ না। গোলে কাজ কি, তিনি ত সম্মুখেই আছেন—একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ না ? যাঁহার মরণকণ্ডূতি থাকে, তিনি একবার কৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া দেখুন না ?"

শুনিয়া কি শিশুপাল চুপ করিয়া থাকিতে পারে ? শিশুপাল কৃষ্ণকে ডাকিয়া বলিল, "আইস, সংগ্রাম কর, তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি।"

এখন, কৃষ্ণ প্রথম কথা কহিলেন। কিন্তু শিশুপালের সঙ্গে নহে। ক্ষত্রিয় হইয়া কৃষ্ণ যুদ্ধে আহূত হইয়াছেন, আর যুদ্ধে বিমুখ হইবার পথ রহিল না ; এবং যুদ্ধেরও ধর্ম্মতঃ প্রয়োজন ছিল। তখন সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া শিশুপালকৃত পূর্ব্বাপরাধ সকল একটি একটি করিয়া বিবৃত করিলেন। তার পর বলিলেন, "এত দিন ক্ষমা করিয়াছি। আজ ক্ষমা করিব না।"

এই কৃষ্ণোক্তি মধ্যে এমন কথা আছে যে, তিনি পিতৃষ্বসার অনুরোধেই তাহার এত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বেই যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করিয়া হয়ত পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, এ কথাটাও প্রক্ষিপ্ত ? আমাদের উত্তর এই যে, ইহা প্রক্ষিপ্ত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। ইহাতে অনৈসর্গিকতা কিছুই নাই , বরং ইহা বিশেষরূপে স্বাভাবিক ও সম্ভব। ছেলে দুরন্ত, কৃষ্ণদ্বেষী ; কৃষ্ণও বলবান্, মনে করিলে শিশুপালকে মাছির মত টিপিয়া মারিতে পারেন, এমন অবস্থায় পিসী যে ভ্রাতুষ্পুত্রকে অনুরোধ করিবেন, ইহা খুব সম্ভব। ক্ষমা-পরায়ণ কৃষ্ণ শিশুপালকে নিজ গুণেই ক্ষমা করিলেও পিসীর অনুরোধ স্মরণ রাখিবেন, ইহাও খুব সম্ভব। আর পিতৃষ্বসার পুত্রকে বধ করা আপাততঃ নিন্দনীয় কার্য্য, কৃষ্ণ পিসীর খাতির কিছুই করিলেন না, এ কথাটা উঠিতেও পারিত। সে কথার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া চাই। এ জন্য কৃষ্ণের এই উক্তি খুব সঙ্গত।

তার পরেই আবার একটা অনৈসর্গিক কাণ্ড উপস্থিত। শ্রীকৃষ্ণ, শিশুপালের বধ জন্য আপনার চক্রাস্ত্র স্মরণ করিলেন। স্মরণ করিবা মাত্র চক্র তাঁহার হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন কৃষ্ণ চক্রের দ্বারা শিশুপালের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন।

বোধ করি এ অনৈসর্গিক ব্যাপার কোন পাঠকেই ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ

করিবেন না। যিনি বলিবেন, কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার, ঈশ্বরে সকলেই সম্ভবে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি চক্রের দ্বারা শিশুপালকে বধ করিতে হইবে, তবে সে জন্য কৃষ্ণের মনুষ্যশরীর ধারণের কি প্রয়োজন ছিল? চক্র ত চেতনাবিশিষ্ট জীবের ন্যায় আজ্ঞামত যাতায়াত করিতে পারে দেখা যাইতেছে, তবে বৈকুণ্ঠ হইতেই বিষ্ণু তাহাকে শিশুপালের শিরশ্ছেদ জন্য পাঠাইতে পারেন নাই কেন? এ সকল কাজের জন্য মনুষ্য-শরীর গ্রহণের প্রয়োজন কি? ঈশ্বর কি আপনার নৈসর্গিক নিয়মে বা কেবল ইচ্ছা মাত্র একটা মনুষ্যের মৃত্যু ঘটাইতে পারেন না যে, তজ্জন্য তাঁহাকে মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে হইবে? এবং মনুষ্য-দেহ ধারণ করিলেও কি তিনি এমনই হীনবল হইবেন যে, স্বীয় মানুষী শক্তিতে একটা মানুষের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না, ঐশী শক্তির দ্বারা দৈব অস্ত্রকে স্মরণ করিয়া আনিতে হইবে? ঈশ্বর যদি এরূপ অল্পশক্তিমান্ হন, তবে মানুষের সঙ্গে তাঁহার তফাৎ বড় অল্প। আমরাও কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করি না—কিন্তু আমাদের মতে কৃষ্ণ মানুষী শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না, এবং মানুষী শক্তির দ্বারাই সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতেন। এই অনৈসর্গিক চক্রাস্ত্রস্মরণবৃত্তান্ত যে অলীক ও প্রক্ষিপ্ত, কৃষ্ণ যে মানুষযুদ্ধেই শিশুপালকে নিহত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ মহাভারতেই আছে। উদ্যোগপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্র শিশুপালবধের ইতিহাস কহিতেছেন, যথা,—

"পূর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞে, চেদিরাজ ও করূষক প্রভৃতি যে সমস্ত ভূপাল সর্ব্বপ্রকার উদ্যোগবিশিষ্ট হইয়া বহুসংখ্যক বীরপুরুষ সমভিব্যাহারে একত্র সমবেত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে চেদিরাজতনয় সূর্য্যের ন্যায় প্রতাপশালী, শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর, ও যুদ্ধে অজেয়। ভগবান্ কৃষ্ণ ক্ষণকাল মধ্যে তাঁহার পরাজয় করিয়া ক্ষত্রিয়গণের উৎসাহ ভঙ্গ করিয়াছিলেন; এবং করূষরাজপ্রমুখ নরেন্দ্রবর্গ যে শিশুপালের সম্মান বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সিংহস্বরূপ কৃষ্ণকে রথারূঢ় নিরীক্ষণ করিয়া চেদিপতিরে পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় পলায়ন করিলেন, তিনি তখন অবলীলাক্রমে শিশুপালের প্রাণসংহার পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের যশ বা মান বর্দ্ধন করিলেন।"—২২ অধ্যায়।

এখানে ত চক্রের কোন কথা দেখিতে পাই না। দেখিতে পাই, কৃষ্ণকে রথারূঢ় হইয়া রীতিমত মানুষিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। এবং তিনি মানুষযুদ্ধেই শিশুপাল ও তাহার অনুচরবর্গকে পরাভূত করিয়াছিলেন। যেখানে এক গ্রন্থে একই ঘটনার দুই প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাই—একটি নৈসর্গিক, অপরটি অনৈসর্গিক, সেখানে অনৈসর্গিক বর্ণনাকে অগ্রাহ্য করিয়া নৈসর্গিককে ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করাই বিধেয়। যিনি পুরাণেতিহাসের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করিবেন, তিনি যেন এই সোজা কথাটা স্মরণ রাখেন। নহিলে সকল পরিশ্রমই বিফল হইবে।

শিশুপালবধের আমরা যে সমালোচনা করিলাম, তাহাতে উক্ত ঘটনার স্থূল ঐতিহাসিক তত্ত্ব আমরা এইরূপ দেখিতেছি। রাজসূয়ের মহাসভায় সকল ক্ষত্রিয়ের অপেক্ষা কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত হয়। ইহাতে শিশুপাল প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষত্রিয় রুষ্ট হইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিবার জন্য যুদ্ধ উপস্থিত করে। কৃষ্ণ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করেন এবং শিশুপালকে নিহত করেন। পরে যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সমাপিত হয়।

আমরা দেখিয়াছি, কৃষ্ণ যুদ্ধে সচরাচর বিদ্বেষবিশিষ্ট। তবে অর্জ্জুনাদি যুদ্ধক্ষম পাণ্ডবেরা থাকিতে, তিনি যজ্ঞঘ্নদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? রাজসূয়ে যে কার্য্যের ভার কৃষ্ণের উপর ছিল, তাহা স্মরণ করিলেই পাঠক কথার উত্তর পাইবেন। যজ্ঞরক্ষা ভার কৃষ্ণের উপর ছিল, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যে কাজের ভার যাহার উপর থাকে, তাহা তাহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম (Duty)। আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের সাধন জন্যই কৃষ্ণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ—পাণ্ডবের বনবাস

রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিয়া গেলেন। সভাপর্ব্বে আর তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তবে এক স্থানে তাঁহার নাম হইয়াছে।

দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে হারিলেন। তার পর দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, এবং সভামধ্যে বস্ত্রহরণ। মহাভারতের এই ভাগের মত, কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট রচনা জগতের সাহিত্যে বড় দুর্লভ। কিন্তু কাব্য আমাদের এখন সমালোচনীয় নহে—ঐতিহাসিক মূল্য কিছু আছে কি না পরীক্ষা করিতে হইবে। যখন দুঃশাসন সভা মধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করিতে প্রবৃত্ত, নিরুপায় দ্রৌপদী তখন কৃষ্ণকে মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন। সে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি :—

"গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়!"

এবং সে সম্বন্ধে আমাদিগের যাহা বলিবার, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

তার পর বনপর্ব্ব। বনপর্ব্বে তিনবার মাত্র কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রথম, পাণ্ডবেরা বনে গিয়াছেন শুনিয়া বৃষ্ণিভোজেরা সকলে তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিয়াছিল—কৃষ্ণও সেই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইহা সম্ভব। কিন্তু যে অংশে এই বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা মহাভারতের প্রথম স্তরগতও নহে, দ্বিতীয় স্তরগতও নহে। রচনার সাদৃশ্য কিছুমাত্র নাই। চরিত্রগত সঙ্গতি কিছুমাত্র নাই। কৃষ্ণকে আর কোথাও রাগিতে দেখা যায় না, কিন্তু এখানে, যুধিষ্ঠিরের কাছে আসিয়াই কৃষ্ণ চটিয়া লাল। কারণ কিছুই নাই, কেহ শত্রু উপস্থিত নাই, কেহ কিছু বলে নাই, কেবল দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে মারিয়া ফেলিতে হইবে, এই বলিয়াই এত রাগ যে, যুধিষ্ঠির বহুতর স্তবস্তুতি মিনতি করিয়া তাঁহাকে থামাইলেন। যে কবি লিখিয়াছেন যে, কৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে মহাভারতের যুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন না, এ কথা সে কবির লেখা নয়, ইহা নিশ্চিত। তার পর এখনকার হোঁৎকাদিগের মত কৃষ্ণ বলিয়া বসিলেন, "আমি থাকিলে এতটা হয়!—আমি বাড়ী ছিলাম না।" তখন যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ কোথায় গিয়াছিলেন, সেই পরিচয় লইতে লাগিলেন। তাহাতে শাল্ববধের কথাটা উঠিল। তাহার সঙ্গে কৃষ্ণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই পরিচয় দিলেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। সৌভ নামে তাহার রাজধানী। সেই রাজধানী আকাশময় উড়িয়া উড়িয়া বেড়ায়; শাল্ব তাহার উপর থাকিয়া যুদ্ধ করে। সেই অবস্থায় কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ হইল। যুদ্ধের সময়ে কৃষ্ণের বিস্তর কাঁদাকাটি। শাল্ব একটা মায়া বসুদেব গড়িয়া তাহাকে কৃষ্ণের সম্মুখে বধ করিল দেখিয়া কৃষ্ণ কাঁদিয়া মূর্চ্ছিত। এ জগদীশ্বরের

চিত্র নহে, কোন মানুষিক ব্যাপারের চিত্রও নহে। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে এবং পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে এই সকল ব্যাপারের কোন প্রসঙ্গও নাই। ভরসা করি, কোন পাঠক এ সকল উপন্যাসের সমালোচনার প্রত্যাশা করেন না।

তার পরে দুর্ব্বাসার সশিষ্য ভোজন। সে ঘোরতর অনৈসর্গিক ব্যাপার। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে সে কথা থাকিলেও তাহার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। সুতরাং তাহা আমাদের সমালোচনীয় নহে।

তার পর বনপর্ব্বের শেষের দিকে মার্কণ্ডেয়সমস্যা-পর্ব্বাধ্যায়ে আবার কৃষ্ণকে দেখিতে পাই। পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে আসিয়াছেন শুনিয়া, কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আবার দেখিতে আসিয়াছিলেন—এবার একা নহে; ছোট ঠাকুরাণীটি সঙ্গে। মার্কণ্ডেয়সমস্যা-পর্ব্বাধ্যায় একখানি বৃহৎ গ্রন্থ বলিলেও হয়। কিন্তু মহাভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, এমন কথা উহাতে কিছুই নাই। সমস্তটাই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়। পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে মার্কণ্ডেয়-সমস্যা-পর্ব্বাধ্যায়ের কথা আছে বটে, কিন্তু অনুক্রমণিকাধ্যায়ে নাই। মহাভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের রচনার সঙ্গে ইহার কোন সাদৃশ্যই নাই। কিন্তু ইহা মৌলিক মহাভারতের অংশ কি না, তাহা আমাদের বিচার করিবারও কোন প্রয়োজন রাখে না। কেন না, কৃষ্ণ এখানে কিছুই করেন নাই। আসিয়া যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী প্রভৃতিকে কিছু মিষ্ট কথা বলিলেন, উত্তরে কিছু মিষ্ট কথা শুনিলেন। তার পর কয় জনে মিলিয়া ঋষি ঠাকুরের আষাঢ়ে গল্প সকল শুনিতে লাগিলেন।

মার্কণ্ডেয়ের কথা ফুরাইলে দ্রৌপদী সত্যভামাতে কিছু কথা হইল। পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে দ্রৌপদী সত্যভামার সংবাদ গণিত হইয়াছে; কিন্তু অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ইহার কোন প্রসঙ্গ নাই। ইহা যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

তাহার পর বিরাটপর্ব্ব। বিরাটপর্ব্বে কৃষ্ণ দেখা দেন নাই—কেবল শেষে উত্তরার বিবাহে আসিয়া উপস্থিত। আসিয়া যে সকল কথাবার্ত্তা বলিয়াছিলেন, তাহা উদ্যোগপর্ব্বে আছে। উদ্যোগপর্ব্বে কৃষ্ণের অনেক কথা আছে। ক্রমশঃ সমালোচনা করিব।

পঞ্চম খণ্ড

উপপ্লব্য

> সর্ব্বভূতাত্মভূতায় ভূতাদিনিধনায় চ।
> অক্রোধদ্রোহমোহায় তস্মৈ শান্তাত্মনে নমঃ॥
>
> শান্তিপর্ব্ব, ৪৭ অধ্যায়ঃ।

প্রথম পরিচ্ছেদ—মহাভারতের যুদ্ধের সেনোদ্যোগ

এক্ষণে উদ্যোগপর্ব্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

সমাজে অপরাধী আছে। মনুষ্যগণ পরস্পরের প্রতি অপরাধ সর্ব্বদাই করিতেছে। সেই অপরাধের দমন সমাজে একটি মুখ্য কার্য্য। রাজনীতি রাজদণ্ড ব্যবস্থাশাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র আইন আদালত সকলেরই একটি মুখ্য উদ্দেশ্য তাই।

অপরাধীর পক্ষে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, নীতিশাস্ত্রে তৎসম্বন্ধে দুইটি মত আছে। এক মত এই যে:—দণ্ডের দ্বারা অর্থাৎ বলপ্রয়োগের দ্বারা দোষের দমন করিতে হইবে—আর একটি মত এই যে, অপরাধ ক্ষমা করিবে। বল এবং ক্ষমা দুইটি পরস্পর বিরোধী—কাজেই দুইটি মত যথার্থ হইতে পারে না। অথচ দুইটির মধ্যে একটি যে একেবারে পরিহার্য্য এমন হইতে পারে না। সকল অপরাধ ক্ষমা করিলে সমাজের ধ্বংস হয়, সকল অপরাধ দণ্ডিত করিলে মনুষ্য পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব বল ও ক্ষমার সামঞ্জস্য নীতিশাস্ত্রের মধ্যে একটি অতি কঠিন তত্ত্ব। আধুনিক সুসভ্য ইউরোপ ইহার সামঞ্জস্যে অদ্যাপি পৌঁছিতে পারিলেন না। ইউরোপীয়দিগের খ্রীষ্টধর্ম্ম বলে, সকল অপরাধ ক্ষমা কর; তাহাদিগের রাজনীতি বলে, সকল অপরাধ দণ্ডিত কর। ইউরোপে ধর্ম্ম অপেক্ষা রাজনীতি প্রবল, এজন্য ক্ষমা ইউরোপে লুপ্তপ্রায়, এবং বলের প্রবল প্রতাপ।

বল ও ক্ষমার যথার্থ সামঞ্জস্য এই উদ্যোগপর্ব্বমধ্যে প্রধান তত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণই তাহার মীমাংসক, প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণই উদ্যোগপর্ব্বের নায়ক। বল ও ক্ষমা উভয়ের প্রয়োগ সম্বন্ধে তিনি যেরূপ আদর্শ কার্য্যতঃ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। যে তাহার নিজের অনিষ্ট করে, তিনি তাহাকে ক্ষমা করেন, এবং যে লোকের অনিষ্ট করে, তিনি বলপ্রয়োগপূর্ব্বক তাহার প্রতি দণ্ডবিধান করেন। কিন্তু এমন অনেক স্থলে ঘটে, যেখানে ঠিক এই বিধান অনুসারে কার্য্য চলে না, অথবা এই বিধানানুসারে বল কি ক্ষমা প্রযোজ্য তাহার বিচার কঠিন হইয়া পড়ে। মনে কর, কেহ আমার সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছে। আপনার সম্পত্তি উদ্ধার সামাজিক ধর্ম্ম। যদি সকলেই আপনার সম্পত্তি উদ্ধারে পরাঙ্মুখ হয় তবে সমাজ অচিরে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। অতএব অপহৃত সম্পত্তির উদ্ধার করিতে হইবে। এখনকার দিনে সভ্য সমাজ সকলে, আইন আদালতের সাহায্যে, আমরা আপন আপন সম্পত্তির উদ্ধার করিতে পারি। কিন্তু যদি এমন ঘটে যে, আইন আদালতের সাহায্য প্রাপ্য নহে, সেখানে বল—

প্রয়োগ ধর্ম্মসঙ্গত কি না? বল ও ক্ষমার সামঞ্জস্য সম্বন্ধে এই সকল কূটতর্ক উঠিয়া থাকে। কার্য্যতঃ প্রায় দেখিতে পাই যে, যে বলবান্, সে বলপ্রয়োগের দিকেই যায়। যে দুর্ব্বল, সে ক্ষমার দিকেই যায়। কিন্তু যে বলবান্ অথচ ক্ষমাবান্, তাহার কি করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ আদর্শ পুরুষের এরূপ স্থলে কি কর্ত্তব্য? তাহার মীমাংসা উদ্যোগ-পর্ব্বের আরম্ভেই আমরা কৃষ্ণবাক্যে পাইতেছি।

ভরসা করি, পাঠকেরা সকলেই জানেন যে, পাণ্ডবেরা দ্যূতক্রীড়ায় শকুনির নিকট হারিয়া এই পণে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, আপনাদিগের রাজ্য দুর্য্যোধনকে সম্প্রদান করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করিবেন। তৎপরে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন; যদি অজ্ঞাতবাসের ঐ এক বৎসরের মধ্যে কেহ তাঁহাদিগের পরিচয় পায়, তবে তাঁহারা রাজ্য পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবেন না, পুনর্ব্বার দ্বাদশ বর্ষ জন্য বনগমন করিবেন। কিন্তু যদি কেহ পরিচয় না পায়, তবে তাঁহারা দুর্য্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। এক্ষণে তাঁহারা দ্বাদশ বর্ষ বনবাস সম্পূর্ণ করিয়া, বিরাটরাজের পুরীমধ্যে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস সম্পন্ন করিয়াছেন, ঐ বৎসরের মধ্যে কেহ তাঁহাদিগের পরিচয় পায় নাই। অতএব তাঁহারা দুর্য্যোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পাইবার ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ অধিকারী। কিন্তু দুর্য্যোধন রাজ্য ফিরাইয়া দিবে কি? না দিবারই সম্ভাবনা। যদি না দেয়, তবে কি করা কর্ত্তব্য? যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বধ করিয়া রাজ্যের পুনরুদ্ধার করা কর্ত্তব্য কি না?

অজ্ঞাতবাসের বৎসর অতীত হইলে পাণ্ডবেরা বিরাটরাজের নিকট পরিচিত হইলেন। বিরাটরাজ তাঁহাদিগের পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া আপনার কন্যা উত্তরাকে অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যুকে সম্প্রদান করিলেন। সেই বিবাহ দিতে অভিমন্যুর মাতুল কৃষ্ণ ও বলদেব ও অন্যান্য যাদবেরা আসিয়াছিলেন। এবং পাণ্ডব-দিগের শ্বশুর দ্রুপদ এবং অন্যান্য কুটুম্বগণও আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে বিরাট-রাজের সভায় আসীন হইলে পাণ্ডব-রাজ্যের পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গটা উত্থাপিত হইল। নৃপতিগণ "শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।" তখন শ্রীকৃষ্ণ রাজাদিগকে সম্বোধন করিয়া অবস্থা সকল বুঝাইয়া বলিলেন। যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বুঝাইয়া তারপর বলিলেন, "এক্ষণে কৌরব ও পাণ্ডবগণের পক্ষে যাহা হিতকর, ধর্ম্ম্য, যশস্কর ও উপযুক্ত, আপনারা তাহাই চিন্তা করুন।"

কৃষ্ণ এমন কথা বলিলেন না যে, যাহাতে রাজ্যের পুনরুদ্ধার হয়, তাহারই চেষ্টা করুন। কেন না হিত, ধর্ম্ম, যশ হইতে বিচ্ছিন্ন যে রাজ্য, তাহা তিনি কাহারও প্রার্থনীয় বিবেচনা করেন না। তাই পুনর্ব্বার বুঝাইয়া বলিতেছেন, "ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অধর্ম্মাগত সুরসাম্রাজ্যও কামনা করেন না, কিন্তু ধর্ম্মার্থসংযুক্ত একটি গ্রামের আধিপত্যেও অধিকতর অভিলাষী হইয়া থাকেন।" আমরা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি যে, আদর্শ মনুষ্য সন্ন্যাসী হইলে চলিবে না—বিষয়ী হইতে হইবে। বিষয়ীর এই প্রকৃত আদর্শ। অধর্ম্মাগত সুর-সাম্রাজ্যও কামনা করিব না, কিন্তু ধর্ম্মতঃ আমি যাহার অধিকারী, তাহার এক তিলও বঞ্চককে ছাড়িয়া দিব না; ছাড়িলে কেবল আমি একা দুঃখী হইব, এমন নহে, আমি দুঃখী না হইতেও পারি, কিন্তু সমাজবিধ্বংসের পথাবলম্বনরূপ পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে।

তারপর কৃষ্ণ কৌরবদিগের লোভ ও শঠতা, যুধিষ্ঠিরের ধার্ম্মিকতা এবং ইহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ বিবেচনাপূর্ব্বক ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিতে রাজগণকে অনুরোধ করিলেন। নিজের অভিপ্রায়ও কিছু ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, যাহাতে দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যার্দ্ধ প্রদান করেন—এইরূপ সন্ধির নিমিত্ত কোন ধার্ম্মিক পুরুষ দূত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করুন। কৃষ্ণের অভিপ্রায় যুদ্ধ নহে, সন্ধি। তিনি এতদূর যুদ্ধের বিরুদ্ধ যে, অর্দ্ধরাজ্য মাত্র প্রাপ্তিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া সন্ধিস্থাপন করিতে পরামর্শ দিলেন, এবং শেষ যখন যুদ্ধ অলঙ্ঘনীয় হইয়া উঠিল, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি সে যুদ্ধে স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিয়া নরশোণিতস্রোত বৃদ্ধি করিবেন না।

কৃষ্ণের বাক্যাবসানে বলদেব তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিলেন, যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ার জন্য কিছু নিন্দা করিলেন, এবং শেষে বলিলেন যে, সন্ধি দ্বারা সম্পাদিত অর্থই অর্থকর হইয়া থাকে, কিন্তু যে অর্থ সংগ্রাম দ্বারা উপার্জ্জিত তাহা অর্থই নহে। সুরাপায়ী বলদেবের এই কথাগুলি সোণার অক্ষরে লিখিয়া ইউরোপের ঘরে ঘরে রাখিলে মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল হইতে পারে।

বলদেবের কথা সমাপ্ত হইলে সাত্যকি গাত্রোত্থান করিয়া (পাঠক দেখিবেন, সেকালেও "parliamentary procedure" ছিল) প্রতিবক্তৃতা করিলেন। সাত্যকি নিজে মহাবলবান্ বীরপুরুষ, তিনি কৃষ্ণের শিষ্য এবং মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরদিগের মধ্যে অর্জ্জুন ও অভিমন্যুর পরেই তাঁহার প্রশংসা দেখা যায়। কৃষ্ণ সন্ধির প্রস্তাব করায় সাত্যকি কিছু বলিতে সাহস করেন নাই, বলদেবের মুখে ঐ কথা শুনিয়া সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া বলদেবকে ক্লীব ও কাপুরুষ ইত্যাদি বাক্যে অপমানিত করিলেন। দ্যূতক্রীড়ার জন্য বলদেব যুধিষ্ঠিরকে যেটুকু দোষ দিয়াছিলেন, সাত্যকি তাহার প্রতিবাদ করিলেন, এবং আপনার অভিপ্রায় এই প্রকাশ করিলেন যে, যদি কৌরবেরা পাণ্ডবদিগকে তাহাদের পৈত্রিক রাজ্য সমস্ত প্রত্যর্পণ না করেন, তবে কৌরবদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করাই কর্ত্তব্য।

তার পর বৃদ্ধ দ্রুপদের বক্তৃতা। দ্রুপদও সাত্যকির মতাবলম্বী। তিনি যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিতে, সৈন্য সংগ্রহ করিতে এবং মিত্ররাজগণের নিকট দূত প্রেরণ করিতে পাণ্ডবগণকে পরামর্শ দিলেন। তবে তিনি এমনও বলিলেন যে, দুর্য্যোধনের নিকটেও দূত প্রেরণ করা হউক।

পরিশেষে কৃষ্ণ পুনর্ব্বার বক্তৃতা করিলেন। দ্রুপদ প্রাচীন এবং সম্বন্ধে গুরুতর, এই জন্য কৃষ্ণ স্পষ্টতঃ তাঁহার কথায় বিরোধ করিলেন না। কিন্তু এমন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি স্বয়ং সে যুদ্ধে নির্লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন। তিনি বলিলেন, "কুরু ও পাণ্ডবদিগের সহিত আমাদিগের তুল্য সম্বন্ধ, তাঁহারা কখন মর্য্যাদালঙ্ঘনপূর্ব্বক আমাদিগের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করেন নাই। আমরা বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া এস্থানে আগমন করিয়াছি, এবং আপনিও সেই নিমিত্ত আসিয়াছেন। এক্ষণে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, আমরা পরমাহ্লাদে নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিব।" গুরুজনকে ইহার পর আর কি ভর্ৎসনা করা যাইতে পারে? কৃষ্ণ আরও বলিলেন যে, "যদি দুর্য্যোধন সন্ধি না করে, তাহা হইলে অগ্রে অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকট দূত প্রেরণ

করিয়া পশ্চাৎ আমাদিগকে আহ্বান করিবেন," অর্থাৎ "এ যুদ্ধে আসিতে আমাদিগের বড় ইচ্ছা নাই।" এই কথা বলিয়া কৃষ্ণ দ্বারকা চলিয়া গেলেন।

আমরা দেখিলাম যে কৃষ্ণ যুদ্ধে নিতান্ত বিপক্ষ, এমন কি তজ্জন্য অর্দ্ধরাজ্য পরিত্যাগেও পাণ্ডবদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। আরও দেখিলাম যে, তিনি কৌরব পাণ্ডবদিগের মধ্যে পক্ষপাতশূন্য, উভয়ের সহিত তাঁহার তুল্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন। পরে যাহা ঘটিল তাহাতে এই দুই কথারই আরও বলবৎ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

এদিকে উভয় পক্ষের যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল, সেনা সংগৃহীত হইতে লাগিল, এবং রাজগণের নিকট দূত গমন করিতে লাগিল। কৃষ্ণকে যুদ্ধে বরণ করিবার জন্য অর্জ্জুন স্বয়ং দ্বারকায় গেলেন। দুর্য্যোধনও তাই করিলেন। দুই জনে এক দিনে এক সময়ে কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাহার পর যাহা ঘটিল, মহাভারত হইতে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

"বাসুদেব তৎকালে শয়ান ও নিদ্রাভিভূত ছিলেন। প্রথমে রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার মস্তকসমীপন্যস্ত প্রশস্ত আসনে উপবেশন করিলেন। ইন্দ্রনন্দন পশ্চাৎ প্রবেশপূর্ব্বক বিনীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া যাদবপতির পদতলসমীপে সমাসীন হইলেন। অনন্তর বৃষ্ণিনন্দন জাগরিত হইয়া অগ্রে ধনঞ্জয় পরে দুর্য্যোধনকে নয়নগোচর করিবামাত্র স্বাগত প্রশ্ন সহকারে সৎকারপূর্ব্বক আগমন হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন।

"দুর্য্যোধন সহাস্য বদনে কহিলেন, হে যাদব! এই উপস্থিত যুদ্ধে আপনাকে সাহায্য দান করিতে হইবে। যদিও আপনার সহিত আমাদের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ ও তুল্য সৌহৃদ্য; তথাপি আমি অগ্রে আগমন করিয়াছি। সাধুগণ প্রথমাগত ব্যক্তির পক্ষই অবলম্বন করিয়া থাকেন; আপনি সাধুগণের শ্রেষ্ঠ ও মাননীয়; অতএব অদ্য সেই সদাচার প্রতিপালন করুন।

"কৃষ্ণ কহিলেন, হে কুরুবীর! আপনি যে অগ্রে আগমন করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার কিছু মাত্র সংশয় নাই; কিন্তু আমি কুন্তীকুমারকে অগ্রে নয়নগোচর করিয়াছি, এই নিমিত্ত আমি আপনাদের উভয়কেই সাহায্য করিব। কিন্তু ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অগ্রে বালকেরই বরণ করিবে, অতএব অগ্রে কুন্তীকুমারের বরণ করাই উচিত। এই বলিয়া ভগবান যদুনন্দন ধনঞ্জয়কে কহিলেন—'হে কৌন্তেয়! অগ্রে তোমারই বরণ গ্রহণ করিব। আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে এক অর্ব্বুদ গোপ, এক পক্ষের সৈনিক পদ গ্রহণ করুক। আর অন্য পক্ষে আমি সমরপরাঙ্মুখ ও নিরস্ত্র হইয়া অবস্থান করি, ইহার মধ্যে যে পক্ষ তোমার হৃদ্যতর, তাহাই অবলম্বন কর।'

"ধনঞ্জয় অরাতিমর্দ্দন জনার্দ্দন সমরপরাঙ্মুখ হইবেন, শ্রবণ করিয়াও তাঁহারে বরণ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন অর্ব্বুদ নারায়ণী সেনা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণকে সমরে পরাঙ্মুখ বিবেচনা করতঃ প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন।"

উদ্যোগপর্ব্বের এই অংশ সমালোচনা করিয়া আমরা এই কয়টি কথা বুঝিতে পারি।

প্রথম—যদিও কৃষ্ণের অভিপ্রায় যে, কাহারও আপনার ধর্ম্মার্থ সংযুক্ত অধিকার

পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে, তথাপি বলের অপেক্ষা ক্ষমা তাঁহার বিবেচনায় এত দূর উৎকৃষ্ট যে, বলপ্রয়োগ করার অপেক্ষা অর্দ্ধেক অধিকার পরিত্যাগ করাও ভাল।

দ্বিতীয়—কৃষ্ণ সর্ব্বত্র সমদর্শী। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, তিনি পাণ্ডবদিগের পক্ষ, এবং কৌরবদিগের বিপক্ষ। উপরে দেখা গেল যে, তিনি উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে পক্ষপাতশূন্য।

তৃতীয়—তিনি স্বয়ং অদ্বিতীয় বীর হইয়াও যুদ্ধের প্রতি বিশেষ প্রকারে বিরাগ-যুক্ত। প্রথমে যাহাতে যুদ্ধ না হয়, এইরূপ পরামর্শ দিলেন, তার পর যখন যুদ্ধ নিতান্তই উপস্থিত হইল, এবং অগত্যা তাঁহাকে একপক্ষ বরণ হইতে হইল, তখন তিনি অস্ত্রত্যাগে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বরণ হইলেন। এরূপ মাহাত্ম্য আর কোন ক্ষত্রিয়েরই দেখা যায় না, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বত্যাগী ভীষ্মেরও নহে।

আমরা দেখিব যে, যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তজ্জন্য কৃষ্ণ ইহার পরেও অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যিনি সকল ক্ষত্রিয়ের মধ্যে যুদ্ধের প্রধান শত্রু, এবং যিনি একাই সর্ব্বত্র সমদর্শী, লোকে তাঁহাকেই এই যুদ্ধের প্রধান পরামর্শদাতা, অনুষ্ঠাতা এবং পাণ্ডব পক্ষের প্রধান কুচক্রী বলিয়া স্থির করিয়াছে। কাজেই এত সবিস্তারে কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনার প্রয়োজন হইয়াছে।

তার পর, নিরস্ত্র কৃষ্ণকে লইয়া অর্জ্জুন যুদ্ধের কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন, ইহা চিন্তা করিয়া, কৃষ্ণকে তাঁহার সারথ্য করিতে অনুরোধ করিলেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সারথ্য অতি হেয় কার্য্য। যখন মদ্ররাজ শল্য কর্ণের সারথ্য করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন তিনি বড় রাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আদর্শপুরুষ অহঙ্কারশূন্য। অতএব কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথ্য তখনই স্বীকার করিলেন। তিনি সর্ব্বদোষশূন্য এবং সর্ব্বগুণান্বিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—সঞ্জয়যান

উভয় পক্ষের যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে থাকুক। এদিকে দ্রুপদের পরামর্শানুসারে যুধিষ্ঠিরাদি দ্রুপদের পুরোহিতকে ধৃতরাষ্ট্রেরসভায় সন্ধিস্থাপনের মানসে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু পুরোহিত মহাশয় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কেন না, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র-বেধ্য ভূমিও প্রত্যর্পণ করা দুর্য্যোধনাদির অভিপ্রায় নহে। এদিকে যুদ্ধে ভীমার্জ্জুন ও কৃষ্ণকে* ধৃতরাষ্ট্রের বড় ভয়; অতএব যাহাতে পাণ্ডবেরা যুদ্ধ না করে, এমন পরামর্শ দিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র আপনার অমাত্য সঞ্জয়কে পাণ্ডবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। "তোমাদের রাজ্যও আমরা অধর্ম্ম করিয়া কাড়িয়া লইব, কিন্তু তোমরা তজ্জন্য যুদ্ধ করিও না, সে কাজটা ভাল নহে"; এরূপ অসঙ্গত কথা বিশেষ নির্লজ্জ ব্যক্তি

* বিপক্ষেরাও যে এক্ষণে কৃষ্ণের সর্ব্বপ্রাধান্য স্বীকার করিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ উদ্যোগ-পর্ব্বে পাওয়া যায়। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের অন্যান্য সহায়ের নামোল্লেখ করিয়া পরিশেষে বলিয়াছিলেন, "বৃষ্ণিসিংহ কৃষ্ণ যাঁহাদিগের সহায়, তাঁহাদিগের প্রতাপ সহ্য করা কাহার সাধ্য?" (২১ অধ্যায়) পুনশ্চ বলিতেছেন, "সেই কৃষ্ণ এক্ষণে পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিতেছেন। কোন্ শত্রু বিজয়াভিলাষী হইয়া দ্বৈরথযুদ্ধে তাঁহার সম্মুখীন হইবে? হে সঞ্জয়! কৃষ্ণ পাণ্ডবার্থ যেরূপ পরাক্রম প্রকাশ

নহিলে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। কিন্তু দূতের লজ্জা নাই। অতএব সঞ্জয় পাণ্ডবসভায় আসিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। বক্তৃতার স্থূলমর্ম্ম এই যে, "যুদ্ধ বড় গুরুতর অধর্ম্ম, তোমরা সেই অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ, অতএব তোমরা বড় অধার্ম্মিক!" যুধিষ্ঠির, তদুত্তরে অনেক কথা বলিলেন, তন্মধ্যে আমাদের যেটুকু প্রয়োজনীয় তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"হে সঞ্জয়! এই পৃথিবীতে দেবগণেরও প্রার্থনীয় যে সমস্ত ধন সম্পত্তি আছে, তৎসমুদায় এবং প্রাজাপত্য স্বর্গ এবং ব্রহ্মলোক এই সকলও অধর্ম্মতঃ লাভ করিতে আমার বাসনা নাই। যাহা হউক, মহাত্মা কৃষ্ণ ধর্ম্মপ্রদাতা, নীতিসম্পন্ন ও ব্রাহ্মণগণের উপাসক। উনি কৌরব ও পাণ্ডব উভয় কুলেরই হিতৈষী এবং বহুসংখ্যক মহাবলপরাক্রান্ত ভূপতিগণকে শাসন করিয়া থাকেন। এক্ষণে উনিই বলুন যে, যদি আমি সন্ধিপথ পরিত্যাগ করি তাহা হইলে নিন্দনীয় হই, আর যদি যুদ্ধে নিবৃত্ত হই তাহা হইলে আমার স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করা হয়, এ স্থলে কি কর্ত্তব্য। মহাপ্রভাব শিনির নপ্তা এবং চেদি, অন্ধক, বৃষ্ণি, ভোজ, কুকুর ও সৃঞ্জয়বংশীয়গণ বাসুদেবের বুদ্ধিপ্রভাবেই শত্রু দমনপূর্ব্বক সুহৃদ্গণকে আনন্দিত করিতেছেন। ইন্দ্রকল্প উগ্রসেন প্রভৃতি বীর সকল এবং মহাবলপরাক্রান্ত মনস্বী সত্যপরায়ণ যাদবগণ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক সততই উপদিষ্ট হইয়া থাকেন। কৃষ্ণ ভ্রাতা ও কর্ত্তা বলিয়াই কাশীশ্বর বভ্রু উত্তম শ্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন; গ্রীষ্মাবসানে জলদজাল যেমন প্রজাদিগকে বারিদান করে, তদ্রূপ বাসুদেব কাশীশ্বরকে সমুদায় অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করিয়া থাকেন। কর্ম্মনিশ্চয়জ্ঞ কেশব ঈদৃশ গুণসম্পন্ন, ইনি আমাদের নিতান্ত প্রিয় ও সাধুতম, আমি কদাচ ইঁহার কথার অন্যথাচরণ করিব না।"

বাসুদেব কহিলেন, "হে সঞ্জয়! আমি নিরন্তর পাণ্ডবগণের অবিনাশ, সমৃদ্ধি ও হিত এবং সপুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অভ্যুদয় বাসনা করিয়া থাকি। কৌরব ও পাণ্ডবগণের পরস্পর সন্ধি সংস্থাপন হয় ইহা আমার অভিপ্রেত, আমি উঁহাদিগকে ইহা ব্যতীত আর কোন পরামর্শ প্রদান করি না। অন্যান্য পাণ্ডবগণের সমক্ষে রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখেও অনেকবার সন্ধি সংস্থাপনের কথা শুনিয়াছি; কিন্তু মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্রগণ সাতিশয় অর্থলোভী, পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহার সন্ধি সংস্থাপন হওয়া নিতান্ত দুষ্কর, সুতরাং বিবাদ যে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? হে সঞ্জয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও আমি কদাচ ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হই নাই, ইহা জানিয়া শুনিয়াও তুমি কি নিমিত্ত স্বকর্ম্মসাধনোদ্যত উৎসাহসম্পন্ন স্বজন-পরিপালক রাজা যুধিষ্ঠিরকে অধার্ম্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে?"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই কথাটা কৃষ্ণচরিত্রে বড় প্রয়োজনীয়। আমরা বলিয়াছি, তাঁহার জীবনের কাজ দুইটি; ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপন

করেন, তাহা আমি শ্রবণ করিয়াছি। তাঁহার কার্য্য অনুক্ষণ স্মরণ করত আমি শান্তিলাভে বঞ্চিত হইয়াছি; কৃষ্ণ যাঁহাদিগের অগ্রণী, কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগের প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে? কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন শুনিয়া ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে।" আর এক স্থানে ধৃতরাষ্ট্র বলিতেছেন কিন্তু "কেশবও অধৃষ্য, লোকত্রয়ের অধিপতি এবং মহাত্মা। যিনি সর্ব্বলোকে একমাত্র বরেণ্য, কোন্ মনুষ্য তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিবে?" এইরূপ অনেক কথা আছে।

এবং ধর্ম্মপ্রচার। মহাভারতে তাঁহার কৃত ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের কথা প্রধানতঃ ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত গীতা-পর্ব্বাধ্যায়েই আছে। এমন বিচার উঠিতে পারে যে, গীতায় যে ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহা গীতাকার কৃষ্ণের মুখে বসাইয়াছেন বটে, কিন্তু সে ধর্ম্ম যে কৃষ্ণ প্রচারিত কি গীতাকার প্রণীত, তাহার স্থিরতা কি? সৌভাগ্য ক্রমে আমরা গীতা-পর্ব্বাধ্যায় ভিন্ন মহাভারতের অন্যান্য অংশেও কৃষ্ণদত্ত ধর্ম্মোপদেশ দেখিতে পাই। যদি আমরা দেখি যে গীতায় যে অভিনব ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে আর মহাভারতের অন্যান্য অংশে কৃষ্ণ যে ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত করিতেছেন, ইহার মধ্যে একতা আছে, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে, এই ধর্ম্ম কৃষ্ণপ্রণীত এবং কৃষ্ণপ্রচারিতই বটে। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা যদি স্বীকার করি, আর যদি দেখি যে মহাভারতকার যে ধর্ম্মব্যাখ্যা স্থানে স্থানে কৃষ্ণে আরোপ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র এক প্রকৃতির ধর্ম্ম, যদি পুনশ্চ দেখি যে সেই ধর্ম্ম প্রচলিত ধর্ম্ম হইতে ভিন্নপ্রকৃতির ধর্ম্ম; তবে বলিব এই ধর্ম্ম কৃষ্ণেরই প্রচারিত। আবার যদি দেখি যে, গীতায় যে ধর্ম্ম সবিস্তারে এবং পূর্ণতার সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সহিত ঐ কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্ম্মের সঙ্গে ঐক্য আছে, উহা তাহারই আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র, তবে বলিব যে গীতোক্ত ধর্ম্ম যথার্থই কৃষ্ণপ্রণীত বটে।

এখন দেখা যাউক, কৃষ্ণ এখানে সঞ্জয়কে কি বলিতেছেন।

"শুচি ও কুটুম্বপরিপালক হইয়া বেদাধ্যয়ন করতঃ জীবনযাপন করিবে, এইরূপ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধি বিদ্যমান থাকিলেও ব্রাহ্মণগণের নানা প্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কেহ কর্ম্মবশতঃ কেহ বা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষলাভ হয় না। যে সমস্ত বিদ্যা দ্বারা কর্ম্ম সংসাধন হইয়া থাকে, তাহাই ফলবতী; যাহাতে কোন কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি নাই, সে বিদ্যা নিতান্ত নিষ্ফল। অতএব যেমন পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির জল পান করিবামাত্র পিপাসা শান্তি হয়, তদ্রূপ ইহকালে যে সকল কর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। হে সঞ্জয়! কর্ম্মবশতঃই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে; সুতরাং কর্ম্মই সর্ব্বপ্রধান। যে ব্যক্তি কর্ম্ম অপেক্ষা অন্য কোন বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয়।

"দেখ, দেবগণ কর্ম্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন; সমীরণ কর্ম্মবলে সতত সঞ্চরণ করিতেছেন; দিবাকর কর্ম্মবলে আলস্যশূন্য হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন; চন্দ্রমা কর্ম্মবলে নক্ষত্রমণ্ডলী পরিবৃত হইয়া মাসার্দ্ধ উদিত হইতেছেন, হুতাশন কর্ম্মবলে প্রজাগণের কর্ম্ম সংসাধন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন; পৃথিবী কর্ম্মবলে নিতান্ত দুর্ভর ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন; স্রোতস্বতী সকল কর্ম্মবলে প্রাণিগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া সলিলরাশি ধারণ করিতেছেন; অমিতবলশালী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সেই কর্ম্মবলে দশ দিক্ ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অপ্রমত্তচিত্তে ভোগাভিলাষ বিসর্জ্জন ও প্রিয়বস্তু সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব-

লাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান্ বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয়নিরোধ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তিনি দেবগণের আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র, আদিত্য, যম, কুবের, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সর, বিশ্বাবসু ও নক্ষত্রগণ কর্ম্মপ্রভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন; মহর্ষিগণ ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য, ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছেন।"

কর্ম্মবাদ কৃষ্ণের পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে প্রচলিত মতানুসারে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডই কর্ম্ম। মনুষ্যজীবনের সমস্ত অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, যাহাকে পাশ্চাত্যেরা Duty বলেন —সে অর্থে সে প্রচলিত ধর্ম্মে কর্ম্ম শব্দ ব্যবহৃত হইত না। গীতাতেই আমরা দেখি কর্ম্ম শব্দের পূর্ব্বপ্রচলিত অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া, যাহা কর্ত্তব্য, যাহা অনুষ্ঠেয়, যাহা Duty, সাধারণতঃ তাহাই কর্ম্ম নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আর এইখানে হইতেছে। ভাষাগত বিশেষ প্রভেদ আছে—কিন্তু মর্ম্মার্থ এক। এখানে যিনি বক্তা, গীতাতেও তিনিই প্রকৃত বক্তা এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে।

অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের যথাবিহিত নির্ব্বাহের অর্থাৎ (ডিউটির সম্পাদনের) নামান্তর স্বধর্ম্মপালন। গীতার প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ স্বধর্ম্মপালনে অর্জ্জুনকে উপদিষ্ট করিতেছেন। এখানেও কৃষ্ণ সেই স্বধর্ম্মপালনের উপদেশ দিতেছেন। যথা,

"হে সঞ্জয়! তুমি কি নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি সকল লোকের ধর্ম্ম সবিশেষ জ্ঞাত হইয়াও কৌরবগণের হিতসাধন মানসে পাণ্ডবদিগের নিগ্রহ চেষ্টা করিতেছ? ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বেদজ্ঞ, অশ্বমেধ ও রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্ত্তা, যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী এবং হস্ত্যশ্বরথ চালনে সুনিপুণ। এক্ষণে যদি পাণ্ডবেরা কৌরবগণের প্রাণহিংসা না করিয়া ভীমসেনকে সান্ত্বনা করতঃ রাজ্যলাভের অন্য কোন উপায় অবধারণ করিতে পারেন; তাহা হইলে ধর্ম্মরক্ষা ও পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়। অথবা ইঁহারা যদি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক স্বকর্ম্ম সংসাধন করিয়া দুরদৃষ্টবশতঃ মৃত্যুমুখে নিপতিত হন, তাহাও প্রশস্ত। বোধ হয়, তুমি সন্ধিসংস্থাপনই শ্রেয়ঃসাধন বিবেচনা করিতেছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধে ধর্ম্মরক্ষা হয়, কি যুদ্ধ না করিলে ধর্ম্মরক্ষা হয়? ইহার মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিবে আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।"

তার পর শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্মকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের যেরূপ ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে—এখানেও ঠিক সেইরূপ। এইরূপ মহাভারতে অন্যত্রও ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গীতোক্ত ধর্ম্ম, এবং মহাভারতের অন্যত্র কথিত কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম এক। অতএব গীতোক্ত ধর্ম্ম যে কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম—সে ধর্ম্ম যে কেবল কৃষ্ণের নামে পরিচিত এমন নহে—যথার্থই কৃষ্ণপ্রণীত ধর্ম্ম, ইহা এক প্রকার সিদ্ধ। কৃষ্ণ সঞ্জয়কে আরও অনেক কথা বলিলেন। তাহার দুই একটা কথা উদ্ধৃত করিব।

ইউরোপীয়দিগের বিবেচনায় পররাজ্যাপহরণ অপেক্ষা গৌরবের কর্ম্ম কিছুই নাই। উহার নাম "Conquest," "Glory," "Extension of Empire" ইত্যাদি ইত্যাদি। যেমন ইংরেজিতে, ইউরোপীয় অন্যান্য ভাষাতেও ঠিক সেইরূপ পররাজ্যাপ-

হরণের গুণানুবাদ। শুধু এক "Gloire" শব্দের মোহে মুগ্ধ হইয়া প্রুষিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেড্রীক তিনবার ইউরোপে সমরানল জ্বালিয়া লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিলেন। ঈদৃশ রুধিরপিপাসু রাক্ষস ভিন্ন অন্য ব্যক্তির সহজেই ইহা বোধ হয় যে, এইরূপ "Gloire" ও তস্করতাতে প্রভেদ আর কিছুই নাই—কেবল পররাজ্যাপহারক বড় চোর, অন্য চোর ছোট চোর।* কিন্তু এ কথাটা বলা বড় দায়, কেন না দিগ্বিজয়ের এমনই একটা মোহ আছে যে, আর্য্য ক্ষত্রিয়েরাও মুগ্ধ হইয়া অনেক সময় ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলিয়া যাইতেন। ইউরোপে কেবল Diogenes মহাবীর আলেকজণ্ডরকে বলিয়াছিলেন, "তুমি এক জন বড় দস্যু মাত্র।" ভারতবর্ষেও শ্রীকৃষ্ণ পররাজ্যলোলুপ রাজাদিগকে তাই বলিতেছেন,—তাঁহার মতে ছোট চোর লুকাইয়া চুরি করে, বড় চোর প্রকাশ্যে চুরি করে। তিনি বলিতেছেন,

"তস্কর দৃশ্য বা অদৃশ্য হইয়া হঠাৎ যে সর্ব্বস্ব অপহরণ করে, উভয়ই নিন্দনীয়। সুতরাং দুর্য্যোধনের কার্য্যও একপ্রকার তস্করকার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে।"

এই তস্করদিগের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষা করাকে কৃষ্ণ পরম ধর্ম্ম বিবেচনা করেন। আধুনিক নীতিজ্ঞদিগেরও সেই মত। ছোট চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার ইংরেজি নাম Justice; বড় চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার নাম Patriotism। উভয়েরই দেশীয় নাম স্বধর্ম্মপালন। কৃষ্ণ বলিতেছেন,

"এই বিষয়ের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহাও শ্লাঘনীয়, তথাপি পৈতৃক রাজ্যের পুনরুদ্ধারণে বিমুখ হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে।"

কৃষ্ণ সঞ্জয়ের ধর্ম্মের ভণ্ডামি শুনিয়া সঞ্জয়কে কিছু সঙ্গত তিরস্কারও করিলেন। বলিলেন, "তুমি এক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছ, কিন্তু তৎকালে (যখন দুঃশাসন সভামধ্যে দ্রৌপদীর উপর অশ্রাব্য অত্যাচার করে) সভামধ্যে দুঃশাসনকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কর নাই।" কৃষ্ণ সচরাচর প্রিয়বাদী, কিন্তু যথার্থ দোষকীর্ত্তনকালে বড় স্পষ্টবক্তা। সত্যই সর্ব্বকালে তাঁহার নিকট প্রিয়।

সঞ্জয়কে তিরস্কার করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিলেন যে, উভয় পক্ষের হিত সাধনার্থ স্বয়ং হস্তিনা নগরে গমন করিবেন। বলিলেন, "যাহাতে পাণ্ডবগণের অর্থহানি না হয়, এবং কৌরবেরাও সন্ধি সংস্থাপনে সম্মত হন, এক্ষণে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতে হইবে। তাহা হইলে, সুমহৎ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, এবং কৌরবগণও মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন।"

লোকের হিতার্থ, অসংখ্য মনুষ্যের প্রাণরক্ষার্থ, কৌরবেরও রক্ষার্থ, কৃষ্ণ এই দুষ্কর কর্ম্মে স্বয়ং উপযাচক হইয়া প্রবৃত্ত হইলেন। মনুষ্য শক্তিতে দুষ্কর কর্ম্ম, কেন না এক্ষণে পাণ্ডবেরা তাঁহাকে বরণ করিয়াছে; এজন্য কৌরবেরা তাঁহার সঙ্গে শত্রুবৎ ব্যবহার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু লোকহিতার্থ তিনি নিরস্ত্র হইয়া শত্রুপুরীমধ্যে প্রবেশ করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলেন।

* তবে যেখানে কেবল পরোপকারার্থ পরের রাজ্য হস্তগত করা যায়, সেখানে নাকি ভিন্ন কথা হইতে পারে। সেরূপ কার্য্যের বিচারে আমি সক্ষম নহি—কেন না রাজনীতিজ্ঞ নহি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—যানসন্ধি

এইখানে সঞ্জয়যানপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত। সঞ্জয়যান-পর্ব্বাধ্যায়ে শেষ ভাগে দেখা যায় যে কৃষ্ণ হস্তিনা যাইতে প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং বাস্তবিক তাহার পরেই তিনি হস্তিনায় গমন করিলেন বটে। কিন্তু সঞ্জয়যান-পর্ব্বাধ্যায় ও ভগবদ্‌যান-পর্ব্বাধ্যায়ের মধ্যে আর তিনটি পর্ব্বাধ্যায় আছে; "প্রজাগর," "সনৎসুজাত," এবং "যানসন্ধি"। প্রথম দুইটি প্রক্ষিপ্ত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উহাতে মহাভারতের কথাও কিছুই নাই—অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম ও নীতিকথা আছে। কৃষ্ণের কোন কথাই নাই, সুতরাং ঐ দুই পর্ব্বাধ্যায়ে আমাদের কোন প্রয়োজনও নাই।

যানসন্ধি-পর্ব্বাধ্যায়ে সঞ্জয় হস্তিনায়। ফিরিয়া আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা যাহা বলিলেন, এবং তচ্ছ্রবণে ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন এবং অন্যান্য কৌরবগণে যে বাদানুবাদ হইল, তাহাই কথিত আছে। বক্তৃতা সকল অতি দীর্ঘ, পুনরুক্তির অত্যন্ত বাহুল্যবিশিষ্ট এবং অনেক সময়ে নিষ্প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণের প্রসঙ্গ, ইহার দুই স্থানে আছে।

প্রথম, অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে। ধৃতরাষ্ট্র অতিবিস্তারে অর্জ্জুনবাক্য সঞ্জয়মুখে শুনিয়া আবার হঠাৎ সঞ্জয়কে জিজ্ঞাস করিতেছেন, "বাসুদেব ও ধনঞ্জয় যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছি, অতএব তাহাই কীর্ত্তন কর।"

তদুত্তরে, সঞ্জয়, সভাতলে যে সকল কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহার কিছুই না বলিয়া, এক আষাঢ়ে গল্প আরম্ভ করিলেন। বলিলেন যে তিনি পাটিপি পাটিপি,—অর্থাৎ চোরের মত, পাণ্ডবদিগের অন্তঃপুরমধ্যে অভিমন্যু প্রভৃতিরও অগম্য স্থানে গমন করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুনের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। দেখেন কৃষ্ণার্জ্জুন মদ খাইয়া উন্মত্ত। অর্জ্জুন, দ্রৌপদী ও সত্যভামার পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া আছেন। কথাবার্তা নূতন কিছুই হইল না। কৃষ্ণ কেবল কিছু দম্ভের কথা বলিলেন,—বলিলেন, "আমি যখন সহায় তখন অর্জ্জুন সকলকে মারিয়া ফেলিবে।"

তার পর অর্জ্জুন কি বলিলেন, সে কথা এখানে আর কিছু নাই, অথচ ধৃতরাষ্ট্র তাহা শুনিতে চাহিয়াছিলেন। অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের শেষে আছে, "অনন্তর মহাবীর কিরীটি তাঁহার (কৃষ্ণের) বাক্য সকল শুনিয়া লোমহর্ষণ বচন প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।" এই কথায় পাঠকের এমন মনে হইবে যে, বুঝি ঊনষষ্টিতম অধ্যায়ে অর্জ্জুন যাহা বলিলেন, তাহাই কথিত হইতেছে। সে দিক্ দিয়া ঊনষষ্টিতম অধ্যায় যায় নাই। ঊনষষ্টিতম অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে কিছু অনুযোগ করিয়া সন্ধি স্থাপন করিতে বলিলেন। ষষ্টিতম অধ্যায়ে দুর্য্যোধন প্রত্যুত্তরে বাপকে কিন্তু কড়া কড়া শুনাইয়া দিল। একষষ্টিতম অধ্যায়ে কর্ণ আসিয়া মাঝে পড়িয়া কিছু বক্তৃতা করিলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে উত্তম মধ্যম রকম শুনাইলেন। কর্ণে ভীষ্মে বাধিয়া গেল। দ্বিষষ্টিতমে দুর্য্যোধনে ভীষ্মে বাধিয়া গেল। ত্রিষষ্টিতমে ভীষ্মের বক্তৃতা। চতুঃষষ্টিতমে বাপ বেটায় আবার বাধিল। পরে, এত কালের পর আবার হঠাৎ ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অর্জ্জুন কি বলিলেন? তখন সঞ্জয় সেই অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের ছিন্ন সূত্র যোড়া দিয়া অর্জ্জুনবাক্য বলিতে লাগিলেন। বোধ করি কোন পাঠকেরই এখন সংশয় নাই যে, ৫৯।৬০।৬১।৬২।৬৩।৬৪ অধ্যায়গুলি প্রক্ষিপ্ত। এই কয় অধ্যায়ে

মহাভারতের ক্রিয়া এক পদও অগ্রসর হইতেছে না। এই অধ্যায়গুলি বড় স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ইহার উল্লেখ করিলাম।

যে সকল কারণে এই ছয় অধ্যায়কে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে, অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়কেও সেই কারণে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে—পরবর্ত্তী এই অধ্যায়গুলি প্রক্ষিপ্তের উপর প্রক্ষিপ্ত। অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায় সম্বন্ধে আরও বলা যাইতে পারে যে, ইহা যে কেবল অপ্রাসঙ্গিক এবং অসংলগ্ন এমন নহে, পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণবাক্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই সকল বৃত্তান্তের কিছু মাত্র প্রসঙ্গ অনুক্রমণিকাধ্যায়ে বা পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে নাই। বোধ হয়, কোন রসিক লেখক, অসুরনিপাতন শৌরি এবং সুরনিপাতনী সুরা, উভয়েরই ভক্ত; একত্রে উভয় উপাস্যকে দেখিবার জন্য অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন।

যানসন্ধি-পর্ব্বাধ্যায়ে এই গেল কৃষ্ণসম্বন্ধীয় প্রথম প্রসঙ্গ। দ্বিতীয় প্রসঙ্গ, সপ্তষষ্টিতম হইতে সপ্ততিতম পর্য্যন্ত চারি অধ্যায়ে। এখানে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের জিজ্ঞাসা মতে কৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন। সঞ্জয় এখানে পূর্ব্বে যাঁহাকে মদ্যপানে উন্মত্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকেই জগদীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। বোধ হয় ইহাও প্রক্ষিপ্ত। প্রক্ষিপ্ত হউক না হউক ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। যদি অন্য কারণে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে আমাদের বিশ্বাস থাকে, তবে সঞ্জয়বাক্যে আমাদের প্রয়োজন কি? আর যদি সে বিশ্বাস না থাকে, তবে সঞ্জয়বাক্যে এমন কিছু নাই যে, তাহার বলে আমাদিগের সে বিশ্বাস হইতে পারে। অতএব সঞ্জয়বাক্যের সমালোচনা আমাদের নিষ্প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণের মানুষচরিত্রের কোন কথাই তাহাতে আমরা পাই না। তাহাই আমাদের সমালোচ্য।

এইখানে যানসন্ধি-পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনা যাত্রার প্রস্তাব

শ্রীকৃষ্ণ, পূর্ব্বকৃত অঙ্গীকারানুসারে সন্ধি স্থাপনার্থ কৌরবদিগের নিকট যাইতে প্রস্তুত হইলেন। গমনকালে পাণ্ডবেরা ও দ্রৌপদী সকলেই, তাঁহাকে কিছু কিছু বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগের কথার উত্তর দিলেন। এই সকল কথোপকথন অবশ্য ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তবে কবি ও ইতিহাসবেত্তা যে সকল কথা কৃষ্ণের মুখে বসাইয়াছেন, তাহার দ্বারা বুঝা যায় যে, কৃষ্ণের কিরূপ পরিচয় তিনি অবগত ছিলেন। ঐ সকল বক্তৃতা হইতে আমরা কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব।

যুধিষ্ঠিরের কথার উত্তরে কৃষ্ণ এক স্থানে বলিতেছেন, "হে মহারাজ, ব্রহ্মচর্য্যাদি ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিধেয় নহে। সমুদায় আশ্রমীরা ক্ষত্রিয়ের ভৈক্ষাচরণ নিষেধ করিয়া থাকেন। বিধাতা সংগ্রামে জয়লাভ বা প্রাণপরিত্যাগ ক্ষত্রিয়ের নিত্যধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অতএব দীনতা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয়। হে অরাতি-নিপাতন যুধিষ্ঠির! আপনি দীনতা অবলম্বন করিলে, কখনই স্বীয় অংশ লাভ করিতে পারিবেন না। অতএব বিক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রুগণকে বিনাশ করুন।"

গীতাতেও অর্জ্জুনকে কৃষ্ণ এইরূপ কথা বলিয়াছেন দেখা যায়। ইহা হইতে যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বে বুঝান গিয়াছে। পুনশ্চ ভীমের কথার উত্তরে বলিতেছেন, "মনুষ্য পুরুষকার পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল দৈব বা দৈব পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল পুরুষকার অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি এইরূপ কৃতনিশ্চয় হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে কর্ম্ম সিদ্ধ না হইলে ব্যথিত বা কর্ম্ম সিদ্ধ হইলে সন্তুষ্ট হয় না।"

গীতাতেও এইরূপ উক্তি আছে।* অর্জ্জুনের কথার উত্তরে কৃষ্ণ বলিতেছেন,

"উর্ব্বর ক্ষেত্রে যথানিয়মে হলচালন বীজবপনাদি করিলেও বর্ষা ব্যতীত কখনই ফলোৎপত্তি হয় না। পুরুষ যদি পুরুষকার সহকারে তাহাতে জল সেচন করে, তথাপি দৈবপ্রভাবে উহা শুষ্ক হইতে পারে। অতএব প্রাচীন মহাত্মাগণ দৈব ও পুরুষকার উভয় একত্র মিলিত না হইলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আমি যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি; কিন্তু দৈব কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই।"

এ কথার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। কৃষ্ণ এখানে দেবত্ব একেবারে অস্বীকার করিলেন। কেন না, তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা কর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত। ঐশী শক্তির দ্বারা কর্ম্মসাধন ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইলে, অবতারের কোন প্রয়োজন থাকে না।

অন্যান্য বক্তার কথা সমাপ্ত হইলে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে কিছু বলিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় এমন একটা কথা আছে যে, স্ত্রীলোকের মুখে তাহা অতি বিস্ময়কর। তিনি বলিতেছেন—

"অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেই পাপ হইয়া থাকে।"

এই উক্তি স্ত্রীলোকের মুখে বিস্ময়কর হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, বহু বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে আমি দ্রৌপদীচরিত্রের যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে এই বাক্যের অত্যন্ত সুসঙ্গতি আছে। আর স্ত্রীলোকের মুখে ভাল শুনাক্ না শুনাক্, ইহা যে প্রকৃত ধর্ম্ম, এবং কৃষ্ণেরও যে এই মত, ইহাও আমি জরাসন্ধবধের সমালোচনাকালে ও অন্য সময়ে বুঝাইয়াছি।

দ্রৌপদীর এই বক্তৃতার উপসংহারকালে এক অপূর্ব্ব কবিত্বকৌশল আছে। তাহা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"অসিতাপাঙ্গী দ্রুপদনন্দিনী এই কথা শুনিয়া কুটিলাগ্র, পরম রমণীয়, সর্ব্বগন্ধাধিবাসিত, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন, মহাভুজঙ্গসদৃশ কেশকলাপ ধারণ করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে দীননয়নে পুনরায় কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে জনার্দ্দন! দুরাত্মা দুঃশাসন আমার এই কেশ আকর্ষণ করিয়াছিল। শত্রুগণ সন্ধিস্থাপনের মতপ্রকাশ করিলে তুমি এই কেশকলাপ স্মরণ করিবে। ভীমার্জ্জুন দীনের ন্যায় সন্ধি স্থাপনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন; তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, আমার বৃদ্ধ পিতা মহারথ পুত্রগণ সমভিব্যাহারে

* সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে। ২। ৪৮

শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন, আমার মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চপুত্র অভিমন্যুরে পুরস্কৃত করিয়া কৌরবগণকে সংহার করিবে। দুরাত্মা দুঃশাসনের শ্যামল বাহু ছিন্ন, ধরাতলে নিপতিত ও পাংশুলুন্ঠিত, না দেখিলে আমার শান্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? আমি হৃদয়ক্ষেত্রে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধ স্থাপন পূর্ব্বক ত্রয়োদশ বৎসর প্রতীক্ষা করিয়াছি। এক্ষণে সেই ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, তথাপি তাহা উপশমিত হইবার কিছুমাত্র উপায় দেখিতেছি না; আজি আবার ধর্ম্মপথাবলম্বী বৃকোদরের বাক্যশল্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

"নিবিড়নিতম্বিনী আয়তলোচনা কৃষ্ণা এই কথা কহিয়া বাষ্পগদগদস্বরে কম্পিত-কলেবরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, দ্রবীভূত হুতাশনের ন্যায় অত্যুষ্ণ নেত্রজলে তাঁহার স্তনযুগল অভিষিক্ত হইতে লাগিল। তখন মহাবাহু বাসুদেব তাঁহারে সান্ত্বনা করতঃ কহিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণে! তুমি অতি অল্প দিন মধ্যেই কৌরব মহিলাগণকে রোদন করিতে দেখিবে। তুমি যেমন রোদন করিতেছ, কুরুকুলকামিনীরাও তাহাদের জ্ঞাতি বান্ধবগণ নিহত হইলে এইরূপ রোদন করিবে। আমি যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেব সমভিব্যাহারে কৌরবগণের বধসাধনে প্রবৃত্ত হইব। ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ কালপ্রেরিতের ন্যায় আমার বাক্যে অনাদর প্রকাশ করিলে অচিরাৎ নিহত ও শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য হইয়া ধরাতলে শয়ন করিবে। যদি হিমবান্ প্রচলিত, মেদিনী উৎক্ষিপ্ত ও আকাশমণ্ডল নক্ষত্রসমূহের সহিত নিপতিত হয় তথাপি আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। হে কৃষ্ণে! বাষ্প সংবরণ কর; আমি তোমারে যথার্থ কহিতেছি, তুমি অচিরকাল মধ্যেই স্বীয় পতিগণকে শত্রু সংহার করিয়া রাজ্যলাভ করিতে দেখিবে।"

এই উক্তি শোণিতপিপাসুর হিংস্রাপ্রবৃত্তিজনিত বা ক্রুদ্ধের ক্রোধাভিব্যক্তি নহে। যিনি সর্ব্বত্রগামী সর্ব্বকালব্যাপী বুদ্ধির প্রভাবে, ভবিষ্যতে যাহা হইবে, তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিলেন, তাঁহার ভবিষ্যদুক্তি মাত্র। কৃষ্ণ বিলক্ষণ জানিতেন যে, দুর্য্যোধন রাজ্যাংশ প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক সন্ধি স্থাপন করিতে কদাপি সম্মত হইবে না। ইহা জানিয়াও যে তিনি সন্ধিস্থাপনার্থ কৌরবসভায় গমনের জন্য উদ্যোগী, তাহার কারণ এই যে, যাহা অনুষ্ঠেয় তাহা সিদ্ধ হউক বা না হউক, করিতে হইবে। সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার মুখবিনির্গত গীতোক্ত অমৃতময় ধর্ম্ম। তিনি নিজেই অর্জ্জুনকে শিখাইয়াছেন যে,

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।

সেই নীতির বশবর্ত্তী হইয়া, আদর্শযোগী, ভবিষ্যৎ জানিয়াও সন্ধিস্থাপনের চেষ্টায় কৌরবসভায় চলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—যাত্রা

যাত্রাকালে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ব্যবহারই মনুষ্যোপযোগী এবং কালোচিত। তিনি "রেবতী নক্ষত্রযুক্ত কার্ত্তিকমাসীয় দিনে মৈত্র মুহূর্ত্তে কৌরবসভায় গমন করিবার বাসনায় সুবিশ্বস্ত ব্রাহ্মণগণের মাঙ্গল্য পুণ্যনির্ঘোষ শ্রবণ ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক

স্নান ও বসনভূষণ পরিধান করিয়া সূর্য্য ও বহ্নির উপাসনা করিলেন; এবং বৃষলাঙ্গুল দর্শন, ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন, অগ্নি প্রদক্ষিণ ও কল্যাণকর দ্রব্যসকল সন্দর্শনপূর্ব্বক", যাত্রা করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে ধর্ম্ম প্রচারিত করিয়াছেন, তাহাতে তৎকালে প্রবল কাম্যকর্ম্ম-পরায়ণ যে বৈদিক ধর্ম্ম, তাহার নিন্দাবাদ আছে। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে কখনও অবমাননা করিতেন না। তিনি আদর্শ মনুষ্য, এই জন্য তৎকালে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যে ব্যবহার উচিত ছিল, তিনি তাহাই করিতেন। তখনকার ব্রাহ্মণেরা বিদ্বান্, জ্ঞানবান্, ধর্ম্মাত্মা, এবং অস্বার্থপর হইয়া সমাজের মঙ্গলসাধনে নিরত ছিলেন, এজন্য অন্য বর্ণের নিকট, পূজা তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য। কৃষ্ণও সেই জন্য তাঁহা-দিগকে উপযুক্তরূপ পূজা করিতেন। উদাহরণস্বরূপ, পথিমধ্যে ঋষিগণের সমাগমের বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি।

"মহাবাহু কেশব এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়া পথের উভয়পার্শ্বে ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান কতিপয় মহর্ষিরে সন্দর্শন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রতাসহকারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহর্ষিগণ! সমুদায় লোকের কুশল? ধর্ম্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে? ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণগণের শাসনে অবস্থান করিতেছে? আপনারা কোথায় সিদ্ধ হইয়াছেন? কোথায় যাইতে বাসনা করিতেছেন? আপনাদের প্রয়োজন কি? আমারে আপনাদের কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে? এবং আপনারা কি নিমিত্ত ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন?

"তখন মহাভাগ জামদগ্ন্য কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, হে মধুসূদন! আমাদের মধ্যে কেহ কেহ দেবর্ষি, কেহ কেহ বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ, কেহ কেহ রাজর্ষি এবং কেহ কেহ তপস্বী। আমরা অনেকবার দেবাসুরের সমাগম দেখিয়াছি; এক্ষণে সমুদায় ক্ষত্রিয়, সভাসদ্ ভূপতি ও আপনারে অবলোকন করিবার বাসনায় গমন করিতেছি। আমরা কৌরব সভামধ্যে আপনার মুখবিনির্গত ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি। হে যাদবশ্রেষ্ঠ! ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভৃতি মহাত্মাগণ এবং আপনি যে সত্য ও হিতকর বাক্য কহিবেন; আমরা সেই সকল বাক্য শ্রবণে নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি।

"এক্ষণে আপনি সত্বরে কুরুরাজ্যে গমন করুন; আমরা তথায় আপনারে সভা-মণ্ডপে দিব্য আসনে আসীন ও তেজঃপ্রদীপ্ত দেখিয়া পুনরায় আপনার সহিত কথো-পকথন করিব।"

এখানে ইহাও বক্তব্য যে, এই জামদগ্ন্য পরশুরাম কৃষ্ণের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। রামায়ণে আবার তিনি রামচন্দ্রের সমসাময়িক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অথচ পুরাণে তিনি রাম কৃষ্ণ উভয়েরই পূর্ব্বগামী বিষ্ণুর অবতারান্তর বলিয়া খ্যাত। পুরাণের দশাবতারবাদ কত দূর সঙ্গত, তাহা আমরা গ্রন্থান্তরে বিচার করিব।

এই হস্তিনাযাত্রার বর্ণনায় জানা যায় যে, কৃষ্ণ নিজেও সাধারণ প্রজার নিকটেও পূজ্য ছিলেন। হস্তিনাযাত্রার বর্ণনা আরও কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

"দেবকীনন্দন সর্ব্বশস্যপরিপূর্ণ অতি রম্য সুখাস্পদ পরম পবিত্রশালিভবন এবং অতি মনোহর ও হৃদয়তোষণ বহুবিধ গ্রাম্যপশু সন্দর্শনকরতঃ বিবিধ পুর ও রাজ্য অতিক্রম করিলেন। কুরুকুলসংরক্ষিত নিত্যপ্রহৃষ্ট অনুদ্বিগ্ন ব্যসনরহিত পুরবাসিগণ কৃষ্ণকে দর্শন করিবার মানসে উপপ্লব্য নগর হইতে পথিমধ্যে আগমন করিয়া তাঁহার পথ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিয়ংক্ষণ পরে মহাত্মা বাসুদেব সমাগত হইলে তাহারা বিধানানুসারে তাঁহার পূজা করিতে লাগিল।

"এদিকে ভগবান্ মরীচিমালী স্বীয় কিরণজাল পরিত্যাগ করিয়া লোহিত কলেবর ধারণ করিলে অরাতিনিপাতন মধুসূদন বৃকস্থলে সমুপস্থিত হইয়া সত্বরে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক যথাবিধি শৌচ সমাপনান্তে রথাশ্বমোচনে আদেশ করিয়া সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন। দারুক কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে অশ্বগণকে রথ হইতে মুক্ত করতঃ শাস্ত্রানুসারে তাহাদের পরিচর্য্যা ও গাত্র হইতে সমুদায় যোক্ত্রাদি মোচন করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল। মহাত্মা মধুসূদন সন্ধ্যা সমাপনান্তে স্বীয় সমভিব্যাহারী জনগণকে কহিলেন, হে পরিচারকবর্গ! অদ্য যুধিষ্ঠিরের কার্য্যানুরোধে এই স্থানে রজনী অতিবাহিত করিতে হইবে। তখন পরিচারকগণ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া ক্ষণকালমধ্যে পটমণ্ডপ নির্ম্মাণ ও বিবিধ সুমিষ্ট অন্নপান প্রস্তুত করিল। অনন্তর সেই গ্রামস্থ স্বধর্ম্মাবলম্বী আর্য্য কুলীন ব্রাহ্মণ সমুদায় অরাতিকুলকালান্তক মহাত্মা হৃষীকেশের সমীপে আগমনপূর্ব্বক বিধানানুসারে তাঁহার পূজা ও আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব ভবনে আনয়ন করিতে বাসনা করিলেন। ভগবান্ মধুসূদন তাঁহাদের অভিপ্রায়ে সম্মত হইলেন এবং তাঁহাদিগকে অর্চ্চনপূর্ব্বক তাঁহাদের ভবনে গমন করিয়া তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে পুনরায় স্বীয় পটমণ্ডপে আগমন করিলেন। পরে সেই সমুদায় ব্রাহ্মণগণের সমভিব্যাহারে সুমিষ্ট দ্রব্যজাত ভোজন করিয়া পরম সুখে যামিনী যাপন করিলেন।

ইহা নিতান্তই মানুষ চরিত্র, কিন্তু আদর্শ মনুষ্যের চরিত্র।

দেখা যাইতেছে যে, দেবতা বলিয়া কেহ তাঁহাকে পূজা করিতেছে, এমন কথা নাই। তবে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যের যেরূপ পূজা পাইবার সম্ভাবনা তাহাই তিনি পাইতেছেন, এবং আদর্শ মনুষ্যের লোকের সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করা সম্ভব, তিনি তাহাই করিতেছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—হস্তিনায় প্রথম দিবস

কৃষ্ণ আসিতেছেন শুনিয়া, বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার অভ্যর্থনা ও সম্মানের জন্য বড় বেশী রকম উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। নানারত্নসমাকীর্ণ সভা সকল নির্ম্মাণ করাইলেন, এবং তাঁহাকে উপঢৌকন দিবার জন্য অনেক হস্ত্যশ্বরথ, দাস, "অজাতাপত্য শতসংখ্যক দাসী," মেষ, অশ্বতরী, মণিমাণিক্য ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

বিদুর দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, "ভাল, ভাল। তুমি যেমন ধার্ম্মিক, তেমনই বুদ্ধিমান্। কিন্তু রত্নাদি দিয়া কৃষ্ণকে ঠকাইতে পারিবে না। তিনি যে জন্য আসিতেছেন, তাহা সম্পাদন কর; তাহা হইলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন—অর্থপ্রলোভিত হইয়া তোমার বশ হইবেন না।"

ধৃতরাষ্ট্র ধূর্ত্ত, এবং বিদুর সরল ; দুর্য্যোধন দুষ্ট। তিনি বলিলেন, "কৃষ্ণ পূজনীয় বটে, কিন্তু তাঁহার পূজা করা হইবে না। যুদ্ধ ত ছাড়িব না ; তবে তাঁর সমাদরে কাজ কি ? লোকে মনে করিবে আমরা ভয়েই বা তাঁহার খোষামোদ করিতেছি। আমি তদপেক্ষা সৎ পরামর্শ স্থির করিয়াছি। আমরা তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিব। পাণ্ডবের বল বুদ্ধি কৃষ্ণ, কৃষ্ণ আটক থাকিলে পাণ্ডবেরা আমার বশীভূত থাকিবে।"

এই কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রও পুত্রকে তিরস্কার করিতে বাধ্য হইলেন। কেন না, কৃষ্ণ দূত হইয়া আসিতেছেন। কৃষ্ণভক্ত ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে কতকগুলা কটূক্তি করিয়া সভা হইতে উঠিয়া গেলেন।

নাগরিকেরা, এবং কৌরবেরা বহু সম্মানের সহিত কৃষ্ণকে কুরুসভায় আনীত করিলেন। তাঁহার জন্য যে সকল সভা নির্ম্মিত ও রত্নজাত রক্ষিত হইয়াছিল, তিনি তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না। তিনি ধৃতরাষ্ট্র ভবনে গমন করিয়া কুরুসভায় উপবেশনপূর্ব্বক, যে যেমন যোগ্য তাহার সঙ্গে সেইরূপ সৎসম্ভাষণ করিলেন। পরে সেই রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া, দীনবন্ধু এক দীনভবনে চলিলেন।

বিদুর, ধৃতরাষ্ট্রের এক রকম ভাই। উভয়েরই ব্যাসদেবের ঔরসে জন্ম। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র রাজা বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্র ; বিদুর তাহা নহে। তিনি, বিচিত্রবীর্য্যের দাসী এক বৈশ্যার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাকে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ ধরিলেও, তাঁহার জাতি নির্ণয় হয় না। কেন না, ব্রাহ্মণের ঔরসে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষেত্রে, বৈশ্যার গর্ভে তাঁহার জন্ম।* তিনি সামান্য ব্যক্তি, কিন্তু পরম ধার্ম্মিক। কৃষ্ণ রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া তাঁহার বাড়ীতে গিয়া, তাঁহার নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সেই জন্য, আজিও এ দেশে "বিদুরের খুদ," এই বাক্য প্রচলিত আছে। পাণ্ডবমাতা কুন্তী, কৃষ্ণের পিতৃস্বসা, সেইখানে বাস করিতেন। বনগমনকালে পাণ্ডবেরা তাঁহাকে সেইখানে রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণ কুন্তীকে প্রণাম করিতে গেলেন। কুন্তী পুত্রগণ ও পুত্রবধূর দুঃখের বিবরণ স্মরণ করিয়া কৃষ্ণের নিকট অনেক কাঁদাকাটা করিলেন। উত্তরে কৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহা অমূল্য। যে ব্যক্তি মনুষ্য-চরিত্রের সর্ব্বপ্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছে, সে ভিন্ন আর কেহই সে কথার অমূল্যত্ব বুঝিবে না। মূর্খের ত কথাই নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,

---

* মহাভারতীয় নায়কদিগের সকলেরই জাতি সম্বন্ধে এইরূপ গোলযোগ। পাণ্ডবদিগের সম্বন্ধে এইরূপ গোলযোগ। পাণ্ডবদিগের প্রপিতামহী সত্যবতী, দাসকন্যা। ভীষ্মের মার জাতি লুকাইবার বোধ হয় বিশেষ প্রয়োজন ছিল, এজন্য তিনি গঙ্গানন্দন। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু ব্রাহ্মণের ঔরসে, ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত। ব্যাস নিজে সেই ধীবরনন্দিনীর কানীনপুত্র। অতএব পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের জাতি সম্বন্ধে এত গোলযোগ যে, এখনকার দিনে, তাঁহারা সর্ব্বজাতির অপাংক্তেয় হইতেন। পাণ্ডুর পুত্রগণ, কুন্তীর গর্ভজাত বটে, কিন্তু বাপের বেটা নহেন ; পাণ্ডু নিজে পুত্রোৎপাদনে অক্ষম। তাঁহারা ইন্দ্রাদির ঔরস-পুত্র বলিয়া পরিচিত। এদিকে, দ্রোণাচার্য্যের পিতা ভরদ্বাজ ঋষি, কিন্তু মা একটা কলসী ; কলসীর গর্ভধারণ যাহাদের বিশ্বাস না হইবে, তাঁহারা দ্রোণের মাতৃকুল সম্বন্ধে

"পাণ্ডবগণ, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা, পিপাসা, হিম, রৌদ্র, পরাজয় করিয়া বীরোচিত সুখে নিরত রহিয়াছেন। তাঁহারা ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করিয়া বীরোচিত সুখে সন্তুষ্ট আছেন; সেই মহাবলপরাক্রান্ত মহোৎসাহসম্পন্ন বীরগণ কদাচ অল্পে সন্তুষ্ট হয়েন না। বীরব্যক্তিরা হয় অতিশয় ক্লেশ না হয় অত্যুৎকৃষ্ট সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন; আর ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ মধ্যাবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে; কিন্তু উহা দুঃখের আকর; রাজ্যলাভ বা বনবাস সুখের নিদান।"

"রাজ্যলাভ বা বনবাস" † এ কথা ত আধুনিক হিন্দু বুঝে না। বুঝিলে, এত দুঃখ থাকিত না। যে দিন বুঝিবে, সে দিন আর দুঃখ থাকিবে না। হিন্দু পুরাণেতিহাসে এমন কথা থাকিতে আমরা কি না, মেম সাহেবদের লেখা নবেল পড়িয়া দিন কাটাই, না হয় সভা করিয়া পাঁচ জনে জুটিয়া পাখির মত কিচির মিচির করি।

কৃষ্ণ কুন্তীকে আরও বলিলেন, "আপনি তাহাদিগকে শত্রুবিনাশ করিয়া সকল লোকের আধিপত্য ও অতুল সম্পত্তি ভোগ করিতে দেখিবেন।"

অতএব কৃষ্ণ নিশ্চিত জানিতেন যে, সন্ধি হইবে না—যুদ্ধ হইবে। তথাপি সন্ধি স্থাপন জন্য হস্তিনায় আসিয়াছেন; কেন না যে কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, তাহা সিদ্ধ হউক বা না হউক, তাহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, ফলাফলে অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য সাধন করিতে হয়। ইহাকেই তিনি গীতায় কর্ম্মযোগ বলিয়া বুঝাইয়াছেন। যুদ্ধের অপেক্ষা সন্ধি মনুষ্যের হিতকর; এই জন্য সন্ধিস্থাপন অনুষ্ঠেয়। কিন্তু যখন যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া সন্ধিস্থাপন করিতে পারিলেন না, তখন কৃষ্ণই আবার যুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ অর্জ্জুনের প্রধান

বিশেষ সন্দিহান হইবেন। পাণ্ডবদিগের পিতা সম্বন্ধে যত গোলযোগ, কর্ণ সম্বন্ধেও তত—বেশীর ভাগ তিনি কানীন। দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্নের বাপ মা কে, কেহ বলিতে পারে না; তাঁহারা যজ্ঞোদ্ভূত।

এ সময়ে কিন্তু, বিবাহ সম্বন্ধে কোন গোলযোগ ছিল না। অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের কথা বলিতেছি না। অনেক ঋষির ধর্ম্মপত্নীও ক্ষত্রিয় কন্যা ছিলেন; যথা, অগস্ত্যপত্নী লোপামুদ্রা, ঋষ্যশৃঙ্গের স্ত্রী শান্তা, ঋচীকভার্য্যা, জমদগ্নির ভার্য্যা (কেহ কেহ বলেন পরশুরামের ভার্য্যা) রেণুকা ইত্যাদি। এমনও কথা আছে যে, পরশুরাম পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য করিলে, ব্রাহ্মণদিগের ঔরসে পরবর্ত্তী ক্ষত্রিয়েরা জন্মিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানী, ক্ষত্রিয় যযাতির ধর্ম্মপত্নী। আহারাদি সম্বন্ধে কোন বাঁধাবাঁধি ছিল না, তাহাও ইতিহাসে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, পরস্পরের অন্নভোজন করিতেন।

† মিল্‌টনের ক্ষুদ্রচেতা সয়তান্ বলিয়াছিল যে, স্বর্গে দাসত্বের অপেক্ষা বরং নরকে রাজত্ব শ্রেয়ঃ। আমি জানি যে, আমার এমন পাঠক আছেন, যাঁহারা এই ক্ষুদ্রোক্তির সঙ্গে উপরি লিখিত মহতী বাণীর কোন প্রভেদ দেখিবেন না। তাঁহাদিগের মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণরূপে আশাশূন্য। লঘুচেতা, পরের প্রভুত্ব সহ্য করিতে পারে না। মহাত্মা, কর্ত্তব্যানুরোধে তাহা পারেন, কিন্তু মহাত্মা জানেন যে, মহাদুঃখ বা মহাসুখ ব্যতীত, তাঁহার বহুবিস্তারাকাঙ্ক্ষিণী চিত্তবৃত্তি সকল স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইতে পারে না।

উৎসাহদাতা, ও সহায়। কেন না, যখন সন্ধি অসাধ্য তখন যুদ্ধই অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম। অতএব যে কর্ম্মযোগ তিনি গীতায় উপদিষ্ট করিয়াছেন, তিনি নিজেই তাহাতে প্রধান যোগী। তাঁহার আদর্শ চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনে আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি, তাহা বুঝিতে পারিব বলিয়াই এত প্রয়াস পাইতেছি।

কৃষ্ণ, কুন্তীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া পুনর্ব্বার কৌরব-সভায় গমন করিলেন। সেখানে গেলে, দুর্য্যোধন তাঁহাকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না। দুর্যোধন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ প্রথমে তাঁহাকে লৌকিক নীতিটা স্মরণ করাইয়া দিলেন। বলিলেন, "দূতগণ কার্য্যসমাধানান্তে ভোজন ও পূজা গ্রহণ করিয়া থাকে; অতএব আমি কৃতকার্য্য হইলেই আপনার পূজা গ্রহণ করিব।" দুর্য্যোধন তবুও ছাড়ে না; আবার পীড়াপীড়ি করিল। তখন কৃষ্ণ বলিলেন,

"লোকে হয় প্রীতি পূর্ব্বক অথবা বিপন্ন হইয়া অন্যের অন্ন ভোজন করে। আপনি প্রীতি সহকারে আমারে ভোজন করাইতে বাসনা করেন নাই; আমিও বিপদ্‌গ্রস্ত হই নাই, তবে কি নিমিত্ত আপনার অন্ন ভোজন করিব?"

ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ একটা সামান্য কর্ম্ম; কিন্তু আমাদের দৈনিক জীবন, সচরাচর কতকগুলা সামান্য কর্ম্মের সমবায় মাত্র। সামান্য কর্ম্মের জন্য একটা নীতি আছে অথবা থাকা উচিত। বৃহৎ কর্ম্ম সকলের নীতির যে ভিত্তি, ক্ষুদ্র কর্ম্ম সকলের নীতিরও সেই ভিত্তি। সে ভিত্তি ধর্ম্ম। তবে উন্নতচরিত্র মনুষ্যের সঙ্গে ক্ষুদ্রচেতার এই প্রভেদ যে, ক্ষুদ্রচেতা ধর্ম্মে পরাঙ্মুখ না হইলেও, সামান্য বিষয়ে নীতির অনুবর্ত্তী হইতে সক্ষম হয়েন না, কেন না, নীতির ভিত্তি তিনি অনুসন্ধান করেন না। আদর্শ মনুষ্য এই ক্ষুদ্র বিষয়েও নীতির ভিত্তি অনুসন্ধান করিলেন। দেখিলেন যে, এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ সরলতা ও সত্যের বিরুদ্ধ হয়। অতএব দুর্য্যোধনকে সরল ও সত্য উত্তর দিলেন, স্পষ্ট কথা পরুষ হইলেও তাহা বলিতে সঙ্কুচিত হইলেন না। যেখানে অকপট ব্যবহার ধর্ম্মানুমত হয়, সেখানেও তাহা পরুষ বলিয়া আমরা পরাঙ্মুখ। এই ধর্ম্মবিরুদ্ধ লজ্জা অনেক সময়ে আমাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধর্ম্মে বিপন্নও করে।

কৃষ্ণ তার পর কুরুসভা হইতে উঠিয়া, বিদুরের ভবনে গমন করিলেন।

বিদুরের সঙ্গে রাত্রিতে তাঁহার অনেক কথোপকথন হইল। বিদুর তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, তাঁহার হস্তিনায় আসা অনুচিত হইয়াছে; কেন না দুর্য্যোধন কোন মতেই সন্ধি স্থাপন করিবে না। কৃষ্ণের উত্তর হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"যিনি অশ্বকুঞ্জররথসমবেত বিপর্য্যস্ত সমুদায় পৃথিবী মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত করিতে সমর্থ হন তাঁহার উৎকৃষ্ট ধর্ম্মলাভ হয়।"

ইউরোপের প্রতি রাজপ্রাসাদে এই কথাগুলি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিত। সিমলার রাজপ্রাসাদেও বাদ না পড়ে। কৃষ্ণ পুনশ্চ বলিতেছেন,

"যে ব্যক্তি ব্যসনগ্রস্ত বান্ধব মুক্ত করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্নবান্ না হয়, পণ্ডিতগণ তাঁহারে নৃশংস বলিয়া কীর্ত্তন করেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মিত্রের কেশ পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া তাহাকে অকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। * * * * যদি

তিনি (দুর্য্যোধন) আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমার প্রতি শঙ্কা করেন, তাহাতে আমার কিছু মাত্র ক্ষতি নাই ; প্রত্যুত আত্মীয়কে সদুপদেশ প্রদান নিবন্ধন পরম সন্তোষ ও আনৃণ্য লাভ হইবে। যে ব্যক্তি জ্ঞাতিভেদ সময়ে সৎপরামর্শ প্রদান না করে, সে ব্যক্তি কখনও আত্মীয় নহে।"

ইউরোপীয়দিগের বিশ্বাস, কৃষ্ণ কেবল পরস্ত্রীলুব্ধ পাপিষ্ঠ গোপ ; এ দেশের লোকের কাহারও বা সেইরূপ বিশ্বাস, কাহারও বিশ্বাস যে তিনি মনুষ্যহত্যার জন্য অবতীর্ণ, কাহারও বিশ্বাস তিনি "চক্রী"—অর্থাৎ স্বাভিলাষসিদ্ধি জন্য কুচক্র উপস্থিত করেন। তিনি যে এ সকল নহেন—তিনি যে তৎপরিবর্ত্তে লোকহিতৈষীর শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মোপদেষ্টার শ্রেষ্ঠ, আদর্শ মনুষ্য—ইহাই বুঝাইবার জন্য এই সকল উদ্ধৃত করিতেছি।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—হস্তিনায় দ্বিতীয় দিবস

পরদিন প্রাতে স্বয়ং দুর্য্যোধন ও শকুনি আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বিদুরভবন হইতে কৌরবসভায় লইয়া গেলেন। অতি মহতী সভা হইল। নারদাদি দেবর্ষি, এবং জমদগ্নি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষি তথায় উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ পরম বাগ্মিতার সহিত দীর্ঘ বক্তৃতায় ধৃতরাষ্ট্রকে সন্ধিস্থাপনে প্রবৃত্তি দিতে লাগিলেন। ঋষিগণও সেইরূপ করিলেন। কিছুতে কিছু হইল না। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, "আমার সাধ্য নহে, দুর্য্যোধনকে বল।" দুর্য্যোধনকে কৃষ্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি অনেক প্রকার বুঝাইলেন। সন্ধি স্থাপন দূরে থাক, দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে কড়া কড়া শুনাইয়া দিলেন। কৃষ্ণও তাহার উপযুক্ত উত্তর দিলেন। দুর্য্যোধনের দুশ্চরিত্র ও পাপাচরণ সকল বুঝাইয়া দিলেন। ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্য্যোধন উঠিয়া গেলেন।

তখন কৃষ্ণ, যাহা সমস্ত পৃথিবীর রাজনীতির মূলসূত্র, তদনুসারে কার্য্য করিতে ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিলেন। রাজশাসনের মূলসূত্র এই যে, প্রজারক্ষার্থ দুষ্কৃতকারীকে দণ্ডিত করিবে। অর্থাৎ অনেকের হিতার্থ একের দণ্ড বিধেয়। সমাজের রক্ষার্থ হত্যাকারীর বধ বিহিত। যাহাকে বদ্ধ না করিলে তাহার পাপাচরণে বহুসহস্র প্রাণীর প্রাণসংহার হইবে, তাহাকে বদ্ধ করাই জ্ঞানীর উপদেশ। ইউরোপীয় সমস্ত রাজা ও রাজমন্ত্রী পরামর্শ করিয়া এই জন্য খ্রীঃ ১৮১৫ অব্দে নপোলেয়নকে যাবজ্জীবন আবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই জন্য মহানীতিজ্ঞ কৃষ্ণ ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিলেন যে, দুর্য্যোধনকে বাঁধিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করুন। তিনি নিজে, সমস্ত যদুবংশের রক্ষার্থ, কংস মাতুল হইলেও তাহাকে বধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি সে উদাহরণও দিলেন। বলা বাহুল্য যে এ পরামর্শ গৃহীত হইল না।

এদিকে দুর্য্যোধন রুষ্ট হইয়া কৃষ্ণকে আবদ্ধ করিবার জন্য কর্ণের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা, প্রভৃতি কৃষ্ণের জ্ঞাতিবর্গ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সাত্যকি কৃষ্ণের নিতান্ত অনুগত ও প্রিয় ; অস্ত্রবিদ্যায় অর্জ্জুনের শিষ্য, এবং প্রায় অর্জ্জুনতুল্য বীর। ইঙ্গিতজ্ঞ মহাবুদ্ধিমান্ সাত্যকি এই মন্ত্রণা জানিতে পারিলেন। তিনি অন্যতর যাদববীর কৃতবর্ম্মাকে সসৈন্যে পুরদ্বারে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া কৃষ্ণকে এই

মন্ত্রণা জানাইলেন। এবং সভামধ্যে প্রকাশ্যে ইহা ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে জানাইলেন। শুনিয়া বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,

"যেমন পতঙ্গগণ পাবকে পতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, ইহাদের দশাও কি সেইরূপ হইবে না? সেইরূপ জনার্দ্দন ইচ্ছা করিলে যুদ্ধকালে সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিবেন।" ইত্যাদি।

পরে কৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহা যথার্থই আদর্শ পুরুষের উক্তি। তিনি বলশালী, সুতরাং ক্রোধশূন্য এবং ক্ষমাশীল। তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন,

"শুনিতেছি, দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বলপূর্ব্বক নিগৃহীত করিবেন। কিন্তু আপনি অনুমতি করিয়া দেখুন, আমি ইহাদিগকে আক্রমণ করি, কি ইঁহারা আমাকে আক্রমণ করেন। আমার এরূপ সামর্থ্য আছে, যে আমি একাকী ইহাদিগকে সকলকে নিগৃহীত করিতে পারি। কিন্তু আমি কোন প্রকারেই নিন্দিত পাপজনক কর্ম্ম করিব না। আপনার পুত্রেরাই পাণ্ডবগণের অর্থে লোলুপ হইয়া স্বার্থভ্রষ্ট হইবেন। বস্তুতঃ ইহারা আমাকে নিগৃহীত করিতে ইচ্ছা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কৃতকার্য্য করিতেছেন। আমি অদ্যই ইঁহাদিগকে ও ইঁহাদিগের অনুচরগণকে নিগ্রহণ করিয়া পাণ্ডবগণকে প্রদান করিতে পারি। তাহাতে আমাকে পাপভাগী হইতেও হয় না। কিন্তু আপনার সন্নিধানে ঈদৃশ ক্রোধ ও পাপবুদ্ধিজনিত গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না। আমি অনুজ্ঞা করিতেছি যে, দুর্নীতিপরায়ণগণ দুর্য্যোধনের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করুক।"*

---

* কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রকাশিত অনুবাদ প্রশংসিত, এ জন্য সচরাচর আমি মূলের সহিত অনুবাদ না মিলাইয়াই অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু কৃষ্ণের এই উক্তিতে কিছু অসঙ্গতি ঐ অনুবাদে দেখা যায়, যথা, যে কার্য্যের জন্য পাপভাগী হইতে হয় না এক স্থানে বলিয়াছেন, সেই কার্য্যকে কয় ছত্র পরে পাপবুদ্ধিজনিত বলিতেছেন। এজন্য মূলের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলাম। মূলে তত অসঙ্গতি দেখা যায় না। মূল উদ্ধৃত করিতেছি—

রাজন্নেতে যদি ক্রুদ্ধা মাং নিগৃহ্নীয়ুরোজসা।
এতে বা মামহং বৈনাননুজানীহি পার্থিব ॥
এতান্ হি সর্ব্বান্ সংরব্ধান্নিয়ন্তুমহমুৎসহে।
ন চাহং নিন্দিতং কর্ম্ম কুর্য্যাং পাপং কথঞ্চন ॥
পাণ্ডবার্থে হি লুভ্যন্তঃ স্বার্থান্ হাস্যন্তি তে সুতাঃ।
এতে চেদেবমিচ্ছন্তি কৃতকার্য্যো যুধিষ্ঠিরঃ ॥
অদ্যৈব হ্যহমেনাংশ্চ যে চৈনাননু ভারত।
নিগৃহ্য রাজন্ পার্থেভ্যো দদ্যাং কিং দুষ্কৃতং ভবেৎ ॥
ইদন্তু ন প্রবর্ত্তেয়ং নিন্দিতং কর্ম্ম ভারত।
সন্নিধৌ তে মহারাজ ক্রোধজং পাপবুদ্ধিজম্ ॥
এষ দুর্য্যোধনো রাজন্ যথেচ্ছতি তথাস্তু তৎ।
অহন্তু সর্ব্বাংস্তনয়াননুজানামি তে নৃপ ॥

"কিং দুষ্কৃতং ভবেৎ" ইতি বাক্যের অর্থ ঠিক "পাপভাগী হইতে হয় না", এমত নহে। কথার ভাব ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, "দুর্য্যোধন আমাকে বদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে; আমি যদি তাহাকে এখন বাঁধিয়া লইয়া যাই, তাহা হইলে কি এমন মন্দ কাজ হয়?" দুর্য্যোধনকে বদ্ধ করা

এই কথার পর, ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে ডাকাইয়া আনাইলেন, এবং তাঁহাকে অতিশয় কটূক্তি করিয়া ভর্ৎসনা করিলেন। বলিলেন,

"তুমি অতি নৃশংস, পাপাত্মা ও নীচাশয়; এই নিমিত্তই অসাধ্য, অযশস্কর, সাধুবিগর্হিত, পাপাচরণে সমুৎসুক হইয়াছ। কুলপাংশুল মূঢ়ের ন্যায় দুরাত্মাদিগের সহিত মিলিত হইয়া নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ জনার্দ্দনকে নিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। যেমন বালক চন্দ্রমাকে গ্রহণ করিতে উৎসুক হয়, তুমিও সেইরূপ ইন্দ্রাদি দেবগণের দুরাক্রম্য কেশবকে গ্রহণ করিবার বাসনা করিতেছ। দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও উরগগণ যাঁহার সংগ্রাম সহ্য করিতে সমর্থ হয় না; তুমি কি, সেই কেশবের পরিচয় পাও নাই? বৎস! হস্তদ্বারা কখন বায়ু গ্রহণ করা যায় না; পাণিতল দ্বারা কখন পাবক স্পর্শ করা যায় না; মস্তক দ্বারা কখন মেদিনী ধারণ করা যায় না; এবং বলদ্বারাও কখন কেশবকে গ্রহণ করা যায় না।"

তার পর বিদুরও দুর্য্যোধনকে ঐরূপ ভর্ৎসনা করিলেন। বিদুরের বাক্যাবসানে, বাসুদেব উচ্চহাস্য করিলেন, পরে সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মার হস্ত ধারণপূর্ব্বক কুরুসভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

এই পর্য্যন্ত মহাভারতে আখ্যাত ভগবদ্যানবৃত্তান্ত, সুসঙ্গত ও স্বাভাবিক; কোন গোলযোগ নাই। অতিপ্রকৃত কিছুই নাই, ও অবিশ্বাসের কারণও কিছু নাই। কিন্তু অঙ্গুলিকণ্ডূয়ননিপীড়িত প্রক্ষিপ্তকারীর জাতি গোষ্ঠী, ইহা কদাচ সহ্য করিতে পারে না। এমন একটা মহদ্ব্যাপারের ভিতর একটা অনৈসর্গিক অদ্ভুত কাণ্ড না প্রবিষ্ট করাইলে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব রক্ষা হয় কৈ? বোধ করি এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহারা, কৃষ্ণের হাস্য ও নিষ্ক্রান্তির মধ্যে একটা বিশ্বরূপপ্রকাশ প্রক্ষিপ্ত করিয়াছেন। এই মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের ভগবদ্গীতা-পর্ব্বাধ্যায়ে (তাহা প্রক্ষিপ্ত হউক বা না হউক) আর একবার বিশ্বরূপপ্রদর্শন বর্ণিত আছে। সেই বিশ্বরূপবর্ণনায় আর এই বর্ণনায় কি বিস্ময়কর প্রভেদ! গীতার একাদশের বিশ্বরূপবর্ণনা প্রথম শ্রেণীর কবির রচনা; সাহিত্য-জগৎ খুঁজিয়া বেড়াইলে তেমন আর কিছু পাওয়া দুর্লভ। আর ভগবদ্যান-পর্ব্বাধ্যায়ে এই বিশ্বরূপবর্ণনা যাঁহার রচিত, কাব্যরচনা তাঁহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। ভগবদ্গীতার একাদশে পড়ি যে, ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, "তোমা ব্যতিরেকে আর কেহই ইহা পূর্ব্বে নিরীক্ষণ করে নাই।" কিন্তু তৎপূর্ব্বেই এখানে দুর্য্যোধনাদি কৌরবসভাস্থ সকল লোকেই বিশ্বরূপ নিরীক্ষণ করিল। ভগবান্ গীতার একাদশে, আরও বলিতেছেন, "তোমা ব্যতিরেকে মনুষ্যলোকে আর কেহই বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, ক্রিয়াকলাপ, লয় ও অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা আমার ঈদৃশ রূপ অবলোকন করিতে সমর্থ হয় না।" কিন্তু কুকবির হাতে পড়িয়া, এখানে বিশ্বরূপ যার তার প্রত্যক্ষীভূত

মন্দ কাজ হয় না, কেন না অনেকের হিতের জন্য এক জনকে পরিত্যাগ করা শ্রেয় বলিয়া কৃষ্ণ স্বয়ংই ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দিয়াছেন যে, ইহাকে বদ্ধ কর। তবে কৃষ্ণ এক্ষণে স্বয়ং এ কাজ করিলে ক্রোধবশতঃই তিনি ইহা করিতেছেন, ইহা বুঝাইবে। কেন না এতক্ষণ তিনি নিজে তাহাকে বধ করিবার অভিপ্রায় করেন নাই। ক্রোধ যাহাতে প্রবর্ত্তিত করে, তাহা পাপবুদ্ধিজনিত, সুতরাং আদর্শ পুরুষের পক্ষে নিন্দিত ও পরিহার্য্য কর্ম্ম।

হইল। গীতায় আরও কথিত হইয়াছে, অনন্যসাধারণ ভক্তি প্রদর্শন করিলেই আমারে এইরূপে জ্ঞাত হইতে পারে, এবং আমার দর্শন ও আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।” কিন্তু এখানে দুষ্কৃতকারী পাপাত্মা ভক্তিশূন্য শত্রুগণও তাহা নিরীক্ষণ করিল।

নিষ্প্রয়োজনে কোন কর্ম্ম মূর্খেও করে না, যিনি বিশ্বরূপী তাঁহার ত কথাই নাই। এখানে বিশ্বরূপ প্রকাশের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় নাই। দুর্য্যোধনাদি বলপ্রয়োগের পরামর্শ করিতেছিল, বলপ্রয়োগের কোন উদ্যম করে নাই। পিতা ও পিতৃব্য কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া দুর্য্যোধন নিরুত্তর হইয়াছিল। বলপ্রকাশের কোন উদ্যম করিলেও, সে বল নিশ্চিত ব্যর্থ হইত, ইহা কৃষ্ণের অগোচর ছিল না। তিনি স্বয়ং এতাদৃশ বলশালী যে, বলের দ্বারা কেহ তাঁহার নিগ্রহ করিতে পারে না। ধৃতরাষ্ট্র ইহা বলিলেন, বিদুর বলিলেন, এবং কৃষ্ণ নিজেও বলিলেন। কৃষ্ণের নিজের বল আত্মরক্ষায় প্রচুর না হইলেও কোন শঙ্কা ছিল না, কেন না, সাত্যকি কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত বৃষ্ণিবংশীয়েরা তাঁহার সাহায্য জন্য উপস্থিত ছিলেন। তাহাদিগের সৈন্যও রাজদ্বারে যোজিত ছিল। দুর্য্যোধনের সৈন্য উপস্থিত থাকার কথা কিছু দেখা যায় না। অতএব বলদ্বারা নিগ্রহের চেষ্টা ফলবতী হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সম্ভাবনার অভাবেও ভীত হন, কৃষ্ণ এরূপ কাপুরুষ নহেন। যিনি বিশ্বরূপ, তাঁহার এরূপ ভয়ের সম্ভাবনা নাই। অতএব বিশ্বরূপ প্রকাশের কোন কারণ ছিল না। এ অবস্থায় ক্রুদ্ধ বা দাম্ভিক ব্যক্তি ভিন্ন শত্রুকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা করে না। যিনি বিশ্বরূপ, তিনি ক্রোধশূন্য এবং দম্ভশূন্য।

অতএব, এখানে বিশ্বরূপের কথাটা কুকবির প্রণীত অলীক উপন্যাস বলিয়া ত্যাগ করাই বিধেয়। আমি পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছি, মানুষী শক্তি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণ কর্ম্ম করেন, ঐশী শক্তি দ্বারা নহে। এখানে তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছিল, এরূপ বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই।

কুরুসভা হইতে কৃষ্ণ কুন্তীসম্ভাষণে গেলেন। সেখান হইতে তিনি উপপ্লব্য নগরে, যেখানে পাণ্ডবেরা অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে কর্ণকে আপনার রথে তুলিয়া লইলেন।

যাহারা কৃষ্ণকে নিগ্রহ করিবার জন্য পরামর্শ করিতেছিল, কর্ণ তাহার মধ্যে। তবে কর্ণকে কৃষ্ণ স্বরথে আরোহণ করাইয়া চলিলেন কেন, তাহা পরপরিচ্ছেদে বলিব। সে কথায় কৃষ্ণচরিত্র পরিস্ফুট হয়। সাম ও দণ্ডনীতিতে কৃষ্ণের নীতিজ্ঞতা দেখিয়াছি। এক্ষণে ভেদনীতিতে তাঁহার পারদর্শিতা দেখিব। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিব যে, কৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ বটে, কেন না, তাঁহার দয়া, জীবের হিতকামনা, এবং বুদ্ধি, সকলই লোকাতীত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণকর্ণসংবাদ

কৃষ্ণ সর্ব্বভূতে দয়াময়। এই মহাযুদ্ধজনিত যে অসংখ্য প্রাণিক্ষয় হইবে, তাহাতে আর কোন ক্ষত্রিয় ব্যথিত নহে, কেবলই কৃষ্ণই ব্যথিত। যখন প্রথম বিরাট নগরে যুদ্ধের প্রস্তাব হয়, তখন, কৃষ্ণ যুদ্ধের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। অর্জ্জুন তাঁহাকে যুদ্ধে

বরণ করিতে গেলে, কৃষ্ণ এ যুদ্ধে অস্ত্র ধরিবেন না ও যুদ্ধ করিবেননা প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্তু তাহাতেও যুদ্ধ বন্ধ হইল না। অতএব উপায়ান্তর না দেখিয়া ভরসাশূন্য হইয়াও, সন্ধি স্থাপনের জন্য ধৃতরাষ্ট্র সভায় গেলেন। তাহাতেও কিছু হইল না, প্রাণিহত্যা নিবারণ হয় না। তখন রাজনীতিজ্ঞ কৃষ্ণ জনসমূহের রক্ষার্থ উপায়ান্তর উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন।

কর্ণ মহাবীরপুরুষ। তিনি অর্জ্জুনের সমকক্ষ রথী। তাঁহার বাহুবলেই দুর্য্যোধন আপনাকে বলবান্ মনে করেন। তাঁহার বলের উপর নির্ভর করিয়াই প্রধানতঃ তিনি পাণ্ডবদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত। কর্ণের সাহায্য না পাইলে তিনি কদাচ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না। কর্ণকে তাঁহার শত্রুপক্ষের সাহায্যে প্রবৃত্ত দেখিলে অবশ্যই তিনি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবেন। যাহাতে তাহা ঘটে, তাহা করিবার জন্য কর্ণকে আপনার রথে তুলিয়া লইলেন। বিরলে কর্ণের সঙ্গে কথোপকথন আবশ্যক।

কৃষ্ণের এই অভিপ্রায় সিদ্ধির উপযোগী অন্যের অজ্ঞাত সহজ উপায়ও ছিল।

কর্ণ অধিরথনামা সূতের পুত্র বলিয়া পরিচিত। বস্তুতঃ তিনি অধিরথের পুত্র নহেন—পালিতপুত্র মাত্র। তাহা তিনি জানিতেন না। তাঁহার নিজ জন্মবৃত্তান্ত তিনি অবগত ছিলেন না। তিনি সূতপত্নী রাধার গর্ভজাত না হইয়া, কুন্তীর গর্ভজাত, সূর্য্যের ঔরসে তাঁহার জন্ম। তবে কুন্তীর কন্যাকালে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া কুন্তী, পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ তিনি যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের সহোদর ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। এ কথা কুন্তী ভিন্ন আর কেহই জানিত না। আর কৃষ্ণ জানিতেন; তাঁহার অলৌকিক বুদ্ধির নিকটে সকল কথাই সহজে প্রতিভাত হইত। কুন্তী তাঁহার পিতৃষ্বসা; ভোজরাজগৃহে এ ঘটনা হয়, অতএব কৃষ্ণ মনুষ্যবুদ্ধিতেই ইহা জানিতে পারা অসম্ভব নহে।

কৃষ্ণ এই কথা এক্ষণে রথারূঢ় কর্ণকে শুনাইলেন। বলিলেন,

"শাস্ত্রজ্ঞেরা কহেন, যিনি যে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তিনিই সেই কন্যার সহোঢ় ও কানীনপুত্রের পিতা। হে কর্ণ! তুমিও তোমার জননীর কন্যাকালাবস্থায় সমুৎপন্ন হইয়াছ, তন্নিমিত্ত তুমি ধর্ম্মতঃ পুত্র; অতএব চল, ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধেও* তুমি রাজ্যেশ্বর হইবে।" তিনি কর্ণকে বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি জ্যেষ্ঠ, এ জন্য তিনিই রাজা হইবেন, অপর পঞ্চ পাণ্ডব তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবে।

কৃষ্ণের এই পরামর্শ সর্ব্বজনের ধর্ম্মবৃদ্ধিকর ও হিতকর। প্রথমতঃ কর্ণের পক্ষে হিতকর, কেন না তিনি রাজ্যেশ্বর হইবেন, এবং তাঁহার পক্ষে ধর্ম্মানুমত, কেন না

---

* "বিরুদ্ধেও" এই পদটি কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে আছে, কিন্তু ইহা এখানে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। আমার কাছে মূল মহাভারত যাহা আছে, তাহাতে দেখিলাম, নিগ্রহার্দ্ধমনাস্ত্রাণাম্ আছে। বোধ হয় নিগ্রহার্থধর্মশাস্ত্রাণাম্ হইবে। তাহা হইলে অর্থ সঙ্গত হয়।

এই অংশ ছাপা হওয়ার পর জানিতে পারিলাম যে, ইহার অন্যতর পাঠও আছে, যথা—"নিগ্রহাদ্ধর্ম্মশাস্ত্রাণাম্।" এ স্থলে নিগ্রহ অর্থে মর্য্যাদা। যথা—

"নিগ্রহো ভর্ৎসনেঽপি স্যাৎ মর্য্যাদায়াঞ্চ বন্ধনে।"—ইতি মেদিনী।

"নিগ্রহো ভর্ৎসনে প্রোক্তো মর্য্যাদায়াঞ্চ বন্ধনে।—ইতি বিশ্ব।

"নিয়মেন বিধিনা গ্রহণং নিগ্রহঃ।"—ইতি চিন্তামণিঃ।

ভ্রাতৃগণের প্রতি শত্রুভাব পরিত্যাগ করিয়া মিত্রভাব অবলম্বন করিবেন। ইহা দুর্য্যোধনাদির পক্ষেও পরম হিতকর, কেন না যুদ্ধ হইলে তাঁহারা কেবল রাজ্যভ্রষ্ট নহে, সবংশে নিপাতপ্রাপ্ত হইবারই সম্ভাবনা। যুদ্ধ না হইলে তাঁহাদের প্রাণও বজায় থাকিবে, রাজ্যও বজায় থাকিবে, কেবল পাণ্ডবের ভাগ ফিরাইয়া দিতে হইবে। ইহাতে পাণ্ডবদিগেরও হিত ও ধর্ম্ম, কেন না যুদ্ধরূপ নৃশংস ব্যাপারে প্রবৃত্ত না হইয়া, আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি বধ না করিয়াও, স্বরাজ্য কর্ণের সহিত ভোগ করিবেন। আর এ পরামর্শের পরম ধর্ম্ম্যতা ও হিতকারিতা এই যে, ইহা দ্বারা অসংখ্য মনুষ্যগণের প্রাণ রক্ষা হইতে পারিবে।

কর্ণও কৃষ্ণের কথার উপযোগিতা স্বীকার করিলেন। তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে, এ যুদ্ধে দুর্য্যোধনাদির রক্ষা নাই। কিন্তু কৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলে তাঁহাকে কোন কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। অধিরথ ও রাধা তাঁহাকে প্রতিপালন করিয়াছে। তাঁহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি সূত বংশে বিবাহ করিয়াছেন, এবং সেই ভার্য্যা হইতে তাঁহার পুত্র পৌত্রাদি জন্মিয়াছে। তাঁহাদিগকে কোন মতেই কর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আর তিনি ত্রয়োদশ বৎসর দুর্য্যোধনের আশ্রয়ে থাকিয়া রাজ্যভোগ করিয়াছেন; দুর্য্যোধন তাঁহারই ভরসা করেন; এখন দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবপক্ষে গেলে লোকে তাঁহাকে কৃতঘ্ন, পাণ্ডবদিগের ঐশ্বর্য্যলোলুপ, বা তাহাদের ভয়ে ভীত কাপুরুষ বলিবে। এই জন্য কর্ণ কোন মতেই কৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলেন না।

কৃষ্ণ বলিলেন, "যখন আমার কথা তোমার হৃদয়ঙ্গম হইল না, তখন নিশ্চয়ই এই বসুন্ধরার সংহারদশা সমুপস্থিত হইয়াছে।"

কর্ণ উপযুক্ত উত্তর দিয়া, কৃষ্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিষণ্ণভাবে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কৃষ্ণচরিত্র বুঝিবার জন্য কর্ণচরিত্রের বিস্তারিত সমালোচনার প্রয়োজন নাই; এজন্য আমি তৎসম্বন্ধে কিছু বলিলাম না। কর্ণচরিত্র অতি মহৎ ও মনোহর।

নবম পরিচ্ছেদ—উপসংহার

কৃষ্ণ উপপ্লব্য নগরে ফিরিয়া আসিলে যুধিষ্ঠিরাদি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি হস্তিনাপুরে কি করিয়াছিলে বল।

কৃষ্ণ, নিজে যাহা বলিয়াছিলেন, এবং অন্যে যাহা বলিয়াছিল, তাই বলিতে লাগিলেন। কিন্তু সেই সকল বক্তৃতার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণনা দেখিয়াছি, এখানে তাহার সহিত মিল নাই। কিছুর সঙ্গে কিছু মিলে না। মিলিলে দীর্ঘ পুনরুক্তি ঘটিত। তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য কোন মহাপুরুষ কিছু নূতন রকম বসাইয়া দিয়াছেন বোধ হয়।

এইখানে ভগবদ্‌যান-পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত। তার পর সৈন্যনির্য্যাণ-পর্ব্বাধ্যায়। ইহাতে বিশেষ কথা কিছু নাই। কতকগুলা মৌলিক কথা আছে; কতকগুলা কথা অমৌলিক বলিয়া বোধ হয়; কৃষ্ণসম্বন্ধীয় কথা বড় অল্প। কৃষ্ণের ও অর্জ্জুনের পরামর্শানুসারে, পাণ্ডবেরা ধৃষ্টদ্যুম্নকে সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন, এবং বলরাম মদ খাইয়া আসিয়া,

কৃষ্ণকে কিছু মিষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন, কেন না, তিনি কুরুপাণ্ডবকে সমান জ্ঞান করেন না। কুরুসভায় যাহা ঘটিয়াছিল, সে কথাও কিছু হইল। ইহা ভিন্ন আরও কিছু নাই।

তাহার পর উলূকদূতাগমন-পর্ব্বাধ্যায়। এটি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ইহাতে আর কিছুই নাই, কেবল উভয় পক্ষের গালিগালাজ। দুর্য্যোধন, শকুনি প্রভৃতির পরামর্শে উলূককে পাণ্ডবদিগের নিকট পাঠাইলেন। উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল পাণ্ডবদিগকে ও কৃষ্ণকে খুব গালিগালাজ করা। উলূক আসিয়া ছয় জনকেই খুব গালিগালাজ করিল। পাণ্ডবেরা উত্তরে খুবই গালিগালাজ করিলেন। কৃষ্ণ বড় কিছু বলিলেন না, তাঁহার ন্যায় রোষামর্ষশূন্য ব্যক্তি গালিগালাজ করেন না, বরং একটা রাগা-রাগি বাড়াবাড়ি যাহাতে না হয়, এই অভিপ্রায়ে পাণ্ডবেরা উত্তর করিবার আগেই তিনি উলূককে বিদায় করিবার চেষ্টা করিলেন। বলিলেন, "তুমি শীঘ্র গমন করিয়া দুর্য্যোধনকে কহিবে—পাণ্ডবেরা তোমার বাক্য শ্রবণ ও তাহার যথার্থ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে তোমার যেরূপ অভিপ্রায় তাহাই হইবে।" অথচ গালিগালাজটা কৃষ্ণার্জ্জুনের ভাগেই বেশী রকম হইয়াছিল।

কিন্তু উলূকের দুর্ব্বুদ্ধি, উলূক ছাড়ে না। আবার গালিগালাজ আরম্ভ করিল। না হইবে কেন? ইনি দুর্য্যোধনের সহোদর। তখন পাণ্ডবেরা একে একে উলূকের উত্তর দিলেন। উলূককে সুদ সমেত আসল ফিরাইয়া দিলেন। কৃষ্ণও একটা কথা বলিলেন, "আমি অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছি বলিয়া যুদ্ধ করিব না, ইহা মনে স্থির করিয়া ভীত হইতেছ না; কিন্তু যেমন হুতাশনে তৃণ সকল ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ আমিও চরম কালে ক্রোধভরে সমস্ত পার্থিবগণকে সংহার করিব সন্দেহ নাই।"

উলূকদূতাগমন-পর্ব্বাধ্যায়ে মহাভারতের কার্য্যের পক্ষে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ইহাতে রচনার নৈপুণ্য বা কবিত্ব নাই। এবং কোন কোন স্থানে মহাভারতের অন্যান্যাংশের সহিত বিরুদ্ধভাবাপন্ন; অনুক্রমণিকাধ্যায়ে সঞ্জয় এবং কৃষ্ণের দৌত্যের কথা আছে, কিন্তু উলূকদূতের কথা নাই। এই সকল কারণে ইহাকে আদিমস্তরান্তর্গত বিবেচনা করি না।

ইহার পর রথাতিরথসংখ্যান, এবং তৎপরে অম্বোপাখ্যান-পর্ব্বাধ্যায়। এ সকলে কৃষ্ণবৃত্তান্ত কিছুই নাই। এইখানে উদ্যোগপর্ব্ব সমাপ্ত।

ষষ্ঠ খণ্ড

কুরুক্ষেত্র

যো নিষণ্ণো ভবেদ্রাত্রৌ দিবা ভবতি বিষ্ঠিতঃ।
ইষ্টানিষ্টস্য চ দ্রষ্টা তস্মৈ দ্রষ্টাত্মনে নমঃ॥
শান্তিপর্ব্ব, ৪৭ অধ্যায়ঃ।

প্রথম পরিচ্ছেদ—ভীষ্মের যুদ্ধ

এক্ষণে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবে। মহাভারতে চারিটি পর্ব্বে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। দুর্য্যোধনের সেনাপতিগণের নামক্রমে ক্রমান্বয়ে এই চারিটি পর্ব্বের নাম হইয়াছে ভীষ্মপর্ব্ব, দ্রোণপর্ব্ব, কর্ণপর্ব্ব ও শল্যপর্ব্ব।

এই যুদ্ধপর্ব্বগুলি মহাভারতের নিকৃষ্ট অংশ মধ্যে গণ্য করা উচিত। পুনরুক্তি, অকারণ এবং অরুচিকর বর্ণনাবাহুল্য, অনৈসর্গিকতা, অত্যুক্তি এবং অসঙ্গতি দোষ এইগুলিতে বড় বেশী। ইহার অল্প ভাগই আদিমস্তরভুক্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু কোন্ অংশ মৌলিক, আর কোন্ অংশ অমৌলিক, স্থির করা বড় দুষ্কর। যেখানে সবই কাঁটাবন, সেখানে পুষ্পচয়ন বড় দুঃসাধ্য। তবে যেখানে কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে কোন কথা পাওয়া যায়, সেই স্থান আমরা যথাসাধ্য বুঝিবার চেষ্টা করিব।

ভীষ্মপর্ব্বের প্রথম জম্বুখণ্ড-বিনির্ম্মাণ-পর্ব্বাধ্যায়। তাহার সঙ্গে যুদ্ধের কোন সম্বন্ধ নাই—মহাভারতেরও বড় অল্প। কৃষ্ণচরিত্রের কোন কথাই নাই। তারপর ভগবদ্গীতা-পর্ব্বাধ্যায়। ইহার প্রথম চব্বিশ অধ্যায়ের পর গীতারম্ভ। এই চব্বিশ অধ্যায় মধ্যে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিশেষ কোন কথা নাই। কৃষ্ণ যুদ্ধের পূর্ব্বে দুর্গাস্তব করিতে অর্জ্জুনকে পরামর্শ দিলে, অর্জ্জুন যুদ্ধারম্ভকালে দুর্গাস্তব পাঠ করিলেন। কোন গুরুতর কার্য্য আরম্ভ করিবার সময়ে আপন আপন বিশ্বাসানুযায়ী দেবতার আরাধনা করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ঈশ্বরের আরাধনা হইল। যাহা বলিয়া ডাকি না কেন, এক ভিন্ন ঈশ্বর নাই।

তারপর গীতা। ইহাই কৃষ্ণচরিত্রের প্রধান অংশ। এই গীতোক্ত অনুপম পবিত্র ধর্ম্ম প্রচারই কৃষ্ণের আদর্শ মনুষ্যত্বের বা দেবত্বের এক প্রধান পরিচয়।

কিন্তু এখানে আমি গীতা সম্বন্ধে কোন কথা বলিব না। তাহার কারণ এই যে, এই গীতোক্ত ধর্ম্ম এইখানি পৃথক্ গ্রন্থে* কিছু কিছু বুঝাইয়াছি, পরে আর একখানি† লিখিতে নিযুক্ত আছি। গীতা সম্বন্ধে আমার মত এই দুই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে। এখানে পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

ভগবদ্গীতা-পর্ব্বাধ্যায়ের পর ভীষ্মবধ-পর্ব্বাধ্যায়। এইখানেই যুদ্ধারম্ভ। যুদ্ধে কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথি মাত্র। সারথিদিগের অদৃষ্ট বড় মন্দ ছিল। মহাভারতে যে যুদ্ধের

* ধর্ম্মতত্ত্ব।

† শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাঙ্গালা টীকা।

বর্ণনা আছে, তাহা কতকগুলি দ্বৈরথ্যযুদ্ধ মাত্র। রথিগণ যুদ্ধ করিবার সময়ে পরস্পরের অশ্ব ও সারথিকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতেন। তাহার কারণ, অশ্ব বা সারথি নষ্ট হইলে, আর রথ চলিবে না। রথ না চলিলে রথী বিপন্ন হয়েন। সারথিরা যোদ্ধা নহে—বিনা দোষে বিনা যুদ্ধে নিহত হইত। কৃষ্ণকেও সে সুখের ভাগী হইতে হইয়াছিল; তিনি হত হয়েন নাই বটে, কিন্তু যুদ্ধের অষ্টাদশ দিবস মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বহুসংখ্যক বাণের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া ক্ষত বিক্ষত হইতেন। অন্যান্য সারথিগণ আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাহারা বৈশ্য, জাতিতে ক্ষত্রিয় নহে। কৃষ্ণ, আত্মরক্ষায় অতিশয় সক্ষম, তথাচ কর্ত্তব্যানুরোধে বসিয়া মার খাইতেন।

মহাভারতের যুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ইহা বলিয়াছি কিন্তু একদিন তিনি অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু প্রয়োগ করেন নাই। সে ঘটনাটা এইরূপ ;—

ভীষ্ম দুর্য্যোধনের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইয়া যুদ্ধ করেন। তিনি যুদ্ধে এরূপ নিপুণ যে, পাণ্ডবসেনার মধ্যে অর্জ্জুন ভিন্ন আর কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। কিন্তু অর্জ্জুন তাঁহার সঙ্গে ভাল করিয়া স্বশক্তি অনুসারে যুদ্ধ করেন না। তাহার কারণ এই যে, ভীষ্ম সম্বন্ধে অর্জ্জুনের পিতামহ, এবং বাল্যকালে পিতৃহীন, পাণ্ডবগণকে ভীষ্মই পিতৃবৎ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ভীষ্ম এখন দুর্য্যোধনের অনুরোধে নিরপরাধী পাণ্ডবদিগের শত্রু হইয়া তাহাদের অনিষ্টার্থ তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন বলিয়া, যদিও ভীষ্ম ধর্ম্মতঃ অর্জ্জুনের বধ্য, তথাপি অর্জ্জুন পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া কোন মতেই ভীষ্মের বধ সাধনে সম্মত নহে। এজন্য ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মৃদুযুদ্ধ করেন, পাছে ভীষ্ম নিপতিত হন, এজন্য সর্ব্বদা সঙ্কুচিত। তাহাতে ভীষ্ম, অপ্রতিহত বীর্য্যে বহুসংখ্যক পাণ্ডবসেনা বিনষ্ট করিতেন। ইহা দেখিয়া এক দিবস ভীষ্মকে বধ করিবার মানসে কৃষ্ণ স্বয়ং চক্রহস্তে অর্জ্জুনের রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক ভীষ্মের প্রতি পদব্রজে ধাবমান হইলেন।

দেখিয়া, কৃষ্ণভক্ত পরমাহ্লাদিত হইয়া বলিলেন,

এহ্যেহি দেবেশ জগন্নিবাস। নমোঽস্তু তে শার্ঙ্গগদাসিপাণে।
প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথ! রথোত্তমাৎ ভূতশরণ্য সংখ্যে॥

"এসো এসো দেবেশ জগন্নিবাস! হে শার্ঙ্গগদাখড়্গধারিন্! তোমাকে নমস্কার। হে লোকনাথ ভূতশরণ্য! যুদ্ধে আমাকে অবিলম্বে রথোত্তম হইতে পাতিত কর।"

অর্জ্জুনও কৃষ্ণের পশ্চাদনুসরণ করিয়া, কৃষ্ণকে অনুনয় করিয়া, স্বয়ং সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া, ফিরাইয়া আনিলেন।

এই ঘটনা দুই বার বর্ণিত হইয়াছে, একবার তৃতীয় দিবসের যুদ্ধে, আর একবার নবম দিবসের যুদ্ধে। শ্লোকগুলি একই, সুতরাং এক দিবসেরই ঘটনা লিপিকারের ভ্রম প্রমাদ বা ইচ্ছাবশতঃ দুই বার লিখিত হইয়া থাকিবে। সংস্কৃত গ্রন্থে সচরাচর এরূপ ঘটিয়া থাকে।

রচনা দেখিয়া বিচার করিলে, এই বিবরণকে মহাভারতের প্রথমস্তরভুক্ত বিবেচনা করা যাইতে পারে। কবিত্ব প্রথম শ্রেণীর, ভাব ও ভাষা উদার এবং জটিলতাশূন্য। প্রথম

স্তরের যতটুকু মৌলিকতা স্বীকার করা যাইতে পারে, এই ঘটনারও ততটুকু মৌলিকতা স্বীকারকরা যাইতে পারে।

এই ঘটনা লইয়া কৃষ্ণভক্তেরা, কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে একটা তর্ক তুলিয়া থাকেন। কাশীদাস ও কথকেরা এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অবলম্বন করিয়া, কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, ভীষ্ম যুদ্ধারম্ভকালে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে—তুমি যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছ যে, এ যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে না, আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমাকে অস্ত্র ধারণ করাইব।

অতএব এক্ষণে ভক্তবৎসল কৃষ্ণ, আপনার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত করিয়া, ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন।

এ সুবুদ্ধিরচনার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। ভীষ্মের এবম্বিধ প্রতিজ্ঞাও মূল মহাভারতে দেখা যায় না। কৃষ্ণেরও কোন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিত হয় না। তাঁহার প্রতিজ্ঞার মর্ম্ম এই যে—যুদ্ধ করিব না। দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন উভয়ে তাঁহাকে এককালে বরণাভিলাষী হইলে, তিনি উভয়ের সঙ্গে তুল্য ব্যবহার করিবার জন্য বলিলেন, "আমার তুল্য বলশালী আমার নারায়ণী সেনা এক জন গ্রহণ কর; আর একজন আমাকে লও।" "অযুধ্যমানঃ সংগ্রামে ন্যস্তশস্ত্রোঽহমেকেতঃ" এই পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা। সে প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইয়াছিল। কৃষ্ণ যুদ্ধ করেন নাই। ভীষ্ম সম্বন্ধীয় এই ঘটনাটির উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে: কেবল সাধ্যানুসারে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে উত্তেজিত করা। ইহা সারথিরা করিতেন। উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল।

যুদ্ধের নবম দিবসের রাত্রিতেও কৃষ্ণ ঐরূপ অভিপ্রায়ে কথা কহিয়াছিলেন। ভীষ্মকে অপরাজিত দেখিয়া যুধিষ্ঠির নবম রাত্রে বন্ধুবান্ধবগণকে ডাকিয়া ভীষ্মবধের পরামর্শ করিতেলাগিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, আমাকে অনুমতি দাও, আমি ভীষ্মকে বধ করিতেছি। অথবা অর্জ্জুনের উপরই এ ভার থাক; অর্জ্জুনও ইহাতে সক্ষম।

যুধিষ্ঠির এ কথায় সম্মত হইলেন না। কৃষ্ণ যে ভীষ্মবধ ইচ্ছা করিলেই করিতে পারিতেন, তাহা তিনি স্বীকার করিলেন। কিন্তু বলিলেন, "আত্মগৌরবের নিমিত্ত তোমাকে মিথ্যাবাদী করিতে চাহি না। তুমি অযুধ্যমান থাকিয়াই সাহায্য কর।" যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না। পরে কৃষ্ণের সম্মতি লইয়া, এবং অন্য পাণ্ডবগণ ও কৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া ভীষ্মের কাছে তাঁহার বধোপায় জানিতে গেলেন।

ভীষ্ম নিজের বধোপায় বলিয়া দিলেন। দৃশ্যতঃ সেইরূপ কার্য্য হইল। কার্য্যতঃ তাহার কিছুই হইল না। কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল—অর্জ্জুনই ভীষ্মকে শরশয্যাশায়িত ও রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। মূল মহাভারতের উপর দ্বিতীয় স্তরের কাব, কলম চালাইয়া একটা সঙ্গতিশূন্য, নিষ্প্রয়োজনীয়, কিন্তু আপাতমনোহর শিখণ্ডীসম্বন্ধীয় গল্প খাড়া করিয়াছেন। কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই, এজন্য আমরা তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—জয়দ্রথবধ

ভীষ্মের পর দ্রোণাচার্য্য সেনাপতি। দ্রোণপর্ব্বে প্রথমে কৃষ্ণকে বিশেষ কোন কর্ম্ম করিতে দেখা যায় না। তিনি নিপুণ সারথির ন্যায় কেবল সারথ্যই করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি যে কর্ত্তা ও নেতা, একথাটা এখানে সত্য নহে। মধ্যে মধ্যে অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠিরকে সদুপদেশ দেওয়া ভিন্ন তিনি আর কিছুই করেন নাই। দ্রোণাভিষেক-পর্ব্বাধ্যায়ের একাদশ অধ্যায়ে সঞ্জয়কৃত কৃষ্ণের বলবীর্য্য ও মহিমা কীর্ত্তন জন্য এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাওয়া যায়। তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই। এই অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বোধ হয়, এবং কৃষ্ণের বলবীর্য্য ও মহিমা কীর্ত্তনের মহাভারতে বা অন্যত্র কিছুই অভাবও নাই। আমরা তাঁহার মানবচরিত্র সমালোচনা করিতে ইচ্ছুক; মানবচরিত্র কার্য্যে প্রকাশ; অতএব আমরা কেবল কৃষ্ণকৃত কার্য্যেরই অনুসন্ধান করিব।

দ্রোণপর্ব্বে প্রথম ভগদত্তবধে কৃষ্ণের কোন কার্য্য দেখিতে পাই। ভগদত্ত মহাবীর, পাণ্ডবপক্ষীয় আর কেহ তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিল না; শেষ অর্জ্জুন আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগদত্ত অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে আপনাকে অশক্ত দেখিয়া, তাঁহার প্রতি বৈষ্ণবাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। অর্জ্জুন বা অপর কেহই এই অস্ত্র নিবারণে সমর্থ নহেন; অতএব কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আচ্ছাদিত করিয়া আপনি বক্ষে ঐ অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বক্ষে অস্ত্র বৈজয়ন্তী মালা হইয়া বিলম্বিত হইল।

এই অস্ত্র একটা অনৈসর্গিক অবোধগম্য ব্যাপার। যাহা অনৈসর্গিক, তাহাতে আমরা পাঠককে বিশ্বাস করিতে বলি না এবং অনৈসর্গিকের উপর কোন সত্যও সংস্থাপিত হয় না। অতএব এ গল্পটা আমাদের পরিত্যাজ্য।

দ্রোণপর্ব্বে, অভিমন্যুবধের পরে কৃষ্ণকে প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিতে পাই। যে দিন সপ্ত রথী বেড়িয়া অন্যায়পূর্ব্বক অভিমন্যুকে বধ করে, সে দিন কৃষ্ণার্জ্জুন সে রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না। তাঁহারা কৃষ্ণের নারায়ণী সেনার সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন—ঐ সেনা কৃষ্ণ দুর্য্যোধনকে দিয়াছিলেন। এক পক্ষে তিনি নিজে, অন্য পক্ষে তাঁহার সেনা—এইরূপে তিনি উভয় পক্ষের সঙ্গে সাম্য রক্ষা করিয়াছিলেন।

যুদ্ধান্তে ও দিবসান্তে শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণার্জ্জুন অভিমন্যুবধ বৃত্তান্ত শুনিলেন। অর্জ্জুন অতিশয় শোককাতর হইলেন।* যোগেশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং শোকমোহের অতীত। তাঁহার প্রথম কার্য্য অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা করা। তিনি যে সকল কথা বলিয়া অর্জ্জুনকে প্রবোধ দিলেন, তাহা তাঁহারই উপযুক্ত। গীতায় তিনি যে ধর্ম্ম প্রচারিত করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মানুমোদিত মহাবাক্যের দ্বারা অর্জ্জুনের শোকাপনয়ন করিলেন। ঋষিরা যুধিষ্ঠিরকে প্রবোধ দিতেছিলেন, এই বলিয়া যে, সকলেই মরিয়াছে ও সকলেই মরিয়া থাকে। তিনি তাহা বলিলেন না। তিনি বুঝাইলেন,

"যুদ্ধোপজীবী ক্ষত্রিয়গণের এই পথ। যুদ্ধমৃত্যুই ক্ষত্রিয়গণের সনাতন ধর্ম্ম।"

কৃষ্ণ অভিমন্যুজননী সুভদ্রাকেও ঐ কথা বলিয়া প্রবোধ দিলেন। বলিলেন,

* এমনও পাঠক থাকিতে পারেন যে, তাঁহাকে বলিয়া দিতে হয় যে, অভিমন্যু অর্জ্জুনের পুত্র ও কৃষ্ণের ভাগিনেয়।

"সৎকুলজাত ধৈর্যশালী ক্ষত্রিয়ের যেরূপ প্রাণপরিত্যাগ করা উচিত, তোমার পুত্র সেইরূপ প্রাণত্যাগ করিয়াছে; অতএব শোক করিবার আবশ্যক নাই। মহারথ, ধীর, পিতৃতুল্যপরাক্রমশালী অভিমন্যু ভাগ্যক্রমেই বীরগণের অভিলষিত গতি প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাবীর অভিমন্যু ভূরি শত্রু সংহার করিয়া পুণ্যজনিত সর্ব্বকামপ্রদ অক্ষয় লোকে গমন করিয়াছে। সাধুগণ, তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য শাস্ত্র ও প্রজ্ঞা দ্বারা যেরূপ গতি অভিলাষ করেন, তোমার কুমারের সেইরূপ গতিলাভ হইয়াছে। হে সুভদ্রে! তুমি বীরজননী, বীরপত্নী, বীরনন্দিনী ও বীরবান্ধবা; অতএব তনয়ের নিমিত্ত তোমার শোকাকুল হওয়া উচিত নহে।"

এ সকলে মাতার শোক নিবারণ হয় না জানি। কিন্তু এ হতভাগ্য দেশে এরূপ কথাগুলা শুনি ও শুনাই, ইহা ইচ্ছা করে।

এদিকে পুত্রশোকার্ত্ত অর্জ্জুন অতিশয় রোষপরবশ হইয়া এক নিদারুণ প্রতিজ্ঞায় আপনাকে আবদ্ধ করিলেন। তিনি যাহা শুনিলেন, তাহাতে বুঝিলেন যে, অভিমন্যুর মৃত্যুর প্রধান কারণ জয়দ্রথ। তিনি অতি কঠিন শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পরদিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে জয়দ্রথকে বধ করিবেন, না পারেন, আপনি অগ্নিপ্রবেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিবেন।

এই প্রতিজ্ঞায় উভয় শিবিরে বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। পাণ্ডবসৈন্য অতিশয় কোলাহল করিতে লাগিল, এবং বাদিত্রবাদকগণ ভারি বাজনা বাজাইতে লাগিল। কৌরবেরা চমকিত হইয়া অনুসন্ধান দ্বারা প্রতিজ্ঞা জানিতে পারিয়া জয়দ্রথরক্ষার্থ মন্ত্রণা করিতে লাগিল।

কৃষ্ণ দেখিলেন, একটা বিষম ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছে। অর্জ্জুন বিবেচনা না করিয়া যে কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন, তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়া সুসাধ্য নহে। জয়দ্রথ নিজে মহারথী, সিন্ধুসৌবীর-দেশের অধিপতি, বহু সেনার নায়ক, এবং দুর্য্যোধনের ভগিনীপতি। কৌরবপক্ষীয় অপরাজেয় যোদ্ধগণ তাঁহাকে সাধ্যানুসারে রক্ষা করিবেন। এ দিকে পাণ্ডবপক্ষের প্রধান পুরুষেরা সকলেই অভিমন্যুশোকে বিহ্বল—মন্ত্রণায় বিমুখ। অতএব কৃষ্ণ নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কৌরবশিবিরে গুপ্তচর পাঠাইলেন। চর আসিয়া সেখানকার বৃত্তান্ত সব বলিল। কৌরবেরা প্রতিজ্ঞার কথা সব জানিয়াছে। দ্রোণাচার্য্য ব্যূহরচনা করিবেন; তৎপশ্চাৎ কর্ণাদি সমস্ত কৌরবপক্ষীয় বীরগণ একত্রিত হইয়া জয়দ্রথকে রক্ষা করিবেন। এই দুর্ভেদ্য ব্যূহভেদ করিয়া, সকল বীরগণকে একত্র পরাজিত করিয়া, মহাবীর জয়দ্রথকে নিহত করা অর্জ্জুনেরও অসাধ্য হইতে পারে। অসাধ্য হয়, তবে অর্জ্জুনের আত্মহত্যা নিশ্চিত।

অতএব কৃষ্ণ আপনার অনুষ্ঠেয় চিন্তা করিয়া, তাহার ব্যবস্থা করিলেন। আপনার সারথি দারুককে ডাকিয়া, কৃষ্ণের নিজের রথ, উত্তম অশ্বে যোজিত করিয়া, অস্ত্রশস্ত্র পরিপূর্ণ করিয়া প্রভাতে প্রস্তুত রাখিতে আজ্ঞা করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় যে, যদি অর্জ্জুন এক দিনে ব্যূহ পার হইয়া সকল বীরগণকে পরাজয় করিতে না পারেন, তবে তিনি নিজেই যুদ্ধ করিয়া কৌরবনেতৃগণকে বধ করিয়া জয়দ্রথবধের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন।

কৃষ্ণকে যুদ্ধ করিতে হয় নাই, অর্জ্জুন স্বীয় বাহুবলেই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু যদি কৃষ্ণকে যুদ্ধ করিতে হইত, তাহা হইলে "অযুধ্যমানঃ সংগ্রামে ন্যস্তশস্ত্রোঽহমেকতঃ" ইতি সত্য হইতে বিচ্যুতি ঘটিত না। কারণ, যে যুদ্ধ সম্বন্ধে এ প্রতিজ্ঞা ঘটিয়াছিল, সে যুদ্ধ এ নহে। কুরুপাণ্ডবের রাজ্য লইয়া যে যুদ্ধ, এ সে যুদ্ধ নহে। আজিকার এ অর্জ্জুনপ্রতিজ্ঞাজনিত যুদ্ধ। এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য ভিন্ন; এক দিকে জয়দ্রথের জীবন, অন্য দিকে অর্জ্জুনের জীবন লইয়া যুদ্ধ। যুদ্ধে অর্জ্জুনের পরাভব হইলে, তাঁহাকে অগ্নিপ্রবেশ করিয়া আত্মহত্যা করিতে হইবে। এ যুদ্ধ পূর্ব্বে উপস্থিত হয় নাই—সুতরাং "অযুধ্যমানঃ সংগ্রামে" ইতি প্রতিজ্ঞা ইহার পক্ষে বর্ত্তে না। অর্জ্জুন কৃষ্ণের সখা, শিষ্য এবং ভগিনীপতি; তাঁহার আত্মহত্যানিবারণ কৃষ্ণের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম।

ইহার পর কৃষ্ণ ও অপর সকলে নিদ্রা গেলেন। এইখানে একটা আষাঢ়ে রকম স্বপ্নের গল্প আছে। স্বপ্নে আবার কৃষ্ণ অর্জ্জুনের কাছে আসিলেন, উভয়ে সেই রাত্রে হিমালয় গেলেন, মহাদেবের উপাসনা করিলেন, পাশুপত অস্ত্র পূর্ব্বেই (বনবাসকালে) অর্জ্জুন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু আবার চাহিলেন, ও পাইলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকল সমালোচনার নিতান্ত অযোগ্য।

পরদিন সূর্য্যাস্তের প্রাক্কালে অর্জ্জুন জয়দ্রথকে নিহত করিলেন। তজ্জন্য কৃষ্ণের কোন সাহায্য প্রয়োজন হয় নাই। তথাপি কথিত হইয়াছে, কৃষ্ণ অপরাহ্ণে যোগমায়া দ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিলেন; জয়দ্রথ নিহত হইলে পরে সূর্য্যকে পুনঃপ্রকাশিত করিলেন। কেন? সূর্য্যাস্ত হইয়াছে ভ্রমে, জয়দ্রথ অর্জ্জুনের সম্মুখে আসিবেন, এইরূপ ভ্রান্তির সৃষ্টির জন্য? এইরূপ ভ্রান্তিতে পড়িয়া জয়দ্রথ এবং তাঁহার রক্ষকগণ, উল্লাসিত এবং অনবহিত হইবেন, ইহাই কি অভিপ্রেত? এইখানে কাব্যের এক স্তরের উপর আর এক স্তর নিহিত হইয়াছে স্পষ্ট দেখা যায়। এক দিকে দেখা যায় যে, এরূপ ভ্রান্তিজননের কোন প্রয়োজন ছিল না। যোগমায়াবিকাশের পূর্ব্বেও অর্জ্জুন জয়দ্রথকে দেখিতে পাইতেছিলেন, এবং তিনি জয়দ্রথকে প্রহার করিতেছিলেন, জয়দ্রথও তাঁহাকে প্রহার করিতেছিল। সূর্য্যাবরণের পরেও ঠিক তাহাই হইতে লাগিল। সূর্য্যাবরণের পূর্ব্বেও অর্জ্জুনকে যেরূপ করিতে হইতেছিল, এখনও ঠিক সেইরূপ হইতে লাগিল। সমস্ত কৌরববীরগণকে পরাভূত না করিয়া অর্জ্জুন জয়দ্রথকে নিহত করিতে পারিলেন না। আর এক দিকে এই সকল উক্তির বিরোধী, সূর্য্যাবরণকারিণী যোগমায়ার বিকাশ। এ ভ্রান্তিসৃষ্টির প্রয়োজন, পরপরিচ্ছেদে বুঝাইতেছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—দ্বিতীয় স্তরের কবি

আমরা এত দূর পর্য্যন্ত সোজা পথে, সুবিধামত চলিয়া আসিতেছিলাম; কিন্তু এখন হইতে ঘোরতর গোলযোগ। মহাভারত সমুদ্রবিশেষ, কিন্তু এতক্ষণ আমরা, তাহার স্থির বারিরাশিমধ্যে মধুর মৃদুগম্ভীর শব্দ শুনিতে শুনিতে সুখে নৌযাত্রা করিতেছিলাম। এক্ষণে সহসা আমরা ঘোর বাত্যায় পড়িয়া, তরঙ্গাভিঘাতে পুনঃ পুনঃ উৎক্ষিপ্ত

নিক্ষিপ্ত হইব। কেন না, এখন আমরা বিশেষ প্রকারে মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরের কবির হাতে পড়িলাম। তাঁহার হস্তে কৃষ্ণচরিত্র সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যাহা উদার ছিল, তাহা এক্ষণে ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে; যাহা সরল, তাহা এক্ষণে কৌশলময়। যাহা সত্যময় ছিল, তাহা এক্ষণে অসত্য ও প্রবঞ্চনার আকর; যাহা ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুমোদিত ছিল, তাহা এক্ষণে অন্যায় ও অধর্ম্মে কলুষিত। দ্বিতীয় স্তরের কবির হাতে কৃষ্ণচরিত্র এইরূপ বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু কেন ইহা হইল? দ্বিতীয় স্তরের কবি নিতান্ত ক্ষুদ্র কবি নহেন; তাঁহার সৃষ্টিকৌশল জাজ্বল্যমান। তিনি ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানশূন্য নহেন। তবে তিনি কৃষ্ণের এরূপ দশা ঘটাইয়াছেন কেন? তাহার অতি নিগূঢ় তাৎপর্য্য দেখা যায়।

প্রথমতঃ আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি ও দেখিব যে, কৃষ্ণ প্রথম স্তরের কবির হাতে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পরিস্ফুট নহেন। তিনি নিজে ত সে কথা মুখেও আনেন না; পুনঃ পুনঃ আপনার মানবী প্রকৃতিই প্রবাদিত ও পরিচিত করেন; এবং মানুষী শক্তি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করেন। কবিও প্রায় সেই ভাবেই তাঁহাকে স্থাপিত করিয়াছেন। প্রথম স্তরে এমন সন্দেহও হয় যে, যখন ইহা প্রণীত হইয়াছিল, তখন হয়ত কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া সর্ব্বজনস্বীকৃত নহেন। তাঁহার নিজের মনেও সে ভাব সকল সময়ে বিরাজমান নহে। স্থূল কথা, মহাভারতের প্রথম স্তর কতকগুলি প্রাচীন কিম্বদন্তীর সংগ্রহ মাত্র এবং কাব্যালঙ্কারে কবিকর্ত্তৃক রঞ্জিত; এক আখ্যায়িকার সূত্রে যথাযথ সন্নিবেশপ্রাপ্ত। কিন্তু যখন দ্বিতীয় স্তর মহাভারতে প্রবিষ্ট হইল, তখন বোধ হয়, শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব সর্ব্বত্র স্বীকৃত। অতএব দ্বিতীয় স্তরের কবি তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার-স্বরূপই স্থিত ও নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় কৃষ্ণও অনেক বার আপনার ঈশ্বরত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন, এবং ঐশী শক্তি দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু ঈশ্বর পুণ্যময়, কবি তাহাও জানেন। তবে, একটা তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য তাঁহাকে বড় ব্যস্ত দেখি। ইউরোপীয়েরাও সেই তত্ত্ব লইয়া বড় ব্যস্ত। তাঁহারা বলেন, ভগবান্ দয়াময়, করুণাক্রমেই জীবসৃষ্টি করিয়াছেন; জীবের মঙ্গলই তাঁহার কামনা। তবে পৃথিবীতে দুঃখ কেন? তিনি পুণ্যময়, পুণ্যই তাঁহার অভিপ্রেত। তবে আবার পৃথিবীতে পাপ আসিল কোথা হইতে? খ্রীষ্টানের পক্ষে এ তত্ত্বের মীমাংসা বড় কষ্টকর, কিন্তু হিন্দুর পক্ষে তাহা সহজ। হিন্দুর মতে ঈশ্বরই জগৎ। তিনি নিজে সুখদুঃখ, পাপপুণ্যের অতীত। আমরা যাহাকে সুখদুঃখ বলি, তাহা তাঁহার কাছে সুখদুঃখ নহে, আমরা যাহাকে পাপপুণ্য বলি, তাহা তাঁহার কাছে পাপপুণ্য নহে। তিনি লীলার জন্য এই জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন। জগৎ তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে—তাঁহার অংশ। তিনি আপনার সত্তাকে অবিদ্যায় আবৃত করাতেই উহা সুখদুঃখ পাপপুণ্যের আধার হইয়াছে। অতএব সুখদুঃখ পাপপুণ্য তাঁহারই মায়াজনিত। তাঁহা হইতেই সুখদুঃখ ও পাপপুণ্য। দুঃখ যে পাই, তাঁহার মায়া; পাপ যে করি, তাঁহার মায়া। বিষ্ণুপুরাণে কবি কৃষ্ণপীড়িত কালিয় সর্পের মুখে এই কথা দিয়াছেন,—

যথাহং ভবতা সৃষ্টো জাত্যা রূপেণ চেশ্বর।
স্বভাবেন চ সংযুক্তস্তথেদং চেষ্টিতং মম॥

অর্থাৎ "তুমি, আমাকে সর্পজাতীয় করিয়াছ, তাই আমি হিংসা করি।" প্রহ্লাদ বিষ্ণু স্তব করিবার সময় বলিতেছেন,

বিদ্যাবিদ্যে ভবান্ সত্যমসত্যং ত্বং বিষামৃতে।*

তুমি বিদ্যা, তুমিই অবিদ্যা, তুমি সত্য, তুমিই অসত্য, তুমি বিষ, তুমিই অমৃত। তিনি ভিন্ন জগতে কিছুই নাই। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, সত্য, অসত্য, ন্যায়, অন্যায়, বুদ্ধি, দুর্ব্বুদ্ধি সব তাঁহা হইতে।

তিনি গীতায় স্বয়ং বলিতেছেন,

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ৭। ১২

"যাহা সাত্ত্বিক ভাব বা রাজস বা তামস, সকলই আমা হইতে জানিবে। আমি তাহার বশ নহি,সে সকল আমার অধীন।" শান্তিপর্ব্বে ভীষ্ম যেখানে কৃষ্ণকে "সত্যাত্মনে নমঃ" "ধর্ম্মাত্মনে নমঃ" বলিয়া স্তব করিতেছেন, সেইখানেই "কামাত্মনে নমঃ" "ঘোরাত্মনে নমঃ," "ক্রৌর্য্যাত্মনে নমঃ," "দৃপ্তাত্মনে নমঃ" ইত্যাদি শব্দে নমস্কার করিতেছেন; এবং উপসংহারে বলিতেছেন, "সর্ব্বাত্মনে নমঃ।" প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র হইতে এরূপ বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বহু শত পৃষ্ঠা পূরণ করা যাইতে পারে।

যদি তাই, তবে মানুষকে একটা গুরুতর কথা বুঝাইতে পারি। দুঃখ জগদীশ্বর-প্রেরিত, তিনি ভিন্ন ইহার অন্য কারণ নাই। যে পাপিষ্ঠ এজন্য নিন্দিত এবং দণ্ডনীয়, তাহার সম্বন্ধে লোককে বুঝাইতে পারি, ইহার পাপবুদ্ধি জগদীশ্বরপ্রবর্ত্তিত, ইহার বিচারে তিনি কর্ত্তা, তোমরা কে?

এই তত্ত্বের অবতারণায় দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি, ভিতরে ভিতরে প্রবৃত্ত। শ্রেষ্ঠ কবিগণ, কখনই আধুনিক লেখকদিগের মত ভূমিকা করিয়া, ভূমিকায় সকল কথা বলিয়া দিয়া, কাব্যের অবতারণা করেন না। যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতে হয়। সেক্ষপীরের এক একখানি নাটকের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিবার জন্য কত সহস্র কৃতবিদ্য প্রতিভাশালী ব্যক্তি কত ভাবিলেন, কত লিখিলেন, আমরা তাহা বুঝিবার জন্য কত মাথা ঘামাইলাম; কিন্তু আমাদের এই অপূর্ব্ব মহাভারত গ্রন্থের একটা অধ্যায়ের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য আমরা কখনও এক দণ্ডের জন্য কোন চেষ্টা করিলাম না। যেমন হরিসংকীর্ত্তনকালে এক দিকে বৈষ্ণবেরা, খোলে ঘা পড়িতেই কাঁদিয়া পড়িয়া মাটিতে গড়াগড়ি দেন, আর এক দিকে নব্য শিক্ষিতেরা 'Nuisance!" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে পশ্চাদ্ধাবিত হয়েন, তেমনই প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থের নাম মাত্রে এক দল মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দেন; মকল কাবল ভুসি শুনিয়া ভক্তিরসে দেশ আপ্লুত করেন, আর এক দল সকলই মিথ্যা, উপধর্ম্ম, অশ্রাব্য, পরিহার্য্য, উপহাসাস্পদ বিবেচনা করেন। বুঝিবার চেষ্টা কাহারও নাই। শব্দার্থবোধ হইতেই তাঁহারা যথেষ্ট বুঝিলেন মনে করেন। দুঃখের উপর দুঃখ এই, কেহ বুঝাইলেও বুঝিতে ইচ্ছা করেন না।

ঈশ্বরই সব—ঈশ্বর হইতেই সমস্ত। তাঁহা হইতে জ্ঞান, তাঁহা হইতে জ্ঞানের অভাব বা ভ্রান্তি, তাঁহা হইতে বুদ্ধি, তাঁহা হইতে দুর্ব্বুদ্ধি। তাঁহা হইতে সত্য, আবার তাঁহা

* বিষ্ণুপুরাণ। ১ অংশ, ১২ অধ্যায়।

হইতে অসত্য। তাঁহা হইতে ন্যায়, এবং তাঁহা হইতেই অন্যায়। মনুষ্যজীবনের প্রধান উপাদান এই জ্ঞান ও বুদ্ধি, সত্য ও ন্যায়, এবং তদভাবে ভ্রান্তি, দুর্ব্বুদ্ধি, অসত্য বা অন্যায়। সবই ঈশ্বরপ্রেরিত। কিন্তু জ্ঞান, বুদ্ধি, সত্য এবং ন্যায় তাঁহা হইতে, ইহা বুঝাইবার প্রয়োজন নাই; হিন্দুর কাছে তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তবে ভ্রান্তি, দুর্ব্বুদ্ধি প্রভৃতিও যে তাঁহা হইতে, তাহা মনুষ্যের হৃদয়ঙ্গম করিবার প্রয়োজন আছে। অন্ততঃ মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরের কবি, এমন বিবেচনা করেন। আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদেরা বলিয়া থাকেন, আমরা চন্দ্রের এক পিঠই চিরকাল দেখি, অপর পৃষ্ঠ কখন দেখিতে পাই না। এই কবি সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব জগৎরহস্যের অপর পৃষ্ঠ আমাদিগকে দেখাইতে চাহেন। তিনি জয়দ্রথবধে দেখাইতেছেন, ভ্রান্তি ঈশ্বরপ্রেরিত, ঘটোৎকচবধে দেখাইবেন, দুর্ব্বুদ্ধিও তাঁহার প্রেরিত, দ্রোণবধে দেখাইবেন, অসত্যও ঈশ্বর হইতে, দুর্য্যোধনবধে দেখাইবেন, অন্যায়ও তাঁহা হইতে। আরও একটা কথা বাকি আছে। জ্ঞানবল, বুদ্ধিবল, সত্যবল, ন্যায়বল, বাহুবলের কাছে কেহ নয়। বিশেষতঃ রাজনীতিতে বাহুবলের প্রাধান্য। মহাভারত বিশিষ্ট প্রকারে রাজনৈতিক কাব্য অর্থাৎ ঐতিহাসিক কাব্য; ইতিহাসের উপর নির্ম্মিত কাব্য। অতএব এ কাব্যে বাহুবলের স্থান, জ্ঞান, বুদ্ধ্যাদির উপরে। দ্বিতীয় স্তরের কবি দেখিতে পান যে, কেবল জ্ঞান ভ্রান্তি, বুদ্ধি দুর্ব্বুদ্ধি, সত্যাসত্য, এবং ন্যায়ান্যায় ঐশিক নিয়োগাধীন, ইহা বলিলেই রাজনৈতিক তত্ত্বটা সম্পূর্ণ হইল না, বাহুবল ও বাহুবলের অভাবও তাই। তিনি ইহা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য মৌসলপর্ব্ব প্রণীত করিয়াছেন। তথায় কৃষ্ণের অভাবে স্বয়ং অর্জ্জুন লগুড়ধারী কৃষকগণের নিকট পরাভূত হইলেন।

আমি যাহাকে ঐশিক নিয়োগ বলিতেছি, অথবা দ্বিতীয় স্তরের কবি যাহা ঈশ্বর-প্রেরণা বলিয়া বুঝেন, ইউরোপীয়েরা তাহার স্থানে "Law" সংস্থাপিত করিয়াছেন। এই মহাভারতীয় কবিগণের বুদ্ধিতে "Law" কোন স্থান পাইয়াছিল কি না, আমি বলিতে পারি না। তবে ইহা বলিতে পারি যাহা "লর" উপরে, যাহা হইতে "Law", তাহা তাঁহারা ভালরূপে বুঝাইয়াছিলেন। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, সকলই ঈশ্বরেচ্ছা। কৃষ্ণকে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতারিত করিয়া, এই কবি সেই ঈশ্বরেচ্ছা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—ঘটোৎকচবধ

জয়দ্রথবধে আর একটা কৃষ্ণ সম্বন্ধে অনৈসর্গিক কথা আছে। অর্জ্জুন জয়দ্রথের শিরশ্ছেদে উদ্যত হইলে, কৃষ্ণ বলিলেন, একটা উপদেশ দিই শুন। ইহার পিতা পুত্রের জন্য তপস্যা করিয়া এই বর পাইয়াছে যে, যে জয়দ্রথের মাথা মাটিতে ফেলিবে, তাহারও মস্তক বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হইবে। অতএব তুমি উহার মাথা মাটিতে ফেলিও না। উহার মস্তক বাণে বাণে সঞ্চালিত করিয়া, যেখানে উহার পিতা সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেছে, সেইখানে লইয়া গিয়া তাহার ক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত কর। অর্জ্জুন তাহাই করিলেন। বুড়া সন্ধ্যা করিয়া উঠিবার সময় ছিন্ন মস্তক তাঁহার কোল হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। অমনি বুড়ার মাথা ফাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইল।

অনৈসর্গিক বলিয়া কথাটা আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি। তৎপরে ঘটোৎকচবধ-ঘটিত বীভৎস কাণ্ড বর্ণিত করিতে আমি বাধ্য।

হিড়িম্ব নামে এক রাক্ষস ছিল, হিড়িম্বা নামে রাক্ষসী তাহার ভগিনী। ভীম কদাচিৎ রাক্ষসটাকে মারিয়া রাক্ষসীটাকে বিবাহ করিলেন। বরকন্যা যে পরস্পরের অনুপযোগী, এমন কথা বলা যায় না। তার পর সেই রাক্ষসীর গর্ভে ভীমের এক পুত্র জন্মিল। তাহার নাম ঘটোৎকচ। সেটাও রাক্ষস। সে বড় বলবান্। এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পিতৃপিতৃব্যের সাহায্যার্থ দল বল লইয়া আসিয়া যুদ্ধ করিতেছিল। আমি তাহার কিছু বুদ্ধিবিপর্য্যয় দেখিতে পাই—সে প্রতিযোদ্ধগণকে ভোজন না করিয়া, তাহাদিগের সঙ্গে বাণাদির দ্বারা মানুষযুদ্ধ করিতেছিল। তাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ দুর্য্যোধনের সেনার মধ্যে একটা রাক্ষসও ছিল। দুইটা রাক্ষসে খুব যুদ্ধ করে।

এখন, এই দিন, একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হইল। অন্য দিন কেবল দিনেই যুদ্ধ হয়, আজ রাত্রেও আলো জ্বালিয়া যুদ্ধ। রাত্রিতে নিশাচরের বল বাড়ে; অতএব ঘটোৎকচ দুর্নিবার্য্য হইল। কৌরববীর কেহই তাহার সম্মুখীন হইতে পারিল না। কৌরবদিগের রাক্ষসটাও মারা গেল। কেবল কর্ণই একাকী ঘটোৎকচের সমকক্ষ হইয়া, রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শেষ কর্ণও আর সামলাইতে পারেন না। তাঁহার নিকট ইন্দ্রদত্তা একপুরুষঘাতিনী এক শক্তি ছিল। এই শক্তি সম্বন্ধে অদ্ভুতের অপেক্ষাও অদ্ভুত এক গল্প আছে—পাঠককে তৎপঠনে পীড়িত করিতে আমি অনিচ্ছুক। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই শক্তি কেহ কোন মতেই ব্যর্থ করিতে পারে না, এক জনের প্রতি প্রযুক্ত হইলে সে মরিবে, কিন্তু শক্তি আর ফিরিবে না; তাই একপুরুষঘাতিনী। কর্ণ এই অমোঘ শক্তি অর্জ্জুনবধার্থ তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু আজ ঘটোৎকচের যুদ্ধে বিপন্ন হইয়া তাহারই প্রতি শক্তি প্রযুক্ত করিলেন। ঘটোৎকচ মরিল। মৃত্যুকালে বিন্ধ্যাচলের একপাদপরিমিত শরীর ধারণ করিল, এবং তাহার চাপে এক অক্ষৌহিণী সেনা মরিল!!

এ সকল অপরাধে প্রাচীন হিন্দু কবিকে মার্জ্জনা করা যায়, কেন না বালক ও অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের পক্ষে এ রকম গল্প বড় মনোহর। কিন্তু তিনি তার পর যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় কেবল তাঁহার নিজেরই মনোহর। তিনি বলেন, ঘটোৎকচ মরিলে পাণ্ডবেরা শোককাতর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু কৃষ্ণ রথের উপর নাচিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি আর গোপবালক নহেন, পৌত্র হইয়াছে; এবং হঠাৎ বায়ুরোগাক্রান্ত হওয়ার কথাও গ্রন্থকার বলেন না। কিন্তু তবু রথের উপর নাচ। কেবল নাচ নহে, সিংহনাদ ও বাহুর আস্ফোটন। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি? এর নাচকাচ কেন? কৃষ্ণ বলিলেন, "কর্ণের নিকট যে অমোঘ শক্তি ছিল, যা তোমার বধের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ঘটোৎকচের জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে তোমার আর ভয় নাই; তুমি এক্ষণে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিবে।" জয়দ্রথবধ উপলক্ষে দেখিয়াছি, কর্ণের সঙ্গে অর্জ্জুনের পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ হইয়াছে, এবং কর্ণ পরাভূত হইয়াছেন। তখন সেই ঐন্দ্রী শক্তির কোন কথাই কাহারও মনে হয় নাই; কবিরও নহে। কিন্তু তখন মনে করিলে জয়দ্রথবধ হয় না; কর্ণ

জয়দ্রথের রক্ষক। সুতরাং তখন চুপে চাপে গেল। যাক—এই শক্তিঘটিত বৃত্তান্তটা অনৈসর্গিক, সুতরাং তাহা আমাদের আলোচনার অযোগ্য। যে কথাটা বলিবার জন্য, ঘটোৎকচবধের কথা তুলিলাম, তাহা এই। কৃষ্ণ, অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিতেছেন,

"যাহা হউক, হে ধনঞ্জয়! আমি তোমার হিতার্থ বিধি উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে মহাবলপরাক্রান্ত জরাসন্ধ, শিশুপাল, নিষাদ একলব্য, হিড়িম্ব, কির্ম্মীর, বক, অলায়ুধ, উগ্রকর্ম্মা, ঘটোৎকচ প্রভৃতি রাক্ষসের বধ সাধন করিয়াছি।"

কথাটা সত্য নহে। কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে অর্জ্জুনের হিতার্থ নহে, শিশুপাল তাঁহাকে সভামধ্যে অপমানিত ও যুদ্ধে আহূত করিয়াছিল, এইজন্য, বা যজ্ঞের রক্ষার্থ। জরাসন্ধবধেরও কৃষ্ণ কর্ত্তা না হউন, প্রবর্ত্তক, কিন্তু সে অর্জ্জুনহিতার্থ নহে, কারারুদ্ধ রাজগণের মুক্তিজন্য। কিন্তু বক, হিড়িম্ব, কির্ম্মীর প্রভৃতি রাক্ষসদিগের বধের, এবং একলব্যের অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদের সঙ্গে কৃষ্ণের কিছুমাত্র সম্বন্ধ ছিল না। তিনি তাহার কিছুই জানিতেন না, এবং ঘটনাকালে উপস্থিতও ছিলেন না। মহাভারতে এক স্থানে পাই বটে, কৃষ্ণ একলব্যকে বধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদের কথা তাহার বিরোধী। ঘটনাগুলি, অর্থাৎ একলব্যের অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদ এবং রাক্ষসগণের বধ, প্রকৃত ঘটনাও নহে।

তবে, এ মিথ্যা বাক্য কৃষ্ণমুখে সাজাইবার উদ্দেশ্য কি?

এ সম্বন্ধে কেবল আর একটা কথা বলিব। ভক্তে বলিতে পারিবেন, কৃষ্ণ ইচ্ছার দ্বারা সকলই করিতেছেন। তাঁহার ইচ্ছাতেই হিড়িম্বাদি বধ, এবং ঘটোৎকচের প্রতি কর্ণের শক্তি প্রযুক্ত হইয়াছিল। এ কথা সঙ্গত নহে। কৃষ্ণই বলিতেছেন যে, তিনি বিবিধ "উপায় উদ্ভাবন" করিয়া ইহা করিয়াছেন। আর যদি ইচ্ছাময় সর্ব্বকর্ত্তা ইচ্ছাদ্বারা এ সকল কার্য্য সাধন করিবেন, তবে মনুষ্যশরীর লইয়া অবতীর্ণ হইবার প্রয়োজন কি ছিল? আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি যে, কৃষ্ণ ইচ্ছাশক্তিদ্বারা কোন কর্ম্ম করেন না; পুরুষকার অবলম্বন করেন। তিনি নিজেও তাহা বলিয়াছেন; সে কথা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। দেখা গিয়াছে যে, তিনি ইচ্ছা করিয়াও যত্ন করিয়া সন্ধিসংস্থাপন করিতে পারেন নাই বা কর্ণকে যুধিষ্ঠিরের পক্ষে আনিতে পারেন নাই। আর যদি ইচ্ছারদ্বারা কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন, তবে ছাই ভস্ম জড়পদার্থ একটা শক্তি-অস্ত্রের জন্য ইচ্ছাময়ের এত ভাবনা কেন?

ইহার ভিতরে আসল কথাটা, যাহা পূর্ব্বপরিচ্ছেদে বলিয়াছি। বুদ্ধি ঈশ্বরপ্রেরিত, দুর্ব্বুদ্ধিও ঈশ্বরপ্রেরিত, কবি এই কথা বলিতে চাহেন। কর্ণ অর্জ্জুনের জন্য ঐন্দ্রী শক্তি তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন যে ঘটোৎকচের উপর তাহা পরিত্যাগ করিলেন, ইহা কর্ণের দুর্ব্বুদ্ধি। কৃষ্ণ বলিতেছেন, সে আমি করাইয়াছি; অর্থাৎ দুর্ব্বুদ্ধি ঈশ্বরপ্রেরিত। শিশুপাল দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে সভাতলে কৃষ্ণের অসহ্য অপমান করিয়াছিলেন। জরাসন্ধ, সৈন্যসাহায্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অজেয়; পাণ্ডবের কথা দূরে থাক্, কৃষ্ণসনাথ যাদবেরাও তাঁহাকে জয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু শারীরিক বলে ভীম তাঁহার অপেক্ষা বলবান্; একাকী ভীমের সঙ্গে মল্লের মত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া, তাদৃশ রাজ-

রাজেশ্বর সম্রাটের পক্ষে দুর্ব্বুদ্ধি। কৃষ্ণোক্তির মর্ম্ম এই যে, সে দুর্ব্বুদ্ধিও আমার প্রেরিত। দ্রোণাচার্য্য অনার্য্য একলব্যের নিকট গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তাহার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ চাহিয়াছিলেন। ঐ অঙ্গুষ্ঠ গেলে বহুকষ্টলব্ধ একলব্যের ধনুর্ব্বিদ্যা নিষ্ফল হয়। কিন্তু একলব্য সে প্রার্থিত গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলেন। ইহা একলব্যের দারুণ দুর্ব্বুদ্ধি। কৃষ্ণের কথার মর্ম্ম এই যে, সে দুর্ব্বুদ্ধি তাঁহার প্রেরিত—ঈশ্বরপ্রেরিত। রাক্ষসবধ সম্বন্ধেও ঐরূপ। এ সমস্তই দ্বিতীয় স্তর।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—দ্রোণবধ

প্রাচীন ভারতবর্ষে কেবল ক্ষত্রিয়েরাই যুদ্ধ করিতেন, এমন নহে। ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য যোদ্ধার কথা মহাভারতেই আছে। দুর্য্যোধনের সেনানায়কদিগের মধ্যে তিন জন প্রধান বীর ব্রাহ্মণ;—দ্রোণ, তাঁহার শ্যালক কৃপ, এবং তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামা। অন্যান্য বিদ্যার ন্যায়, ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধবিদ্যারও আচার্য্য ছিলেন। দ্রোণ ও কৃপ, এইরূপ যুদ্ধাচার্য্য। এই জন্য ইঁহাদিগকে দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্য বলিত।

এদিগে ব্রাহ্মণের সঙ্গে যুদ্ধে বিপদও বেশী। কেন না, রণেও ব্রাহ্মণকে বধ করিলে, ব্রহ্মহত্যার পাতক ঘটে। অন্ততঃ মহাভারতকার এই কারণ, ব্রাহ্মণ যোদ্ধগণকে লইয়া বড় বিপন্ন, ইহা স্পষ্টই দেখা যায়। এই জন্য কৃপ ও অশ্বত্থামা যুদ্ধে মরিল না। কৌরবপক্ষীয় সকলেই মরিল, কেবল তাঁহারা দুই জনে মরিলেন না; তাঁহারা অমর বলিয়া গ্রন্থকার নিষ্কৃতি পাইলেন। কিন্তু দ্রোণাচার্য্যকে না মারিলে চলে না; ভীষ্মের পর তিনি সর্ব্বপ্রধান যোদ্ধা; তিনি জীবিত থাকিতে পাণ্ডবেরা বিজয়লাভ করিতে পারেন না। কিন্তু এ কথাও গ্রন্থকার বলিতে অনিচ্ছুক যে, ধার্ম্মিক রাজগণের মধ্যে কেহ তাঁহাকে মারিয়া ব্রহ্মহত্যার ভাগী হইল। বিশেষতঃ, দ্রোণাচার্য্যকে দ্বৈরথযুদ্ধে পরাজিত করিতে পারে, পাণ্ডবপক্ষে এমন বীর অর্জ্জুন-ভিন্ন আর কেহই নাই; কিন্তু দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনের গুরু, এজন্য অর্জ্জুনের পক্ষে বিশেষরূপে অবধ্য। তাই গ্রন্থকার একটা কৌশল অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

পাণ্ডবভার্য্যা দ্রৌপদীর পিতা দ্রুপদ রাজার সঙ্গে পূর্ব্বকালে বড় বিবাদ হইয়াছিল। দ্রুপদ, দ্রোণের বিক্রমের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই—অপদস্থ ও অপমানিত হইয়াছিলেন। এজন্য তিনি দ্রোণবধার্থ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞকুণ্ড হইতে দ্রোণবধকারী পুত্র উদ্ভূত হয়—নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন। ধৃষ্টদ্যুম্ন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের সেনাপতি। তিনি দ্রোণবধ করিবেন, পাণ্ডবদিগের এই ভরসা। যিনি ব্রহ্মবধার্থ দৈবকর্ম্মজাত, ব্রহ্মবধ তাঁহার পক্ষে পাপ নয়।

কিন্তু মহাভারত এক হাতের নয়, নানা রচয়িতা নানা দিকে ঘটনাবলী যথেচ্ছা লইয়া গিয়াছেন। পনের দিবস যুদ্ধ হইল, ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের কিছু করিতে পারিলেন না। তাঁহার নিকট পরাভূত হইলেন। অতএব দ্রোণ মরার ভরসা নাই—প্রত্যহ পাণ্ডবদিগের সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল। তখন দ্রোণবধার্থ একটা ঘোরতর পাপাচারের পরামর্শ পাণ্ডব পক্ষে স্থির হইল। এই মহাপাপমন্ত্রণার কলঙ্কটা কৃষ্ণের স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে। তিনিই ইহার প্রবর্ত্তক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কৃষ্ণ বলিতেছেন,

"হে পাণ্ডবগণ, অন্যের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্র দ্রোণাচার্য্যকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু উনি অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিলে মনুষ্যেরাও তাঁহার বিনাশ করিতে পারে, অতএব তোমরা ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক উঁহারে পরাজয় করিবার চেষ্টা কর।"

আর পাতা দশ বার পূর্ব্বে যাঁহার মুখে কবি এই বাক্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন,

"আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যে স্থানে ব্রহ্ম, সত্য, দম, শৌচ, ধর্ম্ম, শ্রী, লজ্জা, ক্ষমা, ধৈর্য্য অবস্থান করে, আমি সেইখানেই অবস্থান করি।"*

যিনি ভগবদ্গীতা-পর্ব্বাধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মসংরক্ষণের জন্যই যুগে যুগে অবতীর্ণ হই; যাঁহার চরিত্র, এ পর্য্যন্ত আদর্শ ধাম্মিকের চরিত্র বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে, যাঁহার ধর্ম্মে দার্ঢ্য শত্রুগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে,† তিনি কি না ডাকিয়া বলিতেছেন, "তোমরা ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর!" তাই, বলিতেছিলাম, মহাভারত নানা হাতের রচনা; যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ গড়িয়াছেন।

কৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন,

"আমার নিশ্চিত বোধ হইতেছে যে, অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলে দ্রোণ আর যুদ্ধ করিবেন না। অতএব কোন ব্যক্তি উঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক বলুন যে, অশ্বত্থামা সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়াছেন।"

অর্জ্জুন মিথ্যা বলিতে অস্বীকৃত হইলেন, যুধিষ্ঠির কষ্টে তাহাতে সম্মত হইলেন। ভীম বিনা বাক্যব্যয়ে অশ্বত্থামা নামক একটা হস্তীকে মারিয়া আসিয়া দ্রোণাচার্য্যকে বলিলেন, "অশ্বত্থামা মরিয়াছেন।"‡ দ্রোণ জানিতেন, তাঁহার পুত্র "অমিতবলবিক্রমশালী, এবং শত্রুর অসহ্য"—অতএব ভীমের কথা বিশ্বাস করিলেন না। ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিহত করিবার চেষ্টায় মনোযোগী হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুনশ্চ আবার যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অশ্বত্থামার মৃত্যুর কথা সত্য কি না? যুধিষ্ঠির কখনও অধর্ম্ম করেন না, এবং অসত্য বলেন না, এজন্য তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন, অশ্বত্থামা কুঞ্জর মরিয়াছে—কিন্তু কুঞ্জর শব্দটা অব্যক্ত রহিল। §

তাহাতেই বা কি হইল? দ্রোণ প্রথমে বিমনায়মান হইলেন বটে, কিন্তু তৎপরে অতি ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যুস্বরূপ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার আপনার সাধ্যের অতীত যুদ্ধ করিয়া, নিরস্ত্র ও বিরথ হইয়া দ্রোণহস্তে মরণাপন্ন হইলেন। তখন ভীম গিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিলেন, এবং দ্রোণাচার্য্যের রথ ধারণ করিয়া কতকগুলি কথা বলিলেন, তাহাই দ্রোণকে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। ভীম বলিলেন,

* ঘটোৎকচবধ-পর্ব্বাধ্যায়, ১৮২ অধ্যায়।

† ধৃতরাষ্ট্রবা ক) : দখ

‡ গোপালভাঁড় এইরূপ "কৃষ্ণ পাইয়াছিল"।

§ "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ"—এ কথাটা মহাভারতের নহে। বোধ হয় কথকেরা তৈয়ার করিয়া থাকিবেন। মূল মহাভারতে ইহা নাই। মহাভারতে আছে,

তমতথ্যভয়ে মগ্নো জয়ে সক্তো যুধিষ্ঠিরঃ।
অব্যক্তমব্রবীদ্বাক্যং হতঃ কুঞ্জর ইত্যুত ॥ ১৯১ ॥

"হে ব্রহ্মন্! যদি স্বধর্মে অসন্তুষ্ট শিক্ষিতাস্ত্র অধম ব্রাহ্মণগণ সমরে প্রবৃত্ত না হন, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়গণের কখনই ক্ষয় হয় না। পণ্ডিতেরা প্রাণিগণের হিংসা না করাই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করা ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য; আপনিই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ; কিন্তু চণ্ডালের ন্যায় অজ্ঞানান্ধ হইয়া পুত্র ও কলত্রের উপকারার্থ অর্থলালসা নিবন্ধন বিবিধ ম্লেচ্ছজাতি ও অন্যান্য প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশ করিতেছেন। আপনি এক পুত্রের উপকারার্থ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বকার্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া অসংখ্য জীবের জীবন নাশ করিয়া কি নিমিত্ত লজ্জিত হইতেছেন না?"

কথাগুলি সকলই সত্য। ইহার পর আর তিরস্কার কি আছে? ইহাতেও দুর্য্যোধনের ন্যায় দুরাত্মার মত ফিরিতে পারে না বটে, কিন্তু দ্রোণাচার্য্য ধর্ম্মাত্মা; ইহাই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট। ইহার পর অশ্বত্থামার মৃত্যুর কথাটা আর না তুলিলেও চলিত। কিন্তু তাহাও এখানে আবার পুনরুক্ত হইয়াছে।

এ কথার পর দ্রোণাচার্য্য অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিলেন। তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার মাথা কাটিয়া আনিলেন।

এক্ষণে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। যে কার্য্যটা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা যদি যথার্থ ঘটিয়া থাকে, তবে যিনি যিনি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, তিনি তিনি মহাপাপে লিপ্ত। গ্রন্থকারও তাহা বুঝেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের রথ ইতিপূর্ব্বে পৃথিবীর উপর চারি অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে চলিত, এখন ভূমি স্পর্শ করিয়া চলিল। এই অপরাধে তাঁহার নরক দর্শন হইয়াছিল, ইহাও বলিয়াছেন। আমাদের মতে, এরূপ বিশ্বাসঘাতকতা এবং মিথ্যা প্রবঞ্চনার দ্বারা গুরুহত্যার উপযুক্ত দণ্ড, নরকদর্শন মাত্র নহে;—অনন্ত নরকই ইহার উপযুক্ত।

কৃষ্ণ এই মহাপাপের প্রবর্ত্তক। এজন্য কৃষ্ণকে সেইরূপ অপরাধী ধরিতে হয়। কিন্তু ইহার উত্তর এই প্রচলিত আছে যে, যিনি ঈশ্বর, স্বয়ং পাপ পুণ্যের কর্ত্তা ও বিধাতা, পাপপুণ্যই যাঁহার সৃষ্টি, তাঁহার আবার পাপপুণ্য কি? পাপপুণ্য তাঁহাকে স্পর্শিতে পারে না। এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কি, মনুষ্যদেহ ধারণকালে পাপ তাঁহার আচরণীয়? তিনি নিজে বলিয়াছেন যে, তিনি ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ—পাপাচরণের দ্বারা কি ধর্ম্মসংস্থাপন তাঁহার উদ্দেশ্য? তিনি স্বয়ং ত এরূপ বলেন না। তিনি গীতায় বলিয়াছেন,

"জনকাদি কর্ম্মদ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। জনগণকে স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য (দৃষ্টান্ত দ্বারা) তুমি কর্ম্ম কর। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ করিয়া থাকেন, ইতর লোকেও তাই করে; শ্রেষ্ঠ যাহা মানেন, লোকে তাহারই অনুবর্ত্তিত হয়। হে পার্থ! ত্রিলোকে আমার কর্ত্তব্য কিছুই নাই; আমার প্রাপ্তব্য বা অপ্রাপ্তব্য কিছুই নাই; তথাপি আমি কর্ম্ম করি। (কেন না) আমি যদি কদাচিৎ অতন্দ্রিত হইয়া কর্ম্মানুবর্ত্তন না করি, তবে মনুষ্যগণ সর্ব্বতোভাবে আমার পথে অনুবর্ত্ত হইবে।"—শ্রীমদ্ভবদ্গীতা, ৩য় অঃ, ২০-২৩।

অতএব শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন, মানবাবতারে, স্বকার্য্যের দৃষ্টান্তের দ্বারা ধর্ম্ম-সংস্থাপন তাঁহার উদ্দেশ্যের মধ্যে। অতএব স্বকর্ম্মে মহাপাপের দৃষ্টান্ত তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে না।

তবে, এ কাণ্ডটা কি ? তাহার মীমাংসা স্থির না করিয়া আমি কৃষ্ণচরিত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই নাই। কেন না, বৃন্দাবনের গোপী ও "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" ইহাই কৃষ্ণের প্রধান অপবাদ।

কাণ্ডটা কি ? তাহার উত্তর, কাণ্ডটা সমস্তই অমৌলিক। যদি পাঠক মনোযোগ-পূর্ব্বক আমার এই গ্রন্থখানি পড়িয়া থাকেন, তবে বুঝিয়া থাকিবেন যে, সমস্ত মহাভারত, অর্থাৎ এক্ষণে যে গ্রন্থ মহাভারত নামে প্রচলিত, তাহা এক হাতের নহে। তাহার কিয়দংশ মৌলিক, আদিম মহাভারত, বা "প্রথম স্তর"। অপরাংশ অমৌলিক ও পরবর্ত্তী কবিগণ কর্ত্তৃক মূলগ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত। কোন্ অংশ মৌলিক, আর কোন্ অংশ অমৌলিক ইহা নিরূপণ করা কঠিন। নিরূপণ জন্য আমি কয়েকটি সঙ্কেত পাঠককে বলিয়া দিয়াছি। সেইগুলি এখন পাঠককে স্মরণ করিতে হইবে।

(১) তাহার মধ্যে, একটি এই,—

"শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বর্ণিত চরিত্রগুলির সর্ব্বাংশ সুসঙ্গত হয়। যদি কোথাও ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে।"

উদাহরণ দিবার জন্য বলিয়াছিলাম যে, যদি কোথাও ভীষ্মের পরদারপরায়ণতা বা ভীমের ভীরুতা দেখি, তবে জানিব ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত। এখানে ঠিক তাই ; এক মাত্রায় নহে, তিন মাত্রায় কেবল তাই। পরম ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গে এই নৃশংস বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যা প্রবঞ্চনের দ্বারা গুরুনিপাত যাদৃশ অসঙ্গত, তত অসঙ্গত আর কোন দুই বস্তুই হইতে পারে না। তার পর মহাতেজস্বী, বলগর্ব্বশালী, ভয়শূন্য ভীমের চরিত্রের সঙ্গেও ইহা তদ্রূপ অসঙ্গত। ভীম বাহুবল ভিন্ন আর কিছু মানেন না—শত্রুর বিরুদ্ধে আর কিছু প্রয়োগ করেন না ; রাজ্যার্থেও নহে, প্রাণরক্ষার্থও নহে। স্থানান্তরে কথিত আছে, অশ্বত্থামা নারায়ণাস্ত্র নামে অনিবার্য্য দৈবাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন—তাহাতে সমস্ত পৃথিবী নষ্ট হইতে পারে। দিব্যাস্ত্রবিৎ অর্জ্জুনও তাহার নিবারণে অক্ষম ; সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল। ইহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার একটি উপায় ছিল—এই দৈবাস্ত্র সমরবিমুখ ব্যক্তিকে স্পর্শ করে না। অতএব প্রাণরক্ষার্থ কৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে সমস্ত পাণ্ডবসেনা ও সেনাপতিগণ, রথ ও বাহন হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক বিমুখ হইয়া বসিলেন ; কৃষ্ণের আজ্ঞায় অর্জ্জুনকেও তাহা করিতে হইল। কেবল, ভীম কিছুতেই তাহা করিলেন না,—বলিলেন, "আমি শরনিকর নিপাতে অশ্বত্থামার অস্ত্র নিবারণ করিতেছি। আমি এই সুবর্ণময়ী গুর্ব্বী গদা সমুদ্যত করিয়া দ্রোণপুত্রের নারায়ণাস্ত্র বিমর্দ্দিত করতঃ অন্তকের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিব। এই ভূমণ্ডলমধ্যে যেমন কোন জ্যোতিঃপদার্থই সূর্য্যের সদৃশ নহে, তদ্রূপ আমার তুল্য পরাক্রমশালী আর কোন মনুষ্যই নাই। আমার এই যে ঐরাবতশুণ্ডসদৃশ সুদৃঢ় ভুজদণ্ড অবলোকন করিতেছ, ইহা হিমালয় পর্ব্বতেরও নিপাতনে সমর্থ। আমি অযুতনাগতুল্য বলশালী ; দেবলোকে পুরন্দর যেরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, নরলোকে আমিও তদ্রূপ। আজি আমি দ্রোণপুত্রের অস্ত্রনিবারণে প্রবৃত্ত হইতেছি, সকলে আমার বাহুবীর্য্য অবলোকন করুন। যদি কেহ এই নারায়ণাস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলে আমি স্বয়ং সমস্ত কৌরব ও পাণ্ডব সমক্ষে এই অস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইব।"

স্বীকার করি, বড়াই বড় বেশী, গল্পটাও নিতান্ত আষাঢ়ে। তা হৌক—সত্য বলিয়া কাহাকেও ইহা গ্রহণ করিতে হইতেছে না। কবিপ্রণীত চরিত্রচিত্রের সুসঙ্গতি লইয়া কথা কহিতেছি। নারায়ণাস্ত্রমোক্ষ মৌলিক না হইতে পারে, কিন্তু এই ছাঁচে মৌলিক মহাভারতে সর্ব্বত্রই ভীমের চরিত্র ঢালা। ইহার সঙ্গে ভীমের সেই শৃগালোপম দ্রোণ-প্রবঞ্চনা কতটা সুসঙ্গত? এই ভীম কি স্ত্রীলোকেরও ঘৃণাস্পদ যে শত্রুবধোপায়, তাহা অবলম্বন করিতে পারে? দ্রোণাচার্য্যের অপেক্ষা নারায়ণাস্ত্র সহস্রগুণে ভয়ঙ্কর; যে নারায়ণাস্ত্রের সম্মুখে সিংহের ন্যায় দৃপ্ত, যাহাকে বলপ্রয়োগ ব্যতীত* নারায়ণাস্ত্রের সম্মুখ হইতে কেহ বিমুখ করিতে পারিল না, তাহাকে অর্জ্জুনের প্রতিযোদ্ধা মাত্র দ্রোণের ভয়ে শৃগালাধমের ন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত বলিয়া যে কবি বর্ণনা করিয়াছেন, সে কবির কবিত্ব কোথায়? মহাভারত প্রণয়ন কি তাহার সাধ্য?

তবে নিহত অশ্বত্থামাগজের এই গল্প, ভীমের চরিত্রের সঙ্গে অসঙ্গত; যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গেও অসঙ্গত, ইহা দেখিয়াছি, কিন্তু ভীমের চরিত্রের সঙ্গে ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গে ইহার যতটা অসঙ্গতি, তদপেক্ষা কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গেও ইহার অসঙ্গতি আরও বেশী। যদি আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা পাঠক বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই অসঙ্গতির পরিমাণ বুঝিতে পারিবেন। আলোকে অন্ধকারে যত অসঙ্গতি; কৃষ্ণে শ্বেতে; তাপে শৈত্যে; মধুরে কর্কশে; রোগে স্বাস্থ্যে; ভাবে অভাবে যতটা অসঙ্গতি, ইহাও তত। যখন মৌলিক চরিত্রের সঙ্গে একটি নয়, তিনটি মৌলিক চরিত্রের সঙ্গে এ গল্পের এত অসঙ্গতি, তখন ইহা অমৌলিক ও প্রক্ষিপ্ত, এবং অন্যকবিপ্রণীত বলিয়া আমরা পরিত্যাগ করিতে পারি।

(২) আমার কথা শেষ হয় নাই। কোন্ অংশ মৌলিক, কোন্ অংশ অমৌলিক, ইহার নির্ব্বাচন জন্য যে কয়েকটি লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি, তাহার একটির দ্বারা পরীক্ষা করায় এই হতগজ-বৃত্তান্তটা অমৌলিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। আর একটির দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। আর একটি সূত্র এই যে, দুইটি বিবরণ পরস্পরবিরোধী হইলে, তাহার একটি প্রক্ষিপ্ত। এখন মহাভারতে, ঐ অশ্বত্থামাগজের গল্পের সঙ্গে সঙ্গেই দ্রোণবধের আর একটি বৃত্তান্ত পাই। একটিই যথেষ্ট কারণ, কিন্তু দুইটি একত্র জড়ান হইয়াছে। আমরা সেই স্বতন্ত্র বিবরণটি পৃথক্ করিয়া মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা বুঝাইবার জন্য, অগ্রে আমার বলা উচিত যে, দ্রোণ অধর্ম্মযুদ্ধ করিতেছিলেন। মহাভারতে কথিত অন্যান্য দৈবাস্ত্রের মধ্যে, ব্রহ্মাস্ত্র একটি। আজি এ দেশের লোকে, যে উপায় যে কার্য্যসাধনে অব্যর্থ, তাহাকে সেই কার্য্যের "ব্রহ্মাস্ত্র" বলে। এই ব্রহ্মাস্ত্র অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রয়োগ নিষিদ্ধ ও অধর্ম্ম, ইহাই ঋষিদিগের মত। দ্রোণ ব্রহ্মাস্ত্রের দ্বারা অস্ত্রানভিজ্ঞ সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতেছিলেন। এমন সময়ে,—

"বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, অত্রি, ভৃগু, অঙ্গিরা, সিকত, প্রশ্নি, গর্গ, বালখিল্য, মরীচিপ ও অন্যান্য ক্ষুদ্রতর সাগ্নিক ঋষিগণ আচার্য্যকে নিঃক্ষত্রিয় করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহারে ব্রহ্মলোকে নীত করিবার বাসনায় সকলে শীঘ্র সমাগত

* অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ ভীমকে বলপূর্ব্বক রথ হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে দ্রোণ! তুমি অধর্ম্মযুদ্ধ করিতেছ; অতএব এক্ষণে তোমার বিনাশসময় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আয়ুধ পরিত্যাগ করিয়া একবার আমাদিগকে নিরীক্ষণ কর। আর তোমার এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি বেদবেদাঙ্গবেত্তা এবং সত্যধর্ম্মপরায়ণ; অতএব এরূপ কার্য্য করা তোমার নিতান্ত অনুচিত; তুমি অবিমুগ্ধ হইয়া আয়ুধ পরিত্যাগপূর্ব্বক শাশ্বত পথে অবস্থান কর। অদ্য তোমার মর্ত্ত্যলোকনিবাসের কাল পরিপূর্ণ হইয়াছে। হে বিপ্র! অস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ব্রহ্মাস্ত্রে বিনাশ করিয়া নিতান্ত অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ; অতএব আয়ুধ অবিলম্বে পরিত্যাগ কর; আর ক্রূরকার্য্যের অনুষ্ঠান করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।"

ইহাতেই দ্রোণাচার্য্য যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন। যুধিষ্ঠিরের নিকট অশ্বত্থামার মৃত্যু শুনিয়াও যুদ্ধে ক্ষান্ত হন নাই, পূর্ব্বে বলিয়াছি। তার পরেও তিনি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনষ্ট করিবার উপক্রম করিলে, যদুবংশীয় সাত্যকি আসিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষা সম্পাদন করিলেন। সাত্যকির সঙ্গে কেহই যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইল না। দ্রোণও নিবারিত হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির স্বপক্ষীয় বীরগণকে বলিলেন,—

"হে বীরগণ! তোমরা পরম যত্নসহকারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হও। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যের বিনাশের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। অদ্য সমরক্ষেত্রে দ্রুপদনন্দনের কার্য্য সন্দর্শনে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, উনি ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণকে নিপাতিত করিবেন। অতএব তোমরা মিলিত হইয়া দ্রোণের সহিত যুদ্ধারম্ভ কর।"

এই কথার পর, পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাভারত হইতে পুনশ্চ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"মহারথ দ্রোণও মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমাগত বীরগণের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। সত্যসন্ধ মহাবীর দ্রোণাচার্য্য মহারথগণের প্রতি ধাবমান হইলে মেদিনীমণ্ডল কম্পিত, ও প্রচণ্ড বায়ু সেনাগণকে ভীত করতঃ প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মহতী উল্কা সূর্য্য হইতে নিঃসৃত হইয়া আলোক প্রকাশপূর্ব্বক সকলকে শঙ্কিত করিল। দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্র সকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রথের ভীষণ নিস্বন ও অশ্বগণের অশ্রুপাত হইতে লাগিল। তৎকালে মহারথ দ্রোণ নিতান্ত নিস্তেজ হইলেন। তাঁহার বাম নয়ন ও বাম বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি সম্মুখে ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবলোকন করিয়া নিতান্ত উন্মনা হইলেন, এবং ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের বাক্য স্মরণ করিয়া ধর্ম্মযুদ্ধ অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন।"

পাঠক দেখিবেন যে, এখানে দ্রোণের প্রাণত্যাগের অভিলাষের কারণপরম্পরার মধ্যে অশ্বত্থামার মৃত্যুসম্বাদ পরিগণিত হয় নাই। বিচারকের পক্ষে এই এক প্রমাণ যথেষ্ট।

দ্রোণ তথাপি যুদ্ধ ছাড়িলেন না। মহাভারতকার দশ হাজার সৈন্যধ্বংসের কম কথা কন না, তিনি বলেন, তার পরেও দ্রোণাচার্য্য ত্রিশ হাজার সৈন্য বিনষ্ট করিলেন, এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুনর্ব্বার পরাভূত করিলেন। এবার ভীম ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিলেন, এবং দ্রোণাচার্য্যের রথ ধরিয়া (ভীমের অভ্যাস, রথগুলা ধরিয়া আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া

ফেলেন*) সেই পূর্ব্বোদ্ধৃত তীব্র তিরস্কার করিলেন। সেই তিরস্কারে দ্রোণ যথার্থ আয়ুধ ত্যাগ করিলেন,—

"এবং তৎপরে রথোপরি সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র সন্নিবেশিত করিয়া যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক সমস্ত জীবকে অভয়প্রদান করিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন রন্ধ্র প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রথে ভীষণ সশরশরাসন অবস্থানপূর্ব্বক করবারি ধারণপূর্ব্বক দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এইরূপে দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের বশীভূত হইলে সমরাঙ্গনে মহান্ হাহাকার-শব্দ সমুত্থিত হইল। এদিকে জ্যোতির্ম্ময় মহাতপা দ্রোণাচার্য্য অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক শমভাব অবলম্বন করিয়া যোগসহকারে অনাদিপুরুষ বিষ্ণুর ধ্যান করিতে লাগিলেন। এবং মুখ ঈষৎ উন্নমিত, বক্ষঃস্থল বিষ্টম্ভিত ও নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া বিষয়াদি বাঞ্ছা পরিত্যাগ ও সাত্ত্বিকভাব অবলম্বনপূর্ব্বক একাক্ষর বেদমন্ত্র ওঁকার ও পরাৎপর দেবদেবেশ বাসুদেবকে স্মরণ করতঃ সাধুজনেরও দুর্ল্লভ স্বর্গলোকে গমন করিলেন।"

তার পর ধৃষ্টদ্যুম্ন আসিয়া মৃতদেহের মস্তক কাটিয়া লইয়া গেলেন।

অতএব, দ্রোণের মৃত্যুর মহাভারতে দুইটি পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। দুইটি সম্পূর্ণরূপে যে পরস্পরের বিরোধী, তাহা নহে; একত্রে গাঁথা যায়। একত্রে গাঁথাও আছে—ভাল জোড় লাগে নাই, মোটারকম রিপুকর্ম্ম, স্থানে স্থানে ফাঁক পড়িয়াছে। ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এই দুইটি বিবরণের মধ্যে একটিই দ্রোণের মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট, দুইটির প্রয়োজন নাই। একজন কবির এইরূপ দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ জোড়া দিবার চেষ্টা করিবার সম্ভাবনা ছিল না। দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরের দুই জন কবির প্রণীত বলিয়া কাজেই স্বীকার করিতে হয়। কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত? দ্রোণের প্রাণত্যাগেচ্ছার যে সকল কারণ মহাভারত হইতে উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, অশ্বত্থামার মৃত্যুসংবাদ তাহাতে ধরা হয় নাই। অতএব অশ্বত্থামার মৃত্যুঘটিত বৃত্তান্তটি প্রকৃত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু যে সকল সূত্র পূর্ব্বে সংস্থাপিত করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলেই ইহার মীমাংসা হইবে।

আমরা বলিয়াছি যে, যখন দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বা পরস্পরবিরোধী বিবরণের মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্থির হইবে, তখন কোন্‌টি প্রক্ষিপ্ত, তাহা মীমাংসার জন্য দেখিতে হইবে, কোন্‌টি অন্য লক্ষণের দ্বারা পরস্পরবিরোধী বলিয়া বোধ হয়। যেটি অন্য লক্ষণেও ধরা পড়িবে, সেইটিই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিবে।† আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, অশ্বত্থামাবধসংবাদবৃত্তান্ত, কৃষ্ণ, ভীম ও যুধিষ্ঠিরের চরিত্রের সঙ্গে অত্যন্ত অসঙ্গত। আমরা পূর্ব্বে এই একটি লক্ষণ স্থির করিয়াছি যে, এরূপ অসঙ্গতি থাকিলে তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরিতে হইবে।‡ অতএব এই অশ্বত্থামাবধসংবাদ-বৃত্তান্ত প্রক্ষিপ্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৩) আরও একটি কথা আছে। দেখিয়াছি যে, অশ্বত্থামার মৃত্যুসম্বাদে দ্রোণ যুদ্ধে কিছুমাত্র শৈথিল্য করেন নাই। তবে কৃষ্ণ একথা বলাইলেন কেন? দ্রোণের

* ঋষিগুলা যদি "এক্কার" মত হয়, তবে এখনকার লোকেও ইহা পারে।

† ৫৮৩ পৃষ্ঠা (৩) সূত্র দেখ। ‡ ৫৮৩ পৃষ্ঠা (৪) সূত্র দেখ।

যুদ্ধে নিবৃত্তির সম্ভাবনা আছে বলিয়া ? সম্ভাবনা কোথা ? দ্রোণ জানেন, অশ্বত্থামা অমর। সে কথা অনৈসর্গিক বলিয়া না হয় ছাড়িয়া দিলাম। সামান্য মানুষের, তোমার আমার অথবা একটা কুলি মজুরের যে বুদ্ধি, ততটুকু বুদ্ধিও কৃষ্ণের ছিল, যদি এরূপ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, কৃষ্ণের এরূপ পরামর্শ দিবার সম্ভাবনা ছিল না। দ্রোণই হউক, আর যেই হউক, এরূপ সংবাদ শুনিয়া আত্মহত্যায় উদ্যত হইবার আগে, একবার স্বপক্ষীয় কাহাকেও কি জিজ্ঞাসা করিবেন না যে, অশ্বত্থামা মরিয়াছে কি ? অশ্বত্থামার অনুসন্ধানে পাঠাইবেন না ? তাহাই নিতান্ত সম্ভব। তাহা ঘটিলে জুয়াচুরি তখনই সমস্ত ফাঁসিয়া যাইবে।

অতএব উপন্যাসটি প্রথমতঃ প্রক্ষিপ্ত, দ্বিতীয়তঃ মিথ্যা। আমি এমত বলি না যে, ঋষিবাক্যে দ্রোণের অস্ত্র পরিত্যাগ করাই সত্য। ঋষিদের সেই রণক্ষেত্রে আগমন অনৈসর্গিক ব্যাপার, সুতরাং তাহাও অপ্রকৃত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে আমি বাধ্য। ইহার মধ্যে প্রকৃত বা বিশ্বাসযোগ্য কথা এই হইতে পারে যে দ্রোণ অধর্ম্মাচরণ করিতেছিলেন—ভীমের তীব্র তিরস্কারে তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। যুদ্ধে বিমুখ হওয়া তাঁহার সাধ্য নহে—অপটুতা এবং দুর্য্যোধনকে বিপৎকালে পরিত্যাগ, এই উভয় দোষেই দূষিত হইতে হইবে। অতএব মৃত্যুই স্থির করিলেন। বোধ হয়, এতটুকু একটু কিংবদন্তী ছিল—তাহারই উপর মহাভারতের প্রথম স্তর নির্ম্মিত হইয়াছিল। হয়ত, তাহাও যথার্থ ঘটনা নহে। বোধ হয়, যথার্থ ঘটনা এই পর্য্যন্ত যে, দ্রোণ যুদ্ধে দ্রুপদপুত্র কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন ; পরে যাহা বলিতেছি, তাহাতে তাই বুঝায় ; তার পর প্রবলপ্রতাপ পাঞ্চালবংশকে ব্রহ্মহত্যাকলঙ্ক হইতে উদ্ধৃত করিবার জন্য নানাবিধ উপন্যাস প্রস্তুত হইয়াছে।

(৪) এখন দেখা যাউক, অনুক্রমণিকাধ্যায়ে, এবং পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে কি আছে। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে এই মাত্র আছে যে—

'যদাশ্রৌষং দ্রোণমাচার্য্যমেকং ধৃষ্টদ্যুম্নেনাভ্যতিক্রম্য ধর্ম্মম্।
রথোপস্থে প্রায়গতং বিশস্তং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়॥

অর্থ। হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম যে, এক আচার্য্য দ্রোণকে ধৃষ্টদ্যুম্ন ধর্ম্মাতিক্রম-পূর্ব্বক প্রায়োপবিষ্ট অবস্থায় রথোপস্থে বধ করিয়াছে, তখন আর জয়ে সন্দেহ করি নাই।

অতএব এখানেও দেখা যাইতেছে যে, দ্রোণবধে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভিন্ন আর কেহ অধর্ম্মাচরণ করে নাই। ধৃষ্টদ্যুম্নেরও পাপ এই যে, প্রায়োপবিষ্ট বৃদ্ধকে তিনি নিহত করিয়াছিলেন। দ্রোণের প্রায়োপবেশনের কারণ এখানে কিছু কথিত হয় নাই। যুধিষ্ঠিরবাক্যে, বা ঋষিগণের বাক্যে, বা ভীমের তিরস্কারে, তাহা কিছু কথিত হয় নাই। পশ্চাৎ দেখিব, তিনি পরে শ্রান্ত হইয়াই নিহত হয়েন। আসন্নমৃত্যু ব্রাহ্মণের প্রায়োপবেশনের সেও উপযুক্ত কারণ।

(৫) পূর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে কোন কথাই নাই—"দ্রোণে যুধি নিপাতিতে," এ ছাড়া আর কিছুই নাই। হত গজের কথাটা সত্য হইলে, তাহার প্রসঙ্গ অবশ্যই থাকিত। অভিমন্যুর অধর্ম্মযুদ্ধে মৃত্যুর কথা আছে—দ্রোণেরও অবশ্য থাকিত ; গল্পটা তখন তৈয়ার হয় নাই, এজন্য নাই।

(৬) তার পর, দ্রোণপর্ব্বের সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে দ্রোণযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। তাহাতেও এই জুয়াচুরির কোন প্রসঙ্গ নাই। কেবল আছে যে, ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণকে নিপাতিত করিলেন। এই অধ্যায়গুলি যখন প্রণীত হয়, তখনও গল্পটা তৈয়ার হয় নাই।

(৭) আশ্বমেধিক পর্ব্বে আছে যে, কৃষ্ণও দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিলে, বসুদেব কৃষ্ণের নিকট যুদ্ধবৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে যুদ্ধবৃত্তান্ত সংক্ষেপে শুনাইলেন। দ্রোণযুদ্ধ সম্বন্ধে কৃষ্ণ ইহাই বলিলেন যে, দ্রোণাচার্য্যে ও ধৃষ্টদ্যুম্নে পাঁচ দিন যুদ্ধ হয়। পরিশেষে দ্রোণ সমরশ্রমে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নহস্তে নিহত হইলেন। বোধ হয়, এইটুকুই সত্য; এবং যুবার সহিত যুদ্ধে বৃদ্ধের শ্রান্তিই দ্রোণের যুদ্ধবিরতির যথার্থ কারণ। আর সকলই কবিকল্পনা, বা উপন্যাস। নিতান্তই যে উপন্যাস, তাহার সাত রকম প্রমাণ দিলাম।

কিন্তু সেই উপন্যাস মধ্যে, কৃষ্ণকে মিথ্যা প্রবঞ্চনার প্রবর্ত্তক বলিয়া স্থাপিত করিবার কারণ কি? কারণ পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। বুঝাইয়াছি যে, যেমন জ্ঞান ঈশ্বরদত্ত, অজ্ঞান বা ভ্রান্তিও তাই। জয়দ্রথবধে কবি তাহা দেখাইয়াছেন। ভ্রান্তিও ঈশ্বরপ্রেরিত। ঘটোৎকচবধে কবি দেখাইয়াছেন যে, যেমন বুদ্ধি ঈশ্বরপ্রেরিত, দুর্ব্বুদ্ধিও ঈশ্বরপ্রেরিত। আরও বুঝাইয়াছি যে, যেমন সত্যও ঈশ্বরের, অসত্যও তেমনই ঈশ্বরের। এই দ্রোণবধে কবি তাহাই দেখাইলেন।

ইহার পর, নারায়ণাস্ত্রমোক্ষ-পর্ব্বাধ্যায়। সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। বিস্তারিতের প্রয়োজন নাই, কেন না, নারায়ণাস্ত্র বৃত্তান্তটা অনৈসর্গিক, সুতরাং পরিত্যাজ্য। তবে এই পর্ব্বাধ্যায়ে একটা রহস্যের কথা আছে।

দ্রোণ নিহত হইলে, অর্জ্জুন গুরুর জন্য শোকে অত্যন্ত কাতর। মিথ্যা কথা বলিয়া গুরুবধসাধনজন্য তিনি যুধিষ্ঠিরকে খুব তিরস্কার করিলেন, এবং ধৃষ্টদ্যুম্নের নিন্দা করিলেন। যুধিষ্ঠির ভাল মানুষ, কিছু উত্তর করিলেন না, কিন্তু ভীম অর্জ্জুনকে কড়া রকম কিছু শুনাইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জ্জুনকে আরও কড়া রকম শুনাইলেন। তখন অর্জ্জুনশিষ্য যদুবংশীয় সাত্যকি, অর্জ্জুনের পক্ষ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে ভারি রকম গালিগালাজ দিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সুদ সমেত ফিরাইয়া দিলেন। তখন দুই জনে পরস্পরের বধে উদ্যত। কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম ও সহদেব থামাইয়া দিলেন। বিবাদটা এই যে, মিথ্যা কথা বলিয়া দ্রোণের মৃত্যুসাধন করা কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য কি না, এই তত্ত্ব লইয়া দুইদল দুইপক্ষে যত কথা আছে, সব বলিলেন, কিন্তু কেহই কৃষ্ণকে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। কেহই বলিলেন না যে, কৃষ্ণের কথায় এরূপ হইয়াছে। কৃষ্ণের নামও কেহ করিলেন না। পাঁচ হাতের কাজ না হইলে এমন ঘটে না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণকথিত ধর্ম্মতত্ত্ব

যিনি অশ্বত্থামাবধসংবাদ বৃত্তান্ত রচনা করিয়াছেন, তিনি অর্জ্জুনকে বড় উচ্চ স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন। কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির ও ভীমের অপেক্ষা তাঁহার ধার্ম্মিকতা অনেক বেশী, এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন। যাহার প্রস্তাবকর্ত্তা কৃষ্ণ, এবং যাহা পরিশেষে ভীম ও

যুধিষ্ঠির সম্পাদিত করিলেন, সে মিথ্যা কথা বলিয়া অর্জ্জুন তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না ; বরং তজ্জন্য যুধিষ্ঠিরকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন। কিন্তু এক্ষণে যে বিবরণে আমাকে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে, তাহাতে অর্জ্জুন অতি মূঢ় ও পাষণ্ড বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন। এবং কৃষ্ণের নিকট ধর্ম্মোপদেশ পাইয়াই সৎপথ অবলম্বন করিতেছেন। বৃত্তান্তটা এই :—

দ্রোণের পর কর্ণ দুর্য্যোধনের সেনাপতি। তাঁহার যুদ্ধে পাণ্ডবসেনা অস্থির। যুধিষ্ঠির নিজ দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সম্মুখীন হইয়াছিলেন। কর্ণ তাঁহাকে এরূপ সন্তাড়িত করিলেন যে, যুধিষ্ঠির ভয়ে রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গিয়া শিবিরে লুক্কায়িত হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। এদিকে অর্জ্জুন যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যুধিষ্ঠিরকে না দেখিয়া চিন্তিত হইয়া তাঁহার অন্বেষণে শিবিরে গেলেন। তখনও কর্ণ নিহত হয়েন নাই। যুধিষ্ঠির যখন শুনিলেন যে, অর্জ্জুন এখনও কর্ণবধ করেন নাই, তখন রাগিয়া বড় গরম হইলেন। কাপুরুষের স্বভাবই এই যে, আপনি যাহা না পারে, পরে তাহা করিয়া না দিলে বড় চটিয়া উঠে। সুতরাং যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে খুব কঠিন গালিগালাজ করিলেন। শেষ বলিলেন যে, তুমি নিজে যখন যুদ্ধে ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছ, তখন তুমি কৃষ্ণকে গাণ্ডীব শরাসন প্রদান কর।

শুনিয়া অর্জ্জুন তরবারি লইয়া যুধিষ্ঠিরকে কাটিতে উঠিলেন। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তরবারি দিয়া কাহাকে বধ করিবে? অর্জ্জুন বলিলেন, "তুমি অন্যকে গাণ্ডীব* শরাসন সমর্পণ কর, এই কথা যিনি আমারে কহিবেন, আমি তাঁহার মস্তক ছেদন করিব, এই আমার উপাংশুব্রত। এক্ষণে তোমার সমক্ষেই মহারাজ আমারে এই কথা কহিয়াছেন, অতএব আমি এই ধর্ম্মভীরু নরপতিরে নিহত করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতি-পালন ও সত্যের আনৃণ্য লাভ করতঃ নিশ্চিন্ত হইব।"

কথাটা মূঢ় ও পাষণ্ডের মত হইল—অর্জ্জুনের মত নহে। একে ত, গাণ্ডীব অন্যকে দাও বলিলে কোন ব্যক্তিকে খুন করিতে হইবে, এ প্রতিজ্ঞাই মূঢ়তার কাজ। তার পর পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠাগ্রজ উত্তেজনার জন্য এরূপ কথা বলিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাকে বধ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া অতিশয় পাষণ্ডের কাজ। তবে ইহার ভিতর গুরুতর কথা আছে ; তাহার বিস্তারিত মীমাংসা কৃষ্ণ কর্ত্তৃক হইয়াছিল, এই জন্য এ কথার অবতারণায় আমি বাধ্য।

কথাটা এই। সত্য পরম ধর্ম্ম। যদি অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে বধ না করেন, তবে তাঁহাকে সত্যচ্যুত হইতে হয়। অর্জ্জুনের প্রশ্ন এই যে, সত্যরক্ষার্থ যুধিষ্ঠিরকে বধ করা তাঁহার কর্ত্তব্য কি না। অর্জ্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মতে এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য?"

কৃষ্ণ যে উত্তর দিলেন, তাহা বুঝাইবার পূর্ব্বে, আমরা পাঠককে অনুরোধ করি যে, আপনিই ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করুন। বোধ করি, সকল পাঠকই একমত হইয়া উত্তর দিবেন যে, এরূপ সত্যের জন্য যুধিষ্ঠিরকে বধ করা অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য নহে। কৃষ্ণও সেই উত্তর দিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য নীতিপণ্ডিত আধুনিক পাঠক যে কারণে এই

---

* পাঠককে বোধ করি বলিতে হইবে না, গাণ্ডীব অর্জ্জুনের ধনুকের নাম। উহা দেবদত্ত, অবিনশ্বর এবং শরাসন মধ্যে ভয়ঙ্কর।

উত্তর দিবেন, কৃষ্ণ সেই কারণে এ সকল উত্তর দিলেন না। তিনি প্রাচ্যনীতির বশবর্ত্তী হইয়াই এই উত্তর দিলেন। তাহার কারণ বুঝাইতে হইবে না—বুঝাইতে হইবে না যে, শ্রীকৃষ্ণ ভারতবর্ষে অবতীর্ণ, ইংলণ্ডে নহে। তিনি ভারতবর্ষের নীতিতে সুপণ্ডিত, ইউরোপীয় নীতি তখন হয়ও নাই; এবং কৃষ্ণ তন্মার্গাবলম্বী হইলে অর্জ্জুনও তাহার কিছুই বুঝিতেন না।

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বুঝাইবার জন্য যে সকল তত্ত্বের অবতারণা করিলেন, এক্ষণে তাহার স্থূলমর্ম্ম বলিতেছি—অন্ততঃ যে অংশ বিবাদের স্থল হইতে পারে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

তাঁহার প্রথম কথা "অহিংসা পরম ধর্ম্ম"। ইহাতে প্রথম আপত্তি হইতে পারে যে, সকল স্থানে অহিংসা ধর্ম্ম নহে। দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণ স্বয়ং গীতাপর্ব্বাধ্যায়ে অর্জ্জুনকে যে উপদেশ দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, এ উক্তি তাহার বিপরীত।

যিনি অহিংসাতত্ত্বের যথার্থ মর্ম্ম না বুঝেন, তিনিই এরূপ আপত্তি করিবেন। অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এ কথায় এমন বুঝায় না যে, কোন অবস্থায় কোন প্রকারে প্রাণি-হিংসা করিলে অধর্ম্ম হয়। প্রাণিহিংসা ব্যতীত আমরা ক্ষণমাত্র জীবন ধারণ করিতে পারি না, ইহা ঐশিক নিয়ম। যে জল পান করি, তাহার সঙ্গে সহস্র সহস্র অণুবীক্ষণ-দৃশ্য জীব উদরস্থ করি; প্রতি নিশ্বাসে বহুসংখ্যক তাদৃক্ জীব নাসাপথে প্রেরিত করি, প্রতি পদার্পণে সহস্র সহস্রকে দলিত করি। একটি শাকের পাতা বা একটি বেগুনের সঙ্গে অনেকগুলিকে রাঁধিয়া খাই। যদি বল, এ সকল অজ্ঞানকৃত হিংসা, তাহাতে পাপ নাই; আমি তাহার উত্তরে বলি যে, জ্ঞানকৃত প্রাণিহিংসা ব্যতীতও আমাদের প্রাণরক্ষা নাই। যে বিষধর সর্প বা বৃশ্চিক, আমার গৃহে বা আমার শয্যাতলে আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে ব্যাঘ্র আমাকে গ্রহণ করিবার জন্য লম্ফনোদ্যত, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে শত্রু আমার বধসাধনে কৃতনিশ্চয়, ও উদ্যতায়ুধ, আমি তাহাকে বিনাশ না করিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে। যে দস্যু ধৃতাস্ত্র হইয়া নিশীথে আমার গৃহ প্রবেশপূর্ব্বক সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিতেছে, যদি বিনাশ ভিন্ন তাহাকে নিবারণের উপায় না থাকে, তবে তাহাকে বিনাশ করাই আমার পক্ষে ধর্ম্মানুমত। যে বিচারকের সম্মুখে হত্যাকারিকৃত হত্যা প্রমাণিত হইয়াছে, যদি তাহার বধদণ্ড রাজনিয়োগসম্মত হয়, তবে তিনি তাহার বধাজ্ঞা প্রচার করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য। এবং যে রাজপুরুষের উপর বধার্হের বধের ভার আছে, সেও তাহাকে বধ করিতে বাধ্য। সেকেন্দর বা গজনবী মহম্মদ, আতিলা বা জঙ্গেজ, তৈমুর বা নাদের, দ্বিতীয় ফ্রেড্রিক্ বা নপোলেয়ন্ পরস্ব ও পররাষ্ট্রাপহরণ জন্য যে অগণিত শিক্ষিত তস্কর লইয়া পর রাজ্যপ্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ লক্ষ হইলেও প্রত্যেকেই ধর্ম্মতঃ বধ্য। এখানে হিংসাই ধর্ম্ম।

পক্ষান্তরে, যে পাখিটি আকাশে উড়িয়া যাইতেছে, ভোজন জন্যই হউক বা খেলার জন্যই হউক, তাহার নিপাত অধর্ম্ম। যে মাছিটি মিষ্টবিন্দুর অন্বেষণে উড়িয়া বেড়াইতেছে, ক্রীড়াশীল বালক যে তাহাকে ধরিয়া টিপিয়া মারিল, তাহা অধর্ম্ম।

যে মৃগ, বা যে কুক্কুট তোমার আমার ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য জগতে আসিয়াছে, উদরম্ভরী যে তাহাকে বধ করিয়া খায়, সে অধর্ম্ম। আমরা বায়ুপ্রবাহের তলচারী জীব; মৎস্য, জলপ্রবাহের উপরিচর জীব; আমরা যে তাহাদের ধরিয়া খাই, সে অধর্ম্ম।

তবে অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এ বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্ম্য প্রয়োজন ব্যতীত যে হিংসা, তাহা হইতে বিরতিই পরম ধর্ম্ম। নচেৎ হিংসাকারীর নিবারণ জন্য হিংসা অধর্ম্ম নহে; বরং পরম ধর্ম্ম। এই কথা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলাকের ইতিহাস শুনাইলেন। তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, বলাক নামে ব্যাধ, প্রাণিগণের বিশেষবিনাশহেতু এক শ্বাপদকে বিনাশ করিয়াছিল, করিবামাত্র তাহার উপর "আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল, অপ্সরোদিগের অতি মনোরম গীত বাদ্য আরম্ভ হইল, এবং সেই ব্যাধকে স্বর্গে সমানীত করিবার নিমিত্ত বিমান সমুপস্থিত হইল।" ব্যাধের পুণ্য এই যে, সে হিংসাকারীর হিংসা করিয়াছিল।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এই অর্থে বুঝিতে হইবে। তবে, ধর্ম্ম্য প্রয়োজন ভিন্ন হিংসা করিবে না, এ কথায় একটা ভারি গোলযোগ হয়, এবং জগতে চিরকাল হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্ম্য প্রয়োজন কি? ধর্ম্ম কি? Inquisition কর্ত্তৃক মনুষ্যবধে ধর্ম্ম্য প্রয়োজন আছে বলিয়া কোটি কোটি মনুষ্য যমপুরে প্রেরিত হইয়াছিল। ধর্ম্মার্থই St. Bartholomew হত্যাকাণ্ড। ধর্ম্মাচরণ বিবেচনাতেই ক্রুসেদওয়ালাদিগের দ্বারা পৃথিবী নরশোণিতপ্রবাহে পঙ্কিল হইয়াছিল। ধর্ম্মবিস্তারের জন্য মুসলমানেরা লক্ষ লক্ষ মনুষ্যহত্যা করিয়াছিল। বোধ হয়, ধর্ম্মপ্রয়োজন সম্বন্ধে ভ্রান্তিতে পড়িয়া মনুষ্য যত মনুষ্য নষ্ট করিয়াছে, তত মনুষ্য আর কোন কারণেই নষ্ট হয় নাই।

অর্জ্জুনেরও এখন সেই ভ্রান্তি উপস্থিত। তিনি মনে করিয়াছেন যে, সত্যরক্ষা-ধর্ম্মার্থ যুধিষ্ঠিরকে বধ করা কর্ত্তব্য। অতএব কেবল অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এ কথা বলিলে তাঁহার ভ্রান্তির দূরীকরণ হয় না। এই জন্য কৃষ্ণের দ্বিতীয় কথা।

সে দ্বিতীয় কথা এই যে, বরং মিথ্যা বাক্যও প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্তু কখনই প্রাণিহিংসা করা কর্ত্তব্য নহে।* ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, অহিংসা ও সত্য, এই দুইয়ের মধ্যে অহিংসা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ইহার অর্থ এই:—নানাবিধ পুণ্য কর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া গণনা করা যায়; যথা—দান, তপ, দেবভক্তি, সত্য, শৌচ, অহিংসা ইত্যাদি। ইহার মধ্যে সকলগুলি সমান নহে; ইতরবিশেষ হওয়াই সম্ভব। শৌচের মাহাত্ম্য বা দানের কি সত্যের সঙ্গে বা অহিংসার সঙ্গে এক? যদি তাহা না হয়, যদি তারতম্য থাকে, তবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কে? কৃষ্ণ বলেন, অহিংসা। সত্যের স্থান তাহার নীচে।

---

* যে বচনের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণকথিত এই ধর্ম্মতত্ত্ব সংস্থাপিত হইতেছে, তাহার মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্য।

প্রাণিনামবধস্তাত সর্ব্বজ্যায়ান্মতো মম।
অনৃতাং বা বদেদ্বাচং ন তু হিংস্যাৎ কথঞ্চন॥

পাঠক দেখিবেন, অহিংসা পরমধর্ম্ম, এটা কৃষ্ণবাক্যের ঠিক অনুবাদ নহে। ঠিক অনুবাদ—"আমার মতে প্রাণিগণের অহিংসা সর্ব্ব হইতে শ্রেষ্ঠ।" অর্থগত বিশেষ প্রভেদ নাই বলিয়া "অহিংসা পরম-ধর্ম্ম" ইতি পরিচিত বাক্যই ব্যবহার করিয়াছি।

আমরা পাশ্চাত্যের শিষ্য। অনেক পাঠক এই কথায় শিহরিয়া উঠিবেন। পাশ্চাত্যেরা নাকি বলিয়া থাকেন, কোনও অবস্থাতেই মিথ্যা বলা যাইতে পারে না। তা না হয় হইল ; সে কথা এখন উঠিতেছে না। এমন কেহই বলিবেন না যে, পাশ্চাত্যদিগের মতে এক জন মিথ্যাবাদী এক জন হত্যাকারীর অপেক্ষা গুরুতর পাপী, অথবা মিথ্যাবাদী ও হত্যাকারীর তুল্য পাপী। তাঁহারা যে তাহা বলেন না, সমস্ত ইউরোপীয় দণ্ডবিধিশাস্ত্র তাহার প্রমাণ। যদি তাই হইল, তবে এখন কৃষ্ণের সঙ্গে পাশ্চাত্যের শিষ্যগণের মতভেদের এখানে কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এখানে কেবল পাপের তারতম্যের কথা হইতেছে। কোন অধর্ম্মই কোন সময়ে করিতে নাই। নরহত্যাও করিতে নাই, মিথ্যা কথাও বলিতে নাই। কৃষ্ণের কথার ফল এই যে যদি এমন অবস্থা কাহারও ঘটে যে, হয় তাহাকে মিথ্যা কথা বলিতে হইবে, নয় নরহত্যা করিতে হইবে, তবে সে বরং মিথ্যা কথা বলিবে, তথাপি নরহত্যা করিবে না। যদি এরূপ ধর্ম্মাত্মা নীতিজ্ঞ কেহ থাকেন যে, বলেন যে, বরং নরহত্যা করিবে তথাপি মিথ্যা কথা বলিবে না, তবে আমাদের উত্তর এই যে, তাঁহার ধর্ম্ম তাঁহাতেই থাক, এ নারকী ধর্ম্ম যেন ভারতবর্ষে বিরলপ্রচার হয়।

কৃষ্ণের এই মত। যদি অর্জ্জুন ইহার অনুবর্ত্তী হইবেন, তবে ভ্রাতৃবধ-পাপ হইতে তাঁহাকে বিরত করিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু অর্জ্জুন বলিতে পারেন, "এ ত গেল তোমার মত। কিন্তু লৌকিক ও প্রচলিত ধর্ম্ম কি ? তোমার মতই যথার্থ হইতে পারে, কিন্তু ইহা যদি প্রচলিত ধর্ম্মানুমোদিত না হয়, তবে আমি জনসমাজে সত্যচ্যুত পাপাত্মা বলিয়া কলঙ্কিত হইব।" এজন্য কৃষ্ণ আপনার মত প্রকাশ করিয়া প্রচলিত ধর্ম্ম যাহা, তাহা বুঝাইতেছেন। তিনি বলিলেন, "হে ধনঞ্জয়! কুরুপিতামহ ভীষ্ম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বিদুর ও যশস্বিনী কুন্তী যে ধর্ম্মরহস্য কহিয়াছেন, আমি যথার্থরূপে তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।" এই বলিয়া বলিলেন,

"সাধু ব্যক্তিই সত্য কথা কহিয়া থাকেন, সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই।* সত্যতত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়। সত্যবাক্য প্রয়োগ করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।"

এই গেল স্থূলনীতি। তারপর বর্জ্জিত তত্ত্ব বলিতেছেন,

"কিন্তু যে স্থানে মিথ্যা সত্যস্বরূপ, ও সত্য মিথ্যাস্বরূপ হয়, সে স্থলে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে।"

কিন্তু কখন কি এমন হয় ? এ কথাটা আবার উঠিবে, সেই সময়ে আমরা ইহার যথাসাধ্য বিচার করিব। তারপর কৃষ্ণ বলিতেছেন,

"বিবাহ, রতিক্রীড়া, প্রাণবিয়োগ ও সর্ব্বস্বাপহরণকালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা প্রয়োগ করিলেও পাতক হয় না।"

এখানে ঘোর বিবাদের স্থল, কিন্তু বিবাদ এখন থাক। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদে

* "ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরম্।" ইতিপূর্ব্বে কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "প্রাণিনামবধস্তাত সর্ব্বজ্যায়ান্মতো মম।" এই দুইটি কথা পরস্পরবিরোধী। তাহার কারণ, একটি কৃষ্ণের মত, আর একটি ভীষ্মাদিকথিত প্রচলিত ধর্ম্মনীতি।

উল্লিখিতরূপ আছে। উহা একটি শ্লোকের মাত্র অনুবাদ, কিন্তু মূলে ঐ বিষয়ে দুইটি শ্লোক আছে। দুইটিই উদ্ধৃত করিতেছি ;

১। প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
সর্ব্বস্বস্যাপহারে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ ॥
২। বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে।
বিপ্রস্য চার্থে হ্যনৃতং বদেত পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ॥

এই দুইটি শ্লোকের একই অর্থ ; কেবল প্রথম শ্লোকটিতে ব্রাহ্মণের কথা নাই, এই প্রভেদ। এখন পাঠকের মনে এই প্রশ্ন আপনিই উদয় হইবে, একই অর্থবাচক দুইটি শ্লোকের প্রয়োজন কি ?

ইহার উত্তর এই যে, এই দুইটিই অন্যত্র হইতে উদ্ধৃত—Quotation—কৃষ্ণের নিজোক্তি নহে। সংস্কৃতগ্রন্থে এমন স্থানে স্থানে দেখা যায় যে, অন্যত্র হইতে বচন ধৃত হয়, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বলা হয় না যে, এই বচন গ্রন্থান্তরের। এই মহাভারতীয় গীতা-পর্ব্বাধ্যায়েই তাহার উদাহরণ গ্রন্থান্তরে দিয়াছি।

আমি আন্দাজের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছি না, এ বচন দুইটি অন্যত্র হইতে ধৃত। দ্বিতীয় শ্লোকটি, যথা—"বিবাহকালে রতিসম্প্রয়োগে" ইত্যাদি—ইহা বশিষ্ঠের বচন। পাঠক বশিষ্ঠের ১৬ অধ্যায়ে, ৩৫ শ্লোকে তাহা দেখিবেন ; ইহা মহাভারতের আদিপর্ব্বে, ৩৪১২ শ্লোকে, যেখানে কৃষ্ণের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, সেখানেও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

ন নর্ম্মযুক্তং বচনং হিনস্তি ন স্ত্রীষু রাজন্ন বিবাহকালে।
প্রাণাত্যয়ে সর্ব্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্যাহুরপাতকানি ॥

চারিটি ভিন্ন পাঁচটির কথা এখানে নাই, তথাপি বশিষ্ঠের সেই "পঞ্চানৃতান্যাহুর-পাতকানি" আছে। প্রচলিত বচন সকল মুখে মুখে এইরূপ বিকৃত হইয়া যায়।

প্রথম শ্লোকটির পূর্ব্বগামী শ্লোকের সহিত লিখিতেছি ;

(ক) ভবেৎ সত্যমবক্তব্যং বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
(খ) যত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যঞ্চাপ্যনৃতং ভবেৎ ॥
(গ) প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
(ঘ) সর্ব্বস্বস্যাপহারে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ ॥

এক্ষণে মহাভারতের সভাপর্ব্ব হইতে একটি (১৩৮৪৪) শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—কৃষ্ণের সহিত সেখানে কোন সম্বন্ধ নাই।

(চ) প্রাণান্তিকে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
(ছ) অনৃতেন ভবেৎ সত্যং সত্যেনৈবানৃতং ভবেৎ ॥

পাঠক দেখিবেন, (গ) ও (চ) আর (খ) (ছ) একই। শব্দগুলিও প্রায় একই। অতএব ইহাও প্রচলিত পুরাতন বচন।

ইহা কৃষ্ণের মত নহে ; নিজের অনুমোদিত নীতি বলিয়াও তাহা বলিতেছেন না ; ভীষ্মাদির কাছে যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন ; নিজের অনুমোদিত হউক বা না

হউক, কেন তিনি ইহা অর্জ্জুনকে শুনাইতে বাধ্য, তাহা বলিয়াছি। সুতরাং কৃষ্ণচরিত্রে এ নীতির যাথার্থ্যাযাথার্থ্য বিচারে কোন প্রয়োজন হইতেছে না।

কিন্তু আসল কথা বাকি আছে। আসল কথা, কৃষ্ণের নিজের মতও এই যে, অবস্থাবিশেষে সত্য মিথ্যা হয় এবং মিথ্যা সত্য হয়; এবং সে সকল স্থানে মিথ্যাই প্রযোক্তব্য। একথা তিনি পরে বলিতেছেন।

প্রথমে বিচার্য্য, কখনও কি মিথ্যা সত্য হয়, সত্য মিথ্যা হয়? ইহার স্থূল উত্তর এই যে, যাহা ধর্ম্মানুমোদিত, তাহাই সত্য, আর যাহা অধর্ম্মের অনুমোদিত, তাহাই মিথ্যা। ধর্ম্মানুমোদিত মিথ্যা নাই; এবং অধর্ম্মানুমোদিত সত্য নাই। তবে সত্যাসত্য মীমাংসা ধর্ম্মাধর্ম্ম মীমাংসার উপর নির্ভর করিতেছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতেছেন। কথাগুলাতে গীতার উদারনীতির গম্ভীর শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। বলিতেছেন,

"ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম তত্ত্ব নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে অনুমান দ্বারাও নিতান্ত দুর্ব্বোধ ধর্ম্মের নির্ণয় করিতে হয়।"

ইহার অপেক্ষা উদার ইউরোপেও কিছু নাই। তার পর,

"অনেকে শ্রুতিরে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাহাতে আমি দোষারোপ করি না; কিন্তু শ্রুতিতে সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট নাই; এই জন্য অনেক স্থলে অনুমান দ্বারা ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়।"

এই কথাটা লইয়া আজিও সভ্যজগতে বড় গোলমাল। যাঁহারা বলেন যে, যাহা দৈবোক্তি, বেদই হউক, বাইবেলই হউক, কোরাণই হউক,—তাহাতে যাহা আছে, তাহাই ধর্ম্ম—তাহার বাহিরে ধর্ম্ম কিছুই নাই—তাঁহারা আজিও বড় বলবান্। তাঁহাদের মতে ধর্ম্ম দৈবোক্তিনির্দ্দিষ্ট, অনুমানের বিষয় নহে। এ কথা মনুষ্যজাতির উন্নতির পথে বড় দুরুত্তীর্য্য কণ্টক। আমাদের দেশের কথা দূরে থাকুক, ইউরোপেও আজিও এই মত উন্নতির পথ রোধ করিতেছে। আমাদের দেশের অবনতির ইহা একটি প্রধান কারণ। আজিও ভারতবর্ষের ধর্ম্মজ্ঞান বেদ ও মনুযাজ্ঞবল্ক্যাদি স্মৃতির দ্বারা নিরুদ্ধ;—অনুমানের পথ নিষিদ্ধ। অতি দূরদর্শী মনুষ্যাদর্শ শ্রীকৃষ্ণ লোকোন্নতির এই বিষম ব্যাঘাত সেই অতি প্রাচীন কালেও দেখিয়াছিলেন। এখন হিন্দুসমাজের ধর্ম্মজ্ঞান দেখিয়া বিষণ্ণমনে সেই শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ লইতে ইচ্ছা করে।

কিন্তু অনুমানের একটা মূল চাহি। যেমন অগ্নি ভিন্ন ধূমোৎপত্তি হয় না, এই মূলের উপর অনুমান করি যে, সম্মুখস্থ ধূমবান্ পর্ব্বত বহ্নিমান্ও বটে, তেমনি একটা লক্ষণ চাহি যে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারিব যে, এই কর্ম্মটা ধর্ম্ম বটে। শ্রীকৃষ্ণ তাহার লক্ষণ নির্দিষ্ট করিতেছেন।

"ধর্ম্ম প্রাণিগণকে ধারণ করে বলিয়া ধর্ম্মনামে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব **যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম।**"

এই হইল কৃষ্ণকৃত ধর্ম্মের লক্ষণনির্দ্দেশ। কথাটায়, এখনকার Herbert Spencer, Bentham, Mill ইতি সম্প্রদায়ের শিষ্যগণ কোন প্রকার অমত করিবেন না জানি। কিন্তু অনেকে বলিবেন, এ যে ঘোরতর হিতবাদ—বড় Utilitarian রকমের ধর্ম্ম। বড়

Utilitarian রকম বটে, কিন্তু আমি গ্রন্থান্তরে বুঝাইয়াছি যে, ধর্ম্মতত্ত্ব হিতবাদ হইতে বিযুক্ত করা যায় না ;—জগদীশ্বরের সার্ব্বভৌতিকত্ব এবং সর্ব্বময়তা হইতেই ইহাকে অনুমিত করিতে হয়। সঙ্কীর্ণ খ্রীষ্টধর্ম্মের সঙ্গে হিতবাদের বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু যে হিন্দুধর্ম্মে বলে যে, ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, হিতবাদ সে ধর্ম্মের প্রকৃত অংশ। এই কৃষ্ণবাক্যই যথার্থ ধর্ম্মলক্ষণ।

পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি, যাহা ধর্ম্মানুমোদিত, তাহাই সত্য ; যাহা ধর্ম্মানুমোদিত নহে, তাহাই মিথ্যা। অতএব যাহা সর্ব্বলোকহিতকর, তাহাই সত্য, যাহা লোকের অহিতকর, তাহাই মিথ্যা। এই অর্থে, যাহা লৌকিক সত্য, তাহা ধর্ম্মতঃ মিথ্যা হইতে পারে ; এবং যাহা লৌকিক মিথ্যা, তাহা ধর্ম্মতঃ সত্য হইতে পারে। এইরূপ স্থলে মিথ্যাও সত্যস্বরূপ এবং সত্যও মিথ্যাস্বরূপ হয়।

উদাহরণস্বরূপ কৃষ্ণ বলিতেছেন, যদি কেহ কাহারে বিনাশ করিবার মানসে কাহারও নিকট তাহার অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে **জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্বন করাই উচিত।** যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তবে সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। ঐরূপ স্থলে মিথ্যা সত্যস্বরূপ হয়।

এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিবার পূর্ব্বেই, কৃষ্ণ, কৌশিকের উপাখ্যান অর্জ্জুনকে শুনাইয়া ভূমিকা করিয়াছিলেন। সে উপাখ্যান এই,

"কৌশিক নামে এক বহুশ্রুত তপস্বিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতিদূরে নদীগণের সঙ্গমস্থানে বাস করিতেন। ঐ ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগরূপ ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক তৎকালে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। একদা কতকগুলি লোক দস্যুভয়ে ভীত হইয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিলে, দস্যুরাও ক্রোধভরে যত্নসহকারে সেই বনে তাহাদিগকে অন্বেষণ করতঃ সেই সত্যবাদী কৌশিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, হে ভগবন্! কতকগুলি ব্যক্তি এই দিকে আগমন করিয়াছিল, তাহারা কোন্ পথে গমন করিয়াছে, যদি আপনি তাহা অবগত থাকেন, তাহা হইলে সত্য করিয়া বলুন। কৌশিক দস্যুগণকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্যপালনার্থে তাহাদিগকে কহিলেন, কতকগুলি লোক এই বৃক্ষ, লতা ও বৃক্ষপরিবেষ্টিত অটবীমধ্যে গমন করিয়াছে। তখন সেই ক্রূরকর্ম্মা দস্যুগণ তাহাদের অনুসন্ধান পাইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ ও বিনাশ করিল। সূক্ষ্মধর্ম্মানভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিকও সেই সত্যবাক্যজনিত পাপে লিপ্ত হইয়া ঘোর নরকে নিপতিত হইলেন।"

এ স্থলে ইহা অভিপ্রেত যে, কৌশিক অবগত হইয়াছিলেন যে, ইহারা দস্যু ; পলায়িত ব্যক্তিগণের অনিষ্ট ইহাদের উদ্দেশ্য—নহিলে তাঁহার কোন পাপই নাই। যদি তাহা অবগত ছিলেন, তবে তিনি কৃষ্ণের মতে সত্যকথনের দ্বারা পাপাচরণ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে ঘোরতর মতভেদ। আমাদের প্রতীচ্য শিক্ষকদিগের নিকট শিখিয়াছি যে, সত্য নিত্য, কখন মিথ্যা হয় না, এবং কোন সময়ে মিথ্যা প্রযোক্তব্য নহে। সুতরাং কৃষ্ণের মত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট নিন্দিতই হইতে পারে। যাঁহারা ইহার নিন্দা করিবেন (আমি ইহার সমর্থনও করিতেছি না), তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কৌশিকের এ অবস্থায় কি করা উচিত ছিল ? সহজ উত্তর,

মৌনাবলম্বন করা উচিত ছিল। সে কথা ত কৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—সে বিষয়ে মতভেদ নাই। যদি দস্যুরা মৌনী থাকিতে না দেয়? পীড়নাদির দ্বারা উত্তর গ্রহণ করে? কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, পীড়ন ও মৃত্যু স্বীকার করিয়াও কৌশিকের মৌন-রক্ষা করা উচিত ছিল। তাহাতেও আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। তবে জিজ্ঞাস্য এই, ঈদৃশ ধর্ম্ম পৃথিবীতে সাধারণতঃ চলিবার সম্ভাবনা আছে কি না? ইহাতে সাংখ্য-প্রবচনকারের একটি সূত্র আমাদের মনে পড়িল। মহর্ষি কপিল বলিয়াছেন, "নাশক্যো-পদেশবিধিরুপদিষ্টেঽপ্যনুপদেশঃ।"* এরূপ ধর্ম্মপ্রচার চেষ্টা নিষ্ফল বলিয়া বোধ হয়। যদি সফল হয়, মানবজাতির পরম সৌভাগ্য।

কথাটা এখানে ঠিক তাহা নয়। কথাটা এই যে, যদি, যদি একান্তই কথা কহিতে হয়,

অবশ্যং কূজিতব্যে বা শঙ্কেরন্ বাপ্যকূজতঃ।

তাহা হইলে কি করিবে? সত্য বলিয়া জ্ঞানতঃ নরহত্যার সহায়তা করিবে? যিনি এই-রূপ ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝেন, তাহার ধর্ম্মবাদ যথার্থই হউক, অযাথার্থই হউক, নিতান্ত নৃশংস বটে।

প্রতিবাদকারী বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণোক্ত এই নীতির একটি ফল এমন হয় যে, হত্যাকারীর জীবনরক্ষার্থ মিথ্যা শপথ করাও ধর্ম্ম। যিনি এরূপ আপত্তি করিবেন, তিনি এই সত্যতত্ত্ব কিছুই বুঝেন নাই। হত্যাকারীর দণ্ড মনুষ্যজীবন রক্ষার্থ নিতান্ত প্রয়োজনীয়, নহিলে, যে যাহাকে পাইবে, মারিয়া ফেলিবে। অতএব হত্যাকারীর দণ্ডই ধর্ম্ম; এবং তাহার রক্ষার্থ যে মিথ্যা বলে, সে অধর্ম্ম করে।

কৃষ্ণোক্ত এই সত্যতত্ত্ব নির্দ্দোষ এবং মনুষ্যসাধারণের অবলম্বনীয় কি না, তাহা আমি এক্ষণে বলিতে প্রস্তুত নহি। তবে কৃষ্ণচরিত্র বুঝাইবার জন্য উহা পরিস্ফুট করিতে আমি বাধ্য। কিন্তু ইহাও বলিতে আমি বাধ্য যে, পাশ্চাত্ত্যেরা যে কারণে বলেন যে, সত্য সকল সময়েই সত্য, কোন অবস্থাতেই অপরিহার্য্য নহে, তাহার মূলে একটা গুরুতর কথা আছে। কথাটা এই যে, ইহাই যদি ধর্ম্ম—সত্য যেখানে মনুষ্যের হিতকারী সেইখানেই ধর্ম্ম, আর যেখানে মনুষ্যের হিতকারী নয় সেখানে অধর্ম্ম, ইহাই যদি ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে মনুষ্যজীবন এবং মনুষ্যসমাজ অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে,—যে লোকহিত তোমার উদ্দেশ্য, তাহা ডুবিয়া যায়। [illegible] উপস্থিত হইলে, সত্য অবলম্বনীয়, বা মিথ্যা অবলম্বনীয়, এ কথার মীমাংসা কে করিবে? যে সে মীমাংসা করিবে। যে সে মীমাংসা করিতে বসিলে, মীমাংসা কখন ধর্ম্মানুমোদিত হইতে পারে না। শিক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি, অনেকেরই অতি সামান্য; কাহারও সম্পূর্ণ নহে। বিচারশক্তি অধিকাংশেরই আদৌ অল্প, তার উপর ইন্দ্রিয়ের বেগ, স্নেহ মমতার বেগ, ভয়, লোভ, মোহ, ইত্যাদির প্রকোপ। সত্য নিত্যপালনীয়, এরূপ ধর্ম্মব্যবস্থা না থাকিলে, মনুষ্যজাতি সত্যশূন্য হইবারই সম্ভাবনা।

প্রাচীন হিন্দু ঋষিরা যে তাহা বুঝিতেন না এমত নহে। বুঝিয়াই তাঁহারা বিশেষ করিয়া বিধান করিয়া দিয়াছেন, কোন্ কোন্ সময়ে মিথ্যা বলা যাইতে পারে। প্রাণাত্যয়ে ইত্যাদি সেই বিধি আমরা উদ্ধৃত করিয়াছি। মনু, গৌতম প্রভৃতি

* প্রথম অধ্যায়, ১ সূত্র।

ঋষিদিগেরও মতও সেই প্রকার। তাঁহারা যে কয়টি বিশেষ বিধি বলিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মানুমত কি না, তাহার বিচারে আমার প্রয়োজন নহে। কৃষ্ণকথিত সত্যতত্ত্ব পরিস্ফুট করাই আমার উদ্দেশ্য। কৃষ্ণও আধুনিক ইউরোপীয়দিগের ন্যায় বুঝিয়াছিলেন যে, বিশেষ বিধি ব্যতীত, এই সাধারণ বিধি কার্য্যে পরিণত করা, সাধারণ লোকের পক্ষে অতি দুরূহ। কিন্তু তাঁহার বিবেচনায় প্রাণাত্যয়ে প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ অবস্থা নির্দ্দেশ করিলেই লোককে ধর্ম্মানুমত সত্যাচরণ বুঝান যায় না। তিনি তৎপরিবর্ত্তে কি জন্য, এবং কিরূপ অবস্থায় সাধারণ বিধি উল্লঙ্ঘন করা উচিত, তাহাই বলিতেছেন। আমরা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতেছি।

দান, তপ, শৌচ, আর্জ্জব, সত্য প্রভৃতি অনেকগুলি কার্য্যকে ধর্ম্ম বলা যায়। ইহার সকলগুলিই সাধারণতঃ ধর্ম্ম, আবার সকলগুলিই অবস্থাবিশেষে অধর্ম্ম। অনুপযুক্ত প্রয়োগ বা ব্যবহারই অধর্ম্ম। দান সম্বন্ধে উদাহরণ প্রয়োগ পূর্ব্বক বলিতেছেন "সমর্থ হইলেও চৌরাদিকে ধন দান করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে। পাপাত্মাদিগকে ধন দান করিলে অধর্ম্মাচরণ নিবন্ধন দাতারও নিতান্ত নিপীড়িত হইতে হয়।" সত্য সম্বন্ধেও সেইরূপ। শ্রীকৃষ্ণ তাহার যে দুইটি উদাহরণ দিয়াছেন, তাহার একটি উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, আর একটি এই ;

"যে স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারাও চৌরসংসর্গ হইতে মুক্তি লাভ হয়, সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়ঃ। সে মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্যস্বরূপ হয়।"

ইহা ভিন্ন প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে প্রাণাত্যয়ে বিবাহে ইত্যাদি কথা পুনরুক্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণকথিত সত্যতত্ত্ব এইরূপ। ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এইরূপ বুঝা গেল যে,

১। যাহা ধর্ম্মানুমোদিত তাহাই সত্য, যাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ তাহা অসত্য।

২। যাহাতে লোকের হিত, তাহাই ধর্ম্ম।

৩। অতএব যাহাতে লোকের হিত তাহাই সত্য। যাহা তদ্বিরুদ্ধ তাহা অসত্য।

৪। এইরূপ সত্য সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে প্রযোক্তব্য।

কৃষ্ণভক্ত বলিতে পারেন যে, ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সত্যতত্ত্ব কোথাও কথিত হইয়াছে, এমন যদি দেখাইতে পার, তবে আমরা কৃষ্ণের মত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। যদি তাহা না পার, তবে ইহাই আদর্শ মনুষ্যোচিত বাক্য বলিয়া স্বীকার কর।

উপসংহারে আমার ইহাও বক্তব্য যে, "যদ্দ্বারা লোকরক্ষা বা লোকহিত সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম, আমরা যদি ভক্তি সহকারে এই কৃষ্ণোক্তি হিন্দুধর্ম্মের মূলস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুজাতির উন্নতির আর বিলম্ব থাকে না। তাহা হইলে, যে উপধর্ম্মের ভস্মরাশি মধ্যে, পবিত্র এবং জগতে অতুল্য হিন্দুধর্ম্ম প্রোথিত হইয়া আছে, তাহা অনল্পকালে কোথায় উড়িয়া যায়। তাহা হইলে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কুক্রিয়া, অনর্থক সামর্থ্যব্যয়, ও নিষ্ফল কালাতিপাত, দেশ হইতে দূরীভূত হইয়া সৎকর্ম্ম ও সদনুষ্ঠানে হিন্দুসমাজ প্রভাবিত হইয়া উঠে। তাহা হইলে ভণ্ডামি, জাতি মারামারি, পরস্পরের বিদ্বেষ ও অনিষ্টচেষ্টা আর থাকে না। আমরা মহতী কৃষ্ণকথিতা নীতি পরিত্যাগ করিয়া, শূলপাণি ও রঘুনন্দনের পদানত—লোকহিত পরিত্যাগ

করিয়া তিথিতত্ত্ব মলমাসতত্ত্ব প্রভৃতি আটাইশ তত্ত্বের কচকচিতে মন্ত্রমুগ্ধ। আমাদের জাতীয় উন্নতি হইবে ত কোন্ জাতি অধঃপাতে যাইবে? যদি এখনও আমাদের ভাগ্যোদয় হয়, তবে আমরা সমস্ত হিন্দু একত্রিত হইয়া, নমো ভগবতে বাসুদেবায় বলিয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রণাম করিয়া, তদুপদিষ্ট এই লোকহিতাত্মক ধর্ম্ম গ্রহণ করিব।* তাহা হইলে নিশ্চিতই আমরা জাতীয় উন্নতি সাধিত করিতে পারিব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—কর্ণবধ

অর্জ্জুন কৃষ্ণের কথা বুঝিলেন, কিন্তু অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল। অতএব যাহাতে দুই দিক্ রক্ষা হয়, কৃষ্ণকে তাহার উপায় অবধারণ করিতে বলিলেন।

কৃষ্ণ বলিলেন, অপমান মাননীয় ব্যক্তির মৃত্যুস্বরূপ; তুমি যুধিষ্ঠিরকে অপমান-সূচক একটা কথা বল, তাহা হইলেই, তাঁহাকে বধ করার তুল্য হইবে। অর্জ্জুন তখন যুধিষ্ঠিরকে অপমানসূচক বাক্যে ভর্ৎসিত করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণকে আবার এক বিপদে ফেলিলেন। বলিলেন, আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমানিত করিয়া গুরুতর পাপ করিয়াছি, অতএব আত্মহত্যা করিব। এই বলিয়া আবার অসি নিষ্কোষিত করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহারও মৃত্যুর সোজা ব্যবস্থা করিলেন। বলিলেন, আত্মশ্লাঘা সজ্জনের মৃত্যু-স্বরূপ। কথাটা কিছুমাত্র অন্যায় নহে। অর্জ্জুন তখন অনেক আত্মশ্লাঘা করিলেন। তখন সব গোল মিটিয়া গেল।

কৃষ্ণ, অর্জ্জুনের সারথি, কিন্তু যেমন অর্জ্জুনের অশ্বের যন্তা, তেমনি এখন স্বয়ং অর্জ্জুনেরও নিয়ন্তা। কখনও অর্জ্জুনের আজ্ঞায় কৃষ্ণ রথ চালান, কখনও কৃষ্ণের আজ্ঞায় অর্জ্জুন চলেন। এখন কৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে কর্ণবধে নিযুক্ত করিলেন।

এই কর্ণবধ মহাভারতের একটি প্রধান ঘটনা। বহুকাল হইতে ইহার সূত্রপাত হইয়া আসিতেছে। কর্ণই অর্জ্জুনের প্রতিযোদ্ধা। ভীমার্জ্জুন নকুল সহদেব চারি জনে যুধিষ্ঠিরের জন্য দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন, কর্ণ একাই দুর্য্যোধনের জন্য দিগ্বিজয় করিয়াছিল। অর্জ্জুন দ্রোণের শিষ্য, কর্ণ দ্রোণগুরু পরশুরামের শিষ্য। অর্জ্জুনের যেমন গাণ্ডীব ধনু ছিল, কর্ণের তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিজয় ধনু ছিল। অর্জ্জুনের কৃষ্ণ সারথি, মহাবীর শল্য কর্ণের সারথি, উভয়ে অনেক দিব্যাস্ত্রে শিক্ষিত। উভয়েই পরস্পর বধের জন্য বহুদিন হইতে প্রতিজ্ঞাত। অর্জ্জুন ভীষ্মদ্রোণবধে কিছুমাত্র যত্নশীল ছিলেন না, কর্ণবধে তাঁহার দৃঢ় যত্ন; কুন্তী যখন কর্ণকে কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত অবগত করিয়া, তাঁহার নিকট আর পাঁচটি পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন, তখন কর্ণ যুধিষ্ঠির ভীম নকুল সহদেবের প্রাণ ভিক্ষা মাতাকে দিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই অর্জ্জুনের প্রাণ ভিক্ষা দিলেন না। তাঁহাকে বধ করিবেন, না হয় তাঁহার হস্তে নিহত হইবেন, ইহা নিশ্চিত জানাইলেন।

সেই মহাযুদ্ধে অদ্য অর্জ্জুনকে কৃষ্ণ লইয়া যাইলেন। ইহারই জন্য কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুধিষ্ঠিরের শিবিরে লইয়া আসিয়াছিলেন। ভীম অর্জ্জুনকে যুধিষ্ঠিরের সন্ধানে

* বেন্থামের কথা ইংলণ্ড শুনিল—কৃষ্ণের কথা ভারতবর্ষ শুনিবে না?

যাইতে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রণ শেষ না করিয়া অর্জ্জুনের আসিতে ইচ্ছা ছিল না। কৃষ্ণ জিদ করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত যে, কর্ণ ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হউন, অর্জ্জুন ততক্ষণ বিশ্রাম লাভ করিয়া পুনস্তেজস্বী হউন। এক্ষণে যুদ্ধে লইয়া যাইবার সময়ে আরও অর্জ্জুনের তেজোবৃদ্ধি জন্য অর্জ্জুনের বীরত্বের প্রশংসা করিলেন, এবং তাঁহার পূর্ব্বকৃত অতি দুর্দ্ধর্ষ কার্য্য সকল স্মরণ করাইয়া দিলেন। দ্রৌপদীর অপমান, অভিমন্যুর অন্যায়যুদ্ধে হত্যা প্রভৃতি কর্ণকৃত পাণ্ডবপীড়ন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ করাইয়া দিলেন; এই বক্তৃতার মধ্য হইতে কোন অংশ উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল ইহাই বক্তব্য, কৃষ্ণ বলিতেছেন, "পূর্ব্বে বিষ্ণু যেমন দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন," "পূর্ব্বে দানবগণ বিষ্ণু কর্ত্তৃক নিহত হইলে" ইত্যাদি বাক্যে বুঝিতে পারি যে, কৃষ্ণ এখনও আপনাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরিচয় দেন না। দেবত্বে কোন অধিকার প্রকাশ করেন না, ইহা প্রথম স্তরের একটি লক্ষণ। দ্বিতীয় স্তরে, অন্য ভাব।

পরে কর্ণার্জ্জুনের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহার বর্ণনায় আমার প্রয়োজন নাই। কথিত হইয়াছে যে, কর্ণের সর্পবাণ হইতে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন উহার নিবারণ করিতে পারেন নাই, অতএব কৃষ্ণ পদাঘাতে অর্জ্জুনের রথ ভূমিতে কিঞ্চিৎ বসাইয়া দিলেন, অশ্বগণ জানু পাতিয়া পড়িয়া গেল। অর্জ্জুনের মস্তক বাঁচিয়া গেল; কেবল কিরীট কাটা পড়িল। অর্জ্জুন নিজে মস্তক অবনত করিলেও সেই ফল হইত। কথাটা সমালোচনার যোগ্য নহে। তবে কৃষ্ণের সারথ্যের প্রশংসা মহাভারতে পুনঃ পুনঃ দেখা যায়।

যুদ্ধের শেষ ভাগে কর্ণের রথচক্র মাটিতে বসিয়া গেল। কর্ণ তাহা তুলিবার জন্য মাটিতে নামিলেন। যতক্ষণ রথচক্রের উদ্ধার না করেন, ততক্ষণ জন্য অর্জ্জুনের কাছে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অর্জ্জুনও ক্ষমা করিয়াছিলেন দেখা যাইতেছে, কেন না, কর্ণ তাহার পর আবার রথে উঠিয়া পূর্ব্ববৎ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কর্ণের দুর্ভাগ্য যে, ক্ষমা প্রার্থনাকালে তিনি অর্জ্জুনকে এমন কথা বলিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মতঃ তিনি ঐ সময়ের জন্য কর্ণকে ক্ষমা করিতে বাধ্য; কৃষ্ণ অধর্ম্মের শাস্তা। তিনি কর্ণকে তখন বলিলেন,

"হে সূতপুত্র! তুমি ভাগ্যক্রমে এক্ষণে ধর্ম্ম স্মরণ করিতেছ। নীচাশয়েরা দুঃখে নিমগ্ন হইয়া প্রায়ই দৈবকে নিন্দা করিয়া থাকে; আপনাদিগের দুষ্কর্ম্মের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করে না। দেখ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি তোমার মতানুসারে একবস্ত্রা দ্রৌপদীরে যে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন দুষ্ট শকুনি দুরভিসন্ধিপরতন্ত্র হইয়া তোমার অনুমোদনে অক্ষক্রীড়ায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন রাজা দুর্য্যোধন তোমার মতানুযায়ী হইয়া ভীমসেনকে বিষান্ন ভোজন করাইয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি বারণাবত নগরে জতুগৃহমধ্যে প্রসুপ্ত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার নিমিত্ত অগ্নিপ্রদান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি সভামধ্যে দুঃশাসনের বশীভূতা রজস্বলা দ্রৌপদীরে, হে কৃষ্ণে!

পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে, এক্ষণে তুমি অন্য পতিরে বরণ কর, এই কথা বলিয়া উপহাস করিয়াছিলে এবং অনার্য্য ব্যক্তিরা তাঁহারে নিরপরাধে ক্লেশ প্রদান করিলে উপেক্ষা করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি রাজ্যলোভে শকুনিকে আশ্রয়পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে দ্যূতক্রীড়া করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি মহারথগণ-সমবেত হইয়া বালক অভিমন্যুরে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? হে কর্ণ! তুমি যখন তত্তৎকালে অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছ, তখন আর এ সময় ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া তালুদেশ শুষ্ক করিলে কি হইবে? তুমি যে এখন ধর্ম্ম-পরায়ণ হইলেও জীবন সত্ত্বে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে, ইহা কদাচ মনে করিও না। পূর্ব্বে নিষধদেশাধিপতি নল যেমন পুষ্কর দ্বারা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পুনরায় রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণও ভুজবলে সোমদিগের সহিত শত্রু-গণকে বিনাশ করতঃ রাজ্যলাভ করিবেন। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ অবশ্যই ধর্ম্মসংরক্ষিত পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত হইবে।”

কৃষ্ণের কথা শুনিয়া কর্ণ লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন। তার পর পূর্ব্বমত যুদ্ধ করিয়া, অর্জ্জুনবাণে নিহত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—দুর্য্যোধনবধ

কর্ণ মরিলে, দুর্য্যোধন শল্যকে সেনাপতি করিলেন। পূর্ব্বদিনের যুদ্ধে যুধিষ্ঠির অপ্রিয় হইয়া কাপুরুষতা-কলঙ্ক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এ কলঙ্ক অপনীত করা নিতান্ত আবশ্যক। সর্ব্বদর্শী কৃষ্ণ আজিকার প্রধান যুদ্ধে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। তিনিও সাহস করিয়া শল্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বধ করিলেন।

সেই দিন সমস্ত কৌরবসৈন্য পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইল। দুই জন ব্রাহ্মণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা, যদুবংশীয় কৃতবর্ম্মা এবং স্বয়ং দুর্য্যোধন, এই চারি জন মাত্র জীবিত রহিলেন। দুর্য্যোধন পলাইয়া গিয়া দ্বৈপায়ন হ্রদে ডুবিয়া রহিল। পাণ্ডবগণ খুঁজিয়া সেখানে তাহাকে ধরিল। কিন্তু বিনা যুদ্ধে তাহাকে মারিল না।

যুধিষ্ঠিরের চিরকাল স্থূলবুদ্ধি, সেই স্থূলবুদ্ধির জন্যই পাণ্ডবদিগের এত কষ্ট। তিনি এই সময়ে সেই অপূর্ব্ব বুদ্ধির বিকাশ করিলেন। তিনি দুর্য্যোধনকে বলিলেন, “তুমি অভীষ্ট আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক আমাদের মধ্যে যে কোন বীরের সহিত সমাগত হইয়া যুদ্ধ কর। আমরা সকলে রণস্থলে অবস্থানপূর্ব্বক যুদ্ধব্যাপার নিরীক্ষণ করিব। আমি কহিতেছি যে, তুমি আমাদের মধ্যে একজনকে বিনাশ করিতে পারিলেই সমুদায় রাজ্য তোমার হইবে।” দুর্য্যোধন বলিলেন, আমি গদাযুদ্ধ করিব। কৃষ্ণ জানিতেন, গদাযুদ্ধে ভীম ব্যতীত কোন পাণ্ডবই দুর্য্যোধনের সমকক্ষ নহে। দুর্য্যোধন অন্য কোন পাণ্ডবকে যুদ্ধে আহ্বান করিলে, পাণ্ডবদিগের আবার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। কেহ কিছু বলিলেন না, সকলেই বলদৃপ্ত; যুধিষ্ঠিরকে ভর্ৎসনার ভার কৃষ্ণই গ্রহণ করিলেন। সেই কার্য্য তিনি বিশিষ্ট প্রকারে নির্ব্বাহ করিলেন।

দুর্য্যোধনও অতিশয় বলদৃপ্ত, সেই দর্পে যুধিষ্ঠিরের বুদ্ধির দোষ সংশোধন হইল। দুর্য্যোধন বলিলেন, যাহার ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। সকলকেই বধ করিব। তখন ভীমই গদা লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন।

এখানে আবার মহাভারতের সুর বদল। আঠার দিন যুদ্ধ হইয়াছে, ভীম দুর্য্যোধনেই সর্ব্বদাই যুদ্ধ হইয়াছে, গদাযুদ্ধও অনেক বার হইয়াছে, এবং বরাবরই দুর্য্যোধনই গদাযুদ্ধে ভীমের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আজ সুর উঠিল যে, ভীম গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনের তুল্য নহে। আজ ভীম পরাভূতপ্রায়। আসল কথাটা ভীমের সেই দারুণ প্রতিজ্ঞা। সভাপর্ব্বে যখন দ্যূতক্রীড়ার পর, দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে জিতিয়া লইল, তখন দুঃশাসন একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করিয়া সভামধ্যে আনিয়া বিবস্ত্রা করিতেছিলেন, তখন ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি দুঃশাসনকে বধ করিয়া তাহার বুক চিরিয়া রক্ত খাইব। ভীম মহাশ্মশানতুল্য বিকট রণস্থলে দুঃশাসনকে নিহত করিয়া রাক্ষসের মত তাহার তপ্ত শোণিত পান করিয়া, সকলকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, আমি অমৃত পান করিলাম। দুর্য্যোধন সেই সভামধ্যে "হাসিতে হাসিতে দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করতঃ বসন উত্তোলনপূর্ব্বক সর্ব্বলক্ষণ-সম্পন্ন বজ্রতুল্য দৃঢ় কদলীদণ্ড ও করিশুণ্ডের ন্যায় স্বীয় মধ্য উরু তাঁহাকে দেখাইলেন।" তখন ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি মহাযুদ্ধে গদাঘাতে ঐ উরু যদি ভগ্ন না করি, তবে আমি যেন নরকে যাই।

আজি সেই উরু গদাঘাতে ভাঙ্গিতে হইবে। কিন্তু একটা তাহার বিশেষ প্রতি-বন্ধক—গদাযুদ্ধের নিয়ম এই যে, নাভির অধঃ গদাঘাত করিতে নাই—তাহা হইলে অন্যায় যুদ্ধ করা হয়। ন্যায়যুদ্ধে ভীম দুর্য্যোধনকে মারিতে পারিলেও, প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইবে না।

যে জ্যেষ্ঠতাতপুত্রের হৃদয়রুধির পান করিয়া নৃত্য করিয়াছে, সে রাক্ষসের কাছে মাথায় গদাঘাত ও উরুতে গদাঘাতে তফাৎ কি? যে বৃকোদর দ্রোণভয়ে মিথ্যাপ্রবঞ্চনার সময়ে প্রধান উদ্যোগী বলিয়া চিত্রিত হইয়াছেন, তিনি উরুতে গদাঘাতের জন্য অন্যের উপদেশসাপেক্ষ হইতে পারেন না। কিন্তু সেরূপ কিছু হইল না। ভীম উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেলেন। বলিয়াছি, দ্বিতীয় স্তরের কবি (এখানে তাঁহারই হাত দেখা যায়) চরিত্রের সুসঙ্গতি রক্ষণে সম্পূর্ণ অমনোযোগী। তিনি এখানে ভীমের চরিত্রের কিছুমাত্র সুসঙ্গতি রাখিলেন না; অর্জ্জুনেরও নহে। ভীম ভুলিয়া গেলেন যে, উরুভঙ্গ করিতে হইবে; আর যে পরমধার্ম্মিক অর্জ্জুন, দ্রোণবধের সময়, তাঁহার অস্ত্রগুরু, ধর্ম্মের আচার্য্য, সখা, এবং পরমশ্রদ্ধার পাত্র কৃষ্ণের কথাতেও মিথ্যা বলিতে স্বীকৃত হয়েন নাই, তিনি এক্ষণে স্বেচ্ছাক্রমে অন্যায়যুদ্ধে ভীমকে প্রবর্ত্তিত করিলেন। কিন্তু কথাটা কৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন না হইলে, কবির উদ্দেশ্য সফল হয় না। অতএব কথাটা এই প্রকারে উঠিল—

অর্জ্জুন ভীম-দুর্য্যোধনের যুদ্ধ দেখিয়া কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ইহাদিগের মধ্যে গদাযুদ্ধে কে শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণ বলিলেন, ভীমের বল বেশী, কিন্তু দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধে যত্ন ও নৈপুণ্য অধিক। বিশেষ যাহারা প্রথমতঃ প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া পুনরায়

সময়ে শত্রুগণের সম্মুখীন হয়, তাহাদিগকে জীবিতনিরপেক্ষ ও একাগ্রচিত্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। জীবিতাশানিরপেক্ষ হইয়া সাহস সহকারে যুদ্ধ করিলে, সংগ্রামে সে বীরকে কেহই পরাভব করিতে পারে না। অতএব যদি ভীম দুর্য্যোধনকে অন্যায়যুদ্ধে সংহার না করেন, তবে দুর্য্যোধন জয়ী হইয়া যুধিষ্ঠিরের কথামত পুনর্ব্বার রাজ্যলাভ করিবে।

কৃষ্ণের এইরূপ কথা শুনিয়া অর্জ্জুন "স্বীয় বাম জানু আঘাত করতঃ ভীমকে সঙ্কেত করিলেন।" তার পর ভীম দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিয়া তাহাকে নিপাতিত করিলেন।

যেমন ন্যায় ঈশ্বরপ্রেরিত, অন্যায়ও তেমনি ঈশ্বরপ্রেরিত। ইহাই এখানে দ্বিতীয় স্তরের কবির উদ্দেশ্য।

যুদ্ধকালে দর্শকমধ্যে, বলরাম উপস্থিত ছিলেন। ভীম ও দুর্য্যোধন উভয়েই গদাযুদ্ধে তাঁহার শিষ্য। কিন্তু দুর্য্যোধনই প্রিয়তর। রেবতীবল্লভ সর্ব্বদাই দুর্য্যোধনের পক্ষপাতী। এক্ষণে দুর্য্যোধন, ভীম কর্তৃক অন্যায়যুদ্ধে নিপাতিত দেখিয়া, অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, লাঙ্গল উঠাইয়া তিনি ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। বলা বাহুল্য যে, বলরামের স্কন্ধে সর্ব্বদাই লাঙ্গল, এই জন্য তাঁহার নাম হলধর। কেন তাঁহার এ বিড়ম্বনা, যদি কেহ এ কথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাহার কিছু উত্তর দিতে পারিব না। যাই হউক, কৃষ্ণ বলরামকে অনুনয় বিনয় করিয়া কোনরূপে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। বলরাম কৃষ্ণের কথায় সন্তুষ্ট হইলেন না। রাগ করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

তার পর একটা বীভৎস ব্যাপার উপস্থিত হইল। ভীম নিপাতিত দুর্য্যোধনের মাথায় পদাঘাত করিতেছিলেন। যুধিষ্ঠির নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভীম তাহা শুনেন নাই। কৃষ্ণ তাঁহাকে এই কদর্য্য আচরণে নিযুক্ত দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণ না করার জন্য যুধিষ্ঠিরকে তিরস্কার করিলেন। এদিকে, পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ দুর্য্যোধনের নিপাত জন্য ভীমের বিস্তর প্রশংসা ও দুর্য্যোধনের প্রতি কটূক্তি করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন,

"মৃতকল্প শত্রুর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।"

কৃষ্ণের এই সকল কথা কৃষ্ণের ন্যায় আদর্শ পুরুষের উচিত। কিন্তু ইহার পর যাহা গ্রন্থমধ্যে পাই, তাহা অতিশয় আশ্চর্য্য ব্যাপার।

প্রথম আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, কৃষ্ণ অন্যকে বলিলেন, "মৃতকল্প শত্রুর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।" কিন্তু ইহা বলিয়াই নিজে দুর্য্যোধনকে কটূক্তি করিতে লাগিলেন।

দুর্য্যোধনের উত্তর দ্বিতীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার। দুর্য্যোধন তখনও মরেন নাই, ভগ্নোরু হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে কৃষ্ণের কটূক্তি শুনিয়া কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন,

"হে কংসদাসতনয়! ধনঞ্জয় তোমার বাক্যানুসারে বৃকোদরকে আমার উরু ভগ্ন করিতে সঙ্কেত করাতে ভীমসেন অধর্ম্মযুদ্ধে আমারে নিপাতিত করিয়াছে, ইহাতে তুমি লজ্জিত হইতেছ না। তোমার অন্যায় উপায় দ্বারাই প্রতিদিন ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত

সহস্র নরপতি নিহত হইয়াছেন। (১) তুমি শিখণ্ডীরে অগ্রসর করিয়া পিতামহকে নিপাতিত করিয়াছ। (২) অশ্বত্থামা নামে গজ নিহত হইলে তুমি কৌশলেই আচার্য্যকে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়াছিলে এবং সেই অবসরে দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমার সমক্ষে আচার্য্যকে নিহত করিতে উদ্যত হইলে তাহার নিষেধ কর নাই। (৩) কর্ণ অর্জ্জুনের বিনাশার্থ বহুদিন অতি যত্নসহকারে যে শক্তি রাখিয়াছিলেন, তুমি কৌশলক্রমে সেই শক্তি ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করাইয়া, ব্যর্থ করাইয়াছ। (৪) সাত্যকি তোমারই প্রবর্ত্তনাপরতন্ত্র হইয়া ছিন্নহস্ত প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবারে নিহত করিয়াছিলেন। (৫) মহাবীর কর্ণ অর্জ্জুনবধে সমুদ্যত হইলে, তুমি কৌশলক্রমে তাহার সর্পবাণ ব্যর্থ করিয়াছ। (৬) এবং পরিশেষে সূতপুত্রের রথচক্র ভূগর্ভে প্রবিষ্ট ও তিনি চক্রোদ্ধারের নিমিত্ত ব্যস্তসমস্ত হইলে তুমি কৌশলক্রমে অর্জ্জুন দ্বারা তাঁহার বিনাশ সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছ। (৭) অতএব তোমার তুল্য পাপাত্মা, নির্দ্দয় ও নির্লজ্জ আর কে আছে? দেখ, তোমরা যদি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও আমার সহিত ন্যায়যুদ্ধ করিতে, তাহা হইলে কদাপি জয়লাভে সমর্থ হইতে না। তোমার অনার্য্য উপায় প্রভাবেই আমরা স্বধর্ম্মানুগত পার্থিবগণের সহিত নিহত হইলাম।"

এই বাক্যপরম্পরা সম্বন্ধে আমি যে কয়েকটি ফুটনোট দিলাম, পাঠকের তৎপ্রতি মনোযোগ করিতে হইবে। বাক্যগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা। এরূপ সম্পূর্ণ মিথ্যা তিরস্কার মহাভারতে আর কোথাও নাই। তাহাই বলিতেছিলাম যে, দুর্য্যোধনের উত্তর আশ্চর্য্য।

তৃতীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, কৃষ্ণ ইহার উত্তর করিলেন। পূর্ব্বে দেখিয়াছি, তিনি গম্ভীরপ্রকৃতি ও ক্ষমাশীল, কাহারও কৃত তিরস্কারের উত্তর করেন না। সভামধ্যে শিশুপালকৃত অসহ্য নিন্দাবাদ বিনাবাক্যব্যয়ে সহ্য করিয়াছিলেন। বিশেষ, দুর্য্যোধন এখন মুমূর্ষু, তাহার কথার উত্তরের কোন প্রয়োজনই নাই; তাহাকে কোন প্রকারে কটূক্তি করা কৃষ্ণ নিজেই নিন্দনীয় বিবেচনা করেন। তথাপি কৃষ্ণ দুর্যোধনকৃত তিরস্কারের উত্তরও করিলেন, এবং কটূক্তিও করিলেন। উত্তরে দুর্য্যোধনকৃত পাপাচার

১। এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ মহাভারতে কোথাও নাই। কোন স্তরেই না।

২। কৃষ্ণ ইহার বিন্দুবিসর্গেও ছিলেন না। মহাভারতে কোথাও এমন কথা নাই।

৩। শত্রুকে বধ করিতে কেন নিষেধ করিবেন?

৪। কৃষ্ণ তজ্জন্য কোন যত্ন বা কৌশল করেন নাই। মহাভারতে ইহাই আছে যে, কৌরবগণের অনুরোধানুসারেই কর্ণ ঘটোৎকচের প্রতি শক্তি প্রয়োগ করিলেন।

৫। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এমন কথা মহাভারতে কোথাও নাই। সাত্যকি ভূরিশ্রবাকে নিহত করিয়াছিলেন বটে। কৃষ্ণ বরং ছিন্নবাহু ভূরিশ্রবাকে নিহত করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

৬। সে কৌশল, নিজপদবলে রথচক্র ভূপ্রোথিত করা। এ উপায় অতি ন্যায্য, এবং সারথির ধর্ম্ম, রথীর রক্ষা।

৭। কি কৌশল? মহাভারতে এ সম্বন্ধে কৃষ্ণকৃত কোন কৌশলের কথা নাই। যুদ্ধে অর্জ্জুন কর্ণকে নিহত করিয়াছিলেন, ইহাই আছে।

সকল বিবৃত করিয়া উপসংহারে বলিলেন, "বিস্তর অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে তাহার ফলভোগ কর।"

উত্তরে দুর্য্যোধন বলিলেন, "আমি অধ্যয়ন, বিধিপূর্ব্বক দান, সসাগরা বসুন্ধরার শাসন, বিপক্ষগণের মস্তকোপরি অবস্থান, অন্য ভূপালের দুর্লভ দেবভোগ্য সুখসম্ভোগ, ও অত্যুৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছি, পরিশেষে ধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়গণের প্রার্থনীয় সমরমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আমার তুল্য সৌভাগ্যশালী আর কে হইবে? এক্ষণে আমি ভ্রাতৃবর্গ বন্ধুবান্ধবগণের সহিত স্বর্গে চলিলাম, তোমরা শোকাকুলিতচিত্তে মৃতকল্প হইয়া এই পৃথিবীতে অবস্থান কর।"

এই উত্তর আশ্চর্য্য নহে। যে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া হারিয়াছে, সে যদি দুর্য্যোধনের মত দাম্ভিক হয়, তবে সে যে জয়ী শত্রুকে বলিবে আমিই জিতিয়াছি, তোমরা হারিয়াছ, ইহা আশ্চর্য্য নহে। দুর্য্যোধন এইরূপ কথা হ্রদে থাকিয়াও বলিয়াছিল। যুদ্ধে মরিলে যে স্বর্গলাভ হয়, সকল ক্ষত্রিয়ই বলিত। উত্তর আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু উত্তরের ফল সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য। এই কথা বলিবা মাত্র "আকাশ হইতে সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্বগণ সুমধুর বাদিত্রবাদন ও অপ্সরা সকল রাজা দুর্য্যোধনের যশোগান করিতে আরম্ভ করিলেন। সিদ্ধগণ তাঁহারে সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। সুগন্ধসম্পন্ন সুখস্পর্শ সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। দিঙ্‌মণ্ডল ও নভোমণ্ডল সুনির্ম্মল হইল। তখন বাসুদেবপ্রমুখ পাণ্ডবগণ সেই দুর্য্যোধনের সম্মানসূচক অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইলেন। এবং তাঁহারা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ ভূরিশ্রবারে অধর্ম্মযুদ্ধে বিনাশ করিয়াছেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন।"

যিনি মহাভারতে সর্ব্ব পাপাত্মার অধম পাপাত্মা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহার এরূপ অদ্ভুত সম্মান ও সাধুবাদ, আর যাঁহারা সকল ধর্ম্মাত্মার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহাদের এই অধর্ম্মাচরণ জন্য লজ্জা, মহাভারতে আশ্চর্য্য। সিদ্ধগণ, অপ্সরোগণ, দেবগণ মিলিয়া প্রকটিত করিতেছেন, দুরাত্মা দুর্য্যোধন ধর্ম্মাত্মা, আর কৃষ্ণপাণ্ডব মহাপাপিষ্ঠ। ইহা মহাভারতে আশ্চর্য্য, কেন না, ইহা সমস্ত মহাভারতের বিরোধী। সিদ্ধগণাদি দূরে থাক, কোন মনুষ্য দ্বারা এরূপ সাধুবাদ মহাভারতে আশ্চর্য্য বলিয়া বিবেচ্য, কেন না, মহাভারতের উদ্দেশ্যই দুর্য্যোধনের অধর্ম্ম ও কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের ধর্ম্ম কীর্ত্তন। রসের উপর রসের কথা, তাঁহারা দুর্য্যোধন-মুখে শুনিলেন যে, তাঁহারা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ভূরিশ্রবাকে অধর্ম্মযুদ্ধে বধ করিয়াছেন; অমনি শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এত কাল তাহার কিছু জানিতেন না, এখন পরম শত্রুর মুখে জানিয়া, ভদ্রলোকের মত, শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, ভীষ্ম বা কর্ণকে তাঁহারা কোন প্রকার অধর্ম্ম করিয়া মারেন নাই, কিন্তু পরম শত্রু দুর্য্যোধন বলিতেছে, তোমরা অধর্ম্ম করিয়া মারিয়াছ, কাজেই তাহাতে অবশ্য বিশ্বাস করিলেন; অমনি শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে, ভূরিশ্রবাকে তাঁহারা কেহই বধ করেন নাই—সাত্যকি করিয়াছিলেন, সাত্যকিকে বরং কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ভীম নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি যখন পরমশত্রু দুর্য্যোধন বলিতেছে, তোমরাই মারিয়াছ,

আর তোমরাই অধর্ম্মাচরণ করিয়াছ, তখন গোবেচারা পাণ্ডবেরা অবশ্য বিশ্বাস করিতে বাধ্য যে, তাঁহারাই মারিয়াছেন, এবং তাঁহারাই অধর্ম্ম করিয়াছেন; কাজেই তাঁহারা ভদ্রলোকের মত কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। এ ছাই ভস্ম মাথামুণ্ডের সমালোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। তবে এ হতভাগ্য দেশের লোকের বিশ্বাস যে, যাহা কিছু পুঁথির ভিতর পাওয়া যায়, তাহাই ঋষিবাক্য, অভ্রান্ত, শিরোধার্য্য। কাজেই এ বিড়ম্বনা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

আশ্চর্য্য কথাগুলা এখনও শেষ হয় নাই। কৃষ্ণ স্বকৃত অধর্ম্মাচরণ জন্য লজ্জিত হইলেন, আবার সেই সময়ে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে পাণ্ডবদিগের কাছে সেই পাপাচরণ জন্য আত্মশ্লাঘা করিতে লাগিলেন।*

বলা বাহুল্য যে, দুর্য্যোধনকৃত তিরস্কারাদি বৃত্তান্ত সমস্তই অমৌলিক। দ্রোণবধাদি যে অমৌলিক, তাহা আমি পূর্ব্বে প্রমাণীকৃত করিয়াছি। যাহা অমৌলিক, তাহার প্রসঙ্গে যে অংশে আছে, তাহাও অবশ্য অমৌলিক। কেবল এতটুকু বলা আবশ্যক যে, এখানে দ্বিতীয় স্তরের কবিরও লেখনীচিহ্ন দেখা যায় না। এ তৃতীয় স্তরের বলিয়া বোধ করা যায়। দ্বিতীয় স্তরের কবি কৃষ্ণভক্ত, এই লেখক কৃষ্ণদ্বেষক। শৈবাদি অবৈষ্ণব বা বৈষ্ণবদ্বেষিগণও স্থানে স্থানে মহাভারতের কলেবর বাড়াইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাঁহারা কেহ এখানে গ্রন্থকার, ইহাই সম্ভব। আবার এ কাজ কৃষ্ণভক্তের, ইহাও অসম্ভব নহে। নিন্দাচ্ছলে স্তুতি করা ভারতবর্ষীয় কবিদের একটা বিদ্যার মধ্যে।† এ তাও হইতে পারে।

* যথা, "ভীষ্মপ্রমুখ মহারথগণ ও রাজা দুর্য্যোধন অসাধারণ সমরবিশারদ ছিলেন, তোমরা কদাচ তাঁহাদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতে না। আমি কেবল তোমাদের হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র হইয়া অনেক উপায় উদ্ভাবন ও মায়াবল প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছি। আমি যদি ঐরূপ কুটিল ব্যবহার না করিতাম, তাহা হইলে তোমাদিগের জয়লাভ রাজ্যলাভ ও অর্থলাভ কখনই হইত না। দেখ ভীষ্ম প্রভৃতি সেই চারি মহাত্মা ভূমণ্ডলে অতিরথ বলিয়া প্রথিত আছেন। লোকপালগণ সমবেত হইয়াও তাঁহাদিগকে ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত করিতে সমর্থ হইতেন না। আর দেখ, সমরে অপরিশ্রান্ত গদাধারী এই দুর্য্যোধনকে দণ্ডধারী কৃতান্তও ধর্ম্মযুদ্ধে বিনষ্ট করিতে পারেন না; অতএব ভীম যে উহারে অসৎ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক নিপাতিত করিয়াছেন, সে কথা আর আন্দোলন করিবার আবশ্যক নাই। এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগকে কূট যুদ্ধে বিনাশ করিবে। মহাত্মা সুরগণ কূট যুদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াই অসুরগণকে নিহত করিয়াছিলেন; তাঁহাদের অনুকরণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য।" এমন নির্লজ্জ অধর্ম্ম আর কোথাও শুনা যায় না।

† একটা উদাহরণ না দিলে, অনেক পাঠক বুঝিতে পারিবেন না; স্মর ভস্মীভূত হওয়ার পর বিলাপকালে রতির মুখে ভারতচন্দ্র বলিতেছেন,

"একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে
আগুনের কপালে আগুন।"

সে যাই হউক, ইহার পরেই আবার দেখিতে পাই যে, দুর্য্যোধন অশ্বত্থামার নিকট বলিতেছেন, "আমি অমিততেজা বাসুদেবের মাহাত্ম্য বিলক্ষণ অবগত আছি। তিনি আমারে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট করেন নাই। অতএব আমার জন্য শোক করিবার প্রয়োজন কি?"

এমন বারোইয়ারি কাণ্ডের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা নয়?

নবম পরিচ্ছেদ—যুদ্ধশেষ

অন্যায় যুদ্ধে দুর্য্যোধন হত হইয়াছে বলিয়া যুধিষ্ঠিরের ভয় হইল যে, তপঃপ্রভাব-শালিনী গান্ধারী শুনিয়া পাণ্ডবদিগকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন। এ জন্য তিনি কৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন যে, তিনি হস্তিনায় গমন করিয়া ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে শান্ত করিয়া আসুন।

কথাটা প্রথম স্তরের নয়, কেন না, এখানে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলিতেছেন, "তুমি অব্যয়, এবং লোকের সৃষ্টি ও সংহারকর্ত্তা।" ইহার কিছু পূর্ব্বেই অর্জ্জুনের রথ হইতে কৃষ্ণ অবতরণ করায় সে রথ জ্বলিয়া গিয়াছিল। অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা মতে কৃষ্ণ বলিলেন, "ব্রহ্মাস্ত্রপ্রভাবে পূর্ব্বেই এই রথে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছিল। কেবল আমি উহাতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলাম বলিয়া এ কাল পর্য্যন্ত দগ্ধ হয় নাই।" অর্থাৎ আমি দেবতা বা বিষ্ণু। ইহা দ্বিতীয়, বা তৃতীয় স্তর।

কৃষ্ণ হস্তিনায় গিয়া ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে কিছু বুঝাইলেন। উদ্ধৃত করা বা সমালোচনার যোগ্য কোন কথা নাই।

তার পর, দুর্য্যোধন অশ্বত্থামাকে সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। কিন্তু তখন সেনার মধ্যে সেই অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা। এইখানে শল্যপর্ব্ব শেষ।

তাহার পর, সৌপ্তিক পর্ব্ব। সৌপ্তিক পর্ব্ব, অতি ভীষণ ব্যাপারে পরিপূর্ণ। প্রথমাংশে অশ্বত্থামা চোরের মত নিশীথ কালে পাণ্ডবশিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া নিদ্রাভিভূত ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, এবং সমস্ত পাঞ্চালগণকে, সেনা ও সেনাপতিগণকে বধ করিলেন। পঞ্চ পাণ্ডব ও কৃষ্ণ ভিন্ন পাণ্ডবপক্ষে আর কেহ রহিল না।

বস্তুতঃ এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধ। পাঞ্চালেরা নির্ব্বংশ হইলে যুদ্ধ শেষ হইল।

তাহার পরে, সৌপ্তিক পর্ব্বে একটা ঐষীক পর্ব্বাধ্যায় আছে। অশ্বত্থামা এই চোরোচিত কার্য্য করিয়া পাণ্ডবদিগের ভয়ে বনে গিয়া লুক্কায়িত হইলেন। পাণ্ডবেরা পরদিন তাঁহার অন্বেষণে ধাবিত হইলেন। অশ্বত্থামা ধরা পড়িয়া আত্মরক্ষার্থ অতি ভয়ঙ্কর ব্রহ্মশিরা অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। অর্জ্জুনও তন্নিবারণার্থ ব্রহ্মশিরা অস্ত্রের

ইহা আগুনকে গালি বটে, কিন্তু একটু ভাবান্তর করিলেই স্তুতি, যথা—
"হে অগ্নে! তুমি শঙ্কুললাটবিহারী লোকধ্বংসকারী, তোমার শিখা জ্বালাবিশিষ্ট হউক।" পাঠক ভারতচন্দ্রপ্রণীত অন্নদামঙ্গলে দক্ষকৃত শিবনিন্দা দেখিবেন। গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধিভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

প্রতিপ্রয়োগ করিলেন। দুই অস্ত্রের তেজে ব্রহ্মাণ্ডধ্বংসের সম্ভাবনা দেখিয়া ঋষিরা মিটমাট করিয়া দিলেন। অশ্বত্থামার শিরস্থিত সহজমণি কাটিয়া দ্রৌপদীকে উপহার দিলেন। এ দিকে ব্রহ্মশির৷ অস্ত্র পাণ্ডববধূ উত্তরার গর্ভ নষ্ট করিল।

এই সকল অনৈসর্গিক ব্যাপার আমরা ছাড়িয়া দিতে পারি। আমাদের সমালোচনার যোগ্য কৃষ্ণচরিত্র-ঘটিত কোন কথাই সৌপ্তিক পর্ব্বে নাই।

তার পর স্ত্রীপর্ব্ব। স্ত্রীপর্ব্ব আরও ভীষণ। নিহত বীরবর্গের স্ত্রীগণের ইহাতে আর্ত্তনাদ। এমন ভীষণ আর্ত্তনাদ আর কখন শুনা যায় নাই। কিন্তু কৃষ্ণসম্বন্ধীয় দুইটি কথা মাত্র আছে।

১। ধৃতরাষ্ট্র আলিঙ্গনকালে ভীমকে চূর্ণ করিবেন, কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁহার জন্য লৌহভীম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অন্ধ রাজা তাহাই চূর্ণ করিলেন। অনৈসর্গিক বৃত্তান্ত আমাদের পরিহার্য্য। এজন্য এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার নাই।

২। গান্ধারী কৃষ্ণের নিকট অনেক বিলাপ করিয়া, শেষে কৃষ্ণকেই অভিসম্পাত করিলেন। বলিলেন :—

"জনার্দ্দন! যখন কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পরের ক্রোধানলে পরস্পর দগ্ধ হয়, তৎকালে তুমি কি নিমিত্ত তদ্বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে? তোমার বহুসংখ্যক ভৃত্য ও সৈন্য বিদ্যমান আছে; তুমি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, বাক্যবিশারদ ও অসাধারণ বলবীর্য্যশালী, তথাপি তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক কৌরবগণের বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ। অতএব তোমারে অবশ্যই ইহার ফলভোগ করিতে হইবে। আমি পতিশুশ্রূষা দ্বারা যে কিছু তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, সেই নিতান্ত দুর্ল্ভতপঃপ্রভাবে তোমারে অভিশাপ প্রদান করিতেছি, যে, তুমি যেমন কৌরব ও পাণ্ডবগণের জ্ঞাতিবিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ, তেমনি তোমার আপনার জ্ঞাতিবর্গও তোমাকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবে। অতঃপর ষট্‌ত্রিংশৎ* বর্ষ সমুপস্থিত হইলে তুমি অমাত্য, জ্ঞাতি ও পুত্রহীন ও বনচারী হইয়া অতি কুৎসিত উপায় দ্বারা নিহত হইবে। তোমার কুলরমণীগণও ভরতবংশীয় মহিলাগণের ন্যায় পুত্রহীন ও বন্ধুবান্ধবহীন হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিবে।"

কৃষ্ণ, হাসিয়া উত্তর করিলেন, "দেবি! আমা ব্যতিরেকে যদুবংশীয়দিগের বিনাশ করে, এখন আর কেহ নাই। আমি যে যদুবংশ ধ্বংস করিব, তাহা অনেক দিন অবধারণ করিয়া রাখিয়াছি। আমার যাহা অবশ্যকর্ত্তব্য, এক্ষণে আপনি তাহাই কহিলেন। যাদবেরা মনুষ্য বা দেবদানবগণেরও বধ্য নহে। সুতরাং তাঁহারা পরস্পর বিনষ্ট হইবেন।"

এইরূপে দ্বিতীয় স্তরের কবি মৌসল পর্ব্বের পূর্ব্ব সূচনা করিয়া রাখিলেন। মৌসল পর্ব্ব যে দ্বিতীয় স্তরের, তাহারও পূর্ব্বসূচনা আমরাও করিয়া রাখিয়াছি।

* ষট্‌ত্রিংশৎ বলেন কেন?

দশম পরিচ্ছেদ—বিধি সংস্থাপন

এক্ষণে আমরা অতি দুস্তর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বিবরণ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। কৃষ্ণচরিত্র পুনর্ব্বার সুবিমল প্রভাভাসিত হইতে চলিল। কিন্তু শান্তি ও অনুশাসন পর্ব্বে কৃষ্ণ ঈশ্বর বলিয়া স্পষ্টতঃ স্বীকৃত।

যুদ্ধাদির অবশেষে, অগাধবুদ্ধি যুধিষ্ঠির, আবার এক অগাধবুদ্ধির খেলা খেলিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে বলিলেন, এত জ্ঞাতি প্রভৃতি বধ করিয়া আমার মনে কোন সুখ নাই—আমি বনে যাইব, ভিক্ষা করিয়া খাইব। অর্জ্জুন বড় রাগ করিলেন—যুধিষ্ঠিরকে অনেক বুঝাইলেন। তখন অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরে বড় ভারি বাদানুবাদ উপস্থিত হইল। শেষ, ভীম, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও স্বয়ং কৃষ্ণ অনেক বুঝাইলেন। দুর্ব্বলচিত্ত যুধিষ্ঠির কিছুতেই বুঝেন না। ব্যাস, নারদ প্রভৃতি বুঝাইলেন। কিছুতেই না। শেষ কৃষ্ণের কথায় মহাসমারোহের সহিত হস্তিনা প্রবেশ করিলেন।

কৃষ্ণ তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করাইলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের স্তব করিলেন। সে স্তব জগদীশ্বরের। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের স্তব করিয়া নমস্কার করিলেন। কৃষ্ণ বয়ঃকনিষ্ঠ; যুধিষ্ঠির আর কখন তাঁহাকে স্তব বা নমস্কার করেন নাই।

এদিকে কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম, শরশয্যায় শয়ান, তীব্র যন্ত্রণায় কাতর, উত্তরায়ণের প্রতীক্ষায় শরীর রক্ষা করিতেছেন। তিনি ঋষিগণ-পরিবৃত হইয়া, সর্ব্বময়, সর্ব্বাধার, পরমপুরুষ কৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তুতিবাক্যে চঞ্চলচিত্ত হইয়া কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরাদি সঙ্গে লইয়া ভীষ্মকে দর্শন দিতে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে যুধিষ্ঠির উপযাচক হইয়া পরশুরামের উপাখ্যান কৃষ্ণের নিকট শ্রবণ করিলেন।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ অনুমতি করিয়াছিলেন যে, ভীষ্মের নিকট জ্ঞানলাভ কর। ভীষ্ম সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা; তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্ঞান তাঁহার সঙ্গে যাইবে; তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে সেই জ্ঞান জগতে প্রচারিত হয়, ইহা তাঁহার ইচ্ছা। এই জন্য তিনি যুধিষ্ঠিরকে তাহার নিকট জ্ঞানলাভাদিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ভীষ্মকেও যুধিষ্ঠিরাদিকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া অনুগৃহীত করিতে আদেশ করিলেন।

ভীষ্ম স্বীকৃত হইলেন না। বলিলেন, ধর্ম্ম কর্ম্ম সবই তোমা হইতে; তুমিই সব জান; তুমিই যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান কর। আমি আপনি শরখচিত হইয়া মুমূর্ষু ও অত্যন্ত ক্লিষ্ট, আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইতেছে; আমি পারিয়া উঠিব না। তখন কৃষ্ণ বলিলেন, আমার বরে তোমার শরাঘাতনিবন্ধন সমস্ত ক্লেশ বিদূরিত হইবে, তোমার অন্তঃকরণ জ্ঞানালোকে সমুজ্জ্বল হইবে, বুদ্ধি অব্যাতিক্রান্ত থাকিবে; তোমার মন কেবল সত্ত্বগুণাশ্রয় করিবে। তুমি দিব্যচক্ষুঃপ্রভাবে ভূত ভবিষ্যৎ সমস্ত দেখিবে।

কৃষ্ণের কৃপায় সেইরূপই হইল। কিন্তু তথাপি ভীষ্ম আপত্তি করিলেন। কৃষ্ণকে বলিলেন, "তুমি স্বয়ং কেন যুধিষ্ঠিরকে হিতোপদেশ প্রদান করিলে না?"

উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন, সমস্ত হিতাহিত কর্ম্ম,আমা হইতে সম্ভূত। চন্দ্রের শীতাংশু ঘোষণাও যেরূপ, আমার যশোলাভ সেইরূপ। আমার এখন ইচ্ছা, আপনাকে সমধিক যশস্বী করি। আমার সমুদায় বুদ্ধি সেই জন্য আপনাকে অর্পণ করিয়াছি। ইত্যাদি।

তখন ভীষ্ম প্রফুল্লচিত্তে যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মতত্ত্ব শুনাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজধর্ম্ম,

আপদ্ধর্ম্ম এবং মোক্ষধর্ম্ম অতি সবিস্তারে শুনাইলেন। মোক্ষধর্ম্মের পর শান্তিপর্ব্ব সমাপ্ত।

এই শান্তিপর্ব্বে তিন স্তরই দেখা যায়। প্রথম স্তরই ইহার কঙ্কাল, ও তার পর যিনি যেমন ধর্ম্ম বুঝিয়াছেন, তিনিই তাহা শান্তিপর্ব্বভুক্ত করিয়াছেন। ইহার মধ্যে আমাদের সমালোচনার যোগ্য একটা গুরুতর কথা আছে। কেবল ধার্ম্মিককে রাজা করিলেই ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল না। আজ ধার্ম্মিক যুধিষ্ঠির রাজা ধর্ম্মাত্মা; কাল তাঁহার উত্তরাধিকারী পাপাত্মা হইতে পারেন। এই জন্য ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়া, তাহার রক্ষার জন্য ধর্ম্মানুমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করাও চাই। রণজয়, রাজ্য স্থাপনের প্রথম কার্য্য মাত্র; তাহার শাসন জন্য বিধিব্যবস্থাই (Legislation) প্রধান কার্য্য। কৃষ্ণ সেই কার্য্যে ভীষ্মকে নিযুক্ত করিলেন। ভীষ্মকে নিযুক্ত করিলেন তাহার বিশেষ কারণ ছিল; আদর্শ নীতিজ্ঞই তাহা লক্ষিত করিতে পারেন। কৃষ্ণ সেই সকল কারণ নিজেই ভীষ্মকে বুঝাইতেছেন।

"আপনি বয়োবৃদ্ধ এবং শাস্ত্রজ্ঞান এবং শুদ্ধাচারসম্পন্ন। রাজধর্ম্ম ও অপরাপর ধর্ম্ম কিছুই আপনার অবিদিত নাই। জন্মাবধি আপনার কোনও দোষই লক্ষিত হয় নাই, নরপতিগণ আপনারে সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব পিতার ন্যায় আপনি এই ভূপালগণকে নীতি উপদেশ প্রদান করুন। আপনি প্রতিনিয়ত ঋষি ও দেবগণের উপাসনা করিয়াছেন। এক্ষণে এই ভূপতিগণ আপনার নিকট ধর্ম্মবৃত্তান্ত শ্রবণোৎসুক হইয়াছেন। অতএব আপনাকে অবশ্যই বিশেষরূপে সমস্ত ধর্ম্মকীর্ত্তন করিতে হইবে। পণ্ডিতদিগের মতে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা বিদ্বান্ ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য।"

তার পর অনুশাসন পর্ব্ব। এখানেও হিতোপদেশ; যুধিষ্ঠির শ্রোতা, ভীষ্ম বক্তা। কতকগুলা বাজে কথা লইয়া, এই অনুশাসন পর্ব্ব গ্রথিত হইয়াছে। সমুদয়ই বোধ হয় তৃতীয় স্তরের। তন্মধ্যে আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় কিছু নাই।

পরিশেষে ভীষ্ম স্বর্গারোহণ করিলেন। ইহাই কেবল প্রথম স্তরের।

একাদশ পরিচ্ছেদ—কামগীতা

ভীষ্মের স্বর্গারোহণের পর, যুধিষ্ঠির আবার কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। বাহানা লইলেন, বনে যাইব। অনেকে অনেক প্রকার বুঝাইলেন। কিন্তু কৃষ্ণ এবার রোগের প্রকৃত ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। সেরূপ রোগ নির্ণয় করা আর কাহারও সাধ্য নহে। যুধিষ্ঠিরের প্রকৃত রোগ অহঙ্কার। ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিখায় pride শব্দ অহঙ্কার শব্দের প্রতিশব্দ। বস্তুতঃ তাহা নহে। অহঙ্কার ও মাৎসর্য্য পৃথক্ পৃথক্ বস্তু। "আমি এই সকল করিতেছি," "ইহা আমার," "এই আমার সুখ," "ইহা আমার দুঃখ," এইরূপ জ্ঞানই অহঙ্কার। এই যুধিষ্ঠিরের দুঃখের কারণ। আমি এই পাপ করিয়াছি—আমার এই শোক উপস্থিত; আমি লইয়াই সব, অতএব আমি বনে যাইব, ইত্যাদি আত্মাভিমানই যুধিষ্ঠিরের এই কাঁদাকাটির মূলে আছে। সেই মূলে কুঠারাঘাতপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে উদ্ধৃত করা, এই ধর্ম্মবেত্তৃশ্রেষ্ঠের উদ্দেশ্য। এজন্য তিনি পরুষবাক্যে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, "আপনার এখনও শত্রু অবশিষ্ট আছে। আপনার শরীরের অভ্যন্তরে যে

অহঙ্কাররূপ দুর্জ্জয় শত্রু রহিয়াছে, তাহা কি আপনি নিরীক্ষণ করিতেছেন না ?" এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অহঙ্কারকে বিনষ্ট করার সম্বন্ধে একটি রূপক যুধিষ্ঠিরকে শুনাইলেন। তার পর তিনি যুধিষ্ঠিরকে যে অত্যুৎকৃষ্ট জ্ঞানোপদেশ দিলেন, তাহা সবিস্তারে উদ্ধৃত করিতেছি। যে নিষ্কাম ধর্ম্ম আমরা গীতায় পড়ি, তাহা এখানেও আছে। এইরূপ অতি মহৎ ধর্ম্মোপদেশেই কৃষ্ণচরিত্র বিশেষ স্ফূর্ত্তি পায়।

"হে ধর্ম্মরাজ ! ব্যাধি দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। ঐ দুই প্রকার ব্যাধি পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। শরীরে যে ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহারে শারীরিক এবং মনোমধ্যে যে পীড়া উপস্থিত হয়, তাহারে মানসিক ব্যাধি কহে। কফ পিত্ত ও বায়ু এই তিনটি শরীরের গুণ, যখন এই তিনগুণ সমভাবে অবস্থান করে, তখন শরীরকে সুস্থ এবং যখন ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে বৈষম্য উপস্থিত হয়, তখনই শরীরকে অসুস্থ বলা যায়। পিত্তের আধিক্য হইলে কফের হ্রাস ও কফের আধিক্য হইলে পিত্তের হ্রাস হইয়া থাকে। শরীরের ন্যায় আত্মারও তিনটি গুণ আছে। ঐ তিনটি গুণের নাম সত্ত্ব, রজ ও তম। ঐ গুণত্রয় সমভাবে অবস্থান করিলে আত্মার স্বাস্থ্যলাভ হয়। ঐ গুণত্রয়ের মধ্যে একের আধিক্য হইলে অন্যের হ্রাস হয়। হর্ষ উপস্থিত হইলে শোক এবং শোক উপস্থিত হইলে হর্ষ তিরোহিত হইয়া যায়। দুঃখের সময় কি কেহ সুখানুভব করে এবং সুখের সময় কি কাহার দুঃখানুভব হয় ? যাহা হউক, এক্ষণে সুখদুঃখ উভয় স্মরণ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। সুখদুঃখাতীত পরব্রহ্মকে স্মরণ করাই আপনার বিধেয়। * * * পূর্ব্বে ভীষ্ম দ্রোণাদির সহিত আপনার যে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে একমাত্র অহঙ্কারের সহিত তাহা অপেক্ষা অধিক ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ যুদ্ধে অভিমুখীন হওয়া আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। যোগ ও তদুপযোগী কার্য্য সমুদায় অবলম্বন করিলেই এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন। এই যুদ্ধে শরনিকর, ভৃত্য ও বন্ধুবর্গের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ; একমাত্র মনকে সহায় করিয়া ঐ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিলে দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। অতএব আপনি আমার এই উপদেশানুসারে অচিরাৎ অহঙ্কারকে পরাজয়পূর্ব্বক শোক পরিত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্তে পৈতৃক রাজ্য প্রতিপালন করুন।

"হে ধর্ম্মরাজ ! কেবল রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া সিদ্ধিলাভ করা কদাপি সম্ভবপর নহে। ইন্দ্রিয় সমুদায়কে পরাজয় করিতে পারিলেও সিদ্ধিলাভ হয় কি না সন্দেহ। যাহারা রাজ্যাদি বিষয় সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াও মনে মনে বিষয়ভোগের বাসনা করে, তাহাদিগের ধর্ম্ম ও সুখ তোমার শত্রুগণ লাভ করুক। মমতা সংসার-প্রাপ্তির ও নির্ম্মমতা ব্রহ্মলাভের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী মমতা ও নির্ম্মমতা লোকসমুদায়ের চিত্তে অলক্ষিতভাবে অবস্থানপূর্ব্বক পরস্পরকে আক্রমণ ও পরাজয় করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বের অবিনশ্বরতানিবন্ধন জগতের অস্তিত্ব অবিনশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন, প্রাণিগণের দেহনাশ করিলেও তাঁহারে হিংসাপাপে লিপ্ত হইতে হয় না ; যে ব্যক্তি স্থাবরজঙ্গমসংবলিত সমুদায় জগতের আধিপত্য লাভ করিয়াও মমতা পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহাকে

কখনই সংসারপাপে বদ্ধ হইতে হয় না। আর যে ব্যক্তি অরণ্যে ফলমূলাদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াও বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিতে না পারে, তাহারে নিশ্চয়ই সংসারজালে জড়িত হইতে হয়। অতএব ইন্দ্রিয় ও বিষয় সমুদায় মায়াময় বলিয়া নিশ্চয় করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি এই সমুদায়ের প্রতি কিছুমাত্র মমতা না করেন, তিনি নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হন। কামপরতন্ত্র মূঢ় ব্যক্তিরা কদাচ প্রশংসার আস্পদ হইতে পারে না। কামনা মন হইতে সমুৎপন্ন হয়; উহা সমুদায় প্রবৃত্তির মূল কারণ। যে সমুদায় মহাত্মা বহু জন্মের অভ্যাসবশতঃ কামনারে অধর্ম্মরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া ফললাভের বাসনা সহকারে দান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, ব্রত, যজ্ঞ, বিবিধ নিয়ম, ধ্যানমার্গ ও যোগমার্গ আশ্রয় না করেন, তাঁহারাই এককালে কামনারে পরাজয় করিতে সমর্থ হন। কামনিগ্রহই যথার্থ ধর্ম্ম ও মোক্ষের বীজস্বরূপ, সন্দেহ নাই।

"অতঃপর পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ যে কামগীতা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আমি এক্ষণে তোমার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। কামনা স্বয়ং কহিয়াছে যে, নির্ম্মমতা ও যোগাভ্যাস ভিন্ন কেহই আমারে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। যে ব্যক্তি জপাদি কার্য্য দ্বারা আমারে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে অভিমানরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার কার্য্য বিফল করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা আমারে পরাজিত করিতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে জঙ্গমমধ্যগত জীবাত্মার ন্যায় ব্যক্তরূপে উদিত হই। যে ব্যক্তি বেদ বেদান্ত সমালোচন দ্বারা আমারে শাসন করিতে যত্নবান্ হয়, আমি তাহার মনে স্থাবরান্তর্গত জীবাত্মার ন্যায় অব্যক্তরূপে অবস্থান করি। যে ব্যক্তি ধৈর্য্য দ্বারা আমারে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি কখনই তাহার মন হইতে অপনীত হই না। যে ব্যক্তি তপস্যা দ্বারা আমারে পরাজয় করিতে যত্ন করে, আমি তাহার তপস্যাতেই প্রাদুর্ভূত হই এবং যে ব্যক্তি মোক্ষার্থী হইয়া আমারে জয় করিতে বাসনা করে, আমি তাহারে লক্ষ্য করিয়া নৃত্য ও উপহাস করিয়া থাকি। পণ্ডিতেরা আমারে সর্ব্বভূতের অবধ্য, ও সনাতন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

"হে ধর্ম্মরাজ! এই আমি আপনার কামগীতা সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম। অতএব কামনারে পরাজয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। আপনি বিধিপূর্ব্বক অশ্বমেধ ও অন্যান্য সুসমৃদ্ধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কামনারে ধর্ম্মবিষয়ে নীত করুন। বারংবার বন্ধুবিয়োগে অভিভূত হওয়া আপনার নিতান্ত অনুচিত। আপনি অনুতাপ দ্বারা কখনই তাঁহাদিগের পুনর্দর্শন লাভে সমর্থ হইবেন না। অতএব এক্ষণে মহাসমারোহে সুসমৃদ্ধ যজ্ঞ সমুদায়ের অনুষ্ঠান করুন, তাহা হইলেই ইহলোকে অতুল কীর্ত্তি ও পরলোকে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণপ্রয়াণ

ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল; ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। পাণ্ডবদিগের সঙ্গে কৃষ্ণের জন্য এ গ্রন্থের সম্বন্ধ; মহাভারতে যে জন্য কৃষ্ণের দেখা পাই, তাহা সব ফুরাইল। এইখানে কৃষ্ণের মহাভারত হইতে অন্তর্হিত হওয়া উচিত। কিন্তু রচনাকণ্ডূতিপীড়িতেরা তত সহজে কৃষ্ণকে ছাড়িবার পাত্র নহেন। ইহার পরে অর্জ্জুনের মুখে তাঁহারা একটা

অপ্রাসঙ্গিক, অদ্ভুত কথা তুলিলেন। তিনি বলিলেন, তুমি যুদ্ধকালে আমাকে যে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলে, সব ভুলিয়া গিয়াছি। আবার বল। কৃষ্ণ বলিলেন, কথা বড় মন্দ। আমার আর সে সব কথা মনে হইবে না। আমি তখন যোগযুক্ত হইয়াই সে সব উপদেশ দিয়াছিলাম। আর তুমিও বড় নির্ব্বোধ ও শ্রদ্ধাশূন্য; তোমায় আর কিছু বলিতে চাহি না। তথাপি এক পুরাতন ইতিহাস শুনাইতেছি।

কৃষ্ণ ঐ ইতিহাসোক্ত ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া, অর্জ্জুনকে আবার কিছু তত্ত্বজ্ঞান শুনাইলেন। পূর্ব্বে যাহা শুনাইয়াছিলেন, তাহা গীতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখন যাহা শুনাইলেন, গ্রন্থকার তাহার নাম রাখিয়াছেন "অনুগীতা।" ইহার এক ভাগের নাম "ব্রাহ্মণগীতা"।

ভগবদ্গীতা, প্রজাগর, সনৎসুজাতীয়, মার্কণ্ডেয়সমস্যা, এই অনুগীতা, প্রভৃতি অনেক-গুলি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ মহাভারতের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া, এক্ষণে মহাভারতের অংশ বলিয়া প্রচলিত। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতা, কিন্তু অন্যগুলিতেও অনেক সারগর্ভ কথা পাওয়া যায়। অনুগীতাও উত্তম গ্রন্থ। "ভট্ট মোক্ষমূলর," ইহাকে তাঁহার "Sacred Books of the East" নামক গ্রন্থাবলী মধ্যে স্থান দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্, এক্ষণে যিনি বোম্বাই হাইকোর্টের জজ, তিনি ইহা ইংরাজিতে অনুবাদিত করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থ যেমনই হউক, ইহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। গ্রন্থ যেমনই হউক, ইহা কৃষ্ণোক্তি নহে। গ্রন্থকার, বা অপর কেহ, যেরূপ অবতারণা করিয়া, ইহাকে কৃষ্ণের মুখে উক্ত করিয়াছেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, ইহা কৃষ্ণোক্ত নহে; জোড়া দাগ বড় স্পষ্ট, কষ্টেও জোড় লাগে নাই। গীতোক্ত ধর্ম্মের সঙ্গে অনুগীতোক্ত ধর্ম্মের এরূপ কোন সাদৃশ্য নাই যে, ইহাকে গীতাবেত্তার উক্তি বিবেচনা করা যায় না। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ত্র্যম্বক, নিজকৃত অনুবাদের যে দীর্ঘ উপক্রমণিকা লিখিয়াছেন, তাহাতে সন্তোষজনক প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে, অনুগীতা, গীতার অনেক শতাব্দী পরে রচিত হইয়াছিল। সে প্রমাণের বিস্তারিত আলোচনার আমাদের প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণচরিত্রের কোন অংশই অনু-গীতার উপর নির্ভর করে না। তবে, অনুগীতা ও ব্রাহ্মণগীতা (বা ব্রহ্মগীতা) যে প্রকৃত পক্ষে প্রক্ষিপ্ত, তাহার প্রমাণার্থ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে ইহার কিছুমাত্র প্রসঙ্গ নাই।

অর্জ্জুনকে উপদিষ্ট করিয়া, কৃষ্ণ অর্জ্জুন ও যুধিষ্ঠিরাদির নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক দ্বারকা যাত্রা করিলেন। এই বিদায় মানবপ্রকৃতিসুলভ স্নেহাভিব্যক্তিতে পরিপূর্ণ। কৃষ্ণের মানবিকতার পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমরা অনেক উদাহরণ দিয়াছি। অতএব ইহার সবিস্তার বর্ণন নিষ্প্রয়োজন।

পথিমধ্যে উতঙ্ক মুনির সঙ্গে কৃষ্ণের সাক্ষাৎ বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণ যুদ্ধ নিবারণ করেন নাই, বলিয়া উতঙ্ক তাঁহাকে শাপ দিতে প্রস্তুত। কৃষ্ণ বলিলেন, শাপ দিও না, দিলে তোমার তপঃক্ষয় হইবে, আমি সন্ধিস্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, আর আমি জগদীশ্বর। তখন উতঙ্ক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্তব করিলেন। কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দেখিতে চাহিলেন; কৃষ্ণও বিশ্বরূপ দেখাইলেন। তার পর জোর করিয়া

উতঙ্ককে অভিলষিত বরদান করিলেন। তাহার পর চণ্ডাল আসিল, কুকুর আসিল, চণ্ডাল উতঙ্ককে কুকুরের প্রস্রাব খাইতে বলিল, ইত্যাদি, ইত্যাদি নানারূপ বীভৎস ব্যাপার আছে। এই উতঙ্কসমাগম বৃত্তান্ত মহাভারতের পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে নাই; সুতরাং ইহা মহাভারতের অংশ নহে। কাজেই এ সম্বন্ধে আমাদের কোন কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। স্পষ্টতঃ এখানে তৃতীয় স্তর দেখা যায়।

দ্বারকায় গিয়া কৃষ্ণ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিলিত হইলে বসুদেব তাঁহার নিকট যুদ্ধ-বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন। কৃষ্ণ যুদ্ধবৃত্তান্ত পিতাকে যাহা শুনাইলেন, তাহা সংক্ষিপ্ত, অত্যুক্তিশূন্য, এবং কোন প্রকার অনৈসর্গিক ঘটনার প্রসঙ্গদোষরহিত। অথচ সমস্ত স্থূল ঘটনা প্রকাশিত করিলেন। কেবল অভিমন্যুবধ গোপন করিলেন। কিন্তু সুভদ্রা তাঁহার সঙ্গে দ্বারকায় গিয়াছিলেন, সুভদ্রা অভিমন্যুবধের প্রসঙ্গ স্বয়ং উত্থাপন করিলেন। তখন কৃষ্ণ সে বৃত্তান্তও সবিস্তারে বলিলেন।

এদিকে যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণের বিদায়কালে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, অশ্বমেধ যজ্ঞকালে পুনর্ব্বার আসিতে হইবে। এক্ষণে সেই যজ্ঞের সময় উপস্থিত। অতএব তিনি যাদবগণ পরিবৃত হইয়া পুনর্ব্বার হস্তিনায় গমন করিলেন।

কৃষ্ণ তথায় আসিলে, অভিমন্যুপত্নী উত্তরা একটি মৃত পুত্র প্রসব করিলেন। কৃষ্ণ তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। কিন্তু ইহা হইতে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না যে, কৃষ্ণ ঐশী শক্তির প্রয়োগদ্বারা এই কার্য্য সম্পাদন করিলেন। এখনকার অনেক ডাক্তারই মৃতসন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন এবং কিরূপে করিতে পারেন, যাহা আমরা অনেকেই জানি। ইহা দ্বারা কেবল ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, যাহা তখনকার লোক আর কেহ জানিত না, কৃষ্ণ তাহা জানিতেন। তিনি আদর্শ মনুষ্য, এজন্য সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা ও জ্ঞান তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল।

তার পর নির্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। কৃষ্ণও দ্বারকায় পুনরাগমন করিলেন। তার পর আর পাণ্ডবগণের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই।

সপ্তম খণ্ড

প্রভাস

যোঽসৌ যুগসহস্রান্তে প্রদীপ্তার্চ্চির্বিভাবসুঃ।
সংভক্ষয়তি ভূতানি তস্মৈ ঘোরাত্মনে নমঃ॥

শান্তিপর্ব্ব, ৪৭ অধ্যায়ঃ।

প্রথম পরিচ্ছেদ—যদুবংশধ্বংস

তার পর, আশ্রমবাসিক পর্ব্ব। ইহার সঙ্গে কৃষ্ণের কোন সম্বন্ধ নাই। তার পর, অতি ভয়াবহ মৌসল পর্ব্ব। ইহাতে সমস্ত যদুবংশের নিঃশেষ ধ্বংস ও কৃষ্ণ বলরামের দেহত্যাগ কথিত হইয়াছে। যদুবংশীয়েরা পরস্পরকে নিহত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ নিজে এই মহাভয়ানকব্যাপার নিবারণের কোন উপায় করেন নাই—বরং অনেক যাদব তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল, এইরূপ কথিত হইয়াছে।

সে বৃত্তান্ত এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। গান্ধারীকথিত ষটত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইয়াছে। যাদবেরা অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছেন। একদা, বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদ এই লোকবিশ্রুত ঋষিত্রয় দ্বারকায় উপস্থিত। দুর্বিনীত যাদবেরা কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে মেয়ে সাজাইয়া ঋষিদিগের কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন, ইনি গর্ভবতী, ইঁহার কি পুত্র হইবে? পুরাণেতিহাসে ঋষিগণ অতি ভয়ানক ক্রোধপরবশ স্বরূপ বর্ণিত হইয়া থাকেন। কথায় কথায় তাঁহাদের অভিসম্পাতের ঘটা দেখিলে, তাঁহাদিগকে জিতেন্দ্রিয় ঈশ্বর-পরায়ণ ঋষি না বলিয়া, অতি নৃশংস নরপিশাচ বলিয়া গণ্য করিতে হয়। এখনকার দিনে যে কেহ ভদ্রলোক এমন একটা তামাসা হাসিয়া উড়াইয়া দিত; অন্ততঃ একটু তিরস্কার বাক্যই যথেষ্ট হয়। কিন্তু এই জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিগণ একেবারে সমস্ত যদুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন। বলিলেন, লৌহময় মুসল প্রসব করিবে, আর সেই মুসল হইতে কৃষ্ণ বলরাম ভিন্ন সমস্ত যদুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কৃষ্ণ এ কথা অবগত হইলেন। তিনি বলিলেন, মুনিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবশ্য হইবে। শাপ নিবারণের কোন উপায় করিলেন না।

অগত্যা শাম্ব, পুরুষই হউক আর যাই হউক, এক লোহার মুসল প্রসব করিল। যাদবগণের রাজা (কৃষ্ণ রাজা নহেন, উগ্রসেন রাজা বা প্রধান) ঐ মুসল চূর্ণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। মুসল চূর্ণ হইল—চূর্ণ সকল সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল। এদিকে যাদবগণ সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁহাদিগের "বিনাশ বাসনায়" যাদবগণকে প্রভাসতীর্থে যাত্রা করিতে বলিলেন।

প্রভাসে আসিয়া, যাদবগণ সুরাপান করিয়া নানাবিধ উৎসব করিতে লাগিল। শেষে পরস্পর কলহ আরম্ভ করিল। কুরুক্ষেত্রের মহারথী সাত্যকি প্রথম বিবাদ আরম্ভ করিলেন। তিনি কৃতবর্ম্মার সঙ্গে বিবাদ করিলে প্রদ্যুম্ন সাত্যকির পক্ষাবলম্বন করিলেন। সাত্যকি কৃতবর্ম্মার শিরশ্ছেদ করিলেন। তখন কৃতবর্ম্মার জ্ঞাতি গোষ্ঠী

(যাদবেরা, বৃষ্ণি, ভোজ, অন্ধক, কুকুর ইতি ভিন্ন ভিন্ন বংশীয়) সাত্যকি ও প্রদ্যুম্নকে নিহত করিল। তখন কৃষ্ণ এক মুষ্টি এরকা (শরগাছ) ক্রুদ্ধ হইয়া গ্রহণ করিলেন, এবং তদ্দ্বারা অনেক যাদব নিপাতিত করিলেন। গ্রন্থান্তরে আছে যে, এই শরগাছ মুসলচূর্ণ, যাহা রাজাজ্ঞানুসারে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। মহাভারতে সে কথাটা পাইলাম না, কিন্তু লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ এরকামুষ্টি গ্রহণ করাতে তাহা মুসলরূপে পরিণত হইল, এবং ইহাও আছে যে ঐ স্থানের সমুদায় এরকাই ব্রাহ্মণ-শাপে মুসলীভূত হইয়াছিল। যাদবগণ তখন ঐ সকল এরকা গ্রহণপূর্ব্বক পরস্পর নিহত করিতে লাগিল। এইরূপে সমস্ত যাদবগণ পরস্পরকে নিহত করিলেন। তখন দারুক (কৃষ্ণের সারথি) ও বভ্রু (যাদব) কৃষ্ণকে বলিলেন, "জনার্দ্দন! আপনি এক্ষণে অসংখ্য লোকের প্রাণসংহার করিলেন, অতঃপর চলুন, আমরা মহাত্মা বলভদ্রের নিকট যাই।"

কৃষ্ণ দারুককে হস্তিনায় অর্জ্জুনের নিকট পাঠাইলেন। অর্জ্জুন আসিয়া যাদবদিগের কুলকামিনীগণকে হস্তিনায় লইয়া যাইবে, এইরূপ আজ্ঞা করিলেন। বলরামকে কৃষ্ণ যোগাসনে আসীন দেখিলেন। তাঁহার মুখ হইতে একটি সহস্রমস্তক সর্প নির্গত হইয়া সাগর, নদী, বরুণ, এবং বাসুকি প্রভৃতি অন্য সর্পগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ করিল। বলরামের দেহ জীবনশূন্য হইল। তখন কৃষ্ণ স্বয়ং মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ বাসনায় মহাযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। জরা নামে ব্যাধ মৃগভ্রমে তাঁহার পাদপদ্ম শরদ্বারা বিদ্ধ করিল। পরে আপনার ভ্রম জানিতে পারিয়া শঙ্কিত মনে কৃষ্ণের চরণে নিপতিত হইল। কৃষ্ণ তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

এদিকে অর্জ্জুন দ্বারকায় আসিয়া রামকৃষ্ণাদির ঔর্দ্ধদৈহিক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া যাদবকুলকামিনীগণকে লইয়া হস্তিনায় চলিলেন। পথিমধ্যে দস্যুগণ লাঠি হাতে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। যিনি পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, এবং ভীষ্ম কর্ণের নিহন্তা, তিনি লগুড়ধারী চাষাদিগকে পরাভূত করিতে পারিলেন না। গাণ্ডীব তুলিতে পারিলেন না। রুক্মিণী, সত্যভামা, হৈমবতী, জাম্ববতী প্রভৃতি কৃষ্ণের প্রধানা মহিষীগণ ভিন্ন আর সকলকেই দস্যুগণ হরণ করিয়া লইয়া গেল।

এই সকল কথা কি মৌলিক? মুসল এরকার অনৈসর্গিক উপন্যাস আমরা পূর্ব্ব-নিয়মানুসারে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য। কিন্তু তাহা ত্যাগ করিলে যে, প্রাকৃতিক স্থূল কথা কিছু বাকি থাকে, তাহা তত শীঘ্র ত্যাগ করা যায় না। যাদবেরা পানাসক্ত ও দুর্নীতিপরায়ণ হইয়াছিল; ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। তাহারা সকলে এক বংশীয় নহে; ভিন্ন ভিন্ন বংশীয়, এবং অনেক সময়ে পরস্পর বিরুদ্ধাচারী। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বার্ষ্ণেয় সাত্যকি ও কৃষ্ণ পাণ্ডবপক্ষে, কিন্তু অন্ধক ও ভোজবংশীয় কৃতবর্ম্মা, দুর্য্যোধনের পক্ষে। তার পর, যাদবদিগের কেহ রাজা ছিল না, উগ্রসেনকে কখন রাজা বলা হইয়া থাকে, কিন্তু যাদবদিগের মধ্যে কেহই রাজা নহেন, ইহাই প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণের গুণাধিক্য হেতু, তিনি যাদবগণের নেতা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অগ্রজ বলরামের সঙ্গে তাঁহার মতভেদ দেখা যায়, এবং শান্তিপর্ব্বে দেখিতে পাই ভীষ্ম একটি কৃষ্ণনারদসংবাদ বলিতেছেন, তাহাতে কৃষ্ণ নারদের কাছে দুঃখ করিতেছেন যে, তিনি জ্ঞাতিগণের

মনোরঞ্জনার্থ বহুতর যত্ন করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এ সকল কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অতএব, যখন যাদবেরা, পরস্পর বিদ্বেষবিশিষ্ট, স্ব স্ব প্রধান, অত্যন্ত বলদৃপ্ত, দুর্নীতিপরায়ণ, এবং সুরাপান নিরত* তখন তাঁহারা যে পরস্পর বিবাদ করিয়া যদুকুলক্ষয় করিবেন এবং তন্নিবন্ধন কৃষ্ণ বলরামেরও যে ইচ্ছাধীন বা অনিচ্ছাধীন দেহান্ত হইবে, ইহা অনৈসর্গিক বা অসম্ভব নহে। বোধ হয়, এরূপ একটা কিম্বদন্তী প্রচলিত ছিল, এবং তাহার উপর পুরাণকারগণ যদুবংশধ্বংস স্থাপিত করিয়াছেন। অতএব এ অংশের মৌলিকতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। তবে কেবল দুই একটা কথা বলা আবশ্যক। লিখিত হইয়াছে যে, যদুবংশধ্বংস নিবারণ জন্য কৃষ্ণ কিছুই করেন নাই, বরং তাহার আনুকূল্যই করিয়াছিলেন। ইহাও যদি সত্য হয়, তাহাতে কৃষ্ণচরিত্রের অসঙ্গতি বা অগৌরব কিছুই দেখি না। আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ মনুষ্যের উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন। তাঁহার আত্মীয় বা অনাত্মীয় কেহ নাই—আদর্শ পুরুষের ধর্ম্মই আত্মীয়। যদুবংশীয়েরা যখন অধার্ম্মিক হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাহাদের দণ্ড ও প্রয়োজনীয় স্থলে বিনাশসাধনই তাঁহার কর্ত্তব্য। যিনি জরাসন্ধ প্রভৃতিকে অধর্ম্মাত্মা বলিয়াই বিনষ্ট করিলেন, তিনি যাদবগণকে অধর্ম্মাত্মা দেখিয়া তাহাদের যদি বিনষ্ট না করেন, তবে তিনি ধর্ম্মের বন্ধু নহেন, আত্মীয়গণের বন্ধু, আপনার বন্ধু, ধর্ম্মের পক্ষপাতী নহেন, আপনার পক্ষপাতী, বংশের পক্ষপাতী। আদর্শ ধর্ম্মাত্মা, তাহা হইতে পারেন না—কৃষ্ণও তাহা হয়েন নাই।

কৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণটা কতক অনিশ্চিত রহিল। চারি প্রকার কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

প্রথম, টাল্‌বয়স-হুইলরি সম্প্রদায় বলিতে পারেন, কৃষ্ণ, জুলিয়স্ কাইসরের মত, দ্বেষবিশিষ্ট বন্ধুগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। এরূপ কথা কোন গ্রন্থেই নাই।

দ্বিতীয়, তিনি যোগাবলম্বন করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিক-দিগের শিষ্যগণ যোগাবলম্বনে দেহত্যাগের কথাটায় বিশ্বাস করিবেন না। আমি নিজে অবিশ্বাসের কারণ দেখি না। যাঁহারা যোগাভ্যাসকালে নিশ্বাস অবরুদ্ধ করা অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্বাস অবরুদ্ধ করিয়া আপনার মৃত্যু সম্পাদন করিতে পারেন না, এমন কথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি না। এরূপ ঘটনা বিশ্বস্তসূত্রে শুনাও গিয়া থাকে। অন্যে বলিতে পারেন, ইহা আত্মহত্যা, সুতরাং পাপ ; সুতরাং আদর্শ মনুষ্যের অনাচরণীয়, আমি ঠিক তাহা বলিতে পারি না। প্রাচীন বয়সে, জীবনের কার্য্য সমস্ত সম্পন্ন হইলে পরে, ঈশ্বরে লীন হইবার জন্য, মনোমধ্যে তন্ময় হইয়া, শ্বাসরোধকে আত্মহত্যা বলিব, না "ঈশ্বরপ্রাপ্তি" বলিব? সেটা বিচারস্থল। আত্মহত্যা মহাপাপ স্বীকার করি, জীবনশেষে যোগবলে প্রাণত্যাগও কি তাই?

তৃতীয়, জরাব্যাধের শরাঘাত।

* যাদবেরা এমন মদ্যাসক্ত ছিলেন যে, কৃষ্ণ বলরাম ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, দ্বারকায় যে সুরা প্রস্তুত করিবে তাহাকে শূলে দিব। আমি পাশ্চাত্য রাজপুরুষগণকে এই নীতির অনুবর্ত্তী হইতে বলিতে ইচ্ছা করি।

চতুর্থ, এই সময়ে কৃষ্ণের বয়স শত বর্ষের অধিক হইয়াছিল, বলিয়া বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছিল। এ জরাব্যাধ, জরাব্যাধি নয় ত?

যাঁহারা কৃষ্ণকে মনুষ্যমাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহার ঈশ্বরত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা এই চারিটি মতের যে কোনটি গ্রহণ করিতে পারেন। আমি কৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া স্বীকার করি। অতএব আমি বলি, কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণ। আমার মত ইহা বটে যে, জগতে মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচার তাঁহার ইচ্ছা এবং সেই ইচ্ছা পূরণজন্য তিনি মানুষীশক্তির দ্বারা সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, কিন্তু তাহা বলিলেও ঈশ্বরাবতারের জন্মমৃত্যু তাঁহার ইচ্ছাধীন মাত্র বলিতে হইবে। অতএব আমি বলি কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষ্ণের দেহত্যাগের একমাত্র কারণ।

মৌসলপর্ব্ব মহাভারতের প্রথম স্তরের অন্তর্গত কি না, তাহার আমি বিচার করি নাই। বিশেষ প্রয়োজন নাই বলিয়া সমালোচনা করি নাই। বিশেষ প্রয়োজন নাই, কেন, তাহাও বলিয়াছি। স্থূল ঘটনাটা কতক সত্য বলিয়াই বোধ হয়। তবে তাহা হইলেও, ইহা মহাভারতের প্রথম স্তরের অন্তর্গত নহে বলিয়াই বোধ হয়। যাহা পুরাণ ও হরিবংশে আছে, কৃষ্ণজীবনঘটিত এমন আর কোন ঘটনাই মহাভারতে নাই। একটিই কেবল পুরাণাদিতেও আছে, হরিবংশেও আছে, মহাভারতেও আছে। পাণ্ডবদিগের সম্বন্ধে যাহা কিছু কৃষ্ণ করিয়াছিলেন, তাহা ভিন্ন আর কোন কৃষ্ণবৃত্তান্ত মহাভারতে নাই; ও থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এইটিই কেবল সে নিয়মবহির্ভূত। কৃষ্ণ এখানে ঈশ্বরাবতার, এটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের চিহ্ন পূর্ব্বে বলিয়াছি। এরূপ বিবেচনা করিবার অন্যান্য হেতুও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনাভাব। তবে, ইহা বলা কর্ত্তব্য যে, অনুক্রমণিকাধ্যায়ে মৌসলপর্ব্বের কোন প্রসঙ্গই নাই। পরীক্ষিতের জন্মবৃত্তান্তের পরবর্ত্তী কোন কথাই অনুক্রমণিকাধ্যায়ে নাই। আমার বিবেচনায় পরীক্ষিতের জন্মই আদিম মহাভারতের শেষ। তার পরবর্ত্তী যে সকল কথা, তাহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—উপসংহার

সমালোচকের কার্য্য প্রয়োজনানুসারে দ্বিবিধ;—এক প্রাচীন কুসংস্কারের নিরাস; অপর সত্যের সংগঠন। কৃষ্ণচরিত্রে প্রথমোক্ত কার্য্যই প্রধান; এজন্য আমাদিগের সময় ও চেষ্টা সেই দিকেই বেশী গিয়াছে। কৃষ্ণের চরিত্রে সত্যের নূতন সংগঠন করা অতি দুরূহ ব্যাপার, কেন না, মিথ্যা ও অতিপ্রকৃত উপন্যাসের ভস্মে অগ্নি এখানে এরূপ আচ্ছাদিত যে, তাহার সন্ধান পাওয়া ভার। যে উপাদানে গড়িয়া প্রকৃত কৃষ্ণ-চরিত্র পুনঃ সংস্থাপিত করিব, তাহা মিথ্যার সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। আমার যত দূর সাধ্য, তত দূর আমি গড়িলাম।

উপসংহারে দেখা কর্ত্তব্য যে, যতটুকু সত্য পুরাণেতিহাসে পাওয়া যায়, ততটুকুতে কৃষ্ণচরিত্র কিরূপ প্রতিপন্ন হইল।

দেখিয়াছি, বাল্যে কৃষ্ণ শারীরিক বলে আদর্শ বলবান্। তাঁহার অশিক্ষিত বল-প্রভাবে বৃন্দাবন হিংস্রজন্তু প্রভৃতি হইতে সুরক্ষিত হইত। তাঁহার অশিক্ষিত বলেও

কংসের মল্লপ্রভৃতি নিহত হইয়াছিল। গোচারণকালে গোপালগণের সঙ্গে সর্ব্বদা ক্রীড়া ও ব্যায়ামাদিতে তিনি শারীরিক বলের স্ফূর্ত্তি জন্মাইয়াছিলেন। দেখিয়াছি, দ্রুতগমনে কালযবনও তাঁহাকে পারেন নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁহার রথসঞ্চালনবিদ্যার বিশেষ প্রশংসা দেখা যায়।

এই বল শিক্ষিত হইলে, তিনি সে সময়ের ক্ষত্রিয়সমাজে সর্ব্বপ্রধান অস্ত্রবিৎ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। কেহ কখন তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। তিনি কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতি সে সময়ের সর্ব্বপ্রধান যোদ্ধগণের সঙ্গে, এবং অন্যান্য বহুতর রাজগণের সঙ্গে,—কাশী, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্রক, গান্ধার প্রভৃতি রাজাদিগের সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সকলকেই পরাভূত করিয়াছিলেন, কেহ কখন তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে নাই। তাঁহার যুদ্ধশিষ্যেরা, যথা—সাত্যকি ও অভিমন্যু যুদ্ধে প্রায় অপরাজেয় হইয়াছিলেন। স্বয়ং অর্জ্জুনও তাঁহার নিকট কোন কোন বিষয়ে যুদ্ধ সম্বন্ধে শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।

কেবল শারীরিক বলের ও শিক্ষার উপর যে রণপটুতা নির্ভর করে, পুরাণেতিহাসে তাহারই প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেরূপ রণপটুতা এক জন সামান্য সৈনিকেরও থাকিতে পারে। সৈনাপত্যই যোদ্ধার প্রকৃত গুণ। সৈনাপত্যে সে সময়ের যোদ্ধগণ পটু ছিলেন না। মহাভারতে বা পুরাণে কাহারও সে গুণের বড় পরিচয় পাই না, ভীষ্মের বা অর্জ্জুনেরও নহে। কৃষ্ণের সৈনাপত্যের বিশেষ কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, জরাসন্ধযুদ্ধে। তাঁহার সৈনাপত্য গুণে ক্ষুদ্রা যাদবসেনা জরাসন্ধের সংখ্যাতীত সেনা মথুরা হইতে বিমুখ করিয়াছিল। সেই অগণনীয়া সেনার ক্ষয়, যাদবসেনার দ্বারা অসাধ্য জানিয়া মথুরা পরিত্যাগ, নূতন নগরীর নির্ম্মাণার্থ সাগরদ্বীপ দ্বারকার নির্ব্বাচন, এবং তাহার সম্মুখস্থ রৈবতক পর্ব্বতমালায় দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণীনির্ম্মাণ যে রণনীতিজ্ঞতার পরিচয়, সেরূপ পরিচয় পুরাণেতিহাসে কোন ক্ষত্রিয়েরই পাওয়া যায় না। পুরাণকার ঋষিদিগের ইহা অবোধগম্য—অতএব ইহাও এক অন্যতর প্রমাণ যে, কৃষ্ণেতিহাস তাঁহাদের কল্পনামাত্রপ্রসূত নহে।

শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলও চরমস্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত, তাহারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ, ইহাই ভীষ্ম তাঁহার অর্ঘ প্রাপ্তির অন্যতর কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। শিশুপাল সে কথার অন্য উত্তর দেন নাই, কেবল ইহাই বলিয়াছিলেন যে, তবে বেদব্যাস থাকিতে কৃষ্ণের পূজা কেন?

কৃষ্ণের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকল যে চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল, কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্ম্মই ইহার তীব্রোজ্জ্বল প্রমাণ। এই ধর্ম্ম যে কেবল গীতাতেই পাওয়া যায়, এমত নহে, মহাভারতের অন্য স্থানেও পাওয়া যায়, ইহা দেখিয়াছি। কৃষ্ণকথিত ধর্ম্মের অপেক্ষা উন্নত, সর্ব্বলোকহিতকর, সর্ব্বজনের আচরণীয় ধর্ম্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই, ইহা গ্রন্থান্তরে বলিয়াছি। এই ধর্ম্মে যে জ্ঞানের পরিচয় দেয়, তাহা প্রায় মনুষ্যাতীত। কৃষ্ণ মানুষীশক্তির দ্বারা সকল কার্য্য সিদ্ধ করেন, ইহা আমি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি, ও প্রমাণীকৃতও করিতেছি। কেবল এই গীতায়, শ্রীকৃষ্ণ প্রায় অনন্তজ্ঞানের আশ্রয় লইয়াছেন।

সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম হইতে অবতরণ করিয়া রাজধর্ম্মে বা রাজনীতি সম্বন্ধেও দেখিতে পাই যে, কৃষ্ণের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকল চরমস্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত। তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সভ্রান্ত রাজনীতিজ্ঞ বলিয়াই যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের পরামর্শ পাইয়াও কৃষ্ণের পরামর্শ ব্যতীত রাজসূয় যজ্ঞে হস্তার্পণ করিলেন না। অবাধ্য যাদবেরা এবং বাধ্য পাণ্ডবেরা তাঁহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু করিতেন না। জরাসন্ধকে নিহত করিয়া, কারারুদ্ধ রাজগণকে মুক্ত করা, উন্নত রাজনীতির অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ—সাম্রাজ্য স্থাপনের অল্পায়াসসাধ্য অথচ পরম ধর্ম্ম্য উপায়। ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপনের পর, ধর্ম্মরাজ্য শাসনের জন্য রাজধর্ম্ম-নিয়োগে ভীষ্মের দ্বারা রাজব্যবস্থা সংস্থাপন করান, রাজনীতিজ্ঞতার দ্বিতীয় অতিপ্রশংসনীয় উদাহরণ। আরও অনেক উদাহরণ পাঠক পাইয়াছেন।

কৃষ্ণের বুদ্ধি, চরম স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, তাহা সর্ব্বব্যাপিণী, সর্ব্বদর্শিনী, সকল প্রকার উপায়ের উদ্ভাবনী, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি। মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া যত দূর সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়, কৃষ্ণ তত দূর সর্ব্বজ্ঞ। অপূর্ব্ব অধ্যাত্মতত্ত্ব, ও ধর্ম্মতত্ত্ব, যাহার উপরে আজিও মনুষ্যবুদ্ধি আর যায় নাই, তাহা হইতে চিকিৎসাবিদ্যা ও সঙ্গীতবিদ্যা, এমন কি অশ্বপরিচর্য্যা পর্য্যন্ত তাঁহার আয়ত্ত ছিল। উত্তরার মৃত পুত্রের পুনর্জ্জীবন একের উদাহরণ; বিখ্যাত বংশীবিদ্যা দ্বিতীয়ের, এবং জয়দ্রথবধের দিবসে অশ্বের শল্যোদ্ধার তৃতীয়ের উদাহরণ।

কৃষ্ণের কার্য্যকারিণী বৃত্তি সকলও চরমস্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত। তাঁহার সাহস, ক্ষিপ্রকারিতা, এবং সর্ব্বকর্ম্মে তৎপরতার অনেক পরিচয় দিয়াছি। তাঁহার ধর্ম্ম এবং সত্য যে অবিচলিত, এই গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পরিপূর্ণ। সর্ব্বজনে দয়া ও প্রীতিই এই ইতিহাসে পরিস্ফুট হইয়াছে। বলদৃপ্তগণের অপেক্ষা বলবান্ হইয়াও লোকহিতার্থ তিনি শান্তির জন্য দৃঢ়যত্ন এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি সর্ব্বলোকহিতৈষী, কেবল মনুষ্যের নহে—গোবৎসাদি তির্য্যক্ যোনির প্রতিও তাঁহার দয়া। গিরিযজ্ঞে তাহা পরিস্ফুট। ভাগবতকারকথিত বাল্যকালে বানরদিগের জন্য নবনীত চুরির এবং ফলবিক্রেত্রীর কথা কত দূর কিম্বদন্তী-মূলক, বলা যায় না—কিন্তু যিনি গোবৎসের উত্তম ভোজন জন্য ইন্দ্রযজ্ঞ বন্ধ করাইলেন, ইহাও তাঁহার চরিত্রানুমোদিত। তিনি আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি গোষ্ঠীর কিরূপ হিতৈষী, তাহা দেখিয়াছি, কিন্তু ইহাও দেখিয়াছি আত্মীয় পাপাচারী হইলে তিনি তাহার শত্রু। তাঁহার অপরিসীম ক্ষমাগুণ দেখিয়াছি, আবার ইহাও দেখিয়াছি যে, সময় উপস্থিত দেখিলে তিনি অযোনির্ম্মিত হৃদয়ে অকুণ্ঠিতভাবে দণ্ডবিধান করেন। তিনি স্বজনপ্রিয়, কিন্তু লোকহিতার্থে স্বজনের বিনাশেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। কংস মাতুল; পাণ্ডবেরা যাহা, শিশুপালও তাহা;—পিতৃস্বসার পুত্র; উভয়কেই দণ্ডিত করিলেন; তার পর, পরিশেষে স্বয়ং যাদবেরা সুরাপায়ী ও দুর্নীতিপরায়ণ হইলেও, তাহাদিগকেও রক্ষা করিলেন না।

এই সকল শ্রেষ্ঠ বৃত্তি কৃষ্ণে চরমস্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনে তিনি অপরাঙ্মুখ ছিলেন না, কেন না, তিনি আদর্শ মনুষ্য। যে জন্য বৃন্দাবনে ব্রজলীলা, পরিণত বয়সে সেই উদ্দেশ্যে সমুদ্রবিহার, যমুনাবিহার, রৈবতকবিহার। তাহার বিস্তারিত বর্ণনা আবশ্যক বিবেচনা করি নাই।

কেবল একটা কথা এখন বাকি আছে। ধর্ম্মতত্ত্বে বলিয়াছি, ভক্তিই মনুষ্যের প্রধানা বৃত্তি। কৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য, মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচারের জন্য অবতীর্ণ—তাঁহার ভক্তির স্ফূর্ত্তি দেখিলাম কই? কিন্তু যদি তিনি ঈশ্বরাবতার হয়েন, তবে তাঁহার এই ভক্তির পাত্র কে? তিনি নিজে।* নিজের প্রতি যে ভক্তি, সে কেবল আপনাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন হইলেই উপস্থিত হয়। ইহা জ্ঞানমার্গের চরম। ইহাকে আত্মরতি বলে। ছান্দোগ্য উপনিষদে উহা এইরূপ কথিত হইয়াছে—"য এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্ ভবতীতি।"

"যে ইহা দেখিয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা জানিয়া, আত্মায় রত হয়, আত্মাতেই ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই যাহার মিথুন (সহচর), আত্মাই যাহার আনন্দ, সে স্বরাট্।"

ইহাই গীতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কৃষ্ণ আত্মারাম; আত্মা জগন্ময়; তিনি সেই জগতে প্রীতিবিশিষ্ট। পরমাত্মার আত্মরতি আর কোন প্রকার বুঝিতে পারি না। অন্ততঃ আমি বুঝাইতে পারি না।

উপসংহারে বক্তব্য, কৃষ্ণ সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়ে সর্ব্বগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল। তিনি অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, প্রীতিময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে অপরাঙ্মুখ—ধর্ম্মাত্মা, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ, লোকহিতৈষী, ন্যায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, শাস্তা, নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, যোগযুক্ত, তপস্বী। তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র অমানুষ। এই প্রকার মানুষী শক্তির দ্বারা অতিমানুষ চরিত্রের বিকাশ হইতে তাঁহার মনুষ্যত্ব বা ঈশ্বরত্ব অনুমিত করা বিধেয় কি না, তাহা পাঠক আপন বুদ্ধিবিবেচনা অনুসারে স্থির করিবেন। যিনি মীমাংসা করিবেন যে, কৃষ্ণ মনুষ্যমাত্র ছিলেন, তিনি অন্ততঃ Rhys Davids শাক্যসিংহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, কৃষ্ণকে তাহাই বলিবেন;—"The Wisest and Greatest of the Hindus." আর যিনি বুঝিবেন যে, এই কৃষ্ণচরিত্রে ঈশ্বরের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যুক্তকরে, বিনীতভাবে এই গ্রন্থ সমাপনকালে আমার সঙ্গে বলুন—

নাকারণাৎ কারণাদ্বা কারণাকারণান্ন চ।
শরীরগ্রহণং বাপি ধর্ম্মত্রাণায় তে পরম্॥

* মহাভারতের যে সকল অংশে তাঁহাকে শিবোপাসক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহা প্রক্ষিপ্তের লক্ষণবিশিষ্ট।

"কৃষ্ণচরিত্র" 'প্রচার' পত্রিকায় বঙ্গাব্দ ১২৯১ সনের আশ্বিন সংখ্যা থেকে বঙ্গাব্দ ১২৯৩ সনের আষাঢ় সংখ্যা পর্য্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১২৯৩ সনেই (খ্রীষ্টাব্দ ১৮৮৬) এই পর্যন্ত লিখিত অংশকে বঙ্কিমচন্দ্র "কৃষ্ণচরিত্র—প্রথম ভাগ" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এই মুদ্রণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—

"ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে, তাহার সমস্ত আনুপূর্ব্বিক সাধারণকে বুঝাইতে পারি, এমন সম্ভাবনা অল্পই। কেন না, কথা অনেক, সময় অল্প। সেই সকল কথার মধ্যে তিনটি কথা, আমি তিনটি প্রবন্ধে বুঝাইতে প্রবৃত্ত আছি। ঐ প্রবন্ধ তিনটি দুইখানি সাময়িক পত্রে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইতেছে।

'উক্ত তিনটি প্রবন্ধের একটি অনুশীলন ধর্ম্মবিষয়ক; দ্বিতীয়টি দেবতত্ত্ব বিষয়ক; তৃতীয়টি কৃষ্ণচরিত্র। প্রথম প্রবন্ধ "নবজীবনে" প্রকাশিত হইতেছে; দ্বিতীয় ও তৃতীয় "প্রচার" নামক পত্রে প্রকাশিত হইতেছে। প্রায় দুই বৎসর হইল এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু ইহার মধ্যে একটিও আজি পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিতে পারি নাই। সমাপ্তি দূরে থাকুক, কোনটিও অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। একে বিষয়-গুলি অতি মহৎ, অতি বিস্তারিত সমালোচনা ভিন্ন তন্মধ্যে কোন বিষয়েরই মীমাংসা হইতে পারে না; তাহাতে আবার দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ লেখকের সময়ও অতি অল্প; এবং পরিশ্রম করিবার শক্তিও মনুষ্যের চিরকাল সমান থাকে না।

"এই সকল কারণের প্রতি মনোযোগ করিয়া, এবং মনুষ্যের পরমায়ুর সাধারণ পরিমাণ ও আপনার বয়স বিবেচনা করিয়া, আমি আমার বক্তব্য কথা সকলগুলি বলিবার সময় পাইব, এমন আশা পরিত্যাগ করিয়াছি। যে দেবমন্দির গঠন করিবার উচ্চাভিলাষকে মনে স্থান দিয়া, দুই একখানি করিয়া ইষ্টক সংগ্রহ করিতেছি, তাহা সমাপ্ত করিতে পারিব, এমন আশা আর রাখি না। যে তিনটি প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি, তাহাও সমাপ্ত করিতে পারিব কি না, জগদীশ্বর জানেন। সকলগুলি সম্পূর্ণ হইলে তাহা পুনর্ম্মুদ্রিত করিব, এ আশায় বসিয়া থাকিতে গেলে, হয়ত সময়ে কোন প্রবন্ধ পুনর্ম্মুদ্রিত হইবে না। কেন না, সকল কাজেরই সময় অসময় আছে। এই জন্য কৃষ্ণ-চরিত্রের প্রথম খণ্ড এক্ষণে পুনর্ম্মুদ্রিত করা গেল। বোধ করি এইরূপ পাঁচ ছয় খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইতে পারে। কিন্তু সকলই সময় ও শক্তি এবং ঈশ্বরানু-গ্রহের উপর নির্ভর করে।

"আগে অনুশীলন ধর্ম্ম পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়া তৎপরে কৃষ্ণচরিত্র পুনর্ম্মুদ্রিত হইলেই ভাল হইত। কেন না, "অনুশীলন ধর্ম্মে" যাহা তত্ত্ব মাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে

তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্ম্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া, তার পর উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ; কিন্তু অনুশীলন ধর্ম্ম সম্পূর্ণ না করিয়া পুনর্মুদ্রিত করিতে পারিলাম না। সম্পূর্ণ হইবারও বিলম্ব আছে।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়"

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে "কৃষ্ণচরিত্র (সম্পূর্ণ গ্রন্থ)" প্রকাশিত হয়। 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—

"কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে কেবল মহাভারতীয় কৃষ্ণকথা সমালোচিত হইয়াছিল। তাহাও অল্পাংশ মাত্র। এবার মহাভারতে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় কথা যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা সমস্তই সমালোচিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া হরিবংশে ও পুরাণে যাহা সমালোচনার যোগ্য পাওয়া যায়, তাহাও বিচারিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া উপক্রমণিকাভাগ পুনর্লিখিত এবং বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহা আমার অভিপ্রেত সম্পূর্ণ গ্রন্থ। প্রথম সংস্করণে যাহা ছিল, তাহা এই দ্বিতীয় সংস্করণের অল্পাংশ মাত্র। অধিকাংশই নূতন।

"এত দূরও যে কৃতকার্য্য হইতে পারিব, পূর্ব্বে ইহা আশা করি নাই। কিন্তু সম্পূর্ণ কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশ করিয়াও আমি সুখী হইলাম না। তাহার কারণ, আমার ত্রুটিতেই হউক, আর দূরদৃষ্ট বশতঃই হউক, মুদ্রাঙ্কনকার্য্যে এত ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়াছে যে, অনেক ভাগ পুনর্মুদ্রিত করাই আমার কর্ত্তব্য ছিল। নানা কারণবশতঃ তাহা পারিলাম না। . . .

"আমি বলিতে বাধ্য যে, প্রথম সংস্করণে যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছিলাম, এখন তাহার কিছু কিছু পরিত্যাগ এবং কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়াছি। কৃষ্ণের বাল্যলীলা সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে এই কথা আমার বক্তব্য। এরূপ মত পরিবর্ত্তন স্বীকার করিতে আমি লজ্জা করি না। আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত পরিবর্ত্তন করিয়াছি—কে না করে? কৃষ্ণবিষয়েই আমার মতপরিবর্ত্তনের বিচিত্র উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্ণচরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহা লিখিলাম, আলোক অন্ধকারে যত দূর প্রভেদ, এতদুভয়ে তত দূর প্রভেদ। মতপরিবর্ত্তন, বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার, এবং ভাবনার ফল। যাঁহার কখন মত পরিবর্ত্তিত হয় না, তিনি হয় অভ্রান্ত দৈবজ্ঞানবিশিষ্ট, নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন। যাহা আর সকলের ঘটিয়া থাকে, তাহা স্বীকার করিতে আমি লজ্জাবোধ করিলাম না।

"এ গ্রন্থে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মত অনেক স্থলেই অগ্রাহ্য করিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের নিকট সন্ধান ও সাহায্য না পাইয়াছি এমত নহে। Wilson, Goldstucker, Weber, Muir—ইঁহাদিগের নিকট আমি ঋণ স্বীকার করিতে বাধ্য। দেশী লেখকদিগের মধ্যে আমাদের দেশের মুখোজ্জ্বলকারী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, C. I. E., শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী, এবং মৃত মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের নিকট আমি বাধ্য। অক্ষয় বাবু উত্তম সংগ্রহকার।

সর্ব্বাপেক্ষা আমার ঋণ মৃত মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট গুরুতর। যেখানে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, আমি তাঁহার অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি। প্রয়োজনমতে মূলের সঙ্গে অনুবাদ মিলাইয়াছি। যে দুই এক স্থানে মারাত্মক ভ্রম আছে বুঝিয়াছি, সেখানে নোট করিয়া দিয়াছি। প্রয়োজনানুসারে, স্থানবিশেষে ভিন্ন, গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধি ভয়ে মহাভারতের মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত করি নাই। হরিবংশ ও পুরাণ হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, মূল উদ্ধৃত করিয়াছি, এবং তাহার অনুবাদের দায় দোষ আমার নিজের।

"পরিশেষে বক্তব্য, কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মানবচরিত্র সমালোচন করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি নিজে তাঁহার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করি;—সে বিশ্বাসও আমি লুকাই নাই। কিন্তু পাঠককে সেই মতাবলম্বী করিবার জন্য কোন যত্ন পাই নাই।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়"

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে মাত্র এই দুটি সংস্করণই প্রকাশিত হয়।

—সম্পাদক, ব. র. স.।

ধর্ম্মতত্ত্ব

অনুশীলন

প্রথম অধ্যায়—দুঃখ কি ?

গুরু। বাচস্পতি মহাশয়ের সম্বাদ কি ? তাঁর পীড়া কি সারিয়াছে

শিষ্য। তিনি ত কাশী গেলেন।

গুরু। কবে আসিবেন ?

শিষ্য। আর আসিবেন না। একবারে দেশত্যাগী হইলেন।

গুরু। কেন ?

শিষ্য। কি সুখে আর থাকিবেন ?

গুরু। দুঃখ কি ?

শিষ্য। সবই দুঃখ—দুঃখের বাকি কি ? আপনাকে বলিতে শুনিয়াছি ধর্ম্মেই সুখ। কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তি, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অথচ তাঁহার মত দুঃখীও আর কেহ নাই, ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত।

গুরু। হয় তাঁর কোন দুঃখ নাই, নয় তিনি ধার্ম্মিক নন।

শিষ্য। তাঁর কোন দুঃখ নাই ? সে কি কথা ? তিনি চিরদরিদ্র, অন্ন চলে না। তার পর এই কঠিন রোগে ক্লিষ্ট, আবার গৃহদাহ হইয়া গেল। আবার দুঃখ কাহাকে বলে ?

গুরু। তিনি ধার্ম্মিক নহেন।

শিষ্য। সে কি ? আপনি কি বলেন যে, এই দারিদ্র্য, গৃহদাহ, রোগ, এ সকলই অধর্ম্মের ফল ?

গুরু। তা বলি।

শিষ্য। পূর্ব্বজন্মের ?

গুরু। পূর্ব্বজন্মের কাজ কি ? ইহজন্মের অধর্ম্মের ফল।

শিষ্য। আপনি কি ইহাও মানেন যে, এ জন্মে আমি অধর্ম্ম করিয়াছি বলিয়া আমার রোগ হয় ?

গুরু। আমিও মানি, তুমিও মান। তুমি কি মান না যে, হিম লাগাইলে সর্দ্দি হয়, কি গুরুভোজন করিলে অজীর্ণ হয় ?

শিষ্য। হিম লাগান কি অধর্ম্ম ?

গুরু। অন্য ধর্ম্মের মত একটা শারীরিক ধর্ম্ম আছে। হিম লাগান তাহার বিরোধী। এই জন্য হিম লাগান অধর্ম্ম।

শিষ্য। এখানে অধর্ম্ম মানে hygiene ?

গুরু। যাহা শারীরিক নিয়মবিরুদ্ধ, তাহা শারীরিক অধর্ম্ম।

শিষ্য। ধর্ম্মাধর্ম্ম কি স্বাভাবিক নিয়মানুবর্ত্তিতা আর নিয়মাতিক্রম ?

গুরু। ধর্ম্মাধর্ম্ম অত সহজে বুঝিবার কথা নহে। তাহা হইলে ধর্ম্মতত্ত্ব বৈজ্ঞানিকের হাতে রাখিলেই চলিত। তবে হিম লাগান সম্বন্ধে অতটুকু বলিলেই চলিতে পারে।

শিষ্য। তাই না হয় হইল। বাচস্পতির দারিদ্র্য দুঃখ কোন্ পাপের ফল?

গুরু। দারিদ্র্য দুঃখটা আগে ভাল করিয়া বুঝা যাউক। দুঃখটা কি?

শিষ্য। খাইতে পায় না।

গুরু। বাচস্পতির সে দুঃখ হয় নাই, ইহা নিশ্চিত। কেন না, বাচস্পতি খাইতে না পাইলে এত দিন মরিয়া যাইত।

শিষ্য। মনে করুন, সপরিবারে বুকড়ি চালের ভাত আর কাঁচকলা ভাতে খায়।

গুরু। তাহা যদি শরীর পোষণ ও রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তবে দুঃখ বটে। কিন্তু যদি শরীর রক্ষা ও পুষ্টির পক্ষে উহা যথেষ্ট হয়, তবে তাহার অধিক না হইলে দুঃখ বোধ করা, ধার্ম্মিকের লক্ষণ নহে, পেটুকের লক্ষণ। পেটুক অধার্ম্মিক।

শিষ্য। ছেঁড়া কাপড় পরে।

গুরু। বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ হইলেই ধার্ম্মিকের পক্ষে যথেষ্ট। শীতকালে শীত নিবারণও চাই। তাহা মোটা কম্বলেও হয়। তাহা বাচস্পতির জুটে না কি?

শিষ্য। জুটিতে পারে। কিন্তু তাহারা আপনারা জল তুলে, বাসন মাজে, ঘর ঝাঁট দেয়।

গুরু। শারীরিক পরিশ্রম ঈশ্বরের নিয়ম। যে তাহাতে অনিচ্ছুক, সে অধার্ম্মিক। আমি এমন বলিতেছি না যে, ধনে কোন প্রয়োজন নাই। অথবা যে ধনোপার্জ্জনে যত্নবান্, সে অধার্ম্মিক। বরং যে সমাজে থাকিয়া ধনোপার্জ্জনে যথাবিহিত যত্ন না করে, তাহাকে অধার্ম্মিক বলি। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সচরাচর যাহারা আপনাদিগকে দারিদ্র্যপীড়িত মনে করে, তাহাদিগের নিজের কুশিক্ষা এবং কুবাসনা—অর্থাৎ অধর্ম্মে সংস্কার, তাহাদিগের কষ্টের কারণ। অনুচিত ভোগলালসা অনেকের দুঃখের কারণ।

শিষ্য। পৃথিবীতে কি এমন কেহ নাই, যাহাদের পক্ষে দারিদ্র্য যথার্থ দুঃখ?

গুরু। অনেক কোটি কোটি। যাহারা শরীর রক্ষার উপযোগী অন্নবস্ত্র পায় না—আশ্রয় পায় না—তাহারা যথার্থ দরিদ্র। তাহাদের দারিদ্র্য দুঃখ বটে।

শিষ্য। এ দারিদ্র্যও কি তাহাদের ইহজন্মকৃত অধর্ম্মের ভোগ?

গুরু। অবশ্য।

শিষ্য। কোন্ অধর্ম্মের ভোগ দারিদ্র্য?

গুরু। ধনোপার্জ্জনের উপযোগী অথবা গ্রাসাচ্ছাদন আশ্রয়াদির প্রয়োজনীয় যাহা, তাহার সংগ্রহের উপযোগী আমাদের কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক শক্তি আছে। যাহারা তাহার সম্যক্ অনুশীলন করে নাই বা সম্যক্ পরিচালনা করে না, তাহারাই দরিদ্র।

শিষ্য। তবে, বুঝিতেছি, আপনার মতে আমাদিগের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি অনুশীলন ও পরিচালনাই ধর্ম্ম, ও তাহার অভাবই অধর্ম্ম।

গুরু। ধর্ম্মতত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব, তাহা অল্প কথায় সম্পূর্ণ হয় না। কিন্তু মনে কর যদি তাই বলা যায়?

শিষ্য। এ যে বিলাতী Doctrine of Culture!

গুরু। Culture বিলাতী জিনিষ নহে। ইহা হিন্দুধর্ম্মের সারাংশ।

শিষ্য। সে কি কথা? Culture শব্দের একটা প্রতিশব্দও আমাদের দেশীয় কোন ভাষায় নাই।

গুরু। আমরা কথা খুঁজিয়া মরি, আসল জিনিষটা খুঁজি না, তাই আমাদের এমন দশা। দ্বিজবর্ণের চতুরাশ্রম কি মনে কর?

শিষ্য। System of Culture?

গুরু। এমন, যে তোমার Matthew Arnold প্রভৃতি বিলাতী অনুশীলনবাদীদিগের বুঝিবার সাধ্য আছে কি না সন্দেহ। সধবার পতিদেবতার উপাসনায়, বিধবার ব্রহ্মচর্য্যে, সমস্ত ব্রতনিয়মে, তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে, যোগে, এই অনুশীলনতত্ত্ব অন্তর্নিহিত। যদি এই তত্ত্ব কখন তোমাকে বুঝাইতে পারি, তবে তুমি দেখিবে যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় যে পরম পবিত্র অমৃতময় ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহা এই অনুশীলনতত্ত্বের উপর গঠিত।

শিষ্য। আপনার কথা শুনিয়া আপনার নিকট অনুশীলনতত্ত্ব কিছু শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি। কিন্তু আমি যত দূর বুঝি, পাশ্চাত্ত্য অনুশীলনতত্ত্ব ত নাস্তিকের মত। এমন কি, নিরীশ্বর কোমৎ-ধর্ম্ম-অনুশীলনের অনুষ্ঠান পদ্ধতি মাত্র বলিয়াই বোধ হয়।

গুরু। এ কথা অতি যথার্থ। বিলাতী অনুশীলনতত্ত্ব নিরীশ্বর, এই জন্য উহা অসম্পূর্ণ ও অপরিণত, অথবা উহা অসম্পূর্ণ বা অপরিণত বলিয়াই নিরীশ্বর,—ঠিক সেটা বুঝি না। কিন্তু হিন্দুরা পরম ভক্ত, তাহাদিগের অনুশীলনতত্ত্ব জগদীশ্বর-পাদপদ্মেই সমর্পিত।

শিষ্য। কেন না, উদ্দেশ্য মুক্তি। বিলাতী অনুশীলনতত্ত্বের উদ্দেশ্য সুখ। এই কথা কি ঠিক?

গুরু। সুখ ও মুক্তি, পৃথক্ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত কি না? মুক্তি কি সুখ নয়?

শিষ্য। প্রথমতঃ, মুক্তি সুখ নয়—সুখ দুঃখ মাত্রেরই অভাব। দ্বিতীয়তঃ, মুক্তি যদিও সুখবিশেষ বলেন, তথাপি সুখমাত্র মুক্তি নয়। আমি দুইটা মিঠাই খাইলে সুখী হই, আমার কি তাহাতে মুক্তি লাভ হয়?

গুরু। তুমি বড় গোলযোগের কথা আনিয়া ফেলিলে। সুখ এবং মুক্তি, এই দুইটা কথা আগে বুঝিতে হইবে, নহিলে অনুশীলনতত্ত্ব বুঝা যাইবে না। আজ আর সময় নাই—আইস, একটু ফুলগাছে জল দিই, সন্ধ্যা হইল। কাল সে প্রসঙ্গ আরম্ভ করা যাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়—সুখ কি?

শিষ্য। কাল আপনার কথায় এই পাইলাম যে, আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি সকলের সম্যক্ অনুশীলনের অভাবই আমাদের দুঃখের কারণ। বটে?

গুরু। তার পর?

শিষ্য। বলিয়াছি যে, বাচস্পতির নির্ব্বাসনের একটি কারণ এই যে, তাঁহার ঘর পুড়িয়া গিয়াছে। আগুন কাহার দোষে কি প্রকারে লাগিল, তাহা কেহ বলিতে পারে

না—কিন্তু বাচস্পতির নিজ দোষে নহে, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত। তাঁহার কোন্ অনুশীলনের অভাবে গৃহ দগ্ধ হইল?

গুরু। অনুশীলনতত্ত্বটা না বুঝিয়াই আগে হইতে কি প্রকারে সে কথা বুঝিবে? সুখদুঃখ মানসিক অবস্থা মাত্র—সুখদুঃখের কোন বাহ্যিক অস্তিত্ব নাই। মানসিক অবস্থা মাত্রেই যে সম্পূর্ণরূপে অনুশীলনের অধীন, তাহা তুমি স্বীকার করিবে। এবং ইহাও বুঝিতে পারিবে যে, মানসিক শক্তি সকলের যথাবিহিত অনুশীলন হইলে গৃহদাহ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হইবে না।

শিষ্য। অর্থাৎ বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে হইবে না। কি ভয়ানক!

গুরু। সচরাচর যাহাকে বৈরাগ্য বলে, তাহা ভয়ানক ব্যাপার হইলে হইতে পারে। কিন্তু তাহার কথা হইতেছে কি?

শিষ্য। হইতেছে বৈ কি? হিন্দুধর্ম্মের টান সেই দিকে। সাংখ্যকার বলেন, তিন প্রকার দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি পরমপুরুষার্থ। তার পর আর একস্থানে বলেন যে, সুখ এত অল্প যে, তাহাও দুঃখ পক্ষে নিক্ষেপ করিবে। অর্থাৎ সুখ দুঃখ সব ত্যাগ করিয়া, জড়পিণ্ডে পরিণত হও। আপনার গীতোক্ত ধর্ম্মও তাই বলেন। গীতোক্ত সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব সকল তুল্য জ্ঞান করিবে। যদি সুখে সুখী না হইবে—তবে জীবনে কাজ কি? যদি ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সুখ পরিত্যাগ, তবে আমি সেই ধর্ম্ম চাই না। এবং অনুশীলনতত্ত্বের উদ্দেশ্য যদি ঈদৃশ ধর্ম্মই হয়, তবে আমি অনুশীলনতত্ত্ব শুনিতে চাই না।

গুরু। অত রাগের কথা কিছু নাই—আমার এই অনুশীলনতত্ত্বে তোমার দুইটা মিঠাই খাওয়ার পক্ষে কোন আপত্তি হইবে না—বরং বিধিই থাকিবে। সাংখ্যদর্শনকে তোমাকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। গীতোক্তসুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব সম্বন্ধীয় যে উপদেশ, তাহারও এমন অর্থ নহে যে, মনুষ্যের সুখভোগ করা কর্ত্তব্য নহে। উহার অর্থ কি, তাহার কথায় এখন কাজ নাই। তুমি কাল বলিয়াছিলে যে, বিলাতী অনুশীলনের উদ্দেশ্য সুখ, ভারতবর্ষীয় অনুশীলনের উদ্দেশ্য মুক্তি। আমি তদুত্তরে বলি, মুক্তি সুখের অবস্থাবিশেষ। সুখের পূর্ণমাত্রা এবং চরমোৎকর্ষ। যদি এ কথা ঠিক হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষীয় অনুশীলনের উদ্দেশ্যও সুখ।

শিষ্য। অর্থাৎ ইহকালে দুঃখ ও পরকালে সুখ।

গুরু। না, ইহকালে সুখ ও পরকালে সুখ।

শিষ্য। কিন্তু আমার আপত্তির উত্তর হয় নাই—আমি ত বলিয়াছিলাম যে, জীব মুক্ত হইলে সে সুখদুঃখের অতীত হয়। সুখশূন্য যে অবস্থা, তাহাকে সুখ বলিব কেন?

গুরু। এই আপত্তি খণ্ডন জন্য, সুখ কি ও মুক্তি কি, তাহা বুঝা প্রয়োজন। এখন, মুক্তির কথা থাক। আগে সুখ কি, তাহা বুঝিয়া দেয়া যাক।

শিষ্য। বলুন।

গুরু। তুমি কাল বলিয়াছিলে যে, দুইটা মিঠাই খাইতে পাইলে তুমি সুখী হও। কেন সুখী হও, তাহা বুঝিতে পার?

শিষ্য। আমার ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়।

গুরু। এক মুঠা শুকনা চাউল খাইলেও তাহা হয়—মিঠাই খাইলে ও শুকনা চাল খাইলে কি তুমি তুল্য সুখী হও?

শিষ্য। না। মিঠাই খাইলে অধিক সুখ সন্দেহ নাই।

গুরু। তাহার কারণ কি?

শিষ্য। মিঠাইয়ের উপাদানের সঙ্গে মনুষ্য-রসনার এরূপ কোন নিত্য সম্বন্ধ আছে যে, সেই সম্বন্ধ জন্যই মিষ্ট লাগে।

গুরু। মিষ্ট লাগে সে জন্য বটে, কিন্তু তাহা ত জিজ্ঞাসা করি নাই। মিঠাই খাওয়ায় তোমার সুখ কি জন্য? মিষ্টতায় সকলের সুখ নাই। তুমি একজন আসল বিলাতি সাহেবকে একটা বড়বাজারের সন্দেশ কি মিহিদানা সহজে খাওয়াইতে পারিবে না। পক্ষান্তরে তুমি এক টুকরা রোষ্ট বীফ খাইয়া সুখী হইবে না। 'রবিন্সন ক্রুশো' গ্রন্থের ফ্রাইডে নামক বর্ব্বরকে মনে পড়ে? সেই আমমাংসভোজী বর্ব্বরের মুখে সলবণ সুসিদ্ধ মাংস ভাল লাগিত না। এই সকল বৈচিত্র্য দেখিয়া বুঝিতে পারিবে যে, তোমার মিঠাই খাওয়ার যে সুখ, তাহা রসনার সঙ্গে ঘৃতশর্করাদির নিত্য সম্বন্ধবশতঃ নহে। তবে কি?

শিষ্য। অভ্যাস।

গুরু। তাহা না বলিয়া অনুশীলন বল।

শিষ্য। অভ্যাস আর অনুশীলন কি এক?

গুরু। এক নহে বলিয়াই বলিতেছি যে, অভ্যাস না বলিয়া অনুশীলনই বল।

শিষ্য। উভয়ে প্রভেদ কি?

গুরু। এখন তাহা বুঝাইবার সময় নহে। অনুশীলনতত্ত্ব ভাল করিয়া না বুঝিলে তাহা বুঝিতে পারিবে না। তবে কিছু শুনিয়া রাখ। যে প্রত্যহ কুইনাইন খায়, তাহার কুইনাইনের স্বাদ কেমন লাগে? কখন সুখদ হয় কি?

শিষ্য। বোধ করি কখন সুখদ হয় না, কিন্তু ক্রমে তিক্ত সহ্য হইয়া যায়।

গুরু। সেইটুকু অভ্যাসের ফল। অনুশীলন, শক্তির অনুকূল; অভ্যাস, শক্তির প্রতিকূল। অনুশীলনের ফল শক্তির বিকাশ, অভ্যাসের ফল শক্তির বিকার। অনুশীলনের পরিণাম সুখ, অভ্যাসের পরিণাম সহিষ্ণুতা। এক্ষণে মিঠাই খাওয়ার কথাটা মনে কর। এখানে তোমার চেষ্টা স্বাভাবিকী রসাস্বাদিনী শক্তির অনুকূল, এ জন্য তোমার সে শক্তি অনুশীলিত হইয়াছে—মিঠাই খাইয়া তুমি সুখী হও। ঐরূপ অনুশীলনবলে তুমি রোষ্ট বীফ খাইয়াও সুখী হইতে পার। অন্যান্য ভক্ষ্য পেয় সম্বন্ধেও সেইরূপ।

এ গেল একটা ইন্দ্রিয়ের সুখের কথা। আমাদের আর আর ইন্দ্রিয় আছে, সেই সকল ইন্দ্রিয়ের অনুশীলনেও ঐরূপ সুখোৎপত্তি।

কতকগুলি শারীরিক শক্তিবিশেষের নাম দেওয়া গিয়াছে ইন্দ্রিয়। আরও অনেক-গুলি শারীরিক শক্তি আছে। যথা, গীতবাদ্যের তাল বোধ হয় যে শক্তি অনুশীলনে, তাহাও শারীরিক শক্তি। সাহাবরা তাহার নাম দিয়াছেন muscular sense। এইরূপ আর আর শারীরিক শক্তি আছে। এ সকলের অনুশীলনেও ঐরূপ সুখ।

তা ছাড়া, আমাদের কতকগুলি মানসিক শক্তি আছে। সেগুলির অনুশীলনের যে ফল, তাহাও সুখ। ইহাই সুখ, ইহা ভিন্ন অন্য কোন সুখ নাই। ইহার অভাব দুঃখ। বুঝিলে?

শিষ্য। না। প্রথমতঃ শক্তি কথাটাতেই গোল পড়িতেছে। মনে করুন, দয়া আমাদিগের মনের একটি অবস্থা। তাহার অনুশীলনে সুখ আছে। কিন্তু আমি কি বলিব যে দয়া শক্তির অনুশীলন করিতে হইবে?

গুরু। শক্তি কথাটা গোলের বটে। তৎপরিবর্ত্তে অন্য শব্দের আদেশ করার প্রতি আমার কোন আপত্তি নাই। আগে জিনিসটা বুঝ, তার পর যাহা বলিবে, তাহাতেই বুঝা যাইবে। শরীর এক ও মন এক বটে, তথাপি ইহাদিগের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া আছে; এবং কাজেই সেই সকল বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার সম্পাদনকারিণী বিশেষ বিশেষ শক্তি কল্পনা করা অবৈজ্ঞানিক হয় না। কেন না, আদৌ এই সকল শক্তির মূল এক হইলেও, কার্য্যতঃ ইহাদিগের পার্থক্য দেখিতে পাই। যে অন্ধ, সে দেখিতে পায় না, কিন্তু শব্দ শুনিতে পায়; যে বধির, সে শব্দ শুনিতে পায় না, কিন্তু চক্ষে দেখিতে পায়। কেহ কিছু স্মরণ রাখিতে পারে না, কিন্তু সে হয়ত সুকল্পনাবিশিষ্ট কবি; আবার কেহ কল্পনায় অক্ষম, কিন্তু বড় মেধাবী। কেহ ঈশ্বরে ভক্তিশূন্য, কিন্তু লোককে দয়া করে; আবার নির্দ্দয় লোককেও ঈশ্বরে কিঞ্চিৎ ভক্তিবিশিষ্ট দেখা গিয়াছে।* সুতরাং দেহ ও মনের ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন শক্তি স্বীকার করা যাইতে পারে। তবে কতকগুলি শক্তি—যথা, স্নেহ, দয়া ইত্যাদিকে শক্তি বলা ভাল শুনায় না। কিন্তু অন্য ব্যবহার্য্য শব্দ কি আছে?

শিষ্য। ইংরাজি শব্দটা faculty, অনেক বাঙ্গালি লেখক বৃত্তি শব্দের দ্বারা তাহার অনুবাদ করিয়াছেন।

গুরু। পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রে বৃত্তি শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

শিষ্য। কিন্তু এক্ষণে সে অর্থ বাঙ্গালা ভাষায় অপ্রচলিত। বৃত্তি শব্দ চলিয়াছে।

গুরু। তবে বৃত্তিই চালাও। বুঝিলেই হইল। যখন তোমরা morals অর্থে "নীতি" শব্দ চালাইয়াছ, Science অর্থে "বিজ্ঞান" চালাইয়াছ, তখন faculty অর্থে "বৃত্তি" শব্দ চালাইলে দোষ ধরিব না।

শিষ্য। তার পর আমার দ্বিতীয় আপত্তি। আপনি বলিলেন, বৃত্তির অনুশীলন সুখ—কিন্তু জল বিনা তৃষ্ণার অনুশীলনে দুঃখ।

গুরু। রও। বৃত্তির অনুশীলনের ফল ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি, চরমে পরিণতাবস্থা, তার পর উদ্দিষ্ট বস্তুর সম্মিলনে পরিতৃপ্তি। এই স্ফূর্ত্তি এবং পরিতৃপ্তি উভয়ই সুখের পক্ষে আবশ্যক।

শিষ্য। ইহা যদি সুখ হয়, তবে বোধ হয়, এরূপ সুখ মনুষ্যের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নহে।

গুরু। কেন?

শিষ্য। ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তির ইন্দ্রিয়বৃত্তির অনুশীলনে ও পরিতৃপ্তিতে সুখ। তাই কি তাহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত?

* উদাহরণ—বিলাতের সপ্তদশ শতাব্দীর Puritan সম্প্রদায়। অপিচ, Inquisition অধ্যক্ষেরা।

গুরু। না। তাহা নহে। তাহা হইলেই ইন্দ্রিয় প্রবলতাহেতু মানসিক বৃত্তি সকলের অস্ফূর্ত্তি এবং ক্রমশঃ বিলোপ হইবার সম্ভাবনা। এ বিষয়ে স্থূল নিয়ম হইতেছে সামঞ্জস্য। ইন্দ্রিয় সকলেরও এককালীন বিলোপ ধর্ম্মানুমত নহে। তাহাদের সামঞ্জস্যই ধর্ম্মানুমত। বিলোপে ও সংযমে অনেক প্রভেদ। সে কথা পশ্চাৎ বুঝাইব। এখন স্থূল কথাটা বুঝিয়া রাখ যে, বৃত্তি সকলের অনুশীলনের স্থূল নিয়ম পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্য কি, তাহা সবিস্তারে একদিন বুঝাইব। এখন কথাটা এই বুঝাইতেছি যে, সুখের উপাদান কি ?

প্রথম। শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের অনুশীলন। তজ্জনিত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি।

দ্বিতীয়। সেই সকলের পরস্পর সামঞ্জস্য।

তৃতীয়। তাদৃশ অবস্থায় সেই সকলের পরিতৃপ্তি।

ইহা ভিন্ন আর কোন জাতীয় সুখ নাই। আমি সময়ান্তরে তোমাকে বুঝাইতে পারি, যোগীর যোগজনিত যে সুখ, তাহাও ইহার অন্তর্গত। ইহার অভাবই দুঃখ। সময়ান্তরে আমি তোমাকে বুঝাইতে পারি যে, বাচস্পতির গৃহদাহজনিত যে দুঃখ, অথবা তদপেক্ষাও হতভাগ্য ব্যক্তির পুত্রশোকজনিত যে দুঃখ, তাহাও এই দুঃখ। আমার অবশিষ্ট কথাগুলি শুনিলে তুমি আপনি তাহ বুঝিতে পারিবে, তোমাকে বুঝাইতে হইবে না।

শিষ্য। মনে করুন, তাহ যেন বুঝিলাম, তথাপি প্রধান কথাটা এখনও বুঝিলাম না। কথাটা এই হইতেছিল যে, আমি বলিয়াছিলাম যে, বাচস্পতি ধার্ম্মিক ব্যক্তি, তথাপি দুঃখী। আপনি বলিলেন যে, যখন সে দুঃখী, তখন সে কখনও ধার্ম্মিক নহে। আপনার কথা প্রমাণ করিবার জন্য, আপনি সুখ কি, তাহা বুঝাইলেন ; এবং সুখ বুঝাতে বুঝিলাম যে, দুঃখ কি। ভাল, তাহাতে যেন বুঝিলাম যে, বাচস্পতি যথার্থ দুঃখী নহেন, অথবা তাঁহাকে যদি দুঃখী বলা যায়, তবে তিনি নিজের দোষে, অর্থাৎ নিজ শারীরিক বা মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের ত্রুটি করাতে এই দুঃখ পাইতেছেন। কিন্তু তাহাতে এমন কিছুই বুঝা গেল না যে, তিনি অধার্ম্মিক। এ অনুশীলনতত্ত্বের সঙ্গে ধর্ম্মাধর্ম্মের সম্বন্ধ কি, তাহা ত কিছুই বুঝা গেল না। যদি কিছু বুঝিয়া থাকি, তবে সে এই যে, অনুশীলনই ধর্ম্ম।

গুরু। এক্ষণে তাই মনে করিতে পার। তাহা ছাড়া আরও একটা গুরুতর কথা আছে, তাহা না বুঝাইলে অনুশীলনের সঙ্গে ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ, তাহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু সেটা আমাকে সর্ব্বশেষে বলিতে হইবে ; কেন না, অনুশীলন কি, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে সে তত্ত্ব তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না।

শিষ্য। অনুশীলন আবার ধর্ম্ম ! এ সকল নূতন কথা।

গুরু। নূতন নহে। পুরাতনের সংস্কার মাত্র।

তৃতীয় অধ্যায়—ধর্ম্ম কি ?

শিষ্য। অনুশীলনকে ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে, ইহা বুঝিতে পারিতেছি না। অনুশীলনের ফল সুখ, ধর্ম্মের ফলও কি সুখ ?

গুরু। না ত কি ধর্ম্মের ফল দুঃখ ? যদি তা হইত, তাহা হইলে আমি জগতের সমস্ত লোককে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতাম।

শিষ্য। ধর্ম্মের ফল পরকালে সুখ হইতে পারে, কিন্তু ইহকালেও কি তাই ?

গুরু। তবে বুঝাইলাম কি ? ধর্ম্মের ফল ইহকালে সুখ ও যদি পরকাল থাকে, তবে পরকালেও সুখ। ধর্ম্ম সুখের একমাত্র উপায়। ইহকালে কি পরকালে অন্য উপায় নাই।

শিষ্য। তথাপি গোল মিটিতেছে না। আমরা বলি খ্রীষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, বৈষ্ণবধর্ম্ম —তৎপরিবর্ত্তে কি খ্রীষ্ট অনুশীলন, বৌদ্ধ অনুশীলন, বৈষ্ণব অনুশীলন বলিতে পারি ?

গুরু। ধর্ম্ম কথাটার অর্থ উল্‌টাইয়া দিয়া তুমি গোলযোগ উপস্থিত করিলে। ধর্ম্ম শব্দটা নানা প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন নাই ;* তুমি যে অর্থে এখন ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিলে, উহা ইংরেজি Religion শব্দের আধুনিক তর্জমা মাত্র। দেশী জিনিষ নহে।

শিষ্য। ভাল, Religion কি, তাহাই না হয় বুঝান।

গুরু। কি জন্য ? Religion পাশ্চাত্ত্য শব্দ, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা ইহা নানা প্রকারে বুঝাইয়াছেন ; কাহারও সঙ্গে কাহারও মত মিলে না।†

শিষ্য। কিন্তু রিলিজনের ভিতর এমন কি নিত্য বস্তু কিছুই নাই, যাহা সকল রিলিজনে পাওয়া যায় ?

গুরু। আছে। কিন্তু সেই নিত্য পদার্থকে রিলিজন বলিবার প্রয়োজন নাই ; তাহাকে ধর্ম্ম বলিলে আর কোন গোলযোগ হইবে না।

শিষ্য। তাহা কি ?

গুরু। সমস্ত মনুষ্য জাতি—কি খ্রীষ্টিয়ান, কি বৌদ্ধ, কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলেরই পক্ষে যাহা ধর্ম্ম।

শিষ্য। কি প্রকারে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় ?

গুরু। মনুষ্যের ধর্ম্ম কি, তাহার সন্ধান করিলেই পাওয়া যায়।

শিষ্য। তাই ত জিজ্ঞাস্য।

গুরু। উত্তরও সহজ। চৌম্বকের ধর্ম্ম কি ?

শিষ্য। লৌহাকর্ষণ।

গুরু। অগ্নির ধর্ম্ম কি ?

শিষ্য। দাহকতা।

গুরু। জলের ধর্ম্ম কি ?

শিষ্য। দ্রাবকতা।

* ক চিহ্নিত ক্রোড়পত্র দেখ। † খ চিহ্নিত ক্রোড়পত্র দেখ।

গুরু। বৃক্ষের ধর্ম্ম কি ?

শিষ্য। ফল পুষ্পের উৎপাদকতা।

গুরু। মানুষের ধর্ম্ম কি ?

শিষ্য। এক কথায় কি বলিব ?

গুরু। মনুষ্যত্ব বল না কেন ?

শিষ্য। তাহা হইলে মনুষ্যত্ব কি বুঝিতে হইবে।

গুরু। কাল তাহা বুঝাইব।

চতুর্থ অধ্যায়—মনুষ্যত্ব কি ?

গুরু। মনুষ্যত্ব বুঝিলে ধর্ম্ম সহজে বুঝিতে পারিবে। তাই আগে মনুষ্যত্ব বুঝাইতেছি। মনুষ্যত্ব বুঝিবার আগে বৃক্ষত্ব বুঝ। এই একটি ঘাস দেখিতেছ, আর এই বটগাছ দেখিতেছ —দুইটি কি এক জাতীয় ?

শিষ্য। হাঁ, এক হিসাবে এক জাতীয়। উভয়েই উদ্ভিদ্।

গুরু। দুইটিকেই কি বৃক্ষ বলিবে ?

শিষ্য। না, বটকেই বৃক্ষ বলিব—ওটি তৃণ মাত্র।

গুরু। এ প্রভেদ কেন ?

শিষ্য। কাণ্ড, শাখা, পল্লব, ফুল, ফল, এই লইয়া বৃক্ষ। বটের এ সব আছে, ঘাসের এ সব নাই।

গুরু। ঘাসেরও সব আছে—তবে ক্ষুদ্র, অপরিণত। ঘাসকে বৃক্ষ বলিবে না ?

শিষ্য। ঘাস আবার বৃক্ষ ?

গুরু। যদি ঘাসকে বৃক্ষ না বল, তবে যে মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলি পরিণত হয় নাই, তাহাকেও মনুষ্য বলিতে পারা যায় না। ঘাসের যেমন উদ্ভিত্ত্ব আছে, একজন হটেণ্টট্ বা চিপেবারও সেরূপ মনুষ্যত্ব আছে। কিন্তু যে উদ্ভিত্ত্বকে বৃক্ষত্ব বলি, সে যেমন ঘাসের নাই, তেমনি যে মনুষ্যত্ব মনুষ্যধর্ম্ম, হটেণ্টট্ বা চিপেবার সেই মনুষ্যত্ব নাই। বৃক্ষত্বের উদাহরণ ছাড়িও না, তাহা হইলেই বুঝিবে। ঐ বাঁশঝাড় দেখিতেছ—উহাকে বৃক্ষ বলিবে ?

শিষ্য। বোধ হয় বলিব না। উহার কাণ্ড, শাখা ও পল্লব আছে ; কিন্তু কৈ, উহার ফুল ফল হয় না ; উহার সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি নাই ; উহাকে বৃক্ষ বলিব না।

গুরু। তুমি অনভিজ্ঞ। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পরে এক একবার উহার ফুল হয়। ফুল হইয়া ফল হয়, তাহা চালের মত। চালের মত, তাহাতে ভাতও হয়।

শিষ্য। তবে বাঁশকে বৃক্ষ বলিব।

গুরু। অথচ বাঁশ তৃণ মাত্র। একটি ঘাস উপড়াইয়া লইয়া গিয়া বাঁশের সহিত তুলনা করিয়া দেখ—মিলিবে। উদ্ভিত্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও বাঁশকে তৃণশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিয়া গিয়াছেন। অতএব দেখ, স্ফূর্ত্তিগুণে তৃণে তৃণে কত তফাৎ। অথচ বাঁশের সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি নাই। যে অবস্থায় মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি সম্পূর্ণ হয়, সেই অবস্থাকেই মনুষ্যত্ব বলিতেছি।

শিষ্য। এরূপ পরিণতি কি ধর্ম্মের আয়ত্ত ?

গুরু। উদ্ভিদের এইরূপ উৎকর্ষে পরিণতি, কতকগুলি চেষ্টার ফল ; লৌকিক কথায় তাহাকে কর্ষণ বা পাট বলে। এই কর্ষণ কোথাও মনুষ্য কর্ত্তৃক হইতেছে, কোথাও প্রকৃতির দ্বারা হইতেছে। একটা সামান্য উদাহরণে বুঝাইব। তোমাকে যদি কোন দেবতা আসিয়া বলেন যে, বৃক্ষ আর ঘাস, এই দুইই একত্র পৃথিবীতে রাখিব না। হয় সব বৃক্ষ নষ্ট করিব, নয় সব তৃণ নষ্ট করিব। তাহা হইলে তুমি কি চাহিবে ? বৃক্ষ রাখিতে চাহিবে, না ঘাস রাখিতে চাহিবে ?

শিষ্য। বৃক্ষ রাখিব, তাহাতে সন্দেহ কি ? ঘাস না থাকিলে ছাগল গোরুর কিছু কষ্ট হইবে, কিন্তু বৃক্ষ না থাকিলে আম, কাঁঠাল প্রভৃতি উপাদেয় ফলে বঞ্চিত হইব।

গুরু। মূর্খ ! তৃণ জাতি পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইলে অন্নাভাবে মারা যাইবে যে ? জান না যে, ধানও তৃণজাতীয় ? যে ভাঁটুই দেখিতেছ, উহা ভাল করিয়া দেখিয়া আইস। ধানের পাট হইবার পূর্ব্বে ধানও ঐরূপ ছিল। কেবল কর্ষণ জন্য জীবনদায়িনী লক্ষ্মীর তুল্য হইয়াছে। গমও ঐরূপ। যে ফুলকপি দিয়া অন্নের রাশি সংহার কর, তাহাও আদিম অবস্থায় সমুদ্রতীরবাসী তিক্তস্বাদ কদর্য্য উদ্ভিদ্ ছিল—কর্ষণে এই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। উদ্ভিদের পক্ষে কর্ষণ যাহা, মনুষ্যের পক্ষে স্বীয় বৃত্তিগুলির অনুশীলন তাই ; এজন্য ইংরেজিতে উভয়ের নাম, CULTURE ! এই জন্য কথিত হইয়াছে যে, "The Substance of Religion is Culture." "মানববৃত্তির উৎকর্ষণেই ধর্ম্ম।"

শিষ্য। তাহা হউক। স্থূল কথাও কিছুই বুঝিতে পারি নাই—মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি কাহাকে বলে ?

গুরু। অঙ্কুরের পরিণাম, মহামহীরুহ। মাটি খোঁজ, হয়ত একটি অতি ক্ষুদ্র, প্রায় অদৃশ্য, অঙ্কুর দেখিতে পাইবে। পরিণামে সেই অঙ্কুর সেই প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের মত বৃক্ষ হইবে। কিন্তু তজ্জন্য ইহার কর্ষণ—কৃষকেরা যাহাকে গাছের পাট বলে, তাহা চাই। সরস মাটি চাই—জল না পাইলে হইবে না। রৌদ্র চাই, আওতায় থাকিলে হইবে না। যে সামগ্রী বৃক্ষশরীরের পোষণজন্য প্রয়োজনীয়, তাহা মৃত্তিকায় থাকা চাই—বৃক্ষের জাতিবিশেষে মাটিতে সার দেওয়া চাই। ঘেরা চাই। ইত্যাদি। তাহা হইলে অঙ্কুর সুবৃক্ষত্ব প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্যেরও এইরূপ। যে শিশু দেখিতেছ, ইহা মনুষ্যের অঙ্কুর। বিহিত কর্ষণে অর্থাৎ অনুশীলনে উহ প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। পরিণামে সর্ব্বগুণযুক্ত, সর্ব্ব-সুখ-সম্পন্ন মনুষ্য হইতে পারিবে। ইহাই মনুষ্যের পরিণতি।

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। সর্ব্বসুখী সর্ব্বগুণযুক্ত কি সকল মনুষ্য হইতে পারে ?

গুরু। কখন হইতে পারিবে কি না, সে কথা এখন তুলিয়া কাজ নাই। সে অনেক বিচার। তবে ইহা স্বীকার করিব যে, এ পর্য্যন্ত কেহ কখন হয় নাই। আর সহসা কেহ হইবারও সম্ভাবনা নাই। তবে আমি যে ধর্ম্মের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত, তাহার বিহিত অবলম্বনে ইহাই হইবে যে, লোকে সর্ব্বগুণ অর্জ্জনের জন্য যত্নে বহুগুণসম্পন্ন হইতে পারিবে ; সর্ব্বসুখ লাভের চেষ্টায় বহু সুখ লাভ করিতে পারিবে।

শিষ্য। আমাকে ক্ষমা করুন—মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি কাহাকে বলে, তাহা এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। চেষ্টা কর। মনুষ্যের দুইটি অঙ্গ, এক শরীর, আর এক মন। শরীরের আবার কতকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে; যথা—হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়, চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়; মস্তিষ্ক, হৃৎ, বায়ুকোষ, অন্ত্র প্রভৃতি জীবনসঞ্চালক প্রত্যঙ্গ; অস্থি, মজ্জা, মেদ, মাংস, শোণিত প্রভৃতি শারীরিক উপাদান, এবং ক্ষুৎপিপাসাদি শারীরিক বৃত্তি। এ সকলের বিহিত পরিণতি চাই। আর মনেরও কতকগুলি প্রত্যঙ্গ—

শিষ্য। মনের কথা পশ্চাৎ শুনিব; এখন শারীরিক পরিণতি ভাল করিয়া বুঝান। শারীরিক প্রত্যঙ্গ সকলের কি প্রকারে পরিণতি সাধিত হইবে? শিশুর এই ক্ষুদ্র দুর্ব্বল বাহু বয়োগুণে আপনিই বর্দ্ধিত ও বলশালী হইবে। তাহা ছাড়া আবার কি চাই?

গুরু। তুমি যে স্বাভাবিক পরিণতির কথা বলিতেছ, তাহার দুইটি কারণ। আমিও সেই দুইটির উপর নির্ভর করিতেছি। সেই দুইটি কারণ—পোষণ ও পরিচালনা। তুমি কোন শিশুর একটি বাহু, কাঁধের কাছে দৃঢ় বন্ধনীর দ্বারা বাঁধিয়া রাখ, বাহুতে আর রক্ত না যাইতে পারে। তাহা হইলে ঐ বাহু আর বাড়িবে না, হয়ত অবশ, নয় দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে। কেন না, যে শোণিতে বাহুর পুষ্টি হইত, তাহা আর পাইবে না। আবার, বাঁধিয়া কাজ নাই, কিন্তু এমন কোন বন্দোবস্ত কর যে, শিশু কখনও আর হাত নাড়িতে না পারে। তাহা হইলে ঐ হাত অবশ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে, অন্ততঃ হস্ত সঞ্চালনে যে ক্ষিপ্রকারিতা জৈব কার্য্যে প্রয়োজনীয়, তাহা কখনও হইবে না। ঊর্দ্ধবাহুদিগের বাহু দেখিয়াছ ত?

শিষ্য। বুঝিলাম, অনুশীলন গুণে শিশুর কোমল ক্ষুদ্র বাহু পরিণতবয়স্ক মানুষের বাহুর বিস্তার, বল ও ক্ষিপ্রকারিতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ ত সকলেরই সহজেই হয়। আর কি চাই?

গুরু। তোমার বাহুর সঙ্গে এই বাগানের মালীর বাহু তুলনা করিয়া দেখ। তুমি তোমার বাহুস্থিত অঙ্গুলিগুলিকে অনুশীলনে এরূপ পরিণত করিয়াছ যে, এখনই পাঁচ মিনিটে তুমি দুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিয়া ফেলিবে, কিন্তু ঐ মালী দশ দিন চেষ্টা করিয়া তোমার মত একটি "ক" লিখিতে পারিবে না। তুমি যে না ভাবিয়া, না যত্ন করিয়া অবহেলায় যেখানে যে আকারের যে অক্ষরের প্রয়োজন, তাহা লিখিয়া যাইতেছ, ইহা উহার পক্ষে অতিশয় বিস্ময়কর, ভাবিয়া সে কিছু বুঝিতে পারে না। সচরাচর অনেকেই লিখিতে জানে, এই জন্য সভ্য সমাজে লিপিবিদ্যা বিস্ময়কর অনুশীলন বলিয়া লোকের বোধ হয় না। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই লিপিবিদ্যা ভোজবাজির অপেক্ষা আশ্চর্য্য অনুশীলনফল। দেখ, একটি শব্দ লিখিতে গেলে, মনে কর এই অনুশীলন শব্দ লিখিতে গেলে,—প্রথমে এই শব্দটির বিশ্লেষণ করিয়া উহার উপাদানভূত বর্ণগুলি স্থির করিতে হইবে—বিশ্লেষণে পাইতে হইবে, অ, ন, উ, শ, ঈ, ল, ন। ইহা প্রথমে কেবল কর্ণে, তাহার পর প্রত্যেকের চাক্ষুষ দ্রষ্টব্য অবয়ব ভাবিয়া মনে আনিতে হইবে। এক একটি অবয়ব মনে পড়িবে, আবার এক একটি কাগজে আঁকিতে হইবে। অথচ তুমি এত শীঘ্র লিখিবে যে, তাহাতে বুঝাইবে যে, তুমি কোন প্রকার মানসিক চিন্তা করিতেছ

না। অনুশীলন গুণে অনেকেই এই অসাধারণ কৌশলে কুশলী। অনুশীলনজনিত আরও প্রভেদ এই মালীর তুলনাতেই দেখ। তুমি যেখানে পাঁচ মিনিটে দুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিবে, মালী তেমনি পাঁচ মিনিটে এক কাঠা জমিতে কোদালি দিবে। তুমি দুই ঘণ্টায়, হয়ত দুই প্রহরেও তাহা পারিয়া উঠিবে না। এ বিষয়ে তোমার বাহু উপযুক্তরূপে চালিত অর্থাৎ অনুশীলিত হয় নাই, সমুচিত পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তোমার ও মালীর উভয়েরই হস্ত কিয়দংশে অপরিণত; সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি প্রাপ্ত হয় নাই। আবার এক জন শিক্ষিত গায়কের সঙ্গে তোমার নিজের তুলনা করিয়া দেখ। হয়ত, শৈশবে তোমার কণ্ঠ ও গায়কের কণ্ঠে বিশেষ তারতম্য ছিল না; অনেক গায়ক সচরাচর স্বভাবতঃ সুকণ্ঠ নহে। কিন্তু অনুশীলন গুণে গায়ক সুকণ্ঠ হইয়াছে, তাহার কণ্ঠের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি হইয়াছে। আবার দেখ,—বল দেখি, তুমি কয় ক্রোশ পথ হাঁটিতে পার ?

শিষ্য। আমি বড় হাঁটিতে পারি না; বড় জোর এক ক্রোশ।

গুরু। তোমার পদদ্বয়ের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি হয় নাই। দেখ তোমার হাত, পা, গলা, তিনেরই সহজ পুষ্টি ও পরিণতি হইয়াছে—কিন্তু একেরও সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি হয় নাই। এইরূপ আর সকল শারীরিক প্রত্যঙ্গের বিষয়ে দেখিবে। শারীরিক প্রত্যঙ্গ মাত্রেরই সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি না হইলে শারীরিক সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি হইয়াছে বলা যায় না; কেন না, ভগ্নাংশগুলির পূর্ণতাই ষোল আনার পূর্ণতা। এক আনায় আধ পয়সা কম হইলে, পূরা টাকাতেই কমৃতি হয়। যেমন শরীর সম্বন্ধে বুঝাইলাম, এমনই মন সম্বন্ধে জানিবে। মনেরও অনেকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে, সেগুলিকে বৃত্তি বলা গিয়াছে। কতকগুলির কাজ জ্ঞানার্জ্জন ও বিচার। কতকগুলির কাজ কার্য্যে প্রবৃত্তি দেওয়া—যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি। আর কতকগুলির কাজ আনন্দের উপভোগ, সৌন্দর্য্য হৃদয়ে গ্রহণ, রসগ্রহণ, চিত্তবিনোদন। এই ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তিগুলির সকলের পুষ্টি ও সম্পূর্ণ বিকাশই সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি।

শিষ্য। অর্থাৎ জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্য্যে তৎপরত, চিত্তে ধর্ম্মাত্মতা এবং সুরসে রসিকতা, এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি আছে অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ, এবং সর্ব্ববিধ শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই। কৃষ্ণার্জ্জুন আর শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভিন্ন আর কেহ কখন এরূপ হইয়াছিল কি না, তাহা শুনি নাই।

গুরু। যাহারা মনুষ্যজাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট, তাহারা চেষ্টা করিলে যে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে না, এমত কথা স্বীকার করা যায় না। আমার এমনও ভরসা আছে, যুগান্তরে যখন মনুষ্যজাতি প্রকৃত উন্নতি প্রাপ্ত হইবে, তখন অনেক মনুষ্যই এই আদর্শানুযায়ী হইবে। সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজগণের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায়, সেই রাজগণ সম্পূর্ণরূপে এই মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সে বর্ণনাগুলি যে অনেকটা লেখকদিগের কপোলকল্পিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ রাজগুণবর্ণনা যে স্থলে সাধারণ, সে স্থলে ইহাই অনুমেয় যে, এইরূপ একটা আদর্শ সে কালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দিগের সম্মুখে ছিল। আমিও

সেইরূপ আদর্শ তোমার সম্মুখে স্থাপন করিতেছি। যে যাহা হইতে চায়, তাহার সম্মুখে তাহার সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন আদর্শ চাই। সে ঠিক আদর্শানুরূপ না হউক, তাহার নিকটবর্ত্তী হইবে। ষোল আনা কি, তাহা না জানিলে আট আনা পাইবার কেহ কামনা করে না। যে শিশু টাকায় ষোল আনা, ইহা বুঝে না, সে টাকার মূল্য-স্বরূপ চারিটি পয়সা লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে।

শিষ্য। আদর্শ কোথায় পাইব? এরূপ মানুষ ত দেখি না।

গুরু। মনুষ্য না দেখ, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই সর্ব্বগুণের সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ। এই জন্য বেদান্তের নিগুর্ণ ঈশ্বরে, ধর্ম্ম সম্যক্ ধর্ম্মত্ব প্রাপ্ত হয় না; কেন না, যিনি নিগুর্ণ, তিনি আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। অদ্বৈত-বাদীদিগের "একমেবাদ্বিতীয়ম্" চৈতন্য অথবা যাহাকে হর্বর্ট স্পেন্সর "Inscrutable Power in Nature" বলিয়া ঈশ্বরস্থানে সংস্থাপিত করিয়াছেন—অর্থাৎ যিনি কেবল দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ঈশ্বর, তাঁহার উপাসনায় ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের পুরাণেতিহাসে কথিত বা খ্রীষ্টিয়ানের ধর্ম্মপুস্তকে কথিত সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাই মূল, কেন না, তিনিই আমাদের আদর্শ হইতে পারেন। যাঁহাকে "Impersonal God" বলি, তাঁহার উপাসনা নিষ্ফল; যাঁহাকে "Personal God" বলি, তাঁহার উপাসনাই সফল।

শিষ্য। মানিলাম সগুণ ঈশ্বরকে আদর্শ স্বরূপ মানিতে হইবে। কিন্তু উপাসনার প্রয়োজন কি?

গুরু। ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না। তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়া চলিব, সে সম্ভাবনা নাই। কেবল তাঁহাকে মনে ভাবিতে পারি। সেই ভাবাই উপাসনা। তবে বেগার টালা রকম ভাবিলে কোন ফল নাই। সন্ধ্যা কেবল আওড়াইলে কোন ফল নাই। তাঁহার সর্ব্বগুণসম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাবের উপর চিত্ত স্থির করিতে হইবে, ভক্তিভাবে তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে হইবে। প্রীতির সহিত হৃদয়কে তাঁহার সম্মুখীন করিতে হইবে। তাঁহার স্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাব গঠিত হইতে থাকুক, মনে এ ব্রত দৃঢ় করিতে হইবে;—তাহা হইলেই সেই পবিত্র চরিত্রের বিমল জ্যোতি আমাদের চরিত্রে পড়িবে। তাঁহার নির্ম্মলতার মত নির্ম্মলতা, তাঁহার শক্তির অনুকারী সর্ব্বত্র-মঙ্গলময় শক্তি কামনা করিতে হইবে। তাঁহাকে সর্ব্বদা নিকটে দেখিতে হইবে, তাঁহার স্বভাবের সঙ্গে একস্বভাব হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহার সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য কামনা করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা ক্রমে ঈশ্বরের নিকট হইব। আর্য্য ঋষিরা বিশ্বাস করিতেন যে, তাহা হইলে আমরা ক্রমে সারূপ্য ও সাযুজ্য প্রাপ্ত হইব,—ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরেই লীন হইব। ইহাকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ আর কিছুই নয়, ঐশ্বরিক আদর্শ-নীত ঈশ্বরানুকৃত স্বভাবপ্রাপ্তি। তাহা পাইলেই দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল, এবং সকল সুখের অধিকারী হওয়া গেল।

শিষ্য। আমি এত দিন বুঝিতাম, ঈশ্বর একটা সমুদ্র, আমি এক ফোঁটা জল, তাহাতে গিয়া মিশিব।

গুরু। উপাসনা-তত্ত্বের সার মর্ম্ম হিন্দুরা যেমন বুঝিয়াছিলেন, এমন আর কোন

জাতিই বুঝে নাই। এখন সে পরম রমণীয় ও সুসার উপাসনাপদ্ধতি এক দিকে আত্মপীড়নে, আর এক দিকে রঙ্গদারিতে পরিণত হইয়াছে।

শিষ্য। এখন আমাকে আর একটা কথা বুঝান। মনুষ্যে, প্রকৃত মনুষ্যত্বের, অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন স্বভাবের আদর্শ নাই, এজন্য ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বর অনন্তপ্রকৃতি। আমরা ক্ষুদ্রপ্রকৃতি। তাঁহার গুণগুলি সংখ্যায় অনন্ত, বিস্তারেও অনন্ত। যে ক্ষুদ্র, অনন্ত তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, না আকাশের অনুকরণে চাঁদোয়া খাটান যায়?

গুরু। এই জন্য ধর্ম্মেতিহাসের প্রয়োজন। ধর্ম্মেতিহাসের প্রকৃত আদর্শ নিউ টেষ্টেমেন্টের, এবং আমাদের পুরাণেতিহাসের প্রক্ষিপ্তাংশ বাদে সারভাগ। ধর্ম্মেতিহাসে (Religious History) প্রকৃত ধার্ম্মিকদিগের চরিত্র ব্যাখ্যাত থাকে। অনন্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা, অর্থাৎ যাঁহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বিবেচনা করা যায়, অথবা যাঁহাদিগকে মানবদেহধারী ঈশ্বর মনে করা যায়, তাঁহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন। এই জন্য যীশুখৃষ্ট খ্রীষ্টিয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ। কিন্তু এরূপ ধর্ম্মপরিবর্দ্ধক আদর্শ যেমন হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্ম্মপুস্তকে নাই—কোন জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ নাই। জনকাদি রাজর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, বশিষ্ঠাদি ব্রহ্মর্ষি, সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ। তাহার উপর শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, লক্ষ্মণ, দেবব্রত ভীষ্ম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ, আরও সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ। খৃষ্ট ও শাক্যসিংহ কেবল উদাসীন, কৌপীনধারী নির্ম্মম ধর্ম্মবেত্তা। কিন্তু ইঁহারা তা নয়। ইঁহারা সর্ব্বগুণবিশিষ্ট—ইঁহাদিগেতেই সর্ব্ববৃত্তি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। ইঁহারা সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন; কার্ম্মুকহস্তেও ধর্ম্মবেত্তা; রাজা হইয়াও পণ্ডিত; শক্তিমান্ হইয়াও সর্ব্বজনে প্রেমময়। কিন্তু এই সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, যাঁহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়—যুধিষ্ঠির যাঁহার কাছে ধর্ম্ম শিক্ষা করেন, স্বয়ং অর্জ্জুন যাঁহার শিষ্য, রাম ও লক্ষ্মণ যাঁহার অংশ মাত্র, যাঁহার তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখন মনুষ্যভাষায় কীর্ত্তিত হয় নাই। আইস, আজ তোমাকে কৃষ্ণোপাসনায় দীক্ষিত করি।

শিষ্য। সে কি? কৃষ্ণ!

গুরু। তোমরা কেবল জয়দেবের কৃষ্ণ বা যাত্রার কৃষ্ণ চেন—তাই শিহরিতেছ। তাহারও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝ না। তাহার পশ্চাতে, ঈশ্বরের সর্ব্বগুণসম্পন্ন যে কৃষ্ণচরিত্র কীর্ত্তিত আছে, তাহার কিছুই জান না। তাঁহার শারীরিক বৃত্তিসকল সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া অননুভবনীয় সৌন্দর্য্যে এবং অপরিমেয় বলে পরিণত; তাঁহার মানসিক বৃত্তিসকল সেইরূপ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বলোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্য্য এবং জ্ঞানে পরিণত, এবং প্রীতিবৃত্তির তদনুরূপ পরিণতিতে তিনি সর্ব্বলোকের সর্ব্বহিতে রত। তাই তিনি বলিয়াছেন—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

যিনি বাহুবলে দুষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, জ্ঞানবলে অপূর্ব্ব নিষ্কাম ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি কেবল প্রেমময় বলিয়া নিষ্কাম হইয়া এই সকল মনুষ্যের দুষ্কর কাজ করিয়াছেন, যিনি বাহুবলে সর্ব্বজয়ী এবং পরের সাম্রাজ্য স্থাপনের কর্ত্তা হইয়াও আপনি সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই, যিনি শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষমা করিয়া ক্ষমাগুণ প্রচার করিয়া, তার পর কেবল দণ্ডপ্রণেতৃত্ব প্রযুক্তই তাহার দণ্ড করিয়াছিলেন, যিনি সেই বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রবল সময়ে, বলিয়াছিলেন, "বেদে ধর্ম্ম নহে—ধর্ম্ম লোকহিতে"—তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। যিনি একাধারে শাক্যসিংহ, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র; যিনি সর্ব্ববলাধার, সর্ব্বগুণাধার, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, সর্ব্বত্র প্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি।

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ।
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥

পঞ্চম অধ্যায়—অনুশীলন

শিষ্য। অদ্য অবশিষ্ট কথা শ্রবণের বাসনা করি।

গুরু। সকল কথাই অবশিষ্টের মধ্যে। এখন আমরা পাইয়াছি কেবল দুইটা কথা। (১) মানুষের সুখ, মনুষ্যত্বে; (২) এই মনুষ্যত্ব, সকল বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যের সাপেক্ষ। এক্ষণে, এই বৃত্তিগুলি কি প্রকার, তাহার কিছু পর্য্যালোচনার প্রয়োজন।

বৃত্তিগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) শারীরিক ও (২) মানসিক। মানসিক বৃত্তিগুলির মধ্যে কতকগুলি জ্ঞান উপার্জ্জন করে, কতকগুলি কাজ করে, বা কার্য্যে প্রবৃত্তি দেয়, আর কতকগুলি জ্ঞান উপার্জ্জন করে না, কোন বিশেষ কার্য্যের প্রবর্ত্তকও নয়, কেবল আনন্দ অনুভূত করে। যেগুলির উদ্দেশ্য জ্ঞান, সেগুলিকে জ্ঞানার্জ্জনী বলিব। যেগুলির প্রবর্ত্তনায় আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, বা হইতে পারি, সেগুলিকে কার্যকারিণী বৃত্তি বলিব। আর যেগুলি কেবল আনন্দ অনুভূত করায়, সেগুলিকে আহ্লাদিনী বা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি বলা যাউক। জ্ঞান, কর্ম্ম, আনন্দ, এ ত্রিবিধবৃত্তির ত্রিবিধ ফল। সচ্চিদানন্দ এই ত্রিবিধ বৃত্তির প্রাপ্য।

শিষ্য। এই বিভাগ কি বিশুদ্ধ? সকল বৃত্তির পরিতৃপ্তিতেই ত আনন্দ।

গুরু। তা বটে। কিন্তু এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে, যাহাদিগের পরিতৃপ্তির ফল কেবল আনন্দ – আনন্দ ভিন্ন অন্য ফল নাই। জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির মুখ্য ফল জ্ঞানলাভ, গৌণ ফল আনন্দ। কার্য্যকারিণী বৃত্তির মুখ্য ফল কার্য্যে প্রবৃত্তি, গৌণ ফল আনন্দ। কিন্তু এগুলির মুখ্য ফলই আনন্দ—অন্য ফল নাই। পাশ্চাত্ত্যেরা ইহাকে Æsthetic Faculties বলেন।

শিষ্য। পাশ্চাত্ত্যেরা Æsthetic ত Intellectual বা Emotional মধ্যে ধরেন, কিন্তু আপনি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি পৃথক করিলেন।

গুরু। আমি ঠিক পাশ্চাত্ত্যদিগের অনুসরণ করিতেছি না। ভরসা করি, অনুসরণ করিতে বাধ্য নহি। সত্যের অনুসরণ করিলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। এখন মনুষ্যের সমুদায় শক্তিগুলিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা গেল। (১) শারীরিকী, (২) জ্ঞানার্জ্জনী, (৩) কার্য্যকারিণী, (৪) চিত্তরঞ্জিনী। এই চতুর্ব্বিধ বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যই মনুষ্যত্ব।

শিষ্য। ক্রোধাদি কার্য্যকারিণী বৃত্তি, এবং কামাদি শারীরিক বৃত্তি। এগুলিরও সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি কি মনুষ্যত্বের উপাদান ?

গুরু। এই চারি প্রকার বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া সে আপত্তির মীমাংসা করিতেছি।

শিষ্য। কিন্তু অন্য প্রকার আপত্তিও আছে। আপনি যাহা বলিলেন, তাহাতে ত নূতন কিছু পাইলাম না। সকলেই বলে, ব্যায়ামাদি দ্বারা শারীরিকী বৃত্তিগুলির পুষ্টি হয়। অনেকেই তাহা করে। আর যাহারা সক্ষম, তাহারা পোষ্যগণকে সুশিক্ষা দিয়া জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির স্ফূর্ত্তির জন্য যথেষ্ট যত্ন করিয়া থাকে—তাই সভ্য জগতে এত বিদ্যালয়। তৃতীয়তঃ—কার্য্যকারিণী বৃত্তির রীতিমত অনুশীলন যদিও তাদৃশ ঘটিয়া উঠে না বটে, তবু তাহার ঔচিত্য সকলেই স্বীকার করে। চতুর্থ চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির স্ফুরণও কতক বাঞ্ছনীয় বলিয়া যে জ্ঞান আছে, তাহার প্রমাণ সাহিত্য ও সূক্ষ্ম শিল্পের অনুশীলন। নূতন আমাকে কি শিখাইলেন ?

গুরু। এ সংসারে নূতন কথা বড় অল্পই আছে। বিশেষ, আমি যে কোন নূতন সম্বাদ লইয়া স্বর্গ হইতে সদ্য নামিয়া আসি নাই, ইহা তুমি এক প্রকার মনে স্থির করিয়া রাখিতে পার। আমার সব কথাই পুরাতন। নূতনে আমার নিজের বড় অবিশ্বাস। বিশেষ, আমি ধর্ম্মব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত। পুরাতন, নূতন নহে। আমি নূতন ধর্ম্ম কোথায় পাইব ?

শিষ্য। তবে শিক্ষাকে যে আপনি ধর্ম্মের অংশ বলিয়া খাড়া করিতেছেন, ইহাই দেখিতেছি নূতন।

গুরু। তাহাও নূতন নহে। শিক্ষা যে ধর্ম্মের অংশ, ইহা চিরকাল হিন্দুধর্ম্মে আছে। এই জন্য সকল হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রেই শিক্ষাপ্রণালী বিশেষ প্রকারে বিহিত হইয়াছে। হিন্দুর ব্রহ্মাচর্য্যাশ্রমের বিধি, কেবল পাঠ্যাবস্থার শিক্ষার বিধি। কত বৎসর ধরিয়া অধ্যয়ন করিতে হইবে, কি প্রণালীতে অধ্যয়ন করিতে হইবে, কি অধ্যয়ন করিতে হইবে, তাহার বিস্তারিত বিধান হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে। ব্রহ্মচর্য্যের পর গার্হস্থ্যাশ্রমও শিক্ষানবিশী মাত্র। ব্রহ্মচর্য্যে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিসকলের অনুশীলন ; গার্হস্থ্যে কার্য্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলন। এই দ্বিবিধ শিক্ষার বিধি সংস্থাপনের জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ব্যস্ত। আমিও সেই আর্য্য ঋষিদিগের পদারবিন্দ ধ্যানপূর্ব্বক, তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথেই যাইতেছি। তিন চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের জন্য যে বিধি সংস্থাপিত হইয়াছিল, আজিকার দিনে ঠিক সেই বিধিগুলি অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া চালাইতে পারা যায় না। সেই ঋষিরা যদি আজ ভারতবর্ষে বর্ত্তমান থাকিতেন, তবে তাঁহারাই বলিতেন "না, তাহা চলিবে না। আমাদিগের বিধিগুলির সর্ব্বাঙ্গ বজায় রাখিয়া এখন

যদি চল, তবে আমাদের প্রচারিত ধর্ম্মের মর্ম্মের বিপরীতাচরণ হইবে।" হিন্দুধর্ম্মের সেই মর্ম্মভাগ অমর; চিরকাল চলিবে, মনুষ্যের হিত সাধন করিবে; কেন না, মানবপ্রকৃতি তাহার ভিত্তি। তবে বিশেষ বিধি সকল, সকল ধর্ম্মেই সময়োচিত হয়। তাহা কালভেদে পরিহার্য্য বা পরিবর্ত্তনীয়। হিন্দুধর্ম্মের নব সংস্কারের এই স্থূল কথা।

শিষ্য। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, আপনি ইহার ভিতর অনেক বিলাতী কথা আনিয়া ফেলিতেছেন। শিক্ষা যে ধর্ম্মের অংশ, ইহা কোম্‌তের মত।

গুরু। হইতে পারে। এখন, হিন্দুধর্ম্মের কোন অংশের সঙ্গে যদি কোম্‌ত মতের কোথাও কোন সাদৃশ্য ঘটিয়া থাকে, তবে যবনস্পর্শদোষ ঘটিয়াছে বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের সেটুকু ফেলিয়া দিতে হইবে কি? খ্রীষ্টধর্ম্মে ঈশ্বরোপাসনা আছে বলিয়া, হিন্দুদিগকে ঈশ্বরোপাসনা পরিত্যাগ করিতে হইবে কি? সে দিন নাইন্টীন্থ সেঞ্চুরিতে হর্বর্ট স্পেন্সর কোম্‌ত মত প্রতিবাদে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা মর্ম্মতঃ বেদান্তের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদ। স্পিনোজার মতের সঙ্গেও বেদান্ত মতের সাদৃশ্য আছে। বেদান্তের সঙ্গে হর্বর্ট স্পেন্সরের বা স্পিনোজার মতের সাদৃশ্য ঘটিল বলিয়া বেদান্তটা হিন্দুয়ানির বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে কি? আমি স্পেন্সরি বা স্পিনোজীয় বলিয়া বেদান্ত ত্যাগ করিব না—বরং স্পিনোজা বা স্পেন্সরকে ইউরোপীয় হিন্দু বলিয়া হিন্দুমধ্যে গণ্য করিব। হিন্দুধর্ম্মের যাহা স্থূল ভাগ, ইউরোপ হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তাহার একটু আধটু ছুঁইতে পারিতেছেন, হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার ইহা সামান্য প্রমাণ নহে।

শিষ্য। যাই হউক। গণিত বা ব্যায়াম শিক্ষা যদি ধর্ম্মের শাসনাধীন হইল, তবে ধর্ম্ম ছাড়া কি?

গুরু। কিছুই ধর্ম্ম ছাড়া নহে। ধর্ম্ম যদি যথার্থ সুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্যজীবনের সর্ব্বাংশই ধর্ম্ম কর্ত্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম। অন্য ধর্ম্মে তাহা হয় না, এজন্য অন্য ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ; কেবল হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণ ধর্ম্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস যে, কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়া ধর্ম্ম। হিন্দুর কাছে, ইহকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ—সকল লইয়া ধর্ম্ম। এমন সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বসুখময়, পবিত্র ধর্ম্ম কি আর আছে?

ষষ্ঠ অধ্যায়—সামঞ্জস্য

শিষ্য। বৃত্তির অনুশীলন কি, তাহা বুঝিলাম। এখন সে সকলের সামঞ্জস্য কি, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। শারীরিক প্রভৃতি বৃত্তিগুলি কি সকলই তুল্যরূপে অনুশীলিত করিতে হইবে? কাম, ক্রোধ, বা লোভের যেরূপ অনুশীলন, ভক্তি, প্রীতি, দয়ারও কি সেইরূপ অনুশীলন করিব? পূর্ব্বগামী ধর্ম্মবেত্তৃগণ বলিয়া থাকেন যে, কাম ক্রোধাদির দমন করিবে, এবং ভক্তিপ্রীতিদয়াদির অপরিমিত অনুশীলন করিবে। তাহা যদি সত্য হয়, তবে সামঞ্জস্য কোথায় রহিল?

গুরু। ধর্ম্ম বেত্তৃগণ যাহা বলিয়া আসিয়াছেন, তাহা সুসঙ্গত, এবং তাহার বিশেষ কারণ আছে। ভক্তিপ্রীতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলির সম্প্রসারণশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এবং এই বৃত্তিগুলির অধিক সম্প্রসারণেই অন্য বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য ঘটে। সমুচিত স্ফূর্ত্তি

ও সামঞ্জস্য যাহাকে বলিয়াছি, তাহার এমন তাৎপর্য্য নহে যে, সকল বৃত্তিগুলিই তুল্যরূপে স্ফুরিত ও বর্দ্ধিত হইবে। সকল শ্রেণীর বৃক্ষের সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্যে সুরম্য উদ্যান হয়। কিন্তু এখানে সমুচিত বৃদ্ধির এমন অর্থ নহে যে, তাল ও নারিকেল বৃক্ষ যত বড় হইবে, মল্লিকা বা গোলাপের তত বড় আকার হওয়া চাই। যে বৃক্ষের যেমন সম্প্রসারণশক্তি, সে ততটা বাড়িবে। এক বৃক্ষের অধিক বৃদ্ধির জন্য যদি অন্য বৃক্ষ সমুচিত বৃদ্ধি না পায়, যদি তেঁতুলের আওতায় গোলাপের কেয়ারি শুকাইয়া যায়, তবে সামঞ্জস্যের হানি হইল। মনুষ্যচরিত্রেও সেইরূপ। কতকগুলি বৃত্তি—যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়া,—ইহাদিগের সম্প্রসারণশক্তি অন্যান্য বৃত্তির অপেক্ষা অধিক ; এবং এই গুলির অধিক সম্প্রসারণই সমুচিত স্ফূর্ত্তি, ও সকল বৃত্তির সামঞ্জস্যের মূল। পক্ষান্তরে আরও কতকগুলি বৃত্তি আছে ; প্রধানতঃ কতকগুলি শারীরিক বৃত্তি,—সেগুলিও অধিক সম্প্রসারণশক্তিশালিনী। কিন্তু সেগুলির অধিক সম্প্রসারণে অন্যান্য বৃত্তির সমুচিত স্ফূর্ত্তির বিঘ্ন হয়। সুতরাং সেগুলি যত দূর স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে, তত দূর স্ফূর্ত্তি পাইতে দেওয়া অকর্ত্তব্য। সেগুলি তেঁতুলগাছ, তাহার আওতায় গোলাপের কেয়ারি মরিয়া যাইতে পারে। আমি এমন বলিতেছি না যে, সেগুলি বাগান হইতে উচ্ছেদ করিয়া ফেলিয়া দিবে। তাহা অকর্ত্তব্য ; কেন না, অগ্নে প্রয়োজন আছে—নিকৃষ্ট বৃত্তিতেও প্রয়োজন আছে। সে সকল কথা সবিস্তারে পরে বলিতেছি। তেঁতুলগাছ বাগান হইতে উচ্ছেদ করিবে না বটে, কিন্তু তাহার স্থানে এক কোণে। বড় বাড়িতে না পায় —বাড়িলেই ছাঁটিয়া দিবে। দুই একখানা তেঁতুল ফলিলেই হইল—তার বেশী আর না বাড়িতে পারে। নিকৃষ্ট বৃত্তির সাংসারিক প্রয়োজনসিদ্ধির উপযোগী স্ফূর্ত্তি হইলেই হইল—তাহার বেশী আর বৃদ্ধি যেন না পায়। ইহাকেই সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্য বলিয়াছি।

শিষ্য। তবেই বুঝিলাম যে, এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে—যথা কামাদি, যাহার দমনই সমুচিত স্ফূর্ত্তি।

গুরু। দমন অর্থে যদি ধ্বংস বুঝ, তবে এ কথা ঠিক নহে। কামের ধ্বংসে, মনুষ্য জাতির ধ্বংস ঘটিবে। সুতরাং এই অতি কদর্য্য বৃত্তিরও ধ্বংস ধর্ম্ম নহে—অধর্ম্ম। আমাদের পরম রমণীয় হিন্দুধর্ম্মেরও এই বিধি। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ইহার ধ্বংস বিহিত করেন নাই, এবং ধর্ম্মার্থ তাহার নিয়োগই বিহিত করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পুত্রোৎপাদন এবং বংশরক্ষা ধর্ম্মের অংশ। তবে ধর্ম্মের প্রয়োজনাতিরিক্ত এই বৃত্তির যে স্ফূর্ত্তি, তাহা হিন্দুশাস্ত্রানুসারেও নিষিদ্ধ—এবং তদনুগামী এই ধর্ম্মব্যাখ্যা যাহা তোমাকে শুনাইতেছি, তাহাতেও নিষিদ্ধ হইতেছে। কেন না, বংশরক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয়, তাহার অতিরিক্ত যে স্ফূর্ত্তি, তাহা সামঞ্জস্যের বিঘ্নকর, এবং উচ্চতর বৃত্তিসকলের স্ফূর্ত্তিরোধক। যদি অনুচিত স্ফূর্ত্তিরোধকে দমন বল, তবে এ সকল বৃত্তির দমনই সমুচিত অনুশীলন। এই অর্থে ইন্দ্রিয় দমনই পরম ধর্ম্ম।

শিষ্য। এই বৃত্তিটার লোকরক্ষার্থ একটা প্রয়োজন আছে বটে, এই জন্য আপনি এ সকল কথা বলিতে পারিলেন, কিন্তু অপরাপর অপকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে এ সকল কথা খাটে না।

গুরু। সকল অপকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে এই কথা খাটিবে। কোন্‌টির সম্বন্ধে খাটে না?

শিষ্য। মনে করুন ক্রোধ। ক্রোধের উচ্ছেদে আমি ত কোন অনিষ্ট দেখি না।

গুরু। ক্রোধ আত্মরক্ষা ও সমাজরক্ষার মূল। দণ্ডনীতি—বিধিবদ্ধ সামাজিক ক্রোধ। ক্রোধের উচ্ছেদে দণ্ডনীতির উচ্ছেদ হইবে। দণ্ডনীতির উচ্ছেদ সমাজের উচ্ছেদ।

শিষ্য। দণ্ডনীতি ক্রোধমূলক বলিয়া আমি স্বীকার করিতে পারিলাম না, বরং দয়ামূলক বলা ইহার অপেক্ষা ভাল হইতে পারে। কেন না, সর্ব্বলোকের মঙ্গল কামনা করিয়াই, দণ্ডশাস্ত্রপ্রণেতারা দণ্ডবিধি উদ্ভূত করিয়াছেন। এবং সর্ব্বলোকের মঙ্গল কামনা করিয়া রাজা দণ্ড প্রণয়ন করিয়া থাকেন।

গুরু। আত্মরক্ষার কথাটা বুঝিয়া দেখ। অনিষ্টকারীকে নিবারণ করিবার ইচ্ছাই ক্রোধ। সেই ক্রোধের বশীভূত হইয়াই আমরা অনিষ্টকারীর বিরোধী হই। এই বিরোধই আত্মরক্ষার চেষ্টা। হইতে পারে যে, আমরা কেবল বুদ্ধিবলেই স্থির করিতে পারি যে, অনিষ্টকারীর নিবারণ করা উচিত। কিন্তু কেবল বুদ্ধি দ্বারা কার্য্যে প্রেরিত হইলে, ক্রুদ্ধের যে ক্ষিপ্রকারিতা এবং আগ্রহ, তাহা আমরা কদাচ পাইব না। তার পর যখন মনুষ্য পরকে আত্মবৎ দেখিতে চেষ্টা করে, তখন এই আত্মরক্ষা ও পররক্ষা তুল্যরূপেই ক্রোধের ফল হইয়া দাঁড়ায়। পররক্ষায় চেষ্টিত যে ক্রোধ, তাহা বিধিবদ্ধ হইলে দণ্ডনীতি হইল।

শিষ্য। লোভে ত আমি কিছু ধর্ম্ম দেখি না।

গুরু। যে বৃত্তির অনুচিত স্ফূর্ত্তিকে লোভ বলা যায়, তাহার উচিত এবং সমঞ্জসীভূত স্ফূর্ত্তি—ধর্ম্মসঙ্গত অর্জ্জনস্পৃহা। আপনার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, এবং আমার উপর যাহাদের রক্ষার ভার আছে, তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, তাহার সংগ্রহ অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ পরিমিত অর্জ্জনে—কেবল ধনার্জ্জনের কথা বলিতেছি না, ভোগ্য বস্তু মাত্রেরই অর্জ্জনের কথা বলিতেছি—কোন দোষ নাই। সেই পরিমিত মাত্রা ছাপাইয়া উঠিলেই এই সদ্বৃত্তি লোভে পরিণত হইল। অনুচিত স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইল বলিয়া উহা তখন মহাপাপ হইয়া দাঁড়াইল। দুইটি কথা বুঝ যেগুলিকে আমরা নিকৃষ্ট বৃত্তি বলি, তাহাদের সকলগুলিই উচিত মাত্রায় ধর্ম্ম, অনুচিত মাত্রায় অধর্ম্ম। আর এই বৃত্তিগুলি এমনই তেজস্বিনী যে, যত্ন না করিলে এগুলি সচরাচর উচিত মাত্রা অতিক্রম করিয়া উঠে এ জন্য দমনই এগুলি সম্বন্ধে প্রকৃত অনুশীলন। এই দুটি কথা বুঝিলেই তুমি অনুশীলনতত্ত্বের এ অংশ বুঝিলে। দমনই প্রকৃত অনুশীলন, কিন্তু উচ্ছেদ নহে। মহাদেব, মন্মথের অনুচিত স্ফূর্ত্তি দেখিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, কিন্তু লোকহিতার্থ আবার তাহাকে

* মন্মথ ধ্বংস হইল, অথচ রতি হইতে জীবলোক রক্ষা পাইতে পারে না, এজন্য মন্মথের পুনর্জ্জীবন। পক্ষান্তরে আবার রতি কর্ত্তৃক পুনর্জ্জন্মলব্ধ কাম প্রতিপালিত হইলেন; এ কথাটাও যেন মনে থাকে। অনুচিত অনুশীলনেই অনুচিত স্ফূর্ত্তি। পৌরাণিক উপাখ্যানগুলির এইরূপ গূঢ় তাৎপর্য্য অনুভূত করিতে পারিলে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম আর উপধর্ম্মসঙ্কুল বা "Silly" বলিয়া বোধ হইবে না। সময়ান্তরে দুই একটা উদাহরণ দিব।

পুনর্জ্জীবিত করিতে হইল।* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণের যে উপদেশ, তাহাতেও ইন্দ্রিয়ের উচ্ছেদ উপদিষ্ট হয় নাই, দমনই উপদিষ্ট হইয়াছে। সংযত হইলে সে সকল আর শান্তির বিঘ্নকর হইতে পারে না, যথা—

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ২। ৬৪।

শিষ্য। যাই হউক, এ তত্ত্ব লইয়া আর অধিক কালহরণের প্রয়োজন নাই। ভক্তি, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিসকলের অনুশীলন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন।

গুরু। এ বিষয়ে এত কথা বলিবার আমারও ইচ্ছা ছিল না। দুই কারণে বলিতে বাধ্য হইলাম। প্রথম তোমার আপত্তি খণ্ডন করিতে হইল। আর আজকাল যোগ-ধর্ম্মের একটা হুজুক উঠিয়াছে, তাহাতে কিছু বিরক্ত হইয়াছি। এই ধর্ম্মের ফলাফল সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহার যে সুমহৎ ফল আছে, তাহাতে সন্দেহ কি? তবে যাঁহারা এই হুজুক লইয়া বেড়ান, তাঁহাদের মত এই দেখিতে পাই যে, কতকগুলি বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীণ উচ্ছেদ, কতকগুলির প্রতি অমনোযোগ, এবং কতক-গুলির সমধিক সম্প্রসারণ—ইহাই যোগের উদ্দেশ্য। এখন যদি সকল বৃত্তির উচিত স্ফূর্ত্তি ও সামঞ্জস্য ধর্ম্ম হয়, তবে তাঁহাদিগের এই ধর্ম্ম অধর্ম্ম। বৃত্তি নিকৃষ্ট হউক বা উৎকৃষ্ট হউক, উচ্ছেদমাত্র অধর্ম্ম। লম্পট বা পেটুক অধার্ম্মিক; কেন না, তাহারা আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া দুই একটির সমধিক অনুশীলনে নিযুক্ত। যোগীরাও অধার্ম্মিক; কেন না, তাঁহারাও আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া, দুই একটির সমধিক অনুশীলন করেন। নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বৃত্তিভেদে না হয় লম্পট বা উদরম্ভরীকে নীচ শ্রেণীর অধার্ম্মিক বলিলাম এবং যোগীদিগকে উচ্চশ্রেণীর অধার্ম্মিক বলিলাম, কিন্তু উভয়কেই অধার্ম্মিক বলিব। আর আমি কোন বৃত্তিকে নিকৃষ্ট বা অনিষ্টকর বলিতে সম্মত নহি। আমাদের দোষে অনিষ্ট ঘটে বলিয়া সেগুলিকে নিকৃষ্ট কেন বলিব? জগদীশ্বর আমাদিগকে নিকৃষ্ট কিছুই দেন নাই। তাঁহার কাছে নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভেদ নাই। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা স্ব স্ব কার্য্যোপযোগী করিয়াছেন। কার্য্যোপ-যোগী হইলেই উৎকৃষ্ট হইল। সত্য বটে জগতে অমঙ্গল আছে। কিন্তু সে অমঙ্গল, মঙ্গলের সঙ্গে এমন সম্বন্ধবিশিষ্ট, যে তাহাকে মঙ্গলের অংশ বিবেচনা করাই কর্ত্তব্য। আমাদের সকল বৃত্তিগুলিই মঙ্গলময়। যখন তাহাতে অমঙ্গল হয়, সে আমাদেরই দোষে। জগত্তত্ত্ব যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই বুঝিবে যে, আমাদের মঙ্গলের সঙ্গেই জগৎ সম্বন্ধ। নিখিল বিশ্বের সর্ব্বাংশই মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিরই অনুকূল। প্রকৃতি আমাদের সকল বৃত্তিগুলিরই সহায়। তাই যুগপরম্পরায় মনুষ্যজাতির মোটের উপর উন্নতিই হইয়াছে, মোটের উপর অবনতি নাই। ধর্ম্মই এই উন্নতির কারণ। যে বৈজ্ঞানিক নাস্তিক ধর্ম্মকে উপহাস করিয়া বিজ্ঞানই এই উন্নতির কারণ বলেন, তিনি জানেন না যে, তাঁহার বিজ্ঞানও এই ধর্ম্মের এক অংশ, তিনিও একজন ধর্ম্মের আচার্য্য। তিনি যখন "Law"র মহিমা কীর্ত্তন করেন, আর আমি যখন হরিনাম করি, দুই জন একই কথা বলি। দুই জনে একই বিশ্বেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করি। মনুষ্যমধ্যে ধর্ম্ম লইয়া এত বিবাদ বিসম্বাদ কেন, আমি বুঝিতে পারি না।

সপ্তম অধ্যায়—সামঞ্জস্য ও সুখ

গুরু। এক্ষণে নিকৃষ্ট কার্য্যকারিণী বৃত্তির কথা ছাড়িয়া দিয়া, যাহাকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বল, সে সকলের কথা বলি শুন।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন, কতকগুলি কার্য্যকারিণী বৃত্তি, যথা ভক্ত্যাদি অধিক সম্প্রসারণে সক্ষম, এবং তাহাদিগের অধিক সম্প্রসারণেই সকল বৃত্তির সামঞ্জস্য। আর কতকগুলি বৃত্তি আছে, যথা কামাদি, সেগুলিও অধিক সম্প্রসারণে সক্ষম, সেগুলির অধিক সম্প্রসারণে সামঞ্জস্যের ধ্বংস। কতকগুলির সম্প্রসারণের আধিক্যে সামঞ্জস্য, কতকগুলির সম্প্রসারণের আধিক্যে অসামঞ্জস্য, এমন ঘটে কেন, তাহা বুঝান নাই। আপনি বলিয়াছেন যে, কামাদির অধিক স্ফুরণে, অন্যান্য বৃত্তি, যথা ভক্তি প্রীতি দয়া, এ সকলের উত্তম স্ফূর্ত্তি হয় না, এই জন্য অসামঞ্জস্য ঘটে। কিন্তু ভক্তি প্রীতি দয়াদির অধিক স্ফুরণেও কাম ক্রোধাদির উত্তম স্ফূর্ত্তি হয় না; ইহাতে অসামঞ্জস্য ঘটে না কেন?

গুরু। যেগুলি শারীরিক বৃত্তি বা পাশব বৃত্তি, যাহা পশুদিগেরও আছে এবং আমাদিগেরও আছে, সেগুলি জীবনরক্ষা বা বংশরক্ষা জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইহাতে সহজেই বুঝা যায়, সেগুলি স্বতঃস্ফূর্ত—অনুশীলনসাপেক্ষ নহে। আমাদিগকে অনুশীলন করিয়া ক্ষুধা আনিতে হয় না, অনুশীলন করিয়া ঘুমাইবার শক্তি অর্জ্জন করিতে হয় না। দেখিও, স্বতঃস্ফূর্ত্তে ও সহজে গোল করিও না। যাহা আমাদের সঙ্গে জন্মিয়াছে, তাহা সহজ। সকল বৃত্তিই সহজ। কিন্তু সকল বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত, তাহা অন্য বৃত্তির অনুশীলনে বিলুপ্ত হইতে পারে না।

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে, তাহাই বা অন্য বৃত্তির অনুশীলনে বিলুপ্ত হইবে কেন?

গুরু। অনুশীলন জন্য তিনটি সামগ্রী প্রয়োজনীয়। (১) সময়, (২) শক্তি (Energy), (৩) যাহা লইয়া বৃত্তির অনুশীলন করিব—অনুশীলনের উপাদান। এখন আমাদিগের সময় ও শক্তি উভয় সঙ্কীর্ণ। মনুষ্যজীবন কয়েক বৎসর মাত্র পরিমিত। জীবিকা নির্ব্বাহের কার্য্যের পর বৃত্তির অনুশীলন জন্য যে সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহার কিছুমাত্র অপব্যয় হইলে সকল বৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের উপযোগী সময় পাওয়া যাইবে না। অপব্যয় না হয়, তাহার জন্য এই নিয়ম করিতে হয় যে, যে বৃত্তি অনুশীলনসাপেক্ষ নহে, অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত্ত, তাহার অনুশীলন জন্য সময় দিব না; যাহা অনুশীলনসাপেক্ষ, তাহার অনুশীলনে সকল সময়টুকু দিব। যদি তাহা না করিয়া, স্বতঃস্ফূর্ত্ত বৃত্তির অনাবশ্যক অনুশীলনে সময় হরণ করি, তবে সময়াভাবে অন্য বৃত্তিগুলির উপযুক্ত অনুশীলন হইবে না। কাজেই সে সকলের খর্ব্বতা বা বিলোপ ঘটিবে। দ্বিতীয়তঃ শক্তি সম্বন্ধেও ঐ কথা খাটে। আমাদের কাজ করিবার মোট যে শক্তিটুকু আছে, তাহাও পরিমিত। জীবিকানির্ব্বাহের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত বৃত্তির অনুশীলন জন্য বড় বেশী থাকে না। বিশেষ, পাশব বৃত্তির সমধিক অনুশীলন, শক্তিক্ষয়কারী। তৃতীয়তঃ, স্বতঃস্ফূর্ত্ত পাশব বৃত্তির অনুশীলনের উপাদান ও মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের উপাদান পরস্পর বড় বিরোধী। যেখানে ওগুলি থাকে, সেখানে এগুলি থাকিতে পারে না। বিলাসিনী-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তীর হৃদয়ে ঈশ্বরের বিকাশ অসম্ভব এবং ক্রুদ্ধ অস্ত্রধারীর নিকট ভিক্ষার্থীর

সমাগম অসম্ভব। আর শেষ কথা এই যে, পাশব বৃত্তিগুলি শরীর ও জাতি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বলিয়া, পুরুষপরম্পরাগত স্ফূর্ত্তিজন্যই হউক, বা জীবরক্ষাভিলাষী ঈশ্বরের ইচ্ছায়ই হউক, এমন বলবতী যে, অনুশীলনে তাঁহার সমস্ত হৃদয় পরিব্যাপ্ত করে, আর কোন বৃত্তিরই স্থান হয় না। এইটি বিশেষ কথা।

পক্ষান্তরে, যে বৃত্তিগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে, তাহার অনুশীলনে আমাদের সমস্ত অবসর ও জীবিকানির্ব্বাহাবশিষ্ট শক্তির নিয়োগ করিলে, স্বতঃস্ফূর্ত্ত বৃত্তির আবশ্যকীয় স্ফূর্ত্তির কোন বিঘ্ন হয় না। কেন না, সেগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত। কিন্তু উপাদানবিরোধহেতু, তাহাদের দমন হইতে পারে বটে। কিন্তু ইহা দেখা গিয়াছে যে, এ সকলের দমনই যথার্থ অনুশীলন।

শিষ্য। কিন্তু যোগীরা অন্য বৃত্তির সম্প্রসারণ দ্বারা—কিম্বা উপায়ান্তরের দ্বারা, পাশব বৃত্তিগুলির ধ্বংস করিয়া থাকেন, এ কথা কি সত্য নয়?

গুরু। চেষ্টা করিলে যে কামাদির উচ্ছেদ করা যায় না, এমত নহে। কিন্তু সে ব্যবস্থা অনুশীলন ধর্ম্মের নহে, সন্ন্যাসধর্ম্মের। সন্ন্যাসকে আমি ধর্ম্ম বলি না—অন্ততঃ সম্পূর্ণ ধর্ম্ম বলি না। অনুশীলন প্রবৃত্তিমার্গ—সন্ন্যাস নিবৃত্তিমার্গ। সন্ন্যাস অসম্পূর্ণ ধর্ম্ম। ভগবান্ স্বয়ং কর্ম্মেরই শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অনুশীলন কর্ম্মাত্মক।

শিষ্য। যাক্। তবে আপনার সামঞ্জস্য তত্ত্বের স্থূল নিয়ম একটা এই বুঝিলাম যে, যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত, তাহা বাড়িতে দিব না, যে বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে, তাহা বাড়িতে দিতে পারি। কিন্তু ইহাতে একটা গোলযোগ ঘটে। প্রতিভা (Genius) কি স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে? প্রতিভা একটি কোন বিশেষ বৃত্তি নহে, তাহা আমি জানি। কিন্তু কোন বিশেষ মানসিক বৃত্তি স্বতঃস্ফূর্ত্তিমতী বলিয়া তাহাকে কি বাড়িতে দিব না? তাহার অপেক্ষা আত্মহত্যা ভাল।

গুরু। ইহা যথার্থ।

শিষ্য। ইহা যদি যথার্থ হয়, তবে এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি, আর এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না, ইহা কোন্ লক্ষণ দেখিয়া নির্ব্বাচন করিব? কোন্ কষ্টিপাথরে ঘসিয়া ঠিক করিব যে, এইটি সোনা, এইটি পিতল।

গুরু। আমি বলিয়াছি যে, সুখের উপায় ধর্ম্ম, আর মনুষ্যত্বেই সুখ। অতএব সুখই সেই কষ্টিপাথর।

শিষ্য। বড় ভয়ানক কথা। আমি যদি বলি, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিই সুখ?

গুরু। তাহা বলিতে পার না। কেন না, সুখ কি, তাহা বুঝাইয়াছি। আমাদের সমুদায় বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি, সামঞ্জস্য এবং উপযুক্ত পরিতৃপ্তিই সুখ।

শিষ্য। সে কথাটা এখনও আমার ভাল করিয়া বুঝা হয় নাই। সকল বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তির সমবায় সুখ? না প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তিই সুখ?

গুরু। সমবায়ই সুখ। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তি সুখের অংশ মাত্র।

শিষ্য। তবে কষ্টিপাথর কোন্‌টা? সমবায় না অংশ?

গুরু। সমবায়ই কষ্টিপাথর।

শিষ্য। এ ত বুঝিতে পারিতেছি না। মনে করুন, আমি ছবি আঁকিতে পারি।

কতকগুলি বৃত্তিবিশেষের পরিমার্জ্জনে এ শক্তি জন্মে। কথাটা এই যে, সেই বৃত্তিগুলির সমধিক সম্প্রসারণ আমার কর্ত্তব্য কি না, আপনাকে এ প্রশ্ন করিলে আপনি বলিবেন, "সকল বৃত্তির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও চরিতার্থতার সমবায় যে সুখ, তাহার কোন বিঘ্ন হইবে কি না, এ কথা বুঝিয়া তবে চিত্রবিদ্যার অনুশীলন কর।" আমার তুলি ধরিবার আগে আমাকে গণনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, ইহাতে আমার মাংসপেশীর বল, শিরা ধমনীর স্বাস্থ্য, চক্ষের দৃষ্টি, শ্রবণের শ্রুতি—আমার ঈশ্বরে ভক্তি, মনুষ্যে প্রীতি, দীনে দয়া, সত্যে অনুরাগ—আমার অপত্যে স্নেহ, শত্রুতে ক্রোধ,—আমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, দার্শনিক ধৃতি,—আমার কাব্যের কল্পনা, সাহিত্যের সমালোচনা—কোন দিকে কিছুর কোন বিঘ্ন হয় কি না। ইহাও কি সাধ্য ?

গুরু। কঠিন বটে নিশ্চিত জানিও। ধর্ম্মাচরণ ছেলেখেলা নহে। ধর্ম্মাচরণ অতি দুরূহ ব্যাপার। প্রকৃত ধার্ম্মিক যে পৃথিবীতে এত বিরল, তাহার কারণই তাই। ধর্ম্ম সুখের উপায় বটে, কিন্তু সুখ বড় আয়াসলভ্য। সাধনা অতি দুরূহ। দুরূহ, কিন্তু অসাধ্য নহে।

শিষ্য। কিন্তু ধর্ম্ম ত সর্ব্বসাধারণের উপযোগী হওয়া উচিত।

গুরু। ধর্ম্ম, যদি তোমার আমার গড়িবার সামগ্রী হইত, ত না হয়, তুমি যাহাকে সাধারণের উপযোগী বলিতেছ, সেইরূপ করিয়া গড়িতাম। ফরমায়েস মত জিনিস গড়িয়া দিতাম। কিন্তু ধর্ম্ম তোমার আমার গড়িবার নহে। ধর্ম্ম ঐশিক নিয়মাধীন। যিনি ধর্ম্মের প্রণেতা, তিনি ইহাকে যেরূপ করিয়াছেন, সেইরূপ আমাকে বুঝাইতে হইবে। তবে ধর্ম্মকে সাধারণের অনুপযোগীও বলা উচিত নহে। চেষ্টা করিলে, অর্থাৎ অনুশীলনের দ্বারা সকলেই ধার্ম্মিক হইতে পারে। আমার বিশ্বাস যে, এক সময়ে সকল মনুষ্যই ধার্ম্মিক হইবে। যত দিন তাহা না হয়, তত দিন তাহারা আদর্শের অনুসরণ করুক। আদর্শ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। তাহা হইলেই তোমার এ আপত্তি খণ্ডিত হইবে।

শিষ্য। আমি যদি বলি যে, আপনার ওরূপ একটা পারিভাষিক এবঞ্চ দুষ্প্রাপ্য সুখ মানি না, আমার ইন্দ্রিয়াদির পরিতৃপ্তিই সুখ ?

গুরু। তাহা হইলে আমি বলিব, সুখের উপায় ধর্ম্ম নহে, সুখের উপায় অধর্ম্ম।

শিষ্য। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি কি সুখ নহে ? ইহাও বৃত্তির স্ফুরণ ও চরিতার্থতা বটে। আমি ইন্দ্রিয়গণকে খর্ব্ব করিয়া, কেন দয়া দাক্ষিণ্যাদির সমধিক অনুশীলন করিব, আপনি তাহার উপযুক্ত কোন কারণ দেখান নাই। আপনি ইহা বুঝাইয়াছেন বটে যে, ইন্দ্রিয়াদির অধিক অনুশীলনে দয়া দাক্ষিণ্যাদির ধ্বংস সম্ভাবনা—কিন্তু তদুত্তরে আমি যদি বলি যে, ধ্বংস হউক, আমি ইন্দ্রিয়সুখে বঞ্চিত হই কেন ?

গুরু। তাহা হইলে আমি বলিব, তুমি কিষ্কিন্ধ্যা হইতে পথ ভুলিয়া আসিয়াছ। যাহা হউক, তোমার কথার আমি উত্তর দিব। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি সুখ ? ভাল, তাই হউক। আমি তোমাকে অবাধে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতে অনুমতি দিতেছি। আমি খত লিখিয়া দিতেছি যে, এই ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতে কখন কেহ কোন বাধা দিবে না, কেহ নিন্দা করিবে না,—যদি কেহ করে, আমি গুণাগারি দিব। কিন্তু তোমাকেও

একখানি খত লিখিয়া দিতে হইবে। তুমি লিখিয়া দিবে যে, "আর ইহাতে সুখ নাই" বলিয়া তুমি ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ছাড়িয়া দিবে না। শ্রান্তি, ক্লান্তি, রোগ, মনস্তাপ, আয়ুক্ষয়, পশুত্বে অধঃপতন প্রভৃতি কোনরূপ ওজর আপত্তি করিয়া ইহা কখন ছাড়িতে পারিবে না। কেমন, রাজি আছ?

শিষ্য। দোহাই মহাশয়ের! আমি নই। কিন্তু এমন লোক কি সর্ব্বদা দেখা যায় না, যাহারা যাবজ্জীবন ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিই সার করে? অনেক লোকই ত এইরূপ?

গুরু। আমরা মনে করি বটে, এমন লোক অনেক। কিন্তু ভিতরের খবর রাখি না। ভিতরের খবর এই—যাহাদিগকে যাবজ্জীবন ইন্দ্রিয়পরায়ণ দেখি, তাহাদিগের ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি চেষ্টা বড় প্রবল বটে, কিন্তু তেমন পরিতৃপ্তি ঘটে নাই। যেরূপ তৃপ্তি ঘটিলে ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দুঃখটা বুঝা যায়, সে তৃপ্তি ঘটে নাই। তৃপ্তি ঘটে নাই বলিয়াই চেষ্টা এত প্রবল। অনুশীলনের দোষে, হৃদয়ে আগুন জ্বলিয়াছে,—দাহ নিবারণের জন্য তারা জল খুঁজিয়া বেড়ায়; জানে না যে, অগ্নিদগ্ধের ঔষধ জল নয়।

শিষ্য। কিন্তু এমনও দেখি যে, অনেক লোক অবাধে অনুক্ষণ ইন্দ্রিয়বিশেষ চরিতার্থ করিতেছে, বিরাগও নাই। মদ্যপ ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল। অনেক মাতাল আছে, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মদ খায়, কেবল নিদ্রিত অবস্থায় ক্ষান্ত। কই, তাহারা ত মদ ছাড়ে না—ছাড়িতে চায় না।

গুরু। একে একে বাপু। আগে "ছাড়ে না" কথাটাই বুঝ। ছাড়ে না, তাহার কারণ আছে। ছাড়িতে পারে না। ছাড়িতে পারে না, কেন না, এটি ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির লালসা মাত্র নহে—এ একটি পীড়া। ডাক্তারেরা ইহাকে Dipsomania বলেন। ইহার ঔষধ আছে—চিকিৎসা আছে। রোগী মনে করিলেই রোগ ছাড়িতে পারে না। সেটা চিকিৎসকের হাত। চিকিৎসা নিষ্ফল হইলে রোগের যে অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, তাহা ঘটে;—মৃত্যু আসিয়া রোগ হইতে মুক্ত করে। ছাড়ে না, তাহার কারণ এই। "ছাড়িতে চায় না"—এ কথা সত্য নয়। যে মুখে যাহা বলুক, তুমি যে শ্রেণীর মাতালের কথা বলিলে, তাহাদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, মদ্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মনে মনে অত্যন্ত কাতর নহে। যে মাতাল সপ্তাহে এক দিন মদ খায়, সেই আজিও বলে "মদ ছাড়িব কেন?" তাহার মদ্যপানের আকাঙ্ক্ষা আজিও পরিতৃপ্ত হয় নাই—তৃষ্ণা বলবতী আছে। কিন্তু যাহার মাত্রা পূর্ণ হইয়াছে, সে জানে যে, পৃথিবীতে যত দুঃখ আছে, মদ্যপানের অপেক্ষা বড় দুঃখ বুঝি আর নাই। এ সকল কথা মদ্যপ সম্বন্ধেই যে খাটে, এমত নহে। সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়পরায়ণের পক্ষে খাটে। কামুকের অনুচিত অনুশীলনের ফলও একটি রোগ। তাহারও চিকিৎসা আছে এবং পরিণামে অকালমৃত্যু আছে। এইরূপ একটি রোগীর কথা আমি আমার কোন চিকিৎসক বন্ধুর কাছে এইরূপ শুনিলাম যে, তাহাকে হাসপাতালে লইয়া গিয়া তাহার হাত পা বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল, এবং সে ইচ্ছামত অঙ্গ সঞ্চালন করিতে না পারে, এজন্য লাইকরলিটি দিয়া তাহার অঙ্গের স্থানে স্থানে ঘা করিয়া দিতে হইয়াছিল। ঔদরিকের কথা সকলেই জানে। আমার নিকট এক জন ঔদরিক বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তিনি ঔদরিকতার অনুচিত অনুশীলনের ও পরিতৃপ্তির জন্য গ্রহণী

রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি বেশ জানিতেন যে, দুষ্পাচনীয় দ্রব্য আহার করিলেই তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হইবে। সে জন্য লোভ সম্বরণের যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য যে, তিনি অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। বাপু হে! এই সকল কি সুখ? ইহার আবার প্রমাণ প্রয়োগ চাই?

শিষ্য। এখন বোধ হয়, আপনি যাহাকে সুখ বলিতেছেন, তাহা বুঝিয়াছি। ক্ষণিক যে সুখ, তাহা সুখ নহে।

গুরু। কেন নহে? আমি জীবনের মধ্যে যদি একবার একটি গোলাপ ফুল দেখি, কি একটি গান শুনি, আর পরক্ষণেই সব ভুলিয়া যাই, তবে সে সুখ বড় ক্ষণিক সুখ, কিন্তু সে সুখ কি সুখ নহে? তাহা সত্যই সুখ।

শিষ্য। যে সুখ ক্ষণিক অথচ যাহার পরিণাম স্থায়ী দুঃখ, তাহা সুখ নহে, দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র ঃ এখন বুঝিয়াছি কি?

গুরু। এখন পথে আসিয়াছ। কিন্তু এ ব্যাখ্যা ত ব্যতিরেকী। কেবল ব্যতিরেকী ব্যাখ্যায় সবটুকু পাওয়া যাইবে না। সুখ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) স্থায়ী, (২) ক্ষণিক। ইহার মধ্যে—

শিষ্য। স্থায়ী কাহাকে বলেন? মনে করুন, কোন ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি পাঁচ বৎসর ধরিয়া ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ করিতেছে। কথাটা নিতান্ত অসম্ভব নহে। তাহার সুখ কি ক্ষণিক?

গুরু। প্রথমতঃ, সমস্ত জীবনের তুলনায় পাঁচ বৎসর মুহূর্ত্ত মাত্র। তুমি পরকাল মান, না মান, আমি মানি। অনন্ত কালের তুলনায় পাঁচ বৎসর কতক্ষণ? কিন্তু আমি পরকালের ভয় দেখাইয়া কাহাকেও ধার্ম্মিক করিতে চাহি না। কেন না, অনেক লোক পরকাল মানে না—মুখে মানে ত হৃদয়ের ভিতর মানে না; মনে করে, ছেলেদের জুজুর ভয়ের মত মানুষকে শান্ত করিবার একটা প্রাচীন কথা মাত্র। তাই আজিকালি অনেক লোক পরকালের ভয়ে ভয় পায় না। পরকালের দুঃখের ভয়ের উপর যে ধর্ম্মের ভিত্তি, তাহা এই জন্য সাধারণ লোকের হৃদয়ে সর্ব্বত্র বলবান্ হয় না। "আজিকার দিনে" বলিতেছি; কেন না, এক সময়ে এদেশে সে ধর্ম্ম বড় বলবানই ছিল বটে। এক সময়ে, ইউরোপেও বড় বলবান্ ছিল বটে, কিন্তু এখন বিজ্ঞানময়ী উনবিংশ শতাব্দী। সেই রক্তমাংস-পূতিগন্ধ-শালিনী, কামান-গোলা বারুদ-ব্রীচলোডর-টর্পীডো প্রভৃতিতে শোভিতা রাক্ষসী,—এক হাতে শিল্পীর কল চালাইতেছে, আর এক হাতে ঝাঁটা ধরিয়া, যাহা প্রাচীন, যাহা পবিত্র, যাহা সহস্র সহস্র বৎসরের যত্নের ধন, তাহা ঝাঁটাইয়া ফেলিয়া দিতেছে। সেই পোড়ারমুখী, এদেশে আসিয়াও কালা মুখ দেখাইতেছে। তাহার কুহকে পড়িয়া, তোমার মত সহস্র সহস্র শিক্ষিত, অশিক্ষিত, এবং অর্দ্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী পরকাল আর মানে না। তাই আমি এই ধর্ম্মব্যাখ্যায় যত পারি, পরকালকে বাদ দিতেছি। তাহার কারণ এই যে, যাহা তোমাদের হৃদয়-ক্ষেত্রে নাই, তাহার উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া আমি ধর্ম্মের মন্দির গড়িতে পারিব না। আর আমার বিবেচনায়, পরকাল বাদ দিলেই ধর্ম্ম ভিত্তিশূন্য হইল না। কেন

না, ইহলোকের সুখও কেবল ধর্ম্মমূলক, ইহকালের দুঃখও কেবল অধর্ম্মমূলক। এখন ইহকালের দুঃখকে সকলেই ভয় করে, ইহকালের সুখ সকলেই কামনা করে। এজন্য ইহকালের সুখ দুঃখের উপরও ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইতে পারে। এই দুই কারণে, অর্থাৎ ইহকাল সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং পরকাল সর্ব্ববাদিসম্মত নহে বলিয়া, আমি কেবল ইহকালের উপরই ধর্ম্মের ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছি। কিন্তু "স্থায়ী সুখ কি?" যখন এ প্রশ্ন উঠিল, তখন ইহার প্রথম উত্তরে অবশ্য বলিতে হয় যে, অনন্তকালস্থায়ী যে সুখ, ইহকাল পরকাল উভয় কালব্যাপী যে সুখ, সেই সুখ স্থায়ী সুখ। কিন্তু ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে।

শিষ্য। দ্বিতীয় উত্তর পরে শুনিব, এক্ষণে আর একটা কথার মীমাংসা করুন। মনে করুন, বিচারার্থ পরকাল স্বীকার করিলাম। কিন্তু ইহকালে যাহা সুখ, পরকালেও কি তাই সুখ? ইহকালে যাহা দুঃখ, পরকালেও কি তাই দুঃখ? আপনি বলিতেছেন, ইহকালপরকালব্যাপী যে সুখ, তাহাই সুখ—একজাতীয় সুখ কি উভয়কালব্যাপী হইতে পারে?

গুরু। অন্য প্রকার বিবেচনা করিবার কোন কারণ আমি অবগত নহি। কিন্তু এ কথার উত্তর জন্য দুই প্রকার বিচার আবশ্যক। যে জন্মান্তর মানে, তাহার পক্ষে এক প্রকার, আর যে জন্মান্তর মানে না, তাহার পক্ষে আর এক প্রকার। তুমি কি জন্মান্তর মান?

শিষ্য। না।

গুরু। তবে, আইস। যখন পরকাল স্বীকার করিলে অথচ জন্মান্তর মানিলে না তখন দুইটি কথা স্বীকার করিলে;—প্রথম এই শরীর থাকিবে না, সুতরাং শারীরিকী বৃত্তিনিচয়জনিত যে সকল সুখ দুঃখ, তাহা পরকালে থাকিবে না। দ্বিতীয়, শরীর ব্যতিরিক্ত যাহা, তাহা থাকিবে, অর্থাৎ ত্রিবিধ মানসিক বৃত্তিগুলি থাকিবে, সুতরাং মানসিক বৃত্তিজনিত যে সকল সুখ দুঃখ, তাহা পরকালেও থাকিবে। পরকালে এইরূপ সুখের আধিক্যকে স্বর্গ বলা যাইতে পারে, এইরূপ দুঃখের আধিক্যকে নরক বলা যাইতে পারে।

শিষ্য। কিন্তু যদি পরকাল থাকে, তবে ইহা ধর্ম্মব্যাখ্যার অতি প্রধান উপাদান হওয়াই উচিত। তজ্জন্য অন্যান্য ধর্ম্মব্যাখ্যায় ইহাই প্রধানত্ব লাভ করিয়াছে। আপনি পরকাল মানিয়াও যে, উহা ধর্ম্মব্যাখ্যায় বর্জ্জিত করিয়াছেন, ইহাতে আপনার ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত হইয়াছে বিবেচনা করি।

গুরু। অসম্পূর্ণ হইতে পারে। সে কথাতেও কিছু সন্দেহ আছে। অসম্পূর্ণ হউক বা না হউক, কিন্তু ভ্রান্ত নহে। কেন না, সুখের উপায় যদি ধর্ম্ম হইল, আর ইহকালেও যে সুখ, পরকালেও যদি সেই সুখই সুখ হইল, তবে ইহকালেরও যে ধর্ম্ম, পরকালেরও সেই ধর্ম্ম। পরকাল নাই মান, কেবল ইহকালকে সার করিয়াও সম্পূর্ণরূপে ধার্ম্মিক হওয়া যায়। ধর্ম্ম নিত্য। ধর্ম্ম ইহকালেও সুখপ্রদ, পরকালেও সুখপ্রদ। তুমি পরকাল মান আর না মান—ধর্ম্মাচরণ করিও, তাহা হইলে ইহকালেও সুখী হইবে, পরকালেও সুখী হইবে।

শিষ্য। আপনি নিজে পরকাল মানেন—কিছু প্রমাণ আছে বলিয়া মানেন, না, কেবল মানিতে ভাল লাগে, তাই মানেন ?

গুরু। যাহার প্রমাণাভাব, তাহা আমি মানি না। পরকালের প্রমাণ আছে বলিয়াই পরকাল মানি।

শিষ্য। যদি পরকালের প্রমাণ আছে, যদি আপনি নিজে পরকালে বিশ্বাসী, তবে আমাকে তাহা মানিতে উপদেশ দিতেছেন না কেন ? আমাকে সে সকল প্রমাণ বুঝাইতেছেন না কেন ?

গুরু। আমাকে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, সে প্রমাণগুলি বিবাদের স্থল। প্রমাণগুলির এমন কোন দোষ নাই যে, সে সকল বিবাদের সুমীমাংসা হয় না, বা হয় নাই। তবে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের কুসংস্কারবশতঃ বিবাদ মিটে না। বিবাদের ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে আমার ইচ্ছা নাই এবং প্রয়োজনও নাই। প্রয়োজন নাই, এই জন্য বলিতেছি যে, আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, পবিত্র হও, শুদ্ধচিত্ত হও, ধর্ম্মাত্মা হও। ইহাই যথেষ্ট। আমরা এই ধর্ম্মব্যাখ্যার ভিতর যত প্রবেশ করিব, ততই দেখিব যে, এক্ষণে যাহাকে সমুদায় চিত্তবৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি বলিতেছি, তাহার শেষ ফল পবিত্রতা—চিত্তশুদ্ধি।* তুমি পরকাল যদি নাও মান, তথাপি শুদ্ধচিত্ত ও পবিত্রাত্মা হইলে নিশ্চয়ই তুমি পরকালে সুখী হইবে। যদি চিত্ত শুদ্ধ হইল, তবে ইহলোকই স্বর্গ হইল, তখন পরলোকে স্বর্গের প্রতি আর সন্দেহ কি ? যদি তাই হইল, তবে পরকাল মানা না-মানাতে বড় আসিয়া গেল না। যাহারা পরকাল মানে না, ইহাতে ধর্ম্ম তাহাদের পক্ষে সহজ হইল ; যে ধর্ম্ম তাহারা পরকাল-মূলক বলিয়া এত দিন অগ্রাহ্য করিত, তাহারা এখন সেই ধর্ম্মকে ইহকালমূলক বলিয়া অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিবে। আর যাহারা পরকালে বিশ্বাস করে, তাহাদের বিশ্বাসের সঙ্গে এ ব্যাখ্যার কোন বিবাদ নাই। তাহাদের বিশ্বাস দিন দিন দৃঢ়তর হউক, বরং ইহাই আমি কামনা করি।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছিলেন যে, ইহকাল-পরকাল-ব্যাপী যে সুখ, তাহাই সুখ। একজাতীয় সুখ উভয় কালব্যাপী হইতে পারে। যে জন্মান্তর মানে না, তাহার পক্ষে এই তত্ত্ব যে কারণে গ্রাহ্য, তাহা বুঝাইলেন। যে জন্মান্তর মানে তাহার পক্ষে কি ?

গুরু। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনুশীলনের সম্পূর্ণতায় মোক্ষ। অনুশীলনের পূর্ণমাত্রায় আর পুনর্জ্জন্ম হইবে না। ভক্তিতত্ত্ব যখন বুঝাইব, তখন এ কথা আরও স্পষ্ট বুঝিবে।

শিষ্য। কিন্তু অনুশীলনের পূর্ণমাত্রা ত সচরাচর কাহার কপালে ঘটা সম্ভব নহে ; যাহাদের অনুশীলনের সম্পূর্ণতা ঘটে নাই, তাহাদের পুনর্জ্জন্ম ঘটিবে। এই জন্মের অনুশীলনের ফলে তাহারা কি পরজন্মের কোন সুখ প্রাপ্ত হইবে ?

গুরু। জন্মান্তরবাদের স্থূল মর্ম্মই এই যে, এ জন্মের কর্ম্মফল পরজন্মে পাওয়া যায়। সমস্ত কর্ম্মের সমবায় অনুশীলন। অতএব এ জন্মের অনুশীলনে যে শুভ ফল,

* সকল কথা ক্রমে পরিস্ফুট হইবে।

তাহা অনুশীলনবাদীর মতে পরজন্মে অবশ্য পাওয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এ কথা অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন।

"তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্" ইত্যাদি। গীতা। ৪৩।৬॥

শিষ্য। এক্ষণে আমরা মূল কথা হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কথাটা হইয়াছিল, স্থায়ী সুখ কী। তাহার প্রথম উত্তরে আপনি বলিয়াছেন যে, ইহকালে ও পরকালে চিরস্থায়ী যে সুখ, তাহাই স্থায়ী সুখ। ইহার দ্বিতীয় উত্তর আছে বলিয়াছেন। দ্বিতীয় উত্তর কি?

গুরু। দ্বিতীয় উত্তর যাহারা পরকাল মানে না, তাহাদের জন্য। ইহজীবনই যদি সব হইল, মৃত্যুই যদি জীবনের অন্ত হইল, তাহা হইলে, যে সুখ সেই অন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে, তাহাই স্থায়ী সুখ। যদি পরকাল না থাকে, তবে ইহজীবনে যাহা চিরকাল থাকে, তাহাই স্থায়ী সুখ। তুমি বলিতেছিলে, পাঁচ সাত দশ বৎসর ধরিয়া কেহ কেহ ইন্দ্রিয়সুখে নিমগ্ন থাকে। কিন্তু পাঁচ সাত দশ বৎসর কিছু চিরজীবন নহে। যে পাঁচ সাত দশ বৎসর ধরিয়া ইন্দ্রিয় পরিতর্পণে নিযুক্ত আছে, তাহারও মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সে সুখ থাকিবে না। তিনটির একটি না একটি কারণে অবশ্য অবশ্য তাহার সে সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবে। (১) অতিভোগজনিত গ্লানি বা বিরাগ—অতিতৃপ্তি; কিম্বা (২) ইন্দ্রিয়াসক্তিজনিত অবশ্যম্ভাবী রোগ বা অসামর্থ্য; অথবা (৩) বয়োবৃদ্ধি। অতএব এ সকল সুখের ক্ষণিকত্ব আছেই আছে।

শিষ্য। আর যে সকল বৃত্তিগুলিকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বলা যায়, সেগুলির অনুশীলনে যে সুখ, তাহা কি ইহজীবনে চিরস্থায়ী?

গুরু। তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। একটা সামান্য উদাহরণের দ্বারা বুঝাইব। মনে কর, দয়াবৃত্তির কথা হইতেছে। পরোপকারে ইহার অনুশীলন ও চরিতার্থতা। এ বৃত্তির দোষ এই যে, যে ইহার অনুশীলন আরম্ভ করে নাই, সে ইহার অনুশীলনের সুখ বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু ইহা যে অনুশীলিত করিয়াছে, সে জানে, দয়ার অনুশীলন ও চরিতার্থতায়, অর্থাৎ পরোপকারে এমন তীব্র সুখ আছে যে, নিকৃষ্ট শ্রেণীর ঐন্দ্রিয়িকেরা সর্ব্বলোকসুন্দরীগণের সমাগমেও সেরূপ তীব্র সুখ অনুভূত করিতে পারে না। এ বৃত্তি যত অনুশীলিত করিবে, ততই ইহার সুখজনকতা বাড়িবে। নিকৃষ্ট বৃত্তির ন্যায় ইহাতে গ্লানি জন্মে না, অতিতৃপ্তিজনিত বিরাগ জন্মে না, বৃত্তির অসামর্থ্য বা দৌর্ব্বল্য জন্মে না, বল ও সামর্থ্য বরং বাড়িতে থাকে। ইহার নিয়ত অনুশীলন পক্ষে কোন ব্যাঘাত নাই। ঔদরিক দিবসে দুই বার, তিন বার, না হয় চারি বার আহার করিতে পারে। অন্যান্য, ঐন্দ্রিয়িকের ভোগেরও সেইরূপ সীমা আছে। কিন্তু পরোপকার দণ্ডে দণ্ডে, পলকে পলকে করা যায়। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ইহার অনুশীলন চলে। অনেক লোক মরণকালেও একটি কথা বা একটি ইঙ্গিতের দ্বারা লোকের উপকার করিয়া গিয়াছেন। আডিসন মৃত্যুকালেও কুপথাবলম্বী যুবাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ ধার্ম্মিক (Christian) কেমন সুখে মরে!"

তার পর, পরকালের কথা বলি। যদি জন্মান্তর না মানিয়া পরকাল স্বীকার করা যায়, তবে ইহা বলিতে হইবে যে, পরকালেও আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলি

থাকিবে, সুতরাং এ দয়া বৃত্তিটিও থাকিবে। আমি ইহাকে যেরূপ অবস্থায় লইয়া যাইব, পারলৌকিক প্রথমাবস্থায় ইহার সেই অবস্থায় থাকা সম্ভব; কেন না, হঠাৎ অবস্থান্তরের উপযুক্ত কোন কারণ দেখা যায় না। আমি যদি ইহা উত্তমরূপে অনুশীলিত ও সুখপ্রদ অবস্থায় লইয়া যাই, তবে ইহা পরলোকেও আমার পক্ষে সুখপ্রদ হইবে। সেখানে আমি ইহা অনুশীলিত ও চরিতার্থ করিয়া ইহলোকের অপেক্ষা অধিকতর সুখী হইব।

শিষ্য। এ সকল সুখ-স্বপ্ন মাত্র—অতি অশ্রদ্ধেয় কথা। দয়ার অনুশীলন ও ও চরিতার্থতা কর্ম্মাধীন। পরোপকার কর্ম্মমাত্র। আমার কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি, আমি শরীরের সঙ্গে এখানে রাখিয়া গেলাম, সেখানে কিসের দ্বারা কর্ম্ম করিব?

গুরু। কথাটা কিছু নির্ব্বোধের মত বলিলে। আমরা ইহাই জানি যে, যে চৈতন্য শরীরবদ্ধ, সেই চৈতন্যের কর্ম্ম কর্ম্মেন্দ্রিয়সাধ্য। কিন্তু যে চৈতন্য শরীরে বদ্ধ নহে, তাহারও কর্ম্ম যে কর্ম্মেন্দ্রিয়সাপেক্ষ, এমত বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে।

শিষ্য। ইহাই যুক্তিসঙ্গত। অন্যথা-সিদ্ধি-শূন্যস্য নিয়তপূর্ব্ববর্ত্তিতা কারণত্বং। কর্ম্ম অন্যথা-সিদ্ধি-শূন্য। কোথাও দেখি নাই যে, কর্ম্মেন্দ্রিয়শূন্য যে, সে কর্ম্ম করিয়াছে।

গুরু। ঈশ্বরে দেখিতেছ। যদি বল ঈশ্বর মানি না, তোমার সঙ্গে আমার বিচার ফুরাইল। আমি পরকাল হইতে ধর্ম্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু ঈশ্বর হইতে ধর্ম্মকে বিযুক্ত করিয়া বিচার করিতে প্রস্তুত নহি। আর যদি বল, ঈশ্বর সাকার, তিনি শিল্পকারের মত হাতে করিয়া জগৎ গড়িয়াছেন, তাহা হইলেও তোমার সঙ্গে বিচার ফুরাইল। কিন্তু ভরসা করি, তুমি ঈশ্বর মান এবং ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়াও স্বীকার কর। যদি তাহা কর, তবে কর্ম্মেন্দ্রিয়শূন্য নিরাকারের কর্ম্মকর্তৃত্ব স্বীকার করিলে। কেন না, ঈশ্বর সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বস্রষ্টা।

পরলোকে জীবনের অবস্থা স্বতন্ত্র। অতএব প্রয়োজনও স্বতন্ত্র। ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন না হওয়াই সম্ভব।

শিষ্য। হইলে হইতে পারে। কিন্তু এ সকল আন্দাজি কথা। আন্দাজি কথার প্রয়োজন নাই।

গুরু। আন্দাজি কথা, ইহা আমি স্বীকার করি। বিশ্বাস করা, না করার পক্ষে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, ইহাও আমি স্বীকার করি। আমি যে দেখিয়া আসি নাই, ইহা বোধ করি বলা বাহুল্য। কিন্তু এ সকল আন্দাজি কথার একটু মূল্য আছে। যদি পরকাল থাকে, আর যদি Law of Continuity অর্থাৎ মানসিক অবস্থার ক্রমান্বয় ভাব সত্য হয়, তবে পরকাল সম্বন্ধে যে অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পার, আমি এমন পথ দেখিতেছি না। এই ক্রমান্বয় ভাবটির প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিবে। হিন্দু, খ্রীষ্টীয়, বা ইস্‌লামী যে স্বর্গনরক, তাহা এই নিয়মের বিরুদ্ধ।

শিষ্য। যদি পরকাল মানিতে পারি, তবে এটুকুও না হয় মানিয়া লইব। যদি হাতীটা গিলিতে পারি, তবে হাতীর কানের ভিতর যে মশাটা ঢুকিয়াছে, তাহা গলায় বাধিবে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ পরকালের শাসনকর্তৃত্ব কই?

গুরু। যাহারা স্বর্গের দণ্ডধর গড়িয়াছে, তাহারা পরকালের শাসনকর্ত্তা গড়িয়াছে। আমি কিছুই গড়িতে বসি নাই। আমি মনুষ্যজীবনের সমালোচনা করিয়া, ধর্ম্মের যে স্থূল মর্ম্ম বুঝিয়াছি, তাহাই তোমাকে বুঝাইতেছি। কিন্তু একটা কথা বলিয়া রাখায় ক্ষতি নাই। যে পাঠশালায় পড়িয়াছে, সে যে দিন পাঠশালা ছাড়িল, সেই দিনই একটা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতে পরিণত হইল না। কিন্তু সে কালক্রমে একটা মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতে পরিণত হইতে পারে, এমত সম্ভাবনা রহিল। আর যে একেবারে পাঠশালায় পড়ে নাই, জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মত পৈতৃক পাঠশালাতেও পড়ে নাই, তাহার পণ্ডিত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ইহলোককে আমি তেমনি একটি পাঠশালা মনে করি। যে এখান হইতে সদ্‌বৃত্তিগুলি মার্জ্জিত ও অনুশীলিত করিয়া লইয়া যাইবে, তাহার সেই বৃত্তিগুলি ইহলোকের কল্পনাতীত স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া সেখানে তাহার অনন্ত সুখের কারণ হইবে, এমন সম্ভব। আর যে সদ্‌বৃত্তিগুলির অভাবে অপক্বাবস্থায় পরলোকে লইয়া যাইবে, তাহার পরলোকে কোন সুখেরই সম্ভাবনা নাই। আর যে কেবল অসদ্‌বৃত্তিগুলি স্ফুরিত করিয়া পরলোকে যাইবে, তাহার অনন্ত দুঃখ। জন্মান্তর যদি না মানা যায়, তবে এইরূপ স্বর্গ নরক মানা যায়। কৃমি-কীট-সঙ্কুল অবর্ণনীয় হ্রদরূপ নরক বা অপ্সরোকণ্ঠ-নিনাদ-মধুরিত, উর্ব্বশী মেনকা রম্ভাদির নৃত্যসমাকুলিত, নন্দনকানন-কুসুম-সুবাস-সমুল্লাসিত স্বর্গ মানি না। হিন্দুধর্ম্ম মানি, হিন্দুধর্ম্মের "বখামি"গুলা মানি না। আমার শিষ্যদিগেরও মানিতে নিষেধ করি।

শিষ্য। আমার মত শিষ্যের মানিবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। সম্প্রতি পরকালের কথা ছাড়িয়া দিয়া, ইহকাল লইয়া সুখের যে ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, তাহার সূত্র পুনর্গ্রহণ করুন।

গুরু। বোধ হয় এতক্ষণে বুঝাইয়া থাকিব যে, পরকাল বাদ দিয়া কথা কহিলেও, কোন কোন সুখকে স্থায়ী, কোন কোন সুখের স্থায়িত্বাভাবে তাহাকে ক্ষণিক বলা যাইতে পারে।

শিষ্য। বোধ হয় কথাটা এখনও বুঝি নাই। আমি একটা টপ্পা শুনিয়া আসিলাম কি একখানা নাটকের অভিনয় দেখিয়া আসিলাম। তাহাতে কিছু আনন্দ লাভও করিলাম। সে সুখ স্থায়ী না ক্ষণিক ?

গুরু। যে আনন্দের কথা তুমি মনে ভাবিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি, তাহা ক্ষণিক বটে, কিন্তু চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের যে ফল, তাহা স্থায়ী সুখ। সেই স্থায়ী সুখের অংশ বা উপাদান বলিয়া, ঐ আনন্দটুকুকে স্থায়ী সুখের মধ্যে ধরিয়া লইতে হইবে। সুখ যে বৃত্তির অনুশীলনের ফল, এ কথাটা যেন মনে থাকে। এখন বলিয়াছি যে, কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলনজনিত যে সুখ, তাহা অস্থায়ী। শেষোক্ত সুখও আবার দ্বিবিধ ; (১) যাহার পরিণামে দুঃখ, (২) যাহা ক্ষণিক হইলেও পরিণামে দুঃখশূন্য। ইন্দ্রিয়াদি নিকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে উহা অবশ্য বুঝিয়াছ যে, এই বৃত্তিগুলির পরিমিত অনুশীলনে দুঃখশূন্য সুখ, এবং এই সকলের অসমুচিত অনুশীলনে যে সুখ, তাহারই পরিণাম দুঃখ। অতএব সুখ ত্রিবিধ—

(১) স্থায়ী।

(২) ক্ষণিক, কিন্তু পরিণামে দুঃখশূন্য।

(৩) ক্ষণিক, কিন্তু পরিণামে দুঃখের কারণ।

শেষোক্ত সুখকে সুখ বলা অবিধেয়,—উহা দুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। সুখ তবে, (১) হয় যাহা স্থায়ী, (২) নয়, যাহা অস্থায়ী অথচ পরিণামে দুঃখশূন্য। আমি যখন বলিয়াছি যে, সুখের উপায় ধর্ম্ম, তখন এই অর্থেই সুখ শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। এই ব্যবহারই এই শব্দের যথার্থ ব্যবহার, কেন না, যাহা বস্তুতঃ দুঃখের প্রথমাবস্থা, তাহাকে ভ্রান্ত বা পশুবৃত্ত-দিগের মতাবলম্বী হইয়া সুখের মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না। যে জলে পড়িয়া ডুবিয়া মরে, জলের স্নিগ্ধতাবশতঃ তাহার প্রথম নিমজ্জনকালে কিছু সুখোপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু সে অবস্থা তাহার সুখের অবস্থা নহে, নিমজ্জনদুঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র। তেমনি দুঃখপরিণাম সুখও দুঃখের প্রথমাবস্থা—নিশ্চয়ই তাহা সুখ নহে।

এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর শোন। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, "এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি, আর এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না, ইহা কোন্ লক্ষণ দেখিয়া নির্ব্বাচন করিব? কোন্ কষ্টিপাথরে ঘষিয়া ঠিক করিব যে, এইটি পিত্তল?" এই প্রশ্নের উত্তর এখন পাওয়া গেল। যে বৃত্তিগুলির অনুশীলনে স্থায়ী সুখ, তাহাকে অধিক বাড়িতে দেওয়াই কর্ত্তব্য—যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি। আর যেগুলির অনু-শীলনে ক্ষণিক সুখ, তাহা বাড়িতে দেওয়া অকর্ত্তব্য, কেন না, এ সকল বৃত্তির অধিক অনুশীলনের পরিণাম সুখ নহে। যতক্ষণ ইহাদের অনুশীলন পরিমিত, ততক্ষণ ইহা অবিধেয় নহে—কেন না, তাহাতে পরিণামে দুঃখ নাই। তার পর আর নহে। অনু-শীলনের উদ্দেশ্য সুখ; যেরূপ অনুশীলনে সুখ জন্মে, দুঃখ নাই, তাহাই বিহিত। অতএব সুখই সেই কষ্টিপাথর।

অষ্টম অধ্যায়—শারীরিকী বৃত্তি

শিষ্য। যে পর্য্যন্ত কথা হইয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, অনুশীলন কি। আর বুঝিয়াছি সুখ কি। বুঝিয়াছি অনুশীলনের উদ্দেশ্য সেই সুখ; এবং সামঞ্জস্য তাহার সীমা। কিন্তু বৃত্তিগুলির অনুশীলন সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ কিছু এখনও পাই নাই। কোন্ বৃত্তির কি প্রকার অনুশীলন করিতে হইবে, তাহার কিছু উপদেশের প্রয়োজন নাই কি?

গুরু। ইহা শিক্ষাতত্ত্ব। শিক্ষাতত্ত্ব ধর্ম্মতত্ত্বের অন্তর্গত। আমাদের এই কথাবার্ত্তার প্রধান উদ্দেশ্য তাহা নহে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, ধর্ম্ম কি তাহা বুঝি। তজ্জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই আমি বলিব।

বৃত্তি চতুর্ব্বিধ বলিয়াছি; (১) শারীরিকী, (২) জ্ঞানার্জ্জনী, (৩) কার্য্য-কারিণী, (৪) চিত্তরঞ্জিনী। আগে শারীরিকী বৃত্তির কথা বলিব—কেন না, উহাই সর্ব্বাগ্রে স্ফুরিত হইতে থাকে। এ সকলের স্ফূর্ত্তি ও পরিতৃপ্তিতে যে সুখ আছে, ইহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। কিন্তু ধর্ম্মের সঙ্গে এ সকলের কোন সম্বন্ধ আছে, এ কথা কেহ বিশ্বাস করে না।

শিষ্য। তাহার কারণ বৃত্তির অনুশীলনকে ধর্ম্ম কেহ বলে না।

গুরু। কোন কোন ইউরোপীয় অনুশীলনবাদী বৃত্তির অনুশীলনকে ধর্ম্ম বা ধর্ম্ম-স্থানীয় কোন একটা জিনিস বিবেচনা করেন, কিন্তু তাঁহারা এমন কথা বলেন না যে, শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয়।*

শিষ্য। আপনি কেন বলেন ?

গুরু। যদি সকল বৃত্তির অনুশীলন মনুষ্যের ধর্ম্ম হয়, তবে শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলনও অবশ্য ধর্ম্ম। কিন্তু সে কথা না হয় ছাড়িয়া দাও। লোকে সচরাচর যাহাকে ধর্ম্ম বলে, তাহার মধ্যে যে কোন প্রচলিত মত গ্রহণ কর, তথাপি দেখিবে যে, শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয়। যদি যাগযজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপকে ধর্ম্ম বল; যদি দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকারকে ধর্ম্ম বল; যদি কেবল দেবতার উপাসনা বা ঈশ্বরোপাসনাকে ধর্ম্ম বল; না হয় খৃষ্টধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, ইস্‌লামধর্ম্মকে ধর্ম্ম বল, সকল ধর্ম্মের জন্যই শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন প্রয়োজনীয়। ইহা কোন ধর্ম্মেরই মুখ্য উদ্দেশ্য নহে বটে, কিন্তু সকল ধর্ম্মের বিঘ্ননাশের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন। এই কথাটা কখনও কোন ধর্ম্মবেত্তা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই, কিন্তু এখন এ দেশে সে কথা বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন হইয়াছে।

শিষ্য। ধর্ম্মের বিঘ্ন বা কিরূপ, এবং শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনে কিরূপে তাহার বিনাশ, ইহা বুঝাইয়া দিন।

গুরু। প্রথম ধর, রোগ। রোগ ধর্ম্মের বিঘ্ন। যে গোঁড়া হিন্দু রোগে পড়িয়া আছে, সে যাগযজ্ঞ, ব্রতনিয়ম, তীর্থদর্শন, কিছুই করিতে পারে না। যে গোঁড়া হিন্দু নয়, কিন্তু পরোপকার প্রভৃতি সদনুষ্ঠানকে ধর্ম্ম বলিয়া মানে, রোগ তাহারও ধর্ম্মের বিঘ্ন। রোগে যে নিজে অপটু, সে কাহার কি কার্য্য করিবে ? যাহার বিবেচনায় ধর্ম্মের জন্য, এ সকল কিছুরই প্রয়োজন নাই, কেবল ঈশ্বরের চিন্তাই ধর্ম্ম, রোগ তাহারও ধর্ম্মের বিঘ্ন। কেন না, রোগের যন্ত্রণাতে ঈশ্বরে মন নিবিষ্ট হয় না; অন্ততঃ একাগ্রতা থাকে না; কেন না, চিত্তকে শারীরিক যন্ত্রণায় অভিভূত করিয়া রাখে, মধ্যে মধ্যে বিচলিত করে। রোগ কর্ম্মীর কর্ম্মের বিঘ্ন, যোগীর যোগের বিঘ্ন, ভক্তের ভক্তির সাধনের বিঘ্ন। রোগ ধর্ম্মের পরম বিঘ্ন।

এখন তোমাকে বুঝাইতে হইবে না যে, শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলনের অভাবই প্রধানতঃ রোগের কারণ।

শিষ্য। যে হিম লাগান কথাটা গোড়ায় উঠিয়াছিল, তাহাও কি অনুশীলনের অভাব ?

গুরু। ত্বগিন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্যকর অনুশীলনের ব্যাঘাত। শারীরতত্ত্ববিদ্যাতে তোমার কিছুমাত্র অধিকার থাকিলেই তাহা বুঝিতে পারিবে।

শিষ্য। তবে দেখিতেছি যে, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির সমুচিত অনুশীলন না হইলে, শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন হয় না।

গুরু। না, তা হয় না। সমস্ত বৃত্তিগুলির যথাযথ অনুশীলন পরস্পরের অনুশীলনের সাপেক্ষ। কেবল শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলন জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির সাপেক্ষ,

*Herbert Spencer বলেন। গ চিহ্নিত ক্রোড়পত্র দেখ।

এমত নহে। কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলিও তৎসাপেক্ষ। কোন্ কার্য্য কি উপায়ে করা উচিত, কোন্ বৃত্তির কিসে অনুশীলন হইবে, কিসে অনুশীলনের অবরোধ হইবে, ইহা জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে। জ্ঞান ভিন্ন তুমি ঈশ্বরকেও জানিতে পারিবে না। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

শিষ্য। এখন থাকিলে চলিবে না। যদি বৃত্তিগুলির অনুশীলন পরস্পর সাপেক্ষ, তবে কোন্‌গুলির অনুশীলন আগে আরম্ভ করিব ?

গুরু। সকলগুলিরই যথাসাধ্য অনুশীলন এককালেই আরম্ভ করিতে হইবে; অর্থাৎ শৈশবে।

শিষ্য। আশ্চর্য্য কথা! শৈশবে আমি জানি না যে, কি প্রকারে কোন্ বৃত্তির অনুশীলন করিতে হইবে। তবে কি প্রকারে সকল বৃত্তির অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইব ?

গুরু। এই জন্য শিক্ষকের সহায়তা আবশ্যক। শিক্ষক এবং শিক্ষা ভিন্ন কখনই মনুষ্য মনুষ্য হয় না। সকলেরই শিক্ষকের আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। কেবল শৈশবে কেন, চিরকালই আমাদের পরের কাছে শিক্ষার প্রয়োজন। এই জন্য হিন্দুধর্ম্মে গুরুর এত মান। আর গুরু নাই, গুরুর সম্মান নাই, কাজেই সমাজের উন্নতি হইতেছে না। ভক্তিবৃত্তির অনুশীলনের কথা যখন বলিব, তখন এ কথা মনে থাকে যেন। এখন যাহা বলিতেছিলাম, তাহা বলি।

(২) বৃত্তি সকলের এইরূপ পরস্পর সাপেক্ষতা হইতে শারীরিকী বৃত্তি অনুশীলনের দ্বিতীয় প্রয়োজন, অথবা ধর্ম্মের দ্বিতীয় বিঘ্নের কথা পাওয়া যায়। যদি অন্যান্য বৃত্তিগুলি শারীরিক বৃত্তির সাপেক্ষ হইল, তবে জ্ঞানার্জ্জনী প্রভৃতি বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলনের জন্য শারীরিকী বৃত্তি সকলের সম্যক্ অনুশীলন চাই। বাস্তবিক, ইহা প্রসিদ্ধ যে, শারীরিক শক্তি সকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট না থাকিলে মানসিক শক্তি সকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হয় না, অথবা অসম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা শরীর ও মনের এই সম্বন্ধ উত্তমরূপে প্রমাণীকৃত করিয়াছেন। আমাদের দেশে এক্ষণে যে কলেজি শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত, তাহার প্রধান নিন্দাবাদ এই যে, ইহাতে শিক্ষার্থীদিগের শারীরিক স্ফূর্ত্তির প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি থাকে না, এজন্য কেবল শারীরিক নহে, অকালে মানসিক অধঃপতনও উপস্থিত হয়। ধর্ম্ম মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করে; কাজে কাজেই ধর্ম্মেরও অধোগতি ঘটে।

(৩) কিন্তু এ সম্বন্ধে তৃতীয় তত্ত্ব, বা তৃতীয় বিঘ্ন আরও গুরুতর। যাহার শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলন হয় নাই, সে আত্মরক্ষায় অক্ষম। যে আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাহার নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মাচরণ কোথায় ? সকলেরই শত্রু আছে। দস্যু আছে। ইহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মাচরণের বিঘ্ন করে। তদ্ভিন্ন অনেক সময়ে যে বলে শত্রুদমন করিতে না পারে, সে বলাভাব হেতুই আত্মরক্ষার্থ অধর্ম্ম অবলম্বন করে। আত্মরক্ষা এমন অলঙ্ঘনীয় যে, পরম ধার্ম্মিকও এমন অবস্থায় অধর্ম্ম অবলম্বন পরিত্যাগ করিতে পারে না। মহাভারতকার, "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ" ইতি উপন্যাসে ইহার উত্তম উদাহরণ কল্পনা

করিয়াছেন। বলে দ্রোণাচার্য্যকে পরাভব করিতে অক্ষম হইয়া যুধিষ্ঠিরের ন্যায় পরম ধার্ম্মিকও মিথ্যা প্রবঞ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

শিষ্য। প্রাচীন কালের পক্ষে এ সকল কথা খাটিলে খাটিতে পারে, কিন্তু এখনকার সভ্য সমাজে রাজাই সকলের রক্ষা করেন। এখন কি আত্মরক্ষায় সকলের সক্ষম হওয়া তাদৃশ প্রয়োজনীয়?

গুরু। রাজা সকলকে রক্ষা করিবেন। এইটা আইন বটে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটে না। রাজা সকলকে রক্ষা করিয়া উঠিতে পারেন না। পারিলে এত খুন, জখম, চুরি, ডাকাতি, দাঙ্গা মারামারি প্রত্যহ ঘটিত না। পুলিসের বিজ্ঞাপন সকল পড়িলে জানিতে পারিবে যে, যাহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম, সচরাচর তাহাদের উপরেই এই সকল অত্যাচার ঘটে। বলবানের কাছে কেহ আগু হয় না। কিন্তু আত্মরক্ষার কথা তুলিয়া কেবল আপনার শরীর বা সম্পত্তি রক্ষার কথা আমি বলিতেছিলাম না, ইহাও তোমার বুঝা কর্ত্তব্য। যখন তোমাকে প্রীতিবৃত্তির অনুশীলনের কথা বলিব, তখন বুঝিব যে, আত্মরক্ষা যেমন আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম, আপনার স্ত্রীপুত্র পরিবার স্বজন কুটুম্ব প্রতিবাসী প্রভৃতির রক্ষাও তাদৃশ আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম। যে ইহা করে না, সে পরম অধার্ম্মিক। অতএব যাহার তদুপযোগী বল বা শারীরিক শিক্ষা হয় নাই, সেও অধার্ম্মিক।

(৪) আত্মরক্ষা, বা স্বজনরক্ষার এই কথা হইতে ধর্ম্মের চতুর্থ বিঘ্নের কথা উঠিতেছে। এই তত্ত্ব অত্যন্ত গুরুতর; ধর্ম্মের অতি প্রধান অংশ। অনেক মহাত্মা এই ধর্ম্মের জন্য, প্রাণ পর্য্যন্ত, প্রাণ কি, সর্ব্বসুখ পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমি স্বদেশরক্ষার কথা বলিতেছি।

যদি আত্মরক্ষা এবং স্বজনরক্ষা ধর্ম্ম হয়, তবে স্বদেশরক্ষাও ধর্ম্ম। সমাজস্থ এক এক ব্যক্তি যেমন অপর ব্যক্তির সর্ব্বস্ব অপহরণ মানসে আক্রমণ করে, এক এক সমাজ বা দেশও অপর সমাজকে সেইরূপ আক্রমণ করে। মনুষ্য যতক্ষণ না রাজার শাসনে বা ধর্ম্মের শাসনে নিরুদ্ধ হয়, ততক্ষণ কাড়িয়া খাইতে পারিলে ছাড়ে না। যে সমাজে রাজশাসন নাই, সে সমাজের ব্যক্তিগণ যে যার পারে, সে তার কাড়িয়া খায়। তেমনি, বিবিধ সমাজের উপর কেহ এক জন রাজা না থাকাতে, যে সমাজ বলবান্, সে দুর্ব্বল সমাজের কাড়িয়া খায়। অসভ্য সমাজের কথা বলিতেছি না, সভ্য ইউরোপের এই প্রচলিত রীতি। আজ ফ্রান্স জর্ম্মানির কাড়িয়া খাইতেছে, কাল জর্ম্মানি ফ্রান্সের কাড়িয়া খাইতেছে; আজ তুর্ক গ্রীসের কাড়িয়া খায়, কাল রুস তুর্কের কাড়িয়া খায়। আজ Rhenish Frontier, কাল পোলাণ্ড, পরশু বুলগেরিয়া, আজ মিশর, কাল টঙ্কুইন। এই সকল লইয়া ইউরোপীয় সভ্য জাতিগণ কুকুরের মত হুড়াহুড়ি কামড়াকামড়ি করিয়া থাকেন। যেমন হাটের কুকুরেরা যে যার পায়, সে তার কাড়িয়া খায়, কি সভ্য কি অসভ্য জাতি তেমনি পরের পাইলেই কাড়িয়া খায়। দুর্ব্বল সমাজকে বলবান্ সমাজ আক্রমণ করিবার চেষ্টায় সর্ব্বদাই আছে। অতএব আপনার দেশরক্ষা ভিন্ন আত্মরক্ষা নাই। আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষা যদি ধর্ম্ম হয়, তবে দেশরক্ষাও ধর্ম্ম। বরং আরও গুরুতর ধর্ম্ম; কেন না, এস্থলে আপন ও পর, উভয়ের রক্ষার কথা।

সামাজিক কতকগুলি অবস্থা ধর্ম্মের উপযোগী আর কতকগুলি অনুপযোগী। কতকগুলি অবস্থা সমস্ত বৃত্তির অনুশীলনের ও পরিতৃপ্তির অনুকূল। আবার কোন কোন সামাজিক অবস্থা কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলন ও পরিতৃপ্তির প্রতিকূল। অধিকাংশ সময়ে এই প্রতিকূলতা রাজা বা রাজপুরুষ হইতেই ঘটে। ইউরোপের যে অবস্থায় প্রোটেষ্টাণ্টদিগকে রাজা পুড়াইয়া মারিতেন, সেই অবস্থা ইহার একটি উদাহরণ; ঔরঙ্গজেবের হিন্দুধর্ম্মের বিদ্বেষ আর একটি উৎপীড়ন। সমাজের যে অবস্থা ধর্ম্মের অনুকূল, তাহাকে স্বাধীনতা বলা যায়। স্বাধীনতা দেশী কথা নহে, বিলাতী আমদানি। লিবার্টি শব্দের অনুবাদ। ইহার এমন তাৎপর্য্য নহে যে, রাজা স্বদেশীয় হইতে হইবে। স্বদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার শত্রু, বিদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার মিত্র। ইহার অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। ইহা ধর্ম্মোন্নতির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অতএব আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, এবং স্বদেশরক্ষার জন্য যে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন, তাহা সকলেরই কর্ত্তব্য।

শিষ্য। অর্থাৎ সকলেরই যোদ্ধা হওয়া চাই।

গুরু। তাহার অর্থ এমন নহে যে, সকলকে যুদ্ধব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু সকলেরই প্রয়োজনানুসারে যুদ্ধে সক্ষম হওয়া কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সকল বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষকেই যুদ্ধব্যবসায়ী হইতে হয়, নহিলে সেনাসংখ্যা এত অল্প হয় যে, বৃহৎ রাজ্য সে সকল ক্ষুদ্র রাজ্য অনায়াসে গ্রাস করে। প্রাচীন গ্রীকনগরী সকলে সকলকেই এই জন্য যুদ্ধ করিতে হইত। বৃহৎ রাজ্যে বা সমাজে, যুদ্ধ শ্রেণীবিশেষের কাজ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকে। প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়, এবং মাধ্যকালিক ভারতবর্ষের রাজপুতেরা ইহার উদাহরণ। কিন্তু তাহার ফল এই হয় যে, সেই শ্রেণীবিশেষ আক্রমণকারী কর্ত্তৃক বিজিত হইলে, দেশের আর রক্ষা থাকে না। ভারতবর্ষের রাজপুতেরা পরাভূত হইবামাত্র, ভারতবর্ষ মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইল। কিন্তু রাজপুত ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য জাতি সকল যদি যুদ্ধে সক্ষম হইত, তাহা হইলে ভারতবর্ষে সে দুর্দ্দশা হইত না। ১৭৯৩ সালে ফ্রান্সের সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ অস্ত্রধারণ করিয়া সমবেত ইউরোপকে পরাভূত করিয়াছিল। যদি তাহা না করিত, তবে ফ্রান্সের বড় দুর্দ্দশা হইত।

শিষ্য। কি প্রকার শারীরিক অনুশীলনের দ্বারা এই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইতে পারে?

গুরু। কেবল বলে নহে। চুয়াড়ের সঙ্গে যুদ্ধে কেবল শারীরিক বলই যথেষ্ট, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে শারীরিক বল অপেক্ষা শারীরিক শিক্ষাই বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখনকার দিনে প্রথমতঃ শারীরিক বলের ও অস্থি মাংসপেশী প্রভৃতির পরিপুষ্টির জন্য ব্যায়াম চাই। এদেশে ডন, কুস্তী, মুগুর প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যায়াম প্রচলিত ছিল। ইংরেজি সভ্যতা শিখিতে গিয়া আমরা কেন এ সকল ত্যাগ করিলাম, তাহা বুঝিতে পারি না। আমাদের বর্ত্তমান বুদ্ধি-বিপর্য্যয়ের ইহা একটি উদাহরণ।

দ্বিতীয়তঃ এবং প্রধানতঃ অস্ত্রশিক্ষা। সকলেরই সর্ব্ববিধ অস্ত্রপ্রয়োগে সক্ষম হওয়া উচিত।

শিষ্য। কিন্তু এখনকার আইন অনুসারে আমাদের অস্ত্রধারণ নিষিদ্ধ।

গুরু। সেটা একটা আইনের ভুল। আমরা মহারাণীর রাজভক্ত প্রজা, আমরা অস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহার রাজ্য রক্ষা করিব, ইহাই বাঞ্ছনীয়। আইনের ভুল পশ্চাৎ সংশোধিত হইতে পারে।

তার পর তৃতীয়তঃ অস্ত্রশিক্ষা ভিন্ন আর কতকগুলি শারীরিক শিক্ষা শারীরিক ধর্ম্ম সম্পূর্ণ জন্য প্রয়োজনীয়। যথা অশ্বারোহণ। ইউরোপে যে অশ্বারোহণ করিতে পারে না এবং যাহার অস্ত্রশিক্ষা নাই, সে সমাজের উপহাসাস্পদ। বিলাতী স্ত্রীলোক-দিগেরও এ সকল শক্তি হইয়া থাকে। আমাদের কি দুর্দ্দশা!

অশ্বারোহণ যেমন শারীরিক ধর্ম্মশিক্ষা, পদব্রজে দূরগমন এবং সন্তরণও তাদৃশ। যোদ্ধার পক্ষে ইহা নহিলেই নয়, কিন্তু কেবল যোদ্ধার পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয়, এমন বিবেচনা করিও না। যে সাঁতার না জানে, সে জল হইতে আপনার রক্ষায় ও পরের রক্ষায় অপটু। যুদ্ধে কেবল জল হইতে আত্মরক্ষা ও পরের রক্ষার জন্য ইহা প্রয়োজনীয় এমন নহে, আক্রমণ, নিক্রমণ, ও পলায়ন জন্য অনেক সময়ে ইহার প্রয়োজন হয়। পদব্রজে দূরগমন আরও প্রয়োজনীয়, ইহা বলা বাহুল্য। মনুষ্য মাত্রের পক্ষেই ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

শিষ্য। অতএব যে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন করিবে, কেবল তাহার শরীর পুষ্ট ও বলশালী হইলেই হইবে না। সে ব্যায়ামে সুপটু—

গুরু। এই ব্যায়াম মধ্যে মল্লযুদ্ধটা ধরিয়া লইবে। ইহা বিশেষ বলকারক। আত্মরক্ষার ও পরোপকারের বিশেষ অনুকূল।*

শিষ্য। অতএব, চাই শরীরপুষ্টি, ব্যায়াম, মল্লযুদ্ধ, অস্ত্রশিক্ষা, অশ্বারোহণ, সন্তরণ, পদব্রজে দূরগমন—

গুরু। আরও চাই সহিষ্ণুতা। শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, সকলই সহ্য করিতে পারা চাই। ইহা ভিন্ন যুদ্ধার্থীর আরও চাই। প্রয়োজন হইলে মাটি কাটিতে পারিবে—ঘর বাঁধিতে পারিবে—মোট বহিতে পারিবে। অনেক সময়ে যুদ্ধার্থীকে দশ বার দিনের খাদ্য আপনার পিঠে বহিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছে। স্থূল কথা, যে কর্ম্মকারক আপনার কর্ম্ম জানে, যে যেমন অস্ত্রখানি তীক্ষ্ণধার ও শাণিত করিয়া, সকল দ্রব্য ছেদনের উপযোগী করে, দেহকে সেইরূপ একখানি শাণিত অস্ত্র করিতে হইবে —যেন তদ্দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধ হয়।

শিষ্য। কি উপায়ে ইহা হইতে পারে?

গুরু। ইহার উপায় (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, (৩) আহার, (৪) ইন্দ্রিয়সংযম। চারিটিই অনুশীলন।

শিষ্য। ইহার মধ্যে ব্যায়াম ও শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন শুনিয়াছি। কিন্তু আহার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা আছে। বাচস্পতি মহাশয়ের সেই কাঁচকলা ভাতে ভাতের কথাটা স্মরণ করুন। ততটুকু মাত্র আহার করাই কি ধর্ম্মানুমত? তাহার বেশী আহার কি অধর্ম্ম? আপনি ত এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন।

* লেখক-প্রণীত 'দেবী চৌধুরাণী' নামক গ্রন্থে প্রফুল্লকুমারীকে অনুশীলনের উদাহরণ স্বরূপ প্রতিকৃত করা হইয়াছে। এজন্য সে স্ত্রীলোক হইলেও মল্লযুদ্ধ শিক্ষা করান হইয়াছে।

গুরু। আমি বলিয়াছি শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য যদি তাহাই যথেষ্ট হয়, তবে তাহার অধিক কামনা করা অধর্ম্ম। শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য কিরূপ আহার প্রয়োজনীয়, তাহা বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলিবেন, ধর্ম্মোপদেষ্টার সে কাজ নহে। বোধ করি তাঁহারা বলিবেন যে, কাঁচকলা ভাতে ভাত শরীর রক্ষা ও পুষ্টির জন্য যথেষ্ট নহে। কেহ বা বলিতে পারেন, বাচস্পতির ন্যায়, যে ব্যক্তি কেবল বসিয়া বসিয়া দিন কাটায়, তাহার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। সে তর্কে আমাদের প্রয়োজন নাই—বৈজ্ঞানিকের কর্ম্ম বৈজ্ঞানিক করুক। আহার সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত ধর্ম্মোপদেশ—যাহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মুখনির্গত—গীতা হইতে তাহাই তোমাকে শুনাইয়া আমি নিরস্ত হইব।

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮।১৭

যে আহার আয়ুর্বৃদ্ধিকারক, উৎসাহবৃদ্ধিকারক, বলবৃদ্ধিকারক, স্বাস্থ্যবৃদ্ধিকারক, সুখ বা চিত্তপ্রসাদ বৃদ্ধিকারক, এবং রুচিবৃদ্ধিকারক, যাহা রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, যাহার সারাংশ দেহে থাকিয়া যায় (অর্থাৎ Nutritious) এবং যাহা দেখিলে খাইতে ইচ্ছা করে, তাহাই সাত্ত্বিকের প্রিয়।

শিষ্য। ইহাতে মদ্য, মাংস, মৎস্য বিহিত, না নিষিদ্ধ হইল ?

গুরু। তাহা বৈজ্ঞানিকের বিচার্য্য। শরীরতত্ত্ববিদ্ বা চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিও যে, ইহা আয়ু সত্ত্ব বলারোগ্য সুখপ্রীতিবর্দ্ধক, ইত্যাদি গুণযুক্ত কি না।

শিষ্য। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ত এ সকল নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

গুরু। আমার বিবেচনায় বৈজ্ঞানিকের বা চিকিৎসকের আসনে অবতরণ করা ধর্ম্মোপদেশকের বা ব্যবস্থাপকের উচিত নহে। তবে হিন্দুশাস্ত্রকারেরা মদ্য, মাংস, মৎস্য নিষেধ করিয়া যে মন্দ করিয়াছেন, এমন বলিতেও পারি না। বরং অনুশীলনতত্ত্ব তাঁহাদের বিধি সকলের মূল ছিল, তাহা বুঝা যায়। মদ্য যে অনিষ্টকারী, অনুশীলনের হানিকর, এবং যাহাকেই তুমি ধর্ম্ম বল, তাহারই বিঘ্নকর, একথা বোধ করি তোমাকে কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে হইবে না। মদ্য নিষেধ করিয়া হিন্দুশাস্ত্রকারেরা ভালই করিয়াছেন।

শিষ্য। কোন অবস্থাতেই কি মদ্য ব্যবহার্য্য নহে ?

গুরু। যে পীড়িত ব্যক্তির পীড়া মদ্য ভিন্ন উপশমিত হয় না, তাহার পক্ষে ব্যবহার্য্য হইতে পারে। শীতপ্রধান দেশে, বা অন্য দেশে শৈত্যাধিক্য নিবারণ জন্য ব্যবহার্য্য হইলে হইতে পারে। অত্যন্ত শারীরিক ও মানসিক অবসাদকালে ব্যবহার্য্য হইলে হইতে পারে। কিন্তু এ বিধিও চিকিৎসকের নিকট লইতে হইবে—ধর্ম্মোপদেষ্টার নিকট নহে। কিন্তু একটি এমন অবস্থা আছে যে, সে সময়ে বৈজ্ঞানিক বা চিকিৎসকের কথার অপেক্ষা বা কাহারও বিধির অপেক্ষা না করিয়া পরিমিত মদ্য সেবন করিতে পার।

শিষ্য। এমন কি অবস্থা আছে ?

গুরু। যুদ্ধ। যুদ্ধকালে মদ্য সেবন করা ধর্ম্মানুমত বটে। তাহার কারণ এই যে, যে সকল বৃত্তির বিশেষ স্ফূর্ত্তিতে যুদ্ধে জয় ঘটে, পরিমিত মদ্য সেবনে সে সকলের বিশেষ স্ফূর্ত্তি জন্মে। এ কথা হিন্দুধর্ম্মের অননুমোদিত নহে। মহাভারতে আছে যে, জয়দ্রথ

বধের দিন, অর্জ্জুন একাকী ব্যূহ ভেদ করিয়া শত্রুসেনামধ্যে প্রবেশ করিলে, যুধিষ্ঠির সমস্ত দিন তাঁহার কোন সম্বাদ না পাইয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সাত্যকি ভিন্ন আর কেহই এমন বীর ছিল না, সে ব্যূহ ভেদ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধানে যায়। এ দুষ্কর কার্য্যে যাইতে যুধিষ্ঠির সাত্যকিকে অনুমতি করিলেন। তদুত্তরে সাত্যকি উত্তম মদ্য চাহিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে উত্তম মদ্য দিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে পড়া যায় যে, স্বয়ং কালিকা অসুর বধকালে সুরাপান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে চিন্‌হটের যুদ্ধে ইংরেজসেনা হিন্দু মুসলমান কর্ত্তৃক পরাভূত হয়। স্বয়ং Sir Henry Lawrence সে যুদ্ধে ইংরেজসেনার নায়ক ছিলেন, তথাপি ইংরেজের পরাজয় ঘটিয়াছিল। ইংরেজ ইতিহাস-লেখক সর্ জন্ কে ইহার একটি কারণ এই নির্দ্দেশ করেন যে, ইংরেজসেনা সে দিন মদ্য পায় নাই। অসম্ভব নহে।

যাই হৌক, মদ্য সেবন সম্বন্ধে আমার মত এই যে, (১) যুদ্ধকালে পরিমিত মদ্য সেবন করিতে পার, (২) পীড়াদিতে সুচিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে সেবন করিতে পার, (৩) অন্য কোন সময় সেবন করা অবিধেয়।

শিষ্য। মৎস্য মাংস সম্বন্ধে আপনার কি মত ?

গুরু। মৎস্য মাংস শরীরের অনিষ্টকারী, এমন বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। বরং উপকারী হইতে পারে। কিন্তু সে বিচার বৈজ্ঞানিকের হাতে। ধর্ম্মবেত্তার বক্তব্য এই যে, মৎস্য মাংস, প্রীতিবৃত্তির অনুশীলনের কিয়ৎপরিমাণে বিরোধী। সর্ব্বভূতে প্রীতি হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব। অনুশীলনতত্ত্বেও তাই। অনুশীলন হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্নিহিত—ভিন্ন নহে। এই জন্যই বোধ হয় হিন্দুশাস্ত্রকারেরা মৎস্য মাংস ভক্ষণ নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার ভিতর আর একটা কথা আছে। মৎস্য মাংস বর্জ্জিত করিলে শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত স্ফূর্ত্তি রোধ হয় কি না ? এ কথা বিজ্ঞান-বিদের বিচার্য্য। কিন্তু যদি বিজ্ঞানশাস্ত্র বলে যে, সমুচিত স্ফূর্ত্তি রোধ হয় বটে, তাহা হইলে প্রীতিবৃত্তির অনুচিত সম্প্রসারণ ঘটিল, সামঞ্জস্য বিনষ্ট হইল। এমত অবস্থায় মৎস্য মাংস ব্যবহার্য। কথাটা বিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে। ধর্ম্মোপদেষ্টার বৈজ্ঞানিকের আসন গ্রহণ করা উচিত নহে, পূর্ব্বে বলিয়াছি।

শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের প্রয়োজনীয় মধ্যে, (১) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, এবং (৩) আহারের কথা বলিলাম, এক্ষণে (৪) ইন্দ্রিয় সংযম সম্বন্ধেও একটা কথা বলা আবশ্যক। শারীরিক বৃত্তির সদনুশীলনজন্য ইন্দ্রিয় সংযম যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বোধ করি, বুঝাইতে হইবে না। ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতীত শরীরের পুষ্টি নাই, বল নাই, ব্যায়ামের সম্ভাবনা থাকে না, শিক্ষা নিষ্ফল হয়, আহার বৃথা হয়, তাহার পরিপাকও হয় না। আর ইন্দ্রিয়ের সংযমই যে ইন্দ্রিয়ের উপযুক্ত অনুশীলন, ইহাও তোমাকে বুঝাইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে স্মরণ করিতে বলি যে, ইন্দ্রিয় সংযম মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের অধীন ; মানসিক শক্তি ভিন্ন ইহা ঘটে না। অতএব যেমন ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছ যে, মানসিক বৃত্তির উচিত অনুশীলন শারীরিকী বৃত্তির অনুশীলনের উপর নির্ভর করে, তেমনি এখন দেখিতেছ যে, শারীরিক বৃত্তির উচিত অনুশীলন আবার মানসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করে। শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি এইরূপ সম্বন্ধ-

বিশিষ্ট ; একের অনুশীলনের অভাবে অন্যের অনুশীলনের অভাব ঘটে। অতএব যে সকল ধর্ম্মোপদেষ্টা কেবল মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত, তাঁহাদের কথিত ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ। যে শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞানোপার্জ্জন, সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ, সুতরাং ধর্ম্মবিরুদ্ধ। কালেজে ছেলে পড়াইলেই ছেলে মানুষ হয় না এবং কতকগুলা বহি পড়িলে পণ্ডিত হয় না। পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে এই প্রথাটা বড় অনিষ্টকারী হইয়া উঠিয়াছে।

নবম অধ্যায়—জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি

শিষ্য। শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে কিছু উপদেশ পাইয়াছি, এক্ষণে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। আমি যত দূর বুঝিয়াছি, তাহা এই যে, অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় এ সকল বৃত্তির অনুশীলনে সুখ, ইহাই ধর্ম্ম। অতএব জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন এবং জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে হইবে।

গুরু। ইহা প্রথম প্রয়োজন। দ্বিতীয় প্রয়োজন, জ্ঞানোপার্জ্জন ভিন্ন অন্য বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন করা যায় না। শারীরিক বৃত্তির উদাহরণদ্বারা ইহা বুঝাইয়াছি। ইহা ভিন্ন তৃতীয় প্রয়োজন আছে। তাহা বোধ হয়, সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। জ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরকে জানা যায় না। ঈশ্বরের বিধিপূর্ব্বক উপাসনা করা যায় না।

শিষ্য। তবে কি মূর্খের ঈশ্বরোপাসনা নাই? ঈশ্বর কি কেবল পণ্ডিতের জন্য?

গুরু। মূর্খের ঈশ্বরোপাসনা নাই। মূর্খের ধর্ম্ম নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পৃথিবীতে যত জ্ঞানকৃত পাপ দেখা যায়, সকলই প্রায় মূর্খের কৃত। তবে একটা ভ্রম সংশোধন করিয়া দিই। যে লেখাপড়া জানে না, তাহাকেই মূর্খ বলিও না। আর যে লেখাপড়া করিয়াছে, তাহাকেই জ্ঞানী বলিও না। জ্ঞান পুস্তকপাঠ ভিন্ন অন্য প্রকারে উপার্জ্জিত হইতে পারে; জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলন বিদ্যালয় ভিন্ন অন্যত্র হইতে পারে। আমাদের দেশের প্রাচীন স্ত্রীলোকেরা ইহার উত্তম উদাহরণস্থল। তাঁহারা প্রায় কেহই লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্তু তাঁহাদের মত ধার্ম্মিকও পৃথিবীতে বিরল। কিন্তু তাঁহারা বহি না পড়ুন, মূর্খ ছিলেন না। আমাদের দেশে জ্ঞানোপার্জ্জনের কতকগুলি উপায় ছিল, যাহা এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। কথকতা ইহার মধ্যে একটি। প্রাচীনারা কথকের মুখে পুরাণেতিহাস শ্রবণ করিতেন। পুরাণেতিহাসের মধ্যে অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার নিহিত আছে। তচ্ছ্রবণে তাঁহাদিগের জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকল পরিমার্জ্জিত ও পরিতৃপ্ত হইত। তদ্ভিন্ন আমাদিগের দেশে হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্যে পুরুষপরম্পরায় একটি অপূর্ব্ব জ্ঞানের স্রোত চলিয়া আসিতেছিল। তাঁহারা তাহার অধিকারিণী ছিলেন। এই সকল উপায়ে তাঁহারা শিক্ষিত বাবুদিগের অপেক্ষা অনেক বিষয় ভাল বুঝিতেন। উদাহরণস্বরূপ অতিথিসংকারের কথাটা ধর। অতিথিসংকারের মাহাত্ম্য জ্ঞানলভ্য; জাগতিক সত্যের সঙ্গে ইহা সম্বন্ধবিশিষ্ট। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় অতিথির নামে জ্বলিয়া উঠেন; ভিখারী দেখিলে লাঠি দেখান। কিন্তু যে জ্ঞান ইঁহাদের নাই, প্রাচীনাদের ছিল; তাঁহারা অতিথিসংকারের

মাহাত্ম্য বুঝিতেন। এমনই আর শত শত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। সে সকল বিষয়ে নিরক্ষর প্রাচীনারাই জ্ঞানী, এবং আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় অজ্ঞানী, ইহাই বলিতে হইবে।

শিষ্য। ইহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দোষ নহে, বোধ হয় ইংরেজী শিক্ষাপ্রণালীর দোষ।

গুরু। সন্দেহ নাই। আমি যে অনুশীলনতত্ত্ব তোমাকে বুঝাইলাম অর্থাৎ সকল বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্যপূর্ব্বক অনুশীলন করিতে হইবে, এই কথাটি না বুঝাই এ দোষের কারণ।

কাহারও কোন কোন বৃত্তির অনুশীলন কর্ত্তব্য, এরূপ লোক-প্রতীতি আছে, এবং তদনুরূপ কার্য্য হইতেছে। এইরূপ লোক-প্রতীতি ফল আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী। সেই শিক্ষাপ্রণালীতে তিনটি গুরুতর দোষ আছে। এই মনুষ্যত্তত্ত্বের প্রতি মনোযোগী হইলেই, সেই সকল দোষের আবিষ্কার ও প্রতিকার করা যায়।

শিষ্য। সে সকল দোষ কি?

গুরু। প্রথম, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির প্রতিই অধিক মনোযোগ; কার্য্যকারিণী বা চিত্তরঞ্জিনীর প্রতি প্রায় অমনোযোগ।

এই প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া আধুনিক শিক্ষকেরা শিক্ষালয়ে শিক্ষা দেন বলিয়া, এ দেশে ও ইউরোপে এত অনিষ্ট হইতেছে। এ দেশে বাঙ্গালীরা অমানুষ হইতেছে; তর্ককুশলী, বাগ্মী বা সুলেখক—ইহাই বাঙ্গালীর চরমোৎকর্ষের স্থান হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপের কোন প্রদেশের লোক কেবল শিল্পকুশল, অর্থগৃধ্নু, স্বার্থপর হইতেছে; কোন দেশে রণপ্রিয়, পরস্বাপহারী পিশাচ জন্মিতেছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপে এত যুদ্ধ. দুর্ব্বলের উপর এত পীড়ন। শারীরিক বৃত্তি, কার্য্যকারিণী বৃত্তি, মনোরঞ্জিনী বৃত্তি, যতগুলি আছে সকলগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যযোগ্য যে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন, তাহাই মঙ্গলকর; সেগুলির অবহেলা, আর বুদ্ধিবৃত্তির অসঙ্গত স্ফূর্ত্তি মঙ্গলদায়ক নহে। আমাদিগের সাধারণ লোকের ধর্ম্মসংক্রান্ত বিশ্বাস এরূপ নহে। হিন্দুর পূজনীয় দেবতাদিগের প্রাধান্য, রূপবান্ চন্দ্রে বা বলবান্ কার্ত্তিকেয়ে নিহিত হয় নাই; বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি বা জ্ঞানী ব্রহ্মায় অর্পিত হয় নাই; রসজ্ঞ গন্ধর্ব্বরাজ বা বাগ্দেবীতে নহে। কেবল সেই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন—অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতিবিশিষ্ট ষড়ৈশ্বর্য্যশালী বিষ্ণুতে নিহিত হইয়াছে। অনুশীলন নীতির স্থূল গ্রন্থি এই যে, সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি পরস্পর পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্যবিশিষ্ট হইয়া অনুশীলিত হইবে, কেহ কাহাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া অসঙ্গত বৃদ্ধি পাইবে না।

শিষ্য। এই গেল একটি দোষ। আর?

গুরু। আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর দ্বিতীয় ভ্রম এই যে, সকলকে এক এক, কি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পরিপক্ক হইতে হইবে—সকলের সকল বিষয় শিখিবার প্রয়োজন নাই। যে পারে, সে ভাল করিয়া বিজ্ঞান শিখুক, তাহার সাহিত্যের প্রয়োজন নাই। যে পারে, সে সাহিত্য উত্তম করিয়া শিখুক, তাহার বিজ্ঞানে প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে মানসিক বৃত্তির সকলগুলির স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইল কৈ? সবাই আধখানা

করিয়া মানুষ হইল, আস্ত মানুষ পাইব কোথা? যে বিজ্ঞানকুশলী, কিন্তু কাব্য-রসাদির আস্বাদনে বঞ্চিত, সে কেবল আধখানা মানুষ। অথবা যে সৌন্দর্য্যদগ্ধপ্রাণ, সর্ব্বসৌন্দর্য্যের রসগ্রাহী, কিন্তু জগতের অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে অজ্ঞ—সেও আধখানা মানুষ। উভয়েই মনুষ্যত্ববিহীন, সুতরাং ধর্ম্মে পতিত। যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধবিশারদ—কিন্তু রাজধর্ম্মে অনভিজ্ঞ—অথবা যে ক্ষত্রিয় রাজধর্ম্মে অভিজ্ঞ, কিন্তু রণবিদ্যায় অনভিজ্ঞ, তাহারা যেমন হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মচ্যুত, ইহারাও তেমনি ধর্ম্মচ্যুত—এই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম।

শিষ্য। আপনার ধর্ম্মব্যাখ্যা অনুসারে সকলকেই সকল শিখিতে হইবে।

গুরু। না, ঠিক তা নয়। সকলকেই সকল মনোবৃত্তিগুলি সংকর্ষিত করিতে হইবে।

শিষ্য। তাই হউক—কিন্তু সকলের কি তাহা সাধ্য? সকলের সকল বৃত্তিগুলি তুল্যরূপে তেজস্বিনী নহে। কাহারও বিজ্ঞানানুশীলনী বৃত্তিগুলি অধিক তেজস্বিনী, সাহিত্যানুযায়িনী বৃত্তিগুলি সেরূপ নহে। বিজ্ঞানের অনুশীলন করিলে সে একজন বড় বৈজ্ঞানিক হইতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের অনুশীলনে তাহার কোন ফল হইবে না, এ স্থলে সাহিত্যে বিজ্ঞানে তাহার কি তুল্যরূপ মনোযোগ করা উচিত?

গুরু। প্রতিভার বিচারকালে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। সেই কথা ইহার উত্তর। তার পর তৃতীয় দোষ শুন।

জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে বিশেষ একটি সাধারণ ভ্রম এই যে সংকর্ষণ অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জ্জন, বৃত্তির স্ফুরণ নহে। যদি কোন বৈদ্য, রোগীকে উদর ভরিয়া পথ্য দিতে ব্যতিব্যস্ত হয়েন, অথচ তাহার ক্ষুধাবৃদ্ধি বা পরিপাকশক্তির প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করেন, তবে সেই চিকিৎসক যেরূপ ভ্রান্ত, এই প্রণালীর শিক্ষকেরাও সেইরূপ ভ্রান্ত। যেমন সেই চিকিৎসকের চিকিৎসার ফল অজীর্ণ, রোগবৃদ্ধি,—তেমনি এই জ্ঞানার্জ্জন বাতিকগ্রস্ত শিক্ষকদিগের শিক্ষার ফল মানসিক অজীর্ণ—বৃত্তি সকলের অবনতি। মুখস্থ কর, মনে রাখ, জিজ্ঞাসা করিলে যেন চটপট করিয়া বলিতে পার। তার পর, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইল, কি শুষ্ক কাষ্ঠ কোপাইতে কোপাইতে ভোঁতা হইয়া গেল, স্বশক্তি অবলম্বিনী হইল, কি প্রাচীন পুস্তকপ্রণেতা এবং সমাজের শাসনকর্ত্তারূপ বৃদ্ধ-পিতামহীবর্গের আঁচল ধরিয়া চলিল, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি বুড়ো খোকার মত কেবল গিলাইয়া দিলে গিলিতে পারে, কি আপনি আহারার্জ্জনে সক্ষম হইল, সে বিষয়ে কেহ ভ্রমেও চিন্তা করেন না। এই সকল শিক্ষিত গর্দ্দভ জ্ঞানের ছালা পিঠে করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া বেড়ায়—বিস্মৃতি নামে করুণাময়ী দেবী আসিয়া ভার নামাইয়া লইলে, তাহারা পালে মিশিয়া স্বচ্ছন্দে ঘাস খাইতে থাকে।

শিষ্য। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতি আপনার এত কোপদৃষ্টি কেন?

গুরু। আমি কেবল আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা বলিতেছিলাম না। এখনকার ইংরেজের শিক্ষাও এইরূপ। আমরা যে মহাপ্রভুদিগের অনুকরণ করিয়া, মনুষ্যজন্ম সার্থক করিব মনে করি, তাঁহাদিগেরও বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ, জ্ঞান পীড়াদায়ক।

শিষ্য। ইংরেজের বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ? আপনি ক্ষুদ্র বাঙ্গালী হইয়া এত বড় কথা বলিতে সাহস করেন? আবার জ্ঞান পীড়াদায়ক?

গুরু। একে একে বাপু। ইংরেজের বুদ্ধি সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র বাঙ্গালী হইয়াও বলি। আমি গোষ্পদ বলিয়া যে ডোবাকে সমুদ্র বলিব, এমত হইতে পারে না। যে জাতি এক শত কুড়ি বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষের আধিপত্য করিয়া ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে একটা কথাও বুঝিল না, তাঁহাদের অন্য লক্ষ গুণ থাকে স্বীকার করিব, কিন্তু তাঁহাদিগকে প্রশস্তবুদ্ধি বলিতে পারিব না। কথাটার বেশী বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নাই—তিক্ত হইয়া উঠিবে। তবে ইংরেজের অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণ পথে বাঙ্গালীর বুদ্ধি চলিতেছে, ইহা আমি না হয় স্বীকার করিলাম। ইংরেজের শিক্ষা অপেক্ষাও আমাদের শিক্ষা যে নিকৃষ্ট, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের সেই কুশিক্ষার মূল ইউরোপের দৃষ্টান্ত। আমাদের প্রাচীন শিক্ষা হয়ত আরও নিকৃষ্ট ছিল। কিন্তু তাহা বলিয়া বর্ত্তমান শিক্ষাকে ভাল বলিতে পারি না। একটা আপত্তি মিটিল ত?

শিষ্য। জ্ঞান পীড়াদায়ক, এখনও বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু। জ্ঞান স্বাস্থ্যকর, এবং জ্ঞান পীড়াদায়ক। আহার স্বাস্থ্যকর, এবং অজীর্ণ হইলে পীড়াদায়ক। অজীর্ণ জ্ঞান পীড়াদায়ক। অর্থাৎ কতকগুলা কথা জানিয়াছি, কিন্তু যাহা যাহা জানিয়াছি, সে সকলের কি সম্বন্ধ, সকলগুলির সমবায়ে ফল কি, তাহা কিছুই জানি না। গৃহে অনেক আলোক জ্বালতেছে, কেবল সিঁড়িটুকু অন্ধকার। এই জ্ঞানপীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিরা এই জ্ঞান লইয়া কি করিতে হয়, তাহা জানে না। একজন ইংরেজ স্বদেশ হইতে নূতন আসিয়া একখানি বাগান কিনিয়াছিলেন। মালী বাগানের নারিকেল পাড়িয়া আনিয়া উপহার দিল। সাহেব ছোবড়া খাইয়া তাহা অস্বাদু বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। মালী উপদেশ দিল, "সাহেব! ছোবড়া খাইতে নাই—আঁটি খাইতে হয়।" তার পর আঁব আসিল। সাহেব মালীর উপদেশবাক্য স্মরণ করিয়া ছোবড়া ফেলিয়া দিয়া আঁটি খাইলেন। দেখিলেন, এবারও বড় রস পাওয়া গেল না। মালী বলিয়া দিল, "সাহেব! কেবল খোসাখানা ফেলিয়া দিয়া, শাঁসটা ছুরি দিয়া কাটিয়া খাইতে হয়।" সাহেবের সে কথা স্মরণ রহিল। শেষ ওল আসিল। সাহেব, তাহার খোসা ছাড়াইয়া কাটিয়া খাইলেন। শেষে যন্ত্রণায় কাতর হইয়া মালীকে প্রহারপূর্ব্বক আধা কড়িতে বাগান বেচিয়া ফেলিলেন। অনেকের মানসক্ষেত্র এই বাগানের মত ফলে ফুলে পরিপূর্ণ তবে অধিকারীর ভোগে হয় না। তিনি ছোবড়ার জায়গায় আঁটি, আঁটির জায়গায় ছোবড়া খাইয়া বসিয়া থাকেন। এরূপ জ্ঞান বিড়ম্বনা মাত্র।

শিষ্য। তবে কি জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন জন্য জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন?

গুরু। পাগল! অস্ত্রখানা শানাইতে গেলে কি শূন্যের উপর শান দেওয়া যায়? জ্ঞেয় বস্তু ভিন্ন কিসের উপর অনুশীলন করিবে? জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন জন্য জ্ঞানার্জ্জন নিশ্চিত প্রয়োজন। তবে ইহাই বুঝাইতে চাই যে, জ্ঞানার্জ্জন যেরূপ উদ্দেশ্য, বৃত্তির বিকাশও সেইরূপ মুখ্য উদ্দেশ্য। আর ইহাও মনে করিতে হইবে, জ্ঞানার্জ্জনেই জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির পরিতৃপ্তি। অতএব চরম উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জ্জনই বটে। কিন্তু যে অনুশীলনপ্রথা চলিত, তাহাতে পেট বড় না হইতে আহার ঠুসিয়া দেওয়া হইতে থাকে। পাকশক্তির বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই, ক্ষুধা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই—আধার

বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নাই—ঠুসে গেলা। যেমন কতকগুলি অবোধ মাতা এইরূপ করিয়া শিশুর শারীরিক অবনতি সংসাধিত করিয়া থাকে, তেমন এখনকার পিতা ও শিক্ষকেরা পুত্র ও ছাত্রগণের অবনতি সংসাধিত করেন।

জ্ঞানার্জ্জন ধর্ম্মের একটি প্রধান অংশ। কিন্তু সম্প্রতি তৎসম্বন্ধে এই তিনটি সামাজিক পাপ সর্ব্বদা বর্ত্তমান। ধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য সমাজে গৃহীত হইলে, এই কুশিক্ষারূপ পাপ সমাজ হইতে দূরীকৃত হইবে।

দশম অধ্যায়—মনুষ্যে ভক্তি

শিষ্য। সুখ, সকল বৃত্তিগুলির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি, পরিণতি, সামঞ্জস্য এবং চরিতার্থতা। বৃত্তিগুলির সম্যক্ স্ফূর্ত্তি, পরিণতি এবং সামঞ্জস্য মনুষ্যত্ব। বৃত্তিগুলি, শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জিনী। ইহার মধ্যে শারীরিকী ও জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলন প্রথা সম্বন্ধে কিছু উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। নিকৃষ্টা কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলন কি, সামঞ্জস্য বুঝিবার সময়ে, ভয়, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদির উদাহরণে বুঝিয়াছি। নিকৃষ্টা কার্য্যকারিণী বৃত্তি সম্বন্ধে, বোধ করি, আপনার আর কোন বিশেষ উপদেশ নাই, তাহাও বুঝিয়াছি। কিন্তু অনুশীলনতত্ত্বের এ সকল ত সামান্য অংশ। অবশিষ্ট যাহা শ্রোতব্য, তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। এক্ষণে যাহাকে কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির মধ্যে সচরাচর উৎকৃষ্ট বলে, তাদৃশ বৃত্তির কথা বলিব। বৃত্তির মধ্যে যে অর্থে উৎকর্ষ নিকর্ষ নির্দ্দেশ করা যায়, সেই অর্থে এই তিনটি বৃত্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ভক্তি, প্রীতি, দয়া।

শিষ্য। ভক্তি, প্রীতি, দয়া এ তিনটি কি একই বৃত্তি নহে? প্রীতি ঈশ্বরে ন্যস্ত হইলেই সে ভক্তি হইল, এবং আর্ত্তে ন্যস্ত হইলেই তাহা দয়া হইল।

গুরু। যদি এরূপ বলিতে চাও, তাহাতে আমার এখন কোন আপত্তি নাই; কিন্তু অনুশীলন জন্য তিনটিকে পৃথক্ বিবেচনা করাই ভাল। বিশেষ, ঈশ্বরে ন্যস্ত যে প্রীতি, সেই ভক্তি, এমন নহে। মনুষ্য—যথা রাজা, গুরু, পিতা, মাতা, স্বামী প্রভৃতিও ভক্তির পাত্র। আর ঈশ্বরে ভক্তি না হইয়াও কেবল প্রীতি জন্মিতে পারে। তাই, বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, এবং মধুর, ঈশ্বরের প্রতি এই পঞ্চবিধ অনুরাগ স্বীকার করেন। সে পাঁচটি দেখিবে, এই ভক্তি, প্রীতি, দয়া মাত্র। তবে কোন ভাবটি মিশ্র, কোনটি অমিশ্র, যথা—

শান্ত (সাধারণ ভক্তের যে ভাব) = ভক্তি।

দাস্য (হনুমানাদির যে ভাব) = ভক্তি + দয়া।

সখ্য (শ্রীদামাদির যে ভাব) = প্রীতি।

বাৎসল্য (নন্দ যশোদা) = প্রীতি + দয়া।

মধুর (রাধা) = ভক্তি + প্রীতি + দয়া।

শিষ্য। কৃষ্ণের প্রতি রাধার যে ভাব বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা কল্পনা করেন, তাহার মধ্যে দয়া কোথায়?

গুরু। স্নেহ আছে স্বীকার কর?

শিষ্য। করি, কিন্তু স্নেহ ত প্রীতি।

গুরু। কেবল প্রীতি নহে। প্রীতি ও দয়ার মিশ্রণে স্নেহ। সুতরাং মধুর ভাবের ভিতর দয়াও আছে। ভক্তি, প্রীতি, দয়া, মনুষ্যবৃত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই ভক্তি ঈশ্বরে ন্যস্ত হইলেই, অন্য ধর্ম্মাবলম্বীরা সন্তুষ্ট হইলেন, ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। কিন্তু বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা তাহাতেও সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা চাহেন যে, তিনটি শ্রেষ্ঠবৃত্তিই ঈশ্বরমুখী হইবে। ইহা এক দিনের কাজ নহে। ক্রমে একটি একটি, দুইটি দুইটি করিয়া শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যের পর্য্যায়ক্রমে সর্ব্বশেষে সকলগুলিই ঈশ্বরে অর্পণ করিতে শিখিতে হইবে, তখন "রাধা" (যে আরাধনা করে) হইতে পারা যায়।

কিন্তু ঈশ্বরভক্তির কথা এখন থাক। আগে মনুষ্যে ভক্তির কথা বলা যাউক। যিনিই আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং যাঁহার শ্রেষ্ঠতা হইতে আমরা উপকৃত হই, তিনিই ভক্তির পাত্র। ভক্তির সামাজিক প্রয়োজন এই যে, (১) ভক্তি ভিন্ন নিকৃষ্ট কখন উৎকৃষ্টের অনুগামী হয় না। (২) নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টের অনুগামী না হইলে সমাজের ঐক্য থাকে না, বন্ধন থাকে না, উন্নতি ঘটে না।

দেখা যাউক, মনুষ্যমধ্যে কে ভক্তির পাত্র। (১) পিতামাতা ভক্তির পাত্র। তাঁহারা যে আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা বুঝাইতে হইবে না। গুরু জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ, আমাদের জ্ঞানদাতা, এজন্য তিনিও ভক্তির পাত্র। গুরু ভিন্ন মনুষ্যের মনুষ্যত্বই অসম্ভব, ইহা শারীরিক বৃত্তি আলোচনাকালে বুঝাইয়াছি। এজন্য গুরু বিশেষ প্রকারে ভক্তির পাত্র। হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বতত্ত্বদর্শী, এজন্য হিন্দুধর্ম্মের গুরুভক্তির উপর বিশেষ দৃষ্টি। পুরোহিত, অর্থাৎ যিনি ঈশ্বরের নিকট আমাদের মঙ্গল কামনা করেন, সর্ব্বথা আমাদের হিতানুষ্ঠান করেন এবং আমাদের অপেক্ষা ধর্ম্মাত্মা ও পবিত্রস্বভাব, তিনিও ভক্তির পাত্র। যিনি কেবল চাল কলার জন্য পুরোহিত, তিনি ভক্তির পাত্র নহেন। স্বামী সকল বিষয়েই স্ত্রীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তিনি ভক্তির পাত্র। হিন্দুধর্ম্মে ইহাও বলে যে, স্ত্রীরও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত, কেন না, হিন্দুধর্ম্ম বলে যে, স্ত্রীকে লক্ষ্মীরূপা মনে করিবে। কিন্তু এখানে হিন্দুধর্ম্মের অপেক্ষা কোম্‌ৎ ধর্ম্মের উক্তি কিছু স্পষ্ট এবং শ্রদ্ধার যোগ্য। যেখানে স্ত্রী স্নেহে, ধর্ম্মে বা পবিত্রতায় শ্রেষ্ঠ, সেখানে তাঁহারও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত বটে। গৃহধর্ম্মে ইঁহারা ভক্তির পাত্র; যাঁহারা ইঁহাদের স্থানীয়, তাঁহারাও সেইরূপ ভক্তির পাত্র। গৃহমধ্যে যাহারা নিম্নস্থ তাহারা যদি ভক্তির পাত্রগণকে ভক্তি না করে, যদি পিতা মাতাকে পুত্র কন্যা বা বধূ ভক্তি না করে, যদি স্বামীকে স্ত্রী ভক্তি না করে, যদি স্ত্রীকে স্বামী ঘৃণা করে, যদি শিক্ষাদাতাকে ছাত্র ঘৃণা করে, তবে সে গৃহে কিছুমাত্র উন্নতি নাই—সে গৃহ নরকবিশেষ। এ কথা কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে হইবে না, প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। এই সকল ভক্তির পাত্রের প্রতি সমুচিত ভক্তির উদ্রেক অনুশীলনের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য। হিন্দুধর্ম্মেরও সেই উদ্দেশ্য। বরং অন্যান্য ধর্ম্মের অপেক্ষা এ বিষয়ে হিন্দুধর্ম্মেরই প্রাধান্য আছে। হিন্দুধর্ম্ম যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, ইহা তদ্বিষয়ে অন্যতর প্রমাণ।

(২) এখন বুঝিয়া দেখ, গৃহস্থ পরিবারের যে গঠন, সমাজের সেই গঠন। গৃহের

কর্ত্তার ন্যায়, পিতা মাতার ন্যায়, রাজা সেই সমাজের শিরোভাগ। তাঁহার গুণে, তাঁহার দণ্ডে, তাঁহার পালনে সমাজ রক্ষিত হইয়া থাকে। পিতা যেমন সন্তানের ভক্তির পাত্র, রাজাও সেইরূপ প্রজার ভক্তির পাত্র। প্রজার ভক্তিতেই রাজা শক্তিমান্—নহিলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত? রাজা বলশূন্য হইলে সমাজ থাকিবে না। অতএব রাজাকে সমাজের পিতার স্বরূপ ভক্তি করিবে। লর্ড রীপণ সম্বন্ধে যে সকল উৎসাহ ও উৎসবাদি দেখা গিয়াছে, এইরূপ এবং অন্যান্য সদুপায় দ্বারা রাজভক্তি অনুশীলিত করিবে। যুদ্ধকালে রাজার সহায় হইবে। হিন্দুধর্ম্মে পুনঃ পুনঃ রাজ-ভক্তির প্রশংসা আছে। বিলাতী ধর্ম্মে হউক বা না হউক, বিলাতী সামাজিক নীতিতে রাজভক্তির বড় উচ্চ স্থান ছিল। বিলাতে এখন আর রাজভক্তির স্থান নাই। যেখানে আছে—যথা জর্ম্মানি বা ইতালি, সেখানে রাজ্য উন্নতিশীল।

শিষ্য। সেই ইউরোপীয় রাজভক্তিটা আমার বড় বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। লোকে রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় রাজাকে যে ভক্তি করিবে, ইহা বুঝিতে পারি, আকবর বা অশোকের উপর ভক্তিও না হয় বুঝিলাম, কিন্তু দ্বিতীয় চার্লস্ বা পঞ্চদশ লুইর মত রাজার উপরে যে রাজভক্তি হয়, ইহার পর মনুষ্যের অধঃপতনের আর গুরুতর চিহ্ন কি হইতে পারে?

গুরু। যে মনুষ্য রাজা, সেই মনুষ্যকে ভক্তি করা এক বস্তু, রাজাকে ভক্তি করা স্বতন্ত্র বস্তু। যে দেশে একজন রাজা নাই—যে রাজ্য সাধারণতন্ত্র, সেইখানকার কথা মনে করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, রাজভক্তি কোন মনুষ্যবিশেষের প্রতি ভক্তি নহে। আমেরিকার কংগ্রেসের বা ব্রিটিশ পার্লিমেণ্টের কোন সভ্যবিশেষ ভক্তির পাত্র না হইতে পারেন, কিন্তু কংগ্রেস ও পার্লিমেণ্ট ভক্তির পাত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেইরূপ চার্ল্স্ ষ্টুয়ার্ট বা লুই কাপে ভক্তির পাত্র না হইতে পারেন, কিন্তু তত্তৎ সময়ের ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের রাজা তত্তৎ প্রদেশীয়দিগের ভক্তির পাত্র।

শিষ্য। তবে কি একটা দ্বিতীয় ফিলিপ বা একটা ঔরঙ্গজেবের ন্যায় নরাধমের বিপক্ষে বিদ্রোহ পাপের মধ্যে গণ্য হইবে?

গুরু। কদাপি না। রাজা যতক্ষণ প্রজাপালক, ততক্ষণ তিনি রাজা। যখন তিনি প্রজাপীড়ক হইলেন, তখন তিনি আর রাজা নহেন, আর ভক্তির পাত্র নহেন। এরূপ রাজাকে ভক্তি করা দূরে থাক, যাহাতে সে রাজা সুশাসন করিতে বাধ্য হয়, তাহা দেশবাসীদিগের কর্ত্তব্য। কেন না, রাজার স্বেচ্ছাচারিতা সমাজের অমঙ্গল। কিন্তু সে সকল কথা ভক্তিতত্ত্বে উঠিতেছে না, প্রীতিতত্ত্বের অন্তর্গত। আর একটা কথা বলিয়া রাজভক্তি সমাপ্ত করি। রাজা যেমন ভক্তির পাত্র, তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ রাজপুরুষ-গণও যথাযোগ্য সম্মানের পাত্র। কিন্তু তাঁহারা যতক্ষণ আপন আপন রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকেন, এবং ধর্ম্মতঃ সেই কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, ততক্ষণই তাঁহারা সম্মানের পাত্র। তার পর তাঁহারা সাধারণ মনুষ্য।

রাজপুরুষে যথাযোগ্য ভক্তি ভাল, কিন্তু বেশী মাত্রায় কিছুই ভাল নহে—কেন না, বেশী মাত্রা অসামঞ্জস্যের কারণ। রাজা সমাজের প্রতিনিধি এবং রাজ-পুরুষেরা সমাজের ভৃত্য—এ কথা কাহারও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। আমাদের

দেশীয় লোক এ কথা বিস্মৃত হইয়া, রাজপুরুষের অপরিমিত তোষামোদ করিয়া থাকেন।

(৩) রাজার অপেক্ষাও, যাঁহারা সমাজের শিক্ষক, তাঁহারা ভক্তির পাত্র। গৃহস্থ গুরুর কথা, গৃহস্থিত ভক্তির পাত্রদিগের সঙ্গে বলিয়াছি, কিন্তু এই গুরুগণ, কেবল গার্হস্থ্য গুরু নহেন, সামাজিক গুরু। যাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধি বলে, পরিশ্রমের সহিত সমাজের শিক্ষায় নিযুক্ত, তাঁহারাই সমাজের প্রকৃত নেতা, তাঁহারাই যথার্থ রাজা। অতএব ধর্ম্মবেত্তা, বিজ্ঞানবেত্ত, নীতিবেত্তা, দার্শনিক, পুরাণবেত্তা, সাহিত্যকার, কবি প্রভৃতির প্রতি যথোচিত ভক্তির অনুশীলন কর্ত্তব্য। পৃথিবীর যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে, তাহা ইঁহাদিগের দ্বারা হইয়াছে। ইঁহারা পৃথিবীকে যে পথে চালান, সেই পথে পৃথিবী চলে। ইঁহারা রাজাদিগেরও গুরু। রাজগণ ইঁহাদিগের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া তবে সমাজশাসনে সক্ষম হয়েন। এই হিসাবে, ভারতবর্ষ ভারতীয় ঋষিদিগের সৃষ্টি—এই জন্য ব্যাস, বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, কপিল, গোতম—সমস্ত ভারতবর্ষের পূজ্যপাদ পিতৃগণস্বরূপ। ইউরোপেও গলিলীও, নিউটন, কান্ত্, কোম্‌ৎ, দান্তে, শেক্ষপীয়র প্রভৃতি সেই স্থানে।

শিষ্য। আপনার কথার তাৎপর্য্য কি এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, যাঁহা দ্বারা আমি যে পরিমাণে উপকৃত, তাঁহার প্রতি সেই পরিমাণে ভক্তিযুক্ত হইব?

গুরু। তাহা নহে। ভক্তি কৃতজ্ঞতা নহে। অনেক সময়ে নিকৃষ্টের নিকটও কৃতজ্ঞ হইতে হয়। ভক্তি পরের জন্য নহে, আপনার উন্নতির জন্য। যাহার ভক্তি নাই, তাহার চরিত্রের উন্নতি নাই। এই লোকশিক্ষকদিগের প্রতি যে ভক্তির কথা বলিলাম, তাহাই উদাহরণ স্বরূপ লইয়া বুঝিয়া দেখ। তুমি কোন লেখকের প্রণীত গ্রন্থ পড়িতেছ। যদি সে লেখকের প্রতি তোমার ভক্তি না থাকে, তবে সে গ্রন্থের দ্বারা তোমার কোন উপকার হইবে না। তাঁহার প্রদত্ত উপদেশে তোমার চরিত্র কোনরূপ শাসিত হইবে না। তাহার মর্ম্মার্থ তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে না। গ্রন্থকারের সঙ্গে সহৃদয়তা না থাকিলে, তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। অতএব জগতের শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি না থাকিলে শিক্ষা নাই। সেই শিক্ষাই সকল উন্নতির মূল; অতএব সে ভক্তি ভিন্ন উন্নতিও নাই। ইঁহাদের প্রতি সমুচিত ভক্তি অনুশীলন পরম ধর্ম্ম।

শিষ্য। কৈ, এ ধর্ম্ম ত আপনার প্রশংসিত হিন্দুধর্ম্মে শিখায় না?

গুরু। এটা অতি মূর্খের মত কথা। বরং হিন্দুধর্ম্মে ইহা যে পরিমাণে শিখায়, এমন আর কোন ধর্ম্মেই শিখায় নাই। হিন্দুধর্ম্মে ব্রাহ্মণগণ সকলের পূজ্য। তাঁহারা যে বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং আপামর সাধারণের বিশেষ ভক্তির পাত্র, তাহার কারণ এই যে, ব্রাহ্মণেরাই ভারতবর্ষে সামাজিক শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মবেত্তা, তাঁহারাই নীতিবেত্তা, তাঁহারাই বিজ্ঞানবেত্তা, তাঁহারাই পুরাণবেত্ত, তাঁহারাই দার্শনিক, তাঁহারাই সাহিত্যপ্রণেতা, তাঁহারাই কবি। তাই অনন্তজ্ঞানী হিন্দুধর্ম্মের উপদেশকগণ তাঁহাদিগকে লোকের অশেষ ভক্তির পাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সমাজ ব্রাহ্মণকে এত ভক্তি করিত বলিয়াই, ভারতবর্ষ অল্পকালে এত উন্নত হইয়াছিল। সমাজ শিক্ষাদাতাদিগের সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী হইয়াছিল বলিয়াই সহজে উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

শিষ্য। আধুনিক মত এই যে, ভণ্ড ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের চাল কলার পাকা বন্দোবস্ত করিবার জন্য এই দুর্জ্জয় ব্রহ্মভক্তি ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছে।

গুরু। তুমি যে ফলের নাম করিলে, যাঁহারা তাহা অধিক পরিমাণে ভোজন করিয়া থাকেন, এ কথাটা তাঁহাদিগের বুদ্ধি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। দেখ, বিধি বিধান ব্যবস্থা সকলই ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। নিজ হস্তে সে শক্তি থাকিতেও তাঁহারা আপনাদের উপজীবিকা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? তাঁহারা রাজ্যের অধিকারী হইবেন না, বাণিজ্যের অধিকারী হইবেন না, কৃষিকার্য্যের পর্য্যন্ত অধিকারী নহেন। এক ভিন্ন কোন প্রকার উপজীবিকার অধিকারী নহেন। যে একটি উপজীবিকা ব্রাহ্মণেরা বাছিয়া বাছিয়া আপনাদিগের জন্য রাখিলেন, সেটি কি? যাহার পর দুঃখের উপজীবিকা আর নাই, যাহার পর দারিদ্র্য আর কিছুতেই নাই—ভিক্ষা। এমন নিঃস্বার্থ উন্নতচিত্ত মনুষ্যশ্রেণী ভূমণ্ডলে আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বাহাদুরির জন্য বা পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য, বাছিয়া বাছিয়া ভিক্ষাবৃত্তিটি উপজীবিকা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, ঐশ্বর্য্যসম্পদে মন গেলে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে, সমাজের শিক্ষাদানে বিঘ্ন ঘটে। একমন, একধ্যান হইয়া লোকশিক্ষা দিবেন বলিয়াই সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। যথার্থ নিষ্কাম ধর্ম্ম যাহাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারাই পরহিতব্রত সঙ্কল্প করিয়া এরূপ সর্ব্বত্যাগী হইতে পারে। তাঁহারা যে আপনাদিগের প্রতি লোকের অচলা ভক্তি আদিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাও স্বার্থের জন্য নহে। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, সমাজশিক্ষকদিগের উপর ভক্তি ভিন্ন উন্নতি নাই, সে জন্য ব্রাহ্মণভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। এই সকল করিয়া তাঁহারা যে সমাজ ও যে সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা আজিও জগতে অতুল্য, ইউরোপ আজিও তাহা আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে। ইউরোপে আজিও যুদ্ধটা সামাজিক প্রয়োজন মধ্যে। কেবল ব্রাহ্মণেরাই এই ভয়ঙ্কর দুঃখ—সকল দুঃখের উপর শ্রেষ্ঠ দুঃখ—সকল সামাজিক উৎপাতের উপর বড় উৎপাত—সমাজ হইতে উঠাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। সমাজ ব্রাহ্মণ্য নীতি অবলম্বন করিলে যুদ্ধের আর প্রয়োজন থাকে না। তাঁহাদের কীর্ত্তি অক্ষয়। পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদিগের মত প্রতিভাশালী, ক্ষমতাশালী, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক কোন জাতিই নহে। প্রাচীন এথেন্স বা রোম, মধ্যকালের ইতালি, আধুনিক জার্ম্মানি বা ইংলণ্ডবাসী—কেহই তেমন প্রতিভাশালী বা ক্ষমতাশালী ছিলেন না; রোমক ধর্ম্মযাজক, বৌদ্ধ ভিক্ষু বা অপর কোন সম্প্রদায়ের লোক তেমন জ্ঞানী বা ধার্ম্মিক ছিল না।

শিষ্য। তা যাক। এখন দেখি ত ব্রাহ্মণেরা লুচিও ভাজেন, রুটিও বেচেন, কালী খাড়া করিয়া কসাইয়ের ব্যবসাও চালান। তাঁহাদিগকে ভক্তি করিতে হইবে?

গুরু। কদাপি না। যে গুণের জন্য ভক্তি করিব, সে গুণ যাহার নাই, তাহাকে ভক্তি করিব কেন? সেখানে ভক্তি অধর্ম্ম। এইটুকু না বুঝাই, ভারতবর্ষের অবনতির একটি গুরুতর কারণ। যে গুণে ব্রাহ্মণ ভক্তির পাত্র ছিলেন, সে গুণ যখন গেল, তখন আর ব্রাহ্মণকে কেন ভক্তি করিতে লাগিলাম? কেন আর ব্রাহ্মণের বশীভূত রহিলাম? তাহাতেই কুশিক্ষা হইতে লাগিল, কুপথে যাইতে লাগিলাম। এখন ফিরিতে হইবে।

শিষ্য। অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে আর ভক্তি করা হইবে না।

গুরু। ঠিক তাহা নহে। যে ব্রাহ্মণের গুণ আছে, অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকে ভক্তি করিব; যিনি তাহা নহেন, তাঁহাকে ভক্তি করিব না। তৎপরিবর্ত্তে যে শূদ্র ব্রাহ্মণের গুণযুক্ত, অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান্, নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাঁহাকেও ব্রাহ্মণের মত ভক্তি করিব।

শিষ্য। অর্থাৎ বৈদ্য কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাহ্মণ শিষ্য; ইহা আপনি সঙ্গত মনে করেন?

গুরু। কেন করিব না? ঐ মহাত্মা সুব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ গুণসকলে ভূষিত ছিলেন। তিনি সকল ব্রাহ্মণের ভক্তির যোগ্য পাত্র।

শিষ্য। আপনার এরূপ হিন্দুয়ানিতে কোন হিন্দু মত দিবে না।

গুরু। না দিক, কিন্তু ইহাই ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম। মহাভারতের বনপর্ব্বে মার্কণ্ডেয়-সমস্যাপর্ব্বাধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়ে ঋষিবাক্য এইরূপ আছে;—"পাতিত্যজনক কুক্রিয়াসক্ত, দাম্ভিক, ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রসদৃশ হয়, আর যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি। কারণ, ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়।" পুনশ্চ বনপর্ব্বে অজগর-পর্ব্বাধ্যায়ে ১৮০ অধ্যায়ে রাজর্ষি নহুষ বলিতেছেন, "বেদমূলক সত্য দান ক্ষমা অনৃশংস্য অহিংসা ও করুণা শূদ্রেও লক্ষিত হইতেছে। যদ্যপি শূদ্রেও সত্যাদি ব্রাহ্মণধর্ম্ম লক্ষিত হইল, তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে।" তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন,—"অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণলক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব শূদ্রবংশ্য হইলেই যে শূদ্র হয়, এবং ব্রাহ্মণবংশ্য হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহারাই শূদ্র।" এরূপ কথা আরও অনেক আছে। পুনশ্চ বৃদ্ধগৌতম-সংহিতায় ২১ অধ্যায়ে,

> ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্।
> তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥
> অগ্নিহোত্রব্রতপরান্ স্বাধ্যায়নিরতান শুচীন্।
> উপবাসরতান্ দান্তাংস্তান্ দেবা ব্রাহ্মণান্ বিদুঃ॥
> ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
> চণ্ডালমপি বিত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

ক্ষমাবান্, দমশীল, জিতক্রোধ এবং জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে; আর সকলে শূদ্র। যাঁহারা অগ্নিহোত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, উপবাসরত, দান্ত, দেবতারা তাঁহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে রাজন্! জাতি পূজ্য নহে, গুণই কল্যাণ-কারক। চণ্ডালও বিত্তস্থ হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

শিষ্য। যাক। এক্ষণে বুঝিতেছি, মনুষ্যমধ্যে তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি ভক্তি অনুশীলনীয়, (১) গৃহস্থিত গুরুজন, (২) রাজা, এবং (৩) সমাজ-শিক্ষক। আর কেহ?

গুরু। (৪) যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক বা যে জ্ঞানী, সে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে না আসিলেও ভক্তির পাত্র। ধার্ম্মিক, নীচজাতীয় হইলেও ভক্তির পাত্র।

(৫) আর কতকগুলি লোক আছেন, তাঁহারা কেবল ব্যক্তিবিশেষের ভক্তির পাত্র, বা অবস্থাবিশেষে ভক্তির পাত্র। এ ভক্তিকে আজ্ঞাকারিতা বা সম্মান বলিলেও চলে। যে কোন কার্য্যনির্ব্বাহার্থে অপর ব্যক্তির আজ্ঞাকারিতা স্বীকার করে, সেই অপর ব্যক্তি তাহার ভক্তির, নিতান্ত পক্ষে, তাহার সম্মানের পাত্র হওয়া উচিত। ইংরেজীতে ইহার একটি বেশ নাম আছে—Subordination। এই নামে আগে Official Subordination মনে পড়ে। এ দেশে সে সামগ্রীর অভাব নাই—কিন্তু যাহা আছে, তাহা বড় ভাল জিনিস নহে। ভক্তি নাই, ভয় আছে। ভক্তি মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, ভয় একটা সর্ব্বনিকৃষ্ট বৃত্তির মধ্যে। ভয়ের মত মানসিক অবনতির গুরুতর কারণ অল্পই আছে। উপরওয়ালার আজ্ঞা পালন করিবে, তাঁহাকে সম্মান করিবে, পার ভক্তি করিবে, কিন্তু কদাচ ভয় করিবে না। কিন্তু Official Subordination ভিন্ন অন্য এক জাতীয় আজ্ঞাকারিতা প্রয়োজনীয়। সেটা আমাদের দেশের পক্ষে বড় গুরুতর কথা। ধর্ম্ম কর্ম্ম অনেকই সমাজের মঙ্গলার্থ। সে সকল কাজ সচরাচর পাঁচ জনে মিলিয়া করিতে হয়—এক জনে হয় না। যাহা পাঁচ জনে মিলিয়া করিতে হয়, তাহাতে ঐক্য চাই। ঐক্য জন্য ইহা প্রয়োজনীয় যে, এক জন নায়ক হইবে, আর অপরকে তাহার এবং পর্য্যায়ক্রমে অন্যান্যের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিতে হইবে। এখানেও Subordination প্রয়োজনীয়। কাজেই ইহা একটি গুরুতর ধর্ম্ম। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সমাজে এ সামগ্রী নাই। যে কাজ দশ জনে মিলিয়া মিশিয়া করিতে হইবে, তাহাতে সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইতে চাহে, কেহ কাহারও আজ্ঞা স্বীকার না করায় সব বৃথা হয়। এমন অনেক সময় হয় যে, নিকৃষ্ট ব্যক্তি নেতা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অধীন হয়। এ স্থানে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে, নিকৃষ্টকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহার আজ্ঞা বহন করেন—নহিলে কার্য্যোদ্ধার হইবে না। কিন্তু আমাদের দেশের লোক কোন মতেই তাহা স্বীকার করেন না। তাই আমাদের সামাজিক উন্নতি এত অল্প।

(৬) আর ইহাও ভক্তিতত্ত্বের অন্তর্গত কথা যে, যাহার যে বিষয়ে নৈপুণ্য আছে, সে বিষয়ে তাহাকে সম্মান করিতে হইবে। বয়োজ্যেষ্ঠকেও কেবল বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া সম্মান করিবে।

(৭) সমাজকে ভক্তি করিবে। ইহা স্মরণ রাখিবে যে, মনুষ্যের যত গুণ আছে, সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দণ্ডপ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং রক্ষাকর্ত্তা। সমাজই রাজা, সমাজই শিক্ষক। ভক্তিভাবে সমাজের উপকারে যত্নবান্ হইবে। এই তত্ত্বের সম্প্রসারণ করিয়া ওগুস্ত কোম্‌ৎ "মানবদেবীর" পূজার বিধান করিয়াছেন। সুতরাং এ বিষয়ে আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই।

এখন ভক্তির অভাবে, আমাদের দেশে কি অমঙ্গল ও বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে দেখ। হিন্দুর মধ্যে ভক্তির কিছুই অভাব ছিল না। ভক্তি, হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের একটি প্রধান উপাদান। কিন্তু এখন শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্তি একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। পাশ্চাত্য সাম্যবাদের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহারা এই বিকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়া লইয়াছেন যে, মনুষ্যে মনুষ্যে বুঝি সর্ব্বত্র সর্ব্বথাই সমান—কেহ কাহাকে ভক্তি করিবার প্রয়োজন করে না। ভক্তি, যাহা মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি, তাহা

হীনতার চিহ্ন বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইয়াছে। পিতা এখন "My dear father"—অথবা বুড়ো বেটা। মাতা, বাপের পরিবার। বড় ভাই, জ্ঞাতি মাত্র। শিক্ষক, মাষ্টার বেটা। পুরোহিত চালকলা-লোলুপ ভণ্ড। যে স্বামী দেবতা ছিলেন,—তিনি এখন কেবল প্রিয় বন্ধু মাত্র—কেহ বা ভৃত্যও মনে করেন। স্ত্রীকে আর আমরা লক্ষ্মী-স্বরূপা মনে করিতে পারি না—কেন না, লক্ষ্মীই আর মানি না। এই গেল গৃহের ভিতর। গৃহের বাহিরে অনেকে রাজাকে শত্রু মনে করিয়া থাকেন। রাজপুরুষ, অত্যাচারকারী রাক্ষস। সমাজশিক্ষকেরা, কেবল আমাদের সমালোচনাশক্তির পরিচয় দিবার স্থল—গালি ও বিদ্রূপের স্থান। ধাম্মিক বা জ্ঞানী বলিয়া কাহাকেও মানি না। যদি মানি, তবে ধাম্মিককে "গোবেচারা" বলিয়া দয়া করি—জ্ঞানীকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হই। কেহ কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিব না, সেই জন্য কেহ কাহারও অনুবর্ত্তী হইয়া চলিব না; কাজেই ঐক্যের সহিত কোন সামাজিক মঙ্গল সাধিত করিতে পারি না। নৈপুণ্যের আদর করিব না; বৃদ্ধের বহুদর্শিতা লইয়া ব্যঙ্গ করি। সমাজের ভয়ে জড়সড় থাকি, কিন্তু সমাজকে ভক্তি করি না। তাই গৃহ নরক হইয়া উঠিতেছে, রাজনৈতিক ভেদ ঘটিতেছে, শিক্ষা অনিষ্টকারী হইতেছে, সমাজ অনুন্নত ও বিশৃঙ্খল রহিয়াছে; আপনাদিগের চিত্ত অপরিশুদ্ধ ও আত্মাদরে ভরিয়া রহিয়াছে।

শিষ্য। উন্নতির জন্য ভক্তির যে এত প্রয়োজন, তাহা আমি কখনও মনে করি নাই।

গুরু। তাই আমি ভক্তিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলিতেছিলাম। এ শুধু মনুষ্যভক্তির কথাই বলিয়াছি। আগামী দিবস ঈশ্বরভক্তির কথা শুনিও। ভক্তির শ্রেষ্ঠতা আরও বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবে।

একাদশ অধ্যায়—ঈশ্বরে ভক্তি

শিষ্য। আজ, ঈশ্বরে ভক্তি সম্বন্ধে কিছু উপদেশের প্রার্থনা করি।

গুরু। যাহা কিছু তুমি আমার নিকট শুনিয়াছ, আর যাহা কিছু শুনিবে, তাহাই ঈশ্বর-ভক্তিসম্বন্ধীয় উপদেশ; কেবল বলিবার এবং বুঝিবার গোল আছে। "ভক্তি" কথাটা হিন্দুধর্ম্মে বড় গুরুতর অর্থবাচক, এবং হিন্দুধর্ম্মে ইহা বড় প্রসিদ্ধ। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মবেত্তারা ইহা নানা প্রকারে বুঝাইয়াছেন, এবং খৃষ্টাদি আর্য্যেতর ধর্ম্মবেত্তারাও ভক্তিবাদী। সকলের উক্তির সংশ্লেষ এবং অত্যুন্নত ভক্তদিগের চরিত্রের বিশ্লেষ দ্বারা, আমি ভক্তির যে স্বরূপ স্থির করিয়াছি, তাহা এক কথায় বলিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর এবং যত্নপূর্ব্বক স্মরণ রাখিও। নহিলে আমার সকল পরিশ্রম বিফল হইবে।

শিষ্য। আজ্ঞা করুন।

গুরু। **যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।**

শিষ্য। বুঝিলাম না।

গুরু। অর্থাৎ যখন জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরানুসন্ধান করে, কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরে অর্পিত হয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যই উপভোগ করে, এবং

শারীরিকী বৃত্তিগুলি ঈশ্বরের কার্য্যসাধনে বা ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হয়, সেই অবস্থাকেই ভক্তি বলি। যাহার জ্ঞান ঈশ্বরে, কর্ম্ম ঈশ্বরে, আনন্দ ঈশ্বরে এবং শরীরার্পণ ঈশ্বরে, তাহারই ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে। অথবা—ঈশ্বরসম্বন্ধিনী ভক্তির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইয়াছে।

শিষ্য। এ কথার প্রতি আমার প্রথম আপত্তি এই যে, আপনি এ পর্য্যন্ত ভক্তি অন্যান্য বৃত্তির মধ্যে একটি বৃত্তি বলিয়া বুঝাইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এখন সকল বৃত্তির সমষ্টিকে ভক্তি বলিতেছেন।

গুরু। তাহা নহে। ভক্তি একই বৃত্তি। আমার কথার তাৎপর্য্য এই যে, যখন সকল বৃত্তিগুলিই এই এক ভক্তিবৃত্তির অনুগামী হইবে, তখনই ভক্তির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি হইল। এই কথার দ্বারা, বৃত্তিমধ্যে ভক্তির যে শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিয়াছিলাম, তাহাই সমর্থিত হইল। ভক্তি ঈশ্বরার্পিতা হইলে, আর সকল বৃত্তিগুলিই উহার অধীন হইবে, উহার প্রদর্শিত পথে যাইবে, ইহাই আমার কথার স্থূল তাৎপর্য্য। এমন তাৎপর্য্য নহে যে, সকল বৃত্তির সমষ্টি ভক্তি।

শিষ্য। কিন্তু তাহা হইলে সামঞ্জস্য কোথা গেল? আপনি বলিয়াছেন যে, সকল বৃত্তিগুলির সমুচিত স্ফূর্ত্তিই মনুষ্যত্ব। সেই সমুচিত স্ফূর্ত্তির এই অর্থ করিয়াছেন যে, কোন বৃত্তির সমধিক স্ফূর্ত্তির দ্বারা অন্য বৃত্তির সমুচিত স্ফূর্ত্তির অবরোধ না হয়। কিন্তু সকল বৃত্তিই যদি এই এক ভক্তিবৃত্তির অধীন হইল, ভক্তিই যদি অন্য বৃত্তিগুলিকে শাসিত করিতে লাগিল, তবে পরস্পরের সামঞ্জস্য কোথায় রহিল?

গুরু। ভক্তির অনুবর্ত্তিতা কোন বৃত্তিরই চরম স্ফূর্ত্তির বিঘ্ন করে না। মনুষ্যের বৃত্তি মাত্রেরই যে কিছু উদ্দেশ্য হইতে পারে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ঈশ্বরই মহৎ। যে বৃত্তির যত সম্প্রসারণ হউক না কেন, ঈশ্বরানুবর্ত্তী হইলে, সে সম্প্রসারণ বাড়িবে বৈ কমিবে না। ঈশ্বর যে বৃত্তির উদ্দেশ্য,—অনন্ত মঙ্গল, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ধর্ম্ম, অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত শক্তি, অনন্তই যে বৃত্তির উদ্দেশ্য,—তাহার আবার অবরোধ কোথায়? ভক্তিশাসিতাবস্থাই সকল বৃত্তির যথার্থ সামঞ্জস্য।

শিষ্য। তবে আপনি যে মনুষ্যত্বতত্ত্ব এবং অনুশীলনধর্ম্ম আমাকে শিখাইতেছেন, তাহার স্থূল তাৎপর্য্য কি এই যে, ঈশ্বরে ভক্তিই পূর্ণ মনুষ্যত্ব, এবং অনুশীলনের একমাত্র উদ্দেশ্য সেই ঈশ্বরে ভক্তি?

গুরু। অনুশীলনধর্ম্মের মর্ম্মে এই কথা আছে বটে যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরে সমর্পণ ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। ইহাই প্রকৃত কৃষ্ণার্পণ, ইহাই প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ম্ম। ইহাই স্থায়ী সুখ। ইহারই নামান্তর চিত্তশুদ্ধি। ইহারই লক্ষণ "ভক্তি, প্রীতি, শান্তি"। ইহাই ধর্ম্ম—ইহা ভিন্ন ধর্ম্মান্তর নাই। আমি ইহাই শিখাইতেছি। কিন্তু তুমি এমন মনে করিও না যে, এই কথা বুঝিলেই তুমি অনুশীলনধর্ম্ম বুঝিলে।

শিষ্য। আমি যে এখনও কিছু বুঝি নাই, তাহা আমি স্বয়ং স্বীকার করিতেছি। অনুশীলনধর্ম্মে এই তত্ত্বের প্রকৃত স্থান কি, তাহা এখনও বুঝিতে পারি নাই। আপনি বৃত্তি যে ভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহাতে শারীরিক বল, অর্থাৎ মাংসপেশীর বল একটা Faculty না হউক, একটা বৃত্তি বটে। অনুশীলনধর্ম্মের বিধানানুসারে, ইহার সমুচিত

অনুশীলন চাই। মনে করুন, রোগ দারিদ্র্য আলস্য বা তাদৃশ অন্য কোন কারণে কোন ব্যক্তির এই বৃত্তির সমুচিত স্ফূর্তি হয় নাই। তাহার কি ঈশ্বরভক্তি ঘটিতে পারে না ?

গুরু। আমি বলিয়াছি যে, যে অবস্থায় মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরানুবর্ত্তী হয়, তাহাই ভক্তি। ঐ ব্যক্তির শারীরিক বল বেশী থাক, অল্প থাক, যতটুকু আছে, তাহা যদি ঈশ্বরানুবর্ত্তী হয়, অর্থাৎ ঈশ্বরানুমত কার্য্যে প্রযুক্ত হয়—আর অন্য বৃত্তিগুলিও সেইরূপ হয়, তবে তাহার ঈশ্বরে ভক্তি হইয়াছে। তবে অনুশীলনের অভাবে, ঐ ভক্তির কার্য্যকারিতার সেই পরিমাণে ত্রুটি ঘটিবে। এক জন দস্যু একজন ভাল মানুষকে পীড়িত করিতেছে। মনে কর, দুই ব্যক্তি তাহা দেখিল। মনে কর, দুই জনেই ঈশ্বরে ভক্তিযুক্ত, কিন্তু এক জন বলবান্, অপর দুর্ব্বল। যে বলবান্, সে ভাল মানুষকে দস্যুহস্ত হইতে মুক্ত করিল, কিন্তু যে দুর্ব্বল, সে চেষ্টা করিয়াও পারিল না। এই পরিমাণে, বৃত্তিবিশেষের অনুশীলনের অভাবে, দুর্ব্বল ব্যক্তির মনুষ্যত্বের অসম্পূর্ণতা বলা যাইতে পারে, কিন্তু ভক্তির ত্রুটি বলা যায় না। বৃত্তি সকলের সমুচিত স্ফূর্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই ; এবং সেই বৃত্তিগুলি ভক্তির অনুগামী না হইলেও মনুষ্যত্ব নাই। উভয়ের সমাবেশেই সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব। ইহাতে বৃত্তিগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইতেছে, অথচ ভক্তির প্রাধান্য বজায় থাকিতেছে। তাই বলিতেছিলাম যে, বৃত্তিগুলির ঈশ্বরসমর্পণ, এই কথা বুঝিলেই মনুষ্যত্ব বুঝিলে না। তাহার সঙ্গে এটুকুও বুঝা চাই।

শিষ্য। এখন আরও আপত্তি আছে। যে উপদেশ অনুসারে কার্য্য হইতে পারে না, তাহা উপদেশই নহে। সকল বৃত্তিগুলিই কি ঈশ্বরগামী করা যায় ? ক্রোধ একটা বৃত্তি, ক্রোধ কি ঈশ্বরগামী করা যায় ?

গুরু। জগতে অতুল সেই মহাক্রোধগীতি তোমর কি স্মরণ হয় ?

ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি,
যাবৎ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা
ভস্মাবশেষং মদনঞ্চকার॥

এই ক্রোধ মহাপবিত্র ক্রোধ—কেন না, যোগভঙ্গকারী কুপ্রবৃত্তি ইহার দ্বারা বিনষ্ট হইল। ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের ক্রোধ। অন্য এক নীচ বৃত্তি যে ব্যাসদেব ঈশ্বরানুবর্ত্তী হইয়াছিল, তাহার এক অতি চমৎকার উদাহরণ মহাভারতে আছে। কিন্তু তুমি ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষ। আমি তোমাকে তাহা বুঝাইতে পারিব না।

শিষ্য। আরও আপত্তি আছে—

গুরু। থাকাই সম্ভব। "যখন মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।" এ কথাটা এত গুরুতর, ইহার ভিতর এমন সকল গুরুতর তত্ত্ব নিহিত আছে যে, ইহা তুমি যে একবার শুনিয়াই বুঝিতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা কিছু মাত্র নাই। অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইবে, অনেক গোলমাল ঠেকিবে, অনেক ছিদ্র দেখিবে, হয়ত পরিশেষে ইহাকে অর্থশূন্য প্রলাপ বোধ হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও সহসা নিরাশ হইও না। দিন দিন, মাস মাস, বৎসর বৎসর এই তত্ত্বের চিন্তা করিও। কার্য্যক্ষেত্রে ইহাকে ব্যবহৃত করিবার চেষ্টা করিও। ইন্ধনপুষ্ট অগ্নির

ন্যায় ইহা ক্রমশঃ তোমার চক্ষে পরিস্ফুট হইতে থাকিবে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে তোমার জীবন সার্থক হইল বিবেচনা করিবে। মনুষ্যের শিক্ষণীয় এমন গুরুতর তত্ত্ব আর নাই। একজন মনুষ্যের সমস্ত জীবন সংশিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া, সে যদি শেষে এই তত্ত্বে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবেই তাহার জীবন সার্থক জানিবে।

শিষ্য। যাহা এরূপ দুষ্প্রাপ্য, তাহা আপনিই বা কোথায় পাইলেন ?

গুরু। অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, "এ জীবন লইয়া কি করিব ?" "লইয়া কি করিতে হয় ?" সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। অনেক প্রকার লোক-প্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপ-কথন করিয়াছি, এবং কার্য্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি। এই পরিশ্রম, এই কষ্ট ভোগের ফলে এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকল বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্ত্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। "জীবন লইয়া কি করিব।" এ প্রশ্নের এ উত্তর পাইয়াছি। ইহাই যথার্থ উত্তর, আর সকল উত্তর অযথার্থ। লোকের সমস্ত জীবনের পরিশ্রমের এই শেষ ফল ; এই এক মাত্র সুফল। তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, আমি এ তত্ত্ব কোথায় পাইলাম। সমস্ত জীবন ধরিয়া, আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজিয়া এত দিনে পাইয়াছি। তুমি একদিনে ইহার কি বুঝিবে ?

শিষ্য। আপনার কথাতে আমি ইহাই বুঝিতেছি যে, ভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে আমাকে যে উপদেশ দিলেন, ইহা আপনার নিজের মত। আর্য্য ঋষিরা এ তত্ত্ব অনবগত ছিলেন।

গুরু। মূর্খ! আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির এমন কি শক্তি থাকিবার সম্ভাবনা যে, যাহা আর্য্য ঋষিগণ জানিতেন না—আমি তাহা আবিষ্কৃত করিতে পারি— আমি যাহা বলিতেছিলাম, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত জীবন চেষ্টা করিয়া তাঁহাদিগের শিক্ষার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। তবে, যে ভাষায় আমি তোমাকে ভক্তি বুঝাইলাম, সে ভাষায়, সে কথায় তাঁহারা ভক্তিতত্ত্ব বুঝান নাই। তোমরা উনবিংশ শতাব্দীর লোক—উনবিংশ শতাব্দীর ভাষাতেই তোমা দিগকে বুঝাইতে হয়। ভাষার প্রভেদ হইতেছে বটে, কিন্তু সত্য নিত্য। ভক্তি শাণ্ডিল্যের সময়ে যাহা ছিল, তাহাই আছে। ভক্তির যথার্থ স্বরূপ যাহা, তাহা আর্য্য ঋষিদিগের উপদেশমধ্যে প্রাপ্তব্য। তবে যেমন সমুদ্রনিহিত রত্নের যথার্থ স্বরূপ, ডুব দিয়া না দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি অগাধ সমুদ্র হিন্দুশাস্ত্রের ভিতরে ডুব না দিলে, তদন্তর্নিহিত রত্নসকল চিনিতে পারা যায় না।

শিষ্য। আমার ইচ্ছা আপনার নিকট তাঁহাদের কৃত ভক্তিব্যাখ্যা শুনি।

গুরু। শুনা নিতান্ত আবশ্যক ; কেন না, ভক্তি হিন্দুরই জিনিস। খৃষ্টধর্ম্মে ভক্তিবাদ আছে বটে, কিন্তু হিন্দুরই নিকট ভক্তির যথার্থ পরিণামপ্রাপ্তি হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদিগের কৃত ভক্তিব্যাখ্যা সবিস্তারে বলিবার বা শুনিবার আমার বা তোমার অবকাশ

হইবে না। আর আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য অনুশীলনধর্ম্ম বুঝা, তাহার জন্য সেরূপ সবিস্তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই ; স্থূল কথা তোমাকে বলিয়া যাইব।

শিষ্য। আগে বলুন, ভক্তিবাদ কি চিরকালই হিন্দুধর্ম্মের অংশ ?

গুরু। না, তাহা নহে। বৈদিক ধর্ম্মে ভক্তি নাই। বেদের ধর্ম্মের পরিচয়, বোধ হয়, তুমি কিছু জান। সাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর উপাস্য দেবের যে সম্বন্ধ দেখা যায়, বৈদিক ধর্ম্মে উপাস্য উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছিল। 'হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত এই সোমরস পান কর! হবি ভোজন কর, আর আমাকে ধন দাও, সম্পদ্ দাও, পুত্র দাও, গোরু দাও, শস্য দাও, আমার শত্রুকে পরাস্ত কর।' বড় জোর বলিলেন, 'আমার পাপ ধ্বংস কর।' দেবগণকে এইরূপ অভিপ্রায়ে প্রসন্ন করিবার জন্য বৈদিকেরা যজ্ঞাদি করিতেন। এইরূপ কাম্য বস্তুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি করাকে কাম্য কর্ম্ম বলে। কাম্যাদি কর্ম্মাত্মক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ নাম কর্ম্ম। এই কাজ করিলে তাহার এই ফল, অতএব কাজ করিতে হইবে—এইরূপ ধর্ম্মার্জ্জনের যে পদ্ধতি, তাহারই নাম কর্ম্ম। বৈদিক কালের শেষভাগে এইরূপ কর্ম্মাত্মক ধর্ম্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যাগ যজ্ঞের দৌরাত্ম্যে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন অবস্থায় উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন যে, এই কর্ম্মাত্মক ধর্ম্ম বৃথাধর্ম্ম। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, বৈদিক দেবদেবীর কল্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব বুঝা যায় না ; ভিতরে ইহার একটা অনন্ত অজ্ঞেয় কারণ আছে। তাঁহারা সেই কারণের অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন।

এই সকল কারণে কর্ম্মের উপর অনেকে বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তাঁহারা ত্রিবিধ বিপ্লব উপস্থিত করিলেন—সেই বিপ্লবের ফলে আশিয়া প্রদেশ অদ্যাপি শাসিত। এক দল চার্ব্বাক,—তাঁহারা বলিলেন, কর্ম্মকাণ্ড সকলই মিথ্যা—খাও দাও, নেচে বেড়াও। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা ও নেতা শাক্যসিংহ—তিনি বলিলেন, কর্ম্মফল মানি বটে, কিন্তু কর্ম্ম হইতেই দুঃখ। কর্ম্ম হইতে পুনর্জ্জন্ম, অতএব কর্ম্মের ধ্বংস কর, তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া চিত্তসংযমপূর্ব্বক অষ্টাঙ্গ ধর্ম্মপথে গিয়া নির্ব্বাণ লাভ কর। তৃতীয় বিপ্লব দার্শনিকদিগের দ্বারা উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা প্রায় ব্রহ্মবাদী। তাঁহারা দেখিলেন যে, জগতের যে অনন্ত কারণভূত চৈতন্যের অনুসন্ধানে তাঁহারা প্রবৃত্ত, তাহা অতিশয় দুর্জ্ঞেয়। সেই ব্রহ্ম জানিতে পারিলে—সেই জগতের অন্তরাত্মা বা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ, এবং জগতের সঙ্গেই বা তাঁহার বা আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহা জানিতে পারিলে, বুঝা যাইতে পারে যে, এ জীবন লইয়া কি করিতে হইবে। সেটা জানা কঠিন—তাহা জানাই ধর্ম্ম। অতএব জ্ঞানই ধর্ম্ম—জ্ঞানেই নিঃশ্রেয়স। বেদের যে অংশকে উপনিষদ্ বলা যায়, তাহা এই প্রথম জ্ঞানবাদীদিগের কীর্ত্তি। ব্রহ্মনিরূপণ এবং আত্মজ্ঞানই উপনিষদ্ সকলের উদ্দেশ্য। তার পর ছয় দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও বিবর্দ্ধিত ও প্রচারিত হইয়াছে। কপিলের সাংখ্যে ব্রহ্ম পরিত্যক্ত হইলেও সে দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানবাদাত্মক। দর্শনের মধ্যে কেবল পূর্ব্বমীমাংসা কর্ম্মবাদী—আর সকলেই জ্ঞানবাদী।

শিষ্য। জ্ঞানবাদ বড় অসম্পূর্ণ বলিয়া আমার বোধ হয়। জ্ঞানে ঈশ্বরকে জানিতে

পারি বটে, কিন্তু জ্ঞানে কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? জানিলেই কি পাওয়া যায়? ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার একত্ব, মনে করুন বুঝিতে পারিলাম—বুঝিতে পারিলেই কি ঈশ্বরে মিলিত হইলাম? দুইকে এক করিয়া মিলাইয়া দিবে কে?

গুরু। এই ছিদ্রেই ভক্তিবাদের সৃষ্টি। ভক্তিবাদী বলিলেন, জ্ঞানে ঈশ্বর জানিতে পারি বটে, কিন্তু জানিতে পারিলেই কি তাঁহাকে পাইলাম? অনেক জিনিস আমরা জানিয়াছি—জানিয়াছি বলিয়া কি তাহা পাইয়াছি? আমরা যাহাকে দ্বেষ করি, তাহাকেও ত জানি, কিন্তু তাহার সঙ্গে কি আমরা মিলিত হইয়াছি? আমরা যদি ঈশ্বরের প্রতি দ্বেষ করি, তবে কি তাঁহাকে পাইব? বরং যাহার প্রতি আমাদের অনুরাগ আছে, তাহাকে পাইবার সম্ভাবনা। যে শরীরী, তাহাকে কেবল অনুরাগে না পাইলে না পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যিনি অশরীরী তিনি কেবল অন্তঃকরণের দ্বারাই প্রাপ্য। অতএব তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকিলেই আমরা তাঁহাকে পাইব। সেই প্রকারের অনুরাগের নাম ভক্তি। শাণ্ডিল্যসূত্রের দ্বিতীয় সূত্র এই—"সা (ভক্তিঃ) পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

শিষ্য। ভক্তিবাদের উৎপত্তির এই ইতিবৃত্ত শুনিয়া আমি বিশেষ আপ্যায়িত হইলাম। ইহা না শুনিলে ভক্তিবাদ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতাম না। শুনিয়া আর একটা কথা মনে উদয় হইতেছে। সাহেবেরা এবং দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি এদেশীয় পণ্ডিতেরা বৈদিক ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন, এবং পৌরাণিক বা আধুনিক হিন্দু-ধর্ম্মকে নিকৃষ্ট বলিয়া থাকেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি, এ কথা অতিশয় অযথার্থ। ভক্তিশূন্য যে ধর্ম্ম, তাহা অসম্পূর্ণ বা নিকৃষ্ট ধর্ম্ম—অতএব বেদে যখন ভক্তি নাই, তখন বৈদিক ধর্ম্মই নিকৃষ্ট, পৌরাণিক বা আধুনিক বৈষ্ণবাদি ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যাঁহারা এ সকল ধর্ম্মের লোপ করিয়া বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করেন, তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বিবেচনা করি।

গুরু। কথা যথার্থ। তবে ইহাও বলিতে হয় যে, বেদে যে ভক্তিবাদ কোথাও নাই, ইহাও ঠিক নহে। শাণ্ডিল্যসূত্রের টীকাকার স্বপ্নেশ্বর ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ভক্তি শব্দ ব্যবহৃত না থাকিলেও ভক্তিবাদের সার মর্ম্ম তাহাতে আছে। বচনটি এই "আত্মৈবেদং সর্বমিতি। স বা এষ এব পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্ ভবতীতি।"

ইহার অর্থ এই যে, আত্মা এই সকলই (অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে)। যে ইহা দেখিয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা জানিয়া, আত্মায় রত হয়, আত্মাতে ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই যাহার মিথুন (সহচর), আত্মাই যাহার আনন্দ, সে স্বরাজ (আপনার রাজা বা আপনার দ্বারা রঞ্জিত) হয়। ইহা যথার্থ ভক্তিবাদ।

দ্বাদশ অধ্যায়—ভক্তি

ঈশ্বরে ভক্তি—শাণ্ডিল্য

গুরু। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাই ভক্তিতত্ত্বের প্রধান গ্রন্থ। কিন্তু গীতোক্ত ভক্তিতত্ত্ব তোমাকে বুঝাইবার আগে ঐতিহাসিক প্রথাক্রমে বেদে যতটুকু ভক্তিতত্ত্ব আছে, তাহা তোমাকে শুনান ভাল। বেদে এ কথা প্রায় নাই, ছান্দোগ্য উপনিষদে কিছু আছে, ইহা বলিয়াছি। যাহা আছে, তাহার সহিত শাণ্ডিল্য মহর্ষির নাম সংযুক্ত।

শিষ্য। যিনি ভক্তিসূত্রের প্রণেতা?

গুরু। প্রথমে তোমাকে আমার বলা কর্ত্তব্য যে, দুই জন শাণ্ডিল্য ছিলেন, বোধ হয়। এক জন উপনিষদুক্ত এই ঋষি। আর এক জন শাণ্ডিল্য-সূত্রের প্রণেতা। প্রথমোক্ত শাণ্ডিল্য প্রাচীন ঋষি, দ্বিতীয় শাণ্ডিল্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক পণ্ডিত। ভক্তিসূত্রের ৩১ সূত্রে প্রাচীন শাণ্ডিল্যের নাম উদ্ধৃত হইয়াছে।

শিষ্য। অথবা এমন হইতে পারে যে, আধুনিক সূত্রকার প্রাচীন ঋষির নামে আপনার গ্রন্থখানি চালাইয়াছেন। এক্ষণে প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্যের মতই ব্যাখ্যা করুন।

গুরু। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই প্রাচীন ঋষি-প্রণীত কোন গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই। বেদান্ত-সূত্রের শঙ্করাচার্য্য যে ভাষ্য করিয়াছেন, তন্মধ্যে সূত্রবিশেষের ভাষ্যের ভাবার্থ হইতে কোলব্রুক সাহেব এইরূপ অনুমান করেন, পঞ্চরাত্রের প্রণেতা এই প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্য। তাহা হইতেও পারে, না হইতেও পারে; পঞ্চরাত্রে ভাগবত ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এইরূপ সামান্য মূলের উপর নির্ভর করিয়া স্থির করা যায় না যে, শাণ্ডিল্যই পঞ্চরাত্রের প্রণেতা। ফলে প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্য যে ভক্তিধর্ম্মের এক জন প্রবর্ত্তক, তাহা বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে। কথিত ভাষ্যে জ্ঞানবাদী শঙ্কর, ভক্তিবাদী শাণ্ডিল্যের নিন্দা করিয়া বলিতেছেন—

"বেদপ্রতিষেধশ্চ ভবতি। চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়োঽলব্ধ্বা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রমধিগতবান্। ইত্যাদি বেদনিন্দাদর্শনাৎ। তস্মাদসঙ্গতা এষা কল্পনা ইতি সিদ্ধঃ।"

অর্থাৎ, "ইহাতে বেদের বিপ্রতিষেধ হইতেছে। চতুর্ব্বেদে পরং শ্রেয়ঃ লাভ না করিয়া শাণ্ডিল্য এই শাস্ত্র অধিগমন করিয়াছিলেন। এই সকল বেদনিন্দা দর্শন করায় সিদ্ধ হইতেছে যে, এ সকল কল্পনা অসঙ্গত।"

শিষ্য। কিন্তু এই প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্য ভক্তিবাদে কত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার কিছু উপায় আছে কি?

গুরু। কিছু আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের তৃতীয় প্রপাঠকের চতুর্দ্দশ অধ্যায় হইতে একটু পড়িতেছি, শ্রবণ কর।—

"সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর এষ ম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভাবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ।"

অর্থাৎ, "সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস এই জগতে পরিব্যাপ্ত বাক্যবিহীন,

এবং আপ্তকাম হেতু আদরের অপেক্ষা করেন না এই আমার আত্মা হৃদয়ের মধ্যে, ইনিই ব্রহ্ম। এই লোক হইতে অপসৃত হইয়া, ইঁহাকেই সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া থাকি। যাঁহার ইহাতে শ্রদ্ধা থাকে, তাঁহার ইহাতে সংশয় থাকে না। ইহা শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন।"

এ কথা বড় অধিক দূর গেল না। এ সকল উপনিষদের জ্ঞানবাদীরাও বলিয়া থাকেন। "শ্রদ্ধা" কথা ভক্তিবাচক নহে বটে, তবে শ্রদ্ধা থাকিলে সংশয় থাকে না, এ সকল ভক্তির কথা বটে। কিন্তু আসল কথাটা বেদান্তসারে পাওয়া যায়। বেদান্তসারকর্ত্তা সদানন্দাচার্য্য উপাসনা শব্দের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"উপাসনানি সগুণব্রহ্মবিষয়কমানসব্যাপাররূপাণি শাণ্ডিল্যবিদ্যাদীনি।"

এখন একটু অনুধাবন করিয়া বুঝ। হিন্দুধর্ম্মে ঈশ্বরের দ্বিবিধ কল্পনা আছে—অথবা ঈশ্বরকে হিন্দুরা দুই রকমে বুঝিয়া থাকে। ঈশ্বর নির্গুণ এবং ঈশ্বর সগুণ। তোমাদের ইংরেজিতে যাহাকে "Absolute" বা "Unconditioned" বলে, তাহাই নির্গুণ। যিনি নির্গুণ, তাঁহার কোন উপাসনা হইতে পারে না; যিনি নির্গুণ, তাঁহার কোন গুণানুবাদ করা যাইতে পারে না; যিনি নির্গুণ, যাঁহার কোন "Conditions of Existence" নাই বা বলা যাইতে পারে না—তাঁহাকে কি বলিয়া ডাকিব? কি বলিয়া তাঁহার চিন্তা করিব? অতএব কেবল সগুণ ঈশ্বরেরই উপাসনা হইতে পারে। নির্গুণ-বাদে উপাসনা নাই। সগুণ বা ভক্তিবাদী অর্থাৎ শাণ্ডিল্যাদিই উপাসনা করিতে পারেন। অতএব বেদান্তসারের এই কথা হইতে দুইটি বিষয় সিদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারি। প্রথম, সগুণবাদের প্রথম প্রবর্ত্তক শাণ্ডিল্য, ও উপাসনারও প্রথম প্রবর্ত্তক শাণ্ডিল্য। আর ভক্তি সগুণাবাদেরই অনুসারিণী।

শিষ্য। তবে কি উপনিষদ্ সমুদায় নির্গুণবাদী?

গুরু। ঈশ্বরবাদীর মধ্যে কেহ প্রকৃত নির্গুণবাদী আছে কি না, সন্দেহ। যে প্রকৃত নির্গুণবাদী, তাহাকে নাস্তিক বলিলেও হয়। তবে, জ্ঞানবাদীরা মায়া নামে ঈশ্বরের একটি শক্তি কল্পনা করেন। সেই মায়াই এই জগৎসৃষ্টির কারণ। সেই মায়ার জন্যই আমরা ঈশ্বরকে জানিতে পারি না। মায়া হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে এবং ব্রহ্মে লীন হইতে পারা যায়। অতএব ঈশ্বর তাঁহাদের কাছে কেবল জ্ঞেয়। এই জ্ঞান ঠিক "জানা" নহে। সাধন ভিন্ন সেই জ্ঞান জন্মিতে পারে না। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান এবং শ্রদ্ধা, এই ছয় সাধনা। ঈশ্বর-বিষয়ক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ব্যতিরেকে অন্য বিষয় হইতে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহই শম। তাহা হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ দম। তদতিরিক্ত বিষয় হইতে নিবর্ত্তিত বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন, অথবা বিধিপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের পরিত্যাগই উপরতি। শীতোষ্ণাদি সহন, তিতিক্ষা। মনের একাগ্রতা, সমাধান। গুরুবাক্যাদিতে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা। সর্ব্বত্র এইরূপ সাধন কথিত হইয়াছে, এমত নহে। কিন্তু ধ্যান ধারণা তপস্যাদি প্রায়ই জ্ঞানবাদীর পক্ষে বিহিত। অতএব জ্ঞানবাদীরও উপাসনা আছে। উহা অনুশীলন বটে। আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, উপাসনাও অনুশীলন। অতএব জ্ঞানবাদীর ঈদৃশ অনুশীলনকে তুমি উপাসনা বলিতে পার। কিন্তু সে উপাসনা যে অসম্পূর্ণ,

তাহাও পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে বুঝিতে পারিবে। যথার্থ উপাসনা ভক্তি-প্রসূত। ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় গীতোক্ত ভক্তিতত্ত্ব তোমাকে বুঝাইতে হইবে। সেই সময়ে এ কথা আর একটু স্পষ্ট হইবে।

শিষ্য। এক্ষণে আপনার নিকট যাহা শুনিলাম, তাহাতে কি এমন বুঝিতে হইবে যে, সেই প্রাচীন ঋষি শাণ্ডিল্যই ভক্তিমার্গের প্রথম প্রবর্ত্তক ?

গুরু। ছান্দোগ্য উপনিষদে যেমন শাণ্ডিল্যের নাম আছে, তেমনি দেবকীনন্দন কৃষ্ণেরও নাম আছে। অতএব কৃষ্ণ আগে, কি শাণ্ডিল্য আগে, তাহা আমি জানি না ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ কি শাণ্ডিল্য ভক্তিমার্গের প্রথম প্রবর্ত্তক, তাহা বলিতে পারি না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়—ভক্তি

ভগবদ্গীতা—স্থূল উদ্দেশ্য

শিষ্য। এক্ষণে গীতোক্ত ভক্তিতত্ত্বের কথা শুনিবার বাসনা করি।

গুরু। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ। কিন্তু প্রকৃত ভক্তির ব্যাখ্যা দ্বাদশ অধ্যায়ে অতি অল্পই আছে। দ্বিতীয় হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত সকল অধ্যায়গুলির পর্য্যালোচনা না করিলে, গীতোক্ত প্রকৃত ভক্তিতত্ত্ব বুঝা যায় না। যদি গীতার ভক্তিতত্ত্ব বুঝিতে চাও, তাহা হইলে এই এগার অধ্যায়ের কথা কিছু বুঝিতে হইবে। এই এগার অধ্যায়ে জ্ঞান কর্ম্ম এবং ভক্তি, তিনেরই কথা আছে—তিনেরই প্রশংসা আছে। যাহা আর কোথাও নাই, তাহাও ইহাতে আছে, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য আছে। এই সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই ইহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেই সামঞ্জস্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, এই তিনের চরমাবস্থা যাহা, তাহা ভক্তি। এই জন্য গীতা প্রকৃত পক্ষে ভক্তিশাস্ত্র।

শিষ্য। কথাগুলি একটু অসঙ্গত লাগিতেছে। আত্মীয় অন্তরঙ্গ বধ করিয়া রাজ্যলাভ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া অর্জ্জুন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছিলেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে প্রবৃত্তি দিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন—ইহাই গীতার বিষয়। অতএব ইহাকে ঘাতকশাস্ত্র বলাই বিধেয় ; উহাকে ভক্তিশাস্ত্র বলিব কি জন্য ?

গুরু। অনেকের অভ্যাস আছে যে, তাঁহারা গ্রন্থের একখানা পাতা পড়িয়া মনে করেন, আমরা এ গ্রন্থের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। যাঁহারা এই শ্রেণীর পণ্ডিত, তাঁহারাই ভগবদ্গীতাকে ঘাতকশাস্ত্র বলিয়া বুঝিয়া থাকেন। স্থূল কথা এই যে, অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সে কথা এখন থাক। যুদ্ধ মাত্র যে পাপ নহে, এ কথা তোমাকে পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি।

শিষ্য। বুঝাইয়াছেন যে, আত্মরক্ষার্থ এবং স্বদেশরক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম্মমধ্যে গণ্য।

গুরু। এখানে অর্জ্জুন আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত। কেন না, আপনার সম্পত্তি উদ্ধার—আত্মরক্ষার অন্তর্গত।

শিষ্য। যে নরপিশাচ অনর্থক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, সেই এই কথা বলিয়া যুদ্ধপ্রবৃত্ত হয়। নরপিশাচপ্রধান প্রথম নেপোলেয়ন্ ফ্রান্স রক্ষার ওজর করিয়া ইউরোপ নরশোণিতে প্লাবিত করিয়াছিল।

গুরু। তাহার ইতিহাস যখন নিরপেক্ষ লেখকের দ্বারা লিখিত হইবে, তখন জানিতে পারিবে, নেপোলেয়নের কথা মিথ্যা নহে। নেপোলেয়ন্ নরপিশাচ ছিলেন না। যাক—সে কথা বিচার্য্য নহে। আমাদের বিচার্য্য এই যে, অনেক সময় যুদ্ধও পুণ্য কর্ম্ম।

শিষ্য। কিন্তু সে কখন?

গুরু। এ কথার দুই উত্তর আছে। এক, ইউরোপীয় হিতবাদীর উত্তর। সে উত্তর এই যে, যুদ্ধে যেখানে লক্ষ লোকের অনিষ্ট করিয়া কোটি কোটি লোকের হিত-সাধন করা যায়, সেখানে যুদ্ধ পুণ্য কর্ম্ম। কিন্তু কোটি লোকের জন্য এক লক্ষ লোককেই বা সংহার করিবার আমাদের কি অধিকার? এ কথার উত্তর হিতবাদী দিতে পারেন না। দ্বিতীয় উত্তর ভারতবর্ষীয়। এই উত্তর আধ্যাত্মিক এবং পারমার্থিক। হিন্দুর সকল নীতির মূল আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক। সেই মূল, যুদ্ধের কর্ত্তব্যতার ন্যায় এমন একটা কঠিন তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া যেমন বিশদরূপে বুঝান যায়, সামান্য তত্ত্বের উপলক্ষে সেরূপ বুঝান যায় না। তাই গীতাকার অর্জ্জুনের যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি কল্পিত করিয়া, তদুপলক্ষে পরম পবিত্র ধর্ম্মের আমূল ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

শিষ্য। কথাটা কিরূপে উঠিতেছে?

গুরু। ভগবান্ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে অর্জ্জুনকে প্রথমে দ্বিবিধ অনুষ্ঠান বুঝাইতেছেন। প্রথমে আধ্যাত্মিকতা, অর্থাৎ আত্মার অনশ্বরতা প্রভৃতি, যাহা জ্ঞানের বিষয়। ইহা জ্ঞানযোগ বা সাংখ্যযোগ নামে অভিহিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি বলিতেছেন,—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥ ৩। ৩

ইহার মধ্যে জ্ঞানযোগ প্রথমতঃ সংক্ষেপে বুঝাইয়া কর্ম্মযোগ সবিস্তারে বুঝাইয়াছেন। এই জ্ঞান ও কর্ম্ম যোগ প্রভৃতি বুঝিলে তুমি জানিতে পারিবে যে, গীতা ভক্তিশাস্ত্র—তাই এত সবিস্তারে ভক্তির ব্যাখ্যায়, গীতার পরিচয় দিতেছি।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—ভক্তি

ভগবদ্গীতা—কর্ম্ম

গুরু। এক্ষণে তোমাকে গীতোক্ত কর্ম্মযোগ বুঝাইতেছি, কিন্তু তাহা শুনিবার আগে, ভক্তির আমি যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহা মনে কর। মনুষ্যের যে অবস্থায় সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরাভিমুখী হয়, মানসিক সেই অবস্থা অথবা যে বৃত্তির প্রাবল্যে এই অবস্থা ঘটে, তাহাই ভক্তি। এক্ষণে শ্রবণ কর।

শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মযোগের প্রশংসা করিয়া অর্জ্জুনকে কর্ম্মে প্রবৃত্তি দিতেছেন।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ ৩। ৫

কেহই কখন নিষ্কর্ম্মা হইয়া অবস্থান করিতে পারে না। কর্ম্ম না করিলে প্রকৃতি-

জাত গুণসকলের দ্বারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব কর্ম্ম করিতেই হইবে। কিন্তু সে কি কর্ম্ম ?

কর্ম্ম বলিলে বেদোক্ত কর্ম্মই বুঝাইত, অর্থাৎ আপনার মঙ্গলকামনায় দেবতার প্রসাদার্থ যাগযজ্ঞ ইত্যাদি বুঝাইত, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ কাম্য কর্ম্ম বুঝাইত। এইখানে প্রাচীন বেদোক্ত ধর্ম্মের সঙ্গে কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের প্রথম বিবাদ, এইখান হইতে গীতোক্ত ধর্ম্মের উৎকর্ষের পরিচয়ের আরম্ভ। সেই বেদোক্ত কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানের নিন্দা করিয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন,

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ ২। ৪২-৪৪

"যাহারা বক্ষ্যমাণরূপ শ্রুতিসুখকর বাক্য প্রয়োগ করে, তাহারা বিবেকশূন্য। যাহারা বেদবাক্যে রত হইয়া ফলসাধন কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইহা বলিয়া থাকে, যাহারা কামপরবশ হইয়া স্বর্গই পরমপুরুষার্থ মনে করিয়া জন্মই কর্ম্মের ফল ইহা বলিয়া থাকে, যাহারা (কেবল) ভোগৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তির সাধনীভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল বাক্য মাত্র প্রয়োগ করে, তাহারা অতি মূর্খ। এইরূপ বাক্যে অপহৃতচিত্ত ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্ত ব্যক্তিদিগের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি কখন সমাধিতে নিহিত হইতে পারে না।"

অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্ম বা কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান ধর্ম্ম নহে। অথচ কর্ম্ম করিতেই হইবে। তবে কি কর্ম্ম করিতে হইবে? যাহা কাম্য নহে, তাহাই নিষ্কাম। যাহা নিষ্কাম ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত, তাহা কর্ম্মমার্গ মাত্র, কর্ম্মের অনুষ্ঠান।

শিষ্য। নিষ্কাম কর্ম্ম কাহাকে বলে ?

গুরু। নিষ্কাম কর্ম্মের এই লক্ষণ ভগবান্ নির্দ্দেশ করিতেছেন,

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥ ২। ৪৭

অর্থাৎ, তোমার কর্ম্মেই অধিকার, কদাচ কর্ম্মফলে যেন না হয়। কর্ম্মের ফলার্থী হইও না; কর্ম্মত্যাগেও প্রবৃত্তি না হউক।

অর্থাৎ কর্ম্ম করিতে আপনাকে বাধ্য মনে করিবে, কিন্তু তাহার কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা করিবে না।

শিষ্য। ফলের আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে কর্ম্ম করিব কেন? যদি পেট ভরিবার আকাঙ্ক্ষা না রাখি, তবে ভাত খাইব কেন ?

গুরু। এইরূপ ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা বলিয়া ভগবান্ পর-শ্লোকে ভাল করিয়া বুঝাইতেছেন—

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়!"

অর্থাৎ, হে ধনঞ্জয়! সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর।

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। প্রথম—সঙ্গ কি ?

গুরু। আসক্তি। যে কর্ম্ম করিতেছ, তাহার প্রতি কোন প্রকার অনুরাগ না থাকে। ভাত খাওয়ার কথা বলিতেছিলে। ভাত খাইতে হইবে সন্দেহ নাই ; কেন না, "প্রকৃতিজ গুণে" তোমাকে খাওয়াইবে, কিন্তু আহারে যেন অনুরাগ না হয়। ভোজনে অনুরাগযুক্ত হইয়া ভোজন করিও না।

শিষ্য। আর "যোগস্থ" কি ?

গুরু। পর-চরণে তাহা কথিত হইতেছে—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

কর্ম্ম করিবে, কিন্তু কর্ম্মে সিদ্ধ হউক, অসিদ্ধ হউক, সমান জ্ঞান করিবে। তোমার যত দূর কর্ত্তব্য, তাহা তুমি করিবে। তাতে তোমার কর্ম্ম সিদ্ধ হয় আর নাই হয়, তুল্য জ্ঞান করিবে। এই যে সিদ্ধ্যসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান করা, ইহাকেই ভগবান্ যোগ বলিতেছেন। এইরূপ যোগস্থ হইয়া, কর্ম্মে আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্মের যে অনুষ্ঠান করা, তাহাই নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান।

শিষ্য। এখনও বুঝিলাম না। আমি সিঁধকাটি লইয়া আপনার বাড়ী চুরি করিতে যাইতেছি। কিন্তু আপনি সজাগ আছেন, এজন্য চুরি করিতে পারিলাম না। তার জন্য দুঃখিত হইলাম না। ভাবিলাম, "আচ্ছা, হলো হলো, না হলো না হলো।" আমি কি নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলাম ?

গুরু। কথাটা ঠিক সোণার পাথরবাটির মত হইল। তুমি মুখে, হলো হলো, না হলো না হলো বল, আর নাই বল, তুমি যদি চুরি করিবার অভিপ্রায় কর, তাহা হইলে তুমি কখনই মনে এরূপ ভাবিতে পারিবে না। কেন না, চুরির ফলাকাঙ্ক্ষী না হইয়া, অর্থাৎ অপহৃত ধনের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, তুমি কখন চুরি করিতে যাও নাই। যাহাকে "কর্ম্ম" বলা যাইতেছে, চুরি তাহার মধ্যে নহে। "কর্ম্ম" কি তাহা পরে বুঝাইতেছি। কিন্তু চুরি "কর্ম্ম" মধ্যে গণ্য হইলেও তুমি তাহা অনাসক্ত হইয়া কর নাই। এজন্য ঈদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠানকে সৎ ও নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান বলা যাইতে পারে না।

শিষ্য। ইহাতে যে আপত্তি, তাহা পূর্ব্বেই করিয়াছি। মনে করুন, আমি বিড়ালের মত ভাত খাইতে বসি, বা উইলিয়ম সি সাইলেন্টের মত দেশোদ্ধার করিতে বসি, দুইয়েতেই আমাকে ফলার্থী হইতে হইবে। অর্থাৎ উদরপূর্ত্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়া ভাতের পাতে বসিতে হইবে, এবং দেশের দুঃখনিবারণ আকাঙ্ক্ষা করিয়া দেশের উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

গুরু। ঠিক সেই কথারই উত্তর দিতে যাইতেছিলাম। তুমি যদি উদরপূর্ত্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়া ভাত খাইতে বসো, তবে তোমার কর্ম্ম নিষ্কাম হইল না। তুমি যদি দেশের দুঃখ নিজের দুঃখতুল্য বা তদধিক ভাবিয়া তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিলে, তাহা হইলেও কর্ম্ম নিষ্কাম হইল না।

শিষ্য। যদি সে আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তবে কেনই এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব ?

জাত গুণসকলের দ্বারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব কর্ম্ম করিতেই হইবে। কিন্তু সে কি কর্ম্ম?

কর্ম্ম বলিলে বেদোক্ত কর্ম্মই বুঝাইত, অর্থাৎ আপনার মঙ্গলকামনায় দেবতার প্রসাদার্থ যাগযজ্ঞ ইত্যাদি বুঝাইত, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ কাম্য কর্ম্ম বুঝাইত। এইখানে প্রাচীন বেদোক্ত ধর্ম্মের সঙ্গে কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের প্রথম বিবাদ, এইখান হইতে গীতোক্ত ধর্ম্মের উৎকর্ষের পরিচয়ের আরম্ভ। সেই বেদোক্ত কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানের নিন্দা করিয়া কৃষ্ণ বলিতেছেন,

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ ২। ৪২-৪৪

"যাহারা বক্ষ্যমাণরূপ শ্রুতিসুখকর বাক্য প্রয়োগ করে, তাহারা বিবেকশূন্য। যাহারা বেদবাক্যে রত হইয়া ফলসাধন কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইহা বলিয়া থাকে, যাহারা কামপরবশ হইয়া স্বর্গই পরমপুরুষার্থ মনে করিয়া জন্মই কর্ম্মের ফল ইহা বলিয়া থাকে, যাহারা (কেবল) ভোগৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তির সাধনীভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল বাক্য মাত্র প্রয়োগ করে, তাহারা অতি মূর্খ। এইরূপ বাক্যে অপহৃতচিত্ত ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্ত ব্যক্তিদিগের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি কখন সমাধিতে নিহিত হইতে পারে না।"

অর্থাৎ বৈদিক কর্ম্ম বা কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান ধর্ম্ম নহে। অথচ কর্ম্ম করিতেই হইবে। তবে কি কর্ম্ম করিতে হইবে? যাহা কাম্য নহে, তাহাই নিষ্কাম। যাহা নিষ্কাম ধর্ম্ম বলিয়া পরিচিত, তাহা কর্ম্মমার্গ মাত্র, কর্ম্মের অনুষ্ঠান।

শিষ্য। নিষ্কাম কর্ম্ম কাহাকে বলে?

গুরু। নিষ্কাম কর্ম্মের এই লক্ষণ ভগবান্ নির্দ্দেশ করিতেছেন,

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥ ২। ৪৭

অর্থাৎ, তোমার কর্ম্মেই অধিকার, কদাচ কর্ম্মফলে যেন না হয়। কর্ম্মের ফলার্থী হইও না; কর্ম্মত্যাগেও প্রবৃত্তি না হউক।

অর্থাৎ কর্ম্ম করিতে আপনাকে বাধ্য মনে করিবে, কিন্তু তাহার কোন ফলের আকাঙ্ক্ষা করিবে না।

শিষ্য। ফলের আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে কর্ম্ম করিব কেন? যদি পেট ভরিবার আকাঙ্ক্ষা না রাখি, তবে ভাত খাইব কেন?

গুরু। এইরূপ ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা বলিয়া ভগবান্ পর-শ্লোকে ভাল করিয়া বুঝাইতেছেন—

"যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়!"

অর্থাৎ, হে ধনঞ্জয়! সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর।

শিষ্য। কিছুই বুঝিলাম না। প্রথম—সঙ্গ কি?

গুরু। আসক্তি। যে কর্ম্ম করিতেছ, তাহার প্রতি কোন প্রকার অনুরাগ না থাকে। ভাত খাওয়ার কথা বলিতেছিলে। ভাত খাইতে হইবে সন্দেহ নাই; কেন না, "প্রকৃতিজ গুণে" তোমাকে খাওয়াইবে, কিন্তু আহারে যেন অনুরাগ না হয়। ভোজনে অনুরাগযুক্ত হইয়া ভোজন করিও না।

শিষ্য। আর "যোগস্থ" কি?

গুরু। পর-চরণে তাহা কথিত হইতেছে—

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

কর্ম্ম করিবে, কিন্তু কর্ম্মে সিদ্ধ হউক, অসিদ্ধ হউক, সমান জ্ঞান করিবে। তোমার যত দূর কর্ত্তব্য, তাহা তুমি করিবে। তাতে তোমার কর্ম্ম সিদ্ধ হয় আর নাই হয়, তুল্য জ্ঞান করিবে। এই যে সিদ্ধ্যসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান করা, ইহাকেই ভগবান্ যোগ বলিতেছেন। এইরূপ যোগস্থ হইয়া, কর্ম্মে আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্মের যে অনুষ্ঠান করা, তাহাই নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান।

শিষ্য। এখনও বুঝিলাম না। আমি সিঁধকাটি লইয়া আপনার বাড়ী চুরি করিতে যাইতেছি। কিন্তু আপনি সজাগ আছেন, এজন্য চুরি করিতে পারিলাম না। তার জন্য দুঃখিত হইলাম না। ভাবিলাম, "আচ্ছা, হলো হলো, না হলো না হলো।" আমি কি নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলাম?

গুরু। কথাটা ঠিক সোণার পাথরবাটির মত হইল। তুমি মুখে, হলো হলো, না হলো না হলো বল, আর নাই বল, তুমি যদি চুরি করিবার অভিপ্রায় কর, তাহা হইলে তুমি কখনই মনে এরূপ ভাবিতে পারিবে না। কেন না, চুরির ফলাকাঙ্ক্ষী না হইয়া, অর্থাৎ অপহৃত ধনের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া, তুমি কখন চুরি করিতে যাও নাই। যাহাকে "কর্ম্ম" বলা যাইতেছে, চুরি তাহার মধ্যে নহে। "কর্ম্ম" কি তাহা পরে বুঝাইতেছি। কিন্তু চুরি "কর্ম্ম" মধ্যে গণ্য হইলেও তুমি তাহা অনাসক্ত হইয়া কর নাই। এজন্য ঈদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠানকে সৎ ও নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান বলা যাইতে পারে না।

শিষ্য। ইহাতে যে আপত্তি, তাহা পূর্ব্বেই করিয়াছি। মনে করুন, আমি বিড়ালের মত ভাত খাইতে বসি, বা উইলিয়ম সি সাইলেন্টের মত দেশোদ্ধার করিতে বসি, দুইয়েতেই আমাকে ফলার্থী হইতে হইবে। অর্থাৎ উদরপূর্ত্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়া ভাতের পাতে বসিতে হইবে, এবং দেশের দুঃখনিবারণ আকাঙ্ক্ষা করিয়া দেশের উদ্ধারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

গুরু। ঠিক সেই কথারই উত্তর দিতে যাইতেছিলাম। তুমি যদি উদরপূর্ত্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়া ভাত খাইতে বসো, তবে তোমার কর্ম্ম নিষ্কাম হইল না। তুমি যদি দেশের দুঃখ নিজের দুঃখতুল্য বা তদধিক ভাবিয়া তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিলে, তাহা হইলেও কর্ম্ম নিষ্কাম হইল না।

শিষ্য। যদি সে আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তবে কেনই এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব?

গুরু। কেবল ইহা তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া। আহার এবং দেশোদ্ধার, উভয়ই তোমার অনুষ্ঠেয়। চৌর্য্য তোমার অনুষ্ঠেয় নহে।

শিষ্য। তবে কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, আর কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় নহে, তাহা কি প্রকারে জানিব? তাহা না বলিলে ত নিষ্কাম ধর্ম্মের গোড়াই বোঝা গেল না?

গুরু। এ অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-প্রণেতা কোন কথাই ছাড়িয়া যান নাই। কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, তাহা বলিতেছেন,—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৩।৯

এখানে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বর। আমার কথায় তোমার ইহা বিশ্বাস না হয়, স্বয়ং শঙ্করাচার্য্যের কথার উপর নির্ভর কর। তিনি এই শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—

"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরস্তদর্থং।"

তাহা হইলে শ্লোকের অর্থ হইল এই যে, ঈশ্বরার্থ ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম, তদ্ভিন্ন অন্য কর্ম্ম বন্ধন মাত্র (অনুষ্ঠেয় নহে); অতএব কেবল ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্মই করিবে। ইহার ফল দাঁড়ায় কি? দাঁড়ায় যে, সমস্ত বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী করিবে, নহিলে সকল কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম হইবে না। এই নিষ্কাম ধর্ম্মই নামান্তরে ভক্তি। এইরূপে কর্ম্ম ও ভক্তির সামঞ্জস্য। কর্ম্মের সহিত ভক্তির ঐক্য স্থানান্তরে আরও স্পষ্টীকৃত হইতেছে। যথা—

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥

অর্থাৎ বিবেকবুদ্ধিতে কর্ম্মসকল আমাতে অর্পণ করিয়া, নিষ্কাম হইয়া এবং মমতা ও বিকারশূন্য হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

শিষ্য। ঈশ্বরে কর্ম্ম অর্পণ কি প্রকারে হইতে পারে?

গুরু। "অধ্যাত্মচেতসা" এই বাক্যের সঙ্গে "সংন্যস্য" শব্দ বুঝিতে হইবে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য "অধ্যাত্মচেতসা" শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "অহং কর্ত্তেশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমীত্যনয়া বুদ্ধ্যা।" "কর্ত্তা যিনি ঈশ্বর, তাঁহারই জন্য, তাঁহার ভৃত্যস্বরূপ এই কাজ করিতেছি।" এইরূপ বিবেচনায় কাজ করিলে, কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ হইল।

এখন এই কর্ম্মযোগ বুঝিলে? প্রথমতঃ কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু কেবল অনুষ্ঠেয় কর্ম্মই কর্ম্ম। যে কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট, অর্থাৎ ঈশ্বরাভিপ্রেত, তাহাই অনুষ্ঠেয়। তাহাতে আসক্তিশূন্য এবং ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সিদ্ধি অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিবে। কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিবে অর্থাৎ কর্ম্ম তাঁহার, আমি তাঁহার ভৃত্য স্বরূপ কর্ম্ম করিতেছি, এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করিবে; তাহা হইলেই কর্ম্মযোগ সিদ্ধ হইল।

ইহা করিতে গেলে কার্য্যকারিণী ও শারীরিক বৃত্তি সকলকেই ঈশ্বরমুখী করিতে হইবে। অতএব কর্ম্মযোগই ভক্তিযোগ। ভক্তির সঙ্গে ইহার ঐক্য ও সামঞ্জস্য দেখিলে। এই অপূর্ব্ব তত্ত্ব, অপূর্ব্ব ধর্ম্ম কেবল গীতাতেই আছে। এইরূপ আশ্চর্য্য ধর্ম্মব্যাখ্যা আর কখন কোন দেশে হয় নাই। কিন্তু ইহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা তুমি এখন প্রাপ্ত হও নাই। কর্ম্মযোগেই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল না, কর্ম্ম ধর্ম্মের প্রথম সোপান মাত্র। কাল তোমাকে জ্ঞানযোগের কথা কিছু বলিব।

পঞ্চদশ অধ্যায়—ভক্তি

ভগবদ্গীতা—জ্ঞান

গুরু। এক্ষণে জ্ঞান সম্বন্ধে ভগবদুক্তির সার মর্ম্ম শ্রবণ কর। কর্ম্মের কথা বলিয়া, চতুর্থাধ্যায়ে আপনার অবতার-কথন সময়ে বলিতেছেন,—

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥ ৪।১০

ইহার ভাবার্থ এই যে, অনেকে বিগতরাগভয়ক্রোধ, মন্ময় (ঈশ্বরময়) এবং আমার উপাশ্রিত হইয়া জ্ঞান তপের দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার ভাব অর্থাৎ ঈশ্বরত্ব বা মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে।

শিষ্য। এই জ্ঞান কি প্রকার?

গুরু। যে জ্ঞানের দ্বারা জীব সমুদায় ভূতকে আত্মাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পায়। যথা—

যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি। ৪।৩৫

শিষ্য। সে জ্ঞান কিরূপে লাভ করিব?

গুরু। ভগবান্ তাহার উপায় এই বলিয়াছেন,

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৪।৩৪

অর্থাৎ প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা এবং সেবার দ্বারা জ্ঞানী তত্ত্বদর্শীদিগের নিকট তাহা অবগত হইবে।

শিষ্য। আপনাকে আমি সেবার দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া প্রণিপাত এবং পরিপ্রশ্নের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমাকে সেই জ্ঞান দান করুন।

গুরু। তাহা আমি পারি না; কেন না, আমি জ্ঞানীও নহি, তত্ত্বদর্শীও নহি। তবে একটা মোটা সঙ্কেত বলিয়া দিতে পারি।

জ্ঞানের দ্বারা সমুদায় ভূতকে আপনাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, ইতিবাক্যে কাহার কাহার পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞেয় বলিয়া কথিত হইয়াছে?

শিষ্য। ভূত, আমি, এবং ঈশ্বর।

গুরু। ভূতকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে?

শিষ্য। বহির্বিজ্ঞানে।

গুরু। অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোম্তের প্রথম চারি—Mathematics, Astronomy, Physics, Chemistry, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব এবং রসায়ন। এই জ্ঞানের জন্য আজিকার দিনে পাশ্চাত্যদিগকে গুরু করিবে। তার পর আপনাকে জানিবে কোন্ শাস্ত্রে?

শিষ্য। বহির্বিজ্ঞানে এবং অন্তর্বিজ্ঞানে।

গুরু। অর্থাৎ কোম্তের শেষ দুই—Biology, Sociology, এ জ্ঞানও পাশ্চাত্যের নিকট যাচ্ঞা করিবে।

শিষ্য। তার পর ঈশ্বর জানিব কিসে?

গুরু। হিন্দুশাস্ত্রে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ গীতায়।

শিষ্য। তবে, জগতে যাহা কিছু জ্ঞেয়, সকলই জানিতে হইবে। পৃথিবীতে যত প্রকার জ্ঞানের প্রচার হইয়াছে, সব জানিতে হইবে। তবে জ্ঞান এখানে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে?

গুরু। যাহা তোমাকে শিখাইয়াছি, তাহা মনে করিলেই ঠিক বুঝিবে। জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হওয়া চাই। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের চর্চ্চা ভিন্ন তাহা হইতে পারে না। জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইলে সেই সঙ্গে অনুশীলন ধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে যদি ভক্তি বৃত্তিরও সম্যক্ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইয়া থাকে, তবে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি যখন ভক্তির অধীন হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে, তখনই এই গীতোক্ত জ্ঞানে পৌঁছিবে। অনুশীলনধর্ম্মেই যেমন কর্ম্মযোগ, অনুশীলন-ধর্ম্মেই তেমনি জ্ঞানযোগ।

শিষ্য। আমি গণ্ডমূর্খের মত আপনার ব্যাখ্যাত অনুশীলনধর্ম্ম সকলই উল্টা বুঝিয়াছিলাম; এখন কিছু কিছু বুঝিতেছি।

গুরু। এক্ষণে সে কথা যাউক। এই জ্ঞানযোগ বুঝিবার চেষ্টা কর।

শিষ্য। আগে বলুন, কেবল জ্ঞানেই কি প্রকারে ধর্ম্মের পূর্ণতা হইতে পারে? তাহা হইলে পণ্ডিতই ধার্ম্মিক।

গুরু। এ কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পাণ্ডিত্য জ্ঞান নহে। যে ঈশ্বর বুঝিয়াছে, যে ঈশ্বরে জগতে যে সম্বন্ধ তাহা বুঝিয়াছে, সে কেবল পণ্ডিত নহে, সে জ্ঞানী। পণ্ডিত না হইলেও সে জ্ঞানী। শ্রীকৃষ্ণ এমত বলিতেছেন না যে, কেবল জ্ঞানেই তাঁহাকে কেহ পাইয়াছে। তিনি বলিতেছেন,

> বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
> বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥ ৪।১০

অর্থাৎ যাহারা চিত্তসংযত এবং ঈশ্বরপরায়ণ, তাহারাই জ্ঞানের দ্বারা পূত হইয়া তাঁহাকে পায়, আসল কথা, কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মের এমন মর্ম্ম নহে যে, কেবল জ্ঞানের দ্বারাই সাধন সম্পূর্ণ হয়। জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের সংযোগ চাই।* কেবল কর্ম্মে হইবে না, কেবল জ্ঞানেও নহে। কর্ম্মেই আবার জ্ঞানের সাধন। কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়। ভগবান্ বলিতেছেন,—

> আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে। ৬।৩।

যিনি জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছু, কর্ম্মই তাঁহার তদারোহণের কারণ বলিয়া কথিত হয়। অতএব কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এখানে ভগবদ্বাক্যের অর্থ

* বলা বাহুল্য যে, এই কথা জ্ঞানবাদী শঙ্করাচার্য্যের মতের বিরুদ্ধ। তাঁহার মতে জ্ঞান কর্ম্মে সমুচ্চয় নাই। শঙ্করাচার্য্যের মতের যাহা বিরোধী, শিক্ষিত সম্প্রদায় ভিন্ন আর কেহ আমার কথায় এখনকার দিনে গ্রহণ করিবেন না, তাহা আমি জানি। পক্ষান্তরে ইহাও বক্তব্য যে, শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি ভক্তিবাদিগণ শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী নন। এবং অনেক অনুগামী পণ্ডিত শঙ্করের মতের বিরোধী বলিয়াই তাঁহাকে স্বপক্ষসমর্থন জন্য ভাষ্যের মধ্যে বড় বড় প্রবন্ধ লিখিতে হইয়াছে।

এই যে, কর্ম্মযোগ ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি জন্মে না। চিত্তশুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞানযোগে পৌঁছান যায় না।

শিষ্য। তবে কি কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান জন্মিলে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে?

গুরু। উভয়েরই সংযোগ ও সামঞ্জস্য চাই।

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥ ৪। ৪১

হে ধনঞ্জয়! কর্ম্মযোগের দ্বারা যে ব্যক্তি সংন্যস্তকর্ম্ম এবং জ্ঞানের দ্বারা যার সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, সেই আত্মবান্‌কে কর্ম্মসকল বদ্ধ করিতে পারে না।

তবেই চাই (১) কর্ম্মের সংন্যাস বা ঈশ্বরার্পণ এবং (২) জ্ঞানের দ্বারা সংশয়চ্ছেদন। এইরূপে কর্ম্মবাদের, ও জ্ঞানবাদের বিবাদ মিটিল। ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল। এইরূপে ধর্ম্মপ্রণেতৃশ্রেষ্ঠ, ভূতলে মহামহিমময় এই নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত করিলেন। কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ কর; কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া পরমার্থতত্ত্বে সংশয় ছেদন কর। এই জ্ঞান ভক্তিতে যুক্ত; কেন না,—

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ॥ ৫। ১৭

ঈশ্বরেই যাহাদের বুদ্ধি, ঈশ্বরেই যাহাদের আত্মা, তাঁহাতে যাহাদের নিষ্ঠা, ও যাহারা তৎপরায়ণ, তাহাদের পাপসকল জ্ঞানে নির্ধূত হইয়া যায়, তাহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য। এখন বুঝিতেছি যে, এই জ্ঞান ও কর্ম্মের সমবায়ে ভক্তি। কর্ম্মের জন্য প্রয়োজন—কার্য্যকারিণী ও শারীরিকী বৃত্তিগুলি সকলেই উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে। জ্ঞানের জন্য চাই—জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলি ঐরূপ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে। আর চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি?

গুরু। সেইরূপ হইবে। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকল বুঝাইবার সময়ে বলিব।

শিষ্য। তবে মনুষ্যে সমুদায় বৃত্তি উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইলে, এই গীতোক্ত জ্ঞানকর্ম্মসন্যাস যোগে পরিণত হয়। এতদুভয়ই ভক্তিবাদ। মনুষ্যত্ব ও অনুশীলনধর্ম্ম যাহা আমাকে শুনাইয়াছেন, তাহা এই গীতোক্ত ধর্ম্মের নূতন ব্যাখ্যা মাত্র।

গুরু। ক্রমে এ কথা আরও স্পষ্ট বুঝিবে।

ষোড়শ অধ্যায়—ভক্তি

ভগবদ্গীতা—সন্ন্যাস

গুরু। তার পর, আর একটা কথা শোন। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে যৌবনে জ্ঞানার্জ্জন করিতে হয়, মধ্য বয়সে গৃহস্থ হইয়া কর্ম্ম করিতে হয়। গীতোক্ত ধর্ম্মে ঠিক তাহা বলা হয় নাই; বরং কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান উপার্জ্জন করিবে, এমন কথা বলা হইয়াছে। ইহা সত্য কথা; কেন না, অধ্যয়নও কর্ম্মের মধ্যে, এবং কেবল অধ্যয়নে জ্ঞান জন্মিতে পারে না। সে যাই হৌক, মনুষ্যের এমন এক দিন উপস্থিত হয় যে, কর্ম্ম করিবার সময়ও নহে,

জ্ঞানোপার্জ্জনের সময়ও নহে। তখন জ্ঞান উপার্জ্জিত হইয়াছে, কর্ম্মেরও শক্তি বা প্রয়োজন আর নাই। হিন্দুশাস্ত্রে এই অবস্থায় তৃতীয় ও চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিবার বিধি আছে। তাহাকে সচরাচর সন্ন্যাস বলে। সন্ন্যাসের স্থূল মর্ম্ম কর্ম্মত্যাগ। ইহাও মুক্তির উপায় বলিয়া ভগবৎকর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। বরং তিনি এমনও বলিয়াছেন যে, যদিও জ্ঞানযোগে আরোহণ করিবার যে ইচ্ছা করে, কর্ম্মই তাহার সহায়, কিন্তু যে জ্ঞানযোগে আরোহণ করিয়াছে, কর্ম্মত্যাগ তাহার সহায়।

আরুরুক্ষোর্ম্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৬। ৩

শিষ্য। কিন্তু কর্ম্মত্যাগ ও সংসারত্যাগ একই কথা। তবে কি সংসারত্যাগ একটা ধর্ম্ম? জ্ঞানীর পক্ষে ঠিক কি তাই বিহিত?

গুরু। পূর্ব্বগামী হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের তাহাই মত বটে। জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্মত্যাগ যে তাহার সাধনের সাহায্য করে, তাহাও সত্য। এ বিষয়ে ভগবদ্বাক্যই প্রমাণ। তথাপি কৃষ্ণোক্ত এই পুণ্যময় ধর্ম্মের এমন শিক্ষা নহে যে, কেহ কর্ম্মত্যাগ বা কেহ সংসারত্যাগ করিবে। ভগবান্ বলেন যে, কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মত্যাগ উভয়ই মুক্তির কারণ, কিন্তু তন্মধ্যে কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ৫। ২

শিষ্য। তাহা কখনই হইতে পারে না। জ্বরত্যাগটা যদি ভাল হয়, তবে জ্বর কখন ভাল নহে। কর্ম্মত্যাগ যদি ভাল হয়, তবে কর্ম্ম ভাল হইতে পারে না। জ্বরত্যাগের চেয়ে কি জ্বর ভাল?

গুরু। কিন্তু এমন যদি হয় যে, কর্ম্ম রাখিয়াও কর্ম্মত্যাগের ফল পাওয়া যায়?

শিষ্য। তাহা হইলে কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। কেন না, তাহা হইলে কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ, উভয়েরই ফল পাওয়া গেল।

গুরু। ঠিক তাই। পূর্ব্বগামী হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ—কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসগ্রহণ। গীতার উপদেশ—কর্ম্ম এমন চিত্তে কর যে, তাহাতেই সন্ন্যাসের ফল প্রাপ্ত হইবে। নিষ্কাম কর্ম্মই সন্ন্যাস—সন্ন্যাসে আবার বেশী কি আছে? বেশীর মধ্যে কেবল আছে, নিষ্প্রয়োজনীয় দুঃখ।

জ্ঞেয় স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥
সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৫। ৩-৬

"যাঁহার দ্বেষ নাই ও আকাঙ্ক্ষা নাই, তাঁহাকেই নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়া জানিও। হে মহাবাহো। তাদৃশ নির্দ্বন্দ্ব পুরুষেরাই সুখে বন্ধনমুক্ত হইতে পারে। (সাংখ্য) সন্ন্যাস ও (কর্ম্ম) যোগ যে পৃথক্, ইহা বালকেই বলে, পণ্ডিতে নহে। একের আশ্রয়ে, একত্রে উভয়েরই ফল লাভ করা যায়। সাংখ্যে (সন্ন্যাস)* যাহা পাওয়া যায়, (কর্ম্ম) যোগেও তাই পাওয়া যায়। যিনি উভয়কে একই দেখেন, তিনিই যথার্থদর্শী। হে মহাবাহো! কর্ম্মযোগ বিনা সন্ন্যাস দুঃখের কারণ। যোগযুক্ত মুনি অচিরে ব্রহ্ম পায়েন। স্থূল কথা এই যে, যিনি অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সকলই করিয়া থাকেন, অথচ চিত্তে সকল কর্ম্মসম্বন্ধেই সন্ন্যাসী তিনিই ধার্ম্মিক।

শিষ্য। এই পরম বৈষ্ণবধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এখন বৈরাগীরা ডোর কৌপীন পরিয়া সং সাজিয়া বেড়ায় কেন, বুঝিতে পারি না। ইংরেজরা যাহাকে Asceticism বলেন, বৈরাগ্য শব্দে তাহা বুঝায় না, এখন দেখিতেছি। এই পরম পবিত্র ধর্ম্মে সেই পাপের মূলোচ্ছেদ হইতেছে। অথচ এমন পবিত্র, সর্ব্বব্যাপী, উন্নতিশীল বৈরাগ্য আর কোথাও নাই। ইহাতে সর্ব্বত্র সেই পবিত্র বৈরাগ্য, সকর্ম্ম বৈরাগ্য; অথচ Asceticism কোথাও নাই। আপনি যথার্থই বলিয়াছেন, এমন আশ্চর্য্য ধর্ম্ম এমন সত্যময় উন্নতিকর ধর্ম্ম, জগতে আর কখন প্রচারিত হয় নাই। গীতা থাকিতে, লোকে বেদ, স্মৃতি, বাইবেল বা কোরাণে ধর্ম্ম খুঁজিতে যায়, ইহা আশ্চর্য্য বোধ হয়। এই ধর্ম্মের প্রথম প্রচারকের কাছে কেহই ধর্ম্মবেত্তা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। এ অতিমানুষ ধর্ম্মপ্রণেতা কে?

গুরু। শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জ্জুনের রথে চড়িয়া, কুরুক্ষেত্রে, যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই সকল কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা আমি বিশ্বাস করি না। না বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে। গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত, এ কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণ যে গীতোক্ত ধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহা আমি বিশ্বাস করি। বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। ফলে তুমি দেখিতে পাইতেছ যে, এক নিষ্কামবাদের দ্বারা সমুদায় মনুষ্যজীবন শাসিত, এবং নীতি ও ধর্ম্মের সকল উচ্চ তত্ত্ব একত্র প্রাপ্ত হইয়া পবিত্র হইতেছে। কাম্য কর্ম্মের ত্যাগই সন্ন্যাস, নিষ্কাম কর্ম্মই সন্ন্যাস, নিষ্কাম কর্ম্মত্যাগ সন্ন্যাস নহে।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ১৮। ২

যে দিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প, এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কাম ধর্ম্ম একত্রিত হইবে, সেই দিন মনুষ্য দেবতা হইবে। তখন ঐ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম প্রয়োগ হইবে না।

শিষ্য। মানুষের অদৃষ্টে কি এমন দিন ঘটিবে?

গুরু। তোমরা ভারতবাসী, তোমরা করিলেই হইবে। দুই-ই তোমাদের হাতে। এখন ইচ্ছা করিলে তোমরাই পৃথিবীর কর্ত্তা ও নেতা হইতে পার। সে আশা যদি তোমাদের না থাকে, তবে বৃথায় আমি বকিয়া মরিতেছি। সে যাহা হউক, এক্ষণে এই গীতোক্ত সন্ন্যাসবাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মহীন সন্ন্যাস

* "সাংখ্য" কথাটির অর্থ লইয়া আপাততঃ গোলযোগ বোধ হইতে পারে। যাঁহাদিগের এমত সন্দেহ হইবে, তাঁহারা শাঙ্কর ভাষ্য দেখিবেন।

নিকৃষ্ট সন্ন্যাস। কর্ম্ম, বুঝাইয়াছি—ভক্ত্যাত্মক। অতএব এই গীতোক্ত সন্ন্যাসবাদের তাৎপর্য্য এই যে, ভক্ত্যাত্মক কর্ম্মযুক্ত সন্ন্যাসই যথার্থ সন্ন্যাস।

সপ্তদশ অধ্যায়—ভক্তি

ধ্যান বিজ্ঞানাদি

গুরু। ভগবদ্গীতা পাঁচ অধ্যায়ের কথা তোমাকে বুঝাইয়াছি। প্রথম অধ্যায়ে সৈন্যদর্শন, দ্বিতীয় জ্ঞানযোগের স্থূলাভাষ, উহার নাম সাংখ্যযোগ, তৃতীয়ে কর্ম্মযোগ, চতুর্থে জ্ঞান-কর্ম্মন্যাসযোগ, পঞ্চমে সন্ন্যাসযোগ, এ সকল তোমাকে বুঝাইয়াছি। ষষ্ঠে ধ্যানযোগ। ধ্যান জ্ঞানবাদীর অনুষ্ঠান, সুতরাং উহার পৃথক্ আলোচনার প্রয়োজন নাই। যে ধ্যানমার্গাবলম্বী, সে যোগী। যোগী কে, তাহার লক্ষণ এই অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। যে অবস্থায় চিত্ত যোগানুষ্ঠান দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া উপরত হয়; যে অবস্থায় বিশুদ্ধান্তঃকরণের দ্বারা আত্মাকে অবলোকন করিয়া আত্মাতেই পরিতৃপ্ত হয়; যে অবস্থায় বুদ্ধিমাত্রলভ্য, অতীন্দ্রিয়, আত্যন্তিক সুখ উপলব্ধ হয়; যে অবস্থায় অবস্থান করিলে আত্মতত্ত্ব হইতে পরিচ্যুত হইতে হয় না; যে অবস্থা লাভ করিলে, অন্য লাভকে অধিক বলিয়া বোধ হয় না, এবং যে অবস্থা উপস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও বিচলিত করিতে পারে না, সেই অবস্থার নামই যোগ—নহিলে খাওয়া ছাড়িয়া বার বৎসর একঠাঁই বসিয়া চোক্ বুজিয়া ভাবিলে যোগ হয় না। কিন্তু যোগীর মধ্যেও প্রধান ভক্ত—

> যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
> শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৬। ৪৭

"যে আমাতে আসক্তমনা হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করে, আমার মতে যোগযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ।" ইহা ভগবদুক্তি। অতএব এই গীতোক্ত ধর্ম্মে, জ্ঞান কর্ম্ম ধ্যান সন্ন্যাস—ভক্তি ব্যতীত কিছুই সম্পূর্ণ নহে। ভক্তিই সর্ব্বসাধনের সার।

সপ্তমে বিজ্ঞানযোগ। ইহাতেই ঈশ্বর, আপন স্বরূপ কহিতেছেন। ঈশ্বর আপনাকে নির্গুণ ও সগুণ, অর্থাৎ স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণের দ্বারা বর্ণিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও বিশদরূপে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন তাঁহাকে জানিবার উপায় নাই। অতএব ভক্তিই ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়।

অষ্টমে তারকব্রহ্মযোগ। ইহাও সম্পূর্ণরূপে ভক্তিযোগ। ইহার মূল-তাৎপর্য্যে ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায় কথিত হইয়াছে। একান্ত ভক্তির দ্বারাই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নবমাধ্যায়ে বিখ্যাত রাজগুহ্যযোগ। ইহাতে অতিশয় মনোহারিণী কথা সকল আছে। ইতিপূর্ব্বে জগদীশ্বর একটি অতিশয় মনোহর উপমা দ্বারা আপনার সহিত জগতের সম্বন্ধ প্রকটিত করিয়াছিলেন,—"যেমন সূত্রে মণি সকল গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে।" নবমে আর একটি সুন্দর উপমা প্রযুক্ত হইয়াছে, যথা—

"আমার আত্মা ভূতসকল ধারণ ও পালন করিতেছে, কিন্তু কোন ভূতেই অবস্থান করিতেছে না। যেমন সমীরণ সর্ব্বত্রগামী ও মহৎ হইলেও, প্রতিনিয়ত আকাশে অবস্থান করে, তদ্রূপ সকল ভূতই আমাতে অবস্থান করিতেছে।" হর্বর্ট স্পেন্সরের নদীর উপর জলবুদ্বুদের উপমা অপেক্ষা এই উপমা কত গুণে শ্রেষ্ঠ!

শিষ্য। চক্ষু হইতে আমার ঠুলি খসিয়া পড়িল। আমার একটা বিশ্বাস ছিল যে —নির্গুণ ব্রহ্মবাদটা Pantheism মাত্র। এক্ষণে দেখিতেছি, তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

গুরু। ইংরেজী সংস্কারবিশিষ্ট হইয়া এ সকলের আলোচনার দোষ ঐ। আমাদের মধ্যে এমন অনেক বাবু আছেন, কাচের টম্‌লরে না খাইলে তাঁহাদের জল মিষ্ট লাগে না। আমাদের আর একটা ভ্রম আছে বোধ হয় যে, মনুষ্য মাত্রেই—মূর্খ ও জ্ঞানী, ধনী ও দরিদ্র, পুরুষ ও স্ত্রী, বৃদ্ধ ও বালক,—সকল জাতি, সকলেই যে তুল্যরূপে পরিত্রাণের অধিকারী, এ সাম্যবাদ শাক্যসিংহের ধর্ম্মে ও খৃষ্টধর্ম্মেই আছে, বর্ণভেদজ্ঞ হিন্দুধর্ম্মে নাই। এই অধ্যায়ের দুইটা শ্লোক শ্রবণ কর।

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌ ॥ ৯। ২৯

* * *

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্‌ ॥ ৯। ৩২

"আমি সকল ভূতের পক্ষে সমান; কেহ আমার দ্বেষ্য বা কেহ প্রিয় নাই; যে আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে, আমি তাহাতে, সে আমাতে। * * পাপযোনিও আশ্রয় করিলে পরাগতি পায়—বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রীলোক, সকলেই পায়।"

শিষ্য। এটা বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে।

গুরু। কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে এই একটা পাগলামি প্রচলিত হইয়াছে। ইংরেজ পণ্ডিতগণের কাছে তোমরা শুনিয়াছ যে, ৫৪৩ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে (বা ৪৭৭) শাক্যসিংহ মরিয়াছেন; কাজেই তাঁহাদের দেখাদেখি সিদ্ধান্ত করিতে শিখিয়াছ যে, যাহা কিছু ভারতবর্ষে হইয়াছে, সকলই বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে। তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, হিন্দুধর্ম্ম এমনই নিকৃষ্ট সামগ্রী যে, ভাল জিনিষ কিছুই তাহার নিজ ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। এই অনুকরণপ্রিয় সম্প্রদায় ভুলিয়া যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্ম নিজেই এই হিন্দুধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যদি সমগ্র বৌদ্ধধর্ম্ম ইহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারিল ত আর কোন ভাল জিনিষ কি তাহা হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না?

শিষ্য। যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে করিতে আপনার এ রাগটুকু সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এক্ষণে রাজগুহ্যযোগের বৃত্তান্ত শুনিতে চাই।

গুরু। রাজগুহ্যযোগ সর্ব্বপ্রধান বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই, যদিও ঈশ্বর সকলের প্রাপ্য বটে, তথাপি যে যে-ভাবে চিন্তা করে, সে সেই ভাবেই তাঁহাকে পায়। যাঁহারা দেবদেবীর সকাম উপাসনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরানুগ্রহে সিদ্ধকাম হইয়া স্বর্গ ভোগ করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়েন না। কিন্তু যাঁহারা নিষ্কাম হইয়া দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাঁহাদের উপাসনা নিষ্কাম বলিয়া তাঁহারা ঈশ্বরেরই উপাসনা করেন; কেন না, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। তবে যাঁহারা সকাম হইয়া দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাঁহারা যে ভাবান্তরে ঈশ্বরোপাসনায় ঈশ্বর পান না, তাহার কারণ, সকাম উপাসনা ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃত পদ্ধতি নহে। পরন্তু ঈশ্বরের নিষ্কাম

উপাসনাই মুখ্য উপাসনা, তদ্ভিন্ন ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় না। অতএব সর্ব্বকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া ঈশ্বরে ভক্তি করাই ধর্ম্ম ও মোক্ষের উপায়। এই

সপ্তমে ঈশ্বরের স্বরূপ কথিত হইয়াছে, দশমে তাঁহার বিভূতি সকল কথিত হইতেছে। এই বিভূতিযোগ অতি বিচিত্র, কিন্তু এক্ষণে উহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই। দশমে বিভূতি সকল বিবৃত করিয়া, তাহার প্রত্যক্ষস্বরূপ একাদশে ভগবান অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করান। তাহাতেই দ্বাদশে ভক্তিপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল। কালি তোমাকে সেই ভক্তিযোগ শুনাইব।

অষ্টাদশ অধ্যায়—ভক্তি

ভগবদ্গীতা—ভক্তিযোগ

শিষ্য। ভক্তিযোগ বলিবার আগে, একটা কথা বুঝাইয়া দিন। ঈশ্বর এক, কিন্তু সাধন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কেন? সোজা পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না।

গুরু। সোজা পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না বটে, কিন্তু সকলে, সকল সময়ে, সোজা পথে যাইতে পারে না। পাহাড়ের চূড়ায় উঠিবার যে সোজা পথ, দুই একজন বলবানে তাহাতে আরোহণ করিতে পারে। সাধারণের জন্য ঘুরাণ ফিরাণ পথই বিহিত। এই সংসারে নানাবিধ লোক; তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা, এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি। কেহ সংসারী, কাহারও সংসার হয় নাই, হইয়াছিল ত সে ত্যাগ করিয়াছে। যে সংসারী, তাহার পক্ষে কর্ম্ম; যে অসংসারী, তাহার পক্ষে সন্ন্যাস। যে জ্ঞানী, অথচ সংসারী, তাহার পক্ষে জ্ঞান ও বিজ্ঞানযোগই প্রশস্ত; যে জ্ঞানী অথচ সংসারী নয় অর্থাৎ যে যোগী, তাহার পক্ষে ধ্যানযোগই প্রশস্ত। আর আপামর সাধারণ সকলেরই পক্ষে সর্ব্বসাধনশ্রেষ্ঠ রাজগুহ্যযোগই প্রশস্ত। অতএব সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যের উন্নতির জন্য জগদীশ্বর এই আশ্চর্য্য ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। তিনি করুণাময়—যাহাতে সকলেরই পক্ষে ধর্ম্ম সোজা হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

শিষ্য। কিন্তু আপনি যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তবে ভক্তিই সকল সাধনের অন্তর্গত। তবে এক ভক্তিকে বিহিত বলিলেই, সকলের পক্ষে পথ সোজা হইত।

গুরু। কিন্তু ভক্তির অনুশীলন চাই। তাই বিবিধ সাধন, বিবিধ অনুশীলনপদ্ধতি। আমার কথিত অনুশীলনতত্ত্ব যদি বুঝিয়া থাক, তবে এ কথা শীঘ্র বুঝিবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মনুষ্যের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন অনুশীলনপদ্ধতি বিধেয়। যোগ, সেই অনুশীলন-পদ্ধতির নামান্তর মাত্র।

শিষ্য। কিন্তু যে প্রকারে এই সকল যোগ কথিত হইয়াছে, তাহাতে পাঠকের মনে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা অর্থাৎ জ্ঞান, সাধনবিশেষ বলিয়া কথিত হইয়াছে, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা অর্থাৎ ভক্তিও সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে। অনেকের পক্ষে দুই-ই সাধ্য। যাহার পক্ষে দুই-ই সাধ্য, সে কোন্ পথ অবলম্বন করিবে? দুই-ই ভক্তি বটে জানি, তথাপি জ্ঞান-বুদ্ধি-ময়ী ভক্তি, আর কর্ম্ম-ময়ী ভক্তি মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

গুরু। দ্বাদশ অধ্যায়ের আরম্ভে এই প্রশ্নই অর্জ্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং এই প্রশ্নের উত্তরই দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ। এই প্রশ্নটি বুঝাইবার জন্যই গীতার পূর্ব্বগামী একাদশ অধ্যায় তোমাকে সংক্ষেপে বুঝাইলাম। প্রশ্ন না বুঝিলে উত্তর বুঝা যায় না।

শিষ্য। কৃষ্ণ কি উত্তর দিয়াছেন?

গুরু। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক ও ঈশ্বরভক্ত, উভয়েই ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, ব্রহ্মোপাসকেরা অধিকতর দুঃখ ভোগ করে; ভক্তেরা সহজে উদ্ধৃত হয়।

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ১২ | ৫-৭

শিষ্য। এক্ষণে বলুন, তবে এই ভক্ত কে?

গুরু। ভগবান্ স্বয়ং তাহা বলিতেছেন।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ১২ । ১৩-২০

"যে মমতাশূন্য (অর্থাৎ যার 'আমার! আমার!' জ্ঞান নাই,) অহঙ্কারশূন্য, যাহার সুখ দুঃখে সমান জ্ঞান, যে ক্ষমাশীল, যে সন্তুষ্ট, যোগী, সংযতাত্মা এবং দৃঢ়সঙ্কল্প, যাহার মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত, এমন যে আমার ভক্ত, সে-ই আমার প্রিয়। যাঁহা হইতে লোক উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না এবং যিনি লোক হইতে নিজে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না, যে হর্ষ অমর্ষ ভয় এবং উদ্বেগ হইতে মুক্ত, সে-ই আমার প্রিয়। যে বিষয়াদিতে

অনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, গতব্যথ, অথচ সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগ করিতে সক্ষম, এমন যে আমার ভক্ত, সে-ই আমার প্রিয়। যাঁহার কিছুতে হর্ষ নাই, অথচ দ্বেষও নাই, যিনি শোকও করেন না, বা আকাঙ্ক্ষা করেন না, যিনি শুভাশুভ সকল পরিত্যাগ করিতে সমর্থ, এমন যে ভক্ত, সে-ই আমার প্রিয়। যাঁহার নিকট শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীতোষ্ণ, সুখ ও দুঃখ সমান, যিনি আসঙ্গ-বিবর্জ্জিত, যিনি নিন্দা ও স্তুতি তুল্য বোধ করেন, যিনি সংযতবাক্য, যিনি যে কিছু দ্বারা সন্তুষ্ট, এবং যিনি সর্ব্বদা আশ্রয়ে থাকেন না, এবং স্থিরমতি, সেই ভক্ত আমার প্রিয়। এই ধর্ম্মামৃত যেমন বলিয়াছি, যে সেইরূপ অনুষ্ঠান করে, সেই শ্রদ্ধাবান্ আমার পরম ভক্ত, আমার অতিশয় প্রিয়।”

এখন বুঝিলে ভক্তি কি? ঘরে কপাট দিয়া পূজার ভান করিয়া বসিলে ভক্ত হয় না। মালা ঠক্‌ঠক্ করিয়া, হরি! হরি! করিলে ভক্ত হয় না; হা ঈশ্বর! যো ঈশ্বর! করিয়া গোলযোগ করিয়া বেড়াইলে ভক্ত হয় না; যে আত্মজয়ী, যাহার চিত্ত সংযত, যে সমদর্শী, যে পরহিতে রত, সে-ই ভক্ত। ঈশ্বরকে সর্ব্বদা অন্তরে বিদ্যমান জানিয়া, যে আপনার চরিত্র পবিত্র না করিয়াছে, যাহার চরিত্র ঈশ্বরানুরূপী নহে, সে ভক্ত নহে। যাহার সমস্ত চরিত্র ভক্তির দ্বারা শাসিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। যাহার সকল চিত্তবৃত্তি ঈশ্বরমুখী না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। গীতোক্ত ভক্তির স্থূল কথা এই। এরূপ উদার, এবং প্রশস্ত ভক্তিবাদ জগতে আর কোথাও নাই। এই জন্য ভগবদ্গীতা জগতে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়—ভক্তি

ঈশ্বরে ভক্তি—বিষ্ণুপুরাণ

গুরু। ভগবদ্গীতার অবশিষ্টাংশের কোন কথা তুলিবার এক্ষণে আমাদের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা স্পষ্ট করিবার জন্য বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদ-চরিত্রের আমরা সমালোচনা করিব। বিষ্ণুপুরাণে দুইটি ভক্তের কথা আছে, সকলেই জানেন—ধ্রুব ও প্রহ্লাদ। এই দুই জনের ভক্তি দুই প্রকার। যাহা বলিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছ উপাসনা দ্বিবিধ, সকাম এবং নিষ্কাম। সকাম যে উপাসনা, সেই কাম্য কর্ম্ম; নিষ্কাম যে উপাসনা, সেই ভক্তি। ধ্রুবের উপাসনা সকাম,—তিনি উচ্চ পদ লাভের জন্যই বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার কৃত উপাসনা প্রকৃত ভক্তি নহে; ঈশ্বরে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস এবং মনোবুদ্ধি সমর্পণ হইয়া থাকিলেও তাহা ভক্তের উপাসনা নহে। প্রহ্লাদের উপাসনা নিষ্কাম। তিনি কিছুই পাইবার জন্য ঈশ্বরে ভক্তিমান্ হয়েন নাই; বরং ঈশ্বরে ভক্তিমান্ হওয়াতে বহুবিধ বিপদে পড়িয়াছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরে ভক্তি সেই সকল বিপদের কারণ, ইহা জানিতে পারিয়াও তিনি ভক্তি ত্যাগ করেন নাই। এই নিষ্কাম প্রেমই যথার্থ ভক্তি এবং প্রহ্লাদই পরমভক্ত। বোধ হয় গ্রন্থকার সকাম ও নিষ্কাম উপাসনার উদাহরণস্বরূপ, এবং পরস্পরের তুলনার জন্য ধ্রুব ও প্রহ্লাদ, এই দুইটি উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন। ভগবদ্গীতার রাজযোগ

সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা যদি তোমার স্মরণ থাকে, তাহা হইলে বুঝিবে যে, সকাম উপাসনাও একেবারে নিষ্ফল নহে ; যে যাহা কামনা করিয়া উপাসনা করে, সে তাহা পায়, কিন্তু ঈশ্বর পায় না। ধ্রুব উচ্চ পদ কামনা করিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনি পাইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার সে উপাসনা নিম্নশ্রেণীর উপাসনা, ভক্তি নহে। প্রহ্লাদের উপাসনা ভক্তি, এই জন্য তিনি লাভ·করিলেন—মুক্তি।

শিষ্য। অনেকেই বলিবে, লাভটা ধ্রুবেরই বেশী হইল। মুক্তি পরলৌকিক লাভ, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে অনেকের সংশয় আছে। এরূপ ভক্তিধর্ম্ম লোকায়ত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

গুরু। মুক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তুমি ভুলিয়া গিয়াছ। ইহলোকেই মুক্তি হইতে পারে ও হইয়া থাকে। যাহার চিত্ত শুদ্ধ এবং দুঃখের অতীত, সে-ই ইহলোকেই মুক্ত। সম্রাট্ দুঃখের অতীত নহেন, কিন্তু মুক্ত জীব ইহলোকেই দুঃখের অতীত ; কেন না, সে আত্মজয়ী হইয়া বিশ্বজয়ী হইয়াছে। সম্রাটের কি সুখ বলিতে পারি না। বড় বেশী সুখ আছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু যে মুক্ত, অর্থাৎ সংযতাত্মা, বিশুদ্ধচিত্ত, তাহার মনের সুখের সীমা নাই। যে মুক্ত, সে-ই ইহজীবনেই সুখী এই জন্য তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, সুখের উপায় ধর্ম্ম। মুক্ত ব্যক্তির সকল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া সামঞ্জস্যযুক্ত হইয়াছে বলিয়া সে মুক্ত। যাহার বৃত্তিসকল স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত নহে, সে অজ্ঞান, অসামর্থ্য, বা চিত্তমালিন্যবশতঃ মুক্ত হইতে পারে না।

শিষ্য। আমার বিশ্বাস যে, এই জীবন্মুক্তির কামনা করিয়া ভারতবর্ষীয়েরা এরূপ অধঃপাতে গিয়াছেন। যাঁহারাই এ প্রকার জীবন্মুক্ত, সাংসারিক ব্যাপারে তাদৃশ তাঁহাদের মনোযোগ থাকে না, এজন্য ভারতবর্ষের এই অবনতি হইয়াছে।

গুরু। মুক্তির যথার্থ্য তাৎপর্য্য না বুঝাই এই অধঃপতনের কারণ। যাঁহারা মুক্ত বা মুক্তিপথের পথিক, তাঁহারা সংসারে নির্লিপ্ত হয়েন, কিন্তু তাঁহারা নিষ্কাম হইয়া যাবতীয় অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহাদের কর্ম্ম নিষ্কাম বলিয়া, তাঁহাদের কর্ম্ম স্বদেশের এবং জগতের মঙ্গলকর হয় ; সকাম কর্ম্মীদিগের কর্ম্মে কাহারও মঙ্গল হয় না। আর তাঁহাদের বৃত্তিসকল অনুশীলিত এবং স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত, এই জন্য তাঁহারা দক্ষ এবং কর্ম্মঠ ; পূর্ব্বে যে ভগবদ্বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে দেখিবে যে, ভগবদ্ভক্তদিগের দক্ষতা* একটি লক্ষণ। তাঁহারা দক্ষ অথচ নিষ্কাম কর্ম্মী, এ জন্য তাঁহাদিগের দ্বারা যতটা স্বজাতির এবং জগতের মঙ্গল সিদ্ধ হয়, এত আর কাহারও দ্বারা হইতে পারে না। এ দেশের সকলে এইরূপ মুক্তিমার্গাবলম্বী হইলেই ভারতবর্ষীয়েরাই জগতে শ্রেষ্ঠ জাতির পদ প্রাপ্ত হইবে। মুক্তিতত্ত্বের এই যথার্থ ব্যাখ্যার লোপ হওয়ায় অনুশীলনবাদের দ্বারা আমি তাহা তোমার হৃদয়ঙ্গম করিতেছি।

শিষ্য। এক্ষণে প্রহ্লাদচরিত্র শুনিতে বাসনা করি।

গুরু। প্রহ্লাদচরিত্র সবিস্তারে বলিবার আমার ইচ্ছাও নাই, প্রয়োজন নাই। তবে একটা কথা এই প্রহ্লাদচরিত্রে বুঝাইতে চাই। আমি বলিয়াছি যে, কেবল, হা ঈশ্বর! যো ঈশ্বর! করিয়া বেড়াইলে ভক্তি হইল না। যে আত্মজয়ী, সর্ব্বভূতকে

* অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ, উদাসীনো গতব্যথঃ।

আপনার মত দেখিয়া সর্ব্বজনের হিতে রত, শত্রু মিত্রে সমদর্শী, নিষ্কাম কর্ম্মী—সে-ই ভক্ত। এই কথা ভগবদ্‌গীতায় উক্ত হইয়াছে দেখাইয়াছি। এই প্রহ্লাদ তাহার উদাহরণ। ভগবদ্‌গীতায় যাহা উপদেশ, বিষ্ণুপুরাণে তাহা উপন্যাসচ্ছলে স্পষ্টীকৃত। গীতায় ভক্তের যে সকল লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহা যদি তুমি বিস্মৃত হইয়া থাক, সেই জন্য তোমাকে উহা আর একবার শুনাইতেছি।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ গীতা ১২।১৩-২০

প্রথমেই প্রহ্লাদকে "সর্ব্বত্র সমদৃগ্‌বশী" বলা হইয়াছে।

সমচেতা জগত্যস্মিন্ যঃ সর্ব্বেষ্বেব জন্তুষু।
যথাত্মনি তথান্যত্র পরং মৈত্রগুণান্বিতঃ॥
ধর্ম্মাত্মা সত্যশৌচাদিগুণানামাকরস্তথা।
উপমানমশেষাণাং সাধূনাং যঃ সদাভবৎ॥

কিন্তু কথায় গুণবাদ করিলে কিছু হয় না, কার্য্যতঃ দেখাইতে হয়। প্রহ্লাদের প্রথম কার্য্যে দেখি, তিনি সত্যবাদী। সত্যে তাঁহার এতটা দার্ঢ্য যে, কোন প্রকার ভয়ে ভীত হইয়া তিনি সত্য পরিত্যাগ করেন না। গুরুগৃহ হইতে তিনি পিতৃসমীপে আনীত হইলে, হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি শিখিয়াছ? তাহার সার বল দেখি?"

প্রহ্লাদ বলিলেন, "যাহা শিখিয়াছি, তাহার সার এই যে, যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই—যাঁহার বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই—যিনি অচ্যুত, মহাত্মা, সর্ব্বকারণের কারণ, তাঁহাকে নমস্কার।"

শুনিয়া বড় ক্রুদ্ধ হইয়া হিরণ্যকশিপু আরক্ত লোচনে, কম্পিতাধরে প্রহ্লাদের গুরুকে ভর্ৎসনা করিলেন। গুরু বলিল, "আমার দোষ নাই, আমি এ সব শিখাই নাই।"

তখন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে কে শিখাইল রে?"

প্রহ্লাদ বলিলেন, "পিতঃ! যে বিষ্ণু এই অনন্ত জগতের শাস্তা, যিনি আমার হৃদয়ে স্থিত, সেই পরমাত্মা ভিন্ন আর কে শিখায়?"

হিরণ্যকশিপু বলিলেন, "জগতের ঈশ্বর আমি; বিষ্ণু কে রে দুর্ব্বুদ্ধি!"

প্রহ্লাদ বলিলেন, "যাঁহার পরংপদ শব্দে ব্যক্ত করা যায় না, যাঁহার পরংপদ যোগীরা ধ্যান করে, যাঁহা হইতে বিশ্ব, এবং যিনিই বিশ্ব, সেই বিষ্ণু পরমেশ্বর।"

হিরণ্যকশিপু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "মরিবার ইচ্ছা করিয়াছিস্ যে, পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিতেছিস্? পরমেশ্বর কাহাকে বলে জানিস্ না? আমি থাকিতে আবার তোর পরমেশ্বর কে?"

নির্ভীক প্রহ্লাদ বলিলেন, "পিতঃ, তিনি কি কেবল আমারই পরমেশ্বর! সকল জীবেরও তিনিই পরমেশ্বর,—তোমারও তিনি পরমেশ্বর, ধাতা, বিধাতা, পরমেশ্বর! রাগ করিও না, প্রসন্ন হও।"

হিরণ্যকশিপু বলিলেন, "বোধ হয়, কোন পাপাশয় এই দুর্ব্বুদ্ধি বালকের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে!"

প্রহ্লাদ বলিলেন, "কেবল আমার হৃদয়ে কেন? তিনি সকল লোকেতেই অধিষ্ঠান করিতেছেন। সেই সর্ব্বস্বামী বিষ্ণু, আমাকে, তোমাকে, সকলকে সকল কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছেন।"

এখন, সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ কর। "যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়"* দৃঢ়নিশ্চয় কেন, তাহা বুঝিলে? সেই "হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ" স্মরণ কর। এখন, ভয় হইতে মুক্ত যে ভক্ত, সে কি প্রকার তাহা বুঝিলে? "ময্যর্পিতমনোবুদ্ধিঃ" কি বুঝিলে?† ভক্তের সেই সকল লক্ষণ বুঝাইবার জন্য এই প্রহ্লাদচরিত্র কহিতেছি।

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে তাড়াইয়া দিলেন, প্রহ্লাদ আবার গুরুগৃহে গেলেন। অনেক কালের পর আবার আনাইয়া অধীত বিদ্যার আবার পরীক্ষা লইতে বসিলেন। প্রথম উত্তরেই প্রহ্লাদ আবার সেই কথা বলিল,

কারণং সকলস্যাস্য স নো বিষ্ণুঃ প্রসীদতু।

হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে মারিয়া ফেলিতে হুকুম দিলেন। শত শত দৈত্য তাঁহাকে কাটিতে আসিল, কিন্তু প্রহ্লাদ "দৃঢ়নিশ্চয়", "ঈশ্বরার্পিতমনোবুদ্ধি"—যাহারা মারিতে আসিল, প্রহ্লাদ তাহাদিগকে বলিল, "বিষ্ণু তোমাদের অস্ত্রেও আছেন, আমাতেও আছেন, এই সত্যানুসারে আমি তোমাদের অস্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত হইব না।" ইহাই "দৃঢ়নিশ্চয়"।

শিষ্য। জানি যে, বিষ্ণুপুরাণের উপন্যাসে আছে যে, প্রহ্লাদ অস্ত্রের আঘাতে অক্ষত রহিলেন। কিন্তু উপন্যাসেই এমন কথা থাকিতে পারে,—যথার্থ এমন ঘটনা হয় না। যে যেমন ইচ্ছা ঈশ্বরভক্ত হউক, নৈসর্গিক নিয়ম তাহার কাছে নিষ্ফল হয় না—অস্ত্রে পরমভক্তেরও মাংস কাটে।

গুরু। অর্থাৎ তুমি Miracle মান না। কথাটা পুরাতন। আমি তোমাদের মত ঈশ্বরের শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিতে সম্মত নহি। বিষ্ণুপুরাণে যেরূপে প্রহ্লাদের রক্ষা কথিত হইয়াছে, ঠিক সেই রূপ ঘটিতে দেখা যায় না বটে, আর উপন্যাস বলিয়াই সেই বর্ণনা সম্ভবপর হইয়াছে, ইহাও স্বীকার করি। কিন্তু একটি নৈসর্গিক নিয়মের দ্বারা

---

* সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।

† ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।

ঈশ্বরানুকম্পায় নিয়মান্তরের অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রতিষেধ যে ঘটিতে পারে না, এমত কথা তুমি বলিতে পার না। অস্ত্রে পরম ভক্তেরও মাংস কাটে, কিন্তু ভক্ত ঈশ্বরানুকম্পায় আপনার বল বা বুদ্ধি এরূপে প্রযুক্ত করিতে পারে যে, অস্ত্র নিষ্ফল হয়। বিশেষ, যে ভক্ত, সে "দক্ষ"; ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, তাহার সকল বৃত্তিগুলি সম্পূর্ণ অনুশীলিত, সুতরাং সে অতিশয় কার্য্যক্ষম; ইহার উপর ঈশ্বরানুগ্রহ পাইলে সে যে নৈসর্গিক নিয়মের সাহায্যেই অতিশয় বিপন্ন হইয়াও আত্মরক্ষা করিতে পারিবে, ইহা অসম্ভব কি?* যাহাই হউক, এ সকল কথায় আমাদিগের কোন প্রয়োজন এক্ষণে দেখা যাইতেছে না,—কেন না, আমি ভক্তি বুঝাইতেছি, ভক্ত কি প্রকারে ঈশ্বরানুগ্রহ প্রাপ্ত হন, বা হন কি না, তাহা বুঝাইতেছি না। এরূপ কোন ফলই ভক্তের কামনা করা উচিত নহে,—তাহা হইলে তাঁহার ভক্তি নিষ্কাম হইবে না।

শিষ্য। কিন্তু প্রহ্লাদ ত এখানে রক্ষা কামনা করিলেন—

গুরু। না, তিনি রক্ষা কামনা করেন নাই। তিনি কেবল ইহাই মনে স্থির বুঝিলেন যে, যখন আমার আরাধ্য বিষ্ণু আমাতেও আছেন, এই অস্ত্রেও আছেন, তখন এ অস্ত্রে কখন আমার অনিষ্ট হইবে না। সেই দৃঢ়নিশ্চয়তাই আরও স্পষ্ট হইতেছে। কেবল ইহাই বুঝান আমার উদ্দেশ্য। প্রহ্লাদচরিত্র যে উপন্যাস, তদ্বিষয়ে সংশয় কি? সে উপন্যাসে নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক কথা আছে, তাহাতে কি আসিয়া যায়? উপন্যাসে এরূপ অনৈসর্গিক কথা থাকিলে ক্ষতি কি? অর্থাৎ যেখানে উপন্যাসকারের উদ্দেশ্য মানস ব্যাপারের বিবরণ, জড়ের গুণ ব্যাখ্যা নহে, তখন জড়ের অপ্রকৃত ব্যাখ্যা থাকিলে মানস ব্যাপারের ব্যাখ্যা অস্পষ্ট হয় না। বরং অনেক সময় অধিকতর স্পষ্ট হয়। এই জন্য জগতের শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যে অনেকেই অতিপ্রকৃতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

তার পর অস্ত্রে প্রহ্লাদ মরিল না দেখিয়া, হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বলিলেন, "ওরে দুর্ব্বুদ্ধি, এখনও শত্রুস্তুতি হইতে নিবৃত্ত হ! বড় মূর্খ হইস্ না, আমি এখনও তোকে অভয় দিতেছি।"

অভয়ের কথা শুনিয়া প্রহ্লাদ বলিল, "যিনি সকল ভয়ের অপহারী, যাঁহার স্মরণে জন্ম জরা যম প্রভৃতি সকল ভয়ই দূর হয়, সেই অনন্ত ঈশ্বর হৃদয়ে থাকিতে আমার ভয় কিসের?"

সেই "ভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো" কথা মনে কর। তার পর হিরণ্যকশিপু, সর্পগণকে আদেশ করিলেন যে, উহাকে দংশন কর। কথাটা উপন্যাস, সুতরাং এরূপ বর্ণনায় ভরসা করি, তুমি বিরক্ত হইবে না। সাপের কামড়ে প্রহ্লাদ মরিল না,—সে কথাও তোমার বিশ্বাস করিয়া কাজ নাই! কিন্তু যে কথার জন্য পুরাণকার এই সর্পদংশন-বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তৎপ্রতি মনোযোগ কর—

স ত্বাসক্তমতিঃ কৃষ্ণে দশ্যমানো মহোরগৈঃ।
ন বিবেদাত্মনো গাত্রং তৎস্মৃত্যাহ্লাদসংস্থিতঃ॥

* ঠিক এই কথাটি প্রতিপন্ন করিবার জন্য সিপাহী হস্ত হইতে দেবী চৌধুরাণীর উদ্ধার বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। সময়ে মেঘোদয় ঈশ্বরের অনুগ্রহ; অবশিষ্ট ভক্তের নিজের দক্ষতা। দেবী চৌধুরাণীর সঙ্গে পাঠক এই ভক্তিব্যাখ্যা মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

প্রহ্লাদের মন কৃষ্ণে তখন এমন আসক্ত যে, মহাসর্প সকল দংশন করিতেছে, তথাপি কৃষ্ণস্মৃতির আহ্লাদে তিনি ব্যথা কিছুই জানিতে পারিলেন না। এই আহ্লাদের জন্য সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান হয়। সেই ভগবদ্বাক্য আবার স্মরণ কর "সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।" "ক্ষমী" কি, পরে বুঝিবে, এখন "সমদুঃখসুখ" বুঝিলে?

শিষ্য। বুঝিলাম এই যে, ভক্তের মনে বড় একটা ভারি সুখ রাত্রি দিন রহিয়াছে বলিয়া, অন্য সুখ দুঃখ, সুখ দুঃখ বলিয়াই বোধ হয় না।

গুরু। ঠিক তাই। সর্প কর্তৃক প্রহ্লাদ বিনষ্ট হইল না, দেখিয়া হিরণ্যকশিপু মত্ত হস্তিগণকে আদেশ করিলেন যে, উহাকে দাঁতে ফাড়িয়া মারিয়া ফেল। হস্তীদিগের দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল, প্রহ্লাদের কিছুই হইল না; বিশ্বাস করিও না—উপন্যাস মাত্র। কিন্তু তাহাতে প্রহ্লাদ পিতাকে কি বলিলেন শুন,—

দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ
শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ।
মহাবিপৎপাপবিনাশনোঽয়ং
জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ॥

"কুলিশাগ্রকঠিন এই সকল গজদন্ত যে ভাঙ্গিয়া গেল, ইহা আমার বল নহে। যিনি মহাবিপৎ ও পাপের বিনাশন, তাঁহারই স্মরণে হইয়াছে।"

আবার সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ কর "নির্ম্মমো নিরহঙ্কার" ইত্যাদি।* ইহাই নিরহঙ্কার। ভক্ত জানে যে, সকলই ঈশ্বর করিতেছেন, এই জন্য ভক্ত নিরহঙ্কার।

হস্তী হইতে প্রহ্লাদের কিছু হইল না দেখিয়া হিরণ্যকশিপু আগুনে পোড়াইতে আদেশ করিলেন। প্রহ্লাদ আগুনেও পুড়িল না। প্রহ্লাদ "শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ," তাই প্রহ্লাদের সে আগুন পদ্মপত্রের ন্যায় শীতল বোধ হইল।† তখন দৈত্যপুরোহিত ভার্গবেরা দৈত্যপতিকে বলিলেন যে, "ইহাকে আপনি ক্ষমা করিয়া আমাদের জিম্মা করিয়া দিন। তাহাতেও যদি এ বিষ্ণুভক্তি পরিত্যাগ না করে, তবে আমরা অভিচারের দ্বারা ইহাকে বধ করিব। আমাদের কৃত অভিচার কখন বিফল হয় না।"

দৈত্যেশ্বর এই কথায় সম্মত হইলে, ভার্গবেরা প্রহ্লাদকে লইয়া গিয়া, অন্যান্য দৈত্যগণের সঙ্গে পড়াইতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ সেখানে নিজে একটি ক্লাস খুলিয়া বসিলেন। এবং দৈত্যপুত্রগণকে একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে বিষ্ণুভক্তিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তি আর কিছুই নহে—পরহিতব্রত মাত্র—

বিস্তারঃ সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোর্ব্বিশ্বমিদং জগৎ।
দ্রষ্টব্যমাত্মবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ॥

* * *

সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য॥

অর্থাৎ বিশ্ব, জগৎ, সর্ব্বভূত, বিষ্ণুর বিস্তার মাত্র; বিচক্ষণ ব্যক্তি এই জন্য সকলকে

* নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী। † শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিব

আপনার সঙ্গে অভেদ দেখিবেন। * * হে দৈত্যগণ! তোমরা সর্ব্বত্র সমান দেখিও, এই সমত্ব (আপনার সঙ্গে সর্ব্বভূতের) ঈশ্বরের আরাধনা।

প্রহ্লাদের উক্তি বিষ্ণুপুরাণ হইতে তোমাকে পড়িতে অনুরোধ করি। এখন কেবল আর দুইটি শ্লোক শুন।

অথ ভদ্রাণি ভূতাণি হীনশক্তিরহং পরম্।
মুদং তথাপি কুর্ব্বীত হানির্দ্বেষফলং যতঃ॥
বদ্ধবৈরাণি ভূতাণি দ্বেষং কুর্ব্বন্তি চেত্ততঃ।
শোচ্যান্যহোঽতিমোহেন ব্যাপ্তানীতি মনীষিণা॥

"অন্যের মঙ্গল হইতেছে, আপনি হীনশক্তি, ইহা দেখিয়াও আহ্লাদ করিও, দ্বেষ করিও না; কেন না, দ্বেষে অনিষ্টই হইয়া থাকে। যাহাদের সঙ্গে শত্রুতাবদ্ধ হইয়াছে, তাহাদেরও যে দ্বেষ করে, সে অতি মোহেতে ব্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞানীরা দুঃখ করেন।"

এখন সেই ভগবদ্ভক্ত লক্ষণ মনে কর।

"যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ" এবং 'ন দ্বেষ্টি'* শব্দ মনে কর। ভগবদ্বাক্যে পুরাণকর্ত্তার কৃত এই টীকা।

প্রহ্লাদ আবার বিষ্ণুভক্তির উপদ্রব করিতেছে জানিয়া হিরণ্যকশিপু তাহাকে বিষ পান করাইতে আজ্ঞা দিলেন। বিষেও প্রহ্লাদ মরিল না। তখন দৈত্যেশ্বর পুরোহিত-গণকে ডাকাইয়া অভিচার-ক্রিয়ার দ্বারা প্রহ্লাদের সংহার করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা প্রহ্লাদকে একটু বুঝাইলেন; বলিলেন—তোমার পিতা জগতের ঈশ্বর, তোমার অনন্তে কি হইবে? প্রহ্লাদ "স্থিরমতি"†; প্রহ্লাদ তাঁহাদিগকে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। তখন দৈত্য পুরোহিতেরা ভয়ানক অভিচার ক্রিয়ার সৃষ্টি করিলেন। অগ্নিময়ী মূর্ত্তিমতী অভিচার-ক্রিয়া প্রহ্লাদের হৃদয়ে শূলাঘাত করিল। প্রহ্লাদের হৃদয়ে শূল ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সেই মূর্ত্তিমান্ অভিচার, নিরপরাধ প্রহ্লাদের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া অভিচারকারী পুরোহিতদিগকেই ধ্বংস করিতে গেল। তখন প্রহ্লাদ "হে কৃষ্ণ! হে অনন্ত! ইহাদের রক্ষা কর" বলিয়া সেই দহ্যমান পুরোহিতদিগের রক্ষার জন্য ধাবমান হইলেন। ডাকিলেন, "হে সর্ব্বব্যাপিন্, হে জগৎস্বরূপ, হে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, হে জনার্দ্দন! এই ব্রাহ্মণগণকে এই দুঃসহ মন্ত্রাগ্নি হইতে রক্ষা কর! যেমন সকল ভূতে সর্ব্বব্যাপী, জগদ্গুরু, বিষ্ণু তুমি আছ, তেমনই এই ব্রাহ্মণেরা জীবিত হউক। বিষ্ণু সর্ব্বগত বলিয়া যেমন অগ্নিকে আমি শত্রুপক্ষ বলিয়া ভাবি নাই, এ ব্রাহ্মণেরাও তেমনি—ইহারাও জীবিত হোক। যাহারা আমাকে মারিতে আসিয়াছিল, যাহারা বিষ দিয়াছিল, যাহারা আমাকে আগুনে পোড়াইয়াছিল, হাতীর দ্বারা আমাকে আহত করিয়াছিল, সাপের দ্বারা দংশিত করিয়াছিল, আমি তাহাদের মিত্রভাবে আমার সমান দেখিয়াছিলাম, শত্রু মনে করি নাই, আজ সেই সত্যের হেতু এই পুরোহিতেরা

* যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
† অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ।

জীবিত হউক।" তখন ঈশ্বরকৃপায় পুরোহিতেরা জীবিত হইয়া, প্রহ্লাদকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে গমন করিল।

এমন আর কখন শুনিব কি? তুমি ইহার অপেক্ষা উন্নত ভক্তিবাদ, ইহার অপেক্ষা উন্নত ধর্ম্ম অন্য কোন দেশের কোন শাস্ত্রে দেখাইতে পার? *

শিষ্য। আমি স্বীকার করি, দেশীয় গ্রন্থসকল ত্যাগ করিয়া কেবল ইংরাজী পড়ায় আমাদিগের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে।

গুরু। এখন ভগবদ্গীতায় যে ভক্ত ক্ষমাশীল এবং শত্রু মিত্রে তুল্যজ্ঞানী বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা কি প্রকার তাহা বুঝিলে? †

পরে, হিরণ্যকশিপু পুত্রের প্রভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এই প্রভাব কোথা হইতে হইল?" প্রহ্লাদ বলিলেন, "অচ্যুত হরি যাহাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাহাদের এইরূপ প্রভাব হইয়া থাকে। যে অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করে না—কারণাভাববশতঃ তাহারও অনিষ্ট হয় না। যে কর্ম্মের দ্বারা, মনে বা বাক্যে পরপীড়ন করে, তাহার সেই বীজে প্রভূত অশুভ ফলিয়া থাকে।

"কেশব আমাতেও আছেন, সর্ব্বভূতেও আছেন, ইহা জানিয়া আমি কাহারও মন্দ ইচ্ছা করি না, কাহারও মন্দ করি না, কাহাকেও মন্দ বলি না। আমি সকলের শুভ চিন্তা করি, আমার শারীরিক বা মানসিক, দৈব বা ভৌতিক অশুভ কেন ঘটিবে? হরি সর্ব্বময় জানিয়া সর্ব্বভূতে এইরূপ অব্যভিচারিণী ভক্তি করা পণ্ডিতের কর্ত্তব্য।"

ইহার অপেক্ষা উন্নত ধর্ম্ম আর কি হইতে পারে? বিদ্যালয়ে এ সকল না পড়াইয়া, পড়ায় কি না—মেকলে প্রণীত ক্লাইভ ও হেষ্টিংস সম্বন্ধীয় পাপপূর্ণ উপন্যাস। আর সেই উচ্চ শিক্ষার জন্য আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলী উন্মত্ত।

পরে, প্রহ্লাদের বাক্যে পুনশ্চ ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যপতি তাহাকে প্রাসাদ হইতে নিক্ষিপ্ত করিয়া, শম্বরাসুরের মায়ার দ্বারা ও বায়ুর দ্বারা প্রহ্লাদের বিনাশের চেষ্টা করিলেন। প্রহ্লাদ সে সকলে বিনষ্ট না হইলে, নীতিশিক্ষার জন্য তাহাকে পুনশ্চ গুরুগৃহে পাঠাইলেন। সেখানে নীতিশিক্ষা সমাপ্ত হইলে আচার্য্য প্রহ্লাদকে সঙ্গে করিয়া দৈত্যেশ্বরের নিকট লইয়া আসিলেন। দৈত্যেশ্বর পুনশ্চ তাহার পরীক্ষার্থ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন,—

"হে প্রহ্লাদ! মিত্রের ও শত্রুর প্রতি ভূপতি কিরূপ ব্যবহার করিবেন? তিনি সময়ে কিরূপ আচরণ করিবেন? মন্ত্রী বা অমাত্যের সঙ্গে বাহ্যে এবং অভ্যন্তরে,—চর, চৌর, শঙ্কিতে এবং অশঙ্কিতে,—সন্ধি বিগ্রহে, দুর্গ ও আটবিক সাধনে বা কণ্টকশোধনে —কিরূপ করিবেন, তাহা বল।"

প্রহ্লাদ পিতৃপদে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "গুরু সে সব কথা শিখাইয়াছেন বটে,

---

* মনস্বী শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার স্বপ্রণীত "Oriental Christ" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "A suppliant for mercy on behalf of those very men who put him to death, he said—'Father! forgive them, for they know not what they do.' Can ideal forgiveness go any further?" *Ideal* যায় বৈ কি, এই প্রহ্লাদচরিত্র দেখুন না।

† সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।

আমিও শিখিয়াছি। কিন্তু সে সকল নীতি আমার মনোমত নহে। শত্রু মিত্রের সাধন-জন্য সাম দান ভেদ দণ্ড, এই সকল উপায় কথিত হইয়াছে, কিন্তু পিতঃ! রাগ করিবেন না, আমি ত সেরূপ শত্রু মিত্র দেখি না। যেখানে সাধ্য নাই,* সেখানে সাধনের কি প্রয়োজন! যখন জগন্ময় জগন্নাথ পরমাত্মা গোবিন্দ সর্ব্বভূতাত্মা, তখন আর শত্রু মিত্র কে? তোমাতে ভগবান্ আছেন, আমাতে আছেন, আর সকলেও আছেন, তখন এই ব্যক্তি মিত্র, আর এই শত্রু, এমন করিয়া পৃথক্ ভাবিব কি প্রকারে? অতএব দুষ্ট-চেষ্টা-বিধি-বহুল এই নীতিশাস্ত্রে কি প্রয়োজন?"

হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহ্লাদের বক্ষস্থলে পদাঘাত করিলেন। এবং প্রহ্লাদকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে অসুরগণকে আদেশ করিলেন। অসুরেরা প্রহ্লাদকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া পর্ব্বত চাপা দিল। প্রহ্লাদ তখন জগদীশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব করিতে লাগিলেন, কেন না, অন্তিম কালে ঈশ্বরচিন্তা বিধেয়; কিন্তু ঈশ্বরের কাছে আত্মরক্ষা প্রার্থনা করিলেন না; কেন না, প্রহ্লাদ নিষ্কাম। প্রহ্লাদ ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া, তাঁহার ধ্যান করিতে করিতে তাঁহাতে লীন হইলেন। প্রহ্লাদ যোগী।† তখন তাঁহার নাগপাশ খসিয়া গেল, সমুদ্রের জল সরিয়া গেল; পর্ব্বতসকল দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রহ্লাদ গাত্রোত্থান করিলেন। তখন প্রহ্লাদ আবার বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন,—আত্মরক্ষার জন্য নহে, নিষ্কাম হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু তখন তাঁহাকে দর্শন দিলেন। এবং ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। প্রহ্লাদ "সন্তুষ্টঃ সততং," সুতরাং তাঁহার জগতে প্রার্থনীয় কিছুই নাই। অতএব তিনি কেবল চাহিলেন যে, "যে সহস্র যোনিতে আমি পরিভ্রমণ করিব, সে সকল জন্মেই যেন তোমার প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে।" ভক্ত ভক্তিই প্রার্থনা করে, ভক্তির জন্য ভক্তি প্রার্থনা করে, মুক্তির জন্য বা অন্য ইষ্টসাধনের জন্য নহে।

ভগবান্ কহিলেন, "তাহা আছে ও থাকিবে। অন্য বর দিব, প্রার্থনা কর।"

প্রহ্লাদ দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করিলেন, "আমি তোমার স্তুতি করিয়াছিলাম বলিয়া পিতা আমার যে দ্বেষ করিয়াছিলেন, তার সেই পাপ ক্ষালিত হউক।"

ভগবান্ তাহাও স্বীকার করিয়া, তৃতীয় বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু নিষ্কাম প্রহ্লাদের জগতে আর তৃতীয় প্রার্থনা ছিল না; কেন না, তিনি সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী,—হর্ষ, দ্বেষ, শোক, আকাঙ্ক্ষাশূন্য, শুভাশুভপরিত্যাগী।"‡ তিনি আবার চাহিলেন, "তোমার প্রতি আমার ভক্তি যেন অব্যভিচারিণী থাকে।"

বর দিয়া বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। তার পর হিরণ্যকশিপু আর প্রহ্লাদের উপর অত্যাচার করেন নাই।

* অর্থাৎ যখন পৃথিবীতে কাহাকেও শত্রু মনে করা উচিত নহে।

† সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।

‡ সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥

শিষ্য। তুলামানে এক দিকে বেদ, নিখিল ধর্ম্মশাস্ত্র, বাইবেল, কোরাণ আর এক দিকে প্রহ্লাদচরিত্র রাখিলে প্রহ্লাদচরিত্রই গুরু হয়।

গুরু। প্রহ্লাদকথিত এই বৈষ্ণব ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ইহা ধর্ম্মের সার, সুতরাং সকল বিশুদ্ধ ধর্ম্মেই আছে। যে পরিমাণে ধর্ম্ম বিশুদ্ধ, ইহা সেই পরিমাণে সেই ধর্ম্মে আছে। খৃষ্টধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম এই বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্তর্গত। গড্ বলি, আল্লা বলি, ব্রহ্ম বলি, সেই এক জগন্নাথ বিষ্ণুকেই ডাকি। সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মাস্বরূপ জ্ঞান ও আনন্দময় চৈতন্যকে যে জানিয়াছে, সর্ব্বভূতে যাহার আত্মজ্ঞান আছে, যে অভেদী, অথবা সেইরূপ জ্ঞান ও চিত্তের অবস্থা প্রাপ্তিতে যাহার যত্ন আছে, সেই বৈষ্ণব ও সেই হিন্দু। তদ্ভিন্ন যে কেবল লোকের দ্বেষ করে, লোকের অনিষ্ট করে, পরের সঙ্গে বিবাদ করে, লোকের কেবল জাতি মারিতেই ব্যস্ত, তাহার গলায় গোচ্ছা করা পৈতা, কপালে কপালজোড়া ফোঁটা, মাথায় টিকি, এবং গায়ে নামাবলি ও মুখে হরিনাম থাকিলেও, তাহাকে হিন্দু বলিব না। সে ম্লেচ্ছের অধিক ম্লেচ্ছ, তাহার সংস্পর্শে থাকিলেও হিন্দুর হিন্দুয়ানি যায়।

বিংশতিতম অধ্যায়—ভক্তি

ভক্তির সাধন

শিষ্য। এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাস্য যে, আপনার নিকট যে ভক্তির ব্যাখ্যা শুনিলাম, তাহা সাধন, না সাধ্য ?

গুরু। ভক্তি, সাধন ও সাধ্য। ভক্তি মুক্তিপ্রদা, এজন্য ভক্তি সাধন। আর ভক্তি মুক্তিপ্রদা হইলেও মুক্তি বা কিছুই কামনা করে না, এজন্য ভক্তিই সাধ্য।

শিষ্য। তবে, এই ভক্তির সাধন কি, শুনিতে ইচ্ছা করি। ইহার অনুশীলন প্রথা কি ? উপাসনাই ভক্তির সাধন বলিয়া চিরপ্রথিত, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা যদি যথার্থ হয়, তবে ইহাতে উপাসনার কোন স্থান দেখিতেছি না।

গুরু। উপাসনার যথেষ্ট স্থান আছে, কিন্তু উপাসনা কথাটা অনেক প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, ইহাতে গোলযোগ হইতে পারে বটে। সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বর-মুখী করিবার যে চেষ্টা, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাসনা আর কি হইতে পারে ? তুমি অনুদিন সমস্ত কার্য্যে ঈশ্বরকে আন্তরিক চিন্তা না করিলে কখনই তাহা পারিবে না।

শিষ্য। তথাপি হিন্দুশাস্ত্রে এই ভক্তির অনুশীলনের কি প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। আপনি যে ভক্তিতত্ত্ব বুঝাইলেন, তাহা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ভক্তি হইলেও হিন্দুদিগের মধ্যে বিরল। হিন্দুর মধ্যে ভক্তি আছে ; কিন্তু সে আর এক রকমের। প্রতিমা গড়িয়া, তাহার সম্মুখে যোড়হাত করিয়া, পট্টবস্ত্র গলদেশে দিয়া গদ্গদভাবে অশ্রুমোচন, "হরি ! হরি !" বা "মা ! মা !" ইত্যাদি শব্দে উচ্চতর গোলযোগ, অথবা রোদন, এবং প্রতিমার চরণামৃত পাইলে তাহা মাথায় মুখে, চোখে, নাকে, কাণে,—

গুরু। তুমি যাহা বলিতেছ, বুঝিয়াছি। উহাও চিত্তের উন্নত অবস্থা, উহাকে

উপহাস করিও না। তোমার হক্সলী, টিণ্ডল অপেক্ষা ওরূপ এক জন ভাবুক আমার শ্রদ্ধার পাত্র। তুমি গৌণ ভক্তির কথা তুলিতেছ।

শিষ্য। আপনার পূর্ব্বকার কথায় ইহাই বুঝিয়াছি যে, ইহাকে আপনি ভক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না।

গুরু। ইহা মুখ্য ভক্তি নহে, কিন্তু গৌণ বা নিকৃষ্ট ভক্তি বটে। যে সকল হিন্দুশাস্ত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক, ইহাতে সে সকল পরিপূর্ণ।

শিষ্য। গীতাদি প্রাচীন শাস্ত্রে মুখ্য ভক্তিতত্ত্বেরই প্রচার থাকাতেও আধুনিক শাস্ত্রে গৌণ ভক্তি কি প্রকারে আসিল ?

গুরু। ভক্তি জ্ঞানাত্মিকা, এবং কর্ম্মাত্মিকা, ভরসা করি, ইহা বুঝিয়াছ। ভক্তি উভয়াত্মিকা বলিয়া, তাহার অনুশীলনে মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরে সমর্পিত করিতে হয়। সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করিতে হয়। যখন ভক্তি কর্ম্মাত্মিকা এবং কর্ম্ম সকলই ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হয়, তখন কাজেই কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলই ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, যাহা জগতে অনুষ্ঠেয় অর্থাৎ ঈশ্বরানুমোদিত কর্ম্ম, তাহাতে শারীরিক বৃত্তির নিয়োগ হইলেই ঐ বৃত্তি ঈশ্বরমুখী হইল। কিন্তু অনেক শাস্ত্রকারেরা অন্যরূপ বুঝিয়াছেন। কি ভাবে তাঁহারা কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে চান, তাহার উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি শ্লোক ভাগবতপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। হরিনামের কথা হইতেছে,—

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃন্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ॥
ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্টমপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দং।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা॥
বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ননিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ॥
জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুন্ ন জাতু মর্ত্যোভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধং॥
তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥

ভাগবত, ২ স্ক, ৩ অ, ২০—২৪।

"যে মনুষ্য কর্ণপুটে হরিগুণানুবাদ শ্রবণ না করে, হায়! তাহার কর্ণ দুইটি বৃথা গর্ত্ত মাত্র। হে সূত! যে হরিগাথা গান না করে, তাহার অসতী জিহ্বা ভেকজিহ্বাতুল্যা। যাহার মস্তক মুকুন্দকে নমস্কার না করে, তাহা পট্ট-কিরীট-শোভিত হইলেও বোঝা মাত্র। যাহার হস্তদ্বয় হরির সপর্য্যা না করে, তাহা কনককঙ্কণে শোভিত হইলেও মড়ার হাত মাত্র। মনুষ্যদিগের চক্ষুর্দ্বয় যদি বিষ্ণুমূর্ত্তি* নিরীক্ষণ না করে, তবে তাহা

* এখানে "লিঙ্গানি বিষ্ণোঃ" অর্থে বিষ্ণুর মূর্ত্তিসকল। অতি সঙ্গত অর্থ। তবে শিবলিঙ্গের কেবল সেই অর্থ না করিয়া, কদর্য্য উপন্যাস ও উপাসনাপদ্ধতিতে যাই কেন?

ময়ূরপুচ্ছ মাত্র। আর যে চরণদ্বয় হরিতীর্থে পর্য্যটন না করে, তাহার বৃক্ষজন্ম লাভ হইয়াছে মাত্র। আর যে ভগবৎপদরেণু ধারণ না করে, সে জীবদ্দশাতেই শব। বিষ্ণু পাদার্পিত তুলসীর গন্ধ যে মনুষ্য না জানিয়াছে, সে বিশ্বাস থাকিতেও শব। হায়! হরিনামকীর্ত্তনে যাহার হৃদয় বিকারপ্রাপ্ত না হয়, এবং বিকারেও যাহার চক্ষে জল ও গাত্রে রোমাঞ্চ না হয়, তাহার হৃদয় লৌহময়।"

এই শ্রেণীর ভক্তেরা এইরূপে ঈশ্বরে বাহ্যেন্দ্রিয় সমর্পণ করিতে চাহেন। কিন্তু ইহা সাকারোপাসনাসাপেক্ষ। নিরাকারে চক্ষুপাণিপাদের এরূপ নিয়োগ অঘটনীয়।

শিষ্য। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও পাই নাই। ভক্তির প্রকৃত সাধন কি?

গুরু। তাহা ভগবান্ গীতার সেই দ্বাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন,—

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং॥
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥ ১২। ৬—৮

"হে অর্জ্জুন! যাহারা সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে ন্যস্ত করিয়া মৎপরায়ণ হয়, এবং অন্য ভজনা-রহিত যে ভক্তিযোগ, তদ্দ্বারা আমার ধ্যান ও উপাসনা করে, মৃত্যুযুক্ত সংসার হইতে সেই আমাতে নিবিষ্টচেতাদিগের আমি অচিরে উদ্ধারকর্ত্তা হই। আমাতে তুমি মন স্থির কর, আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তাহা হইতে তুমি দেহান্তে আমাতেই অধিষ্ঠান করিবে।"

শিষ্য। বড় কঠিন কথা। এইরূপ ঈশ্বরে চিত্ত নিবিষ্ট করিতে কয়জন পারে?

গুরু। সকলেই পারে। চেষ্টা করিলেই পারে।

শিষ্য। কি প্রকারে চেষ্টা করিতে হইবে?

গুরু। ভগবান্ তাহাও অর্জ্জুনকে বলিয়া দিতেছেন,

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয়॥ ১২। ৯

"হে অর্জ্জুন! যদি আমাতে চিত্ত স্থির করিয়া রাখিতে না পার, তবে অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কর।" অর্থাৎ যদি ঈশ্বরে চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তবে পুনঃ পুনঃ চেষ্টার দ্বারা সেই কার্য্য অভ্যস্ত করিবে।

শিষ্য। অভ্যাস মাত্রই কঠিন, এবং এ গুরুতর অভ্যাস আরও কঠিন। সকলে পারে না। যাহারা না পারে, তাহারা কি করিবে?

গুরু। যাহারা কর্ম্ম করিতে পারে, তাহারা যে কর্ম্ম ঈশ্বরোদ্দিষ্ট বা ঈশ্বরানুমোদিত, সেই সকল কর্ম্ম সর্ব্বদা করিলে ক্রমে ঈশ্বরে মন স্থির হইবে। তাহাই ভগবান্ বলিতেছেন—

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি॥ ১২। ১০

"যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মৎকর্ম্মপরায়ণ হও। আমার জন্য কর্ম্মসকল করিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।"

শিষ্য। কিন্তু অনেকে কর্ম্মেও অপটু—বা অকর্ম্মা। তাহাদের উপায় কি?

গুরু। এই প্রশ্নের আশঙ্কায় ভগবান্ বলিতেছেন,—

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১২। ১১

"যদি মদাশ্রিত কর্ম্মেও অশক্ত হও, তবে যতাত্মা হইয়া সর্ব্বকর্ম্মফল ত্যাগ কর।"

শিষ্য। সে কি? যে কর্ম্মে অক্ষম, যাহার কোন কর্ম্ম নাই, সে কর্ম্মফল ত্যাগ করিবে কি প্রকারে?

গুরু। কোন জীবই একেবারে কর্ম্মশূন্য হইতে পারে না। যে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া কর্ম্ম না করে, ভূততাড়িত হইয়া সেও কর্ম্ম করিবে। এ বিষয়ে ভগবদুক্তি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। যে কর্ম্মই তদ্দ্বারা সম্পন্ন হয়, যদি কর্ম্মকর্ত্তা তাহার ফলাকাঙ্ক্ষা না করে, তবে অন্য কামনাভাবে, ঈশ্বরই একমাত্র কাম্য পদার্থ হইয়া দাঁড়াইবেন। তখন আপনা হইতেই চিত্ত ঈশ্বরে স্থির হইবে।

শিষ্য। এই চতুর্ব্বিধ সাধনই অতি কঠিন। আর ইহার কিছুতেই উপাসনার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না।

গুরু। এই চতুর্ব্বিধ সাধনই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। ঈদৃশ সাধকদিগের পক্ষে অন্যবিধ উপাসনার প্রয়োজন নাই।

শিষ্য। কিন্তু অজ্ঞ, নীচবৃত্ত, কলুষিত, বালক প্রভৃতির এ সকল সাধন আয়ত্ত নহে। তাহারা কি ভক্তির অধিকারী নহে?

গুরু। এই সব স্থলে উপাসনাত্মিকা গৌণ ভক্তির প্রয়োজন। গীতায় ভগবদুক্তি আছে যে,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।

"যে যে-রূপে আমাকে আশ্রয় করে, আমি তাহাকে সেইরূপ ভজনা করি।"

এবং স্থানান্তরে বলিয়াছেন,—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

"যে ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল দেয়, তাহা প্রযতাত্মার ভক্তির উপহার বলিয়া আমি গ্রহণ করি।"

শিষ্য। তবে কি গীতায় সাকার মূর্ত্তির উপাসনা বিহিত হইয়াছে?

গুরু। ফল পুষ্পাদি প্রদান করিতে হইলে, তাহা যে প্রতিমায় অর্পণ করিতে হইবে, এমন কথা নাই। ঈশ্বর সর্ব্বত্র আছেন; যেখানে দিবে, সেইখানে তিনি পাইবেন।

শিষ্য। প্রতিমাদির পূজা বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মে নিষিদ্ধ, না বিহিত?

গুরু। অধিকারভেদে নিষিদ্ধ, এবং বিহিত। তদ্বিষয়ে ভাগবতপুরাণ হইতে কপিলোক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ভাগবতপুরাণে কপিল, ঈশ্বরের অবতার বলিয়া গণ্য। তিনি তাঁহার মাতা দেবহূতীকে নির্গুণ ভক্তিযোগের সাধন বলিতেছেন। এই সাধনের

মধ্যে এক দিকে সর্ব্বভূতে ঈশ্বরচিন্তা, দয়া, মৈত্র, যম নিয়মাদি ধরিয়াছেন, আর এক দিকে প্রতিমা দর্শন, স্পর্শন, পূজাদি ধরিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ এই বলিতেছেন,—

অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনং॥
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥
৩ স্ক। ২৯ অ। ১৭। ১৮

"আমি, সর্ব্বভূতে ভূতাত্মস্বরূপ অবস্থিত আছি। সেই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া (অর্থাৎ সর্ব্বভূতকে অবজ্ঞা করিয়া) মনুষ্য প্রতিমাপূজা বিড়ম্বনা করিয়া থাকে। সর্ব্বভূতে আত্মস্বরূপ ঈশ্বর আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যে প্রতিমা ভজনা করে, সে ভস্মে ঘি ঢালে।"

পুনশ্চ,

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতং॥ ২৯ অ। ২০

যে ব্যক্তি স্বকর্ম্মে রত, সে যত দিন না আপনার হৃদয়ে সর্ব্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তাবৎ প্রতিমাদি পূজা করিবে।

বিধিও রহিল, নিষেধও রহিল। যাহার সর্ব্বজনে প্রীতি নাই, ঈশ্বর জ্ঞান নাই, তাহার প্রতিমাদির অর্চ্চনা বিড়ম্বনা। আর যাহার সর্ব্বজনে প্রীতি জন্মিয়াছে, ঈশ্বর জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহারও প্রতিমাদি পূজা নিষ্প্রয়োজনীয়। তবে যত দিন সে জ্ঞান না জন্মে, তত দিন বিষয়ী লোকের পক্ষে প্রতিমাদি পূজা অবিহিত নহে; কেন না, তদ্দ্বারা ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি জন্মিতে পারে। প্রতিমাপূজা গৌণ ভক্তির মধ্যে।

শিষ্য। গৌণ ভক্তি কাহাকে বলিতেছেন, আমি ঠিক বুঝিতেছি না।

গুরু। মুখ্য ভক্তির অনেক বিঘ্ন আছে। যাহা দ্বারা সেই সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয়, শাণ্ডিল্যসূত্রপ্রণেতা তাহারই নাম দিয়াছেন গৌণ ভক্তি। ঈশ্বরের নামকীর্ত্তন, ফল পুষ্পাদির দ্বার তাঁহার অর্চ্চনা, বন্দন, প্রতিমাদির পূজা—এ সকল গৌণ ভক্তির লক্ষণ। সূত্রের টীকাকার স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, এই সকল অনুষ্ঠান ভক্তিজনক মাত্র; ইহার ফলান্তর নাই।*

শিষ্য। তবে আপনার মত এই বুঝিলাম যে, পূজা, হোম, যজ্ঞ, নামসঙ্কীর্ত্তন, সন্ধ্যা-বন্দনাদি বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মের বিরোধী নহে। তবে উহাতে কোন প্রকার ঐহিক বা পারমার্থিক ফল নাই,—ঐ সকল কেবল ভক্তির সাধন মাত্র।

গুরু। তাহাও নিকৃষ্ট সাধন। উৎকৃষ্ট সাধন, যাহা তোমাকে কৃষ্ণোক্তি উদ্ধৃত করিয়া শুনাইয়াছি। যে তাহাতে অক্ষম, সেই পূজাদি করিবে। তবে স্তুতি বন্দনা প্রভৃতি সম্বন্ধে একটা বিশেষ কথা আছে। যখন কেবল ঈশ্বরচিন্তাই উহার উদ্দেশ্য, তখন উহা মুখ্য ভক্তির লক্ষণ। যথা বিপন্মুক্ত প্রহ্লাদকৃত বিষ্ণুস্তুতি মুখ্য ভক্তি। আর "আমার পাপ

* ভক্ত্যা কীর্ত্তনেন ভক্ত্যা দানেন পরাভক্তিং সাধয়েদিতি * * ন ফলান্তরার্থং গৌরবাদিতি।

ক্ষালিত হউক," "আমার সুখে দিন যাউক," ইত্যাদি সকাম সন্ধ্যাবন্দনা, স্তুতি বা Prayer গৌণভক্তিমধ্যে গণ্য। আমি তোমাকে পরামর্শ দিই যে, কৃষ্ণোক্তির অনুবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরের কর্ম্মতৎপর হও।

শিষ্য। সেও ত পূজা, হোম, যাগ যজ্ঞ—

গুরু। সে আর একটি ভ্রম। এ সকল ঈশ্বরের জন্য কর্ম্ম নহে; এ সকল সাধকের নিজ মঙ্গলোদ্দিষ্ট কর্ম্ম—সাধকের নিজের কার্য্য; ভক্তির বৃদ্ধি জন্যও যদি এ সকল কর, তথাপি তোমার নিজের জন্য হইল। ঈশ্বর জগন্ময়; জগতের কাজই তাঁহার কাজ। অতএব যাহাতে জগতের হিত হয়, সেই সকল কর্ম্মই কৃষ্ণোক্ত "মৎকর্ম্ম"; তাহার সাধনে তৎপর হও, এবং সমস্ত বৃত্তির সম্যক অনুশীলনের দ্বারায় সে সকল সম্পাদনের যোগ্য হও। তাহা হইলে যাঁহার উদ্দিষ্ট সেই সকল কর্ম্ম, তাঁহাতে মন স্থির হইবে। তাহা হইলে ক্রমশঃ জীবন্মুক্ত হইবে। জীবন্মুক্তিই সুখ। বলিয়াছি, "সুখের উপায় ধর্ম্ম।" এই জীবন্মুক্তিসুখের উপায়ই ধর্ম্ম। রাজসম্পদাদি কোন সম্পদেই তত সুখ নাই।

যে ইহা না পারিবে, সে গৌণ উপাসনা অর্থাৎ পূজা, নামকীর্ত্তন, সন্ধ্যাবন্দনাদির দ্বারা ভক্তির নিকৃষ্ট অনুশীলনে প্রবৃত্ত হউক। কিন্তু তাহা করিতে হইলে, অন্তরের সহিত সে সকলের অনুষ্ঠান করিবে। তদ্ব্যতীত ভক্তির কিছুমাত্র অনুশীলন হয় না। কেবল বাহ্যাড়ম্বরে বিশেষ অনিষ্ট জন্মে। উহা তখন ভক্তির সাধন না হইয়া কেবল শঠতার সাধন হইয়া পড়ে। তাহার অপেক্ষা সর্ব্বপ্রকার সাধনের অভাবই ভাল। কিন্তু, যে কোন প্রকার সাধনে প্রবৃত্ত নহে, সে শঠ ও ভণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও, তাহার সঙ্গে পশুগণের প্রভেদ অল্প।

শিষ্য। তবে এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালি হয় ভণ্ড ও শঠ, নয় পশুবৎ।

গুরু। হিন্দুর অবনতির এই একটা কারণ। কিন্তু তুমি দেখিবে, শীঘ্রই বিশুদ্ধ ভক্তির প্রচারে হিন্দু নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমওয়েলের সমকালিক ইংরেজের মত বা মহম্মদের সমকালিক আরবের মত অতিশয় প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিবে।

শিষ্য। কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরের নিকট সেই প্রার্থনা করি।

একবিংশতিতম অধ্যায়—প্রীতি

শিষ্য। এক্ষণে অন্যান্য হিন্দুগ্রন্থের ভক্তিব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। তাহা এই অনুশীলনধর্ম্মের ব্যাখ্যায় প্রয়োজনীয় নহে। ভাগবতপুরাণেও ভক্তিতত্ত্বের অনেক কথা আছে। কিন্তু ভগবদ্গীতাতেই সে সকলের মূল। এইরূপ অন্যান্য গ্রন্থেও যাহা আছে, সেও গীতামূলক। অতএব সে সকলের পর্য্যালোচনায় কালক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল চৈতন্যের ভক্তিবাদ ভিন্ন প্রকৃতির। কিন্তু অনুশীলনধর্ম্মের সহিত সে ভক্তিবাদের সম্বন্ধ তাদৃশ ঘনিষ্ঠ নহে, বরং একটুখানি বিরোধ আছে। অতএব আমি সে ভক্তিবাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না।

শিষ্য। তবে এক্ষণে প্রীতিবৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে উপদেশ দান করুন।

গুরু। ভক্তিবৃত্তির কথা বলিবার সময়ে প্রীতিরও আসল কথা বলিয়াছি। মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই। প্রহ্লাদচরিত্রে প্রহ্লাদোক্তিতে ইহা বিশেষ

বুঝিয়াছ। অন্য ধর্ম্মের এ মত হোক না হোক, হিন্দুধর্ম্মের এই মত। প্রীতির অনুশীলনের দুইটি প্রণালী আছে। একটি প্রাকৃতিক বা ইউরোপীয়, আর একটি আধ্যাত্মিক বা ভারতবর্ষীয়। আধ্যাত্মিক প্রণালীর কথা এখন থাক। আগে প্রাকৃতিক প্রণালী আমি যে রকম বুঝি, তাহা বুঝাইতেছি। প্রীতি দ্বিবিধ, সহজ এবং সংসর্গজ। কতকগুলি মনুষ্যের প্রতি প্রীতি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ, যেমন সন্তানের প্রতি মাতা পিতার, বা মাতা পিতার প্রতি সন্তানের। ইহাই সহজ প্রীতি। আর কতকগুলির প্রতি প্রীতি সংসর্গজ, যেমন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর, প্রভুর প্রতি ভৃত্যের, বা ভৃত্যের প্রতি প্রভুর। এই সহজ এবং সংসর্গজ প্রীতিই পারিবারিক বন্ধন এবং ইহা হইতেই পারিবারিক জীবনের সৃষ্টি। এই পরিবারই প্রীতির প্রথম শিক্ষাস্থল। কেন না, যে ভাবের বশীভূত হইয়া অন্যের জন্য আমরা আত্মত্যাগে প্রবৃত্ত হই, তাহাই প্রীতি। পুত্রাদির জন্য আমরা আত্মত্যাগ করিতে স্বতঃই প্রবৃত্ত, এই জন্য পরিবার হইতে প্রথম প্রীতিবৃত্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই। অতএব পারিবারিক জীবন ধার্ম্মিকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তাই হিন্দুশাস্ত্রকারেরা শিক্ষানবিশীর পরেই গার্হস্থ্য আশ্রম অবশ্য পালনীয় বলিয়া অনুজ্ঞাত করিয়াছিলেন।

পারিবারিক অনুশীলনে প্রীতিবৃত্তি কিয়ৎপরিমাণে স্ফুরিত হইলে পরিবারের বাহিরেও বিস্তার কামনা করে। বলিয়াছি যে, প্রীতিবৃত্তি অন্যান্য শ্রেষ্ঠ বৃত্তির ন্যায় অধিকতর স্ফুরণক্ষম; সুতরাং অনুশীলিত হইতে থাকিলেই ইহা গৃহের ক্ষুদ্র সীমা ছাপাইয়া বাহির হইতে চাহিবে। অতএব ইহা ক্রমশঃ কুটুম্ব, বন্ধুবর্গ, অনুগত ও আশ্রিতে, গোষ্ঠীতে, গোত্রে সমাবিষ্ট হয়। ইহাতেও অনুশীলন থাকিলে ইহার স্ফূর্ত্তিশক্তি সীমা প্রাপ্ত হয় না। ক্রমে আপনার গ্রামস্থ, নগরস্থ, দেশস্থ মনুষ্যমাত্রের উপর নিবিষ্ট হয়। যখন নিখিল জন্মভূমির উপর এই প্রীতি বিস্তারিত হয়, তখন ইহা সচরাচর দেশবাৎসল্য নাম প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় এই বৃত্তি অতিশয় বলবতী হইতে পারে, এবং হইয়াও থাকে। হইলে, ইহা জাতিবিশেষের বিশেষ মঙ্গলের কারণ হয়। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে প্রীতিবৃত্তির এই অবস্থা সচরাচর প্রবল দেখা যায়। ইউরোপীয়দিগের জাতীয় উন্নতি যে এতটা বেশী হইয়াছে, ইহা তাহার এক কারণ।

শিষ্য। ইউরোপে দেশবাৎসল্যের এত প্রাবল্য এবং আমাদের দেশে নাই, তাহার কারণ কি আপনি কিছু বুঝাইতে পারেন?

গুরু। উত্তমরূপে পারি। ইউরোপের ধর্ম্ম, বিশেষতঃ পূর্ব্বতর ইউরোপের ধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্মের মত উন্নত ধর্ম্ম নহে; ইহাই সেই কারণ। একটু সবিস্তারে সেই কথাটা বুঝাইতেছি, তাহা শুন।

দেশবাৎসল্য প্রীতিবৃত্তির স্ফূর্ত্তির চরম সীমা নহে। তাহার উপর আর এক সোপান আছে। সমস্ত জগতে যে প্রীতি, তাহাই প্রীতিবৃত্তির চরম সীমা। তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম। যত দিন প্রীতির জগৎপরিমিত স্ফূর্ত্তি না হইল, তত দিন প্রীতিও অসম্পূর্ণ—ধর্ম্মও অসম্পূর্ণ।

এখন দেখা যায় যে, ইউরোপীয়দিগের প্রীতি আপনাদের স্বদেশেই পর্য্যবসিত হয়, সমস্ত মনুষ্যলোককে ব্যাপ্ত হইতে সচরাচর পারে না। আপনার জাতিকে ভালবাসেন, অন্য জাতীয়কে দেখিতে পারেন না, ইহাই তাঁহাদের স্বভাব। অন্যান্যজাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা সধর্ম্মীকে ভালবাসে, বিধর্ম্মীকে দেখিতে পারে না। মুসলমান ইহার উদাহরণ। কিন্তু ধর্ম্ম এক হইলে, জাতি লইয়া তাহারা বড় আর দ্বেষ করে না। মুসলমানের চক্ষে সব মুসলমান প্রায় তুল্য; কিন্তু ইংরেজখ্রীষ্টিয়ান ও কৃষ্ণখ্রীষ্টিয়ানের মধ্যে বড় গোলযোগ।

শিষ্য। এ স্থলে মুসলমানেরও প্রীতি জাগতিক নহে, ইউরোপের প্রীতিও জাগতিক নহে।

গুরু। মুসলমানের প্রীতি-বিস্তারে নিরোধক তাহার ধর্ম্ম। জগৎসুদ্ধ মুসলমান হইলে জগৎসুদ্ধ সে ভালবাসিতে পারে, কিন্তু জগৎসুদ্ধ খ্রীষ্টিয়ান হইলে জর্ম্মাণ জর্ম্মাণ ভিন্ন, ফরাসি ফরাসি ভিন্ন আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারে না। এখন জিজ্ঞাস্য কথা এই,—ইউরোপীয় প্রীতি দেশব্যাপক হইয়াও আর উঠিতে পারে না কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে বুঝিতে হইবে, প্রীতিস্ফূর্ত্তির কার্য্যতঃ বিরোধী কে? কার্য্যতঃ বিরোধী আত্মপ্রীতি। পশুপক্ষীর ন্যায় মনুষ্যেতে আত্মপ্রীতিও অতিশয় প্রবলা। পরপ্রীতির অপেক্ষা আত্মপ্রীতি প্রবলা। এই জন্য উন্নত ধর্ম্মের দ্বারা চিত্ত শাসিত না হইলে, প্রীতির বিস্তার আত্মপ্রীতির দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়। অর্থাৎ পরে প্রীতি যত দূর আত্মপ্রীতির সঙ্গে সঙ্গত হয়, তত দূরই তাহার বিস্তার হয়, বেশী হয় না। এখন পারিবারিক প্রীতি আত্মপ্রীতির সঙ্গে সুসঙ্গত; এই পুত্র আমার, এই ভার্য্যা আমার, ইহারা আমার সুখের উপাদান, এই জন্য আমি ইহাদের ভালবাসি। তার পর কুটুম্ব, বন্ধু, স্বজন, জ্ঞাতি, গোষ্ঠীগোত্রও আমার, আশ্রিত অনুগত, ইহারাও আমার সুখের উপাদান, এই জন্য আমি ইহাদের ভালবাসি। তেমনি আমার গ্রাম, আমার নগর, আমার দেশ আমি ভালবাসি। কিন্তু জগৎ আমার নহে, জগৎ আমি ভালবাসিব না। পৃথিবীতে এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছে, যাহার দেশ আমার দেশ হইতে ভিন্ন, কিন্তু এমন কেহই নাই, যাহার পৃথিবী আমার পৃথিবী হইতে ভিন্ন। সুতরাং পৃথিবী আমার নহে, আমি পৃথিবী ভালবাসিব কেন?

শিষ্য। কেন? ইহার কি কোন উত্তর নাই?

গুরু। ইউরোপে অনেক রকমের উত্তর আছে, ভারতবর্ষে এক উত্তর আছে। ইউরোপে হিতবাদীদের "Greatest good of the greatest number," কোম্‌তের Humanity পূজা, সর্ব্বোপরি খ্রীষ্টের জাগতিক প্রীতিবাদ, মনুষ্য মনুষ্যে সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান, সুতরাং সকলেই ভাই ভাই, এই সকল উত্তর আছে।

শিষ্য। এই সকল উত্তর থাকিতে, বিশেষ খ্রীষ্টধর্ম্মের এই উন্নত নীতি থাকিতে, ইউরোপের প্রীতি দেশ ছাড়ায় না কেন?

গুরু। তাহার কারণানুসন্ধান জন্য প্রাচীন গ্রীস ও রোমে যাইতে হইবে। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে কোন উন্নত ধর্ম্ম ছিল না, যে পৌত্তলিকতা সুন্দরের এবং শক্তিমানের পূজা মাত্র, তাহার উপর আর কোন উচ্চ ধর্ম্ম ছিল না। জগতের লোক কেন ভালবাসিব,

ইহার কোন উত্তর ছিল না। এই জন্য তাহাদের প্রীতি কখন দেশকে ছাড়ায় নাই। কিন্তু এই দুই জাতি অতি উন্নতস্বভাব আর্য্যবংশীয় জাতি ছিল; তাহাদের স্বাভাবিক মহত্ত্বগুণে তাহাদের প্রীতি দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বড় বেগবতী ও মনোহারিণী হইয়াছিল। দেশবাৎসল্যে এই দুই জাতি পৃথিবীতে বিখ্যাত।

এখন আধুনিক ইউরোপে খ্রীষ্টিয়ান হৌক আর যাই হৌক, ইহার শিক্ষা প্রধানতঃ প্রাচীন গ্রীস ও রোম হইতে। গ্রীস ও রোম ইহার চরিত্রের আদর্শ। সেই আদর্শ আধুনিক ইউরোপে যতটা আধিপত্য করিয়াছে, যীশু তত দূর নহে। আর এক জাতি আধুনিক ইউরোপীয়দিগের শিক্ষা ও চরিত্রের উপর কিছু ফল দিয়াছে। য়িহুদী জাতিও বিশিষ্টরূপে দেশবৎসল, লোকবৎসল নহে। এই তিন দিকের ত্রিস্রোতে পড়িয়া ইউরোপ দেশবৎসল হইয়া পড়িয়াছে, লোকবৎসল হইতে পারে নাই। অথচ খ্রীষ্টের ধর্ম্ম ইউরোপের ধর্ম্ম। তাহাও বর্ত্তমান। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্ম এই তিনের সমবায়ের অপেক্ষা ক্ষীণবল বলিয়া কেবল মুখেই রহিয়া গিয়াছে। ইউরোপীয়েরা মুখে লোকবৎসল, অন্তরে ও কার্য্যে দেশবৎসল মাত্র। কথাটা বুঝিলে?

শিষ্য। প্রীতির প্রাকৃতিক বা ইউরোপীয় অনুশীলন কি, তাহা বুঝিলাম। বুঝিলাম, ইহাতে প্রীতির পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হয় না। দেশবাৎসল্যে থামিয়া যায়, কেন না, তার আত্মপ্রীতি আসিয়া আপত্তি উত্থাপিত করে যে, জগৎ ভালবাসিব কেন, জগতের সঙ্গে আমার বিশেষ কি সম্পর্ক? এক্ষণে প্রীতির পারমার্থিক বা ভারতবর্ষীয় অনুশীলনের মর্ম্ম কি বলুন।

গুরু। তাহা বুঝিবার আগে ভারতবর্ষীয়ের চক্ষে ঈশ্বর কি, তাহা মনে করিয়া দেখ। খ্রীষ্টিয়ানের ঈশ্বর জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। তিনি জগতের ঈশ্বর বটে, কিন্তু যেমন জর্ম্মাণি বা রুষিয়ার রাজা সমস্ত জর্ম্মাণ বা সমস্ত রুষ হইতে একটা পৃথক্ ব্যক্তি, খ্রীষ্টিয়ানের ঈশ্বর তাই। তিনিও পার্থিব রাজার মত পৃথক্ করিয়া রাজ্য পালন রাজ্য শাসন করেন, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন, এবং লোকে কি করিল, পুলিসের মত তাহার খবর রাখেন। তাঁহাকে ভালবাসিতে হইলে, পার্থিব রাজাকে ভালবাসিবার জন্য যেমন প্রীতিবৃত্তির বিশেষ বিস্তার করিতে হয়, তেমনই করিতে হয়।

হিন্দুর ঈশ্বর সেরূপ নহেন। তিনি সর্ব্বভূতময়। তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি জড় জগৎ নহেন, জগৎ হইতে পৃথক, কিন্তু জগৎ তাঁহাতেই আছে। যেমন সূত্রে মণিহার, যেমন আকাশে বায়ু, তেমনি তাঁহাতে জগৎ। কোন মনুষ্য তাঁহা ছাড়া নহে, সকলেই তিনি বিদ্যমান। আমাতে তিনি বিদ্যমান। আমাকে ভালবাসিলে তাঁহাকে ভালবাসিলাম। তাঁহাকে না ভাল বাসিলে আমাকেও ভাল বাসিলাম না। তাঁহাকে ভাল বাসিলে সকল মনুষ্যকেই ভাল বাসিলাম। সকল মনুষ্যকে না ভালবাসিলে, তাঁহাকে ভালবাসা হইল না, আপনাকে ভালবাসা হইল না, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ প্রীতির অন্তর্গত না হইলে প্রীতির অস্তিত্বই রহিল না। যতক্ষণ না বুঝিতে পারিব যে, সকল জগৎই আমি, যতক্ষণ না বুঝিব যে, সর্ব্বলোকে আর আমাতে অভেদ, ততক্ষণ আমার জ্ঞান হয় নাই, ভক্তি হয় নাই, প্রীতি হয় নাই। অতএব জাগতিক প্রীতি হিন্দুধর্ম্মের

মূলেই আছে; অচ্ছেদ্য, অভিন্ন, জাগতিক প্রীতি ভিন্ন হিন্দুত্ব নাই। ভগবানের সেই মহাবাক্য পুনরুক্ত করিতেছি :—

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥*

"যে যোগযুক্তাত্মা হইয়া সর্ব্বভূতে আপনাকে দেখে এবং আপনাতে সর্ব্বভূতকে দেখে ও সর্ব্বত্র সমান দেখে, যে আমাকে সর্ব্বত্র দেখে, আমাতে সকলকে দেখে, আমি তাহার অদৃশ্য হই না, সেও আমার অদৃশ্য হয় না।"

স্থূল কথ, মনুষ্যে প্রীতি হিন্দু শাস্ত্রের মতে ঈশ্বরে ভক্তির অন্তর্গত; মনুষ্যে প্রীতি ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই, ভক্তি ও প্রীতি হিন্দুধর্ম্মে অভিন্ন, অভেদ্য, ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যাকালে ইহা দেখিয়াছি; ভগবদ্গীতা এবং বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদচরিত্র হইতে যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে উহা দেখিয়াছি। প্রহ্লাদকে যখন হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শত্রুর সঙ্গে রাজার কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, প্রহ্লাদ উত্তর করিলেন, "শত্রু কে? সকলই বিষ্ণু-(ঈশ্বর) ময়, শত্রু মিত্র কি প্রকারে প্রভেদ করা যায়!" প্রীতি-তত্ত্বের এইখানে একশেষ হইল। এবং এই এক কথাতেই সকল ধর্ম্মের উপর হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইল বিবেচনা করি। প্রহ্লাদের সেই সকল উক্তি এবং গীতা হইতে যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা পুনর্ব্বার স্মরণ কর। স্মরণ না হয়, গ্রন্থ হইতে পুনর্ব্বার অধ্যয়ন কর। তদ্ব্যতীত হিন্দুধর্ম্মোক্ত প্রীতিতত্ত্ব বুঝিতে পারিবে না। এই প্রীতি জগতের বন্ধন, এই প্রীতি ভিন্ন জগৎ বন্ধনশূন্য বিশৃঙ্খল জড়পিণ্ড সকলের সমষ্টি মাত্র। প্রীতি না থাকিলে পরস্পর বিদ্বেষপরায়ণ মনুষ্য জগতে বাস করিতে অক্ষম হইত, অনেক কাল হয়ত পৃথিবী মনুষ্যলোকের অসহ্য নরক হইয়া উঠিত। ভক্তির পর প্রীতির অপেক্ষা উচ্চ বৃত্তি আর নাই। যেমন ঈশ্বরে এই জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, প্রীতিতেও তেমনি জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে। ঈশ্বরই প্রীতি, ঈশ্বরই ভক্তি,—বৃত্তি স্বরূপ জগদাধার হইয়া তিনি লোকের হৃদয়ে অবস্থান করেন। অজ্ঞান আমাদিগকে ঈশ্বরকে জানিতে দেয় না এবং অজ্ঞানই আমাদিগকে ভক্তি প্রীতি ভুলাইয়া রাখে। অতএব ভক্তি প্রীতির সম্যক্ অনুশীলন জন্য, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের সম্যক্ অনুশীলন আবশ্যক। ফলে সকল বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন ও সামঞ্জস্য ব্যতীত সম্পূর্ণ ধর্ম্ম লাভ হয় না, ইহার প্রমাণ পুনঃ পুনঃ পাইয়াছ।

শিষ্য। এক্ষণে প্রীতিবৃত্তির ভারতবর্ষীয় বা পারমার্থিক অনুশীলনপদ্ধতি বুঝিলাম। জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিয়া জগতের সঙ্গে তাঁহার এবং আমার অভিন্নতা ক্রমে

---

* এই ধর্ম্ম বৈদিক। বাজসনেয় সংহিতোপনিষদে আছে—

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানন্ততো ন বিজুগুপ্সতে॥
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কঃ মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥

হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। ক্রমে সর্ব্বলোককে আপনার মত দেখিতে শিখিলে প্রীতিবৃত্তির পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হইবে। ইহার ফলও বুঝিলাম। আত্মপ্রীতি ইহার বিরোধী হইবার সম্ভাবনা নাই—কেন না, সমস্ত জগৎ আত্মময় হইয়া যায়। অতএব ইহার ফল কেবল দেশবাৎসল্য মাত্র হইতে পারে না,—সর্ব্বলোকবাৎসল্যই ইহার ফল। প্রাকৃতিক অনুশীলনের ফল ইউরোপে কেবল দেশবাৎসল্য মাত্র জন্মিয়াছে—কিন্তু ভারতবর্ষে লোকবাৎসল্য জন্মিয়াছে কি ?

গুরু। আজিকালকার কথা ছাড়িয়া দাও। আজিকালি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার জোর বড় বেশী হইয়াছে বলিয়া আমরা দেশবৎসল হইতেছি, লোকবৎসল আর নহি। এখন ভিন্ন জাতির উপর আমাদেরও বিদ্বেষ জন্মিতেছে। কিন্তু এতকাল তাহা ছিল না; দেশবাৎসল্য জিনিষটা দেশে ছিল না। কথাটাও ছিল না। ভিন্ন জাতির প্রতি ভিন্ন ভাব ছিল না। হিন্দু রাজা ছিল, তার পর মুসলমান হইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কহিল না, হিন্দুর কাছে হিন্দু মুসলমান সমান। মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা হইল, হিন্দু প্রজা তাহাতে কথা কহিল না। বরং হিন্দুরাই ইংরেজকে ডাকিয়া রাজ্যে বসাইল। হিন্দু সিপাহী ইংরেজের হইয়া লড়িয়া, হিন্দুর রাজ্য জয় করিয়া ইংরেজকে দিল; কেন না, হিন্দুর ইংরেজের উপর ভিন্নজাতীয় বলিয়া কোন দ্বেষ নাই। আজিও অধীন ভারতবর্ষ অত্যন্ত প্রভুভক্ত। ইংরেজ ইহার কারণ না বুঝিয়া মনে করে, হিন্দু দুর্ব্বল বলিয়া কৃত্রিম প্রভুভক্ত।

শিষ্য। তা, সাধারণ হিন্দু প্রজা বা ইংরেজের সিপাহীরা যে বুঝিয়াছিল, ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, সকলই আমি, এ কথা ত বিশ্বাস হয় না।

গুরু। তাহা বুঝে নাই। কিন্তু জাতীয় ধর্ম্মে জাতীয় চরিত্র গঠিত। যে জাতীয় ধর্ম্ম বুঝে না, সেও জাতীয় ধর্ম্মের অধীন হয়, জাতীয় ধর্ম্মে তাহার চরিত্র শাসিত হয়। ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম অল্প লোকেই বুঝিয়া থাকে। যে কয় জন বুঝে, তাহাদেরই অনুকরণে ও শাসনে জাতীয় চরিত্র শাসিত ও গঠিত হয়। এই অনুশীলনধর্ম্ম যাহা তোমাকে বুঝাইতেছি, তাহা যে সাধারণ হিন্দুর সহজে বোধগম্য হইবে, তাহার বেশী ভরসা আমি এখন রাখি না। কিন্তু এমন ভরসা রাখি যে, মনস্বিগণ কর্ত্তৃক ইহা গৃহীত হইলে, ইহার দ্বারা জাতীয় চরিত্র গঠিত হইতে পারিবে। জাতীয় ধর্ম্মের মুখ্য ফল অল্প লোকেই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু গৌণ ফল সকলেই পাইতে পারে।

শিষ্য। তার পর আর একটা কথা আছে। আপনি যে প্রীতির পারমার্থিক অনুশীলনপদ্ধতি বুঝাইলেন, তাহার ফল, লোক-বাৎসল্যে দেশ-বাৎসল্য ভাসিয়া যায়। কিন্তু দেশ-বাৎসল্যের অভাবে ভারতবর্ষ সাত শত বৎসর পরাধীন হইয়া অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই পারমার্থিক প্রীতির সঙ্গে জাতীয় উন্নতির কিরূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে ?

গুরু। সেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারাই হইবে। যাহা অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, তাহা নিষ্কাম হইয়া করিবে। যে কর্ম্ম ঈশ্বরানুমোদিত, তাহাই অনুষ্ঠেয়। আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, পরপীড়িতের রক্ষা, অনুন্নতের উন্নতি সাধন—সকলই ঈশ্বরানুমোদিত কর্ম্ম, সুতরাং অনুষ্ঠেয়। অতএব নিষ্কাম হইয়া আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, পীড়িত দেশীয়বর্গের রক্ষা, দেশীয় লোকের উন্নতি সাধন করিবে।

শিষ্য। নিষ্কাম আত্মরক্ষা কি রকম? আত্মরক্ষাই ত সকাম।

গুরু। সে কথার উত্তর কাল দিব।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়—আত্মপ্রীতি

শিষ্য। আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, নিষ্কাম আত্মরক্ষা কি রকম? আপনি বলিয়াছিলেন, "কাল উত্তর দিব।" সেই উত্তর এক্ষণে শুনিব ইচ্ছা করি।

গুরু। আমার এই ভক্তিবাদ সমর্থনার্থ কোন জড়বাদীর সহায়তা গ্রহণ করিব, তুমি এমন প্রত্যাশা কর না। তথাপি হর্বর্ট স্পেন্সরের একটি কথা তোমাকে পড়াইয়া শুনাইব।

"A creature must live before it can act. From this it is a corollary that the acts by which each maintains his own life must, *speaking generally*, precede in imperativeness all other acts of which he is capable. For if it be asserted that these other acts must precede in imperativeness the acts which maintain life; and if this, accepted as a general law of conduct, is conformed to by all; then by postponing the acts which maintain life to the other acts which life makes possible, all must lose their lives... The acts required for continued self-preservation, including the enjoyment of benefits achieved by such acts, are the first requisites to universal welfare. Uuless each *duly* cares for himself, his care for all others is ended by death; and if each thus dies, there remain no others to be cared for."*

অতএব জগদীশ্বরের সৃষ্টিরক্ষার্থ আত্মরক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। জগদীশ্বরের সৃষ্টিরক্ষার্থ প্রয়োজনীয় বলিয়া ইহা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম। ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম, এজন্য আত্মরক্ষাকেও নিষ্কাম কর্ম্মে পরিণত করা যাইতে পারে ও করাই কর্ত্তব্য।

এক্ষণে পরহিত ও পররক্ষার সঙ্গে এই আত্মরক্ষার তুলনা করিয়া দেখ। পরহিত ধর্ম্মাপেক্ষা আত্মরক্ষা ধর্ম্মের গৌরব অধিক। যদি জগতে লোকে পরস্পরের হিত না করে, পরস্পরের রক্ষা না করে, তাহাতে জগৎ মনুষ্যশূন্য হইবে না। অসভ্য সমাজ সকল ইহার উদাহরণ। কিন্তু সকলে আত্মরক্ষায় বিরত হইলে, সভ্য কি অসভ্য, কোন সমাজ, কোন প্রকার মনুষ্য বা জীব জগতে থাকিবে না। অতএব পরহিতের আগে আপনার প্রাণরক্ষা।

শিষ্য। এ সকল অতি অশ্রদ্ধেয় কথা বলিয়া আমার বোধ হইতেছে। মনে করুন, পরকে না দিয়া আপনি খাইব?

* *Data of Ethics*, Chap. XI. [p. 187.] Italic যে যে শব্দে দেওয়া হইল, তাহা আমার দেওয়া।

গুরু। তুমি যাহা কিছু আহার্য্য সংগ্রহ কর, তাহা যদি সমস্তই প্রত্যহ অন্যকে বিলাইয়া দাও, তবে পাঁচ-সাত দিনে তোমার দানধর্ম্মের শেষ হইবে। কেন না, তুমি নিজে না খাইয়া মরিয়া যাইবে। পরকে দিবে, কিন্তু পরকে দিয়া আপনি খাইবে। যদি পরকে দিতে না কুলায়, তবে কাজেই পরকে না দিয়া আপনিই খাইবে। এই "না কুলায়" কথাটাই যত অধর্ম্মের গোড়া। যাঁর নিজের আহারের জন্য প্রত্যহ তিনটা পাঁঠা, দেড় কুড়ি মাছের প্রাণ সংহার হয়, তাঁর কাজেই পরকে দিতে কুলায় না। যে সর্ব্বভূতে সমান দেখে, আপনাতে ও পরে সমান দেখে, সে পরকে যেমন দিতে পারে, আপনি তেমনই খায়। ইহাই ধর্ম্ম—আপনি উপবাস করিয়া পরকে দেওয়া ধর্ম্ম নহে। কেন না, আপনাতে ও পরে সমান করিতে হইবে।

শিষ্য। ভাল, আমার প্রযুক্ত উদাহরণটা না হয়, অনুপযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু কখন কি পরোপকারার্থ আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করা কর্ত্তব্য নহে?

গুরু। অনেক সময়ে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। না করাই অধর্ম্ম।

শিষ্য। তাহার দুই একটা উদাহরণ শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। যে মাতা পিতার নিকট তুমি প্রাণ পাইয়াছ, যাঁহাদিগের যত্নে তুমি কর্ম্মক্ষম ও ধর্ম্মক্ষম হইয়াছ, তাঁহাদিগের রক্ষার্থে প্রয়োজনমতে আপনার প্রাণ বিসর্জ্জনই ধর্ম্ম, না করা অধর্ম্ম।

সেইরূপ প্রাণদানাদি উপকার যদি তুমি অন্যের কাছে পাইয়া থাক, তবে তাহার জন্যও ঐরূপ আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জনীয়।

যাহাদের তুমি রক্ষক, তাহাদের জন্য আত্মপ্রাণ ঐরূপে বিসর্জ্জনীয়। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি রক্ষক কাহার। তুমি রক্ষক, (১) স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গের, (২) স্বদেশের, (৩) প্রভুর, অর্থাৎ যে তোমাকে রক্ষার্থ বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়াছে, তাহার; (৪) শরণাগতের। অতএব স্ত্রীপুত্রাদি, স্বদেশ, প্রভু, এবং শরণাগত, এই সকলের রক্ষার্থ আপনার প্রাণ পরিত্যাগ করা ধর্ম্ম।

যাহারা আপনাদের রক্ষায় অক্ষম, মনুষ্য মাত্রেই তাঁহাদের রক্ষক। স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, পীড়িত, অন্ধ খঞ্জাদি অঙ্গহীন, ইহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম। ইহাদের রক্ষার্থ প্রাণ পরিত্যাগ ধর্ম্ম।

এইরূপ আরও অনেক স্থান আছে। সকলগুলি গণনা করিয়া উঠা যায় না। প্রয়োজনও নাই। যাহার জ্ঞানার্জ্জনী ও কার্য্যকারিণী বৃত্তি অনুশীলিত ও সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইয়াছে, সে সকল অবস্থাতেই বুঝিতে পারিবে যে, এই স্থলে প্রাণ পরিত্যাগ ধর্ম্ম, এই স্থলে অধর্ম্ম।

শিষ্য। আপনার কথার তাৎপর্য্য এই বুঝিলাম যে, আত্মপ্রীতি প্রীতিবৃত্তির বিরোধী হইলেও, ঘৃণার যোগ্য নহে। উপযুক্ত নিয়মে উহার সীমাবদ্ধ করিয়া উহারও সম্যক্ অনুশীলন কর্ত্তব্য। বটে?

গুরু। বস্তুতঃ যদি আত্ম-পর সমান হইল, তবে আত্মপ্রীতি ও জাগতিক প্রীতি, ভিন্ন বিবেচনা করাও উচিত নহে। উপযুক্তরূপে উভয়ে অনুশীলিত ও সামঞ্জস্যবিশিষ্ট হইলে আত্মপ্রীতি জাগতিক প্রীতির অন্তর্গত হইয়া দাঁড়ায়। কেন না, আমি ত

জগতের বাহিরে নই। ধর্ম্মের, বিশেষতঃ হিন্দুধর্ম্মের মূল একমাত্র ঈশ্বর। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন; এজন্য সর্ব্বভূতের হিতসাধন আমাদের ধর্ম্ম, কেন না, বলিয়াছি যে—সকল বৃত্তিকে ঈশ্বরমুখী করাই মনুষ্যজন্মের চরম উদ্দেশ্য। যদি সর্ব্বভূতের হিতসাধন ধর্ম্ম হয়, তবে পরের হিতসাধন যেমন আমার ধর্ম্ম, তেমনি আমার নিজেরও হিতসাধন আমার ধর্ম্ম। আমিও সর্ব্বভূতের অন্তর্গত: ঈশ্বর যেমন অপর ভূতে আছেন, তেমনি আমাতেও আছেন। অতএব পরের রক্ষাদি আমার ধর্ম্ম এবং আপনারও রক্ষাদি আমার ধর্ম্ম। আত্মপ্রীতি ও জাগতিক প্রীতি এক।

শিষ্য। কিন্তু কথাটার গোলযোগ এই যে, যখন আত্মহিত এবং পরহিত পরস্পর বিরোধী তখন আপনার হিত করিব, না পরের হিত করিব? পূর্ব্বগামী ধর্ম্মবেত্তৃগণের মত এই যে, আত্মহিতে ও পরহিতে পরস্পর বিরোধ হইলে, পরহিত সাধনই ধর্ম্ম।

গুরু। ঠিক এমন কথাটা কোন ধর্ম্মে আছে, তাহা আমি বুঝি না। খ্রীষ্টধর্ম্মের উক্তি যে, "পরের তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার তুমি বাসনা কর, তুমি পরের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিবে।" এ উক্তিতে পরহিতকে প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে না, পরহিত ও আত্মহিতকে তুল্য করা হইতেছে। কিন্তু সে কথা থাক্, কেন না, আমাকেও এই অনুশীলনতত্ত্বে পরহিতকেই স্থলবিশেষে প্রাধান্য দিতে হইবে। কিন্তু তুমি যে কথা তুলিলে, তাহারও সুমীমাংসা আছে। সেই মীমাংসার প্রথম এবং প্রধান নিয়ম এই যে, পরের অনিষ্টমাত্রই অধর্ম্ম। পরের অনিষ্ট করিয়া আপনার হিতসাধন করিবার কাহারও অধিকার নাই। ইহা হিন্দুধর্ম্মেও বলে, খ্রীষ্ট বৌদ্ধাদি অপর ধর্ম্মেরও এই মত, এবং আধুনিক দার্শনিক বা নীতিবেত্তাদিগেরও মত। অনুশীলনতত্ত্ব যদি বুঝিয়া থাক, তবে অবশ্য বুঝিয়াছ, পরের অনিষ্ট, ভক্তি প্রীতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃত্তিসকলের সমুচিত অনুশীলনের বিরোধী ও বিঘ্নকর এবং যে সাম্যজ্ঞান ভক্তি ও প্রীতির লক্ষণ, তাহার উচ্ছেদক। পরের অনিষ্ট, ভক্তি প্রীতি দয়াদির অনুশীলনের বিরোধী, এজন্য যেখানে পরের অনিষ্ট ঘটে, সেখানে তদ্দ্বারা আপনার হিতসাধন করিবে না, ইহা অনুশীলনধর্ম্মের এবং হিন্দুধর্ম্মের আজ্ঞা। আত্মপ্রীতি-তত্ত্বের ইহাই প্রথম নিয়ম।

শিষ্য। নিয়মটা কি প্রকারে খাটে—দেখা যাউক। এক ব্যক্তি চোর, সে সপরিবারে খাইতে পায় না, উপবাস করিয়া আছে। এরূপ যে চোরের সর্ব্বদা ঘটে, তাহা বলা বাহুল্য। সে, রাত্রে আমার ঘরে সিঁধ দিয়াছে—অভিপ্রায়, কিছু চুরি করিয়া আপনার ও পরিবারবর্গের আহার সংগ্রহ করে। তাহাকে আমি ধৃত করিয়া বিহিত দণ্ডবিধান করিব, না উপহারস্বরূপ কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিব?

গুরু। তাহাকে ধৃত করিয়া বিহিত দণ্ডবিধান করিবে।

শিষ্য। তাহা হইলে আমার সম্পত্তিরক্ষা-রূপ ইষ্টসাধন হইল বটে, কিন্তু চোরের এবং তাহার নিরপরাধী স্ত্রীপুত্রগণের ঘোরতর অনিষ্ট হইল। আপনার সূত্রটি খাটে?

গুরু। চোরের নিরপরাধী স্ত্রীপুত্রাদি যদি অনাহারে মরে, তুমি তাহাদের আহারার্থ কিছু দান করিতে পার। চোরও যদি না খাইয়া মরে, তবে তাহাকেও খাইতে দিতে পার। কিন্তু চুরির দণ্ড দিতে হইবে। কেন না, না দিলে, কেবল তোমার অনিষ্ট নহে, সমস্ত লোকের অনিষ্ট। চোরের প্রশ্রয়ে চৌর্য্যবৃদ্ধি, চৌর্য্যবৃদ্ধিতে সমাজের অনিষ্ট।

শিষ্য। এ ত বিলাতী হিতবাদীর কথা—আপনার মতে "Greatest good of the greatest number" এখানে অবলম্বনীয়।

গুরু। হিতবাদ মতটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বস্তু নহে। হিতবাদীদিগের ভ্রম এই যে, তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্বটা এই হিতবাদ মতের ভিতরই আছে। তাহা না হইয়া, ইহা ধর্ম্মতত্ত্বের সামান্য অংশ মাত্র। আমি যেখানে উহাকে স্থান দিলাম, তাহা আমার ব্যাখ্যাত অনুশীলনতত্ত্বের একটি কোণের কোণ মাত্র। তত্ত্বটা সত্যমূলক, কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্বের সমস্ত ক্ষেত্র আবৃত করে না। ধর্ম্ম ভক্তিতে, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিতে। সেই মহাশিখর হইতে যে সহস্র সহস্র নির্ঝরিণী নামিয়াছে—হিতবাদ ইহা তাহার একটি ক্ষুদ্রতম স্রোতঃ। ক্ষুদ্রতম হউক—ইহার জল পবিত্র। হিতবাদ ধর্ম্ম—অধর্ম্ম নহে।

স্থূল কথা, অনুশীলন ধর্ম্মে "Greatest good of the greatest number," গণিততত্ত্ব ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি ভূতমাত্রের হিতসাধন ধর্ম্ম হয়, তবে এক জনের হিতসাধন ধর্ম্ম, আবার এক জনের হিতসাধন অপেক্ষা দশ জনের তুল্য হিতসাধন অবশ্য দশগুণ ধর্ম্ম। যদি এক দিকে এক জনের হিতসাধন ও আর এক দিকে দশ জনের তুল্য হিতসাধন পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম হয়, তবে এক জনের হিত পরিত্যাগ করিয়া দশ জনের তুল্য হিতসাধনই ধর্ম্ম; এবং দশ জনের হিত পরিত্যাগ করিয়া এক জনের তুল্য হিত-সাধন করা অধর্ম্ম।* এখানে "Good of the greatest number."

পক্ষান্তরে, এক জনের অল্প হিত, আর এক দিকে আর এক জনের বেশী হিত পরস্পর বিরোধী, সেখানে অল্প হিত পরিত্যাগ করিয়া বেশী হিত সাধন করাই ধর্ম্ম, তদ্বিপরীতই অধর্ম্ম। এখানে কথাটা "Greatest good."

শিষ্য। সে ত স্পষ্ট কথা।

গুরু। যত স্পষ্ট এখন বোধ হইতেছে, কার্য্যকালে তত স্পষ্ট হয় না। এক দিকে শ্যামু ঠাকুর, কুলীন, ব্রাহ্মণ, কন্যাভারগ্রস্ত, অর্থাভাবে মেয়েটি স্বঘরে দিতে পারিতেছেন না; আর এক দিকে রামা ডোম, কতকগুলি অপোগণ্ডভারগ্রস্ত সপরিবারে খাইতে পায় না, প্রাণ যায়। এখানে "Greatest good" রামার দিকে, কিন্তু উভয়েই তোমার নিকট যাচ্ঞা করিতে আসিলে, তুমি বোধ করি শ্যামু ঠাকুরকে পাঁচটি টাকা দিয়াও কুণ্ঠিত হইবে, মনে করিবে কম হইল, আর রামাকে চারিটা পয়সা দিতে পারিলেই আপনাকে দাতা ব্যক্তি মধ্যে গণ্য করিবে। অন্ততঃ অনেক বাঙ্গালিই এইরূপ। বাঙ্গালি কেন, সকল জাতীয় লোক সম্বন্ধে এইরূপ সহস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

শিষ্য। সে কথা যাক্। সর্ব্বভূতে যদি সমান, তবে অল্পের অপেক্ষা বেশী লোকের হিতসাধন ধর্ম্ম, এবং এক জনের অল্প হিতের অপেক্ষায় এক জনের বেশী হিতসাধন ধর্ম্ম। কিন্তু যেখানে এক জনের বেশী হিত একদিকে, আর দশ জনের অল্প হিত (তুল্য হিত নহে) আর একদিকে, সেখানে ধর্ম্ম কি?

গুরু। সেখানে অঙ্ক কষিবে। মনে কর, এক দিকে এক জনের যে পরিমাণ হিত

* ভরসা করি, কেহই ইহার এমন অর্থ বুঝিবেন না যে দশ জনের হিতের জন্য এক জনের অনিষ্ট করিবে। তাহা করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ, ইহা বলা বাহুল্য।

সাধিত হইতে পারে, অন্য দিকে শত জনের প্রত্যেকের চতুর্থাংশের এক অংশ সাধিত হইতে পারে। এ স্থলে এই শত জনের হিতের অঙ্ক $\frac{১০০}{৪} = ২৫$। এখানে এক জনের বেশী হিত পরিত্যাগ করিয়া শত জনের অল্প হিতসাধন করাই ধর্ম্ম। পক্ষান্তরে, যদি এই শত জনের প্রত্যেকের হিতের মাত্রা চতুর্থাংশ না হইয়া সহস্রাংশ হইত, তাহা হইলে ইহাদিগের সুখের মাত্রার সমষ্টি এক জনের $\frac{১}{১০}$ মাত্র। সুতরাং এ স্থলে সে শত ব্যক্তির হিত পরিত্যাগ করিয়া এক ব্যক্তির হিতসাধন করাই ধর্ম্ম।

শিষ্য। হিতের কি এরূপ ওজন হয়? মাপকাঠিতে মাপ হয়, এত গজ এত ইঞ্চি?

গুরু। ইহার সদুত্তর কেবল অনুশীলনবাদীই দিতে পারেন। যাঁহার সকল বৃত্তি, বিশেষ জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সম্যক্ অনুশীলিত ও স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে, হিতাহিত মাত্রা ঠিক বুঝিতে তিনি সক্ষম। যাঁহার সেরূপ অনুশীলন হয় নাই, তাঁহার পক্ষে ইহা অনেক সময় দুঃসাধ্য, কিন্তু তাঁহার পক্ষে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মই দুঃসাধ্য ইহা বোধ করি বুঝাইয়াছি। তথাপি ইহা দেখিবে যে, সচরাচর মনুষ্য অনেক স্থানেই এরূপ কার্য্য করিতে পারে। ইউরোপীয় হিতবাদীরা ইহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন, সুতরাং আমার আর সে সকল কথা তুলিবার প্রয়োজন নাই। হিতবাদের এতটুকু বুঝাইবার আমার উদ্দেশ্য এই যে, তুমি বুঝ যে, অনুশীলনতত্ত্বে হিতবাদের স্থান কোথায়।

শিষ্য। স্থান কোথায়?

গুরু। প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যে। সর্ব্বভূতে সমান, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষে হিত পরস্পর বিরোধী হইয়া থাকে, সে স্থলে ওজন করিয়া বা অঙ্ক কষিয়া দেখিবে। অর্থাৎ "Greatest good of the greatest number" আমি যে অর্থে বুঝাইলাম, তাহাই অবলম্বন করিবে। যখন পরহিতে পরহিতে এইরূপ বিরোধ, তখন কি প্রকারে এই বিচার কর্ত্তব্য, তাহাই বুঝাইয়াছি। কিন্তু পরহিতে পরহিতে বিরোধের অপেক্ষা, আত্মহিতে পরহিতে বিবাদ আরও সাধারণ এবং গুরুতর ব্যাপার। সেখানেও সামঞ্জস্যের সেই নিয়ম। অর্থাৎ—

(১) যখন এক দিকে তোমার হিত, অপর দিকে একাধিক সংখ্যক লোকের তুল্য হিত, সেখানে আত্মহিত ত্যাজ্য, এবং পরহিতই অনুষ্ঠেয়।

(২) যেখানে এক দিকে আত্মহিত, অন্য দিকে অপর এক জনের অধিক হিত, সেখানেও পরের হিত অনুষ্ঠেয়।

(৩) যেখানে তোমার বেশী হিত এক দিকে, অন্যের অল্প হিত এক দিকে, সেখানে কোন্ দিকের মোট মাত্রা বেশী, তাহা দেখিবে। তোমার দিক্ বেশী হয়, আপনার হিত সাধিত করিবে; পরের দিক্ বেশী হয়, পরের হিত খুঁজিবে।

শিষ্য। (৪) আর যেখানে দুইখানে দুই দিক্ সমান?

গুরু। সেখানে পরের হিত অনুষ্ঠেয়।

শিষ্য। কেন? সর্ব্বভূত যখন সমান, তখন আপনি পর ত সমান।

গুরু। অনুশীলনতত্ত্বে ইহার উত্তর পাওয়া যায়। প্রীতিবৃত্তি পরানুরাগিণী। কেবল আত্মানুরাগিণী প্রীতি প্রীতি নহে। আপনার হিতসাধনে প্রীতির অনুশীলন, স্ফুরণ বা চরিতার্থ হয় না। পরহিতসাধনে তাহা হইবে। এই জন্য এ স্থলে পরপক্ষ অবলম্বনীয়।

কেন না, তাহাতে পরহিতও সাধিত হয় এবং প্রীতিবৃত্তির অনুশীলন ও চরিতার্থতা জন্য তোমার যে নিজের হিত, তাহাও সাধিত হয়। অতএব মোটের উপর পরপক্ষে বেশী হিত সাধিত হয়।

অতএব, আত্মপ্রীতির সামঞ্জস্য সম্বন্ধে আমি যে প্রথম নিয়ম বলিয়াছি, অর্থাৎ যেখানে পরের অনিষ্ট হয়, সেখানে আত্মহিত পরিত্যাজ্য, তাহার সম্প্রসারণ ও সীমা-বন্ধন স্বরূপ হিতবাদীদিগের এই নিয়ম দ্বিতীয় নিয়মের স্বরূপ গ্রহণ করিতে পার।

আর একটি তৃতীয় নিয়ম আছে। অনেক সময় আমার আত্মহিত যত দূর আমার আয়ত্ত, পরের হিত তাদৃশ নহে। উদাহরণস্বরূপ দেখ, আমরা যত সহজে আপনার মানসিক উন্নতি সাধিত করিতে পারি, পরের তত সহজে পারি না। এ স্থলে অগ্রে আপনার মানসিক উন্নতির সাধনই কর্ত্তব্য; কেন না, সিদ্ধির সম্ভাবনা বেশী। পুনশ্চ অনেক স্থলে আপনার হিত আগে সাধিত না করিলে পরের হিত সাধিত করিতে পারা যায় না। এ স্থলেও পরপক্ষ অপেক্ষা আত্মপক্ষই অবলম্বনীয়। আমার মানসিক উন্নতি না হইলে, আমি তোমার মানসিক উন্নতি সাধিত করিতে পারিব না; অতএব এখানে আগে আপনার হিত অবলম্বনীয়। যদি তোমাকে আমাকে এককালে শত্রুতে আক্রমণ করে, তবে আগে আপনার রক্ষা না করিলে, আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। চিকিৎসক নিজে রুগ্নশয্যাশায়ী হইলে, আগে আপনার আরোগ্যসাধন না করিলে, পরকে আরোগ্য দিতে পারেন না। এ সকল স্থানেও আত্মহিতই আগে সাধনীয়।

এক্ষণে, তোমাকে যাহা বুঝাইয়াছিলাম, তাহা আবার স্মরণ কর।

প্রথম, আত্মপর অভেদজ্ঞানই যথার্থ প্রীতির অনুশীলন।

দ্বিতীয়, তদ্দ্বারা আত্মপ্রীতির সমুচিত ও সীমাবদ্ধ অনুশীলন নিষিদ্ধ হইতেছে না, কেন না, আমিও সর্ব্বভূতের অন্তর্গত।

তৃতীয়, বৃত্তির অনুশীলনের চরম উদ্দেশ্য—সকল বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা। অতএব যাহা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম, তাহাই অনুষ্ঠেয়। ঈদৃশ অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের অনুবর্ত্তনে কখন অবস্থাবিশেষে আত্মহিত, কখন অবস্থাবিশেষে পরহিতকে প্রাধান্য দিতে হয়।

তাহাতে হিন্দুধর্ম্মোক্ত সাম্যজ্ঞানের বিঘ্ন হয় না। তুমি সেখানে আত্মরক্ষার অধিকারী, পরেও সেইখানে সেইরূপ আত্মরক্ষার অধিকারী। যেখানে তুমি পরের জন্য আত্মবিসর্জনে বাধ্য, পরেও সেইখানে তোমার জন্য আত্মবিসর্জ্জনে বাধ্য। এই জ্ঞানই সাম্যজ্ঞান। অতএব আমি যে সকল বর্জ্জিত কথা বলিলাম, তদ্দ্বারা গীতোক্ত সাম্যজ্ঞানের কোন হানি হইতেছে না।

শিষ্য। কিন্তু আমি ইতিপূর্ব্বে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার কোন সমুচিত উত্তর হয় নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হিন্দুর পারমার্থিক প্রীতির সঙ্গে জাতীয় উন্নতির কিরূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে।

গুরু। উত্তরের প্রথম সূত্র সংস্থাপিত হইল। এক্ষণে ক্রমশঃ উত্তর দিতেছি।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়—স্বজনপ্রীতি

গুরু। এক্ষণে হর্বর্ট স্পেন্সরের যে উক্তি তোমাকে শুনাইয়াছি, তাহা স্মরণ কর।

"Unless each duly cares for himself, his care for all others is ended by death; and if each thus dies, there remain no others to be cared for."

জগদীশ্বরের সৃষ্টিরক্ষা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত, ইহা যদি মানিয়া লওয়া যায়, তবে আত্মরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম; কেন না, তদ্ব্যতীত সৃষ্টিরক্ষা হয় না। কিন্তু এ কথা কেবল আত্মরক্ষা সম্বন্ধেই যে খাটে, এমন নহে। যাহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম, এবং যাহাদের রক্ষার ভার তোমার উপর, তাহাদের রক্ষাও আত্মরক্ষার ন্যায় জগৎরক্ষার পক্ষে তাদৃশ প্রয়োজনীয়।

শিষ্য। আপনি সন্তানাদির কথা বলিতেছেন?

গুরু। প্রথমে অপত্যপ্রীতির কথাই বলিতেছি। বালকেরা আপনাদিগের পালনে ও রক্ষণে সক্ষম নহে। অন্যে যদি তাহাদিগকে রক্ষা ও পালন না করে, তবে তাহারা বাঁচে না। যদি সমস্ত শিশু অপালিত ও অরক্ষিত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে, তবে জগৎও জীবশূন্য হইবে। অতএব আত্মরক্ষাও যেমন গুরুতর ধর্ম্ম, সন্তানাদির পালনও তাদৃশ গুরুতর ধর্ম্ম; আত্মরক্ষার ন্যায়, ইহাও ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম, সুতরাং ইহাকেও নিষ্কাম কর্ম্মে পরিণত করা যাইতে পারে। বরং আত্মরক্ষার অপেক্ষাও সন্তানাদির পালন ও রক্ষণ গুরুতর ধর্ম্ম; কেন না, যদি সমস্ত জগৎ আত্মরক্ষায় বিরত হইয়াও সন্তানাদি রক্ষায় নিযুক্ত ও সফল হইয়া সন্তানাদি রাখিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে সৃষ্টি রক্ষিত হয়, কিন্তু সমস্ত জীব সন্তানাদির রক্ষায় বিরত হইয়া কেবল আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হইলে, সন্তানাদির অভাবে জীবসৃষ্টি বিলুপ্ত হইবে। অতএব আত্মরক্ষার অপেক্ষা সন্তানাদির রক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম।

ইহা হইতে একটি গুরুতর তত্ত্ব উপলব্ধ হয়। অপত্যাদির রক্ষার্থ আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করা ধর্ম্মসঙ্গত। পূর্ব্বে যে কথা আন্দাজি বলিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা প্রমাণীকৃত হইল।

ইহা পশু পক্ষীতেও করিয়া থাকে। ধর্ম্মজ্ঞানবশতঃ তাহারা এরূপ করে, এমন বলা যায় না। অপত্যপ্রীতি স্বাভাবিক বৃত্তি, এই জন্য ইহা করিয়া থাকে। অপত্যস্নেহ যদি স্বতন্ত্র স্বাভাবিক বৃত্তি হয়, তবে তাহা সাধারণ প্রীতিবৃত্তির বিরোধী হইবার সম্ভাবনা। অনেক সময়ে হইয়াও থাকে। অনেক সময়েই দেখিতে পাই যে, অনেকে অপত্যস্নেহের বশীভূত হইয়া পরের অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়। যেমন জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতির বিরোধ সম্ভাবনার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, জাগতিক প্রীতির সঙ্গে অপত্যপ্রীতিরও সেইরূপ বিরোধের শঙ্কা করিতে হয়।

কেবল তাহাই নহে। এখানে যে আত্মপ্রীতি আসিয়া যোগ দেয় না, এমন কথা বলা যায় না। ছেলে আমার, সুতরাং পরের কাড়িয়া লইয়া ইহাকে দিতে হইবে। ছেলের উপকারে আমার উপকার, অতএব যে উপায়ে হউক, ছেলের উপকার সিদ্ধ করিতে হইবে। এরূপ বুদ্ধির বশীভূত হইয়া অনেকে কার্য্য করিয়া থাকেন।

অতএব এই অপত্যপ্রীতির সামঞ্জস্যজন্য বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।

শিষ্য। এই সামঞ্জস্যের উপায় কি?

গুরু। উপায়—হিন্দুধর্ম্মের ও প্রীতিতত্ত্বের সেই মূল সূত্র—সর্ব্বভূতে সমদর্শন। অপত্যপ্রীতি সেই জাগাতিক প্রীতিতে নিমজ্জিত করিয়া, অপত্যপালন ও রক্ষণ ঈশ্বরোদ্দিষ্ট; সুতরাং অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম জানিয়া, "জগদীশ্বরের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছি, আমার ইহাতে ইষ্টানিষ্ট কিছু নাই," ইহা মনে বুঝিয়া, সেই অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিবে। তাহা হইলে এই অপত্যপালন ও রক্ষণধর্ম্ম নিষ্কাম ধর্ম্মে পরিণত হইবে। তাহা হইলে তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মেরও অতিশয় সুনির্ব্বাহ হইবে; অথচ তুমি নিজে এক দিকে শোকমোহাদি, আর এক দিকে পাপ ও দুর্ব্বাসনা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।

শিষ্য। আপনি কি অপত্যস্নেহ-বৃত্তির উচ্ছেদ করিয়া তাহার স্থানে জাগতিক প্রীতির সমাবেশ করিতে বলেন?

গুরু। আমি কোন বৃত্তিরই উচ্ছেদ করিতে বলি না, ইহা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি। তবে, পাশব বৃত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। পাশব বৃত্তিসকল স্বতঃস্ফূর্ত্ত। যাহা স্বতঃস্ফূর্ত্ত, তাহার দমনই অনুশীলন। অপত্যস্নেহ পরম রমণীয় ও পবিত্র বৃত্তি। পাশব বৃত্তিগুলির সঙ্গে ইহার এই ঐক্য আছে যে, ইহা যেমন মনুষ্যের আছে, তেমনি পশুদিগেরও আছে। তাদৃশ সকল বৃত্তিই স্বতঃস্ফূর্ত্ত, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অপত্যস্নেহও সেই জন্য স্বতঃস্ফূর্ত্ত। বরং সমস্ত মানসিক বৃত্তির অপেক্ষা ইহার বল দুর্দ্দমনীয় বলা যাইতে পারে। এখন অপত্যপ্রীতি যতই রমণীয় ও পবিত্র হউক না কেন, উহার অনুচিত স্ফূর্ত্তি ঘটিয়া উঠে। এই জন্য উহার সংযম আবশ্যক। উহার সংযম না করিলে, জাগতিক প্রীতি ও ঈশ্বরের ভক্তি, উহার স্রোতে ভাসিয়া যায়। আমি বলিয়াছি, ঈশ্বরে ভক্তি ও মনুষ্যে প্রীতি, ইহাই ধর্ম্মের সার, অনুশীলনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সুখের মূলীভূত এবং মনুষ্যত্বের চরম। অতএব অপত্যপ্রীতির অনুচিত স্ফুরণে এইরূপ ধর্ম্মনাশ, সুখনাশ, এবং মনুষ্যত্বনাশ ঘটিতে পারে; লোকে ইহার অন্যায় বশীভূত হইয়া ঈশ্বর ভুলিয়া যায়; ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলিয়া, অপত্য ভিন্ন আর সকল মনুষ্যকে ভুলিয়া যায়। আপনার অপত্য ভিন্ন আর কাহারও জন্য কিছু করিতে চাহে না। ইহাই অন্যায় স্ফূর্ত্তি। পক্ষান্তরে, অবস্থাবিশেষ ইহার দমন না করিয়া ইহার উদ্দীপনাই বিধেয় হয়। অন্যান্য পাশব বৃত্তি হইতে ইহার এক পার্থক্য এই যে, ইহা কামাদি নীচ বৃত্তির ন্যায় সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে। এমন নরপিশাচ ও পিশাচীও দেখা যায় যে, তাহাদের এই পরম রমণীয়, পবিত্র এবং সুখকর স্বাভাবিক বৃত্তি অন্তর্হিত। অনেক সময়ে সামাজিক পাপবাহুল্যে এই সকল বৃত্তির বিলোপ ঘটে। ধনলোভে পিশাচ পিশাচীরা পুত্র কন্যা বিক্রয় করে; লোকলজ্জাভয়ে কুলকলঙ্কিনীরা তাহাদের বিনাশ করে; কুলকলঙ্কভয়ে কুলাভিমানীরা কন্যাসন্তান বিনাশ করে; অনেক কামুকী কামাতুর হইয়া সন্তান পরিত্যাগ করিয়া যায়। অতএব এই বৃত্তির অভাব বা লোপও অতি ভয়ঙ্কর অধর্ম্মের কারণ। যেখানে ইহা উপযুক্তরূপে স্বতঃস্ফূর্ত্ত না হয়, সেখানে অনুশীলন দ্বারা ইহাকে স্ফুরিত করা আবশ্যক। উপযুক্তমত স্ফুরিত ও চরিতার্থ হইলে

ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন আর কোন বৃত্তিই ঈদৃশ সুখদ হয় না। সুখকারিতায় অপত্যপ্রীতি ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন সকল বৃত্তির অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ।

অপত্যপ্রীতি সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, দম্পতিপ্রীতি সম্বন্ধেও তাহা বলা যায়। অর্থাৎ (১) স্ত্রীর প্রতিপালন ও রক্ষণের ভার তোমার উপর। স্ত্রী নিজে আত্মরক্ষণে ও প্রতিপালনে অক্ষম। অতএব তাহা তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। স্ত্রী পালন ও রক্ষা ব্যতীত প্রজার বিলোপ সম্ভাবনা। এজন্য তৎপালন ও রক্ষণ জন্য স্বামীর প্রাণপাত করাও ধর্ম্মসঙ্গত।

(২) স্বামীর পালন ও রক্ষণ স্ত্রীর সাধ্য নহে, কিন্তু তাঁহার সেবা ও সুখসাধন তাঁহার সাধ্য। তাহাই তাঁহার ধর্ম্ম। অন্য ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ, হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ; হিন্দুধর্ম্মে স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলিয়াছে। যদি দম্পতিপ্রীতিকে পাশব বৃত্তিতে পরিণত না করা হয়, তবে ইহাই স্ত্রীর যোগ্য নাম। তিনি স্বামীর ধর্ম্মের সহায়। অতএব স্বামীর সেবা, সুখসাধন ও ধর্ম্মের সহায়তা, ইহাই স্ত্রীর ধর্ম্ম।

(৩) জগৎ রক্ষার্থ এবং ধর্ম্মাচরণের জন্য দম্পতিপ্রীতি। তাহা স্মরণ রাখিয়া এই প্রীতির অনুশীলন করিলে ইহাও নিষ্কাম ধর্ম্মে পরিণত হইতে পারে, ও হওয়াই উচিত। নহিলে ইহা নিষ্কাম কর্ম্ম নহে।

শিষ্য। আমি এই দম্পতিপ্রীতিকেই পাশব বৃত্তি বলি, অপত্যপ্রীতিকে পাশব বৃত্তি বলিতে তত সম্মত নহি। কেন না, পশুদিগেরও দাম্পত্য অনুরাগ আছে। সে অনুরাগও অতিশয় তীব্র;

গুরু। পশুদিগের দম্পতিপ্রীতি নাই।

শিষ্য। মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে
পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
শৃঙ্গেণঃ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং
মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥
দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি
গজায় গণ্ডূষজলং করেণুঃ।
অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং
সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা॥

গুরু। ওহো! কিন্তু আসল কথাটা ছাড়িয়া গেলে যে!
তং দেশমারোপিতপুষ্পচাপে
রতিদ্বিতীয়ে মদনে প্রপন্নে—ইত্যাদি।

রতি সহিত মন্মথ সেখানে উপস্থিত, তাই এই পাশব অনুরাগের বিকাশ। কবি নিজেই বলিয়া দিয়াছেন যে, এই অনুরাগ স্মরজ। ইহা পশুদিগেরও আছে, মনুষ্যেরও আছে। ইহাকে কামবৃত্তি বলিয়া পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি। ইহাকে দম্পতিপ্রীতি বলি না। ইহা পাশব বৃত্তি বটে, স্বতঃস্ফূর্ত্ত, এবং ইহার দমনই অনুশীলন। কাম, সহজ; দম্পতিপ্রীতি সংসর্গজ; কামজনিত অনুরাগ ক্ষণিক, দম্পতিপ্রীতি স্থায়ী। তবে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, অনেক সময়ে এই কামবৃত্তি আসিয়া দম্পতিপ্রীতিস্থান

অধিকার করে। অনেক সময়ে তাহার স্থান অধিকার না করুক, দম্পতিপ্রীতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়। সে অবস্থায় যে পরিমাণে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, বাসনার প্রবলতা, সেই পরিমাণে দম্পতিপ্রীতিও পাশবতা প্রাপ্ত হয়। এই সকল অবস্থায় দম্পতিপ্রীতি অতিশয় বলবতী বৃত্তি হইয়া উঠে। এ সকল অবস্থায় তাহার সামঞ্জস্য আবশ্যক। যে সকল নিয়ম পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাই সামঞ্জস্যের উত্তম উপায়।

শিষ্য। আমি যতদূর বুঝিতে পারি, এই কামবৃত্তিই সৃষ্টিরক্ষার উপায়। দম্পতি-প্রীতি ব্যতীত ইহার দ্বারাই জগৎ রক্ষিত হইতে পারে। ইহাই তবে নিষ্কাম ধর্ম্মে পরিণত করা যাইতে পারে। দম্পতিপ্রীতি যে নিষ্কাম ধর্ম্মে পরিণত করা যাইতে পারে, এমন বিচারপ্রণালী দেখিতেছি না।

গুরু। স্মরজ বৃত্তিও যে নিষ্কাম কর্ম্মের কারণ হইতে পারে, ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু তোমার আসল কথাতেই ভুল। দম্পতিপ্রীতি ব্যতীত কেবল পাশব বৃত্তিতে জগৎ রক্ষা হইতে পারে না।

শিষ্য। পশুসৃষ্টি ত কেবল তদ্দ্বারাই রক্ষিত হইয়া থাকে।

গুরু। পশুসৃষ্টি রক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্যসৃষ্টি রক্ষা পাইতে পারে না। কারণ, পশুদিগের স্ত্রীদিগের আত্মরক্ষার ও আত্মপালনের শক্তি আছে। মনুষ্যস্ত্রীর তাহা নাই। অতএব মনুষ্যজাতিমধ্যে পুরুষ দ্বারা স্ত্রীজাতির পালন ও রক্ষণ না হইলে স্ত্রীজাতির বিলোপের সম্ভাবনা।

শিষ্য। মনুষ্যজাতির অসভ্যাবস্থায় কিরূপ?

গুরু। যেরূপ অসভ্যাবস্থায় মনুষ্য পশুতুল্য, অর্থাৎ বিবাহপ্রথা নাই, সেই অবস্থায় স্ত্রীলোক সকল আত্মরক্ষায় ও আত্মপালনে সক্ষম কি না, তাহা বিচারের প্রয়োজন নাই। কেন না, তাদৃশ অসভ্যাবস্থার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। মনুষ্য যতদিন সমাজভুক্ত না হয় তত দিন তাহাদের শারীরিক ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম নাই বলিলেও হয়। ধর্ম্মাচরণ জন্য সমাজ আবশ্যক। সমাজ ভিন্ন জ্ঞানোন্নতি নাই; জ্ঞানোন্নতি ভিন্ন ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান সম্ভবে না। ধর্ম্মজ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি সম্ভবে না; এবং যেখানে অন্য মনুষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, সেখানে মনুষ্যে প্রীতি প্রভৃতি ধর্ম্মও সম্ভবে না। অর্থাৎ অসভ্যাবস্থায় শারীরিক ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্ম সম্ভব নহে।

ধর্ম্মজন্য সমাজ আবশ্যক। সমাজগঠনের পক্ষে একটি প্রথম প্রয়োজন বিবাহপ্রথা। বিবাহপ্রথার স্থূল মর্ম্ম এই যে, স্ত্রীপুরুষ এক হইয়া সাংসারিক ব্যাপার ভাগে নির্ব্বাহ করিবে। যাহার যাহা যোগ্য, সে সেই ভাগের ভারপ্রাপ্ত। পুরুষের ভাগ—পালন ও রক্ষণ। স্ত্রী অন্য ভারপ্রাপ্ত, পালন ও রক্ষণে সক্ষম হইলেও বিরত। বহুপুরুষ-পরম্পরায় এইরূপ বিরতি ও অনভ্যাসবশতঃ সামাজিক নারী আত্মপালনে ও রক্ষণে অক্ষম। এ অবস্থায় পুরুষ স্ত্রীপালন ও রক্ষণ না করিলে অবশ্য স্ত্রীজাতির বিলোপ ঘটিবে। অথচ যদি পুনশ্চ তাহাদিগের সে শক্তি পুনরভ্যাসে পুরুষপরম্পরা উপস্থিত হইতে পারে, এমন কথা বল, তবে বিবাহপ্রথার বিলোপ এবং সমাজ ও ধর্ম্ম বিনষ্ট হইলে তাহার সম্ভাবনা নাই, ইহাও বলিতে হইবে।

শিষ্য। তবে পাশ্চাত্ত্যেরা যে স্ত্রীপুরুষের সাম্য স্থাপন করিতে চাহেন, সেটা সামাজিক বিড়ম্বনা মাত্র ?

গুরু। সাম্য কি সম্ভব ? পুরুষে কি প্রসব করিতে পারে, না শিশুকে স্তন্য পান করাইতে পারে ? পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকের পল্টন লইয়া লড়াই চলে কি ?

শিষ্য। তবে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের কথা যে পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে খাটে না ?

গুরু। কেন খাটিবে না ? যাহার যে শক্তি আছে, সে তাহার অনুশীলন করিবে। স্ত্রীলোকের যুদ্ধ করিবার শক্তি থাকে, তাহা অনুশীলিত করুক ; পুরুষের স্তন্য পান করাইবার শক্তি থাকে, অনুশীলিত করুক।

শিষ্য। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্ত্য স্ত্রীলোকেরা ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক ছোড়া প্রভৃতি পৌরুষ কর্ম্মে বিলক্ষণ পটুতা লাভ করিয়া থাকে।

গুরু। অভ্যাস ও অনুশীলনে যে প্রভেদের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। অনুশীলন, শক্তির অনুকূল ; অভ্যাস, শক্তির প্রতিকূল। অনুশীলনে শক্তির বিকাশ ; অভ্যাসে বিকার। এ সকল অভ্যাসের ফল, অনুশীলনের নহে। অভ্যাস, প্রয়োজনমতে কর্ত্তব্য, অনুশীলন সর্ব্বত্র কর্ত্তব্য।

যাক। এ তত্ত্ব যেটুকু বলা আবশ্যক, তাহা বলা গেল। এখন অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি সম্বন্ধে কয়টা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা পুনরুক্ত করিয়া সমাপ্ত করি।

প্রথম, বলিয়াছি যে, অপত্যপ্রীতি স্বতঃস্ফূর্ত্ত। দম্পতিপ্রীতি স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে ; কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত্ত ইন্দ্রিয়লালসা ইহার সঙ্গে সংযুক্ত হইলে, ইহাও স্বতঃস্ফূর্ত্তের ন্যায় বলবতী হয়। এই উভয় বৃত্তিই এই সকল কারণে অতি দুর্দ্দমনীয় বেগবিশিষ্ট। অপত্যপ্রীতির ন্যায় দুর্দ্দমনীয় বেগবিশিষ্ট বৃত্তি মনুষ্যের আর আছে কিনা সন্দেহ। নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

দ্বিতীয়, এই দুইটি বৃত্তিই অতিশয় রমণীয়। ইহাদের তুল্য বল আর কোন বৃত্তির থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু এমন পরম রমণীয় বৃত্তি মনুষ্যের আর নাই। রমণীয়তায় এই দুইটি বৃত্তি সমস্ত মনুষ্যবৃত্তিকে এত দূর পরাভব করিয়াছে যে, এই দুইটি বৃত্তি, বিশেষতঃ দম্পতিপ্রীতি সকল জাতির কাব্য সাহিত্য অধিকৃত করিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত জগতে ইহাই কাব্যের একমাত্র উপাদান বলিলেও বলা যায়।

তৃতীয়তঃ, সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে সুখকরও এই দুই বৃত্তির তুল্যও আর নাই। ভক্তি ও জাগতিক প্রীতির সুখ উচ্চতর ও তীব্রতর, কিন্তু তাহা অনুশীলন ভিন্ন পাওয়া যায় না ; সে অনুশীলনও কঠিন ও জ্ঞানসাপেক্ষ। কিন্তু অপত্যপ্রীতির সুখ অনুশীলন-সাপেক্ষ নহে ; এবং দম্পতিপ্রীতির সুখ কিয়ৎপরিমাণে অনুশীলনসাপেক্ষ হইলেও সে অনুশীলন অতি সহজ ও সুখকর।

এই সকল কারণে এই দুই বৃত্তি অনেক সময়ে মনুষ্যের ঘোরতর ধর্ম্মবিঘ্নে পরিণত হয়। ইহারা পরম রমণীয় এবং অতিশয় সুখদ, এজন্য ইহাদের অপরিমিত অনুশীলনে মনুষ্যের অতিশয় প্রবৃত্তি। এবং ইহার বেগ দুর্দ্দমনীয়, এই জন্য ইহার অনুশীলনের ফল, ইহাদের সর্ব্বগ্রাসিনী বৃদ্ধি। তখন ভক্তি, প্রীতি এবং সমস্ত ধর্ম্ম ইহাদের বেগে ভাসিয়া

যায়। এই জন্য সচরাচর দেখা যায় যে, মনুষ্য স্ত্রীপুত্রাদির স্নেহের বশীভূত হইয়া অন্য সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। বাঙ্গালির এ কলঙ্ক বিশেষ বলবান্।

এই কারণে যাঁহারা সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বী, তাঁহাদিগের নিকট অপত্যপ্রীতি ও দম্পতি-প্রীতি অতিশয় ঘৃণিত। তাঁহারা স্ত্রীমাত্রকেই পিশাচী মনে করেন। আমি তোমাকে বুঝাইতেছি, অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি সমুচিত মাত্রায় পরম ধর্ম্ম। তাহা পরিত্যাগ ঘোরতর অধর্ম্ম। অতএব সন্ন্যাসধর্ম্মাবলম্বীদিগের এই আচরণ যে মহৎ পাপাচরণ, তাহা তোমাকে বলিতে হইবে না। আর জাগতিক-প্রীতি-তত্ত্ব বুঝাইবার সময় তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, এই পারিবারিক প্রীতি জাগতিক প্রীতিতে আরোহণ করিবার প্রথম সোপান। যাহারা এই সোপানে পদার্পণ না করে, তাহারা জাগতিক প্রীতিতে আরোহণ করিতে পারে না।

শিষ্য। যীশু?

গুরু। যীশু বা শাক্যসিংহের ন্যায় যাহারা পারে, তাহাদের ঈশ্বরাংশ বলিয়া মনুষ্যে স্বীকার করিয়া থাকে। ইহাই প্রমাণ যে, এই বিধি যীশু বা শাক্যসিংহের ন্যায় মনুষ্য ভিন্ন আর কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। আর যীশু বা শাক্যসিংহ যদি গৃহী হইয়া জগতের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের ধার্ম্মিকতা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইত সন্দেহ নাই।* আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ গৃহী। যীশু বা শাক্যসিংহ সন্ন্যাসী—আদর্শ পুরুষ নহেন।

অপত্যপ্রীতি ও দম্পতিপ্রীতি ভিন্ন স্বজনপ্রীতির ভিতর আরও কিছু আছে। (১) যাহারা অপত্যস্থানীয়, তাহারাও অপত্যপ্রীতির ভাগী। (২) যাহারা শোণিত-সম্বন্ধে আমাদের সহিত সম্বন্ধ, যথা—ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি, তাহারাও আমাদের প্রীতির পাত্র। সংসর্গজনিতই হউক, আত্মপ্রীতির সম্প্রসারণেই হউক, তাহাদের প্রতি প্রীতি সচরাচর জন্মিয়া থাকে। (৩) এইরূপ প্রীতির সম্প্রসারণ হইতে থাকিলে, কুটুম্বাদি ও প্রতিবাসিগণ প্রীতির পাত্র হয়, ইহা প্রীতির নৈসর্গিক বিস্তার কথনকালে বলিয়াছি। (৪) এমন অনেক ব্যক্তির সংসর্গে আমরা পড়িয়া থাকি যে, তাহারা আমাদের স্বজনমধ্যে গণনীয় না হইলেও তাহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া আমরা তাহাদের প্রতি বিশেষ প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকি। এই বন্ধুপ্রীতি অনেক সময়ে অত্যন্ত বলবতী হইয়া থাকে।

ঈদৃশ প্রীতিও অনুশীলনীয় ও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। সামঞ্জস্যের সাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ইহার অনুশীলন করিবে।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়—স্বদেশপ্রীতি

গুরু। অনুশীলনের উদ্দেশ্য, সমস্ত বৃত্তিগুলিকে স্ফুরিত ও পরিণত করিয়া ঈশ্বর-মুখী করা। ইহার সাধন, কর্ম্মীর পক্ষে, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন, সমস্ত জগৎ আত্মবৎ প্রীতির আধার হওয়া উচিত। জাগতিক প্রীতির ইহাই মূল। এই মৌলিকতা দেখিতে পাইতেছ, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্মের। সমস্ত জগৎ কেন আপনার মত ভাল বাসিব? ইহা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম বলিয়া। তবে, যদি এমন কাজ দেখি যে, তাহাও

* 'কৃষ্ণচরিত্র' নামক গ্রন্থে এই কথাটা বর্ত্তমান গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

ঈশ্বরোদ্দিষ্ট, কিন্তু এই জাগতিক প্রীতির বিরোধী, তবে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য? যদি দুই দিক্ বজায় না রাখা যায়, তবে কোন্ দিক্ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য?

শিষ্য। সে স্থলে বিচার করা কর্ত্তব্য। বিচারে যে দিক্ গুরু হইবে, সেই দিক্ অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

গুরু। তবে, যাহা বলি, তাহা শুনিয়া বিচার কর। দম্পতিপ্রীতি-তত্ত্ব বুঝাইবার সময়ে বুঝাইয়াছি যে, সমাজের বাহিরে মনুষ্যের কেবল পশুজীবন আছে মাত্র, সমাজের ভিতরে ভিন্ন মনুষ্যের ধর্ম্মজীবন নাই। সমাজের ভিতরে ভিন্ন কোন প্রকার মঙ্গল নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমাজধ্বংসে সমস্ত মনুষ্যের ধর্ম্মধ্বংস। এবং সমস্ত মনুষ্যের সকলপ্রকার মঙ্গলধ্বংস। তোমার ন্যায় সুশিক্ষিতকে কষ্ট পাইয়া এ কথাটা বোধ করি বুঝাইতে হইবে না।

শিষ্য। নিষ্প্রয়োজন। বাচস্পতি মহাশয় দেশে থাকিলে এ সকল বিষয়ে আপত্তি উত্থাপিত করার ভার তাঁরে দিতাম।

গুরু। যদি তাহাই হইল, যদি সমাজধ্বংসে ধর্ম্মধ্বংস এবং মনুষ্যের সমস্ত মঙ্গলের ধ্বংস, তবে সব রাখিয়া আগে সমাজ রক্ষা করিতে হয়। এই জন্য হর্বর্ট স্পেন্সার বলিয়াছেন, "The life of the social organism must, as an end, rank above the lives of its units." অর্থাৎ আত্মরক্ষার অপেক্ষাও দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এবং এই জন্যই সহস্র সহস্র ব্যক্তি আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও দেশরক্ষার চেষ্টা করিয়াছেন।

যে কারণে আত্মরক্ষার অপেক্ষা দেশরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, সেই কারণেই ইহা স্বজনরক্ষার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। কেন না, তোমার পরিবারবর্গ সমাজের সামান্য অংশ মাত্র, সমুদায়ের জন্য অংশ মাত্রকে পরিত্যাগ বিধেয়।

আত্মরক্ষার ন্যায় ও স্বজনরক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম; কেন না, ইহা সমস্ত জগতের হিতের উপায়। পরস্পরের আক্রমণে সমস্ত বিনষ্ট বা অধঃপতিত হইয়া কোন পরস্বলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির অধিকারভুক্ত হইলে, পৃথিবী হইতে ধর্ম্ম ও উন্নতি বিলুপ্ত হইবে। এইজন্য সর্ব্বভূতের হিতের জন্য সকলেরই স্বদেশরক্ষণ কর্ত্তব্য।

যদি স্বদেশরক্ষাও আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার ন্যায় ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম হয়, তবে ইহাও নিষ্কাম কর্ম্মে পরিণত হইতে পারে। ইহা যে আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষার অপেক্ষা সহজে নিষ্কাম কর্ম্মে পরিণত হইতে পারে ও হইয়া থাকে, তাহা বোধ করি কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে হইবে না।

শিষ্য। প্রশ্নটা উত্থাপিত করিয়া আপনি বলিয়াছিলেন, "বিচার কর।" এক্ষণে বিচারে কি নিষ্পন্ন হইল?

গুরু। বিচারে এই নিষ্পন্ন হইতেছে যে, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি যাদৃশ আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা এবং দেশরক্ষা আমার তাদৃশ অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। উভয়েরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যখন উভয়ে পরস্পরবিরোধী হইবে, তখন কোন্ দিক্ গুরু, তাহাই দেখিবে। আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা দেশরক্ষা—জগৎরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়, অতএব সেই দিক্ অবলম্বনীয়।

কিন্তু বস্তুতঃ জাগতিক প্রীতির সঙ্গে, আত্মপ্রীতি বা স্বজনপ্রীতি বা দেশপ্রীতির কোন বিরোধ নাই। যে আক্রমণকারী, তাহা হইতে আত্মরক্ষা করিব, কিন্তু তাহার প্রতি প্রীতিশূন্য কেন হইব? ক্ষুধার্ত্ত চোরের উদাহরণের দ্বারা ইহা তোমাকে পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। আর ইহাও বুঝাইয়াছি যে, জাগতিক প্রীতি এবং সর্ব্বত্র সমদর্শনের এমন তাৎপর্য্য নহে যে, পড়িয়া মার খাইতে হইবে! ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যখন সকলেই আমার তুল্য, তখন আমি কখন কাহারও অনিষ্ট করিব না। কোন মনুষ্যেরও করিব না এবং কোন সমাজেরও করিব না। আপনার সমাজের যেমন সাধ্যানুসারে ইষ্ট সাধন করিব, সাধ্যানুসারে পর সমাজেরও তেমনি ইষ্ট সাধন করিব। সাধ্যানুসারে—কেন না, কোন সমাজের অনিষ্ট করিয়া অন্য কোন সমাজের ইষ্ট সাধন করিব না। পর-সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া, আমার সমাজের ইষ্ট সাধন করিব না, এবং আমার সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া, কাহারেও আপনার সমাজের ইষ্ট সাধন করিতে দিব না। ইহাই যথার্থ সম দর্শন এবং ইহাই জাগতিক প্রীতি ও দেশপ্রীতির সামঞ্জস্য। কয় দিন পূর্ব্বে তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার উত্তর পাইলে। বোধ করি, তোমার মনে ইউরোপীয় Patriotism ধর্ম্মের কথা জাগিতেছিল, তাই তুমি এ প্রশ্ন করিয়াছিলে। আমি তোমাকে যে দেশপ্রীতি বুঝাইলাম, তাহা ইউরোপীয় Patriotism নহে। ইউরোপীয় Patriotism একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ! ইউরোপীয় Patriotism ধর্ম্মের তাৎপর্য্য এই যে, পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্ব্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। এই দুরন্ত Patriotism প্রভাবে আমেরিকার আদিম জাতিসকল পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইল। জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবর্ষীয়ের কপালে এরূপ দেশবাৎসল্য ধর্ম্ম না লিখেন। এখন বল, প্রীতিতত্ত্বের স্থূল তত্ত্ব কি বুঝিলে?

শিষ্য। বুঝিয়াছি যে, মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলি অনুশীলিত হইয়া যখন ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হইবে, মনের সেই অবস্থাই ভক্তি।

এই ভক্তির ফল, জাগতিক প্রীতি। কেন না, ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন।

এই জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি এবং স্বদেশপ্রীতির প্রকৃত পক্ষে কোন বিরোধ নাই। আপাততঃ যে বিরোধ আমরা অনুভব করি, সেটা এই সকল বৃত্তিকে নিষ্কামতায় পরিণত করিতে আমরা যত্ন করি না, এই জন্য। অর্থাৎ সমুচিত অনুশীলনের অভাবে।

আরও বুঝিয়াছি, আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম, স্বজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম। যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্ব্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন, দেশপ্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম।

গুরু। ইহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অবনতির কারণ পাইলে। ভারতবর্ষীয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্ব্বলোকে সমদৃষ্টি ছিল। কিন্তু তাঁহারা দেশপ্রীতি সেই সার্ব্বলৌকিক প্রীতিতে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা প্রীতিবৃত্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলন নহে। দেশপ্রীতি ও সার্ব্বলৌকিক প্রীতি, উভয়ের অনুশীলন

ও পরস্পর সামঞ্জস্য চাই। তাহা ঘটিলে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিতে পারিবে।

শিষ্য। ভারতবর্ষ আপনার ব্যাখ্যাত অনুশীলনতত্ত্ব বুঝিতে পারিলে ও কার্য্যে পরিণত করিলে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ করিবে, তদ্বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়—পশুপ্রীতি

গুরু। প্রীতিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আর একটি কথা বাকি আছে। অন্য সকল ধর্ম্মের অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্ম যে শ্রেষ্ঠ, তাহার সহস্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রীতিতত্ত্ব যাহা তোমাকে বুঝাইলাম, ইহার ভিতরেই তাহার কত উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে। হিন্দুদিগের জাগতিক প্রীতি যাহা তোমাকে বুঝাইয়াছি, তাহাতেই ইহার চমৎকার উদাহরণ পাইয়াছ। অন্য ধর্ম্মেও সর্ব্বলোকে প্রীতিযুক্ত হইতে বলে বটে, কিন্তু তাহার উপযুক্ত মূল কিছুই নির্দ্দেশ করিতে পারে না। হিন্দুধর্ম্মের এই জাগতিক প্রীতি জগত্তত্ত্বে দৃঢ় বদ্ধমূল। ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপকতায় ইহার ভিত্তি। হিন্দুদিগের দম্পতি-প্রীতি সমালোচনায় আর একটি এই শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ পাওয়া যায়; হিন্দুদিগের দম্পতিপ্রীতি অন্য জাতির আদর্শস্থল; হিন্দুধর্ম্মের বিবাহপ্রথা ইহার কারণ।* আমি এক্ষণে প্রীতিতত্ত্বঘটিত আর একটি প্রমাণ দিব।

ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন। এই জন্য সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি করিতে হইবে। কিন্তু সর্ব্বভূত বলিলে কেবল মনুষ্য বুঝায় না। সমস্ত জীব সর্ব্বভূতান্তর্গত। অতএব পশুগণও মনুষ্যের প্রীতির পাত্র। মনুষ্যও যেরূপ প্রীতির পাত্র, পশুগণও সেইরূপ প্রীতির পাত্র। এইরূপ অভেদজ্ঞান আর কোন ধর্ম্মে নাই, কেবল হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দুধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন বৌদ্ধধর্ম্মে আছে।

শিষ্য। কথা বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে পাইয়াছে, না হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে পাইয়াছে?

গুরু। অর্থাৎ তোমার জিজ্ঞাস্য যে, ছেলে বাপের বিষয় পাইয়াছে, না বাপ ছেলের বিষয় পাইয়াছে?

শিষ্য। বাপ কখন ছেলের বিষয় পায়?

গুরু। যে প্রকৃতির গতিবিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থন করে, প্রমাণের ভার তাহার উপর। বৌদ্ধ পক্ষে প্রমাণ কি?

শিষ্য। কিছুই না বোধ হয়। হিন্দু পক্ষে প্রমাণ কি?

গুরু। ছেলে বাপের বিষয় পায়, এই কথাই যথেষ্ট। তা ছাড়া বাজসনেয় উপনিষৎ শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ দিয়াছি যে, সর্ব্বভূতের যে সাম্য, ইহা প্রাচীন বেদোক্ত ধর্ম্ম।

শিষ্য। কিন্তু বেদে ত অশ্বমেধাদির বিধি আছে।

* বাবু চন্দ্রনাথ বসু প্রণীত হিন্দুবিবাহ বিষয়ক পুস্তিকা দেখ।

গুরু। বেদ যদি কোন এক ব্যক্তিবিশেষ-প্রণীত একখানি গ্রন্থ হইত, তাহা হইলে না হয় বেদের প্রতি অসঙ্গতি দোষ দেওয়া যাইত। Thomas Acquinas সঙ্গে হর্বর্ট স্পেন্সরের সঙ্গতি খোঁজা যত দূর সঙ্গত, বেদের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সঙ্গতির সন্ধানও তত দূর সঙ্গত। হিংসা হইতে অহিংসায় ধর্ম্মের উন্নতি। যাক্। হিন্দুধর্ম্মবিহিত "পশুদিগের প্রতি অহিংসা" পরম রমণীয় ধর্ম্ম। যত্নে ইহার অনুশীলন করিবে। অহিন্দুরা যত্নে ইহার অনুশীলন করিয়া থাকে। খাইবার জন্য বা চাষের জন্য বা চড়িবার জন্য যাহারা গো মেষ অশ্বাদির পালন করে, আমি কেবল তাহাদের কথা বলিতেছি না। কুকুরের মাংস খাওয়া যায় না, তথাপি কত যত্নে খৃষ্টানেরা কুকুর পালন করে! তাহাতে তাহাদের কত সুখ! আমাদের দেশে কত স্ত্রীলোক বিড়াল পুষিয়া অপত্যহীনতার দুঃখ নিবারণ করে। একটি পক্ষী পুষিয়া কে না সুখী হয়? আমি একদা একখানি ইংরাজি গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম,—যে বাড়ীতে দেখিবে—পিঞ্জরে পক্ষী আছে, জানিবে—সেই বাড়ীতে একজন বিজ্ঞ মানুষ আছে। গ্রন্থখানির নাম মনে নাই, কিন্তু মানুষের কথা বটে।

পশুদিগের মধ্যে গো হিন্দুদিগের বিশেষ প্রীতির পাত্র। গোরুর তুল্য হিন্দুর পরমোপকারী আর কেহই নাই। গোদুগ্ধ হিন্দুর দ্বিতীয় জীবন স্বরূপ। হিন্দু, মাংস ভোজন করে না। যে অন্ন আমরা ভোজন করি, তাহাতে পুষ্টিকর (nitrogenous) দ্রব্য বড় অল্প, গোরুর দুগ্ধ না খাইলে সে অভাব মোচন হইত না। কেবল গোরুর দুগ্ধ খাইয়াই আমরা মানুষ এমন নহে; যে ধান্যের উপর আমাদের নির্ভর, তাহার চাষও গোরুর উপর নির্ভর—গোরুই আমাদের অন্নদাতা। গোরু কেবল ধান্য উৎপাদন করিয়াই ক্ষান্ত নহে; তাহা মাঠ হইতে গোলায়, গোলা হইতে বাজারে, বাজার হইতে ঘরে বহিয়া দিয়া যায়। ভারতবর্ষের সমস্ত বহনকার্য্য গোরুই করে। গোরু মরিয়াও দ্বিতীয় দধীচির ন্যায়, অস্থির দ্বারা, শৃঙ্গের দ্বারা ও চামড়ার দ্বারা উপকার করে। মূর্খে বলে, গোরু হিন্দুর দেবতা; দেবতা নহে, কিন্তু দেবতার ন্যায় উপকার করে। বৃষ্টিদেবতা ইন্দ্র আমাদের যত উপকার করে; গোরু তাহার অধিক উপকার করে। ইন্দ্র যদি পূজার্হ হয়েন, গোরুও তবে পূজার্হ। যদি কোন কারণে বাঙ্গালা দেশে হঠাৎ গোবংশ লোপ পায়, তবে বাঙ্গালি জাতিও লোপ পাইবে সন্দেহ নাই। যদি হিন্দু, মুসলমানের দেখাদেখি গোরু খাইতে শিখিত, তবে হয় এত দিন হিন্দু নাম লোপ পাইত, নয় হিন্দুরা অতিশয় দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া থাকিত। হিন্দুর অহিংসা ধর্ম্মই এখানে হিন্দুকে রক্ষা করিয়াছে। অনুশীলনের ফল হাতে হাতে দেখ। পশু-প্রীতি অনুশীলিত হইয়াছিল বলিয়াই হিন্দুর এ উপকার হইয়াছে।

শিষ্য। বাঙ্গালার অর্দ্ধেক কৃষক মুসলমান।

গুরু। তাহারা হিন্দুজাতিসম্ভূত বলিয়াই হউক, আর হিন্দুর মধ্যে থাকার জন্যই হউক আচারে ত তাহারা হিন্দু। তাহারা গোরু খায় না। হিন্দুবংশসম্ভূত হইয়া যে গোরু খায়, সে কুলাঙ্গার ও নরাধম।

শিষ্য। অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত বলেন, হিন্দুরা জন্মান্তরবাদী; তাহারা মনে করে, কি জানি, আমাদের কোন্ পূর্ব্বপুরুষ দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া কোন্ পশু হইয়া আছেন, এই আশঙ্কায় হিন্দুরা পশুদিগের প্রতি দয়াবান্।

গুরু। তুমি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতে ও পাশ্চাত্ত্য গর্দ্দভে গোল করিয়া ফেলিতেছ। এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম কিছু কিছু বুঝিলে, এক্ষণে ডাক শুনিলে গর্দ্দভ চিনিতে পারিবে।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়—দয়া

গুরু। ভক্তি ও প্রীতির পর দয়া। আর্ত্তের প্রতি যে বিশেষ প্রীতিভাব, তাহাই দয়া। প্রীতি যেমন ভক্তির অন্তর্গত, দয়া তেমনই প্রীতির অন্তর্গত। যে আপনাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আপনাতে দেখে, সে সর্ব্বভূতে দয়াময়। অতএব ভক্তির অনুশীলনেই যেমন প্রীতির অনুশীলন, তেমনই প্রীতির অনুশীলনেই দয়ার অনুশীলন। ভক্তি, প্রীতি, দয়া হিন্দুধর্ম্মে এক সূত্রে গ্রথিত—পৃথক্ করা যায় না। হিন্দুধর্ম্মের মত সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন ধর্ম্ম আর দেখা যায় না।

শিষ্য। তথাপি দয়ার পৃথক্ অনুশীলন হিন্দুধর্ম্মে অনুজ্ঞাত হইয়াছে।

গুরু। ভূরি ভূরি, পুনঃ পুনঃ। দয়ার অনুশীলন যত পুনঃ পুনঃ অনুজ্ঞাত হইয়াছে, এমন কিছুই নহে। যাহার দয়া নাই, সে হিন্দুই নহে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের এই সকল উপদেশে দয়া কথাটা তত ব্যবহৃত হয় নাই, যত দান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। দয়ার অনুশীলন দানে, কিন্তু দান কথাটা লইয়া একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে। দান বলিলে সচরাচর আমরা অন্নদান, বস্ত্রদান, ধনদান ইত্যাদিই বুঝি। কিন্তু দানের এরূপ অর্থ অতি সঙ্কীর্ণ। দানের প্রকৃত অর্থ ত্যাগ। ত্যাগ ও দান পরস্পর প্রতিশব্দ। দয়ার অনুশীলনার্থ ত্যাগ শব্দও অনেক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ত্যাগ অর্থে কেবল ধনত্যাগ বুঝা উচিত নহে। সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ—আত্মত্যাগ পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে। অতএব যখন দানধর্ম্ম আদিষ্ট হইয়াছে, তখন আত্মত্যাগ পর্য্যন্ত ইহাতে আদিষ্ট হইল বুঝিতে হইবে। এইরূপ দানই যথার্থ দয়ার অনুশীলনমার্গ। নহিলে তোমার অনেক টাকা আছে, তাহার অত্যল্পাংশ তুমি কোন দরিদ্রকে দিলে, ইহাতে তাহাকে দয়া করা হইল না। কেন না, যেমন জলাশয় হইতে এক গণ্ডূষ জল তুলিয়া লইলে জলাশয়ের কোন প্রকার সঙ্কোচ হয় না, তেমনি এইরূপ দানে তোমারও কোন প্রকার কষ্ট হইল না, কোন প্রকার আত্মোৎসর্গ হইল না। এরূপ দান যে না করে, সে ঘোরতর নরাধম বটে, কিন্তু যে করে, সে একটা বাহাদুর নয়। ইহাতে দয়া বৃত্তির প্রকৃত অনুশীলন নাই। আপনাকে কষ্ট দিয়া পরের উপকার করিবে, তাহাই দান।

শিষ্য। যদি আপনিই কষ্ট পাইলাম, তবে বৃত্তির অনুশীলনে সুখ হইল কৈ? অথচ আপনি বলিয়াছেন—সুখের উপায় ধর্ম্ম।

গুরু। যে, বৃত্তিকে অনুশীলিত করে, তাহার সেই কষ্টই পরম পবিত্র সুখে পরিণত হয়। শ্রেষ্ঠ বৃত্তিগুলি—ভক্তি, প্রীতি, দয়া; ইহাদের একটি লক্ষণ এই, ইহাদের অনুশীলনজনিত দুঃখ সুখে পরিণত হয়। এই বৃত্তিগুলি সকল দুঃখকেই সুখে পরিণত করে। সুখের উপায় ধর্ম্মই বটে, আর সেই যে কষ্ট, সেও যত দিন আত্ম-পর ভেদজ্ঞান থাকে, তত দিনই লোক তাহাকে কষ্ট নাম দেয়। ফলতঃ ধর্ম্মানুমোদিত যে আত্মপ্রীতি, তাহার সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত পরের জন্য যে আত্মত্যাগ, তাহা ঈশ্বরানুমোদিত; এ জন্য নিষ্কাম হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিবে। সামঞ্জস্যবিধি পূর্ব্বে বলিয়াছি।

এক্ষণে দানধর্ম্ম যে ভাবে সাধারণ হিন্দুশাস্ত্রকারদিগের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ শাস্ত্রকারেরা (সকলে নহে) বলেন, দান করিলে পুণ্য হয়, এজন্য দান করিবে। এখানে "পুণ্য"—স্বর্গাদি কাম্য বস্তু লাভের উপায়। দান করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়, এই জন্য দান করিবে, ইহাই সাধারণ হিন্দুশাস্ত্রকারের ব্যবস্থা। এরূপ দানকে ধর্ম্ম বলিতে পারি না। স্বর্গলাভার্থ ধন দান করার অর্থ—মূল্য দিয়া স্বর্গে একটু জমি খরিদ করা, স্বর্গের জন্য টাকা দাদন দিয়া রাখা মাত্র। ইহা ধর্ম্ম নহে, বিনিময় বা বাণিজ্য। এরূপ দানকে ধর্ম্ম বলা ধর্ম্মের অবমাননা।

দান করিতে হইবে, কিন্তু নিষ্কাম হইয়া দান করিবে। দয়াবৃত্তির অনুশীলন জন্য দান করিবে; দয়াবৃত্তিতে প্রীতিবৃত্তিরই অনুশীলন, এবং প্রীতি ভক্তিরই অনুশীলন; অতএব ভক্তি, প্রীতি, দয়ার অনুশীলন জন্য দান করিবে, বৃত্তির অনুশীলন ও স্ফূর্ত্তিতে ধর্ম্ম, অতএব ধর্ম্মার্থেই দান করিবে, পুণ্যার্থে বা স্বর্গার্থ নহে। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন; অতএব সর্ব্বভূতে দান করিবে, যাহা ঈশ্বরের, তাহা ঈশ্বরকে দেয়, ঈশ্বরে সর্ব্বস্ব দানই মনুষ্যত্বের চরম। সর্ব্বভূতে এবং তোমাতে অভেদ, অতএব তোমার সর্ব্বস্বে তোমার, এবঞ্চ সর্ব্ব-লোকের অধিকার; যাহা সর্ব্বলোকের, তাহা সর্ব্বলোককে দিবে। ইহাই যথার্থ হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত, গীতোক্ত ধর্ম্মের অনুমোদিত দান। ইহাই যথার্থ দানধর্ম্ম। নহিলে তোমার অনেক আছে, তুমি ভিক্ষুককে কিছু দিলে, তাহা দান নহে। বিস্ময়ের বিষয়, এমন অনেক লোকও আছে যে, তাহাও দেয় না।

শিষ্য। সকলকেই কি দান করিতে হইবে? দানের কি পাত্রাপাত্র নাই? আকাশের সূর্য্য সর্ব্বত্র করবর্ষণ করেন বটে, কিন্তু অনেক প্রদেশ তাহাতে দগ্ধ হইয়া যায়। আকাশের মেঘ সর্ব্বত্র জলবর্ষণ করেন বটে, কিন্তু তাহাতে অনেক স্থান হাজিয়া ভাসিয়া যায়। বিচারশূন্য দানে কি সেইরূপ আশঙ্কা নাই?

গুরু। দান, দয়াবৃত্তির অনুশীলন জন্য। যে দয়ার পাত্র, তাহাকেই দান করিবে। যে আর্ত্ত, সে-ই দয়ার পাত্র, অপরে নহে। অতএব যে আর্ত্ত, তাহাকে দান করিবে—অপরকে নহে। সর্ব্বভূতে দয়া করিবে বলিলে এমন বুঝায় না যে, যাহার কোন প্রকার দুঃখ নাই, তাহার দুঃখমোচনার্থ আত্মোৎসর্গ করিবে। তবে কোন প্রকার দুঃখ নাই, এমন লোকও সংসারে পাওয়া যায় না। যাহার দারিদ্র্যদুঃখ নাই, তাহাকে ধনদান বিধেয় নহে, যাহার রোগদুঃখ নাই, তাহার চিকিৎসা বিধেয় নহে। ইহা বলা কর্ত্তব্য, অনুচিত দানে অনেক সময়ে পৃথিবীর পাপ বৃদ্ধি হয়। অনেক লোক অনুচিত দান করে বলিয়া, পৃথিবীতে যাহারা সৎকার্য্যে দিন যাপন করিতে পারে, তাহারাও ভিক্ষুক বা প্রবঞ্চক হয়। অনুচিত দানে সংসারে আলস্য, বঞ্চনা এবং পাপক্রিয়া বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, অনেকে তাই ভাবিয়া কাহাকেও দান করেন না। তাঁহাদের বিবেচনায় সকল ভিক্ষুকই আলস্যবশতঃই ভিক্ষুক অথবা প্রবঞ্চক। এই দুই দিক্ বাঁচাইয়া দান করিবে। যাহারা জ্ঞানার্জ্জনী ও কার্য্যকারিণী বৃত্তি বিহিত অনুশীলিত করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহা কঠিন নহে। কেন না, তাহারা বিচারক্ষম অথচ দয়াপর। অতএব মনুষ্যের সকল বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন ব্যতীত কোন বৃত্তিই সম্পূর্ণ হয় না।

গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে দান সম্বন্ধে যে ভগবদুক্তি আছে, তাহারও তাৎপর্য্য এইরূপ :—

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতং ॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতং ॥
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতং ॥

অর্থাৎ "দেওয়া উচিত, এই বিবেচনায় যে দান, যাহার প্রত্যুপকার করিবার সম্ভাবনা নাই, তাহাকে দান, দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া যে দান, তাই সাত্ত্বিক দান। প্রত্যুপকারপ্রত্যাশায় যে দান, ফলের উদ্দেশে যে দান, এবং অপ্রসন্ন হইয়া যে দান করা যায়, তাহা রাজস দান। দেশ কাল পাত্র বিচারশূন্য যে দান, অনাদরে এবং অবজ্ঞাযুক্ত যে দান, তাহা তামস দান।"

শিষ্য। দানের দেশ কাল পাত্র কিরূপে বিচার করিতে হইবে, গীতায় তাহার কিছু উপদেশ আছে কি?

গুরু। গীতায় নাই, কিন্তু ভাষ্যকারেরা সে কথা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারদিগের রহস্য দেখ। দেশ কাল পাত্র বিচার করিবে, এ কথাটার বাস্তবিক একটা বিশেষ ব্যাখ্যা প্রয়োজন করে না। সকল কর্ম্মই দেশ কাল পাত্র বিচার করিয়া করিতে হয়। দানও সেইরূপ। দেশ কাল পাত্র বিচার না করিয়া দান করিলে, দান আর সাত্ত্বিক হইল না, তামসিক হইল। কথাটার অর্থ সোজা, বুঝিবার জন্য হিন্দুধর্ম্মের কোন বিশেষ বিধির প্রয়োজন করে না। বাঙ্গালা দেশ দুর্ভিক্ষে উৎসন্ন যাইতেছে; মনে কর, সেই সময়ে মাঞ্চেষ্টরে কাপড়ের কল বন্ধ—শিল্পীদিগের কষ্ট হইয়াছে। এ অবস্থায় আমার কিছু দিবার থাকিলে দুই জায়গায় কিছু কিছু দিতে পারিলে ভাল হয়, না পারিলে কেবল বাঙ্গালায় যা পারি দিব। তাহা না দিয়া, যদি আমি সকলই মাঞ্চেষ্টরে দিই, তবে দেশ-বিচার হইল না। কেন না, মাঞ্চেষ্টরে দিবার অনেক লোক আছে, বাঙ্গালায় দিবার লোক বড় কম। কালবিচারও ঐরূপ। আজ যে ব্যক্তির প্রাণ তুমি আপনার প্রাণপাত করিয়া রক্ষা করিলে, কাল হয়ত তাহাকে তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিতে বাধ্য হইবে, তখন সে প্রাণদান চাহিলে তুমি দিতে পারিবে না। পাত্রবিচার অতি সহজ—প্রায় সকলেই করিতে পারে। দুঃখীকে সকলেই দেয়, জুয়াচোরকে কেহই দিতে চাহে না। অতএব "দেশে কালে চ পাত্রে চ" এ কথার একটা সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজন নাই—যে উদার জাগতিক মহানীতি সকলের হৃদয়গত, ইহা তাহারই অন্তর্গত। এখন ভাষ্যকারেরা কি বলেন, তাহা দেখ। "দেশে"—কি না "পুণ্যে কুরুক্ষেত্রাদৌ।" শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধর স্বামী উভয়েই ইহা বলেন। তার পর "কালে" কি? শঙ্কর বলেন, "সংক্রান্ত্যাদৌ"—শ্রীধর বলেন, "গ্রহণাদৌ"। পাত্রে কি? শঙ্কর বলেন, "ষড়ঙ্গবিদ্বেদপারাগ ইত্যাদৌ আচারনিষ্ঠায়"—শ্রীধর বলেন, "পাত্র ভূতায় তপোব্রতাদিসম্পন্নায় ব্রাহ্মণায়।" সর্ব্বনাশ! আমি যদি স্বদেশে বসিয়া মাসের ১লা হইতে ২৯শে তারিখের মধ্যে কোন দিনে, অতি দীনদুঃখী পীড়িত কাতর এক জন মুচি কি ডোমকে কিছু দান করি, তবে

সে দান ভগবদভিপ্রেত দান হইল না। এইরূপে কখন কখন ভাষ্যকারদিগের বিচারে অতি উন্নত, উদার এবং সার্ব্বলৌকিক যে হিন্দুধর্ম্ম, তাহা অতি সঙ্কীর্ণ এবং অনুদার উপধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। এখানে শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধর স্বামী যাহা বলিলেন, তাহা ভগবদ্বাক্যে নাই। কিন্তু তাহা স্মৃতিশাস্ত্রে আছে। ভগবদ্বাক্যকে স্মৃতির অনুমোদিত করিবার জন্য সেই উদার ধর্ম্মকে অনুদার এবং সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। এই সকল মহাপ্রতিভাসম্পন্ন, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ মহামহোপাধ্যায়গণের তুলনায় আমাদের মত ক্ষুদ্র লোকেরা পর্ব্বতের নিকট বালুকাকণাতুল্য, কিন্তু ইহাও কথিত আছে যে,—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥*

বিনা বিচারে, ঋষিদিগের বাক্যসকল মস্তকের উপর এত কাল বহন করিয়া আমরা এই বিশৃঙ্খলা, অধর্ম্ম এবং দুর্দ্দশায় আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আর বিনা বিচারে বহন করা কর্ত্তব্য নহে। আপনার বুদ্ধি অনুসারে সকলেরই বিচার করা উচিত। নহিলে আমরা চন্দনবাহী গর্দ্দভের অবস্থাই ক্রমে প্রাপ্ত হইব। কেবল ভারেই পীড়িত হইতে থাকিব—চন্দনের মহিমা কিছুই বুঝিব না।

শিষ্য। তবে এখন ভাষ্যকারদিগের হাত হইতে হিন্দুধর্ম্মের উদ্ধার করা আমাদের গুরুতর কর্ত্তব্য কার্য্য।

গুরু। প্রাচীন ঋষি এবং পণ্ডিতগণ অতিশয় প্রতিভাসম্পন্ন এবং মহাজ্ঞানী। তাঁহাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি করিবে, কদাপি অমর্য্যাদা বা অনাদর করিবে না। তবে যেখানে বুঝিবে যে, তাঁহাদিগের উক্তি ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ, সেখানে তাঁহাদের পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরাভিপ্রায়েরই অনুসরণ করিবে।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়—চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি

শিষ্য। এক্ষণে অন্যান্য কার্য্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলনের পদ্ধতি শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। সে সকল বিস্তারিত কথা শিক্ষাতত্ত্বের অন্তর্গত। আমার কাছে তাহা বিশেষ শুনিবার প্রয়োজন নাই। শারীরিকী বৃত্তি বা জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সম্বন্ধেও আমি কেবল সাধারণ অনুশীলনপদ্ধতি বলিয়া দিয়াছি, বৃত্তিবিশেষ সম্বন্ধে অনুশীলনপদ্ধতি কিছু শিখাই নাই। কি প্রকারে শরীরকে বলাধান করিতে হইবে, কি প্রকারে অস্ত্রশিক্ষা বা অশ্বসঞ্চালন করিতে হইবে, কি প্রকারে মেধাকে তীক্ষ্ণ করিতে হইবে বা কি প্রকারে বুদ্ধিকে গণিতশাস্ত্রের উপযোগী করিতে হইবে, তাহা বলি নাই। কারণ, সে সকল শিক্ষাতত্ত্বের অন্তর্গত। অনুশীলনতত্ত্বের স্থূল মর্ম্ম বুঝিবার জন্য কেবল সাধারণ বিধি জানিলেই যথেষ্ট হয়। আমি শারীরিকী ও জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সম্বন্ধে তাহাই বলিয়াছি। কার্য্যকারিণী বৃত্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ কথা বলাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু কার্য্যকারিণী বৃত্তি অনুশীলন সম্বন্ধে যে সাধারণ বিধি, তাহা ভক্তিতত্ত্বের অন্তর্গত। প্রীতি ভক্তির অন্তর্গত। সমস্ত ধর্ম্মই এই তিনটি বৃত্তির উপর বিশেষ প্রকারে নির্ভর করে। এই জন্য

* মনু, ১২ অধ্যায়, ১১৩শ শ্লোকের টীকায় কুল্লুকভট্ট-ধৃত বৃহস্পতি-বচন।

আমি ভক্তি, প্রীতি, দয়া বিশেষ প্রকারে বুঝাইয়াছি। নচেৎ সকল বৃত্তি গণনা করা বা তাহার অনুশীলনপদ্ধতি নির্ব্বাচন করা আমার উদ্দেশ্য নহে, সাধ্যও নহে। শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী বা কার্য্যকারিণী বৃত্তি সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা বলিয়াছি। এক্ষণে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

জগতের সকল ধর্ম্মের একটি অসম্পূর্ণতা এই যে, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলন বিশেষরূপে উপদিষ্ট হয় নাই। তাই বলিয়া কেহ এমত সিদ্ধান্ত করিতে পারে না যে, প্রাচীন ধর্ম্মবেত্তারা ইহার আবশ্যকতা অনবগত ছিলেন না, এ সকলের অনুশীলনের কোন উপায় বিহিত করেন নাই। হিন্দুর পূজার পুষ্প, চন্দন, মাল্য, ধূপ, দীপ, ধুনা, গুগ্গুল, নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতি সকলেরই উদ্দেশ্য ভক্তির অনুশীলনের সঙ্গে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের সম্মিলন অথবা এই সকলের দ্বারা ভক্তির উদ্দীপন। প্রাচীন গ্রীকদিগের ধর্ম্মে, এবং মধ্যকালের ইউরোপে রোমীয় খ্রীষ্টধর্ম্মে উপাসনার সঙ্গে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিসকলের স্ফূর্ত্তির ও পরিতৃপ্তির বিলক্ষণ চেষ্টা ছিল। আপিলীস্ বা রাফেলের চিত্র, মাইকেল এঞ্জিলো বা ফিদিয়সের ভাস্কর্য্য, জর্ম্মাণির বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রণেতৃগণের সঙ্গীত উপাসনার সহায় হইয়াছিল। চিত্রকরের, ভাস্করের, স্থপতির, সঙ্গীতকারকের সকল বিদ্যা ধর্ম্মের পদে উৎসর্গ করা হইত। ভারতবর্ষেরও স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত উপাসনার সহায়।

শিষ্য। তবে এমন হইতে পারে, প্রতিমা গঠন, উপাসনার সঙ্গে এই প্রকার চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষার ফল।

গুরু। এ কথা সঙ্গত বটে*, কিন্তু প্রতিমাগঠনের যে অন্য কোন মূলও নাই, এমন কথা বলিতে পার না। প্রতিমাপূজার উৎপত্তি কি, তাহা বিচারের স্থল এ নহে। চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, সঙ্গীত, এ সকল চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও তৃপ্তিবিধায়ক,

* এ বিষয়ে পূর্ব্বে যাহা ইংরাজিতে বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"The true explanation consists in the ever true relations of the subjective ideal to its objective Reality. Man is by instinct a poet and an artist. The passionate yearnings of the heart for the Ideal in beauty, in power, and in purity, must find an expression in the world of the Real. Hence proceed all poetry and all art. Exactly in the same way the ideal of the Divine in man receives a form from him, and the form an image. The existence of Idols is as justifiable as that of the tragedy of Hamlet or of that of Prometheus. The *religious* worship of Idols is as justifiable as the *intellectual* worship of Hamlet or Prometheus. The homage we owe to the ideal of the human realised in art is admiration, the homage we owe to the ideal of the Divine realised in idolatry is worship."—*Statesman*, Oct. 28, 1882.

এই তত্ত্ব সুলেখক বাবু চন্দ্রনাথ বসু নবজীবনের "ষোড়শোপচারে পূজা" ইত্যাদি শীর্ষক প্রবন্ধে এরূপ বিশদ ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, আমার উপরিধৃত দুই ছত্র ইংরেজির অনুবাদ এখানে দিবার প্রয়োজন আছে বোধ হয় না।

কিন্তু কাব্যই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের শ্রেষ্ঠ উপায়। এই কাব্য, গ্রীক ও রোমকে ধর্ম্মের সহায়, কিন্তু হিন্দুধর্ম্মেই কাব্যের বিশেষ সাহায্য গৃহীত হইয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতের তুল্য কাব্যগ্রন্থ আর নাই, অথচ ইহাই হিন্দুদিগের এক্ষণে প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। বিষ্ণু ও ভাগবতাদি পুরাণে এমন কাব্য আছে যে, অন্য দেশে তাহা অতুলনীয়। অতএব হিন্দুধর্ম্মে যে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলনের অল্প মনোযোগ ছিল, এমন নহে। তবে যাহা পূর্ব্বে বিধিবদ্ধ না হইয়া কেবল লোকাচারেই ছিল, তাহা এক্ষণে ধর্ম্মের অংশ বলিয়া বিধিবদ্ধ করিতে হইবে। এবং জ্ঞানার্জ্জনী ও কার্য্যকারিণী বৃত্তিগুলির যেমন অনুশীলন অবশ্য কর্ত্তব্য, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির সেইরূপ অনুশীলন ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্বারা অনুজ্ঞাত করিতে হইবে।

শিষ্য। অর্থাৎ যেমন ধর্ম্মশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে যে, গুরুজনে ভক্তি করিবে, কাহারও হিংসা করিবে না, দান করিবে, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও জ্ঞানোপার্জ্জন করিবে, সেইরূপ আপনার এই ব্যাখ্যানুসারে ইহাও বিহিত হইবে যে, চিত্রবিদ্যা, ভাস্কর্য্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য, এবং কাব্যের অনুশীলন করিবে?

গুরু। হাঁ। নহিলে মনুষ্যের ধর্ম্মহানি হইবে।

শিষ্য। বুঝিলাম না।

গুরু। বুঝ। জগতে আছে কি?

শিষ্য। যাহা আছে, তাই আছে।

গুরু। তাহাকে কি বলে?

শিষ্য। সৎ।

গুরু। বা সত্য। এখন এই জগৎ ত জড়পিণ্ডের সমষ্টি। জাগতিক বস্তু নানাবিধ, ভিন্নপ্রকৃতি, বিবিধ গুণবিশিষ্ট। ইহার ভিতর কিছু ঐক্য দেখিতে পাও না? বিশৃঙ্খলার মধ্যে কি শৃঙ্খলা দেখিতে পাও না?

শিষ্য। পাই।

গুরু। কিসে দেখ?

শিষ্য। এক অনন্ত অনির্ব্বচনীয় শক্তি—যাহাকে স্পেন্সর ·Inscrutable Power in Nature বলিয়াছেন; তাহা হইতে সকল জন্মিতেছে, চলিতেছে, নিয়ত উৎপন্ন হইতেছে এবং তাহাতেই সব বিলীন হইতেছে।

গুরু। তাহাকে বিশ্বব্যাপী চৈতন্য বলা যাউক। সেই চৈতন্যরূপিণী যে শক্তি, তাহাকে চিৎশক্তি বলা যাউক। এখন বল দেখি, সতে এই চিতের অবস্থানের ফল কি?

শিষ্য। ফল ত এই মাত্র আপনিই বলিয়াছেন। ফল এই জাগতিক শৃঙ্খলা। অনির্ব্বচনীয় ঐক্য।

গুরু। বিশেষ করিয়া ভাবিয়া বল, জীবনের পক্ষে এই অনির্ব্বচনীয় শৃঙ্খলার ফল কি?

কিষ্য। জীবনের উপযোগিতা বা জীবের সুখ।

গুরু। তাহার নাম দাও আনন্দ। এই সচ্চিদানন্দকে জানিলেই জগৎ জানিলাম।

কিন্তু জানিব কি প্রকারে? এক একটা করিয়া ভাবিয়া দেখ। প্রথম, সৎ অর্থাৎ যাহা আছে, সেই অস্তিত্বমাত্র জানিব কি প্রকারে?

শিষ্য। এই "সৎ" অর্থে সতের গুণও বটে?

গুরু। হাঁ; কেন না, সেই সকল গুণও আছে। তাহাই সত্য।

শিষ্য। তবে সৎ বা সত্যকে প্রমাণের দ্বারা জানিতে হইবে।

গুরু। প্রমাণ কি?

শিষ্য। প্রত্যক্ষ ও অনুমান। অন্য প্রমাণ আমি অনুমানের মধ্যে ধরি।

গুরু। ঠিক। কিন্তু অনুমানেরও বুনিয়াদ প্রত্যক্ষ। অতএব সত্যজ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক।* প্রত্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা হইয়া থাকে। অতএব যথার্থ প্রত্যক্ষ জন্য ইন্দ্রিয়সকলের অর্থাৎ কতিপয় শারীরিক বৃত্তির স্বচ্ছন্দতাই যথেষ্ট। তার পর অনুমান জন্য জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি সকলের সমুচিত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি আবশ্যক। জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তিগুলির মধ্যে কতকগুলিকে হিন্দুদিগের দর্শনশাস্ত্রে মনঃ নাম দেওয়া হইয়াছে, আর কতকগুলির নাম বুদ্ধি বলা হইয়াছে। এই মন ও বুদ্ধির প্রভেদ কোন কোন ইউরোপীয় দার্শনিককৃত জ্ঞাপিকা এবং বিচারিকা বৃত্তি মধ্যে যে প্রভেদ, তাহার সঙ্গে কতক মিলে। অনুমান জন্য এই মনোনামযুক্ত বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তিই বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখন এই সদ্ব্যাপী চিৎকে জানিবে কি প্রকারে?

শিষ্য। সেই অনুমানের দ্বারা।

গুরু। ঠিক তাহা নহে। যাহাকে বুদ্ধি বা বিচারিকা বৃত্তি বলা হইয়াছে, তাহার অনুশীলনের দ্বারা। অর্থাৎ সৎকে জানিতে হইবে জ্ঞানের দ্বারা এবং চিৎকে জানিবে ধ্যানের দ্বারা। তার পর আনন্দকে জানিবে কিসের দ্বারা?

শিষ্য। ইহা অনুমানের বিষয় নহে, অনুভবের বিষয়। আমরা আনন্দ অনুমান করি না—অনুভব করি, ভোগ করি। অতএব আনন্দ জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অপ্রাপ্য। অতএব ইহার জন্য অন্যজাতীয় বৃত্তি চাই।

গুরু। সেইগুলি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। তাহার সম্যক্ অনুশীলনে এই সচ্চিদানন্দময় জগৎ এবং জগন্ময় সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপানুভূতি হইতে পারে। তদ্ব্যতীত ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ। তাই বলিতেছিলাম যে, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন অভাবে ধর্ম্মের হানি হয়। আমাদের সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইহার যত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা কেবল ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিবার চেষ্টার ফল। ইহার প্রথমাবস্থা ঋগ্বেদসংহিতার ধর্ম্ম আলোচনায় জানা যায়। যাহা শক্তিমান্ বা উপকারী বা সুন্দর, তাহারই উপাসনা এই আদিম বৈদিক ধর্ম্ম। তাহাতে আনন্দভাগ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সতের ও চিতের উপাসনার, অর্থাৎ জ্ঞান ও ধ্যানের অভাব ছিল। এই জন্য কালে তাহা উপনিষদ্‌সকলের দ্বারা সংশোধিত হইল। উপনিষদের ধর্ম্ম—চিন্ময় পরব্রহ্মের উপাসনা। তাহাতে জ্ঞানের ও ধ্যানের অভাব নাই। কিন্তু আনন্দাংশের অভাব আছে। ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তিই উপনিষদ্ সকলের উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন ও স্ফূর্ত্তির পক্ষে সেই জ্ঞান ও ধ্যানময় ধর্ম্মের

* সকল জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক নহে, ইহা ভগবদ্গীতার টীকায় বুঝান গিয়াছে—পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

কোন ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধধর্ম্মে উপাসনা নাই। বৌদ্ধেরা সৎ মানিতেন না। এবং তাঁহাদের ধর্ম্মে আনন্দ ছিল না। এই তিন ধর্ম্মের একটিও সচ্চিদানন্দপ্রয়াসী হিন্দুজাতির মধ্যে অধিক দিন স্থায়ী হইল না। এই তিন ধর্ম্মের সারভাগ গ্রহণ করিয়া পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম সংগঠিত হইল। তাহাতে সতের উপাসনা, চিতের উপাসনা এবং আনন্দের উপাসনা প্রচুর পরিমাণে আছে। বিশেষ আনন্দভাগ বিশেষরূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই জাতীয় ধর্ম্ম হইবার উপযুক্ত, এবং এই কারণেই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হিন্দুধর্ম্ম অন্য কোন অসম্পূর্ণ বিজাতীয় ধর্ম্ম কর্ত্তৃক স্থানচ্যুত বা বিজিত হইতে পারে নাই। এক্ষণে যাঁহারা ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত, তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ঈশ্বর যেমন সৎস্বরূপ, যেমন চিৎস্বরূপ, তেমন আনন্দস্বরূপ; অতএব চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের অনুশীলনের বিধি এবং উপায় না থাকিলে সংস্কৃত ধর্ম্ম কখন স্থায়ী হইবে না।

শিষ্য। কিন্তু পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মে আনন্দের কিছু বাড়াবাড়ি আছে, সামঞ্জস্য নাই, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

গুরু। অবশ্য হিন্দুধর্ম্মে অনেক জঙ্গাল জন্মিয়াছে—ঝাঁটাইয়া পরিষ্কার করিতে হইবে। হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম যে বুঝিতে পারিবে, সে অনায়াসেই আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় অংশ বুঝিতে পারিবে ও পরিত্যাগ করিবে। তাহা না বুঝিলে হিন্দুজাতির উন্নতি নাই। এক্ষণে ইহাই আমাদের বিবেচ্য যে, ঈশ্বর অনন্ত সৌন্দর্য্যময়। তিনি যদি সগুণ হয়েন, তবে তাঁহার সকল গুণই আছে; কেন না, তিনি সর্ব্বময়, এবং তাঁহার সকল গুণই অনন্ত। অনন্তের গুণ সান্ত বা পরিমাণবিশিষ্ট হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর অনন্তসৌন্দর্য্যবিশিষ্ট। তিনি মহৎ, শুচি, প্রেমময়, বিচিত্র অথচ এক, সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন এবং নির্ব্বিকার। এই সকল গুণই অপরিমেয়। অতএব এই সকল গুণের সমবায় যে সৌন্দর্য্য, তাহাও অনন্ত। যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্য্য অনুভূত করা যায়, তাহাদিগের সম্পূর্ণ অনুশীলন ভিন্ন তাঁহাকে পাইব কি প্রকারে? অতএব বুদ্ধ্যাদি জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির, ভক্ত্যাদি কার্য্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলন, ধর্ম্মের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলনও সেইরূপ প্রয়োজনীয়। তাঁহার সৌন্দর্য্যের সমুচিত অনুভব ভিন্ন আমাদের হৃদয়ে কখনও তাঁহার প্রতি সম্যক্ প্রেম বা ভক্তি জন্মিবে না। আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম্মে এই জন্য কৃষ্ণোপাসনার সঙ্গে কৃষ্ণের ব্রজলীলাকীর্ত্তনের সংযোগ হইয়াছে।

শিষ্য। তাহার ফল কি সুফল হইয়াছে?

গুরু। যে এই ব্রজলীলার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিয়াছে, এবং যাহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, তাহার পক্ষে ইহার ফল সুফল। যে অজ্ঞান, এই ব্রজলীলার প্রকৃত অর্থ বুঝে না, যাহার নিজের চিত্ত কলুষিত, তাহার পক্ষে ইহার ফল কুফল। চিত্তশুদ্ধি, অর্থাৎ জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী প্রভৃতি বৃত্তিগুলির সমুচিত অনুশীলন ব্যতীত কেহই বৈষ্ণব হইতে পারে না। এই বৈষ্ণব ধর্ম্ম অজ্ঞান বা পাপাত্মার জন্য নহে। যাহারা রাধাকৃষ্ণকে ইন্দ্রিয়সুখরত মনে করে, তাহারা বৈষ্ণব নহে—পৈশাচ।

সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে, রাসলীলা অতি অশ্লীল ও জঘন্য ব্যাপার। কালে লোকে রাসলীলাকে একটা জঘন্য ব্যাপারে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু আদৌ ইহা

ঈশ্বরোপাসনা মাত্র, অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্য্যের বিকাশ এবং উপাসনা মাত্র ; চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির চরম অনুশীলন, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা মাত্র। প্রাচীন ভারতে স্ত্রীগণের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ ; কেন না, বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের পক্ষে কর্ম্মমার্গ কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভক্তিতে তাহাদের বিশেষ অধিকার। ভক্তি, বলিয়াছি —"পরানুরক্তিরীশ্বরে।" অনুরাগ নানা কারণে জন্মিতে পারে ; কিন্তু সৌন্দর্য্যের মোহঘটিত যে অনুরাগ, তাহা মনুষ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। অতএব অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই অপরের হউক বা না হউক, স্ত্রীজাতির জীবন-সার্থকতার মুখ্য উপায়। এই তত্ত্বাত্মক রূপকই রাসলীলা। জড় প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য তাহাতে বর্ত্তমান ; শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র, শরৎপ্রবাহপরিপূর্ণা শ্যামসলিলা যমুনা, প্রস্ফুটিত কুসুমসুবাসিত কুঞ্জবিহঙ্গমকূজিত বৃন্দাবনবনস্থলী, জড়প্রকৃতি মধ্যে অনন্ত সুন্দরের সশরীরে বিকাশ। তাহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী বংশী। এইরূপ সর্ব্বপ্রকার চিত্তরঞ্জনের দ্বারা স্ত্রীজাতির ভক্তি উদ্রিক্তা হইলে তাহারা কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়া কৃষ্ণে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইল ; আপনাকেই কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল,—

কৃষ্ণে বিরুদ্ধহৃদয়া ইদমূচুঃ পরস্পরম্।
কৃষ্ণোঽহমেতল্ললিতং ব্রজাম্যাক্যতং গতিং॥
অন্যা ব্রবীতি কৃষ্ণস্য মম গীতির্নিশাম্যতাং।
দুষ্ট কালিয়! তিষ্ঠাত্র কৃষ্ণোঽহমিতি চাপরা।
বাহুমাস্ফোট্য কৃষ্ণস্য লীলাসর্ব্বস্বমাদদে॥
অন্যা ব্রবীতি ভো গোপা নিঃশঙ্কৈঃ স্থীয়তামিহ।
অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধৃতো গোবর্দ্ধনো ময়া॥ ইত্যাদি

জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে অভেদজ্ঞান, জ্ঞানের তাহাই চিরোদ্দেশ্য। মহাজ্ঞানীও সমস্ত জীবন ইহার সন্ধানে ব্যয়িত করিয়াও ইহা পাইয়া উঠেন না। কিন্তু এই জ্ঞানহীনা গোপকন্যাগণ কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্য্যের অনুরাগিণী হইয়া (অর্থাৎ আমি যাহাকে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন বলিতেছি, তাহার সর্ব্বোচ্চ সোপানে উঠিয়া) সেই অভেদজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল। রাসলীলা রূপকের ইহাই স্থূল তাৎপর্য্য এবং আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম্মও সেই পথগামী। অতএব মনুষ্যত্বে, মনুষ্যজীবনে, এবং হিন্দুধর্ম্মে, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির কত দূর আধিপত্য বিবেচনা কর।

শিষ্য। এক্ষণে এই চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিসকলের অনুশীলন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ প্রদান করুন।

গুরু। জাগতিক সৌন্দর্য্যে চিত্তকে সংযুক্ত করাই ইহার অনুশীলনের প্রধান উপায়। জগৎ সৌন্দর্য্যময়। বহিঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্য্যময়, অন্তঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্য্যময়। বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য সহজে চিত্তকে আকৃষ্ট করে। সেই আকর্ষণের বশবর্ত্তী হইয়া সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী বৃত্তিগুলির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। বৃত্তিগুলি স্ফূরিত হইতে থাকিলে, ক্রমে অন্তঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্য্যানুভবে সক্ষম হইলে, জগদীশ্বরের অনন্ত সৌন্দর্য্যের আভাস পাইতে থাকিবে। সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী বৃত্তিগুলির এই এক স্বভাব যে, তদ্দ্বারা প্রীতি, দয়া, ভক্তি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কার্য্যকারিণী বৃত্তিসকল স্ফূরিত ও পরিপুষ্ট

হইতে থাকে। তবে একটা বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুচিত অনুশীলন ও স্ফূর্ত্তিতে আর কতকগুলি কার্য্যকারিণী বৃত্তি দুর্ব্বলা হইয়া পড়ে। এই জন্য সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে, কবিরা কাব্য ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে অকর্ম্মণ্য হয়। এ কথার যাথার্থ্য এই পর্য্যন্ত যে, যাহারা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুচিত অনুশীলন করে, অন্য বৃত্তিগুলির সহিত তাহাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টা পায় না, অথবা "আমি প্রতিভাশালী, আমাকে কাব্যরচনা ভিন্ন আর কিছু করিতে নাই," এই ভাবিয়া যাঁহারা ফুলিয়া বসিয়া থাকেন, তাঁহারাই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে যে সকল শ্রেষ্ঠ কবি, অন্যান্য বৃত্তির সমুচিত পরিচালনা করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করেন, তাঁহারা অকর্ম্মণ্য না হইয়া বরং বিষয়কর্ম্মে বিশেষ পটুতা প্রকাশ করেন। ইউরোপে শেক্ষপীয়র, মিলটন, দান্তে, গেটে প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কবিরা বিষয়কর্ম্মে অতি সুদক্ষ ছিলেন। কালিদাস না কি কাশ্মীরের রাজা হইয়াছিলেন। এখনকার লর্ড টেনিসন না কি ঘোরতর বিষয়ী লোক। চার্লচ ডিকেন্‌স প্রভৃতির কথাও জান।

শিষ্য। কেবল নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের উপর চিত্ত স্থাপনেই কি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিসকলের সমুচিত স্ফূর্ত্তি হইবে?

গুরু। এ বিষয়ে মনুষ্যই মনুষ্যের উত্তম সহায়। চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিসকলের অনুশীলনের বিশেষ সাহায্যকারী বিদ্যাসকল, মনুষ্যের দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছে। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত, নৃত্য, এ সকল সেই অনুশীলনের সহায়। বহিঃসৌন্দর্য্যের অনুভবশক্তি এ সকলের দ্বারা বিশেষরূপে স্ফুরিত হয়। কিন্তু কাব্যই এ বিষয়ে মনুষ্যের প্রধান সহায়। তদ্দ্বারাই চিত্ত বিশুদ্ধ এবং অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্যে প্রেমিক হয়। এই জন্য কবি, ধর্ম্মের একজন প্রধান সহায়। বিজ্ঞান বা ধর্ম্মোপদেশ, মনুষ্যত্বের জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয়, কাব্যও সেইরূপ। যিনি তিনের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দিতে চাহেন, তিনি মনুষ্যত্ব বা ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝেন নাই।

শিষ্য। কিন্তু কুকাব্যও আছে।

গুরু। সে বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। যাহারা কুকাব্য প্রণয়ন করিয়া পরের চিত্ত কলুষিত করিতে চেষ্টা করে, তাহারা তস্করাদির ন্যায় মনুষ্যজাতির শত্রু। এবং তাহাদিগকে তস্করাদির ন্যায় শারীরিক দণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত করা বিধেয়।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়—উপসংহার

গুরু। অনুশীলনতত্ত্ব সমাপ্ত করিলাম। যাহা বলিবার, তাহা সব বলিয়াছি, এমন নহে। সকল কথা বলিতে হইলে শেষ হয় না। সকল আপত্তির মীমাংসা করিয়াছি এমন নহে; কেন না, তাহা করিতে গেলেও কথার শেষ হয় না। অনেক কথা অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ আছে, এবং অনেক ভুলও যে থাকিতে পারে, তাহা আমার স্বীকার করিতে আপত্তি নাই। আমি এমনও প্রত্যাশা করিতে পারি না যে, আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা সকলই বুঝিয়াছ। তবে ইহা পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা করিলে ভবিষ্যতে বুঝিতে পারিবে, এমন ভরসা করি। তবে স্থূল মর্ম্ম যে বুঝিয়াছ, বোধ করি এমন প্রত্যাশা করিতে পারি।

শিষ্য। তাহা আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

১। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আপনি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছিলেন। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম।

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই সুখ।

৫। এই সমস্ত বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হইলে ইহারা সকলই ঈশ্বরমুখী হয়। ঈশ্বরমুখতাই উপযুক্ত অনুশীলন। সেই অবস্থাই ভক্তি।

৬। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন; এই জন্য সর্ব্বভূতে প্রীতি, ভক্তির অন্তর্গত, এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্ব্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম্ম নাই।

৭। আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া, এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বদেশপ্রীতিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা উচিত।

এই সকল স্থূল কথা।

গুরু। কই, শারীরিকী বৃত্তি, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তি, কার্য্যকারিণী, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি এ সকলের তুমি ত নামও করিলে না?

শিষ্য। নিষ্প্রয়োজন। অনুশীলনতত্ত্বের স্থূল মর্ম্মে এ সকল বিভাগ নাই। এক্ষণে বুঝিয়াছি, আমাকে অনুশীলনতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য এ সকল নামের সৃষ্টি করিয়াছেন।

গুরু। তবে, তুমি অনুশীলনতত্ত্ব বুঝিয়াছ। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, ঈশ্বরে ভক্তি তোমার দৃঢ় হউক। সকল ধর্ম্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।*

ক্রোড়পত্র—ক

(মল্লিখিত "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" নামক প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।)

ধর্ম্ম শব্দের আধুনিক ব্যবহার-জাত কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তাহার ইংরেজি প্রতিশব্দের দ্বারা আগে নির্দ্দেশ করিতেছি, তুমি বুঝিয়া দেখ। প্রথম, ইংরেজ যাহাকে Religion বলে, আমরা তাহাকে ধর্ম্ম বলি, যেমন হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম। দ্বিতীয়, ইংরেজ যাহাকে Morality বলে, আমরা তাহাকেও ধর্ম্ম বলি, যথা—অমুক কার্য্য "ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ" "মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র," "ধর্ম্মসূত্র" ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গালায় ইহার আর একটি নাম প্রচলিত আছে—নীতি। বাঙ্গালি একালে আর কিছু পারুক না পারুক "নীতিবিরুদ্ধ" কথাটা চট্ করিয়া বলিয়া ফেলিতে পারে। তৃতীয়, ধর্ম্ম শব্দে Virtue বুঝায়। Virtue ধর্ম্মাত্মা মনুষ্যের অভ্যস্ত গুণকে বুঝায়; নীতির বশবর্ত্তী অভ্যাসের উহা ফল। এই অর্থে আমরা বলিয়া থাকি—অমুক ব্যক্তি ধার্ম্মিক, অমুক ব্যক্তি অধার্ম্মিক। এখানে অধর্ম্মকে ইংরেজিতে Vice বলে। চতুর্থ, রিলিজন বা নীতির

* অনুশীলনতত্ত্বের সঙ্গে জাতিভেদ ও শ্রমজীবনের কি সম্বন্ধ, তাহা এই গ্রন্থমধ্যে বুঝাইলাম না। কারণ, তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকায় "ধর্ম্ম" বুঝাইবার সময়ে বুঝাইয়াছি। গ্রন্থের সম্পূর্ণতা রক্ষার জন্য খ-চিহ্নিত ক্রোড়পত্রে তদংশ গীতার টীকা হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

অনুমোদিত যে কার্য্য, তাহাকেও ধর্ম্ম বলে, তাহার বিপরীতকে অধর্ম্ম বলে। যথা—দান পরম ধর্ম্ম, অহিংসা পরম ধর্ম্ম, গুরুনিন্দা পরম অধর্ম্ম। ইহাদের সচরাচর পাপপুণ্যও বলে। ইংরেজিতে এই অধর্ম্মের নাম "Sin"—পুণ্যের এক কথায় একটা নাম নাই—"good deed" বা তদ্রূপ বাগ্‌বাহুল্য দ্বারা সাহেবেরা অভাব মোচন করেন। পঞ্চম, ধর্ম্ম শব্দে গুণ বুঝায়, যথা—চুম্বকের ধর্ম্ম লৌহাকর্ষণ। এস্থলে যাহা অর্থান্তরে অধর্ম্ম, তাহাকেও ধর্ম্ম বলা যায়। যথা, "পরনিন্দা—ক্ষুদ্রচেতাদিগের ধর্ম্ম।" এই অর্থে মনু স্বয়ং "পাষণ্ডধর্ম্মের" কথা লিখিয়াছেন, যথা—

"হিংস্রাহিংস্রে মৃদুক্রূরে ধর্ম্মাধর্ম্মাবৃতানৃতে।
যদ্যস্য সোঽদধাৎ সর্গে তত্তস্য স্বমাবিশৎ॥"

পুনশ্চ—

"পাষণ্ডগণধর্ম্মাংশ্চ শাস্ত্রেঽস্মিন্নুক্তবান্ মনুঃ।"

আর ষষ্ঠতঃ, ধর্ম্ম শব্দ তখন আচার বা ব্যবহারার্থে প্রযুক্ত হয়। মনু এই অর্থেই বলেন,—

"দেশধর্ম্মান্ জাতিধর্ম্মান্ কুলধর্ম্মাংশ্চ শাশ্বতান্।

এই ছয়টি অর্থ লইয়া এ-দেশীয় লোক বড় গোলযোগ করিয়া থাকে। এই মাত্র এক অর্থে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিয়া পরক্ষণেই ভিন্নার্থে ব্যবহার করে; কাজেই অপসিদ্ধান্তে পতিত হয়। এইরূপ অনিয়ম প্রয়োগের জন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন তত্ত্বের সুমীমাংসা হয় না। এ গোলযোগ আজ নূতন নহে। যে সকল গ্রন্থকে আমরা হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহাতেও এই গোলযোগ বড় ভয়ানক। মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের শেষ ছয়টি শ্লোক উহার উত্তম উদাহরণ। ধর্ম্ম কখন রিলিজনের প্রতি, কখন নীতির প্রতি, কখনও অভ্যস্ত ধর্ম্মাত্মতার প্রতি, এবং কখন পুণ্যকর্ম্মের প্রতি প্রযুক্ত হওয়াতে—নীতির প্রকৃতি রিলিজনে, রিলিজনের প্রকৃতি নীতিতে, অভ্যস্ত গুণের লক্ষণ কর্ম্মে, কর্ম্মের লক্ষণ অভ্যাসে ন্যস্ত হওয়াতে একটা ঘোরতর গণ্ডগোল হইয়াছে। তাহার ফল এই হইয়াছে যে, ধর্ম্ম (রিলিজন)—উপধর্ম্মসঙ্কুল, নীতি—ভ্রান্ত, অভ্যাস—কঠিন, এবং পুণ্য—দুঃখজনক হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দুনীতির আধুনিক অবনতি ও তৎপ্রতি আধুনিক অনাস্থার গুরুতর এক কারণ এই গণ্ডগোল।

ক্রোড়পত্র—খ

("ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" নামক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত)

গুরু। রিলিজন কি?

শিষ্য। সেটা জানা কথা।

গুরু। বড় নয়—বল দেখি কি জানা আছে?

শিষ্য। যদি বলি পারলৌকিক ব্যাপারে বিশ্বাস।

গুরু। প্রাচীন য়ীহুদীরা পরলোক মানিত না। য়ীহুদীদের প্রাচীন ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নয়?

শিষ্য। যদি বলি দেবদেবীতে বিশ্বাস।

গুরু। ইস্‌লাম, খ্রীষ্টীয়, য়ীহুদ, প্রভৃতি ধর্ম্মে দেবী নাই। সে সকল ধর্ম্মে দেবও এক—ঈশ্বর। এগুলি কি ধর্ম্ম নয়?

শিষ্য। ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর্ম্ম?

গুরু। এমন অনেক পরম রমণীয় ধর্ম্ম আছে, যাহাতে ঈশ্বর নাই। ঋগ্বেদসংহিতার প্রাচীনতম মন্ত্রগুলি সমালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, তৎপ্রণয়নের সমকালিক আর্য্য-দিগের ধর্ম্মে অনেক দেবদেবী ছিল বটে, কিন্তু ঈশ্বর নাই। বিশ্বকর্ম্মা, প্রজাপতি, ব্রহ্ম ইত্যাদি ঈশ্বরবাচক শব্দ, ঋগ্বেদের প্রাচীনতম মন্ত্রগুলিতে নাই—যেগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সেইগুলিতে আছে। প্রাচীন সাংখ্যেরাও অনীশ্বরবাদী ছিলেন। অথচ তাঁহারা ধর্ম্মহীন নহেন, কেন না, তাঁহারা কর্ম্মফল মানিতেন, এবং মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স্ কামনা করিতেন। বৌদ্ধধর্ম্মও নিরীশ্বর। অতএব ঈশ্বরবাদ ধর্ম্মের লক্ষণ কি প্রকারে বলি? দেখ, কিছুই পরিষ্কার হয় নাই।

শিষ্য। তবে বিদেশী তার্কিকদিগের ভাষা অবলম্বন করিতে হইল—লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাসই ধর্ম্ম।

গুরু। অর্থাৎ Supernaturalism, কিন্তু ইহাতে তুমি কোথায় আসিয়া পড়িলে দেখ। প্রেততত্ত্ববিদ্ সম্প্রদায় ছাড়া, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে লোকাতীত চৈতন্যের কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং ধর্ম্মও নাই—ধর্ম্মের প্রয়োজনও নাই। রিলিজনকে ধর্ম্ম বলিতেছি মনে থাকে যেন।

শিষ্য। অথচ সে অর্থে ঘোর বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যেও ধর্ম্ম আছে। যথা Religion of Humanity.

গুরু। সুতরাং লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাস ধর্ম্ম নয়।

শিষ্য। তবে আপনিই বলুন, ধর্ম্ম কাহাকে বলিব।

গুরু। প্রশ্নটা অতি প্রাচীন। "অথাতো ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" মীমাংসা দর্শনের প্রথম সূত্র। এই প্রশ্নের উত্তর দানই মীমাংসা দর্শনের উদ্দেশ্য। সর্ব্বত্র গ্রাহ্য উত্তর আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। আমি যে ইহার সদুত্তর দিতে সক্ষম হইব, এমন সম্ভাবনা নাই। তবে পূর্ব্বপণ্ডিতদিগের মত তোমাকে শুনাইতে পারি। প্রথম মীমাংসাকারের উত্তর শুন। তিনি বলেন, "নোদনালক্ষণো ধর্ম্মঃ।" নোদনা, ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বাক্য। শুধু এইটুকু থাকিলে বলা যাইত কথাটা বুঝি নিতান্ত মন্দ নয়; কিন্তু যখন উহার কথা উঠিল, "নোদনা প্রবর্ত্তকো বেদবিধিরূপঃ" তখন আমার বড় সন্দেহ হইতেছে, তুমি উহাকে ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবে কি না।

শিষ্য। কখনই না। তাহা হইলে যতগুলি পৃথক্ ধর্ম্মগ্রন্থ, ততগুলি পৃথক্-প্রকৃতি-সম্পন্ন ধর্ম্ম মানিতে হয়। খ্রীষ্টান বলিতে পারে, বাইবেল-বিধিই ধর্ম্ম; মুসলমানও কোরাণ সম্বন্ধে ঐরূপ বলিবে। ধর্ম্মপদ্ধতি ভিন্ন হউক, ধর্ম্ম বলিয়া একটা সাধারণ সামগ্রী নাই কি? Religions আছে বলিয়া Religion বলিয়া একটা সাধারণ সামগ্রী নাই কি?

গুরু। এই এক সম্প্রদায়ের মত। লোগাক্ষি ভাস্কর প্রভৃতি এইরূপ কহিয়াছেন যে, "বেদপ্রতিপাদ্যপ্রয়োজনবদর্থো ধর্ম্ম।" এই সকল কথার পরিমাণফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, যাগাদিই ধর্ম্ম এবং সদাচারই ধর্ম্ম শব্দে বাচ্য হইয়া গিয়াছে—যথা মহাভারতে,

শ্রদ্ধা কর্ম্ম তপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এব চ।
স্বেষু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং বিদ্যানসূয়িতা।
আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্ম্মঃ সাধারণো নৃপ॥

কেহ বা বলেন, "দ্রব্যক্রিয়াগুণাদীনাং ধর্ম্মত্বং" এবং কেহ বলেন, ধর্ম্ম অদৃষ্টবিশেষ। ফলতঃ আর্য্যদিগের সাধারণ অভিপ্রায় এই যে, বেদ বা লোকাচারসম্মত কার্য্যই ধর্ম্ম, যথা বিশ্বামিত্র—

যমার্য্যাঃ ক্রিয়মাণং হি শংসন্ত্যাগমবেদিনঃ
স ধর্ম্মো যং বিগর্হন্তি তমধর্ম্মং প্রচক্ষতে॥

কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে যে ভিন্ন মত নাই, এমত নহে। "দ্বে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ," ইত্যাদি শ্রুতিতে সূচিত হইয়াছে যে, বৈদিক জ্ঞান ও তদনুবর্ত্তী যাগাদি নিকৃষ্ট ধর্ম্ম, ব্রহ্মজ্ঞানই পরম ধর্ম্ম। ভগবদ্গীতার স্থূল তাৎপর্য্যই কর্ম্মাত্মক বৈদিকাদি অনুষ্ঠানের নিকৃষ্টতা এবং গীতোক্ত ধর্ম্মের উৎকর্ষ প্রতিপাদন। বিশেষতঃ হিন্দু ধর্ম্মের ভিতর একটি পরম রমণীয় ধর্ম্ম পাওয়া যায়, যাহা এই মীমাংসা এবং তন্নীত হিন্দুধর্ম্মবাদের সাধারণতঃ বিরোধী। যেখানে এই ধর্ম্ম দেখি—অর্থাৎ কি গীতায়, কি মহাভারতের অন্যত্র, কি ভাগবতে—সর্ব্বত্রই দেখি, শ্রীকৃষ্ণই ইহার বক্তা। এই জন্য আমি হিন্দুশাস্ত্রে নিহিত এই উৎকৃষ্টতর ধর্ম্মকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত মনে করি এবং কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম বলিতে ইচ্ছা করি। মহাভারতের কর্ণপর্ব্ব হইতে একটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া উহার উদাহরণ দিতেছি।

"অনেকে শ্রুতিরে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না। কিন্তু শ্রুতিতে সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট নাই। এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। প্রাণিগণের উৎপত্তির নিমিত্তই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অহিংসাযুক্ত কার্য্য করিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। হিংস্রকদিকের হিংসা নিবারণার্থেই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণিগণকে ধারণ করে বলিয়াই ধর্ম্ম নাম নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণিগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম"—ইহা কৃষ্ণোক্তি। ইহার পরে বনপর্ব্ব হইতে ধর্ম্মব্যাধোক্ত ধর্ম্মব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। "যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক, তাহাই সত্য। সত্যই শ্রেয় লাভের অদ্বিতীয় উপায়। সত্যপ্রভাবেই যথার্থ জ্ঞান ও হিতসাধন হয়।" এস্থলে ধর্ম্ম অর্থেই সত্য শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে।

শিষ্য। এ দেশীয়েরা ধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা নীতির ব্যাখ্যা বা পুণ্যের ব্যাখ্যা। রিলিজনের ব্যাখ্যা কই?

গুরু। রিলিজন শব্দে যে বিষয় বুঝায়, সে বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য আমাদের দেশের লোক কখন উপলব্ধি করেন নাই। যে বিষয়ের প্রজ্ঞা আমার মনে নাই, আমার পরিচিত কোন শব্দে কি প্রকারে তাহার নামকরণ হইতে পারে?

শিষ্য। কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। তবে আমার কাছে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ আছে, তাহা হইতে একটু পড়িয়া শুনাই।

"For religion, the ancient Hindu had no name, because his conception of it was so broad as to dispense with the necessity of a name. With other peoples, religion is only a part of life; there are things religious, and there are things lay and secular. To the Hindu, his whole life was religion. To other peoples, their relations to God and to the spiritual world are things sharply distinguished from their relations to man and to the temporal world. To the Hindu, his relations to God and his relations to man, his spiritual life and his temporal life are incapable of being so distinguished. They form one compact and harmonious whole, to separate which into its component parts is to break the entire fabric. All life to him was religion, and religion never received a name from him, because it never had for him an existence apart from all that had received a name. A department of thought which the people in whom it had its existence had thus failed to differentiate, has necessarily mixed itself inextricably with every other department of thought, and this is what makes it so difficult at the present day, to erect it into a separate entity."*

শিষ্য। তবে রিলিজন কি, তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য আচার্য্যদিগের মতই শুনা যাউক।

গুরু। তাহাতেও বড় গোলযোগ! প্রথমত: রিলিজন শব্দের যৌগিক অর্থ দেওয়া যাউক। প্রচলিত মত এই যে, *re-ligare* হইতে শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতএব ইহার প্রকৃত অর্থ বন্ধন,—ইহা সমাজের বন্ধনী। কিন্তু বড় বড় পণ্ডিতগণের এ মত নহে। রোমক পণ্ডিত কিকিরো (বা সিসিরো) বলেন যে, ইহা re-ligere হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাহার অর্থ পুনরাহরণ, সংগ্রহ, চিন্তা, এইরূপ। মক্ষমূলর প্রভৃতি এই মতানুযায়ী। যেটাই প্রকৃত হউক, দেখা যাইতেছে যে, এ শব্দের আদি অর্থ এক্ষণে আর ব্যবহৃত নহে। যেমন লোকের ধর্ম্মবুদ্ধি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, এ শব্দের অর্থও তেমনি স্ফুরিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

শিষ্য। প্রাচীন অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন নাই, এক্ষণে ধর্ম্ম অর্থাৎ রিলিজন কাহাকে বলিব, তাই বলুন।

গুরু। কেবল একটি কথা বলিয়া রাখি। ধর্ম্ম শব্দের যৌগিক অর্থ অনেকটা

* লেখক-প্রণীত কোন ইংরেজি প্রবন্ধ হইতে এইটুকু উদ্ধৃত হইল, উহা এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহার মর্ম্মার্থ বাঙ্গালায় এখানে সন্নিবেশিত করিলে করা যাইতে পারিত, কিন্তু বাঙ্গালায় এ রকমের কথা আমার অনেক পাঠকে বুঝিবেন না। যাঁহাদের জন্য লিখিতেছি, তাঁহারা না বুঝিলে, লেখা বৃথা। অতএব এই রুচিবিরুদ্ধ কার্য্যটুকু পাঠক মার্জ্জনা করিবেন। যাঁহারা ইংরেজী জানেন না, তাঁহারা এটুকু ছাড়িয়া গেলে ক্ষতি হইবে না।

religio শব্দের অনুরূপ। ধর্ম্ম = ধৃ + মন্ (ধ্রিয়তে লোকো অনেন, ধরতি লোকং বা) এই জন্য আমি ধর্ম্মকে religio শব্দের প্রকৃত প্রতিশব্দ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

শিষ্য। তা হোক—এক্ষণে রিলিজনের আধুনিক ব্যাখ্যা বলুন।

গুরু। আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে জর্ম্মানেরাই সর্ব্বাগ্রগণ্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি নিজে জার্ম্মান জানি না। অতএব প্রথমতঃ মক্ষমূলরের পুস্তক হইতে জার্ম্মানদিগের মত পড়িয়া শুনাইব। আদৌ কাণ্টের মত পর্য্যালোচনা কর।

"According to Kant, religion is morality. When we look upon all our moral duties as divine commands, that, he thinks, constitutes religion. And we must not forget that Kant does not consider that duties are moral duties because they rest on a divine command (that would be according to Kant merely revealed Religion); on the contrary, he tells us that because we are directly conscious of them as duties, therefore we look upon them as divine commands."

তার পর ফিক্তে। ফিক্তের মতে "Religion is knowledge. It gives to a man a clear insight into himself, answers the highest questions, and thus imparts to us a complete harmony with ourselves, and a thorough sanctification to our mind." সাংখ্যাদিরও প্রায় এই মত। কেবল শব্দপ্রয়োগ ভিন্ন প্রকার। তার পর স্লিয়ের মেকর। তাঁহার মতে,—Religion consists in our consciousness of absolute dependence on something, which though it determines us, we cannot determine in our turn. তাঁহাকে উপহাস করিয়া হীগেল বলেন,—"Religion is or ought to be perfect freedom; for it is neither more or less than the divine spirit becoming conscious of himself through the finite spirit—" এ মত কতকটা বেদান্তের অনুগামী।

শিষ্য। যাহারই অনুগামী হউক, এই চারিটির একটি ব্যাখ্যাও ত শ্রদ্ধেয় বলিয়া বোধ হইল না। আচার্য্য মক্ষমূলরের নিজের মত কি?

গুরু। বলেন, "Religion is a subjective faculty for the apprehension of the Infinite."

শিষ্য। Faculty! সর্ব্বনাশ! বরং রিলিজন বুঝিলে বুঝা যাইবে,—Faculty বুঝিব কি প্রকারে? তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি?

গুরু। এখন জর্ম্মানদের ছাড়িয়া দিয়া দুই এক জন ইংরেজের ব্যাখ্যা আমি নিজে সংগ্রহ করিয়া শুনাইতেছি। টইলর সাহেব বলেন যে, যেখানে "Spiritual Beings" সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে, সেইখানেই রিলিজন। এখানে "Spiritual Beings" অর্থে কেবল ভূত প্রেত নহে—লোকাতীত চৈতন্যই অভিপ্রেত; দেবদেবী ও ঈশ্বরও তদন্তর্গত। অতএব তোমার বাক্যের সহিত ইঁহার বাক্যের ঐক্য হইল।

শিষ্য। সে জ্ঞান ত প্রমাণাধীন।

গুরু। সকল প্রমাজ্ঞানই প্রমাণাধীন, ভ্রমজ্ঞান প্রমাণাধীন নহে। সাহেব মৌসুকের বিবেচনায় রিলিজনটা ভ্রমজ্ঞান মাত্র। এক্ষণে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের ব্যাখ্যা শোন।

শিষ্য। তিনি ত নীতিমাত্রবাদী, ধর্ম্মবিরোধী।

গুরু। তাঁহার শেষাবস্থার রচনা পাঠে সেরূপ বোধ হয় না। অনেক স্থানে দ্বিধাযুক্ত বটে। যাই হোক, তাঁহার ব্যাখ্যা উচ্চশ্রেণীর ধর্ম্মসকল সম্বন্ধে বেশ খাটে।

তিনি বলেন, "The essence of Religion is the strong and earnest direction of the emotions and desires towards an ideal object recognised as of the highest excellence, and is rightfully paramount over all selfish objects of desire."

শিষ্য। কথাটা বেশ।

গুরু। মন্দ নহে বটে। সম্প্রতি আচার্য্য সীলীর কথা শোন। আধুনিক ধর্ম্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যাকারদিগের মধ্যে তিনি এক জন শ্রেষ্ঠ। তাঁহার প্রণীত "Ecce Homo" এবং "Natural Religion" অনেককেই মোহিত করিয়াছে। এ বিষয়ে তাঁহার একটি উক্তি বাঙ্গালি পাঠকদিগের নিকট সম্প্রতি পরিচিত হইয়াছে।* বাক্যটি এই—"*The substance of Religion is Culture*" কিন্তু তিনি এক দল লোকের মতের সমালোচনকালে এই উক্তির দ্বারা তাঁহাদিগের মত পরিস্ফুট করিয়াছেন—এটি ঠিক তাঁহার নিজের মত নহে। তাঁহার নিজের মত বড় সর্ব্বব্যাপী। সে মতানুসারে রিলিজন "*habitual and permanent admiration.*" ব্যাখ্যাটি সবিস্তারে শুনাইতে হইল।

"The words Religion and Worship are commonly and conveniently appropriated to the feelings with which we regard God. But those feelings—love, awe, admiration, which together make up worship—are felt in various combinations for human beings, and even for inanimate objects. It is not exclusively but only *par excellence* that religion is directed towards God. When feelings of admiration are very strong and at the same time serious and permanent, they express themselves in recurring acts, and hence arises ritual, liturgy and whatever the multitude identifies with religion. But without ritual, religion may exist in its elementary state and this elementary state of Religion is what may be described as *habitual and permanent admiration.*"

শিষ্য। এ ব্যাখ্যাটি অতি সুন্দর। আর আমি দেখিতেছি, মিল যে কথা বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে ইহার ঐক্য হইতেছে। এই "habitual and permanent admiration" যে মানসিক ভাব, তাহারই ফল, "strong and earnest direction of the emotions and desires towards an ideal object recognised as of the highest excellence."

গুরু। এ ভাব, ধর্ম্মের একটি অঙ্গমাত্র।

* দেবী চৌধুরাণীতে।

যাহা হউক, তোমাকে আর পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যে বিরক্ত না করিয়া অগুস্ত কোম্‌তের ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনাইয়া, নিরস্ত হইব। এটিতে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন; কেন না, কোম্‌ৎ নিজে একটি অভিনব ধর্ম্মের সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং তাঁহার এই ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াই তিনি সেই ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বলেন, "Religion, in itself expresses the state of perfect *unity* which is the distinctive mark of man's existence both as an individual and in society, when all the constituent parts of his nature, moral and physical, are made habitually to converge towards one common purpose." অর্থাৎ "Religion consists in regulating one's individual nature, and forms the rallying-point for all the separate individuals."

যতগুলি ব্যাখ্যা তোমাকে শুনাইলাম, সকলের মধ্যে এইটি উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। আর যদি এই ব্যাখ্যা প্রকৃত হয়, তবে হিন্দুধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

শিষ্য। আগে ধর্ম্ম কি বুঝি, তার পর পারি যদি, তবে না হয় হিন্দুধর্ম্ম বুঝিব। এই সকল পণ্ডিতগণকৃত ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া আমার সাত কাণার হাতী দেখা মনে পড়িল।

গুরু। কথা সত্য। এমন মনুষ্য কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে ধর্ম্মের পূর্ণ প্রকৃতি ধ্যানে পাইয়াছে? যেমন সমগ্র বিশ্বসংসার কোন মনুষ্য চক্ষে দেখিতে পায় না, তেমনই সমগ্র ধর্ম্ম কোন মনুষ্য ধ্যানে পায় না। অন্যের কথা দূরে থাক, শাক্যসিংহ, যীশুখ্রীষ্ট, মহম্মদ, কি চৈতন্য,—তাঁহারাও ধর্ম্মের সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, এমত স্বীকার করিতে পারি না। অন্যের অপেক্ষা বেশি দেখুন, তথাপি সবটা দেখিতে পান নাই। যদি কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান, এবং মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকার। ভগবদ্গীতার উক্তি, ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি কি কোন মনুষ্যপ্রণীত, তাহা জানি না। কিন্তু যদি কোথাও ধর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্যক্ত ও পরিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়।

ক্রোড়পত্র—গ

(অষ্টম অধ্যায় দেখ)

If, as the sequence of a malady contracted in pursuit of illegitimate gratification, an attack of iritis injures vision, the mischief is to be counted among those entailed by immoral conduct: but if, regardless of protesting sensations, the eyes are used in study too soon after opthalmia, and there follows blindness for years or for life, entailing not only personal unhappiness but a burden on others, moralists are silent. The broken leg which a drunkard's accident causes, counts among those miseries brought on self and family

by intemperance, which form the ground for reprobating it ; but if anxiety to fulfil duties prompts the continued use of a sprained knee in spite of the pain, and brings on a chronic lameness involving lack of exercise, consequent ill health, inefficiency, anxiety, and unhappiness, it is supposed that ethics has no verdict to give in the matter. A student who is plucked because he has spent in amusement the time and money that should have gone in study, is blamed for thus making parents unhappy and preparing for himself a miserable future ; but another who, thinking exclusively of claims on him, reads night after night with hot or aching head, and, breaking down, cannot take his degree, but returns home shattered in health unable to support himself, is named with pity only, as not subject to any moral judgment ; or rather, the moral judgment passed is wholly favourable.

Thus recognizing the evils caused by some kinds of conduct only, men at large, and moralists as exponents of their beliefs, ignore the suffering and death daily caused around them by disregard of that guidance which has established itself in the course of evolution. Led by the tacit assumption, common to Pagan stoics and Christian ascetics, that we are so diabolically organized that pleasures are injurious and pains beneficial, people on all sides yield examples of lives blasted by persisting in actions against which their sensations rebel. Here is one who, drenched to the skin and sitting in a cold wind, pooh-poohs his shiverings and gets rheumatic fever with subsequent heart-disease, which makes worthless the short life remaining to him. Here is another who, disregarding painful feelings, works too soon after a debilitating illness, and establishes disordered health that lasts for the rest of his days, and makes him useless to himself and others. Now the account is of a youth who, persisting in gymnastic feats spite of scarcely bearable straining, bursts a blood-vessel, and, long laid on the shelf, is permanently damaged ; while now it is of a man in middle life who, pushing muscular effort to painful excess, suddenly brings on hernia. In this family is a case of aphasis, spreading paralysis, and death, caused by eating too little and doing too much ; in that softening of the brain has been brought on by ceaseless mental efforts against which the feelings hourly protested : and in others, less serious brain-affections have been contracted by overstudy continued regardless of discomfort and

the craving for fresh air and exercise.* Even without accumulating special examples, the truth is forced on us by the visible traits of classes. The careworn man of business too long at his office, the cadaverous barrister pouring half the night over his briefs, the feeble factory hands and unhealthy seamstresses passing long hours in bad air, the anæmic, flat-chested school girls, bending over many lessons and forbidden boisterous play, no less than Sheffield grinders who die of suffocating dust, and peasants crippled with rheumatism due to exposure, show us the widespread miseries caused by persevering in action repugnant to the sensations and neglecting actions which the sensations prompt. Nay the evidence is still more extensive and conspicuous. What are the puny malformed children, seen in poverty-stricken districts, but children whose appetites for food and desires for warmth have not been adequately satisfied? What are populations stunted in growth and prematurely aged, such as parts of France show us, but populations injured by work in excess and food in defect: the one implying positive pain, the other negative pain? What is the implication of that greater mortality which occurs among people who are weakened by privations, unless it is that bodily miseries conduce to fatal illness? Or once more, what must we infer from the frightful amount of disease and death suffered by armies in the field, fed on scanty and bad provisions, lying on damp ground, exposed to extremes of heat and cold, inadequately sheltered from rain, and subject to exhausting efforts; unless it be the terrible mischiefs caused by continuously subjecting the body to treatment which the feelings protest against?

It matters not to the argument whether the actions entailing such efforts are voluntary or involuntary. It matters not from the biological point of view, whether the motives prompting them are high or low. The vital functions accept no apologies on the ground that neglect of them was unavoidable, or that the reason for neglect was noble. The direct and indirect sufferings caused by non-conformity to the laws of life, are the same whatever induces the non-conformity; and cannot be omitted in any rationat estimate of conduct. If the purpose of ethical inquiry is to establish rules of right living; and if the rules of right living are those of which

---

* I can count up more than a dozen such cases among those personally well known to me.

the total results, individual and general, direct and indirect, are conducive to human happiness; then it is absurd to ignore the immediate results and recognize only the remote results.—Herbert Spencer: *Data af Ethics*, pp. 93-95.

ক্রোড়পত্র—ঘ

(অনুশীলনতত্ত্বের সঙ্গে জাতিভেদ ও শ্রমজীবনের সম্বন্ধ)

"বৃত্তির সঞ্চালন দ্বারা আমরা কি করি? হয় কিছু কর্ম্ম করি, না হয় কিছু জানি। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যের জীবনে ফল আর কিছু নাই।*

অতএব জ্ঞান ও কর্ম্ম মানুষের স্বধর্ম্ম। সকল বৃত্তিগুলি সকলেই যদি বিহিতরূপে অনুশীলন করিত, তবে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই সকল মনুষ্যেরই স্বধর্ম্ম হইত। কিন্তু মনুষ্য-সমাজের অপরিণতাবস্থায় তাহা সাধারণতঃ ঘটিয়া উঠে না।† কেহ কেবল জ্ঞানকেই প্রধানতঃ স্বধর্ম্মস্থানীয় করেন, কেহ কর্ম্মকে ঐরূপ প্রধানতঃ স্বধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করেন।

জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য ব্রহ্ম; সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে আছে। এজন্য জ্ঞানার্জ্জন যাঁহাদিগের স্বধর্ম্ম, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। ব্রাহ্মণ শব্দ ব্রহ্মন্ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

কর্ম্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বুঝিতে গেলে কর্ম্মের বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। জগতে অন্তর্বিষয় আছে ও বহির্বিষয় আছে। অন্তর্বিষয় কর্ম্মের বিষয়ীভূত হইতে পারে না; বহির্বিষয়ই কর্ম্মের বিষয়। সেই বহির্বিষয়ের মধ্যে কতগুলিই হৌক, অথবা সবই হৌক, মনুষ্যের ভোগ্য। মনুষ্যের কর্ম্ম মনুষ্যের ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। সেই আশ্রয় ত্রিবিধ, যথা,—(১) উৎপাদন, (২) সংযোজন বা সংগ্রহ, (৩) রক্ষা। (১) যাহারা উৎপাদন করে, তাহারা কৃষিধর্ম্মী; যাহারা সংযোজন বা সংগ্রহ করে, তাহারা শিল্প বা বাণিজ্যধর্ম্মী: (৩) এবং যাহারা রক্ষা করে, তাহারা যুদ্ধধর্ম্মী। ইহাদিগের নামান্তর ব্যুৎক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এ কথা পাঠক স্বীকার করিতে পারেন কি?

স্বীকার করিবার প্রতি একটা আপত্তি আছে। হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে এবং এই গীতার ব্যবস্থানুসারে কৃষি শূদ্রের ধর্ম্ম নহে; বাণিজ্য এবং কৃষি উভয়েই বৈশ্যের ধর্ম্ম। অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের ধর্ম্ম। এখনকার দিনে দেখিতে পাই, কৃষি প্রধানতঃ শূদ্রেরই ধর্ম্ম। কিন্তু অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যাও এখনকার দিনে প্রধানতঃ শূদ্রেরই ধর্ম্ম। যখন জ্ঞানধর্ম্মী, যুদ্ধধর্ম্মী, বাণিজ্যধর্ম্মী বা কৃষিধর্ম্মীর কর্ম্মের এত বাহুল্য হয় যে, তদ্ধর্ম্মিগণ আপনাদিগের দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় সকল কর্ম্ম সম্পন্ন

* কোম্‌ৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণ তিন ভাগে চিত্তপরিণতিকে বিভক্ত করেন "Thought, Feeling, Action." ইহা ন্যায্য। কিন্তু Feeling অবশেষে Thought কিম্বা Action প্রাপ্ত হয়। এই জন্য পরিণামের ফল জ্ঞান ও কর্ম্ম, এই দ্বিবিধ বলাও ন্যায্য।

† আমি ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপকেও সমাজের অপরিণতাবস্থা বলিতেছি।

করিয়া উঠিতে পারে না, তখন কতকগুলি লোক তাহাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব (১) জ্ঞানার্জ্জন বা লোকশিক্ষা, (২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা, (৩) শিল্প বা বাণিজ্য, (৪) উৎপাদন বা কৃষি, (৫) পরিচর্য্যা, এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম।"

ভগবদ্গীতার টীকায় যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতে এই কয়টি কথা উদ্ধৃত করিলাম। এক্ষণে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সর্ব্ববিধ কর্ম্মানুষ্ঠান জন্য অনুশীলন প্রয়োজনীয়। তবে কথা এই যে, যাহার যে স্বধর্ম্ম, অনুশীলন তদনুবর্ত্তী না হইলে সে স্বধর্ম্মের সুপালন হইবে না। অনুশীলন স্বধর্ম্মানুবর্ত্তী হওয়ার অর্থ এই যে, স্বধর্ম্মের প্রয়োজন অনুসারে বৃত্তি-বিশেষের বিশেষ অনুশীলন চাই।

সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বৃত্তিবিশেষের বিশেষ অনুশীলন কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা শিক্ষাতত্ত্বের অন্তর্গত। সুতরাং এ গ্রন্থে সে বিশেষ অনুশীলনের কথা লেখা গেল না। আমি এই গ্রন্থে সাধারণ অনুশীলনের কথাই বলিয়াছি; কেন না, তাহাই ধর্ম্ম-তত্ত্বের অন্তর্গত; বিশেষ অনুশীলনের কথা বলি নাই; কেন না, তাহা শিক্ষাতত্ত্ব। উভয়ে কোন বিরোধ নাই ও হইতে পারে না, ইহাই আমার এখানে বলিবার প্রয়োজন।

সম্পাদকের নিবেদন

"ধর্ম্মতত্ত্ব" অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রিকায় বঙ্গাব্দ ১২৯১ শ্রাবণ সংখ্যা থেকে ১২৯২ চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই রচনাসমষ্টির কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে এবং আরও কয়েকটি নূতন রচনা সংযোজন করে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন "ধর্ম্মতত্ত্ব। প্রথম ভাগ। অনুশীলন।" ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—

"গ্রন্থের ভূমিকায় যে সকল কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহা সকলই আমি গ্রন্থের মধ্যে বলিয়াছি। যাঁহারা কেবল ভূমিকা দেখিয়াই পুস্তক পাঠ করা না করা স্থির করেন, তাঁহাদিগের এই গ্রন্থ পাঠ করার সম্ভাবনা অল্প। এজন্য ভূমিকায় আমার অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

"বিশেষ, গ্রন্থের প্রথম দশ অধ্যায়ই একপ্রকার ভূমিকা মাত্র। আমার কথিত অনুশীলনতত্ত্বের প্রধান কথা যাহা, তাহা একাদশ অধ্যায়ে আছে। এজন্য ভূমিকায় কোন ফল নাই।

"এই দশ অধ্যায় নীরস, এবং মধ্যে মধ্যে দুরূহ, এই দোষ স্বীকার করাই আমার এই ভূমিকার উদ্দেশ্য। সপ্তম অধ্যায় বিশেষতঃ নীরস ও দুরূহ। শ্রেণীবিশেষের পাঠক, সপ্তম অধ্যায় পরিত্যাগ করিতে পারেন।

"প্রধানতঃ শিক্ষাপ্রাপ্ত পাঠকদিগের জন্যই এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, এজন্য সকল কথা সকল স্থানে বিশদ করিয়া বুঝান যায় নাই। এবং সেই জন্য স্থানে স্থানে ইংরাজি ও সংস্কৃতের অনুবাদ দেওয়া যায় নাই।

"এই গ্রন্থের কিয়দংশ 'নবজীবনে' প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে গ্রন্থটির একটিই মাত্র সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে।

—সম্পাদক, ব. র. স.

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ভূমিকা

ভগবান শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রণীত গীতার ভাষ্য ও টীকা থাকিতে গীতার অন্য ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। তবে ঐ সকল ভাষ্য ও টীকা সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত। এখনকার দিনে এমন অনেক পাঠক আছেন যে, সংস্কৃত বুঝেন না, অথচ গীতা পাঠে বিশেষ ইচ্ছুক। কিন্তু গীতা এমনই দুরূহ গ্রন্থ যে, টীকার সাহায্য ব্যতীত অনেকেরই বোধগম্য হয় না। এই জন্য গীতার একখানি বাঙ্গালা টীকা প্রয়োজনীয়।

বাঙ্গালা টীকা দুই প্রকার হইতে পারে। এক, শঙ্করাদি-প্রণীত প্রাচীন ভাষ্যের ও টীকার বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়, নূতন বাঙ্গালা টীকা প্রণয়ন করা যাইতে পারে। কেহ কেহ প্রথমোক্ত প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। বাবু হিতলাল মিশ্র নিজকৃত অনুবাদে, কখন শঙ্করভাষ্যের সারাংশ, কখন শ্রীধরস্বামিকৃত টীকার সারাংশ সঙ্কলন করিয়াছেন। পরম বৈষ্ণব ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত নিজকৃত অনুবাদে, অনেক সময়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত টীকার মর্ম্মার্থ দিয়াছেন। ইঁহাদিগের নিকট বাঙ্গালী পাঠক তজ্জন্য বিশেষ ঋণী। প্রিয়বর শ্রীযুক্ত বাবু ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গীতার আর একখানি সংস্করণ প্রকাশে উদ্যত হইয়াছেন; বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, তাহাতে শঙ্করভাষ্যের অনুবাদ থাকিবে। ইহা বাঙ্গালী পাঠকের বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়।

শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণপ্রসন্ন দ্বিতীয় প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি নিজকৃত অনুবাদের সহিত "গীতাসন্দীপনী" নামে একখানি বাঙ্গালা টীকা প্রকাশ করিতেছেন। ইহা সুখের বিষয় যে, "গীতাসন্দীপনী"তে গীতার মর্ম্ম পূর্ব্বপণ্ডিতেরা যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, সেইরূপ বুঝান হইতেছে। বাঙ্গালী পাঠকেরা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাবুর নিকট তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হইবেন সন্দেহ নাই।

এই সকল অনুবাদ বা টীকা থাকাতেও মাদৃশ ব্যক্তির অভিনব অনুবাদ ও টীকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়া বৃথা পরিশ্রম বলিয়া গণিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার যথার্থ প্রয়োজন না থাকিলে, আমি এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না। সে প্রয়োজন কি, তাহা বুঝাইতেছি।

এখনকার পাঠকদিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই "শিক্ষিত" সম্প্রদায়ভুক্ত। যাঁহারা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহাদিগেরই সচরাচর "শিক্ষিত" বলা হইয়া থাকে; আমি প্রচলিত প্রথার বশবর্ত্তী হইয়াই তদর্থে "শিক্ষিত" শব্দ ব্যবহার করিতেছি। কাহারও শিক্ষা বেশী, কাহারও শিক্ষা কম, কিন্তু কম হউক, বেশী হউক, এখনকার পাঠক অধিকাংশই "শিক্ষিত" সম্প্রদায়ভুক্ত ইহা আমার জানা আছে। এখন গোলযোগের কথা এই যে, এই শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের উক্তি সহজে বুঝিতে পারেন না। ইহা তাঁহাদিগের দোষ নহে, তাঁহাদিগের শিক্ষার নৈসর্গিক ফল। পাশ্চাত্ত্য

চিন্তা-প্রণালী প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের চিন্তা-প্রণালী হইতে এত বিভিন্ন যে, ভাষার অনুবাদ হইলেই ভাবের অনুবাদ হৃদয়ঙ্গম হয় না। এখন আমাদিগের "শিক্ষিত" সম্প্রদায়, শৈশব হইতে পাশ্চাত্ত্য চিন্তা-প্রণালীর অনুবর্ত্তী, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় চিন্তা-প্রণালী তাঁহাদিগর নিকট অপরিচিত ; কেবল ভাষান্তরিত হইলে প্রাচীন ভাবসকল তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে গেলে পাশ্চাত্ত্য প্রথা অবলম্বন করিতে হয়, পাশ্চাত্ত্য ভাবের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। পাশ্চাত্ত্য প্রথা অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্ত্য ভাবের সাহায্যে গীতার মর্ম্ম তাঁহাদিগকে বুঝান আমার এই টীকার উদ্দেশ্য।

ইহার আরও বিশেষ প্রয়োজন এই যে, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, পূর্ব্বপণ্ডিতদিগের কৃত ভাষ্যাদিতে তাহার মীমাংসা নাই। থাকিবারও সম্ভাবনা নাই ; কেন না, তাঁহারা যে সকল পাঠকের সাহায্য জন্য ভাষ্যাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মনে সে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনাই ছিল না। এই টীকায় যতদূর সাধ্য, সেই সকল সংশয়ের মীমাংসা করা গিয়াছে।

অতএব যে সকল পণ্ডিতগণ গীতার ব্যাখ্যা বাঙ্গালায় প্রচার করিয়াছেন বা করিতেছেন, আমি তাঁহাদিগের প্রতিযোগী নহি ; যথাসাধ্য তাঁহাদিগের সাহায্য করি, ইহাই আমার ক্ষুদ্রাভিলাষ। আমিও যতদূর পারিয়াছি, পূর্ব্বপণ্ডিতদিগের অনুগামী হইয়াছি। আনন্দগিরি-টীকা-সম্বলিত শঙ্করভাষ্য, শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা রামানুজভাষ্য, মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকৃত টীকা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই টীকা প্রণয়ন করিয়াছি। তবে ইহাও আমাকে বলিতে হইতেছে যে, যে ব্যক্তি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং দর্শন অবগত হইয়াছে, সকল সময়েই যে, সে প্রাচীন-দিগের অনুগামী হইতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা নাই। আমিও সর্ব্বত্র তাঁহাদের অনুগামী হইতে পারি নাই। যাঁহারা বিবেচনা করেন, এদেশীয় পূর্ব্বপণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলই ঠিক এবং পাশ্চাত্ত্যগণ জাগতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা সকলই ভুল, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই।

টীকাই আমার উদ্দেশ্য, কিন্তু মূল ভিন্ন টীকা চলে না, এই জন্য মূলও দেওয়া গেল। অনেক পাঠক অনুবাদ ভিন্ন মূল বুঝিতে সক্ষম নহেন, তজ্জন্য একটা অনুবাদও দেওয়া গেল। বাঙ্গালা ভাষায় গীতার অনেক উৎকৃষ্ট অনুবাদ আছে। পাঠক যেটা ভাল বিবেচনা করেন, সেইটা অবলম্বন করিতে পারেন। সচরাচর যাহাতে অনুবাদ অবিকল হয়, সেই চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু দুই এক স্থানে অর্থব্যক্তির অনুরোধে এ নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

কলিকাতা। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১২৯৩ সাল।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ—ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে সঞ্জয়! পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী সমবেত আমার পক্ষ ও পাণ্ডবেরা কি করিল? ১।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত। ভীষ্মপর্ব্বের ৩ অধ্যায় হইতে ৪৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত—এই অংশের নাম ভগবদ্গীতাপর্ব্বাধ্যায়; কিন্তু ভগবদ্গীতার আরম্ভ পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়ে। তৎপূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সকল পাঠক জানিতে না পারেন, এজন্য তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি; কেন না, তাহা না বলিলে ধৃতরাষ্ট্র কেন এই প্রশ্ন করিলেন, এবং সঞ্জয়ই বা কে, তাহা অনেক পাঠক বুঝিবেন না।

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যসমৃদ্ধি দেখিয়া, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধন তাহা অপহরণ করিবার অভিপ্রায়ে যুধিষ্ঠিরকে কপটদ্যূতে আহ্বান করেন। যুধিষ্ঠির কপটদ্যূতে পরাজিত হইয়া এই পণে আবদ্ধ হয়েন যে, দ্বাদশ বৎসর তিনি ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ বনবাস করিবেন, তার পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন। এই ত্রয়োদশ বৎসর দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের রাজ্য ভোগ করিবেন। তার পর পাণ্ডবেরা এই পণ রক্ষা করিতে পারিলে আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বৎসর বনবাসে এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে যাপন করিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন তার পর রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। কাজেই পাণ্ডবেরা যুদ্ধ করিয়া স্বরাজ্যের উদ্ধার করিতে প্রস্তুত হইলেন। উভয় পক্ষ সেনা সংগ্রহ করিলেন। উভয় পক্ষীয় সেনা যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইল। যখন উভয় সেনা পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই, তখন এই গীতার আরম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন—তিনি হস্তিনানগরে আপনার রাজভবনে আছেন। তাহার কারণ, তিনি জন্মান্ধ, কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধদর্শন-সুখেও বঞ্চিত। কিন্তু যুদ্ধে কি হয়, তাহা জানিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভগবান্ ব্যাসদেব তাঁহার সম্ভাষণে আসিয়াছিলেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন যে, "আমি জ্ঞাতিবধ সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করি না, আপনার তেজঃপ্রভাবে আদ্যোপান্ত এই যুদ্ধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিব।" তখন ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী সঞ্জয়কে বর দান করিলেন। বর-প্রভাবে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে থাকিয়াও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধবৃত্তান্ত সকল দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিতেছেন, সঞ্জয় উত্তর দিতেছেন, মহাভারতের যুদ্ধপর্ব্বগুলি এই প্রণালীতে লিখিত। সকলই সঞ্জয়োক্তি। এক্ষণে উভয়পক্ষীয় সেনা যুদ্ধার্থ পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন, উভয় পক্ষ কি করিলেন। গীতার এইরূপ আরম্ভ।

এই দিব্য চক্ষুর কথাটা অনৈসর্গিক, পাঠককে বিশ্বাস করিতে বলি না। গীতোক্ত ধর্ম্মের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

যে ধর্ম্মব্যাখ্যা গীতার উদ্দেশ্য, প্রথমাধ্যায়ে তাহার কিছুই নাই। কি প্রসঙ্গোপলক্ষ্যে এই তত্ত্ব উত্থাপিত হইয়াছিল, প্রথমাধ্যায়ে এবং দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম একাদশ শ্লোকে কেবল তাহারই পরিচয় আছে। গীতার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য এতদংশের কোন প্রয়োজন নাই। পাঠক ইচ্ছা করিলে এতদংশ পরিত্যাগ করিতে পারেন। আমার যে উদ্দেশ্য, তাহাতে এতদংশের কোন টীকা লিখিবারও প্রয়োজন নাই; ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও এতদংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তবে শ্রেণীবিশেষের পাঠক কোন কোন বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। এজন্য দুই একটা কথা লেখা গেল।

কুরুক্ষেত্র একটি চক্র বা জনপদ। ঐ চক্র এখনকার স্থানেশ্বর বা থানেশ্বর নগরের দক্ষিণবর্ত্তী। আম্বালা নগর হইতে উহা ১৫ ক্রোশ দক্ষিণ। পানিপাট হইতে উহা ২০ ক্রোশ উত্তর। কুরুক্ষেত্র ও পানিপাট ভারতবর্ষের যুদ্ধক্ষেত্র, ভারতের ভাগ্য অনেক বার ঐ ক্ষেত্রে নিষ্পত্তি পাইয়াছে। "ক্ষেত্র" নাম শুনিয়া ভরসা করি, কেহ একখানি মাঠ বুঝিবেন না। কুরুক্ষেত্র প্রাচীন কালেই পঞ্চ যোজন দৈর্ঘ্যে এবং পঞ্চ যোজন প্রস্থে। এই জন্য উহাকে সমন্তপঞ্চক বলা যাইত। চক্রের সীমা এখন আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

কুরু নামে একজন চন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলেন। তাঁহা হইতেই এই চক্রের নাম কুরুক্ষেত্র হইয়াছে। তিনি দুর্য্যোধনাদির ও পাণ্ডবদিগের পূর্ব্বপুরুষ; এজন্য দুর্য্যোধনাদিগকে কৌরব বলা হয়, এবং কখন কখন পাণ্ডবদিগকেও বলা হয়। তিনি এই স্থানে তপস্যা করিয়া বর লাভ করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহার নাম কুরুক্ষেত্র। মহাভারতে কথিত হইয়াছে যে, তাঁহার তপস্যার কারণেই উহা পুণ্যতীর্থ। ফলে চিরকালই কুরুক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র বা ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, "দেবাঃ হ বৈ সত্রং নিষেদুরগ্নিরিন্দ্রঃ সোমো মখো বিষ্ণুর্বিশ্বেদেবা অন্যত্রৈবাশ্বিভ্যম্। তেষাং কুরুক্ষেত্রং দেবযজনমাস। তস্মাদাহুঃ কুরুক্ষেত্রং দেবযজনম্।" অর্থাৎ দেবতারা এইখানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এজন্য ইহাকে "দেবতাদিগের যজ্ঞস্থান" বলে।

মহাভারতের বনপর্ব্বের তীর্থযাত্রা পর্ব্বাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্র ত্রিলোকীর মধ্যে প্রধান তীর্থ। বনপর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের সীমা এইরূপ লেখা আছে— "উত্তরে সরস্বতী, দক্ষিণে দৃষদ্বতী; কুরুক্ষেত্র এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী।" (৮৩ অধ্যায়) মনুসংহিতায় বিখ্যাত ব্রহ্মাবর্ত্তেরও ঠিক সেই সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।—

সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দ্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥ ২।১৭।

অতএব কুরুক্ষেত্র এবং ব্রহ্মাবর্ত্ত একই। কালিদাসের নিম্নলিখিত কবিতাতে তাহাই বুঝা যাইতেছে।

ব্রহ্মাবর্ত্তং জনপদমথচ্ছায়য়া গাহমানঃ
ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রধনপিশুনং কৌরবং তদ্ভজেথাঃ।
রাজন্যানাং শিতশরশতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা
ধারাপাতৈস্ত্বমিব কমলান্যভ্যবর্ষন্ মুখানি ॥

—মেঘদূত ৪৯।

কিন্তু মনুতে আবার অন্য প্রকার আছে। যথা—

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে চৈনিক পরিব্রাজক হিউন্থসাঙ্‌ও ইহাকে স্বীয় গ্রন্থে "ধর্ম্মক্ষেত্র" বলিয়াছেন।*

কুরুক্ষেত্র আজিও পুণ্যতীর্থ বলিয়া ভারতবর্ষে পরিচিত; অনেক যোগী সন্ন্যাসী তথা পরিভ্রমণ করেন। কুরুক্ষেত্রে অনেক ভিন্ন ভিন্ন তীর্থ আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি মহাভারতের যুদ্ধের স্মারক স্বরূপ। যে স্থানে অভিমন্যু সপ্তরথিকর্তৃক অন্যায়-যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, সে স্থানকে এক্ষণে 'অভিমন্যুক্ষেত্র' বা 'অমিন' বলিয়া থাকে। সেখানে আজিও পুত্রহীনারা পুত্রকামনায় অদিতির মন্দিরে অদিতির উপাসনা করে। যেখানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাদিগের সংকার সমাপন হইয়াছিল, ক্ষেত্রের যে ভাগ সেই বীরগণের অস্থিতে সমাকীর্ণ হইয়াছিল, এখনও তাহাকে 'অস্থিপুর' বলে। যেখানে সাত্যকিতে ও ভূরিশ্রবাতে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, এবং অর্জ্জুন সাত্যকির রক্ষার্থ অন্যায় করিয়া ভূরিশ্রবার বাহুচ্ছেদ করেন, সে স্থানকে এক্ষণে 'ভোর' বলে। জনপ্রবাদ আছে যে, ভূরিশ্রবার সালঙ্কার ছিন্ন হস্ত পক্ষীতে লইয়া যায়। সেই ছিন্ন হস্তের অলঙ্কারে একখণ্ড বহুমূল্য হীরক ছিল। তাহাই কহীনুর, এক্ষণে ভারতেশ্বরীর অঙ্গে শোভা পাইতেছে। কথাটা যে সত্য, তাহার অবশ্য কোন প্রমাণ নাই।

কুরুক্ষেত্রের নাম বাঙ্গালীমাত্রেরই মুখে আছে। একটা কিছু গোল দেখিলে বাঙ্গালীর মেয়েরাও বলে, "কুরুক্ষেত্র হইতেছে"। অথচ কুরুক্ষেত্রের সবিশেষ তত্ত্ব কেহই জানে না। বিশেষ টম্সন, হুইলর প্রভৃতি ইংরেজ লেখকেরা সবিশেষ না জানিয়া অনেক গোলযোগ বাধাইয়াছেন। তাই কুরুক্ষেত্রের কথা এখানে এত সবিস্তারে লেখা গেল।†

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ॥ ২॥

সঞ্জয় বলিলেন—

ব্যূহিত পাণ্ডবসৈন্য দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন আচার্য্যের নিকটে গিয়া বলিলেন। ২।

---

* M. Stanislaus Julien অনুবাদে লিখিয়াছেন "*Le champ du bonheur.*" অর্থাৎ ধর্ম্মক্ষেত্র।

† সাহেবদিগের ভ্রমের উদাহরণস্বরূপ গীতার অনুবাদক টম্সনের টীকা হইতে দুই ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি। কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—

"A part of Dharmmakshetra, the flat plain around Delhi, which city is often identified with Hastinapur, the Capital of Kurukshetra."

এইটুকুর ভিতর ৫টি ভুল। (১) ধর্ম্মক্ষেত্র নামে কোন স্বতন্ত্র ক্ষেত্র নাই। (২) কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্রের অংশ মাত্র নহে। (৩) "The flat plain around Delhi" কুরুক্ষেত্র নহে। (৪) দিল্লী হস্তিনাপুর নহে। (৫) হস্তিনাপুর কুরুক্ষেত্রের রাজধানী নহে। এতটুকুর ভিতর এতগুলি ভুল একত্র করা যায়, আমরা জানিতাম না।

দুর্য্যোধনাদির অস্ত্রবিদ্যার আচার্য্য ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ। ইনি পাণ্ডবদিগেরও গুরু। ইনি ব্রাহ্মণ। কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় অদ্বিতীয়। শস্ত্রবিদ্যা ক্ষত্রিয়দিগেরই ছিল, এমন নহে। দ্রোণাচার্য্য, পরশুরাম, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ, অথচ সচরাচর ক্ষত্রিয়দিগের অপেক্ষা যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যখন পশ্চাৎ স্বধর্ম্মপালনের কথা উঠিবে, তখন এই কথা স্মরণ করিতে হইবে।

যুদ্ধার্থ সৈন্য-সন্নিবেশকে ব্যূহ বলে।

সমগ্রস্য তু সৈন্যস্য বিন্যাসঃ স্থানভেদতঃ।
স ব্যূহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেষু পৃথিবীভুজাম্॥

আধুনিক ইউরোপীয় সমরে সেনাপতির ব্যূহরচনাই প্রধান কার্য্য।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা॥ ৩॥

হে আচার্য্য! আপনার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদপুত্রের দ্বারা ব্যূহিতা পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা দর্শন করুন। ৩।

দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, পাণ্ডবদিগের একজন সেনাপতি। তিনিই ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ইঁহার পিতা দ্রোণবধ কামনায় যজ্ঞ করিলে ইঁহার জন্ম হয়। ইনিও দ্রোণের শিষ্য বলিয়া বর্ণিত হইতেছেন। এ কথাটা স্বধর্ম্মপালন বুঝিবার সময়ে স্মরণ করিতে হইবে। নিজ বধার্থ উৎপন্ন শত্রুকে দ্রোণ শিক্ষা দিয়াছিলেন। আচার্য্যের ধর্ম্ম বিদ্যা দান।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ॥ ৪॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ॥ ৫॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ॥ ৬॥

ইহার মধ্যে শূর, বাণক্ষেপে মহান্, যুদ্ধে ভীমার্জ্জুনতুল্য, যুযুধান, (১) বিরাট, (২) মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, (৩) চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, (৪) নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র, (৫) দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ইঁহারা সকলেই মহারথ। ৪। ৫। ৬।

(১) যুযুধান—যদুবংশীয় মহাবীর সাত্যকি।

(২) দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টকেতু প্রভৃতি সকলে অক্ষৌহিণীপতি।

(৩) ধৃষ্টকেতু মহাভারতে চেদিদেশের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অন্যবিধ বর্ণনাও আছে। (মহা, উদ্যোগ, ১৭১ অধ্যায়)।

(৪) কুন্তিভোজ বংশের নাম। বৃদ্ধ কুন্তিভোজ বসুদেবের পিতা শূরের পিতৃষসৃপুত্র। পাণ্ডবমাতা কুন্তী তাঁহার ভবনে প্রতিপালিতা হয়েন। পুরুজিৎ এ সম্বন্ধে পাণ্ডব-মাতুল।

(৫) বিখ্যাত অভিমন্যু।

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

হে দ্বিজোত্তম! আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, আমার সৈন্যের নায়ক, তাঁহাদিগকে অবগত হউন। আপনার অবগতির জন্য সে সকল আপনাকে বলিতেছি।৭।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥*

আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপ, (৬) অশ্বত্থামা, (৭) বিকর্ণ, সোমদত্তপুত্র (৮) ও জয়দ্রথ (৯)। ৮।

(৬) ইনিও ব্রাহ্মণ এবং অস্ত্রবিদ্যায় কৌরবদিগের আচার্য্য।

(৭) দ্রোণপুত্র।

(৮) ইনিই বিখ্যাত ভূরিশ্রবা।

(৯) দুর্যোধনের ভগিনীপতি।

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

আরও অনেক অনেক বীর আমার জন্য ত্যক্তজীবন হইয়াছেন (অর্থাৎ জীবনত্যাগে প্রস্তুত হইয়াছেন)। তাঁহারা সকলে নানাস্ত্রধারী এবং যুদ্ধবিশারদ। ৯।

গীতায় প্রথমাধ্যায়ে ধর্ম্মতত্ত্ব কিছু নাই। কিন্তু প্রথম অধ্যায় কাব্যাংশে বড় উৎকৃষ্ট। উপরে উভয়পক্ষের বহু গুণবান্ সেনানায়কদিগের নাম যে পাঠককে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল, ইহা কবির একটা কৌশল। পশ্চাতে অর্জ্জুনের যে করুণাময়ী মনোমোহিনী ভক্তি লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য এখন হইতে উদ্যোগ হইতেছে।

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০ ॥

ভীষ্মাভিরক্ষিত আমাদের সেই সৈন্য অসমর্থ। আর ইহাদিগের ভীমাভিরক্ষিত সৈন্য সমর্থ। ১০।

পর্য্যাপ্ত এবং অপর্য্যাপ্ত শব্দের অর্থ শ্রীধর স্বামীর টীকানুসারে করা গেল। অন্যে অর্থে করিয়াছেন—পরিমিত এবং অপরিমিত।

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১ ॥

আপনারা সকলে স্ব-স্ব বিভাগানুসারে সকল ব্যূহদ্বারে অবস্থিতি করিয়া ভীষ্মকে রক্ষা করুন। ১১।

ভীষ্ম দুর্য্যোধনের সেনাপতি।

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২ ॥

* সৌমদত্তিস্তথৈব চ ইতি পাঠান্তর আছে।

(তখন) প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ (ভীষ্ম) দুর্য্যোধনের হর্ষ জন্মাইয়া উচ্চ সিংহনাদ করতঃ শঙ্খধ্বনি করিলেন। ১২।

পূর্ব্বকালে রথিগণ যুদ্ধের পূর্ব্বে শঙ্খধ্বনি করিতেন। ভীষ্ম দুর্য্যোধনের পিতামহের ভাই।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥

তখন শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ সকল (বাদ্যযন্ত্র) সহসা আহত হইলে সে শব্দ তুমুল হইয়া উঠিল। ১৩।

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥

তখন শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে স্থিত কৃষ্ণার্জ্জুন দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন। ১৪।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ, অর্জ্জুন দেবদত্ত এবং ভীমকর্ম্মা ভীম পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ বাজাইলেন। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ, এবং সহদেব মণিপুষ্পক (নামে) শঙ্খ বাজাইলেন। ১৫। ১৬।

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥

পরম ধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, মহাবাহু সুভদ্রাপুত্র—হে পৃথিবীপতে! ইঁহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজাইলেন। ১৭। ১৮।

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥*

সেই শব্দ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিল ও আকাশ এবং পৃথিবীকে তুমুল ধ্বনিত করিল। ১৯।

অথ ব্যবস্থিতান দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥ ২০ ॥

* তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্ ইতি পাঠান্তর আছে।

পরে হে মহীপতে!* ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে ব্যবস্থিত দেখিয়া অস্ত্রনিক্ষেপে প্রবৃত্ত কপিধ্বজ অর্জ্জুন ধনু উত্তোলন করিয়া হৃষীকেশকে এই কথা বলিলেন। ২০।

"ব্যবস্থিত" শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন "যুদ্ধোদ্যোগে অবস্থিত।"

অর্জ্জুন উবাচ।

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১ ॥
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন—

যাহারা যুদ্ধ-কামনায় অবস্থিত, আমি যাবৎ তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করি, এই রণ-সমুদ্যমে কাহাদিগের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে (যাবৎ তাহা দেখি), যাহারা দুর্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রের প্রিয়চিকীর্ষায় এইখানে যুদ্ধে সমাগত হইয়াছে, সেই সকল যুদ্ধার্থী-দিগকে (যাবৎ) আমি দেখি, (তাবৎ) তুমি উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর। ২১। ২২। ২৩।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥

সঞ্জয় বলিলেন—

হে ভারত! † অর্জ্জুন কর্ত্তৃক হৃষীকেশ এইরূপ অভিহিত হইয়া উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ সকল রাজগণের সম্মুখে সেই উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়া কহিলেন, হে পার্থ সমবেত কুরুগণকে এই নিরীক্ষণ কর। ২৪। ২৫।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ॥
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ॥

তখন অর্জ্জুন সেইখানে স্থিত উভয় সেনায় পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ, আচার্য্যগণ, মাতুল-গণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, শ্বশুরগণ, সখিগণ ‡ এবং সুহৃদগণকে দেখিলেন। ২৬।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

---

* বোধ করি পাঠকের স্মরণ আছে যে, সঞ্জয়োক্তি চলিতেছে। সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রের বৃত্তান্ত ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতেছেন।

† ধৃতরাষ্ট্র এবং অর্জ্জুন উভয়কেই "ভারত" বলিয়া এই গ্রন্থে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহার কারণ, ইঁহারা দুষ্মন্তপুত্র ভরতের বংশ।

‡ সখা ও সুহৃদে অবশ্য প্রভেদ আছে। যাহার নিকট উপকার পাওয়া গিয়াছে, সেই সখা।

সেই কুন্তীপুত্র সেই সকল বন্ধুগণকে অবস্থিত দেখিয়া, পরম কৃপাবিষ্ট হইয়া বিষাদ-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন। ২৭।

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান।*
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥ ২৮॥

অর্জ্জুন বলিলেন—

হে কৃষ্ণ! এই যুদ্ধেচ্ছু সম্মুখে অবস্থিত স্বজনগণকে দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে। ২৮।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে॥ ২৯॥

আমার দেহ কাঁপিতেছে, রোমহর্ষ জন্মিতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে এবং চর্ম্ম জ্বালা করিতেছে। ২৯।

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব॥ ৩০॥

হে কেশব! আমি আর থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন যেন ভ্রান্ত হইতেছে, আমি দুর্লক্ষণ সকল দর্শন করিতেছি। ৩০।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥ ৩১॥

যুদ্ধে আত্মীয়বর্গকে বিনাশ করায় আমি কোন মঙ্গল দেখি না—হে কৃষ্ণ! আমি জয় চাহি না, রাজ্যসুখ চাহি না। ৩১।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ॥ ৩২॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ॥ ৩৩॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন॥ ৩৪॥

যাহাদিগের জন্য রাজ্য, ভোগ, সুখ কামনা করা যায়, সেই আচার্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালা এবং কুটুম্বগণ যখন ধন প্রাণ ত্যাগ করিয়া এই যুদ্ধে অবস্থিত, তখন হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যেই কাজ কি, ভোগেই কাজ কি, জীবনেই কাজ কি? হে মধুসূদন। আমি হত হই হইব, তথাপিও তাহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা করি না। ৩২। ৩৩। ৩৪।

"আমি হত হই হইব (ঘ্নতোঽপি)" কথার তাৎপর্য্য এই যে, "আমি না মারিলে তাহারা আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারে বটে। যদি তাই হয়, সেও ভাল, তথাপি

* দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্ ইতি পাঠান্তর আছে।

আমি তাহাদিগকে মারিব না।" বস্তুতঃ ভীষ্ম, দ্রোণের সহিত অর্জ্জুন এই ভাবেই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের "মৃদু যুদ্ধের" কথা আমরা অনেক বার শুনিতে পাই।

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫ ॥

পৃথিবীর কথা দূরে থাক, ত্রৈলোক্যের রাজ্যের জন্যই বা ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকে বধ করিলে কি সুখ হইবে, জনার্দ্দন ? ৩৫।

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।*
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ॥

এই আততায়ীদিগকে বিনাশ করিলে আমাদিগকে পাপ আশ্রয় করিবে, অতএব আমরা সবান্ধব ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে বিনাশ করিতে পারিব না। হে মাধব! স্বজন হত্যা করিয়া আমরা কি প্রকারে সুখী হইব ? ৩৬।

ছয় জনকে আততায়ী বলে—

অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ ॥

যে ঘরে আগুন দেয়, যে বিষ দেয়, শস্ত্রপাণি, ধনাপহারী, ভূমি যে অপহরণ করে ও বনিতা অপহরণ করে, এই ছয় জন আততায়ী। অর্থশাস্ত্রানুসারে আততায়ী বধ্য। টীকাকারেরা অর্জ্জুনের বাক্যের এইরূপ অর্থ করেন যে, যদিও অর্থশাস্ত্রানুসারে আততায়ী বধ্য, তথাপি ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে গুরু প্রভৃতি অবধ্য। ধর্ম্মশাস্ত্রের কাছে অর্থশাস্ত্র দুর্ব্বল, সুতরাং দ্রোণ ভীষ্মাদি আততায়ী হইলেও তাঁহাদিগের বধে পাপাশ্রয় হইবে। একালে আমরা "Law" এবং "Morality"র মধ্যে প্রভেদ করি, এ বিচার ঠিক সেইরূপ। "Law"র উপর "Morals" ইংরেজের পিনাল কোডেও লিখে যে, অবস্থাবিশেষে আততায়ীর বধজন্য দণ্ড নাই। কিন্তু সেই সকল অবস্থায় আততায়ীর বধ সর্ব্বত্র আধুনিক নীতিশাস্ত্রসঙ্গত নহে।

আনন্দগিরি এই শ্লোকের আর একটা অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এমনও বুঝাইতে পারে যে, গুরু প্রভৃতি বধ করিলে আমরাই আততায়ী হইব; সুতরাং আমাদের পাপাশ্রয় করিবে। "গুরুভ্রাতৃসুহৃৎপ্রভৃতীনেতান্ হত্বা বয়মাততায়িনঃ স্যামঃ।"

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭ ॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুং।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥ ৩৮ ॥

যদ্যপি ইহারা লোভে হতজ্ঞান হইয়া কুলক্ষয়দোষ এবং মিত্রদ্রোহে যে পাতক, তাহা দেখিতেছে না, কিন্তু হে জনার্দ্দন! আমরা কুলক্ষয় করার দোষ দেখিতেছি, আমরা সে পাপ হইতে নিবৃত্তিবুদ্ধিবিশিষ্ট কেন না হইব ? ৩৭। ৩৮।

*স্ববান্ধবান্ ইতি পাঠান্তর আছে।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯ ॥

কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়। ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট কুল অধর্ম্মে অভিভূত হয়। ৩৯।

সনাতন কুলধর্ম্ম—অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষপরম্পরা-প্রাপ্ত কুলধর্ম্ম।

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥

হে কৃষ্ণ! অধর্ম্মাভিভবে কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হয়, স্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে, হে বার্ষ্ণেয়!* বর্ণসঙ্কর জন্মায়। ৪০।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥

এই সঙ্কর কুলনাশকারীদিগের ও তাহাদের কুলের নরকের নিমিত্ত হয়। পিণ্ডোদক-ক্রিয়ার লোপ হেতু তাহাদিগের পিতৃগণ পতিত হয়। ৪১।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ ॥

এইরূপ কুলঘ্নদিগের বর্ণসঙ্করকারক এই দোষে জাতিধর্ম্ম এবং সনাতন কুলধর্ম্ম উৎসন্ন যায়। ৪২।

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩ ॥

হে জনার্দ্দন॥ আমরা শুনিয়াছি যে, যে মনুষ্যদিগের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন যায়, তাহাদিগের নিয়ত নরকে বাস হয়। ৪৩।

৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, এই পাঁচটি শ্লোক আধুনিক কৃতবিদ্য পাঠকদিগের কানে ভাল লাগিবে না। ইহা বর্ণসঙ্কর-বিরোধী প্রাচীন কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে, তার উপর "লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ" প্রভৃতি অলঙ্কারও আছে। বর্ণসঙ্করের উপর গীতাকারের বিশেষ বিদ্বেষ দেখা যায়। ইনি স্বয়ং ভগবানের মুখেও বর্ণসঙ্করের নিন্দা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। আমরা যখন তদ্বিষয়িণী ভগবদুক্তির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব, তখন তদুক্তির তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করিব। এক্ষণে অর্জ্জুনোক্তির স্থূল মর্ম্ম বুঝিলেই যথেষ্ট হইল। কুলের পুরুষগণ মরিলে কুলস্ত্রীগণ যে ব্যভিচারিণী হয়, ইহা সচরাচর দেখা যায়। কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইলে তাহাদিগের গর্ভে নীচ লোকের ঔরসে সন্তান জন্মিতে থাকে। বংশ নীচ সন্ততিতে পরিপূর্ণ হয়, কাজেই কুলধর্ম্ম লোপ পায়। বর্ণসঙ্করে যাঁহারা দোষ না দেখেন, এবং পিণ্ডাদির স্বর্গকারকতায় যাঁহারা বিশ্বাসবান্ নহেন—স্বর্গ নরকাদিও যাঁহারা মানেন না, তাঁহারাও বোধ করি,

* কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশসম্ভূত, এজন্য বার্ষ্ণেয়।

এতটুকু স্বীকার করিবেন।* বাকীটুকু কালোচিত ভাষা এবং অলঙ্কার।+ কথাটা অতি মোটা কথা বটে। কথাটা অর্জ্জুনের মুখে বসাইবার একটু কারণ আছে—অর্জ্জুনের এই "কুলধর্ম্মের" বড়াইয়ের উত্তরে ভগবান্ "স্বধর্ম্মের" কথাটা তুলিবেন। এটুকু গ্রন্থকারের কৌশল। "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ" এই অমৃতময় বাক্যের পর বলিবার যোগ্য কথা এ নহে।

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ॥

হায়! আমরা রাজ্যসুখলাভে স্বজনকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি—মহৎ পাপ করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি। ৪৪।

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

---

* The women, for instance, whose husbands, friends or relations have been all slain in battle, no longer restrained by law, seek husbands among other and lower castes, or tribes, causing a mixture of blood, which many nations at all ages have regarded as a most serious evil ; but particularly those who—like the Aryans, the Jews and the Scotch—were at first surrounded by foreigners very different to themselves, and thus preserved the distinction and genealogies of their races more effectively than any other.

(Thomson's *Translation of the Bhagavadgita*, p. 7.)

By the destruction of the males the rites of both tribe and family would cease, because women were not allowed to perform them : and confusion of castes would arise, for the women would marry men of another caste. Such marriages were considered impure (Manu, x, 1-40). Such marriages produced elsewhere a confusion of classes. Livy tells us that the Roman patricians at the instance of Canuleius complained of the intermarriages of the plebian class with their own, affirming that "omina divina humanaque turbari, ut qui natus sit, ignoret, cujus sanguinis, quorum sacrorum sit."

(Davies' *Translation of the Bhagavadgita*, p. 26.)

+ In bringing forward these and other melancholy superstitions of Brahmanism in the mouth of Arjuna, we are not to suppose that our poet though as much Brahman as philosopher in many un important points of belief—himself received and approved of them.

(Thomson, p. 7.)

যদি আমি প্রতীকারপরাঙ্মুখ এবং অশস্ত্র হইলে শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যুদ্ধে আমাকে বিনাশ করে, তাহাও আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত মঙ্গলকর হইবে। ৪৫।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬ ॥

সঞ্জয় বলিলেন—

অর্জ্জুন এইরূপ বলিয়া শোকাকুল মানসে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া সংগ্রামস্থলে রথোপস্থে উপবেশন করিলেন। ৪৬।

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে অর্জ্জুনবিষাদো*
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

বলিয়াছি, গীতার প্রথম অধ্যায়ে ধর্ম্মতত্ত্ব কিছু নাই, কিন্তু এই অধ্যায় একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। কাব্যের উপাদান সকল এখানে বড় সুন্দর সাজান হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রে উভয় সেনা সুসজ্জিত হইয়া পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে। পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা ব্যূহবদ্ধা হইয়াছে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন, পরম রণপণ্ডিত আপনার আচার্য্যকে দেখাইলেন। একটু ভীত হইয়া আচার্য্যকে বলিলেন, "আপনারা আমার সেনাপতি ভীষ্মকে রক্ষা করিবেন।" কিন্তু সেই বৃদ্ধ ভীষ্ম যুবার অপেক্ষাও উদ্যমশীল—তিনি সেই সময়ে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন—(শঙ্খ তখনকার bugle)। তাঁহার শঙ্খধ্বনি শুনিয়া উৎসাহে বা প্রত্যুত্তরে উভয় সৈন্যস্থ যোদ্ধৃগণ সকলেই শঙ্খধ্বনি করিলেন। তখন উভয় দলে নানাবিধ রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল—শঙ্খে, ভেরীতে, অন্যান্য বাদ্যের কোলাহলে গগন বিদীর্ণ হইল—আকাশ পৃথিবী তুমুল হইয়া উঠিল। সেই মহোৎসাহের সময়ে স্থিরচিত্ত অর্জ্জুন—যাঁহার উপরে কৌরব জয়ের ভার—আপনার সারথি কৃষ্ণকে বলিলেন—"একবার উভয় সেনার মধ্যে রথ রাখ দেখি—দেখি, কাহার সঙ্গে আমায় যুদ্ধ করিতে হইবে।" কৃষ্ণ, শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথ উভয় সেনার মধ্যে স্থাপিত করিলেন,—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তা বলিলেন, "এই দেখ।" অর্জ্জুন দেখিলেন, দুই দিকেই ত আপনার জন,—পিতৃব্য, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, মাতুল, শ্বশুর, শ্যালক, সুহৃৎ, সখা—তাঁহার গা কাঁপিয়া উঠিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইল, মুখ শুকাইল, দেহ অবসন্ন হইল, মাথা ঘুরিল, হাত হইতে সেই মহাধনু গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল। বলিলেন, "কৃষ্ণ! রাজ্য যাদের জন্য, তাদের মারিয়া রাজ্যে কি ফল?—আমি যুদ্ধ করিব না।" এই সংগ্রাম-ক্ষেত্র, দুই দিকে দুই মহতী সেনা, এই তুমুল কোলাহল, রণবাদ্য এবং ঘোরতর উৎসাহ—সেই সময়ে এই মহাবীরের প্রথমে স্থৈর্য্য, তার পর তাঁহার হৃদয়ে সেই করুণ এবং মহান্ প্রশান্ত ভাব—এরূপ মহচ্চিত্র সাহিত্যজগতে দুর্লভ। "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ"—ঈদৃশী অমৃতময়ী বাণী আর কে কোথায় শুনিয়াছে?

* কোন কোন পুস্তকে "সৈন্যদর্শনং" ইতি পাঠ আছে।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

সঞ্জয় বলিলেন—

তখন সেই কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণাকুললোচন বিষাদযুক্ত (অর্জ্জুন)কে মধুসূদন এই কথা বলিলেন। ১।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

হে অর্জ্জুন! এই সঙ্কটে অনার্য্যসেবিত স্বর্গহানিকর এবং অকীর্ত্তিকর তোমার এই মোহ কোথা হইতে উপস্থিত হইল? ২।

মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়* নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

হে কৌন্তেয়! ক্লীবতা প্রাপ্ত হইও না, ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। হে পরন্তপ! ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উত্থান কর। ৩।

অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন—

হে শত্রুনিসূদন মধুসূদন! পূজার্হ যে ভীষ্ম এবং দ্রোণ, যুদ্ধে তাঁহাদের সহিত বাণের দ্বারা কি প্রকারে আমি প্রতিযুদ্ধ করিব? ৪।

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫ ॥

মহানুভব গুরুদিগকে বধ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষা অবলম্বন করিতে হয়, সেও শ্রেয়। আর গুরুদিগকে বধ করিয়া যে অর্থ কাম ভোগ করা যায়, তাহা রুধিরলিপ্ত।৫।

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

আমরা জয়ী হই বা আমাদিগকে জয় করুক, ইহার মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়, তাহা

---

* "ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ" ইতি আনন্দগিরি-ধৃত পাঠ।

আমরা বুঝিতে পারিতেছি না—যাহাদিগকে বধ করিয়া আমরা বাঁচিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সম্মুখে অবস্থিত। ৬।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ ৭॥

কার্পণ্য-দোষে আমি অভিভূত হইয়াছি এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার চিত্ত বিমূঢ় হইয়াছে, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। যাহা ভাল হয়, আমাকে নিশ্চিত করিয়া বল। আমি তোমার শিষ্য এবং তোমার শরণাপন্ন হইতেছি—আমাকে শিক্ষা দাও। ৭।

কার্পণ্য অর্থে দীনতা। তারানাথ 'বাচস্পত্যে' এই অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া উদাহরণ-স্বরূপ গীতার এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভরসা করি, কোন পাঠকই এখানে দীনতা অর্থে দারিদ্র্য বুঝিবেন না। 'দীন' অর্থে মহাব্যসনপ্রাপ্ত। উদাহরণস্বরূপ—তারানাথ রামায়ণ হইতে আর একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা:—"মহদ্বা ব্যসনং প্রাপ্তো দীনঃ কৃপণ উচ্যতে।" আনন্দগিরি বলেন—যোঽল্পাং স্বল্পামপি স্বক্ষতিং ন ক্ষমতে স কৃপণঃ।" যে সামান্য ক্ষতি স্বীকার করিতে পারে না, সেই কৃপণ।* শ্রীধর স্বামী বুঝাইয়াছেন যে, "এই সকল বন্ধুবর্গকে নষ্ট করিয়া কি প্রাণ ধারণ করিব?" অর্জ্জুনের ইতি বুদ্ধিই কার্পণ্য। তিনি "কার্পণ্যদোষ" ইতি সমাসকে দ্বন্দ্ব সমাস বুঝিয়াছেন—কার্পণ্য এবং দোষ। দোষ শব্দে এখানে পূর্ব্বকথিত কুলক্ষয়কৃত পাপ বুঝিতে হইবে। অন্যান্য টীকাকারেরা সেরূপ অর্থ করেন নাই।

নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্-
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্যভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্॥ ৮॥

পৃথিবীতে অসপত্ন সমৃদ্ধ রাজ্য এবং সুরলোকের আধিপত্য পাইলেও যে শোক আমার ইন্দ্রিয়গণকে বিশোষণ করিবে, তাহা কিসে যাইবে, আমি দেখিতেছি না। ৮।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ॥ ৯॥

সঞ্জয় বলিতেছেন—

শত্রুজয়ী অর্জ্জুন† হৃষীকেশকে এইরূপ বলিয়া, যুদ্ধ করিব না, ইহা গোবিন্দকে বলিয়া তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিলেন। ৯।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ॥ ১০॥

---

* কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং "কার্পণ্য" শব্দের প্রতিবাক্য দিয়াছেন "helplessness"।

† মূলে "গুড়াকেশ" শব্দ আছে। গুড়াকেশ অর্জ্জুনের একটি নাম। টীকাকারেরা ইহার অর্থ করেন 'নিদ্রাজয়ী'। অন্যবিধ অর্থও দেখা গিয়াছে।

হে ভারত! হৃষীকেশ হাস্য করিয়া উভয় সেনার মধ্যে বিষাদপর অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন। ১০।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ১১॥

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

তুমি বিজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছ বটে; কিন্তু যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে, তাহাদের জন্য শোক করিতেছ। কি জীবিত, কি মৃত, কাহারও জন্য পণ্ডিতেরা শোক করেন না। ১১।

এইখানে প্রকৃত গ্রন্থারম্ভ। এখন কি কথাটা উঠিতেছে, তাহা বুঝিয়া দেখা যাউক।

দুর্য্যোধনাদি অন্যায়পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের রাজ্যাপহরণ করিয়াছে। যুদ্ধ বিনা তাহার পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। এখানে যুদ্ধ কি কর্ত্তব্য?

মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে এই কথাটার অনেক বিচার হইয়াছে। বিচারে স্থির হইয়াছিল যে, যুদ্ধই কর্ত্তব্য। তাই এই উভয় সেনা সংগৃহীত হইয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে।

এ অবস্থায় যুদ্ধ কর্ত্তব্য কি না, আধুনিক নীতির অনুগামী হইয়া বিচার করিলেও আমরা পাণ্ডবদিগের সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য স্বীকার করিব। এই জগতে যত প্রকার কর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে সচরাচর যুদ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু ধর্ম্মযুদ্ধও আছে। আমেরিকায় ওয়াশিংটন, ইউরোপে উইলিয়ম দি সাইলেণ্ট্ এবং ভারতবর্ষে প্রতাপ সিংহ প্রভৃতি যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা পরম ধর্ম্ম—দানাদি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। পাণ্ডবদিগেরও এই যুদ্ধপ্রবৃত্তি সেই শ্রেণীর ধর্ম্ম। এ বিচার আমি কৃষ্ণচরিত্রে সবিস্তারে করিয়াছি—এক্ষণে সে সকল পুনরুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই।* এ বিচারের স্থূল মর্ম্ম এই যে, যেটি যাহার ধর্ম্মানুমত অধিকার, তাহার সাধ্যানুসারে রক্ষা করা তাহার ধর্ম্ম। রক্ষার অর্থ এই যে, কেহ অন্যায়পূর্ব্বক তাহার অপহরণ বা অবরোধ করিতে না পারে; করিলে তাহার পুনরুদ্ধার এবং অপহর্ত্তার দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য। যদি লোকে স্বেচ্ছামত পরকে অধিকারচ্যুত করিয়া স্বচ্ছন্দে পরস্বাপহরণপূর্ব্বক উপভোগ করিতে পারে, তবে সমাজ এক দিনও টিকে না। সকল মনুষ্যই তাহা হইলে অনন্ত দুঃখ ভোগ করিবে। অতএব আপনার সম্পত্তির পুনরুদ্ধার কর্ত্তব্য। যদি বল ভিন্ন অন্য সদুপায় থাকে, তবে তাহাই অগ্রে অবলম্বনীয়। যদি বল ভিন্ন সদুপায় না থাকে, তবে বলই প্রযোজ্য। এখানে বলই ধর্ম্ম।

মহাভারতে দেখি যে, অর্জ্জুন ইতিপূর্ব্বে সকল সময়েই যুদ্ধপক্ষ ছিলেন। যখন যুদ্ধে স্বজনবধের সময় উপস্থিত হইল, বধ্য স্বজনবর্গের মুখ দেখিয়া তিনি যে কাতরচিত্ত ও যুদ্ধবুদ্ধি হইতে বিচলিত হইবেন, ইহাও সজ্জনস্বভাবসুলভ ভ্রান্তি।

মহাভারতে ইহাও দেখিতে পাই যে, যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ যত্ন

* এবং নবজীবন, প্রথম খণ্ড দেখ।

করিয়াছিলেন। পরে যখন যুদ্ধ অলঙ্ঘ্য হইয়া উঠিল, তখন তিনি যুদ্ধে কোন পক্ষে ব্রতী হইতে অস্বীকৃত হইয়া, কেবল অর্জ্জুনের সারথ্য মাত্র স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত হইলেও তিনি পরম ধর্ম্মজ্ঞ, সুতরাং এ স্থলে ধর্ম্মের পথ কোন্‌টা, তাহা অর্জ্জুনকে বুঝাইতে বাধ্য। অতএব অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন যে, যুদ্ধ করাই এখানে ধর্ম্ম, যুদ্ধ না করাই অধর্ম্ম।

বাস্তবিক যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধারম্ভ সময়ে কৃষ্ণার্জ্জুনে এই কথোপকথন হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু গীতাকার এইরূপ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্ম্মের সার মর্ম্ম সঙ্কলিত করিয়া মহাভারতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

যুদ্ধে প্রবৃত্তিসূচক যে সকল উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দিতেছেন, তাহা এই দ্বিতীয় অধ্যায়েই আছে। অন্যান্য অধ্যায়েও "যুদ্ধ কর" এইরূপ উপদেশ দিয়া ভগবান্ মধ্যে মধ্যে আপনার বাক্যের উপসংহার করেন বটে, কিন্তু সে সকল বাক্যের সঙ্গে যুদ্ধের কর্ত্তব্যতার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাই বোধ হয় যে, যে কৌশলে গ্রন্থকার এই ধর্ম্মব্যাখ্যার প্রসঙ্গ মহাভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছেন, তাহার অপ্রকৃততা পাঠক অনুভূত করিতে না পারেন, এই জন্য যুদ্ধের কথাটা মধ্যে মধ্যে পাঠককে স্মরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নতুবা যুদ্ধপক্ষ সমর্থন এই গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। যুদ্ধপক্ষ সমর্থনকে উপলক্ষ করিয়া সমস্ত মনুষ্যধর্ম্মের প্রকৃত পরিচয় প্রচারিত করাই উদ্দেশ্য।

এই কথাটা বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে, বোধ হয়, পাঠক মনে মনে বুঝিবেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় সেনার সম্মুখে রথ স্থাপিত করিয়া, কৃষ্ণার্জ্জুনে যথার্থ এইরূপ কথোপকথন যে হইয়াছিল, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ। দুই পক্ষের সেনা ব্যূহিত হইয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্যত, সেই সময়ে যে এক পক্ষের সেনাপতি উভয় সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায় যোগধর্ম্ম শ্রবণ করিবেন, এ কথাটা বড় সম্ভবপর বলিয়াও বোধ হয় না। এ কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করা যাউক না যাউক, পাঠকের আর কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

(১) গীতার ভগবৎপ্রচারিত ধর্ম্ম সঙ্কলিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু গীতাগ্রন্থখানি ভগবৎপ্রণীত নহে, অন্য ব্যক্তি ইহার প্রণেতা।

(২) যে ব্যক্তি এই গ্রন্থের প্রণেতা, তিনি যে কৃষ্ণার্জ্জুনের কথোপকথনকালে সেখানে উপস্থিত থাকিয়া সকলই স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন, এবং শুনিয়া সেইখানে বসিয়া সব লিখিয়াছিলেন বা স্মৃতিধরের মত স্মরণ রাখিয়াছিলেন, এমন কথাও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। সুতরাং যে সকল কথা গীতাকার ভগবানের মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, সে সকলই যে প্রকৃত পক্ষে ভগবানের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, এমন বিশ্বাস করা যায় না। অনেক কথা যে গ্রন্থকারের নিজের মত, তিনি ভগবানের মুখ হইতে বাহির করিতেছেন, ইহা সম্ভব।

যাঁহারা বলিবেন যে, এই গ্রন্থ মহাভারতান্তর্গত, মহাভারত মহর্ষি ব্যাস প্রণীত, তিনি যোগবলে সর্ব্বজ্ঞ এবং অভ্রান্ত, অতএব এরূপ সংশয় এখানে অকর্ত্তব্য, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমাদের কোন বিচার হইতে পারে না। সে শ্রেণীর পাঠকের জন্য এই ব্যাখ্যা প্রণীত হয় নাই, ইহা আমার বলা রহিল।

(৩) সংস্কৃত সকল গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য প্রণীত হইবার পর কোন শ্লোক গীতায় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে নাই, তাঁহার ভাষ্যের সঙ্গে এখন প্রচলিত মূলের ঐক্য আছে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের অন্যূন সহস্র বা ততোধিক বৎসর পূর্ব্বেও গীতা প্রচলিত ছিল। এই কাল মধ্যে যে কোন শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, তাহা কি প্রকারে বলিব? আমরা মধ্যে মধ্যে এমন শ্লোক পাইব, যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বোধ হয়।

এই সকল কথা স্মরণ না রাখিলে আমরা গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিব না। এ জন্য আগেই এই কয়টি কথা বলিয়া রাখিলাম। এক্ষণে দেখা যাউক, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই যুদ্ধের ধর্ম্ম্যতা বুঝাইতেছেন, সে সকল কথার সার মর্ম্ম কি?

আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর নীতিশাস্ত্রের বশবর্ত্তী হইয়া উপরে যে প্রণালীতে সংক্ষেপে এই যুদ্ধের ধর্ম্ম্যতা বুঝাইলাম, শ্রীকৃষ্ণ যে সে প্রথা অবলম্বন করেন নাই, ইহা বলা বাহুল্য। তাঁহার কথার স্থূল মর্ম্ম এই যে, সকলেরই স্বধর্ম্ম পালন করা কর্ত্তব্য।

আগে আমাদিগের বুঝিয়া দেখা চাই যে, স্বধর্ম্ম সামগ্রীটা কি?

শঙ্করাদি পূর্ব্বপণ্ডিতগণের পক্ষে এ তত্ত্ব বুঝান বড় সহজ হইয়াছিল। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, সুতরাং অর্জ্জুনের স্বধর্ম্ম ক্ষাত্র ধর্ম্ম বা যুদ্ধ। তিনি যে যুদ্ধ না করিয়া বরং বলিতেছিলেন যে, "ভিক্ষাবলম্বন করিব, সেও ভাল," সেটা তাঁহার পরধর্ম্মাবলম্বনের ইচ্ছা—কেন না, ভিক্ষা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।*

কিন্তু আমরা এই ব্যাখ্যায় সকল বুঝিলাম কি? বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুধর্ম্মের স্বধর্ম্ম বর্ণবিভাগানুসারে নির্ণীত হইতে পারে, ইহা যেন বুঝিলাম। কিন্তু অহিন্দুর পক্ষে স্বধর্ম্ম কি? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যে সমষ্টি, তাহা পৃথিবীর লোকসংখ্যার অতি ক্ষুদ্রাংশ—অধিকাংশ মনুষ্য চতুর্ব্বর্ণের বাহির; তাহাদের স্বধর্ম্ম নাই? জগদীশ্বর কি তাহাদের কোন ধর্ম্ম বিহিত করেন নাই? কোটি কোটি মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া কেবল ভারতবাসীর জন্য ধর্ম্ম বিহিত করিয়া, আর সকলকেই ধর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন? ভগবদুক্ত ধর্ম্ম কি হিন্দুর জন্যই? ম্লেচ্ছেরা কি তাঁহার সন্তান নহে? ভাগবত ধর্ম্ম এমন অনুদার নহে।

যিনি স্বয়ং জগদীশ্বরের এইরূপ ধর্ম্মচ্যুতিতে বিশ্বাসবান, তিনি খ্রীষ্টানের † তুল্য। আর যিনি তাহাতে বিশ্বাসবান নহেন, তিনি "স্বধর্ম্মের" অন্য তাৎপর্য্যের অনুসন্ধান করিবেন সন্দেহ নাই।

যাহার যে ধর্ম্ম, তাহার তাই স্বধর্ম্ম। এখন মনুষ্যের ধর্ম্ম কি? যাহা লইয়া মনুষ্যত্ব, তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম। কি লইয়া মনুষ্যত্ব? মানুষের শরীর আছে, এবং মন ‡ আছে।

* শোকমোহাভ্যাং হ্যভিভূতবিবেকবিজ্ঞানঃ স্বতএব ক্ষত্রধর্ম্মে যুদ্ধে প্রবৃত্তোঽপি তস্মাদ্যুদ্ধাদুপররাম পরধর্ম্মঞ্চ ভিক্ষাজীবনাদিকং কর্ত্তুং প্রববৃতে।—শঙ্করভাষ্য।

† খ্রীষ্টানদিগের বিশ্বাস যে, যে যীশুখ্রীষ্ট না ভজে, জগদীশ্বর তাহাকে অনন্তকাল জন্য নরকে নিক্ষেপ করেন।

‡ "মন" চলিত কথা, এই জন্য "মন" শব্দ ব্যবহার করিলাম। এই চলিত কথাটি ইংরেজি "mind" শব্দের অনুবাদ মাত্র। হিন্দুদর্শনশাস্ত্রের ভাষা ব্যবহার করিতে গেলে, ইহার পরিবর্ত্তে

এই শরীরই বা কি ? এবং মনই বা কি ? শরীর কতকগুলি জড় পদার্থের সমবায়, তাহাতে কতকগুলি শক্তি আছে। এই শক্তিগুলি শরীর হইতে তিরোহিত হইলে মনুষ্যত্ব থাকে না ; কেন না, মানুষের মৃতদেহে মনুষ্যত্ব আছে, এমন কথা বলা যায় না। তবেই জড় পদার্থকে ছাড়িয়া দিতে হইবে—সেই দৈহিকী শক্তিগুলিই মনুষ্যশরীরে প্রকৃত উপাদান। আমি স্থানান্তরে এইগুলির নাম দিয়াছি—"শারীরিকী বৃত্তি"। মনুষ্যের মনও এইরূপ শক্তি বা বৃত্তির সমষ্টি। সেইগুলির নাম দেওয়া যাউক—মানসিক বৃত্তি। এখন দেখা যাইতেছে যে, এই শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি লইয়াই মানুষ বা মানুষের মানুষত্ব।

যদি তাই হইল, তবে সেই সকল বৃত্তিগুলির বিহিত অনুশীলনই মানুষের ধর্ম্ম

বৃত্তির সঞ্চালন দ্বারা আমরা কি করি ? হয় কিছু কর্ম্ম করি, না হয় কিছু জানি। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যের জীবনে ফল আর কিছু নাই।*

অতএব জ্ঞান ও কর্ম্ম মানুষের স্বধর্ম্ম। সকল বৃত্তিগুলি সকলেই যদি বিহিতরূপে অনুষ্ঠিত করিত, তবে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েই সকল মনুষ্যেরই স্বধর্ম্ম হইত। কিন্তু মনুষ্য-সমাজের অপরিণতাবস্থায় তাহা সাধারণতঃ ঘটিয়া উঠে না।† কেহ কেবল জ্ঞানকেই প্রধানতঃ স্বধর্ম্মস্থানীয় করেন, কেহ কর্ম্মকে ঐরূপ প্রধানতঃ স্বধর্ম্মস্বরূপ গ্রহণ করেন।

জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য ব্রহ্ম ; সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে আছে। এ জন্য জ্ঞানার্জ্জন যাঁহাদিগের স্বধর্ম্ম, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। ব্রাহ্মণ শব্দ ব্রহ্মন্ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

কর্ম্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বুঝিতে গেলে কর্ম্মের বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। জগতে অন্তর্ব্বিষয় আছে ও বহির্ব্বিষয় আছে। অন্তর্ব্বিষয় কর্ম্মের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, বহির্ব্বিষয়ই কর্ম্মের বিষয়। সেই বহির্ব্বিষয়ের মধ্যে কতকগুলিই হউক, অথবা সবই হউক, মনুষ্যের ভোগ্য। মনুষ্যের কর্ম্ম মনুষ্যের ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। সেই আশ্রয় ত্রিবিধ, যথা (১) উৎপাদন, (২) সংযোজন বা সংগ্রহ, (৩) রক্ষা। (১) যাহারা উৎপাদন করে, তাহারা কৃষিধর্ম্মী ; (২) যাহারা সংযোজন বা সংগ্রহ করে, তাহারা শিল্প বা বাণিজ্যধর্ম্মী ; এবং (৩) যাহারা রক্ষা করে, তাহারা যুদ্ধধর্ম্মী। ইহাদিগের নামান্তর ব্যুৎক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এ কথা পাঠক স্বীকার করিতে পারেন কি ?

স্বীকার করিবার প্রতি একটা আপত্তি আছে। হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে এবং এই গীতার ব্যবস্থানুসারে কৃষি শূদ্রের ধর্ম্ম নহে ; বাণিজ্য এবং কৃষি, উভয়ই বৈশ্যের ধর্ম্ম। অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের ধর্ম্ম। এখনকার দিনে দেখিতে পাই, কৃষি প্রধানতঃ শূদ্রেরই ধর্ম্ম। কিন্তু অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যাও এখনকার দিনে প্রধানতঃ

বুদ্ধি ও মন উভয় শব্দ এবং তৎসঙ্গে অহঙ্কার এই তিনটি শব্দই ব্যবহার করিতে হইবে। তাহার পরিবর্ত্তে "matter and mind" এই বিভাগের অনুবর্ত্তী হওয়াই ভাল।

* কোম্‌ৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণ তিন ভাগে চিত্তপারণতিকে বিভক্ত করেন "Thought, Feeling, Action," ইহা ন্যায্য। কিন্তু Feeling অবশেষে Thought কিম্বা Action প্রাপ্ত হয়। এই জন্য পারণামের ফল জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দ্বিবিধ বলাও ন্যায্য।

† আমি উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপকেও সমাজের অপরিণতাবস্থা বলিতেছি।

শূদ্রেরই ধর্ম্ম। যখন জ্ঞানধর্ম্মী, যুদ্ধধর্ম্মী, বাণিজ্যধর্ম্মী বা কৃষিধর্ম্মীর কর্ম্মের এত বাহুল্য হয় যে তদ্ধর্ম্মিগণ আপনাদিগের দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না, তখন কতকগুলি লোক তাহাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব (১) জ্ঞানার্জ্জন বা লোকশিক্ষা, (২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা, (৩) শিল্প বা বাণিজ্য, (৪) উৎপাদন বা কৃষি, (৫) পরিচর্য্যা, এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম।

ইহার অনুরূপ পাঁচটি জাতি, রূপান্তরে, সকল সমাজেই আছে। তবে অন্য সমাজের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রভেদ এই যে, এখানে ধর্ম্ম পুরুষপরম্পরাগত। কেবল হিন্দুসমাজেই যে এরূপ, তাহা নহে, হিন্দুসমাজসংলগ্ন মুসলমানদিগের মধ্যেও এরূপ ঘটিয়াছে। দরজিরা পুরুষানুক্রমে সিলাই করে। জোলারা পুরুষানুক্রমে বস্ত্র বুনে, কলুরা পুরুষানুক্রমে তৈল বিক্রয় করে। ব্যবসা এইরূপ পুরুষপরম্পরানিবদ্ধ হইলে একটা দোষ ঘটে এই যে, যখন কোন জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি হইল, তখন নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ে কুলান হয় না, কর্ম্মান্তর অবলম্বন না করিলে জীবিকানির্ব্বাহ হয় না। প্রাচীন কালের অপেক্ষা এ কালে শূদ্রজাতির সংখ্যা বিশেষ প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।* এজন্য শূদ্র এখন কেবল পরিচর্য্যা ছাড়িয়া কৃষিধর্ম্মী। পক্ষান্তরে পূর্ব্বকালে আর্য্যসমাজস্থ অধিকাংশ লোক এইরূপ সামাজিক কারণে শিল্প, বাণিজ্য বা কৃষিধর্ম্মী ছিল। এবং তাহাদিগেরই নাম বৈশ্য।

সে যাই হউক, মনুষ্য মাত্রে, জ্ঞান বা কর্ম্মানুসারে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বণিক, শিল্পী, কৃষক, বা পরিচারকধর্ম্মী। সামাজিক অবস্থার গতি দেখিয়া যদি বল যে, মনুষ্য মাত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র, তাহাতেও কোন আপত্তি হইতে পারে না। স্থূল কথা এই যে, এই ষড়্‌বিধ বা পঞ্চবিধ বা চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম ভিন্ন মনুষ্যের কর্ম্মান্তর নাই। যদি থাকে, তাহা কুকর্ম্ম।† এই ষড়্‌বিধ কর্ম্মের মধ্যে যিনি যাহা গ্রহণ করেন, উপজীবিকার জন্যই হউক, আর যে কারণেই হউক, যাহার ভার আপনার উপর গ্রহণ করেন, তাহাই তাঁহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, তাঁহার Duty. তাহাই তাঁহার স্বধর্ম্ম। ইহাই আমার বুদ্ধিতে গীতোক্ত স্বধর্ম্মের উদার ব্যাখ্যা। যাঁহারা ইহার কেবল প্রাচীন হিন্দুসমাজের উপযোগী অর্থ নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা ভগবদুক্তিকে অতি সঙ্কীর্ণার্থক বিবেচনা করেন। ভগবান্ কখনই সঙ্কীর্ণবুদ্ধি নহেন।

যাহা ভগবদুক্তি,—গীতাই হউক, Bible-ই হউক, স্বয়ং অবতীর্ণ ভগবানের স্বমুখনির্গতই হউক বা তাঁহার অনুগৃহীত মনুষ্যের মুখনির্গতই হউক, যখন উহা প্রচারিত হয়, উহা তখনকার ভাষায় ব্যক্ত হইয়া থাকে, এবং তখনকার সমাজের এবং লোকের শিক্ষা ও সংস্কারের অবস্থার অনুমত যে অর্থ, তাহাই তৎকালে গৃহীত হয়। কিন্তু সমাজের অবস্থা

---

* কেবল কালসহকারে প্রজাবৃদ্ধির কথা বলিতেছি না। "বাঙ্গালির উৎপত্তি" বিষয়ে বঙ্গদর্শনে যে কয়টি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি যে, অনার্য্য জাতিবিশেষসকল হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু শূদ্রজাতিবিশেষে পরিণত হইয়াছে। যথা পুণ্ড্র নামক প্রাচীন অনার্য্য জাতিবিশেষ এখন কোন স্থানে পুঁড়া কোন স্থানে পোদে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে কালক্রমে শূদ্রের সংখ্যা বাড়িয়াছে। বর্ণসঙ্কর শূদ্রবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

† যথা চৌর্য্যাদি।

এবং লোকের শিক্ষা ও সংস্কারসকল কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়। তখন ভগবদুক্তির ব্যাখ্যারও সম্প্রসারণ আবশ্যক হয়। কেন না, ধর্ম্ম নিত্য; এবং সমাজের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধও নিত্য। ঈশ্বরোক্ত ধর্ম্ম যে কেবল একটি বিশেষ সমাজ বা বিশেষ সামাজিক অবস্থার পক্ষেই ধর্ম্ম, সমাজের অবস্থান্তরে তাহা আর খাটিবে না, এজন্য সমাজকে পূর্ব্বা-বস্থাতে রাখিতে হইবে, ইহা কখন ঈশ্বরাভিপ্রায়সঙ্গত হইতে পারে না। কালক্রমে সামাজিক পরিবর্ত্তনানুসারে ঈশ্বরোক্তির সামাজিক জ্ঞানোপযোগিনী ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণোক্ত স্বধর্ম্মের অর্থের ভিতর বর্ণাশ্রমধর্ম্মও আছে; আমি যাহা বুঝাইলাম, তাহাও আছে; কেন না, উহা বর্ণাশ্রমধর্ম্মেও সম্প্রসারণ মাত্র। তবে প্রাচীন কালে বর্ণাশ্রম বুঝিলেই ঈশ্বরোক্তির কালোচিত ব্যাখ্যা করা হয়; আমি যেরূপ বুঝাইলাম, এখন সেইরূপ বুঝিলেই কালোচিত ব্যাখ্যা করা হয়।

স্বধর্ম্ম কি, তাহা যদি, যাহা হউক এক রকম, আমরা বুঝিয়া থাকি, তবে এক্ষণে স্বধর্ম্ম পালন কেন করিব, তাহা বুঝিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ দুই প্রকার বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক এ তত্ত্ব অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন। একটি জ্ঞানমার্গ, আর একটি কর্ম্মমার্গ। এই অধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোক হইতে আটত্রিশ শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞানমার্গ কীর্ত্তন, তৎপরে কর্ম্মমার্গ।

জ্ঞানমার্গের স্থূল তত্ত্ব আত্মা অবিনশ্বর, পর-শ্লোকে সেই কথা উঠিতেছে।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২ ॥

আমি কদাচিৎ ছিলাম না, এমন নহে। তুমি বা এই রাজগণ ছিলেন না, এমন নহে। ইহার পরে আমরা সকলে যে থাকিব না, এমন নহে। ১২।

যুদ্ধে স্বজন-নিধন-সম্ভাবনা দেখিয়া অর্জ্জুন অনুতাপ করিলেন। তাহাতে কৃষ্ণ ইহার পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছেন, "যাহার জন্য শোক করিতে নাই, তাহার জন্য তুমি শোক করিতেছ।" যে মরিবে, তাহার জন্য শোক করা উচিত নহে কেন, তাহা এই শ্লোকে বুঝাইতেছেন। ভাবার্থ এই যে, "দেখ, কেহ মরে না। দেখ, আমি, তুমি আর এই রাজগণ অর্থাৎ সকলেই চিরস্থায়ী; পূর্ব্বেও সকলেই ছিলাম, এ জীবন ধ্বংসের পর সবাই থাকিবে। যদি থাকিবে, মরিবে না, তবে তাহাদের জন্য শোক করিবে কেন?"

ইহাই হিন্দুধর্ম্মের স্থূল কথা—হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত প্রধান তত্ত্ব। কেবল হিন্দুধর্ম্মের নহে, খ্রীষ্টধর্ম্মের, বৌদ্ধধর্ম্মের, ইস্‌লামধর্ম্মের, সকল ধর্ম্মের মধ্যে ইহাই প্রধান তত্ত্ব। সে তত্ত্ব এই যে, দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মা আছে, এবং সেই আত্মা অবিনাশী। শরীরের ধ্বংস হইলেও আত্মা পরকালে বিদ্যমান থাকে। পরকালে আত্মার কি অবস্থা হয়, তদ্বিষয়ে নানা মতভেদ আছে ও হইতে পারে, কিন্তু দেহাতিরিক্ত অথচ দেহস্থিত আত্মা আছেন, এবং তিনি বিনাশ-শূন্য, অমর, ইহা হিন্দু, খ্রীষ্টিয়ান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, মুসলমান প্রভৃতি সকলের সম্মত। এই সকল ধর্ম্মের ইহাই মূলভিত্তি।

এই তত্ত্বের প্রধান প্রতিবাদী বৈজ্ঞানিকেরা। তাঁহারা বলেন, শরীরাতিরিক্ত আর কিছু নাই। শরীরাতিরিক্ত আর একটা যে আত্মা আছে, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই।

আজকাল বৈজ্ঞানিকেরাই বড় বলবান্। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম এক দিকে, তাঁহারা

আর এক দিকে। তাঁহাদের প্রচণ্ড প্রতাপে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম হটিয়া যাইতেছে। অথচ বিজ্ঞানের* অপেক্ষা ধর্ম্ম বড়। পক্ষান্তরে ধর্ম্ম বড় বলিয়া আমরা বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। ধর্ম্মও সত্য, বিজ্ঞানও সত্য। অতএব এ স্থলে আমাদের বিচার করিয়া দেখা যাউক, কতটুকু সত্য কোন্ দিকে আছে। বিশেষতঃ শিক্ষিত বাঙ্গালী, বিজ্ঞান জানুন বা না জানুন, বিজ্ঞানের প্রতি অচল ভক্তিবিশিষ্ট। বিজ্ঞানে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ হয়, জাহাজ চলে, কল চলে, কাপড় হয়, নানা রকমে টাকা আসে, অতএব বিজ্ঞানই তাঁহাদের কাছে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ। যখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য এই টীকা লেখা যাইতেছে, তখন আত্মবাদের বিজ্ঞান যে প্রতিবাদ করেন, তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত।

এ বিচারে আগে বুঝা কর্ত্তব্য যে, আত্মা কাহাকে বলা যাইতেছে, এবং হিন্দুরা আত্মাকে কিরূপ বুঝে।

হিন্দু দার্শনিকেরা আত্মাকে বলেন, "অহম্প্রত্যয়বিষয়াস্পদপ্রত্যয়লক্ষিতার্থঃ"—অর্থাৎ "আমি" বলিলে যাহা বুঝিব, সেই আত্মা। এ সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা এই বাক্যের সম্প্রসারণ মাত্র।

"আমি দুঃখ ভোগ করি—কিন্তু আমি কে? বাহ্য প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছু তোমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। তুমি বলিতেছ, আমি বড় দুঃখ পাইতেছি—আমি বড় সুখী। কিন্তু একটি মনুষ্যদেহ ভিন্ন 'তুমি' বলিব, এমন কোন সামগ্রী দেখিতে পাই না। তোমার দেহ এবং দৈহিক প্রক্রিয়া, ইহাই কেবল আমার জ্ঞানগোচর। তবে কি তোমার দেহেরই এই সুখ দুঃখ ভোগ বলিব?

তোমার মৃত্যু হইলে তোমার সেই দেহ পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু তৎকালে তাহার সুখ দুঃখ ভোগের কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না। আবার মনে কর, কেহ তোমাকে অপমান করিয়াছে, তাহাতে দেহের কোন বিকার নাই, তথাপি তুমি দুঃখী। তবে তোমার দেহ দুঃখভোগ করে না। যে দুঃখভোগ করে, সে স্বতন্ত্র। সেই তুমি। তোমার দেহ তুমি নহে।

এইরূপ সকল জীবের। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই জগতের কিয়দংশ ইন্দ্রিয়-গোচর, কিয়দংশ অনুমেয় মাত্র, ইন্দ্রিয়গোচর নহে, এবং সুখ দুঃখাদির ভোগকর্ত্তা। যে সুখ দুঃখাদির ভোগকর্ত্তা, সেই আত্মা।"†

আত্মতত্ত্ব বিষয়ক এই স্থূল কথাটা খ্রীষ্টিয়াদি সকল ধর্ম্মেই আছে। কিন্তু তাহার উপর আর একটা অতি সূক্ষ্ম, অতি চমৎকার কথা কেবল হিন্দুধর্ম্মেই আছে। সেই তত্ত্ব অতি উন্নত, উদার, বিশুদ্ধ, বিশ্বাসমাত্রে মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়। হিন্দু ভিন্ন আর কোন জাতিই সেই অতি মহত্তত্ত্ব অনুভূত করিতে পারে নাই। যে সকল কারণে হিন্দুধর্ম্ম অন্য সকল ধর্ম্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা তাহার মধ্যে একটি অতি গুরুতর কারণ। সেই তত্ত্ব এখন বুঝাইতেছি।

* পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রচলিত প্রথানুসারে Scienceকেই বিজ্ঞান বলিতেছি ও বলিব।
† প্রবন্ধ পুস্তক।

আত্মা সকলেরই আছে। তুমি যখন আমা হইতে ভিন্ন, তখন তোমার আত্মা আমা হইতে কাজেই ভিন্ন। কিন্তু ভিন্ন হইয়াও প্রকৃতরূপে ভিন্ন নহে। মনে কর, বহু-সংখ্যক শূন্য পাত্র আছে; তাহার সকলগুলির ভিতর আকাশ আছে। এক পাত্রাভ্যন্তরস্থ আকাশ পাত্রান্তরস্থ আকাশ হইতে ভিন্ন। কিন্তু পৃথক্ হইলেও সকল পাত্রস্থ আকাশ জাগতিক আকাশের অংশ। পাত্রগুলি ভগ্ন করিলেই আর কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না। সকল পাত্রস্থ আকাশ সেই জাগতিক আকাশ হইতে অভিন্ন হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জীবগত আত্মা পরস্পর পৃথক্ হইলেও জাগতিক আত্মার অংশ, কেহ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইলে সেই জাগতিক আত্মায় বিলীন হয়। এই জগদাত্মাকে হিন্দু-দার্শনিকেরা পরমাত্মা বলেন। জীবদেহস্থায়ী আত্মা যত দিন সেই পরমাত্মায় বিলীন না হয়, তত দিন তাহাকে জীবাত্মা বলেন।

এখন এই জীবাত্মা কি নশ্বর? দেহের ধ্বংস হইলেই কি তাহার ধ্বংস হইল? ইহার সহজ উত্তর এই যে, যাহা অবিনশ্বরের অংশ, তাহা কখন নশ্বর হইতে পারে না। যদি জাগতিক আকাশ অবিনশ্বর হয়, তবে ভাণ্ডস্থ আকাশও অবিনশ্বর। যদি পরমাত্মা অবিনশ্বর হয়েন, তবে তদংশ জীবাত্মাও অবিনশ্বর।

এই হইল হিন্দুধর্ম্মের কথা। অন্য কোন ধর্ম্ম এই অত্যুন্নত তত্ত্বের নিকটেও আসিতে পারেন নাই। আমরা পরে দেখাইব যে, ইহার অপেক্ষা উন্নত তত্ত্ব মনুষ্যজ্ঞাত তত্ত্বের ভিতর আর নাই বলিলেও হয়। প্রাচীন ঋষিরা বলিতে পারেন, "আমরা যদি আর কিছু না করিতাম, কেবল এই কথাটা পৃথিবীতে প্রচার করিয়া যাইতাম, তাহা হইলেও আমরা সকল মনুষ্যের উপরে আসন পাইবার যোগ্য হইতাম।"* বাস্তবিক এই সকল তত্ত্বের আলোচনা করিলে তাঁহাদিগকে মনুষ্যমধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না; দেবতা বলিতে ইচ্ছা করে।

এখন দেখা যাউক, বৈজ্ঞানিকেরা এই সম্বন্ধে কি বলেন। তাঁহারা বলেন, আদৌ আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। প্রমাণাভাবে কোন কথাই স্বীকার কর্ত্তব্য নহে। যখন আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করা যাইতে পারে না, তখন তাহার অবিনাশিতা, জীবাত্মা, পরমাত্মা, এ সকল উপন্যাসমধ্যে গণনা করিতে হয়। এই শ্রেণীর এক জন জগদ্বিখ্যাত লেখক আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার পক্ষে যে আপত্তি, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন।

"Thought and consciousness, though mentally distinguishable from the body, may not be a substance separable from it, but a result of it, standing in relation to it, like that of a tune to the musical instrument on which it is played; and that the arguments used to prove that the soul does not die with the body, would equally prove that the tune does not die with the instrument but survives its destruction and continues to exist apart. In fact, those moderns who dispute the evidence of the immortality of the soul, do

* যে তত্ত্বটা বুঝাইলাম, তাহা যে বিলাতী pantheism নয়, এ কথা বোধ হয় বলিবার প্রয়োজন নাই।

not in general believe the soul to be a substance *per se*, but regard it as a bundle of attributes, the attributes of feeling, thinking, reasoning, believing, willing and these attributes they regard as a consequence of the bodily organization which therefore, they urge, it is as unreasonable to suppose surviving when that organization is dispersed, as to suppose the colour or odour of a rose surviving when the rose itself has perished. Those, therefore, who would deduce the immortality of the soul from its own nature have first to prove that the attributes in question are not attributes of the body, but of a separate substance."*

এইখানে পাঠক একটু সূক্ষ্ম বুঝিয়া দেখুন। এই বিচারের তাৎপর্য্য এই যে, আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব অসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন ইহার দ্বারা আত্মার অনস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে না। আত্মা নাই, এমন কথা মিল, কি কেহই বলিতে পারেন না। উক্ত বিচারে যে আত্মার অনস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে না, তাহা মিল নিজেই বুঝাইতেছেন।

"In the first place, it does not prove, experimentally, that any mode of organization has the power of producing feeling or thought. To make that proof good, it would be necessary, that we should be able to produce an organism, and try whether it would feel, which we cannot do."

পুনশ্চ—

"There are thinkers who regard it as a truth of reason that miracles are impossible; and in like manner there are others who, because the phenomena of life and consciousness are associated in their minds by undeviating experience with the action of material organs, think it an absurdity *per se* to imagine it possible those phenomena can exist under any other conditions. But they should remember that the uniform co-existence of one fact with another does not make the one fact a part of the other or the same with it. The relation of thought to a material brain is no metaphysical necessity; but simply a constant co-existence within the limits of observation. And when analysed to the bottom on the principles of the associative Psychology, just as much as the mental functions, is, like matter itself, merely a set of human sensations either actual or inferrible as possible... Experience furnishes us with no example

* *Three Essays on Religion*, p. 197. শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য এই টীকা লেখা যাইতেছে, সুতরাং ইংরেজির তরজমা দেওয়া যাইবে না।

of any series of states of consciousness without this group of contingent sensations attached to it; but it is as easy to imagine such a series of states without, as with, this accompaniment and we know of no reason in the nature of things against the possibility of its being thus disjoined. We may suppose that the same thoughts, emotions, volition and even sensations which we have here, may persist or recommence somewhere else under other conditions, just as we may suppose that other thoughts and sensations may exist under other conditions in other parts of the universe. And in entertaining this supposition we need not be embarrassed by any metaphysical difficulty about a thinking substance. Substance is but a general name for the perdurability of attributes; wherever there is a series of thoughts connected together by memories, that constitutes a thinking substance."

জড়বাদীর আপত্তি এই বিচারে ভাসিয়া গেল, তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না। তথাপি ইহাতেই আত্মবাদী জয়ী হইতেছেন। পৃথক্ আত্মা নাই, অথবা তাহা নশ্বর, এ কথা বলিবার কাহারও অধিকার নাই, ইহাতে প্রমাণীকৃত হইল। কিন্তু আত্মা যে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ, এবং তাহা অবিনাশী, ইহা প্রমাণীকৃত হইল না। তুমি বলিতেছ, স্বতন্ত্র আত্মা আছে, এবং তাহা অবিনাশী, এ কথার প্রমাণ কি ?

অনেক সহস্র বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির মধ্যে এই প্রমাণ সংগৃহীত হইয়া আসিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা তাহা অপ্রচুর বলিয়া উড়াইয়া দেন। বৈজ্ঞানিকেরা সত্যবাদী এবং প্রমাণ সম্বন্ধে তাঁহারা সুবিচারক। অতএব তাঁহারা এ কথা কেন বলেন সেটাও বুঝিয়া রাখা চাই।

বুঝিতে গেলে, আগে বুঝিতে হইবে, প্রমাণ কি ? যাহা দ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞান জন্মে, তাহাই তাহার প্রমাণ। আমি এই এই পুষ্পটি দেখিতে পাইতেছি বলিয়াই, জানিতে পারিতেছি যে, পুষ্পটি আছে। প্রত্যক্ষ দৃষ্টিই এখানে পুষ্পের অস্তিত্বের প্রমাণ। আমি গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া মেঘগর্জ্জন শুনিলাম, ইহাতে জানিলাম যে, আকাশে মেঘ আছে। এখানে মেঘ আমার প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। কিন্তু মেঘের ধ্বনি আমার প্রত্যক্ষের * বিষয়। প্রত্যক্ষাভাবেও মেঘবিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার কারণ পূর্ব্বকৃত প্রত্যক্ষ হইতে অনুমান। যখনই যখনই এইরূপ গর্জ্জনধ্বনি শুনিয়া আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করা গিয়াছে, তখনই তখনই আকাশে মেঘ দেখা গিয়াছে।

অতএব আমরা দ্বিবিধ প্রমাণের দেখা পাইতেছি—(১) প্রত্যক্ষ (২) অনুমান। ভারতবর্ষীয়েরা অন্যবিধ প্রমাণও স্বীকার করেন, তাহার কথা পরে বলিতেছি। বৈজ্ঞানিক বা জড়বাদিগণ অন্য কোন প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা অনুমান সম্বন্ধে

* যাহা ইন্দ্রিয়গোচর, তাহাই প্রত্যক্ষের বিষয়। পুষ্পের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইল, মেঘের ধ্বনির শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল।

ইহাও বলেন যে, যে অনুমান প্রত্যক্ষমূলক নহে, সে অনুমান অসিদ্ধ ; অথবা এরূপ অনুমান হইতে পারে না। এই তত্ত্বের মীমাংসা জন্য ইউরোপীয়েরা এক অতি বিচিত্র এবং মনোহর দর্শনশাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ পরিচয় দিবার স্থান নাই।

এখন ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মা কখন কাহারও প্রত্যক্ষের বিষয় হয় নাই। শরীর প্রত্যক্ষ কিন্তু শরীরস্থ আত্মার প্রত্যক্ষতা নাই। শরীর-বিমুক্ত আত্মারও কেহ কখন প্রত্যক্ষ করে নাই। যাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ-মূলক কোন অনুমানও হইতে পারে না। কেবল ইহাই নহে। আত্মা ভিন্ন এমন অন্য কোন পদার্থ সম্বন্ধে মনুষ্যের কোন প্রকার প্রত্যক্ষজাত কোন প্রকার জ্ঞান নাই যে, তাহা হইতে আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। এরূপ যে সকল প্রমাণ এদেশে বা ইউরোপে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বিচারে টিকে না। অতএব আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই।*

তাই বিজ্ঞান, আত্মাকে খুঁজিয়া পায় না। বিজ্ঞান সত্যবাদী। বিজ্ঞানের যতদূর সাধ্য, বিজ্ঞান তত দূর সন্ধান করিল, কিন্তু যথার্থ সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া ও সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও বিজ্ঞান আত্মাকে পাইল না। পাইল না কেন, না বিজ্ঞানের তত দূর গতি-শক্তি নাই। যাহার যত দৌড়, তাহার বেশী সে যাইতে পারে না। ডুবুরী কোমরে দড়ি বাঁধিয়া সাগরে নামে, যতটুকু দড়ি, তত দূর যাইতে পারে, তার বেশী যাইতে পারে না, সাগরের সমস্ত রত্ন কুড়াইবার সাধ্য নাই। প্রমাণের দড়ি বিজ্ঞানের কোমরে বাঁধা, বিজ্ঞান প্রমাণের অপ্রাপ্য আত্মতত্ত্ব পাইবে কোথা? যেখানে বিজ্ঞান পৌঁছে না, সেখানে বিজ্ঞানের অধিকার নাই, যে উচ্চ ধামের নিম্ন সোপানে বসিয়া বিজ্ঞান জন্ম সার্থক করে, সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অনুসন্ধান করাই ভ্রম। "Our victorious Science fails to sound one fathom's depth on any side, since it does not explain the parentage of *mind*.† For mind was in truth before

* তবে সর্ব্ব দেশে সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, মৃত ব্যক্তির দেহবিমুক্ত আত্মা কখন কখন মনুষ্যের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হয়। দেহ-বিমুক্তাত্মা এইরূপে মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গোচর হইলে অবস্থাবিশেষে ভূত প্রেত নাম প্রাপ্ত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এ সকল চিত্তের ভ্রমমাত্র, রজ্জুতে সর্পজ্ঞানবৎ ভ্রমজ্ঞান মাত্র, আর ঈদৃশ ভ্রমজ্ঞানই আত্মার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসের কারণ। কিন্তু এক্ষণে ইউরোপ ও আমেরিকায় Spiritualism তত্ত্বের প্রাদুর্ভাব, এই প্রেততত্ত্বই বিজ্ঞানের একটি শাখা হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; এবং Crookes, Wallace প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরা এতদ্বিষয়ক প্রমাণ সকল এমন উত্তমরূপে পরীক্ষিত ও শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন যে, প্রতিপক্ষেরা কিছু গোলযোগে পড়িয়াছেন। ইহার নানা প্রকার বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, প্রেতপক্ষের যাথার্থ্য এখনও বৈজ্ঞানিকেরা সাধারণতঃ স্বীকার করেন না। সুতরাং উহা আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণের মধ্যে আমি গণনা করিতে পারিলাম না। আর ঈদৃশ প্রমাণের উপর ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করি না। ধর্ম্ম বিজ্ঞান নহে। তাহার ভিত্তি আরও দৃঢ়সংস্থাপিত।

† আত্মা।

all science, and remains for ever, the seer, judge, interpreter, even father of all its systems, facts, and laws. Our faculties are none the less truly above our heads because we no longer wonder like children at processes we do not understand. Spite of category and formula of Kant and Hegel, we are abashed before our own untraceable thought. The star of heaven, the grass of the field, the very dust that shall be man, foil our curiosity as much as ever, and none the less yielding to the lens, the prism and the polariscope of science ever now triumphs for our pride and delight."* যখন বিজ্ঞান একটি ধূলিকণার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারে না,† তখন আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিবে কি প্রকারে? যে হৃদয়ে ঈশ্বরকে না পায়, সে বিজ্ঞানে পায় না। যে হৃদয়ে ঈশ্বরকে পাইয়াছে, তাহার কাছে আত্মবাদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের কোন প্রয়োজন নাই।

এখন বৈজ্ঞানিক উত্তর করিবেন যে, বিচার বড় অন্যায় হইতেছে। যখন বলিতেছ, জ্ঞান মাত্রের উপায় প্রমাণ, তখন অবশ্য স্বীকার করিতেছ যে, প্রমাণাতিরিক্ত জ্ঞেয় কিছুই নাই। আত্মতত্ত্ব যখন প্রমাণের অতীত, আত্মার অস্তিত্বের যখন প্রমাণ নাই, তখন আত্ম-সম্বন্ধে মনুষ্যের কোন জ্ঞান নাই ও হইতে পারে না। অতএব আত্মা আছে কি না জানি না, ইহা ভিন্ন আর কিছু আমাদের বলিবার উপায় নাই।

এ কথার দুইটি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। একটি প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকদিগের উত্তর, একটি আধুনিক জর্ম্মাণদিগের উত্তর। দর্শনশাস্ত্রে এই দুইটি জাতিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ। এই দুই জাতিই দেখিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষমূলক যে অনুমান, তাহার গতিশক্তি অতি সঙ্কীর্ণ, তাহা কখনই মনুষ্য-জ্ঞানের সীমা নহে। এই জন্য হিন্দু দার্শনিকেরা অন্যবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকেরা বলেন, আর দ্বিবিধ প্রমাণ আছে, উপমান এবং শাব্দ। সাংখ্যেরা উপমান স্বীকার করেন না, কিন্তু শাব্দকে তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন।

উপমান (Analogy) যে একটি পৃথক্ প্রমাণ, ইহা আমরা পাঠকদিগকে স্বীকার করিতে বলিতে পারি না। অনেক স্থলে উহার দ্বারা প্রমাণজ্ঞান জন্মে না, ভ্রমজ্ঞান জন্মে। যেখানে উপমান প্রমাণের কার্য্য করে, সেখানে উহা পৃথগ্‌বিধ প্রমাণ নহে, অনুমানবিশেষ মাত্র। এক্ষণে "শাব্দ" কি, তাহা বুঝাইতেছি।

আপ্তোপদেশই শাব্দ, অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদিশূন্য যে বাক্য, তাহাই তৃতীয় প্রমাণ। যদি বেদাদিকে ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি, তবে তাহা প্রমাণ। যদি বেদাদিকে আমরা ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য বাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি, তবে আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা বেদে উক্ত হইয়াছে বলিয়া, উহা অনায়াসে স্বীকার করা যাইতে পারে। পরন্তু বেদাদি যদি মনুষ্যোক্তি হয় তবে উহা ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না; কেন না, মনুষ্যমাত্রেই ভ্রমপ্রমাদাদির অধীন।

* *Oriental Religions, India, p. 447.*

† কতকগুলি ইউরোপীয় দার্শনিকদের মতে বহির্জ্জগতের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই।

স্থূল কথা, এক ঈশ্বরই ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য পুরুষ। যদি কোন উক্তিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি, তবে তাহাই প্রকৃত শাব্দরূপ প্রমাণ। খ্রীষ্টিয়ানেরাও ইহাকে উৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন—ইংরাজি নাম Revelation, বস্তুতঃ যদি কোন উক্তিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে তাহা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কেন না, প্রত্যক্ষ ও অনুমানও ভ্রান্ত হইতে পারে, ঈশ্বর কখনই ভ্রান্ত হইতে পারেন না। যদি এই গীতাকে কাহারও ঈশ্বরোক্তি বলিয়া বিশ্বাস হয়, তবে আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা সম্বন্ধে তাঁহার অন্য প্রমাণ খুঁজিবারও প্রয়োজন নাই; এই গীতাই অখণ্ডনীয় প্রমাণ। তবে নিরীশ্বর বৈজ্ঞানিক, গীতাদিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া স্বীকার করিবেন না। আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে তিনি কি বাধ্য নহেন?

তাঁহাদিগের জন্য জর্ম্মাণ-দার্শনিকদিগের উত্তর আছে। কাণ্টের বিচিত্র দর্শনশাস্ত্র পাঠককে বুঝাইবার স্থান এখানে নাই। কিন্তু কাণ্ট এবং তাঁহার পরবর্ত্তী কতকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ দার্শনিকদিগের মত এই যে, প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষমূলক অনুমান ভিন্ন জ্ঞানের অন্য কারণ আছে। তাঁহারা বলেন, কতকগুলি তত্ত্ব মনুষ্যচিত্তে স্বতঃসিদ্ধ। তাঁহারা কেবল "বলেন" ইহাই নয়, কাণ্ট এই তত্ত্বের যে প্রকার প্রমাণ করিয়াছেন, তাহা মনুষ্য বুদ্ধির আশ্চর্য্য পরিচয়স্থল। কাণ্ট ইহাও বলেন যে, যাহাকে আমরা বুদ্ধি বলি, অর্থাৎ যে শক্তির দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষাদি হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান লইয়া বিচার করি, তাহার উচ্চতর আমাদের আর এক শক্তি আছে। যাহা বিচারে অপ্রাপ্য, সেই শক্তির প্রভাবে আমরা তাহা জানিতে পারি। ঈশ্বর, আত্মা, এবং জগতের একত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমরা সেই মহতী শক্তি হইতে পাই। এই "Transcendental Philosophy," সর্ব্ববাদি-সম্মত নহে। অতএব এমন লোক অনেক আছেন যে আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতায় বিশ্বাস তাঁহাদের পক্ষে দুর্লভ। তবে যাহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য, তাহা আমি এখানে বলিতে বাধ্য। আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, চিত্তবৃত্তি সকল সমুচিত মার্জ্জিত হইলে, আত্মসম্বন্ধীয় এই জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ হয়।*"

ভক্তের এ সকল কচকচিতে কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরভক্ত কেবল ক্ষুদ্র দর্শন-শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া, আত্মার স্বাতন্ত্র্য বা অবিনাশিতা স্বীকার করেন না। ভক্তের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট যে, ঈশ্বর আছেন, এবং তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, তিনিই পরমাত্মা এবং স্বয়ংই সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছেন। তবে যে এই দীর্ঘ বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহার কারণ এই যে, অনেকে অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মতত্ত্বকে উপহসিত করেন। তাঁহাদের জানা উচিত যে, আত্মতত্ত্ব পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের অতীত হউক, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ১৩॥

* অনেকে বলিবেন, তবে কি Huxley, Tyndall প্রভৃতির মত লোকের 'চিত্তবৃত্তি সকল সমুচিত মার্জ্জিত হয় নাই? উত্তর—না, সকলগুলি হয় নাই।

দেহীর যেমন এই দেহে কৌমার ও যৌবন ও বার্দ্ধক্য, তেমনি দেহান্তর-প্রাপ্তি। পণ্ডিত তাহাতে মুগ্ধ হন না। ১৩।

গীতোক্ত প্রথম প্রধান তত্ত্ব, আত্মার অবিনাশিতা। এই শ্লোকে দ্বিতীয় প্রধান তত্ত্ব কথিত হইতেছে—জন্মান্তরবাদ। যেমন এই দেহেতেই আমাদিগকে ক্রমশঃ কৌমার, যৌবন, জরা ইত্যাদি অবস্থান্তরপ্রাপ্ত হইতে হয়, তেমনি দেহান্তে দেহান্তরপ্রাপ্তি অবস্থান্তরপ্রাপ্তি মাত্র। অর্থাৎ মৃত্যু কেবল অবস্থান্তর মাত্র, যেমন কৌমার গেলে যৌবন উপস্থিত হয়, যৌবন গেলে জরা উপস্থিত হয়, তেমনি এ দেহ যায়, আর এক দেহ আসে ; —যেমন কৌমার গিয়া যৌবন আসিলে কেহ শোক করে না, যৌবন গিয়া জরা আসিলে কেহ শোক করে না, তেমনি এ দেহ গেলে দেহান্তরপ্রাপ্তির বেলাই বা কেন শোক করিব?

এই কথায় মানিয়া লওয়া হইল যে, মরিলেই আবার জন্ম আছে। আত্মার অবিনাশিতা যেমন হিন্দুধর্ম্মের প্রথম তত্ত্ব, জন্মান্তরবাদ তেমনি দ্বিতীয় তত্ত্ব। কিন্তু আত্মার অবিনাশিতা যেমন খ্রীষ্টিয়াদি অন্যান্য প্রধান ধর্ম্মে স্বীকৃত, জন্মান্তরবাদ সেরূপ নহে। পক্ষান্তরে জন্মান্তরবাদ যে কেবল হিন্দুধর্ম্মেই আছে, এমন নহে। বৌদ্ধধর্ম্মেরও ইহা প্রধান তত্ত্ব, এবং অন্যান্য ধর্ম্মেও ছিল বা আছে। তবে ইউরোপে এ মত অগ্রাহ্য এবং ইহার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই। এজন্য শিক্ষিত বাঙ্গালী এ মত গ্রাহ্য করেন না।

বাস্তবিক আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, তেমনি জন্মান্তর সম্বন্ধেও তদ্রূপ কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে যেমন আত্মার অস্তিত্ব অপ্রমাণ করা যায় না, জন্মান্তরও অপ্রমাণ করা যায় না। তা না যাক, যাহার প্রমাণাভাব, তাহা মানিতে কেহ বাধ্য নহে। এই তত্ত্বে বিশ্বাস যে, চিত্তবৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলনে স্বতঃসিদ্ধ হয়, এমন কথাও আমি বলিতে পারি না। তবে যিনি স্বর্গ নরকাদি মানেন, জন্মান্তরবাদীর অপেক্ষা তাহার বেশী জোর কিছুই নাই। যেমন জন্মান্তরবাদের আপ্তোপদেশ ভিন্ন অন্য প্রমাণ নাই, স্বর্গ নরকাদিরও তেমনি অন্য প্রমাণ নাই। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এ দেশে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ইউরোপীয়দিগের দেখাদেখি প্রমাণাভাবেও স্বর্গনরকে বিশ্বাসবান্—অর্থাৎ সুখ-দুঃখ-যুক্ত পরলৌকিক অবস্থাবিশেষে বিশ্বাসবান্, কিন্তু জন্মান্তরে কোন মতেই বিশ্বাসবান্ নহেন।

কথাটা একটু সবিস্তারে সমালোচনা করিবার আমাদের একটু প্রয়োজন আছে। যিনি আত্মার অস্তিত্ব মানেন না, তাঁহার সঙ্গে ত আমাদের কথাই নাই ; কেন না, তিনি কাজেই জন্মান্তর মানিবেন না। কিন্তু যিনি আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা মানেন, তাঁহার সম্মুখে একটা বড় গুরুতর প্রশ্ন আপনা হইতে উপস্থাপিত হয়।

জীবাত্মা যদি অবিনশ্বর হইল, তবে দেহান্তে তাহার গতি কি হয়?

এ বিষয়ে জগতে অনেকগুলি মত প্রচলিত আছে।

১। ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়। ইহা সচরাচর অসভ্য জাতিদিগের বিশ্বাস।

২। স্বর্গাদি লোকান্তর প্রাপ্ত হয়। খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানদিগের এই মত।

৩। জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধদিগের এই মত।

৪। পরব্রহ্মে লীন হয় বা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।

হিন্দুধর্ম্মে শেষোক্ত এই তিনটি মতই প্রচলিত আছে। এই তিনটি মতের সামঞ্জস্য কি প্রকার হইয়াছে, তাহা বুঝাইতেছি। হিন্দুরা বলেন যে, দেহান্তে জীবাত্মা মুক্ত হয় না; আপনার কৃত কর্ম্মানুসারে পুনর্ব্বার দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহার আবার জন্মান্তর হয়। যখন জীবাত্মা এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, ঈশ্বরে লীন হইবার যোগ্য হইয়াছে, তখন আর জন্ম হয় না, ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় বা নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হয়। ইহাকেই সচরাচর মুক্তি বা মোক্ষ বলে। কিসে জীবাত্মা এই অবস্থাপন্ন হইতে পারে, ইহাই সাংখ্যাদি দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। হিন্দুরা ইহাও বলেন যে, যখন জীবাত্মা মুক্ত হইবার অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই অথচ এমন কোন সুকৃত করিয়াছে যে, স্বর্গাদি উপভোগের যোগ্য, তখন জীবাত্মা কৃত পুণ্যের পরিমাণানুযায়ী কাল, স্বর্গাদি উপভোগ করে, পরে জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়।

আপাততঃ শুনিলে এ সকল কথা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকের নিকট অশ্রদ্ধেয় বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু একটু বিচার করিলে আর এক রকম বোধ হইবে।

এই জন্মান্তরবাদ হিন্দুধর্ম্মে অতিশয় প্রবল। উপনিষদুক্ত হিন্দুধর্ম্ম, গীতোক্ত হিন্দুধর্ম্ম, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম বা দার্শনিক হিন্দুধর্ম্ম, সকলপ্রকার হিন্দুধর্ম্ম ইহার উপর স্থাপিত। যেমন সূত্রে মণি গ্রথিত থাকে, হিন্দুধর্ম্মের সকল তত্ত্বগুলিই তেমনি এই সূত্রে গ্রথিত আছে। অতএব এই তত্ত্বটি আমাদিগকে বড় যত্নপূর্ব্বক বুঝিতে হইবে। কথাটা বড় গুরুতর,—অতি দুরূহ। আমরা বাল্যকাল হইতে কথাটা শুনিয়া আসিতেছি, ইহা আমাদের বাল্য-সংস্কারের মধ্যে, সুতরাং আমরা সচরাচর ইহার গৌরব অনুভব করি না। কিন্তু বিদেশীয় এবং অন্যধর্ম্মাবলম্বী চিন্তাশীল পণ্ডিতেরা কুসংস্কার-বর্জ্জিত হইয়া ইহার আলোচনাকালে বিস্ময়াবিষ্ট হয়েন। গীতার অনুবাদকার টমসন সাহেব এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "Undoubtedly it is the most novel and startling idea ever started in any age or country". টেলর সাহেব ইহাকে "One of the most remarkable developments of ethical speuclation" বলিয়া প্রশংসিত করিয়াছেন।*

কথাটা যদি এমনই গুরুতর, তবে আর একটু ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

বলা হইয়াছে, জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ, ইহা হিন্দুশাস্ত্রের উক্তি। পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের অংশ তাঁহা হইতে পার্থক্য লাভ করিল কি প্রকারে? তাঁহার দেহবদ্ধাবস্থা বা কেন? হিন্দুশাস্ত্রে ইহার যে উত্তর আছে, তাহা বুঝাইতেছি। ঈশ্বরের অশেষ প্রকার শক্তি আছে। একটি শক্তির নাম মায়া। এই মায়া কি, তাহা স্থানান্তরে বুঝাইব। এই মায়ার দ্বারা তিনি আপনার সত্তাকে জগতে পরিণত করিয়াছেন। তিনি চৈতন্যময়; তাঁহা ভিন্ন আর চৈতন্য নাই; অতএব জগতে যে চৈতন্য দেখি, ইহা তাঁহারই অংশ; তাঁহার সিসৃক্ষাক্রমে এই অংশমায়ার বশীভূত হইয়া পৃথক্ ও দেহবদ্ধ হইয়াছে। যদি সেই পৃথগ্‌ভূত চৈতন্য বা জীবাত্মা কোন প্রকারে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, তবে আর তাহার পার্থক্য থাকিবে কেন? পার্থক্য ঘুচিয়া যাইবে, জীবাত্মা আবার পরমাত্মায় বিলীন হইবে।

---

* *Primitive Culture*, Vol. I, page 12.

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, জীবাত্মা এই মায়াকে অতিক্রম করিবে কি প্রকারে? যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা বা নিয়োগক্রমেই বদ্ধ হইয়া থাকে, তবে আবার বিমুক্ত হইবার সাধ্য কি? ইহার উত্তর এই যে ঈশ্বরের নিয়োগ এরূপ নহে যে, জীবাত্মা চিরকালই মায়াবদ্ধ থাকিবে। তিনি যে সকল নিয়ম করিয়াছেন, মায়ার অতিক্রমের উপায়ও তাহার ভিতরে রাখিয়াছেন। সে উপায় কি, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, জ্ঞানেই সেই মায়াকে অতিক্রম করা যায়; কেহ বলেন—কর্ম্মে, কেহ বলেন—ভক্তিতে। এই সকল মতের মধ্যে কোন্‌টি সত্য বা কোন্‌টি অসত্য, তাহার বিচার পশ্চাৎ করা যাইবে। এখন সকলগুলিই সত্য, ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক। এখন এইগুলিই যদি ঈশ্বরে বিলীন হইবার উপায় হয়, তবে যে ব্যক্তি ইহজীবনে জ্ঞান, কর্ম্ম বা ভক্তির সমুচিত অনুষ্ঠান করে নাই, সে ঈশ্বরে লয় বা মুক্তি লাভ করিবে না। তবে সে ব্যক্তির আত্মা, মৃত্যুর পর কোথায় যাইবে? আত্মা অবিনশ্বর; সুতরাং দেহভ্রষ্ট আত্মাকে কোথাও না কোথাও যাইতে হইবে।

ইহার এক উত্তর এই হইতে পারে যে, দেহভ্রষ্ট আত্মা কর্ম্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে যাইবে। স্বর্গ বা নরক প্রভৃতি লোকান্তরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব। কিন্তু প্রমাণের কথা এখন থাক। স্বীকার করা যাউক, কর্ম্মফলানুসারে আত্মা স্বর্গে বা নরকে যায়। এখন জিজ্ঞাস্য যে, জীবাত্মা স্বর্গে বা নরকে কিয়ৎকালের জন্য যায়, না অনন্তকালের জন্য যায়?

যদি বল কিয়ৎকালের জন্য যায়, তবে সেখান হইতে ফিরিয়া আবার কোথায় যাইবে? জন্মান্তর স্বীকার না করিয়া, এ প্রশ্নের উত্তর নাই। হয় বল যে, জীব কর্ম্মফলের উপযোগী কাল স্বর্গ বা নরক ভোগ করিয়া, পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিবে, নয় বল যে অনন্তকাল সে স্বর্গ বা নরক ভোগ করিবে।

খ্রীষ্টিয়ানেরা তাই বলেন। তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর বিচার করিয়া পাপীকে অনন্ত নরকে এবং পুণ্যবান্‌কে অনন্ত স্বর্গে প্রেরণ করেন।

এ কথায় বড় গোলমালে পড়িতে হয়। মনুষ্যলোকে এমন কেহই নাই যে, কোন সৎ কর্ম্ম কখন করে নাই বা কোন অসৎ কর্ম্ম কখন করে নাই। সকলেই কিছু পাপ, কিছু পুণ্য করে। এখন জিজ্ঞাস্য যে, যে কিছু পাপ করিয়াছে, কিছু পুণ্য করিয়াছে, সে অনন্ত স্বর্গে যাইবে, না অনন্ত নরকে যাইবে? যদি সে অনন্ত স্বর্গে যায়, তবে জিজ্ঞাসা করি, তাহার পাপের দণ্ড হইল না কেন? যদি বল, অনন্ত নরকে যাইবে, তবে জিজ্ঞাসা করি, তাহার পুণ্যের পুরস্কার হইল না কেন?

যদি বল, যাহারা পাপের ভাগ বেশী, সে অনন্ত নরকে, যাহার পুণ্যের ভাগ বেশী, সে অনন্ত স্বর্গে যাইবে, তাহা হইলেও ঈশ্বরে অবিচার আরোপ করা হইল। কেন না, তাহা হইলে এক পক্ষে পুণ্যের কিছুই পুরস্কার হইল না, আর এক পক্ষে পাপের কিছুই দণ্ড হইল না।

কেবল ঈশ্বরের প্রতি অবিচার আরোপ করা হয়, এমত নহে। ঘোরতর নিষ্ঠুরতা আরোপ করাও হয়। যাঁহাকে দয়াময় বলি, তিনি যে এই অল্প কাল পরিমিত মনুষ্যজীবনে কৃত পাপের জন্য অনন্তকালস্থায়ী দণ্ড বিধান করিবেন, ইহার

অপেক্ষা অবিচার ও নিষ্ঠুরতা আর কি আছে? ঈদৃশ নিষ্ঠুরতা ইহলোকের পামরগণের মধ্যেও পাওয়া যায় না।

যদি বল, যাহার পাপের ভাগ বেশী, পুণ্যের ভাগ কম, সে পুণ্যানুরূপ কাল স্বর্গ ভোগ করিয়া অনন্তকাল জন্য নরকে যাইবে, এবং তদ্বিপরীতে বিপরীত ফল হইবে; তাহাতেও ঐ সকল আপত্তির নিরাস হইল না। কেন না, পরিমিত কাল, কোটি কোটি যুগ হইলেও, অনন্ত কালের তুলনায় কিছুই নহে। অবিচার ও নিষ্ঠুরতার লাঘব হইল, এমন হইতে পারে, অভাব হইল না। অতএব তুমি যদি স্বর্গ নরক স্বীকার কর, তবে তোমাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, অনন্ত কালের জন্য স্বর্গ নরক ভোগ বিহিত হইতে পারে না। তুমি উর্দ্ধ ইহাই বলিতে পার যে, পাপ পুণ্যের পরিমাণানুযায়ী পরিমিত কাল জীব স্বর্গ বা নরকে বা পৌর্ব্বাপর্য্যের সহিত উভয় লোক ভোগ করিবে। তাহা হইলে সেই সাবেক প্রশ্নটির উত্তর বাকি থাকে। সেই পরিমিত কালের অবসানে জীবাত্মা কোথায় যাইবে? পরব্রহ্মে লীন হইতে পারে না; কেন না, জ্ঞান কর্ম্মাদিই যদি মুক্তির উপায়, তবে স্বর্গ নরকে সে উপায়ের সাধনভাবে মুক্তি অপ্রাপ্য। কেন না, স্বর্গ নরক ভোগ মাত্র—কর্ম্মক্ষেত্র নহে, এবং দেহশূন্য আত্মার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অভাবে, স্বর্গ নরকে জ্ঞান কর্ম্মের অভাব। অতএব এখনও জিজ্ঞাস্য, সেই পরিমিত কালের অবসানে জীবাত্মা কোথায় যায়?

হিন্দুশাস্ত্র এ প্রশ্নের উত্তরে বলে,—জীবাত্মা তখন জীবলোকে প্রত্যাগমন করিয়া দেহান্তর ধারণ করে। হিন্দুধর্ম্মের, বিশেষতঃ এই গীতোক্ত ধর্ম্মের এই অভিপ্রায় যে, জীবাত্মা সচরাচর দেহধ্বংসের পর দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে। সেই দেহান্তর-প্রাপ্তিতে কর্ম্মফলানুসারে এবং পাপপুণ্যের তারতম্যানুসারে সদসৎ যোনি প্রাপ্ত হয়। সচরাচর কর্ম্মফল ভোগ জন্মান্তরেই হইয়া থাকে, কিন্তু কতকগুলি কর্ম্ম এমন আছে যে, তাহার ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি হইতে পারে, আর কতকগুলি কর্ম্ম এমন আছে যে, তাহার ফলে নরক ভোগ করিতে হয়। যে সেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, তাহাকে স্বর্গে বা নরকে যাইতে হইবে। কর্ম্মের ফলের পরিমাণানুযায়ী কালই স্বর্গ বা নরক ভোগ করিবে, তাহার পর আবার জীবলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিবে।

কিন্তু যে ব্যক্তি জন্মান্তর মানে না, তাহার সকল আপত্তির এখনও নিরাস হয় নাই। সে বলিবে, "যাহা বলিলে, এটা সাফ আন্দাজি কথা। অনন্ত স্বর্গ নরক ভোগ অসঙ্গত কথা স্বীকার করি। স্বর্গ ও নরক আমি আদৌ মানিতেছি না। কেন না, তাহার প্রমাণাভাব। কিন্তু স্বর্গ নরক না মানিলেই জন্মান্তর মানিব কেন? মানিলাম যে, আত্মা অবিনাশী। তুমি বলিতেছ যে, অবিনাশী আত্মা, যদি দেহান্তরে না যায়, তবে কোথায় যাইবে? আমি উত্তরে বলিব, কোথায় যায়, তাহা জানি না। পরকালের কথা কিছুই জানি না। যাহা জানি না, যাহার প্রমাণাভাব, তাহা মানিব না। জন্মান্তরের প্রমাণ দাও, তবে মানিব। গত্যন্তরের প্রমাণাভাব, জন্মান্তরের প্রমাণ নয়। তুমি যে রামও নও, শ্যামও নও, তাহাতে প্রমাণ হইতেছে না যে, তুমি যাদব কি মাধব। জন্মান্তর যে হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ কি?"

কথা বড় শক্ত। জন্মান্তরবাদীরা এ বিষয়ে যে সকল প্রমাণ দিয়া থাকেন বা ইচ্ছা করিলে দিতে পারেন, তাহা আমি যথাসাধ্য নিম্নে সংগ্রহ করিলাম।

১। এ দেশে সচরাচর লোকের অদৃষ্ট-তারতম্য দেখাইয়া এই মত সমর্থন করা হয়। কেহ বিনা দোষে দুঃখী; কেহ সহস্র দোষ করিয়াও সুখী, এ দেশীয়গণ জন্মান্তরের সুকৃত দুষ্কৃত ভিন্ন এরূপ বৈষম্যের কিছু কারণ দেখেন না। লোকান্তরে অর্থাৎ স্বর্গ নরকে সুকৃতের পুরস্কার ও দুষ্কৃতের দণ্ড হইবে, এ কথা বলিলে ইহলোকের অদৃষ্ট-বৈষম্য সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায় না। কেহ আজন্ম দুঃখী, অন্নহীনের ঘরে জন্মিয়াছে; কেহ আজন্ম সুখী, রাজার একমাত্র পুত্র;—জন্মকালেই এ অদৃষ্ট-তারতম্য কেন? যদি ইহা জীবের কর্ম্মফল হয়, তবে ইহজন্মের কর্ম্মফল নহে; কেন না, সদ্যঃপ্রসূত শিশুর ত কিছুই ইহজন্মকৃত কর্ম্ম নাই। কাজেই তাঁহারা এখানে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফল বিবেচনা করিয়া থাকেন।

আপত্তিকারক এ বিচারে সন্তুষ্ট হইবেন না। মনে কর, তিনি বলিবেন, "সকলই কি কর্ম্মফল? যদি তাই হয়, তবে মৃত্যুকেও কর্ম্মফল বলিতে হইবে। কিন্তু কখনও কোন জীব মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। অতএব ইহাই সিদ্ধ যে এমন কোন কর্ম্ম বা অকর্ম্ম নাই, যদ্দ্বারা মৃত্যু হইতে রক্ষা হইতে পারে। অতএব মৃত্যু কর্ম্মফল হইতে পারে না। মৃত্যু যদি কর্ম্মফল না হইল, তবে জন্মই বা কর্ম্মফল বলিব কেন? যাহা কর্ম্মফল, যাহা কর্ম্মফল নহে, সকলই ঈশ্বরের নিয়মে ঘটে। ইহাও তাই। দম্পতি-সংসর্গে অবস্থাবিশেষে পুত্র জন্মে; রাজার ঘরেও জন্মে, মুটের ঘরেও জন্মে। ইহাও তাই ঘটিয়াছে। এমন স্থলে জাত ব্যক্তির কর্ম্মফল খুঁজিব কেন?"

এখানেও বিচার শেষ হয় না। পূর্ব্বজন্মবাদী প্রত্যুত্তরে বলিতে পারে, "ঈশ্বরের নিয়মের ফলে সকলই ঘটে, ইহা আমিও স্বীকার করি। তবে বলিতেছি যে, এ বিষয়ে ঈশ্বরের নিয়ম এই যে, পূর্ব্বজন্মকৃত ফলানুসারে এই সকল বৈষম্য ঘটে। তুমি যে নিয়ম বলিতেছ আমি তাহা অস্বীকার করিতেছি— জন্মের কারণ উপস্থিত হইলেই জন্ম ঘটিবে—তা রাজ্ঞীর গর্ভেই কি, আর দরিদ্রের গর্ভেই কি? কিন্তু এ নিয়মে কি জন্মতত্ত্ব সকলই বুঝাইতে পার? কেহ রূপ, কান্তি, বুদ্ধি, সদ্‌গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে—কেহ কুরূপ, নির্ব্বোধ ও গুণহীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। তুমি যদি বল যে, এইরূপ প্রভেদ অনেক স্থলে জন্মের পরবর্ত্তী শিক্ষার ফল, তাহাতে আমার উত্তর এই যে শিক্ষার প্রভেদে কতক তারতম্য ঘটে বটে, কিন্তু সমস্ত তারতম্যটুকু শিক্ষাধীন বলিয়া বুঝা যায় না। কেন না, অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, এক প্রকার শিক্ষায় পাত্রভেদে ফলের বিশেষ তারতম্য ঘটে। এমন কি, শিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে দেহ ও বুদ্ধির তারতম্য দেখা যায়। ছয় মাসের শিশুদিগের মধ্যেও এ প্রভেদ লক্ষিত হয়। জানি, তুমি বলিবে যে, যেটুকু শিক্ষার অধীন বলিয়া বুঝা যায় না, সে তারতম্যটুকু বৈজিক, অর্থাৎ পিতা মাতা বা পূর্ব্বপুরুষগণের প্রকৃতির ফল। আমি ইহাও মানি যে, মাতা পিতা বা তৎপূর্ব্বগামী পূর্ব্বপুরুষগণের প্রকৃতি, এমন কি সংস্কার পর্য্যন্ত আমাদিগকে পাইতে হয়, এবং পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু মনুষ্যমধ্যে যে তারতম্যের কথা বলিতেছি, তাহা তোমার বৈজিক

তত্ত্বে নিঃশেষে বুঝা যায় না। দেখ, এক মাতার গর্ভে এক পিতার ঔরসে অনেক-গুলি ভ্রাতা জন্মে; তাহাদের মাতা পিতা বা পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে কোনই প্রভেদ নাই; অথচ ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। ইহার উত্তরে তুমি বলিতে পার বটে যে, গর্ভাধানকালে মাতা পিতার দৈহিক অবস্থা এবং যত দিন শিশু গর্ভে থাকে, তত দিন মাতার দৈহিক ও মানসিক অবস্থা ও তৎকালীন ঘটনাসকল এই তারতম্যের কারণ। না হয় ইহাও মানিলাম—কিন্তু যমজেও এরূপ তারতম্য দেখা যায়—সে তার-তম্যের কিছু কারণ নির্দ্দেশ করিতে পার কি?"

ইহারও বৈজ্ঞানিক উত্তর দিতে পারেন। তিনি বলিতে পারেন যে, এই সকল তারতম্য এত দূর মনুষ্য-পরিজ্ঞাত নৈসর্গিক নিয়মাধীন বলিয়া বুঝা গেল, তবে বাকিটুকু মনুষ্যের জ্ঞেয় নিয়মের অধীন বলিয়া বিবেচনা করা উচিত—পূর্ব্বজন্ম কল্পনা করা অনাবশ্যক। এখনও বিজ্ঞান এত দূর যায় নাই যে, এই তারতম্যের কারণ সর্ব্বত্র নির্দ্দেশ করা যায়; কিন্তু একদিন যাইবে ভরসা করা যায়।

এ দিকে জন্মান্তরবাদীও বলিতে পারেন যে, এ তোমার আন্দাজি কথা। যাহা বিজ্ঞান এখন বুঝাইতে পারিতেছে না, তাহা যে বিজ্ঞান বুঝাইতে পারে, এবং ভবিষ্যতে বুঝাইতে পারিবে, এটা আন্দাজি কথা। ইহা আমি মানি না।

এরূপ বিচারের অন্ত নাই, কোন পক্ষের জয় পরাজয় নাই। এখানে বৈজ্ঞানিক জন্মান্তরবাদীকে নিরস্ত করিতে পারেন না, বা জন্মান্তরবাদী বৈজ্ঞানিককে নিরস্ত করিতে পারেন না। উভয়ের দশা তুল্য হইয়া পড়ে। যাহা অজ্ঞাত, উভয়কেই তাহার আশ্রয় লইতে হয়। তবে জন্মান্তরবাদীকেই বিশেষ প্রকারে অজ্ঞাত ও অপ্রামাণিকের আশ্রয় লইতে হয়। এ বিচারে জন্মান্তর প্রমাণীকৃত হইতেছে, এমন আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

২। যাহাতে মনুষ্যসাধারণের বিশ্বাস, তাহা সত্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়, এমন কথা অনেকে বলেন। খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানেরা যাই বলুন, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী মনুষ্যেরা সাধারণতঃ জন্মান্তরে বিশ্বাস করে। পৃথিবী অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, নানা দেশে নানা জাতিই জন্মান্তরে বিশ্বাসবান্।*

* "It has been accepted, in some form, by disciples of every religion in the world. It is common to Greek philosophers, Egyptian priests, Jewish Rabbins and several early Christian sects. It appears in the speculations of the Neo-Platonists, of later European mystics, even of socialists like Fourier, who elaborates a fanciful system of successive lines mutually connected by numerical relation. It reaches from the Eleusinian mysteries down to the religions of many rude tribes of North America and the Pacific isles. Not a few noble dreams of the cultivated imagination are subtly associated with it, as in Plato, Giordano Bruno, Herder, Sir Thomas Browne, and specially notable is Lessing's conception of gradual

বলা বাহুল্য যে, এ প্রমাণও অনেক লোকের প্রতীতিকর হইবে না। যাহা জনসাধারণের বিশ্বাস, তাহাও সকল সময়ে সত্য হয় না। ইহা প্রসিদ্ধ। যথা, পৃথিবী সূর্য্যাদির সম্বর্ত্তনকেন্দ্র।

৩। যত দিন না আত্মা বহুজন্মার্জ্জিত জ্ঞান কর্ম্মাদির দ্বারা বিধূতপাপ হয়, তত দিন ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয় না। এক জন্মে সকলে তদুপযোগী চিত্তশুদ্ধি লাভ করে না। এ কথাটা আমাদের দেশী, কিন্তু গ্রীক দার্শনিকেরাও এই যুক্তির দ্বারা জন্মান্তরবাদের সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহারা তাহা সবিস্তারে পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা *Phædon* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সোক্রেতিসের উক্তি অধ্যয়ন করিবেন। বৈজ্ঞানিক বলিবেন, এ কথারও প্রমাণাভাব।

৪। অনেকের বিশ্বাস যে, যোগসিদ্ধ পুরুষেরা আপনাদিগের পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারেন। কিন্তু কোন সিদ্ধ পুরুষের যে এরূপ পূর্ব্বজন্মস্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাসজনক কিছু প্রমাণ নাই। পুরাণেতিহাসের সকল কথা যে বিশ্বাসযোগ্য নহে, ইহা বলা বাহুল্য।* আর যদি কোন সিদ্ধপুরুষ যথার্থই বলিয়া থাকেন যে, তাঁহার পূর্ব্বজন্মস্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইলেও প্রমাণ সম্পূর্ণ হইল না। কেন না, দুইটি সন্দেহের কারণ বিদ্যমান থাকে, (১) তিনি সত্য কথা বলিতেছেন কি না, (২) যদিও ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা না বলুন, তাঁহার সেই বিস্মৃতি কোন পীড়াজনিত মস্তিষ্কের বিক্রিয়া মাত্র কি না?

improvement of the human type through metamorphosis in a series of future lives." *Oriental Religions : India*, p. 517.

যিনি এ সকল কথার বিস্তারিত প্রথম সংগ্রহ দেখিতে চান, তিনি টেলর-প্রণীত *Primitive Culture* নামক গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায় অধ্যয়ন করিবেন।

* কিন্তু ইহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ভিন্ন দেশীয় লেখকেও এরূপ পূর্ব্বজন্মস্মৃতির কথা বলেন।

"Pythagoras is made to illustrate in his own person his doctrine of metempsychosis, by recognizing where it hung in Here's temple the shield he had carried in a former birth, when he was that Euphorbos whom Menelaus slew at the siege of Troy. Afterwards he was Hermotimos, the Klazomenian prophet, whose funeral rites were so prematurely celebrated while his soul was out, and after that, as Lucian tells the story, his prophetic soul passed into the body of a cock. Mikyllos asks this cock to tell him about Troy—were things there really as Homer said? But the cock replies; "How should Homer have known, O Mikyllos? When the Trojan war was going on, he was a camel in Baktria."—Tylor's *Primitive Culture*, Vol. II, p. 13.

বলা বাহুল্য, ইহা সব খোস গল্প মাত্র।

৫। যোগীদিগের পূর্ব্বজন্মস্মৃতিতে বিশ্বাসবান্ না হইলে°, আর এক প্রকার পূর্ব্বজন্মস্মৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অনেকেরই এমন ঘটে যে, কোন নূতন স্থানে আসিলে মনে হয় যে, পূর্ব্বে যেন কখনও এ স্থানে আসিয়াছি—কোন একটা নূতন ঘটনা হইলে মনে হয়, যেন এ ঘটনা পূর্ব্বে কখন ঘটিয়াছিল। অথচ ইহাও নিশ্চিত স্মরণ হয় যে, এ জন্মে কখন সে স্থানে আসি নাই বা সে ঘটনা ঘটে নাই। অনেকে এমন স্থলে বিবেচনা করেন যে, পূর্ব্বজন্মে সেই স্থানে গিয়াছিলাম, অথবা সেই ঘটনা ঘটিয়াছিল—নহিলে এরূপ স্মৃতি কোথা হইতে উদয় হয়?

এরূপ স্মৃতির উদয় যে হইয়া থাকে, তাহা সত্য। অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি সত্য। অনেক পাঠকই বলিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের মনে কখন না কখন এমন স্মৃতির উদয় হইয়াছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রও ইহার সত্যতা স্বীকার করে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, এ সকল "Fallacies of Memory", অথবা মস্তিষ্কের Double action. কিরূপে এরূপ স্মৃতির উদয় হয়, তাহা কার্পেণ্টর সাহেবের *Mental Physiology* নামক গ্রন্থ হইতে দুইটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইব।

"Several years ago the Rev. S. Hansard, now Rector of Bethnal Green, was doing clerical duty for a time at Hurstmonceaux in Sussex and while there, he one day went over with a party of friends of Pevesey Castle, which he did not remember to have previously visited. As he approached the gateway he became conscious of a very vivid impression of having seen it before and he "seemed to himself to see" not only the gateway itself but donkeys beneath the arch and people on the top of it. His conviction that he *must* have visited the castle on some former occasion—although he had neither the slightest remembrance of such a visit, nor any knowledge of having ever been in the neighbourhood previously to his residence at Hurstmonceaux—made him enquire from his mother if she could throw any light on the matter. She at once informed him that being in that part of the country when he was about *eighteen manths* old, she has gone over with a large party and had taken him in the pannier of a donkey, that the elders of the party having brought lunch with them, had eaten it on the roof of the gateway, where they would have been seen from below, whilst he had been left with the attendants and donkeys.—This case is remarkable for the vividness of the sensorial impression (it may be worth mentioning that Mr. Hansard has a decidely artistic temperament) and for the reproduction of details which were not likely to have been brought up in conversation, even if he had happened to hear the visit itself

mentioned as an event of his childhood, and of such mention he has no remembrance whatever."

যদি এই ব্যক্তির মা না বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে এ স্মৃতি কোথা হইতে আসিল, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা হইত না। পূর্ব্বজন্মবাদিগণ ইহা পূর্ব্বজন্মস্মৃতি বলিয়া ধরিতেন সন্দেহ নাই। এইরূপ অনেক স্মৃতি আছে, যাহার আমরা কোন কারণ দেখি না, অনুসন্ধান করিলে ইহজন্মেই তাহার কারণ পাওয়া যায়। এইরূপ সফল অনুসন্ধানের আর একটি উদাহরণ কার্পেণ্টর সাহেবের ঐ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"In a Roman Catholic town in Germany a young woman who could neither read nor write, was seized with a fever and was said by the priests to be possessed of the devil, because she was heard talking Latin, Greek and Hebrew. Whole sheets of her ravings were written out and found to consist of sentences intelligible in themselves, but having slight connection with each other. Of her Hebrew sayings only a few could be traced to the Bible and most seemed to be in Rabbinical dialect. All trick was out of the question ; the woman was a simple creature ; there was no doubt as to the fever. It was long before any explanation, save that of demoniacal possession, could be obtained. At last the mystery was unveiled by a physician who determined to trace back the girl's history and who after much trouble discovered that at the age of nine she had been charitably taken by an old Protestant pastor, a great Hebrew scholar, in whose house she lived till his death. On further inquiry it appeared to have been the old man's custom for years to walk up and down a passage in his house into which the kitchen opened, and to read to himself with a loud voice out of his books. The books were ransacked and among them were found several of the Greek and Latin Fathers together with a collection of Rabbinical writings. In these works so many of the passages taken down at the young woman's bedside were identified that there could be no reasonable doubt as to their source."

এ দেশে হইলে ইহার আর কোন অনুসন্ধান হইত না, গ্রীক, লাটিন ও হিব্রু, এই স্ত্রীলোকের "পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিদ্যার" মধ্যে গণিত ও স্থিরীকৃত হইত।

পক্ষান্তরে ইহাও বলিতে পারা যায় না, এরূপ সকল স্মৃতিই, অনুসন্ধান করিলে, এই বর্ত্তমান জীবনমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। বেশী অনুসন্ধান না হইলে এ কথা স্থির করিয়া বলা যায় না। তেমন বেশী অনুসন্ধান আজিও হয় নাই। যত দিন না হয় তত দিন এ প্রমাণ কত দূর গ্রাহ্য, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

অনুসন্ধানের ফল যাহাই হউক, আর একটা তর্ক উঠিতে পারে। স্মৃতি মস্তিষ্কের ক্রিয়া, না আত্মার ক্রিয়া? যদি বল, আত্মার ক্রিয়া, তবে পূর্ব্বজন্মের সবিশেষ স্মৃতি

আমাদের মনে উদয় হয় না কেন? কেবল এক আধটুকু অস্পষ্ট স্মৃতি কখন কদাচিৎ মনে আসার কথা বল কেন? আত্মা ত সেই আছে, তবে তাহার স্মৃতি কোথায় গেল? আর যদি বল, স্মৃতি মস্তিষ্কের ক্রিয়া, তবে এই এক আধটুকু অস্পষ্ট স্মৃতিই বা উদিত হইতে পারে কি প্রকারে? কেন না, যে মস্তিষ্কে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি ছিল, সে মস্তিষ্ক ত দেহের সঙ্গে ধ্বংস পাইয়াছে—আর নাই।

এ আপত্তির সুমীমাংসা করা যায়। কিন্তু প্রয়োজন নাই। কেন না, এই সকল স্মৃতি যে পূর্ব্বজন্মস্মৃতি, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে না।

শেষ কথা এই যে, যাঁহারা জীবাত্মার নিত্যতা স্বীকার করেন, তাঁহাদের জন্মান্তর স্বীকার ভিন্ন গতি নাই। আত্মা যদি নিত্য হয়, তবে অবশ্য পূর্ব্বে ছিল। কোথায় ছিল? পরমাত্মায় লীন ছিল, এ কথা বলা যায় না। কেন না, পরমাত্মায় যাহা লীন, তাহা জীবাত্মা নহে, তাহার পৃথক অস্তিত্ব নাই। আর যদি বল, লোকান্তরে ছিল, তাহা হইলে ইহলোকে তাঁহার জন্ম, জন্মান্তর বলিতেই হইবে। লোকান্তরে ছিল, যদি এমন না বল, তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে, ইহলোকেই দেহান্তরে ছিল।

এমন কেহ থাকিতে পারেন যে, আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করিবেন, কিন্তু নিত্যতা স্বীকার করিবেন না। অর্থাৎ বলিবেন যে, দেহের সহিত আত্মার জন্ম হয়, জন্ম হইলে আর ধ্বংস নাই; কিন্তু জন্মের পূর্ব্বে যে আত্মা ছিল, এমন না হইতে পারে। যাঁহারা এমন বলেন, তাঁহারা প্রত্যেক জীবজন্মে একটি নূতন সৃষ্টির কল্পনা করেন। এরূপ কল্পনা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। কেন না, বিজ্ঞানশাস্ত্রের মূল সূত্র এই যে, জাগতিক নিয়ম সকল নিত্য, তাহার কখন বিপর্য্যয় ঘটে না। এখন জাগতিক নিয়মের মধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রমাণীকৃত একটি নিয়ম এই যে, জগতে কিছু নূতন সৃষ্টি নাই। জগতে কিছু নূতন সৃষ্টি হয় না,—নিত্য নিয়মাবলীর প্রভাবে বস্তুর রূপান্তর হয় মাত্র।* এই যে জীব-শরীর, ইহা জন্মিলে বা গর্ভে সঞ্চারিত হইলে কোন নূতন সৃষ্টি হইল, এমন কথা বলা যায় না; পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান জড় পদার্থসমূহের নূতন সমবায় হইল মাত্র। আত্মা, যাহা শরীরের সহিত জন্মগ্রহণ করিল, তাহা কিছুরই রূপান্তর বলা যায় না। কেন না, আত্মা জড় পদার্থ নহে, সুতরাং জড়ের বিকার নহে। পূর্ব্বজাত আত্মা সকলও অবিনাশী, সুতরাং তাহারও রূপান্তর নহে। কাজেই নূতন সৃষ্টি বলিতে হইবে। কিন্তু নূতন সৃষ্টি জাগতিক নিয়ম বিরুদ্ধ। অতএব আত্মাকে অবিনাশী বলিলে নিত্য ও অনাদি কাজেই বলিতে হয়। নিত্য ও অনাদি বলিলে জন্মান্তর কাজেই স্বীকার করিতে হয়।

আর যাঁহারা আত্মার স্বাতন্ত্র্য বা অবিনাশিতা স্বীকার করেন না, তাঁহারা অবশ্য জন্মান্তরও স্বীকার করিবেন না। তাঁহাদিগের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, জন্মান্তরবাদ ইহা তাঁহাদিগের কাছে অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। তাঁহাদিগেরই সম্প্রদায়ভুক্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কি বলেন, শুনা যাউক।†

---

* নাবস্তুনো বস্তু-সিদ্ধিঃ *Exnihilo nihit fit.*

† অনেকগুলি আধুনিক ইউরোপীয় লেখক জন্মান্তরবাদ সমর্থন করিয়াছেন। Herder ও Lessing তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তদ্ভিন্ন Fourier, Soame Jenyns, Figuier, Dupont de Nemours, Pezzani প্রভৃতি অনেক ইতর লেখকের নাম করা যাইতে পারে।

বৌদ্ধতত্ত্ববেত্তা Rhys Davids লেখেন,

"The doctrine of Transmigration in either the Brahmanical or the Buddhist form, is not capable of disproof ; while it affords an explanation, quite complete to those who can believe in it, of the apparent anomalies and wrongs in the distribution of happiness or woe.* The explanation can always be exact, for it is scarcely more than a repetition of the facts to be explained : it may always fit the facts, for it is derived from them ; and it cannot be disproved, † for it lies in a sphere beyond the reach of human enquiry."

টেলর সাহেব লিখিতেছেন—

"The Budhist Theory of 'Karma', or 'Action', which controls the destiny of all sentient beings, nor by judicial rewards and punishment, but by the inexhorable result of cause into effect, where the present is ever determined by the past in an unbroken line of causation is indeed one of the world's most remarkable developments of ethical speculation."—*Primitive Culture*, Vol. II, p. 12.

কথাটার ভিতর একটু নিগূঢ়ার্থ আছে। খ্রীষ্টানেরা জন্মান্তর বিশ্বাস করেন না; তাঁহারা বলেন, স্বর্গে বসিয়া ঈশ্বর পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া দোষীর দণ্ড ও পুণ্যাত্মার পুরস্কার বিহিত করেন। টেলর সাহেবের এ কথাটার তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর যে হাকিমের মত বেঞ্চে বসিয়া ডিক্রী ডিসমিস করেন, তাহার অপেক্ষা এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধে নিবদ্ধ জীবাদৃষ্ট অধিকতর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বটে। কথাটা একটু ভাল করিয়া বুঝা উচিত। জগতের শাসনপ্রণালী এই যে, কতকগুলি জাগতিক নিয়ম আছে। তাহা নিত্য, কখন বিপর্য্যস্ত হয় না। সেইগুলির প্রভাবে সমস্ত জাগতিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়; জগদীশ্বরকে কখনও হস্তক্ষেপ করিয়া নিজে কোন কাজ করিতে হয় না। ইহাও সত্য, সকল কাজ তিনি নিজেই করেন, কিন্তু সে নিয়মের আড়ালে থাকিয়া। কিন্তু যদি বলি যে, তিনি বিচারকার্য্যে ব্রতী হইয়া জীবের মৃত্যুর পর তাহার অদৃষ্ট সম্বন্ধে ডিক্রী ডিসমিস করিয়া কাহাকে স্বর্গে বা কাহাকে নরকে পাঠাইতেছেন, তবে যাহা জগতের বিরুদ্ধ, তাহা কল্পনা করা হইল। এখানে নিয়মের দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে না, স্বয়ং জগদীশ্বরকে কার্য্য করিতে হইতেছে। প্রত্যেক জীবের দণ্ড পুরস্কার বিধান, এক একটি ঈশ্বরের অনিয়মসিদ্ধ কার্য্য—অর্থাৎ miracle. কিন্তু জন্মান্তরবাদে এ আপত্তি ঘটে না। ঈশ্বরের নিয়ম এই যে, এইরূপ পাপাচারী এইরূপ যোনি প্রাপ্ত

* *Buddhism*, p. 100.

† যদি বল, প্রেততত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিতেছেন যে, দেহভ্রষ্ট মনুষ্যাত্মা কখন কখন মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া থাকে, তাহাতেও জন্মান্তরবাদের নিরাস হয় না। জন্মান্তরবাদীরা এমন বলেন না যে, সকল সময়েই মৃত্যু হইবামাত্র আত্মা দেহান্তরে প্রবেশ করে। যদি এমন হয় যে, কখন কখন দেহান্তরপ্রাপণ পক্ষে কালবিলম্ব ঘটে, তাহা হইতে জন্মান্তর অপ্রামাণিত হইল না।

হইবে। কর্ম্ম কারণ, যোনিবিশেষ, তাহার কার্য্য। এইরূপ কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধে-নিবদ্ধ কর্ম্মফলের দ্বারাই জন্মান্তর সম্পাদিত হয়—"miracle" প্রয়োজন হয় না।

শ্লেগেল বড় গোঁড়া খ্রীষ্টীয়ান, কিন্তু তিনি ইউরোপের এক জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক ও পণ্ডিত। তিনি এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার ইংরেজি অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি।

"In this doctrine, there was a noble element of truth—the feeling that man, since he has gone astray, and wandered so far from his God, must needs exert many efforts, and undergo a long and painful pilgrimage before he can regain the source of all perfection; —the firm conviction and positive certainty that nothing defective, impure, or defiled with earthly stains can enter the pure region of perfect spirits, or be eternally united to God; and that thus before it can attain to this blissful end, the immortal soul must pass through long trials and many purifications. It may now well be conceived (and indeed the experience of this life would prove it) that suffering, which deeply pierces the soul, anguish that convulses all the members of existence, may contribute, or may even be necessary, to the deliverance of the soul from all alloy, and pollution, or to borrow a comparison from natural objects, the generous metal is melted down in fire and purged from its dross. It is certainly true that the greater the degeneracy and the degradation of man, the nearer is his approximation to the brute; and when the transmigration of the immortal soul through the bodies of various animals is merely considered as the punishment of its former transgressions, we can very well understand the opinion which supposes that man who by his crimes and the abuse of his reason, had descended to the level of the brute should at last be tranformed into the brute itself."*

পরিশেষে আমেরিকা-নিবাসী সামুয়েল জনসন সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ইঁহার মত বিজ্ঞ লেখক দুর্লভ।

"The Transmigration faith was so widely spread in the elder world, because it had its roots in natural and profound aspirations. It combined the two-fold intuition of immortality and moral sequence with that mystic sense of the unity of being which is a germ of the highest religious truth."†

এক্ষণে যাহা বলা হইল, তাহার স্থূল মর্ম্ম বলিতেছি।

১। জন্মান্তরবাদ অপ্রমাণ করা যায় না।

২। ইহার পক্ষে কোন রকম কিছু প্রমাণও আছে।

---

* *Philosophy of History*—translated by Robertson—Bohn's.Edition, pp. 157-8.

† *Oriental Religions : India*, p. 539.

৩। যাঁহারা আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের নিকট ইহার প্রামাণ্যতা অখণ্ডনীয়।

৪। যাঁহারা আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করেন না, এই তত্ত্ব তাঁহাদিগের নিকটও অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না ; কেন না, জাগতিক নিত্য নিয়মাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিযুক্ত পরলোকবাদ আর কিছুই প্রচলিত নাই।

যিনি ভক্ত, তাঁহার পক্ষে এ সকল বিচারের কোন প্রয়োজন নাই। যদি এই শ্লোকটিতে ঈশ্বরোক্তির মর্ম্ম থাকে, তবে তাহাই তাঁহার বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ। তাঁহার বিচার্য্য বিষয় এই যে, জন্মান্তরবাদ যাহা গীতায় আছে, তাহা যথার্থ ঈশ্বরোক্তি, না গ্রন্থকারের বিশ্বাস মাত্র—তিনি আপনার বিশ্বাস ঈশ্বরবাক্যমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন ?

যদি কাহারও এমন সংশয় উপস্থিত হয় যে, ইহা ভগবদুক্তি কি না এবং উপরে যে সকল প্রমাণের উপরে সমালোচনা করা গেল, তাহাতে যদি জন্মান্তরে বিশ্বাসবান্ না হয়েন, তবে তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, জন্মান্তরে বিশ্বাস না করিলেও, এই গীতোক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করা যায় কি না ?

ইহার উত্তর বড় সোজা। এই গীতোক্ত ধর্ম্ম সমস্ত মনুষ্যের জন্য। জন্মান্তরে যে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ; যে না করে, তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করে, তাহার পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ; যে ভক্তি না করে, তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ; যে ঈশ্বরে বিশ্বাস নাও করে, তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ; কেন না, চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সংযম অনীশ্বরবাদীর পক্ষেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ; সেই চিত্তশুদ্ধি এই গীতার উদ্দেশ্য। এরূপ বিশ্বলৌকিক ও সর্ব্বব্যাপক ধর্ম্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই। যাঁহার যতটুকুতে অধিকার, তিনি ততটুকু গ্রহণ করিবেন। যেখানে যাহার বিশ্বাস নাই, সেখানে সে অনধিকারী। যাঁহার যাহাতে অধিকার, তিনি তাহা হইতে পাইবেন।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥

হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়গণ এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে তৎসংযোগ,* ইহাই শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখজনক। সে সকলের উৎপত্তি ও অপায় আছে, অতএব তাহা অনিত্য, অতএব হে ভারত! সে সকল সহ্য কর। ১৪।

একাদশ শ্লোকে বলা হইল যে, যাহার জন্য শোক করা উচিত নহে, তাহার জন্য তুমি শোক করিতেছ। দ্বাদশ শ্লোকে এরূপ অনুযোগ করিবার কারণ নির্দ্দেশ করা হইল। সে কারণ এই যে, কেহই ত মরিবে না ; কেন না, আত্মা অবিনাশী। তুমি কাটিয়া পড়িলেও সে থাকিবে, কেন না, তাহার আত্মা থাকিবে। একাদশ শ্লোক পাঠে জানা যায় যে, যখন গীতা প্রণীত হয়, তখন জন্মান্তর জনসমাজে গৃহীত। একাদশ শ্লোকে অর্জ্জুনের আপত্তি আশঙ্কা করিয়া, ভগবান্ তাহারই খণ্ডন করিতেছেন। অর্জ্জুন বলিতে পারেন,

* মাত্রাশ্চ স্পর্শাশ্চ ইতি শঙ্করঃ।

আত্মা না হয় রহিল, কিন্তু যখন দেহ গেল তখন আমার আত্মীয় ব্যক্তি, যাহার জন্য শোক করিতেছি, সে আর রহিল কৈ? দেহান্তর প্রাপ্ত হইলে সে ত ভিন্ন ব্যক্তি হইল। এই আপত্তির আশঙ্কা করিয়া ভগবান্ ত্রয়োদশ শ্লোকে বলিতেছেন যে, এরূপ ভেদ কল্পনা করা অনুচিত; কেন না, যেমন কৌমার, যৌবন, জরা এক ব্যক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র, তেমনি দেহান্তরপ্রাপ্তিও অবস্থান্তর মাত্র। ইহাতেও অর্জ্জুন আপত্তি করিতে পারেন যে, না হয় স্বীকার করা গেল যে, দেহান্তরেও দেহীর একতা থাকে—কিন্তু মৃত্যুর একটা দুঃখ-কষ্ট ত আছেই? এই স্বজনগণ সেই কষ্ট পাইবে—তাহা স্মরণ করিয়া শোক করিব না কেন? তাহাদের বিরহে কাতর হইব না কেন?

তাহার উত্তরে ভগবান্ এই চতুর্দ্দশ শ্লোকে বলিতেছেন যে, যে সকলকে তুমি এই দুঃখ বলিতেছ, তাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-জনিত। যতক্ষণ সেই সংযোগ থাকে, ততক্ষণ সেই দুঃখ থাকে, সংযোগের অভাবে আর সে দুঃখ থাকে না। যেমন যতক্ষণত্বগের সঙ্গে রৌদ্রাদির উত্তাপের বা হিমের শৈত্যের সংযোগ হয়, ততক্ষণ উষ্ণ বা শীতস্বরূপ যে দুঃখ, তাহা অনুভূত করি, রৌদ্রাদির অভাব হইলে আর তাহা থাকে না। যাহা থাকিবে না, অনিত্য, তাহা সহ্য করাই উচিত। যে দুঃখ সহ্য করিলেই ফুরাইবে, তাহার জন্য কষ্ট বিবেচনা করিব কেন?

এই সহিষ্ণুতা বা ধৈর্য্যগুণ থাকিলেই জীবন মধুর হয়। অভ্যাস করিলে অভ্যাসগুণে আর কোন দুঃখকেই দুঃখবোধ হয় না। তার পর এই গীতোক্ত সর্ব্বানন্দময়ী ভক্তিতে মনুষ্যের জীবন অপরিসীম সুখে আপ্লুত হয়। দুঃখমাত্র থাকে না। জীবনকে সুখময় করিবার জন্য, গোড়াতে এই দুঃখসহিষ্ণুতা আছে—তাহা ব্যতীত কিছু হইবে না। ইন্দ্রিয়গণের সহিত বহির্ব্বিষয়ের সংযোগজনিত যে সুখ—ভোগবিলাসাদি, তাহাও দুঃখের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে; কেন না, তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিলে, তাহার অভাবও দুঃখ বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য "শীতোষ্ণ সুখদুঃখ" একত্র গণনা করা হইয়াছে।*

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥

হে পুরুষর্ষভ! সুখদুঃখে সমভাব যে ধীর পুরুষ, এ সকলে ব্যথিত হন না, তিনিই মোক্ষলাভে সমর্থ হন। ১৫।

---

* এখানে মূলে যে মাত্রা শব্দ আছে ও মাত্রাস্পর্শ পদ আছে, তাহার দুই প্রকার অর্থ করা যায়। উহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বুঝাইতে পারে, এবং ইন্দ্রিয়গণের বিষয়কেও বুঝাইতে পারে। শঙ্করাচার্য্য বলেন,—"মাত্রা আভির্মীয়ন্তে শব্দাদয় ইতি শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি, মাত্রাণাং স্পর্শাঃ শব্দাদিভিঃ সংযোগাঃ।" শ্রীধর স্বামীও ঐরূপ বলেন, যথা—"মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়-বৃত্তয়স্তাসাং স্পর্শা বিষয়ৈঃ সহ সম্বন্ধাঃ (মাত্রাস্পর্শাঃ)।" মধুসূদন সরস্বতীও ঠিক তাই বলেন। পক্ষান্তরে, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন, "মাত্রা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়াঃ।" তাতেও বড় আসিয়া যাইত না, কিন্তু একজন ইংরেজ অনুবাদক Davis স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, এই মাত্রা শব্দ লাটিন ভাষায় Materia ও ইংরাজিতে matter, সুতরাং তিনি "মাত্রাস্পর্শাঃ" পদের অনুবাদে "Matter-contact" লিখিয়াছেন। পরিমাণজ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয়বিষয়েরও যে আবশ্যকতা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাংখ্যদর্শনের "তন্মাত্র" শব্দের তাৎপর্য্য বিচার করা কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য যে, আমি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও ডেভিস সাহেবকে পরিত্যাগ করিয়া শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধর স্বামীর অনুসরণ করিয়াছি।

সুখ দুঃখ সহ্য করিতে পারিলে মোক্ষলাভের উপযোগী হয় কেন? দুঃখ হইতে মুক্তিই, মুক্তি বা মোক্ষ। সংসার দুঃখময়। যাঁহারা বলেন, সংসারে দুঃখের অপেক্ষা সুখ বেশী, তাঁহাদেরও স্বীকার করিতে হইবে, সংসারে দুঃখ আছে। এজন্য জন্মান্তরেও দুঃখ, কেন না, পুনর্ব্বার সংসারে আসিয়া আবার দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। অতএব পুনর্জন্ম হইতে মুক্তিলাভও মুক্তি বা মোক্ষ। স্থূলতঃ দুঃখভোগ হইতে মুক্তিলাভই মোক্ষ। এই জন্য সাংখ্যকার প্রথম সূত্রেই বলিয়াছেন, "ত্রিবিধদুঃখস্যাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।" এখন, দুঃখ সহ্য করিতে শিখিলেই দুঃখ হইতে মুক্তি হইল। কেন না, যে দুঃখ সহ্য করিতে শিখিয়াছে, সে দুঃখকে আর দুঃখ মনে করে না। তাহার আর দুঃখ নাই বলিয়া তাহার মোক্ষলাভ হইয়াছে। অতএব মোক্ষের জন্য মরিবার প্রয়োজন নাই। দুঃখ সহ্য করিতে পারিলে, অর্থাৎ দুঃখে দুঃখিত না হইলে, ইহজীবনেই মোক্ষলাভ হইল।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥

অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নাই, সদ্বস্তুর অভাব হয় না। তত্ত্বদর্শিগণ এইরূপ উভয়ের অন্ত দর্শন করিয়াছেন। ১৬।

অস্ ধাতু হইতে সৎ শব্দ হইয়াছে। যাহা থাকিবে, তাহাই সৎ; যাহা নাই বা থাকিবে না, তাহাই অসৎ। আত্মাই সৎ; শীতোষ্ণাদি সুখ দুঃখ অসৎ। নিত্য আত্মার এই অনিত্য শীতোষ্ণাদি সুখ-দুঃখাদি স্থায়ী হইতে পারে না। কেন না, সৎ যে আত্মা, অসৎ শীতোষ্ণাদি তাহার ধর্ম্মবিরোধী। শ্রীধর স্বামী এইরূপ বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, "অসতোঽনাত্মধর্ম্মত্বাৎ অবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেরাত্মনি ন ভাবঃ।" আমরা তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি।

শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া সদসদ্বুদ্ধি যে প্রকার বুঝাইয়াছেন, তাহাও পাঠকদিগের বিশেষ অভিনিবেশপূর্ব্বক আলোচনা করা কর্ত্তব্য। তাহা হইতে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা এই সকল বিষয় কোন দিক্ হইতে দেখিতেন, এবং আমরা এখন কোন্ দিক্ হইতে দেখি, তাহার প্রভেদ বুঝিতে পারিবেন। এই শ্লোকের শঙ্করপ্রণীত ভাষ্য অতিশয় দুরূহ। নিম্নে তাহার একটি অনুবাদ দেওয়া গেল।

"কারণ হইতে উৎপন্ন, অতএব অসৎস্বরূপ শীত উষ্ণ প্রভৃতি কার্য্যের অস্তিত্ব নাই। শীত উষ্ণাদি যে কারণ হইতে উৎপন্ন, তাহা প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত হয়; সুতরাং উহারা সৎ পদার্থ হইতে পারে না। কারণ, উহারা বিকার মাত্র, এবং বিকারেরও সর্ব্বদা ব্যভিচার দৃষ্ট হয় (অর্থাৎ কখন বিকার থাকে, কখন থাকে না)। যেমন চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইলেই ঘটাদি পদার্থ মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কিছু * বলিয়া উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ কারণ ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া উপলব্ধি না হওয়ায় সর্ব্বপ্রকার বিকার পদার্থই অসৎ। উৎপত্তির পূর্ব্বে এবং ধ্বংসের পরে, মৃত্তিকাদি কারণ হইতে উৎপন্ন ঘটাদি কার্য্যের উপলব্ধি হয় না। সেই সকল কারণও আবার তাহাদের কারণ হইতে ভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি হয় না, সুতরাং তাহারাও অসৎ। এস্থলে আপত্তি হইতে

* অর্থাৎ ঘটের জ্ঞান জন্মিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্তিকার জ্ঞান জন্মায়। মৃত্তিকার জ্ঞান না জন্মাইলে ঘটের জ্ঞান জন্মায় না, সুতরাং ঘট অসৎ, উহার কারণ মৃত্তিকা সৎ।

পারে, কারণসমূহ এইরূপে অসৎ হইলে সকল পদার্থই অসৎ হইয়া পড়ে, (সৎ আর কিছুই থাকে না)। এরূপ আপত্তির খণ্ডন এই যে, সকল স্থলেই দুই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয় ; সৎ বলিয়া জ্ঞান ও অসৎ বলিয়া জ্ঞান। যে বস্তুর জ্ঞানের ব্যভিচার নাই অর্থাৎ যে বস্তু একবার "আছে" বলিয়া বোধ হইলে আর "নাই" বলিয়া বোধ হয় না তাহার নাম সৎ। আর যে বস্তু একবার আছে বলিয়া বোধ হইলে পরে আবার নাই বলিয়া বোধ হয়, তাহার নাম অসৎ। এইরূপে বুদ্ধিতন্ত্র সৎ ও অসৎ দুই ভাগে বিভক্ত, এবং সকলেই সর্ব্বত্র এই দুই প্রকার জ্ঞান হইতেছে বলিয়া উপলব্ধি করেন। বিশেষণ ও বিশেষ্য পদ এক বিভক্তিতে বর্ত্তমান থাকিলে তাহাদের অভেদ হয়, যেমন "নীলং উৎপলং" ইহার অর্থ উৎপল নীল হইতে অভিন্ন, অর্থাৎ ঐ উৎপলের জ্ঞান হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অভিন্নভাবে নীলত্বের জ্ঞান হইবে। এইরূপ যখন "ঘটঃ সন্," "পটঃ সন্" "হস্তী সন্" ইত্যাদি জ্ঞান হয়, তখন ঘটজ্ঞানের সহিত "সৎ" এই জ্ঞান অভিন্নভাবে উৎপন্ন হয়। সুতরাং সৎ ও অসৎ ভেদবুদ্ধির যে কল্পনা করা হইতেছিল তাহা নিরর্থক হয়। কিন্তু লোকে এরূপ অভিন্নভাবে উপলব্ধি করে না। এই বুদ্ধিদ্বয়ের (সৎ ও অসৎ) মধ্যে ঘটাদি বুদ্ধির ব্যভিচার হয়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে ; সৎ বুদ্ধির ব্যভিচার হয় না। অতএব ব্যভিচার হয় বলিয়া যে পদার্থ ঘটাদি বুদ্ধির বিষয় তাহা অসৎ, এবং অব্যভিচার হয় না বলিয়া উহা বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না।

যদি বল, ঘট বিনষ্ট হইলে যখন ঘটবুদ্ধির ব্যভিচার হয়, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে সৎ-বুদ্ধিরও ব্যভিচার হউক (অর্থাৎ আপত্তিকারীর মতে ঘটবুদ্ধি ও সৎবুদ্ধি অভিন্ন, সুতরাং ঘটবুদ্ধির ব্যভিচার হইলে সৎবুদ্ধিরও ব্যভিচার হউক)। এই আপত্তি খাটিতে পারে না ; কারণ, তৎকালে সেই সৎবুদ্ধি ঘটাদিতে বর্ত্তমান থাকে (সুতরাং উহার ব্যভিচার হয় না।) সে সৎবুদ্ধি বিশেষণভাবে অবস্থিত, সুতরাং (বিশেষ্যনাশে) বিনষ্ট হয় না।

যদি বল, সৎবুদ্ধির স্থলে যেরূপ যুক্তি অনুসারে একটি ঘট বিনষ্ট হইলেও অন্য ঘটেত ঘটবুদ্ধি থাকে, "সুতরাং ঘটবুদ্ধি সৎ হউক," এ আপত্তি ইহাতে খাটিতে পারে না ; যেহেতু সে ঘটবুদ্ধি পটাদিতে থাকে না।

যদি বল, সৎবুদ্ধিও ঘট নষ্ট হইলে দৃষ্ট হয় না। এ কথা গুরুতর নহে। সৎবুদ্ধি বিশেষণভাবে অবস্থিত, বিশেষ্যের অভাব হইলে বিশেষণ থাকিতে পারে না। থাকিলে তাহার বিষয় কি হইবে? বিষয়ের অভাব হইলে সৎবুদ্ধি থাকে না। যদি বল, ঘটাদি বিশেষ্যের অভাব হইলেও বিশেষণ বিশেষ্য ভাবে এক বিভক্তিতে উল্লেখ করা যায় বলিয়া ঘট সৎ হইবে, তাহার উত্তর এই যে, মরীচিকা প্রভৃতি স্থলেও সৎবুদ্ধি এবং উদক, উভয়ের অভাব হইলেও এক বিভক্তিতে 'সৎ ইদং উদকং' এরূপ ব্যবহার হয় (ইহার দ্বারা এক বিভক্তিতে উল্লেখ হওয়া সৎ অথবা অসৎ, এ উভয়ের কোন পক্ষেই প্রমাণ নহে)।

অতএব দেহাদি দ্বন্দ্ব কারণ হইতে উৎপন্ন ও অসৎ, উহার অস্তিত্ব নাই ; এবং সৎ যে আত্মা, তাঁহার কোথাও অভাব নাই, যেহেতু তাঁহার কোথাও ব্যভিচার হয় না। ইহাই সৎ এবং অসৎরূপ আত্মা এবং অনাত্মার স্বরূপনির্ণয়। যে সৎ, সে সৎই ; যে অসৎ, সে অসৎই। *

* শাঙ্কর ভাষ্যের এই অনুবাদ আমরা কোন বন্ধুর নিকট উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

শঙ্করাচার্য্য যেমন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত. এই দার্শনিক বিচারও তাঁহার উপযুক্ত। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সঙ্গে ইহা বড় মিশিবে না। সুখ দুঃখকে সৎই বল, আর অসৎই বল, সুখ দুঃখ আছে। থাকিবে না সত্য, কিন্তু নাই, এ কথা বলিবার বিষয় নাই। কিন্তু থাকিবে না, এইটাই বড় কাজের কথা। তবে সহ্য করিতে পারিলেই দুঃখ নষ্ট হইবে।

"——The darkest day,
Wait till to-morrow,
Will have passed away."

এখন ১৪। ১৫। ১৬, এই তিন শ্লোকে যাহা উক্ত হইল, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে, কয়েকটি আপত্তি উপস্থাপিত হইতে পারে। প্রথম আপত্তি, দুঃখ সহ্য করিতে হইবে—নিবারণ করিতে হইবে না? অর্জ্জুনের দুঃখ, জ্ঞাতি-বন্ধু-বধ; যুদ্ধ না করিলেই সে দুঃখ নিবারণ হইল; দুঃখনিবারণের সহজ উপায় আছে। এ স্থলে তাঁহাকে দুঃখ-নিবারণ করিতে উপদেশ না দিয়া, ভগবান্ দুঃখ সহ্য করিতে উপদেশ দিতেছেন, ইহা কিরূপ উপদেশ? রোগীর রোগের উপশমের জন্য ঔষধ ব্যবহার করিতে পরামর্শ না দিয়া, তাহাকে রোগের দুঃখ সহ্য করিতে উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে কি এ উপদেশ তুল্য নহে?

না। তাহা নহে। দুঃখ নিবারণের কোন নিষেধ নাই। তবে যেখানে দুঃখ নিবারণ করিতে গেলে অধর্ম্ম হয়, সেখানে দুঃখ নিবারণ না করিয়া সহ্য করিবে। যে যুদ্ধে অর্জ্জুন প্রবৃত্ত, তাহা ধর্ম্মযুদ্ধ। ধর্ম্মযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আর ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্ম পরিত্যাগে অধর্ম্ম। অতএব এ স্থলে দুঃখ সহ্য না করিয়া নিবারণ করিলে অধর্ম্ম আছে। এজন্য এখানে সহ্য করিতে হইবে, নিবারণ করা হইবে না।

দ্বিতীয় আপত্তি এই, দুঃখই সহ্য করিবে—সুখ সহ্য করা কিরূপ? সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান করিব? তবে ভগবানের কি এই আজ্ঞা যে, পৃথিবীর কোন সুখে সুখ হইবে না? তবে আর asceticism কাহাকে বলে? সুখশূন্য ধর্ম্ম লইয়া কি হইবে?

ইহার উত্তর পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। ইন্দ্রিয়ের অধীন যে সুখ, তাহা দুঃখের কারণ—তাহা দুঃখমধ্যে গণ্য। ইন্দ্রিয়াদির অনধীন যে সুখ, যথা—জ্ঞান, ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি-জনিত যে সুখ, তাহা গীতোক্ত ধর্ম্মানুসারে পরিত্যাজ্য নহে, বরং গীতোক্ত ধর্ম্মেই সেই সুখই উদ্দেশ্য। আর ইন্দ্রিয়ের অধীন যে সুখ, তাহাও প্রকৃতপক্ষে পরিত্যাজ্য নহে। তৎপরিত্যাগও গীতোক্ত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে। তাহাতে অনাসক্তিই গীতোক্ত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, পরিত্যাগ উদ্দেশ্য নহে।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ২। ৬৪॥

উক্ত চতুঃষষ্টিতম শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে আমরা এ বিষয়ে আরও কিছু বলিব।

আমরা দেখিতেছি যে, দ্বাদশ শ্লোকে হিন্দুধর্ম্মের প্রথম তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে আত্মার অবিনাশিতা। ত্রয়োদশ শ্লোকে দ্বিতীয় তত্ত্ব—জন্মান্তরবাদ। চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, এবং ষোড়শ শ্লোকে তৃতীয় তত্ত্ব সূচিত হইতেছে—সুখদুঃখের অনাত্মধর্ম্মিতা ও অনিত্যত্ব।

সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যার উপলক্ষে আত্মার সঙ্গে সুখদুঃখের সম্বন্ধ পূর্ব্বে যেরূপ বুঝাইয়াছিলাম, তাহা বুঝাইতেছি।

"শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষ। কিন্তু দুঃখ ত শারীরাদিক; শারীরাদিতে যে দুঃখের কারণ নাই,—এমন দুঃখ নাই। যাহাকে মানসিক দুঃখ বলি—বাহ্য পদার্থই তাহার মূল। আমার বাক্যে তুমি অপমানিত হইলে, আমার বাক্য প্রাকৃতিক পদার্থ, তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি গ্রহণ করিলে, তাহাতে তোমার দুঃখ। অতএব প্রকৃতিভিন্ন দুঃখ নাই, কিন্তু প্রকৃতিঘটিত দুঃখ পুরুষে বর্ত্তে কেন? "অসঙ্গোঽয়ম্পুরুষঃ। পুরুষ একা, কাহারও সংসর্গবিশিষ্ট নহে। (১ম অধ্যায়ে ১৫শ সূত্র।) অবস্থাদি সকল শরীরের, আত্মার নহে। (ঐ, ১৪ সূত্র) "ন বাহ্যান্তরয়োরুপরজ্যোপরঞ্জকভাবোঽপি দেশব্যবধানাৎ স্রুঘ্নস্থপাটলিপুত্রস্থয়োরিব।" বাহ্য এবং আন্তরিকের মধ্যে উপরজ্য এবং উপরঞ্জক ভাব নাই; কেন না, তাহা পরস্পর সংলগ্ন নহে, দেশব্যবধানবিশিষ্ট, যেমন এক জন পাটলিপুত্র নগরে থাকে, আর একজন স্রুঘ্ন নগরে থাকে, ইহাদিগের পরস্পরের ব্যবধান তদ্রূপ।

তবে পুরুষের দুঃখ কেন? প্রকৃতির সংযোগই দুঃখের কারণ। বাহ্যে আন্তরিকে দেশব্যবধান আছে বটে, কিন্তু কোন প্রকার সংযোগই নাই, এমত নহে। যেমন স্ফাটিক পাত্রের নিকট জবাকুসুম রাখিলে পাত্র পুষ্পের বর্ণবিশিষ্ট হয় বলিয়া, পুষ্প এবং পাত্রে এক প্রকার সংযোগ আছে বলা যায়, এ সেইরূপ সংযোগ। পুষ্প এবং পাত্র মধ্যে দেশব্যবধান থাকিলেও পাত্রের বর্ণ বিকৃত হইতে পারে; ইহাও সেইরূপ। এ সংযোগ নিত্য নহে, দেখা যাইতেছে; সুতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে। সেই সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই দুঃখের কারণ অপনীত হইল। অতএব এই সংযোগের উচ্ছিত্তিই দুঃখনিবারণের উপায়, সুতরাং তাহাই পুরুষার্থ। "যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ" (৬, ৭০)।*

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥ ১৭॥

যাহার দ্বারা এই সকলই ব্যাপ্ত, তাহাকে অবিনাশী জানিবে। এই অব্যয়ের কেহই বিনাশ করিতে পারে না। ১৭।

"যাহার দ্বারা" অর্থাৎ পরমাত্মার দ্বারা। "এই সকলই" অর্থাৎ জগৎ। এই সমস্ত জগৎ পরমাত্মার দ্বারা ব্যাপ্ত—শঙ্কর বলেন, যেমন ঘটাদি আকাশের দ্বারা ব্যাপ্ত, সেইরূপ ব্যাপ্ত।

যাহা সর্ব্বব্যাপী, তাহার বিনাশ হইতে পারে না; কেন না, যত কাল কিছু থাকিবে, তত কাল সেই সর্ব্বব্যাপী সত্তাও থাকিবে। যত কাল কিছু থাকিবে, তত কাল সেই সর্ব্বব্যাপী সত্তা সর্ব্বব্যাপীই থাকিবে। অতএব তাহা অব্যয়। আকাশ সর্ব্বব্যাপী, আকাশের বিনাশ বা ক্ষয় আমরা মনেও কল্পনা করিতে পারি না। আকাশ অবিনাশী এবং অব্যয়। যিনি সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং আকাশও যাঁহার দ্বারা ব্যাপ্ত, তিনিও অবিনাশী ও অব্যয়। কাজেই কেহই ইঁহার বিনাশসাধন করিতে পারে না।

---

* প্রবন্ধ-পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

এক্ষণে এই কথার দ্বারা আর কয়েকটি কথা সূচিত হইতেছে। সেই সকল কথা হিন্দুধর্ম্মের স্থূল কথা, এ জন্য এখানে তাহার উত্থাপন করা উচিত।

প্রথমতঃ এই শ্লোকের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, ঈশ্বর নিরাকার, সাকার হইতে পারেন না। যাহা সাকার, তাহা সর্ব্বব্যাপী হইতে পারে না। সাকার ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য। আমরা জানি যে, ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য সাকার সর্ব্বব্যাপী কোন পদার্থ নাই। অতএব ঈশ্বর যদি সর্ব্বব্যাপী হয়েন, তবে তিনি সাকার নহেন।

ঈশ্বর সাকার নহেন, ইহাই গীতার মত। কেবল গীতার নহে, হিন্দুশাস্ত্রের এবং হিন্দুধর্ম্মের ইহাই সাধারণ মত। উপনিষৎ এবং দর্শনশাস্ত্রের এই মত। সে সকলে ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। সত্য বটে, পুরাণেতিহাসে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি সাকার চৈতন্য কল্পিত হইয়া অনেক স্থলে ঈশ্বরস্বরূপ উপাসিত হইয়াছেন। যে কারণে এইরূপ ঈশ্বরের রূপকল্পনার প্রয়োজন বা উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার অনুসন্ধানের এ স্থলে প্রয়োজন নাই। কেবল ইহাই বক্তব্য যে, পুরাণেতিহাসে শিবাদি সাকার বলিয়া কথিত হইলেও পুরাণ ও ইতিহাসকারেরা ঈশ্বরের সাকারতা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন না, ঈশ্বর যে নিরাকার, তাহা কখনই ভুলেন না। পুরাণেতিহাসেও ঈশ্বর নিরাকার।

একটা উদাহরণ দিলেই আমার কথার তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। বিষ্ণুপুরাণের প্রহ্লাদ-চরিত্র ইহার উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। তথায় বিষ্ণুই ঈশ্বর। প্রহ্লাদ তাঁহাকে "নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ" বলিয়া স্তব করিতেছেন। অন্য স্থলে স্পষ্টতঃ সাকারতা স্বীকার করিতেছেন। যথা—

ব্রহ্মত্বে সৃজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পুনঃ।
রুদ্ররূপায় কল্পান্তে নমস্তুভ্যং ত্রিমূর্ত্তয়ে॥

এবং পরিশেষে পীতাম্বর হরি সশরীরে প্রহ্লাদকে দর্শন দিলেন। কিন্তু তথাপি এই প্রহ্লাদচরিত্রে বিষ্ণু নিরাকার; তাঁহার নাম "অনন্ত", তিনি "সর্ব্বব্যাপী"। যিনি অনন্ত এবং সর্ব্বব্যাপী, তিনি নিরাকার ভিন্ন সাকার হইতে পারেন না; এবং তিনি যে নির্গুণ ও নিরাকার, তাহা পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে। যথা—

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ পরাত্মনে।
নামরূপং ন যস্যৈকো যোঽস্তিত্বেনোপলভ্যতে॥ ইত্যাদি। ১। ১৯। ৭৯

পুনশ্চ বিষ্ণু "অনাদিমধ্যান্তঃ", সুতরাং নিরাকার।

এরূপ সকল পুরাণে ইতিহাসে। অতএব ঈশ্বর নিরাকার, ইহাই যে হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত।

তবে কি হিন্দুধর্ম্মে সাকারের উপাসনা নাই? গ্রামে গ্রামে ত প্রত্যহ প্রতিমা-পূজা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষ প্রতিমার্চ্চনায় পরিপূর্ণ। তবে হিন্দুধর্ম্মে সাকারবাদ নাই কি প্রকারে বলিব?

ইহার উত্তর এই যে, অন্য দেশে যাহা হউক, হিন্দুর প্রতিমার্চ্চনা সাকারের উপাসনা নয়; এবং যে হিন্দু প্রতিমার্চ্চনা করে, সে নিতান্ত অজ্ঞ ও অশিক্ষিত না হইলে মনে করে না যে, এই প্রতিমা ঈশ্বর, অথবা ঈশ্বরের এইরূপ আকার বা ইহা ঈশ্বরের প্রকৃত

প্রতিমা। যে একখানা মাটির কালী গড়িয়া পূজা করে, সে যদি প্রকৃত উপাসনার কিছু মাত্র বুঝে, তবে সে জানে, এই চিত্রিত মৃৎপিণ্ড ঈশ্বর নহে বা ঈশ্বরের প্রতিমা নহে, এবং সে জানে, তাহা ঈশ্বরের প্রতিকৃতি হইতে পারে না।

তবে সে মাটির তালের পূজা করে কেন? সে যাঁহার পূজা করিবে, তাঁহাকে খুঁজিয়া পায় না। তিনি অদৃশ্য, অচিন্তনীয়, ধ্যানের অপ্রাপ্য, অতএব উপাসনার অতীত। কাজেই সে তাঁহাকে ডাকিয়া বলে, "হে বিশ্বব্যাপিনি সর্ব্বময়ি আদ্যাশক্তি! তুমি সর্ব্বত্রই আছ, কিন্তু আমি তোমাকে দেখিতে পাই না; তুমি সর্ব্বত্রই আবির্ভূত হইতে পার, অতএব আমি দেখিতে পাই, এমন কিছুতে আবির্ভূত হও। আমি তোমার যে রূপ কল্পনা করিয়া গড়িয়াছি, তাহাতে আবির্ভূত হও, আমি তোমার উপাসনা করি। নহিলে কোথায় পুষ্পচন্দন দিব, তদ্বিষয়ে মনঃস্থির করিতে পারি না।"

এই প্রতিমাপূজার উপরে আমাদের শিক্ষাগুরু ইংরেজদিগের বড় রাগ এবং তাঁহাদিগের শিষ্য নব্য ভারতবর্ষীয়েরও বড় রাগ। ইংরেজের রাগ, তাহার কারণ—বাইবেলে ইহার নিষেধ আছে। শিক্ষিত ভারতবর্ষীয়ের রাগ; কেন না, ইংরেজের ইহার উপর রাগ। যাহা ইংরেজে নিন্দা করে, তাহা "আমাদের" অবশ্য নিন্দনীয়। প্রতিমাপূজা ইংরেজের নিকট নিন্দনীয়, অতএব প্রতিমাপূজা অবশ্য "আমাদের" নিন্দনীয়, তাহার আর বিচার আচারের প্রয়োজন নাই। ইংরেজ বলে যে, এই প্রতিমাপূজার জন্য ভারতবর্ষ উৎসন্ন গিয়াছে, এবং ইহার ধ্বংস না হইলে একেবারে উৎসন্ন যাইবে; সুতরাং আমরাও তাহাই বিশ্বাস করিতে বাধ্য; তাহার আর বিচার আচারের প্রয়োজন নাই। সত্য বটে, রোম গ্রীস প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য প্রতিমাপূজা করিয়াও উন্নত হইয়াছিল, কিন্তু ইংরেজ বলে যে, ভারতবর্ষ প্রতিমাপূজায় উৎসন্ন যাইবে, অতএব ভারতবর্ষ নিশ্চয় প্রতিমাপূজায় উৎসন্নে যাইবে; তদ্বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই। এইরূপ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে ভাবিয়া থাকেন। অন্যমত বিবেচনা করা কুশিক্ষা, কুবুদ্ধি, এবং নীচাশয়তার কারণ মনে করেন।

আমরা এরূপ উক্তির অনুমোদন করিতে পারি না। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সকলের অন্তর্য্যামী। সকলের অন্তরের ভিতর তিনি প্রবেশ করিতে পারেন, সকল প্রকারের উপাসনা গ্রহণ করিতে পারেন; কি নিরাকারের উপাসক, কি সাকারোপাসক, কেহই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ অনুভূত করিতে পারেন না। তিনি অচিন্তনীয়। অতএব তাঁহার চক্ষে সাকার উপাসকের উপাসনা ও নিরাকার উপাসকের উপাসনা তুল্য; কেহই তাঁহাকে জানে না। যদি ইহা সত্য হয়, যদি ভক্তিই উপাসনার সার হয়, এবং ভক্তিশূন্য উপাসনা যদি তাঁহার অগ্রাহ্যই হয়, তবে ভক্তিযুক্ত হইলে সাকারোপাসকের উপাসনা তাঁহার নিকট গ্রাহ্য; ভক্তিশূন্য হইলে নিরাকারোপাসকের উপাসনা তাঁহার নিকট পৌঁছিবে না। অতএব আমাদের বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষীয়ের যদি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে, তবে সাকার উপাসনার ভাবে আচ্ছন্ন হইলেও কেহ উৎসন্ন যাইবে না, আর ভক্তিশূন্য হইলে নিরাকারোপাসনায়ও উৎসন্ন হইবে তদ্বিষয়ের কোন সংশয় নাই। সাকার ও নিরাকার উপাসনার মধ্যে আমাদের মতে কোনটাই নিষ্ফল নহে; এবং এতদুভয়ের মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ নাই। সুতরাং উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার নিষ্প্রয়োজনীয়।

যে ইঁহাকে হন্তা বলিয়া জানে, এবং যে ইঁহাকে হত বলিয়া জানে, ইহারা উভয়েই অনভিজ্ঞ। ইনি হত্যা করেন না—হতও হয়েন না। ১৯।

প্রাচীন টীকাকারেরা এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন ; যথা—ভীষ্মাদির মৃত্যু নিমিত্ত অর্জ্জুনের শোক, উক্ত বাক্যে নিবারিত হইল। এক্ষণে "আমি ইহাদের বধের কর্ত্তা।" এই নিমিত্ত যে দুঃখ, প্রথম অধ্যায়ে ৩৪।৩৫ ইত্যাদি শ্লোকে অর্জ্জুনের দ্বারা উক্ত হইয়াছে, তাহার উত্তরে ভগবান্ বুঝাইতেছেন যে, আত্মা যেমন কাহারও কর্ত্তৃক হত হয়েন না, তেমনি তিনি কাহাকেও হত্যা করেন না। কেন না, আত্মা অবিক্রিয়।

শঙ্কর ও শ্রীধর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়েরা যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, আমি এক্ষণে সেইরূপ বলিতেছি। ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকেরও সেইরূপ অর্থ করিব। অন্য অর্থ হয় কি না, তাহাও বলা যাইবে। টীকাকারেরা বলেন, আত্মা যে অবিক্রিয়, তাহার প্রমাণ পরবর্ত্তী শ্লোকে দেওয়া হইতেছে।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥

ইনি জন্মেন না বা মরেন না, কখন হয়েন নাই, বর্ত্তমান নাই বা হইবেন না। ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ ; শরীর হত হইলে ইনি হত হয়েন না। ২০।

টীকাকারেরা বলেন, আত্মা যে অবিক্রিয়, ইঁহার ষড়্ভাববিকারশূন্যত্বের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত করা হইতেছে। ইনি জন্মশূন্য—এই কথার দ্বারা জন্ম প্রতিষিদ্ধ হইল ; মরেন না—ইহাতে বিনাশ প্রতিষিদ্ধ হইল। ইনি কখন উৎপন্ন হয়েন নাই, এজন্য বর্ত্তমান নাই। যাহা জন্মে, তাহাকেই বর্ত্তমান বলা যায় ; কিন্তু ইনি পূর্ব্ব হইতে স্বতঃ সদ্রূপে আছেন, অতএব উৎপন্ন হইয়া যে বিদ্যমানতা, তাহা ইঁহার নাই। এবং সেই জন্য ইনি আবার জন্মিবেন না। সেই জন্য ইনি অজ অর্থাৎ জন্মশূন্য, ইনি নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদা একরূপ, শাশ্বত অর্থাৎ অপক্ষয়শূন্য, পুরাণ অর্থাৎ বিপরিণামশূন্য।

এক্ষণে পাঠক, এই দুইটি শ্লোকের প্রতি মনোভিনিবেশ করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, আত্মার এই অবিক্রিয়ত্ববাদ সম্বন্ধে কোন কথা স্পষ্টতঃ মূলে নাই। অস্পষ্টতঃ "নায়ঃ হন্তি" এই কথাটা আছে, কিন্তু ইহার অন্য অর্থ না হইতে পারে, এমনও নহে। যদি কেহ মরে না, তবে আত্মাও কাহাকে মারে না।

আত্মা যে অবিক্রিয়, ইহা প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের একটি মত। তত্ত্বটা কি, তাহা পাঠককে বুঝান যাইতে পারে, কিন্তু সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত করা আবশ্যক বোধ হইতেছে না। আবশ্যক বোধ হইতেছে না, তাহার কারণ, আমরা গীতার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত, কিন্তু এই দুটি শ্লোক গীতার নহে। শ্লোক দুটি কঠোপনিষদের। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের যেটি ১৯শ শ্লোক, তাহা কঠোপনিষদের দ্বিতীয় বল্লীর ১৯শ শ্লোক ; আর গীতার ঐ অধ্যায়ের যেটি ২০শ শ্লোক তাহাও কঠোপনিষদের ঐ বল্লীর ১৮শ শ্লোক। গীতার শ্লোক ও কঠোপনিষদের শ্লোক পাশাপাশি লেখা যাইতেছে।

গীতা

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ২ । ১৯
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ম্পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২ । ২০

কঠোপনিষদ্

হন্তা চেন্মন্যতো হন্তং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্ ।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ২ । ১৯
ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ম্পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২ ।১৮

শ্লোক দুইটি কঠোপনিষদ্ হইতে গীতায় আনীত হইয়াছে, গীতা হইতে কঠোপনিষদে নীত হয় নাই। এ কথা লইয়া বোধ করি বেশী বিচারের প্রয়োজন নাই। আমরা দেখিব, উপনিষদ্ হইতে অনেক শ্লোক গীতায় আনীত হইয়াছে। অন্ততঃ প্রাচীন ভাষ্যকারদিগের এই মত। শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—"শোকমোহাদিসংসারকারণ-নিবৃত্ত্যর্থং গীতাশাস্ত্রং ন প্রবর্ত্তকমিত্যেতৎ পার্থস্য সাক্ষীভূতে ঋচাবানিনায়" এবং আনন্দগিরি লিখিয়াছেন—"হন্তা চেন্মন্যতে হন্তং ইত্যাদ্যামৃচমর্থতো দর্শয়িত্বা ব্যাচষ্টে য এনমিতি।"

এক্ষণে এই শ্লোক সম্বন্ধে দুইটি কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি।

প্রথম, আত্মা যদি কর্ত্তা নহে, তবে কর্ম্মযোগ জলে ভাসাইয়া দিতে হয়। শঙ্করাচার্য্যের যে তাহাই উদ্দেশ্য, ইহা বলা বাহুল্য। কর্ম্মযোগের কথা যখন পড়িবেন, পাঠক তখন এ বিষয়ের বিচার করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়, আত্মার অবিক্রিয়ত্ব একটা দার্শনিক মত। প্রাচীন কালে সকল দেশে, দর্শন ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে এবং ধর্ম্ম দর্শনের অনুগামী হয়। ইহা উভয়েরই অনিষ্টকারী। ধর্ম্ম ও দর্শন পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইলেই উভয়ের উন্নতি হয়, নচেৎ হয় না। এই তত্ত্বটি সপ্রমাণ করিয়া কোম্‌ৎ ও তৎশিষ্যগণ দর্শন ও ধর্ম্ম উভয়েরই উপকার করিয়াছেন। আমাদিগেরও সেই মার্গাবলম্বী হওয়া উচিত।

দার্শনিক মত যাহাই হউক, হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ মত—আত্মাই কর্ত্তা। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য শত পৃষ্ঠা ধরিয়া বচন উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। আমরা কেবল দুইটি কথা তুলিব। একটি উপনিষদ্ হইতে, আর একটি পুরাণ হইতে।

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।
নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।
স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি ॥ ১
স ইমাল্লোকানসৃজত অম্ভো মরীচীর্ম্মরমিত্যাদি।

ঋগ্বেদীয়ৈতরেয়োপনিষৎ।

আত্মাই সব সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং আত্মাই কর্ত্তা।

দ্বিতীয় উদাহরণ পুরাণ হইতে গ্রহণ করিতেছি। উহা কঠোপনিষদের শ্লোকের

সঙ্গে তুলনা করিয়া পাঠক দেখিবেন, হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করা কি যন্ত্রণা—

ক: কেন হন্যতে জন্তুর্জন্তুঃ কঃ কেন রক্ষ্যতে ॥
হন্তি রক্ষতি চৈবাত্মা হ্যসৎ সাধু সমাচরন্‌ ॥
বিষ্ণুপুরাণ। ১। ১৮। ২৯

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্‌ ॥
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্‌ ॥ ২১ ॥

যে ইহাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ এবং অব্যয় বলিয়া জানে, হে পার্থ, সে পুরুষ কাহাকে মারে ? কাহাকেই বা হনন করায় ? ২১।

ভাবার্থ—যে জানে যে, দেহ নাশ হইলেই শরীরীর বিনাশ হইল না, সে যদি কাহারও দেহধ্বংসের কারণ হয়, তবে তাহার উচিত নহে যে, সে "আমি ইহার বিনাশের কারণ হইলাম" বলিয়া দুঃখিত হয়। কেন না, আত্মা অবিনাশী। শরীরের বিনাশে তাহার বিনাশ হইল না।

তবে যদি বল যে, "ভাল, আত্মার বিনাশ না হউক, কিন্তু শরীরের ত বিনাশ আছেই। শরীরনাশেরই বা আমি কেন কারণ হই ?" তাহার উত্তর পরশ্লোকে কথিত হইতেছে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র* গ্রহণ করে, তেমনি আত্মা পুরাতন শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীরে সংগত হয়। ২২।

অর্থাৎ যেমন তোমার জীর্ণ বস্ত্র কেহ ছিঁড়িয়া দিক বা না দিক, তোমাকে জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করিতেই হইবে, তেমনি তুমি যুদ্ধ কর বা না কর, যোদ্ধৃগণ অবশ্য দেহত্যাগ করিবে, তোমার যুদ্ধাবিরতিতে তাহাদের দেহনাশ নিবারণ হইবে না। তবে কেন যুদ্ধ করিবে না ?

স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যে ব্যক্তি বধকার্য্য করিতে হইবে বলিয়া শোকমোহপ্রযুক্ত ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে বিমুখ হয়, তাহার প্রতি এই সকল বাক্য প্রযোজ্য। নচেৎ আত্মা অবিনশ্বর এবং দেহমাত্র নশ্বর, ইহার এমন অর্থ নহে যে, কেহ কাহাকেও খুন করিলে তাহাতে দোষ নাই। খুন করিলে দোষ আছে কি না আছে—সে বিচারের সঙ্গে এ বিচারের কোন সম্বন্ধই নাই—থাকিতেও পারে না। এখানে বিবেচ্য, ধর্ম্মযুদ্ধে শোক-

* "It was if my soul were thinking separately from the body: she looked upon the *body as a foreign substance, as we look upon a garment.*" Wilhelm Meister Carlyle's Translation, Book VI.

যে কয়টি কথা ইটালিক অক্ষরে লিখিলাম, পাঠক তৎপ্রতি অনুধাবন করিবেন, গীতার কথাটা বেশ বুঝা যাইবে।

মোহের কোন কারণ আছে কি না? উত্তর—কারণ নাই, কেন না, আত্মা অবিনশ্বর, আর দেহ নশ্বর। দেহী কেবল নূতন কাপড় পরিবে মাত্র। তাহাতে কাঁদাকাটার কথাটা কি?

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২৩॥

এই (আত্মা) অস্ত্রে কাটে না, আগুনে পুড়ে না, জলে ভিজে না, এবং বাতাসে শুকায় না। ২৩।

আত্মা নিরবয়ব, এই জন্য অস্ত্রাদির অতীত।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে॥ ২৪॥

ইনি ছেদনীয় নহেন, দহনীয় নহেন, ক্লেদনীয় নহেন, এবং শোষণীয় নহেন। (ইনি) নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকার্য্য বলিয়া কথিত হন। ২৪।

স্থাণু—অর্থাৎ স্থিরস্বভাব। অচল—পূর্ব্বরূপ অপরিত্যাগী। সনাতন—চিরন্তন, অনাদি। অব্যক্ত—চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়। অচিন্ত্য—মনের অবিষয়। অবিকার্য্য অচল—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়।

শঙ্কর এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ করেন। আত্মা অচ্ছেদ্য ইত্যাদি, এজন্য আত্মা নিত্য; নিত্য—এজন্য সর্ব্বগত; সর্ব্বগত—এজন্য স্থিরস্বভাব; স্থিরস্বভাব—এজন্য অচল; অচল—এজন্য সনাতন, ইত্যাদি।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥ ২৫॥

অতএব ইহাকে এইরূপ জানিয়া, শোক করিও না। ২৫।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং * শোচিতুমর্হসি॥ ২৬॥

আর যদি তুমি ইহা মনে কর, আত্মা সর্ব্বদাই জন্মে, সর্ব্বদা মরে, তথাপি হে মহাবাহো! ইহার জন্য শোক করিও না। ২৬।

কেন তথাপি শোক করিবে না? শঙ্কর বলেন, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী বলিয়া। পরশ্লোকেও সেই কথা আছে। কিন্তু পরশ্লোকে "ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ"—এই বাক্যে আত্মার অবিনাশিতাও সূচিত হইতেছে। তাহা হইলে আর আত্মার বিনাশ স্বীকার করা হইল কৈ? এবং নূতন কথাই বা কি হইল? এই জন্য শ্রীধর আর এক প্রকার বুঝাইয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, আত্মাও যদি মরিল, তাহা হইলে তোমাকেও আর পাপপুণ্যের ফলভাগী হইতে হইবে না, তবে আর দুঃখের বিষয় কি?

কেন তথাপি শোক করিবে না, তাহা পরশ্লোকে বলা হইতেছে।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ২৭॥

---

* "নৈবং" পাঠান্তর।

যে জন্মে, সে অবশ্য মরে; যে মরে, সে অবশ্য জন্মে; অতএব যাহা অপরিহার্য্য, তাহাতে শোক করিও না। ২৭।

আত্মার অবিনাশিতা গীতাকারের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। "নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্" বলিয়া মানিয়া লইয়াও, উত্তরে আবার বলিতেছেন, "ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" যদি মরিলে আবার অবশ্য জন্মিবে, তবে আত্মা অবশ্য অবিনাশী, "নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্" বলা আর খাটে না। তবে শ্রীধরের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে এ আপত্তি উপস্থিত হয় না।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥

জীবসকল আদিতে অব্যক্ত, (কেবল) মধ্যে ব্যক্ত, (আবার) নিধনে অব্যক্ত; সেখানে শোকবিলাপ কি? ২৮।

অব্যক্ত শব্দের অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শঙ্কর অর্থ করেন, "অব্যক্তমদর্শনমনুপলব্ধি-র্যেষাং ভূতানাং" অর্থাৎ যে (যে অবস্থায়) ভূতসকলের দর্শন বা উপলব্ধি নাই। শ্রীধর অর্থ করেন; "অব্যক্তং প্রধানং তদেবাদি উৎপত্তেঃ পূর্ব্বরূপম্।" অর্থাৎ ভূত সকল উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণরূপে অব্যক্ত থাকে। অপর সকলে কেহ শ্রীধরের, কেহ শঙ্করের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। শঙ্করের অর্থ গ্রহণ করিলেই অর্থ সহজে বুঝা যায়।

শ্লোকের অর্থ এই যে, যেখানে জীব সকল আদিতে অর্থাৎ জন্মের পূর্ব্বে চক্ষুরাদির অতীত ছিল; কেবল মধ্যে দিনকত জন্মগ্রহণ করিয়া ব্যক্তরূপ হইয়াছিল, শেষে মৃত্যুর পর আবার চক্ষুরাদির অতীত হইবে, তখন আর তজ্জন্য শোক করিব কেন? "প্রতি-বুদ্ধস্য স্বপ্নদৃষ্টবস্তুম্বিব শোকো ন যুজ্যতে" (শ্রীধর স্বামী)—ঘুম ভাঙ্গিলে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় জীবের জন্য শোক অনুচিত।

এখানেও আত্মার অবিনাশিত্ববাদ জাজ্বল্যমান।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

এই (আত্মা)কে কেহ আশ্চর্য্যবৎ দেখেন; কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ বলেন; কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ শুনিয়া থাকেন। শুনিয়াও কেহ ইহাকে জানিতে পারিলেন না। ২৯।

এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই। আত্মা অবিনাশী হইলেও পণ্ডিতেরাও মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করিয়া থাকেন বটে। কিন্তু তাহার কারণ এই যে, তাঁহারাও প্রকৃত আত্মতত্ত্ব অবগত নহেন। আত্মা তাঁহাদের নিকট বিস্ময়ের বিষয় মাত্র—তাঁহারা আশ্চর্য্য বিবেচনা করেন। আত্মার দুর্জ্ঞেয়তাবশতঃ সকলের এই ভ্রান্তি।

এ কথাতে এই আপত্তি হইতে পারে যে, "আত্মা অবিনাশী" এবং "ইন্দ্রিয়াদির অবিষয়" এই সকল কথাতে এমত কিছু নাই যে, পণ্ডিতেও বুঝিতে পারে না। কিন্তু ভগবদুক্তির উদ্দেশ্য কেবল দুর্ব্বোধ্যতা প্রতিপাদন করা নহে। আমরা আত্মার অবিনাশিতা বুঝিতে পারিলেও কথাটা আমাদের হৃদয়ে বড় প্রবেশ করে না।

তদ্বিষয়ক যে বিশ্বাস, তাহা আমাদের সমস্ত জীবন শাসিত করে না। এই বিশ্বাসকে আমরা একটা সর্ব্বদা-জাজ্বল্যমান, জীবন্ত, সর্ব্বথা-হৃদয়ে-প্রস্ফুটিত ব্যাপারে পরিণত করি না। ইহাই ভগবদ্ভক্তির উদ্দেশ্য।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ৩০॥

হে ভারত! সকলের দেহে, আত্মা নিত্য ও অবধ্য। অতএব জীব সকলের জন্য তোমার শোক করা উচিত নহে। ৩০।

আত্মার অবিনাশিতা সম্বন্ধে যাহা কথিত হইল, এই শ্লোক তাহার উপসংহার।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥ ৩১॥

স্বধর্ম্ম প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভীত হইও না। ধর্ম্ম্য যুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয় আর নাই। ৩১।

এক্ষণে ১১ ও ২২ শ্লোকের টীকায় যাহা বলা গিয়াছে, তাহা স্মরণ করিতে হইবে। স্বধর্ম্ম কি, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ক্ষত্রিয় অর্থাৎ যুদ্ধব্যবসায়ীর স্বধর্ম্ম—যুদ্ধ। কিন্তু যোদ্ধার স্বধর্ম্ম যুদ্ধ বলিয়া যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলেই যে যোদ্ধাকে তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, এমন নহে। অনেক সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যোদ্ধার পক্ষে অধর্ম্ম। অনেক রাজা পরস্বাপহরণ জন্যই যুদ্ধ করেন। তাদৃশ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া ধর্ম্মানুমত নহে। কিন্তু যে যুদ্ধব্যবসায়ী, মনুষ্যসমাজের দোষে তাহাকে তাহাতেও প্রবৃত্ত হইতে হয়। যোদ্ধগণ রাজা বা সেনাপতির আজ্ঞানুবর্ত্তী। তাঁহাদের আজ্ঞামত যুদ্ধ করিতে, অধীন যোদ্ধ-মাত্রেই বাধ্য। কিন্তু সে অবস্থায় যুদ্ধ করিলেও তাঁহারা পরস্বাপহরণ ইত্যাদি পাপের অংশী হয়েন। এই অধর্ম্মযুদ্ধই অনেক। যোদ্ধা তাহা হইতে কোনরূপে নিষ্কৃতি পান না। ভীষ্মের ন্যায় পরমধার্ম্মিক ব্যক্তিরও অন্নদাসত্ববশতঃ দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক অধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার কথা এই মহাভারতেই আছে। ইউরোপীয় সৈন্যমধ্যে খুঁজিলে ভীষ্মের অবস্থাপন্ন লোক সহস্র পাওয়া যাইবে। অতএব যোদ্ধার এই মহৎ দুর্ভাগ্য যে, স্বধর্ম্ম পালন করিতে গিয়া, অনেক সময়েই অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। ধার্ম্মিক যোদ্ধা ইহাকে মহদ্দুঃখ বিবেচনা করেন। কিন্তু ধর্ম্মযুদ্ধও আছে। আত্মরক্ষা, স্বজন-রক্ষা, সমাজরক্ষা, দেশরক্ষা, সমস্ত প্রজার রক্ষা, ধর্ম্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এইরূপ যুদ্ধে যোদ্ধার অধর্ম্ম সঞ্চয় না হইয়া পরম ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়। এখানে কেবল স্বধর্ম্মপালন নহে, তাহার সঙ্গে অনন্ত পুণ্য সঞ্চয়। এরূপ ধর্ম্মযুদ্ধ যে যোদ্ধার অদৃষ্টে ঘটে, সে পরম ভাগ্যবান্। অর্জ্জুনের সেই সময় উপস্থিত, এরূপ যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি পরম অধর্ম্ম—অনর্থক স্বধর্ম্মপরিত্যাগ। অর্জ্জুন সেই অনর্থক স্বধর্ম্মপরিত্যাগরূপ ঘোরতর অধর্ম্মে প্রবৃত্ত। ইহার কারণ আর কিছু নহে। কেবল স্বজনাদি নিধনের ভয়। সেই ভয়ে ভীত শোকাকুল বা মুগ্ধ হইবার কোন কারণ নাই, তাহা ভগবান্ বুঝাইলেন; বুঝাইলেন যে, কেহ মরিবে না—কেন না, দেহী অমর। যাইবে কেবল শূন্য দেহ। কিন্তু সেটা ত জীর্ণ বস্ত্র মাত্র। অতএব স্বজনবধাশঙ্কায় ভীত হইয়া স্বধর্ম্মে উপেক্ষা অকর্ত্তব্য। এই ধর্ম্মযুদ্ধের মত এমন মঙ্গলময় ব্যাপার ক্ষত্রিয়ের আর ঘটে না। ইহাই শ্লোকার্থ।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ ।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়া পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥

মুক্ত স্বর্গদ্বারস্বরূপ ঈদৃশ যুদ্ধ, আপনা হইতে যাহা উপস্থিত হইয়াছে, সুখী ক্ষত্রিয়েরাই ইহা লাভ করিয়া থাকে । ৩২ ।

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

আর যদি তুমি এই ধর্ম্ম্য যুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্ম্ম এবং কীর্ত্তি পরিত্যাগে পাপযুক্ত হইবে । ৩৩ ।

৩১ শ্লোকের টীকায় যাহা লেখা গিয়াছে, তাহাতেই এই দুই শ্লোকের তাৎপর্য্য স্পষ্ট বুঝা যাইবে ।

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্ ।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

লোকে তোমার চিরস্থায়ী অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। সমর্থ ব্যক্তির অকীর্ত্তির অপেক্ষা মৃত্যু ভাল । ৩৪ ।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫ ॥

মহারথগণ মনে করিবেন, তুমি ভয়ে রণ হইতে বিরত হইলে। যাঁহারা তোমাকে বহুমান করেন, তাঁহাদিগের নিকট তুমি লাঘব প্রাপ্ত হইবে । ৩৫ ।

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬ ॥

তোমার শত্রুগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবে ও অনেক অবাচ্য কথা বলিবে । তার পর অধিক দুঃখ আর কি আছে ? ৩৬ ।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্ ।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

হত হইলে স্বর্গ পাইবে। জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব হে কৌন্তেয় ! যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থান কর । ৩৭ ।

৩৪ । ৩৫ । ৩৬ । ৩৭, এই চারিটি শ্লোক কি প্রকারে এখানে আসিল, তাহা বুঝা যায় না। এই চারিটি শ্লোক গীতার অযোগ্য। গীতায় ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আছে, এবং দার্শনিক তত্ত্বও আছে। এই চারটি শ্লোকের বিষয় না ধর্ম্ম, না দার্শনিক তত্ত্ব। ইহাতে বিষয়ী লোকে যে অসার অশ্রদ্ধেয় কথা সচরাচর উপদেশ স্বরূপ ব্যবহার করে, তাহা ভিন্ন আর কিছু নাই। ইহা ঘোরতর স্বার্থবাদে পূর্ণ, তাহা ভিন্ন আর কিছুই নহে ।

৩৩শ শ্লোক পর্য্যন্ত ভগবান্ অর্জ্জুনকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পরম পবিত্র উপদেশ দিলেন । ৩৮ শ্লোক হইতে আবার জ্ঞান ও কর্ম্ম সম্বন্ধীয় পরম পবিত্র উপদেশ আরম্ভ হইবে। এই চারিটি শ্লোকের সঙ্গে, দুইয়ের একেরও কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। তৎপরিবর্ত্তে লোক নিন্দা-ভয় প্রদর্শিত হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, লোক-নিন্দা-ভয় কোন প্রকার ধর্ম্ম নহে। সত্য বটে, আধুনিক সমাজ সকলে ধর্ম্ম এতই দুর্ব্বল যে, অনেক সময়ে লোক-

নিন্দা-ভয় ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে। অনেক চোর চৌর্য্যে ইচ্ছুক হইয়াও কেবল লোক-নিন্দা-ভয়ে চুরি করে না, অনেক পারদারিক লোক-নিন্দা-ভয়েই শাসিত থাকে। তাহা হইলেও ইহা ধর্ম্ম হইল না, পিতলকে গিল্টি করিলে দুই চারি দিন সোনা বলিয়া চালান যায় বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া পিতল সোনা হয় না। পক্ষান্তরে এই লোক-নিন্দা বহুতর পাপের কারণ। আজিকার দিনে হিন্দুসমাজের ভ্রূণহত্যা ও স্ত্রীহত্যা অনেকই এই লোক-নিন্দা-ভয় হইতে উৎপন্ন। এক সময়ে ফরাসীর দেশে উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে পারদারিকতার অভাবই নিন্দার কারণ ছিল। সিয়াপোষ কাফরদিগের মধ্যে, যে একজনও মুসলমানের মাথা কাটে নাই, অর্থাৎ যে নরঘাতী নহে, সে সমাজে নিন্দিত—তাহার বিবাহ হয় না। সকল সমাজেরই সহস্র সহস্র পাপ লোক-নিন্দা-ভয় হইতেই উৎপন্ন ; কেন না, সাধারণ লোক নির্ব্বোধ, যাহা ভাল, তাহারও নিন্দা করিয়া থাকে। লোকে যাহা ভাল বলে, মনুষ্য এখন তাহারই অন্বেষণ করে বলিয়াই মনুষ্যের ধর্ম্মাচরণে অবসর বা তৎপ্রতি মনোযোগ নাই। লোক-নিন্দা-ভয়ে অনেকে যে ধর্ম্মাচরণ করিতে পারে না, এবং ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে অসার লোক-নিন্দা-ভয় প্রদর্শন করে, ইহা সচরাচর দেখা গিয়া থাকে। যে লোক-নিন্দা-ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত, সে সাক্ষাৎ নরপিশাচ। ভগবান্ স্বয়ং যে অর্জ্জুনকে সেই মহাপাপে উপদিষ্ট করিবেন, ইহা সম্ভব নহে। কোন জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই ইহা ঈশ্বরোক্তি বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। ইহা গীতাকারের নিজের কথা বলিয়াও গ্রহণ করিতে পারা যায় না ; কেন না, গীতাকার যেই হউন, তিনি পরম জ্ঞানী এবং ভগবদ্ধর্ম্মে সুদীক্ষিত ; এরূপ পাপোক্তি তাঁহা হইতেও সম্ভবে না। যদি কেহ বলেন যে, এই শ্লোক চারিটি প্রক্ষিপ্ত, তবে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা শঙ্করের পর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। অভিনবগুপ্তাচার্য্য এই কয় শ্লোককে "লৌকিক ন্যায়" বলিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যদি "লৌকিক ন্যায়" পরিত্যাগ না করিবেন, তবে আর দাঁড়াই কোথায়! যাহাই হউক, লোকনিন্দার কথার পর ও পৃথিবীভোগের কথার পরেই "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে" ইত্যাদি কথা অসংলগ্ন বোধ হয় বটে। অতএব যাঁহারা এই চারিটি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিবেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমরা বিবাদ করিতে ইচ্ছুক নহি।

বলিতে কেবল বাকি আছে যে, যদিও ৩৭শ শ্লোকে লোক-নিন্দা-ভয় দেখান নাই, তথাপি ইহা স্বার্থবাদ-পরিপূর্ণ। স্বর্গ বা রাজ্যের প্রলোভন দেখাইয়া ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করা, আর ছেলেকে মিঠাই দিব বলিয়া সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করা তুল্য কথা, উভয়ই নিকৃষ্ট স্বার্থ-পরতার উত্তেজনা মাত্র।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

অতএব সুখদুঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হও। নচেৎ পাপযুক্ত হইবে। ৩৮।

যুদ্ধই যদি স্বধর্ম্ম, অতএব অপরিহার্য্য, তবে তাহাতে সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয় পরাজয় সমান জ্ঞান করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে ; কেন না, ফল যাহাই হউক, যাহা অনুষ্ঠেয়, তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য—করিলে সুখ হইবে কি দুঃখ হইবে, লাভ হইবে কি অলাভ

হইবে, ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে। ইহাই পশ্চাৎ কর্ম্মযোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা—

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

পাঠক দেখিবেন, ৩৭শ শ্লোকের পর আবার সুর ফিরিয়াছে। এখন যথার্থ ভগবদ্গীতার মহিমাময় শব্দ পাওয়া যাইতেছে। এই যথার্থ কৃষ্ণের বংশীরব। ৩৪-৩৭শ শ্লোক ও ৩৮শ শ্লোকে কত প্রভেদ!

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥

তোমাকে সাংখ্যে এই জ্ঞান কথিত হইল। (কর্ম্মযোগে) ইহা (যাহা বলিব) শ্রবণ কর। তদ্দ্বারা যুক্ত হইলে, হে পার্থ! কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইবে। ৩৯।

প্রথম—সাংখ্য কি? "সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা। সম্যগ্জ্ঞানং তস্যাং প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যম্।" (শ্রীধর)। যাহার দ্বারা বস্তুতত্ত্ব সম্যক্ প্রকাশিত হয়, তাহা সংখ্যা। তাহার সম্যগ্জ্ঞান প্রকাশমান আত্মতত্ত্ব সাংখ্য নামটি এক্ষণে দর্শনবিশেষ সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তজ্জন্য ইংরেজ পণ্ডিতেরা গুরুতর ভ্রমে পড়িয়া থাকেন। বস্তুতঃ এই গীতাগ্রন্থে সাংখ্য শব্দ "তত্ত্বজ্ঞান" অর্থেই ব্যবহৃত দেখা যায়, এবং ইহাই ইহার প্রাচীন অর্থ বলিয়া বোধ হয়।

দ্বিতীয়—যোগ কি? যেমন সাংখ্য এক্ষণে কপিল-দর্শনের নাম, যোগও এক্ষণে পাতঞ্জলদর্শনের নাম। পতঞ্জলি যে অর্থে যোগ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন,* এক্ষণে সচরাচর যোগ বলিলে তাহাই আমরা বুঝিয়া থাকি। কিন্তু গীতায় যোগ সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। তাহা হইলে "কর্ম্মযোগ" "ভক্তিযোগ" ইত্যাদি—শব্দের কোন অর্থ হয় না। বস্তুতঃ গীতায় "যোগ" শব্দটি সর্ব্বত্র এক অর্থেই যে ব্যবহৃত হইয়াছে, এমন কথাও বলা যায় না। সচরাচর ইহা গীতায় যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, ঈশ্বরারাধনা বা মোক্ষের বিবিধ উপায় বা সাধনাবিশেষই যোগ। জ্ঞান, ঈদৃশ একটি উপায় বা সাধন, কর্ম্ম তাদৃশ উপায়ান্তর, ভক্তি তৃতীয়, ইত্যাদি—এজন্য জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে। সচরাচর এই অর্থ, কিন্তু এ শ্লোকে সে অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে না। এ স্থলে "যোগ" অর্থে কর্ম্মযোগ। এই অর্থে "যোগ" "যোগী" "যুক্ত" ইত্যাদি শব্দ গীতায় ব্যবহৃত হইতে দেখিব। স্থানান্তরে "যোগ" শব্দে জ্ঞানযোগাদিও বুঝাইতে দেখা যাইবে।

অতএব এই শ্লোকের দুইটি শব্দ বুঝিলাম—সাংখ্য, জ্ঞান; এবং যোগ, কর্ম্ম। এক্ষণে মনুষ্যপ্রকৃতির কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

মনুষ্যজীবনে যাহা কিছু আছে, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা তাহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—Thought, Action and Feeling. আমরা না হয় পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের মতাবলম্বী নাই হইলাম, তথাপি আমরা নিজেই মনুষ্যজীবন আলোচনা করিয়া দেখিলে জানিব যে, তাহাতে এই তিন ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই তিনকেই ঈশ্বরমুখ করা যাইতে

* যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।

পারে। তিনই ঈশ্বরার্পিত হইলে ঈশ্বরসমীপে লইয়া যাইতে পারে। Thought ঈশ্বরমুখ হইলে জ্ঞানযোগ; Action ঈশ্বরমুখ হইলে কর্ম্মযোগ; Feeling ঈশ্বরমুখ হইলে ভক্তিযোগ। ভক্তিযোগের কথা এখন থাক। ৩৪ শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞানের কথা ভগবান্ অর্জ্জুনকে বুঝাইলেন; এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামই "সাংখ্যযোগ"।* জ্ঞানে অর্জ্জুনকে উপদিষ্ট করিয়া ভগবান্ এক্ষণে ৩৯ শ্লোক† হইতে কর্ম্মে উপদিষ্ট করিতেছেন। কি বলিতেছেন, এক্ষণে তাহাই শুন।

ভাষ্যকারেরা বলেন, এই কর্ম্ম, জ্ঞানের সাধন (শ্রীধর) বা প্রাপ্তির উপায় (শঙ্কর)। অর্থাৎ প্রথমে তত্ত্বজ্ঞান কি, তাহা অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া, "যদি অর্জ্জুনের তত্ত্বজ্ঞান অপরোক্ষ না হইয়া থাকে, তবে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবার নিমিত্ত এই কর্ম্মযোগ" কহিতেছেন (হিতলাল মিশ্র)। বলা বাহুল্য, এরূপ কথা মূলে এখানে নাই। তবে স্থানান্তরে এরূপ কথা আছে বটে, যথা—

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে। ৩। ৬

কিন্তু আবার স্থানবিশেষে অন্য প্রকার কথাও পাওয়া যাইবে, যথা—

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।

ইত্যাদি। ৫। ৬। ৫

এ সকল কথার মর্ম্ম পশ্চাৎ বুঝা যাইবে।

এই শ্লোকে কর্ম্মযোগের ফলও কথিত হইতেছে। এই ফল "কর্ম্মবন্ধ" হইতে মোচন। কর্ম্মবন্ধ কি? কর্ম্ম করিলেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। জন্মান্তরবাদীরা বলেন, এ জন্মে যাহা করা যায়, জন্মান্তরে তাহার ফলভোগ করিতে হয়। যদি আর পুনর্জ্জন্ম না হয়, তবেই আর কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইল না। তাহা হইলেই কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তি হইল। অতএব মোক্ষপ্রাপ্তিই কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তি।

কিন্তু যে জন্মান্তর না মানে, সেও কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তি এ জীবনের চরমোদ্দেশ্য বলিয়া মানিতে পারে। পরকালে বা জন্মান্তরে কি হইবে, তাহা জানি না, কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে, ইহজন্মেই আমরা সকল কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকি। আমরা সকলেই জানি যে, হিম লাগাইলে ইহজন্মেই সর্দ্দি হয়। আমরা সকলেই জানি যে, রোগের চিকিৎসা করিলে রোগ আরাম হয়। সকলেই জানি যে, আমরা যদি কাহারও শত্রুতা করি, তবে সেও ইহজীবনেই আমাদের শত্রুতা করে, এবং আমরা যদি কাহারও উপকার করি, তবে তাহার ইহজীবনেই আমাদের প্রত্যুপকার করার সম্ভাবনা। সকলেই জানে, ধনসঞ্চয় করিলেই ইহজন্মেই "বড়মানুষ" করা যায়; এবং পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করিলেই ইহজন্মেই বিদ্যালাভ করা যায়। সকল প্রকার কর্ম্মের ফল ইহজন্মেই এইরূপ পাওয়া গিয়া থাকে।

তবে কতকগুলি কর্ম্ম আছে, তাহার বিশেষ প্রকার ফলের প্রত্যাশা করিতে আমরা শিক্ষিত হইয়াছি। এই কর্ম্মগুলিকে সচরাচর পাপ পুণ্য বলিয়া থাকে। তাহার যে সকল ফল প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশা করিতে আমরা শিখিয়াছি, তাহা ইহজন্মে

* চতুর্থাধ্যায়ের নাম "জ্ঞানযোগ"। প্রভেদ কি, পশ্চাৎ জানা যাইবে।

† মধ্যের চারিটি শ্লোক তবে কি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয় না?

পাই না বটে। আমরা শিখিয়াছি যে, দান করিলে, স্বর্গলাভ হয়, কিন্তু ইহজীবনে কাহারও স্বর্গলাভ হয় না। কেহ বা মনে করেন, একগুণ দিলে দশগুণ পাওয়া যায়, কিন্তু ইহজীবনে একগুণ দিলে অর্দ্ধগুণও পাওয়া যায় না। শুনা আছে, চুরি করিলে একটা ঘোরতর পাপ হয়। কিন্তু ইহজীবনে চুরি করিয়া সকলে রাজদণ্ডে পড়ে না—সকলে সে পাপের কোন প্রকার দণ্ড দেখিতে পায় না। সকলে দেখিতে পায় না বলিয়া ইহজীবনে চুরির কোন প্রকার দণ্ড নাই—কর্ম্মফলভোগ নাই, এমন নহে; এবং দানের যে কোন পুরস্কার নাই, তাহাও নহে। চিত্তপ্রসাদ আছে—পুনঃ পুনঃ দানে আপনার চিত্তের উন্নতি এবং মাহাত্ম্য বৃদ্ধি আছে। পাপ পুণ্যে ইহজীবনে কিরূপ সমুচিত কর্ম্মফল পাওয়া যায়, তাহা আমি গ্রন্থান্তরে বুঝাইয়াছি,* পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। যাঁহাদের ইচ্ছা হইবে, সেই গ্রন্থে দৃষ্টি করিবেন।

সেই গ্রন্থে ইহাও বুঝাইয়াছি যে, সম্পূর্ণ ধর্ম্মাচরণের দ্বারা ইহজীবনেই মুক্তিলাভ করা যায়। সেই মুক্তি কি প্রকার এবং কিরূপেই লাভ হয়, তাহাও সেই গ্রন্থে বুঝাইয়াছি। সে সকল কথা আর এখানে পুনরুক্ত করিব না। ফলে জীবন্মুক্তি হিন্দুধর্ম্মের বহির্ভূত তত্ত্ব নহে। এই গীতাতেই উক্ত হইয়াছে যে, জীবন্মুক্তি লাভ করা যায়। আমরা ক্রমশঃ তাহা বুঝিব। যেরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহা লাভ করা যাইতে পারে. তাহাই কর্ম্মযোগ। ইহাও দেখিব। সুতরাং যাঁহারা জন্মান্তর মানেন না, তাঁহারাও কর্ম্মযোগের দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে পারেন। গীতোক্ত ধর্ম্ম বিশ্বলৌকিক, ইহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে।

উপসংহারে বলা কর্ত্তব্য যে, আর এক কর্ম্মফলের কথা আছে। হিন্দুরা যাগযজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন—কর্ম্মফল পাইবার জন্য। এই সকলের ইহলোকে যে কোন প্রকার ফল পাওয়া যায় না, এমন কথা আমরা বলি না। একাদশীব্রত করিলে শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ করা যায় এবং অন্যান্য যাগযজ্ঞের ও ব্রতাদির কোন কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক ফল পাওয়া যাইতে পারে। তবে হিন্দুরা সচরাচর যে সকল ফল কামনা করিয়া এই সকল অনুষ্ঠান করেন, তাহা এ জন্মে পাওয়া যায় না বটে। ভরসা করি, এ টীকার এমন কোন পাঠক উপস্থিত হইবেন না, যিনি এ প্রশ্নের কোন উত্তর প্রত্যাশা করিবেন।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

এই (কর্ম্মযোগে) প্রারম্ভের নাশ নাই; প্রত্যবায় নাই; এ ধর্ম্মের অল্পতেই মহদ্ভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।৪০।

জ্ঞান সম্বন্ধে এরূপ কথা বলা যায় না। কেন না, অল্প জ্ঞানের কোন ফলোপধায়িতা নাই; বরং প্রত্যবায় আছে, উদাহরণ—সামান্য জ্ঞানীর ঈশ্বরানুসন্ধানে নাস্তিকতা উপস্থিত হইয়া থাকে; এমন সচরাচর দেখা গিয়াছে।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

* ধর্ম্মতত্ত্ব।

হে কুরুনন্দন! ইহাতে (কর্ম্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি একই হইয়া থাকে। কিন্তু অব্যবসায়িগণের বুদ্ধি বহুশাখাযুক্ত ও অনন্ত হইয়া থাকে। ৪১।

শ্রীধর বলেন, "পরমেশ্বরে ভক্তির দ্বারা আমি নিশ্চিত ত্রাণ পাইব" এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। ইহা একই হয়, অর্থাৎ একনিষ্ঠই হয়, নানা বিষয়ে ধাবিত হয় না। কিন্তু যাহারা অব্যবসায়ী, অর্থাৎ যাহাদের সেরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি নাই, অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বরাধনাবহির্ম্মুখ, এবং সকাম, তাহাদের কামনা সকল অনন্ত এবং কর্ম্মফল-গুণফলত্বাদির প্রকারভেদ আছে, এজন্য তাহাদের বুদ্ধিও বহুশাখা ও অনন্ত হয়, অর্থাৎ কত দিকে যায়, তাহার অন্ত নাই। যাহারা কামনাপরবশ, এবং কামনাপরবশ হইয়াই কাম্য কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাদের ঈশ্বরারাধনার বুদ্ধি একনিষ্ঠ নহে, নানাবিধ বিষয়েই প্রধাবিত হয়।

কথাটার স্থূল তাৎপর্য্য এই। ভগবান্ কর্ম্মযোগের অবতারণা করিতেছেন, কিন্তু অর্জ্জুন সহসা মনে করিতে পারেন যে, কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানই কর্ম্মযোগ; কেন না, তৎকালে বৈদিক কাম্য কর্ম্মই কর্ম্ম বলিয়া পরিচিত। কর্ম্ম বলিলে সেই সকল কর্ম্মই বুঝায়। অতএব প্রথমেই ভগবান্ বলিয়া রাখিতেছেন যে, কাম্য কর্ম্ম কর্ম্মযোগ নহে, তাহার বিরোধী। কর্ম্ম কি, তাহা পশ্চাৎ বলিবেন, কিন্তু তাহা বলিবার আগে এ বিষয়ে যে সাধারণ ভ্রম প্রচলিত, পরে তাহারই নিরাস করিতেছেন।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

হে পার্থ! অবিবেকিগণ এই শ্রবণরমণীয়, জন্মকর্ম্মফলপ্রদ, ভোগৈশ্বর্য্যের সাধনভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল বাক্য বলে, যাহারা বেদবাদরত, "(তদ্ভিন্ন) আর কিছুই নাই" যাহারা ইহা বলে, তাহারা কামাত্ম্য, স্বর্গপর, ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত এবং সেই কথায় যাহাদের চিত্ত অপহৃত, তাহাদের বুদ্ধি সমাধিতে সংশয়বিহীন হয় না। ৪২। ৪৩। ৪৪।

এই তিনটি শ্লোক ও ইহার পরবর্ত্তী দুই শ্লোকের ও ৫৩ শ্লোকের বিশেষ প্রাধান্য আছে; কেন না এই ছয়টি শ্লোকে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। এবং গীতার এবং কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বুঝিবার জন্য ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। অতএব ইহার প্রতি পাঠকের বিশেষ মনোযোগের অনুরোধ করি।*

* এই শ্লোকত্রয়ের বিশেষ প্রাধান্য আছে বলিয়া পাঠকের সন্দেহভঞ্জনার্থ মৎকৃত অনুবাদ ভিন্ন আর একটি অনুবাদ দেওয়া ভাল। এজন্য কালীপ্রসন্ন সিংহের কৃত মহাভারতের অনুবাদও এ স্থলে দেওয়া গেল; উহা অবিকল অনুবাদ এমন বলা যায় না, কিন্তু বিশদ বটে।

"যাহারা আপাতমনোহর শ্রবণরমণীয় বাক্যে অনুরক্ত; বহুবিধ ফলপ্রকাশক বেদবাক্যই যাহাদের প্রীতিপ্রদ; যাহারা স্বর্গাদি ফলসাধন কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুই স্বীকার করে না; যাহারা কামনাপরায়ণ; স্বর্গই যাহাদের পরমপুরুষার্থ; জন্ম কর্ম্ম ও ফলপ্রদ ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের সাধনভূত নানাবিধ ক্রিয়া-

প্রথমতঃ শ্লোকত্রয়ে যে কয়টি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাউক।

কাম্য কর্ম্মের কথা হইতেছিল। এখনও সেই কথাই হইতেছে। কাম্যকর্ম্মবিষয়িণী কথাকে আপাতশ্রুতিসুখকর বলা হইতেছে ; কেন না, বলা হইয়া থাকে যে, এই করিলে স্বর্গলাভ হইবে, এই করিলে রাজ্যলাভ হইবে, ইত্যাদি।

সে সকল কথা "জন্মকর্ম্মফলপ্রদ"। শঙ্কর ইহার এইরূপ অর্থ করেন, "জন্মৈব কর্ম্মণঃ ফলং জন্মকর্ম্মফলং, তৎ প্রদদাতীতি জন্মকর্ম্মফলপ্রদা।" জন্মই কর্ম্মের ফল, যাহা তাহা প্রদান করে, তাহা "জন্মকর্ম্মফলপ্রদ"। শ্রীধর ভিন্ন প্রকার অর্থ করেন, "জন্ম চ তত্র কর্ম্মাণি চ তৎফলানি চ প্রদদাতীতি।" জন্ম, তথা কর্ম্ম, এবং তাহার ফল, ইহা যে প্রদান করে। অনুবাদকেরা কেহ শঙ্করের, কেহ শ্রীধরের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। দুই অর্থই গ্রহণ করা যাইতে পারে।

তার পর ঐ কাম্যকর্ম্মবিষয়িণী কথাকে "ভোগৈশ্বর্য্যের সাধনভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল" বলা হইয়াছে। তাহা বুঝিবার কোন কষ্ট নাই। ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির জন্য ক্রিয়াবিশেষের বাহুল্য ঐ সকল বিধিতে আছে, এই মাত্র অর্থ।

কথা এইরূপ। যাহারা এই সকল কথা বলে, তাহারা "বেদবাদরত"। বেদেই এই সকল কাম্যকর্ম্মবিষয়িণী কথা আছে—অন্ততঃ তৎকালেই বেদেই ছিল ; এবং এখনও ঐ সকল কর্ম্ম বেদমূলক বলিয়াই প্রসিদ্ধ ও অনুষ্ঠেয়। যাহারা কাম্যকর্ম্মানুরাগী, তাহারা বেদেরই দোহাই দেয়—বেদ ছাড়া "আর কিছু নাই" ইহাই বলে। অর্থাৎ বেদোক্ত কাম্যকর্ম্মাত্মক যে ধর্ম্ম, তাহা ভিন্ন আর কিছু ধর্ম্ম নাই, ইহাই তাহাদের মত। তাহারা "কামাত্মা" বা কামনাপরবশ—"স্বর্গপর," অর্থাৎ স্বর্গই তাহাদের পরমপুরুষার্থ, ঈশ্বরে তাহাদের মতি নাই, মোক্ষলাভে তাহাদের আকাঙ্ক্ষা নাই। তাহারা ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যে আসক্ত—সেই জন্যই স্বর্গ কামনা করে ; কেন না, স্বর্গ একটা ভোগৈশ্বর্য্যের স্থান বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস আছে। কাম্যকর্ম্মবিষয়ক পুষ্পিত বাক্য তাহাদের মনকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঈদৃশ ব্যক্তিরা অবিবেকী বা মূঢ়। সমাধিতে—ঈশ্বরে চিত্তের যে অভিমুখতা বা একাগ্রতা—তাহাতে এবংবিধ বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা হয় না।

শ্লোকত্রয়ের অর্থ এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি। বেদে নানা কাম্য কর্ম্মের বিধি আছে; বেদে বলে যে, সেই সকল বহুপ্রকার কাম্য কর্ম্মের ফলে স্বর্গাদি বহুবিধ ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয়, সুতরাং আপাততঃ শুনিতে সে সকল কথা বড় মনোহারিণী। যাহারা কামনাপরায়ণ, আপনার ভোগৈশ্বর্য্য খুঁজে, সেই জন্য স্বর্গাদি কামনা করে, তাহাদের মন সেই সকল কথায় মুগ্ধ হয়। তাহারা কেবল বেদের দোহাই দিয়া বেড়ায়, বলে—ইহা ছাড়া আর ধর্ম্ম নাই। তাহারা মূঢ়। তাহাদের বুদ্ধি কখনও ঈশ্বরে একাগ্র হইতে পারে না। কেন না, তাহাদের বুদ্ধি "বহুশাখা" ও "অনন্ত", ইহা পূর্ব্বশ্লোকে কথিত হইয়াছে।

কথাটা বড় ভয়ানক ও বিস্ময়কর। ভারতবর্ষ এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেও বেদশাসিত। আজিও বেদের যে প্রতাপ, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের তাহার সহস্রাংশের এক অংশ নাই।

প্রকাশক বাক্যে যাহাদের চিত্ত অপহৃত হইয়াছে ; এবং যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে একান্ত সংসক্ত ; সেই বিবেকহীন মূঢ়দিগের বুদ্ধি সমাধি বিষয়ে সংশয়শূন্য হয় না।"

সেই প্রাচীন কালে বেদের আবার ইহার সহস্রগুণ প্রতাপ ছিল। সাংখ্যপ্রবচনকার ঈশ্বর মানেন না—ঈশ্বর নাই, এ কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতে সাহস করিয়াছেন, তিনিও বেদ অমান্য করিতে সাহস করেন না—পুনঃ পুনঃ বেদের দোহাই দিতে বাধ্য হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন, এই বেদবাদীরা মূঢ় বিলাসী; ইহারা ঈশ্বরারাধনার অযোগ্য।

ইহার ভিতরে একটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। তাহা বুঝাইবার আগে আর দুইটা কথা বলা আবশ্যক। প্রথমতঃ কৃষ্ণের ঈদৃশ উক্তি বেদের নিন্দা নহে, বৈদিক কর্ম্মবাদীদিগের নিন্দা। যাহারা বলে, বেদোক্ত কর্ম্মই (যথা, অশ্বমেধাদি) ধর্ম্ম, কেবল তাহাই আচরণীয়, তাহাদেরই নিন্দা। কিন্তু বেদে যে কেবল অশ্বমেধাদি যজ্ঞেরই বিধি আছে, আর কিছু নাই, এমন নহে। উপনিষদে যে অত্যুন্নত ব্রহ্মবাদ আছে, গীতা সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুবাদিনী, তদুক্ত জ্ঞানবাদ অনেক সময়েই গীতায় উদ্ধৃত, সঙ্কলিত ও সম্প্রসারিত হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মবাদ ও ভক্তিবাদের সহিত সমঞ্জসীভূত হইয়াছে। অতএব কৃষ্ণের এতদুক্তিকে সমস্ত বেদের নিন্দা বিবেচনা করা অনুচিত। তবে দ্বিতীয় কথা এই বক্তব্য যে, যাঁহারা বলেন যে, বেদে যাহা আছে, তাহাই ধর্ম্ম, তাহা ছাড়া আর কিছু ধর্ম্ম নহে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্যে নহেন। তিনি বলেন, (১) বেদে ধর্ম্ম আছে, ইহা মানি। (২) কিন্তু বেদে এমন অনেক কথা আছে, যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম নহে—যথা, এই সকল জন্মকর্ম্মফলপ্রদা ক্রিয়াবিশেষবহুলা পুষ্পিতা কথা। (৩) তিনি আরও বলেন যে, যেমন এক দিকে বেদে এমন অনেক কথা আছে, যাহা ধর্ম্ম নহে, আবার অপর দিকে অনেক তত্ত্ব যাহা প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব, অথচ বেদে নাই। ইহার উদাহরণ আমরা গীতাতেই পাইব। কিন্তু গীতা ভিন্ন মহাভারতের অন্য স্থানেও পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ কর্ণপর্ব্ব হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রুতের্ধর্ম্ম ইতি হ্যেকে বদন্তি বহবো জনাঃ।
তত্তে ন প্রত্যসূয়ামি ন চ সর্ব্বং বিধীয়তে ॥ ৫৬ ॥
প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্ ॥ ৫৭ ॥*

যদি কেহ ইহাকে বেদনিন্দা বলিতে চাহেন, তবে শ্রীকৃষ্ণ বেদনিন্দক এবং গীতায় এবং মহাভারতের অন্যত্র বেদনিন্দা আছে। বস্তুতঃ ইহা এই পর্য্যন্ত বেদনিন্দা যে, এতদ্দ্বারা বেদের অসম্পূর্ণতা সূচিত হয়।

তত দূর ইহাকে না হয়, বেদনিন্দাই বলা যাউক। এই বেদনিন্দার ভিতর একটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে বলিয়াছি, তাহা মৎপ্রণীত "ধর্ম্মতত্ত্ব" গ্রন্থে বুঝাইয়াছি। কিন্তু ঐ গ্রন্থ সম্প্রতি মাত্র প্রচারিত হইয়াছে। এ জন্য পাঠকদিগের সুলভ না হইতে পারে। অতএব প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

* "অনেকে শ্রুতিকে ধর্ম্মপ্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না। কিন্তু শ্রুতিতে সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট নাই। এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়।" কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ—কর্ণপর্ব্ব, ৭০ অধ্যায়। সিংহ মহোদয় যে কপি দেখিয়া অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে এই শ্লোক দুটি ৭০ অধ্যায়ে আছে। কিন্তু অন্যত্র ৬৯ অধ্যায়ে ইহা পাওয়া যায়।

"সাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর উপাস্য দেবের যে সম্বন্ধ দেখা যায়, বৈদিক ধর্ম্মে উপাস্য উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছিল। 'হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত এই সোমরস পান কর। হবি ভোজন কর, আর আমাকে ধন দাও, সম্পদ্ দাও, পুত্র দাও, গোরু দাও, শস্য দাও, আমার শত্রুকে পরাস্ত কর।' বড় জোর বলিলেন, 'আমার পাপ ধ্বংস কর।' দেবগণকে এইরূপ অভিপ্রায়ে প্রসন্ন করিবার জন্য বৈদিকেরা যজ্ঞাদি করিতেন। এইরূপ কাম্য বস্তুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞাদি করাকে কাম্য কর্ম্ম বলে।

কাম্যাদি কর্ম্মাত্মক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ নাম কর্ম্ম। এই কাজ করিলে তাহার এই ফল; অতএব কাজ করিতে হইবে—এইরূপ ধর্ম্মার্জ্জনের যে পদ্ধতি তাহারই নাম কর্ম্ম। বৈদিক কালের শেষ ভাগে এইরূপ কর্ম্মাত্মক ধর্ম্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যাগযজ্ঞের দৌরাত্ম্যে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন অবস্থায় উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন যে, এই কর্ম্মাত্মক ধর্ম্ম বৃথা ধর্ম্ম। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, বৈদিক দেবদেবীর কল্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব বুঝা যায় না; ভিতরে ইহার একটা অনন্ত অজ্ঞেয় কারণ আছে। তাঁহারা সেই কারণের অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন।

এই সকল কারণে কর্ম্মের উপর অনেকে বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তাঁহারা ত্রিবিধ বিপ্লব উপস্থিত করিলেন। সেই বিপ্লবের ফলে আসিয়া প্রদেশ অদ্যাপি শাসিত। এক দল চার্ব্বাক—তাঁহারা বলেন, কর্ম্মকাণ্ড সকলই মিথ্যা—খাও দাও, নেচে বেড়াও। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা ও নেতা শাক্যসিংহ—তিনি বলিলেন, কর্ম্মফল মানি বটে, কিন্তু কর্ম্ম হইতেই দুঃখ। কর্ম্ম হইতে পুনর্জন্ম। অতএব কর্ম্মের ধ্বংস কর, তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া চিত্তসংযমপূর্ব্বক অষ্টাঙ্গ ধর্ম্মপথে গিয়া নির্ব্বাণ লাভ কর। তৃতীয় বিপ্লব দার্শনিকদিগের দ্বারা উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা প্রায় ব্রহ্মবাদী। তাঁহারা দেখিলেন যে, জগতের যে অনন্ত কারণভূত চৈতন্যের অনুসন্ধানে তাঁহারা প্রবৃত্ত, তাহা অতিশয় দুর্জ্ঞেয়। সেই ব্রহ্ম জানিতে পারিলে—সেই জগতের অন্তরাত্মা বা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ এবং জগতের সঙ্গে বা তাঁহার বা আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহা জানিতে পারিলে বুঝা যাইতে পারে যে, এ জীবন লইয়া কি করিতে হইবে। সেটা কঠিন—তাহা জানাই ধর্ম্ম—অতএব জ্ঞানই ধর্ম্ম—জ্ঞানই নিঃশ্রেয়স্। বেদের যে অংশকে উপনিষদ্ বলা যায়, তাহা এই প্রথম জ্ঞানবাদীদিগের কীর্ত্তি। ব্রহ্মনিরূপণ ও আত্ম-জ্ঞানই উপনিষদ্ সকলের উদ্দেশ্য। তার পর ছয় দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও বিবর্দ্ধিত ও প্রচারিত হইয়াছে। কপিলের সাংখ্যে ব্রহ্ম পরিত্যক্ত হইলেও সে দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানবাদাত্মক।"

শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞানবাদীদিগের মধ্যে। কিন্তু অন্য জ্ঞানবাদী যাহা দেখিতে পায় না, অনন্তজ্ঞানী তাহা দেখিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, জ্ঞান সকলের আয়ত্ত নহে; অন্ততঃ অনেকের পক্ষে অতি দুঃসাধ্য। তিনি আরও দেখিয়াছিলেন, ধর্ম্মের অন্য পথও আছে, অধিকারভেদে তাহা জ্ঞানাপেক্ষা দুঃসাধ্য। পরিশেষে ইহাও দেখিয়াছিলেন, অথবা দেখাইয়াছেন—জ্ঞানমার্গ এবং অন্য মার্গ, পরিণামে সকলই এক। এই কয়টি কথা লইয়া গীতা।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥

হে অর্জ্জুন! বেদ সকল ত্রৈগুণ্যবিষয়; তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও। নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, যোগ-ক্ষেম-রহিত এবং আত্মবান্ হও। ৪৫।

এই শ্লোকে ব্যবহৃত শব্দগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুবাদে তাহার কিছুই পরিষ্কার করা গেল না। প্রথম, "ত্রৈগুণ্যবিষয়" কি? সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই ত্রিগুণ; ইহার সমষ্টি ত্রৈগুণ্য। এই তিন গুণের সমষ্টি কোথায় দেখি? সংসারে। সেই সংসার যাহার বিষয়, অর্থাৎ প্রকাশয়িতব্য (Subject), তাহাই "ত্রৈগুণ্যবিষয়"।

শঙ্করাচার্য্য এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন—"ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ ত্রৈগুণ্যং সংসারো বিষয়ঃ প্রকাশয়িতব্যো যেষাং তে বেদাস্ত্রৈগুণ্যবিষয়া।" ইহাও একটু বেদ-নিন্দার মত শুনায়। অতএব শঙ্করের টীকাকার আনন্দগিরি প্রমাদ গণিয়া সকল দিক বজায় রাখিবার জন্য লিখিলেন, 'বেদশব্দেনাত্র কর্ম্মকাণ্ডমেব গৃহ্যতে। তদভ্যাসবতাং তদনুষ্ঠানদ্বারা সংসারধ্রৌব্যান্ন বিবেকাবসরোঽস্তীত্যর্থঃ।" অর্থাৎ এখানে বেদ শব্দের অর্থে কর্ম্মকাণ্ড বুঝিতে হইবে। যাহারা তাহা অভ্যাস করে, তাহাদের তদনুষ্ঠান দ্বারা সংসারধ্রৌব্য হেতু বিবেকের অবসর থাকে না।" বেদের কতটুকু কর্ম্মকাণ্ড, আর কতটুকু জ্ঞানকাণ্ড, সে বিষয়ে কোন ভ্রম না ঘটিলে, আনন্দগিরির এ কথায় আমাদের কোন আপত্তি নাই।

শ্রীধর স্বামী বলেন, "ত্রিগুণাত্মকাঃ সকামা যে অধিকারিণস্তদ্বিষয়াঃ কর্ম্মফলসম্বন্ধ-প্রতিপাদকা বেদাঃ।" এই ব্যাখ্যা অবলম্বনে প্রাচীন বাঙ্গালা অনুবাদক হিতলাল মিশ্র বুঝাইয়াছেন যে, "ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সকাম অধিকারীদিগের নিমিত্তই (!) বেদ সকল কর্ম্মফল সম্বন্ধে প্রতিবাদক হয়েন।" এবং শ্রীধরের বাক্যেরই অনুসরণ করিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতকার এই শ্লোকার্দ্ধের অনুবাদ করিয়াছেন যে, "বেদসকল সকাম ব্যক্তিদিগের কর্ম্মফলপ্রতিপাদক।" অন্যান্যও এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন।

উভয় ব্যাখ্যা মর্ম্মতঃ এক। সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। তাহা হইলেই ইহার অর্থ এই হইতেছে যে, "হে অর্জ্জুন! বেদ সকল সংসারপ্রতিপাদক বা কর্ম্মফলপ্রতিপাদক। তুমি বেদকে অতিক্রম করিয়া সাংসারিক বিষয়ে বা কর্ম্মফল বিষয়ে নিষ্কাম হও।" কথাটা কি হইতেছিল, স্মরণ করিয়া দেখা যাউক। প্রথমে ভগবান্ অর্জ্জুনকে সাংখ্যযোগ বুঝাইয়া, তৎপরে কর্ম্মযোগ বুঝাইবেন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কর্ম্মযোগ কি, তাহা এখনও বলেন নাই। কেন না, কর্ম্ম সম্বন্ধে যে একটা গুরুতর সাধারণ ভ্রম প্রচলিত ছিল (এবং এখনও আছে), প্রথমে তাহার নিরাস করা কর্ত্তব্য। নহিলে প্রকৃত কর্ম্ম কি, অর্জ্জুন তাহা বুঝিবেন না। সে সাধারণ ভ্রম এই যে, বেদে যে সকল যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান-প্রথা কথিত ও বিহিত হইয়াছে, তাহাই কর্ম্ম। ভগবান্ বুঝাইতে চাহেন যে, ইহা প্রকৃত কর্ম্ম নহে। বরং যাহারা ইহাতে চিত্তনিবেশ করে, ঈশ্বরারাধনায় তাহাদিগের একাগ্রতা হয় না। এ জন্য প্রকৃত কর্ম্মযোগীর পক্ষে উহা কর্ম্ম নহে। এই ৪৫শ শ্লোকে সেই কথাই পুনরুক্ত হইতেছে। ভগবান বলিতেছেন যে, বেদ সকল, যাহারা সংসারী অর্থাৎ

সংসারের সুখ খোঁজে, তাহাদিগের অনুসরণীয়। তুমি সেরূপ সাংসারিক সুখ খুঁজিও না। ত্রৈগুণ্যের অতীত হও।

কি প্রকারে ত্রৈগুণ্যের অতীত হইতে পারা যায়, শ্লোকের দ্বিতীয় অর্দ্ধে তাহা কথিত হইতেছে। ভগবান্ বলিতেছেন—তুমি নির্দ্বন্দ্ব হও, নিত্যসত্ত্বস্থ হও, যোগ-ক্ষেম-রহিত হও এবং আত্মবান্ হও। এখন এই কয়টা কথা বুঝিলেই শ্লোক বুঝা হয়।

১। নির্দ্বন্দ্ব—শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদিকে দ্বন্দ্ব বলে, তাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। যে সে-সকল তুল্য জ্ঞান করে, সেই নির্দ্বন্দ্ব।

২। নিত্যসত্ত্বস্থ—নিত্য সত্ত্বগুণাশ্রিত।

৩। যোগ-ক্ষেম-রহিত—যাহা অপ্রাপ্ত, তাহার উপার্জ্জনকে যোগ বলে, আর যাহা প্রাপ্ত, তাহার রক্ষণকে ক্ষেম বলে। অর্থাৎ উপার্জ্জন রক্ষা সম্বন্ধে যে চিন্তা, তদ্রহিত হও।

৪। আত্মবান্—অথবা অপ্রমত্ত।*

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ৪৬॥

এখানে এই শ্লোকের অনুবাদ দিলাম না। টীকার ভিতরে অনুবাদ পাওয়া যাইবে। কেন না, এই শ্লোকের প্রচলিত যে অর্থ, তাহাতে দুই একটা আপত্তি ঘটে; সে সকলের মীমাংসা না করিয়া অনুবাদ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে।

আমি এই শ্লোকের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা বুঝাইব।

* আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ মূল সঙ্গত বোধ হইয়াছে, আমি সেইরূপ অর্থ করিলাম। কিন্তু যাঁহারা বেদের গৌরব বজায় রাখিয়া এই শ্লোকের অর্থ করিতে চান, তাঁহারা কিরূপ বুঝেন, তাহার উদাহরণস্বরূপ বাবু কেদারনাথ দত্ত কৃত এই শ্লোকের ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকের যে অর্থ সঙ্গত বোধ হয়, সেই অর্থ গ্রহণ করিবেন।

"শাস্ত্রসমূহের দুই প্রকার বিষয়—অর্থাৎ উদ্দিষ্ট বিষয় ও নির্দ্দিষ্ট বিষয়। যে বিষয়টি যে শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, তাহাই তাহার উদ্দিষ্ট বিষয়। যে বিষয়কে নির্দ্দেশ করিয়া উদ্দিষ্ট বিষয়কে লক্ষ্য করে, সেই বিষয়ের নাম নির্দ্দিষ্ট বিষয়। অরুন্ধতী যে স্থলে উদ্দিষ্ট বিষয়, সে স্থলে তাহার নিকটে প্রথমে লক্ষিত যে স্থূল তারা, তাহাই নির্দ্দিষ্ট বিষয় হয়। বেদসমূহ নির্গুণ তত্ত্বকে উদ্দিষ্ট বলিয়া লক্ষ্য করে, কিন্তু নির্গুণ তত্ত্ব সহসা লক্ষিত হয় না বলিয়া প্রথমে কোন সগুণ তত্ত্বকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সেই জন্যই সত্ত্ব, রজঃ ও তম রূপ ত্রিগুণময়ী মায়াকেই প্রথম দৃষ্টিক্রমে বেদ সকলের বিষয় বলিয়া বোধ হয়। হে অর্জ্জুন, তুমি সেই নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া নির্গুণতত্ত্বরূপ উদ্দিষ্ট তত্ত্ব লাভ করতঃ নিস্ত্রৈগুণ্য স্বীকার কর। বেদ শাস্ত্রে কোন স্থলে রজস্তমোগুণাত্মক কর্ম্ম, কোন স্থলে সত্ত্বগুণাত্মক জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে নির্গুণ ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। গুণময় মানাপমানাদি দ্বন্দ্বভাব হইতে রহিত হইয়া নিত্য সত্ত্ব অর্থাৎ আমার ভক্তগণের সঙ্গ করতঃ কর্ম্মজ্ঞানমার্গের অনুসন্ধেয় যোগ ও ক্ষেমানুসন্ধান পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধিযোগ সহকারে নিস্ত্রৈগুণ্য লাভ কর।"

প্রথম। যে ব্যাখ্যাটি পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত, এবং শঙ্কর ও শ্রীধরাদির অনুমোদিত, তাহাই অগ্রে বুঝাইব।

দ্বিতীয়। আর একটি নূতন ব্যাখ্যা পাঠকের সমীপে তাঁহার বিচার জন্য উপস্থিত করিব। সঙ্গত বোধ না হয়, পাঠক তাহা পরিত্যাগ করিবেন।

তৃতীয়। আধুনিক ইংরেজি অনুবাদকেরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাও বুঝাইব।

সংক্ষেপতঃ সেই তিন প্রকার ব্যাখ্যা এই :—

১ম। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে উদপানে যাবানর্থঃ বিজানতো ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষু বেদেষু তাবানর্থঃ। ইংরেজি অনুবাদকেরা এই অর্থ করিয়াছেন। ইহার কোন মানে হয় না।

২য়। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। এই ব্যাখ্যা নূতন।

৩য়। উপাদানে যাবানর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে তাবানার্থঃ। এবং সর্ব্বেষু বেদেষু যাবানর্থঃ বিজানতো ব্রাহ্মণস্য তাবানর্থঃ। এই অর্থ প্রাচীন এবং প্রচলিত।

অগ্রে প্রচলিত ব্যাখ্যাই বুঝাইব। কিন্তু বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া যায় নাই; তদভাবে যাঁহারা সংস্কৃত না জানেন, তাঁহাদের অসুবিধা হইতে পারে, এ জন্য প্রচলিত ব্যাখ্যার উদাহরণস্বরূপ প্রথমে প্রাচীন অনুবাদক হিতলাল মিশ্র-কৃত অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"যাহা হইতে জল পান করা যায়, তাহা উদপান শব্দে বাচ্য, অর্থাৎ পুষ্করিণী এবং কূপাদি। তাহাতে স্থিত অল্প জলে একেবারে সমস্ত প্রয়োজন সাধনের অসম্ভব হেতু সেই সেই সমস্ত কূপাদি পরিভ্রমণ করিলে, পৃথক্ পৃথক্ যে প্রকার স্নান পানাদি প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, সে সমুদায় প্রয়োজন, সংপ্লুতোদকশব্দবাচ্য এক মহাহ্রদে একত্র যেমন নির্ব্বাহ হইতে পারে, তদ্রূপ সমস্ত বেদে কথিত যে কর্ম্মফলরূপ অর্থ, তাহা সমুদায়ই ভগবদ্ভক্তিযুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির তদ্দ্বারাই সম্পন্ন হয়।

শঙ্কর ও শ্রীধর উভয়েই এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, কাজেই আর সকলে সেই পথের পথিক হইয়াছেন। শ্রীধর কৃত ব্যাখ্যা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

"উদকং পীয়তে যস্মিংস্তদুদপানং বাপীকূপতড়াগাদি। তস্মিন্ স্বল্পোদকে একত্র কৃৎস্নার্থস্যাসম্ভবাত্তত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো **যাবান্** স্নানপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং ভবতি **তাবান্** সর্ব্বোঽপ্যর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে মহাহ্রদে একত্রৈব যথা ভবতি এবং **যাবান্** সর্ব্বেষু বেদেষু তত্তৎকর্ম্মফলরূপোঽর্থ**স্তাবান্** সর্ব্বোঽপি বিজানতো ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিযুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ভবত্যেব।"

ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় অনেকগুলিন পরিভ্রমণ করিলে যাবৎ পরিমিত প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, এক মহাহ্রদেই তাবৎ প্রয়োজন সম্পন্ন হয়। সেইরূপ সমস্ত বেদে যাবৎ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি-যুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠায় তাবৎ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়।*

* শঙ্করাচার্য্য-ব্যবহৃত ভাষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকার। শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, সর্ব্বেষু বেদেষু বেদোক্তেষু কর্ম্মসু যোঽর্থো যৎ কর্ম্মফলং সোঽর্থো ব্রাহ্মণস্য সন্ন্যাসিনঃ পরমার্থতত্ত্বং

আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি, এই ব্যাখ্যা বুঝিতে গিয়া যে গোলযোগে পড়িয়াছি, প্রাচীন মহামহোপাধ্যায়দিগের পাদপদ্ম বন্দনাপূর্ব্বক আমি তাহা নিবেদন করিতেছি। যে আপনার সন্দেহ ব্যক্ত করিতে সাহস না করে, তাহার কোন জ্ঞানই জন্মে নাই। এবং জন্মিবারও সম্ভাবনাও নাই।

"যাবৎ" "তাবৎ" শব্দ পরিমাণবাচক। কিন্তু কেবল যাবৎ বলিলে কোন পরিমাণ বুঝা যায় না। একটা যাবৎ থাকিলেই তার একটা তাবৎ আছেই। একটা তাবৎ থাকিলেই তার একটা যাবৎ আছেই। এমন অনেক সময়ে ঘটে যে, কেবল "যাবৎ" শব্দটা স্পষ্ট, তাহার পরবর্ত্তী "তাবৎকে" বুঝিয়া লইতে হয়; যথা—'আমি যাবৎ না আসি, তুমি এখানে থাকিও।" ইহার প্রকৃত অর্থ, "আমি যাবৎ না আসি, (তাবৎ) তুমি এখানে থাকিও।" অতএব স্পষ্টই হউক, আর উহ্যই হউক, যাবৎ থাকিলেই তাবৎ থাকিবে। তদ্রূপ তাবৎ থাকিলেই যাবৎ থাকিবে।

এই যাবৎ তাবৎ শব্দের পরস্পরের সম্বন্ধ এই, যে বস্তুর সঙ্গে যাবৎ থাকে, আর যাহার সঙ্গে তাবৎ থাকে, উভয়ের পরিমাণ এক বা সমান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। অতএব যাবৎ তাবৎ থাকিলে দুইটি তুল্য বা তুলনার বস্তু আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। "আমি যাবৎ না আসি, (তাবৎ) তুমি এখানে থাকিও"—এই বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, "আমার পুনরাগমন পর্য্যন্ত যে কাল, আর তোমার এখানে অবস্থিতিকাল, উভয়ে সমান হইবে।" এখানে এই দুইটি সময় তুল্য বা তুলনীয়।

এইরূপ যেখানে একটি যাবান্ আর একটি তাবান্ আছে, সেখানেও বুঝিতে হইবে যে, দুইটি বিষয় পরস্পর তুলিত হইতেছে। যদি তার পর আবার যাবান্ তাবান্ দেখি, তবে অবশ্য বুঝিতে হইবে যে, আবার আরও দুইটি পরস্পর তুলিত হইতেছে। ইহার অন্যথা কদাচ হইতে পারে না।

এখন এই শ্লোকের মূলে মোটে একটি যাবান্ আর একটি তাবান্ আছে; অতএব বুঝিতে হইবে, দুইটি বিষয় মাত্র পরস্পর তুলিত হইতেছে, অর্থাৎ (১) উদপানে বা সঙ্কীর্ণ জলাশয়ে অবস্থাবিশেষে যাবৎ পরিমিত প্রয়োজন, (২) সমস্ত বেদে অবস্থাবিশেষে তাবৎ প্রয়োজন। কিন্তু প্রাচীন টীকাকারদিগের কৃত যে ব্যাখ্যা, যাহার উদাহরণ উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে দেখি যে দুইটা যাবান্ এবং দুইটা তাবান্।* অতএব বুঝিতে হইবে যে, প্রথমে দুইটা বস্তু পরস্পর তুলিত হইলে পর, আবার দুইটা বস্তু পরস্পর তুলিত হইয়াছে। প্রথম, সঙ্কীর্ণ জলাশয়ের সঙ্গে সমস্ত বেদ তুলিত না হইয়া মহাহ্রদের সঙ্গে তুলিত হইতেছে। তার পরে আবার সমস্ত বেদ, সঙ্কীর্ণ জলাশয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িয়া ব্রহ্মনিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা প্রাপ্ত হইল। ইহাতে কোন অর্থবিপর্য্যয় ঘটিতেছে কি না?

বিজ্ঞানতো যোঽর্থঃ যৎ বিজ্ঞানফলং সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ং তস্মিংস্তাবানেব সংপদ্যতে ইত্যাদি।" ইহার ভিতর অন্য যে কল-কৌশল থাকে, তাহা পশ্চাৎ বুঝাইব। সম্প্রতি "সর্ব্বেষু বেদেষু" ইহার যেরূপ অর্থ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন, তৎপ্রতি পাঠককে মনোযোগ করিতে বলি। "সর্ব্বেষু বেদেষু" অর্থ "বেদোক্তেষু কর্ম্মসু"। যে কারণে আনন্দগিরি বলিয়াছেন, "বেদশব্দেনাত্র কর্ম্মকাণ্ডমেব গৃহ্যতে," সেই কারণে ইনিও বলিয়াছেন, "সর্ব্বেষু বেদেষু" অর্থে "বেদোক্তেষু কর্ম্মসু"।

* স্থূল অক্ষরে এই চারিটা শব্দ ছাপিয়াছি, পাঠক মিলাইয়া দেখিবেন।

সচরাচর এ প্রশ্নের এই উত্তর যে, কোন অর্থবিপর্য্যয় ঘটিতেছে না। কেন না, যাবান্ তাবান্ যেখানে নাও থাকে, সেখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজনানুসারে ব্যাখ্যাকারকে বসাইয়া লইতে হয়; তাহার উদাহরণ পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। এ কথায় এখানে দুইটি আপত্তি উপস্থিত হইতেছে।

প্রথম আপত্তি এই। মানিলাম যে, ব্যাখ্যার প্রয়োজনানুসারে ব্যাখ্যাকার যাবান্ তাবান্ বসাইয়া লইতে পারেন। কিন্তু যাবান্ কাটিয়া তাবান্ করিতে, তাবান্ কাটিয়া যাবান্ করিতে পারেন কি? আমি যদি বলি, আমি যাবৎ না আসি, তুমি এখানে থাকিও, তাহা হইলে বাখ্যাকার তাবৎ শব্দ বসাইয়া লইয়া 'তাবৎ তুমি এখানে থাকিও' বলিতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি যাবৎ কাটিয়া তাবৎ করেন, তাবৎ কাটিয়া যাবৎ করেন, যদি বলেন যে, এই বাক্যের অর্থ 'আমি তাবৎ না আসি, যাবৎ তুমি এখানে থাকিও' তাহা হইলে তাঁহার ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য ও মূলের বিপরীত বলিতে হইবে।

আরও একটা উদাহরণের দ্বারা কথাটা আরও স্পষ্ট করা যাউক।

"যাবৎ তোমার জীবন, তাবৎ আমার সুখ।" (ক)

এই বাক্যটি উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ কর, এবং তাহাতে (ক) চিহ্ন দাও। তার পর উহার যাবৎ কাটিয়া তাবৎ কর, তাবৎ কাটিয়া যাবৎ কর। তাহা হইলে বাক্য এইরূপ দাঁড়াইতেছে।

"তাবৎ তোমার জীবন, যাবৎ আমার সুখ।" (খ)

এখন দেখ, বাক্যার্থের কিরূপ বিপর্য্যয় ঘটিল। (ক)-চিহ্নিত বাক্যের প্রকৃত অর্থ যে, "তুমি যত দিন বাঁচিবে, তত দিনই আমি সুখী, তার পর আর সুখী হইব না।" (খ)-চিহ্নিত বাক্যের প্রকৃত অর্থ "যত দিন আমি সুখী থাকিব, তত দিন তুমি বাঁচিবে, তার পর আর তুমি বাঁচিবে না।" অর্থের সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিল।

অতএব টীকাকার কখনও যাবান্ কাটিয়া তাবান্, তাবান্ কাটিয়া যাবান্ করিবার অধিকারী নহেন। কিন্তু এখানে টীকাকার ঠিক তাহাই করিয়াছেন। বুঝিবার জন্য শ্লোকের চারিটি চরণে ক্রমান্বয়ে ক, খ, গ, ঘ, চিহ্ন দেওয়া যাক। তাহা হইলে শ্লোকস্থ "যাবানের" গায়ে (ক) এবং "তাবানের" গায়ে (গ) চিহ্ন পড়িতেছে।

(ক) যাবানর্থ উদপানে (গ) তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু
(খ) সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে (ঘ) ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ

তদ্ব্যাখ্যায় টীকাকার করিয়াছেন—

(ক) যাবানর্থ উদপানে (গ) যাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু
(খ) তাবান্ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে (ঘ) তাবান্ ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ

এক্ষণে পাঠক (গ)তে (গ)তে মিলাইয়া দেখিবেন, তাবান্ কাটিয়া যাবান্ হইয়াছে কি না।*

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ব্যাখ্যার প্রয়োজনমতে ব্যাখ্যাকারা যাবান্ তাবান্ বসাইয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে বসাইতে পারেন কি?

* সত্য বটে, শঙ্করাচার্য্য তাবান্ শব্দের স্থানে যাবান্ শব্দ ব্যবহার করার বিষয়ে সতর্ক হইয়াছেন, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে "যদ্" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কাজেই এক কথা।

যেখানে নূতন যাবান্ তাবান্ না বসাইয়া লইয়া সোজা অর্থ করিলেই অর্থ হয়, সেখানেও কি যাবান্ তাবান্ বসাইয়া লইতে হইবে ? এখানে কি নূতন যাবান্ তাবান্ না বসাইলে অর্থ হয় না ? হয় বৈ কি । বড় সোজা অর্থই আছে ।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে ।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥

ইহার সোজা অর্থ আমি এইরূপ বুঝি ;—

সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থঃ বিজানতো ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষু বেদেষু তাবানর্থঃ ।

অর্থাৎ সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে উদপানে অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয়ে যাবৎ প্রয়োজন, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠের সমস্ত বেদে তাবৎ প্রয়োজন ।

মহামহোপাধ্যায় প্রাচীন ঋষিতুল্য ভাষ্যকার টীকাকারেরা যে এই সহজ অর্থের প্রতি দৃষ্টি করেন নাই, আমার এরূপ বোধ হয় না । আমার বোধ হয় যে, তাঁহারা এই অর্থের প্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি করিয়াছেন এবং অতিশয় দূরদর্শী দেশকালপাত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াই এই সহজ অর্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন । দুইটা ব্যাখ্যার প্রকৃত তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন । শেষে কথিত এই সহজ ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য কি ? সর্ব্বত্র জলপ্লাবিত হইলে ক্ষুদ্র জলাশয়ে লোকের আর কি প্রয়োজন থাকে ? কোন প্রয়োজনই থাকে না । কেন না, সর্ব্বত্র জলপ্লাবিত—সকল ঠাঁইই জল পাওয়া যায় । ঘরে বসিয়া জল পাইলে কেহ আর বাপী কূপাদিতে যায় না । তেমনি যে ঈশ্বরকে জানিয়াছে, তাহার পক্ষে সমস্ত বেদে আর কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই । এখন বেদে কিছু প্রয়োজন নাই, এমন কথা, আমরা উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ শিষ্য, আমরা না হয় সাহস করিয়া বলিতে পারি, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য, কি শ্রীধর স্বামী এমন কথা কি বলিতে পারিতেন ? বেদ স্বয়ম্ভুব, অপৌরুষেয়, নিত্য, সর্ব্বফলপ্রদ । প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা বেদকেই একটা ঈশ্বরস্বরূপ খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন । কপিল ঈশ্বর পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু বেদ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই । বৃহস্পতি বা শাক্যসিংহ প্রভৃতি যাঁহারা বেদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দু-সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন । অতএব শঙ্করাচার্য্য, কি শ্রীধর স্বামী হইতে এমন উক্তি কখন সম্ভবে না যে, ব্রহ্মজ্ঞানই হউক বা যেই হউক, কাহারও পক্ষে বেদ নিষ্প্রয়োজনীয় । কাজেই তাঁহাদিগকে এমন একটা অর্থ করিতে হইয়াছে যে, তাহাতে বুঝায় যে, ব্রহ্মজ্ঞানেও যা, বেদেও তা, একই ফল তাহা হইলে বেদের মর্য্যাদা বাহাল রহিল । শেষে যে ব্যাখ্যা লিখিত হইল, তাহার অর্থ যে, ব্রহ্মজ্ঞানের তুলনায় বেদজ্ঞান অতি তুচ্ছ । এক্ষণে সেই "সর্ব্বেষু বেদেষু" অর্থে "বেদোক্তেষু কর্ম্মসু" "বেদশব্দেনাত্র কর্ম্মকাণ্ডমেব গৃহ্যতে ।" ইত্যাদি বাক্য পাঠক স্মরণ করুন । প্রাচীন টীকাকারদিগের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন ।

এক্ষণে পাঠকের বিচার্য্য এই যে, দুইটা ব্যাখ্যা, তাহার মধ্যে একটার জন্য মূল কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করিতে হয় না ; যেমন আছে, তেমনি ব্যাখ্যা করিলেই সেই অর্থ পাওয়া যায় । কিন্তু সে ব্যাখ্যার পক্ষে কেহই সহায় নাই । আর একটা ব্যাখ্যার জন্য কিছু নূতন কথা বসাইয়া কিছু কাটকুট করিয়া লইতে হয় । কিন্তু সমস্ত টীকাকার,

ভাষ্যকার ও অনুবাদক এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী সেই ব্যাখ্যার পক্ষে। কোন্ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা উচিত? আমার কোন দিকেই অনুরোধ নাই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেমন বুঝিয়াছি, সেইরূপ বুঝাইলাম। দুই দিক্ই বুঝাইলাম, পাঠকের যে ব্যাখ্যা সঙ্গত বোধ হয়, তাহাই অবলম্বন করিবেন। অভিনব ব্যাখ্যার সমর্থন জন্য আরও কিছু বলা যাইতে পারে, কিন্তু ততটা প্রয়াস পাইবার বিষয় কিছু দেখা যায় না। বৈদিক ধর্মের সঙ্গত গীতোক্ত ধর্মের কি সম্বন্ধ, পাঠক তাহা বুঝিলেই হইল। সে সম্বন্ধ কি, পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি।

তৃতীয়, ইংরাজি অনুবাদকেরা এই শ্লোকের আর এক প্রকার অর্থ করিয়াছেন। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোকে সতি উদপানে যাবানর্থঃ, এরূপ না বুঝিয়া, তাঁহারা বুঝেন, সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে উদপানে যাবানর্থঃ ইত্যাদি। অর্থাৎ "সংপ্লুতোদকে" পদ "উদপানের" বিশেষণ মাত্র। অন্য ইংরাজি অনুবাদকগণের প্রতি পাঠকগণের শ্রদ্ধা হউক বা না হউক কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা হইতে পারে। তিনি এই শ্লোকের অনুবাদ করিয়াছেন—

"To the instructed Brahmana there is in all the Vedas as much utility as in a reservoir of water into which waters flow from all sides."

দুঃখের বিষয় কেবল এই যে, ইহার অর্থ হয় না। কিছু তাৎপর্য্য নাই। অনুবাদকও তাহা অগত্যা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এই শ্লোকের একটি টীকা লিখিয়া, তাহাতে বলিয়াছেন—

"The meaning here is not easily apprehended. I suggest the folloging explanation ;—Having said that the Vedas are concerned with actions for special benefits, Krisna compares them to a reservoir which provides water for various special purposes—drinking, bathing &c. The Vedas similarly prescribe particular rites and ceremonies for going to heaven, or destroying an enemy &c. But, says Krishna, man's duty is merely to perform the actions prescribed for him among these, and not entertain desires for the special benefits named.

তেলাঙ্গের পর আর কোন ইংরেজি অনুবাদকের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজনীয় হইতে পারে না। ইহাই বলা যথেষ্ট যে, Davis ও Thomson প্রভৃতি সাহেবরা তেলাঙ্গের ন্যায় অর্থ করিয়াছেন। তবে তাঁহারা সেই অনুবাদের সঙ্গে যে একটু একটু টীকা সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে আরও রস আছে। Thomson কৃত টীকাটুকু পাঠককে উপহার দিলেই যথেষ্ট হইবে। তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

"As a tank full of fresh water may be used for drinking, bathing, washing one's clothes and numerous other purposes, so the text of the Vedas may be turned to any object of self-interest by a Brahmin who is well acquainted with them and knows how to wield them.

We may exemplify this general fact by the uses made of texts from our scriptures in the mouths of the Puritans on the one hand, and of the Cavaliers on the other. Our author must not, however, be understood to reject the use of the Vedas by what he here says. He merely advises a careful use of them. Kapila himself admits them as a last source of proof of the truth when others fail."

আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি গীতার মর্ম্মার্থ বুঝিতে বা বুঝাইতে যে অক্ষম, আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। তবে "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য' ইত্যাদি বাক্য স্মরণ করিয়াই স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু আমি বুঝাইতে পারি বা না পারি, প্রাচীন ভাষ্যকারদিগের যে সকল মহদ্বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি, অন্ততঃ তাহা হইতে পাঠক ইহার মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারিবেন, এমত ভরসা আছে। কিন্তু তাহাতেও বুঝুন বা না বুঝুন, পাঠকের কাছে যুক্তকরে এই নিবেদন করি যে, ইংরেজের কাছে গীতার্থ বুঝিবার জন্য না যান। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীকে ইংরেজের কৃত গীতানুবাদ পড়িতে দেখিয়াছি বলিয়াই এ কথা বলিতেছি ; এবং সেই প্রবৃত্তির বিনাশের জন্যই এতটা ইংরেজি এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

প্রবাদ আছে যে, পুরাণাদি প্রণয়নের পর ব্যাসদেব এক দিন সমুদ্রতীরে উপবেশন করিয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন। সমুদ্রে বৃহৎ বৃহৎ উর্ম্মিমালার মত তাঁহার মানস-সমুদ্রে গুরুতর চিন্তা উঠিয়া মনকে অশান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সময়ে দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। নারদের নিকট ব্যাসদেব মনের অবস্থা বিবৃত করেন ; বলেন,—প্রভু, জগতের হিতার্থ আমি সাধারণের দুর্ব্বোধ্য বেদোক্ত ধর্ম্মকে সহজ করিয়া প্রচার করিয়াছি, গল্পচ্ছলে বেদোক্ত উপদেশ লইয়া পুরাণাদি প্রণয়ন করিয়াছি, ইহাতে আমার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছে। তথাপি আমার মনে হইতেছে, বুঝি আমার কর্ত্তব্য কিছুই করা হয় নাই, অথচ আর আমি কি করিব, নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। এই জন্য মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে—অশান্ত মনে সমুদ্রতীরে আসিয়াছি—দেব ! কোথায় আমার কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইয়াছে, আরও আমার কি কর্ত্তব্য বাকী আছে, নির্দ্দেশ করিয়া আমার এই অশান্ত মনে শান্তি প্রদান করুন। "ধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন ভক্তি জগতে প্রচার কর"—এই উপদেশ দিয়া দেবর্ষি অন্তর্হিত হইলেন। কথিত আছে যে, ব্যাসদেব তখন ভাগবত ও ভগবদ্গীতা প্রণয়ন করেন, আরও দুই একখানি পুরাণে ভক্তের আদর্শ অঙ্কন করেন। এই কারণে কেহ কেহ মহাভারত গীতার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, অনুমান করেন।

গীতাও ভাগবত ভক্তিপ্রধান গ্রন্থ। ব্যাসদেব বুঝিয়াছিলেন, ভক্তি জীবনের চরম উদ্দেশ্য, পরিত্রাণের একমাত্র উপায়।

কি কথাটা হইতেছিল, এক্ষণে একবার স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ভগবান্, অর্জ্জুনকে জ্ঞানযোগ বুঝাইয়া, "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে" ইত্যাদি বাক্যে বলিলেন যে, এখন তোমাকে কর্ম্মযোগ শুনাইব। তখন কর্ম্মযোগের কিছু প্রশংসা করিয়া, প্রথমতঃ একটা সাধারণ প্রচলিত ভ্রান্তির নিরাসে প্রবৃত্ত হইলেন। সে ভ্রান্তি এই যে, বেদোক্ত কাম্য

কর্ম্ম সকলেই লোকের চিত্ত নিবিষ্ট, তাদৃশ লোক ঈশ্বরে একাগ্রচিত্ত হইতে পারে না। তাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন যে, বেদ সকল "ত্রৈগুণ্যবিষয়," তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও বা বেদবিষয়কে অতিক্রম কর। কেন না, যেমন সর্ব্বত্র জলপ্লাবিত হইলে বাপী কূপ তড়াগাদিতে কাহারও প্রয়োজন হয় না, তেমনি যে ব্রহ্মনিষ্ঠ, বেদে আর তাহার প্রয়োজন হয় না। কর্ম্মযোগের সহিত বৈদিক কর্ম্মের সম্বন্ধরাহিত্য এইরূপে প্রতিপাদন করিয়া ভগবান্ এক্ষণে কর্ম্মযোগে কহিতেছেন :—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭ ॥

কর্ম্মে তোমার অধিকার, কিন্তু ফলে কদাচ (অধিকার) না হউক। তুমি কর্ম্মফলহেতু হইও না ; অকর্ম্মে তোমার আসক্তি না হউক। ৪৭।

এই শ্লোক বুঝিতে গেলে, "কর্ম্ম" কি, "কর্ম্মফলহেতু" কি, "অকর্ম্ম" কি, বুঝা চাই।

"কর্ম্ম কি" বুঝিলে, আর দুইটা বুঝা গেল। কর্ম্মফল যাহার প্রবৃত্তি হেতু, সেই "কর্ম্মফলহেতু"। কর্ম্মশূন্যতাই অকর্ম্ম। কর্ম্ম কি, তাহা পরে বলিতেছি।

অতএব শ্লোকের অর্থ এই যে, কর্ম্ম করিও, কিন্তু কর্ম্মফল কামনা করিও না। কর্ম্মফলপ্রাপ্তিই যেন তোমার কর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতু না হয়। কিন্তু কর্ম্মের ফলের প্রত্যাশা না থাকিলে কেহ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, এই জন্য শ্লোকশেষে তাহাও নিষিদ্ধ হইতেছে। বলা হইতেছে, ফল চাহি না বলিয়া কর্ম্মে বিরত হইও না। অর্থাৎ কর্ম্ম অবশ্য করিবে, কিন্তু ফল কামনা করিয়া কর্ম্ম করিবে না।

বোধ হয় এক্ষণে শ্লোকের অর্থ বুঝা গিয়াছে। ইহাই সুবিখ্যাত নিষ্কাম কর্ম্মতত্ত্ব। এরূপ উন্নত, পবিত্র এবং মনুষ্যের মঙ্গলকর মহামহিমময় ধর্ম্মোক্তি জগতে আর কখন প্রচারিত হয় নাই। কেবল ভগবৎপ্রসাদাৎই হিন্দু এরূপ পবিত্র ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিতে পারিয়াছে।

কিন্তু লাভ করিয়াও হিন্দুর পক্ষে ইহার বিশেষ ফলোপধায়িতা ঘটে নাই। তাহার কারণ, এমন কথাতেও আমাদের বুদ্ধিবিভ্রংশবশতঃ অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছে। আমরা আজিও ভাল করিয়া ইহা বুঝিতে পারি নাই।

আমি এমন বলিতেছি না যে, আমি ইহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছি বা পাঠককে সম্পূর্ণরূপে বুঝাইতে পারিব। ভগবান্ যাঁহাকে তাদৃশ অনুগ্রহ করিবেন, তিনিই ইহা বুঝিতে পারিবেন। তবে যতটুকু পারি, বুঝাইতে চেষ্টা করায় বোধ হয় ক্ষতি নাই।

ইহার প্রথম গোলযোগ কর্ম্ম শব্দের অর্থ সম্বন্ধে। যাহা করা যায় বা করিতে হয়, তাহাই কর্ম্ম, কর্ম্ম শব্দের এই প্রচলিত অর্থ। কিন্তু কতকগুলি হিন্দু শাস্ত্রকার বা হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার ইহাতে একটা গোলযোগ উপস্থিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের কৃপায় এ সকল স্থলে বুঝিতে হয়, কর্ম্ম অর্থে বেদোক্ত যজ্ঞাদি। কর্ম্ম মাত্রই কর্ম্ম নহে—বেদোক্ত অথবা শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞই কর্ম্ম।

যদি তাই হয়, তাহা হইলে এই শ্লোকের অর্থ এই বুঝিতে হয় যে, বেদোক্তাদি যজ্ঞাদি করিবে, কিন্তু সেই সকল যজ্ঞের ফল স্বর্গাদি, সেই স্বর্গাদির কামনা করিবে না।

এইরূপ অর্থ চিরপ্রচলিত বলিয়া সুশিক্ষিত ইংরেজিনবিশেরাও এইরূপ অর্থ বুঝিয়াছেন। সুপণ্ডিত কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্ ইহার পূর্ব্ব-শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, "The Vedas . . . prescribe particular rites and ceremonies for going to heaven or destroying an enemy &c. But, says Krishna, man's duty is merely to perform the actions prescribed for him among these, and not entertain desires for the special benefits named."

যদি কর্ম্ম শব্দের এই অর্থ হয়, তবে পাঠককে একটু গোলযোগে পড়িতে হইবে। পাঠক বলিবেন যে, যে কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি, অন্য কোন প্রয়োজন নাই, যদি সে ফলই কামনা না করিলাম, তবে সে কর্ম্মই করিব কেন? নিষ্কাম কাম্য কর্ম্ম কিরূপ? কাম্য কর্ম্ম নিষ্কাম হইয়াই বা করি কেন?

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্ম অর্থে বেদোক্তাদি কাম্য কর্ম্ম বুঝিলে আমরা কোন বোধগম্য তত্ত্বে উপস্থিত হইতে পারি না। আর বেদোক্ত কাম্য কর্ম্ম গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মের উদ্দিষ্ট নহে, তাহা গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় অতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ঐ তৃতীয় অধ্যায়ের নামই "কর্ম্মযোগ"। ইহাতে কর্ম্মসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥

"কেহ কখন ক্ষণমাত্র কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না; কেন না, প্রকৃতিজ বা স্বাভাবিক গুণে সকলেই কর্ম্ম করিতে বাধ্য করে।"

এখন দেখা যাইতেছে, বেদোক্ত যজ্ঞাদি সম্বন্ধে এ কথা কখনই বলা যায় না। কেবল সচরাচর যাহাকে কর্ম্ম বলি—যাহাকে ভাষায় কাজ এবং ইংরেজিতে action বলে, তাহার সম্বন্ধেই কেবল এ কথা বলা যাইতে পারে। কেহ কখন কাজ না করিয়া থাকিতে পারে না, অন্য কোন কাজ না করুক, স্বভাব বা প্রকৃতির (Nature) বশীভূত হইয়া কতকগুলি কাজ অবশ্য করিতে হইবে। যথা,—অয়ন, বসন, শয়ন, শ্বাস, প্রশ্বাস ইত্যাদি। অতএব স্পষ্টই কর্ম্ম শব্দে বাচ্য, যাহাকে সচরাচর কর্ম্ম বলা যায়, তাহাই; যজ্ঞাদি নহে।

পুনশ্চ ঐ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে কথিত হইতেছে—

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥

"তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর; কর্ম্ম অকর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ; অকর্ম্মে তোমার শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হইতে পারিবে না।"

এখানেও নিশ্চিত কর্ম্ম সর্ব্ববিধ কর্ম্ম বা 'কাজ';—যজ্ঞাদি নহে। যজ্ঞাদি ব্যতীত সকলেরই শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে ও হইয়া থাকে, কেবল কাজ বা action, যাহাকে সচরাচর কর্ম্ম বলা যায়, তাহা ভিন্ন শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না।

এবংবিধ প্রমাণ গীতা হইতে আরও উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।* প্রমাণ নির্দ্দোষ হইলে, এক প্রমাণই যথেষ্ট। অতএব আর নিষ্প্রয়োজনীয়!

অতএব ইহা সিদ্ধ যে, কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যায় কর্ম্ম অর্থে সচরাচর যাহাকে কর্ম্ম বলা যায়, অর্থাৎ কাজ বা action, তাহাই ভগবানের অভিপ্রেত;—বৈদিক যজ্ঞাদি নহে।

তাহা হইলে এই ৪৭ শ্লোকের অর্থ এই হইতেছে যে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল করিতে হইবে। কিন্তু তাহার ফল কামনা করিবে না, নিষ্কাম হইয়া করিবে। এক্ষণে এই মহাকাব্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

ইহার ভিতর দুইটি আজ্ঞা আছে—প্রথম, কর্ম্ম করিতে হইবে। দ্বিতীয়, সকল কর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া করিতে হইবে। এক একটি করিয়া বুঝা যাউক। প্রথম, কর্ম্ম করিতে হইবে।

কর্ম্ম করিতে হইবে কেন? তৃতীয়াধ্যায়ের যে দুই শ্লোক উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই উহা বুঝান হইয়াছে। কর্ম্ম আমাদের জীবনের নিয়ম—Law of Life—কর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারে না। সকলেই প্রকৃতিজ গুণে কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। কর্ম্ম না করিলে শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হয় না। কাজেই সকলকে কর্ম্ম করিতে হইবে।

কিন্তু সকল কর্ম্মই কি করিতে হইবে? কতকগুলি কর্ম্মকে আমরা সৎকর্ম্ম বলি, কতকগুলিকে অসৎকর্ম্ম বলি। অসৎকর্ম্মও করিতে হইবে?

অসৎকর্ম্ম আমাদের জীবন নির্ব্বাহের নিয়ম নহে—ইহা আমাদের Law of Life নহে। অসৎকর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল থাকিতে পারে না, এমন নহে—অসৎকর্ম্ম না করিলে কাহারও শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের বিঘ্ন হয় না। চুরি বা পরদার না করিয়া কেহ যে বাঁচিতে পারে না এমন নহে। সুতরাং অসৎকর্ম্ম করিতে হইবে না। তৃতীয় অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত ঐ দুই শ্লোক হইতে বুঝা যাইতেছে, পশ্চাৎ আরও বুঝা যাইবে।

পক্ষান্তরে ইহাও জিজ্ঞাসিত হইতে পারে যে, যাহাকে সৎকর্ম্ম বলি, তাহাই কি আমাদের জীবনযাত্রার নিয়ম? আমরা কতকগুলিকে সৎকর্ম্ম বলি, যথা—পরোপকারাদি; আর কতকগুলিকে অসৎকর্ম্ম বলি, যথা—পরদারগমনাদি; আর কতকগুলিকে সদসৎ কিছুই বলি না, যথা, শয়ন ভোজনাদি। ভাল বুঝা গিয়াছে যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মগুলি করিবার প্রয়োজন নাই; এবং তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মগুলি না করিলে নয়,

---

* পক্ষান্তরে অষ্টমাধ্যায়ে, "ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ" ইতি বাক্যও আছে। তাহার প্রচলিত অর্থ যজ্ঞ পক্ষ বটে। কিন্তু সেই প্রচলিত অর্থও যে ভ্রমাত্মক, বোধ করি পাঠক তাহা পশ্চাৎ বুঝিতে পারিবেন। আমি বুঝাইব, এমন কথা বলি না—পাঠক সহজেই বুঝিবেন। এবং ইহাও স্বীকার করিতে আমি বাধ্য যে, কখন কখন গীতাতেও কর্ম্ম শব্দে বৈদিক কাম্য কর্ম্ম বুঝায়, যথা—এই যে অধ্যায়ের ৪৯ শ্লোকে, "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম"। কিন্তু এখানেও স্পষ্টই বুঝা যায়, এ "কর্ম্মের" সঙ্গে কর্ম্মযোগের বিরুদ্ধভাব। গীতায় অনেকগুলি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

সুতরাং করিতে হইবে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মগুলি করিব কেন? সৎকর্ম্ম মনুষ্য-জীবনের নিয়ম কিসে?

এ কথার উত্তর আমার প্রণীত ধর্ম্মতত্ত্ব নামক গ্রন্থে সবিস্তারে দিয়াছি, সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। আমি সেই গ্রন্থে বুঝাইয়াছি যে, যাহাকে আমরা সৎকর্ম্ম বলি, তাহাই মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান। অতএব ইহা মনুষ্যজীবন নির্ব্বাহের নিয়ম।

বস্তুতঃ কর্ম্মের এই ত্রিবিধ প্রভেদ করা যায় না। যাহাকে সৎকর্ম্ম বলি, আর যাহাকে সদসৎ কিছুই বলি না, অথচ করিতে বাধ্য হই, এতদুভয়ই মনুষ্যত্ব পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই জন্য এই দুইকে আমি ধর্ম্মতত্ত্বে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়াছি। এই টীকাতেও বলিতে থাকিব।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় এবং কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় নহে, তাহার মীমাংসা কে করিবে? মীমাংসার স্থূল নিয়ম এই, গীতাতেই কথিত হইয়াছে, পশ্চাৎ দেখিব; এবং সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া আমি উক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রন্থে এ তত্ত্ব কিছু দূর মীমাংসা করিয়াছি।

এই শ্লোকোক্ত প্রথম বিধি, "কর্ম্ম করিবে" তৎসম্বন্ধে এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলিয়া দ্বিতীয় বিধি সামান্যতঃ বুঝাইব। দ্বিতীয় বিধি এই যে, যে কর্ম্ম করিবে, তাহা নিষ্কাম হইয়া করিবে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক।

পরোপকার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। অনেকে পরোপকার এইরূপ অভিপ্রায়ে করিয়া থাকে যে, আমি যাহার উপকার করিলাম, সে আমার প্রত্যুপকার করিবে। ইহা সকাম কর্ম্ম। ইহা এই বিধির বহির্ভূত।

অনেকে এই অভিপ্রায়ে দানাদির দ্বারা পরোপকার করে যে, ইহাতে আমার পুণ্য-সঞ্চয় হইয়া তৎফলে স্বর্গাদি লাভ হইবে। ইহাও সকাম কর্ম্ম, এবং এই বিধির বহির্ভূত।

অনেকে এইরূপ অভিপ্রায়ে পরোপকার করিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর ইহাতে আমার উপর প্রসন্ন হইবেন, এবং প্রসন্ন হইয়া আমার মঙ্গল করিবেন। তাহা হইতে পারে; ঈশ্বর প্রসন্ন হইবেন সন্দেহ নাই এবং পরোপকারীর মঙ্গলও করিতে পারেন; কিন্তু ইহা নিষ্কাম কর্ম্ম নহে। ইহা সকাম, এবং এই বিধির বহির্ভূত।

নিষ্কামকর্ম্মী তাহাও চাহে না, কিছুই চাহে না, কেবল আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিতে চাহে। পরোপকার আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম—এই জন্য আমি করিব, কোন ফলই চাই না। ইহা নিষ্কাম চিত্তভাব।

ধর্ম্মতত্ত্বে আমি আর আর উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়াছি যে, সকল প্রকার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মই নিষ্কাম হইতে পারে। অতএব পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

নিষ্কাম কর্ম্ম সম্বন্ধে এইটি প্রথম কথা। এ তত্ত্ব ক্রমশঃ আরও পরিস্ফুট ও বিশদ হইবে।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

হে ধনঞ্জয়! যোগস্থ হইয়া "সঙ্গ" ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কর। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান করিয়া (কর্ম্ম কর)। (এইরূপ) সমত্বকে যোগ বলে। ৪৮।

পূর্ব্বশ্লোকে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য যে কর্ম্ম, তাহাই বিহিত হইয়াছে। এক্ষণে সেইরূপ কর্ম্ম করার পক্ষে তিনটি বিধি নির্দ্দিষ্ট হইতেছে—

প্রথম, যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবে।

দ্বিতীয়, সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবে।

তৃতীয়, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে তুল্যজ্ঞান করিবে।

ক্রমশঃ এই তিনটি বিধি বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

প্রথম যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবে। যোগ কি? যোগ শব্দ গীতায় স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পাঠককে বুঝাইতে হইবে না যে, যাহাকে পতঞ্জলি ঠাকুর "চিত্তবৃত্তিনিরোধ" বলিয়াছেন, সেরূপ কথা হইতেছে না।

এখানে "যোগ" শব্দের অর্থে শ্রীধর স্বামীর মতে "পরমেশ্বরৈকপরতা।" শঙ্করাচার্য্যও তাহাই বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন, "যোগস্থ সন্ কুরু কর্ম্মাণি কেবলমীশ্বরার্থম্"। কিন্তু শ্লোকের শেষাংশের ব্যাখ্যাকালে তিনি বলিয়াছেন, "কোঽসৌ যোগো যত্রস্থঃ কুর্ব্বিত্যুক্ত-মিদমেব তৎ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্বং যোগ উচ্যতে।"

স্থূল কথা, যোগ কি, তাহা যখন এই শ্লোকেই ভগবান্ বুঝাইয়াছেন, তখন আর ভিন্ন অর্থ খুঁজিবার প্রয়োজন কি? সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যে সমত্বজ্ঞান, তাহাই যোগ। তৃতীয় বিধি বুঝিলেই তাহা বুঝিব। তৃতীয় বিধি, প্রথম বিধির সম্প্রসারণ মাত্র। সম্প্রসারণকে পুনরুক্তি বলা যায় না।

তৃতীয় বিধির আগে দ্বিতীয় বিধি বুঝা যাউক। "সঙ্গ" ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবে। সঙ্গ কি? শ্রীধর বলেন, "কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশঃ।" আমি কর্ত্তা, এই অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ঈশ্বরাশ্রয়ে অর্থাৎ ঈশ্বরই কর্ত্তা, ইহা জানিয়া কর্ম্ম করিবে।

শঙ্কর বলেন, "যোগস্থঃ সন্ কুরু কর্ম্মাণি, কেবলমীশ্বরার্থং তত্রাপীশ্বরো মে তুষ্যত্বিতি সঙ্গং ত্যক্ত্বা," কেবল ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিবে, কিন্তু ঈশ্বর তজ্জন্য আমার শুভ করুন, এরূপ কামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবে। ফলে, ফলকামনা ত্যাগই সঙ্গত্যাগ, এইরূপ অর্থে "সঙ্গ" শব্দ পুনঃ পুনঃ গীতায় ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখা যায়।

এক্ষণে তৃতীয় বিধি বুঝা যাউক। কর্ম্মসিদ্ধি, এবং কর্ম্মের অসিদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে, এই সমত্বজ্ঞানই যোগ। এই কথা জ্ঞানবাদী শঙ্করাচার্য্য যেরূপ বুঝাইয়াছেন, আমাদের মত অজ্ঞানীদিগের সেরূপ বুঝায় বিশেষ লাভ নাই। তাঁহার মত এই যে, জ্ঞানপ্রাপ্তি কর্ম্মের সিদ্ধি। তাই তিনি বলেন যে, "সত্ত্বশুদ্ধিজা জ্ঞানপ্রাপ্তিলক্ষণা সিদ্ধিঃ"। এবং "তদ্বিপর্য্যয়জা অসিদ্ধি"। শ্রীধর ঠাকুরও এখানে শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী। তিনি বলেন "কর্ম্মফলস্য জ্ঞানস্য সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ" ইত্যাদি।

এখন জ্ঞান, কর্ম্মের ফল কি না, সে বিচারের প্রয়োজন নাই। স্থানান্তরে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আপাততঃ যে কথাটা উপস্থিত, তাহার সোজা অর্থ বুঝিতে পারিলে আমাদিগের পরম লাভ হইবে। টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী সেই সোজা অর্থ বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, "সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বেতি ফলসিদ্ধৌ হর্ষং ফলাসিদ্ধৌ চ বিষাদং ত্যক্ত্বা" ইত্যাদি। ফলসিদ্ধিতে হর্ষত্যাগ এবং ফলের অসিদ্ধিতে বিষাদত্যাগ, ইহাই সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমত্বজ্ঞান। সাধারণ পাঠকের ইহাই সঙ্গত অর্থ বলিয়া বোধ

হইবে। যে নিষ্কাম, ফলকামনা করে না, তাহার ফলসিদ্ধিতে হর্ষ হইতে পারে না এবং অসিদ্ধিতে বিষাদ জন্মিতে পারে না। যত দিন সে ফলসিদ্ধিতে আনন্দ লাভ করে, তত দিন বুঝিতে হইবে যে, সে ফলকামনা করে—কেন না, ফলকামনা না করিলে ফলসিদ্ধিতে হর্ষলাভ করিবে কেন। কর্ম্মকারী নিষ্কাম হইলে, তাহার ফলসিদ্ধিতে হর্ষ নাই বা অসিদ্ধিতে দুঃখ নাই। তাহার পক্ষে অসিদ্ধি ও সিদ্ধি সমান। এই সমত্বজ্ঞানই যোগ। তাদৃশ যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর, ইহাই প্রথম বিধি।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ॥ ৪৯॥

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগ হইতে কর্ম্ম অনেক নিকৃষ্ট। বুদ্ধিতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। যাহারা সকাম, তাহারা নিকৃষ্ট। ৪৯।

বুদ্ধিযোগ কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্বে কথিত হয় নাই। শ্রীধর বলেন, ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি-যুক্ত কর্ম্মযোগই বুদ্ধিযোগ। শঙ্কর বলেন, সমত্ববুদ্ধি। সমত্বং যোগ উচ্যতে। তাহা হইতে কর্ম্ম অনেক নিকৃষ্ট যখন বলা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইতে, এখানে কর্ম্ম শব্দে কাম্য কর্ম্ম। ভাষ্যকারেরা এইরূপ বলেন। অতএব শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের অর্থ এই যে, যে কর্ম্মযোগের কথা বলিলাম, তাহা হইতে কাম্য কর্ম্ম অনেক নিকৃষ্ট।

শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বলা হইতেছে যে, বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ কর বা বুদ্ধির অনুষ্ঠান কর। ইহাতে এখানে "বুদ্ধি" শব্দে ঐ বুদ্ধিযোগই বুঝিতে হয়। ভাষ্যকারেরা বলেন, সংখ্যাবুদ্ধি বা জ্ঞান। যদি তাই হয়, তবে প্রথমার্দ্ধেও বুদ্ধি শব্দে জ্ঞান বুঝাই উচিত। তাহা হইলে তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে "জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন" ইত্যাদি বাক্যে আর কোন গোলযোগ হইবে না। কিন্তু পরবর্ত্তী ৫০ শ্লোকে কিন্তু গোলযোগ বাধিবে।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্॥ ৫০॥

যিনি বুদ্ধিযুক্ত, ইহজন্মে তিনি সুকৃত দুষ্কৃত উভয়ই পরিত্যাগ করেন। তজ্জন্য তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর। কর্ম্মে কৌশলই যোগ। ৫০।

"বুদ্ধিযুক্ত"—অর্থাৎ বুদ্ধিযোগে যুক্ত। যে সকল কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি, তাহাই সুকৃত; আর যে সকল কর্ম্মের ফল নরকাদি, তাহাই দুষ্কৃত। যিনি বুদ্ধিযুক্ত, তিনি যাহাতে স্বর্গাদি বা নরকাদি প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ উভয়বিধ কর্ম্মই পরিত্যাগ করেন। ইহার তাৎপর্য্য এমন নহে যে, তিনি কোন প্রকার সৎকর্ম্ম করেন না, অথবা ভাল মন্দ কোন কর্ম্মই করেন না। ইহার অর্থ এই যে, তিনি স্বর্গাদি কামনা বা নরকাদি ভয়ে কোন কর্ম্ম করেন না। যাহা করেন, তাহা অনুষ্ঠেয় বলিয়া করেন।

অতএব তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর। কর্ম্মে কৌশলই যোগ। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা এ কথায় অর্থ করিয়াছেন যে, কর্ম্ম বন্ধনজনক; কেন না, কর্ম্ম করিলেই পুনশ্চ জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার ফলভোগ করিতে হয়। কিন্তু তাদৃশ বন্ধনকেও যদি ঈশ্বরারাধনার সাহায্যে মুক্তির উপায়ে পরিণত করিতে পারা যায়, তবে তাহাকেই কর্ম্মের কৌশল বা চাতুর্য্য বলা যায়।

উনবিংশ শতাব্দীতে আমরা এরূপ বুঝিতে প্রস্তুত নহি। আমরা বুঝি, যিনি কর্ম্মে কুশলী, অর্থাৎ আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মসকল যথাবিহিত নির্ব্বাহ করেন, তিনিই যোগী। কর্ম্মে তাদৃশ কৌশল বা বিহিত অনুষ্ঠানই যোগ। "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।" এ কথার এই অর্থই সহজ এবং সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যেখানে সহজ অর্থ আছে, সেখানে ভাষ্যকার মহামহোপাধ্যায়দিগকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া, আমরা সেই সহজ অর্থেরই অনুবর্ত্তী হইব।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যানাময়ম্॥ ৫১॥

বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ কর্ম্মজনিত ফল ত্যাগ করিয়া, জন্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া অনাময় পদ প্রাপ্ত হয়েন। ৫১।

"বুদ্ধিযুক্ত"—বুদ্ধিযোগাবলম্বী।

অনাময় পদ—সর্ব্বোপদ্রবশূন্য বিষ্ণুপদ। (শ্রীধর)

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥ ৫২॥

যবে তোমার বুদ্ধি মোহকানন অতিক্রম করিবে, তবে তুমি শ্রোতব্য এবং শ্রুত বিষয় সকলে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে। ৫২।

এই ফলকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক অনাময় পদ কিসে পাওয়া যায়? যখন মোহ বা দেহাভিমান হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তখন সমস্ত শ্রুত বা শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগ্য বা কামনাশূন্যতা জন্মে। স্বর্গাদি সুখ বা রাজ্যাদি সম্পদ্, কোন বিষয়েরই কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইতে হয় না।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি॥ ৫৩॥

তোমার "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না" বুদ্ধি যখন সমাধিতে নিশ্চলা, (সুতরাং) অচল হইয়া থাকিবে, তখন যোগ প্রাপ্ত হইবে। ৫৩।

"শ্রুতিবিপ্রতিপন্না"। বিপ্রতিপন্ন অর্থে বিক্ষিপ্ত।* কিন্তু শ্রুতি কি? শ্রুতি, যাহা শুনা গিয়াছে—আর শ্রুতি, বেদকে বলে। বেদ বুদ্ধিবিক্ষেপের কারণ হইতে পারে, ইহা প্রাচীন ভাষ্যকারেরা স্বীকার করিতে পারেন না; সুতরাং এখানে শ্রুতি শব্দে "যাহা শুনা গিয়াছে," তাঁহারা এইরূপ অর্থ করেন। রামানুজের মত সোজা—শ্রুতি, শ্রবণ মাত্র। মধুসূদন আর একটু বেশী বলেন, "নানাবিধ ফলশ্রবণই" শ্রুতি। শঙ্করাচার্য্য তাই বলেন, তবে তাঁহার মার্জ্জিত লেখনীর শব্দের ছটাটা বেশীর ভাগ। তিনি বলেন, "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না অনেকসাধ্যসাধনসম্বন্ধপ্রকাশনশ্রুতিভিঃ শ্রবণৈর্ব্বিপ্রতিপন্না।" শ্রীধর স্বামী সকলের অপেক্ষা একটু সাহস করিয়াছেন—তিনি বলেন, "নানালৌকিকবৈদিকার্থ শ্রবণৈর্ব্বিপ্রতিপন্না।"

ইংরেজ গীতার কিছুই বুঝে না—বুঝিবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু অনেক সময়ে

* *Anglice*—distracted.

পণ্ডিত, মূর্খের কথাও শুনায় ক্ষতি বোধ করে না। Davis সাহেব এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

সাহেব প্রথমে একটু আপনার বড়াই করিতেছেন—

"I, too, have consulted Hindu Commentators largely (কদাচিৎ) and have found them deficient in critical insight and more intent on finding or forming Vedantist doctrines in every part than in giving the true sense of the author. (শাঙ্কর ভাষ্য সম্বন্ধে অনেক দেশী লোকও এ কথা বলিয়া থাকেন)। I have examined their explanations with the freedom of inquiry that is common to western habits of thought, and thus while I have sometimes followed their guidance, I have been obliged to reject their comments as misrepresenting the doctrine of the author. I append some instances of this kind, that my readers may be able to form their own judgment."

এই বলিয়া সাহেব, দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই শ্লোককেই উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি শ্রুতি শব্দে 'বেদ' এই অর্থ করেন। এবং উপরিলিখিত উক্তির পোষকতায় বলেন যে—

"Here the reference is to *Sruti* which means (1) hearing, (2) revelation. Hindu commentators say that the meaning is, what you have heard, about the means of obtaining desirable things; assuming as a certain proposition that the Vedas could not be attacked. The doctrine of the Bhagavadagita is, however, that the devotee (*yogin*), when fixed in meditation lays aside the Vedas and Vedic ritual."

ডেবিস এক জন ক্ষুদ্র প্রাণী—তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া কাগজ নষ্ট করিবার প্রয়োজন ছিল না। তবে এই মতটা ইউরোপের এক জন পণ্ডিতশ্রেষ্ঠের—খোদ লাসেনের। তিনিও "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না" পদের ঐরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। আর আর ক্ষুদ্র অনুবাদকেরা তাঁহার পথে গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ডেবিসের আত্মশ্লাঘার ভিতর একটি অমূল্য কথা আছে—সেই অমূল্য তত্ত্ব ভারতবর্ষে ইদানীং ছিল না ও এখনও নাই। "FREEDOM OF ENQUIRY"—এই অমূল্য বাক্যের অনুরোধেই আমরা তাঁহার ন্যায় লেখকের আত্মশ্লাঘা উদ্ধৃত করিতে কুণ্ঠিত হইলাম না।

বেদ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ মত আমরা বুঝিয়াছি বা বুঝাইয়াছি, তাহার সঙ্গে দেশী মতের অপেক্ষা বিলাতী মতটা বেশী সঙ্গত। তবে পাঠক ইচ্ছা করিলে শ্রীধর স্বামীকে এখানে বিলাতী দলে টানিয়া লইতে পারেন।

এই শ্লোকে "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না" ভিন্ন আর একটি মাত্র পদ বুঝাইবার প্রয়োজন। যাহাতে চিত্ত সমাহিত হয়, তাহাই "সমাধি"।

এক্ষণে অনুবাদ পাঠ করিলে, পাঠক বোধ হয় শ্লোকার্থ বুঝিতে পারিবেন।

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন,—

হে কেশব! যিনি সমাধিস্থ হইয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহার কি লক্ষণ? স্থিতধী ব্যক্তি কি বলেন, কিরূপে অবস্থান করেন, কিরূপে চলেন? । ৫৪ ।

ইতিপূর্ব্বে সাংখ্যযোগ কহিয়া, ভগবান্ এক্ষণে অর্জ্জুনকে কর্ম্মযোগ বুঝাইলেন। কর্ম্মযোগের শেষ কথা এই বলিয়াছেন যে, কর্ম্মফল সম্বন্ধে যাহা (বেদেই হউক, অন্যত্রই হউক) শুনিয়াছ, তাহাতে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। যত দিন সেরূপ থাকিবে, তত দিন তুমি কর্ম্মযোগ প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু যখন তোমার বুদ্ধি সমাধিতে (পরমেশ্বরে) স্থির হইবে, তখন তুমি যোগ প্রাপ্ত হইবে। যাহার এইরূপ বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বা স্থিতধী বলা যায়। অর্জ্জুন এক্ষণে সেই সমাধিস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

যখন সকল প্রকার মনোগত কামনা বর্জ্জিত হয়, আপনাতে বা (আত্মাতে) আপনি তুষ্ট থাকে, তখন স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। ৫৫।

কামনার পূরণেই মানুষের সুখ দেখিতে পাই। যে কামনা ত্যাগ করিল, তাহার আর কি সুখ রহিল? শঙ্করাচার্য্য বলেন, পরমার্থদর্শনলাভে অন্য আনন্দ নিষ্প্রয়োজন। বেদে তাদৃশ ব্যক্তিকে "আত্মারাম" বলা হইয়াছে।

আমরা আর একটা সোজা উত্তরে সন্তুষ্ট। আমরা স্বীকার করি, পরমেশ্বরই আনন্দ। তিনিই পরমানন্দ। কিন্তু বহির্জগৎও ঈশ্বর হইতে বিযুক্ত নহে। কামনা-শূন্য হইলে বহির্বিষয়ে আনন্দ উপভোগ করা যাইবে না কেন? যে কামনাশূন্য, সে কি জগতের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হয় না? না, জ্ঞানার্জ্জনে আনন্দ লাভ করে না? না সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে প্রফুল্ল হয় না? কর্ম্মের অনুষ্ঠানই আনন্দময়—তাহার উপর সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্যজ্ঞান থাকিলে, সে আনন্দের আর কখন লাঘব হয় না; এবং এইরূপ আনন্দ আত্মাতেই; কাহারও সাপেক্ষ নহে।

যিনি এই কথাটা তলাইয়া না বুঝিবেন, তিনি গীতার এই সকল উক্তি, এই শ্লোক এবং ইহার পরবর্ত্তী কয়টি শ্লোক Ascetic Philosophy বলিয়া গণ্য করিবেন। বস্তুতঃ ইহা Asceticism নহে। সংসারে যে কিছু সুখ আছে, তাহার নির্ব্বিঘ্নে উপভোগের এই তত্ত্বই উপযোগী। সংসারে উপভোগ্য যে কিছু সুখ আছে, তাহার উপভোগের বিঘ্ন কামনা ও ইন্দ্রিয়াদির প্রাবল্য। তাহার বশবর্ত্তী হইলে সাংসারিক সুখসকলের উপ-ভোগের আর কোন বিঘ্ন থাকে না, সংসার পবিত্র ও সুখময় কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য মৎপ্রণীত অনুশীলনতত্ত্বে (ধর্ম্মতত্ত্ব প্রথম ভাগ) আমি

বিশেষ যত্ন পাইয়াছি, সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। পরবর্তী শ্লোক সকলে ইহা বিশেষ প্রকারে পরিস্ফুট হইবে।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

দুঃখে যিনি অনুদ্বিগ্নমনা, সুখে যিনি স্পৃহাশূন্য, যাঁহার অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ আর নাই, তাঁহাকে স্থিতধী মুনি বলা যায়। ৫৬।

এ সকল Asceticism নহে, এই তত্ত্ব দুঃখনাশক, (সুতরাং) সুখবৃদ্ধির উপায়। দুঃখে যে কাতর হয়, সেই দুঃখী। দুঃখে যাহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, সে দুঃখজয়ী হইয়াছে, তাহার আর দুঃখ নাই। সুখে যাহার স্পৃহা, সে বড় দুঃখী; কেন না, সুখের স্পৃহা অনেক সময়েই ফলবতী হয় না, ফলবতী হইলেও আশানুরূপ ফল ফলে না; এই উভয় অবস্থাতেই সেই সুখস্পৃহা দুঃখে পরিণত হয়। অতএব সুখস্পৃহা কেবল দুঃখবৃদ্ধির কারণ। ভয়, ক্রোধ দুঃখের কারণ, ইহা বলা বাহুল্য। অনুরাগ অর্থে এখানে সকল প্রকার অনুরাগ বুঝা উচিত নহে। যথা ঈশ্বরানুরাগ—ইহা কখন নিষিদ্ধ হইতে পারে না। অনুরাগ অর্থে এখানে কেবল কাম্য বস্তুতে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগ্যাদি বস্তুতে অনুরাগই বুঝিতে হইবে। তাদৃশ বিষয় সকলে অনুরাগ যে দুঃখের কারণ, তাহা আবার বলিতে হইবে না।

বলিতে কেবল বাকি আছে যে, সুখস্পৃহা ত্যাগ করিলেই সুখ ত্যাগ করা হইল না। এবং সুখস্পৃহাত্যাগ ভিন্ন, সুখভোগত্যাগ এখানে বিহিত হইতেছে না। যে সুখে স্পৃহাশূন্য, সে সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ করিতে পারে, এবং করিয়াও থাকে। স্বয়ং জগদীশ্বর সর্ব্বপ্রকার স্পৃহাশূন্য, অথচ অনন্ত সুখে সুখী। তবে মনুষ্য সম্বন্ধে এই আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, মনুষ্য সুখে স্পৃহাশূন্য হইলে, সুখলাভের চেষ্টা করিবে না, সুখলাভের চেষ্টা না করিলে, মনুষ্য সুখলাভ করে না। যিনি কর্ম্মযোগ বুঝিয়াছেন, তিনি কখন এই আপত্তি করিবেন না। কর্ম্মযোগের মর্ম্ম এই যে, নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিবে। কর্ম্মের ফলই সুখ—যে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সুনির্ব্বাহ করে সে তজ্জনিত সুখলাভও করে। যে কামনা বা স্পৃহার অধীন হইয়া কর্ম্ম করে, সে সুখলাভ করে না—কামনা ও স্পৃহা অননুষ্ঠেয় কর্ম্মের, সুতরাং পাপের ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। অতএব নিষ্কাম ও সুখে স্পৃহাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবে—সুখ আপনি আসিবে। ৭০ শ্লোকে ভগবান্ স্বয়ং তাহাই বলিয়াছেন, পরে দেখিব।

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্ ॥
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥

যিনি সর্ব্বত্র স্নেহশূন্য, তত্তদ্বিষয়ে শুভপ্রাপ্তিতে আনন্দিত বা অশুভপ্রাপ্তিতে বিদ্বেষযুক্ত হন না, তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ। ৫৭।

"সর্ব্বত্র স্নেহশূন্য।"—শ্রীধর বলেন, সর্ব্বত্র কি না "পুত্রমিত্রাদিষ্বপি।" শঙ্কর বলেন, "দেহজীবিতাদিষ্বপি"। শঙ্করের ব্যাখ্যাই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। দেহ জীবনাদির শুভাশুভে যাহার কোন আনন্দ বা বিদ্বেষ নাই, তাহারই বুদ্ধি যে ঈশ্বরে স্থির হইবার সম্ভাবনা, তাহা বুঝাইতে হইবে না।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥

কূর্ম্ম যেমন সকল বস্তু হইতে আপনার অঙ্গসকল সংহরণ করিয়া লয়, তেমনি যিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সকল সংহরণ করেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। ৫৮।

এই কথার উপর কোন টীকা চাহি না। ইন্দ্রিয়সংযম ভিন্ন কোন প্রকার ধর্ম্মাচরণ নাই, ইহা সকল ধর্ম্মগ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা, সকল ধর্ম্মমন্দিরের প্রথম সোপান।* সর্ব্বশাস্ত্রেই আগে ইন্দ্রিয়সংযমের কথা। কেবল এই কূর্ম্মের উপমার প্রতি একটু মনোযোগ আবশ্যক। কূর্ম্ম তাহার হস্তপদাদি সংহৃত করিয়া রাখে—ধ্বংস করে না, এবং আবশ্যকমত তদ্দ্বারা জৈবনিক কার্য্য নির্ব্বাহ করে। ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধেও তাই। ইহার সংযমই ধর্ম্ম, ধ্বংস ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্মতত্ত্বে এ কথা বুঝাইয়াছি।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯ ॥

নিরাহার দেহীর (ইন্দ্রিয়াদির) বিষয় বিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু তৎপ্রতি অনুরাগ যায় না। (কেবল) ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেই তাহা নিবৃত্ত হইয়া থাকে। ৫৯।

"নিরাহার"—যে ইন্দ্রিয়াদির বিষয়োপভোগে বিরত।

মনের একটি অতি ভয়ঙ্কর অবস্থা আছে, দুর্ভাগ্যবশতঃ জগতে তাহা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। উপভোগ যায়, কিন্তু বাসনা যায় না। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা আতুরাদির উদাহরণ দিয়াছেন। যে জড় বা আতুর, তাহার উপভোগের সাধ্য নাই, সুতরাং উপভোগ নাই। কিন্তু ভোগের বাসনার অভাব নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার অপেক্ষা শোচনীয় উদাহরণ আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাই; লোকনিন্দাভয়ে বা পবিত্র চরিত্রের ভান করিয়া বা সন্ন্যাসাদির ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, অনেকে উপভোগ ত্যাগ করেন, কিন্তু বাসনা ত্যাগ করিতে পারেন না। তার পর এক দিন বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া পাপের স্রোতে সব ভাসিয়া যায়। ঈদৃশ ব্যক্তির সঙ্গে উপভোগরত ব্যক্তির প্রভেদ বড় অল্প। এইরূপ মানসিক অবস্থা বড় দুর্জ্জয়। কিন্তু ঈশ্বরে অনুরাগ জন্মিলে ইহা দূরীকৃত হয়। "পরং দৃষ্ট্বা" এই কথার এমন তাৎপর্য্য নহে যে, ঈশ্বরকে চক্ষে দেখিবে।

ধর্ম্মের এই বিঘ্ন এমন গুরুতর যে, ভগবান্ পরবর্ত্তী কয় শ্লোকে ইহা আরও পরিস্ফুট করিতেছেন।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

---

* All ethical gymnastic consists therefore singly in subjugating the instincts and appetites of our physical system in order that we remain their masters in any and all circumstances hazardous to morality; a gymnastic exercise rendering the will hardy and robust and which by the consciousness of regained freedom makes the heart glad. Kant: *Metaphysics of Ethics*—translated by Semple.

হে কৌন্তেয়! বিবেকী পুরুষ প্রযত্ন করিলেও প্রমথনকারী ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্ব্বক চিত্ত হরণ করে। ৬০।

সেই সকল ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, যোগযুক্ত হইয়া, মৎপর হইয়া যিনি অবস্থান করেন, যাঁহার ইন্দ্রিয়সকল বশীভূত হইয়াছে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ৬১।

এই গেল ইন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিক বলের কথা। যিনি বিবেকী, তিনিও যত্ন করিয়াও ইহাদিগকে সহজে দমন করিতে পারেন না, বলপূর্ব্বক ইহারা চিত্তকে হরণ করে। আর যাহারা যত্ন করে না, যাহারা বাহিরে উপভোগ করে না, কিন্তু মনে কেবল সেই ইন্দ্রিয়বিষয়েরই ধ্যান করে, তাহাদের সর্ব্বনাশ ঘটে। সেই কথা পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে বলা হইতেছে।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬২॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্‌বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ৬৩॥

(ইন্দ্রিয়ের) বিষয়ে ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কামনা জন্মে, কামনা হইতে ক্রোধ জন্মে। ৬২।

ক্রোধ হইতে সম্মোহ হয়, সম্মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ ঘটে। ৬৩।

যাহাকে মনে পুনঃ পুনঃ স্থান দিবে, তাহারই প্রতি আসক্তি জন্মিবে। আসক্তি জন্মিলে তাহা পাইতে ইচ্ছা করে, অর্থাৎ কামনা জন্মে। না পাইলেই, প্রতিরোধক বিষয়ের প্রতি ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞানশূন্যতা বা মূঢ়তা জন্মে। এরূপ মোহ হইতে কার্য্য-কারণ-পরস্পর-সম্বন্ধ বিস্মৃত হইতে হয়। কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ ভুলিলেই বুদ্ধিনাশ হইল। বুদ্ধিনাশে বিনাশ।*

ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে হইবে, এবং ইন্দ্রিয়াদির বিষয়কে মনেও স্থান দেওয়া হইবে না। তবে কি ইন্দ্রিয়াদির উপভোগ একেবারে নিষিদ্ধ? যদি তাহা হয়, তবে গীতোক্ত ধর্ম্ম Asceticism † না ত কি? তাহা হইলে জনসমাজকে সন্ন্যাসীর মঠে পরিণত করিতে হয়।

তাহা নহে, ইন্দ্রিয়ের উপভোগ নিষিদ্ধ নহে, তাহার বিশেষ বিধি পরশ্লোকে দেওয়া হইতেছে।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি॥ ৬৪॥

যিনি বিধেয়াত্মা, তিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত এবং আপনার বশ্য ইন্দ্রিয়-গণের দ্বারা বিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ লাভ করেন। ৬৪।

---

* সীতারামের চরিত্রে বর্ত্তমান লেখক এই কথাগুলিন উদাহরণের দ্বারা পরিস্ফুট করিতে যত্ন করিয়াছেন।

† আমরা যাহাকে বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস বলি, Asceticism তাহা হইতে একটু স্বতন্ত্র জিনিষ। এই জন্য ইংরেজি কথাটাই আমি উপরে ব্যবহার করিয়াছি।

বিধেয়াত্মা—যাঁহার আত্মা বা অন্তঃকরণ বশবর্ত্তী।

ঈদৃশ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল নিজের আজ্ঞাধীন—বলের দ্বারা তাঁহার চিত্ত হরণ করিতে পারে না। তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল ভোগ্য বিষয়ের প্রতি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত—ইন্দ্রিয়সকল তাঁহার বশ, তিনি ইন্দ্রিয়ের বশ নহেন। ঈদৃশ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ বা শান্তি * লাভ করেন। অর্থাৎ তাঁহার কৃত উপভোগ দুঃখের কারণ নহে, সুখের কারণ। তাই বলিতেছিলাম যে, গীতোক্ত এই ধর্ম্ম Ascetic Philosophy নহে—প্রকৃত পুণ্যময় ও সুখময় ধর্ম্ম। বিষয়ের উপভোগ ইহাতে নিষিদ্ধ হইতেছে না, তবে ইহার পরিমাণ ও উপযুক্ত বিধি কথিত হইয়াছে।

একটা কথা বুঝাইতে বাকি আছে। বিধেয়াত্মা পুরুষের ইন্দ্রিয়সকলকে "রাগদ্বেষ বিমুক্ত"—অনুরাগ ও বিদ্বেষশূন্য বলা হইয়াছে। বিধেয়াত্মা পুরুষের ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয়ে অনুরাগ-শূন্য কেন হইবে, তাহা বুঝান নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বিদ্বেষশূন্য বলিবার কারণ কি? ভোগবিষয়ে অনুরাগই ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, বিদ্বেষ অস্বাভাবিক, কখন দেখান যায় না। যাহার সম্ভাবনা নাই, তাহার নিষেধের কারণ কি? আর যদি উপভোগ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের বিদ্বেষ ঘটে, সে ত ভালই—তাহা হইলে আর ইন্দ্রিয়সুখে প্রবৃত্তি থাকিবে না। তবে এ নিষেধ কেন?

উপভোগ্যে যে বিদ্বেষ ঘটে না, এমন নহে। রোগীর আহারে অরুচি এবং অলসের ব্যায়ামসুখে অরুচি, উদাহরণ-স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। এ সকল শারীরিক স্বাস্থ্যেরও লক্ষণ নহে, মানসিক স্বাস্থ্যেরও লক্ষণ নহে। অনেককে দেখিতে পাই, কিছুতেই পাড়ওয়ালা ধুতি পরিবেন না, চটি জুতা নহিলে পায়ে দিবেন না। ইঁহাদিগের চিত্ত আজিও বিকারশূন্য হয় নাই, যে ফিন্‌ফিনে কালাপেড়ে ধুতি নহিলে পরিবে না, তাহাদিগের চিত্ত যেমন এখনও বিকৃত, ইহাদিগের তেমনি। যখন সকলই সমান জ্ঞান হইবে, তখন ইহারা আর এরূপ আপত্তি করিবে না।

এই সকল ক্ষুদ্র উদাহরণে কথাটা যত ক্ষুদ্র বোধ হইতেছে, বস্তুতঃ কথাটা ততটা ছোট কথা নহে। একটা বড় উদাহরণ দ্বারা উহার গৌরব প্রতিপন্ন করিতেছি। রোমান কাথলিক ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের ইন্দ্রিয়বিশেষের তৃপ্তির প্রতি বিদ্বেষ—কার্য্যতঃ না হউক, বিধিতঃ বটে। এই জন্য তাঁহাদের মধ্যে চিরকৌমার বিহিত ছিল। ইহার ফলে কিরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাসপাঠক মাত্রেই জানেন। কিন্তু আর্য্য ঋষিরা যথার্থ স্থিতপ্রজ্ঞ—কোন ইন্দ্রিয়ের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগও নাই, বিদ্বেষও নাই। অতএব তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া, যথাকালে দারপরিগ্রহ করিতেন। কিন্তু তাঁহারা যেমন বিদ্বেষশূন্য, ইন্দ্রিয়ের প্রতি তেমনি অনুরাগশূন্য, অতএব কেবল ধর্ম্মতঃ সন্তানোৎপাদন জন্যই বিবাহ করিতেন, সেই জন্যই স্বভাব-নির্দ্দিষ্ট সাময়িক নিয়মের অতিরিক্ত কখন ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতেন না।

Asceticism দূরে থাকুক, যাহাকে Puritanism বলে, এই গীতোক্ত ধর্ম্ম তাহারও বিরোধী। কেন না, Puritanism এই "বিদ্বেষ"-বুদ্ধিজাত। গীতোক্ত ধর্ম্মে কোনরূপ ভণ্ডামি চলিবার পথ নাই।

---

* "Makes the heart glad,"—পূর্ব্বোদ্ধৃত কান্তের উক্তি দেখ।

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

প্রসাদে তাঁহার সকল দুঃখের বিনাশ জন্মে। যিনি প্রসন্নচিত্ত, আশু তাঁহার বুদ্ধি স্থিত হয়। ৬৫।

পূর্ব্বশ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, আত্মবশ্য ও রাগদ্বেষবিমুক্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের উপভোগে প্রসাদ লাভ হয়। প্রসাদ অর্থে প্রসন্ন চিত্ত বা শান্তি। এক্ষণে কথিত হইতেছে, সেই প্রসাদে সর্ব্বদুঃখ নষ্ট হয়, সেই প্রসন্নচেতার স্থিতপ্রজ্ঞতা জন্মে।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ॥

অযুক্তের বুদ্ধি নাই। অযুক্তের ভাবনা নাই। যাহার ভাবনা নাই, তাহার শান্তি নাই; যাহার শান্তি নাই, তাহার সুখ নাই। ৬৬।

অযুক্ত অসমাহিতান্তঃকরণ (যোগশূন্য)। ভাবনা ধ্যান, চিন্তা। যাহার অন্তঃকরণ অসমাহিত, ইন্দ্রিয়সকল বশীকৃত হয় নাই, তাহার শাস্ত্রাদির আলোচনাতেও বুদ্ধি জন্মে না। যাহার বুদ্ধি নাই, সে চিন্তা করিতে পারে না (ভাষ্যকারেরা বলেন, আত্মজ্ঞানাভিনিবেশ নাই)। যাহার চিন্তার শক্তি নাই, তাহার শান্তি নাই; শান্তি না থাকিলে সুখ নাই।

ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তির যে বুদ্ধি নাই, ইহা বুদ্ধি শব্দের সাধারণ অর্থে সত্য নহে। অনেক ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ বলিয়া জগতে পরিচিত হইয়াছেন। তবে সে বুদ্ধিতে তাঁহাদিগকে কখন সুখী করে না। যে বুদ্ধিতে সুখী করে না, সে বুদ্ধি বুদ্ধিই নহে।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭ ॥

যাহার মন বিষয়ে প্রবর্ত্তমান ইন্দ্রিয়গণের অনুবর্ত্তন করে, যেমন বায়ু নৌকাকে জলে মগ্ন করে, সেইরূপ (ইন্দ্রিয়) তাহার প্রজ্ঞা হরণ করে। ৬৭।

টীকার প্রয়োজন নাই।

তস্মাদ্‌যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

অতএব হে মহাবাহো! যাহার ইন্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে সর্ব্বপ্রকারে বিমুখীকৃত হইয়াছে, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ। ৬৮।

টীকার প্রয়োজন নাই।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯ ॥

যাহা সর্ব্বভূতের রাত্রি, সংযমী তখন জাগ্রত। সর্ব্বভূত যখন জাগে, দৃষ্টিযুক্ত মুনির তাহাই রাত্রি। ৬৯।

মহাভারতকারের অনুবাদই এই শ্লোকের প্রচুর টীকা। "অজ্ঞানতিমিরাবৃতমতি ব্যক্তিদিগের নিশাস্বরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠাতে জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ জাগ্রত থাকেন। এবং

প্রাণিগণ যে বিষয়নিষ্ঠা-স্বরূপ দিবায় প্রবোধিত থাকে, আত্মতত্ত্বদর্শী যোগীদিগের সেই রাত্রি।"

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

যেমন পূর্য্যমাণ স্থিরপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রে নদীসকল প্রবেশ করে, সেইরূপ ভোগসকল যাহাতে প্রবেশ করে, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হয়েন; যিনি ভোগসকলের কামনা করেন, তিনি পান না। ৭০।

সমুদ্র, জলের অন্বেষণে বেড়ায় না; নদীসকল আপনা হইতে জল লইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পরিপূর্ণ রাখে। তেমনি যিনি ইন্দ্রিয়সকল বশ করিয়াছেন, ভোগ সকলি আপনা হইতেই তাঁহাকে আশ্রয় করে; সেই কারণে তিনিই শান্তি লাভ করেন। যিনি ইন্দ্রিয়-তাড়িত, সুতরাং কামনাপরবশ, তিনি সে শান্তি কদাচ লাভ করিতে পারেন না। এখন ৫৬ শ্লোকের টীকায় যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। কামনা পরিত্যাগই কর্ম্মফলজনিত সুখলাভের কারণ। কর্ম্মফলজনিত সুখ আসিয়া তাঁহাকে আপনি আশ্রয় করে। তাদৃশ সুখই শান্তিদায়ক। কামনাজনিত সুখে শান্তি নাই; সুতরাং সে সুখ সুখই নয়।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১।

যিনি সর্ব্বকামনা ত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ হইয়া বিচরণ করেন, যিনি মমতাশূন্য এবং নিরহঙ্কার, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। ৭১।

মমতাশূন্য—আত্মাভিমানশূন্য।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাহস্যামন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

হে পার্থ। ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠা। ইহা প্রাপ্ত হইলে আর মুগ্ধ হইতে হয় না। কেবল অন্তকালেও ইহাতে স্থিত হইলেও ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৭২।

তবে ব্রহ্মনিষ্ঠা, অতি অল্প কথার ভিতর আসিল। ইন্দ্রিয়সংযম এবং কামনা-পরিত্যাগই ব্রহ্মনিষ্ঠা। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বরে সমাহিতচিত্তের ইহা লক্ষণ মাত্র—ভগবদারাধনা ভিন্ন কামনাত্যাগ ঘটে না। অতএব সংযতেন্দ্রিয় ও নিষ্কাম হইয়া যে ঈশ্বরে চিত্তার্পণ, তাহাই প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠা। ইন্দ্রিয়সংযম এবং ঈশ্বরে চিত্তার্পণপূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান, ইহাই যথেষ্ট ব্রহ্মনিষ্ঠা।

ইহা হইলেই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের সারভাগ। গীতার আর যাহা কিছু আছে, তাহা এই কথার সম্প্রসারণ মাত্র—অধিকারভেদে পদ্ধতিনির্ব্বাচন মাত্র। হিন্দুধর্ম্মে বা অপর কোন ধর্ম্মে ইহা ছাড়া যাহা কিছু আছে, তাহা ধর্ম্মের প্রয়োজনীয় অংশ নহে। তাহা হয় উপন্যাস, নয় উপধর্ম্ম, নয় সামাজিক নীতি, নয় বাজে কথা—ত্যাগ করিলেই ভাল।° ইহা সকলের আয়ত্ত, ইহার জন্য বেদাধ্যয়নের আবশ্যক নাই,

সন্ধ্যাগায়ত্রীর আবশ্যক নাই। স্ত্রীলোক বা পতিত ব্যক্তি, শূদ্র বা ম্লেচ্ছ, মুসলমান বা খ্রীষ্টীয়ান, সকলেরই ইহা আয়ত্ত। ইহা জগতে একমাত্র ধর্ম্ম—ইহাই একমাত্র Catholic religion.

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম-
বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে সাংখ্যযোগো নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয় অধ্যায়—অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব॥ ১॥

হে জনার্দ্দন! যদি তোমার মতে কর্ম্ম হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব! আমাকে হিংসাত্মক কর্ম্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ? ১।

বুদ্ধি অর্থে এখানে আবার জ্ঞান বুঝিতে হইতেছে। ভগবান্ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু দ্বিতীয়াধ্যায়ে শেষ কয়েক শ্লোকে, অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে অর্জ্জুন এইরূপ বুঝিয়াছেন যে, জ্ঞান কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, যদি জ্ঞানই কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, তবে আমাকে কর্ম্মে, বিশেষ যুদ্ধের ন্যায় নিকৃষ্ট কর্ম্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ?

অর্জ্জুনের এইরূপ সংশয় কিরূপে উপস্থিত হইল, শ্রীধর তাহা এইরূপে বুঝাইয়াছেন, "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্" (দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১১শ শ্লোক দেখ) ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা প্রথমে মোক্ষ-সাধনজন্য দেহাত্মবিবেকবুদ্ধির কথা বলিয়া, তাহার পর "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিঃ" ইত্যাদি বাক্যে (দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৩৯শ শ্লোক দেখ) কর্ম্মও কথিত হইয়াছে। কিন্তু এতদুভয় মধ্যে গুণপ্রধান ভাব স্পষ্টতঃ দেখান হয় নাই। তথা বুদ্ধিযুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের নিষ্ক্রিয়ত্ব, নিয়তেন্দ্রিয়ত্ব, নিরহঙ্কারত্ব ইত্যাদি লক্ষণের গুণবাদে "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ" (৭২ শ্লোক দেখ) সপ্রশংস উপসংহারে, বুদ্ধি ও কর্ম্ম, এতন্মধ্যে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বই ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিয়াই অর্জ্জুন এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

বস্তুতঃ দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্পষ্টতঃ কোথাও বলেন নাই যে, কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। তবে ৪৯ শ্লোকে কিছু গোলযোগ ঘটিয়াছে বটে,

"দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।"

এখানে ভাষ্যকারেরা যে বুদ্ধি অর্থে ব্যবসায়াত্মিকা কর্ম্মযোগ বুঝাইয়াছেন, তাহাও উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে বুঝাইয়াছি। সেখানে এই অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, বুদ্ধি অর্থে জ্ঞান বুঝিলে আর কোনও গোল থাকে না। নচেৎ এইখানে গোলযোগ উপস্থিত হয়, এ কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। আনন্দগিরিও এই তৃতীয়ের প্রথম শ্লোকের ভাষ্যের টীকায় "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম" ইত্যাদি শ্লোকটি বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

যাহাই হউক, জ্ঞান কর্ম্মের গুণপ্রাধান্য সম্বন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ভগবদুক্তি যাহা আছে, তাহা কিছু "ব্যামিশ্র" (anglice ambiguous) বটে। বোধ হয়, ইচ্ছাপূর্ব্বকই ভগবান্ এই কথা প্রথমে পরিস্ফুট করেন নাই—এই প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা করিয়াছিলেন। কেন না, এই প্রশ্নের উত্তর উপলক্ষে পরবর্ত্তী কয়েক অধ্যায়ে জ্ঞান-কর্ম্মের তারতম্য ও পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে যে মীমাংসা হইয়াছে, ইহা মনুষ্যের অনন্ত মঙ্গলকর, এবং ইহাকে অতিমানুষ-বুদ্ধি-প্রসূত বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। আর কোথাও কখনও ভূমণ্ডলে এরূপ সর্ব্বমঙ্গলময় ধর্ম্ম কথিত হয় নাই।

অর্জ্জুন সেই "ব্যামিশ্র" বাক্যের কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন,—

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

ব্যামিশ্র (সন্দেহজনক) বাক্যের দ্বারা আমার মন মুগ্ধ করিতেছ। অতএব যাহার দ্বারা আমি শ্রেয় প্রাপ্ত হইব, সেই একই (এক প্রকার নিষ্ঠাই) আমাকে নিশ্চিত করিয়া বলিয়া দাও। ২।

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩ ॥

হে অনঘ! ইহলোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা আছে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ সাংখ্যদিগের জ্ঞানযোগ এবং (কর্ম্ম)যোগীদিগের কর্ম্মযোগ বলিয়াছি। ৩।

এই সকল কথা একবার বুঝান হইয়াছে। পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

এই কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই পুরুষ নৈষ্কর্ম্ম্য প্রাপ্ত হয় না। আর কর্ম্মত্যাগেই সিদ্ধি পাওয়া যায় না। ৪।

অর্জ্জুনের প্রশ্ন ছিল, যদি কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তবে কর্ম্মে নিয়োগ করিতেছ কেন? ভগবানের উত্তর, জ্ঞান যদি শ্রেষ্ঠই হয়, তাহা হইতে কি তোমাকে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বলিতে হইবে? জ্ঞাননিষ্ঠ হইলেই কি তুমি কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারিবে? তুমি কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেই কি নৈষ্কর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইবে? না নৈষ্কর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইলেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে?

কর্ম্মের অনুষ্ঠানে কেন নৈষ্কর্ম্ম্য প্রাপ্ত হইবে না, তাহা ভগবান্ বলিতেছেন,—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥

কেহই কখনও ক্ষণমাত্র কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতিজ গুণে সকলেই কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। ৫।

হে অর্জ্জুন! তুমি বলিতেছ, জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সত্বেও আমি তোমাকে কর্ম্ম করিতে বলিতেছি, কিন্তু কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পার কৈ? প্রকৃতি ছাড়েন কৈ? নিশ্বাস,

প্রশ্বাস, অশন, শয়ন, স্নান, পান, এ সকল কর্ম্ম নয় কি? জ্ঞানমার্গাবলম্বী হইলে এ সকল ত্যাগ করা যায় কি?

জিজ্ঞাসু এখানে বলিতে পারেন যে, যে সকল কর্ম্ম প্রকৃতির বশ হইয়া করিতে হইবে, তাহা ত্যাগ করা যায় না বটে; কিন্তু যে সকল কার্য্য আপনার ইচ্ছাধীন, তাহা কি জ্ঞানী বা সন্ন্যাসী পরিত্যাগ করিতে পারেন না?

ইহার সহজ উত্তর এই, অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কেহই পরিত্যাগ করিতে পারে না। ঈশ্বরচিন্তা স্বেচ্ছাধীন কর্ম্ম, ইহা কি জ্ঞানমার্গাবলম্বী পরিত্যাগ করিতে পারে? তবে জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি?

অনেকে বলিবেন, সাধারণতঃ যাহাকে কর্ম্ম বলে, তাহার কথা হইতেছে না। হিন্দুশাস্ত্রে শ্রৌত কর্ম্ম ও স্মার্ত্ত কর্ম্মকেই কর্ম্ম বলে। কিন্তু ইহা সত্য নহে, শ্রৌত কর্ম্ম ও স্মার্ত্ত কর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারে না এবং এই সকল স্বাভাবিক নহে যে, প্রকৃতির তাড়নায় বাধ্য হইয়া তাহা করিতে হয়। অতএব সাধারণতঃ যাহাকে কর্ম্ম বলে—যাহা কিছু করা যায়—তাহারই কথা হইতেছে বটে। ইহা আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এক্ষণেও বলিতেছি। গীতার ব্যাখ্যায় কর্ম্ম বলিলে, কর্ম্ম মাত্রই বুঝিতে হইবে; কেবল শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্ম যে ভগবানের অভিপ্রেত নহে, তাহা এই শ্লোকেই দেখা যাইতেছে।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

যে বিমূঢ়াত্মা, মনেতে ইন্দ্রিয়-বিষয় সকল স্মরণ রাখিয়া, কেবল কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া অবস্থিতি করে, সে মিথ্যাচারী। ৬।

ভগবান্ বলিয়াছেন যে, কর্ম্মের অননুষ্ঠানেই নৈষ্কর্ম্ম্য পাওয়া যায় না এবং কর্ম্মত্যাগেই সিদ্ধি পাওয়া যায় না। কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যে নৈষ্কর্ম্ম্য ঘটে না, ভগবান্ তাহার এই প্রমাণ দিলেন যে, তুমি কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেও স্বভাবগুণেই তোমাকে কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইতে হইবে! আর কর্ম্মত্যাগেই যে সিদ্ধি ঘটে না, তাহার এই প্রমাণ দিতেছেন যে, কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া, "কর্ম্ম করিব না" বলিয়া বসিয়া থাকিলেও ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়সকল মনে আসিয়া উদিত হইতে পারে। তাহা হইলে সে মিথ্যাচার মাত্র। তাহাতে কোন সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই।

যদি কর্ম্মত্যাগও করা যায় না, এবং কর্ম্মত্যাগ করিলেও সিদ্ধি নাই, তবে কর্ত্তব্য কি, তাহাই এক্ষণে কথিত হইতেছে।—

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

হে অর্জ্জুন! যে ইন্দ্রিয়সকল মনের দ্বারা নিয়ত করিয়া, অসক্ত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করে, সেই শ্রেষ্ঠ। ৭।

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮ ॥

তুমি নিয়ত কর্ম্ম করিবে। কর্ম্মশূন্যতা হইতে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মশূন্যতায় তোমার শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হইতে পারে না। ৮।

"তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব!" অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের, ভগবান্ এই উত্তর দিলেন। উত্তর এই যে, কর্ম্মত্যাগ কেহই করিতে পারে না, এবং কর্ম্ম ত্যাগ করিলেই সিদ্ধি ঘটে না। কর্ম্ম না করিলে তোমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সম্ভাবনা নাই। অতএব কর্ম্ম করিবে। তবে যদি কর্ম্ম করিতেই হইল, তবে যে প্রকারে করিলে কর্ম্ম মঙ্গলকর হয়, তাহাই করিবে। কর্ম্ম যাহাতে শ্রেয়ঃসাধক হয়, তাহার দুইটি নিয়ম কথিত হইল। প্রথম, ইন্দ্রিয়সকল* মনের দ্বারা সংযত করিয়া; দ্বিতীয়, অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবে। তদতিরিক্ত আর একটি নিয়ম আছে; তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং কর্ম্মযোগের কেন্দ্রীভূত। তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে কথিত হইতেছে।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচার॥ ৯॥

যজ্ঞার্থ যে কর্ম্ম, তদ্ভিন্ন অন্যত্র কর্ম্ম ইহলোকে বন্ধনের কারণ। হে কৌন্তেয়! তুমি সেই জন্য (যজ্ঞার্থে) অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর। ৯।

যজ্ঞ শব্দের অর্থের উপর এই শ্লোকের ব্যাখ্যা নির্ভর করে। সচরাচর বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপকে পূর্ব্বে যজ্ঞ বলিত, যথা—অশ্বমেধাদি। এক্ষণে সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপকেই যজ্ঞ বলে।

প্রাচীন ভাষ্যকার শঙ্কর ও শ্রীধর এ অর্থ গ্রহণ করেন না। শঙ্কর বলেন—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরঃ"। শ্রীধর সেই অর্থ গ্রহণ করেন। মধুসূদন সরস্বতীও এইরূপ অর্থ করেন। রামানুজ তাহা বলেন না। তিনি দ্রব্যার্জ্জনাদিক কর্ম্মকে যজ্ঞ বলেন।

শঙ্করাদি-কথিত যজ্ঞ শব্দের অর্থ গ্রহণ করিলে, এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ হয় যে, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট ভিন্ন যে সকল কর্ম্ম, তাহা কেবল কর্ম্মফলভোগের জন্য বন্ধন মাত্র। অতএব অনাসক্ত হইয়া কেবল ঈশ্বরোদ্দেশেই কর্ম্ম করিবে।

তাহা হইলে বিচার্য্য শ্লোকের অর্থ এই হয় যে, ঈশ্বরারাধনার্থ যে কর্ম্ম, তাহা ভিন্ন অন্য সকল কর্ম্ম, কর্ম্মফলভোগের বন্ধন মাত্র। অতএব কেবল ঈশ্বরারাধনার্থই কর্ম্ম করিবে।

এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তাও কি হয়? ভগবানই স্বয়ং বলিতেছেন, নিতান্ত পক্ষে প্রকৃতিতাড়িত হইয়া এবং জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থও কর্ম্ম করিতে হইবে। ঈশ্বরারাধানা কি সে সকল কর্ম্মের উদ্দেশ্য হইতে পারে? আমি জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থ স্নান পান, আহার ব্যায়ামাদি করি, তাহাতে ঈশ্বরারাধনার কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে?

এ কথা বুঝিবার আগে স্থির করিতে হয়, ঈশ্বরারাধনা কি? মনুষ্যের আরাধনা করিতে গেলে, আমরা আরাধ্য ব্যক্তির স্তবস্তুতি করি। কিন্তু ঈশ্বরকে সেরূপ তোষামোদপ্রিয় ক্ষুদ্রচেতা মনে করা যায় না। তাঁহার স্তবস্তুতি করিলে যদি আমাদের নিজের সুখ, কি চিত্তোন্নতি হয়, তবে এরূপ স্তবস্তুতি করার পক্ষে কোন আপত্তিই নাই, এবং এরূপ স্থলে ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা বলা যায় না। সেইরূপ যাহাকে সাধারণতঃ "যাগযজ্ঞ" বলে, পুষ্প, চন্দন, নৈবেদ্য, হোম, বলি, উৎসব, এ সকলও ঈশ্বরারাধনা নহে।

* ভাষ্যকারেরা বলেন,—কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল।

ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন ঈশ্বরারাধনা বটে, কিন্তু তোষামোদে তাঁহার তুষ্টিসাধন হইতে পারে না। তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্যের সম্পাদন, তাঁহার নিয়ম প্রতিপালনই তাঁহার তুষ্টি-সাধন—তাহাই প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা। এই তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্যের সম্পাদন ও তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন কাহাকে বলি? বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ এক কথায় এই প্রশ্নের অতি সুন্দর উত্তর দিয়াছেন—

"সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য ॥"

সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিই প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা; আমরা ক্রমশঃ ভূয়ো ভূয়ঃ দেখিব, গীতোক্ত ঈশ্বরারাধনাও তাই—সর্ব্বভূতেসমদৃষ্টি,সর্ব্বভূতে আত্মবৎ জ্ঞান, এবং সর্ব্বভূতের হিতসাধন।

অতএব কর্ম্মযোগীর কর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য, সর্ব্বভূতের হিতসাধন।

যে কর্ম্মকর্ত্তা, সে নিজেও সর্ব্বভূতের অন্তর্গত। অতএব আত্মরক্ষাও ঈশ্বরাভিপ্রেত। জগদীশ্বর আত্মরক্ষার ভার, সকলকেই নিজের উপর দিয়াছেন। এ সকল কথা আমি সবিস্তারে ধর্ম্মতত্ত্বে বুঝাইয়াছি, পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

এই নবম শ্লোকে বলা হইতেছে যে, "যজ্ঞ" (যে অর্থেই হউক) ভিন্ন অন্যত্র কর্ম্ম বন্ধন মাত্র। "বন্ধন" কি, এইটা বুঝাইতে বাকি আছে। অন্যবিধ কর্ম্ম নিষ্ফল হয় বা পাপজনক, এমন কথা বলা হইতেছে না—বলা হইতেছে, তাহা বন্ধনস্বরূপ। এই বন্ধন বুঝিতে জন্মান্তরবাদ স্মরণ করিতে হইবে। কর্ম্ম করিলেই জন্মান্তরে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। কর্ম্মফল—সুফলই হউক, আর কুফলই হউক, তাহা ভোগ করিবার জন্য জীবকে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হইবে। যত দিন জন্মের পর জন্ম হইবে, তত দিন জীবের মুক্তি নাই। মুক্তি প্রতিবন্ধক বলিয়াই কর্ম্ম বন্ধন মাত্র।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—যদি জন্মান্তর না থাকে? তাহা হইলেও গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মই কি ধর্ম্মানুমোদিত? না, নিষ্কাম কর্ম্ম যা, সকাম কর্ম্মও তা?

আমি ধর্ম্মতত্ত্বে এ কথার উত্তর দিয়াছি। নিষ্কাম কর্ম্ম ভিন্ন মনুষ্যত্ব নাই। মনুষ্যত্ব ব্যতীত ইহজন্মে বা ইহলোকে স্থায়ী সুখ নাই। অতএব গীতোক্ত এই ধর্ম্ম বিশ্বজনীন।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বকালে প্রজাপতি প্রজাগণের সহিত যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "ইহার দ্বারা তোমরা বর্দ্ধিত হইবে, ইহা তোমাদিগের অভীষ্টপ্রদ হইবে"। ১০।

এখানে 'যজ্ঞ' শব্দে আর 'ঈশ্বর' নহে বা ঈশ্বরারাধনা নহে। কেবল, যজ্ঞই অর্থাৎ শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মই যজ্ঞ; এবং পরবর্ত্তী ১২শ, ১৩শ, ১৪শ এবং ১৫শ শ্লোকেতে যজ্ঞ শব্দে কেবল ঐ যজ্ঞই বুঝায়। এক শ্লোকে একার্থে একটি শব্দ কোন অর্থবিশেষে ব্যবহৃত করিয়া, তাহার পরছত্রেই ভিন্নার্থে কেহ ব্যবহার করে না। এ জন্য অনেক আধুনিক পণ্ডিত নবম শ্লোকে যজ্ঞার্থে যজ্ঞই বুঝেন। কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্‌ স্বকৃত অনুবাদে যজ্ঞার্থে sacrifice লিখিয়াছেন। তাহার পর দশম শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"Probably the sacrifices spoken of in that passage (নবম শ্লোকে) must be taken to be the same as those referred to in this passage."

ডেবিস্ সাহেবও তৎপথাবলম্বী। শঙ্করের ভাষ্য দেখিয়াও গ্রাহ্য করেন নাই, নোটে এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। এদিকে কামধুকের স্থানে *Kamduk* লিখিয়া বসিয়াছেন! একবার নহে, বার বার !!!

এতক্ষণ ভগবান্ সকাম কর্ম্মের নিন্দা ও নিষ্কাম কর্ম্মের প্রশংসা করিতেছিলেন। কিন্তু যজ্ঞ সকাম। অতএব যজ্ঞার্থে ঈশ্বর না বুঝিলে ইহাই বুঝিতে হয়, ভগবান্ সকাম কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিতেছেন। তাই নবমে যজ্ঞার্থে ঈশ্বর, ইহা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বেদ হইতে বাহির করিয়াছেন। চতুর্ব্বেদ তাঁহার কণ্ঠস্থ।

এক্ষণে এই শ্লোকটা সম্বন্ধে একটা কথা বুঝাইবার প্রয়োজন আছে। বলা হইতেছে, প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এমন কেহই বুঝিবেন না যে, যজ্ঞ একটা জীব বা জিনিষ; প্রজাপতি যখন মনুষ্য সৃষ্টি করিলেন, তখন তাহাকেও সৃষ্টি করিলেন। ইহার অর্থ এই যে, বেদে যজ্ঞবিধি আছে, এবং যখন প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিলেন, তখন সেই বেদও ছিল। গোঁড়া হিন্দু এইটুকুতেই সন্তুষ্ট হইবেন, কিন্তু আমার অধিকাংশ পাঠক সে শ্রেণীর লোক নহেন। আমার পাঠকেরা বলিবেন, প্রথমতঃ প্রজাসৃষ্টিই মানি না—মনুষ্য ত বানরের বিবর্ত্তন। তার পর বেদ নিত্য বা অপৌরুষেয় বা প্রজাসৃষ্টির সমসাময়িক, ইহাও মানি না। পরিশেষে প্রজাপতি যে প্রজা সৃষ্টি করিয়া যজ্ঞ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়া শুনাইলেন, ইহাও মানি না।

মানিবার আবশ্যকতা নাই। আমিও মানি না। শ্রীকৃষ্ণও মানিতে বলিতেছেন না। ক্রমশঃ বুঝা যাইবে। এই সকল কথার আলোচনা, আর পরবর্ত্তী কয়েকটি শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য আমি ষোড়শ শ্লোকের পর বলিব।

পুনশ্চ লৌকিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছেন,—

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

তোমার যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদিগকে সংবর্দ্ধিত কর; দেবগণ তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন। পরস্পর এইরূপ সংবর্দ্ধিত করিয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিবে। ১১।

টীকায় শ্রীধর স্বামী বলেন, "তোমরা হবির্ভাগের দ্বারা দেবগণকে সংবর্দ্ধিত করিবে, দেবগণও বৃষ্ট্যাদির দ্বারা অন্নোৎপত্তি করিয়া তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করিবেন"। আমরা ত অন্ন না খাইলে বাঁচি না, ইহা জানা আছে। দেবতারাও না কি যজ্ঞের ঘি খাইয়া থাকেন, খাইলে তাঁহাদের পুষ্টিসাধন হয়। বেদে এরূপ কথা আছে। থাকুক।

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২ ॥

যজ্ঞের দ্বারা সংবর্দ্ধিত দেবগণ, যে অভীষ্ট ভোগ তোমাদিগকে দিবেন, তাঁহাদিগকে তদ্দত্ত (অন্ন) না দিয়া, যে খায়, সে চোর। ১২।

শঙ্কর ও শ্রীধর স্বামী বলেন, (বলিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না) "পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্ত্বা", পঞ্চযজ্ঞাদির দ্বারা না দিয়া যে খায়, সে চোর। পঞ্চ যজ্ঞ যথা,

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিভোজনম্ ॥

অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞ বা অধ্যাপন, পিতৃযজ্ঞ বা তর্পণ, দৈব যজ্ঞ বা হোম, ভূতযজ্ঞ বা বলি, এবং নরযজ্ঞ বা অতিথি-ভোজন। ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, শ্রীধর "পঞ্চযজ্ঞৈরদত্ত্বা" বলেন না, "পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্ত্বা" বলেন।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩ ॥

যে সজ্জনগণ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করেন, তাঁহারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন। যাহারা কেবল আপনার জন্য পাক করে, সেই পাপিষ্ঠেরা পাপ ভোজন করে। ১৩।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

অন্ন হইতে ভূতসকল উৎপন্ন; পর্জ্জন্য হইতে অন্ন জন্মে; যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য জন্মে। কর্ম্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি। ১৪।

পর্জ্জন্য একটি বৈদিক দেবতা। তিনি বৃষ্টি করেন। এখানে পর্জ্জন্য অর্থে বৃষ্টি বুঝিলেই হইবে।

অন্ন হইতে জীবের উৎপত্তি। কথাটা ঠিক বৈজ্ঞানিক না হউক, অসত্য নয় এবং বোধগম্য বটে। টীকাকারেরা বুঝাইয়াছেন, অন্ন রূপান্তরে শুক্র শোণিত হয়, তাহা হইতে জীব জন্মে। ইহাই যথেষ্ট।

তার পর বৃষ্টি হইতে অন্ন। তাহাও স্বীকার করা যাইতে পারে; কেন না, বৃষ্টি না হইলে ফসল হয় না। কিন্তু যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি এ কথাটা বৈজ্ঞানিক স্বীকার করিবেন না। টীকাকারেরা বলেন, যজ্ঞের ধূমে মেঘ জন্মে। অন্য ধূমেও মেঘ জন্মিতে পারে। অধিকাংশ মেঘ ধূম ব্যতীত জন্মে। যে দেশে যজ্ঞ হয় না, সে দেশেও মেঘ ও বৃষ্টি হয়। সে যাহা হউক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এ স্থলে আলোচিত হইতেছে না। তবে কি ভগবদুক্তি অসত্য ও অবৈজ্ঞানিক? ক্রমশঃ তাহাই বুঝাইতেছি।

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥

কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত জানিও; ব্রহ্ম অক্ষর হইতে সমুদ্ভূত; অতএব সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। ১৫।

টীকাকারেরা বলেন, ব্রহ্ম শব্দে এখানে বেদ বুঝিবে। এবং অক্ষর পরমাত্মা। তবে কেহ কেহ এই গোলযোগ করেন যে, প্রথম চরণে ব্রহ্ম শব্দে বেদ বুঝিয়া, দ্বিতীয় চরণে ব্রহ্ম শব্দে পরব্রহ্ম বুঝেন। নহিলে অর্থ হয় না। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতকার এবং অন্যান্য অনুবাদকেরা এই মতের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং দ্বিতীয় চরণেও ব্রহ্ম শব্দে বেদ বুঝিয়াছেন, অতএব এই শ্লোকের এই দুই প্রকার অর্থ করা যায়।

প্রথম শ্রীধরাদির মতে—

"কর্ম্ম বেদ হইতে, এবং বেদ পরব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে; অতএব সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।"

দ্বিতীয়, শঙ্করাচার্য্যের মতে—

"কর্ম্ম বেদ হইতে, এবং বেদ পরব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। অতএব বেদ সর্ব্বার্থ-প্রকাশকত্ব হেতু নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।"

পাঠকের যে ব্যাখ্যা ইচ্ছা, তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন; স্থূল তাৎপর্য্যের বিঘ্ন কোনও ব্যাখ্যাতেই হইবে না।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ ॥

এইরূপ প্রবর্ত্তিত চক্রের যে অনুবর্ত্তী না হয়, সে পাপজীবন ও ইন্দ্রিয়ারাম, হে পার্থ, সে অনর্থক জীবন ধারণ করে। ১৬।

(ইন্দ্রিয়সুখে যাহার আরাম, সেই ইন্দ্রিয়ারাম।)

ব্রহ্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন, অন্ন হইতে জীব। টীকাকারেরা ইহাকে জগচ্চক্র বলিয়াছেন, কর্ম্ম করিলে এই জগচ্চক্রের অনুবর্ত্তন করা হইল। কেন না, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ হইবে, যজ্ঞ হইতে মেঘ হইবে, মেঘ হইতে অন্ন হইবে, অন্ন হইতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। এই হইল চক্রের এক ভাগ। এ ভাগ সত্য নহে; কেন না, আমরা জানি, কর্ম্ম করিলে যজ্ঞ* হয় না, যজ্ঞ করিলেই মেঘ হয় না, মেঘ হইলেই শস্য হয় না (সকল মেঘে বৃষ্টি নাই এবং অতিবৃষ্টিও আছে) ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যজ্ঞ ভিন্ন কর্ম্ম আছে, বিনা যজ্ঞেও মেঘ হয়, বিনা মেঘেও শস্য হয় (যথা রবিখন্দ), শস্য বিনাও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় (উদাহরণ, সকল অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতি মৃগয়া বা পশুপালন করিয়া খায়) ইত্যাদি।

চক্রের দ্বিতীয় ভাগ এই যে, ব্রহ্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কর্ম্ম। ইহাও বিরোধের স্থল। ব্রহ্ম হইতে বেদ না বলিয়া, অনেকে বলেন, বেদ অপৌরুষেয়। অনেকে বলিতে পারেন, বেদ অপৌরুষেয়ও নহে, ব্রহ্মসম্ভূতও নহে, ঋষিপ্রণীতমাত্র, তাহার প্রমাণ বেদেই আছে। তার পর বেদ হইতে কর্ম্ম, এ কথা কেবল শ্রৌত কর্ম্ম ভিন্ন আর কোন প্রকার কর্ম্ম সম্বন্ধে সত্য নহে। পাঠক দেখিবেন, দশম শ্লোক হইতে আর এই ষোড়শ পর্য্যন্ত আমরা অনৈসর্গিক কথার ঘোরতর আবর্ত্তে পড়িয়াছি। সমস্তই অবৈজ্ঞানিক (unscientific) কথা। এখানে মহর্ষিতুল্য প্রাচীন ভাষ্যকারেরা কেহই সহায় নহেন; তাঁহারা বিশ্বাসের জাহাজে পাল ভরিয়া অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। আমরা ম্লেচ্ছের শিষ্য; আমাদের উদ্ধারের সে উপায় নাই। তবে ইহা আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারিব যে, গীতা বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ নহে। বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রচার Tyndale Huxley জন্য বা ইহার প্রণয়ন করেন নাই। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান তাহাতে পাওয়ার প্রত্যাশা করা যায় না।

তবে পাঠক বলিতে পারেন যে, যাহা তুমি ভগবদুক্তি বলিতেছ, তাহা ভ্রমশূন্য ও

* যদি বল, শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মই কর্ম্ম, কাজেই যজ্ঞ ভিন্ন কর্ম্ম নাই, তাহা হইলে " নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ" (৫ম শ্লোক), এবং "শরীরযাত্রাপি চ তেন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ (৮ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যের অর্থ নাই।

অসত্যশূন্য হওয়াই উচিত। অবৈজ্ঞানিক হইলে অসত্য হইল। ঈশ্বরের অসত্য কথা কি প্রকারে সম্ভবে ?

কিন্তু এই সাতটি শ্লোক যে ভগবদুক্তি, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গীতায় যাহা কিছু আছে, তাহাই যে ভগবদুক্তি, এমন কথা বিশ্বাস করা উচিত নহে। আমি বলিয়াছি যে, কৃষ্ণকথিত ধর্ম্ম অন্য কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। যিনি সঙ্কলন করিয়াছেন, তাঁহার নিজের মতামত অবশ্য ছিল। তিনি যে নিজ-সঙ্কলিত গ্রন্থে কোথাও নিজের মত চালান নাই, ইহা সম্ভব নহে। শ্রীধর স্বামীর ন্যায় টীকাকারও সঙ্কলনকর্ত্তা সম্বন্ধে "প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখাদ্বিনিঃসৃতানেব শ্লোকানলিখৎ," ইহা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, "কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ঞ্চ ব্যরচয়ৎ।" এখানে দেখিতে পাইতেছি, কৃষ্ণোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্মের সঙ্গে এই সাতটি শ্লোকের বিশেষ বিরোধ। এজন্য ইহা ভগবদুক্তি নহে—সঙ্কলনকর্ত্তার মত—ইহাই আমার বিশ্বাস।

তবে ইহাও আমার বক্তব্য যে, ইহা যদি প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণোক্তিই হয়, তবে যে এ সকল কথা উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানসঙ্গত হওয়া উচিত ছিল, এমন বিশ্বাস আমার নাই। আমি 'কৃষ্ণচরিত্রে' দেখাইয়াছি যে, কৃষ্ণ মানুষী শক্তির দ্বারা পার্থিব কর্ম্মসকল নির্ব্বাহ করেন, ঐশী শক্তি দ্বারা নহে। মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ ভিন্ন, ঈশ্বরের মনুষ্যদেহ গ্রহণ করা বুঝা যায় না। কৃষ্ণ যদি মানবশরীরধারী ঈশ্বর হয়েন, তবে তাঁহার মানুষী শক্তি ভিন্ন ঐশী শক্তির দ্বারা কার্য্য করা অসম্ভব ; কেন না, কোন মানুষেরই ঐশী শক্তি নাই—মানুষের আদর্শেও থাকিতে পারে না। কেবল মানুষী শক্তির ফল যে ধর্ম্মতত্ত্ব, তাহাতে তিন সহস্র বৎসর পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক সত্য প্রত্যাশা করা যায় না। ঈশ্বরের তাহা অভিপ্রেত নহে।

আর এই বৈজ্ঞানিকতা সম্বন্ধে আর একটা কথা আছে। মনে কর, এখন ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া নূতন ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিলেন। এখনকার লোকের বোধগম্য বিজ্ঞান অতিক্রম করিয়া, নিজের সর্ব্বজ্ঞতাপ্রভাবে আর তিন চারি হাজার বৎসর পরে বিজ্ঞান যে অবস্থায় দাঁড়াইবে, তাহার সহিত সুসঙ্গতি রাখিলেন। বিজ্ঞানের যেরূপ দ্রুতগতি, তাহাতে তিন চারি হাজার বৎসর পরে বিজ্ঞানে যে কি না করিবে, তাহা বলা যায় না। তখন হয়ত মনুষ্য, জীবন্ত মনুষ্য হাতে গড়িয়া সৃষ্টি করিবে, ইথরের তরঙ্গে চড়িয়া সপ্তর্ষিমণ্ডল* বা রোহিণী নক্ষত্র† বেড়াইয়া আসিবে, হিমালয়ের উপর দাঁড়াইয়া মঙ্গলাদি গ্রহ উপগ্রহবাসী কিম্ভূতকিমাকার জীবগণের সঙ্গে কথোপকথন বা যুদ্ধ করিবে, এ বেলা ও বেলা সূর্য্যালোকে অগ্নিভোজনের নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইবে। মনে কর, ভগবান্, সর্ব্বজ্ঞতাপ্রযুক্ত এই ভাবী বিজ্ঞানের সঙ্গে সুসঙ্গতি রাখিয়া তদুপযোগী ভাষায় নূতন ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিলেন। করিলে, শুনিবে কে ? বুঝিবে কে ? অনুবর্ত্তী হইবে কে ? কেহ না। এই জন্য ঈশ্বরোক্তি সময়োপযোগী ভাষায় প্রচারিত হওয়া উচিত। তার পর ক্রমশঃ মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সেই প্রাচীন কালোপযোগী ভাষার দেশ কাল পাত্রের উপযোগী ব্যাখ্যা হইতে পারে। সেই জন্যই শঙ্করাদি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকৃত গীতাভাষ্য থাকিতেও, আমার ন্যায় মূর্খ অভিনব ভাষ্যরচনায় সাহসী।

* Great Bears. † Plerades.

এই সাতটি শ্লোক যে বৈজ্ঞানিক অসত্যে কলঙ্কিত, এই প্রথম আপত্তির আমি এই তিনটি উত্তর দিলাম। দ্বিতীয় আপত্তি এই উপস্থিত হইতে পারে যে, এই সাতটি শ্লোক গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্মের বিরোধী। এ আপত্তি অতি যথার্থ। তবে এই কয়টি শ্লোক কেন এখানে আসিল, এ প্রশ্নের উত্তর শঙ্কর ও শ্রীধর যেরূপ দিয়াছেন, তাহা নবম শ্লোকের টীকায় বলিয়াছি। মধুসূদন সরস্বতী যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষাকৃত সঙ্গত বোধ হইতে পারে। পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন তাহার মর্ম্মার্থ অতি বিশদরূপে বুঝিয়াছেন, অতএব তাঁহার কৃত গীতার্থসন্দীপনী নাম্নী টীকা হইতে ঐ অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"সহযজ্ঞ" অর্থাৎ কর্ম্মাধিকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকে সম্বোধন করিয়া প্রজাপতি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কাম্য কর্ম্মেরই উদ্‌ঘোষণা হইল। কিন্তু "মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ" এই বচনে কাম্য কর্ম্মের নিষেধও করা হইয়াছে এবং গীতাতেও কাম্য কর্ম্মের প্রসঙ্গ নাই, এজন্য ব্রহ্মার উক্তি এ স্থলে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে এ আশঙ্কা বিদূরিত হইবে। "প্রজাগণ, তোমরা কামনা করিয়া ফলপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান কারও"—ব্রহ্মা এ কথা বলেন নাই। কর্ত্তব্যানুরোধে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই ব্রহ্মার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই কর্ম্মসাধন মধ্যে যে দিব্য শক্তি নিহিত আছে, তাহারই ঘোষণার্থ ব্রহ্মা বলিলেন, "তোমরা নিয়মিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও। তাহারই অলৌকিক প্রভাবে তোমরা যখন যাহা বাসনা করিবে, তাহা সিদ্ধ হইতে থাকিবে। লোকে আম্রেরই জন্য যেমন আম্রবৃক্ষ রোপণ করে, কিন্তু ছায়া ও মুকুলের সদ্গন্ধ তাহারা বিনা চেষ্টাতেই পাইয়া থাকে, সেইরূপ কর্ত্তব্যের অনুরোধেই কর্ম্ম সাধন করিবে, কিন্তু অনুষ্ঠানের ফল কামনা না করিলেও, উহা স্বতএব প্রাপ্ত হইবে। ফলে ইচ্ছা না থাকিলেও কর্ম্মের স্বভাবগুণেই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।"

আমার বোধ হয়, আমার পাঠকের নিকট শঙ্কর ও শ্রীধরের উত্তরের ন্যায়, এ উত্তরও সন্তোষজনক হইবে না। কিন্তু বিচারে বা প্রতিবাদে আমার কোন প্রয়োজন নাই। এই সাতটি শ্লোকের ভিতর একটি রহস্য আছে, দেখাইয়া দিয়া ক্ষান্ত হইব।

গীতাকার বলিতেছেন যে—

সহযজ্ঞঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পরোবাচ প্রজাপতিঃ।*

এই কথা গীতাকার নিজে হইতে বলেন নাই। এইরূপ বিশ্বাস প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। মনুসংহিতায় আছে,

কর্ম্মাত্মনাঞ্চ দেবানাং সোঽসৃজৎ প্রাণিনাং প্রভুঃ।
সাধ্যানাঞ্চ গণং সূক্ষ্মং যজ্ঞঞ্চৈব সনাতনম্॥

১-২২। ইত্যাদি।

যজ্ঞের দ্বারা দেবগণ পরিতুষ্ট ও প্রসন্ন হয়েন, এবং যজ্ঞকারীকে অভিমত ফল দান করেন, ইহা বৈদিক ধর্ম্মের স্থূলাংশ। ইহাই লৌকিক ধর্ম্ম।

এখন পূর্ব্বপ্রচলিত প্রাচীন লৌকিক ধর্ম্মের প্রতি ধর্ম্মসংস্কারকের কিরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য? এমন লৌকিক ধর্ম্ম নাই, এবং হইতেও পারে না যে, তাহাতে উপধর্ম্মের

* ইহার অনুবাদ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

কোনও সম্বন্ধ নাই। যিনি ধর্ম্মসংস্করণে প্রবৃত্ত, তিনি সেই লৌকিক বিশ্বাসভুক্ত উপ-ধর্ম্মের প্রতি কিরূপ আচরণ করিবেন?

কেহ কেহ বলেন, তাহার একেবারে উচ্ছেদ কর্ত্তব্য। মহম্মদ তাহাই করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার পরবর্ত্তী মহাপুরুষগণের তরবারির জোর তত বেশী না থাকিলে, তিনি কৃতকার্য হইতে পারিতেন না। যীশুখ্রীষ্ট নিজে যীহুদা ধর্ম্মের উপরেই আপনার প্রচারিত ধর্ম্মতত্ত্ব সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তার পর খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম যে রোমক সাম্রাজ্য হইতে প্রাচীন উপধর্ম্মকে একেবারে দূরীকৃত করিয়াছিল, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, রোমক সাম্রাজ্যের প্রাচীন ধর্ম্ম তখন একেবারে জীবনশূন্য হইয়াছিল। যাহা জীবনশূন্য, তাহার মৃত দেহটা ফেলিয়া দেওয়া বড় কঠিন কাজ নহে। পক্ষান্তরে শাক্যসিংহের ধর্ম্ম, প্রাচীন ধর্ম্মের সঙ্গে কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই।

গীতাকারও বৈদিক ধর্ম্মের প্রতি খড়্গহস্ত নহেন। তিনি জানিতেন যে, তাঁহার কথিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ কখনও লৌকিক ধর্ম্মের সমস্ত স্থান অধিকার করিতে পারিবে না। তবে লৌকিক ধর্ম্ম বজায় থাকিলে, ইহার দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে সেই লৌকিক ধর্ম্মের বিশুদ্ধিসাধন হইতে পারিবে। এ জন্য তিনি সম্বন্ধবিচ্ছেদ করিতে ইচ্ছুক নহেন। যাঁহারা বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তাঁহাকে আমরা গণনা করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার কৃত যে বিদ্রোহ, তাহার সীমা এই পর্য্যন্ত যে, বেদে ধর্ম্ম আছে, তাহা অসম্পূর্ণ; নিষ্কাম কর্ম্মযোগাদির দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ করিতে হইবে। এই জন্য তিনি বৈদিক সকাম ধর্ম্মকে নিকৃষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু নিকৃষ্ট বলিয়া যে তাহার কোনও প্রকার গুণ নাই, এমন কথা বলেন না। তাহার গুণ সম্বন্ধে এখানে গীতাকার যাহা বলেন, বুঝাইতেছি।

যাহারা কর্ম্ম করে (সকলেই কর্ম্ম করে), তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইতেছে। প্রথম, যাহারা নিষ্কামকর্ম্মী, এবং যাহারা নিষ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারা জ্ঞানমার্গে আরোহণ করিয়াছে, তাহাদের সপ্তদশ শ্লোকে "আত্মরতি" বা "আত্মারাম" বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়, যাহারা কেবল আপন ইন্দ্রিয়সুখের জন্য কর্ম্ম করে, ষোড়শ শ্লোকে তাহাদিগকে "ইন্দ্রিয়ারাম" বলা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তৃতীয় শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা প্রচলিত ধর্ম্মানুসারে যজ্ঞাদি করিয়া যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করে। দশম হইতে পঞ্চদশ শ্লোকে তাহাদেরই কথা বলা হইল। তাহাদের অন্ততঃ এই প্রশংসা করা যাইতে পারে যে, তাহারা "ইন্দ্রিয়ারাম" নহে—প্রচলিত ধর্ম্মানুসারে চলিয়া থাকে। যদিও তাহাদের ধর্ম্ম উপধর্ম্ম মাত্র, তথাপি তাহারা ঈশ্বরোপাসক; কেন না, ঈশ্বর যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। এই কথার তাৎপর্য্য আমরা পরে বুঝিব। দেখিব যে, কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, আমি ভিন্ন দেবতা নাই। যাহারা অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারা আমারই উপাসনা করে। সে উপাসনাকে তিনি অবৈধ উপাসনা বলিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাহাও তাঁহার উপাসনা, এবং তিনিই তাহার ফলদাতা, ইহাও বলিয়াছেন।

এখন জিজ্ঞাস্য, কাহাদের মতটা উদার? যাঁহারা বলেন যে, অবৈধ উপাসনা অনন্ত নরকের পথ, না যাঁহারা বলেন যে, বৈধ হউক আর অবৈধ হউক, উপাসনা মাত্র ঈশ্বরের গ্রাহ্য? কি বৈধ আর অবৈধ, তাহা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। কাহাদের মত উদার?

যাঁহারা বলেন, জ্ঞানের অভাব জন্য উপাসক ঈশ্বর কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবে, না যাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর জ্ঞানের মাপ করেন না, উপাসকের হৃদয়ের ভাব দেখেন? কে নরকে যাইবে,—যে বলে যে, নিরাকারের উপাসনা না করিলেই অনন্ত নরক, না যে যেমন বুঝে, তেমনই উপাসনা করে?

গঙ্গা বা Caspian Sea বা আমাদের লালদীঘি, সবই জল। কিন্তু জল গঙ্গা নহে, Caspian Sea নহে বা লালদীঘি নহে। "জল মনুষ্যজীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়," বলিলে কখনও বুঝাইবে না যে, গঙ্গা মনুষ্য জীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বা Caspian Sea তজ্জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় বা লালদীঘি তজ্জন্য প্রয়োজনীয়। অতএব বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপক বলিয়া যজ্ঞ বিষ্ণু অতএব "যজ্ঞার্থে" বলিলে "বিষ্ণ্বর্থে" বুঝিতে হইবে এ কথা খাটে না।

আর কোনও অর্থ শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রেত হইতে পারে কি না এখন দেখা যাউক। আর কোন অভিপ্রায়ই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—তবে শতপথব্রাহ্মণ হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে যা হউক, একটা কিছু পাওয়া যায়। সে কথার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবগণ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করেন। সেই দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু এক জন। সেই যজ্ঞে ইনি অন্য দেবতাদিগের উপর প্রাধান্য লাভ করেন এবং তজ্জন্য যজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। অতএব এই বিষ্ণুই ঈশ্বর নহেন। আর পাঁচটা দেবতার মধ্যে এক জন মাত্র—আদৌ আর পাঁচটা দেবতার সঙ্গে সমান। শঙ্করাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যা এই যে, "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরঃ।" এখন যাঁহারা বলিলেন যে, "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইহা স্বীকার করিলে, যজ্ঞ ঈশ্বর, ইহা যে বেদে কথিত হইয়াছে, এমন কথা কোনও মতেই স্বীকার করা যায় না।

শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় পণ্ডিত দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে কেহ জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ। এক্ষণে ভারতবর্ষে কেহই নাই যে, তাঁহার পাদুকা বহন করিবার যোগ্য। তবে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া আমাদের স্মরণ করিতে হইবে যে, গীতা যে আদ্যন্ত সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম-বিনির্গত, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন বা করিতে বাধ্য। কাজেই এখানে অপরের উক্তি কিছু আছে বা জোড়াতাড়া আছে, এমন কথা তিনি মুখেও আনিতে পারেন না। পক্ষান্তরে যদি যজ্ঞের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অর্থাৎ সকাম কর্ম্মের উৎসাহ দেওয়া হয়। তাহাতে অর্থবিরোধ উপস্থিত হয়। কেন না, এ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ সকাম কর্ম্ম অপ্রশংসিত ও নিষ্কাম কর্ম্ম অনুজ্ঞাত করিয়া আসিতেছেন। এই জন্য এখানে যজ্ঞার্থে ঈশ্বর বলিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাহা বলিয়াও পরবর্ত্তী কয়টি শ্লোকের কোন উপায় হয় নাই। সে সকলে যজ্ঞার্থ কাম্য কর্ম্মই বুঝাইতে হইয়াছে। গীতায় এইরূপ কাম্য কর্ম্মের বিধি থাকার কারণ ষোড়শ শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, প্রথমে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা প্রাপ্তির জন্য অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম্ম-যোগানুষ্ঠান করিবে। ইহার জন্য "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদি যুক্তি পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে; কিন্তু অনাত্মজ্ঞানের কর্ম্ম না করার অনেক দোষ আছে, ইহাই কথিত হইতেছে।

শ্রীধর স্বামী শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী। তিনি নবম শ্লোকের ব্যাখ্যায় যজ্ঞার্থে ঈশ্বরই বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সামান্যতঃ অকর্ম্ম (কর্ম্মশূন্যতা) হইতে কাম্য কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, এই জন্য পরবর্ত্তী শ্লোক কয়টি কথিত হইয়াছে।

সেই পরবর্ত্তী শ্লোক কি, তাহা পাঠক নিম্নে জানিতে পারিবেন। তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে যদি আমরা কেহ শঙ্করাচার্য্যকৃত নবম শ্লোকের যজ্ঞ শব্দের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক না হই, তবে তাহার আর একটা সদর্থের সন্ধান করা আমাদের কর্ত্তব্য।

যজ্ঞ শব্দের মৌলিক অর্থই এখানে গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? যজ্ ধাতু দেবপূজার্থে। অতএব যজ্ঞের মৌলিক অর্থ দেবোপাসনা। যেখানে বহু দেবতার উপাসনা স্বীকৃত, সেখানে সকল দেবতার পূজা যজ্ঞ। কিন্তু যেখানে এক ঈশ্বরই সর্ব্বদেবময়, যথা—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥" ২৩॥

গীতা, ৯ অ।

সেখানে যজ্ঞার্থে ঈশ্বরারাধনা। ভগবান তাহাই স্বয়ং বলিতেছেন—

"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ" ॥ ২৪ ॥

গীতা, ৯ অ।

যজ্ ধাতু এবং যজ্ঞ শব্দ এইরূপ ঈশ্বরারাধানার্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। উপরিধৃত শ্লোকে তিনটি উদাহরণ আছে। আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে—

"ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্।"

গীতা, ২৫, ১০ অ।

"যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ।"

গীতা, ২৫, ১০ অ।

অন্য গ্রন্থেও যজ্ঞ শব্দের ঈশ্বরারাধনার্থে ব্যবহার অনেক দেখা যায়। যথা মহাভারতে—

"বাক্‌যজ্ঞেনার্চ্চিতো দেবঃ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দন।"

শান্তিপর্ব্ব, ৪৭ অধ্যায়।

এখন এই নবম শ্লোকে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বরারাধনা বুঝিলে কি প্রত্যবায় আছে? তাহা করিলে, এই শ্লোকের সদর্থও হয়, সুসঙ্গত অর্থও হয়।

কিন্তু যজ্ঞ শব্দের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবার পক্ষে কিছু আপত্তি আছে। একটি আপত্তি এই:—এই শ্লোকের পরবর্ত্তী কয় শ্লোকে যজ্ঞ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে; সেখানে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বর, এমন অর্থ বুঝায় না। "সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ", "যজ্ঞভাবিতাঃ দেবাঃ," "যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ," "যজ্ঞ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ," "যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্" ইত্যাদি প্রয়োগে যজ্ঞ শব্দে বিষ্ণু বা ঈশ্বর বুঝাইতে পারে না। এখন ৯ম শ্লোকে যজ্ঞ শব্দ এক অর্থে ব্যবহার করিয়া, তাহার পরেই দশম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ শ্লোকে ভিন্নার্থে সেই শব্দ ব্যবহার করা নিতান্ত অসম্ভব। সামান্য লেখকও এরূপ করে না, গীতা প্রণেতা যে এরূপ করিবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। হয় গীতাকর্ত্তা রচনায় নিতান্ত অপটু, নয়

শঙ্করাদিকৃত যজ্ঞ শব্দের এই অর্থ ভ্রান্ত। এ দুইয়ের একটাও স্বীকার করা যায় না। যদি তা না যায়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, হয় নবম হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত একার্থেই যজ্ঞ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, নয় নবম শ্লোকের পর একটা জোড়াতাড়া আছে।

প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, যজ্ঞ বিষ্ণুর নাম নয়। অভিধানে কোথাও নাই যে, যজ্ঞ বিষ্ণুর নাম। কোথাও এমন প্রয়োগও নাই। 'হে যজ্ঞ!' বলিলে কেহই বুঝিবে না যে, 'হে বিষ্ণো!' বলিয়া ডাকিতেছি। "বিষ্ণুর দশ অবতার" এ কথার পরিবর্ত্তে কখনও বলা যায় না যে, 'যজ্ঞের দশ অবতার'। "যজ্ঞ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বনমালী" বলিলে, লোক হাসিবে। তবে শঙ্করাচার্য্য কেন বলেন যে, যজ্ঞার্থে বিষ্ণু? কেন বলেন, তাহা তিনি বলিয়াছেন। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ"—যজ্ঞ বিষ্ণু, ইহা বেদে আছে।

শতপথব্রাহ্মণে* কথিত আছে যে, অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, মঘ, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রে তাঁহারা যজ্ঞকালে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমাদিগের মধ্যে যিনি শ্রম, তপ, শ্রদ্ধা, যজ্ঞ, আহুতির দ্বারা যজ্ঞের ফল প্রথমে অবগত হইতে পারিবেন, তিনি আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন। বিষ্ণু তাহা প্রথমে পাইলেন। তিনি দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন। এক্ষণে শতপথব্রাহ্মণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"তদ্বিষ্ণুঃ প্রথমঃ প্রাপঃ। স দেবানাং শ্রেষ্ঠোঽভবৎ। তস্মাদাহুর্বিষ্ণুর্দেবানাং শ্রেষ্ঠ ইতি। সঃ যঃ স বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ সঃ যঃ স যজ্ঞোঽসৌ স আদিত্যঃ।"

অর্থ—ইহা বিষ্ণু প্রথমে পাইলেন। তিনি দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ হইলেন। তাই বলে, বিষ্ণু, দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ যে, সেই বিষ্ণু, যজ্ঞ সেই। যে সেই যজ্ঞ, সেই আদিত্য।

পুনশ্চ তৈত্তিরীয়সংহিতায় "শিপিবিষ্টায়" শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা আছে।—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ পশবঃ শিপিঃ। যজ্ঞ এব পশুষু প্রতিতিষ্ঠতি।"† ভট্ট ভাস্কর মিশ্রও লিখিয়াছেন, "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ পশবঃ শিপিরিতি শ্রুতেঃ।"

অতএব শঙ্করাচার্য্যের কথা ঠিক—শ্রুতিতে যজ্ঞকে বিষ্ণু বলা হইয়াছে। কিন্তু কি অর্থে? একটা অর্থ হইতে পারে যে, বিষ্ণু যজ্ঞ, কেন না, সর্ব্বব্যাপী। ভট্ট ভাস্কর মিশ্রও তাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "বিষ্ণুঃ পশবঃ শিপিরিতি শ্রুতেঃ সর্ব্বপ্রাণ্যন্তর্য্যামিত্বেন প্রবিষ্ট ইত্যর্থঃ।"

এই গীতার ভিতর সন্ধান করিলেই পাওয়া যাইবে,—

"অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহগ্নিরহং হুতম্॥"

গীতা, ৯ অ, ১৬।

আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি ঘৃত, আমি অগ্নি, আমি হবন।

---

* ১৪।১।১

† ইহা আমি Muir সংগ্রহ হইতে তুলিলাম। কিন্তু একটু সন্দেহের বিষয় আছে।

যদি তাই হয়, তবে বিষ্ণু যজ্ঞ, কিন্তু যজ্ঞ বিষ্ণু নহে। বিষ্ণু সর্ব্বময়, এজন্য তিনি মন্ত্র, তিনি ঘৃত, তিনি অগ্নি, কিন্তু মন্ত্রও বিষ্ণু নহে, ঘৃতও বিষ্ণু নহে, অগ্নিও বিষ্ণু নহে। অতএব বিষ্ণু যজ্ঞ, কিন্তু যজ্ঞ বিষ্ণু নহে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা খাটে না।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

যে মনুষ্যের আত্মাতেই রতি, যিনি আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই যিনি সন্তুষ্ট, তাঁহার কার্য্য নাই। ১৭।

দ্বিবিধ মনুষ্য, এক ইন্দ্রিয়ারাম (১৫ শ্লোক দেখ), দ্বিতীয় আত্মারাম। যে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ সেই আত্মারাম; সাংখ্যযোগ তাহারই জন্য। এই শ্লোকে তাহারই কথা হইতেছে।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কেহই কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণমাত্র থাকিতে পারে না। কর্ম্ম ব্যতীত কাহারও জীবনযাত্রাও নির্ব্বাহ হয় না। আবার এখন বলা যাইতেছে যে, ব্যক্তিবিশেষের কর্ম্ম নাই। অতএব কর্ম্ম বা কার্য্য শব্দের বিশেষ বুঝিতে হইবে। বৈদিকাদি সকাম কর্ম্মই এখানে অভিপ্রেত। ভাবার্থ এই যে, যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ, তাহার পক্ষে উপরিকথিত যজ্ঞাদির প্রয়োজন নাই।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

তাঁহার কর্ম্মের কোন প্রয়োজন নাই; এবং কর্ম্ম অকরণেও কোন প্রত্যবায় নাই। সর্ব্বভূতমধ্যে কাহারও আশ্রয় ইঁহার প্রয়োজন নাই। ১৮।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯ ॥

অতএব সতত অসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিবে। পুরুষ অসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে মুক্তি লাভ করে। ১৯।

'অসক্ত' অর্থে আসক্তিশূন্য অর্থাৎ ফলকামনাশূন্য। পাঠক দেখিবেন যে, ৮ম বা ৯ম শ্লোকের পর ১৮শ শ্লোক পর্য্যন্ত বাদ দিয়া পড়িলে, এই 'তস্মাৎ' (অতএব) শব্দ অতিশয় সুসঙ্গত হয়। মধ্যে যে কয়টি শ্লোক আছে, এবং যাহার ব্যাখ্যায় এত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার পর এই 'তস্মাৎ' শব্দ বড় সঙ্গত বোধ হয় না। ৮ম শ্লোকে বলা হইল যে, কর্ম্ম না করিলে তোমার শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। ৯ম শ্লোকে বলা হইল যে, ঈশ্বর আরাধনা ভিন্ন অন্যত্র কর্ম্ম, বন্ধনের কারণ মাত্র। অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম কর, অনাসক্ত হইয়া ঈশ্বরারাধনার্থ যে কর্ম্ম, তাহার দ্বারা মনুষ্য মুক্তি লাভ করে। ৮ম, তার পর ৯ম, তার পর ১৯শ শ্লোকে পড়িলে এইরূপ সদর্থ হয়। মধ্যবর্ত্তী নয়টি শ্লোক কিছু অসংলগ্ন বোধ হয়। মধ্যবর্ত্তী কয়টি শ্লোকের যে ব্যাখ্যা হয় না, এমতও নহে। তাহা উপরে দেখাইয়াছি। অতএব এ নয়টি শ্লোক যে প্রক্ষিপ্ত, ইহা সাহস করিয়া বলিতে পারি না।

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

জনকাদি কর্ম্মের দ্বারাই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তুমিও লোকসংগ্রহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কর্ম্ম কর। ২০।

এই 'লোকসংগ্রহ' শব্দের অর্থে ভাষ্যকারেরা বুঝেন, দৃষ্টান্তের দ্বারা লোকের ধর্ম্মে প্রবর্ত্তন। শ্রীধর স্বামী বলেন যে, লোককে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তন, অর্থাৎ আমি কর্ম্ম করিলে সকলে কর্ম্ম করিবে, না করিলে অজ্ঞেরা জ্ঞানীর দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পতিত হইবে, এই লোকরক্ষণই লোকসংগ্রহ। শঙ্করও এইরূপ বুঝাইয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য বলেন, লোকের উন্মার্গপ্রবৃত্তি নিবারণ লোকসংগ্রহ। পরশ্লোকে গীতাকার এই কথা পরিষ্কার করিতেছেন।

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ ২১॥

যে যে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ লোকে আচরণ করেন, ইতর লোকেও তাহাই করে। তাঁহারা যাহা প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, লোকে তাহারই অনুবর্ত্তী হয়। ২১।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, আত্মজ্ঞানীদিগের কর্ম্ম নাই। এক্ষণে কথিত হইতেছে যে, কর্ম্ম না থাকিলেও তাঁহাদের কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। কেন না, তাঁহারা কর্ম্ম না করিলে সাধারণ লোক যাহারা আত্মজ্ঞানী নহে, তাহারাও তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম হইতে বিরত হইবে। কর্ম্ম হইতে বিরত হইলে স্ব স্ব ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে। অতএব সকলেরই কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা জ্ঞানমার্গাবলম্বী ছিলেন। জ্ঞানমার্গাবলম্বীর কর্ম্ম নাই, ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা কর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। এবং সেই দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষই কর্ম্মে অনুরাগশূন্য, সুতরাং অকর্ম্মা লোকের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া এই অধঃপতন দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভগবান্ উপরিলিখিত যে মহাবাক্যের দ্বারা কর্ম্মবাদ ও জ্ঞানবাদের সামঞ্জস্য বা একীকরণ করিলেন, ভারতবর্ষীয়েরা তাহা স্মরণ রাখিলে, তদনুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করিলে, জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই তাঁহাদের তুল্যরূপে উদ্দেশ্য হইলে, তাঁহারা কখনই আজিকার দিনের সভ্যতর জাতি হইতে নিকৃষ্টদশাগ্রস্ত হইতেন না-- পরাধীন, পরমুখাপেক্ষী, পরজাতিদত্তশিক্ষাবিপদ্গ্রস্ত হইতেন না।

শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল এই গীতাতেই কর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তিত করিয়াছেন, এমত নহে; মহাভারতে উদ্যোগপর্ব্বে সঞ্জয়যানপর্ব্বাধ্যায়েও তিনি ঐরূপ করিয়াছেন। তাহা গ্রন্থান্তরে উদ্ধৃত করিয়াছি, এখানেও উদ্ধৃত করিলাম :—

"শুচি ও কুটুম্বপরিপালক হইয়া বেদাধ্যয়ন করতঃ জীবন যাপন করিবে, এইরূপ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধি বিদ্যমান থাকিলেও ব্রাহ্মণগণের নানাপ্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কেহ কর্ম্মবশতঃ, কেহ বা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্তি লাভ হয় না, তদ্রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষ লাভ হয় না। যে সমস্ত বিদ্যা দ্বারা কর্ম্ম সংসাধন হইয়া থাকে, তাহাই ফলবতী; যাহাতে কোনও কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি নাই, সে বিদ্যা নিতান্ত নিষ্ফল; অতএব যেমন পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির জল পান করিবা মাত্র পিপাসা শান্তি হয়, তদ্রূপ ইহকালে যে সকল কর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ

হইয়া থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। হে সঞ্জয়! কর্ম্মবশতঃই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে, সুতরাং কর্ম্মই সর্ব্বপ্রধান। যে ব্যক্তি কর্ম্ম অপেক্ষা অন্য কোনও বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয়।

"দেখ, দেবগণ কর্ম্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন। সমীরণ কর্ম্মবলে সতত সঞ্চরণ করিতেছেন; দিবাকর কর্ম্মবলে আলস্যশূন্য হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন। চন্দ্রমা কর্ম্মবলে নক্ষত্রমণ্ডলীপরিবৃত হইয়া মাসার্দ্ধ উদিত হইতেছেন; হুতাশন কর্ম্মবলে প্রজাগণের কর্ম্ম সংসাধন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন; পৃথিবী কর্ম্মবলে নিতান্ত দুর্ভর ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন; স্রোতস্বতী সকল কর্ম্মবলে প্রাণিগণের তৃপ্তি সাধন করিয়া সলিলরাশি ধারণ করিতেছে। অমিতবলশালী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সেই কর্ম্মবলে দশ দিক্ ও নভোমণ্ডল হইতে বারি বর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অপ্রমত্তচিত্তে ভোগবিলাস বিসর্জ্জন ও প্রিয় বস্তুসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান্ বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয় নিরোধনপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি দেবগণের আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র, আদিত্য, যম, কুবের, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সর, বিশ্বাবসু ও নক্ষত্রগণ কর্ম্মপ্রভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন, মহর্ষিগণ ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন।"

আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিদিগেরও কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, ইহা বলিয়া ভগবান্ কর্ম্মপরায়ণতার মাহাত্ম্য আরব্ধ পরিস্ফুট করিবার জন্য নিজের কথা বলিতেছেন:—

> ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
> নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২ ॥
> যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
> মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥

হে পার্থ! এই তিন লোকে আমার কিছু মাত্র কর্ত্তব্য নাই। অপ্রাপ্ত অথবা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই, তথাপি আমি কর্ম্ম করিয়া থাকি। ২২।

কর্ম্মে অনলস না হইয়া যদি আমি কখনও কর্ম্ম না করি, তবে হে পার্থ! মনুষ্য সকলে সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথের অনুবর্ত্তী হইবে। ২৩।

এখানে বক্তা স্বয়ং ভগবান্ জগদীশ্বর। ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন নাই, কোনও বিকার নাই, সুখ দুঃখ কিছুই নাই, অতএব তাঁহার কোনও কর্ম্ম নাই। তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং জগৎ চলিবার নিয়মও করিয়াছেন, সেই নিয়মের বলে জগৎ চলিতেছে; তাহাতে তাঁহার হস্তক্ষেপণের কোনও প্রয়োজন নাই। এ জন্য তাঁহার কর্ম্ম নাই। তবে তিনি যদি মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচার জন্য ইচ্ছাক্রমে মনুষ্যশরীর ধারণ করেন, তাহা হইলে তিনি মনুষ্যধর্ম্মী বলিয়া তাঁহার কর্ম্মও আছে। যদিও তিনি নিজের ঐশী শক্তির দ্বারা সকল প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারেন, তথাপি মনুষ্যধর্ম্মিত্বহেতু কর্ম্মের দ্বারাই তাঁহাকে প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে হয়। তিনি আদর্শ মনুষ্য, কাজে কাজেই তিনি আদর্শ কর্ম্মী। অতএব তিনি কদাচ আলস্যপরবশ হইয়া কর্ম্ম না করিলে

লোকেও আদর্শ মনুষ্যের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তনে অলস ও কর্ম্মে অমনোযোগী হইবে। যে অলস ও কর্ম্মে অমনোযোগী, সে উৎসন্ন যায়। তাই ভগবান্ পুনশ্চ বলিতেছেন,—

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাধুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ॥ ২৪॥

যদি আমি কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে এই লোকসকল আমি উৎসন্ন দিব। সঙ্করের কর্ত্তা হইব এবং এই প্রজা সকলের মালিন্যহেতু হইব। ২৪।

ভাষ্যকারেরা এই সঙ্কর শব্দে বর্ণসঙ্করই বুঝিয়াছেন। হিন্দুরা জাতিগত বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য অতিশয় যত্নশীল; এ জন্য বর্ণসঙ্কর একটা কদর্য্য সামাজিক দোষ বলিয়া প্রাচীন হিন্দুদিগের বিশ্বাস। মনু বলেন, নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর জাতি রাজ্যনাশের কারণ, এবং এই গীতাতেই আছে—

"সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।"

কিন্তু আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না যে, সংসারে এত গুরুতর অমঙ্গল থাকিতে ঈশ্বরের আলস্যে বর্ণসঙ্করোৎপত্তির ভয়টাই এত প্রবল কেন? এমন ত কিছু বুঝিতে পারি না যে, ঈশ্বর বা শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ধরিয়া ব্রাহ্মণীর নিকট, ক্ষত্রিয়কে ধরিয়া ক্ষত্রিয়ার নিকট, বৈশ্যকে ধরিয়া বৈশ্যার নিকট এবং শূদ্রকে ধরিয়া শূদ্রার নিকট প্রেরণ করিয়া বর্ণসাঙ্কর্য্য নিবারণ করেন। দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, লোকক্ষয়, সর্ব্বদেশব্যাপী রোগ, হত্যা, চৌর্য্য এবং দান, তপস্যা প্রভৃতি ধর্ম্মের তিরোভাব ঈশ্বরের আলস্যে, এ সকলের কোনও শঙ্কার কথা না বলিয়া, বর্ণসাঙ্কর্য্যের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ এত ত্রস্ত কেন? সঙ্কর জাতির বাহুল্য যে আধুনিক সমাজের উপকারী, ইহাও সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। অতএব সঙ্কর অর্থে বর্ণসঙ্কর বুঝিলে, এই শ্লোকের অর্থ আমাদিগের ক্ষুদ্রবুদ্ধিগম্য হয় না।

কিন্তু সঙ্কর শব্দে বর্ণসঙ্করই বুঝিতে হইবে, সংস্কৃত ভাষায় এমন কিছু নিশ্চয়তা নাই। সঙ্কর অর্থে মিলন, মিশ্রণ। ভিন্নজাতীয় বা বিরুদ্ধভাবাপন্ন পদার্থের একত্রীকরণ ঘটিলে সাঙ্কর্য্য উপস্থিত হয়। তাহার ফল বিশৃঙ্খলা, ইংরাজিতে যাহাকে disorder বলে। শ্রীকৃষ্ণোক্তির তাৎপর্য্য এই আমি বুঝি যে, তিনি কর্ম্মবিরত হইলে, সামাজিক বিশৃঙ্খলতা ঘটিবে। আদর্শ পুরুষের দৃষ্টান্তে সকলেই আলস্যপরবশ এবং কর্ম্মে অমনোযোগী হইলে সামাজিক বিশৃঙ্খলতা যথার্থই সম্ভব।

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥ ২৫॥

হে ভারত! যেমন অবিদ্বানেরা কর্ম্মে আসক্তিবিশিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে, তেমনই লোকসংগ্রহচিকীর্ষু বিদ্বানেরা অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবেন। ২৫।

অবিদ্বানেরা ফলকামনা করিয়া কর্ম্ম করেন, বিদ্বানেরা লোকরক্ষার্থে অর্থাৎ ধর্ম্মার্থে ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবেন।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ২৬॥

বিদ্বানেরা কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। আপনারা অবহিত হইয়া ও সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়া, তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। ২৬।

যাহারা জ্ঞানী, তাঁহারা কর্ম্ম না করিলে অজ্ঞানেরা বিবেচনা করিতে পারে যে, আমাদিগেরও এই সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে ; অতএব জ্ঞানীদিগের দৃষ্টান্তদোষে অজ্ঞানদিগের এইরূপ বুদ্ধিভেদ জন্মিতে পারে।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

প্রকৃতির গুণসকলের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম ক্রিয়মাণ। কিন্তু যাহার বুদ্ধি অহঙ্কারে বিমুগ্ধ, সে আপনাকে কর্ত্তা মনে করে। ২৭।

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

হে মহাবাহো! গুণকর্ম্মবিভাগের তত্ত্ব যাঁহারা জানেন, তাঁহারা বুঝেন যে, ইন্দ্রিয়সকলই বিষয়ে বর্ত্তমান ; এ জন্য তাঁহারা কর্ম্মে আসক্ত হন না। ২৮।

যাঁহারা শরীর হইতে ভিন্ন আত্মা মানেন না, তাঁহারা উপরিব্যাখ্যাত দুই শ্লোকের দুই অর্থ বুঝিবেন না। ঐ দুই শ্লোক এবং তৎপূর্ব্বে বিদ্বান্ এবং অবিদ্বান, জ্ঞানী অজ্ঞান ইত্যাদি শব্দ যে ব্যবহৃত হইয়াছে, সে সকল এই আত্মজ্ঞান লইয়া। যাঁহার আত্মজ্ঞান আছে, অর্থাৎ যিনি জানেন যে, শরীর হইতে পৃথক্ অবিনাশী আত্মা আছেন, তাঁহাকেই বিদ্বান্ বা জ্ঞানী বলা হইতেছে। বলা হইতেছে যে, অবিদ্বান্ বা অজ্ঞানেরা কর্ম্মে আসক্ত বা ফলকামনাবিশিষ্ট, এবং বিদ্বান্ জ্ঞানীরা কর্ম্মে অনাসক্ত বা ফলকামনাশূন্য। কিন্তু এই প্রভেদ ঘটে কেন? আত্মজ্ঞান থাকিলেই ফলকামনা পরিত্যাগ করে, এবং আত্মজ্ঞান না থাকিলেই ফলকামনাবিশিষ্ট হয়, এই প্রভেদ ঘটে কেন, তাহাই এই দুই শ্লোকে বুঝান হইতেছে। ইন্দ্রিয়ের যাহা ভোগ্য, তাহাকেই বিষয় বলে। কেন না, তাহাই ইন্দ্রিয়ের বিষয়। ইন্দ্রিয়ে ও বিষয়ে যে সংযোগ সংঘটন, তাহাই কর্ম্ম। যাহার আত্মজ্ঞান নাই, যে আত্মার অস্তিত্ব অবগত নহে, সে জানে যে, ইন্দ্রিয়ে ও বিষয়ে যে সংঘটন, তাহা আমা হইতেই ঘটিল ; অতএব আমিই কর্ম্মের কর্ত্তা। "আমিই কর্ম্মের কর্ত্তা" এই বিবেচনাই অহঙ্কার। সে বুঝে যে, আমি কর্ম্ম করিয়াছি, এ জন্য আমিই কর্ম্মের ফল ভোগ করিব ; তাই সে ফল কামনা করে। আর যাঁহার আত্মজ্ঞান আছে, আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে ; ইন্দ্রিয়সকল আত্মার কোন অংশ নহে, ইহা যাঁহার বোধ আছে, তিনি জানেন যে, ইন্দ্রিয় বা প্রকৃতিই কর্ম্ম করিল। কেন না, তদ্দ্বারাই বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সুযোগ সংঘটিত হইল। আত্মা কর্ম্ম করেন নাই, সুতরাং আত্মা তাহার ফলভোগী নহেন। আত্মাই আমি ; অতএব আমি তাহার ফলভোগ করিব না, এই বোধে তাঁহার ফল কামনা করেন না। অতএব আত্মতত্ত্বজ্ঞানই নিষ্কাম কর্ম্মের মূল। এবং এই তত্ত্বের দ্বারা জ্ঞানযোগের এবং কর্ম্মযোগের সমুচ্চয় হইতেছে। জ্ঞান ব্যতীত কর্ম্ম নিষ্কাম হয় না, এবং নিষ্কাম কর্ম্ম ব্যতীত জ্ঞানের পরিপাক হয় না। নিষ্কাম কর্ম্মও অভ্যস্ত না হইলে ঘটে না। আমরা পরে দেখিব যে, কথিত হইতেছে—কর্ম্ম হইতেই জ্ঞানে আরোহণ করিতে হয়। সে কথা বলিবার কারণ এইখানে নির্দ্দিষ্ট হইল।

প্রকৃতেগু'ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

যাহারা প্রকৃতির গুণে বিমূঢ়, তাহারা ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মে অনুরাগযুক্ত হয়। এই সকল মন্দবুদ্ধি অল্পজ্ঞান ব্যক্তিদিগকে জ্ঞানিগণ বিচালিত করিবেন না। ২৯।

অর্থাৎ তাহাদিগকে কর্ম্মফলকামনা পরিত্যাগ করিতে বলিলে, তাহা তাহারা পারিবে না। তবে উপদেশ বা দৃষ্টান্তের ফলে এমত ঘটিতে পারে যে, তাহারা সকাম কর্ম্ম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবে। সকাম কর্ম্ম অভ্যস্ত না হইলে নিষ্কাম কর্ম্ম সম্ভবে না; এই জন্য তাহাদিগের বুদ্ধি বিচালিত করা বা বুদ্ধিভেদ জন্মান নিষিদ্ধ হইতেছে।

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ॥ ৩০॥

আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া অধ্যাত্ম জ্ঞানের দ্বারা নিস্পৃহ, মমতাশূন্য ও শোকশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর। ৩০।

গোড়ার কথাটা এই হইয়াছিল যে, অর্জ্জুন আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করিয়া তাদৃশ পাপ-কর্ম্মের দ্বারা রাজ্য লাভ করিতে অনিচ্ছুক; অতএব যুদ্ধ করিবেন না স্থির করিলেন। তদুত্তরে ভগবান্ প্রথমে আত্মজ্ঞানে তাঁহাকে উপদিষ্ট করিলেন। তারপর কর্ম্মের মাহাত্ম্য ও অবশ্যকর্ত্তব্যতা বুঝাইলেন। বুঝাইলেন যে, সকলকে কর্ম্ম করিতেই হয়। অন্য কর্ম্ম না করিলেও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্ম করিতে হয়। তবে যাহার আত্মজ্ঞান নাই, সে মূর্খ ফলকামনা করিয়া কর্ম্ম করে, আর যে আত্মজ্ঞানী, সে নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করে; কিন্তু নিষ্কাম হইয়াই হউক, আর সকাম হইয়াই হউক, অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিতেই হইবে। যদি করিতেই হইল, তবে নিষ্কাম হইয়া করাই ভাল; কেন না, নিষ্কাম কর্ম্মই পরম ধর্ম্ম। অতএব তুমি নিষ্কাম হইয়া, ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া, রাজ্যলাভ হইবে, না হইবে, সে চিন্তা না করিয়া, কর্ম্মের ফলাফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া, যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে যুদ্ধ কর।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ॥ ৩১॥

যে সকল মনুষ্য শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া আমার এই মতের নিত্য অনুষ্ঠান করে, তাহারা কর্ম্ম হইতে অর্থাৎ কর্ম্মফলভোগ হইতে মুক্ত হয়। ৩১।

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥ ৩২॥

যাহারা অসূয়াপরবশ হইয়া আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে না, তাহাদিগকে সর্ব্ব-জ্ঞানবিমূঢ়, বিনষ্ট এবং বিবেকশূন্য বলিয়া জানিও। ৩২।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি॥ ৩৩॥

জ্ঞানবান্ও যাহা আপন প্রকৃতির অনুকূল, সেইরূপই চেষ্টা করে। জীবগণ প্রকৃতিরই অনুগামী হয়। নিগ্রহে কোন ফল হয় না। ৩৩।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥ ৩৪॥

ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের রাগদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। তাহার বশগামী হইও না ; কেন না, তাহা শ্রেয়োমার্গের বিঘ্নকারক। ৩৪।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥ ৩৫॥

পরধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধর্ম্মের অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠানও ভাল। বরং স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, পরধর্ম্ম ভয়াবহ। ৩৫।

তেত্রিশ, চৌত্রিশ, পঁয়ত্রিশ—এই তিন শ্লোকে যাহা কথিত হইল, তাহার মর্ম্মার্থ বুঝাইতেছি। সকলেই আপন আপন প্রকৃতির বশ, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। জ্ঞানবান্ও আপন স্বভাবের অনুকূল যে কার্য্য, তাহাই করিয়া থাকেন। নিষেধ বা পীড়নের দ্বারাও আপন স্বভাবের প্রতিকূল কার্য্যে কাহাকে নিযুক্ত বা সুদক্ষ করা যায় না। কিন্তু লোকে যদি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়, তবে সে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকে। স্বধর্ম্ম কি, তাহা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যে স্বধর্ম্ম, এমন অর্থ করা যায় না। কেন না, যে সকল সমাজের মধ্যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নাই, সে সকল সমাজের প্রতি এই উপদেশ অপ্রযোক্তব্য হয়। কিন্তু ভগবদুক্ত ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন, মনুষ্য মাত্রেরই রক্ষা ও পরিত্রাণের উপায়। অতএব স্বধর্ম্ম এইরূপই বুঝিতে হইবে যে, ইহজীবনে যে, যে কর্ম্মকে আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম। যে সমাজে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচলিত, এবং যে সমাজে সে ধর্ম্ম প্রচলিত নহে, এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মীরা পুরুষপরম্পরায় একজাতীয় কার্য্যকেই আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। অন্য সমাজে, লোক আপন আপন ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, সুযোগ এবং শক্তি অনুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। শক্তি ও প্রবৃত্তির অনুযায়ী বলিয়া অথবা আজীবন অভ্যস্ত বলিয়া স্বধর্ম্মই লোকের অনুকূল। কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়াদির বশীভূত হইয়া, ধনাদির লোভে বিমুগ্ধ হইয়া, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকে পরধর্ম্ম অবলম্বন করে। তাহাদের প্রায় ঘোরতর অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা এই অমঙ্গল পারলৌকিক অবস্থা সম্বন্ধেই বুঝেন। কিন্তু ইহলোকেও যে স্বধর্ম্মত্যাগ এবং পরধর্ম্ম অবলম্বন অমঙ্গলের কারণ, তাহা আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাই। যে সকল পুরুষ স্বধর্ম্মে থাকিয়া, তাহার সদনুষ্ঠান জন্য প্রাণপণ যত্ন করেন, এবং তাহার সাধনজন্য মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করেন, তাঁহারাই ইহলোকে বীর বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকেন ; এবং স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে, তাঁহারাই ইহলোকে যথার্থ সুখী হয়েন। কিন্তু পরধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ যাহা নিজের অনুষ্ঠেয় নয়, এমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহা সুসম্পন্ন করিতে পারিলেও, কেহ যে সুখী বা যশস্বী হইতে পারিয়াছেন, এমন দেখা যায় না। অতএব পরধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধর্ম্মের অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠানও ভাল। বরং স্বধর্ম্মে মরণও ভাল, তথাপি পরধর্ম্ম অবলম্বনীয় নহে।

অর্জ্জুন উবাচ।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬॥

পরে অর্জ্জুন বলিতেছেন,—

হে বাষ্ণেয়! পুরুষ কাহার দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া পাপাচরণ করে? কাহার নিয়োগে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলের দ্বারা পাপে নিযুক্ত হয়? ৩৬।

পূর্ব্বে কথা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের রাগদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। পুরুষের ইচ্ছা না থাকিলেও সে স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া উঠে, ইহাই এরূপ কথায় বুঝায়। অর্জ্জুন এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, কেন এরূপ ঘটিয়া থাকে? কে এরূপ করায়?

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩৭॥

ইহা কাম। ইহা ক্রোধ। ইহা রজোগুণোৎপন্ন মহাশন এবং অত্যুগ্র। ইহলোকে ইহাকে শত্রু বিবেচনা করিবে। ৩৭।

আগে শব্দার্থ সকল বুঝা যাউক। রজোগুণ কি তাহা স্থানান্তরে কথিত হইবে। মহাশন অর্থে যে অধিক আহার করে। কাম দুষ্পূরণীয়, এ জন্য মহাশন।

পাঠক দেখিবেন যে, কাম ক্রোধ উভয়েরই নামোল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু একবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে বুঝায় যে, কাম ও ক্রোধ একই; দুইটি পৃথক্ রিপুর কথা হইতেছে না। ভাষ্যকারেরা বুঝাইয়াছেন যে, কাম প্রতিহত হইলে অর্থাৎ বাধা পাইলে ক্রোধে পরিণত হয়; অতএব কাম ক্রোধ একই।

তবে কথাটা এই হইল যে, স্বধর্ম্মানুষ্ঠানই শ্রেয়, কিন্তু ইহা সকলে পারে না। কেন না, স্বভাবই বলবান্; স্বভাবের বশীভূত বলিয়াই লোকে অনিচ্ছু হইয়াই পরধর্ম্মাশ্রয় করে; পাপাচরণ করে। ইহার কারণ, কামের বলশালিতা। কাম অর্থে রিপুবিশেষ না বুঝিয়া সাধারণতঃ ইন্দ্রিয় মাত্রেরই বিষয়াকাঙ্ক্ষা বুঝিলে, এই সকল শ্লোকের প্রকৃত উদার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যাইবে।

ভগবদ্বাক্যের যাথার্থ্য এবং সার্ব্বজনীনতার প্রমাণস্বরূপ পরবর্ত্তী দেশী বিদেশী ইতিহাস হইতে তিনটি উদাহরণ প্রয়োগ করিব।

প্রথম, রাজার স্বধর্ম্ম—রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন। তিনি ধর্ম্মপ্রচারক বা ধর্ম্মনিয়ন্তা নহেন। এখানে Religion অর্থে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিতেছি। কিন্তু মধ্যকালে ইউরোপে রাজগণ ধর্ম্মনিয়ন্তৃত্ব গ্রহণ করায় মনুষ্যজাতির কি ভয়ানক অমঙ্গল ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে সুপরিচিত। উদাহরণস্বরূপ St. Bartholomew, Sicilian Vespers এবং স্পেনের Inquisition, এই তিনটা নামের উত্থাপনই যথেষ্ট। কথিত আছে, পঞ্চম চার্লসের সময়ে এক Netherland দেশে দশ লক্ষ মনুষ্য কেবল রাজার ধর্ম্ম হইতে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া প্রাণে নিহত হইয়াছিল। আজকাল ইংরাজরাজ্যে ভারতবর্ষে রাজার এরূপ পরধর্ম্মাবলম্বন প্রবৃত্তি থাকিলে ভারতবর্ষে কয়জন হিন্দু থাকিত?

দ্বিতীয় উদাহরণ, বাঙ্গালা দেশে ইংরেজরাজত্বের প্রথম সময়ে। রাজার ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম। বাণিজ্য বৈশ্যের ধর্ম্ম। রাজা এই সময়ে বৈশ্যধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন—East India Company বাণিজ্যব্যবসায়ী হইয়াছিলেন। ইহার ফল ঘটিয়াছিল বাঙ্গালার শিল্পনাশ, বাণিজ্যনাশ, অর্থনাশ। বাঙ্গালার কার্পাসবস্ত্র, পট্টবস্ত্র, রেশম,

পিত্তল, কাঁসা, সব ধ্বংসপুরে গেল ;—আভ্যন্তরিক বাণিজ্য কতক একেবারে অন্তর্হিত হইল, কতক অন্যের হাতে গেল ; বাঙ্গালা এমন দারিদ্র্যসমুদ্রে ডুবিল যে, আর উঠিল না। কোম্পানিকেও শেষ বাণিজ্য ছাড়িতে হইল। মানুষ সব ছাড়ে, আফিঙ্গ ছাড়ে না। সে বাণিজ্যের এখনও আফিঙ্গটুকু আছে।

তৃতীয় উদাহরণ, আমেরিকার স্ত্রীজাতির আধুনিক স্বধর্ম্মত্যাগে ও পৌরুষ কর্ম্মে প্রবৃত্তি। ইহাতে ঘটিতেছে, স্ত্রীজাতির বৈষয়িক ভিন্ন প্রকার অবনতি, গৃহে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং জাতীয় সুখহানি। যে স্ত্রীলোক স্বর্গসম্ভূত শিশুকে স্তন্যদানে অসমর্থা, তাহাকে স্মরণ করিয়া, সহমরণাভিলাষিণী হিন্দুমহিলা অবশ্যই বলিবেন,

স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেণাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

যেমন ধূমে বহ্নি আবৃত, মলে দর্পণ এবং গর্ভ জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই কামের দ্বারা (জ্ঞান) আবৃত থাকে। ৩৮।

"জ্ঞান" শব্দটি মূলে নাই,—তৎপরিবর্ত্তে "ইদম্" আছে। কিন্তু পরশ্লোকে "জ্ঞান" শব্দই আবৃতের বিশেষ্য ; এ জন্য শ্লোকের অনুবাদেও সেইরূপ করা গেল।

৩৩শ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, জ্ঞানবান্‌ও আপন প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করে।

"সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞ্যানবানপি"

জ্ঞানবান্ জ্ঞান থাকিতে কেন এরূপ করে ? তাহাই বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন যে, জ্ঞান এই কামের দ্বারা আবৃত থাকে ; জ্ঞান এ অবস্থায় অকর্ম্মণ্য হয়।

উপমা তিনটি অতি চমৎকার ; কিন্তু উপমার কৌশল বুঝাইবার পূর্ব্বে বলা আবশ্যক, "মল" শব্দে শঙ্করাচার্য্য "মল", অর্থাৎ মলই বুঝিয়াছেন। কিন্তু শ্রীধর স্বামী বলেন, "মলেন" কি না "আগন্তুকেন"। এ অবস্থায় দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব যে "মল" শব্দের অভিপ্রেত, ইহাই বুঝিতে হইতেছে।

উপমা তিনটির প্রতি দৃষ্টি করা যাউক। যাহা উপমিত, এবং যাহা উপমেয়, উভয়ই স্বাভাবিক। বহ্নির স্বাভাবিক আবরণ ধূম ; দর্পণ থাকিলেই ছায়া বা প্রতিবিম্ব থাকিবে, নহিলে দর্পণত্ব নাই ; এবং গর্ভেরও স্বাভাবিক আবরণ জরায়ু। তেমনই জ্ঞানের আবরণ কামও স্বাভাবিক। ইহা পূর্ব্বেই কথিত আছে। উপমেয় ও উপমিত উভয়ই প্রকাশাত্মক ; বহ্নি প্রকাশাত্মক ; দর্পণ প্রকাশাত্মক ; গর্ভ প্রকাশাত্মক ;—তেমনই জ্ঞানও প্রকাশাত্মক। প্রকাশের জন্য প্রয়োজন, ক্রিয়াবিশেষ। ফুৎকারাদির দ্বারা ধূমাবরণ, অপসারণের দ্বারা বিম্বাবরণ এবং প্রসবের দ্বারা উল্বণাবরণ হইয়া অগ্নি, দর্পণ ও গর্ভের প্রকাশ হয়, তেমনই ইন্দ্রিয় দমনের দ্বারা কামাবরণ বিনষ্ট হইয়া জ্ঞানের প্রকাশ পায়। ইহা ৪১ শ্লোকে দেখিব।

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥

হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীদিগের নিত্যশত্রু, কামরূপে দুষ্পূর, এবং অগ্নিতুল্য হইয়া জ্ঞানকে আবৃত রাখে। ৩৯।

কামই জ্ঞানীদিগের নিত্যশত্রু। ভোগকালে সুখদায়ক, পরিণামে সুখদায়ক এবং ভোগকালেও যাহা নিষ্প্রয়োজনীয়, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করিয়া দুঃখদায়ক, এই জন্য নিত্যশত্রু।* ইহা দুষ্পূর—কেন না, কিছুতেই ইহার পূরণ নাই; এবং ইহা সন্তাপহেতু, এই জন্য অগ্নিতুল্য।

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥

ইন্দ্রিয় সকল মন ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠান বলিয়া কথিত হইয়াছে। জ্ঞানকে আবৃত রাখিয়া, এই সকলের দ্বারা ইহা (কাম) আত্মাকে মুগ্ধ করে। ৪০।

এই কাম কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে? ইন্দ্রিয় সকলকে এবং মন ও বুদ্ধিকে। আত্মা হইতে পৃথক্। আত্মাকে আশ্রয় করিতে পারে না। আত্মাকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখে।

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১ ॥

অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি আগে ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ত করিয়া, জ্ঞানবিজ্ঞান বিনাশী পাপস্বরূপ কামকে বিনষ্ট (বা ত্যাগ) কর। ৪১।

যদি ইন্দ্রিয়গণই কামের অধিষ্ঠানভূমি, তবে আগে ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ত করিতে হইবে। তাহা হইলে কামকে বিনষ্ট করা হইবে।

জ্ঞান বা বিজ্ঞানে প্রভেদ কি? শ্রীধর বলেন, জ্ঞান আত্মবিষয়ক, বিজ্ঞান শাস্ত্রীয় অথবা "জ্ঞান শাস্ত্রাচার্য্যের উপদেশজাত, বিজ্ঞান নিদিধ্যাসজাত।" শঙ্করাচার্য্য বলেন, "জ্ঞান শাস্ত্র হইতে আচার্য্যলব্ধ আত্মাদির অবরোধ। আর তাহার বিশেষ প্রকার অনুভবই বিজ্ঞান।" পাঠক এই ব্যাখ্যা অপেক্ষা শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল বলিয়া গ্রহণ করিবেন। আমি বুঝি যে, এইটুকু বুঝিতে পারিলেই আমাদের মত লোকের পক্ষে যথেষ্ট হইবে যে কাম সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান ও আত্মার উন্নতির বিনাশক।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

ইন্দ্রিয় সকল শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত; ইন্দ্রিয় সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ; মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধি হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ। ৪২।

এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা পরমাত্মাকে বুঝিয়া আপনাকে স্তম্ভিত করিয়া, হে মহাবাহো! তুমি কামরূপ দুরাসদ† শত্রুকে জয় কর। ৪৩।

পাঠক প্রথম ৪২ শ্লোকের প্রতি মনোযোগ করুন। ইহা অনুবাদে দুর্বোধ্য। বলা হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। মন ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ, ইত্যাদি।

* ভাষ্যকারেরা এইরূপ বলেন।
† দুরাসদ শব্দে দুর্বিজ্ঞেয়, শ্রীধর স্বামী বুঝিয়াছেন।

তবে ইন্দ্রিয়গণ কাহা হইতে শ্রেষ্ঠ? ভাষ্যকারেরা বলেন, দেহাদি হইতে। তাহাই শ্লোকের অভিপ্রায় বটে, কিন্তু আধুনিক পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ইন্দ্রিয় কি দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র?

অতএব প্রথমে বুঝিতে হয়, ইন্দ্রিয় কি। দর্শনশাস্ত্রে কহে, চক্ষুঃশ্রবণাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্তপদাদি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং মন অন্তরিন্দ্রিয়। কিন্তু এ শ্লোকে মনকে ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ বলা হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ই এখানে অভিপ্রেত।

দেহাদি হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ হইল কিসে? ভাষ্যকারেরা বলেন, ইন্দ্রিয় সকল সূক্ষ্ম ও প্রকাশক, দেহাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। কিন্তু এ কথা কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্বন্ধেই সত্য। আর জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র নহে। তবে স্পষ্টতঃ ভাষ্যকারেরা দেহাদি শব্দের দ্বারা স্থূল পদার্থ বা স্থূল ভূত অভিপ্রেত করিয়াছেন। স্থূল কথা এই যে, ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ।

বক্তার অভিপ্রায় কি, তাহা মূলে যে "আহুঃ" পদ আছে, তাহার প্রতি মনোযোগ করিলে সন্ধান পাওয়া যাইবে। বক্তা নিজের মত বলিয়া ইহা বলিতেছেন না, এইরূপ কথিত হইয়াছে বলিয়া বলিতেছেন। কে এরূপ বলিয়াছে? সাংখ্যদর্শন স্মরণ করিলেই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। তাহা বুঝাইতেছি।

সাংখ্যদর্শনে সমস্ত পদার্থ পঞ্চবিংশতি গণে বিভক্ত হইয়াছে। পর্য্যায়ক্রমে পঞ্চবিংশতি গণ এইরূপ।

১। প্রকৃতি।	৪ হইতে ১৯। পঞ্চ তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়।
২। মহৎ।	২০-২৪। পঞ্চ স্থূল ভূত।
৩। অহঙ্কার।	২৫। পুরুষ।

এই পর্য্যায়ের তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়; পঞ্চ তন্মাত্র হইতে স্থূল ভূত। পুরুষ পরমাত্মা।

এই পর্য্যায়ানুসারে স্থূল ভূত (ক্ষিত্যাদি, সুতরাং পাঞ্চভৌতিক দেহাদি) হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। এখানে মন ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্; কিন্তু সাংখ্যমতানুসারে মন ইন্দ্রিয় হইলে অন্যান্য ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ; কেন না, অন্যগুলি বহিরিন্দ্রিয়; দ্বিতীয় গণ, অহঙ্কারকে বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে বুদ্ধি বলিয়াছেন। অতএব বুদ্ধি মন হইতে শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু এমন বলিতে পারা যায় না, এই সাংখ্যদর্শন গীতাপ্রণয়নকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। তবে গীতাপ্রণয়নকালে ইহা হইতে ভিন্ন প্রকার সাংখ্যমত প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ গীতাতেই আছে। তাহারই সম্প্রসারণে কপিল-প্রচারিত সাংখ্য। গীতার সপ্তমাধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে এইরূপ গণ কথিত হইয়াছে,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

আটটি মাত্র গণ কথিত হইল, পাঁচটি স্থূল ভূত, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার। শঙ্করাচার্য্য বলেন, পঞ্চ ভূতের গণনাতেই পঞ্চ তন্মাত্র এবং ইন্দ্রিয় সকলের গণনা হইল বুঝিতে হইবে।* আর পাঠক ইহাও দেখিবেন যে, ভগবান্ বলিতেছেন যে, এই আট প্রকার আমার প্রকৃতি। অতএব কাপিল সাংখ্যের সঙ্গে এ মতের প্রভেদও অতি গুরুতর।

যাহা হউক, শ্লোকোক্ত পারম্পর্য্য কতক বুঝা গেল। কিন্তু বুদ্ধির আর একটি অর্থ আছে। নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিকে বুদ্ধি বলা যায়।† এই অর্থে বুদ্ধি শব্দ যে গীতাতেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিয়াছি। শ্লোকের অবশিষ্টাংশ বুঝিবার জন্য এই অর্থ স্মরণ করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়দমনের উপায় কথিত হইতেছে। অন্য সমস্ত অন্তঃকরণপ্রবৃত্তি হইতে শ্রেষ্ঠ যে এই নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি, পরমাত্মা তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ।

এখন ৪৩ শ্লোক সহজে বুঝিব। এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা সেই পরমাত্মাকে বুঝিয়া, আপনাকে নিশ্চল করিয়া কামকে পরাজিত করিতে হইবে। ইহার অপেক্ষা ইন্দ্রিয়জয়ের উৎকৃষ্ট উপায় আর কোথাও কখন কথিত হইয়াছে, এমন জানি না।‡

ইতি মহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

* অপি চ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৫।৬ শ্লোকে বলিতেছেন,

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥ ৫॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥ ৬॥

ইহাতে কাপিল সাংখ্যের ১৩টি গণ আছে, মন ও আত্মা, আরও সাতটি আছে। ইহা গণ বা পদার্থ বলিয়া কথিত হইতেছে না; সমস্ত জগৎকে এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার উদ্দেশ্য নাই। অতএব কাপিল সাংখ্যের মূল এইখানে আছে, এমন কথা বলা যাইতে পারে।

† বেদান্তসার—২৮।

‡ সভ্যসমাজে মনুষ্যের একটি ইন্দ্রিয় এত প্রবল দেখা যায় যে, "ইন্দ্রিয়দোষ" বলিলে সেই ইন্দ্রিয়ের দোষই বুঝায়। ইহার প্রাবল্য নিবারণের উপায় অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, অনেকে জিজ্ঞাসু হইয়াও লজ্জার অনুরোধে প্রশ্ন করিতে পারেন না। অনেকে এমনও আছেন যে, ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন বা তাঁহাকে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা ধারণ করিতে অক্ষম। অতএব ইন্দ্রিয়দমনের ক্ষুদ্রতর যে সকল উপায় আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

(১) শারীরিক ব্যায়াম। ইহাতে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্য সাধিত হয়। শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্য থাকিলে ইন্দ্রিয়ের দুষণীয় বেগ জন্মিতে পারে না।

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—

এই অব্যয় যোগ আমি সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম। সূর্য্য মনুকে বলিয়াছিলেন, মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন। ১।

এই যোগের ফল অব্যয়, এ জন্য ইহাকে অব্যয় বলা হইয়াছে। ইক্ষ্বাকু মনুর পুত্র, এবং সূর্য্যবংশীয় রাজগণের আদি পুরুষ।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ॥

এইরূপ পরম্পরাপ্রাপ্ত হইয়া এই যোগ রাজর্ষিগণ অবগত হইয়াছিলেন। হে পরন্তপ! এক্ষণে মহৎ কালপ্রভাবে সে যোগ নষ্ট হইয়াছে। ২।

(টীকা অনাবশ্যক।)

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

তুমি আমার ভক্ত ও সখা, সেই পুরাতন যোগ অদ্য আমি তোমাকে বলিলাম। এ প্রসঙ্গ উত্তম। ৩।

(টীকা অনাবশ্যক।)

অর্জ্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

---

(২) আহারের নিয়ম। উত্তেজক পানাহার পরিত্যাগ করিবে। মদ্যাদি বিশেষ নিষেধ। মৎস্য, মাংস একেবারে নিষেধ করা যায় না; বিশেষতঃ মৎস্যের অনেক সদ্‌গুণ আছে; কিন্তু মৎস্য ইন্দ্রিয়ের বিশেষ উত্তেজক। অতএব মৎস্য মাংসের অল্প ভোজনই ভাল। মৎস্য মাংসের এই দোষ জন্যই ব্রহ্মচারীর পক্ষে হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। মৎস্য হিন্দুমাত্রেরই পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

(৩) আলস্য পরিত্যাগ। আলস্য ইন্দ্রিয়দোষের একটি অতিশয় গুরুতর কারণ। আলস্যে কুচিন্তার অবসর পাওয়া যায়,—অন্য চিন্তার অভাব থাকিলে ইন্দ্রিয়সুখচিন্তাই বলবতী হয়। অন্য কর্ম্ম না থাকিলে, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি চেষ্টাই প্রবল হয়। যাঁহার বিষয়কর্ম্ম আছে, তিনি বিষয়কর্ম্মে বিশেষ মনোনিবেশ করিবেন এবং অবসরকালেও বিষয়কর্ম্মের উন্নতিচেষ্টা করিবেন। তাহাতে দ্বিবিধ শুভ ফল ফলিবে; ইন্দ্রিয়ও শাসিত থাকিবে এবং বিষয়কর্ম্মেরও উন্নতি ঘটিবে। তবে এরূপ বিষয়কর্ম্ম-চিন্তার দোষ এই ঘটে যে, লোক অত্যন্ত বিষয়ী হইয়া উঠে। সেটা মানসিক অবনতির কারণ হয়। অতএব যাঁহারা পারেন, তাঁহারা অবসরকালে সুসাহিত্য পাঠ বা বৈজ্ঞানিক

আপনার জন্ম পরে, সূর্য্যের জন্ম পূর্ব্বে, আপনি যে ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাহা কি প্রকারে বুঝিতে পারিব ? ৪ ।

(টীকা অনাবশ্যক ।)

শ্রীভগবানুবাচ ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন ।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫ ॥

আমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে, তোমারও হইয়াছে। আমি সেগুলি সকলই অবগত আছি। হে পরন্তপ ! তুমি জান না। ৫।

সহসা অবতারবাদের কথা উত্থাপিত হইল। কর্ম্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধ বুঝিবার জন্য উহার প্রয়োজন আছে। আপাততঃ এই শ্লোকগুলির ভাবে বোধ হয়, যেন অর্জ্জুন অবতারতত্ত্ব অবগত ছিলেন না। এ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ, মহাভারতের অনেক স্থলে শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে, ইহা সত্য বটে। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্র নামক মৎপ্রণীত গ্রন্থে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, মহাভারতের সকল অংশ এক সময়ের নহে ; এবং যে সকল অংশে কৃষ্ণের অবতারত্ব আরোপিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। দ্বিতীয়তঃ, মহাভারতে দশ অবতারের কথা মাত্র নাই, এক ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একত্র বিদ্যমান। তৃতীয়তঃ, দশ অবতারের কথা অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুরাণগুলিতে আছে ; কিন্তু পুরাণে আবার ভিন্ন প্রকারও আছে। ভাগবতে আছে, অবতার বাইশটি ; আবার এ কথাও বলা আছে যে, অবতার অসংখ্যেয়। শ্রীকৃষ্ণও এখানে আটটি কি দশটি,

আলোচনা করিবেন। যাঁহারা শিক্ষার অভাবে তাহাতে অক্ষম বা অননুরাগী, তাঁহারা আপনার কার্য্য শেষ করিয়া পরের কার্য্য করিবেন। পরিবারবর্গের সহিত কথোপকথন, বালকবালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার তত্ত্বাবধান, আপনার আয়ব্যয়ের তত্ত্বাবধান এবং প্রতিবাসিগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের তত্ত্বাবধানে সকলেই সমস্ত অবসরকাল অতিবাহিত করিতে পারেন। ইহাতে যাঁহাদের মন না যায়, তাঁহারা কোনও গুরুতর পরকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন। অনেকে একটা স্কুল বা একটা ডাক্তারখানা স্থাপন ও রক্ষণে ব্রতী হইয়া অনেক পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

(৪) অতি প্রধান উপায় কুসংসর্গ পরিত্যাগ। যাহারা ইন্দ্রিয়পরবশ, অশ্লীলভাষী, অশ্লীল আমোদ-প্রমোদে অনুরক্ত, তাহাদের ছায়াও পরিত্যাগ করিবে। ইহাদের দৃষ্টান্ত, প্ররোচনা ও কথোপকথনে দেবর্ষিগণও কলুষিত হইতে পারেন। সভ্য সমাজে বাসের একটি প্রধান অমঙ্গলই এই কুসংসর্গ।

(৫) সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়—কেবল ঈশ্বরচিন্তার নীচে—পবিত্র দাম্পত্য-প্রণয়। এ বিষয়ে অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই।

এই সকল কথা যদিও গীতাব্যাখ্যার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক, তথাপি ইহা লোকের পক্ষে অশেষ মঙ্গলকর বলিয়া ঐ স্থানে লিখিত হইল।

কি বাইশটির কথা বলিতেছেন না। "বহু" অবতারের কথা বলিতেছেন। ভাগবতের "অসংখ্যেয়" এবং এই "বহু" শব্দ একার্থবাচক সন্দেহ নাই।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

আমি অজ; আমি অব্যয়াত্মা; সর্ব্বভূতের ঈশ্বর; তাহা হইয়াও আপন প্রকৃতি বশীকৃত করিয়া আপন মায়ায় জন্মগ্রহণ করি। ৬।

অজ—জন্মরহিত।

অব্যয়াত্মা—যাঁহার জ্ঞানশক্তির ক্ষয় নাই (শঙ্কর)।

ঈশ্বর—কর্ম্মপারতন্ত্র্য-রহিত (শ্রীধর)।

প্রকৃতি—ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, সর্ব্বজগৎ যাহার বশীভূত।

এতদ্ব্যতীত মূলে যে "অধিষ্ঠায়" শব্দ আছে, শঙ্করাচার্য্য তাহার অর্থ "বশীকৃত্য" লিখিয়াছেন, কিন্তু শ্রীধর স্বামী "স্বীকৃত্য" লিখিয়াছেন। শঙ্করকৃত ব্যাখ্যা অধিকতর সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা গিয়াছে।

স্থূল কথা এই যে, ভগবানের কথায় এই আপত্তি হইতে পারে, যিনি জন্মরহিত, তাঁহার জন্ম হইল কি প্রকারে? জ্ঞানে মোক্ষ;—যাঁহার জ্ঞান অক্ষয়, তাঁহার জন্ম হইবে কেন? জন্ম কর্ম্মাধীন,—যিনি ঈশ্বর, এ জন্য কর্ম্মের অনধীন, তাঁহার জন্ম কেন?

উত্তরে ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্য তাহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। আমার যে স্বপ্রকৃতি, অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তম ইতি ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়া, সমস্ত জগৎ যাহার বশে আছে, যদ্দারা মোহিত হইয়া আমাকে বাসুদেব বলিয়া জানিতে পারে না, সেই প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আমি জন্মগ্রহণ করি। আপনার মায়ায়—কি না, সাধারণ লোক যেমন পরমার্থনিবন্ধন জন্মগ্রহণ করে, এ সেরূপ নহে।

শ্রীধর স্বামী একটু ভিন্ন প্রকার অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভগবান্ বলিতেছেন যে, আমি আপনার শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতি স্বীকার করিয়া, বিশুদ্ধ উজ্জ্বল সত্ত্বমূর্ত্তির দ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হই।

কথাগুলি বড় জটিল। পাঠকের বুঝিবার সাহায্যার্থ দুই একটি কথা বলা উচিত।

"মায়া" ঈশ্বরের একটি শক্তি। এই মায়া, হিন্দুদিগের ঈশ্বরতত্ত্বে, বিশেষতঃ উপনিষদে ও দর্শনশাস্ত্রে অতি প্রধান স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ বেদান্তে মায়া কিরূপে পরিচিত হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। এই গীতাতেই মায়া কিরূপ বুঝান হইয়াছে, তাহাই বুঝাইতেছি। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, তৃতীয় অধ্যায়ের ৪২ শ্লোকের টীকায় আমরা গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, আমার ভিন্ন ভিন্ন অষ্ট প্রকার প্রকৃতি। ৪। ইহা বলিয়াই বলিতেছেন—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৫॥

ইহা আমার অপরা বা নিকৃষ্টা প্রকৃতি; আমার পরা বা উৎকৃষ্ট প্রকৃতিও জান। ইনি জীবভূতা, এবং ইনি জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। ৫।

তবে ঈশ্বরের যে শক্তি জীবস্বরূপা, এবং যাহা জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, তাহাই তাঁহার পরা প্রকৃতি বা মায়া। আপনার জীবস্বরূপা এই শক্তিতে ভগবান্ জীবসৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শক্তিকে বশীভূত করিয়া আপনার স্বত্বকে জীবরূপী করিতে পারেন।

ঈশ্বর শরীর ধারণপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইতে পারেন না, ইহার বিচার নিষ্প্রয়োজন; কেন না, তিনি ইচ্ছাময় ও সর্ব্বশক্তিমান্,—পারেন না, এমন কথা বলিলে তাঁহার শক্তির সীমা নির্দ্দেশ করা হয়। ঈশ্বর শরীরী হইয়া অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহার বিচার আমি গ্রন্থান্তরে* যথাসাধ্য করিয়াছি—পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। আর শরীর ধারণপূর্ব্বক ঈশ্বর অবতীর্ণ হওয়ার কোন প্রয়োজন আছে কি না, ভগবান্ নিজেই পরশ্লোকদ্বয়ে তাহা বলিতেছেন।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ ৭॥
পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮॥

যে যে সময়ে ধর্ম্মের ক্ষীণতা এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সেই সময়ে আপনাকে সৃজন করি। ৭।

সাধুগণের পরিত্রাণহেতু, দুষ্কৃতকারীদিগের বিনাশার্থ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি†। ৮।

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥ ৯॥

হে অর্জ্জুন! আমার জন্ম কর্ম্ম দিব্য। ইহা যে তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হয়, সে পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয় না,—আমাকে প্রাপ্ত হয়। ৯।

দিব্য অর্থে "অপ্রাকৃত", "ঐশ্বর" বা "অলৌকিক"।

ভগবানের মানবিক জন্ম কর্ম্ম তত্ত্বতঃ জানিলে মোক্ষলাভ হইবে কেন? আমি কৃষ্ণচরিত্রবিষয়ক গ্রন্থে এইরূপ বুঝাইয়াছি যে, মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রকাশের জন্য ভগবানের মানবদেহ ধারণ। অন্য উদ্দেশ্য সম্ভবে না। আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ কর্ম্মী। অতএব কর্ম্মযোগীর পক্ষে আদর্শ কর্ম্মীর কর্ম্ম তত্ত্বতঃ বুঝা আবশ্যক। তদ্ব্যতীত কর্ম্মযোগ, অন্ধকারে লোষ্ট্রক্ষেপ। যদি ইহা না স্বীকার করা যায়, তবে কর্ম্মযোগ কথনকালে এই

* কৃষ্ণচরিত্র, প্রথম খণ্ড।
† এই সকলের কথাও আমি কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম খণ্ডে বিচার করিয়াছি। পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

অবতারতত্ত্ব উত্থাপনের কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। যিনি ভগবানের আদর্শকর্ম্মিত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিবেন, তিনি কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থ বিস্তারশঃ পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন। আর একটা অর্থ না হয়, এমন নহে। যাহাকে দার্শনিকেরা জ্ঞানমার্গ কহেন, তাহার অর্থ এইরূপ প্রসিদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির পথ। ব্রহ্মকে জানিতে হইবে, কিন্তু ব্রহ্ম কি? ব্রহ্ম নিরাকার, নিরঞ্জন, অপরিচ্ছিন্ন, নিত্য, শুদ্ধমুক্ত, সত্য জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। এই ব্রহ্মকে জানিলেই মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু অবতীর্ণ এবং শরীর-বিশিষ্ট যে ঈশ্বর, তাঁহাকে নিরাকার ইত্যাদি বলা যাইতে পারে না। তবে কি অবতীর্ণ এবং শরীরবিশিষ্ট ঈশ্বরের জ্ঞানে কোনও ফলোদয় নাই, তাঁহার উপাসনায় মুক্তির সম্ভাবনা নাই? এই শ্লোকে সে সংশয় নিরাকৃত হইতেছে। অবতীর্ণ এবং শরীরী ঈশ্বরের দিব্য জন্ম কর্ম্ম তত্ত্বতঃ জানিলেও মুক্তিলাভ হইতে পারে। কিন্তু তত্ত্বতঃ জানিতে হইবে। যাহাকে তাহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া জানিলে সে লাভ নাই।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥ ১০॥

বীতরাগভয়ক্রোধ, মন্ময়, আমাতে উপাশ্রিত, জ্ঞানতপস্যার দ্বারা পূত অনেকে মদ্ভাবগত হইয়াছে। ১০।

প্রথমে কথার অর্থ। রাগ—অনুরাগ। মন্ময়—ব্রহ্মবিৎ, ঈশ্বরভেদজ্ঞানরহিত। আমাতে উপাশ্রিত। শঙ্কর বলেন, কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ; শ্রীধর বলেন, মৎপ্রসাদলব্ধ মদ্ভাবগত, ঈশ্বরভাবগত, মোক্ষপ্রাপ্ত।

ভাষ্যকারেরা বলেন যে, এ কথা এখানে বলিবার কারণ এই যে, আমাতে ভক্তিবাদ এই নূতন প্রচারিত হইতেছে না। পূর্ব্বেও অনেকে ঈদৃশ জ্ঞানতপের দ্বারা মোক্ষলাভ করিয়াছেন। তাহাই বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ এইটুকু বুঝা কর্ত্তব্য যে, যাঁহারা আদর্শ কর্ম্মীর কর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিয়া কর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহাদেরই কথা হইতেছে। পরবর্ত্তী পঞ্চদশ শ্লোক পাঠ করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। ইহা বুঝিতে না পারিলে কর্ম্মযোগের সঙ্গে এই সকল কথার কোনও সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

নিষ্কাম কর্ম্মের পক্ষে রাগভয়ক্রোধ থাকিবে না, ঈশ্বরে অভেদ জ্ঞান থাকিবে, এবং জ্ঞান ও তপের (Spiritual culture) দ্বারা চরিত্র বিশুদ্ধীকৃত হইবে। তাহা না হইলে কর্ম্ম নিষ্কাম হইবে না।

সকলেই নিষ্কামকর্ম্মী হইতে পারে না। যাহারা সকাম কর্ম্ম করে, তাহাদের কর্ম্মের কি কোন ফল নাই? ঈশ্বর সকল কর্ম্মের ফলবিধাতা। ইহা পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে কথিত হইতেছে।—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ১১॥

যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি। মনুষ্য সর্ব্বপ্রকারে আমার পথের অনুবর্ত্তী হয়। ১১।

অগ্রে প্রথম চরণ বুঝা যাউক। অর্জ্জুন বলিতে পারেন, "প্রভো! আসল কথাটা কি, তা ত এখনও বুঝাও নাই। নিষ্কাম কর্ম্মেই তোমাকে পাইব, আর সকাম কর্ম্মে

কিছু পাইব না কি ? সেগুলো কি পণ্ডশ্রম ?" ভগবান্ এই সংশয়চ্ছেদ করিতেছেন। সকলেই একই প্রকার চিত্তভাবের অধীন হইয়া আমার উপাসনা করে না। যে যে-ভাবে আমার উপাসনা করে, তাহাকে সেইরূপ ফল দান করি। যে যাহা কামনা করিয়া আমার উপাসনা করে, তাহার সেই কামনা পূর্ণ করি। যে কোনও কামনা করে না,—অর্থাৎ যে নিষ্কাম, সে আমায় পায়। কামনাভাবে তাহার কামনা পূর্ণ হয় না, কিন্তু সে আমায় পায়।

তার পর দ্বিতীয় চরণ। "মনুষ্য সর্ব্বপ্রকারে আমার পথের অনুবর্ত্তী হয়," এ কথার অর্থ সহসা এই বোধ হয় যে, "আমি যে পথে চলি, মানুষ সর্ব্বপ্রকারে সেই পথে চলে।" এখানে সে অর্থ নহে—গীতাকারের "Idiom" ঠিক আমাদের "Idiom" সঙ্গে মিলিবে, এমন প্রত্যাশা করা যায় না। এ চরণের অর্থ এই যে, "উপাসনার বিষয়ে মনুষ্য যে পথই অবলম্বন করুক না, আমি যে পথে আছি, সেই পথেই মানুষকে আসিতে হইবে।" "মানুষ যে-দেবতারই পূজা করুক না কেন, সে আমারই পূজা করা হইবে; কেন না, এক ভিন্ন দেবতা নাই। আমিই সর্ব্বদেব—অন্য দেবের পূজার ফল আমিই কামনানুরূপ দিই। এমন কি, যদি মানুষ দেবোপাসনা না করিয়া কেবল ইন্দ্রিয়াদির সেবা করে, তবে সেও আমার সেবা। কেন না, জগতে আমি ছাড়া কিছু নাই—ইন্দ্রিয়াদিও আমি, আমিই ইন্দ্রিয়াদিস্বরূপে ইন্দ্রিয়াদির ফল দিই। ইহা নিকৃষ্ট ও দুঃখময় ফল বটে, কিন্তু যেমন উপাসনা ও কামনা, তদনুরূপ ফল দান করি।"

পৃথিবীর বহুবিধ উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত আছে। কেহ নিরাকারের, কেহ সাকারের উপাসনা করেন। কেহ একমাত্র জগদীশ্বরের, কেহ বহু দেবতার উপাসনা করেন; কোনও জাতি ভূতযোনির, কোনও জাতি বা পিতৃলোকের, কেহ সজীবের, কেহ নির্জ্জীবের, কেহ মনুষ্যের, কেহ গবাদি পশুর, কেহ বা বৃক্ষের বা প্রস্তরখণ্ডের উপাসনা করে। এই সকলই উপাসনা; কিন্তু ইহার মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ আছে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সে উৎকর্ষাপকর্ষ কেবল উপাসকের জ্ঞানের পরিমাণ মাত্র। যে নিতান্ত অজ্ঞ, সে পথিপার্শ্বে পুষ্পচন্দনসিন্দূরাক্ত শিলাখণ্ড দেখিয়া, তাহাতে আবার পুষ্প চন্দন সিন্দূর লেপিয়া যায়; যে কিঞ্চিৎ জানিয়াছে, সে না হয়, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃতির পরিমাণজ্ঞান সম্বন্ধে দুই জনেই প্রায় তুল্য অন্ধ। যে হিমালয় পর্ব্বতকে বল্মীক-পরিমিত মনে করে, আর যে তাহাকে বপ্র-পরিমিত মনে করে, এ উভয়ে সমান অন্ধ। ব্রহ্মবাদীও ঈশ্বরস্বরূপ অবগত নহেন—শিলাখণ্ডের উপাসকও নহে। তবে একজনের উপাসনা ঈশ্বরের নিকট গ্রাহ্য, আর একজনের অগ্রাহ্য, ইহা কি প্রকারে বলা যাইবে ? হয় কাহারও উপাসনা ঈশ্বরের গ্রাহ্য নহে, নয় সকল উপাসনাই গ্রাহ্য। স্থূল কথা, উপাসনা আমাদিগের চিত্তবৃত্তির, আমাদের জীবনের পবিত্রতা সাধন জন্য—ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন জন্য নহে। যিনি অনন্ত আনন্দময়, যিনি তুষ্টি অতুষ্টির অতীত, উপাসনা দ্বারা আমরা তাঁহার তুষ্টিবিধান করিতে পারি না। তবে ইহা যদি সত্য হয় যে, তিনি বিচারক—কেন না, কর্ম্মের ফলবিধাতা—তবে যাহা তাঁহার বিশুদ্ধ স্বভাবের অনুমোদিত, সেই উপাসনাই তাঁহার গ্রাহ্য হইতে পারে। যে উপাসনা কপট, কেবল লোকের কাছে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভের উপায়স্বরূপ, তাহা তাঁহার গ্রাহ্য নহে—

কেন না, তিনি অন্তর্যামী। আর যে উপাসনা আন্তরিক, তাহা ভ্রান্ত হইলেও তাঁহার কাছে গ্রাহ্য। যিনি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক বা তপশ্চারী, তাঁহার উপাসনা যদি কেবল লোকের কাছে পসার করিবার জন্য হয়, তাহার অপেক্ষা যে অভাগী পুত্রের মঙ্গল কামনায় ষষ্ঠীতলায় মাথা কুটে, তাহার উপাসনাই অধিক পরিমাণে ভগবানের গ্রাহ্য বলিয়া বোধ হয়।

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিলে, পৃথিবীতে আর ধর্ম্মগত পার্থক্য থাকে না;—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান, জৈন, নিরাকারবাদী, সাকারবাদী, বহুদেবোপাসক, জড়োপাসক, সকলেই সেই এক ঈশ্বরের উপাসক—যে পথে তিনি আছেন, সেই পথে সকলেই যায়। এই শ্লোকোক্ত ধর্ম্মই জগতে একমাত্র অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম। এক মাত্র সর্ব্বজনাবলম্বনীয় ধর্ম্ম। ইহাও প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্মের তুল্য উদার ধর্ম্ম আর নাই—আর এই শ্লোকের তুল্য উদার মহাবাক্যও আর নাই।

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥ ১২ ॥

ইহলোকে যাহারা কর্ম্মসিদ্ধি কামনা করে, তাহারা দেবগণের আরাধনা করে। এবং শীঘ্র মনুষ্যলোকেই তাহাদের কর্ম্মসিদ্ধি হয়। ১২।

অর্থাৎ সচরাচর মনুষ্য কর্ম্মফল কামনা করিয়া দেবগণের আরাধনা করে এবং ইহলোকেই সেই অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হয়।

সে ফল সামান্য। নিষ্কাম কর্ম্মের ফল অতি মহৎ। তবে মহৎ ফলের আশা না করিয়া, লোকে সামান্য ফলের চেষ্টা করে কেন? ইহা মনুষ্যের স্বভাব যে, যে-সুখ শীঘ্র পাওয়া যাইবে, তাহা ক্ষুদ্র হইলেও, মনুষ্য তাহারই চেষ্টা করে।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে আমি চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি তাহার (সৃষ্টি) কর্ত্তা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা ও বিকার-রহিত জানিও। ১৩।

হিন্দুশাস্ত্রের সাধারণ উক্তি এই যে ব্রাহ্মণ বর্ণ সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহু হইতে, বৈশ্য উরু হইতে এবং শূদ্র চরণ হইতে সৃষ্ট হয়। কিন্তু গুণকর্ম্মবিভাগশঃ চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্ট হইয়াছে, এই কথা হিন্দুশাস্ত্রের কথিত সাধারণ উক্তির সঙ্গে আপাততঃ সঙ্গত বোধ হয় না। নানা কারণে এ কথাটার বিস্তারিত বিচার আবশ্যক।

প্রথমতঃ দেখা যায়, হিন্দুশাস্ত্রের কথিত সাধারণ উক্তির আদি বিখ্যাত পুরুষসূক্তে।

ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের নবতিতম সূক্তকে পুরুষসূক্ত কহে। উহার প্রথম ঋক্ "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ" ইত্যাদি ব্রাহ্মণগণ আজিও বিষ্ণুপূজাকালে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ—যাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, বৈদিক কালে জাতিভেদ ছিল না,—তাঁহারা বলেন যে, এই সূক্ত আধুনিক। আমাদের সে বিচারে প্রয়োজন নাই। বৈদিকসূক্ত সবই অতি প্রাচীন, ইহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। আমার বলিবার কথা, ঐ সূক্তে যাহা আছে, তাহাতে ঠিক

এমন বুঝায় না যে, মুখ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছে, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে, ইত্যাদি। সেই ঋকৃগুলি উদ্ধৃত করিতেছি—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত ॥"

শূদ্রের সম্বন্ধে "অজায়ত" বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ সেই পুরুষের মুখ হইলেন এবং ক্ষত্রিয় বাহু (কৃত) হইলেন।* বৈশ্য সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে যে, ইঁহার উরুই বৈশ্য।

বেদের মধ্যে কেবল তৈত্তিরীয় সংহিতায় পাওয়া যায় যে, প্রজাপতি মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, মধ্যভাগ হইতে (মধ্যতঃ) বৈশ্য, এবং চরণ হইতে শূদ্র সৃষ্টি করিলেন।

* ডাক্তার হোগ এই ঋক্ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "Now, according to this passage, which is the most ancient and authoritative, we have on the origin of Brahmanism, and *caste in general*, the Brahmana has not come from the mouth of this primary being, the Purusha, but the mouth of the latter became the Brahmanichal caste, that is to say, was transformed into it. The passage has no doubt an allegorical sense. (বেদের অনেক সূক্তে তাই) Mouth is the seat of speech. The allegory points out that the Brahmans are teachers and instructors of mankind. The arms are the seat of strength. If the two arms of the Purusha are said to have been made of Kshattriya (warrior), that means, then, that the Kshattriya have to carry arms to defend the empire. That the thighs of the Purusha were transformed into Vaisya, that, as the lower parts of the body are the principal repository of food taken, the Vaisya caste is destined to provide food for the others." এটুকু বড় কষ্ট কল্পনা,—উরুতে ডাল ভাত যায় না—কিন্তু এ সকল স্থানে উদর শব্দের প্রয়োগও হিন্দুশাস্ত্রে দেখা যায়। যথা—মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ৪৭ অধ্যায়ে—

"ব্রহ্ম বক্ত্রং ভুজৌ ক্ষত্রং কৃৎস্নমূরূদরং বিশঃ" তার পর "The creation of the Sudra from the feet of the Purusha indicates that he is destined to be a servant to the others, just as the foot supports the other parts of the body as a firm support." *Dr. Haug on the origin of Brahmanism*, p. 4.

Dr. Muir-ও বলেন, "It is indeed said that the Sudra sprang from Purusha's feet; but as regards the three superior castes and the members with which they are respectively connected, it is not quite

কিন্তু বেদের অন্যান্য ভাগে চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি অন্য প্রকার কথিত হইয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে, যথা—

"ভূরিতি বৈ প্রজাপতিব্রর্হ্ম অজনয়ত। ভুব ইতি ক্ষত্রং স্বরিতি বিশম্।" শূদ্রের কথা নাই।*

পুনশ্চ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে—

"ঋগ্‌ভ্যো জাতং বৈশ্যং বর্ণমাহুঃ যজুর্ব্বেদং ক্ষত্রিয়স্যাহুর্যোনিম্। সামবেদো ব্রাহ্মণানাং প্রসূতিঃ।† অর্থাৎ সামবেদ হইতে ব্রাহ্মণের, যজুর্ব্বেদ হইতে ক্ষত্রিয়ের এবং ঋগ্বেদ হইতে বৈশ্যের জন্ম। এখানেও শূদ্রের কথা নাই।

উদাহরণস্বরূপ এই মতগুলি উদ্ধৃত করা গেল। এমন আরও অনেক আছে। সকল উদ্ধৃত করিতে গেলে পাঠকের বিরক্তিকর হইবে। স্থূল কথা, হিন্দুশাস্ত্রে চাতুর্ব্বর্ণ্য উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা প্রকার মত আছে। শ্রীকৃষ্ণও যাহা বলিতেছেন, তাহাও সাধারণ মত হইতে ভিন্ন বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে। তিনি বলেন না যে, আমি আমার অঙ্গবিশেষ হইতে বর্ণবিশেষ সৃষ্টি করিয়াছি। তিনি বলেন, গুণকর্ম্মের বিভাগানুসারে করিয়াছি। প্রথম দেখা যাউক, গুণ কাহাকে বলে।

সত্ত্বরজস্তম এই তিন গুণ। ভাষ্যকারেরা বলেন, সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ, তাহাদিগের কর্ম্ম শমদমাদি, সত্ত্বরজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়, তাহাদিগের কর্ম্ম শৌর্য্য যুদ্ধাদি; রজস্তমঃপ্রধান বৈশ্য, তাহাদিগের কর্ম্ম কৃষিবাণিজ্যাদি; তমঃপ্রধান শূদ্র, তাহাদিগের কর্ম্ম অন্য তিন বর্ণের সেবা। এইরূপ গুণকর্ম্মের বিভাগ অনুসারে সৃষ্টি করিয়াছি, ইহাই ভগবদভিপ্রায়।

এক্ষণে যে জন্মিবে, সে গর্ভে জন্মিবার পূর্ব্বেই সত্ত্বগুণাধিক্য, রজোগুণাধিক্য বা তমোগুণাধিক্য ইত্যাদি প্রকৃতি সৃষ্ট হয়?

যিনি বলিবেন যে, আগে জীবের জন্ম, তার পর তাহার সত্ত্বপ্রধানাদি স্বভাব, তাঁহাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, মনুষ্যের বংশানুসারে নহে, গুণানুসারে তাহার ব্রাহ্মণত্বাদি। ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই তাহাকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে, এমন নহে; সত্ত্বগুণপ্রধান স্বভাব হইলে শূদ্রের পুত্র হইলেও ব্রাহ্মণ হইবে এবং ব্রাহ্মণের পুত্রের তমোগুণপ্রধান স্বভাব হইলে সে শূদ্র হইবে, ভগবদ্বাক্য হইতে ইহাই সহজ উপলব্ধি।

আমি যে একটা নূতন মত নিজে গড়িয়া প্রচার করিতেছি, তাহা নহে। প্রাচীন কালে, শঙ্কর শ্রীধরের অনেক পূর্ব্বে প্রাচীন ঋষিগণও এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মতত্ত্বে তাহার কিছু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, যথা—

ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥

---

clear which (*i.e.*) the castes or the members are to be taken as subjects, and which as the predicates, and consequently, whether we are to suppose verse 12, (উদ্ধৃত ঋক্) to declare that the three castes were the members or conversely that the three members were, or became the three castes." *Sanskrit Texts*, Vol. II, p. 15, 2nd edition.

* ২। ১। ৪। ১১ ইত্যাদি। † ৩। ১২। ৯। ২

পুনশ্চ—

অগ্নিহোত্রব্রতপরান্ স্বাধ্যায়নিরতান্ শুচীন্।
উপবাসরতান্ দান্তাংস্তান্ দেবা ব্রাহ্মণান্ বিদুঃ॥
ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

গৌতমসংহিতা।

ক্ষমাবান্, দমশীল, জিতক্রোধ, এবং জিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে, আর সকলে শূদ্র। যাহারা অগ্নিহোত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, উপবাসরত, দান্ত, দেবতারা তাঁহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে রাজন্! জাতি পূজ্য নহে, গুণই কল্যাণকারক। চণ্ডালও বৃত্তস্থ হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

পুনশ্চ, মহাভারতের বনপর্ব্বে মার্কণ্ডেয়সমস্যাপর্ব্বাধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়ে ঋষিবাক্য আছে, "পাতিত্যজনক কুক্রিয়াসক্ত, দাম্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রসদৃশ হয়, আর যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি। কারণ, ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়।" পুনশ্চ বনপর্ব্বে অজগরপর্ব্বাধ্যায়ে ১৮০ অধ্যায়ে রাজর্ষি নহুষ বলিতেছেন, "বেদমূলক সত্য, দান, ক্ষমা, আনৃশংস্য, অহিংসা ও করুণা শূদ্রেও লক্ষিত হইতেছে। যদ্যপি সত্যাদি ব্রাহ্মণধর্ম্ম শূদ্রেও লক্ষিত হইল, তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে।" তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, "অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণলক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, অতএব শূদ্রবংশ্য হইলেই যে শূদ্র হয়, এবং ব্রাহ্মণবংশ্য হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহারাই শূদ্র।"

কিন্তু হইতেছিল নিষ্কাম ও সকাম কর্ম্মের কথা, কর্ম্মের ফলকামনার কথা,—চাতুর্ব্বর্ণ্যের কথা আসিল কেন? কথাটা বলা হইয়াছে যে, কেহ ইহকালে আশুলভ্য ফলের কামনায় দেবাদির যজনা করে, কেহ বা নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া থাকে। লোকের মধ্যে এরূপ বিসদৃশ আচরণ দেখা যায় কেন? তাহাদিগের প্রকৃতিভেদবশতঃ। এই প্রকৃতিভেদই চাতুর্ব্বর্ণ্য বা বর্ণভেদ। কিন্তু এই বর্ণভেদ কেন? ঈশ্বরেচ্ছা। ঈশ্বর ইহা করিয়াছেন। তবে ঈশ্বর কি কর্ম্ম করেন? করেন বৈ কি। কিন্তু এরূপ কর্ম্ম করিয়াও তিনি অকর্ত্তা। কেন না, তিনি অব্যয়। তিনি যদি অব্যয়, তবে তিনি কর্ম্মফলের অধীন হইতে পারেন না—তাহার সুখ দুঃখ, হ্রাস বৃদ্ধি নাই। যদি তিনি ফলের অধীন নহেন, তবে তাঁহার কৃত কর্ম্ম নিষ্কাম। তিনি নিষ্কামকর্ম্মী। মনুষ্যেও সেই জন্য নিষ্কাম না হইলে ঈশ্বরে মিলিত হইতে পারে না। জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হওয়াই মুক্তি। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব নিষ্কামস্বভাব পরমাত্মায় সকাম জীবাত্মা লীন হইতে পারে না। নিষ্কামকর্ম্মীই মুক্তির অধিকারী।

ঈশ্বর কর্ম্ম করেন, এ কথা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের শিষ্যেরা মানিবেন না। তাঁহারা বলিবেন, ঈশ্বর কর্ম্ম করেন না; যাহা হয়, তাহা তাঁহার সংস্থাপননিয়মে (Law) নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু সেই নিয়ম সংস্থাপনও কর্ম্ম। যাঁহারা বলিবেন, সেই সকল নিয়ম জড়ের গুণ, যদি তাঁহারা জড়কে ঈশ্বরসৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন, তবে

তাঁহারা ঈশ্বরের কর্ম্মকারিত্ব স্বীকার করিলেন। যাঁহারা তাহাও স্বীকার করেন না, তাঁহারা অনীশ্বরবাদী, তাঁহাদের সঙ্গে ঈশ্বরের কর্ম্মকারিত্ব সম্বন্ধে কোন বিচারই নাই।

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥

কর্ম্মসকল আমাকে লিপ্ত করে না। আমারও কর্ম্মে ফলস্পৃহা নাই। এইরূপ আমায় যে জানে, সে কর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ হয় না। ১৪।

ঈশ্বরের নিষ্কামকর্ম্মিত্ব না জানিলে, নিষ্কাম কর্ম্ম বুঝা যায় না। তাহা জানিলে কর্ম্ম নিষ্কাম হইবে। তাহা হইলে সকাম কর্ম্মরূপ বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। পূর্ব্বশ্লোকের যে টীকা দেওয়া গিয়াছে, তাহাতে এ কথা পরিস্ফুট করা গিয়াছে।

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতমং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

এইরূপ জানিয়া পূর্ব্বকালের মোক্ষাভিলাষিগণ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তুমি পূর্ব্বগামী-দিগের পূর্ব্বকাল-কৃত কর্ম্ম সকল কর। ১৫।

অর্থাৎ প্রাচীন কালে যাঁহারা মোক্ষকাম, তাঁহারা আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া— কর্ম্মের ফলভোগী নহি, ইহা জানিয়া কর্ম্ম করিতেন। তুমিও সেইরূপ কর্ম্ম কর।

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬।

কর্ম্ম কি, অকর্ম্ম কি, পণ্ডিতেরাও তাহা বুঝিতে পারেন না। অতএব কর্ম্ম কি, তাহা তোমাকে বলিতেছি। তাহা জানিলে, অশুভ হইতে মুক্ত হইবে। ১৬।

অকর্ম্ম অর্থে এখানে মন্দ কর্ম্ম নহে—অকর্ম্ম অর্থে কর্ম্মশূন্যতা।

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥

কর্ম্ম কি, তাহা বুঝিতে হইবে, বিকর্ম্ম কি, তাহা বুঝিতে হইবে, এবং অকর্ম্ম কি, তাহা বুঝিতে হইবে। কর্ম্মের গতি দুর্জ্ঞেয়। ১৭।

কর্ম্ম—অর্থে বিহিত কর্ম্ম, যাহা যথার্থ কর্ম্ম।

বিকর্ম্ম—অবিহিত কর্ম্ম।

অকর্ম্ম—কর্ম্মত্যাগ, কর্ম্মশূন্যতা।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্মঃ যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

যে কর্ম্মেতেও কর্ম্মশূন্যতা দেখে, এবং অকর্ম্মেও কর্ম্ম দেখে, সেই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্। সেই যোগযুক্ত ; এবং সেই সর্ব্বকর্ম্মকারী। ১৮।

ভগবদারাধনা কর্ম্ম ; কিন্তু তাহাতে কর্ম্মের যে বন্ধকতা, তাহা ঘটে না, এই জন্য তাহাকে কর্ম্মস্বরূপ বিবেচনা করিবে না। আর যে কর্ম্ম বিহিত, তাহা না করিলে তাহার ফলভাগী হইতে হয়, ফলভাগিত্ব মুক্তির রোধক ; এ জন্য না করাকেই, অর্থাৎ অকর্ম্মকেই কর্ম্ম বিবেচনা করিবে। শ্রীধরের টীকার মর্ম্মার্থ এই। ইহাতে এ শ্লোকে হইতে ইহাই পাওয়া যায় যে, ভগবদারাধনাই কর্ত্তব্য। অন্যান্য অনুষ্ঠান মুক্তির বিঘ্ন।

শঙ্করাচার্য্য অন্যরূপ বুঝাইয়াছেন। তিনি এই শ্লোক উপলক্ষে একটি দীর্ঘ এবং জটিল প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার স্থূল কথা এই—আত্মাক্রিয়ানির্লিপ্ত; কর্ম্ম ইন্দ্রিয়াদির দ্বারাই কৃত হইয়া থাকে; কিন্তু ভ্রমক্রমেই আত্মাতে কর্ম্মারোপ হইয়া থাকে। যিনি ইহা জানেন, তিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখেন। আর ইন্দ্রিয়াদি বিহিতানুষ্ঠানে বিরত হইলেও সেই অকর্ম্মকেও তিনি ইন্দ্রিয়াদির কর্ম্ম দেখেন।

কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, পরবর্ত্তী শ্লোকের উপর দৃষ্টি রাখিলে একটা সোজা অর্থ পাওয়া যায়। কামসঙ্কল্প-বিবর্জ্জিত, ফলকামনাশূন্য যে কর্ম্ম, সে অকর্ম্ম—কর্ম্মশূন্যতা। আর যিনি অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে বিরত, তাঁহার কর্ত্তব্য-বিরতির ফলভাগিত্ব আছেই আছে—অতএব এখানে কর্ম্মশূন্যতাও কর্ম্ম। কেন না, ফলোৎপত্তির কারণ। যিনি ইহা বুঝিতে পারেন, তিনিই জ্ঞানী।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥

যাঁহার সকল চেষ্টা কাম ও সঙ্কল্পবর্জ্জিত, এবং যাঁহার কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ, তাঁহাকেই জ্ঞানিগণ পণ্ডিত বলেন। ১৯।

"কামসঙ্কল্প" এই পদের অর্থের উপর শ্লোকের গৌরব কিয়ৎপরিমাণে নির্ভর করে। শঙ্করাচার্য্যকৃত এই অর্থ,—"কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ", "কামৈস্তৎকারণৈশ্চ সঙ্কল্পৈর্বর্জ্জিতাঃ। শ্রীধরকৃত ব্যাখ্যা এই, "কাম্যতে ইতি কামঃ। ফলং তৎসঙ্কল্পেন বর্জ্জিতাঃ।" মধুসূদন সরস্বতী বলেন, "কামঃ ফলতৃষ্ণা। সঙ্কল্পোঽহং করোমীতি কর্তৃত্বাভিমানস্তাভ্যাং বর্জ্জিতাঃ"। এইরূপ নানা মুনির নানা মত। মধুসূদন সরস্বতীকৃত সঙ্কল্প শব্দের অর্থ আভিধানিক নহে, কিন্তু এখানে খুব সঙ্গত। শঙ্করাচার্য্যকৃত, কাম এবং তাহার কারণ সঙ্কল্প উভয়-বিবর্জ্জিত হইলে কর্ম্মে প্রবৃত্তির অভাব জন্মিবে। যে কর্ম্ম করিবার অভিলাষ রাখে, এবং ফল কামনা করে না, সে কর্ম্ম করিবে কেন? এ জন্য শঙ্করাচার্য্য নিজেই বলিয়াছেন, "মুধৈব চেষ্টামাত্রম্ অনুষ্ঠীয়ন্তে প্রবৃত্তেন চেল্লোকসংগ্রহার্থং নিবৃত্তেন জীবন-যাত্রার্থং।" অর্থাৎ ঈদৃশ ব্যক্তির সমারম্ভসকল অনর্থক চেষ্টা মাত্র। প্রবৃত্তিমার্গে কেবল লোকশিক্ষার্থ, এবং নিবৃত্তিমার্গে কেবল জীবনযাত্রানির্ব্বাহার্থ। পাঠকদিগের নিকট আমার বিনীত নিবেদন যে, তাহা হইলেও কামও সঙ্কল্পবর্জ্জিত হইল না।

মধুসূদন সরস্বতীও "লোকশিক্ষার্থং" ও "জীবনযাত্রার্থং" কথা দুইটি রাখিয়াছেন, কিন্তু "কামসঙ্কল্পবর্জ্জিত" পদের তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পাঠক নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারেন। ফলতৃষ্ণা এবং অহঙ্কাররহিত যে কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহাই বিহিত, এবং তাহাই কর্ম্মশূন্যতা।

সচরাচর লোকে ফলকামনাতেই কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়—এবং আমি এই কর্ম্ম করিতেছি বা করিয়াছি, এই অহঙ্কার তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। ভগবদভিপ্রায় এই যে, দুইয়ের অভাবই কর্ম্মের লক্ষণ, কর্ম্মে তদুভয়ের অভাবই কর্ম্মশূন্যতা।

এইরূপ বুঝিলেই কি আপত্তির মীমাংসা হইল? হইল বৈ কি। ফলকামনাতেই লোকে সচরাচর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু ফলকামনা ব্যতীত যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায় না, এমন নহে। যদি তাই হইত, তাহা হইলে নিষ্কাম শব্দের অর্থ নাই—এমন বস্তুর

অস্তিত্ব নাই। যদি তাই হইত, তাহা হইলে গীতার এক ছত্রেরও কোন মানে নাই। কথাটা পূর্ব্বে বুঝান হয় নাই। এখন বুঝান যাউক।

কতকগুলি কার্য্য আছে, যাহা মনুষ্যের অনুষ্ঠেয়। যে সে কর্ম্মের ফলকামনা করে না, তাহারও পক্ষে অনুষ্ঠেয়। এমন মনুষ্য আছে সন্দেহ নাই, যে জীবন রক্ষা কামনা করে না—মরিতে পারিলেই তাহার সব যন্ত্রণা ফুরায়। কিন্তু আত্মজীবন রক্ষা তাহার অনুষ্ঠেয়। যে শূলরোগী আত্মহত্যা করে, সে পাপ করে সন্দেহ নাই। শত্রুর জীবন-রক্ষা সচরাচর কেহ কামনা করে না, কিন্তু শত্রু মজ্জনোন্মুখ বা অন্য প্রকারে মৃত্যুকবল-গ্রস্তপ্রায় দেখিলে তাহার রক্ষা আমাদের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। শত্রুকে উদ্ধারকালে মনে হইতে পারে, "আমার চেষ্টা নিষ্ফল হইলেই ভাল।" এখানে ফলকামনা নাই, কিন্তু কর্ম্ম আছে।

তবে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, নিষ্কাম কর্ম্মে ফলসিদ্ধির চেষ্টা নাই, এমন কথা বলাও যায় না, এবং গীতার সে অভিপ্রায়ও নয়। মুক্তিই যাহার উদ্দেশ্য, সে মুক্তি কামনা করে এবং মুক্তিপ্রাপ্তির উপযোগী চেষ্টা করে। কাম শব্দ গীতায় বা অন্যত্র এমন অর্থে ব্যবহার হয় না যে, তাহারও ফলসিদ্ধির চেষ্টা বুঝায় না। মনে কর, স্বদেশের বা স্বজাতির হিতসাধন একটি অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। যে স্বদেশহিতের চেষ্টা করে, সে যে স্বদেশের হিতকামনা করিয়া, সে চেষ্টা করে না, এমন কখনই হইতে পারে না। অতএব কাম শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারিটি অপবর্গ—পুরুষার্থ। পুরুষার্থে ইহা ভিন্ন আর কোন প্রয়োজন নাই। যাহা ধর্ম্ম, অর্থ অর্থাৎ ঐহিক ধন সৌভাগ্যাদি এবং মোক্ষ, এই তিনের অতিরিক্ত, তাহাই কাম। এই জন্য কাম্য কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গাদি লাভ সাধনাকে কাম শব্দে অভিহিত করা যায়। কিন্তু সেই কাম্যকর্ম্মজনিত যে সুখভোগ, সে আপনার সুখ। অতএব কামের উদ্দিষ্ট যে সুখ—তাহা নিজের সুখ—পরের মঙ্গল নহে। যে কর্ম্মের উদ্দেশ্য পরহিতাদি, তাহাই নিষ্কাম। যে কর্ম্মের উদ্দেশ্য নিজহিত, তাহা নিষ্কাম নহে।

কাম শব্দ মহাভারতের অন্যত্র বিশেষ করিয়া বুঝান আছে।

> ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ পঞ্চানাং মনসো হৃদয়স্য চ।
> বিষয়ে বর্ত্তমানানাং যা প্রীতিরুপজায়তে।
> স কাম ইতি মে বুদ্ধিঃ কর্ম্মণাং ফলমুত্তমম্॥

পাঁচটি ইন্দ্রিয়, মন, এবং হৃদয়, স্ব স্ব বিষয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া যে প্রীতি উপভোগ, আমার বিবেচনায় তাহাই কাম। তাহাই কর্ম্মের উত্তম ফল।

অতএব কাম অর্থে আত্মসুখ।

এখন সেই স্বদেশহিতৈষীর উদাহরণ মনে কর। যদি স্বদেশহিতৈষী কেবল মাত্র স্বদেশের হিতকামনা করিয়া কর্ম্ম করেন, তবে তাঁহারই কর্ম্ম নিষ্কাম। আর যদি আপনার যশ মান সম্ভ্রম উন্নতি প্রভৃতির বাসনায় স্বদেশের ইষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তিনি সকামকর্ম্মা।

সম্পাদকের নিবেদন

'প্রচার' পত্রিকায় বঙ্গাব্দ ১২৯৩ সনের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে ১২৯৫ সনের ফাল্গুন সংখ্যা পর্য্যন্ত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' প্রকাশিত হয়—তাতে দ্বিতীয় অধ্যায় পর্যন্ত ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯শ শ্লোক পর্যন্ত আলোচনা পাণ্ডুলিপি অবস্থায় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র দিব্যেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মৃত্যুর পরে সেই অংশ 'প্রচার'-এ প্রকাশ করান, এবং পরে তা পুস্তকাকারেও মুদ্রিত হয়।

—সম্পাদক, ব. র. স.।

দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম

হিন্দুধর্ম্ম

সম্প্রতি সুশিক্ষিত বাঙ্গালিদিগের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের আলোচনা দেখা যাইতেছে। অনেকেই মনে করেন যে, আমরা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ভক্তিমান্ হইতেছি। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে আহ্লাদের বিষয় বটে। জাতীয় ধর্ম্মের পুনর্জ্জীবন ব্যতীত ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই, ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের প্রতি এইরূপ অনুরাগযুক্ত, তাঁহাদিগকে আমাদিগের গোটাকত কথা জিজ্ঞাস্য আছে। প্রথম জিজ্ঞাস্য, হিন্দুধর্ম্ম কি? হিন্দুয়ানিতে অনেক রকম দেখিতে পাই। হিন্দু হাঁচি পড়িলে পা বাড়ায় না, টিকটিকি ডাকিলে "সত্য সত্য" বলে, হাই উঠিলে তুড়ি দেয়, এ সকল কি হিন্দুধর্ম্ম? অমুক শিয়রে শুইতে নাই, অমুক আস্যে খাইতে নাই, শূন্য কলসী দেখিলে যাত্রা করিতে নাই, অমুক বারে ক্ষৌরী হইতে নাই, অমুক বারে অমুক কাজ করিতে নাই, এ সকল কি হিন্দুধর্ম্ম? অনেকে স্বীকার করিবেন যে, এ সকল হিন্দুধর্ম্ম নহে। মূর্খের আচার মাত্র। যদি ইহা হিন্দুধর্ম্ম হয়, তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমরা হিন্দুধর্ম্মের পুনর্জ্জীবন চাহি না।*

এক্ষণে শুনিতে পাইতেছি যে, হিন্দুধর্ম্মের নিয়মগুলি পালন করিলে শরীর ভাল থাকে। যথা একাদশীর ব্রত স্বাস্থ্যরক্ষার একটি উত্তম উপায়। তবে শরীররক্ষার ব্রতই কি হিন্দুধর্ম্ম? আমরা একটি জমিদার দেখিয়াছি। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং অত্যন্ত হিন্দু। তিনি অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া কি শীত কি বর্ষা প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করেন এবং তখনই পূজাহ্নিকে বসিয়া বেলা আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত অনন্যমনে তাহাতে নিযুক্ত থাকেন। পূজাহ্নিকের কিছুমাত্র বিঘ্ন হইলে, মাথায় বজ্রাঘাত হইল, মনে করেন। তার পর অপরাহ্ণে নিরামিষ শাকান্ন ভোজন করিয়া একাহারে থাকেন,—ভোজনান্তে জমিদারী কার্য্যে বসেন। তখন কোন্ প্রজার সর্ব্বনাশ করিবেন, কোন্ অনাথা বিধবার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইবেন, কাহার ঋণ ফাঁকি দিবেন, মিথ্যা জাল করিয়া কাহাকে বিনাপরাধে জেলে দিতে হইবে, কোন্ মোকদ্দমার কি মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করিতে হইবে, ইহাতেই তাঁহার চিত্ত নিবিষ্ট থাকে, এবং যত্ন পর্য্যাপ্ত হয়। আমরা জানি যে, এ ব্যক্তির পূজা আহ্নিকে, ক্রিয়া কর্ম্মে, দেবতা ব্রাহ্মণে আন্তরিক ভক্তি, সেখানে কপটতা কিছু নাই। জাল করিতে করিতেও হরিনাম করিয়া থাকেন। মনে করেন, এ সময় হরি-স্মরণ করিলে এ জাল করা আমার অবশ্য সার্থক হইবে। এ ব্যক্তি কি হিন্দু?

---

* পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় যে-হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত, তাহা আমাদের মতে কখনই টিকিবে না, এবং তাঁহার যত্ন সফল হইবে না। এইরূপ বিশ্বাস আছে বলিয়া, আমরা তাঁহার কোন কথার প্রতিবাদ করিলাম না।

আর একটি হিন্দুর কথা বলি। তাঁহার অভক্ষ্য প্রায় কিছুই নাই। যাহা অস্বাস্থ্যকর, তাহা ভিন্ন সকলই খান। এবং ব্রাহ্মণ হইয়া এক আধটু সুরাপান পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। যে কোন জাতির অন্ন গ্রহণ করেন। যবন ও ম্লেচ্ছের সঙ্গে একত্র ভোজনে কোন আপত্তি করেন না। সন্ধ্যা আহ্নিক ক্রিয়া কর্ম্ম কিছুই করেন না। কিন্তু কখন মিথ্যা কথা কহেন না। যদি মিথ্যা কথা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্ব্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়—অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন। নিষ্কাম হইয়া দান ও পরহিত সাধন করিয়া থাকেন। যথাসাধ্য ইন্দ্রিয় সংযম এবং অন্তরে ঈশ্বরকে ভক্তি করেন। কাহাকে বঞ্চনা করেন না, কখন পরস্ব কামনা করেন না। ইন্দ্রিয়াদি দেবতা আকাশাদি ঈশ্বরের মূর্ত্তি স্বরূপ এবং শক্তি ও সৌন্দর্য্যের বিকাশ স্বরূপ বিবেচনা করিয়া, সে সকলের মানসিক উপাসনা করেন। এবং পুরাণকথিত শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বগুণসম্পন্ন ঈশ্বরের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত করেন। হিন্দুধর্ম্মানুসারে গুরুজনে ভক্তি, পুত্র কলত্রাদির সস্নেহ প্রতিপালন, পশুর প্রতি দয়া করিয়া থাকেন। তিনি অক্রোধ ও ক্ষমাশীল। এ ব্যক্তি কি হিন্দু? এ দুই ব্যক্তির মধ্যে কে হিন্দু? ইহাদের মধ্যে কেহই কি হিন্দু নয়? যদি না হয়—তবে কেন নয়? ইহাদের মধ্যে কাহাতেও যদি হিন্দুয়ানি পাইলাম না, তবে হিন্দুধর্ম্ম কি? এক ব্যক্তি ধর্ম্মভ্রষ্ট, দ্বিতীয় ব্যক্তি আচারভ্রষ্ট। আচার ধর্ম্ম, না ধর্ম্মই ধর্ম্ম? যদি আচার ধর্ম্ম না হয়, ধর্ম্মই ধর্ম্ম হয়, তবে এই আচারভ্রষ্ট ধার্ম্মিক ব্যক্তিকেই হিন্দু বলিতে হয়। তাহাতে আপত্তি কি?

ইহার উত্তরে অনেকে বলিবেন যে, এ ব্যক্তি হিন্দুশাস্ত্রবিহিত আচারবান্ নহে, এজন্য এ হিন্দু নহে। কোথায় এ হিন্দুধর্ম্মের স্বরূপ পাইব?

এ সকল লোকের বিশ্বাস যে, হিন্দুশাস্ত্রেই হিন্দুধর্ম্ম আছে। এই হিন্দুশাস্ত্র কি? শাস্ত্র তো অনেক। যে সকল গ্রন্থকে শাস্ত্র বলা যায়, তাহার যেখানে যাহা আছে, সকলই কি হিন্দুধর্ম্ম? যদি কোন গ্রন্থ হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া এ দেশে মান্য হয়, তবে সে 'মনুসংহিতা'। মনুতে আছে যে, যুদ্ধকালে শত্রুসেনা যে তড়াগপুষ্করিণ্যাদির জলে স্নান পানাদি করে, তাহা নষ্ট করিবে।* যে হিন্দুধর্ম্মে তৃষিতকে এক গণ্ডূষ জলদানের অপেক্ষা আর পুণ্য নাই বলে, সেই হিন্দুধর্ম্মেরই এই গ্রন্থে বলিতেছে যে, সহস্র সহস্র লোককে জলপিপাসাপীড়িত করিয়া প্রাণে মারিবে। এটা কি হিন্দুধর্ম্ম? যদি হয়, তবে এরূপ নৃশংস ধর্ম্মের পুনর্জ্জীবনে কি ফল? বস্তুতঃ এ হিন্দুধর্ম্ম নহে, যুদ্ধনীতি মাত্র,—কি উপায়ে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ক উপদেশ। যদি ইহা হিন্দুধর্ম্ম হয়, তবে এ হিন্দুধর্ম্মে মন্বাদি অপেক্ষা মোল্‌ত্‌কে ও নেপোলিয়ন্ অধিক অভিজ্ঞ।

স্থূল কথা এই, মনুতে যাহা কিছু আছে, তাহাই যে ধর্ম্ম নহে, ইহা এক উদাহরণেই সিদ্ধ হইতেছে। এ সকলকে যদি ধর্ম্ম বলা যায়, তবে সে ধর্ম্ম শব্দের অপব্যবহার। যখন বলি, চোরের ধর্ম্ম লুকাচুরি, তখন যেমন ধর্ম্ম শব্দ অর্থান্তরে প্রযুক্ত হয়, এ সকল

* ভিন্দ্যাচ্চৈব তড়াগানি প্রাকারোপরিখাস্তথা ইত্যাদি। ৭ম অধ্যায়, ১৯৬।

বিধিকে "রাজধর্ম্ম" ইত্যাদি বলা, সেইরূপ। তবে মনুতে যাহা পাই, তাহাই যদি ধর্ম্ম নহে, তবে জিজ্ঞাস্য, মনুর কোন্ উক্তিগুলিতে হিন্দুধর্ম্ম আছে এবং কোন্‌গুলিতে নাই, এ কথা কে মীমাংসা করিবে? যদি মন্বাদি ঋষিরা অভ্রান্ত হন, তবে তাঁহাদের সকল উক্তিগুলিই ধর্ম্ম—যদি তাহাই ধর্ম্ম হয়, তবে ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, হিন্দুধর্ম্মানুসারে সমাজ চলা অসাধ্য। মনু হইতেই একটা উদাহরণ দিয়া আমরা দেখাইতেছি। মনে কর, কাহারও পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত। হিন্দুশাস্ত্রমতে শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে হইবে। কাহাকে নিমন্ত্রণ করিবে? মনুতে নিষেধ আছে যে, যে রাজার বেতনভুক্, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে বাণিজ্য করে, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে টাকার সুদ খায়, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে বেদাধ্যয়নশূন্য, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে পরলোক মানে না, তাহাকে খাওয়াইবে না; যাহার অনেক যজমান, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে চিকিৎসক, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে শ্রৌতস্মার্ত্ত অগ্নি পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে শূদ্রের নিকট অধ্যয়ন করে, কি শূদ্রকে অধ্যয়ন করায়, যে ছল করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করে, যে দুর্জ্জন, যে পিতামাতার সহিত বিবাদ করে, যে পতিত লোকের সহিত অধ্যয়ন করে, ইত্যাদি বহুবিধ লোককে খাওয়াইবে না। এমন কথাও আছে যে, মিত্র ব্যক্তিকেও ভোজন করাইবে না। ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, মনুর এই বিধি অনুসারে চলিলে শ্রাদ্ধকর্ম্মে আজিকার দিনে একটিও ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না। সুতরাং শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্য পরিত্যাগ করিতে হয়। অথচ যে বাপের শ্রাদ্ধ করিল না, তাহাকেই হিন্দু বলি কি প্রকারে? এইরূপ ভূরি ভূরি উদাহরণের দ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, সর্ব্বাংশে শাস্ত্রসম্মত যে হিন্দুধর্ম্ম, তাহা কোনরূপে এক্ষণে পুনঃসংস্থাপিত হইতে পারে না; কখন হইয়াছিল কি না, তদ্বিষয়ে সন্দেহ। আর হইলেও সেরূপ হিন্দুধর্ম্মে এক্ষণে সমাজের উপকার হইবে না, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত বলা যাইতে পারে।

যদি সমস্ত শাস্ত্রের সঙ্গে সর্ব্বাংশে সংমিলিত যে হিন্দুধর্ম্ম, তাহা পুনঃসংস্থাপনের সম্ভাবনা না থাকে, তবে এক্ষণে আমাদিগের কি করা কর্ত্তব্য? দুইটি মাত্র পথ আছে। এক, হিন্দুধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করা, আর এক হিন্দুধর্ম্মের সারভাগ অর্থাৎ যেটুকু লইয়া সমাজ চলিতে পারে, এবং চলিলে সমাজ উন্নত হইতে পারে, তাহাই অবলম্বন করা। হিন্দুধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করা আমরা ঘোরতর অনিষ্টকর মনে করি। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন, তাঁহাদের আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্ত্তে আর কোন নূতন ধর্ম্ম সমাজে প্রচলিত হওয়া উচিত, না সমাজকে একেবারে ধর্ম্মহীন রাখা উচিত? যে সমাজ ধর্ম্মশূন্য, তাহার উন্নতি দূরে থাকুক, বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।* আর তাঁহারা যদি বলেন যে, হিন্দুধর্ম্মের পরিবর্ত্তে

* অনেকে বলেন যে, ধর্ম্ম (Religion) পরিত্যাগ করিয়া কেবল নীতিমাত্র অবলম্বন করিয়া সমাজ চলিতে পারে ও উন্নত হইতে পারে। এ কথার প্রতিবাদের এ স্থান নহে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, এমন কোন সমাজ দেখা যায় নাই যে, ধর্ম্ম ছাড়িয়া, কেবল নীতিমাত্র অবলম্বন করিয়া উন্নত হইয়াছে। দ্বিতীয়, এই নাস্তিবাদীরা যাহাকে নীতি বলেন, তাহা বাস্তবিক ধর্ম্ম বা ধর্ম্মমূলক।

ধর্ম্মান্তরকে সমাজ আশ্রয় করুক, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, কোন্ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিতে হইবে ? পৃথিবীতে আর যে কয়টি শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আছে, বৌদ্ধধর্ম্ম, ইস্লামধর্ম্ম এবং খৃষ্টধর্ম্ম, এই তিন ধর্ম্মই ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহার আসন গ্রহণ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে ; কেহই হিন্দুধর্ম্মকে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। ইস্লাম কতকগুলা বন্যজাতি এবং হিন্দুনামধারী কতকগুলা অনার্য্য জাতিকে অধিকৃত করিয়াছে বটে, কিন্তু ভারতীয় প্রকৃত আর্য্যসমাজের কোন অংশ বিচলিত করিতে পারে নাই। ভারতীয় আর্য্য হিন্দু ছিল, হিন্দুই আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মকে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া দিয়া দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম রাজার ধর্ম্ম হইয়াও কদাচিৎ একখানি চণ্ডালের বা পোদের গ্রাম অধিকার, অথবা দুই এক জন কুক্কুট-মাংস-লোলুপ ভদ্রসন্তানকে দখল ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারে নাই। যখন বৌদ্ধধর্ম্ম, ইস্লামধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্মের স্থান অধিকার করিতে পারে নাই, তখন আর কোন্ ধর্ম্মকে তাহার স্থানে এখন স্থাপিত করিব ? ব্রাহ্মধর্ম্মের আমরা পৃথক্ উল্লেখ করিলাম না, কেন না, ব্রাহ্মধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের শাখা মাত্র। ইহার এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই, যাহাতে মনে করা যাইতে পারে যে, ইহা ভবিষ্যতে সামাজিক ধর্ম্মে পরিণত হইবে।

যখন ধর্ম্মশূন্য সমাজের বিনাশ নিশ্চিত, যদি হিন্দুধর্ম্মের স্থান অধিকার করিবার শক্তি আর কোন ধর্ম্মেরই নাই, তখন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা ভিন্ন হিন্দুসমাজের আর কি গতি আছে ? তবে হিন্দুধর্ম্ম লইয়া একটা গণ্ডগোলে পড়িতে হইতেছে। আমরা দেখিয়াছি যে, শাস্ত্রোক্ত যে ধর্ম্ম, তাহার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করিয়া কখন সমাজ চলিতে পারে না—এখনও—চলিতেছে না—এবং বোধ হয়, কখন চলে নাই। তা ছাড়া একটা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম আছে ; তৎকর্ত্তৃক শাস্ত্রের কতক বিধি রক্ষিত এবং কতক পরিত্যক্ত এবং অনেক অশাস্ত্রীয় আচার-ব্যবহার-বিধি তাহাতে গৃহীত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের কি সপক্ষ কি বিপক্ষ সকলেই স্বীকার করেন যে, এই বিমিশ্র এবং কলুষিত হিন্দুসমাজের উন্নতি হইতেছে না। তাই আমরা বলিতেছিলাম যে, যেটুকু হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম, যেটুকু সারভাগ, যেটুকু প্রকৃত ধর্ম্ম, সেইটুকু অনুসন্ধান করিয়া আমাদের স্থির করা উচিত। তাহাই জাতীয় ধর্ম্ম বলিয়া অবলম্বন করা উচিত। যাহা প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম নহে, যাহা কেবল অপবিত্র কলুষিত দেশাচার বা লোকাচার, ছদ্মবেশে ধর্ম্ম বলিয়া হিন্দুধর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, যাহা কেবল অলীক উপন্যাস, যাহা কেবল কাব্য, অথবা প্রত্নতত্ত্ব, যাহা কেবল ভণ্ড এবং স্বার্থপরদিগের স্বার্থসাধনার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং অজ্ঞ ও নির্ব্বোধগণ কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, যাহা কেবল বিজ্ঞান, অথবা ভ্রান্ত এবং মিথ্যা বিজ্ঞান, যাহা কেবল ইতিহাস, অথবা কেবল কল্পিত ইতিহাস, কেবল ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে বিন্যস্ত বা প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় ধর্ম্ম বলিয়া গণিত হইয়াছে, সে সকল এখন পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি, শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সর্ব্ববিধ উন্নতি হয়, তাহাই ধর্ম্ম। এইরূপ উন্নতিকর তত্ত্ব লইয়া সকল ধর্ম্মেরই সারভাগ গঠিত, এইরূপ উন্নতিকর তত্ত্বসকল, সকল ধর্ম্মাপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মেই প্রবল। হিন্দুধর্ম্মেই তাহার প্রকৃত সম্পূর্ণতা আছে। হিন্দুধর্ম্মে যেরূপ আছে, এরূপ আর কোন ধর্ম্মেই নাই। সেইটুকু সারভাগ। সেইটুকুই হিন্দুধর্ম্ম। সেটুকু ছাড়া আর যাহা থাকে—শাস্ত্রে

থাকুক, অশাস্ত্রে থাকুক বা লোকাচারে থাকুক—তাহা অধর্ম্ম। যাহা ধর্ম্ম তাহা সত্য, যাহা অসত্য, তাহা অধর্ম্ম। যদি অসত্য মনুতে থাকে, মহাভারতে থাকে বা বেদে থাকে, তবু অসত্য, অধর্ম্ম বলিয়া পরিহার্য্য।

এ কথায় দুইটি গোল ঘটে। প্রথম, বেদাদিতে অসত্য বা অধর্ম্ম আছে, বা থাকিতে পারে, এ কথা অনেকেই স্বীকার করিবেন না। এমন কথা শুনিলেঅনেকে কানে আঙ্গুল দিবেন। এ সম্প্রদায়ের জন্য আমরা লিখিতেছি না। তাঁহাদের যা হোক্ একটা ধর্ম্ম অবলম্বন আছে। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে আস্থাশূন্য হইয়াছেন, অথচ অন্য কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের জন্যই লিখিতেছি। তাঁহারা এ কথা অস্বীকার করিবেন না।

আর একটি গোলযোগ এই যে, হিন্দুশাস্ত্রের কোন্ কথা সত্য, কোন্ কথা মিথ্যা, ইহার মীমাংসা কে করিবে? কোন্টুকু ধর্ম্ম, কোন্টুকু ধর্ম্ম নয়? কোন্টুকু সার, কোন্টুকু অসার? উত্তর, আপনাদেরই তাহার মীমাংসা করিতে হইবে। সত্যের লক্ষণ আছে। যেখানে সেই লক্ষণ দেখিব, সেইখানেই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিব। যাহাতে সে লক্ষণ না দেখিব, তাহা পরিত্যাগ করিব। অতএব প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম নিরূপণ পক্ষে, আগে দেখিতে হইবে, হিন্দুশাস্ত্রে কি কি আছে।

কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র অগাধ সমুদ্র। তাহার যথোচিত অধ্যয়নের অবসর অল্প লোকেরই আছে। কিন্তু সকলে পরস্পরের সাহায্য করিলে, সকলেরই কিছু কিছু উপকার হইতে পারে। আমরা সে বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন করিব।—'প্রচার" ১ম বর্ষ, পৃ-১৫-২৩।

বেদ

বেদ, হিন্দুশাস্ত্রের শিরোভাগে। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং আর সকল শাস্ত্রের আকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। অন্য শাস্ত্রে যাহা বেদাতিরিক্ত আছে, তাহা বেদমূলক বলিয়া চলিয়া যায়। যাহা বেদে নাই বা বেদবিরুদ্ধ, তাহাও বেদের দোহাই দিয়া পাচার হয়। অতএব, আগে বেদের কিছু পরিচয় দিব।

সকলেই জানেন, বেদ চারিটি—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায় যে, বেদ তিনটি—ঋক্, যজুঃ, সাম। অথর্ব্ব সে সকল স্থানে গণিত হয় নাই। অথর্ব্ব বেদ অন্য তিন বেদের পর সঙ্কলিত হইয়াছিল কি না, সে বিচারে আমাদের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

কিম্বদন্তী আছে যে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, বেদকে এই চারি ভাগে বিভক্ত করেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, আগে চারি বেদ ছিল না, এক বেদই ছিল। বাস্তবিক দেখা যায় যে, ঋগ্বেদের অনেক শ্লোকার্দ্ধ যজুর্ব্বেদে ও সামবেদে পাওয়া যায়। অতএব এক সামগ্রী চারি ভাগ হইয়াছে ইহা বিবেচনা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

যখন বলি, ঋক্ একটি বেদ, যজুঃ একটি বেদ, তখন এমন বুঝিতে হইবে না যে, ঋগ্বেদ একখানি বই বা যজুর্ব্বেদ একখানি বই। ফলতঃ এক একখানি বেদ লইয়া এক একটি ক্ষুদ্র লাইব্রেরী সাজান যায়। এক একখানি বেদের ভিতর অনেকগুলি গ্রন্থ আছে।

একখানি বেদের তিনটি করিয়া অংশ আছে, মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ। মন্ত্রগুলির সংগ্রহকে সংহিতা বলে, যথা—ঋগ্বেদসংহিতা, যজুর্ব্বেদসংহিতা। সংহিতা, সকল বেদের

এক একখানি, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ অনেক। যজ্ঞের নিমিত্ত বিনিয়োগাদি সহিত মন্ত্রসকলের ব্যাখ্যা সহিত গদ্যগ্রন্থের নাম ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মপ্রতিপাদক অংশের নাম উপনিষৎ। আবার আরণ্যক নামে কতকগুলি গ্রন্থ বেদের অংশ। এই উপনিষদ্‌ই ১০৮ খানি।

বেদ কে প্রণয়ন করিল? এ বিষয়ে হিন্দুদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। এক মত এই যে, ইহা কেহই প্রণয়ন করে নাই। বেদ অপৌরুষেয় এবং চিরকালই আছে। কতকগুলি কথা আপনা হইতে চিরকাল আছে। মনুষ্য হইবার আগে, সৃষ্টি হইবার আগে হইতে, মনুষ্য-ভাষায় সঙ্কলিত কতকগুলি গদ্য পদ্য আপনা হইতে চিরকাল আছে; অধিকাংশ পাঠকই এ মত গ্রহণ করিবেন না, বোধ হয়।

আর এক মত এই যে, বেদ ঈশ্বর-প্রণীত। ঈশ্বর বসিয়া বসিয়া অগ্নিস্তব ও ইন্দ্রস্তব ও নদীস্তব ও অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রভৃতির বিবিধ রচনা করিয়াছেন, ইহাও বোধ হয় পাঠকের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস না করিতে পারেন। বেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও অনেক মত আছে, সে সকল সবিস্তারে সঙ্কলিত করিবার প্রয়োজন নাই। বেদ যে মনুষ্য-প্রণীত, তাহা বেদের আর কিছু পরিচয় পাইলেই, বোধ হয় পাঠকেরা আপনারাই সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন। তাঁহারা আপন আপন বুদ্ধিমত মীমাংসা করেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ।

বেদ যেরূপেই প্রণীত হউক, এক জন উহা সঙ্কলিত ও বিভক্ত করিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ। সেই বিভাগ মন্ত্রভেদে হইয়াছে এবং মন্ত্রভেদানুসারে তিন বেদই দেখা যায়। ঋগ্বেদের মন্ত্র ছন্দোনিবদ্ধ স্তোত্র; যথা, ইন্দ্রস্তোত্র, অগ্নিস্তোত্র, বরুণস্তোত্র। যজুর্ব্বেদের মন্ত্র প্রশ্লিষ্টপাঠ গদ্যে বিবৃত, এবং যজ্ঞানুষ্ঠানই তাহার উদ্দেশ্য। সামবেদের মন্ত্র গান। ঋগ্বেদের মন্ত্রও গীত হয়, এবং গীত হইলে তাহাকেও সাম বলে। অথর্ব্ববেদের মন্ত্রের উদ্দেশ্য মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদি।

হিন্দুমতানুসারে অন্য বেদের অপেক্ষা সামবেদের উৎকর্ষ আছে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "বেদানাং সামবেদোস্মি দেবানামিত্যাদি"* কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের কাছে ঋগ্বেদেরই প্রাধান্য। বাস্তবিক ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য আমরা প্রথমে ঋগ্বেদের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হই। ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের পরিচয় পশ্চাৎ দিব, অগ্রে সংহিতার পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য হইতেছে।

ঋগ্বেদে দশটি মণ্ডল ও আটটি অষ্টক। এক একটি মন্ত্রকে এক একটি ঋচ্ বলে। এক ঋষির প্রণীত এক দেবতার স্তুতি সম্বন্ধে মন্ত্রগুলিকে একটি সূক্ত বলে। বহুসংখ্যক ঋষি কর্ত্তৃক প্রণীত সূক্তসকল এক জন ঋষি কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইলে একটি মণ্ডল হইল। এইরূপ দশটি মণ্ডল ঋগ্বেদসংহিতায় আছে। কিন্তু এরূপ পরিচয় দিয়া আমরা পাঠকের বিশেষ কিছু উপকার করিতে পারিব না। এগুলি কেবল ভূমিকা স্বরূপ বলিলাম। আমরা পাঠককে ঋগ্বেদ-সংহিতার ভিতরে লইয়া যাইতে চাই। এবং সেই জন্য দুই একটা সূক্ত বা ঋক্ উদ্ধৃত করিব। সর্ব্বাগ্রে ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের প্রথম অনুবাকের

* বেদের মধ্যে আমি সামবেদ ইত্যাদি।

প্রথম সূক্তের প্রথম ঋক্ উদ্ধৃত করিব। কিন্তু ইহার একটি "হেডিং" আছে। আগে "হেডিং"টি উদ্ধৃত করি।

"ঋষির্বিশ্বামিত্রপুত্রো মধুচ্ছন্দা। অগ্নির্দ্দেবতা।
গায়ত্রীচ্ছন্দঃ। ব্রহ্মযজ্ঞান্তে বিনিয়োগঃ অগ্নিষ্টোমে চ।"

আগে এই "হেডিং"টুকু ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপ "হেডিং" সকল সূক্তেরই আছে। ব্রাহ্মণ পাঠকেরা দেখিবেন, তাঁহারা প্রত্যহ যে সন্ধ্যা করেন, তাহাতে যে সকল বেদমন্ত্র আছে, সে সকলেরও ঐরূপ একটু একটু ভূমিকা আছে। দেখা যাক্, এই "হেডিং" টুকুর তাৎপর্য্য কি ? ইহাতে চারিটি কথা আছে, প্রথম, এই সূক্তের ঋষি, বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা। দ্বিতীয়, এই সূক্তের দেবতা অগ্নি। তৃতীয়, এই সূক্তের ছন্দ গায়ত্রী। চতুর্থ, এই সূক্তের বিনিয়োগ ব্রহ্মযজ্ঞান্তে এবং অগ্নিষ্টোমযজ্ঞে। এইরূপ সকল সূক্তের একটি ঋষি, একটি দেবতা, ছন্দ এবং বিনিয়োগ নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার তাৎপর্য্য কি ?

প্রথম, ঋষিশব্দটুকু বুঝা যাক্। ঋষি বলিলে এক্ষণে আমরা সচরাচর সাদা দাড়ীওয়ালা গেরুয়াকাপড়-পরা সন্ধ্যাহ্নিক-পরায়ণ ব্রাহ্মণ—বড় জোর সেকালের ব্যাস বাল্মীকির মত তপোবলবিশিষ্ট একটা অলৌকিক কাণ্ড মনে করি। কিন্তু দেখা যাইতেছে, সেরূপ কোন অর্থে ঋষি শব্দ এ সকল স্থলে প্রযুক্ত হয় নাই।

বেদের অর্থ বুঝাইবার জন্য একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র আছে, তাহার নাম "নিরুক্ত"। নিরুক্ত একটি "বেদাঙ্গ"। যাস্ক, স্থৌলষ্টিবী, শাকপূণি প্রভৃতি প্রাচীন মহর্ষিগণ নিরুক্তকর্ত্তা। বেদের কোন শব্দের যথার্থ অর্থ জানিতে হইলে, নিরুক্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এখন, নিরুক্তকার ঋষি শব্দের অর্থ কি বলেন ? নিরুক্তকার বলেন এই যে, "যস্য বাক্যং স ঋষি" অর্থাৎ যাহার কথা সেই ঋষি।* অতএব যখন কোন সূক্তের পূর্ব্বে দেখি যে, এই সূক্তের অমুক ঋষি, তখন বুঝিতে হইবে যে, সূক্তটির বক্তা ঐ ঋষি। এই বক্তা অর্থে প্রণেতা বুঝিতে হইবে কি ? যাঁহারা বলেন, বেদ নিত্য অর্থাৎ কাহারও প্রণীত নহে, তাঁহাদের উত্তর এই যে, বেদ-মন্ত্রসকল ঋষিদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাঁহারা মন্ত্ররচনা করেন নাই, জ্ঞানবলে দৃষ্ট করিয়াছিলেন। যে ঋষি যে সূক্ত দেখিয়াছিলেন, তিনিই সেই সূক্তের ঋষি। শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে ইহা জানি, কিন্তু যোগ-বলেই হউক আর যে বলেই হউক, শব্দ যে দৃষ্ট হইতে পারে, ইহা অনেকে কিছুতেই স্বীকার করিবেন না। যদি কেহ বিশ্বাস করিতে চান যে, যখন লিপিবিদ্যার সৃষ্টি হয় নাই, তখন মন্ত্রসকল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ঋষিদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিল, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করুন, আমরা আপত্তি করিব না। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, বেদেই অনেক স্থলে আছে যে, মন্ত্রসকল ঋষিপ্রণীত, ঋষিদৃষ্ট নহে। আমরা ইহার অনেক উদাহরণ দিতে পারি, কিন্তু অপর সাধারণের পাঠ্য প্রচারে এরূপ উদাহরণের স্থান হইতে পারে না। এক্ষণে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এমন অনেক সূক্ত আছে যে, তাহাতে ঋষিরাই বলিয়াছেন যে, আমরা মন্ত্র করিয়াছি, গড়িয়াছি,

* বৃহদ্দেবতা গ্রন্থের মতে সম্পূর্ণমৃষিবাক্যন্তু সূক্তমিত্যভিধীয়তে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ ঋষি-বাক্যকে সূক্ত বলে।

সৃষ্ট করিয়াছি বা জন্মাইয়াছি। সে যাহাই হউক, ইহা স্থির যে, ঋষি অর্থে আদৌ তপোবলবিশিষ্ট মহাপুরুষ নহে, সূক্তের বক্তা মাত্র।

এই প্রথম সূক্তের ঋষি মধুচ্ছন্দা। তার পর দেবতা অগ্নি। সূক্তের দেবতা কি? যেমন ঋষি শব্দের আলোচনায় তাহার লৌকিক অর্থ উড়িয়া গেল, তেমনি দেবতা শব্দের আলোচনায় ঐরূপ দেবতার লৌকিক অর্থ উড়িয়া যায়। নিরুক্তকার বলেন যে, "যস্ত বাক্যং স ঋষিঃ যা তেনোচ্যতে সা দেবতা" অর্থাৎ সূক্তে যাহার কথা থাকে, সেই সে সূক্তের দেবতা। অর্থাৎ সূক্তের যা "Subject" তাই দেবতা।

ইহাতে অনেকে এমন কথা বলিতে পারেন, এক্ষণে যাহাদিগকে দেবতা বলি, অর্থাৎ ইন্দ্রাদি, সূক্ত সকলে তাঁহারই স্তুত হইয়াছেন, অতএব এখন যে অর্থে তাঁহারা দেবতা, সেই অর্থেই তাঁহারা বেদমন্ত্রে দেবতা। এরূপ আপত্তি যে হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ দানস্তুতিসকল। কতকগুলি সূক্ত আছে, সেগুলিকে দানস্তুতি বলে। তাহাতে কোন দেবতারই প্রশংসা নাই, কেবল দানেরই প্রশংসা আছে। অতএব ঐ সকল সূক্তের দানই দেবতা। ইহা অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি দেবতা শব্দের অর্থ সূক্তের বিষয় (subject), তবে দেবতার আধুনিক অর্থ আসিল কোথা হইতে? এ তত্ত্ব বুঝিবার জন্য দেবতা শব্দটি একটু তলাইয়া বুঝিতে হইবে। নিরুক্তকার যাস্ক বলিয়াছেন, "যো দেবঃ সা দেবতা" যাহাকে দেব বলে, তাহাকেই দেবতা বলা যায়। এই দেব শব্দের উৎপত্তি দেখ। দিব্ ধাতু হইতে দেব। দিব্ দীপনে বা দ্যোতনে। যাহা উজ্জ্বল, তাহাই দেব। আকাশ, সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র প্রভৃতি উজ্জ্বল, এই জন্য এ সকল আদৌ দেব। এ সকল মহিমাময় বস্তু, এই জন্য আদৌ ইহাদের প্রশংসায় স্তোত্র, অর্থাৎ সূক্ত রচিত হইয়াছিল। কালে যাহার প্রশংসায় সূক্ত রচিত হইতে লাগিল তাহাই দেব হইল। পর্জ্জন্য যিনি বৃষ্টি করেন। তিনি উজ্জ্বল নহেন, তিনিও দেব হইলেন। ইন্দ্ ধাতু বর্ষণে। সংস্কৃতে একটি র প্রত্যয় আছে। রুদ্ ধাতুর পর র করিয়া রুদ্র হয়, অসু ধাতুর পর র করিয়া অসুর হয়। ইন্দ্ ধাতুর পর র করিয়া ইন্দ্র হয়। অতএব যিনি বৃষ্টি করেন, তিনিই ইন্দ্র। যিনি বৃষ্টি করেন তাঁহাকে উজ্জ্বল বলিয়া মনে কল্পনা করিতে পারি না, কিন্তু তিনি ক্ষমতাবান্—বৃষ্টি না হইলে শস্য হয় না, শস্য না হইলে লোকের প্রাণ বাঁচে না। কাজেই তিনিও বৈদিক সূক্তে স্তুত হইলেন। বৈদিক সূক্তেস্তুত হইলেন বলিয়াই তিনি দেবতা হইলেন। এ সকল কথার সবিস্তার প্রমাণ ক্রমে পাওয়া যাইবে।

"ঋষির্মধুচ্ছন্দা। অগ্নির্দেবতা। গায়ত্রীচ্ছন্দঃ।" ছন্দ বুঝিতে কাহারও দেরী হইবে না। কেন না, ছন্দ ইংরাজি বাঙ্গালাতে আছে। ঋক্‌গুলি পদ্য, কাজেই ছন্দে বিন্যস্ত। "যদক্ষরপরিমাণং তচ্ছন্দঃ।" অক্ষর পরিমাণকে ছন্দ বলে। চৌদ্দ অক্ষরে পয়ার হয়—পয়ার একটি ছন্দ। আমাদের যেমন পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী, নানা রকম ছন্দ আছে, বেদেও তেমনি গায়ত্রী, অনুষ্টুভ্, ত্রিষ্টুভ্, বৃহতী, পংক্তি প্রভৃতি নানাবিধ ছন্দ আছে। যে সূক্ত যে ছন্দে রচিত,—আমরা যাহাকে "হেডিং" বলিয়াছি, তাহাতে দেবতার ও ঋষির পর ছন্দের নাম কথিত থাকে। যাঁহারা মাইকেল দত্ত ও হেমচন্দ্রের পূর্ব্বকার কবিদিগের কাব্য পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, এ প্রথা বাঙ্গালা

রচনাতেও ছিল। আগে বিষয় অর্থাৎ দেবতা লিখিত হইত যথা—"গণেশ-বন্দনা।" তাহার পর ছন্দ লিখিত হইত, যথা—"ত্রিপদী ছন্দ" বা "পয়ার।" শেষে ঋষি লিখিত হইত, যথা—"কাশীরাম দাস কহে" কি "কহে রায় গুণাকর।" ইংরাজিতেও দেবতা ও ঋষি লিখিতে হয়; ছন্দ লিখিত হয় না। যথা, De Profundis দেবতা, Alfred Tennyson ঋষি।

ঋষি দেবতা ও ছন্দের পর বিনিয়োগ। যে কাজের জন্য সূক্তটির প্রয়োজন, অথবা যে কাজে উহা ব্যবহার হইবে, তাহাই বিনিয়োগ। যথা, অগ্নিষ্টোমে বিনিয়োগ অর্থাৎ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে ইহার নিয়োগ বা ব্যবহার। অতএব ইংরাজিতে বুঝাইতে হইলে বুঝাইব যে, ঋষি (author) দেবত (subject) ছন্দ (metre) বিনিয়োগ (use)।

এক্ষণে আমরা ঋক্‌টি উদ্ধৃত করিতে পারি।

"অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারাং রত্নধাতমম্॥"

'ঈলে' কি না স্তব করি। "অগ্নিমীলে" কি না অগ্নিকে স্তব করি। এ ঋকের এইটিই আসল কথা। "অগ্নিং" কর্ম্ম "ঈলে" ক্রিয়া। আর যতগুলি কথা আছে, সব অগ্নির বিশেষণ। সেগুলি পরে বুঝাইব। আগে অগ্নি শব্দটি বুঝাই। বেদের টীকাকার সায়নাচার্য্য বলেন, অগ্নি অগ্‌ ধাতু হইতে হইয়াছে, "অগ কম্পনে।" বাচস্পত্য অভিধানে লেখে, "অগ বক্রগতৌ" কিন্তু ইহার আরও অনেক ব্যাখ্যা আছে। সে সকল উদ্ধৃত করিয়া পাঠককে পীড়িত করিব না। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি ব্যাখ্যা অনেক কাজ করিয়াছে। নিরুক্তে সেটি পাওয়া যায়। "অগ্র" শব্দ পূর্ব্বক "নী" ধাতুর পর ইন্‌ প্রত্যয় কর, তাহা হইলে অগ্রণী হইবে। নিরুক্তকার বলেন, ইহাতে "অগ্নি" শব্দ নিষ্পন্ন হইবে। যাহা অগ্রে নীয়মান। এখন যজ্ঞ করিতে গেলে হোম চাই। হোমে অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। নহিলে দেবতারা পান না; এই জন্য যাহা প্রথমে যজ্ঞে নীয়মান তাহাই অগ্নি। এই ব্যাখ্যাটি পরিশুদ্ধ বলিয়া কোন মতে গৃহীত হইতে পারে না। কেন না, অগ্নি এই নাম অন্যান্য আর্য্যজাতির মধ্যে দেখা যায়। যথা Latin *ignis* Slav *Ogni*. তবে নিরুক্তকারের জন্যই হউক আর যে জন্যই হউক, ব্যাখ্যাটা চলিয়াছিল, চলিয়া দেবগঠনে লাগিয়াছিল, তাই ইহার কথা বলিলাম।—কাজেই যদি অগ্রপূর্ব্বক নী ধাতু হইতে অগ্নি হইল, তবে অগ্নি দেবতাদিগের অগ্রণী হইলেন, যদি অগ্রণী হইলেন, তবেই তিনি দেবতাদের প্রধান, আগে যান, এ কথাও উঠিল। বহ্বৃক্‌ মন্ত্রভাগে আছে—"অগ্নির্মুখং দেবতানাম্।" অগ্নি দেবতাদিগের প্রথম ও মুখস্বরূপ। আর "অগ্নির্বৈদেবানামবমঃ" দেবতাদিগের মধ্যে অগ্নিই মুখ্য। এইরূপ কথা হইতে হইতেই কথা উঠিল, "অগ্নির্বৈ দেবানাং সেনানী" অর্থাৎ অগ্নি দেবতাদিগের সেনানী। সেনানী কি না সেনাপতি।

তারপর এক রহস্য আছে।—আমাদিগের বর্ত্তমান হিন্দুশাস্ত্রে অর্থাৎ পৌরাণিক হিন্দুয়ানিতে দেবতাদিগের সেনাপতি কে? পুরাণেতিহাসে কাহাকে দেবসেনানী বলে? কুমার, কার্ত্তিকেয়, স্কন্দ, ইনিই এখন দেবসেনানী। শেষ প্রচলিত মত এই যে, কার্ত্তিকেয়, মহাদেব অর্থাৎ রুদ্রের পুত্র। যখন এই মত প্রচলিত হইয়াছে, তখন অগ্নি

রুদ্রে মিশিয়া গিয়েছে। অগ্নির সঙ্গে রুদ্রের কি সম্বন্ধ তাহা আমরা ক্রমে পরে দেখাইব, কিন্তু অতি প্রাচীন ইতিহাসে, যখন অগ্নি রুদ্র হন নাই, তখন কার্ত্তিকেয় অগ্নির পুত্র। যাঁহারা এ তত্ত্বের বিশেষ প্রমাণ খুঁজেন, তাঁহারা মহাভারতের বনপর্ব্বের মার্কণ্ডেয়সমস্যা পর্ব্বাধ্যায়ের ১১২ অধ্যায়ে এবং তৎপরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে দেখিতে পাইবেন। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"। অগ্নির দেব-সেনানী, শেষ দাঁড়াইল, অগ্নির ছেলে দেব-সেনানী। কুমার রুদ্রজ, অতএব শেষ মহাদেবের পুত্র।

> "অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
> হোতারং রত্নধাতমম্॥"

"অগ্নিমীলে"। অগ্নিকে স্তব করি। অগ্নি কি রূপ তাহা বলা হইতেছে। "পুরোহিতং"। অগ্নি পুরোহিত। অগ্নি হোমকার্য্য সম্পন্ন করেন, এই জন্য অগ্নিকে পুরোহিত বলা যাইতেছে। ঋগ্বেদ-সংহিতায় অগ্নিকে পুনঃ পুনঃ পুরোহিত বলা হইয়াছে। বেদব্যাখ্যায় পাঠক মহাশয়েরা যদি একটুখানি ব্যঙ্গ মার্জ্জনা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমরা বলিতাম যে, আধুনিক পুরোহিতদিগের সঙ্গে অগ্নির বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে; যজ্ঞীয় দ্রব্য উভয়েই উত্তমরূপে সংহার করেন।

"যজ্ঞস্য দেবং" অগ্নি যজ্ঞের দেব। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে আমরা বলিয়াছি—দিব্ ধাতু দীপনে বা দ্যোতনে। "যজ্ঞস্য দেবং" যিনি যজ্ঞে দীপ্যমান।

"ঋত্বিজং"। ঋত্বিক্ বলে যাজককে। তখনকার এক একটি বৈদিক যজ্ঞে ষোল জন করিয়া ঋত্বিক্ প্রয়োজন হইত। চারি জন হোতা, চারি জন অধ্বর্য্যু, চারি জন উদ্গাতা, আর চারি জন ব্রহ্মা। যাহারা ঋঙ্‌মন্ত্র পাঠ করিত, তাহারা হোতা। যজুর্ব্বেদী ঋত্বিকেরা অধ্বর্য্যু। আর যাঁহারা সামগান করেন, তাঁহারা উদ্গাতা। যাঁহারা কার্য্য-পরিদর্শক, তাঁহারা ব্রহ্মা।

হোতারং। হোতৃগণ ঋঙ্‌মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবতাদিগকে আহ্বান করেন, অগ্নি হবিরাদি বহন করিয়া দেবতাদিগকে আহ্বান করেন, এই জন্য অগ্নি হোতা। "ঋত্বিজং হোতারং" সায়নাচার্য্য ইহার এই অর্থ করেন যে, অগ্নি ঋত্বিকের মধ্যে হোতা।

রত্নধাতমম্। ধাতমম্ ধারয়িতারম্। যিনি রত্ন দান করেন, তিনি রত্নধাতম। অগ্নি যজ্ঞফলরূপ রত্ন প্রদান করেন, এই নিমিত্ত অগ্নি রত্নাধাতম।

এই একটি ঋক্ সবিস্তারে বুঝাইলাম। এই সূক্তে এমন নয়টি ঋক্ আছে। অবশিষ্ট আটটি এইরূপ সবিস্তারে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা কেবল তাহার একটা বাঙ্গালা অনুবাদ দিতেছি।

"অগ্নি পূর্ব্বঋষিদিগের দ্বারা স্তুত হইয়াছেন এবং নূতনের দ্বারাও। তিনি দেবতাদিগকে এখানে বহন করুন। ২।

যাহা দিন দিন বাড়িতে থাকে, এবং যাহাতে যশ ও শ্রেষ্ঠ ধীরবত্তা আছে, সেই ধন অগ্নির দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৩।

হে অগ্নে! যাহা বিঘ্নরহিত এবং তুমি যাহার সর্ব্বতোভাবে রক্ষাকর্ত্তা, সেই যজ্ঞই দেবগণের নিকট গমন করে। ৪।

যিনি আহ্বান-কর্ত্তা, যজ্ঞকুশল, বিচিত্র যশঃশালিগণের শ্রেষ্ঠ এবং সত্যস্বরূপ, সেই অগ্নিদেব দেবগণের সহিত আগমন করুন। ৫।

হে অগ্নে! তুমি হবিদাতার যে মঙ্গল কর, হে অঙ্গির! তাহা সত্যই তোমা ভিন্ন আর কেহই করিতে পারে না। ৬।

হে অগ্নে! আমরা প্রতিদিন রাত্রে ও দিবসে ভক্তিভাবে তোমাকে নমস্কার করিতে করিতে সমীপস্থ হই। ৭।

তুমি যজ্ঞসকলের জ্বলন্ত রাজা, সত্যের জ্বলন্ত রক্ষাকর্ত্তা। এবং স্বগৃহে বর্দ্ধমান, (তোমাকে নমস্কার করিতে করিতে আমরা তোমার সমীপস্থ হই) । ৮।

হে অগ্নি! পিতা যেমন পুত্রের, তুমি তেমনি আমাদের অনায়াসলভ্য হও; মঙ্গলার্থে তুমি আমাদের সন্নিহিত থাক। ৯।*

অনেক হিন্দুরই বিশ্বাস আছে যে, বেদের ভিতর মনুষ্যের বুদ্ধির অগম্য অতি দুরূহ কথা আছে; বুঝিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, কণ্ঠস্থ করাই ভাল—তাও দ্বিজাতির পক্ষে। এজন্য আমরা ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম সূক্তের অনুবাদ পাঠককে উপহার দিলাম। লোকে বলে, একটা ভাত টিপিলেই হাঁড়ির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রয়োজনমতে আরও কোন কোন সূক্ত উদ্ধৃত করিব। সম্প্রতি প্রয়োজন নাই।

ইহার পর দ্বিতীয় সূক্তের এক দেবতা নহেন। প্রথম তিন ঋকের দেবতা, বায়ু, ৪—৬ ঋকের দেবতা ইন্দ্র ও বায়ু; শেষ তিনটি ঋকের দেবতা, মিত্র ও বরুণ, সংস্কৃতে "মিত্রাবরুণৌ।" মিত্র কে তাহা পরে বলিব। বেদের অনুশীলনে, এমন অনেক দেবতা পাওয়া যাইবে যে, আধুনিক হিন্দুয়ানিতে যাহার নাম মাত্র নাই। আবার, আধুনিক হিন্দুর কাছে যে সকল দেবতার বড় আদর, তাহার মধ্যে অনেকের নামমাত্রও বেদে পাওয়া যাইবে না।

তৃতীয় সূক্তের দেবতাও অনেকগুলি। ১—৩ ঋকের দেবতা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বেদে তাঁহাদের নাম "অশ্বিনৌ"। ৪—৬ ঋকের দেবতা ইন্দ্র; ৭—৯ ঋকের দেবতা "বিশ্বেদেবাঃ"। আধুনিক হিন্দু ইহাদিগের নামও অনবগত। ১০—১২ ঋকের দেবতা সরস্বতী।

* মূল এই সঙ্গে দিলাম। প্রথম ঋক্ পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে।

অগ্নিঃ পূর্ব্বেভিঃ ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত। স দেবান্ এহ বক্ষতি। ২।
অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবে দিবে। যশসং বীরবত্তমং। ৩।
অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি। স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি। ৪।
অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ। দেবো দেবেভিরাগমৎ। ৫।
যদঙ্গ দাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি। তবেত্তৎ সত্যমঙ্গিরঃ। ৬।
উপত্বাগ্নে দিবে দিবে দোষা বস্তর্ধিয়া বয়ম্ নমো ভরন্ত এমসি। ৭।
রাজন্তমধ্বরাণাং গোপামৃতস্য দীদিবিং। বর্ধমানং স্বে দমে। ৮।
স নঃ পিতেব সূনবেঽগ্নে সূপায়নো ভব। সচস্বা নঃ স্বস্তয়ে। ৯।

বাঙ্গালা অনুবাদ যাহা দেওয়া হইল, তাহার মধ্যে ১ ও ২ ঋক্ লেখকের; অন্য ঋক্গুলির অনুবাদ কোন বন্ধু হইতে উপহার প্রাপ্ত।

চতুর্থ সূক্তের দেবতা ইন্দ্র। ঋগ্বেদে ইন্দ্রের স্তবই অধিক। ৪ হইতে ১১ পর্য্যন্ত সূক্তের দেবতা ইন্দ্র। তন্মধ্যে ষষ্ঠ সূক্তে মরুতেরাও আছেন। মরুতেরা বায়ু হইতে ভিন্ন। সে প্রভেদ পরে বুঝাইব।

দ্বাদশে আবার অগ্নিদেবতা। ইন্দ্রের পর ঋগ্বেদে অগ্নির স্তবই অধিক।

ত্রয়োদশ সূক্ত "আপ্রী" সূক্ত। আপ্রীসূক্তের বিনিয়োগ পশুযজ্ঞে। ঋগ্বেদে মোট দশটি আপ্রীসূক্ত আছে। এই আপ্রীসূক্তের দেবতাও অগ্নি, কিন্তু সূক্তের ১২টি ঋকে অগ্নির দ্বাদশ মূর্ত্তির স্তব করা হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ সূক্তের অনেক দেবতা, যথা—বিশ্বদেবাঃ, ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, মিত্র, বৃহস্পতি, পূষা, ভগ, আদিত্য ও মরুদ্গণ।

পঞ্চদশে ইন্দ্রাদি অনেক দেবতা। সায়নাচার্য্য বলেন, ঋতুরাই ইহার দেবতা। ষোড়শে একা ইন্দ্র দেবতা। সপ্তদশে ইন্দ্র, বরুণ। অষ্টাদশের এক দেবতা ব্রহ্মণস্পতি। তিনি কে? সে বড় গোলযোগের কথা। আরও ইন্দ্র ও সোম আছেন, তদ্ভিন্ন দক্ষিণা ও সদসস্পতি বা নারাশংস বলিয়া এক দেবতা আছেন। উনবিংশ সূক্তের দেবতা অগ্নি, মরুৎ।

এক অধ্যায়ের দেবতার তালিকা দিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইলাম। বৈদিক দেবতা কাহারা, তাহা পাঠককে দেখাইবার জন্য তাঁহাকে এতটা দুঃখ দিলাম। এই এক অধ্যায়ে যে সব দেবতার নাম আছে, অবশ্য এমত নহে। কিন্তু পাঠক দেখিলেন যে, এই এক অধ্যায়ের মধ্যে, যে সকল দেবতা এখনকার পূজার ভাগ খাইতে অগ্রসর তাঁহারা কেহ নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, কার্ত্তিক, গণেশ, ইঁহারা কেহই নাই। আমরা ঋগ্বেদের অন্যত্র বিষ্ণুকে খুব মতে পাইব; আর শিবকে না পাই, রুদ্রকে পাইব। ব্রহ্মাকে না পাই, প্রজাপতিকে পাইব। লক্ষ্মীকে না পাই, শ্রীকে পাইব। কিন্তু আর ঠাকুর ঠাকুরাণীগুলির বৈদিকত্বের ও মৌলিকত্বের ভারী গোলযোগ। বাঙ্গালার চাউল কলার উপর তাঁহাদের আর যে দাবি দাওয়া থাকে থাকুক, বেদ-কর্ত্তা ঋষিদিগের কাছে তাঁহারা সনন্দ পান নাই, ইহা নিশ্চিত। এখন দেবত্র বাজেয়াপ্ত করা যাইবে কি?

বাজেয়াপ্ত করিলে, অনেক বেচারা দেবতা মারা যায়। হিন্দুর মুখে ত শুনি, হিন্দুর দেবতা তেত্রিশ কোটি। কিন্তু দেখি, বেদে আছে, দেবতা মোটে তেত্রিশটি। ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের, ৩৪ সূক্তের, ১১ ঋকে অশ্বীদিগকে বলিতেছেন, "তিন একাদশ (১১ × ৩ = ৩৩) দেবতা লইয়া আসিয়া মধুপান কর।" ১।৪৫।২ ঋকে অগ্নিকে বলা হইতেছে, "তেত্রিশটিকে লইয়া আইস" ঐরূপ ১।১৩৯।১১ ও ৩।৬।৯ ও ৮।২৮।১ ও ৮।৩০।২ ও ৮।৩৫।৩ ও ৯।৯২।৪ ঋকে ঐরূপ আছে। কেবল ঋগ্বেদে নয়, শতপথ-ব্রাহ্মণে, মহাভারতে, রামায়ণে ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও তেত্রিশটিমাত্র দেবতার কথা আছে।

এখন তেত্রিশ হইতে তেত্রিশ কোটি হইল কোথা হইতে? ইহার উত্তর, বিদ্যাসুন্দরের ভাটের কথায় দেওয়াই উচিত—

"এক মে হাজারুলাখ মেয় কহা বনায়কে।"

ঋগ্বেদের ৩।৯।৯ ঋগ্বেক আছে, "ত্রীণি শতা ত্রীসহস্রাণি অগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চ অসপর্য্যন্।" তিন শত, তিন সহস্র, ত্রিশ, নয় দেবতা। তেত্রিশ কোটি হইতে আর কতক্ষণ লাগে।*

তার পর জিজ্ঞাস্য এই তেত্রিশটি দেবতা কে কে? ঋগ্বেদে সে কথা নাই, থাকিবার কথাও নয়। তবে শতপথব্রাহ্মণে ও মহাভারতে উহাদিগের শ্রেণীবিভাগ ও নাম পাওয়া যায়। শ্রেণীবিভাগ এইরূপ। দ্বাদশটি আদিত্য, একাদশটি রুদ্র এবং আটটি বসু। "আদিত্য" "রুদ্র" এবং "বসু" বিশেষ একটি দেবতার নাম নয়, দেবতার শ্রেণী বা জাতিবাচক মাত্র।

এই হইল একত্রিশ। তারপর এ ছাড়া "দ্যাবা পৃথিবী" এই দুটি লইয়া তেত্রিশটি। শতপথব্রাহ্মণে প্রজাপতিকে ধরিয়া ৩৪টি গণা হইয়াছে। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে উহাদিগের নাম নির্দ্দেশ আছে। যথা—

আদিত্য। অংশ, ভগ, মিত্র, জলেশ্বর, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, জয়ন্ত, ভাস্কর, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র, বিষ্ণু।

রুদ্র। অজ, একপদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, ঋত, পিতৃরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, হবন, ঈশ্বর।

বসু। ধর, ধ্রুব, সোম, সবিতা, অনিল, অনল, প্রত্যুষ, প্রভাস।

—'প্রচার', ১ম বর্ষ, পৃ. ৩৭-৪৬, ১০২-৮।

বেদের দেবতা

(বেদশীর্ষক প্রবন্ধের পরভাগ)

আমরা বেদ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য যে কেবল পাঠককে দেখাইব, বেদে কি রকম সামগ্রী আছে, তাহা নহে। আমাদের আর একটি উদ্দেশ্য এই যে, বেদে কোন্ দেবতাদের উপাসনা আছে? ঋগ্বেদসংহিতা বেদের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অংশ বলিয়া আধুনিক পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, তাই আমরা এখন ঋগ্বেদসংহিতার আলোচনায় প্রবৃত্ত, কিন্তু সময়ে বেদের অন্যান্যাংশের দেবোপাসনার স্থূল মর্ম্ম যাহা পাওয়া যায়, তাহা বুঝাইব। এখন, আমরা দেখিয়াছি, ঋগ্বেদে আছে যে, দেবতা তেত্রিশটি, কবি, ভক্ত বা ঠাকুরাণীদিদিদিগের গল্পে গল্পে তেত্রিশ কোটি হইয়াছে।

তার পর দেখিয়াছি যে, সেই তেত্রিশটি দেবতা, শতপথব্রাহ্মণে (ইহাও বেদ) তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন, যথা (১) আদিত্য, (২) রুদ্র, (৩) বসু। তার পর মহাভারতে এই তিন শ্রেণীর দেবতার যেরূপ নাম দেওয়া আছে, তাহাও দিয়াছি।

ঋগ্বেদের সঙ্গে ইহার কিছু মিলে না। ইহার মধ্যে কোন কোন দেবতার নামও ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদে এমন অনেক দেবতার নাম পাওয়া যায়, যাহা এই

* তবু ঋষি ঠাকুর তিন ছাড়েন নাই।

যে তিনের একাদশ গুণে তেত্রিশ, সেই তিনকে শত গুণ, সহস্র গুণ, দশ গুণ ও তিন গুণ করিয়াছেন। লোকে কোটি গুণ করিয়াছে। সেই "তিন" পাঠক ছাড়িবেন না। তাহা হইলে হিন্দু ধর্ম্মের চরমে পৌঁছিতে পারিবেন। সে কথা পরে হইবে।

তালিকার ভিতর নাই। ঋগ্বেদে কতকগুলি আদিত্যের নাম আছে বটে, এবং রুদ্র ও বসু শব্দদ্বয় বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, এবং অষ্ট বসু, এমন কথা নাই। ঋগ্বেদে নিম্নলিখিত দেবতাদিগের নাম পাওয়া যায়।

(১) মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, ভগ, দক্ষ, অংশ, মার্ত্তণ্ড, সূর্য্য, সবিতা, ও ইন্দ্র। ইহাদিগকে ঋগ্বেদের কোন স্থানে না কোন স্থানে আদিত্য বলা হইয়াছে।

ইহার মধ্যে অর্য্যমা, ভগ, দক্ষ, অংশ, মার্ত্তণ্ড ইঁহাদিগের কোন প্রাধান্য নাই।

(২) আর কয়টির, অর্থাৎ মিত্র, সূর্য্য, বরুণ, সবিতা ও ইন্দ্রের খুব প্রাধান্য। তদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত দেবতারাও ঋগ্বেদসংহিতায় বড় প্রবল।

অগ্নি, বায়ু, মরুদ্গণ, বিষ্ণু, পর্জ্জন্য, পূষ, ত্বষ্টা অশ্বীদ্বয়, সোম।

(৩) বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি ও যমেরও কিছু গৌরব আছে।

(৪) ত্রিত, আপ্ত্য, অহিব্রধ্ন ও অজ একপদের নাম স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।

(৫) এই কয়টি নামে সৃষ্টিকর্ত্তা বা ঈশ্বর বুঝায়—বিশ্বকর্ম্মা, হিরণ্যগর্ভ, স্কন্দ, প্রজাপতি, পুরুষ, ব্রহ্ম।

(৬) তদ্ভিন্ন কয়েকটি দেবী আছেন। দুইটি দেবী বড় প্রধানা—অদিতি ও উষা।

(৭) সরস্বতী, ইলা, ভারতী, মহী, হোত্রা, বরুত্রী, ধীষণা, অরণ্যানী, অগ্নায়ী, বরুণানী, অশ্বিনী, রোদসী, রাকা, সিনিবালী, গুঙ্গু, শ্রদ্ধা ও শ্রী, এই কয় দেবীও আছেন। তদ্ভিন্ন পরিচিতা সকল নদীগণও স্তুত হইয়াছেন।

এক্ষণে, আগে আদিত্যদিগের কথা কিছু বলিব। আদিত্য শব্দে এখন সচরাচর সূর্য্য বুঝায়। দ্বাদশ আদিত্য বলিলে অনেকেই বারটি সূর্য্য বুঝেন। অনেক পণ্ডিত আবার এই ব্যাখ্যা করেন যে, দ্বাদশ আদিত্য অর্থে বারটি মাস বুঝিতে হইবে। পক্ষান্তরে আদিত্য সকল দেবতাদিগের সাধারণ নাম, এরূপ প্রয়োগও আছে। যাঁহারা অমর-কোষের ছত্র দুই চারি পড়িয়াছেন, তাঁহারাও জানেন যে, "দেব" ইহার প্রতিশব্দ মধ্যে "আদিতেয়" শব্দটি ধরা হইয়াছে। আদিতেয়, আদিত্য, একই। এরূপ গণ্ডগোল কেন? দেখা যাউক আদিত্য শব্দের প্রকৃত অর্থ কি?

দিত ধাতু বন্ধনে বা খণ্ডনে বা ছেদনে। দিতি, যাহার বন্ধন নাই, সীমা আছে, খণ্ডিত বা ছিন্ন। অদিতি, যাহার বন্ধন নাই, অখণ্ড, অচ্ছিন্ন, সীমা নাই, যে অনন্ত; *The Infinite.*

এই জড় জগৎ সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, মেঘ, সবই সেই অখণ্ড বা অনন্ত হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি, যাহা উজ্জ্বল, তাহাই দেব, সূর্য্যাদি রশ্মিময় পদার্থ দেব। তাহারা অনন্ত হইতে উৎপন্ন; অদিতি অনন্ত, তাই অদিতি দেবমাতা; দেবতারা আদিত্য। কিন্তু সকল দেবতার মাতা যে অদিতি, ঠিক এ কথা বেদে পাওয়া যায় না। এ কথা পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক। পুরাণেতিহাসেই, বেদে অঙ্কুরিত যে হিন্দুধর্ম্ম, তাহাই সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এখনকার সাহেবদিগের এবং সাহেব শিষ্যদিগের মত এই যে, পুরাণ ইতিহাস কেবল মূর্খতা, এবং উপধার্ম্মিকতা, ভণ্ডামি এবং নষ্টামি। বাস্তবিক বৈদিক ধর্ম্ম অপেক্ষা পৌরাণিক ধর্ম্ম অঙ্কুরের অপেক্ষা বৃক্ষের ন্যায় শ্রেষ্ঠ। তবে বৃক্ষটিতে

এখন অনেক বানরের বাসা হইয়াছে বটে। ভরসা আছে, সময়ান্তরে সে কথা বুঝাইব। এক্ষণে কথাটা যাহা বলিতেছি, তাহা এই :—পৌরাণিকেরা বুঝিয়াছিল যে, এই অনন্ত, —অনন্ত কাল ও অনন্ত স্থিতি, অনন্ত জড়পরম্পরা, অনন্ত জীবপরম্পরা—এই অদিতি; (*The Infinite in time, space and existence*) ইহাই সর্ব্বপ্রসূতি। সর্ব্বপ্রসূতি বলিয়া যাহা তেজঃপুঞ্জ, যাহা সুন্দর, যাহা দীপ্তিমান, যাহা মহৎ, যাহা বলবান্—আকাশ চন্দ্র সূর্য্য বরুণ মরুৎ পর্জ্জন্য, সকলেরই প্রসূতি। তাই অদিতি দেবমাতা। কিন্তু ঋগ্বেদে অদিতির এতটা বিস্তার নাই। ঋগ্বেদে অদিতি অনন্ত বটে, কিন্তু সে অনন্ত আকাশ। আকাশ অনন্ত, আকাশ অদিতি। তাই বেদে অদিতি কেবল সূর্য্যাদি আদিত্যাদিগের মাতা। অদিতি যে আকাশ, তাহা বেদের অনেক স্থানেই লেখা আছে; —যথা ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৬৩ সূক্তের ৩ ঋকে "যেভ্যো মাতা মধুমৎ পিন্বতে পয়ঃ পীয়ূষং দ্যৌরদিতিরদ্রিবর্হাঃ"—ইত্যাদি।

এখানে অদিতির বিশেষণ "দ্যৌঃ" শব্দ। দ্যৌঃ শব্দে আকাশ।*

অদিতি একটি প্রধানা বৈদিকী দেবী ইহা বলিয়াছি; কিন্তু দেখিতেছি ইনি আকাশ মাত্র। ইঁহাকে আকাশ-দেবতা বলা যাইতে পারে। বেদের যে সকল দেবতার নাম করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে আরও আকাশ-দেবতা পাইব। বাস্তবিক ঋগ্বেদের দেবতারা, হয়,

(১) আকাশ, যথা, অদিতি, দ্যৌস্, বরুণ, (ইনি আদৌ জলেশ্বর নহেন), ইন্দ্র পর্জ্জন্য।
(২) নয়, সূর্য্য দেবতা, যথা, সূর্য্য, মিত্র, সবিতা, পূষা, বিষ্ণু।
(৩) নয়, অগ্নি দেবতা, যথা, অগ্নি, বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি, রুদ্র।
(৪) নয়, অন্যবিধ আলোক দেবতা, যথা, সোম, উষা, অশ্বীদ্বয়।
(৫) নয়, বায়ু দেবতা, যথা, বায়ু, মরুদ্গণ।
(৬) নয়, সৃষ্টিকর্ত্তা, যথা, প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ, পুরুষ, বিশ্বকর্ম্মা।
(৭) ত্বষ্টা, যম প্রভৃতি দুই চারিটি মাত্র এই শ্রেণীর বাহিরে।

—'প্রচার', ১ম বর্ষ, পৃ. ১২৪-২৮।

ইন্দ্র

এখন আমরা কতক কতক জানিয়াছি, ঋগ্বেদে কোন্ কোন্ দেবতার উপাসনা আছে। আকাশ দেবতা, সূর্য্য দেবতা, এ সকল কথা এখন ছাড়িয়া দিই। যদি প্রয়োজন বিবেচনা করি, তবে সে কথার সবিশেষ আলোচনা পশ্চাৎ করা যাইবে। এখন, ইন্দ্রাদির কথা বলি।

এই ইন্দ্রাদি কে? ইন্দ্র বলিয়া যে একজন দেবতা আছেন, কি বিষ্ণু বলিয়া দেবতা এক জন আছেন, ইহা আমরা কেমন করিয়া জানিলাম? কোন মনুষ্য কি তাঁহাদের

* শতপথব্রাহ্মণে আছে "ইয়ং বৈ পৃথিবী অদিতিঃ", এখানে যদিও পৃথিবীকে অদিতি বলা হইয়াছে, সে অনন্তার্থে। অথর্ব্ব বেদে পৃথিবী হইতে অদিতির প্রভেদ করা হইয়াছে। যথা, "ভূমির্মাতা অদিতির্নো জনিত্রং ভ্রাতান্তরীক্ষম্।" এখানে তিন লোক গণা হইল। এখানেও অদিতি স্পষ্টই আকাশ।

দেখিয়া আসিয়াছে? তাঁহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে অনেক পাকা হিন্দু বলিলেন যে, "হাঁ অনেকেই তাঁহাদিগকে দেখিয়া আসিয়াছে। সেকালে ঋষিরা সর্ব্বদাই স্বর্গে যাইতেন এবং ইন্দ্রাদি দেবতার সঙ্গে আলাপ করিয়া আসিতেন। এবং তাঁহারাও সর্ব্বদা পৃথিবীতে আসিয়া মনুষ্যাদিগের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিতেন। এ সকল কথা পুরাণ ইতিহাসে আছে।" বোধ হয়, আমাদিগকে এ সকল কথার উত্তর দিতে হইবে না। কেন না, আমাদিগের অধিকাংশ পাঠকই এ সকল কথায় শ্রদ্ধাযুক্ত নহেন। তবে এ সম্বন্ধে একটা কথা না বলিয়া থাকা যায় না। পুরাণেতিহাসে যে ইন্দ্রাদি দেবতার বর্ণনা আছে, যাঁহাদিগের সহিত রাজর্ষিরা এবং মহর্ষিরা সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং যাঁহারা পৃথিবীতে আসিয়া সশরীরে লীলা করিতেন, তাঁহাদিগের চরিত্র বড় চমৎকার। কেহ গুরুতল্পগামী, কেহ চোর, কেহ বাঙ্গালি বাবুদিগের ন্যায় ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া নন্দন-কাননে উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা লইয়া ক্রীড়া করেন, কেহ অভিমানী, কেহ স্বার্থপর, কেহ লোভী,—সকলেই মহাপাপিষ্ঠ, সকলেই দুর্ব্বল, কখন অসুর কর্ত্তৃক তাড়িত, কখন রাক্ষস কর্ত্তৃক দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ, কখন মানব কর্ত্তৃক পরাজিত, কখন দুর্ব্বাসা প্রভৃতি মানবদিগের অভিশাপে বিপদ্‌গ্রস্ত, সর্ব্বদা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের শরণাপন্ন। এই কি দেব-চরিত্র? ইহার সঙ্গে এবং নিকৃষ্ট মনুষ্য-চরিত্রের সঙ্গে প্রভেদ কি? এই সকল দেবতার উপাসনায় মহাপাপ এবং চিত্তের অবনতি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। যদি এ সকল দেবতার উপাসনা হিন্দুধর্ম্ম হয়, তবে হিন্দুধর্ম্মের পুনর্জ্জীবন নিশ্চিত বাঞ্ছনীয় নহে। বাস্তবিক হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য এরূপ নহে। ইহার ভিতর একটা গূঢ় তাৎপর্য্য আছে; তাহা পরম রমণীয় এবং মনুষ্যের উন্নতিকর। সেই কথাটি ক্রমে পরিস্ফুট করিব বলিয়া আমরা এই সকল প্রবন্ধগুলি লিখিতেছি। সেই কথা বুঝিবার জন্য আগে বোঝা চাই, এই সকল দেবতা কোথা হইতে পাইলাম।

অনেক বলিবেন, বেদেই পাইয়াছি। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, বেদেই বা তাঁহারা কোথা হইতে আসিলেন? বেদ-প্রণেতারা তাঁহাদিগকে কোথা হইতে জানিলেন? পাকা হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকে বলিবেন, কেন বেদ ত অপৌরুষেয়! বেদও চিরকাল আছেন, দেবতারাও চিরকাল আছেন, সুতরাং তাঁহারাও বেদে আছেন। অপর কেহ বলিবেন, বেদ ঈশ্বর-প্রণীত, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, কাজেই বেদে ইন্দ্রাদি দেবগণের কথা থাকা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এরূপ পাকা হিন্দুর সঙ্গে বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা বলিয়াছি যে, বেদ যে ঋষি প্রণীত অর্থাৎ মনুষ্য-রচিত, এ কথা বেদেই পুনঃপুনঃ উক্ত হইয়াছে। এ কথায় যাঁহারা বুঝিবেন না তাঁহাদিগকে বুঝাইবার আর উপায় নাই।

বেদ যদি ঋষি-প্রণীত হইল, তবে বিচার্য্য এই যে, ঋষিরা ইন্দ্রাদিকে কোথা হইতে পাইলেন। তাঁহারা ত বলেন না যে, আমরা ইন্দ্রাদিকে দেখিয়াছি। সে কথা পুরাণ ইতিহাসে থাকুক, ঋগ্বেদে নাই। অথচ তাঁহারা ইন্দ্রাদির রূপ ও গুণ সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। খবর পৌঁছিল কোথা হইতে? ইন্দ্রাদি কি, এ কথাটা বুঝিলেই সে কথটা বোঝা যাইবে। এবং আরও অনেক কথা বোঝা যাইবে।

এই ইন্দ্রকেই উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। ইঁহার ইন্দ্র নাম হইল কোথা হইতে? কে নাম রাখিল? মনুষ্যে না তাঁর বাপ মায়ে? "তাঁর বাপ মায়ে," এমন কথা বলিতেছি

তাহার কারণ এই যে, তাঁহার বাপ মা আছেন, এ কথা ঋগ্বেদে আছে। তবে তাঁর বাপ মা কে, সে বিষয়ে ঋগ্বেদে বড় গোলযোগ। ঋগ্বেদে অনেক রকম বাপ মার কথা আছে। ঋগ্বেদে এক স্থানে মাত্র তিনি আদিত্য বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। কিন্তু শেষ পৌরাণিক তত্ত্ব এই দাঁড়াইয়াছে যে, তিনি অদিতি ও কাশ্যপের পুত্র। পুরাণেতিহাসে তাঁহার এই পরিচয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, অদিতি ও কশ্যপ—ইন্দ্রের অন্নপ্রাশনের সময় কি তাঁহার ঐ নাম রাখিয়াছিলেন?

আগে বুঝিয়া দেখা যাউক যে, ইন্দ্র অদিতি এবং কশ্যপের সন্তান কেন হইলেন? অদিতি কে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বুঝাইয়াছি—তিনি অনন্ত প্রকৃতি। আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহার উপর দুই একজন বিলাতী পণ্ডিতের কথা হইলে বোধ হয় আমাদের দেশের অনেক বাবুর মনঃপূত হইবে। এই জন্য নোটে প্রথমতঃ আচার্য্য রোথের মত, দ্বিতীয়তঃ মাক্ষমূলরের মত উদ্ধৃত করিলাম।*

এই ত গেল দেবতাদিগের মা। এখন দেবতাদিগের বাপ কশ্যপের কিছু পরিচয় দিই। এখানে সাহেবদিগের সাহায্য পাইব না বটে, কিন্তু বেদের সাহায্য পাইব। কশ্যপ অর্থে কচ্ছপ। এ অর্থ বেদেও লেখে, আজিও অভিধানেও লেখে। এখন, কচ্ছপের আর একটা সংস্কৃত নাম কূর্ম্ম। আবার কূর্ম্ম শব্দ কৃ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইতে পারে—কি প্রকারে নিষ্পন্ন হইতে পারে সে কচকচিতে আমাদের কাজ নাই—বৈদিক ঋষিরা তাহার দায়ী—অতএব যে করিয়াছে, সেই কূর্ম্ম। কূর্ম্ম হইতে কালক্রমে সেই কর্ত্তা

*আচার্য্য রোথ বলেন—

"Aditi Eternity or the Eternal, is the element which sustains and is sustained by the Adityas. This conception, owing to the character of what it embraces, had not in the Vedas been carried out into a definite personification, though the beginnings of such are not wanting.*** This eternal and inviolable principle in which the Adityas live and which constitutes their essence is the Celestical Light." মূর সাহেব কৃতানুবাদ।

২। মাক্ষমূলর বলেন—

"Aditi an ancient God or Goddess, is in reality the earliest name invented to express the Infinite; not the Infinite as the result of a long process of abstract reasoning but the visible Infinite, visible by the naked eye, the endless expanse beyond the earth beyond the clouds beyond the sky." *Translations from the Rig-Veda I, 230.*

সায়নাচার্য্যের মত ভিন্ন প্রকার, কিন্তু তিনিও জানেন যে, অদিতি চৈতন্যযুক্তা দেবী-বিশেষ নহেন। তিনি বলেন, "অদিতিং অখণ্ডনীয়াং ভূমিং দিতিং খণ্ডিতাং প্রজাদিকাং।" কেহ কেহ অদিতিকে পৃথিবী মনে করিতেন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

আবার কশ্যপ হইল, কেন না—কূর্ম্ম কশ্যপ একার্থবাচক শব্দ। যিনি সকল করিয়াছেন, যিনি বেদে প্রজাপতি বা পুরুষ বলিয়া অভিহিত, তিনি কূর্ম্ম, তিনিই এই কশ্যপ। এখন বেদ হইতে ইহার প্রমাণ দিতেছি।

"স যৎ কূর্ম্মো নাম। এতদ্বৈ রূপং ধৃত্বা প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। যদসৃজত অকরোত্তৎ। যদকরোত্তস্মাৎ কূর্ম্মঃ। কশ্যপো বৈ কূর্ম্ম। তস্মাদাহুঃ সর্ব্বাঃ প্রজা কাশ্যপা ইতি।" শতপথব্রাহ্মণ ৭।৪।১।৫

ইহার অর্থ—

"কূর্ম্ম নামের কথা বলা যাইতেছে।—প্রজাপতি এই রূপ ধারণ করিয়া প্রজা সৃজন করিলেন। যাহা সৃজন করিলেন, তাহা তিনি করিলেন (অকরোৎ), করিলেন বলিয়া তিনি কূর্ম্ম। কশ্যপও (অর্থাৎ কচ্ছপ) কূর্ম্ম। এই জন্য লোকে বলে, সকল জীব কশ্যপের বংশ।"

অতএব প্রজাপতি বা স্রষ্টাই কশ্যপ। গোড়ায় তাই। তার উপর উপন্যাসকারেরা উপন্যাস বাড়াইয়াছে।

অতএব ইন্দ্রের বাপ মার ঠিকানা হইল। সকল বস্তুর বাপ মা যে, ইন্দ্রেরও বাপ মা সেই প্রকৃতি পুরুষ। সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ নহে; ইন্দ্র যখন হইয়াছেন, সাংখ্য তখন হয় নাই। প্রকৃতি অনন্তসত্তা *—পুরুষ আদি কারণ। যখন বাপ মার এরূপ পরিচয় পাইলাম, তখন এরূপ বুঝা যায় যে, ইন্দ্রও বুঝি একটা শরীরী চৈতন্য না হইবেন—প্রকৃতিতে ঐশী শক্তির বিকাশ মাত্র হইবেন। আমরা প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, ইন্দ্রের নামেই সে কথা স্পষ্ট বুঝা যায়। নামটা অদিতি ও কশ্যপ তাঁহার অন্নপ্রাশনের সময় রাখেন নাই, আমরাই রাখিয়াছি। আমরা যাঁহাকে ইন্দ্র বলি, তাঁহার গুণ দেখিয়াই ইন্দ্র নাম রাখিয়াছি। ইন্দ্ ধাতু বর্ষণে। তদুত্তর "র" প্রত্যয় করিয়া "ইন্দ্র" শব্দ হয়। অতএব, যিনি বৃষ্টি করেন, তিনিই ইন্দ্র। আকাশ বৃষ্টি করে, অতএব ইন্দ্র আকাশ।

আমরা অন্য প্রবন্ধে বলিয়াছি, অদিতিও আকাশ-দেবতা। আকাশকে দুই বার পৃথক্ পৃথক্ ভিন্ন ভিন্ন দেবতা কল্পনা করা কিছুই অসম্ভব নহে। † বরং আরও আকাশ-দেবতা আছে—থাকাও সম্ভব। যখন আকাশকে অনন্ত বলিয়া ভাবি, তখন আকাশ অদিতি; যখন আকাশকে বৃষ্টিকারক বলিয়া ভাবি, তখন আকাশ ইন্দ্র; যখন আকাশকে আলোকময় ভাবি, তখন দ্যৌঃ। এমনই আকাশের আর আর মূর্ত্তি আছে। সূর্য্য অগ্নি বায়ু প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্তির আলোচনায় ভিন্ন ভিন্ন বৈদিক দেবের উৎপত্তি হইয়াছে, ক্রমে দেখাইব।

---

* পাঠকের স্মরণ থাকে যেন প্রথমে অদিতি অনন্তসত্তা বা প্রকৃতি নহেন—প্রথমে অদিতি অনন্ত আকাশ মাত্র। "অনন্ত" ইতিজ্ঞান, প্রথমে আকাশ হইতে জন্মিয়া পরিণামে সমস্ত সত্তায় পোঁছে।

† মাও আকাশ, ছেলেও আকাশ, ইহাও বিস্ময়কর নহে। প্রথম যখন আকাশ "অদিতি" এবং আকাশ "ইন্দ্র" বলিয়া কল্পিত হয়, তখন ইহাদিগের মাতা পুত্র সম্বন্ধ কল্পিত হয় নাই। ঋগ্বেদে তিনি অদিতির পুত্রদিগের মধ্যে গণিত হন নাই; কেবল এক স্থানে মাত্র ঋগ্বেদে আদিত্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। সে সূক্তটিও বোধ হয় আধুনিক।

আমরা যদি এই কথা মনে রাখি যে, বৃষ্টিকারী আকাশই ইন্দ্র, তাহা হইলে ইন্দ্র সম্বন্ধে যত গুণ, যত উপন্যাস, বেদ, পুরাণ ও ইতিহাসে কথিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি। এখন বুঝিতে পারি, ইন্দ্রই কেন বজ্রধর, আর কেহ কেন নহে। যিনি বৃষ্টি করেন, তিনিই বজ্রপাত করেন।

ঋগ্বেদের সূক্তগুলির সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারিব যে, কতকগুলি সূক্ত অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, কতকগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ইহাতে কিছুই অসম্ভব নাই, কেন না সংহিতা সঙ্কলিত গ্রন্থ মাত্র। নানা সময়ে, নানা ঋষি কর্ত্তৃক প্রণীত, না হয় দৃষ্ট মন্ত্রগুলির সংগ্রহ মাত্র। অতএব তাহার মধ্যে কোনটি পূর্ব্ববর্ত্তী, কোনটি পরবর্ত্তী অবশ্য হইবে। যে সূক্তগুলি আধুনিক, তাহাতে ইন্দ্র শরীরী, চৈতন্যযুক্ত দেবতা হইয়া পড়িয়াছেন বটে, তখন ইন্দ্রের উৎপত্তি ঋষিরা ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন সূক্তগুলিতে দেখা যায় যে, ইন্দ্র যে আকাশ, এ কথা ঋষিদের মনে আছে। কতকগুলি উদাহরণ দিতেছি।

"অবর্দ্ধয়ন্নিন্দ্রমরুতশ্চিদত্র মাতা যদ্বীরং দধনদ্ধনিষ্ঠা" ১০। ৭৩। ১

অর্থাৎ যখন তাঁহার ধনাঢ্যা মাতা তাঁহাকে প্রসব করিলেন, তখন মরুতেরা তাঁহাকে বাড়াইলেন। এস্থলে ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে।

"ইন্দ্রস্য শীর্ষং ক্রতবো নিরেকে" ১০। ১১২। ৩

এখানে সূর্য্যালোকে আকাশ আলোকিত হইবার কথা সূচিত হইতেছে এবং ইন্দ্রকে "হরিশিপ্র" "হরিকেশ" "হরিশ্মশ্রু" "হরিবর্পা" "হিরণ্যয়" "হিরণ্যবাহু" ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা আকাশে সূর্য্যালোকজনিত কাঞ্চনবর্ণ সূচিত হইতেছে। বর্ষণকালীন মেঘ সকল বায়ুর উপর আরোহণ করিয়া চলে, এজন্য কথিত হইয়াছে যে, ইন্দ্র বাতাসের ঘোড়ার উপর চলেন "যুজানো অশ্বা বাতস্য ধুনী দেবো দেবস্য বজ্রিবঃ" ১০। ২২। ৪। ৬। ইন্দ্রের বজ্রের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে "সমুদ্রে অন্তঃ শয়তে উদ্না বজ্রো অভীবৃতঃ" ৮। ৭৯। ৯। বজ্র অন্তঃসমুদ্রে জলকর্ত্তৃক আবৃত হইয়া শুইয়া থাকে। এখানে অন্তঃসমুদ্র অর্থে অন্তরীক্ষ, আর জল অর্থে অন্তরীক্ষের বায়বীয় পদার্থ। অথর্ব্ব বেদে ইন্দ্রের জাল আছে "অন্তরীক্ষম্ জালমাসীজ্জালদণ্ডা দিশোমহীঃ।" অথর্ব্ব বেদ ৮। ৫। অর্থাৎ অন্তরীক্ষটা ইন্দ্রের জাল আর পৃথিবীর দিক্ সকল জালের দণ্ড বা বাঁশ —এ জাল আকাশেরই।

এরূপ উদাহরণ খুঁজিলে অনেক পাওয়া যায়। পাঠকের রুচি হয়, আমরা আরও যোগাইতে পারিব। এক্ষণে ইন্দ্র সম্বন্ধে যে সকল উপন্যাস আছে, তাহার দুই একটা বুঝাইবার চেষ্টা করা যাউক। এ সকল উপন্যাস অধিকাংশ অসুরবধ সম্বন্ধে। আধুনিক বৈয়াকরণেরা অসুর শব্দের এই ব্যাখ্যা করেন যে, "অস্যতি ক্ষিপতি দেবান্ উর বিরোধে ইতি অসুরঃ।"

যদিও এই ব্যাখ্যা প্রকৃত নহে এবং আদৌ অসুর ও দেব উভয় শব্দ একার্থবাচক ছিল, তথাপি শেষাবস্থায় দেবদ্বেষীদিগকেই যে অসুর বলা হইত, ইহা যথার্থ। যখন বেদে পড়ি যে, বৃত্র নমুচি শম্বর প্রভৃতি অসুরগণ ইন্দ্রের দ্বেষক ছিল এবং ইন্দ্র ইহাদিগকে বজ্রদ্বারা বধ করিলেন তখন অনেক স্থানেই বুঝিতে পারি যে, এই সকল অসুর

বৃষ্টির বিঘ্ন মাত্র, বৃষ্টিনিরোধক প্রাকৃতিক ক্রিয়া মাত্র। আকাশ বজ্রপাত করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ করেন, অমনি সে অসুরেরা মরিয়া যায়। অমনি ইন্দ্রের বজ্রে বৃত্র মরে। "বজ্রেণ হত্বা নিরাপঃ সসর্জ" "বজ্রেণ যানি অতৃণৎ নদীনাং" "ইন্দ্রো অর্ণো অপাং প্রৈরয়দহীহাচ্ছ সমুদ্রং" এমন কথা অনেক পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের ৩২ সূক্তের ২ ঋকে আছে যে, ''বাশ্রা ইব ধেনবঃ স্যন্দমানাঃ অঞ্জঃ সমুদ্রমবজগ্মুরাপঃ" বৃত্রাসুর হত হইলে পর রুদ্ধগতি নদী সকল বেগের সহিত সমুদ্রে প্রবাহিত হইয়াছিল, যদ্রূপ গো সকল হাম্বারব করিয়া সত্বর বৎসের নিকট গমন করে।

এই সকল কথার মর্ম্ম এই যে, বৃত্রাদি অসুর বধ হইলেই জল ছোটে। অতএব অসুর-বধ আর কিছুই নহে—বৃষ্টির বিঘ্ন সকল বিনাশ করিয়া বর্ষণ করা। সচরাচর দেখা যায় যে, গ্রীষ্মের পর প্রথম বৃষ্টিতে অধিক বজ্রাঘাত হয়, এই জন্য বজ্রের দ্বারা ইন্দ্র অসুর বধ করেন। কিন্তু কেবল বজ্রের দ্বারা নহে, "হিমেন অবিধ্যদর্ব্বুদং" ৮। ৩২। ২৬, (হিমেন, হিমের দ্বারা অর্থাৎ আমরা যাহাকে শিল বলি তদ্দ্বারা)। শুষ্ককালের পর প্রথম বৃষ্টির সময়ে অনেক সময়ে শিল (hail) পড়ে। পুনশ্চ ''অপাম্ ফেনেন নমুচেঃ শির ইন্দ্র উদবর্ত্তয়ৎ" ৮। ১৪। ১৩। জলের ফেনার দ্বারা ইন্দ্র নমুচির মস্তক উদ্বর্ত্তন করিলেন। ঝড় বৃষ্টির চোটে অসুরটা মারা গেল।

অতএব নমুচি বৃত্র শম্বর অহি প্রভৃতি অসুরেরা বৃষ্টি-নিরোধক প্রাকৃতিক ক্রিয়া ভিন্ন অন্য কিছুই যে নহে, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। কিন্তু ইহারা পুরাণেতিহাসের অনেক মালমসলা যোগাইয়াছে।

ইন্দ্র বৃষ্টিকারী আকাশ, শুধু এই কথাটুকু লইয়া পুরাণেতিহাসের উপন্যাস সকল কি প্রকারে রচিত হইয়াছে, তাহার আর একটা উদাহরণ দিতেছি। অহল্যার গল্প সকলেই জানেন। কথিত আছে, ইন্দ্র গৌতমপত্নী অহল্যাকে হরণ করেন এবং ঋষির শাপে তাঁহার অঙ্গ সহস্রধা বিকৃত হয়। তাহার পর আবার ঋষিবাক্যে সেই বিকার সহস্র চক্ষে পরিণত হয়। উপন্যাসটা শুনিতে অতি কদর্য্য এবং এইরূপ উপন্যাসের জন্যই হিন্দুশাস্ত্র লক্ষ গালি খাইয়াছে। আর এই সকল উপন্যাসই হিন্দুধর্ম্মের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এত অভক্তির কারণ হইয়াছে। ইউরোপীয় পণ্ডিত সাহেবরাও—অন্যে নয়, মূর, মাক্ষমূলার, লাসেন প্রভৃতি, পড়িয়া শুনিয়া স্থির করিয়াছেন যে, লাম্পট্যপ্রিয় হিন্দুশাস্ত্র-কারেরা লাম্পট্যপ্রিয়তাবশতঃই, ইন্দ্রাদি দেবতাকে লম্পট বলিয়া চিত্রিত করিয়াছে।

কিন্তু কথাটা বড় সোজা। ইন্দ্র সহস্রাক্ষ কিন্তু ইন্দ্র আকাশ। আকাশের সহস্র চক্ষু কে না দেখিতে পায়? সাহেবরা কি দেখিতে পান না যে, আকাশে তারা উঠে? সহস্র তারাযুক্ত আকাশ, সহস্রাক্ষ ইন্দ্র। কথাটা আমি নূতন গড়িতেছি না—অনেক সহস্র বৎসরের কথা। প্রাচীন গ্রীসেও এ কথা প্রচলিত ছিল। তবে আমরা বলি, ইন্দ্র সহস্রাক্ষ; তাহারা বলে, আর্গস শতাক্ষ।*

*Even where the tellers of legends may have altered or forgotten its earlier mythic meaning, there are often sufficient grounds for an attempt to restore it.*** For instance the Greeks had still present to their thought the meaning of Argos Panoptes, Jo's hundred eyed all seeing guard. who slain by Hermes and

পাঠক বলিতে পারেন, তাহা হউক, কিন্তু অহল্যার কথাটা আসিল কোথা হইতে? সকলেই জানেন হল বলে লাঙ্গলকে। অহল্যা অর্থাৎ যে ভূমি হলের দ্বারা কর্ষিত হয় না—কঠিন, অনুর্ব্বর। ইন্দ্র বর্ষণ করিয়া সেই কঠিন ভূমিকে কোমল করেন,—জীর্ণ করেন, এই জন্য ইন্দ্র অহল্যা-জার। জৄ ধাতু হইতে জার শব্দ নিষ্পন্ন হয়। বৃষ্টির দ্বারা ইন্দ্র তাহাতে প্রবেশ করেন, এই জন্য তিনি অহল্যাতে অভিগমন করেন। কুমারিলভট্ট এ উপন্যাসের আর একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা নোটে* উদ্ধৃত করিলাম। উপরি-কথিত ব্যাখ্যাগুলির জন্য লেখক নিজে দায়ী।

এখন বোধ হয় পাঠক কতক কতক বুঝিয়া থাকিবেন যে, হিন্দুধর্ম্মের ইন্দ্রাদি দেবতা কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং পুরাণেতিহাসের উপাখ্যান সকলই বা কোথা হইতে আসিয়াছে। বেদের অন্যান্য দেবতা সম্বন্ধেও আমরা কিছু কিছু বলিব।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই ইন্দ্রকে পূজা না করিব কেন? ইনি অচেতন, বর্ষণকারী আকাশ মাত্র, কিন্তু ইহাতে কি জগদীশ্বরের শক্তি, মহিমা, দয়ার আশ্চর্য্য পরিচয় পাই না? যদি আমি আকাশ সচেতন, স্বয়ং সুখদুঃখের বিধানকর্ত্তা বলিয়া, তাঁহার উপাসনা করি, যদি তাই ভাবিয়া, তাঁহার কাছে প্রার্থনা করি যে, হে ইন্দ্র! ধন দাও, গোরু দাও, ভার্য্যা দাও, শত্রুসংহার কর, তবে আমার উপাসনা, দুষ্ট, অলীক, উপধর্ম্ম মাত্র। কিন্তু যদি আমার মনে থাকে যে, এই আকাশ নিজে অচেতন বটে, কিন্তু জগদীশ্বরের বর্ষণ-শক্তির বিকাশস্থল; যে অনন্ত কারুণ্যের গুণে পৃথিবী বৃষ্টি পাইয়া শীতলা, জলশালিনী, শস্যশালিনী, জীবশালিনী হয়, সেই কারুণ্যের দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী প্রতিমা, তবে তাহাকে ভক্তি করিলে, পূজা করিলে, ঈশ্বরের পূজা করা হইল। ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না; তবে তাঁহাকে আমরা জানিতে পারি কিসে? তাঁহার কার্য্য দেখিয়া, তাঁহার শক্তি ও দয়ার পরিচয় পাইয়া। যেখানে সে শক্তি দেখিব, সে পরিচয় পাইব, সেইখানে তাঁহার উপাসনা করিব, নহিলে তাঁহার প্রতি আন্তরিক ভক্তির সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হইবে না। আর যদি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি সুখের হয়, তবে জগতে যাহা মহৎ, যাহা সুন্দর, যাহা শক্তিমান্, তাহার উপাসনা করিতে হয়। যদি এ সকলের প্রতি ভক্তিমান্ না হইব, তবে চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলি লইয়া কি করিব? এ উপাসনা ভিন্ন হৃদয় মরুভূমি হইয়া যাইবে। এগুলি বাদ দিয়া যে ঈশ্বরোপাসনা, সে পত্রহীন বৃক্ষের ন্যায় অঙ্গহীন উপাসনা। হিন্দুধর্ম্মে এ উপাসনা আছে। ইহা হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ। তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ ক্রমে হিন্দুধর্ম্মের বিকৃতি হইয়াছে, ইন্দ্র যে

---

changed into a peacock, for Macrobus writes as recognizing in him the star eyed heaven itself, even as the Aryan Indra—the Sky—is the "thousand eyed."

Tylor's Primitive Culture, p. 230. Vol. I.

* "সমস্ততেজাঃ পরমেশ্বরত্বনিমিত্তেন্দ্রশব্দবাচ্যঃ সবিতৈবাহনি লীয়মানতয়া রাত্রেরহল্যাশব্দবাচ্যায়াঃ ক্ষয়াত্মকজরণহেতুত্বাজ্জীর্যত্যস্মাদনেন বোধিতেন বেত্যহল্যাজার ইত্যুচ্যতে ন পরস্ত্রীব্যভিচারাৎ।"

ইহার অর্থ। তেজোময় সবিতা ঐশ্বর্য্যহেতুক ইন্দ্রপদবাচ্য। অহন্ অর্থাৎ দিনকে লয় করে বলিয়া রাত্রের নাম অহল্যা। সেই রাত্রিকে ক্ষয় বা জীর্ণ করেন বলিয়া ইন্দ্র অর্থাৎ সবিতা অহল্যাজার। ব্যভিচার জন্য নহে। বঙ্গদর্শন, ১২৮১—৪৬৮ পৃঃ।

বর্ষণকারী আকাশ, তাহা ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে স্বয়ং সুখদুঃখের বিধাতা, অথচ ইন্দ্রিয়-পরবশ, কুকর্ম্মশালী, স্বর্গস্থ একটা জীবে পরিণত করিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মের সেইটুকু এখন বাদ দিতে হইবে—হিন্দুধর্ম্মে যে একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই, ইহা মনে রাখিতে হইবে। তবে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বর বিশ্বরূপ ; যেখানে তাঁহার রূপ দেখিব, সেইখানে তাঁহার পূজা করিব। সেই অর্থে ইন্দ্রাদির উপাসনা পুণ্যময়—নহিলে অধর্ম্ম। 'প্রচার', ১ম বর্ষ, পৃ ১৪৫-৫৬।

কোন্ পথে যাইতেছি ?

যাঁহারা ধর্ম্ম-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত, তাঁহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারেরা বলেন, যাহাকে ধর্ম্ম বলিতেছি, তাহা ঈশ্বরোক্ত বা ঈশ্বর-প্রেরিত উপদেশ। তাঁহাদের কাজ বড় সোজা। অমুক গ্রন্থে ঈশ্বরদত্ত উপদেশগুলি পাওয়া যায়, আর তাহার তাৎপর্য্য এই, এই কথা বলিলেই তাহাদের কাজ ফুরাইল। খ্রীষ্টিয়ান, ব্রাহ্মণ, মুসলমান, য়ীহুদী, সচরাচর এই প্রথাই অবলম্বন করিয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারেরা বলেন যে, কোন ধর্ম্ম বা ধর্ম্মপুস্তক যে ঈশ্বরোক্ত, ইহা বিশ্বাস করিবার উপযুক্ত কারণ নাই। বৌদ্ধ, কোমৎ, ব্রাহ্ম, এবং নব্য হিন্দু ব্যাখ্যাকারেরা এই মতের উদাহরণস্বরূপ। ইঁহারা কোন গ্রন্থকেই ঈশ্বরোক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না। যদি ঈশ্বর-প্রণীত ধর্ম্ম না স্বীকার করিলেন, তবে তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের একটা নৈসর্গিক ভিত্তি আছে, ইহা প্রমাণ করিতে হইবে। নইলে ধর্ম্মের কোন মূল থাকে না—কিসের উপর ধর্ম্ম সংস্থাপিত হইবে ? ধর্ম্মের এই নৈসর্গিক ভিত্তি কল্পিত অস্তিত্বশূন্য বস্তু নহে ; যাঁহারা ঈশ্বর-প্রণীত ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া থাকেন, তাঁহারাও ধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তি স্বীকার করিতে পারেন।

উপস্থিত লেখক হিন্দুধর্ম্মের অন্যান্য নূতন ব্যাখ্যাকারদিগের ন্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। আমি কোন ধর্ম্মকে ঈশ্বরপ্রণীত বা ঈশ্বরপ্রেরিত মনে করি না।* ধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তি আছে, ইহাই স্বীকার করি। অথচ স্বীকার করি যে, সকল ধর্ম্মের অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ।

এই দুইটি কথা একত্রিত করিলে, পাঠক প্রথমে আপত্তি করিবেন যে, এই দুইটি উক্তি পরস্পর অসঙ্গত। হিন্দুধর্ম্ম যাহারা গ্রহণ করে, তাহারা হিন্দুধর্ম্ম ঈশ্বরোক্ত বলিয়াই গ্রহণ করে। কেন না, হিন্দুধর্ম্ম বেদমূলক। বেদ হয় ঈশ্বরোক্ত, নয় ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য। যে ইহা মানিল না, সে আবার হিন্দুধর্ম্মের সত্যতা এবং শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করে কি প্রকারে ?

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ধর্ম্মের যে নৈসর্গিক ভিত্তি আছে, হিন্দুধর্ম্ম তাহার উপর স্থাপিত, তাই ঈশ্বর-প্রণীত ধর্ম্ম না মানিয়াও হিন্দুধর্ম্মের যাথার্থ্য ও শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা যাইতে পারে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে এই কথা ক্রমে পরিস্ফুট হইতেছে।

---

* যাহা কিছু জগতে আছে, তাহাই ঈশ্বর-প্রণীত বা ঈশ্বর-প্রেরিত। সে কথা এখন হইতেছে না।

যাঁহারা এই কথা বলেন, তাঁহাদের উপর এই কথা প্রমাণের ভার আছে। তাঁহাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, হিন্দুধর্ম্ম, ধর্ম্মের নৈসর্গিক মূলের উপর স্থাপিত। যদি তাহা না দেখাইতে পারেন, তবে একশ্রেণীর লোক বলিবেন, "হিন্দুধর্ম্ম তবে ধর্ম্মই নহে, মিথ্যা ধর্ম্ম।" আর এক শ্রেণীর লোক বলিবেন, "ধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তির কথা ছাড়িয়া দাও—বেদ নিত্য বা বিধিবাক্য বলিয়া স্বীকার কর।"

অতএব হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যায় আমাদের দেখাইতে হইবে যে, হিন্দুধর্ম্ম, ধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তির উপরে স্থাপিত। ইহা দেখাইতে গেলে প্রথমে বুঝাইতে হইবে, ধর্ম্মের সেই নৈসর্গিক মূল কি? তাহার পর দেখাইতে হইবে যে, হিন্দুধর্ম্ম সেই মূলের উপরেই স্থাপিত।

প্রথমটি, অর্থাৎ ধর্ম্মের নৈসর্গিক তত্ত্ব, আমি 'নবজীবনে' বুঝাইতেছি। দ্বিতীয়টি 'প্রচারে' বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেছি।

আমি 'নবজীবনে' দেখাইয়াছি যে, ধর্ম্মের তিন ভাগ, (১) তত্ত্বজ্ঞান, (২) উপাসনা, (৩) নীতি। হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতে গেলে, ঐ তিন ভাগই একে একে বুঝিয়া লইতে হয়।

হিন্দুধর্ম্মের প্রথম ভাগ, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান, ইহাকেও আবার তিনটি পৃথক্ অবস্থায় অধীত করিতে হয়। (১) বৈদিক, (২) দার্শনিক, (৩) পৌরাণিক।

এই বৈদিক তত্ত্ব আবার ত্রিবিধ। (১) দেবতাতত্ত্ব, (২) ঈশ্বরতত্ত্ব, (৩) আত্মতত্ত্ব। দেবতাতত্ত্ব প্রধানতঃ সংহিতায়; আত্মতত্ত্ব উপনিষদে; ঈশ্বরতত্ত্ব উভয়ে।

অতএব হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যার গোড়ায় ঋগ্বেদসংহিতার দেবতাতত্ত্ব। পাঠক এখন বুঝিয়াছেন যে, কেন আমরা ঋগ্বেদসংহিতার দেবতাদিগকে লইয়া 'প্রচারে' ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছি।

পূর্ব্ব কয় সংখ্যার কয়টি বৈদিক প্রবন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে ভরসা করি, পাঠকদিগের স্মরণ আছে। যথা, (১) বেদে বলে দেবতা মোটে তেত্রিশটি। অনেক আধুনিক দেবতা এই তেত্রিশটির মধ্যে নাই। অনেকে আবার এমন আছেন যে, তাঁহাদের উপাসনা এখন আর প্রচলিত নাই।

(২) সে তেত্রিশটি দেবতা হয় আকাশ, নয় সূর্য্য, নয় অগ্নি, নয় অন্য কোন নৈসর্গিক পদার্থ। তাঁহারা লোকাতীত চৈতন্য, অথবা এখানে যাঁহাকে দেবতা বলি—সেরূপ দেবতা নহেন।

(৩) ঐ নৈসর্গিক পদার্থের যে সকল গুণ, তাহার বর্ণনাগুলি ক্রমে বৈদিক এবং পৌরাণিক উপন্যাসে পরিণত হইয়াছে।

(৪) এ সকল অচেতন পদার্থ জগদীশ্বরের মহিমার পরিচায়ক এবং নিজেও মহান্ বা সুন্দর, অতএব সে সকল বস্তুর ধ্যানে ঈশ্বরে ভক্তি, এবং চিত্তবৃত্তির স্ফূর্ত্তি হয়। এই অর্থে বৈদিক উপাসনা বিধেয়।

এই চারিটির মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয়, ও চতুর্থ তত্ত্বের প্রমাণ এবং উদাহরণস্বরূপ আমি অদিতি ও ইন্দ্রের কিছু বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছি। কিন্তু আর আর বৈদিক দেবতা-গুলির প্রত্যেককে এইরূপ সশরীরে পরিচিত না করিলে, এই দেবতাতত্ত্ব প্রমাণীকৃত বা

প্রাঞ্জল হইয়াছে, এমত বিবেচনা করা যায় না। অতএব ইন্দ্রের পরে, বরুণাদির পরিচয়ে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু সকলেরই তত সবিস্তারে পরিচয় আবশ্যক হইবে না। আবশ্যক হইলে দিব। দেবতাতত্ত্ব সমাপ্ত হইলে ঈশ্বরতত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

পাঠককে এত দূরে আনিয়া আমরা কোন্ পথে যাইতেছি, তাহা বলিয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ হইল। কোন্ পথে কোথায় যাইতেছি, তাহা না বলিয়া দিলে পাঠক সঙ্গে যাইতে অস্বীকার করিতে পারেন। 'প্রচার', ১ম বর্ষ, পৃ. ২০০-২০৪।

বরুণাদি *

আমরা বলিয়াছি, ইন্দ্র ও অদিতি আকাশ-দেবতা। বরুণ আর একটি আকাশ-দেবতা। বৃ ধাতু আবরণে। যাহা চরাচর বিশ্ব আবরণ করিয়া আছে, তাহাই বরুণ। আকাশকে যখন অনন্ত ভাবি, তখন তিনি অদিতি, যখন আকাশকে বৃষ্টিকারী ভাবি, তখন আকাশ ইন্দ্র, যখন আকাশকে সর্ব্বাবরণকারী ভাবি, তখন আকাশ বরুণ।

পুরাণে বরুণ আর আকাশ-দেবতা নহেন, তিনি জলেশ্বর। ঋগ্বেদেও তিনি স্থানে স্থানে জলাধিপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। তাহার কারণ, বেদে পৃথিবীর বায়বীয় আবরণ অনেক স্থলে জল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। † কিন্তু প্রাচীন কালে তিনি যে আকাশ-দেবতা ছিলেন, গ্রীকদিগের মধ্যে Ouranos দেবতা তাহার এক প্রমাণ। ভাষাতত্ত্ববিৎ পাঠকেরা অবগত আছেন যে, গ্রীক ও হিন্দুরা যে এক বংশসম্ভূত, তাহার অনুল্লঙ্ঘ্য প্রমাণ আছে। গ্রীক ধর্ম্মে Ouranos আকাশ-দেবতা।

ঋগ্বেদে বরুণের বড় প্রাধান্য। তিনি সচরাচর সম্রাট্ ও রাজা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিত কেহ কেহ বলেন যে, প্রথমে বরুণ বৈদিক উপাসক-দিগের প্রধান দেবতা ছিলেন, ক্রমে ইন্দ্র তাঁহাকে স্থানচ্যুত করিয়াছেন। ফলতঃ ঋগ্বেদে বরুণের যেরূপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, এরূপ ইন্দ্র ভিন্ন আর কোন দেবতারই হয় নাই। পৌরাণিক বরুণ ক্ষুদ্র দেবতা।

আর এক আকাশ-দেবতা "দ্যৌঃ"। ভাষাতত্ত্ববিদেরা বলেন, ইনি গ্রীকদিগের "Zeus" এবং "Zeus Pater" হইয়া রোমকদিগের Jupiter হইয়াছেন। Zeus ও Jupiter উক্ত জাতিদিগের প্রধান দেবতা। "দ্যৌঃ" এককালে আর্য্যদিগের প্রধান দেবতা ছিলেন। ইঁহাকে বেদে প্রায় পৃথিবীর সঙ্গে একত্রে পাওয়া যায়। যুক্তনাম "দ্যাবা পৃথিবী"। দ্যৌঃ পিতা—পৃথিবী মাতা। ইঁহাদিগের সম্বন্ধে কয়েকটা কথা ভবিষ্যতে বলিবার আছে। ইঁহারা যে আকাশ ও পৃথিবী, ইঁহাদের নামেই প্রকাশ আছে, অন্য প্রমাণ দিতে হইবে না।

আর একটি আকাশ-দেবতা পর্জ্জন্য। ইনিও ইন্দ্রের ন্যায় বৃষ্টি করেন, বজ্রপাত করেন,

* এই প্রবন্ধ পড়িবার আগে, ইহার পূর্ব্বস্থিত প্রবন্ধটি পড়িলে ভাল হয়।

† যথা "যে দেবাসো দিবি একাদশ স্থ পৃথিব্যামধি একাদশ স্থ অপ্সুক্ষিতো মহিমা একাদশ স্থ তে দেবাসো" ইত্যাদি। ১, ১৩৯, ১১।

ভূমিকে শস্যশালিনী করেন। ইন্দ্রের সঙ্গে ইঁহার প্রভেদ কেন হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই, বুঝাইতেও পারিলাম না। তবে ইহা বুঝিতে পারি যে, পর্জন্য ইন্দ্রের অপেক্ষা প্রাচীন দেবতা। লিথুয়েনিয়া বলিয়া রুষ দেশের একটি ক্ষুদ্র বিভাগ আছে। সে প্রদেশের লোক আর্য্যবংশোদ্ভব। শুনিয়াছি তাহাদের ভাষার সঙ্গে প্রাচীন বেদের ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য। এমন কি, বেদজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের ভাষা অনেক বুঝিতে পারেন। এই পর্জন্যদেব, সেই প্রদেশে আজিও বিরাজ করিতেছেন। সেখানে নাম Perkunas. সেখানেও তিনি বজ্রবৃষ্টির দেবতা। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে যে আদিম আর্য্যজাতি, ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় আধুনিক আর্য্যজাতিদিগের পূর্ব্বপুরুষ, পর্জন্য তাঁহাদিগের দেবতা। ইন্দ্রের নাম ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোথাও নাই। ইনি কেবল ভারতবর্ষীয় দেবতা। আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিলে তবে ইঁহার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইন্দ্র পর্জন্যের অনেক পরবর্ত্তী।

এক্ষণে সূর্য্যদেবতাদিগের কথা বলি। সূর্য্যদেবতাগুলি সংখ্যায় অনেক। যথা, সূর্য্য, সবিতা, পূষা, মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বিষ্ণু। সূর্য্যের সবিশেষ পরিচয় দিতে হইবে না। সূর্য্যকে প্রত্যহ দেখিতে পাই—তিনি কে তা জানি। অন্য সৌর দেবতাদিগের পরিচয় দিতেছি। যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী-শাখা চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ে ব্রহ্মযজ্ঞপাঠে কতকগুলি দেবতার স্তুতি আছে। তন্মধ্যে রাত্রি, উষা ও প্রাতস্তুতির পর পারম্পর্য্যের সহিত কতকগুলি সৌর দেবতার স্তুতি আছে। প্রথমে ভগস্তুতি। তারপর পূষার স্তুতি। তার পর অর্য্যমার স্তুতি। তার পর বিষ্ণুর স্তুতি। পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমী যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখা ব্রহ্মযজ্ঞপ্রকরণের অনুবাদের টীকায় ঐ মূর্ত্তি চারিটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। "উষোদয়ের পরেই প্রাতঃকাল—ইহাকেই অরুণোদয়কাল কহে। প্রাতঃকালের পরেই ভগোদয়কাল—অর্থাৎ অরুণোদয়ের পরেই যখন সূর্য্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তীব্র হইয়া উঠে, ভগ সেই কালের সূর্য্য।"

"যে পর্য্যন্ত সূর্য্যের তেজ অত্যুগ্র না হয়, তাবৎ তাদৃশ স্বল্পতেজা সূর্যকে পূষা কহে, অর্থাৎ পূষা ভগোদয়ের পরকালবর্ত্তী সূর্য্য।"

তারপর অর্য্যমা, অর্য্যমা অর্ক একই। সামশ্রমী মহাশয় লিখিতেছেন।—

"পুষোদয়ের পরেই অর্কোদয়কাল—ইহার পরেই মধ্যাহ্ন। এই কালের সূর্য্যকেই অর্ক বা অর্য্যমা কহে। এই অর্য্যমার অন্তেই পূর্ব্বাহ্ণ শেষ হয়।"

"মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যকে বিষ্ণু কহে।"

ঋগ্বেদে পূষাকে অনেক স্থলেই "পশুপা" "পুষ্টিম্ভর" ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। যে ভাবে এই কথাগুলি পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, তাহাতে এমন বোধ হয় যে, যে মূর্ত্তিতে সূর্য্য কৃষিধনের রক্ষাকর্ত্তা, পশুদিগের পাতা, পূষা সূর্য্যের সেই মূর্ত্তি। কিন্তু এই পশু কে, সে বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। অনেক স্থানে পূষা পথিকদিগের দেবতা বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে।

যাহাই হউক, পূষা সম্বন্ধে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, কেন না, তিনি এক্ষণে আর হিন্দুধর্ম্মের প্রচলিত দেবতা নহেন।

এক্ষণে মিত্রের কথা বলি। মিত্র সূর্য্য, কিন্তু মিত্র বরুণের ভাই। বেদে যেখানে

মিত্রের স্তুতি, সেইখানে বরুণের স্তুতি,—মিত্রাবরুণৌ বেদের দুইটি প্রধান দেবতা! আদিত্য শব্দ এই দুই দেবতা সম্বন্ধে যেমন পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে, এমন আর কোন দেবতা সম্বন্ধেই নহে। আমরা বলিয়াছি যে, বরুণ আকাশ, তবে মিত্র সূর্য্য হইল কোথা হইতে? তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে, "ন বৈ ইদং দিবা ন নক্তমাসীদব্যাকৃতং তে দেবা মিত্রাবরুণৌ অব্রুবন্ ইদং নো বিব্যাসয়তামিতি মিত্রো অহরজনয়দ্বরুণো রাত্রিং।" অর্থাৎ দিন ছিল না, রাত্রি ছিল না—জগৎ অব্যাকৃত ছিল, তখন দেবতারা মিত্র বরুণকে বলিলেন—তোমরা ইহাকে বিভাগ কর। মিত্র দিবা করিলেন, বরুণ রাত্রি করিলেন। ১।৭।১০।১। সায়নাচার্য্য বলিয়াছেন, "অস্তং গচ্ছন্ সূর্য্য এব বরুণ ইতি উচ্যতে—স হি স্বগমনেন রাত্রিং জনয়তি।" "অস্তগামী সূর্য্যকে বরুণ বলে, তিনি আপনার গমনের দ্বারা রাত্রির সৃষ্টি করেন।" শতপথব্রাহ্মণে আছে, "অয়ং হি লোকো মিত্রঃ। অসৌ বরুণঃ।" অর্থাৎ ইহলোক মিত্র, পরলোক বরুণ। বোধ হয়, ইহাতে পাঠক বুঝিয়াছেন যে, বরুণ সর্ব্বাবরণকারী অন্ধকার—তিনি সর্ব্বত্রই আছেন, যেখানে কেহ গিয়া আলো করে, সেইখানে আলো হয়, নহিলে অন্ধকার, নহিলে বরুণ। আলো করেন মিত্র। সৌভাগ্যক্রমে এই বরুণ আর এই মিত্র অন্য আর্য্যজাতি মধ্যেও পূজিত। বরুণ যে গ্রীকদিগের Uranos তাহা বলিয়াছি। আবার তিনি প্রাচীন পারস্যজাতিদিগের দেবতা, এমনও কেহ কেহ বলেন। প্রাচীন পারস্যদিগের প্রধান দেবতা অহুরমজ্‌দ। ভাষাবিদেরা জানেন যে, পারস্যেরা সংস্কৃত স স্থানে হ উচ্চারণ করে।—যথা, সিন্ধু স্থানে হিন্দু, সপ্ত স্থানে হপ্ত। তেমনি অসুর স্থানে অহুর। এখন সুরাসুর শব্দ যাঁহারা ব্যবহার করেন তাহাদিগের কথার তাৎপর্য্য এই, অসুরেরা দেবতাদিগের বিদ্বেষী,* কিন্তু আদৌ অসুরই দেবতা। অসু নিশ্বাসে। অসু ধাতুর পর র প্রত্যয় করিয়া "অসুর" হয়। অর্থাৎ আকাশে সূর্য্যে পর্ব্বতে নদীতে যাঁহাদিগকে প্রাচীন আর্য্যেরা শক্তিশালী লোকাতীত চৈতন্য মনে করিতেন, তাঁহারাই অসুর। বেদে ইন্দ্রাদি দেবগণ পুনঃ পুনঃ অসুর বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদে বরুণকে পুনঃ পুনঃ "অসুর" বলা হইয়াছে। এই অহুরমজ্‌দ নামের অহুর শব্দের তাৎপর্য্য দেব। অনেক ইউরোপীয় লেখক প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, এই অহুরমজ্‌দ বরুণ। ইনি বরুণ হউন বা না হউন, ইঁহার আনুষঙ্গিক দেবতা মিথ্ৰ যে বরুণের আনুষঙ্গিক মিত্র, তদ্বিষয়ে সন্দেহ অল্পই। মিত্র সম্বন্ধে আর একটি রহস্যের কথা আছে। প্রাচীন পারসিকদিগের মধ্যে এই মিথ্ৰ দেবের একটা উৎসব ছিল। সে উৎসব শীতকালে হইত। রোমকেরা যখন আশিয়ার পশ্চিম ভাগ অধিকৃত করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা স্বরাজ্য মধ্যে ঐ উৎসবটি প্রচলিত করেন। তার পর রোমক রাজ্য খ্রীষ্টীয়ান হইয়া গেল। কিন্তু উৎসবটি উঠিয়া গেল না। উৎসবটি শেষে খ্রীষ্টের জন্মোৎসব খ্রীষ্টমাসে (Christmas) পরিণত ও সেই নামে পরিচিত হইল। এই যে ইংরেজ মহলে আজি এত গাঁদাফুল ও কেকের শ্রাদ্ধ পড়িয়া গিয়াছে, সাহেবেরা জানুন বা না জানুন, মানুন

অস্যতি ক্ষিপতি দেবান্ উর বিরোধে।

বা না মানুন, এ উৎসব আদৌ আমাদের মিত্রদেবের উৎসব। নোটে প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি।*

আবার সেই মিত্রদেবের উৎসবই বা কি? সেটা সূর্য্যের উত্তরায়ণের উৎসব। আমাদেরও যে উৎসব আছে—"মকর সংক্রান্তি"—যে দিন সূর্য্যের মকর রাশিতে সঞ্চার হয়। বাস্তবিক এখনকার "মকর সংক্রান্তি", আর যে দিন সূর্য্যের মকরে যথার্থ সঞ্চার হয়, সে এক দিনই নয়—মকরে প্রকৃত সঞ্চার, "মকর সংক্রান্তি" হইতে তিন সপ্তাহের কিছু বেশী পিছাইয়া পড়িয়াছে। এই ব্যতিক্রমের কারণ "Precesion of the Equinoxes". জ্যোতিষ শাস্ত্র যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা সহজে গণনা করিতে পারিবেন, কত দিনে এই ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। সে যাহাই হউক, সাহেবদিগের এই আমাদের "মকর সংক্রান্তি" পৌষপার্ব্বণ ও "খ্রীষ্টমাস" একই। কথাটা "আষাঢ়ে" রকম, কিন্তু প্রমাণে কিছু ছিদ্র নাই।—'প্রচার', ১ম বর্ষ, পৃ. ২০৪-১০।

* The Roman winter solstice festival as celebrated on December 25 (VIII. Kal. Jan.) in connexion with the worship of the Sun-God Mithra, appears to have been instituted in this special form by Aurelian about A. D. 273, and to this festival the day owes its apposite name of Birth-day of the Unconquered Sun, "Dies Natalis Solis Invicti." With full symbolic appropriateness, though not with historical justification, the day was adopted in the Western Church, where it appears to have been generally introduced in the fourth century, and whence in time it passed to the Eastern Church, as the solemn anniversary of the birth of Christ, the Christian Dies Natalis, Christmas Day. Attempts have been made to ratify this date as a matter of history, but no valid or even consistent Christian tradition vouches for it. The real origin of the festival is clear from the writ.ngs of the Fathers after its institution. In religious symbolism of the material and spiritual Sun, ugustine and Gregory Nyassa discourse on the glowing light and dwindling darkness that follow the Nativity, while Leo the Great, among whose people the earlier Solar meaning of the festival remained in strong remembrance, rebukes in a sermon the pestiferous persuasion, as he calls it, that this solemn day is to be honoured not for the birth of Christ, but for the rising, as they say, of the new Sun.

Tylor's *Primitive Culture*, Vol. II, p. 297-8.

টেলর সাহেব নোটে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যাঁহাদিগের সে প্রমাণগুলি বিস্তারিত দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তাঁহারা তাঁহার ঐ নোটের লিখিত গ্রন্থগুলি পড়িয়া দেখিবেন। নোটে ছয়খানি গ্রন্থের নাম আছে।

সবিতা ও গায়ত্রী

আকাশ-দেবতাদিগের কথা বলিয়াছি। তার পর সূর্য্য-দেবতাদিগের কথা বলিতেছিলাম। সূর্য্য-দেবতা, সূর্য্য, ভগ, অর্য্যমা, পূষা, মিত্র, সবিতা, বিষ্ণু। ইহার মধ্যে সূর্য্যের কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হয় নাই—চেনা জিনিষ। ভগ, অর্য্যমা, পূষা, ও মিত্র সম্বন্ধে কিছু কিছু বলা গিয়াছে। বিষ্ণুর কথা এখন বলিব না—পৌরাণিক তত্ত্বের আলোচনায় তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিতে হইবে। অতএব এক্ষণে কেবল সবিতাই আমাদের আলোচ্য।

কিন্তু সবিতাকে লইয়া বড় গোলযোগ। সূর্য্যের নাম সবিতা, ইহা বালকেও জানে। কিন্তু প্রসিদ্ধ গায়ত্রী নামক মন্ত্রে যেখানে সবিতা আছেন ("তৎসবিতুঃ") সেখানে তিনি স্বয়ং পরব্রহ্ম পরমেশ্বর বলিয়া পরিচিত। অনেকেই সবিতা অর্থে জগৎস্রষ্টাকেই বুঝেন। এ কথা আমাদের বিচার্য্য। পূষা বা মিত্রের মত তাঁহাকে অপ্রচলিতের মধ্যে ফেলিয়া তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিতে পারি না—কেন না, তিনি আর্য্য ব্রাহ্মণের উপর বড় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। যে গায়ত্রীকে ব্রাহ্মণেরা আপনাদের ব্রাহ্মণ্যের ও উপাসনার সার ভাগ মনে করেন, তিনি সেই গায়ত্রীর দেবতা। গায়ত্রী কেবল তাঁরই স্তব। সুতরাং এ কথাটা আগে মীমাংসার প্রয়োজন—তিনি কেবল একটা বৃহৎ জড়পিণ্ড, না সর্ব্বস্রষ্টা, অনন্তচৈতন্য পরমেশ্বর? আমরা নিরপেক্ষ হইয়া এ বিষয়ের মীমাংসার চেষ্টা করিব। আমরা সবিতাকে সূর্য্য দেবতা মধ্যে গণিয়াছি বটে, কিন্তু সে মতের বিরুদ্ধ কতকগুলি কথা আছে, তাহাও দেখাইতে হইবে।

"সু" ধাতু হইতে সবিতৃ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তবেই সবিতা অর্থ প্রসবিতা। কাহার প্রসবিতা? নিরুক্তকার যাস্ক বলেন, "সর্ব্বস্য প্রসবিতা।" সায়নাচার্য্য গায়ত্রীর ব্যাখ্যা কালে "তৎসবিতুঃ" ইতি বাক্যের অর্থ করেন, "জগৎপ্রসবিতুঃ।" যদি তাই হয়, তাহা হইলে সবিতা, পরব্রহ্ম পরমেশ্বর। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিও "তৎসবিতুঃ" শব্দের ব্যাখ্যা পরব্রহ্ম পক্ষে করিয়া থাকেন। বেদের এক স্থানে তাঁহাকে "প্রজাপতি" বলা হইয়াছে। আর এক স্থানে বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা, রুদ্র, কেহই তাঁহার বিরোধী হইতে পারে না।* জলবায়ু তাঁহার আজ্ঞাকারী।† অন্য দেবতারা তাঁহার অনুযায়ী।‡ বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা, অদিতি, ও বসুগণ তাঁহার স্তুতি করেন।§ তিনি প্রার্থনার বস্তু ঈশ্বর; আমাদের কাম্য বস্তু সকল দান করেন।

* নকিরস্য তানি ব্রতাঃ দেবস্য সবিতুর্মিনন্তি। ন যস্য ইন্দ্রো বরুণো ন মিত্রো ব্রতং অর্য্যমান্‌ মিনন্তি রুদ্রাঃ। অস্যহি সর্ব্বশান্তারং সবিতুঃ কচ্চন প্রিয়ং। ন মিনন্তি স্বরাজ্যং। ২। ৩৮। ৭। ৯।—৫। ৮২। ২।

† আপশ্চিদস্য ব্রতে আনিমৃগ্রা অয়ঞ্চিৎ বাতো রমতে পরিজ্‌মন্‌। ২। ৩৮। ২।

‡ যস্য প্রয়ানমন্বয়ে ইদযযুর্দেবাঃ। ৫। ৮১। ৩।

§ অপি স্তুতঃ সবিতা দেবো অস্তুয়ং আচিদ্বিশ্বেবসবো গৃণন্তি। অভি যং দেবী অদিতির্গণাতি সবং দেবস্য সবিতুর্জুষাণা। অভিসম্রাজো বরুণো গৃণন্তি অভিমিত্রাসো অর্য্যমা সযোষাঃ। ৭। ৩৮। ৩, ৪।

তিনি ভুবনের প্রজাপতি; আকাশের ধর্ত্তা (দিবো ধর্ত্তা ভুবনস্য প্রজাপতিঃ। ৫।৫৩।২।) তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আছে যে, "প্রজাপতিঃ সবিতা ভূত্বা প্রজা অসৃজত"। সবিতা প্রজাপতি হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিলেন। কথাগুলায় যেন কেবল পরমেশ্বরকেই বুঝায়।

পক্ষান্তরে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রসবিতৃ শব্দ ঋগ্বেদে সূর্য্য প্রতিও এক স্থানে প্রযুক্ত হইয়াছে (৭।৬৩।২)। ঋগ্বেদের সূক্তের একটি লক্ষণ এই যে, যখন যে দেবতা স্তুত হন, তখন তিনিই সকলের বড় হইয়া দাঁড়ান। সুতরাং সবিতার এত মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত দেখিয়াও কিছুই স্থির করা যায় না। সবিতা যে সূর্য্য, এমত বিবেচনা করিবার অনেকগুলি কারণ আছে।

১। ঋগ্বেদে অনেক স্থানে স্পষ্টই সূর্য্যার্থে সবিতৃ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যথা, ৪ ম, ১৪ সূ, ২ ঋকে।

২। সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার রূপ। সূর্য্যের মত তাঁহার কিরণ আছে। (প্রসুবন্নক্তুভির্জগৎ। ৪ ম, ৫৩ সূ, ৩ ঋক্) সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার রথ আছে, অশ্ব আছে এবং সূর্য্যের ন্যায় তিনি আকাশ পরিভ্রমণ করেন।

৩। যাস্ক বলেন, যখন আকাশ হইতে অন্ধকার গিয়াছে, রশ্মি বিকীর্ণ হইয়াছে, সেই সবিতার কাল।* সায়নাচার্য্য বলেন যে, উদয়ের পূর্ব্বে যে মূর্ত্তি সেই সবিতা, উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত যে মূর্ত্তি, সেই সূর্য্য।† অতএব এই মত পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক গৃহীত।

৪। সবিতা যে পরব্রহ্ম নহেন, তাহার আর এক প্রমাণ এই যে, পরব্রহ্মবাদীরা ঈশ্বরকে নিরাকার বলিয়াই স্বীকার করেন, অথবা বিশ্বরূপ বলিয়া থাকেন, কিন্তু সবিতা অন্যান্য বৈদিক দেবতার ন্যায় সাকার। তিনি হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যহস্ত, হিরণ্যজিহ্ব, হিরণ্যপাণি, পৃথুপাণি, সুপাণি, সুজিহ্ব, মন্দ্রজিহ্ব, হরিকেশ ইত্যাদি শব্দে বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার বাহুর কথা অনেক বার কথিত হইয়াছে। (বাহু, কর মাত্র)

বোধ হয় এখন স্বীকার করিতে হইবে যে, সবিতা, পরব্রহ্ম নহেন, জড়পিণ্ড সূর্য্য। তবে গায়ত্রীর সেই "তৎসবিতুঃ" শব্দের অর্থ কি হইল? এত কাল কি ব্রাহ্মণেরা গায়ত্রীতে সূর্য্যকেই ডাকিয়া আসিতেছে, পরব্রহ্মকে নয়? যে গায়ত্রী না জপিয়া ব্রাহ্মণকে জলগ্রহণ করিতে নাই, যে গায়ত্রী জপ করিয়া ব্রাহ্মণ মনে করেন, আমি পবিত্র হইলাম, আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল—সে কি কেবল জড়পিণ্ড সূর্য্যের কথা, জগদীশ্বরের নহে?

ব্রাহ্মণে এমন ভাবে না। এমন ভাবিতে ব্রাহ্মণের প্রাণে বড় আঘাত লাগে। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মপক্ষে গায়ত্রীর কিরূপ অর্থ করেন, তাহার উদাহরণস্বরূপ মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের কৃত ব্যাখ্যা নোটে উদ্ধৃত করিলাম।‡ কিন্তু এখনকার ব্রাহ্মণেরা

* তস্য কালো যদা দ্যৌরপহততমস্কাকীর্ণরশ্মির্ভবতি।

† উদয়াৎ পূর্ব্বভাবী সবিতা। উদয়াস্তমধ্যবর্ত্তী সূর্য্য ইতি।

‡ "গায়ত্র্যা অর্থমাহ যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ। দেবস্য সবিতুর্বর্চ্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুং। ব্রহ্মবাদিন এবাহুর্ব্বরেণ্যঞ্চাস্য ধীমহি। চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুনঃ পুনঃ। 'বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্তু চিদাত্মা পুরুষো বিরাট্।

যাই বলুন, এইরূপ ব্যাখ্যাই কি প্রকৃত ব্যাখ্যা ? গায়ত্রী সামগ্রীটা কি, তাহা বুঝিলেই গোল মিটিতে পারে ।

গায়ত্রী আর কিছুই নহে। ঋগ্বেদের একটি ঋক্ । তৃতীয় মণ্ডলে দ্বিষষ্টিতম সূক্তের ১৮টি ঋক্ আছে; তন্মধ্যে দশম ঋক্ গায়ত্রী। ঐ সূক্তটি সমুদায় উদ্ধৃত করিতে হইতেছে, নহিলে পাঠক "গায়ত্রীর" মর্ম্ম বুঝিবেন না।

এই সূক্তের ঋষি বিশ্বামিত্র। ইন্দ্রাবরুণৌ (ইন্দ্র ও বরুণ একত্রে) বৃহস্পতি, পূষা, সবিতা, সোম, মিত্রাবরুণৌ (মিত্র ও বরুণ একত্রে) এই সূক্তের দেবতা। অর্থাৎ বিশ্বামিত্র এই সূক্তে বক্তা (প্রণেতা) এবং ইন্দ্রাদি দেবতা ইহাতে স্তুত হইয়াছেন। ঐ স্তুত দেবতাদিগের মধ্যে সবিতা এক জন। যে ঋক্‌টিকে গায়ত্রী বলা যায়, তাহা তাঁহারই স্তব।

সূক্তটি এই—

"ইমা উ বাং ভৃময়ো মন্যমানা য়ুবাবতে ন তুজ্যা অভূবন্ ।
কত্যদিন্দ্রাবরুণা যশো বাং যেন স্মা সিনং ভরথঃ সখিভ্যঃ ॥ ১ ॥
অয়মু বাং পুরুতমো রয়ীয়ঞ্ছশ্বত্তমমবসে জোহবীতি ।
সজোষাবিন্দ্রাবরুণা মরুদ্ভির্দ্দিবা পৃথিব্যা শৃণুতং হবং মে ॥ ২ ॥
অস্মে তদিন্দ্রাবরুণা বসু ষ্যাদস্মে রয়ির্ম্মরুতঃ সর্ব্ববীরঃ ।
অস্মান্ বরুত্রীঃ শরণৈরবন্ত্বস্মান্ হোত্রা ভারতী দক্ষিণাভিঃ ॥ ৩ ॥
বৃহস্পতে জুষস্ব নো হব্যানি বিশ্বদেব্য ।
রাস্ব রত্নানি দাশুষে ॥ ৪ ॥
শুচিমর্কৈর্বৃহস্পতিমধ্বরেষু নমস্যত ।
অনাম্যোজ আ চকে ॥ ৫ ॥
বৃষভং চর্ষণীনাং বিশ্বরূপমদাভ্যং ।
বৃহস্পতিং বরেণ্যং ॥ ৬ ॥
ইয়ং তে পূষন্নাঘৃণে সুষ্টুতির্দ্দেব নব্যসী ।
অস্মাভিস্তুভ্যং শস্যতে ॥ ৭ ॥

বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ। আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যং তন্মুমুক্ষুভিঃ। জন্মমৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্য ত্রিতয়স্য চ। ধ্যানেন পুরুষো যশ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে। মন্ত্রার্থমপি চৈবায়ং জ্ঞাপয়ত্যেবমেবহি। তেন গায়ত্র্যা অয়মর্থঃ। দেবস্য সবিতুর্ভর্গস্বরূপান্তর্যামি ব্রহ্ম বরেণ্যং বরণীয়ং জন্মমৃত্যুভীরুভিঃ তদ্বিনাশায় উপাসনীয়ং। ধীমহি প্রাগুক্তেন সোঽহমস্মীত্যনেন চিন্তয়ামঃ, যো ভর্গঃ সর্ব্বান্তর্যামীশ্বরো নোঽস্মাকং সর্ব্বেষাং সংসারিণাং ধিয়ো বুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু প্রেরয়তি। তথাচ ভগবদ্গীতায়াং। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া।" ঈশ্বরোঽন্তর্যামী হৃদ্দেশে অন্তঃকরণে ভ্রাময়ন্ তত্তৎকর্ম্মসু প্রেরয়ন্ যন্ত্রারূঢ়ানি দারুযন্ত্রতুল্যশরীরারূঢ়ানি ভূতানি প্রাণিনো জীবানিতি যাবৎ মায়য়া অঘটনঘটনপটীয়স্যা নিজশক্ত্যা। তথাচাশ্বতরাণাং মন্ত্রঃ। "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ় সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ।"

তাং জুষস্ব গিরং মম বাজয়ন্তীমবা ধিয়ং।
বধূয়ুরিব যোষণাং ॥ ৮ ॥
যো বিশ্বাভি বিপশ্যতি ভুবনা সং চ পশ্যতি।
স নঃ পূষাবিতা ভুবৎ ॥ ৯ ॥
তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১০ ॥
দেবস্য সবিতুর্ব্বয়ং বাজয়ন্তঃ পুরন্ধ্যা।
ভগস্য রাতিমীমহে ॥ ১১ ॥
দেবং নরঃ সবিতারং বিপ্রা যজ্ঞৈঃ সুবৃক্তিভিঃ।
নমস্যন্তি ধিয়েষিতাঃ ॥ ১২ ॥
সোমো জিগাতি গাতুবিৎ দেবানামেতি নিষ্কৃতং।
ঋতস্য যোনিমাসদং ॥ ১৩ ॥
সোমো অস্মভ্যং দ্বিপদে চতুষ্পদে চ পশবে।
অনমীবা ইষস্করৎ ॥ ১৪ ॥
অস্মাকমায়ুর্ব্বর্ধয়ন্নভিমাতীঃ সহমানঃ।
সোমঃ সধস্থমাসদৎ ॥ ১৫ ॥
আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতং।
মধ্বা রজাংসি সুক্রতূ ॥ ১৬ ॥
উরুশংসা নমোবৃধা মহ্না দক্ষস্য রাজথঃ।
দ্রাঘিষ্ঠাভিঃ শুচিব্রতা ॥ ১৭ ॥
গৃণানা জমদগ্নিনা যোনাবৃতস্য সীদতং।
পাতং সোমমৃতাবৃধা ॥ ১৮ ॥

শেষ ৪ ঋকের ঋষি কোন কোন মতে জমদগ্নি। অস্যার্থ।

হে ইন্দ্র ও বরুণদেব! আপনাদিগের সম্বন্ধীয় মান্যমান এবং ভ্রমণশীল এই প্রজাগণ যুবা এবং বলবান্ রিপুকর্ত্তৃক যেন বিনষ্ট না হয়। আপনাদিগের তাদৃশ যশ আর কোথায় আছে, যে যশঃদ্বারা সখিভূত আমাদিগকে অন্নপ্রদান করেন। ১। হে ইন্দ্র ও বরুণ! ধনেচ্ছু মহান্ যজমান রক্ষার নিমিত্ত আপনাদিগকে আহ্বান করেন। মরুদ্গণ, দ্যুলোক ও পৃথিবীর সহিত সংগত হইয়া আপনারা আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন। ২। হে দেবদ্বয়! আমরা যেন সেই অভিলষিত বসু এবং সেই সর্ব্বকর্ম্ম-করণে সামর্থবিধায়ক অর্থ প্রাপ্ত হই। সকলের বরণীয় দেবপত্নীগণ রক্ষার সহিত এবং হবনীয় সরস্বতী গোরূপ দক্ষিণার সহিত আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৩। হে সর্ব্বদেবহিত বৃহস্পতে! আমাদিগের হব্যাদি গ্রহণ করুন এবং আমাদিগকে ধনদান করুন। ৪। হে ঋত্বিক্‌গণ! বৃহস্পতিদেবকে তোমরা স্তোত্রদ্বারা নমস্কার কর। আমরা তাঁহার অনভিভবনীয় তেজের স্তুতি করিতেছি। ৫। মনুষ্যদিগের অভিমত ফলদাতা অনভিভবনীয় এবং ব্যাপ্তরূপ বরেণ্য বৃহস্পতিকে নমস্কার কর। ৬। হে দীপ্তিমন্ পূষন্! এই নূতন স্তুতি আপনার উদ্দেশে কীর্ত্তন করিতেছি। ৭। হে

পূষন্, স্তুতিকারক আমার এই স্তুতি গ্রহণ করুন এবং স্তুতিদ্বারা প্রীত হইয়া অন্ন ইচ্ছাকারিণী ও হর্ষকারিণী এই স্তুতি গ্রহণ করুন, যেমন স্ত্রীকামী পুরুষ স্ত্রীকে গ্রহণ করে। ৮। যে পূষাদেব বিশ্বজগৎ দর্শন করেন, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন। ৯। সবিতৃদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন। ১০। অন্ন ইচ্ছা করিয়া আমরা স্তুতির সহিত সবিতৃদেবের এবং ভগদেবের দান প্রার্থনা করি। ১১। নেতৃ বিপ্রগণ যজ্ঞে শোভন স্তুতিদ্বারা সবিতৃদেবকে বন্দন করে। ১২। পথপ্রদর্শক সোমদেব দেবগণের সংস্কৃত আবাসে এবং যজ্ঞস্থানে গমন করেন। ১৩। সোমদেব আমাদিগকে এবং সর্ব্বপ্রাণীকে অনাময়প্রদ অন্ন প্রদান করুন। ১৪। সোমদেব আমাদিগের আয়ুর্ব্বর্দ্ধন এবং পাপনাশ করিয়া হবির্ধানপ্রদেশে আগমন করুন। ১৫। হে শোভনকর্ম্মশীল মিত্র ও বরুণদেব! আপনারা আমাদিগের গাভীসকলকে দুগ্ধপূর্ণ করুন এবং জল মধু রসবিশিষ্ট করুন। ১৬। বহুস্তুত এবং স্তুতিবৃদ্ধ শুদ্ধব্রত আপনারা দীর্ঘস্তুতিদ্বারা বলের ঈশ্বর হয়েন। ১৭। জমদগ্নি ঋষি কর্তৃক স্তুত হইয়া যজ্ঞবর্দ্ধক আপনারা যজ্ঞস্থলে আগমন করুন এবং সোম পান করুন। ১৮।

এখন দেখা যাইতেছে, যখন, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, সোমাদির সঙ্গে একত্রেই সবিতা স্তুত হইয়াছেন, তখন সবিতা পরব্রহ্ম না হইয়া সূর্য্য হইবারই সম্ভাবনা। একাদশ ঋকৃটিও সবিতৃস্তব। ঐ ঋকে সবিতার সঙ্গে ভগদেবও যুক্ত হইয়াছেন। অতএব উভয়েই সূর্য্যের মূর্ত্তিবিশেষ, ইহাই সম্ভব। পাঠক দেখিবেন, যে ঋকৃটিকে গায়ত্রী বলা যায় (দশম ঋক্) তাহার পূর্ব্বে "ভূ" "ভূব" "স্বর্" এ তিনটি শব্দ নাই। গায়ত্রীর পূর্ব্বে এই তিনটি শব্দ সচরাচর উচ্চারিত হওয়ার নিয়ম থাকায়, অনেকে মনে করেন, "তৎসবিতা" অর্থে, এই ত্রৈলোক্যের প্রসবিতা।

এই ঋকৃটির গায়ত্রী নাম হইল কেন? গায়ত্রী একটি ছন্দের নাম। এই ৬২তম সূক্তের প্রথম তিনটি ঋক্ ত্রিষ্টুপ ছন্দে। আর ১৫টি গায়ত্রীচ্ছন্দে। এই ঋকৃটির প্রাধান্য আছে বলিয়াই ইহাই গায়ত্রী নামে প্রচলিত। এই প্রাধান্য, ইহার অর্থগৌরব হেতু। সত্য বটে যে, সূর্য্যপক্ষে ব্যাখ্যা করিলে তত অর্থগৌরব থাকে না। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, যখন ভারতবর্ষে প্রধান ঋষিরা ব্রহ্মবাদী হইলেন, আর তাঁহারা ব্রহ্মবাদ বেদমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন গায়ত্রীর অর্থ ব্রহ্মপক্ষেই করিলেন। এবং সেই অর্থই ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে প্রচলিত হইল।

ইহাতে ক্ষতি কি? ব্রাহ্মণেরই বা লাঘব কি? গায়ত্রীরই বা লাঘব কি? যে ঋষি গায়ত্রী প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তিনি যে অর্থই অভিপ্রেত করিয়া থাকুন না, যখন ব্রহ্মপক্ষে তাঁহার বাক্যের সদর্থ হয়, আর যখন সেই অর্থেই গায়ত্রী সনাতন ধর্ম্মোপযোগী এবং মনুষ্যের চিত্ত-শুদ্ধিকর, তখন সেই অর্থই প্রচলিত থাকাই উচিত। তাহাতে ব্রাহ্মণেরও গৌরব, হিন্দুধর্ম্মেরও গৌরব। এই অর্থে ব্রাহ্মণ শূদ্র, ব্রাহ্ম খ্রীষ্টীয়ান্ সকলেই গায়ত্রী জপ করিতে পারে। তবে আদৌ বৈদিক ধর্ম্ম কি ছিল, তাহার যথার্থ মর্ম্ম কি, তাহা হইতে কি প্রকারে বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে, এই তত্ত্বগুলি পরিষ্কার করিয়া বুঝান আমাদের চেষ্টা, তাই গোড়ার কথাটা লইয়া আমাদের

এত বিচার করিতে হইল। বৈদিক ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের মূল, কিন্তু মূল বৃক্ষ নহে; বৃক্ষ পৃথক্ বস্তু। বৃক্ষ যে শাখা প্রশাখা, পত্র পুষ্প ফলে ভূষিত, মূলে তাহা নাই। কিন্তু মূলের গুণাগুণ না বুঝিলে, আমরা বৃক্ষটিও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব না।—'প্রচার', ১ম বর্ষ, পৃ. ২২৮-৩৭।

বৈদিক দেবতা

এক্ষণে আমরা অবশিষ্ট বৈদিক দেবতাদিগের কথা সংক্ষেপে বলিব। আমরা আকাশ ও সূর্য্যদেবতাদিগের কথা বলিয়াছি, এক্ষণে বায়ু-দেবতাদিগের কথা বলিব। বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই। বায়ু দেবতা,—প্রথম বায়ু বা বাত, দ্বিতীয় মরুদ্গণ। বায়ুর বিশেষ পরিচয় কিছুই দিবার নাই। সূর্য্যের ন্যায় বায়ু আমাদিগের কাছে নিত্য পরিচিত। ইনি পৌরাণিক দেবতার মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। পুরাণেতিহাসে ইন্দ্রাদির ন্যায় ইনি একজন দিক্পাল মধ্যে গণ্য। এবং বায়ু বা পবন নাম ধারণ করিয়াছেন। সুতরাং ইঁহাকে প্রচলিত দেবতাদের মধ্যে ধরিতে হয়।

মরুদ্গণ সেরূপ নহেন। ইঁহারা এক্ষণে অপ্রচলিত। বায়ু সাধারণ বাতাস, মরুদ্গণ ঝড়। নামটা কোথাও একবচন নাই; সর্ব্বত্রই বহুবচন। কথিত আছে যে, মরুদ্গণ ত্রিগুণিত ষষ্টিসংখ্যক, একশত আশী। এ দেশে ঝড়ের যে দৌরাত্ম্য, তাহাতে এক লক্ষ আশী হাজার বলিলেও অত্যুক্তি হইত না। ইঁহাদিগকে কখন কখন রুদ্র বলা হইয়া থাকে। রুদ্ ধাতু চীৎকারার্থে, রুদ্ ধাতু হইতে রোদন শব্দ হইয়াছে। রুদ্ ধাতুর পর সেই "র" প্রত্যয় করিয়া রুদ্র শব্দ হইয়াছে। ঝড় বড় শব্দ করে, এই জন্য মরুদ্গণকে রুদ্র বলা হইয়াছে সন্দেহ নাই। কোথাও বা মরুদগণকে রুদ্রের সন্ততি বলা হইয়াছে।

তার পর অগ্নিদেবতা। অগ্নিও আমাদের নিকট এত সুপরিচিত যে তাঁহারও কোন পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। কিছু পরিচয় দেওয়াও হইয়াছে।

ঋগ্বেদে আর একটি দেবতা আছেন, তাহাকে কখন বৃহস্পতি কখন ব্রহ্মণস্পতি বলা হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, ইনি অগ্নি, কেহ কেহ বলেন, ইনি ব্রহ্মণ্যদেব। সে যাহাই হউক, ব্রহ্মণস্পতির সঙ্গে আমাদের আর বড় সম্বন্ধ নাই। বৃহস্পতি এক্ষণে দেবগুরু অথবা আকাশের একটি তারা। অতএব তাঁহার সম্বন্ধে বড় বিশেষ বলিবার প্রয়োজন নাই।

সোমকে এক্ষণে চন্দ্র বলি, কিন্তু ঋগ্বেদে তিনি চন্দ্র নহেন। ঋগ্বেদে তিনি সোম-রসের দেবতা।

অশ্বীদ্বয় পুরাণেতিহাসে অশ্বিনীকুমার বলিয়া বিখ্যাত। কথিত আছে যে, তাহারা সূর্য্যের ঔরসে অশ্বিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহাদিগের পৌরাণিক নাম অশ্বিনীকুমার। এমন বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে যে, তাঁহারা শেষ-রাত্রির দেবতা; ঊষার পূর্ব্বগামী দেবতা।

আর একটি দেবতা ত্বষ্টা। পুরাণেতিহাসে বিশ্বকর্ম্মা যাহা, ঋগ্বেদে ত্বষ্টা তাহাই। অর্থাৎ দেবতাদিগের কারিগর।

যমও ঋগ্বেদে আছেন কিন্তু যমও আমাদিগের নিকট বিশেষ পরিচিত। যমদেবতার একটি গূঢ় তাৎপর্য্য আছে, তাহা সময়ান্তরে বুঝাইবার প্রয়োজন হইবে।

ত্রিত আপ্ত্য অজ একপাদ প্রভৃতি দুই একটি ক্ষুদ্র দেবতা আছেন, কখন কখন বেদে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে এমন কিছুই কথা নাই যে, তাঁহাদের কোন পরিচয় দিবার প্রয়োজন করে।

বৈদিক দেবীদিগের মধ্যে অদিতি পৃথিবী এবং উষা এই তিনেরই কিঞ্চিৎ প্রাধান্য আছে। অদিতি ও পৃথিবীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছি। উষার পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই, কেন না, যাহার ঘুম একটু সকালে ভাঙ্গিয়াছে সেই তাহাকে চিনে। সরস্বতীও একটি বৈদিক দেবী। তিনি কখন নদী কখন বাগ্‌দেবী। গঙ্গা-সিন্ধু প্রভৃতি নদী ঋগ্বেদে স্তুত হইয়াছেন। ফলতঃ ক্ষুদ্র বৈদিক দেবীদিগের সবিস্তার বর্ণনে কালহরণ করিয়া পাঠকদিগকে আর কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই। আমরা এইখানে বৈদিক দেবতাদিগের ব্যক্তিগত পরিচয় সমাপ্ত করিলাম। কিন্তু আমরা বৈদিক দেবতাতত্ত্ব সমাপ্ত করিলাম না। আমরা এখন বৈদিক দেবতাতত্ত্বের স্থূল মর্ম্ম বুঝিবার চেষ্টা করিব। তার পর বৈদিক ঈশ্বরতত্ত্বে প্রবৃত্ত হইবার চেষ্টা করিব।—'প্রচার', ১ম বর্ষ, পৃ. ২৬৬ ৬৮।

দেবতত্ত্ব

আমরা দেখিয়াছি যে, বেদের ইন্দ্রাদি দেবতারা কেহ বা আকাশ, কেহ বা সূর্য্য, কেহ বা অগ্নি, কেহ বা নদী; এইরূপ অচেতন জড়পদার্থ মাত্র। বেদে এইরূপ অচেতন জড়পদার্থের উপাসনা কেন? এরূপ উপাসনা কোথা হইতে আসিল? ইহার উৎপত্তির কি কোন কারণ আছে? অদ্য এই বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কেবল বৈদিক হিন্দুরাই এই ইন্দ্রাদির উপাসনা করিতেন না। পৃথিবীর অনেক সভ্য এবং অসভ্য জাতি ইঁহাদিগের উপাসনা করিত এবং এখনও করিয়া থাকে। সেই সকল জাতিমধ্যে এই দেবতাদিগের নাম ভিন্ন প্রকার বটে, কিন্তু উপাস্য দেবতা একই। আমরা কেবল প্রাচীন আর্য্যজাতিসম্ভূত যোন, রোমক প্রভৃতি জাতিদিগের কথা বলিতেছি না। হিন্দুরা যে জাতি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারাও সেই জাতি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; সুতরাং একই বংশে একই দেবতার উপাসনা যে প্রচলিত থাকিবে ইহা বিস্ময়কর নহে। বিস্ময়কর এই যে, যে সকল জাতির সঙ্গে আর্য্যবংশীয়দিগের বংশগত, স্থানগত, বা অন্য কোনপ্রকার ঐতিহাসিক সম্বন্ধ নাই, তাহাদিগের মধ্যেও এই ইন্দ্রাদির উপাসনা প্রচলিত। আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া বা পলিনেসিয়ার অভ্যন্তরবাসীদিগের মধ্যেও এই সকল দেবতাদিগের উপাসনা প্রচলিত। আমরা কতকগুলি উদাহরণ দিব। অধিক উদাহরণ সঙ্কলনের জন্য প্রচারের স্থান নাই। উদাহরণ দিবার পূর্ব্বে আমাদিগের দুইটি কথা বলিবার আছে।

প্রথম, হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যায় আমরা পাশ্চাত্ত্য লেখকদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে অতিশয় অনিচ্ছুক। ইংরেজভক্ত পাঠকদিগের তুষ্টির জন্য দুই একবার আপন মতের

পোষকতায় পাশ্চাত্ত্য লেখকের মত উদ্ধৃত করিয়াছি বটে, কিন্তু সে অনিচ্ছাপূর্ব্বক। এবং আপনার মতের সঙ্গে তাহাদিগের মত না মিলিলে সেরূপ সাহায্য গ্রহণ করি নাই। কিন্তু এখানে ইউরোপের সাহায্য ব্যতীত আমাদের চলিবার উপায় নাই, কেন না কোন হিন্দুই আমেরিকা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও পলিনেসিয়ার আদিমবাসীদিগকে দেখিয়া আইসে নাই।

দ্বিতীয়, আমরা প্রধানতঃ অসভ্য জাতিদিগের মধ্য হইতেই অধিকাংশ উদাহরণ গ্রহণ করিব। ইহাতে কেহ মনে না করেন যে, আমরা হিন্দুদিগকে অথবা প্রাচীন বৈদিক হিন্দুদিগকে, অসভ্য জাতি মধ্যে গণ্য করি। ইহা আমরা বলিতে স্বীকৃত আছি যে, বৈদিক হিন্দুরা যে সকল কথা বুঝিয়াছিলেন, ইউরোপে সভ্য জাতিরাও তাহার অনেক কথা এখনও বুঝেন নাই। তবে সাদৃশ্য এই যে, বৈদিক ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের প্রথম অবস্থা, আর আমরা যে সকল অসভ্য জাতিদের কথা বলিব, তাহাদেরও ধর্ম্মের প্রথম অবস্থা।

এক্ষণে আমরা উদাহরণ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হই। প্রথমতঃ ইন্দ্রদেবতাই আমাদের উদাহরণ হউন। প্রমাণ করিয়াছি যে ইন্দ্র বৃষ্টি-দেবতা। শ্বেত-নীল-নদীতীরবাসী দিঙ্ক নামে জাতি ইন্দ্রকে দেন্দিদ নামে উপাসনা করে। তিনি ইন্দ্রের ন্যায় বৃষ্টি-দেবতা এবং ইন্দ্রের ন্যায় স্বর্গবাসী প্রধান দেবতা। 'ডমর' নামে অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে 'ওমাকুরু' নামে দেবতা বৃষ্টি-দেবতাও বটে, সর্ব্বপ্রধান দেবতাও বটে। ইনিই ডমরদিগের ইন্দ্র। আমেরিকার আদিম জাতিদিগের মধ্যে দুইটি সভ্যজাতি ছিল,—মেক্সিকোর আদিবাসী 'অজতেক' এবং 'পিরুর' আদিমবাসী 'ইঙ্কা'দিগের প্রজা। অজতেকেরা ৎলালোকের উপাসনা করিত। তিনি ইন্দ্রের ন্যায় আকাশ-দেবতা এবং ইন্দ্রের ন্যায় বৃষ্টি-দেবতা এবং ইন্দ্রের ন্যায় বজ্রী। পিরুবাসীদিগের মধ্যে ইন্দ্র, দেব নহেন, দেবী। নিকারাগুয়াবাসীদিগের মধ্যে বৃষ্টি-দেবতার পূজা আছে। ভারতবর্ষীয় অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে উড়িষ্যার খন্দেরা পিজ্জুপেন্নু নামে বৃষ্টি-দেবতার পূজা করে। কোলেদের বড় পর্ব্বতকে তাহারা মরংবুরু বলে। তিনিই ইহাদের বৃষ্টি-দেবতা। পূর্ব্বে আমরা স্থানান্তরে বলিয়াছি যে, রোমকদিগের জুপিটার আমাদিগের দৌষ্পিতৃ। কিন্তু দ্যৌঃ ত কেবল আকাশ, রোমকেরা কেবল আকাশের উপাসনায় সন্তুষ্ট নহেন। বৃষ্টিকারী আকাশের উপাসনা চাই। এজন্য তাঁহারা জুপিটার প্লুবিয়স, অর্থাৎ বৃষ্টিকারী আকাশের উপাসনা করিতেন। ইনি রোমকদিগের ইন্দ্র।

অগ্নিকে দ্বিতীয় উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। পৃথিবীতে, বিশেষতঃ আশিয়া প্রদেশে, অগ্নির উপাসনা বড় প্রবলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমেরিকার দিলাবরেরা অগ্নিদেবতাকে আমেরিকার আদিমবাসীদিগের আদি পুরুষ (মনু) বলিয়া বৎসরে বৎসরে উপাসনা করে। অভিডের লিখিত পুস্তকে জানা যায় যে, চিনুক নামে আমেরিকার প্রান্তবাসী আদিমজাতিরা অগ্নির পূজা করিত। সভ্য মেক্সিকোবাসীদিগের মধ্যে অগ্নি একজন প্রধান দেবতা ছিলেন; কিন্তু তাঁহার নামটি এত দুরুচ্চার্য্য যে, আমরা তাহা বাঙ্গলায় লিখিতে পারিলাম না।* পলিনেসিয়াতে মহুইকা নামে এবং আফ্রিকার ডাহোমে

* Xiuhteuctli ; also Huehueteotl.

প্রদেশে জো নামে অগ্নি পূজিত। আশিয়া প্রদেশে কঞ্চড়লেরা শব পূজা করে এবং অগ্নিও পূজা করে। জাপান প্রদেশস্থ য়েসো প্রদেশে অগ্নিই প্রধান দেবতা। তুঙ্গুজ মোগল এবং তুর্ক জাতীয়েরা অগ্নির উপাসনা করিয়া থাকে। টইলর সাহেব মোগলদিগের* একটি বিবাহমন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া ঋগ্বেদের অগ্নি-সূক্ত মনে পড়ে।

ইতিহাসে বিখ্যাত আসিরিয়া, কালদিয়া, ফিনিসিয়া প্রভৃতি দেশের লোকেরা প্রধানতঃ অগ্নির উপাসক ছিল। প্রাচীন পারস্যবাসীরা বিখ্যাত অগ্নির উপাসক এবং তাহাদিগের বংশ, বোম্বাইয়ের পার্সীরা অদ্যাপিও বিখ্যাত অগ্নির উপাসক। ইউরোপের গ্রীকদের মধ্যে Vulcan, Hephaistos, Hestia অগ্নিদেবতা। তৎপরবর্ত্তী ইউরোপীয়দিগের মধ্যে প্রাচীন প্রুসিয়েরা এবং রুষিয়েরা এবং লিথুয়ানীয়েরা অগ্নির পূজা করিত। এখনও ইউরোপে একটু একটু অগ্নিপূজা আছে। উদাহরণস্বরূপ টইলর সাহেবের গ্রন্থ হইতে একটু উদ্ধৃত করিলাম।†

সূর্য্যোপাসনা জগতে অতিশয় বিস্তৃত। সভ্য এবং অসভ্য সকলেই তাঁহার উপাসনা করে। আমেরিকায় অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে হডসন বের উপকূলবাসী আদিমজাতিরা প্রাতঃসূর্য্যের উপাসনা করে। বঙ্কুবর দ্বীপবাসীরা মধ্যাহ্নসূর্য্যের উপাসনা করে। দিলাবরদিগের দ্বাদশ দেবতার মধ্যে সূর্য্য দ্বিতীয় দেবতা। বর্জিনিয়ার আদিমবাসীরা উদয় এবং অস্তকালে সূর্য্যের উপাসনা করিত। পোত্তবিতুমিরা ছাদের উপর উঠিয়া সূর্য্যের ভোগ দিত। আলগোঙ্কুইনদিগের চিত্রলিপি মধ্যে সূর্য্যের চিত্র প্রধান দেবতার স্বরূপ লিখিত হইয়াছে। সিউস জাতিরা সূর্য্যকে জগতের সৃজনকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা স্বরূপ বিবেচনা করে। ক্রীক্ জাতিরা সূর্য্যকে ঈশ্বরের প্রতিমাস্বরূপ বিবেচনা করে। আরৌকানিয়েরা সূর্য্যকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া উপাসনা করে। পুয়েল্চেরা সূর্য্যের নিকট সকল মঙ্গল কামনা করে। টুকুমানবাসীরা সূর্য্যের মন্দির গঠন করিয়া, তন্মধ্যে তাঁহার উপাসনা করে। লুইসিয়ানাবাসী নাচেজ জাতিদিগের মধ্যে সূর্য্যের পুরোহিতরাই রাজা হইত এবং সূর্য্যের মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক রীতিমত প্রত্যহ তাঁহার উপাসনা করিত। ফ্লোরিদার আদিমবাসী অপলশেরা প্রকৃত সৌর ছিল। তাহারা প্রত্যহ প্রাতে ও

* আমরা যাহাদিগকে মোগল বলি তাহারা যথার্থ মোগল নহে। আরব্য বা পারস্য হইতে আসিয়া যাহারা ভারতবর্ষে বাস করিয়াছে, আমরা তাহাদিগকেই মোগল বলি। তাহারা মোগল নহে। মধ্য-আশিয়ায় মোগল নামে একটি ভিন্ন জাতি আছে।

† The Esthonian bride consecrates her new hearth and home by an offering of money cast into the fire, or laid on the oven for Tule-Ema, fire mother. The Carinthian peasant will 'fodder' the fire to make it kindly and throw lard or dripping to it, that it may not burn his house. To the Bohemian it is a godless thing to spit into the fire, God's fire as he calls it. It is not right to throw away the crumbs after a meal, for they belong to the fire. Of every kind of dish some should be given to the fire and if some runs over, it is wrong to scold, for it belongs to the fire. It is because these rights are now so neglected that harmful fires so often break out.". *Primitive Culture*, p. 285.

সন্ধ্যাকালে সূর্য্য উপাসনা করিত এবং বৎসরে চারিবার সূর্য্যের উৎসব করিত। এদেশে দুর্গাপূজায় যেমন ঘটা, মেক্সিকো নিবাসী অজতেকদিগের মধ্যে সূর্য্যপূজার সেইরূপ ঘটা ছিল। তাহাদিগের নির্ম্মিত সূর্য্যের বৃহৎ স্তূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং প্রেস্কটের মনোহর রচনায় এই সূর্য্যের ভীষণ উপাসনা চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ সূর্য্যকেই অজতেকেরা ঈশ্বর বলিয়া মানিত। দক্ষিণ আমেরিকার বোগোটা নিবাসী মুইস্কা জাতিরা সূর্য্যের নিকট নরবলি দিত। পিরুর সূর্য্যোপাসনা অতি বিখ্যাত এবং পিরুবাসীদিগের জীবনের সমস্ত কর্ম্ম এই সূর্য্যোপাসনার দ্বারা শাসিত হইত। পিরুর রাজারা আমাদিগের রামচন্দ্রাদির ন্যায় সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহারা সূর্য্যের প্রতিনিধি বলিয়া রাজ্য করিতেন। পিরুদেশে স্বর্ণ খচিত অসংখ্য সূর্য্যমন্দিরে সূর্য্যের স্বর্ণনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি সকল সর্ব্বলোকের দ্বারা উপাসিত হইত।

ভারতবর্ষীয় অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে বোড়ো ও ধীমাল জাতিরা সূর্য্য উপাসনা করে। বাঙ্গালার প্রান্তবাসী কোল, মুণ্ডা, ওরাঁও এবং সাঁওতাল জাতিরা সিংবোঙ্গা নামে সূর্য্যদেবের উপাসনা করে। উড়িষ্যার খন্দদিগের মধ্যে সূর্য্যদেবের নাম বুড়াপেন্নু। তিনি স্রষ্টা এবং বিধাতা। তদ্ভিন্ন তাতার, মঙ্গল, তুঙ্গুজ, সাইবিরিয়া-বাসীরা এবং লাপ জাতিরা সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকে।

আর্য্যজাতিদিগের মধ্যে প্রাচীন পারসিকদিগের সূর্য্যোপাসনার কথা বলিয়াছি। গ্রীকদিগের মধ্যে সূর্য্যদেবতা হিলিয়স্ বা আপোলন নামে উপাসিত হইতেন। সক্রেটিস্ প্রভৃতিও তাঁহার উপাসনা করিতেন। আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকেই বলেন যে, গ্রীক প্রভৃতি আর্য্যজাতিদিগের দেবোপাখ্যান সকল অধিকাংশই সৌরোপন্যাস—সূর্য্যরূপক। তাঁহারা এ বিষয়ে কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, পাঠকেরা তাহা অবগত থাকিতে পারেন।

প্রাচীন মিশরবাসীদিগের মধ্যে সূর্য্যোপাসনার বড় প্রাধান্য ছিল। বৈদিক হিন্দুদিগের ন্যায় তাঁহারাও সূর্য্যের নানা মূর্ত্তির উপাসনা করিতেন। এক মূর্ত্তি রা আর এক মূর্ত্তি ওসাইরিস, তৃতীয় মূর্ত্তি হার্পক্রোতি।* প্রাচীন সিরীয়, ও আসিরীয় ও টিরীয়দিগের মধ্যে সূর্য্য বালসমেস্, বেল বা বাল নামে উপাসিত হইতেন। সিরিয়া হইতে সূর্য্যোপাসনা রোমকে আনীত হইয়াছিল। এই সূর্য্যদেবের নাম এলোগবল্। তাঁহার পুরোহিত হেলিওগবলস্ রোমকের একজন সম্রাট্ হইয়াছিলেন। পরে রোমক খৃষ্টান হইলেও খৃষ্টোপাসনার সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থানে সূর্য্যোপাসনা চলিয়াছিল এবং এখনও চলিতেছে। যেখানে সূর্য্যোপাসনা লুপ্ত হইয়াছে, সেখানেও খৃষ্টমাস্ প্রভৃতি উৎসবে তাঁহার উপাসনার চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে পক্ষান্তরে, বিড়ুইন আরবেরা মুসলমান হইয়াও অদ্যাপি সূর্য্যের উপাসনা করিয়া থাকে।

চতুর্থ উদাহরণস্বরূপ আমরা বায়ুদেবতাকে গ্রহণ করি। ইন্দ্রাগ্নিসূর্য্যের ন্যায় বায়ুরও উপাসনা বহুদেশে প্রচলিত। আলাগন্‌কুইন জাতিদিগের বায়ুদেবচতুষ্টয়ের উপাখ্যান লংফেলো কৃত *Hiawatha* নামক কাব্যে বর্ণিত আছে। দিলাবরদিগের দ্বাদশ দেবতার মধ্যে উত্তর, পশ্চিম, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, এই চারিটি দেবতা চারি প্রকার বায়ু মাত্র।

* Harpokrates.

ইরকোয়া জাতিদিগের মধ্যে বায়ুর অধিপতি দেবতার নাম গাওঃ। বেদে যেমন বায়ু এবং মরুদ্গণ পৃথক্ পৃথক্ দেবতা, অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও তেমনি কোথাও বায়ু কোথাও মরুদ্গণ পূজিত। পলিনেসীয়দিগের মধ্যে মরুদ্গণের পূজা আছে। তাহাদিগের মধ্যে প্রধান বেরোমতৌতরু এবং তৈরিবু। বন্ধুজন ঝড়ের সময় সমুদ্রে থাকিলে উহারা এই মরুদ্গণের পূজা করে। উহাদিগের বিশ্বাস, ঐ পূজায় প্রার্থনামত ঝড় বন্ধ হয় এবং প্রার্থনামত ঝড় উপস্থিত হয়। অষ্ট্রেলেসিয়ার উপদ্বীপ মধ্যে মৌই প্রধান দেবতা। তিনি কোন কোন স্থানে বায়ু-দেবতা বলিয়া পূজিত হন। টাহিটিতে তিনি পূর্ব্ব বায়ু। নবজিলণ্ডে তিনি বায়ুগণের শাসনকর্ত্তা। ফিন্‌জাতিদিগের প্রধান দেবতা উক্কো ঝড়ের অধিপতি। গ্রীকদিগের মধ্যে বোরিয়স্, জেফিরস্ এবং ইয়লস্ বায়ুদেবতা। হার্পিগণ মরুদ্দেবতা। স্ক্যাণ্ডিনেভীয়দিগের বিখ্যাত ওডিন মরুদ্দেবতা। এই মরুদ্দেবের পূজার চিহ্ন আজও ইউরোপে বর্ত্তমান আছে। কারিন্থিয়ার কৃষকেরা মাংসপূর্ণ কাষ্ঠপাত্র গাছে ঝুলাইয়া দিয়া বায়ুদেবতাকে ভোগ দেয়। জার্ম্মানির অন্তর্গত স্বাবিয়া, টাইরোল এবং উপর-পালাটিনেট প্রদেশে ঝড় হইলে ঝড়কে ঐরূপ মাংস উপহার দিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করে।

বেদে বরুণ প্রধানতঃ আকাশদেবতা, কিন্তু তিনি স্থানে স্থানে জলেশ্বর বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন। পুরাণে তিনি কেবল জলেশ্বর। গ্রীকদিগের মধ্যেও বরুণ এইরূপ দুই ভাগ হইয়াছেন। য়ুরেনস্ (Uranos) আকাশ বরুণ এবং পোসাইডন (Poseidon) বা নেপচুন (Neptune) জলবরুণ। অসভ্য জাতিদের মধ্যেও এই দ্বিবিধ বরুণের উপাসনা আছে। আকাশ বরুণের কথা আমরা পরে বলিব, এক্ষণে জলেশ্বর বরুণেরই কথা বলি। পলিনেসিয়া প্রদেশে তুয়ারাতাই এবং রুয়াহাতু এই দুই জলেশ্বর বরুণ উপাসিত হইয়া থাকেন। আফ্রিকায় বোসমান জাতিদিগের মধ্যে জলেশ্বরের পূজা খুব ধুমধামের সহিত হইয়া থাকে। আফ্রিকার অন্যান্য প্রদেশেও জলেশ্বরের পূজা আছে। দক্ষিণ আমেরিকায় পিরুবাসীরা মামাকোচা নামে সমুদ্রদেবের পূজা করে। পূর্ব্ব আসিয়ায় কামচকট্‌কা প্রদেশে মিংক্ নামে জলেশ্বর উপাসিত হইয়া থাকেন। জাপানে দ্বিবিধ জলেশ্বর আছেন। স্থলমধ্যগত জলেশ্বরের নাম মিধসুনোকামি, এবং জলমধ্যগত জলেশ্বরের নাম জেবিসু।

আগামী সংখ্যায় আমরা আর দুইটি বৈদিক দেবতাকে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিব। পরে যে তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য এই সকল উদাহরণ সংগ্রহ করিতেছি, তাহার অবতারণা করিব।—'প্রচার', ১ম বর্ষ, পৃ. ৩০১-১০।

দ্যাবাপৃথিবী

আকাশের একটি নাম দ্যু বা দ্যৌঃ। নামটি এখনও অর্থাৎ আধুনিক সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয়। এই দ্যু বা দ্যৌ বেদে দেবতা বলিয়া স্তুত হইয়াছেন, ইহা বলিয়াছি। ইনি একজন আকাশদেবতা। ইন্দ্র বৃষ্টিকারী আকাশ, বরুণ আবরণকারী আকাশ,

অদিতি অনন্ত আকাশ। কিন্তু দ্যৌ বা দ্যু আকাশের কোন্ মূর্ত্তি—এ কথাটা বলা হয় নাই।

বেদে যেমন আকাশের স্তোত্র আছে, তেমনি পৃথিবীরও আছে। আকাশ দেব বলিয়া, পৃথিবী দেবী বলিয়া স্তুত হইয়াছেন। একটা কাজের কথা এই যে, এই দ্যু বা দ্যৌ, আর এই পৃথিবী, একত্রে এক সূক্তেই স্তুত হইয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তনাম দ্যাবাপৃথিবী।

আরও কাজের কথা এই যে, কেবল তাঁহারা একত্রে স্তুত হইয়াছেন, এমত নহে, তাঁহারা দম্পতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। আকাশ পুরুষ, পৃথিবী স্ত্রী।

কেবল তাই নহে। এই দম্পতি সমস্ত জীবের পিতা ও মাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দ্যৌ পিতা, পৃথিবী মাতা। আজি আমরা পৃথিবীকে মা বলিয়া থাকি —বাঙ্গালা সাহিত্যেও "মাতর্ব্বসুমতি!" এমন সম্বোধন পাওয়া যায়। কিন্তু আকাশকে পিতা বলিয়া ডাকিতে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। বৈদিক ঋষিরা যেমন পৃথিবীকে মাতা বলিতেন, তেমনি আকাশকে পিতা বলিতেন। "তন্মাতা পৃথিবী তৎপিতা দ্যৌঃ।" (১,৮৩,৪) এই "পিতা দ্যৌঃ" বা "দ্যৌষ্পিতা" অর্থাৎ "দ্যৌষ্পিতৃ" শব্দ গ্রীকদিগের "Zeus Pater" এবং রোমকদিগের "Ju-piter" ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

হিন্দু দর্শনশাস্ত্রে বলে, আকাশ পঞ্চভূতের একটি। কিন্তু ইহাই আদিম। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল, জল হইতে ক্ষিতি। ঋগ্বেদসংহিতায় দর্শনশাস্ত্র নাই—অতএব ঋগ্বেদসংহিতায় এ সকল কথা নাই। কিন্তু তাহাতে আছে যে, আকাশ হইতে সর্ব্বভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। যথা, "দ্যাবাপৃথিবী জনিত্রী।" বা "দ্যৌষ্পিতা পৃথিবী মাতরধ্রুগগ্নে ভ্রাতর্ব্বসবো" ইত্যাদি।

তবেই, যেমন ইন্দ্র আকাশের বর্ষকমূর্ত্তি, বরুণ আবরকমূর্ত্তি, অদিতি অনন্তমূর্ত্তি, দ্যু বা দ্যৌ তেমনি জনকমূর্ত্তি। মনুও বলিয়াছেন, "মাতা পৃথিব্যাঃ মূর্ত্তিঃ।"

এখন আধুনিক বিজ্ঞানে এমন কথা বলে না যে, আকাশ এই বিশ্বব্যাপী জীবপুঞ্জের জনক। এরূপ কথার কোন "প্রমাণ" নাই। কিন্তু বিজ্ঞান লইয়া প্রাচীন ধর্ম্ম সকল গঠিত হয় নাই। যখন বিজ্ঞান হয় নাই, তখন বিজ্ঞান কিছুরই গঠনে লাগিতে পারে না। তবে এই জনকপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার আকাশের কি কোন দাবি দাওয়া ছিল না, তাহা আমাদের বলিবার প্রয়োজন করে না, কেবল ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, পৃথিবী জুড়িয়া এই দাবি স্বীকার করিয়াছিল। সকল আদিম ধর্ম্মে আকাশ জনক। অনেক ধর্ম্মে আকাশের নামে ঈশ্বরের নাম।

বেদে দ্যৌঃ স্বামী, পৃথিবী স্ত্রী। প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যেও আকাশ স্বামী, পৃথিবী স্ত্রী। আমরা বলিয়াছি যে, এই "দ্যৌঃ" শব্দই "Zeus," কিন্তু Zeus গ্রীক-পুরাণে পৃথিবীর স্বামী নহে। গ্রীকপুরাণে Ouranos দেবের পত্নী Gaia দেবী। Gaia সংস্কৃত "গো"। গো শব্দে পৃথিবী সকলেই জানে। কিন্তু ইহার পতি Zeus নহেন, Ouranos পতি। Ouranos দ্যৌঃ নহেন—Ouranos বরুণ। বরুণও আকাশ। অতএব গ্রীকপুরাণেও আকাশ পৃথিবীর স্বামী। এবং ইহারাই সেই পুরাণমতে সর্ব্বজীবের জনক-জননী। আমাদের পাঠকেরা, দুই এক জন ছাড়া, বোধ

হয় লাটিন ও গ্রীক বুঝেন না—এবং আমরাও দুর্ভাগ্যক্রমে এই অপরাধে অপরাধী। সুতরাং এ কথার পোষকতায় বচন উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।*

উত্তর আমেরিকার হুরণ, ইরিকোওয়া প্রভৃতি জাতির মধ্যে, আফ্রিকার জুলুজাতি, বম্নিজাতি প্রভৃতি জাতির মধ্যে এই আকাশ-দেবতা পূজিত। উত্তর আশিয়ার সামোয়েদ জাতির মধ্যে, ফিন্ জাতিদিগের মধ্যে এবং চীনজাতিদিগের মধ্যে আকাশ জনক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত। অনেক স্থানে আকাশবাচক শব্দই ঈশ্বরবাচক শব্দ।

ঐরূপ আর্য্যজাতীয়দিগের মধ্যে, নানা অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে এবং চৈনিক জাতিদিগের মধ্যে আকাশ পিতা, পৃথিবী মাতা, পৃথিবী আকাশের পত্নী; পৃথিবী ও আকাশের সংযোগে বা বিবাহে জীবসৃষ্টি।

চৈনিক দার্শনিকেরা ইহার উপর একটু বাড়াইলেন। আকাশ পিতা, পৃথিবী মাতা; ইহা হইতে তাঁহারা করিলেন যে, সৃষ্টিতে দুইটি শক্তি আছে—একটি পুরুষ, একটা স্ত্রী, একটি স্বর্গীয়, একটি পার্থিব। একটির নাম ইন্, আর একটির নাম ইয়ঙ্।

ইহাতে পাঠকের, ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি পুরুষ মনে পড়িবে। ভারতবর্ষীয়েরা যে চৈনিকদিগের নিকট হইতে এ কথা পাইয়াছিলেন, অথবা চৈনিকেরা যে ভারতবর্ষীয়-দিগের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, এমন কথা বলিবার কোন কারণ পাওয়া যায় না। বোধ হয়, দুই জাতির মধ্যে এক কারণেই এই প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব উদ্ভূত হইয়াছিল। উভয় দেশেই আকাশ পিতা, পৃথিবী মাতা, এবং উভয়ের সংযোগে বিশ্বজনন, এই বিশ্বাস ছিল, তাহা হইতেই প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব উদ্ভূত হইয়া থাকিবে। সাংখ্যের পুরুষ আকাশ নহে, এবং প্রকৃতি পৃথিবী নহে, তাহা আমরা জানি। বোধ হয় এই দ্যাবাপৃথিবীতত্ত্ব, উপনিষদের আত্মতত্ত্ব ও মায়াবাদে মিলিত হইয়া প্রকৃতি পুরুষে পরিণত হইয়া থাকিবে। সেই প্রকৃতি-পুরুষতত্ত্ব হইতে তান্ত্রিক উপাসনার উৎপত্তি কি না, এবং ভৈরব ও ভৈরবীর মূলে এই দ্যাবাপৃথিবী কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। এক্ষণে আমরা তাহার বিচারে প্রবৃত্ত নহি।

আমরা এত দিনে যে দুইটি স্থূল কথা বুঝাইলাম, তাহা পাঠককে এইখানে স্মরণ করাইয়া দিই।

প্রথম। ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতা বিশ্বের নানা বিকাশ মাত্র, যথা—আকাশ, সূর্য্য, অগ্নি বা বায়ু।

দ্বিতীয়। এইরূপ ইন্দ্রাদির উপাসনা কেবল ভারতবর্ষে নহে, অনেক স্থানে আছে। এক্ষণে আমরা বিচার করিব,

প্রথম। কেন এরূপ ঘটিয়াছে।

দ্বিতীয়। এখানে উপাসনা বস্তুটা কি।

'প্রচার', ১ম বর্ষ, পৃ. ৩৬৩ ৬৭

---

* এই তত্ত্বে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, যখন আকাশ ও পৃথিবীর পরিণয় কল্পিত হইয়াছিল, তখন দ্যৌঃ শব্দ জিয়স্ শব্দে পরিণত হয় নাই। তখন আর্য্যবংশীয়েরা পৃথক্ পৃথক্ দেশে যাত্রা করে নাই। অনেক কালের প্রাচীন কথা।

চৈতন্যবাদ

পৃথিবীতে ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল ?

অনেকেই মনে করেন, এ কথার উত্তর অতি সহজ। খ্রীষ্টীয়ান বলিবেন, মুসা ও যীশু ধর্ম্ম আনিয়াছেন। মুসলমান বলিবেন, মহম্মদ আনিয়াছেন, বৌদ্ধ বলিবেন, তথাগত আনিয়াছেন, ইত্যাদি। কিন্তু তাহা ছাড়া আরও ধর্ম্ম আছে। প্রাচীন গ্রীক প্রভৃতি জাতির ধর্ম্মের মুসা মহম্মদ কেহ নাই। পৃথিবীতে কত জাতীয় মনুষ্য আছে, তাহার সংখ্যা নাই বলিলেও হয়। সকলেরই এক একটা ধর্ম্ম আছে, এমন কোন জাতি আজি পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহাদের কোন প্রকার ধর্ম্মজ্ঞান নাই। এই অসংখ্য জাতিদিগের ধর্ম্মে প্রায় মহম্মদ মুসা খ্রীষ্ট বৌদ্ধের তুল্য কেহ ধর্ম্মস্রষ্টা নাই। তাহাদের ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল ?

আর যাঁহারা বলেন যে, খ্রীষ্ট বা বুদ্ধ, মুসা বা মহম্মদ ধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের কথায় একটা ভুল আছে। ইঁহারা কেহই ধর্ম্মের সৃষ্টি করেন নাই, কোন প্রচলিত ধর্ম্মের উন্নতি করিয়াছেন মাত্র। খ্রীষ্টের পূর্ব্বে য়িহুদায় য়িহুদী ধর্ম্ম ছিল, খ্রীষ্টধর্ম্ম তাহারই উপর গঠিত হইয়াছে ; মহম্মদের পূর্ব্বে আরবে ধর্ম্ম ছিল, ইস্লাম তাহার উপর ও য়িহুদী ধর্ম্মের উপর গঠিত হইয়াছে ; শাক্যসিংহের আগে বৈদিক ধর্ম্ম ছিল, বৌদ্ধ ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের সংস্করণ মাত্র। মুসার ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বেও এক য়িহুদী ধর্ম্ম ছিল ; মুসা তাহার উন্নতি করিয়াছিলেন। সেই সকল আদিম ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল ? তাহার প্রণেতা কাহাকেও দেখা যায় না। অর্থাৎ কদাচিৎ ধর্ম্মের সংস্কারক দেখা যায়, কোথাও ধর্ম্মের স্রষ্টা দেখা যায় না। সৃষ্ট ধর্ম্ম নাই ; সকল ধর্ম্মই পরম্পরাগত, কদাচিৎ বা সংস্কৃত।

বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে এমনই একটা প্রশ্ন আছে—পৃথিবীতে জীব কোথা হইতে আসিল ? যদি বলা যায়, ঈশ্বরেচ্ছায় বা ঈশ্বরের সৃষ্টিক্রমে পৃথ্বীতলে জীবসঞ্চার হইয়াছে, তাহা হইলে বিজ্ঞান বিনষ্ট হইল। কেন না, সকলই ঈশ্বরেচ্ছায় ঘটিয়াছে ; সকল বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের এই উত্তর দিয়া অনুসন্ধান সমাপন করা যাইতে পারে। অতএব কি জীবোৎপত্তি কি ধর্ম্মোৎপত্তি সম্বন্ধে এ উত্তর দিলে চলিবে না।

কেন না ধর্ম্মোৎপত্তিও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব। ইহারও অনুসন্ধান বৈজ্ঞানিক প্রথায় করিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক প্রথা এই যে, বিশেষের লক্ষণ দেখিয়া সাধারণ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে হয়।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকেই এই প্রণালী অনুসারে ধর্ম্মের উৎপত্তির অনুসন্ধান করিয়াছেন। কিন্তু নানা মুনির নানা মত। কাহারও মত এমন প্রশস্ত বলিয়া বোধ হয় না যে, পাঠককে তাহা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে পারি। আমি নিজে যাহা কিছু বুঝি পাঠকদিগকে অতি সংক্ষেপে তাহার মর্ম্মার্থ বুঝাইতেছি।

ধর্ম্মের উৎপত্তি বুঝিতে গেলে সভ্য জাতির ধর্ম্মের মধ্যে অনুসন্ধান করিলে কিছু পাইব না। কেন না, সভ্য জাতির ধর্ম্ম পুরাতন হইয়াছে, সে সকলের প্রথম অবস্থা আর নাই, প্রথমাবস্থা নহিলে আর কোথাও উৎপত্তি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। গাছ কোথা হইতে হইল, অঙ্কুর দেখিলে বুঝা যায় ; প্রকাণ্ড বৃক্ষ দেখিয়া বুঝা যায় না। অতএব অসভ্য জাতিদিগের ধর্ম্মের সমালোচনা করিয়া ধর্ম্মের উৎপত্তি বুঝাই ভাল।

এখন, মনুষ্য যতই অসভ্য হৌক না কেন, একটা কথা তাহারা সহজে বুঝিতে পারে। বুঝিতে পারে যে, শরীর হইতে চৈতন্য একটা পৃথক্ সামগ্রী।

এই একজন মানুষ চলিতেছে, খাইতেছে, কথা কহিতেছে, কাজ করিতেছে। সে মরিয়া গেল, আর সে কিছুই করে না। তাহার শরীর যেমন ছিল, তেমনই আছে, হস্তপদাদি কিছুরই অভাব নাই, কিন্তু সে আর কিছুই করিতে পারে না। একটা কিছু তার আর নাই, তাই আর পারে না। তাই অসভ্য মনুষ্য বুঝিতে পারে যে, শরীর ছাড়া জীবে আর একটা কি আছে, সেইটার বলে জীবত্ব, শরীরের বলে জীবত্ব নহে।

সভ্য হইলে মনুষ্য ইহার নাম দেয়, "জীবন" বা "প্রাণ" বা আর কিছু। অসভ্য মনুষ্য নাম দিতে পারুক না পারুক, জিনিষটা বুঝিয়া লয়। বুঝিলে দেখিতে পারে যে, এটা কেবল জীবেরই আছে, এমত নহে, গাছ পালারও আছে। গাছ পালাতেও এমন একটা কি আছে যে, সেটা যত দিন থাকে, তত দিন গাছে ফুল ধরে, পাতা গজায়, ফল ধরে, সেটার অভাব হইলেই আর ফুল হয় না, পাতা হয় না, ফল হয় না, গাছ শুকাইয়া যায়, মরিয়া যায়। অতএব গাছ পালারও জীবন আছে। কিন্তু গাছ পালার সঙ্গে জীবের একটা প্রভেদ এই যে, গাছ পালা নড়িয়া বেড়ায় না, খায় না, গলায় শব্দ করে না, মারপিট লড়াই বা ইচ্ছাজনিত কোন ক্রিয়া করে না।

অতএব অসভ্য মনুষ্য জ্ঞানের সোপানে আর এক পদ উঠিল। দেখিল, জীবন ছাড়া জীবে আর একটা কিছু আছে, যাহা গাছ পালায় নাই। সভ্য হইলে তাহার নাম দেয়, "চৈতন্য"। অসভ্য নাম দিতে পারুক না পারুক, জিনিষটা বুঝিয়া লয়।

আদিম মনুষ্য দেখে যে, মানুষ মরিলে, তাহার শরীর থাকে—অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণ থাকে, কিন্তু চৈতন্য থাকে না। মানুষ নিদ্রা যায়, তখন শরীর থাকে, কিন্তু চৈতন্য থাকে না। মূর্চ্ছাদি রোগে শরীর থাকে, কিন্তু চৈতন্য থাকে না। তখন সে সিদ্ধান্ত করে যে, চৈতন্য শরীর ছাড়া একটা স্বতন্ত্র বস্তু।

এখন অসভ্য হইলেও, মনুষ্যের মনে এমন কথাটা উদয় হওয়ার সম্ভাবনা যে, এই শরীর হইতে চৈতন্য যদি পৃথক্ বস্তু হইল, তবে শরীর না থাকিলে এই চৈতন্য থাকিতে পারে কি না? থাকে কি না?

মনে করিতে পারে, মনে করে, থাকে বৈ কি? স্বপ্নে দেখি; স্বপ্নে শরীর এক স্থানে রহিল, কিন্তু চৈতন্য গিয়া আর এক স্থানে দেখিতেছে, বেড়াইতেছে, সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে, নানা কাজ করিতেছে। ভূত আছে, এ কথা স্বীকার করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই, কিন্তু সভ্য কি অসভ্য মনুষ্য কখন কখন ভূত দেখিয়া থাকে, এ কথা স্বীকার করিবার বোধ হয় কাহারও আপত্তি নাই। মস্তিষ্কের রোগে, কিম্বা ভ্রমবশতঃ মনুষ্যে ভূত দেখে, ইহা বলা যাউক। যে কারণে হউক মনুষ্য ভূত দেখে। মরা মানুষের ভূত দেখিলে অসভ্য মানুষের মনে এমন হইতে পারে যে, শরীর গেলেও চৈতন্য থাকে। এই বিশ্বাসই পরলোকে বিশ্বাস, এবং এইখানেই ধর্ম্মের প্রথম সূত্রপাত।

ইহা বলিয়াছি যে অসভ্য মনুষ্য বা আদিম মানুষ, যাহাকে ক্রিয়াবান্, আপনার ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্, দেখে, তাহারই চৈতন্য আছে বিশ্বাস করে। জীব, আপন ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্, এজন্য জীবের চৈতন্য আছে, নির্জ্জীব ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্ নহে,

এজন্য নির্জ্জীব চেতন নহে। কিন্তু আদিম মনুষ্য সকল সময়ে বুঝিতে পারে না, কোন্‌টা চৈতন্যযুক্ত, কোন্‌টা চৈতন্যযুক্ত নহে। পাহাড়, পর্ব্বত, জড়পদার্থ সচরাচর ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্ নহে, সচরাচর ইহাদের অচেতন বলিয়া বুঝিতে পারে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক একটা পাহাড় অগ্নি উদ্গীরণ করিয়া অতি ভয়াবহ ব্যাপার সম্পাদন করে। সেটাকে ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্ বলিয়াই বোধ হয়; আদিম মনুষ্যের সেটাকে সচৈতন্য বলিয়া বোধ হয়। কলনাদিনী নদী, রাত্রি দিন ছুটিতেছে, শব্দ করিতেছে, বাড়িতেছে, কমিতেছে, কখন ফাঁপিয়া উঠিয়া দুই কূল ভাসাইয়া দিয়া সর্ব্বনাশ করিতেছে, কখন পরিমিত জলসেচ করিয়া শস্য উৎপাদন করিতেছে, ইহাকেও ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবতী বলিয়া বোধ হয়। সূর্য্যের কথা বড় আশ্চর্য্য। জগতের যাহাই হোক না কেন, ইনি ঠিক সেই নিয়মিত সময়ে পূর্ব্বদিকে হাজির। আবার ঠিক আপনার নির্দ্দিষ্ট পথে সমস্ত দিন ফিরিয়া, ঠিক নিয়মিত সময়ে পশ্চিমে লুক্কায়িত। ইহাকেও স্বেচ্ছাক্রিয় বলিয়া বোধ হয়, ইহাও সচৈতন্য বোধ হয়। চন্দ্র, ও তারা সম্বন্ধেও এইরূপ হইতে পারে। কোথা হইতে আকাশে মেঘ আসে? মেঘ আসিয়া কেন বৃষ্টি করে? বৃষ্টি করিয়া কোথায় চলিয়া যায়? মেঘ আসিলেই বা সকল সময়ে বৃষ্টি হয় না কেন? যে সময় বৃষ্টির প্রয়োজন, যে সময়ে বৃষ্টি হইলে শস্য হইবে, সচরাচর ঠিক সেই সময়ে বৃষ্টি হয় কেন? সচরাচর তাহা হয়, কিন্তু এক এক সময়ে তাই বা হয় না কেন? কখন কখন অনাবৃষ্টিতে দেশ জ্বলিয়া যায় কেন? এ সব আকাশের ইচ্ছা, মেঘের ইচ্ছা, বা বৃষ্টির ইচ্ছা, এজন্য আকাশ সচেতন, মেঘ সচেতন, বা বৃষ্টি সচেতন বলিয়া বোধ হয়। ঝড়, বা বায়ু সম্বন্ধেও ঐরূপ। বজ্র বা বিদ্যুৎ সম্বন্ধেও ঐরূপ ঘটে। অগ্নি সম্বন্ধেও যে ঐরূপ ঘটিবে, তাহা অগ্নির ক্রিয়া সকলের সমালোচনা করিলে সহজে বুঝা যাইতে পারে। অগাধ, দুস্তর, তরঙ্গ-সঙ্কুল, জলচরে সংক্ষুব্ধ রত্নাকর সমুদ্র সম্বন্ধেও সেই কথা হইতে পারে। ইত্যাদি।

এইরূপে জড়ে চৈতন্য আরোপ, ধর্ম্মের দ্বিতীয় সোপান। ইহাকে ধর্ম্ম না বলিয়া, উপধর্ম্ম বলিতে কেহ ইচ্ছা করেন, আপত্তি নাই। ইহা স্মরণ রাখিলে যথেষ্ট হইবে যে, উপধর্ম্মই সত্য ধর্ম্মের প্রাথমিক অবস্থা। বিজ্ঞানের প্রথমাবস্থা যেমন ভ্রমজ্ঞান, ইতিহাসের প্রথমাবস্থা যেমন লৌকিক উপন্যাস বা উপকথা, ধর্ম্মের প্রথমাবস্থা তেমনি উপধর্ম্ম। মতান্তর আছে, তাহা আমরা জানি, কিন্তু মনুষ্যের আদিম অবস্থায় বিজ্ঞান নিকৃষ্ট, ইতিহাস নিকৃষ্ট, দর্শন, কাব্য সাহিত্যশিল্প, সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা বুদ্ধি, সবই নিকৃষ্ট, কেবল তত্ত্বজ্ঞান উৎকৃষ্ট হইবে ইহা সম্ভব নহে।

তার পর ধর্ম্মের তৃতীয় সোপান। যে সকল জড়পদার্থে মনুষ্য চৈতন্যারোপ করিতে আরম্ভ করে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি অতিশয় ক্ষমতাশালী, তেজস্বী, বা সুন্দর। সেই আগ্নেয়গিরি একেবারে দেশ উৎসন্ন দিতে পারে, তাহার ক্রিয়া দেখিয়া মনুষ্যবুদ্ধি স্তম্ভিত, লুপ্তপ্রায় হইয়া যায়। সেই কূলপরিপ্লাবিনী, ভূমির উৎপাদিকা শক্তির সঞ্চারিণী নদী, মঙ্গলে অতিশয় প্রশংসনীয়া, অমঙ্গলে অতি ভয়ঙ্করী বলিয়া বোধ হয়। ঝড়, বৃষ্টি, বায়ু বজ্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি, ইহাদের অপেক্ষা আর বলবান্ কে? ইহাদের অপেক্ষা ভীমকর্ম্মা কে? যদি ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ থাকে, তবে সূর্য্য; ইঁহার প্রচণ্ড তেজ, আশ্চর্য্য গতি, ফলোৎপাদন জীবোৎপাদন শক্তি, আলোক, সকলই

বিস্ময়কর। ইঁহাকে জগতের রক্ষক বলিয়া বোধ হয়, ইনি যতক্ষণ অনুদিত থাকেন, ততক্ষণ জগতের ক্রিয়াকলাপ প্রায় বন্ধ হইয়া থাকে।

এই সকল শক্তিশালী মহামহিমাময় জড় পদার্থ, যদি সচেতন, স্বেচ্ছাচারী বলিয়া বোধ হইল, তবে মানুষের মন ভয়ে বা প্রীতিতে অভিভূত হয়। ইহাদের কেবল শক্তি এত বেশী তাই নহে, মনুষ্যের মঙ্গলামঙ্গল ইহাদিগের অধীন। সচরাচর দেখা যায় যে, যে চৈতন্যযুক্ত, সে তুষ্ট হইলে ভাল করে, রুষ্ট হইলে অনিষ্ট করে। এই সকল মহাশক্তিযুক্ত মঙ্গলামঙ্গল-সম্পাদক পদার্থ যদি চৈতন্যবিশিষ্ট হয়, তবে তাহারাও সেই নিয়মের বশীভূত, ইহা আদিম মনুষ্য মনে করে। মনে করে, তাহাদের তুষ্ট রাখিতে পারিলে সর্ব্বত্র মঙ্গল, তাহারা রুষ্ট হইলে সর্ব্বনাশ হইবে। ইহাতে উপাসনার উৎপত্তি। ইহাই ধর্ম্মের তৃতীয় সোপান। এই জন্য সর্ব্বদেশে সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ঝড়, বৃষ্টি, অগ্নি, জলধি, আকাশাদির উপাসনা। এই জন্য বেদের ইন্দ্রাদি আকাশ দেবতা, সূর্য্য দেবতা, বায়ু দেবতা, অগ্নি দেবতা প্রভৃতির উপাসনা।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটা কথা আছে। উপাসনা দ্বিবিধ। যাহার শক্তিতে ভীত হই, বা যাহার শক্তি হইতে সুফল পাইবার আশা করি, তাহার উপাসনা করি। কিন্তু তা ছাড়া আরও এমন সামগ্রী আছে, যাহার উপাসনা করি, সেবা করি, আদর করি। যাহার ভয়দায়িকা শক্তি নাই, অথচ হিতকর তাহারও আদর করি। অচেতন ওষধি বা ঔষধের আমরা এরূপ আদর করি। ছায়াকারক বট বা স্বাস্থ্যদায়ক শেফালিকা বা তুলসীর তলায় জল সিঞ্চন করি। উপকারী অশ্বের ভৃত্যবৎ সেবা করি। গৃহরক্ষক কুক্কুরকে যত্ন করি। দুগ্ধদায়িনী গাভী, এবং কর্ষণকারী বলদকে আরও আদর করি। ধার্ম্মিক মনুষ্যকে ভক্তি করি। এ এক জাতীয় উপাসনা। এই উপাসনার বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দু ছুতার কুড়ালি পূজা করে, কামার হাতুড়ি পূজা করে, বেশ্যা বাদ্যযন্ত্র পূজা করে, লেখক লেখনী পূজা করে, ব্রাহ্মণ পুঁথি পূজা করে।*

আরও আছে। যাহা সুন্দর, তাহা আমরা বড় ভালবাসি। সুন্দর হইতে আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, কোন উপকার পাই না, তবু আমরা সুন্দরের আদর করি। যে ছেলে চন্দ্র হইতে কি উপকার বা অপকার পাওয়া যায়, তাহার কিছুই জানে না, সেও চাঁদ ভালবাসে। যে ছবির পুতুল, আমাদিগের ভাল মন্দ কিছুই করিতে পারে না, তাহাকেও আদর করি। সুন্দর ফুলটি, সুন্দর পাখিটি, সুন্দর মেয়েটিকে বড় আদর করি। চন্দ্র কেবল সৌন্দর্য্য গুণেই দেবতা, সাতাইশ নক্ষত্র তাঁহার মহিষী।

প্রকৃত পক্ষে ইহা উপাসনা নহে, কেবল আদর। কিন্তু অনেক সময় ইহা উপাসনা বলিয়া গণিত হয়। বৈদিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাই অনেক সময়ে হইয়াছে। কথাটা উনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় অনুবাদ করা যাউক, তাহা হইলেই অনেকেই বুঝিতে পারিবেন।

যাহা শক্তিশালী, তাহা নৈসর্গিক পদার্থের কোন বিশেষ সম্বন্ধ বিশিষ্ট বলিয়াই শক্তিশালী। কার্ব্বনের প্রতি অম্লজানের নৈসর্গিক অনুরাগই অগ্নির শক্তির কারণ।

* এই কথা শুনিয়া সর আলফ্রেড লায়েল লিখিলেন, কি ভয়ানক উপধর্ম্ম। এমন নিকৃষ্ট জাতির কি গতি হইবে। কাজেই বুদ্ধির জোরে লেফটেনেন্ট গবর্ণর হইলেন।

তাপ, জল, ও বায়ু এই তিন পদার্থের পরস্পরে বিশেষ কোন সম্বন্ধ বিশিষ্ট হওয়াতেই মেঘের শক্তি।

এই যে জাগতিক পদার্থের পরস্পরের সম্বন্ধের কথা বলিলাম, এই সম্বন্ধের বৈজ্ঞানিক নাম সত্য। সত্যই শক্তি। কেবল জড়শক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। যীশু বা শাক্যসিংহের উক্তি সকল বা কর্ম্ম সকল সমাজের সহিত নৈসর্গিক শক্তিবিশিষ্ট, অর্দ্ধেক জগৎ আজিও তাঁহাদের বশীভূত।

যাহা হিতকর, শক্তিশালী হউক বা না হউক, কেবল হিতকর, উনবিংশ শতাব্দী তাহার নাম দিয়াছে, শিব। সুন্দর বা সৌম্যের নূতন নাম কিছু হয় নাই, সুন্দর সুন্দরই আছে, সৌম্য সৌম্যই আছে।

এই সত্য (The True), শিব (The Good) এবং সুন্দর (The Beautiful) এই ত্রিবিধ ভাব মানুষের উপাস্য। এই উপাসনা দ্বিবিধ হইতে পারে। উপাসনার সময়ে অচেতন উপাস্যকে সচেতন মনে করিয়া উপাসনা করা যাইতে পারে, আদিম মনুষ্য তাহাই করিয়া থাকে। এই উপাসনা-পদ্ধতি ভ্রান্ত, কাজেই অহিতকর। দ্বিতীয়বিধ উপাসনায়, অচেতনকে অচেতন বলিয়া জ্ঞান থাকে। গেটে (Goethe) বা বর্ডস্বর্থ (Wordsworth) এই জাতীয় জড়োপাসক। ইহা অহিতকর নহে, বরং হিতকর, কেন না, ইহার দ্বারা কতকগুলি চিত্তবৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি সাধিত হয়। ইহা অনুশীলন বিশেষ। এখনকার দেশী পণ্ডিতেরা (বিশেষ বালকেরা) তাহা বুঝিতে পারিয়া উঠে না, কিন্তু কতকগুলি বৈদিক ঋষি তাহা বুঝিতেন। বেদে দ্বিবিধ উপাসনাই আছে।

'প্রচারে'র প্রথম সংখ্যা হইতে বৈদিক দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা কি কি কথা বলিলাম তাহা একবার স্মরণ করিয়া দেখা যাউক।

১। ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতা, আকাশ, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি জড়ের বিকাশ ভিন্ন লোকাতীত চৈতন্য নহেন।

২। এই সকল দেবতাদিগের উপাসনা যেমন বেদে আছে, এবং ভারতবর্ষীয়েরা যেমন ইঁহাদিগের দেবতা বলিয়া মানিয়া থাকে, সেইরূপ পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগণ করিত বা করে।

৩। ইহার কারণ এই যে, প্রথমাবস্থায় মনুষ্য জড়ে চৈতন্য আরোপণ করিয়া, তাহার শক্তি, হিতকারিতা, বা সৌন্দর্য্য অনুসারে, তাহার উপাসনা করে।

৪। সেই উপাসনা ইষ্টকারী এবং অনিষ্টকারী উভয়বিধ হইতে পারে। এখন দেখিতে হইবে, বেদে কিরূপ উপাসনা আছে। তাহা হইলেই আমরা বৈদিক দেবতাতত্ত্ব সমাপ্ত করি।—'প্রচার', ১ম বর্ষ, পৃঃ ৩৭৪-৮৩।

উপাসনা

পূর্ব্বে উপাসনা সম্বন্ধে যাহা বলা গিয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, উপাসনা দ্বিবিধ। এক, যাহাদের ফলপ্রদ বিবেচনা করা যায়, তাহাদের কাছে ফলকামনাপূর্ব্বক তাহাদের উপাসনা, আর, এক যাহাকে ভালবাসি, বা যাহার নিকট কৃতজ্ঞ হই, তাহার প্রশংসা বা আদর। প্রথমোক্ত উপাসনা সকাম, দ্বিতীয় নিষ্কাম। এইরূপ সামান্য

নিষ্কাম উপাসনা কেবল ঈশ্বর সম্বন্ধে হইতে পারে এমন নহে, সামান্য জড়পদার্থ সম্বন্ধে হইতে পারে। ভিন্নজাতীয় মহাত্মাদিগের বিশ্বাস যে, হিন্দু গোরুর উপাসনা করে। বস্তুতঃ এমন হিন্দু কেহই নাই যে, বিশ্বাস করে যে, আমি আমার গাইটির স্তবস্তুতি বা পূজা করিলে সে আমাকে কোন ফল দিবে। গোরু ঘাস খায়, আর দুধ দেয়, তাহা ছাড়া আর কিছু পারে না, তাহা সকলেই জানে। তবে সাধারণ হিন্দুর এই বিশ্বাস যে গোরুকে যত্ন করিলে, আদর করিলে, দেবতা প্রসন্ন হয়েন। এ কথাটা তত অসঙ্গত নহে। যাহা উপকারী, তাহা আদরের। যাহা আদরের, তাহার আদর অনুষ্ঠেয় কার্য্য, ঈশ্বরানুমোদিত। এইরূপ গোরুর আদরের একটা উদাহরণ বেদ হইতেই উদ্ধৃত করিতেছি।

শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতায় দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞে বৎসাপাকরণ কার্য্যের মন্ত্রে আছে,

"হে বৎসগণ, তোমরা ক্রীড়াপরবশ, সুতরাং বায়ুবেগে দিগ্‌দিগন্তরে ধাবমান হও। বায়ু-দেবতাই তোমাদিগের রক্ষক। ৩॥

হে গাভীগণ, আমরা শ্রেষ্ঠতম কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। তৎসাধনার্থ সবিতা-দেবতা তোমাদিগকে প্রভূত তৃণ বন প্রাপ্ত করান। ৪॥

হে (স্বল্প বা বহুতর) রোগশূন্য অচিরপ্রসূতা অবধ্য গাভীগণ! তোমরা অক্ষুব্ধ চিত্তে নিঃশঙ্ক ভাবে গোষ্ঠে প্রচুর তৃণ শস্য ভোজন করতঃ ইন্দ্র দেবতার ভোগের উপযোগী দুগ্ধের পরিবর্দ্ধন কর। তোমাদিগকে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর বা চৌর প্রভৃতি পাপিগণ কেহই আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবে না। তোমরা এই যজমানের গৃহে চিরদিন বহুপরিবার হইতে থাক। ৫॥"*

ঐ যজ্ঞের দুগ্ধকে সম্বোধন করিয়া ঋত্বিক্ বলেন,

"হে দুগ্ধ, যজ্ঞীয় সুপবিত্র শতধার এই পবিত্রে তুমি শোধিত হও। সবিতা-দেবতা তোমাকে পবিত্র করুন।"

উখা অর্থাৎ হাঁড়িকে সম্বোধন করিয়া বলিতে হয়, "হে উখে! তুমি মৃন্ময়, সুতরাং পৃথিবীরূপিণী ত বটেই। অধিকন্তু তোমার সাহায্যে যজমানগণের দ্যুলোক প্রাপ্তি হয়। অতএব দ্যুরূপাও তোমাকে বলিতে পারি। ২॥

"হে উখে, তোমার উদরে অবকাশ আছে। সুতরাং বায়ুর স্থান অন্তরীক্ষলোকও তোমার অধীন। অতএব তোমাকে অন্তরীক্ষলোকও বলিতে পারি। এতাবতা তুমি ত্রিলোকস্বরূপ। সমস্ত দুগ্ধ ধারণেই সক্ষম হইতেছ। স্বীয় উৎকৃষ্ট তেজে দৃঢ় থাকিবে। বক্র হইবে না। সাবধান! তোমার দার্ঢ্যের ন্যূনতা বা বক্রতা হইলেই যজ্ঞবিঘ্ন উপস্থিত হইবে। সুতরাং যজমান আমাদিগের প্রতি বক্র হইতে পারেন, অতএব তিনি যাহাতে বক্র না হন। ৩॥"

এখানে সকলেই দেখিতে পাইতেছেন, যাহার উপাসনা হইতেছে, উপাসক তাহাকে অচেতন জড়পদার্থ বলিয়াই জানেন। হাঁড়ি কি দুধকে কেহই ইষ্টানিষ্টফলপ্রদানে সক্ষম চৈতন্যবিশিষ্ট বস্তু বলিয়া মনে করিতে পারে না। অথচ তাহার উপাসনা

* এই প্রবন্ধে যজুর্ম্মন্ত্রের যে যে অনুবাদ উদ্ধৃত হইল, তাহা শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমীকৃত বাজসনেয়ী সংহিতার অনুবাদ হইতে।

হইতেছে। এ উপাসনা কেবল আদর মাত্র। গোবৎস সম্বন্ধেও ঐরূপ। অন্য যজ্ঞের মন্ত্র হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

চাতুর্ম্মাস্য যাগে দর্ব্বী অর্থাৎ হাতাকে বলা হইতেছে,

"হে দর্ব্বি, তুমি অন্নে পরিপূর্ণ হইবার অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছ। এই আকারেই ইন্দ্র দেবতার সমীপে গমন কর। ভরসা করি পুনরাগমনকালেও ফলে পরিপূর্ণ হইয়া এইরূপ শোভিত হইবে।"

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে প্রথমেই যজমানের মস্তক কেশ ও শ্মশ্রু প্রভৃতি ক্ষুরের দ্বারা মুণ্ডন করিতে হয়। আগে কুশা কাটিয়া ক্ষুর পরীক্ষা করিতে হয়। সেই সময় কুশাকে বলিতে হয়, "হে কুশা সকল। অতীক্ষ্ণধার ক্ষুরের দ্বারা ক্ষৌরে যে কষ্ট হইতে পারে তাহা হইতে ত্রাণ কর। অর্থ ৎ তোমাদের দ্বারাই তাহা পরীক্ষিত হউক।"

পরে ক্ষৌরকালে ক্ষুরকে বলিতে হয়, "হে ক্ষুর, তুমি যেন ইঁহার রক্তপাত করিও না।"

পরে স্নান করিয়া ক্ষৌম বস্ত্র পরিধান করিতে হয়। বস্ত্র পরিধানকালে বস্ত্রকে বলিতে হয়, "হে ক্ষৌম! তুমি কি দীক্ষণীয় কি উপসদ উভয় প্রকার যজ্ঞেরই অঙ্গীভূত হইতেছ। আমি এই স্নানে সুন্দর কান্তি লাভ করতঃ সুখস্পর্শ কল্যাণকর তোমাকে পরিধান করিতেছি।"

তার পর গাত্রে নবনীত মর্দ্দন করিতে হয়। মর্দ্দনকালে নবনীতকে বলিতে হয়, "হে গব্য নবনীত। তুমি তেজ সম্পাদনে সমর্থ হইতেছ। আমাকে তেজঃপ্রদান কর।"

এ সকল স্থানে কি কুশা কিংবা ক্ষুর বা বস্ত্র বা নবনীতকে কেহ ফলপ্রদানে সক্ষম চৈতন্যবিশিষ্ট দেবতা মনে করিতেছে না। বাতুল ভিন্ন অপরের দ্বারা এরূপ বিবেচনা হওয়া সম্ভব নহে। এ সকল কেবল যত্নের বস্তুতে যত্নজনক বিধি প্রয়োগ মাত্র। ইন্দ্রাদি দেবের যে স্তুতি সকল ঋগ্বেদে আছে আদৌ তাহা প্রশংসনীয় বা আদরণীয়ের প্রশংসা বা আদর মাত্র ছিল। উদাহরণস্বরূপ আমরা একটি ইন্দ্রসূক্ত উদ্ধৃত করিতেছি।

"ইন্দ্রস্য নু বীর্য্যাণি প্র বোচং যানি চকার প্রথমানি বজ্রী।
অহন্নহিমন্বপস্ততর্দ্দ প্র বক্ষণা অভিনৎ পর্ব্বতানাং॥
অহন্নহিং পর্ব্বতে শিশ্রিয়াণং ত্বষ্টাস্মৈ বজ্রং স্বর্য্যং ততক্ষ।
বাশ্রা ইব ধেনবঃ স্যন্দমানা অংজঃ সমুদ্রমবজগ্মুরাপঃ॥
বৃষায়মানোঽবৃণীত সোমং ত্রিকদ্রুকেষ্বপিবৎ সুতস্য।
আ সায়কং মঘবাদত্ত বজ্রমহন্নেনং প্রথমজামহীনাং॥
যদিন্দ্রাহন্ প্রথমজামহীনামান্মায়িনামমিনাঃ প্রোত মায়াঃ।
আৎ সূর্য্যং জনয়ন্ দ্যামুষাসং তাদিত্না শত্রুং ন কিলাবিবিৎসে॥
অহন্ বৃত্রং বৃত্রতরং ব্যংসমিন্দ্রো বজ্রেণ মহতা বধেন।
স্কন্ধাংসীব কুলিশেনাবিবৃক্ণাহিঃ শয়ত উপপৃক্ পৃথিব্যাঃ॥
অযোদ্ধেব দুর্মদ আ হি জুহ্বে মহাবীরং তুবিবাধমৃজীষম্।
নাতারীদস্য সমৃতিং বধানাং সংরুজানাঃ পিপিষ ইন্দ্রশত্রুঃ॥

অপাদহস্তো অপৃতন্যদিন্দ্রমাস্য বজ্রমধি সানৌ জঘান।
বৃষ্ণো বধ্রিঃ প্রতিমানং বভূষন্ পুরুত্রা বৃত্রো অশয়ৎ ব্যস্তঃ॥
নদং ন ভিন্নমমুয়া শয়ানং মনো রুহাণা অতিযন্ত্যাপঃ।
যাশ্চিৎ বৃত্রো মহিনা পর্য্যতিষ্ঠৎ তাসামহিঃ পৎসুতঃশীর্বভূব॥
নীচাবয়া অভবৎ বৃত্রপুত্রেন্দ্রো অস্যা অব বধর্জভার।
উত্তরা সূরধরঃ পুত্র আসীৎ দানুঃশয়ে সহবৎসা ন ধেনুঃ॥
অতিষ্ঠন্তীনামনিবেশনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরীরং।
বৃত্রস্য নিণ্যং বিচরন্ত্যাপো দীর্ঘং তম আশয়দিন্দ্রশত্রুঃ॥
দাসপত্নীরহিগোপা অতিষ্ঠন্নিরুদ্ধা আপঃ পণিনেব গাবঃ।
অপাং বিলমপিহিতং যদাসীৎ বৃত্রং জঘন্বাঁ অপ তদ্ববার॥
অশ্ব্যো বারো অভবস্তদিন্দ্র সৃকে যত্ত্বা প্রত্যহন্দেব একঃ।
অজয়ো গা অজয়ঃ শূর সোমমবাসৃজঃ সর্ত্তবে সপ্ত সিন্ধূন্॥
নাস্মৈ বিদ্যুন্ন তন্যতুঃ সিষেধ ন যাং মিহমকিরৎব্রাহ্লুনিং চ।
ইন্দ্রশ্চ যৎযুযুধাতে অহিশ্চোতাপরীভ্যো মঘবা বিজিগ্যে॥
অহের্যাতারং কমপশ্য ইন্দ্র হৃদি যত্তে জঘ্নুষো ভীরগচ্ছৎ।
নব চ যন্নবতিং চ স্রবন্তীঃ শ্যেনো ন ভীতো অতরো রজাংসি॥
ইন্দ্রো যাতোঽবসিতস্য রাজা শমস্য চ শৃঙ্গিনো বজ্রবাহুঃ।
সেদু রাজা ক্ষয়তি চর্ষণীনামরান্ন নেমিঃ পরি তা বভূব॥

অনুবাদ

১। "বজ্রধর ইন্দ্রদেব প্রথমে যে সমস্ত পরাক্রমসূচক কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা আমি বর্ণনা করিতেছি। তিনি অহিনামে অভিহিত বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। জলসমূহ ভূমিতে পতিত করিয়াছিলেন। এবং পার্ব্বত প্রদেশের রুদ্ধ বহনশীল নদী সকলের কূল ভগ্ন করিয়া জল প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

২। ইন্দ্রদেব পর্ব্বতে লুক্কায়িত বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। ত্বষ্টৃদেব ইন্দ্রদেবের নিমিত্ত গর্জ্জনশীল বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। বৃত্রাসুর হত হইলে পর রুদ্ধগতি নদী সকল বেগের সহিত সমুদ্রে প্রবাহিত হইয়াছিল, যদ্রূপ গো সকল হম্বারব করিয়া সত্বর বৎসের নিকট গমন করে।

৩। বলবান্ ইন্দ্রদেব সোমরস পান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং উপর্য্যুপরি যজ্ঞত্রয়ে সোমরস পান করিয়াছিলেন। তৎপরে বলবান্ ইন্দ্রদেব মারকবজ্র গ্রহণ-পূর্ব্বক অহিদিগের শ্রেষ্ঠ বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন।

৪। হে ইন্দ্রদেব আপনি যখন অহিদিগের শ্রেষ্ঠ বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া মায়াবী অসুরদিগের মায়া নষ্ট করিয়াছিলেন এবং তৎপরে যখন সূর্য্য উষাকাল এবং আকাশ সৃষ্টি করিয়াছিলেন তখন আর কোন শত্রু দেখিতে পান নাই।

৫। ইন্দ্রদেব তাঁহার বৃহৎ ও বধকারী বজ্রের সহিত লোকের উপদ্রবকারী

বৃত্রাসুরকে লোকে যেমন কুঠার দ্বারা বৃক্ষস্কন্ধ ছেদন করে, তদ্রূপ বাহুচ্ছেদনপূর্ব্বক বধ করিয়াছিলেন, এবং বৃত্রাসুরকে তদবস্থ ভূমির উপর পতিত করিয়াছিলেন।

৬। আমার সমান যোদ্ধা আর কেহ নাই এইরূপ দর্পযুক্ত বৃত্রাসুর মহাবীর ও বহুশত্রুনিবারক ইন্দ্রদেবকে যুদ্ধার্থে স্পর্দ্ধা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রদেবের অস্ত্র-প্রহার হইতে কোন প্রকারে আপনাকে রক্ষা করিতে না পারিয়া অবশেষে হত হইয়া নদী সকলের উপর পতিত হইয়া তাহাদের কূলাদি ভগ্ন করিয়াছিল।

৭। হস্ত ও পদশূন্য হইয়াও বৃত্রাসুর ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল এবং ইন্দ্র ইহার পাষাণসদৃশ স্কন্ধের উপর বজ্র নিক্ষেপ করিয়াছিল। পৌরুষবর্জ্জিত ব্যক্তি যদ্রূপ পৌরুষবিশিষ্ট ব্যক্তির সমকক্ষ হইতে ইচ্ছা করে, তদ্রূপ বৃত্রাসুর ইন্দ্রের সমকক্ষ হইতে ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্র কর্ত্তৃক শরীরের নানা স্থানে আহত হইয়া ভূমিতে পতিত হইয়াছিল।

৮। নদীর জল সকল ভগ্ন কূলের উপর যেমন বেগের সহিত প্রবাহিত হয় তদ্রূপ নদীর উপর পতিত বৃত্রাসুরের দেহের উপর প্রবাহিত হইয়াছিল। বৃত্রাসুর জীবনদশায় যে জল সকল বলের দ্বারায় রুদ্ধ রাখিয়াছিলেন সেই জল সকলের নিম্নে মৃত্যুর পর তাহার দেহ পতিত রহিল।

৯। বৃত্রাসুরের মাতা পুত্রদেহ রক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বয়ং বৃত্রকে ব্যবহিত করিয়াছিল। কিন্তু ইন্দ্রদেব বৃত্রের মাতার উপর বজ্র প্রহার করেন, তাহাতে বৃত্রমাতা হত হইয়া গাভী বৎসের সহিত যেমন শয়ন করে, তদ্রূপ মৃত পুত্রের উপর পতিত হইয়া তাহা আচ্ছাদিত করতঃ শয়ন করিয়াছিল।

১০। অবিশ্রান্ত প্রবহনশীল নদী সকলের জলমধ্যে বৃত্রাসুরের দেহ পতিত হইল। জল সমূহ বন্ধনমুক্ত হইয়া অন্তর্হিত বৃত্রপ্রদেশের উপর প্রবাহিত হইতে লাগিল। ইন্দ্রদেবের সহিত শত্রুতা করিয়া বৃত্রাসুর চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল।

১১। দাস এবং অহিনামে প্রসিদ্ধ বৃত্রাসুর যে সকল নদীর প্রবাহ বিরোধ করিয়াছিল, যদ্রূপ পণি নামক অসুর গো সকল গুহাতে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, ইন্দ্রদেব বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া সেই সকল নিরোধ দূর করিয়া প্রবাহমার্গ মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

১২। হে ইন্দ্রদেব! যখন অসহায় বৃত্রাসুর আপনার বজ্রে প্রতিপ্রহার করিয়াছিল তখন আপনি অনায়াসে বৃত্রাসুরকে নিরাকৃত করিয়াছিলেন, যদ্রূপ অশ্বপুচ্ছগত বালসমূহ মক্ষিকাদি অনায়াসে নিরাকৃত করে। তদনন্তর আপনি পণি নামক অসুর কর্ত্তৃক অপহৃত অনিরুদ্ধ ও নিরুদ্ধ গোসমূহ জয় করিয়া স্ববশে আনয়ন করিয়াছিলেন। জয়লাভ করিয়া সোমরস পান করিয়াছিলেন এবং সপ্ত নদীর প্রবাহ নিরোধ অপনয়নপূর্ব্বক তাহাদিগকে প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

১৩। বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত যে বিদ্যুৎ প্রহার, যে গর্জ্জন, যে বর্ষণ, যে অশনি নিক্ষেপ, এবং যে অপরাপর কৌশল প্রয়োগ করিয়াছিল, তৎসমুদায়ই ইন্দ্রের অনিষ্ট করিতে ব্যর্থ হইয়াছিল এবং অবশেষে ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে অভিভূত করিয়াছিলেন।

১৪। হে ইন্দ্রদেব! আপনি যখন বৃত্রাসুরকে বধ করিয়া ভীত হইয়াছিলেন, এবং ভীত হইয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় একোনশত সংখ্যক প্রবহনশীল নদী পার হইয়াছিলেন, তখন বৃত্রাসুর বধের নির্য্যাতনেচ্ছু কোন্ জনকে দেখিয়াছিলেন?

১৫। বজ্রধর ইন্দ্রদেব স্থাবর এবং জঙ্গম জগতের রাজা, শান্ত এবং দুর্দান্ত জীবগণের অধীশ্বর। এবম্ভূত ইন্দ্রদেব মনুষ্যদিগের প্রভু। রথচক্রের নেমি যদ্রূপ চক্রগত আরাখ্য কাষ্ঠ সকল বেষ্টন করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি মনুষ্যদিগকে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টনপূর্ব্বক রক্ষা করেন।"*

এই সূক্তের তাৎপর্য্য বড় স্পষ্ট। পূর্ব্বে বুঝান গিয়াছে, ইন্দ্র বর্ষণকারী আকাশ। বৃত্র বৃষ্টিনিরোধকারী নৈসর্গিক ব্যাপার। বর্ষণশক্তির দ্বারা সেই সকল নৈসর্গিক ব্যাপার অপহত হইলে বৃত্রবধ হইল। এই সূক্ত বর্ষণকারী আকাশের সেই ক্রিয়ার প্রশংসা মাত্র। ইন্দ্র এখানে কোন চৈতন্যবিশিষ্ট পুরুষ নহেন, এবং এ সূক্তে তাঁহার কোন সকাম উপাসনাও নাই।

স্বীকার করি, এক্ষণে বৈদিক সংহিতায় যে উপাসনা আছে, তাহার প্রায় অধিকাংশই সকাম, এবং উপাস্যেরা তাহাতে চৈতন্যবিশিষ্ট দেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু জড়শক্তির প্রশংসা-পদ্ধতি ক্রমে প্রচলিত হইয়া আসিলে, শব্দের আড়ম্বরে তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য লোকের চিত্ত হইতে অপসৃত হইল। "জগতের রাজা," এবং "জীবগণের অধীশ্বর" ইত্যাকার বাক্যের যথার্থ তাৎপর্য্য যে, বৃষ্টি হইতেই জগৎ ও জীবের রক্ষা, লোকে ইহা ক্রমে ভুলিয়া যাইতে লাগিল, এবং ইন্দ্রকে যথার্থ জগতের চৈতন্যবিশিষ্ট রাজা এবং জীবগণের চৈতন্যবিশিষ্ট অধীশ্বর মনে করিতে লাগিল। তখন জগতের জড়শক্তির নিষ্কাম প্রশংসার স্থানে সকাম উপাসনা আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির অনুশীলন মাত্র ছিল, তাহা দেবতাবহুল উপধর্ম্মে পরিণত হইল।

বৈদিক ধর্ম্মের উৎপত্তি কি তাহা উপরি উদ্ধৃত অপেক্ষাকৃত প্রাচীন সূক্তগুলি হইতেই আমরা বুঝিতে পারি। ঋগ্বেদ-সংহিতার সকল সূক্তগুলি এক সময়ে প্রণীত হয় নাই; এবং ঋগ্বেদের সর্ব্বত্র বহু দেবতার উপাসনাত্মক উপধর্ম্মই যে আছে, এমত নহে। অনেক-গুলি এমত সূক্ত আছে যে, তাহা হইতে আমরা একেশ্বরবাদই শিক্ষা করি। সময়ান্তরে আমরা তাহার আলোচনা করিব। সেইগুলি যে বৈদিক ধর্ম্মের অপেক্ষাকৃত শেষাবস্থায়, আর উপরি উদ্ধৃত সূক্তের সদৃশ সূক্তগুলি যে আদিম অবস্থায়, আর সচেতন ইন্দ্রাদির উপাসনাত্মক সূক্তগুলি প্রধানতঃ যে মধ্যাবস্থায় প্রণীত হইয়াছিল, ইহা যে মনোযোগপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিবে সেই বুঝিতে পারিবে। বেদব্যাস, বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন। সঙ্কলন ব্যতীত চতুর্ব্বেদের বিভাগ হয় নাই। যাহা সঙ্কলিত, তাহা নানা ব্যক্তির দ্বারা নানা সময়ে প্রণীত হইয়াছিল। অতএব, আদিম, মধ্যকালিক, এবং শেষাবস্থার সূক্ত বলিয়া সূক্তগুলিকে বিভাগ করা যাইতে পারে। ধর্ম্মের প্রথমাবস্থা জড় প্রশংসা, মধ্যকালে চৈতন্যবাদ, এবং পরিণতি একেশ্বরবাদে। অতএব সূক্তের তাৎপর্য্য বুঝিয়া তাহার সময় নির্দ্দেশ করা যায়।

* এই অনুবাদ রমানাথ সরস্বতী কৃত।

এক্ষণে 'প্রচারে'র দ্বিতীয় সংখ্যা হইতে এ পর্য্যন্ত বৈদিক দেবতাতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিলাম পাঠক তাহা স্মরণ করুন। তাহার স্থূল তাৎপর্য্য এই;—

১। ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতা, আকাশ, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, প্রভৃতি জড়ের বিকাশ ভিন্ন কোন লোকোত্তর চৈতন্য নহে।

২। এই সকল দেবতাদিগের উপাসনা যেমন বেদে আছে, সেইরূপ ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যান্য দেশে ছিল বা আছে।

৩। তাহার কারণ এই যে, প্রথমাবস্থায় মনুষ্য জড়ে চৈতন্য আরোপণ করিয়া শক্তি, হিতকারিতা, বা সৌন্দর্য্য অনুসারে তাহার উপাসনা করে।

৪। এই উপাসনা গোড়ায় কেবল শক্তিমান, সুন্দর বা উপকারী জড়পদার্থের প্রশংসা বা আদর মাত্র। কেবল লোকে সে কথা ভুলিয়া গেলে, ইহা ইতর দেবতার উপাসনায় পরিণত হয়।

হিন্দুধর্ম্মে ইতর দেবোপাসনা এই অবস্থায় পরিণত হইয়াছে; ঈদৃশ উপাসনা অনিষ্টকর এবং উপধর্ম্ম। কিন্তু ইহার মূল অনিষ্টকর নহে। জড়শক্তিও ঈশ্বরের শক্তি। সে সকলের আলোচনার দ্বারা ঈশ্বরের মহিমা এবং কৃপা অনুভূত করা এবং তদ্দ্বারা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন করা বিধেয় বটে।

বৈদিক ধর্ম্মের এই স্থূল তাৎপর্য্য। আধুনিক হিন্দুধর্ম্মেও সেই সকল বৈদিক দেবতারা উপাসিত। অতএব এখনকার হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারে সেই কথা আমাদের মনে রাখা উচিত। জড়ের শক্তির চিন্তার দ্বারা জ্ঞানার্জ্জনী এবং চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি সকলের অনুশীলন করিব, এবং ঈশ্বরের মহিমা বুঝিবার চেষ্টা করিব, কিন্তু জড়ের উপাসনা করিব না। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের একটি স্থূল কথা।

এক্ষণে বৈদিক তত্ত্বান্তর্গত দেবতাতত্ত্ব সমাপ্ত করিয়া, আমরা বৈদিক তত্ত্বান্তর্গত ঈশ্বরতত্ত্বের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি। হিন্দুধর্ম্মের এই ব্যাখ্যার প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত করিলাম।—'প্রচার', ১ম বর্ষ, পৃ. ৩৯৭-৪০৭।

হিন্দু কি জড়োপাসক ?

যতক্ষণ আমার অঙ্গুলিটি আমা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে ততক্ষণ ঐ অঙ্গুলিটি চেতনাময়, কিন্তু অঙ্গুলিটি কাটিয়া ফেলিলে, উহা আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, উহাতে আর চেতনা থাকে না, তখন উহা অচেতন জড় পদার্থ।

এই সমগ্র বিশ্ব চৈতন্যময় এক পুরুষের দেহ। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শক্তির আধার সকল, অর্থাৎ অগ্নি বায়ু ইত্যাদি পদার্থ সকল সেই দেবতার অঙ্গবিশেষ। অগ্নিকে যদি সেই এক চৈতন্যময় পুরুষের অঙ্গ বলিয়া জানি, অগ্নিকে যদি সেই চৈতন্যময় পুরুষ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখি, তবে অগ্নির চেতনা আছে বলিয়া বুঝিব। আর যিনি অগ্নির সহিত সেই চৈতন্যময়ের কোন সম্বন্ধ দেখিতে পান না তাঁহার কাছেই অগ্নি জড় পদার্থ।

আজকালকার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অগ্নিকে (Igneous principle) জড় বলিয়া জানেন কিন্তু প্রাচীন হিন্দুগণ অগ্নির সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ বুঝিয়া উহাকে চেতন বলিয়া

বুঝিতেন। আজকালকার পাশ্চাত্ত্যগণ অগ্নিগত শক্তিকেই (Heat) জগতের আদি শক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দু ঋষিগণও এই অগ্নিকে জগতের আদি শক্তি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তবে প্রভেদ এই, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের অগ্নি জড়শক্তি, প্রাচীন হিন্দু ঋষিদের অগ্নি চেতনাযুক্ত।

প্রণব মন্ত্র হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্য্য চলিতেছে। এই প্রণব মন্ত্রের দেবতা অগ্নি। হিন্দুরা বুঝিয়াছিলেন যে, এই অগ্নিগত শক্তি হইতেই এই জগৎচক্র ঘুরিতেছে। কিন্তু এই অগ্নিগত শক্তি যে চৈতন্য সম্বন্ধ রহিত ইহা তাঁহারা কখনও ভাবিতেন না। হিন্দুদের কাছে প্রণব মন্ত্রের লক্ষ্য অগ্নিগত শক্তি ব্রহ্মচৈতন্যে চেতনাযুক্ত।

ওঁকারস্য ব্রহ্মাঋষিঃ গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ।

প্রণব মন্ত্রের লক্ষ্য অগ্নিগত শক্তি সম্বন্ধে যিনি চিন্তা করিতে চান, অথবা উক্ত শক্তির সাহায্যে যিনি কোন কর্ম্ম করিতে চান, তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে উক্ত মন্ত্রের ঋষি কে—তাহা জানিতে হইবে। মন্ত্রের ঋষি কে—ইহা না জানিয়া অর্থাৎ মন্ত্রের লক্ষ্য শক্তি কিরূপ চেতনাযুক্ত ইহা না জানিয়া, যিনি মন্ত্র সাহায্য গ্রহণ করেন তাঁহাকে পাপভাক্ হইতে হয়, ইহা শ্রুতির কথা।

যোঽহরহরবিদিতঋষিচ্ছন্দো দৈবতবিনিয়োগেন ব্রাহ্মণেন বা মন্ত্রেণ বা যজতি যাজয়তি বা অধীতে অধ্যাপয়তি বা হোমে কর্ম্মণি অন্তর্জলাদৌ বা স পাপীয়ান্ ভবতি।

এখন দেখ বেদোক্ত ধর্ম্মাচারী ঋষিগণকে জড়োপাসক বলা কি কোন ক্রমে সঙ্গত হয় ? যে পাশ্চাত্ত্যগণ হিন্দুদের জড়োপাসক বলেন প্রকৃতপক্ষে তাঁহারাই জড়োপাসক। পাশ্চাত্ত্যগণ আজকাল নানা প্রকার প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্য অবলম্বন করিয়া নানাবিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; কিন্তু ঐ সকল শক্তি যে চৈতন্যময়ের চেতনাযুক্ত, ইহা একবারও ভাবেন না। জগতে ঐ সকল শক্তি দ্বারা চৈতন্যময়ের কি প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে পাশ্চাত্ত্যগণ তাহা একবার অনুসন্ধানও করেন না। পাশ্চাত্ত্যগণ ঋষি বিনিয়োগাদি না জানিয়া প্রাকৃতিক শক্তির সহিত খেলা করিতেছেন। শ্রুতিমতে উঁহারা পাপভাগী হইতেছেন।

আমার বোধ হয় যেদিন হইতে ডাইনামাইট সৃষ্টি হইয়াছে সেই দিন পাশ্চাত্ত্যগণের উক্ত পাপের ফল ফলিবার সূত্রপাত হইয়াছে।

হিন্দুরা জড়োপাসক নহে। চৈতন্যবিহীন পদার্থ হিন্দুদের কাছে অস্পৃশ্য পদার্থ। আজকাল যাহাকে জড় পদার্থ বলা হয়, যেমন অগ্নি বায়ু নদী পর্ব্বত ইত্যাদি, ইহারা হিন্দুদের কাছে চৈতন্যময়ের চেতনাযুক্ত পদার্থ। চৈতন্যবিহীন পদার্থ আর মৃত শরীর এই দুইটি কথায় হিন্দু একই অর্থ বুঝিয়া থাকেন। মৃত শরীরের সংস্পর্শে হিন্দু থাকিতে চান না।—'প্রচার', ১ম বর্ষ, পৃ. ৪২৭-৩০।

হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে একটি স্থূল কথা

আমরা বেদের দেবতত্ত্ব সমাপন করিয়াছি। এক্ষণে ঈশ্বরতত্ত্ব সমালোচনে প্রবৃত্ত হইব। পরে আনন্দময়ী ব্রহ্ম কথায় আমরা প্রবেশ করিব।

একজন ঈশ্বর যে এই জগৎ সৃষ্ট করিয়াছেন, এবং ইহার স্থিতিবিধান ও ধ্বংস করিতেছেন, এই কথাটা আমরা নিত্য শুনি বলিয়া, ইহা যে কত গুরুতর কথা, মনুষ্য-বুদ্ধির কত দূর দুষ্প্রাপ্য, তাহা আমরা অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারি না। মনুষ্যজ্ঞানের অগম্য যত তত্ত্ব আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ইহাই মনুষ্যের বুদ্ধির অগম্য।

এই গুরুতর কথা, যাহা আজিও কৃতবিদ্য সভ্য মনুষ্যরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছে না, তাহা কি আদিম অসভ্য জাতিদিগের জানা ছিল? ইহা অসম্ভব। বিজ্ঞান* প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর জ্ঞানের উন্নতি অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে ক্রমশঃ হইয়া আসিতেছে; তখন সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ব্বোধ্য যে জ্ঞান তাহাই আদিম মনুষ্য সর্ব্বাগ্রে লাভ করিবে, ইহা সম্ভব নহে। অনেকে বলিবেন, ও বলিয়া থাকেন, ঈশ্বরকৃপায় তাহা অসম্ভব নহে; যাহা মনুষ্য উদ্ধারের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা কৃপা করিয়া তিনি অপকবুদ্ধি আদিম মনুষ্যের হৃদয়ে প্রকটিত করিতে পারেন; এবং কখনও দেখিতে পাই যে, সভ্য সমাজস্থিত অনেক অকৃতবিদ্য মূর্খেরও ঈশ্বরজ্ঞান আছে। এ উত্তর যথার্থ নহে। কেন না, এখন পৃথিবীতে যে সকল অসভ্য জাতি বর্ত্তমান আছে, তাহাদের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাইতেছে যে, তাহাদের মধ্যে প্রায়ই ঈশ্বরজ্ঞান নাই। একটা মনুষ্যের আদি পুরুষ কিম্বা একটা বড় ভূত বলিয়া কোন অলৌকিক চৈতন্যে কোন কোন অসভ্য জাতির বিশ্বাস থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা ঈশ্বরজ্ঞান নহে। তেমনি সভ্য সমাজস্থ নির্ব্বোধ মূর্খ ব্যক্তি ঈশ্বর নাম শুনিয়া তাহার মৌখিক ব্যবহার করিতে পারে, কিন্তু যাহার চিত্তবৃত্তি অনুশীলিত হয় নাই, তাহার পক্ষে ঈশ্বরজ্ঞান অসম্ভব। বহি না পড়িলে যে চিত্তবৃত্তি সকল অনুশীলিত হয় না এমত নহে। কিন্তু যে প্রকারেই হউক, বুদ্ধি, ভক্তি প্রভৃতির সম্যক্ অনুশীলন ভিন্ন ঈশ্বরজ্ঞান অসম্ভব। তাহা না থাকিলে, ঈশ্বর নামে কেবল দেবদেবীর উপাসনাই সম্ভব।

অতএব বুদ্ধির মার্জ্জিতাবস্থা ভিন্ন মনুষ্যহৃদয়ে ঈশ্বরজ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনা নাই। কোন জাতি যে পরিমাণে সভ্য হইয়া মার্জ্জিতবুদ্ধি হয়, সেই পরিমাণে ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করে। এ কথার প্রতিবাদে যদি কেহ প্রাচীন য়িহুদীদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলেন যে, তাহারা প্রাচীন গ্রীক প্রভৃতি জাতির অপেক্ষায় সভ্যতায় হীন হইয়াও ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করিয়াছিল, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, য়িহুদীদিগের সে ঈশ্বরজ্ঞান বস্তুতঃ ঈশ্বরজ্ঞান নহে। জিহোবাকে আমরা আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষকদিগের কৃপায় ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছি, কিন্তু জিহোবা য়িহুদীদিগের একমাত্র উপাস্য দেবতা হইলেও

* হিন্দুশাস্ত্রে যাঁহারা অভিজ্ঞ তাঁহারা জানেন যে, "বিজ্ঞান" অর্থে Science নহে। কিন্তু এক্ষণে ঐ অর্থে তাহা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে বলিয়া আমিও ঐ অর্থে ব্যবহার করিতে বাধ্য। "নীতি" শব্দেরও ঐরূপ দশা ঘটিয়াছে। নীতি অর্থে Politics কিন্তু এখন আমরা "Morals" অর্থে ব্যবহার করি।

ঈশ্বর নহেন। তিনি রাগদ্বেষপরতন্ত্র পক্ষপাতী মনুষ্যপ্রকৃত দেবতামাত্র। পক্ষান্তরে সুশিক্ষিত গ্রীকেরা ইহার অপেক্ষা উন্নত ঈশ্বরজ্ঞানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের যে ঈশ্বরজ্ঞান, যিশু য়িহুদী হইলেও, সে জ্ঞান কেবল য়িহুদীদিগেরই নিকট প্রাপ্ত নহে। খৃষ্টধর্ম্মের যথার্থ প্রণেতা সেন্ট পল। তিনি গ্রীকদিগের শাস্ত্রে অত্যন্ত সুশিক্ষিত ছিলেন।

সর্ব্বাপেক্ষা বৈদিক হিন্দুরাই অল্পকালে সভ্যতার পদবীতে আরূঢ় হইয়া ঈশ্বরজ্ঞানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমরা এ পর্য্যন্ত বৈদিক ধর্ম্মের কেবল দেবতাতত্ত্বই সমালোচনা করিয়াছি। কেন না সেইটা গোড়া, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরিপক যে বৈদিক ধর্ম্ম, তাহা অতি উন্নত ধর্ম্ম, এবং এক ঈশ্বরের উপাসনাই তাহার স্থূল মর্ম্ম। তবে বলিবার কথা এই যে, প্রথম হিন্দুরা, একেবারে গোড়া হইতে ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্ত হয় নাই। জাতিকর্ত্তৃক ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্তির সচরাচর ইতিহাস এই যে, আগে নৈসর্গিক পদার্থ বা শক্তিতে ক্রিয়মান্ চৈতন্য আরোপ করে, অচেতনে চৈতন্য আরোপ করে। তাহাতে কি প্রকারে দেবোৎপত্তি হয় তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। এই প্রণালী অনুসারে, বৈদিকেরা কি প্রকারে ইন্দ্রাদি দেব পাইয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়াছি। এই অবস্থায় জ্ঞানের উন্নতি হইলে উপাসকেরা দেখিতে পান যে, আকাশের উপাসনা করি, বায়ুরই উপাসনা করি, মেঘেরই উপাসনা করি, আর অগ্নিরই উপাসনা করি, এই সকল পদার্থই নিয়মের অধীন। এই নিয়মেও সর্ব্বত্র একত্ব, এক স্বভাব দেখা যায়। ঘোল মউনির তাড়নে ঘোল, আর বাত্যাতাড়িত সমুদ্র এক নিয়মে বিলোড়িত হয়; যে নিয়মে আমার হাতের গণ্ডূষের জল পড়িয়া যায়, সেই নিয়মেই আকাশের বৃষ্টি পৃথিবীতে পড়ে। এক নিয়তি সকলকে শাসন করিতেছে; সকলই সেই নিয়মের অধীন হইয়া আপন আপন কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে, কেহই নিয়মকে ব্যতিক্ষুণ্ণ করিতে পারেন না। তবে ইহাদেরও নিয়মকর্ত্তা, শাস্তা, এবং কারণস্বরূপ আর একজন আছেন। এই বিশ্বসংসারে যাহা কিছু আছে সকলই সেই এক নিয়মে চালিত; অতএব এই বিশ্বজগতের সর্ব্বাংশই সেই নিয়ম-কর্ত্তার প্রণীত এবং শাসিত। ইন্দ্রাদি হইতে রেণুকণা পর্য্যন্ত সকলই এক নিয়মের অধীন, সকলই এক জনের সৃষ্ট ও রক্ষিত, এবং এক জনই তাহার লয়কর্ত্তা। ইহাই সরল ঈশ্বরজ্ঞান। জড়ের উপাসনা হইতেই ইহা অনেক সময়ে উৎপন্ন হয়, কেন না জড়ের একতা ও নিয়মাধীনতা ক্রমশঃ উপাসকের হৃদয়ঙ্গম হয়।

তবে ঈশ্বরজ্ঞান উপস্থিত হইলেই যে দেবদেবীর উপাসনা লুপ্ত হইবে এমন নহে। যাহাদিগকে চৈতন্যবিশিষ্ট বলিয়া পূর্ব্বে বিশ্বাস হইয়াছে, জ্ঞানের আরও অধিক উন্নতি না হইলে, বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা ব্যতীত, তাহাদিগকে জড় ও অচেতন বলিয়া বিবেচনা হয় না। ঈশ্বরজ্ঞান এই বিশ্বাসের প্রতিষেধক হয় না। ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা হউন, কিন্তু ইন্দ্রাদিও আছে, এই বিশ্বাস থাকে—তবে ঈশ্বরজ্ঞান হইলে উপাসক ইহা বিবেচনা করে যে, এই ইন্দ্রাদিও সেই ঈশ্বরের সৃষ্ট, এবং তাঁহার নিয়োগানুসারেই স্ব স্ব ধর্ম্ম পালন করে। ঈশ্বর যেমন মনুষ্য ও জীবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি ইন্দ্রাদিকেও করিয়াছেন; এবং মনুষ্য ও জীবগণকে যেমন পালন ও কল্পে কল্পে ধ্বংস করেন, ইন্দ্রাদিকেও সেইরূপ করিয়া থাকেন। তবে ইন্দ্রাদিও মনুষ্যের উপাস্য, এ

কথাতেও বিশ্বাস থাকে, কেন না, ইন্দ্রাদিকে লোকোত্তর শক্তিসম্পন্ন ও ঈশ্বর কর্ত্তৃক লোকরক্ষায় নিযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস থাকে। এই কারণে ঈশ্বরজ্ঞান জন্মিলেও, জাতি মধ্যে দেবদেবীর উপাসনা উঠিয়া যায় না। হিন্দুধর্ম্মে তাহাই ঘটিয়াছে। ইহাই প্রচলিত সাধারণ হিন্দুধর্ম্ম—অর্থাৎ লৌকিক হিন্দুধর্ম্ম, বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম নহে। লৌকিক হিন্দুধর্ম্ম এই যে, একজন ঈশ্বর সর্ব্বস্রষ্টা, সর্ব্বকর্ত্তা, কিন্তু দেবগণও আছেন, এবং তাঁহারা ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া লোক রক্ষা করিতেছেন। বেদে এবং হিন্দু শাস্ত্রের অন্যান্য অংশে স্থানে স্থানে এই ভাবের বাহুল্য আছে।

তার পর, জ্ঞানের আর একটু উন্নতি হইলে, দেবদেবী সম্বন্ধে ভাবান্তরের উদয় হয়। জ্ঞানবান্ উপাসক দেখিতে পান যে, ইন্দ্র বৃষ্টি করেন না, ঈশ্বরের শক্তিতে বা ঈশ্বরের নিয়মে বৃষ্টি হয়; ঈশ্বরই বৃষ্টি করেন। বায়ু নামে কোন স্বতন্ত্র দেবতা বাতাস করেন না; বাতাস ঐশিক কার্য্য। সূর্য্য চৈতন্যবিশিষ্ট আলোককর্ত্তা নহেন; সূর্য্য জড় বস্তু, সৌরালোকও ঐশিক ক্রিয়া। যখন বৃষ্টিকর্ত্তা, বায়ুকর্ত্তা, আলোকদাতা প্রভৃতি সকলেই সেই ঈশ্বর বলিয়া জানা গেল, তখন, ইন্দ্র, বায়ু, সূর্য্য এ সকল উপাসনাকালে ঈশ্বরেরই নামান্তর বলিয়া গৃহীত হইল। তিনি এক, কিন্তু তাহার বিকাশ ও ক্রিয়া অসংখ্য, কার্য্যভেদে, শক্তিভেদে, বিকাশভেদে তাঁহার নামও অসংখ্য। তখন উপাসক যখন ইন্দ্র বলিয়া ডাকে, তখন তাঁহাকেই ডাকে, যখন বরুণ বলিয়া ডাকে, তখন তাঁহাকেই ডাকে; যখন সূর্য্যকে বা অগ্নিকে ডাকে, তখন তাঁহাকেই ডাকে।

ইহার এক ফল হয় এই যে উপাসক ঈশ্বরের স্তবকালে ঈশ্বরকে পূর্ব্বপরিচিত ইন্দ্রাদি নামে অভিহিত করে। ঈশ্বরই ইন্দ্রাদি, কাজেই ইন্দ্রাদিও ঈশ্বরের নামান্তর। তখন ইন্দ্রাদি নামে তাঁহার পূজাকালীন, ইন্দ্রাদির প্রতি সর্ব্বাঙ্গীণ জগদীশ্বরত্ব আরোপিত হয়। কেন না, জগদীশ্বর ভিন্ন আর কেহই ইন্দ্রাদি নাই।

বেদের সূক্তে এই ভাবের বিশেষ বাহুল্য দেখিতে পাই। এ সূক্তে ইন্দ্রে জগদীশ্বরত্ব, ও সূক্তে বরুণে জগদীশ্বরত্ব, অন্য সূক্তে অগ্নিতে জগদীশ্বরত্ব, সূক্তান্তরে সূর্য্যে জগদীশ্বরত্ব, এইরূপ পুনঃ পুনঃ আছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত মাক্ষমূলর ইহার মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, একটা কিম্ভূতকিমাকার ব্যাপার ভাবিয়া কি বলিয়া এরূপ ধর্ম্মের নামকরণ করিবেন, তদ্বিষয়িণী দুশ্চিন্তায় ম্রিয়মাণ! এরূপ কাণ্ডটা ত কোন পাশ্চাত্ত্য ধর্ম্মে নাই, ইহা না Theism না Polytheism, না Atheism—কোন ismই নয়! ভাবিয়া চিন্তিয়া পণ্ডিতপ্রবর গ্রীক ভাষার অভিধান খুলিয়া খুব দেড়গজী রকম একটা নাম প্রস্তুত করিলেন—Kakenotheism বা Henotheism. এই সকল বিদ্যা যে এ দেশে অধীত, অধ্যাপিত, আদৃত, এবং অনুবাদিত হয়, ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে। আচার্য্য মাক্ষমূলের বেদ বিশেষ প্রকারে অধীত করিয়াছেন, কিন্তু পুরাণেতিহাসে তাঁহার কিছুই দর্শন নাই বলিলেও হয়। যদি থাকিত, তাহা হইলে জানিতেন যে এই দুর্ব্বোধ্য ব্যাপার—অর্থাৎ সকল দেবতাতেই জগদীশ্বরত্ব আরোপ, কেবল বেদে নহে, পুরাণেতিহাসেও আছে। উহার তাৎপর্য্য আর কিছুই নহে—কেবল সমস্ত নৈসর্গিক ব্যাপারে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য দর্শন। তাঁহার Henotheism বা Kakenotheism আর কিছুই নহে, কেবল Polytheism নামক সামগ্রীর উত্তরাধিকারী Pure Theism.

এই গেল বৈদিক ধর্ম্মের তিন অবস্থা—

(১) প্রথম, দেবোপাসনা—অর্থাৎ জড়ে চৈতন্য আরোপ, এবং তাহার উপাসনা।

(২) ঈশ্বরোপাসনা, এবং তৎসঙ্গে দেবোপাসনা।

(৩) ঈশ্বরোপাসনা, এবং দেবগণের ঈশ্বরে বিলয়।

বৈদিক ধর্ম্মের চরমাবস্থা উপনিষদে। সেখানে দেবগণ একেবারে দূরীকৃত বলিলেই হয়। কেবল আনন্দময় ব্রহ্মাই উপাস্যস্বরূপ বিরাজমান। এই ধর্ম্ম অতি বিশুদ্ধ, কিন্তু অসম্পূর্ণ। ইহাই চতুর্থাবস্থা।

শেষে গীতাদি ভক্তিশাস্ত্রের আবির্ভাবে এই সচ্চিদানন্দের উপাসনার সঙ্গে ভক্তি মিলিতা হইল। তখন হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ ধর্ম্ম, এবং ধর্ম্মের মধ্যে জগতে শ্রেষ্ঠ। নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান, এবং সগুণ ঈশ্বরের ভক্তিযুক্ত উপাসনা ইহাই বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম। ইহাই সকল মনুষ্যের অবলম্বনীয়। দুঃখের বিষয়ে এই যে হিন্দুরা এ সকল কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশকে বা দেশাচারকে হিন্দু-ধর্ম্মের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহাতেই হিন্দুধর্ম্মের অবনতি এবং হিন্দুজাতির অবনতি ঘটিয়াছে।

এক্ষণে যাহা বলিলাম তাহা আরও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া প্রমাণের দ্বারা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব। সফল হইব কিনা, তাহা যিনি এই ধর্ম্মের উপাস্য, তাঁহারই হাত। কিন্তু পাঠকের যেন এই কয়টা স্থূল কথা মনে থাকে। নহিলে পরিশ্রম বৃথা হইবে। হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রচারে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ পায়, তাহা ধারাবাহিক ক্রমে না পড়িয়া, মাঝে মাঝে পড়িলে সে সকলের মর্ম্ম গ্রহণের সম্ভাবনা নাই। হস্তীই হউক, আর শৃগালই হউক, অন্ধের ন্যায় কেবল তাহার কর চরণ বা কর্ণ স্পর্শ করিয়া তাহার স্বরূপ অনুভব করা যায় না। "এটা রাজদ্বারে আছে, সুতরাং বান্ধব", এ রকম কথা আমরা শুনিয়াছি।—'প্রচার', ২য় বর্ষ, পৃ. ৭৪-৮০।

বেদের ঈশ্বরবাদ

প্রবাদ আছে হিন্দুদিগের তেত্রিশ কোটি দেবতা, কিন্তু বেদে বলে মোটে তেত্রিশটি দেবতা। এ সম্বন্ধে আমরা প্রথম প্রবন্ধে যে সকল ঋক্ উদ্ধৃত করিয়াছি, পাঠক তাহা স্মরণ করুন। আমরা দেখিয়াছি, বেদে বলে এই তেত্রিশটি দেবতা তিন শ্রেণীভুক্ত; এগারটি আকাশে, এগারটি অন্তরিক্ষে, এগারটি পৃথিবীতে।

ইহাতে যাস্ক কি বলেন শুনা যাউক। তিনি অতি প্রাচীন নিরুক্তকার—আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিত নহেন। তিনি বলেন,

"তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ। অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বায়ুর্বা ইন্দ্রো বা অন্তরিক্ষ-স্থানঃ সূর্য্যো দ্যুস্থানঃ। তাসাং মহাভাগ্যাদ্ একৈকস্যাপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি। অপি বা কর্ম্মপৃথক্ত্বাৎ যথা হোতা অধ্বর্য্যুর্ব্রহ্মা উদ্গাতা ইত্যপ্যেকস্য সতঃ।" ৭।৫।

অর্থাৎ "নৈরুক্তদিগের মতে বেদের দেবতা তিন জন। পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরিক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু এবং আকাশে সূর্য্য। তাঁহাদের মহাভাগত্ব কারণ এক এক জনের অনেক-

গুলি নাম। অথবা তাঁহাদিগের কর্ম্মের পার্থক্য জন্য, যথা হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, উদ্‌গাতা, এক জনেরই নাম হয়।

তেত্রিশ কোটির স্থানে গোড়ায় তেত্রিশ পাইয়াছিলাম, এখন নিরুক্তের মতে, তেত্রিশের স্থানে মোটে তিন জন দেখিতেছি—অগ্নি, বায়ু বা ইন্দ্র, এবং সূর্য্য। বহুসংখ্যক পৃথক্ পৃথক্ চৈতন্য দ্বারা যে জগৎ শাসিত হয় না—জাগতিকী শক্তি এক, বহুবিধা নহে, পৃথিবীতে সর্ব্বত্র এক নিয়মের শাসন, অন্তরিক্ষে সর্ব্বত্র এক নিয়মের শাসন, এবং আকাশে সর্ব্বত্র এক নিয়মের শাসন এখন তাঁহারা দেখিতেছেন। পৃথিবীতে আর এগারটি পৃথক্ দেবতা নাই—এক দেবতা, তাঁহার কর্ম্মভেদে অনেক নাম, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি এক, অনেক দেবতা নহেন। তেমনি অন্তরিক্ষেও এক দেবতা, আকাশেও এক দেবতা।

এখনও প্রকাশ পাইতেছে না যে, ঋষিরা জাগতিক শক্তির সম্পূর্ণ ঐক্য অনুভূত করিয়াছেন। এখন পৃথিবীর এক দেবতা, অন্তরিক্ষের অন্য দেবতা, আকাশের তৃতীয় দেবতা। জীব, উদ্ভিদাদির উৎপত্তি ও রক্ষা হইতে বায়ু বৃষ্টি প্রভৃতি অন্তরিক্ষের ক্রিয়া এত ভিন্নপ্রকৃতি, আবার সে সকল হইতে আলোকাদি আকাশব্যাপার সকল এত ভিন্ন যে, এই তিনের ঐক্য এবং একনিয়মাধীনত্ব অনুভূত করা আরও কালসাপেক্ষ। কিন্তু অসীম প্রতিভাসম্পন্ন বৈদিক ঋষিদিগের নিকট তাহাও অধিক দিন অস্পষ্ট থাকে নাই। ঋগ্বেদসংহিতাতেই পাওয়া যায়, "মূর্দ্ধা ভুবো ভবতি নক্তমগ্নিস্ততঃ সূর্য্যো জায়তে প্রাতরুদ্যন্।" (১০-৮৮) "অগ্নি রাত্রে পৃথিবীর মস্তক; প্রাতে তিনি সূর্য্য হইয়া উদয় হন।" পুনশ্চ "যদেনমদধুর্য্যজ্ঞিয়াসে দিবি দেবাঃ সূর্য্যমাদিতেয়ম্।" ইহাতে "এনং অগ্নিং সূর্য্যং আদিতেয়ং" ইত্যাদি বাক্যে অগ্নিই সূর্য্য বুঝাইতেছে।

এই সূক্তের ব্যাখ্যায় যাস্ক বলেন, "ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যামন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ" অর্থাৎ শাকপূণি (পূর্ব্বগামী নিরুক্তকার) বলিয়াছেন যে, "পৃথিবীতে, অন্তরিক্ষে, এবং আকাশে, তিন স্থানে অগ্নি আছেন।" ভৌম, অন্তরিক্ষ, ও দিব্য, এই ত্রিবিধ দেবই তবে অগ্নি।

অগ্নি সম্বন্ধে এইরূপ আরও অনেক কথা পাওয়া যায়। ক্রমে জগতের একশক্ত্যধীনত্ব ঋষিদিগের মনে আরও স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্। একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানং।" ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি বল, বা দিব্য সুপর্ণ গরুত্মান্ বল, এক জনকেই বিপ্রগণে অনেক বলেন, যথা, "অগ্নি যম মাতরিশ্বন্।" পুনশ্চ, অথর্ব্ব বেদে, "স বরুণঃ সায়মগ্নির্ভবতি স মিত্রো ভবতি প্রাতরুদ্যন্। স সবিতা ভূত্বা অন্তরিক্ষেণ যাতি, স ইন্দ্রো ভূত্বা তপতি মধ্যতো দিবং" সেই অগ্নিই সায়ংকালে বরুণ হয়েন। তিনিই প্রাতঃকালে উদয় হইয়া মিত্র হয়েন। তিনিই সবিতা হইয়া অন্তরিক্ষে গমন করেন, এবং ইন্দ্র হইয়া মধ্যাকাশে তাপ বিকাশ করেন।

এইরূপে ঋষিরা বুঝিতে লাগিলেন যে, অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবীর দেবগণ, অন্তরিক্ষের দেবগণ, এবং আকাশের দেবগণ, সব এক। অর্থাৎ যে শক্তির দ্বারা পৃথিবী শাসিত হয়, যে শক্তির দ্বারা অন্তরিক্ষের প্রক্রিয়া সকল শাসিত হয়, আর যে শক্তির

দ্বারা আকাশের প্রক্রিয়া সকল শাসিত হয়, সবই এক। জগৎ একই নিয়মের অধীন। একই নিয়ন্তার অধীন। "মহদ্দেবানামসুরত্বমেকম্" (ঋগ্বেদসংহিতা ৩। ৫৫) এইরূপে বেদে একেশ্বরবাদ উপস্থিত হইল। অতএব বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম্ম তেত্রিশ দেবতারও উপাসনা নহে, তিন দেবতারও উপাসনা নহে, এক ঈশ্বরের উপাসনাই বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম্ম। বেদে যে ইন্দ্রাদির উপাসনা আছে, তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য কি তাহা আমরা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। স্থূলতঃ উহা জড়ের উপাসনা। সেইটি বেদের প্রাচীন এবং অসংস্কৃতাবস্থা। সূক্ষ্মতঃ উহা ঈশ্বরের বিবিধ শক্তি এবং বিকাশের উপাসনা—ঈশ্বরেরই উপাসনা। ইহাই বৈদিক ধর্ম্মের পরিণাম, এবং সংস্কৃতাবস্থা। সাধারণ হিন্দু যদি জানিত যে, বেদে কি আছে, তাহা হইলে কখন আজিকার হিন্দুধর্ম্ম এমন কুসংস্কারাপন্ন এবং অবনত হইত না; মনসা মাকালের পূজায় পৌঁছিত না। জ্ঞান, চাবি-তালার ভিতর বদ্ধ থাকাই উন্নতিপ্রাপ্ত সমাজের অবনতির কারণ। ভারতবর্ষে সচরাচর জ্ঞান চাবি-তালার ভিতর বদ্ধ থাকে; যাঁহার হাতে চাবি তিনি কদাচ কখন সিন্দুক খুলিয়া, এক আধ টুকরা কোন প্রিয় শিষ্যকে বখ্‌শিষ করেন। তাই, ভারতবর্ষ অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার হইলেও সাধারণ ভারতসন্তান অজ্ঞান। ইউরোপের পুঁজি পাটা অপেক্ষাকৃত অল্প, কিন্তু ইউরোপীয়েরা জ্ঞান বিতরণে সম্পূর্ণ মুক্তহস্ত। এই জন্য ইউরোপের ক্রমশঃ উন্নতি, আর এই জন্য ভারতবর্ষের ক্রমশঃ অবনতি। বেদ এত দিন চাবি-তালার ভিতর ছিল, তাই বেদমূলক ধর্ম্মের ক্রমশঃ অবনতি। সৌভাগ্যক্রমে, বেদ এখন সাধারণ বাঙ্গালির বোধগম্য হইতে চলিল। বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অনুবাদ সকল প্রচার হইতেছে। বাবু মহেশচন্দ্র পাল উপনিষদ্ ভাগের সানুবাদ প্রকাশ আরম্ভ করিয়াছেন। বেদজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতা প্রভৃতির অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ প্রকাশ আরম্ভ করিয়াছেন। এই তিন জনেই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।*

* এস্থলে বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ অতি গুরুতর ব্যাপার। রমেশ বাবু যেরূপ ক্ষিপ্রকারিতা, বিশুদ্ধি, এবং সর্ব্বাঙ্গীণতার সহিত এই কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতেছেন, ইউরোপে হইলে এত দিন বড় জয় জয়কার পড়িয়া যাইত। আমাদের সমাজে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া, ভরসা করি, তিনি ভগ্নোৎসাহ হইবেন না। আমরা যত দূর বুঝিতে পারি, এবং প্রথম অষ্টকের অনুবাদ দেখিয়া যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে তাঁহার ভূয়ো ভূয়ো প্রশংসা করিতে আমরা বাধ্য। পাঠকেরা বোধ করি জানেন, ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেক স্থানে সায়নাচার্য্যের ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, রমেশ বাবু সর্ব্বত্রই সায়নের অনুগামী হইয়াছেন।

বেদ সম্বন্ধে কতকগুলি বিলাতী মত আছে। অনেক স্থানে সেই মতগুলি অশ্রদ্ধেয়, অনেক স্থলে তাহা অতি শ্রদ্ধেয়। শ্রদ্ধেয় হউক, অশ্রদ্ধেয় হউক, হিন্দুর সেগুলি জানা আবশ্যক। জানিলে বৈদিক তত্ত্ব সমুদায়ের তাঁহারা সুমীমাংসা করিতে পারেন। আমার যাহা মত, তাহার প্রতিবাদীরা কেন তাহার প্রতিবাদ করে, তাহা না জানিলে আমার

এইরূপে বৈদিক ঋষিরা ক্রমে ক্রমে এক বেদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জানিলেন যে, একজনেই সব করিয়াছেন ও সব করেন। যাস্ক বলেন—"মাহাত্ম্যাদ্দেবতায়াঃ এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে। একস্যাত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি।"

মাহাত্ম্যপ্রযুক্ত এক আত্মা বহু দেবতা স্বরূপ স্তুত হন। দেবতা সকলেই একই আত্মার প্রত্যঙ্গমাত্র। অতএব ঈশ্বর এক ইহা স্থির।

(১) তিনি একাই এই বিশ্ব নির্ম্মিত করিয়াছেন, এই জন্য বেদে তাঁহার এক নাম বিশ্বকর্ম্মা। ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ৮১ ও ৮২ সূক্তে জগৎকর্ত্তার এই নাম—পুরাণেতিহাসে বিশ্বকর্ম্মা দেবতাদের প্রধান শিল্পকর মাত্র। সূক্তে আছে যে, তিনি আকাশ ও পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়াছেন (১০।৮১।২) বিশ্বময় (বিশ্বতঃ) তাঁহার চক্ষু, মুখ, বাহু, পদ (ঐ, ৩) ইত্যাদি।

(২) তিনি হিরণ্যগর্ভ। এই হিরণ্যগর্ভের নানা শাস্ত্রে নানা প্রকার ব্যাখ্যা আছে। হেমতুল্য নারায়ণসৃষ্ট অণ্ড হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্রহ্মাকে মনুসংহিতায় হিরণ্যগর্ভ বলা হইয়াছে এবং পুরাণেতিহাসেও হিরণ্যগর্ভ শব্দের ঐরূপ ব্যাখ্যা আছে। ঐ দশম মণ্ডলের ১২১ সূক্তে হিরণ্যগর্ভ সর্ব্বাগ্রে জাত, সর্ব্বভূতের একমাত্র পতি, স্বর্গ মর্ত্ত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, আত্মদ, বলদ, বিশ্বের উপাসিত, জগতের একমাত্র রাজা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৩) তিনি প্রজাপতি। তাঁহা হইতে সকল প্রজা সৃষ্টি হইয়াছে। স্থানে স্থানে সূর্য্য বা সবিতাকে প্রজাপতি বলা হইয়াছে। কিন্তু পরিশেষে যাঁহাকে ঋষিরা জগতের

মতের সত্যাসত্য কখনই আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব না। অতএব সেই সকল মত সঙ্কলন করিয়া টীকাতে উহা সন্নিবেশিত করাতে রমেশ বাবুর অনুবাদ বিশেষ উপকারক হইয়াছে। দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, রমেশ বাবু ৩০০ পৃষ্ঠা পুস্তকের ৷৵০ মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, বোধ করি ইহা কেবল ছাপার খরচেই বিক্রীত হইতেছে।

যিনি যাহাই বলুন, রমেশচন্দ্রের এই কীর্ত্তিটি চিরস্মরণীয় হইবে। ইউরোপে যখন বাইবেল প্রথম ইংরেজি প্রভৃতি প্রচলিত ভাষায় অনুবাদিত হয় তখন রোমকীয় পুরোহিত এবং অধ্যাপক সম্প্রদায়, অনুবাদের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। রমেশ বাবুর প্রতিও সেইরূপ অত্যাচার হওয়াই সম্ভবে। কিন্তু যেমন বাইবেলের সেই অনুবাদে, ইউরোপ উপধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইল, ইউরোপীয় উন্নতির পথ অনর্গল হইল, রমেশ বাবুর এই অনুবাদে এ দেশে তদ্রূপ সুফল ফলিবে। বাঙ্গালী ইঁহার ঋণ কখন প্রতিশোধ করিতে পারিবে না।

প্রথম অষ্টকের অনুবাদ এক খণ্ড আমাদিগের নিকট সমালোচনার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। 'প্রচারে' কোন গ্রন্থের সমালোচনা হয় না, এবং বর্ত্তমান লেখকও গ্রন্থসমালোচনা কার্য্যে হস্তক্ষেপকরণে পরাঙ্মুখ। এজন্য 'প্রচারে' উহার সমালোচনার সম্ভাবনা নাই। তবে, যে উদ্দেশ্যে 'প্রচারে' এই বৈদিক প্রবন্ধগুলি লিখিত হইতেছে, এই অনুবাদ সেই উদ্দেশ্যের সহায় ও সাধক। এই জন্য এই অনুবাদ সম্বন্ধে এই কয়টি কথা বলা প্রয়োজন বিবেচনা করিলাম। বেদে কি আছে, তাহা যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে বেদের অনুবাদ পাঠ করিতে হইবে—আমরা বেশী উদাহরণ উদ্ধৃত করি—'প্রচারে' এত স্থান নাই।

একমাত্র চৈতন্যবিশিষ্ট সর্ব্বস্রষ্টা বলিয়া বুঝিলেন তখন তাঁহাকেই এই নামে অভিহিত করিতে লাগিলেন। ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক দিনে ব্রহ্মাই এই নাম প্রাপ্ত হইলেন। ঋগ্বেদসংহিতায় ব্রহ্মা শব্দ নাই।

(৪) ব্রহ্ম শব্দও আমি ঋগ্বেদসংহিতায় কোথাও দেখিতে পাই নাই। অথচ বেদের যে পরভাগ, উপনিষদ্, এই ব্রহ্ম নিরূপণ তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মণ ভাগে ও বাজসনেয় সংহিতায়ও অথর্ব্ববেদে ব্রহ্মকে দেখা যায়। সে সকল কথা পরে হইবে।

(৫) ঋগ্বেদসংহিতার ৯০ সূক্তকে পুরুষসূক্ত বলে। ইহাতে সর্ব্বব্যাপী পুরুষের বর্ণনা আছে। এই পুরুষ শতপথব্রাহ্মণে নারায়ণ নামে কথিত হইয়াছেন। অদ্যাপি বিষ্ণুপূজায় পুরুষসূক্তের প্রথম ঋক্ ব্যবহৃত হয়—

সহস্রশীর্ষঃ পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলং

কথিত হইয়াছে যে এই পুরুষকে দেবতারা হবির সঙ্গে যজ্ঞে আহুতি দিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞফলে সমস্ত জীবের উৎপত্তি। এই পুরুষ "সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং"—সমস্ত বিশ্ব ইহার এক পাদ মাত্র। বিশ্বকর্ম্মা হিরণ্যগর্ভ ও প্রজাপতির সঙ্গে, এই পুরুষ একীভূত হইলে বৈদান্তিক পরব্রহ্মে প্রায় উপস্থিত হওয়া যায়।

অতএব অতি প্রাচীন কালেই বৈদিকেরা জড়োপাসনা হইতে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিছু দিন সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রাদি বহু দেবের উপাসনা রহিল। ক্রমে ক্রমে দেখিব যে, সেই ইন্দ্রাদিও পরমাত্মায় লীন হইলেন। দেখিব যে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম একমাত্র জগদীশ্বরের উপাসনা। আর সকলই তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন নাম মাত্র।

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং ॥ গীতা ৯। ২৩।

আমরা ঋগ্বেদ হইতেই আরম্ভ করি, আর রামপ্রসাদের শ্যামা বিষয়* হইতেই আরম্ভ করি, সেই কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্মেই উপস্থিত হইতে হইবে। বুঝিব—এক ঈশ্বর আছেন, অন্য কোন দেবতা নাই। ইন্দ্রাদি নামেই ডাকি, সেই এক জনকেই ডাকি। ইহাই কৃষ্ণোক্ত ধর্ম্ম।—'প্রচার', ২য় বর্ষ, পৃ. ১৪৭-৫২।

হিন্দুধর্ম্মে ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই

প্রথমে জড়োপাসনা। তখন জড়কেই চৈতন্যবিশিষ্ট বিবেচনা হয়, জড় হইতে জাগতিক ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতেছে বোধ হয়। তাহার পর দেখিতে পাওয়া যায়, জাগতিক ব্যাপার সকল নিয়মাধীন। এক জন সর্ব্বনিয়ন্তা তখন পাওয়া যায়। ইহাই ঈশ্বরজ্ঞান। কিন্তু যে সকল জড়কে চৈতন্যবিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করিয়া লোকে উপাসনা

* রামপ্রসাদ কালী নামে পরব্রহ্মের উপাসনা করিতেন।

প্রসাদ বলে, ভক্তি মুক্তি, উভয়কে মাথে ধরেছি।
এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সব ছেড়েছি।

করিত, ঈশ্বরজ্ঞান হইলেই তাহাদের উপাসনা লোপ পায় না। তাহারা সেই সর্ব্বস্রষ্টা ঈশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট চৈতন্য এবং বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত বলিয়া উপাসিত হইতে থাকে।

তবে দেবগণ ঈশ্বরসৃষ্ট, এ কথা ঋগ্বেদের সূক্তের ভিতর পাইবার তেমন সম্ভাবনা নাই। কেন না, সূক্ত সকল ঐ সকল দেবগণেরই স্তোত্র; স্তোত্রে স্তুতকে কেহ ক্ষুদ্র বলিয়া উল্লেখ করিতে চাহে না। কিন্তু ঐ ভাব উপনিষদ্ সকলে অত্যন্ত পরিস্ফুট। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়োপনিষদের আরম্ভেই আছে,

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র আত্মাই ছিলেন—আর কিছুমাত্র ছিল না। পরে তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া, দেবগণকে সৃষ্টি করিলেন;

স ঈক্ষতে মে নু লোকা লোকাপালান্নু সৃজা ইতি। ইত্যাদি।

আমরা বলিয়াছি যে, পরিশেষে যখন জ্ঞানের আধিক্যে লোকের আর জড় চৈতন্যে বিশ্বাস থাকে না, তখন উপাসক ঐ সকল জড়কে ঈশ্বরের শক্তি বা বিকাশ মাত্র বিবেচনা করে। তখন ঈশ্বর হইতে ইন্দ্রাদির ভেদ থাকে না, ইন্দ্রাদি নাম, ঈশ্বরের নামে পরিণত হয়। ইহাই আচার্য্য মাক্ষমূলরের Henotheism. ঋগ্বেদ হইতে তিনি ইহার বিস্তর উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সুতরাং যিনি এই কথার বৈদিক প্রমাণ চাহেন, তাঁহাকে উক্ত লেখকের গ্রন্থাবলীর উপর বরাত দিলাম। এখানে সে সকল প্রমাণের পুনঃ সংগ্রহের প্রয়োজন নাই। যে কথাটা আচার্য্য মহাশয় বুঝেন নাই, তাহা এই। তিনি বলেন, এটি বৈদিক ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ যে, যখন যে দেবতার স্তুতি করা হয়, তখন সেই দেবতাকে সকলের উপর বাড়ান হয়। স্থূল কথা যে উহা বৈদিক ধর্ম্মের বিশেষ লক্ষণ নহে—পুরাণেতিহাসে সর্ব্বত্র আছে;—উহা পরিণত হিন্দুধর্ম্মের একেশ্বর-বাদের সঙ্গে প্রাচীন বহু দেবোপাসনার সংমিলন। যখন দেবতা একমাত্র বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, তখন ইন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি নামগুলি তাঁহারই নাম হইল। এবং তিনিই ইন্দ্রাদি নামে স্তুত হইতে লাগিলেন।

এই ইন্দ্রাদি যে শেষে সকলই ঈশ্বর স্বরূপ উপাসিত হইতেন, তাহার প্রমাণ বেদ হইতে দিলাম না। আচার্য্য মাক্ষমূলরের গ্রন্থে সকল উদ্ধৃত Henotheism সম্বন্ধীয় উদাহরণগুলিই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।—আমি দেখাইব যে ইহা কেবল বেদে নহে, পুরাণেতিহাসেও আছে। তজ্জন্য মহাভারত হইতে কয়েকটি স্তোত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

ইন্দ্র স্তোত্র আদিপর্ব্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। "হে সুরপতে! সম্প্রতি তোমা ব্যতিরেকে আমাদিগের প্রাণ রক্ষার আর কোন উপায়ান্তর নাই—যেহেতু তুমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করিতে সমর্থ। তুমি বায়ু; তুমি মেঘ; তুমি অগ্নি; তুমি গগনমণ্ডলে সৌদামিনী রূপে প্রকাশমান হও এবং তোমা হইতেই ঘনাবলী পরিচালিত হইয়া থাকে; তোমাকেই লোকে মহামেঘ বলিয়া নির্দ্দেশ করে; তুমি ঘোর ও প্রকাণ্ড বজ্রজ্যোতিঃস্বরূপ; তুমি আদিত্য; তুমি বিভাবসু; তুমি অত্যাশ্চর্য্য মহাভূত; তুমি নিখিল দেবগণের অধিপতি; তুমি সহস্রাক্ষ; তুমি দেব; তুমি পরমগতি; তুমি অক্ষয় অমৃত; তুমি পরম পূজিত সৌম্যমূর্ত্তি; তুমি মুহূর্ত্ত,; তুমি তিথি; তুমি বল; তুমি ক্ষণ; তুমি শুক্লপক্ষ; তুমি কৃষ্ণপক্ষ, তুমিই কলা, কাষ্ঠা, ত্রুটী, মাস, ঋতু,

সম্বৎসর ও অহোরাত্র; তুমি সমস্ত পর্ব্বত ও বনসমাকীর্ণ বসুন্ধরা; তুমি তিমিরবিরহিত ও সূর্য্যসংস্কৃত আকাশ; তুমি তিমিতিমিঙ্গিল সহিত উত্তুঙ্গতরঙ্গকুল-সঙ্কুল মহার্ণব।" এই স্তোত্রে জগদ্ব্যাপী পরমেশ্বরের বর্ণনা করা হইল।

তার পর আদিপর্ব্বের দুই শত উনবিংশ অধ্যায় হইতে অগ্নি স্তোত্র উদ্ধৃত করি।

"হে হুতাশন! মহর্ষিগণ কহেন, তুমিই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি না থাকিলে এই সমস্ত জগৎ ক্ষণকালমধ্যে ধ্বংস হইয়া যায়; বিপ্রগণ স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে তোমাকে নমস্কার করিয়া স্বধর্ম্মবিজিত ইষ্টগতি প্রাপ্ত হন। হে অগ্নে! সজ্জনগণ তোমাকে আকাশবিলম্ব সবিদ্যুৎ জলধর বলিয়া থাকেন; তোমা হইতে অস্ত্র সমুদায় নির্গত হইয়া সমস্ত ভূতগণকে দগ্ধ করে. হে জাতবেদঃ! এই সমস্ত চরাচর বিশ্ব তুমিই নির্ম্মাণ করিয়াছ; তুমিই সর্ব্বাগ্রে জলের সৃষ্টি করিয়া তৎপরে তাহা হইতে সমস্ত জগৎ উৎপাদন করিয়াছ; তোমাতেই হব্য ও কব্য যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত থাকে; হে দেব! তুমি দহন; তুমি ধাতা; তুমি বৃহস্পতি; তুমি অশ্বিনীকুমার; তুমি মিত্র; তুমি সোম এবং তুমিই পবন।"

বনপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সূর্য্যস্তোত্র এইরূপ—"ওঁ সূর্য্য; অর্য্যমা, ভগ, ত্বষ্টা, পূষা, অর্ক, সবিতা, রবি, গভস্তিমান্, অজ, কাল, মৃত্যু, ধাতব, প্রভাকর, পৃথিবী, জল, তেজঃ, আকাশ, বায়ু, সোম, বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ, অঙ্গারক, ইন্দ্র, বিবস্বান্, দীপ্তাংশু, শুচি, সৌরি, শনৈশ্চর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, স্কন্দ, বরুণ, যম, বৈদ্যুতাগ্নি, জঠরাগ্নি, ঐন্ধনাগ্নি, তেজঃপতি, ধর্ম্মধ্বজ, বেদকর্ত্তা, বেদাঙ্গ, বেদবাহন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, ক্ষপা, যাম, ক্ষণ, সম্বৎসরকর, অশ্বত্থ, কালচক্র, বিভাবসু, ব্যক্তাব্যক্ত, পুরুষ, শাশ্বতযোগী কালাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, বিশ্বকর্ম্মা, তমোনুদ, বরুণ, সাগর অংশ, জীমূত, জীবন, অরিহা, ভূতাশ্রয়, ভূতপতি, স্রষ্টা, সম্বর্ত্তক, বহ্নি, সর্ব্বাদি, অলোলুপ, অনন্ত, কপিল, ভানু, কামদ, জয়, বিশাল, বরদ, মন, সুপর্ণ, ভূতাদি, শীঘ্রগ, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, আদিদেব, দিতিসুত, দ্বাদশাক্ষর, অরবিন্দাক্ষ, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিবিষ্টপ, দেহকর্ত্তা, প্রশান্তাত্মা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বতোমুখ, চরাচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা, ও মৈত্রেয়, স্বয়ম্ভূ ও অমিততেজা।"

তার পর আদিপর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ের অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তোত্র উদ্ধৃত করিতেছি:—

"হে অশ্বিনীকুমার! তোমরা সৃষ্টির প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলে; তোমরাই সর্ব্বভূত-প্রধান হিরণ্যগর্ভরূপে উৎপন্ন হইয়াছ, পরে তোমরাই সংসারে প্রপঞ্চস্বরূপে প্রকাশমান হইয়াছ। দেশকাল ও অবস্থাদ্বারা তোমাদিগের ইয়ত্তা করা যায় না; তোমরাই মায়া ও মায়ারূঢ় চৈতন্যরূপে দ্যোতমান আছ; তোমরা শরীরবৃক্ষে পক্ষিরূপে অবস্থান করিতেছ; তোমরা সৃষ্টির প্রক্রিয়ার পরমাণু সমষ্টি ও প্রকৃতির সহযোগিতার আবশ্যকতা রাখ না; তোমরা বাক্য ও মনের অগোচর; তোমরাই স্বীয়প্রকৃতি বিক্ষেপশক্তি দ্বারা নিখিলবিশ্বকে সুপ্রকাশ করিয়াছ।"

দুই শত একত্রিশ অধ্যায়ে, কার্ত্তিকেয়ের স্তোত্র এইরূপ :—

"তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি পরম পবিত্র; মন্ত্র সকল তোমারই স্তব করিয়া থাকে; তুমিই বিখ্যাত হুতাশন, তুমিই সংবৎসর, তুমিই ছয় ঋতু, মাস, অর্দ্ধ মাস, অয়ন ও

দিক্। হে [illegible]! তুমি সহস্রমুখ ও সহস্রবাহু; তুমি লোক সকলের পাতা, তুমি পরমপবিত্র হবি, তুমিই সুরাসুরগণের শুদ্ধিকর্ত্তা; তুমিই প্রচণ্ড প্রভু ও শত্রুগণের জেতা; তুমি সহস্রভূ; তুমি সহস্রভুজ ও সহস্রশীর্ষ; তুমি অনন্তরূপ, তুমি সহস্রপাত, তুমিই গুরুশক্তিধারী।"

তার পর আদিপর্ব্বে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের গরুড় স্তোত্রে—

"হে মহাভাগ পতগেশ্বর! তুমি ঋষি, তুমি দেব, তুমি প্রভু, তুমি সূর্য্য, তুমি প্রজাপতি, তুমি ব্রহ্মা, তুমি ইন্দ্র, তুমি হয়গ্রীব, তুমি শর, তুমি জগৎপতি, তুমি সুখ, তুমি দুঃখ, তুমি বিপ্র, তুমি অগ্নি, তুমি পবন, তুমি ধাতা, তুমি বিধাতা, তুমি বিষ্ণু, তুমি অমৃত, তুমি মহৎযশঃ, তুমি প্রভা, তুমি আমাদিগের পবিত্র স্থান, তুমি বল, তুমি সাধু, তুমি মহাত্মা, তুমি সমৃদ্ধিমান্, তুমি অন্তক, তুমি স্থিরাস্থির সমস্ত পদার্থ, তুমি অতি দুঃসহ, তুমি উত্তম, তুমি চরাচর স্বরূপ, হে প্রভূতকীর্ত্তি গরুড়! ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তোমা হইতেই ঘটিতেছে, তুমি স্বকীয় প্রভাপুঞ্জে সূর্য্যের তেজোরাশি সমাক্ষিপ্ত করিতেছে, হে হুতাশনপ্রভ! তুমি কোপাবিষ্ট দিবাকরের ন্যায় প্রজা সকলকে দগ্ধ করিতেছ, তুমি সর্ব্বসংহারে উদ্যত যুগান্ত বায়ুর ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়াছ। আমরা মহাবলপরাক্রান্ত বিদ্যুৎসমানকান্তি, গগনবিহারী, অমিত-পরাক্রমশালী, খড়্গচূড়ামণি, গরুড়ের শরণ লইলাম।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং শিব সম্বন্ধে এইরূপ স্তোত্রের এতই বাহুল্য পুরাণাদিতে আছে যে, তাহার উদাহরণ দিবার প্রয়োজন হইতেছে না, এক্ষণে আমরা সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ করি—

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং॥ গীতা ৯। ২৩।

অর্থাৎ ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই। যে অন্য দেবতাকে ভজনা করে সে অবিধি-পূর্ব্বক ঈশ্বরকেই ভজনা করে।—'প্রচার', ২য় বর্ষ, পৃ., ২৭৪-৭৮।

সম্পাদকের নিবেদন

"দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম" বঙ্কিমচন্দ্রের একটি অসম্পূর্ণ রচনা—'প্রচার'-এর প্রথম দুই বৎসরের কয়েকটি সংখ্যায় প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমের মৃত্যুর প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর পরে পর্যন্ত প্রবন্ধগুলি বাঙালী পাঠকসমাজের অগোচর থেকে গিয়েছিল; বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ সনে সজনীকান্ত দাস মহাশয় এগুলির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণেই এই নিবন্ধগুলি সর্বপ্রথম বর্তমান নামে পুস্তকাকারে সংকলিত হয়।

—সম্পাদক, ব. র. স.

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা

জীবনী

দীনবন্ধুর জীবনচরিত লিখিবার এখনও সময় হয় নাই। কোন ব্যক্তির জীবনের ঘটনাপরম্পরার বিবৃতিমাত্র জীবনচরিতের উদ্দেশ্য নহে। কিয়ৎ-পরিমাণে তাহাও উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু যিনি সম্প্রতি মাত্র অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধীয় প্রকৃত ঘটনা সকল বিবৃত করিতে হইলে, এমন অনেক কথা বলিতে হয় যে, তাহাতে জীবিত লোক লিপ্ত। কখন কোন জীবিত ব্যক্তির নিন্দা করিবার প্রয়োজন ঘটে; কখন জীবিত ব্যক্তিদিগের অন্য প্রকার পীড়াদায়ক কথা বলিবার প্রয়োজন হয়; কখন কখন গুহ্য কথা ব্যক্ত করিতে হয়, তাহা কাহারও না কাহারও পীড়াদায়ক হয়। আর, একজনের জীবনবৃত্তান্ত অবগত হইয়া অন্য ব্যক্তি শিক্ষা প্রাপ্ত হউক,—ইহা যদি জীবনচরিত-প্রণয়নের যথার্থ উদ্দেশ্য হয়, তবে বর্ণনীয় ব্যক্তির দোষ গুণ উভয়েরই সবিস্তর বর্ণনা করিতে হয়। দোষশূন্য মনুষ্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই;—দীনবন্ধুরও যে কোন দোষ ছিল না, ইহা কোন্ সাহসে বলিব? যে কারণেই হউক, এক্ষণে তাঁহার জীবনচরিত লিখিতব্য নহে।

আর লিখিবার তাদৃশ প্রয়োজনও নাই। এই বঙ্গদেশে দীনবন্ধুকে না চিনিত কে? কাহার সঙ্গে তাঁহার আলাপ ও সৌহার্দ্দ ছিল না? দীনবন্ধু যে প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা কে না জানে? সুতরাং জানাইবার তত আবশ্যকতা নাই।

এই সকল কারণে, আমি এক্ষণে দীনবন্ধুর প্রকৃত জীবনচরিত লিখিব না। যাহা লিখিব, তাহা পক্ষপাত-শূন্য হইয়া লিখিতে যত্ন করিব। দীনবন্ধুর স্নেহ-ঋণে আমি ঋণী, কিন্তু তাই বলিয়া আমি মিথ্যা প্রশংসার দ্বারা সে ঋণ পরিশোধ করিবার যত্ন করিব না।

পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের কাঁচরাপাড়া ষ্টেশনের কয় ক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে চৌবেড়িয়া নামে গ্রাম আছে। যমুনা নামে ক্ষুদ্র নদী এই গ্রামকে প্রায় চারি দিকে বেষ্টন করিয়াছে; এই জন্য ইহার নাম চৌবেড়িয়া। সেই গ্রাম দীনবন্ধুর জন্মভূমি। এ গ্রাম নদীয়া জেলার অন্তর্গত। বাঙ্গালা সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে নদীয়া জেলার বিশেষ গৌরব আছে, দীনবন্ধুর নাম নদীয়ার আর একটি গৌরবের স্থল।

সন ১২৩৮ শালে দীনবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কালাচাঁদ মিত্রের পুত্র। তাঁহার বাল্যকাল-সম্বন্ধীয় কথা অধিক বলিবার নাই। দীনবন্ধু অল্পবয়সে কলিকাতায় আসিয়া, হেয়ার স্কুলে ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ করেন। সেই বিদ্যালয়ে থাকিতে থাকিতেই তিনি বাঙ্গালা রচনা আরম্ভ করেন।

সেই সময় তিনি প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট পরিচিত হয়েন। বাঙ্গালা সাহিত্যের তখনই বড় দুরবস্থা। তখন প্রভাকর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংবাদ-পত্র। ঈশ্বর

গুপ্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর একাধিপত্য করিতেন। বালকগণ তাঁহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ব্যগ্র হইত। ঈশ্বর গুপ্ত তরুণবয়স্ক লেখকদিগকে উৎসাহ দিতে বিশেষ সমুৎসুক ছিলেন। হিন্দু পেট্রিয়ট যথার্থই বলিয়াছিলেন, আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে অনেকে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল কত দূর স্থায়ী বা বাঞ্ছনীয় হইয়াছে তাহা বলা যায় না। দীনবন্ধু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লেখকের ন্যায় এই ক্ষুদ্র লেখকও ঈশ্বর গুপ্তের নিকট ঋণী। সুতরাং ঈশ্বর গুপ্তের কোন অপ্রশংসার কথা লিখিয়া আপনাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক নহি। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না যে, এক্ষণকার পরিমাণ ধরিতে গেলে, ঈশ্বর গুপ্তের রুচি তাদৃশ বিশুদ্ধ বা উন্নত ছিল না, বলিতে হইবে। তাঁহার শিষ্যেরা অনেকেই তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া অন্য পথে গমন করিয়াছেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনামধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কেবল দীনবন্ধুতেই কিয়ৎ-পরিমাণে তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন পাওয়া যায়।

"এলোচুলে বেণে বউ আল্‌তা দিয়ে পায়,
নলক নাকে, কলসী কাঁকে, জল আন্‌তে যায়।"

ইত্যাকার কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তকে স্মরণ হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যে চারি জন রহস্যপটু লেখকের নাম করা যাইতে পারে,—টেকচাঁদ, হুতোম, ঈশ্বর গুপ্ত এবং দীনবন্ধু। সহজেই বুঝা যায়, যে, ইহার মধ্যে দ্বিতীয় প্রথমের শিষ্য এবং চতুর্থ তৃতীয়ের শিষ্য। টেকচাঁদের সহিত হুতোমের যত দূর সাদৃশ্য, ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে দীনবন্ধুর তত দূর সাদৃশ্য না থাকুক, অনেক দূর ছিল। প্রভেদ এই যে, ঈশ্বর গুপ্তের লেখায় ব্যঙ্গ (wit) প্রধান; দীনবন্ধুর লেখায় হাস্য প্রধান। কিন্তু ব্যঙ্গ এবং হাস্য উভয়বিধ রচনায় দুই জনেই পটু ছিলেন,—তুল্য পটু ছিলেন না। হাস্যরসে ঈশ্বর গুপ্ত দীনবন্ধুর সমকক্ষ নহেন।

আমি যতদূর জানি, দীনবন্ধুর প্রথম রচনা "মানব-চরিত্র"-নামক একটি কবিতা। ঈশ্বর গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত "সাধুরঞ্জন"-নামক সাপ্তাহিক পত্রে উহা প্রকাশিত হয়। অতি অল্প বয়সের লেখা, এজন্য ঐ কবিতায় অনুপ্রাসের অত্যন্ত আড়ম্বর। ইহাও, বোধ হয়, ঈশ্বর গুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল। অন্যে ঐ কবিতা পাঠ করিয়া কিরূপ বোধ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না, কিন্তু উহা আমাকে অত্যন্ত মোহিত করিয়াছিল। আমি ঐ কবিতা আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম এবং যত দিন সেই সংখ্যার সাধুরঞ্জন-খানি জীর্ণগলিত না হইয়াছিল, তত দিন উহাকে ত্যাগ করি নাই। সে প্রায় সাতাইশ বৎসর হইল; এই কাল মধ্যে ঐ কবিতা আর কখন দেখি নাই; কিন্তু ঐ কবিতা আমাকে এমনই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল যে, অদ্যাপি তাহার কোন কোন অংশ স্মরণ করিয়া বলিতে পারি। পাঠকগণের ঐ কবিতা দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা নাই, কেন না উহা কখন পুনর্মুদ্রিত হয় নাই। অনেকেই দীনবন্ধুর প্রথম রচনার দুই এক পঙ্‌ক্তি শুনিলেও প্রীত হইতে পারেন; এজন্য স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া ঐ কবিতা হইতে দুই পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিলাম। উহার আরম্ভ এইরূপ—

মানব-চরিত্র-ক্ষেত্রে নেত্র নিক্ষেপিয়া।
দুঃখানলে দহে দেহ, বিদরয়ে হিয়া।

একটি কবিতা এই

যে দোষে সরস হয় সে জনে সরস।
যে দোষে বিরস হয় সে জনে বিরস ॥

আর একটি

যে নয়নে রেণু অণু অসি অনুমান।
বায়সে হানিবে তায় তীক্ষ্ণ চঞ্চু-বাণ ॥
ইত্যাদি।

সেই অবধি, দীনবন্ধু মধ্যে মধ্যে প্রভাকরে কবিতা লিখিতেন। তাঁহার প্রণীত কবিতা সকল পাঠক-সমাজে আদৃত হইত। তিনি সেই তরুণ বয়সে যে কবিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহার অসাধারণ "সুরধুনী" কাব্য এবং "দ্বাদশ কবিতা" সেই পরিচয়ানুরূপ হয় নাই। তিনি দুই বৎসর, জামাই-ষষ্ঠীর সময়ে "জামাই-ষষ্ঠী" নামে দুইটি কবিতা লেখেন। এই দুইটি কবিতা বিশেষ প্রশংসিত এবং আগ্রহাতিশয্যের সহিত পঠিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরের "জামাইষষ্ঠী" যে সংখ্যক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, তাহা পুনর্মুদ্রিত করিতে হইয়াছিল। সেই সকল কবিতা যেরূপ প্রশংসিত হইয়াছিল, "সুরধুনী" কাব্য এবং "দ্বাদশ কবিতা" সেরূপ প্রশংসিত হয় নাই। তাহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। হাস্যরসে দীনবন্ধুর অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল। "জামাই-ষষ্ঠী"তে হাস্যরস প্রধান। সুরধুনী কাব্যে ও দ্বাদশ কবিতায় হাস্যরসের আশ্রয় মাত্র নাই। প্রভাকরে দীনবন্ধু যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহা পুনর্মুদ্রিত হইলে বিশেষরূপে আদৃত হইবার সম্ভাবনা।

আমরা দেখিয়াছি, কোন কোন সংবাদপত্রে "কালেজীয় কবিতাযুদ্ধে"র উল্লেখ হইয়াছে। তাহাতে গৌরবের কথা কিছু নাই, সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলিব না। তরুণ বয়সে গালি দিতে কিছু ভাল লাগে; বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রায় পরস্পরকে গালি দিয়া থাকে। দীনবন্ধু চিরকাল রহস্যপ্রিয়, এজন্য এটি ঘটিয়াছিল।

দীনবন্ধু প্রভাকরে "বিজয়-কামিনী" নামে একটি ক্ষুদ্র উপাখ্যান কাব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। নায়কের নাম বিজয়, নায়িকার নাম কামিনী। তাহার, বোধ হয়, দশ বার বৎসর পরে "নবীন তপস্বিনী" লিখিত হয়। "নবীন তপস্বিনী"র নায়কের নামও বিজয়, নায়িকাও কামিনী। চরিত্রগত, উপাখ্যান কাব্য ও নাটকের নায়ক নায়িকার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। এই ক্ষুদ্র উপাখ্যান-কাব্যখানি সুন্দর হইয়াছিল।

দীনবন্ধু হেয়ারের স্কুল হইতে হিন্দু কালেজে যান, এবং তথায় ছাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়া কয় বৎসর অধ্যয়ন করেন। তিনি কালেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য ছিলেন।

দীনবন্ধুর পাঠাবস্থার কথা আমি বিশেষ জানি না, তৎকালে তাঁহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না।

বোধ হয় ১৮৫৫ সালে, দীনবন্ধু কালেজ পরিত্যাগ করিয়া, ১৫০৲ বেতনে পাটনার পোষ্টমাষ্টারের পদ গ্রহণ করেন। ঐ কর্ম্মে তিনি ছয় মাস নিযুক্ত থাকিয়া সুখ্যাতি

লাভ করেন। দেড় বৎসর পরেই তাঁহার পদবৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি উড়িষ্যা বিভাগের ইন্‌স্পেক্‌টিং পোষ্টমাষ্টার হইয়া যান। পদবৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু তখন বেতনবৃদ্ধি হইল না; পরে হইয়াছিল।

এক্ষণে মনে হয়, দীনবন্ধু চিরদিন দেড় শত টাকার পোষ্টমাষ্টার থাকিতেন, সেও ভাল ছিল, তাঁহার ইন্‌স্পেক্‌টিং পোষ্টমাষ্টার হওয়া মঙ্গলের বিষয় হয় নাই। পূর্ব্বে এই পদের কার্য্যের এই নিয়ম ছিল, যে, ইঁহাদিগকে অবিরত নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া পোষ্ট আপিসের কার্য্য সকলের তত্ত্বাবধারণ করিতে হইবে। এক্ষণে ইঁহারা ছয় মাস হেডকোয়ার্টারে স্থায়ী হইতে পারেন। পূর্ব্বে সে নিয়ম ছিল না। সংবৎসরই ভ্রমণ করিতে হইত। কোন স্থানে এক দিন, কোন স্থানে দুই দিন, কোন স্থানে তিন দিন—এইরূপ কাল মাত্র অবস্থিতি। বৎসর বৎসর ক্রমাগত এইরূপ পরিশ্রমে লৌহের শরীরও ভগ্ন হইয়া যায়। নিয়ত আবর্ত্তনে লোহার চক্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। দীনবন্ধুর শরীরে আর সে পরিশ্রম সহিল না; বঙ্গদেশের দুরদৃষ্টবশতঃই তিনি ইন্‌স্পেক্‌টিং পোষ্টমাষ্টার হইয়াছিলেন।

ইহাতে আমাদের মূলধন নষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু কিছু লাভ হয় নাই এমত নহে। উপহাসনিপুণ লেখকের একটি বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন। নানা প্রকার মনুষ্যের চরিত্রের পর্য্যালোচনাতেই সেই শিক্ষা পাওয়া যায়। দীনবন্ধু নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া নানাবিধ চরিত্রের মনুষ্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তজ্জনিত শিক্ষার গুণে তিনি নানাবিধ রহস্যজনক চরিত্রসৃজনে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত নাটক সকলে যেরূপ চরিত্রবৈচিত্র্য আছে, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে বিরল।

উড়িষ্যা বিভাগ হইতে দীনবন্ধু নদীয়া বিভাগে প্রেরিত হয়েন, এবং তথা হইতে ঢাকা বিভাগে গমন করেন। এই সময়ে নীলবিষয়ক গোলযোগ উপস্থিত হয়। দীনবন্ধু নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে "নীল-দর্পণ" প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় প্রজাগণকে অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ করিলেন।

দীনবন্ধু বিলক্ষণ জানিতেন যে, তিনি যে নীল-দর্পণের প্রণেতা, এ কথা ব্যক্ত হইলে, তাঁহার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। যে সকল ইংরেজের অধীন হইয়া তিনি কর্ম্ম করিতেন, তাহারা নীলকরের সুহৃদ। বিশেষ, পোষ্ট আপিসের কার্য্যে নীলকর প্রভৃতি অনেক ইংরেজের সংস্পর্শে সর্ব্বদা আসিতে হয়। তাহারা শত্রুতা করিলে বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারুক না পারুক, সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন করিতে পারে; এ সকল জানিয়াও দীনবন্ধু নীল-দর্পণ-প্রচারে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। নীল-দর্পণে গ্রন্থকারের নাম ছিল না বটে, কিন্তু গ্রন্থকারের নাম গোপন করিবার জন্য দীনবন্ধু অন্য কোন প্রকার যত্ন করেন নাই। নীল-দর্পণ-প্রচারের পরেই বঙ্গদেশের সকল লোকেই কোন প্রকারে না কোন প্রকারে জানিয়াছিল যে, দীনবন্ধু ইহার প্রণেতা।

দীনবন্ধু পরের দুঃখে নিতান্ত কাতর হইতেন, নীল-দর্পণ এই গুণের ফল। তিনি বঙ্গদেশের প্রজাগণের দুঃখ সহৃদয়তার সহিত সম্পূর্ণরূপে অনুভূত করিয়াছিলেন বলিয়াই নীল-দর্পণ প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছিল। যে সকল মনুষ্য পরের দুঃখে কাতর হন,

দীনবন্ধু তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের অসাধারণ গুণ এই ছিল, যে, যাহার দুঃখ, সে যেরূপ কাতর হইত, দীনবন্ধু তদ্রূপ বা ততোধিক কাতর হইতেন। ইহার একটি অপূর্ব্ব উদাহরণ আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একদা তিনি যশোহরে আমার বাসায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাত্রে তাঁহার কোন বন্ধুর কোন উৎকট পীড়ার উপক্রম হইল। যিনি পীড়ার আশঙ্কা করিতেছিলেন, তিনি দীনবন্ধুকে জাগরিত করিলেন, এবং পীড়ার আশঙ্কা জানাইলেন। শুনিয়া দীনবন্ধু মূর্চ্ছিত হইলেন। যিনি স্বয়ং পীড়িত বলিয়া সাহায্যার্থ দীনবন্ধুকে জাগাইয়াছিলেন, তিনিই আবার দীনবন্ধুর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। সেই দিন জানিয়াছিলাম, যে, অন্য যাহার যে গুণ থাকুক, পরের দুঃখে দীনবন্ধুর ন্যায় কেহ কাতর হয় না। সেই গুণের ফল নীল-দর্পণ।

নীল-দর্পণ ইংরেজিতে অনুবাদিত হইয়া ইংলণ্ডে যায়। লং সাহেব তৎপ্রচারের জন্য সুপ্রীম কোর্টের বিচারে দণ্ডনীয় হইয়া কারাবদ্ধ হয়েন। সীটনকার সাহেব তৎপ্রচার-জন্য অপদস্থ হইয়াছিলেন। এ সকল বৃত্তান্ত সকলেই অবগত আছেন।

এই গ্রন্থের নিমিত্ত লং সাহেব কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই হউক, অথবা ইহার কোন বিশেষ গুণ থাকার নিমিত্তই হউক, নীল-দর্পণ ইউরোপের অনেক ভাষায় অনুবাদিত ও পঠিত হইয়াছিল। এই সৌভাগ্য বাঙ্গালায় আর কোন গ্রন্থেরই ঘটে নাই। গ্রন্থের সৌভাগ্য যতই হউক, কিন্তু যে যে ব্যক্তি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, প্রায় তাঁহারা সকলেই কিছু কিছু বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইহার প্রচার করিয়া লং সাহেব কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন; সীটনকার অপদস্থ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরেজি অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি শেষে তাঁহার জীবননির্ব্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকুরি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গ্রন্থকর্ত্তা নিজে কারাবদ্ধ কি কর্ম্মচ্যুত হয়েন নাই বটে, কিন্তু তিনি ততোধিক বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন। এক দিন রাত্রে নীল-দর্পণ লিখিতে লিখিতে দীনবন্ধু মেঘনা পার হইতেছিলেন। কূল হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে গেলে নৌকা হঠাৎ জলমগ্ন হইতে লাগিল। দাঁড়ী মাঝি সকলেই সন্তরণ আরম্ভ করিল; দীনবন্ধু তাহাতে অক্ষম। দীনবন্ধু নীল-দর্পণ হস্তে করিয়া জলমজ্জনোন্মুখ নৌকায় নিস্তব্ধে বসিয়া রহিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ একজন সন্তরণকারীর পদ মৃত্তিকা স্পর্শ করিলে সে সকলকে ডাকিয়া বলিল, "ভয় নাই, এখানে জল অল্প, নিকটে অবশ্য চর আছে।" বাস্তব নিকটে চর ছিল, তথায় নৌকা আনীত হইয়া চরলগ্ন হইলে দীনবন্ধু উঠিয়া নৌকার ছাদের উপর বসিয়া রহিলেন। তখনও সেই আর্দ্র নীল-দর্পণ, তাঁহার হস্তে রহিয়াছে। এই সময় মেঘনায় ভাঁটা বহিতেছিল, সত্বরেই জোয়ার আসিয়া এই চর ডুবিয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে এই জলপূর্ণ ভগ্ন তরি ভাসিয়া যাইবে, তখন জীবনরক্ষার উপায় কি হইবে, এই ভাবনা দাঁড়ী, মাঝি সকলেই ভাবিতেছিল, দীনবন্ধুও ভাবিতে-ছিলেন। তখন রাত্রি গভীর, আবার ঘোর অন্ধকার, চারি দিকে বেগবতীর বিষম স্রোতধ্বনি, কচিৎ মধ্যে মধ্যে নিশাচর পক্ষীদিগের চীৎকার। জীবনরক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া দীনবন্ধু একেবারে নিরাশ্বাস হইতেছিলেন, এমত সময়ে দূরে দাঁড়ের

শব্দ শুনা গেল। সকলেই উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ ডাকিবায় দূরবর্ত্তী নৌকারোহীরা উত্তর দিল, এবং সত্বরে আসিয়া দীনবন্ধু ও তৎসমভিব্যাহারীদিগের উদ্ধার করিল।

ঢাকা বিভাগ হইতে, দীনবন্ধু পুনর্ব্বার নদীয়া প্রত্যাগমন করেন। ফলতঃ নদীয়ার বিভাগেই তিনি অধিক কাল নিযুক্ত ছিলেন; বিশেষ কার্য্য-নির্ব্বাহ জন্য তিনি ঢাকা বা অন্যত্র প্রেরিত হইতেন।

ঢাকা বিভাগ হইতে প্রত্যাগমন-পরে দীনবন্ধু "নবীন তপস্বিনী" প্রণয়ন করেন। উহা কৃষ্ণনগরে মুদ্রিত হয়। ঐ মুদ্রাযন্ত্রটি দীনবন্ধু প্রভৃতি কয়েক জন কৃতবিদ্যের উদ্যোগে স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু স্থায়ী হয় নাই।

দীনবন্ধু নদীয়া বিভাগ হইতে পুনর্ব্বার ঢাকা বিভাগে প্রেরিত হয়েন। আবার ফিরিয়া আসিয়া উড়িষ্যা বিভাগে প্রেরিত হয়েন। পুনর্ব্বার নদীয়া বিভাগে আইসেন। কৃষ্ণনগরেই তিনি অধিক কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সেখানে একটি বাড়ী কিনিয়াছিলেন। সন ১৮৬৯ সালের শেষে বা সন ১৮৭০ সালের প্রথমে তিনি কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ করিয়া, কলিকাতায় সুপরনিউমররি ইন্‌স্পেক্‌টিং পোষ্টমাষ্টার নিযুক্ত হইয়া আইসেন। পোষ্টমাষ্টার জেনেরলের সাহায্যই এ পদের কার্য্য। দীনবন্ধুর সাহায্যে পোষ্ট আপিসের কার্য্য কয় বৎসর অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে লাগিল। ১৮৭১ সালে দীনবন্ধু লুশাই যুদ্ধের ডাকের বন্দোবস্ত করিবার জন্য কাছাড় গমন করেন। তথায় সেই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অল্পকালমধ্যে প্রত্যাগমন করেন।

কলিকাতায় অবস্থিতিকালে, তিনি "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই উপাধি যিনি প্রাপ্ত হয়েন, তিনি আপনাকে কত দূর কৃতার্থ মনে করেন বলিতে পারি না। দীনবন্ধুর অদৃষ্টে ঐ পুরস্কার ভিন্ন আর কিছু ঘটে নাই। কেন না, দীনবন্ধু বাঙ্গালি-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম শ্রেণীর বেতন পাইতেন বটে, কিন্তু কালসাহায্যে প্রথম শ্রেণীর বেতন চতুষ্পদ জন্তুদিগেরও প্রাপ্য হইয়া থাকে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রথম-শ্রেণীভুক্ত গর্দ্দভ দেখা যায়।

দীনবন্ধু এবং সূর্য্যনারায়ণ এই দুই জন পোষ্টাল বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুদক্ষ বলিয়া গণ্য ছিলেন। সূর্য্যনারায়ণ বাবু আসামের কার্য্যের গুরু ভার লইয়া তথায় অবস্থান করিতেন; অন্য যেখানে কোন কঠিন কার্য্য পড়িত, দীনবন্ধু সেইখানেই প্রেরিত হইতেন। এইরূপ কার্য্যে ঢাকা, উড়িষ্যা, উত্তর পশ্চিম, দারজিলিঙ্গ, কাছাড় প্রভৃতি স্থানে সর্ব্বদা যাইতেন। এইরূপে, তিনি বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার প্রায় সর্ব্ব স্থানেই গমন করিয়াছিলেন, বেহারেরও অনেক স্থান দেখিয়াছিলেন। পোষ্টাল বিভাগের যে পরিশ্রমের ভাগ তাহা তাঁহার ছিল, পুরস্কারের ভাগ অন্যের কপালে ঘটিল।

দীনবন্ধুর যেরূপ কার্য্যদক্ষতা এবং বহুদর্শিতা ছিল, তাহাতে তিনি যদি বাঙ্গালী না হইতেন, তাহা হইলে মৃত্যুর অনেক দিন পূর্ব্বেই তিনি পোষ্টমাষ্টার জেনেরল হইতেন, এবং কালে ডাইরেক্টর জেনেরল হইতে পারিতেন। কিন্তু যেমন শতবার ধৌত করিলে অঙ্গারের মালিন্য যায় না, তেমনি কাহারও কাহারও কাছে সহস্র গুণ থাকিলেও কৃষ্ণবর্ণের দোষ যায় না। Charity যেমন সহস্র দোষ ঢাকিয়া রাখে, কৃষ্ণচর্ম্মে তেমনি সহস্র গুণ ঢাকিয়া রাখে।

পুরস্কার দূরে থাকুক, শেষাবস্থায় দীনবন্ধু লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পোষ্টমাষ্টার জেনেরল এবং ডাইরেক্টর জেনেরলে বিবাদ উপস্থিত হইল। দীনবন্ধুর অপরাধ, তিনি পোস্টমাষ্টার জেনেরলের সাহায্য করিতেন। এজন্য তিনি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত হইলেন। প্রথম কিছু দিন রেলওয়ের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার পরে হাবড়া ডিবিজনে নিযুক্ত হয়েন। সেই শেষ পরিবর্ত্তন।

শ্রমাধিক্যে অনেক দিন হইতে দীনবন্ধু উৎকোটরোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, বহুমূত্র রোগ প্রায় সাংঘাতিক হয়। সে কথা সত্য কি না বলা যায় না, কিন্তু ইদানীং মনে করিয়াছিলাম যে, দীনবন্ধু বুঝি রোগের হাত হইতে মুক্তি পাইবেন। রোগাক্রান্ত হইয়া অবধি দীনবন্ধু অতি সাবধান, এবং অবিহিতাচারবর্জ্জিত হইয়াছিলেন। অতি অল্প পরিমাণে অহিফেন সেবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতে রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইয়াছে বলিতেন। পরে সন ১২৮০ সালের আশ্বিন মাসে অকস্মাৎ বিস্ফোটককর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর বৃত্তান্ত সকলে অবগত আছেন। বিস্তারিত লেখার আবশ্যক নাই। লিখিতেও পারি না। যদি মনুষ্যের প্রার্থনা সফল হইবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে প্রার্থনা করিতাম যে, এরূপ সুহৃদের মৃত্যুর কথা কাহাকেও যেন লিখিতে না হয়।

নবীন তপস্বিনীর পর "বিয়েপাগলা বুড়ো" প্রচার হয়। দীনবন্ধুর অনেকগুলিন গ্রন্থ প্রকৃত-ঘটনা-মূলক এবং অনেক জীবিত ব্যক্তির চরিত্র তাঁহার প্রণীত চরিত্রে অনুকৃত হইয়াছে। "নীল-দর্পণে"র অনেকগুলি ঘটনা প্রকৃত; "নবীন তপস্বিনী"র বড় রাণী ছোট রাণীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। "সধবার একাদশী"র প্রায় সকল নায়ক-নায়িকাগুলিন জীবিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি; তদ্বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে কিয়দংশ প্রকৃত ঘটনা। "জামাই-বারিকে"র দুই স্ত্রীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। "বিয়েপাগলা বুড়ো"ও জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল।

প্রকৃত ঘটনা, জীবিত ব্যক্তির চরিত্র, প্রাচীন উপন্যাস, ইংরেজি গ্রন্থ এবং "প্রচলিত খোসগল্প" হইতে সারাদান করিয়া দীনবন্ধু তাঁহার অপূর্ব্ব চিত্তরঞ্জক নাটক সকলের সৃষ্টি করিতেন। নবীন তপস্বিনীতে ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজা রমণীমোহনের বৃত্তান্ত কতক প্রকৃত। হোঁদলকুঁৎকুঁতের ব্যাপার প্রাচীন-উপন্যাসমূলক; "জলধর" "জগদম্বা" "Merry Wives of Windsor" হইতে নীত।

বাঙ্গালি-পাঠক-মধ্যে নিতান্ত অশিক্ষিত অনেক আছেন। তাঁহারা ভাবিবেন, যদি দীনবন্ধুর গ্রন্থের মূল প্রাচীন উপন্যাসে, ইংরেজি গ্রন্থে বা প্রচলিত গল্পে আছে, তবে আর তাঁহার গ্রন্থের প্রশংসা কি? তাঁহারা ভাবিবেন, আমি দীনবন্ধুর অপ্রশংসা করিতেছি। এ সম্প্রদায়ের পাঠকদিগকে কোন কথা বুঝাইয়া বলিতে আমি অনিচ্ছুক, কেন না, জলে আল্পিনা সম্ভবে না। সেক্ষপীয়রের প্রায় এমন নাটক নাই যাহা কোন প্রাচীনতর-গ্রন্থমূলক নহে। স্কটের অনেকগুলি উপন্যাস প্রাচীন কথা বা প্রাচীন-গ্রন্থমূলক। মহাভারত রামায়ণের অনুকরণ। ইনিদ্, ইলিয়দের অনুকরণ। ইহার মধ্যে কোন্ গ্রন্থ অপ্রশংসনীয়?

"সধবার একাদশী" "বিয়েপাগলা বুড়ো"র পরে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু উহা

তৎপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। সধবার একাদশীর যেমন অসাধারণ গুণ আছে, তেমনি অনেক অসাধারণ দোষও আছে। এই প্রহসন বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত নহে, এই জন্য আমি দীনবন্ধুকে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, ইহার বিশেষ পরিবর্তন ব্যতীত প্রচার না হয়। কিছু দিন মাত্র এ অনুরোধ রক্ষা হইয়াছিল। অনেকে বলিবেন, এ অনুরোধ রক্ষা হয় নাই ভালই হইয়াছে, আমরা "নিমচাঁদ"কে দেখিতে পাইয়াছি। অনেক ইহার বিপরীত বলিবেন।

"লীলাবতী" বিশেষ যত্নের সহিত রচিত, এবং দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকাপেক্ষ ইহাতে দোষ অল্প। এই সময়কে দীনবন্ধুর কবিত্বসূর্য্যের মধ্যাহ্নকাল বলা যাইতে পারে। ইহার পর হইতে কিঞ্চিৎ তেজঃক্ষতি দেখা যায়। এরূপ উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়। স্কট প্রথমে পদ্যগ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রথম তিনখানি কাব্য অত্যুৎকৃষ্ট হয়, "Lady of the Lake" নামক কাব্যের পর আর তেমন হইল না। দেখিয়া, স্কট পদ্য লেখা ত্যাগ করিলেন, গদ্যকাব্য লিখিতে আরম্ভ করিলেন। গদ্যকাব্য-লেখক বলিয়া স্কটের যে যশ, তাহার মূল প্রথম পনের বা ষোলখানি নবেল। "Kenilworth" নামক গ্রন্থের পর স্কটের আর কোন উপন্যাস প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য হয় নাই। মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রের সঙ্গে সন্ধ্যাকালীন ক্ষীণালোকের সে সম্বন্ধ "Ivanhoe" এবং "Kenilworth" প্রভৃতির সঙ্গে স্কটের শেষ দুইখানি গদ্য-কাব্যের সেই সম্বন্ধ।

"লীলাবতী"র পর দীনবন্ধুর লেখনী কিছুকাল বিশ্রাম লাভ করিয়াছিল। সেই বিশ্রামের পর "সুরধুনী কাব্য" "জামাই-বারিক" এবং "দ্বাদশ কবিতা" অতি শীঘ্র শীঘ্র প্রকাশিত হয়। "সুরধুনী" কাব্য অনেক দিন পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। ইহার কিয়দংশ "বিয়েপাগলা বুড়ো"রও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। ইহাও প্রচার না হয়, আমি এমত অনুরোধ করিয়াছিলাম,—আমার বিবেচনায় ইহা দীনবন্ধুর লেখনীর যোগ্য হয় নাই। বোধ হয়, অন্যান্য বন্ধুগণও এইরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই জন্য ইহা অনেক দিন অপ্রকাশ ছিল।

দীনবন্ধুর মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে "কমলে কামিনী" প্রকাশিত হইয়াছিল। যখন ইহা সাধারণে প্রচারিত হয়, তখন তিনি রুগ্নশয্যায়।

আমি দীনবন্ধুর গ্রন্থ সকলের কোন সমালোচনা করিলাম না। গ্রন্থ-সমালোচনা এ প্রবন্ধে উদ্দিষ্ট নহে; সমালোচনার সময়ও নহে। দীনবন্ধু যে সুলেখক ছিলেন, ইহা সকলেই জানেন, আমাকে বলিতে হইবে না। তিনি যে অতি সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, তাহাও কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু দীনবন্ধুর একটি পরিচয়ের বাকি আছে। তাঁহার সরল, অকপট, স্নেহময় হৃদয়ের পরিচয় কি প্রকারে দিব? বঙ্গদেশে আজকাল গুণবান্ ব্যক্তির অভাব নাই, সুদক্ষ কর্ম্মচারীর অভাব নাই, সুলেখকেরও নিতান্ত অভাব নাই, কিন্তু দীনবন্ধুর অন্তঃকরণের মত অন্তঃকরণের অভাব বঙ্গদেশে কেন—মনুষ্যলোকে—চিরকাল থাকিবে। এ সংসারে ক্ষুদ্র কীট হইতে সম্রাট্ পর্য্যন্ত সকলেরই এক স্বভাব—অহঙ্কার, অভিমান, ক্রোধ, স্বার্থপরতা, কপটতায় পরিপূর্ণ। এমন সংসারে দীনবন্ধুর ন্যায় রত্নই ল্য রত্ন।

সে পরিচয় দিবারই বা প্রয়োজন কি? এই বঙ্গদেশে দীনবন্ধুকে কে বিশেষ না জানে? দারজিলিঙ্গ হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত, কাছাড় হইতে গঞ্জাম পর্য্যন্ত, ইহার মধ্যে কয়জন ভদ্রলোক দীনবন্ধুর বন্ধুমধ্যে গণ্য নহেন? কয়জন তাঁহার স্বভাবের পরিচয় না জানেন? কাহার নিকট পরিচয় দিতে হইবে?

দীনবন্ধু যেখানে না গিয়াছেন বাঙ্গালায় এমত স্থান অল্পই আছে। যেখানে গিয়াছেন সেইখানেই বন্ধু সংগ্রহ করিয়াছেন। যে তাঁহার আগমন-বার্ত্তা শুনিত, সেই তাঁহার সহিত আলাপের জন্য উৎসুক হইত। যে আলাপ করিত, সেই তাঁহার বন্ধু হইত। তাঁহার ন্যায় সুরসিক লোক বঙ্গভূমে এখন আর কেহ আছে কি না বলিতে পারি না। তিনি যে সভায় বসিতেন, সেই সভার জীবনস্বরূপ হইতেন। তাঁহার সরস, সুমিষ্ট কথোপকথনে সকলেই মুগ্ধ হইত। শ্রোতৃবর্গ, মর্ম্মের দুঃখ সকল ভুলিয়া গিয়া, তাঁহার সৃষ্ট হাস্যরস-সাগরে ভাসিত। তাহার প্রণীত গ্রন্থ সকল বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হাস্যরসের গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত হাস্যরসপটুতার শতাংশের পরিচয় তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায় না। হাস্যরসাবতারণায় তাঁহার যে পটুতা, তাহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কথোপকথনেই পাওয়া যাইত। অনেক সময়ে, তাঁহাকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ হাস্যরস বলিয়া বোধ হইত। দেখা গিয়াছে যে, অনেকে "আর হাসিতে পারি না" বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছেন। হাস্যরসে তিনি প্রকৃত ঐন্দ্রজালিক ছিলেন।

অনেক লোক আছে যে, নির্ব্বোধ অথচ অত্যন্ত আত্মাভিমানী। এরূপ লোকের পক্ষে দীনবন্ধু সাক্ষাৎ যম ছিলেন। কদাচ তাহাদিগের আত্মাভিমানের প্রতিবাদ করিতেন না, বরং সেই আগুনে সাধ্যমত বাতাস দিতেন। নির্ব্বোধ সেই বাতাসে উন্মত্ত হইয়া উঠিত। তখন তাহার রঙ্গভঙ্গ দেখিতেন। এরূপ লোক দীনবন্ধুর হাতে পড়িলে কোনরূপে নিষ্কৃতি পাইত না।

ইদানীং কয়েক বৎসর হইল, তাঁহার হাস্যরসপটুতা ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। প্রায় বৎসরাধিক হইল, এক দিন তাঁহার কোন বিশেষ বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "দীনবন্ধু, তোমার সে হাস্যরস কোথা গেল? তোমার রস শুখাইতেছে, তুমি আর অধিক কাল বাঁচিবে না।" দীনবন্ধু কেবলমাত্র উত্তর করিলেন, "কে বলিল?" কিন্তু পরক্ষণেই অন্যমনস্ক হইলেন। এক দিবস আমরা একত্রে রাত্রিযাপন করি। তাঁহার রস-উদ্দীপন-শক্তি শুখাইয়াছে কি না আপনি জানিবার নিমিত্ত একবার সেই রাত্রে চেষ্টা করিয়াছিলাম; সে চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই। রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত অনেকগুলি বন্ধুকে একেবারে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তখন জানিতাম না যে, সেই তাঁহার শেষ উদ্দীপন। তাহার পর আর কয়েক বার দিবারাত্রি একত্রে বাস করিয়াছি, কিন্তু এই রাত্রের ন্যায় আর তাঁহাকে আনন্দ-উৎফুল্ল দেখি নাই। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ক্রমে দুর্ব্বল হইতেছিল। তথাপি তাঁহার ব্যঙ্গশক্তি একেবারে নিস্তেজ হয় নাই। মৃত্যুশয্যায় পড়িয়াও তাহা ত্যাগ করেন নাই। অনেকেই জানেন যে, তাঁহার মৃত্যুর কারণ বিস্ফোটক, প্রথমে একটি পৃষ্ঠদেশে হয়, তাহার কিঞ্চিৎ উপশম হইলেই আর একটি পশ্চাৎভাগে হইল। তাহার পর শেষ আর একটি বামপদে

হইল। এই সময়ে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটি কার্য্যস্থান হইতে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। দীনবন্ধু অতি দূরবর্ত্তী মেঘের ক্ষীণ বিদ্যুতের ন্যায় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ফোঁড়া এখন আমার পায়ে ধরিয়াছে।"

মনুষ্যমাত্রেরই অহঙ্কার আছে;—দীনবন্ধুর ছিল না; মনুষ্যমাত্রেরই রাগ আছে;—দীনবন্ধুর ছিল না। দীনবন্ধুর কোন কথা আমার কাছে গোপন ছিল না, আমি কখন তাঁহার রাগ দেখি নাই। অনেক সময়ে তাঁহার ক্রোধাভাব দেখিয়া তাঁহাকে অনুযোগ করিয়াছি, তিনি রাগ করিতে পারিলেন না বলিয়া অপ্রতিভ হইয়াছেন। অথবা ক্রুদ্ধ হইবার জন্য যত্ন করিয়া, শেষে নিষ্ফল হইয়া বলিয়াছেন, "কই, রাগ যে হয় না।"

তাঁহার যে কিছু ক্রোধের চিহ্ন পাওয়া যায়, তাহা জামাই-বারিকের "ভোঁতারাম ভাটে"র উপরে। যেমন অনেকে দীনবন্ধুর গ্রন্থের প্রশংসা করিতেন, তেমনি কতকগুলি লোক তাঁহার গ্রন্থের নিন্দক ছিল। যেখানে যশ, সেইখানেই নিন্দা, সংসারের ইহা নিয়ম। পৃথিবীতে যিনি যশস্বী হইয়াছেন, তিনিই সম্প্রদায়বিশেষকর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছেন। ইহার অনেক কারণ আছে। প্রথম, দোষশূন্য মনুষ্য জন্মে না; যিনি বহুগুণবিশিষ্ট, তাঁহার দোষগুলি, গুণসান্নিধ্য হেতু, কিছু অধিকতর স্পষ্ট হয়, সুতরাং লোকে তৎকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়। দ্বিতীয়, গুণের সঙ্গে দোষের চিরবিরোধ, দোষযুক্ত ব্যক্তিগণ গুণশালী ব্যক্তির সুতরাং শত্রু হইয়া পড়ে। তৃতীয়, কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইলে কার্য্যের গতিকে অনেক শত্রু হয়; শত্রুগণ অন্য প্রকারে শত্রুতা সাধনে অসমর্থ হইলে নিন্দার দ্বারা শত্রুতা সাধে। চতুর্থ, অনেক মনুষ্যের স্বভাবই এই, প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দা করিতে ও শুনিতে ভালবাসে; সামান্য ব্যক্তির নিন্দার অপেক্ষা যশস্বী ব্যক্তির নিন্দা বক্তা ও শ্রোতার সুখদায়ক। পঞ্চম, ঈর্ষা মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; অনেকে পরের যশে অত্যন্ত কাতর হইয়া যশস্বীর নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই শ্রেণীর নিন্দকই অনেক, বিশেষ বঙ্গদেশে।

দীনবন্ধু স্বয়ং নির্ব্বিরোধ, নিরহঙ্কার, এবং ক্রোধশূন্য হইলেও এই সকল কারণে তাঁহার অনেকগুলি নিন্দক হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথমাবস্থায় কেহ তাঁহার নিন্দক ছিল না, কেন না, প্রথমাবস্থাতে তিনি তাদৃশ যশস্বী হয়েন নাই। যখন "নবীন তপস্বিনী" প্রচারের পর তাঁহার যশের মাত্রা পূর্ণ হইতে লাগিল, তখন নিন্দকশ্রেণী মাথা তুলিতে লাগিল। দীনবন্ধুর গ্রন্থে যথার্থই অনেক দোষ আছে,—কেহ কেহ কেবল সেই জন্যই নিন্দা করিতেন। তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই; তবে তাঁহারা যে দোষের ভাগের সঙ্গে গুণের ভাগ বিবেচনা করেন না, এই জন্যই তাঁহাদিগকে নিন্দক বলি।

অনেকে দীনবন্ধুর নিকট চাকরির উমেদারী করিয়া নিষ্ফল হইয়া সেই রাগে দীনবন্ধুর সমালোচক-শ্রেণী-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। এ শ্রেণীস্থ নিন্দকদিগের নিন্দায় দীনবন্ধু হাসিতেন,—নিম্ন শ্রেণীর সংবাদপত্রে তাঁহার সমুচিত ঘৃণা ছিল, ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু, "কলিকাতা রিবিউ"র ন্যায় পত্রে কোন নিন্দা দেখিলে তিনি ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত হইতেন। কলিকাতা রিবিউতে সুরধুনী কাব্যের যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা অন্যায় বোধ হয় না। দীনবন্ধু যে ইহাতে রাগ করিয়াছিলেন, ইহাই অন্যায়। "ভোঁতারাম ভাট" দীনবন্ধুর চরিত্রে ক্ষুদ্র কলঙ্ক।

ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতে পারে যে, দীনবন্ধু কখন একটিও অসৎ কার্য্য করেন নাই। তাঁহার স্বভাব তাদৃশ তেজস্বী ছিল না বটে, বন্ধুর অনুরোধ বা সংসর্গদোষে নিন্দনীয় কার্য্যের কিঞ্চিৎ সংস্পর্শ তিনি সকল সময়ে এড়াইতে পারিতেন না; কিন্তু যাহা অসৎ, যাহাতে পরের অনিষ্ট আছে, যাহা পাপের কার্য্য, এমত কার্য্য দীনবন্ধু কখনও করেন নাই। তিনি অনেক লোকের উপকার করিয়াছিলেন, তাঁহার অনুগ্রহে বিস্তর লোকের অন্নের সংস্থান হইয়াছে।

একটি দুর্লভ সুখ দীনবন্ধুর কপালে ঘটিয়াছিল। তিনি সাধ্বী স্নেহশালিনী পতি-পরায়ণা পত্নীর স্বামী ছিলেন। দীনবন্ধুর অল্পবয়সে বিবাহ হয় নাই। হুগলীর কিছু উত্তর বংশবাটী গ্রামে তাঁহার বিবাহ হয়। দীনবন্ধু চিরদিন গৃহসুখে সুখী ছিলেন। দম্পতি-কলহ কখন না কখন সকল ঘরেই হইয়া থাকে, কিন্তু কস্মিন্ কালে মুহূর্ত্ত নিমিত্ত ইঁহাদের কথান্তর হয় নাই। একবার কলহ করিবার নিমিত্ত দীনবন্ধু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা বৃথা হইয়াছিল। বিবাদ করিতে পারেন নাই। কলহ করিতে গিয়া তিনিই প্রথমে হাসিয়া ফেলেন, কি তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাগ দেখিয়া উপহাস দ্বারা বেদখল করেন, তাহা এক্ষণে আমার স্মরণ নাই।

দীনবন্ধু আটটি সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন।

দীনবন্ধু বন্ধুবর্গের প্রতি বিশেষ স্নেহবান্ ছিলেন। আমি ইহা বলিতে পারি যে, তাঁহার ন্যায় বন্ধুর প্রীতি সংসারের একটি প্রধান সুখ। যাঁহারা তাহা হারাইয়াছেন, তাঁহাদের দুঃখ বর্ণনীয় নহে।

কবিত্ব

যে বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয়, সেই বৎসর মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য" রহস্যসন্দর্ভে ['বিবিধার্থ-সংগ্রহে' ?] প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ইহাই মধুসূদনের প্রথম বাঙ্গালা কাব্য। তার পর-বৎসর দীনবন্ধুর প্রথম গ্রন্থ "নীল-দর্পণ" প্রকাশিত হয়।

সেই ১৮৫৯।৬০ সাল বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়—উহা নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরাণ দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ। দীনবন্ধু ইহাদের সন্ধিস্থল। বলিতে পারা যায় যে, ১৮৫৯।৬০ সালের মত দীনবন্ধুও বাঙ্গালা কাব্যের নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থল।

দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের একজন কাব্য-শিষ্য। ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্যশিষ্যদিগের মধ্যে দীনবন্ধু গুরুর যতটা কবি-স্বভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, এত আর কেহ নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসের যে অধিকার, তাহা গুরুর অনুকারী। বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে দীনবন্ধুর কবিতার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাও গুরুর অনুকারী। যে রুচির জন্য দীনবন্ধুকে অনেকে দুষিয়া থাকেন, সে রুচিও গুরুর।

কিন্তু কবিত্ব সম্বন্ধে গুরুর অপেক্ষা শিষ্যকে উচ্চ আসন দিতে হইবে। ইহা গুরুরও অগৌরবের কথা নহে। দীনবন্ধুর হাস্যরসে অধিকার যে ঈশ্বর গুপ্তের অনুকারী

বলিয়াছি, সে কথার তাৎপর্য্য এই যে, দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে এক জাতীয় ব্যঙ্গ-প্রণেতা ছিলেন। আগেকার দেশীয় ব্যঙ্গ-প্রণালী এক জাতীয় ছিল—এখন আর এক জাতীয় ব্যঙ্গে আমাদিগের ভালবাসা জন্মিতেছে। আগেকার লোক কিছু মোটা কাজ ভালবাসিত; এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ। আগেকার রসিক, লাঠিয়ালের ন্যায় মোটা লাঠি লইয়া সজোরে শত্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত। এখনকার রসিকেরা ডাক্তারের মত, সরু লান্‌সেটখানি বাহির করিয়া, কখন কুচ করিয়া ব্যথার স্থানে বসাইয়া দেন, কিছু জানিতে পারা যায় না, কিন্তু হৃদয়ের শোণিত ক্ষতমুখে বাহির হইয়া যায়। এখন ইংরেজ-শাসিত সমাজে ডাক্তারের শ্রীবৃদ্ধি—লাঠিয়ালের বড় দুরবস্থা। সাহিত্য সমাজে লাঠিয়াল আর নাই, এমন নহে—দুর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যায় কিছু বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহাদের লাঠি ঘুণে ধরা, বাহুতে বল নাই, তাহারা লাঠির ভয়ে কাতর, শিক্ষা নাই, কোথায় মারিতে কোথায় মারে। লোক হাসায় বটে, কিন্তু হাস্যের পাত্র তাহারা স্বয়ং। ঈশ্বর গুপ্ত বা দীনবন্ধু এ জাতীয় লাঠিয়াল ছিলেন না। তাঁহাদের হাতে পাকা বাঁশের মোটা লাঠি, বাহুতেও অমিত বল, শিক্ষাও বিচিত্র। দীনবন্ধুর লাঠির আঘাতে অনেক জলধর ও রাজীব মুখোপাধ্যায় জলধর বা রাজীব-জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে।

কবির প্রধান গুণ, সৃষ্টি-কৌশল। ঈশ্বর গুপ্তের এ ক্ষমতা ছিল না। দীনবন্ধুর এ শক্তি অতি প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাঁহার প্রণীত জলধর, জগদম্বা, মল্লিকা, নিমচাঁদ দত্ত, প্রভৃতি এই সকল কথার উজ্জ্বল উদাহরণ। তবে, যাহা সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত—সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না। তাঁহার লীলাবতী, মালতী, কামিনী, সৈরিন্ধ্রী, সরলা প্রভৃতি রসজ্ঞের নিকট তাদৃশ আদরণীয়া নহে। তাঁহার বিনায়ক, রমণীমোহন, অরবিন্দ, ললিতমোহন মন মুগ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু যাহা স্থূল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিপর্য্যস্ত, তাহা তাঁহার ইঙ্গিত মাত্রেরও অধীন। ওঝার ডাকে ভূতের দলের মত স্মরণমাত্র সারি দিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।

কি উপাদান লইয়া দীনবন্ধু এই সকল চিত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিস্ময়ের বিষয়, বাঙ্গালা সমাজ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদর্শিতা। সকল শ্রেণীর বাঙ্গালীর দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখে, এমন বাঙ্গালী লেখক আর নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গালী লেখকদিগের এখন সাধারণতঃ বড় শোচনীয় অবস্থা। তাঁহাদিগের অনেকেরই লিখিবার যোগ্য শিক্ষা আছে, লিখিবার শক্তি আছে, কেবল যাহা জানিলে তাঁহাদের লেখা সার্থক হয় তাহা জানা নাই। তাঁহারা অনেকেই দেশবৎসল, দেশের মঙ্গলার্থ লেখেন, কিন্তু দেশের অবস্থা কিছুই জানেন না। কলিকাতার ভিতর স্বশ্রেণীর লোকে কি করে, ইহাই অনেকের স্বদেশ সম্বন্ধীয় জ্ঞানের সীমা। কেহ বা অতিরিক্ত দুই চারিখানি পল্লীগ্রাম, বা দুই একটা ক্ষুদ্র নগর দেখিয়াছেন, কিন্তু সে বুঝি কেবল পথ ঘাট, বাগান বাগিচা, হাট বাজার। লোকের সঙ্গে মিলেন নাই। দেশ সম্বন্ধীয় তাঁহাদের যে জ্ঞান তাহা সচরাচর সম্বাদপত্র হইতে প্রাপ্ত। সম্বাদপত্র লেখকেরা আবার সচরাচর (সকলে নহেন) ঐ শ্রেণীর লেখক—ইংরেজেরা ত বটেনই। কাজেই তাঁহাদের কাছেও দেশ সম্বন্ধীয় যে জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহা দার্শনিকদিগের

ভাষায় রজ্জুতে সর্পজ্ঞানবৎ ভ্রম জ্ঞান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এমন বলিতেছি না, যে, কোন বাঙ্গালী লেখক গ্রাম্য প্রদেশ ভ্রমণ করেন নাই। অনেকে করিয়াছেন, কিন্তু লোকের সঙ্গে মিশিয়াছেন কি? না মিশিলে, যাহা জানিয়াছেন তাহার মূল্য কি?

বাঙ্গালী লেখকদিগের মধ্যে দীনবন্ধুই এ বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইতে পারেন। দীনবন্ধুকে রাজকার্য্যানুরোধে, মণিপুর হইতে গঞ্জাম পর্য্যন্ত, দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত, পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। কেবল পথ ভ্রমণ বা নগর দর্শন নহে, ডাকঘর দেখিবার জন্য গ্রামে গ্রামে যাইতে হইত। লোকের সঙ্গে মিশিবার তাঁহার অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি আহ্লাদপূর্ব্বক সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। ক্ষেত্রমণির মত গ্রাম্য প্রদেশের ইতর লোকের কন্যা, আদুরীর মত গ্রাম্যা বর্ষীয়সী, তোরাবের মত গ্রাম্য প্রজা, রাজীবের মত গ্রাম্য বৃদ্ধ, নশীরাম ও রতার মত গ্রাম্য বালক, পক্ষান্তরে নিমচাঁদের মত সহুরে শিক্ষিত মাতাল, অটলের মত নগরবিহারী গ্রাম্য বাবু, কাঞ্চনের মত মনুষ্যশোণিতপায়িনী নগরবাসিনী রাক্ষসী, নদেরচাঁদ হেমচাঁদের মত "উনপাঁজুরে বরাখুরে" হাপ পাড়াগেঁয়ে হাপ সহুরে বয়াটে ছেলে, ঘটীরামের মত ডিপুটি, নীলকুঠির দেওয়ান, আমীন তাগাদ্গীর, উড়ে বেহারা, দুলে বেহারা, পেঁচোর মা কাওরাণীর মত লোকের পর্য্যন্ত তিনি নাড়ী নক্ষত্র জানিতেন। তাহারা কি করে, কি বলে, তাহা ঠিক জানিতেন। কলমের মুখে তাহা ঠিক বাহির করিতে পারিতেন,—আর কোন বাঙ্গালী লেখক তেমন পারে নাই। তাঁহার আদুরীর মত অনেক আদুরী আমি দেখিয়াছি—তাহারা ঠিক আদুরী। নদেরচাঁদ হেমচাঁদ আমি দেখিয়াছি, তাহারা ঠিক নদেরচাঁদ বা হেমচাঁদ। মল্লিকা দেখা গিয়াছে,—ঠিক অমনি ফুটন্ত মল্লিকা। দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলি গঠিতেন। সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই, অমনি তুলি ধরিয়া তাহার লেজশুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন। এটুকু গেল তাঁহার Realism, তাহার উপর Idealize করিবারও বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া, আপনার স্মৃতির ভাণ্ডার খুলিয়া, তাহার ঘাড়ের উপর অন্যের গুণ দোষ চাপাইয়া দিতেন। যেখানে যেটি সাজে, তাহা বসাইতে জানিতেন। গাছের বানরকে এইরূপ সাজাইতে সাজাইতে সে একটা হনুমান্ বা জাম্বুবানে পরিণত হইত। নিমচাঁদ, ঘটিরাম, ভোলাচাঁদ প্রভৃতি বন্য জন্তুর এইরূপ উৎপত্তি। এই সকল সৃষ্টির বাহুল্য ও বৈচিত্র্য বিবেচনা করিলে, তাঁহার অভিজ্ঞতা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু কেবল অভিজ্ঞতায় কিছু হয় না, সহানুভূতি ভিন্ন সৃষ্টি নাই। দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিস্ময়কর নহে—তাঁহার সহানুভূতিও অতিশয় তীব্র। বিস্ময় এবং বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাঁহার তীব্র সহানুভূতি। গরিব দুঃখীর দুঃখের মর্ম্ম বুঝিতে এমন আর কাহাকে দেখি না। তাই দীনবন্ধু অমন একটা তোরাপ কি রাইচরণ, একটা আদুরী কি রেবতী লিখিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই তীব্র সহানুভূতি কেবল গরিব দুঃখীর সঙ্গে নহে; ইহা সর্ব্বব্যাপী। তিনি নিজে পবিত্রচরিত্র ছিলেন, কিন্তু দুশ্চরিত্রের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন।

দীনবন্ধুর পবিত্রতার ভান ছিল না। এই বিশ্বব্যাপী সহানুভূতির গুণেই হউক বা দোষেই হউক, তিনি সর্ব্বস্থানে যাইতেন, শুদ্ধাত্মা পাপাত্মা সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। কিন্তু অগ্নিমধ্যস্থ অদাহ্য শিলার ন্যায় পাপাগ্নিকুণ্ডেও আপনার বিশুদ্ধি রক্ষা করিতেন। নিজে এই প্রকার পবিত্রচেতা হইয়াও সহানুভূতি শক্তির গুণে তিনি পাপিষ্ঠের দুঃখ পাপিষ্ঠের ন্যায় বুঝিতে পারিতেন। তিনি নিমচাঁদ দত্তের ন্যায় বিশুষ্ক-জীবন-সুখ বিফলীকৃতশিক্ষা, নৈরাশ্যপীড়িত মত্তপের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, বিবাহ বিষয়ে ভগ্ন-মনোরথ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, গোপীনাথের ন্যায় নীলকরের আজ্ঞাবর্ত্তিতার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিতেন। দীনবন্ধুকে আমি বিশেষ জানিতাম; তাঁহার হৃদয়ের সকল ভাগই আমার জানা ছিল। আমার এই বিশ্বাস, এরূপ পরদুঃখকাতর মনুষ্য আর আমি দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। তাঁহার গ্রন্থেও সেই পরিচয় আছে।

কিন্তু এ সহানুভূতি কেবল দুঃখের সঙ্গে নহে; সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষ সকলেরই সঙ্গে তুল্য সহানুভূতি। আদুরীর বাউটি পৈঁছার সুখের সঙ্গে সহানুভূতি, তোরাপের রাগের সঙ্গে সহানুভূতি, ভোলাচাঁদ যে শুভ কারণ বশতঃ শ্বশুরবাড়ী যাইতে পারে না, সে সুখের সঙ্গেও সহানুভূতি। সকল কবিরই এ সহানুভূতি চাই। তা নহিলে কেহই উচ্চ শ্রেণীর কবি হইতে পারেন না। কিন্তু অন্য কবিদিগের সঙ্গে ও দীনবন্ধুর সঙ্গে একটু প্রভেদ আছে। সহানুভূতি প্রধানতঃ কল্পনাশক্তির ফল। আমি আপনাকে ঠিক অন্যের স্থানে কল্পনার দ্বারা বসাইতে পারিলেই তাহার সঙ্গে আমার সহানুভূতি জন্মে। যদি তাহাই হয় তবে এমন হইতে পারে যে, অতি নির্দ্দয় নিষ্ঠুর ব্যক্তিও কল্পনাশক্তির বল থাকিলে কাব্য প্রণয়ন কালে দুঃখীর সঙ্গে আপনার সহানুভূতি জন্মাইয়া লইয়া কাব্যের উদ্দেশ্য সাধন করেন। কিন্তু আবার এমন শ্রেণীর লোকও আছেন যে, দয়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তি সকল তাঁহাদের স্বভাবে এত প্রবল যে, সহানুভূতি তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ কল্পনার সাহায্যের অপেক্ষা করে না। মনস্তত্ত্ববিদেরা বলিবেন, এখানেও কল্পনাশক্তি লুকাইয়া কাজ করে, তবে সে কার্য্য এমন অভ্যস্ত, বা শীঘ্র সম্পাদিত, যে আমরা বুঝিতে পারি না যে এখানেও কল্পনা বিরাজমান। তাই না হয় হইল, তথাপিও একটা প্রভেদ হইল। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি তাঁহাদের ইচ্ছা বা চেষ্টার অধীন, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি তাঁহাদের ইচ্ছাধীন নহে, তাঁহারাই সহানুভূতির অধীন। এক শ্রেণীর লোক যখন মনে করেন, তখনই সহানুভূতি আসিয়া উপস্থিত হয়, নহিলে সে আসিতে পারে না; সহানুভূতি তাঁহাদের দাসী। অপর শ্রেণীর লোকেরা নিজেই সহানুভূতির দাস, তাঁহারা তাকে চান বা না চান, সে আসিয়া ঘাড়ে চাপিয়াই আছে, হৃদয় ব্যাপিয়া আসন পাতিয়া বিরাজ করিতেছে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের কল্পনাশক্তি বড় প্রবল; দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের প্রীতি দয়াদি বৃত্তি সকল প্রবল।

দীনবন্ধু এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁহার সহানুভূতি তাঁহার অধীন বা আয়ত্ত নহে; তিনিই নিজে সহানুভূতির অধীন। তাঁহার সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি তাঁহাকে যখন যে পথে লইয়া যাইত, তখন তাহাই করিতে বাধ্য হইতেন। তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয়, এখন তাহা আমরা বুঝিতে

পারিব। তিনি নিজে সুশিক্ষিত, এবং নির্ম্মলচরিত্র, তথাপি তাঁহার গ্রন্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার প্রবলা, দুর্দ্দমনীয়া সহানুভূতিই তাহার কারণ। যাহার সঙ্গে তাঁহার সহানুভূতি, যাহার চরিত্র আঁকিতে বসিয়াছেন, তাহার সমুদায় অংশই তাঁহার কলমের আগায় আসিয়া পড়িত! কিছু বাদসাদ দিবার তাঁহার শক্তি ছিল না, কেন না, তিনি সহানুভূতির অধীন, সহানুভূতি তাঁহার অধীন নহে। আমরা বলিয়াছি যে, তিনি জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্র প্রণয়নে নিযুক্ত হইতেন। সেই জীবন্ত আদর্শের সঙ্গে সহানুভূতি হইত বলিয়াই তিনি তাহাকে আদর্শ করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার উপর আদর্শের এমনই বল যে সেই আদর্শের কোন অংশ ত্যাগ করিতে পারিতেন না। তোরাপের সৃষ্টিকালে তোরাপ যে ভাষায় রাগ প্রকাশ করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না। আদুরীর সৃষ্টিকালে আদুরী যে ভাষায় রহস্য করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না। নিমচাঁদ গড়িবার সময়ে, নিমচাঁদ যে ভাষায় মাতলামি করে, তাহা ছাড়িতে পারিতেন না। অন্য কবি হইলে সহানুভূতির সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করিত,—বলিত,—"তুমি আমাকে তোরাপের বা আদুরীর বা নিমচাঁদের স্বভাবচরিত্র বুঝাইয়া দাও—কিন্তু ভাষা আমার পছন্দমত হইবে,—ভাষা তোমার কাছে লইব না।" কিন্তু দীনবন্ধুর সাধ্য ছিল না, সহানুভূতির সঙ্গে কোন প্রকার বন্দোবস্ত করেন। সহানুভূতি তাঁহাকে বলিত, "আমার হুকুম—সবটুকু লইতে হইবে—মায় —ভাষা। দেখিতেছ না যে, তোরাপের ভাষা ছাড়িলে, তোরোপের রাগ আর তোরাপের রাগের মত থাকে না, আদুরীর ভাষা ছাড়িলে আদুরীর তামাসা আর আদুরীর তামাসার মত থাকে না, নিমচাঁদের ভাষা ছাড়িলে নিমচাঁদের মাতলামি আর নিমচাঁদের মাতলামির মত থাকে না? সবটুকু দিতে হবে।" দীনবন্ধুর সাধ্য ছিল না যে বলেন—যে "না তা হবে না।" তাই আমরা একটা আস্ত তোরাপ, আস্ত নিমচাঁদ, আস্ত আদুরী দখিতে পাই। রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে, ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।

আমি এমন বলিতেছি না যে, দীনবন্ধু যাহা করিয়াছেন, বেশ করিয়াছেন। গ্রন্থে রুচির দোষ না ঘটে, ইহা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়, তাহাতে সংশয় কি? আমি যে কয়টা কথা বলিলাম তাহার উদ্দেশ্য প্রশংসা বা নিন্দা নহে। মানুষটা বুঝানই আমার উদ্দেশ্য। দীনবন্ধুর রুচির দোষ তাঁহার ইচ্ছায় ঘটে নাই, তাঁহার তীব্র সহানুভূতির গুণেই ঘটিয়াছে। গুণেও দোষ জন্মে, ইহা সকলেই জানে। কথাটায় আমরা মানুষটা বুঝিতে পারিতেছি। গ্রন্থ ভাল হউক আর মন্দ হউক, মানুষটা বড় ভালবাসিবার মানুষ। তাঁহার জীবনেও তাই দেখিয়াছি। দীনবন্ধুকে যত লোক ভালবাসিত, আর কোন বাঙ্গালীকে যে তত লোকে ভালবাসিয়াছে, এমন আমি কখন দেখি নাই বা শুনি নাই। সেই সর্ব্ব-ব্যাপিনী তীব্রা সহানুভূতিই তাহার কারণ।

দীনবন্ধুর এই দুটি গুণ—(১) তাঁহার সামাজিক অভিজ্ঞতা, (২) তাঁহার প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্ব্বব্যাপী সহানুভূতি, তাঁহার কাব্যের গুণ দোষের কারণ—এই তত্ত্বটি বুঝান এই সমালোচনার প্রধান উদ্দেশ্য। আমি ইহাও বুঝাইতে চাই যে, যেখানে এই দুইটির মধ্যে একটির অভাব হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার কবিত্ব নিষ্ফল হইয়াছে। যাহারা

তাঁহার প্রধান নায়ক নায়িকা—(hero এবং heroine), তাহাদিগের চরিত্র যে তেমন মনোহর হয় নাই, ইহাই তাহার কারণ। আদুরী বা তোরাপ জীবন্ত চিত্র, কামিনী বা লীলাবতী, বিজয় বা ললিতমোহন সেরূপ নয়। সহানুভূতি আদুরী বা তোরাপের বেলা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ভাষা পর্য্যন্ত আনিয়া কবির কলমের আগায় বসাইয়া দিয়াছিল; কামিনী বা বিজয়ের বেলা, লীলাবতী বা ললিতের বেলা, চরিত্র ও ভাষা উভয় বিকৃত কেন? যদি তাঁহার সহানুভূতি স্বাভাবিক এবং সর্ব্বব্যাপী, তবে এখানে সহানুভূতি নিষ্ফল কেন? কথাটা বুঝা সহজ। এখানে অভিজ্ঞতার অভাব। প্রথমে নায়িকাদের কথা ধর। লীলাবতী বা কামিনীর শ্রেণীর নায়িকা সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ছিল না, কেন না, কোন লীলাবতী বা কামিনী বাঙ্গালা সমাজে ছিল না বা নাই। হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, কোর্টশিপের পাত্রী হইয়া, যিনি কোর্ট করিতেছেন, তাঁহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাঙ্গালী সমাজে ছিল না—কেবল আজিকাল নাকি দুই একটা হইতেছে শুনিতেছি। ইংরেজের ঘরে তেমন মেয়ে আছে; ইংরেজ কন্যা-জীবনই তাই। আমাদিগের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও তেমনি আছে। দীনবন্ধু ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটক নবেল ইত্যাদি পড়িয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা কাব্যে বাঙ্গালার সমাজস্থিত নায়ক নায়িকাকেও সেই ছাঁচে ঢালা চাই। কাজেই যাহা নাই, যাহার আদর্শ সমাজে নাই, তিনি তাই গড়িতে বসিয়াছিলেন। এখন, আমি ইহাও বুঝাইয়াছি যে, তাঁহার চরিত্র প্রণয়ন প্রথা এই ছিল যে, জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চিত্রকরের ন্যায় চিত্র আঁকিতেন। এখানে জীবন্ত আদর্শ নাই, কাজেই ইংরেজি ও সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যগত মৃৎপুত্তলগুলি দেখিয়া, সে চরিত্র গঠন করিতে হইত। জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে নাই, কাজেই সে সর্ব্ব-ব্যাপিনী সহানুভূতিও সেখানে নাই। কেন না, সর্ব্বব্যাপিনী সহানুভূতিও জীবন্ত ভিন্ন জীবনহীনকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না—জীবনহীনের সঙ্গে সহানুভূতির কোন সম্বন্ধ নাই। এখানে পাঠক দেখিলেন যে, দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাও নাই—স্বাভাবিক সহানুভূতিও নাই। এই দুইটি লইয়া দীনবন্ধুর কবিত্ব। কাজেই এখানে কবিত্ব নিষ্ফল।

যেখানে দীনবন্ধুর প্রধান নায়িকা কোর্টশিপের পাত্রী নহে—যথা সৈরিন্ধ্রী—সেখানেও দীনবন্ধু জীবন্ত আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া পুস্তকগত আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন। কাজেই সেখানেও নায়িকার চরিত্র স্বাভাবিক হইতে পায় নাই।

দীনবন্ধুর নায়কদিগের সম্বন্ধে ঐরূপ কথা বলা যাইতে পারে। দীনবন্ধুর নায়কগুলি সর্ব্বগুণসম্পন্ন বাঙ্গালী যুবা—কাজ কর্ম্ম নাই, কাজ কর্ম্মের মধ্যে কাহারও Philanthropy, কাহারও কোর্ট-শিপ। এরূপ চরিত্রের জীবন্ত আদর্শ বাঙ্গালা সমাজেই নাই, কাজেই এখানেও অভিজ্ঞতা নাই, সহানুভূতি নাই। কাজেই এখানেও দীনবন্ধুর কবিত্ব নিষ্ফল।

যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া দীনবন্ধু জলধর বা জগদম্বা বা নিমচাঁদের চরিত্র প্রণীত করিয়াছিলেন, যদি এখানে সেই প্রথা অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলেও এখানে তাঁহার কবিত্ব সফল হইত। যদি একত্রে, একাধারে বাঞ্ছনীয় আদর্শ পাইলেন না, তবে বহু-সংখ্যক জীবন্ত আদর্শের অংশবিশেষ বাছিয়া লইয়া যদি বিন্যস্ত করিতেন, তাহা হইলেও

এখানেও কবিত্ব সফল হইত। তাঁহার সে শক্তি যে বিলক্ষণ ছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বোধ হয়, তাঁহার চিত্তের উপর ইংরেজি সাহিত্যের আধিপত্য বেশী হইয়াছিল বলিয়াই এ স্থলে সে পথে যাইতে ইচ্ছা করেন নাই। পক্ষান্তরে ভিন্ন প্রকৃতির কবি অর্থাৎ যাঁহাদের সহানুভূতি কল্পনার অধীনা, স্বাভাবিকী নহে, তাঁহারা এমন স্থলে কল্পনার বলে সেই জীবনহীন আদর্শকে জীবন্ত করিয়া, সহানুভূতিকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বসাইয়া, একটা নবীনমাধব বা লীলাবতীর চরিত্রকে জীবন্ত করিতে পারিতেন। সেক্ষপীয়র অবলীলাক্রমে জীবন্ত Caliban বা জীবন্ত Ariel সৃষ্টি করিয়াছেন, কালিদাস অবলীলাক্রমে উমা বা শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানে সহানুভূতি কল্পনার আজ্ঞাকারিণী।

দীনবন্ধুর এই অলৌকিক সমাজজ্ঞতা এবং তীব্র সহানুভূতির ফলেই তাঁহার প্রথম নাটক প্রণয়ন। যে সকল প্রদেশে নীল প্রস্তুত হইত, সেই সকল প্রদেশে তিনি অনেক ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নীলকরের তাৎকালিক প্রজাপীড়ন সবিস্তারে স্বক্ষেত্রে অবগত হইয়াছিলেন। এই প্রজাপীড়ন তিনি যেমন জানিয়াছিলেন, এমন আর কেহই জানিতেন না। তাঁহার স্বাভাবিক সহানুভূতির বলে সেই পীড়িত প্রজাদিগের দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে আপনার ভোগ্য দুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল, কাজেই হৃদয়ের উৎস কবিকে লেখনীমুখে নিঃসৃত করিতে হইল। নীলদর্পণ বাঙ্গালার Uncle Tom's Cabin. "টম্ কাকার কুটীর" আমেরিকার কাফ্রিদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে ; নীলদর্পণ, নীল দাস-দিগের দাসত্ব মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে। নীলদর্পণে, গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি পূর্ণ মাত্রায় যোগ দিয়াছিল বলিয়া, নীল-দর্পণ তাঁহার প্রণীত সকল নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী। অন্য নাটকের অন্য গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু নীলদর্পণের মত শক্তি আর কিছুতেই নাই। তাঁর আর কোন নাটকই পাঠককে বা দর্শককে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না। বাঙ্গালা ভাষায় এমন অনেকগুলি নাটক নবেল বা অন্যবিধ কাব্য প্রণীত হইয়াছে, যাহার উদ্দেশ্য সামাজিক অনিষ্টের সংশোধন। প্রায়ই সেগুলি কাব্যাংশে নিকৃষ্ট, তাহার কারণ কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি ! তাহা ছাড়িয়া, সমাজসংস্করণকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে কাজেই কবিত্ব নিষ্ফল হয়। কিন্তু নীলদর্পণের মুখ্য উদ্দেশ্য এবম্বিধ হইলেও কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট। তাহার কারণ এই যে, গ্রন্থকারের মোহময়ী সহানুভূতি সকলই মাধুর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে।

উপসংহারে আমার কেবল ইহাই বক্তব্য যে, আমি দীনবন্ধুর কবিত্বের দোষ-গুণের যে উৎপত্তিস্থল নির্দ্দিষ্ট করিলাম, ইহা তাঁহার গ্রন্থ হইতেই যে পাইয়াছি, এমন নহে। বহি পড়িয়া একটা আন্দাজি Theory খাড়া করিয়াছি, এমন নহে। গ্রন্থকারের হৃদয় আমি বিশেষ জানিতাম, তাই এ কথা বলিয়াছি, ও বলিতে পারিয়াছি। যাহা গ্রন্থকারের হৃদয়ে পাইয়াছি, গ্রন্থেও তাহা পাইয়াছি বলিয়া এ কথা বলিলাম। গ্রন্থকারকে না জানিলে, তাঁহার গ্রন্থ এরূপে বুঝিতে পারিতাম কি না বলিতে পারি না। অন্যে, যে গ্রন্থকারের হৃদয়ের এমন নিকটে স্থান পায় নাই, সে বলিতে পারিত কি না, জানি না। কথাটা দীনবন্ধুর গ্রন্থের পাঠকমণ্ডলীকে বুঝাইয়া বলিব, ইহা আমার বড় সাধ ছিল। দীনবন্ধুর স্নেহ ও প্রীতির ঋণের যতটুকু পারি পরিশোধ করিব, এই বাসনা ছিল।

তাই, এই সমালোচনা লিখিবার জন্য আমি তাঁহার পুত্রদিগের নিকট উপযাচক হইয়াছিলাম। দীনবন্ধুর গ্রন্থের প্রশংসা বা নিন্দা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কেবল, সেই অসাধারণ মনুষ্য কিসে অসাধারণ ছিলেন, তাহাই বুঝান আমার উদ্দেশ্য।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহ—ভূমিকা

জীবনচরিত ও কবিত্ব

উপক্রমণিকা

বাঙ্গালা সাহিত্যে আর যাহারই অভাব থাকুক, কবিতার অভাব নাই। উৎকৃষ্ট কবিতারও অভাব নাই—বিদ্যাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত অনেক সুকবি বাঙ্গালায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অনেক উত্তম কবিতা লিখিয়াছেন, বলিতে গেলে বরং বলিতে হয়, যে বাঙ্গালা সাহিত্য, কাব্যরাশি ভারে কিছু পীড়িত। তবে আবার ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিয়া সে বোঝা আরও ভারি করি কেন? সেই কথাটা আগে বুঝাই।

প্রবাদ আছে যে, গরিব বাঙ্গালীর ছেলে সাহেব হইয়া, মোচার ঘণ্টে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। সামগ্রীটা কি এ? বহুকষ্টে পিসীমা তাঁহাকে সামগ্রীটা বুঝাইয়া দিলে, তিনি স্থির করিলেন যে, এ "কেলা কা ফুল"। রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায় যে, এখন আমরা সকলেই মোচা ভুলিয়া কেলা কা ফুল বলিতে শিখিয়াছি। তাই আজ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ করিতে বসিয়াছি। আর যেই কেলা কা ফুল বলুক, ঈশ্বর গুপ্ত মোচা বলেন।

একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষকাল—প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষবীচিবিক্ষেপশালিনী—মৃদু পবনহিল্লোলে তরঙ্গভঙ্গচঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারেণ্ডায় বসিয়াছিলাম তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদু রব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি! কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনে তৃপ্তি সাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস ভবভূতিও অনেক দূরে।

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গায়িতেছে—

"সাধো আছে মা মনে।
দুর্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব,
জাহ্নবী-জীবনে।"

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায়—বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবী-জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ, সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল—এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।

সেইরূপ, আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়—হোক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের—আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালী কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালীর কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই—বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না। আমরা "বৃত্রসংহার" পরিত্যাগ করিয়া "পৌষপার্ব্বণ" চাই না। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে পৌষপার্ব্বণে যে একটা সুখ আছে—বৃত্রসংহারে তাহা নাই। পিঠাপুলিতে যে একটা সুখ আছে, শচীর বিম্বাধর-প্রতিবিম্বিত সুধায় তাহা নাই। সে জিনিষটা একেবারে আমাদের ছাড়িলে চলিবে না; দেশশুদ্ধ জোনস্, গমিসের তৃতীয় সংস্করণে পরিণত হইলে চলিবে না। বাঙ্গালী নাম রাখিতে হইবে। জননী জন্মভূমিকে ভালবাসিতে হইবে। যাহা মার প্রসাদ, তাহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিতে হইবে। এই দেশী জিনিসগুলি মার প্রসাদ। এই খাঁটি বাঙ্গালাটি, এই খাঁটি দেশী কথাগুলি মার প্রসাদ। মার প্রসাদে পেট না ভরে, বিলাতী বাজার হইতে কিনিয়া খাইতে পারি—কিন্তু মার প্রসাদ ছাড়িব না। এই কবিতাগুলি মার প্রসাদ। তাই সংগ্রহ করিলাম।

এই সংগ্রহের জন্য বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ই পাঠকের ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার উদ্যোগ ও পরিশ্রম ও যত্নেই ইহা সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে যে পরিশ্রম আবশ্যক তাহা আমাকে করিতে হইলে, আমি কখন পারিয়া উঠিতাম না।

এক্ষণে পাঠককে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যে জীবনী উপহার দিতেছি, তাহার জন্যও ধন্যবাদ গোপাল বাবুরই প্রাপ্য। তাঁহার জীবনী সংগ্রহ করিয়া গোপাল বাবু আমাকে কতকগুলি নোট দিয়াছিলেন। আমি সেই নোটগুলি অবলম্বন করিয়া এই জীবনী সঙ্কলন করিয়াছি। গোপাল বাবু নিজে সুলেখক, এবং বাঙ্গালা সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত। তাঁহার নোটগুলি এরূপ পরিপাটী যে, আমি তাহাতে কাটাকুটি বড় কিছু করি নাই, কেবল আমার নিজের বক্তব্যের সঙ্গে গাঁথিয়া দিয়াছি। প্রথম পরিচ্ছেদটি

বিশেষতঃ এই প্রণালীতে লিখিত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, গোপাল বাবুর নোটগুলি প্রায় বজায় রাখিয়াছি—আর কিছুই গাঁথিতে হয় নাই। তৃতীয় পরিচ্ছেদের জন্য আমি একাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

এই কথাগুলি বলিবার তাৎপর্য্য এই যে গোপাল বাবুই এই সংগ্রহ ও জীবনী জন্য আমার ও সাধারণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ—বাল্য ও শিক্ষা

প্রয়াগে যুক্তবেণী—বাঙ্গালার ধান্যক্ষেত্র মধ্যে মুক্তবেণী—কলিকাতার ১৫ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী ত্রিপথগামিনী হইয়াছেন। যেখানে এই পবিত্র তীর্থস্থান, তাহার পশ্চিম পারস্থ গ্রামের নাম "ত্রিবেণী"—পূর্ব্ব পারস্থিত গ্রামের নাম "কাঞ্চনপল্লী" বা কাঁচরাপাড়া।

কাঁচরাপাড়ার দক্ষিণে কুমারহট্ট, কুমারহট্টের দক্ষিণে গৌরীভা বা গরিফা। এই তিন গ্রামে অনেক বৈদ্যের বাস। এই বৈদ্যদিগের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। গরিফার গৌরব রামকমল সেন, কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণবিহারী সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। কুমারহট্টের গৌরব কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ। কাঁচরাপাড়ার একটি অলঙ্কার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।*

কাঁচরাপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র দাস একটি বৈদ্যবংশের আদি পুরুষ। তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম রামগোবিন্দ। রামগোবিন্দের দুই পুত্র, (১) বিজয়রাম, (২) নিধিরাম। বিজয়রাম পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার ছিল। সেই জন্য তিনি বাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার একটি টোল ছিল, তথায় অনেক ছাত্র সংস্কৃত, সাহিত্য, ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার প্রভৃতি তাঁহার নিকট শিক্ষা করিত। তিনি সংস্কৃত ভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হয় নাই।

কনিষ্ঠ নিধিরাম, আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কবিভূষণ উপাধি পাইয়াছিলেন। নিধিরামের তিনটি পুত্র জন্মে, (১) বৈদ্যনাথ, (২) ভোলানাথ এবং (৩) গোপীনাথ।

গোপীনাথের প্রথম পক্ষের দ্বিতীয় পুত্র হরিনারায়ণ দাসের ঔরসে শ্রীমতী দেবীর গর্ভে (১) গিরিশচন্দ্র, (২) ঈশ্বরচন্দ্র, (৩) রামচন্দ্র, (৪) শিবচন্দ্র এবং একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র, পিতার দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ১৭৩৩ শকের (বাঙ্গালা ১২১৮ সালে) ২৫এ ফাল্গুনে শুক্রবারে কাঁচরাপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

গুপ্তেরা তাদৃশ ধনী ছিল না; মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। পৈতৃক ধান্যক্ষেত্র, পুষ্করিণী, উদ্যান, এবং রাইয়তি জমির আয়ে এই একান্নভুক্ত পারিবারের কোন অভাব ঘটিত না। সমাজ মধ্যে এই গৃহস্থেরা মান্য গণ্য ছিল।

* এই প্রদেশের বৈদ্যগণ রাজকার্য্যেও বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। নাম করিলে অনেকের নাম করা যাইতে পারে।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা, চিকিৎসা-ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া, স্বগ্রামের নিকট শেয়ালডাঙ্গার কুটিতে মাসিক ৮ টাকা বেতনে কাজ করিতেন।

কলিকাতা জোড়াসাঁকোয় ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহাশ্রম। ঈশ্বরচন্দ্র শৈশব হইতেই স্বীয় জননীর সহিত কাঁচরাপাড়া, এবং মাতামহাশ্রমে বাস করিতেন। মাতামহ রামমোহন গুপ্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কানপুরে বিষয়-কর্ম্ম করিতেন। মাতামহের অবস্থা বড় ভাল ছিল না।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকালের যে দুই একটা কথা জানা যায়, তাহাতে বোধ হয়, ঈশ্বর বড় দুরন্ত ছেলে ছিলেন। সাহসটা খুব ছিল। পাঁচ বৎসর বয়সে কালীপূজার দিন, অমাবস্যার রাত্রে, একা নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলেন। অন্ধকারে, একজন কেহ পথে তাঁহার ঘাড়ে পড়িয়া গিয়াছিল। সে ঘোর অন্ধকারে তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"কেরে?—কে যায়?"

"আমি—ঈশ্বর।"

"একেলা এই অন্ধকারে অমাবস্যার রাত্রিতে কোথায় যাইতেছিস?"

"ঠাকুর মশায়ের বাড়ী লুচি আনিতে।"

দেশকাল গুণে এ সাহসের পারণাম—হোগলকুঁড়িয়ায় বসিয়া কবিতা লেখা।

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়ঃক্রম যৎকালে ১০ বর্ষ, সেই সময়ে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়।

স্ত্রীবিয়োগের কিছুদিন পরেই তাঁহার পিতা হরিনারায়ণ দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। তিনি বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয় হইতে বাটী না আসিয়া কার্য্যস্থলে গমন করেন। নব বধূ একাকিনী কাঁচরাপাড়ার বাটীতে আসিলে, হরিনারায়ণের বিমাতা (মাতা জীবিতা ছিলেন না) তাঁহাকে বরণ করিয়া লইতেছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই সময়ে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার চরিত্রের উপযোগী বটে। ঈশ্বরচন্দ্রের এই মহৎ গুণ ছিল, যে তিনি খাঁটি জিনিষ বড় ভালবাসতেন, মেকির বড় শত্রু। এই সংগ্রহস্থিত কবিতাগুলি পড়িলেই পাঠক দেখিতে পাইবেন, যে কবি মেকির বড় শত্রু—সকল রকম মেকির উপর তিনি গালি বর্ষণ করিতেছেন—গবর্ণর জেনরল হইতে কলিকাতার মুটে পর্য্যন্ত কাহারও মাফ নাই। এই বিমাতার আগমনে কবির সঙ্গে মেকির প্রথম সম্মুখ সাক্ষাৎ। খাঁটি মা কোথায় চলিয়া গিয়াছে—তাহার স্থানে একটা মেকি মা আসিয়া দাঁড়াইল। মেকির শত্রু ঈশ্বরচন্দ্রের রাগ আর সহ্য হইল না, এক গাছা রুল লইয়া স্বীয় বিমাতাকে লক্ষ্য করিয়া বিষম বেগে তিনি নিক্ষেপ করিলেন। কাবপ্রযুক্ত রুল সৌভাগ্যক্রমে, বিমাতার অপেক্ষা আরও অসার সামগ্রী খুঁজিল—বিমাতা ত্যাগ করিয়া একটা কলা গাছে বিঁধিয়া গেল।

অস্ত্র ব্যর্থ দেখিয়া কিরাতপরাজিত ধনঞ্জয়ের মত ঈশ্বরচন্দ্র এক ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত দিন দ্বার রুদ্ধ করিয়া রহিলেন। কিন্তু বরদানার্থ পিনাকহস্তে পশুপতি না আসিয়া, প্রহারার্থ জুতাহস্তে জ্যেঠা মহাশয় আসিয়া উপস্থিত। জ্যেঠা মহাশয় দ্বার ভাঙ্গিয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে পাদুকা প্রহার করিয়া চলিয়া গেলেন।

কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের পাশুপত অস্ত্র সংগ্রহ হইল সন্দেহ নাই। তিনি বুঝিলেন, এ সংসার

মেকি চলিবার ঠাঁই—মেকির পক্ষ হইয়া না চলিলে এখানে জুতা খাইতে হয়। ইহার পর, যখন তাঁহার লেখনী হইতে অজস্র তীব্র জ্বালাবিশিষ্ট বক্রোক্তি সকল নির্গত হইল, তখন পৃথিবীর অনেক রকম মেকি তাঁহার নিকট জুতা খাইল। কবিকে মারিলে, কবি মার তুলিয়া রাখেন। ইংরেজ সমাজ বায়রণকে প্রপীড়িত করিয়াছিল—বায়রণ, ডন জুয়ানে তাহার শোধ লইলেন।

পরে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতামহ আসিয়া সান্ত্বনা করিয়া বলেন, "তোদের মা নাই, মা হইল, তোদেরই ভাল। তোদেরি দেখিবে শুনিবে।"

আবার মেকি! জ্যেঠা মহাশয় যা হৌক—খাঁটি রকম জুতা মারিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পিতামহের নিকট এ স্নেহের মেকি ঈশ্বরচন্দ্রের সহ্য হইল না। ঈশ্বরচন্দ্র পিতামহের মুখের উপর বলিলেন,—

"হাঁ! তুমি আর একটা বিয়ে করে যেমন বাবাকে দেখ্‌ছ, বাবা আমাদের তেমনই দেখ্‌বেন।"

দুরন্ত ছেলে, কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র লেখা পড়ায় বড় মন দিলেন না। বুদ্ধির অভাব ছিল না। কথিত আছে ঈশ্বরচন্দ্রের যখন তিন বৎসর বয়স, তখন তিনি একবার কলিকাতায় মাতুলালয়ে আসিয়া পীড়িত হয়েন। সেই পীড়ায় তাঁহাকে শয্যাগত হইয়া থাকিতে হয়। কলিকাতা তৎকালে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল এবং মশা মাছির বড়ই উপদ্রব ছিল। প্রবাদ আছে, ঈশ্বরচন্দ্র শয্যাগত থাকিয়া সেই মশা মাছির উপদ্রবে একদা স্বতঃই আবৃত্তি করিতে থাকেন—

"রেতে মশা দিনে মাছি,
এই তাড়্যে কল্‌কেতায় আছি।"

I lisped in numbers, for the numbers came!

তাই নাকি? অনেকে কথাটা না বিশ্বাস করতে পারেন—আমরা বিশ্বাস করিব কি না জানি না। তবে যখন জন ষ্টুয়ার্ট মিলের তিন বৎসর বয়সে গ্রীক শেখার কথাটা সাহিত্যজগতে চলিয়া গিয়াছে, তখন এ কথাটা চলুক।

ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই তৎকালে সাধারণ্যে সমাদৃত পাঁচালি, কবি প্রভৃতিতে যোগদান এবং সংগীত রচনা করিতে পারিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা ও পিতৃব্যদিগের সংগীত রচনা শক্তি ছিল। বীজ গুণে নাকি অনেকে আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে।

কিন্তু পাঠশালায় গিয়া লেখা পড়া শিখিতে ঈশ্বরচন্দ্র মনোযোগী ছিলেন না। কখনও পাঠশালায় যাইতেন, কখনও বা টো টো করিয়া খেলিয়া বেড়াইতেন। এ সময় মুখে মুখে কবিতা রচনায় তৎপর ছিলেন। পাঠশালার উচ্চশ্রেণীর ছাত্রেরা পারস্য ভাষায় যে সকল পুস্তক অর্থ করিয়া পাঠ করিত, শুনিয়া, ঈশ্বর তাহার এক এক স্থল অবলম্বন পূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রকে লেখা পড়া শিক্ষায় অমনোযোগী দেখিয়া, গুরুজনেরা সকলেই বলিতেন, ঈশ্বর মূর্খ এবং অপরের গলগ্রহ হইবে। চিরজীবন অন্নবস্ত্রের জন্য কষ্ট পাইবে।

সেই অনাবিষ্ট বালক সমাজে রুদ্ধপ্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। আমাদের দেশে সচরাচর প্রচলিত প্রথানুসারে লেখা পড়া না শিখিলেই ছেলে গেল স্থির করা যায়। কিন্তু ক্লাইব

বালককালে কেবল পরের ফলকরা চুরি করিয়া বেড়াইতেন, বড় ফ্রেড্রিক বাপের অবাধ্য বয়াটে ছেলে ছিলেন, এবং আর আর অনেকে এইরূপ ছিলেন। কিম্বদন্তী আছে, স্বয়ং কালিদাস নাকি বাল্যকালে ঘোর মূর্খ ছিলেন।

মাতৃহীন হইবার পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া মাতুলালয়ে অবস্থান করিতে থাকেন। কলিকাতায় আসিয়া সামান্য প্রকার শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। স্বভাব-সিদ্ধ কবিতা রচনায় বিশেষ মনোযোগ থাকায়, শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিতেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, আজ কাল অনেক ছেলেকে সেই ভ্রমে পতিত হইতে দেখি। লিখিবার একটু শক্তি থাকিলেই, অমনি পড়া শুনা ছাড়িয়া দিয়া কেবল রচনায় মন। রাতারাতি যশস্বী হইবার বাসনা। এই সকল ছেলেদের দুই দিক নষ্ট হয়—রচনাশক্তি যেটুকু থাকে, শিক্ষার অভাবে তাহা সামান্য ফলপ্রদ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যে পড়া শুনায় অমনোযোগী হউন, শেষে তিনি কিছু শিখিয়াছিলেন। তাঁহার গদ্য রচনায় তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ আছে। কিন্তু তিনি বাল্যকালে যে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ করেন নাই, ইহা বড় দুঃখেরই বিষয়। তিনি সুশিক্ষিত হইলে, তাঁহার যে প্রতিভা ছিল, তাহার বিহিত প্রয়োগ হইলে, তাঁহার কবিত্ব, কার্য্য, এবং সমাজের উপর আধিপত্য অনেক বেশী হইত। আমার বিশ্বাস যে তিনি যদি তাঁহার সমসাময়িক লেখক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা পরবর্তী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় সুশিক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্য অনেক দূর অগ্রসর হইত। বাঙ্গালার উন্নতি আরও ত্রিশ বৎসর অগ্রসর হইত। তাঁহার রচনায় দুইটি অভাব দেখিয়া বড় দুঃখ হয়—মার্জ্জিত রুচির অভাব, এবং উচ্চ লক্ষ্যের অভাব। অনেকটাই ইয়ারকি। আধুনিক সামাজিক বানরদিগের ইয়ারকির মত ইয়ারকি নয়—প্রতিভাশালী মহাত্মার ইয়ারকি। তবু ইয়ারকি বটে। জগদীশ্বরের সঙ্গেও একটু ইয়ারকি—

কহিতে না পার কথা—কি রাখিব নাম ?
তুমি হে আমার বাবা হাবা আত্মারাম।

ঈশ্বর গুপ্তের যে ইয়ারকি, তাহা আমরা ছাড়িতে রাজি নই। বাঙ্গালা সাহিত্যে উহা আছে বলিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যে একটা দুর্লভ সামগ্রী আছে। অনেক সময়েই এই ইয়ারকি বিশুদ্ধ, এবং ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা বা পরের প্রতি বিদ্বেষশূন্য। রত্নটি পাইয়া হারাইতে আমরা রাজি নই, কিন্তু দুঃখ এই যে—এতটা প্রতিভা ইয়ারকিতেই ফুরাইল।

একজন দেউলেপড়া শুঁড়ী, মতি শীলের গল্প শুনিয়া, দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল, "কত লোকে খালি বোতল বেচিয়া বড় মানুষ হইল—আমি ভরা বোতল বেচিয়া কিছু করিতে পারিলাম না ?" সুশিক্ষার অভাবে ঈশ্বর গুপ্তের ঠিক তাই ঘটিয়াছিল। তাই এখনকার ছেলেদের সতর্ক করিতেছি—ভাল শিক্ষা লাভ না করিয়া কালির আঁচড় পাড়িও না। মহাত্মাদিগের জীবনচরিত্রের সমালোচনায় অনেক গুরুতর নীতি আমরা শিখিয়া থাকি। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের সমালোচনায় আমরা এই মহতী নীতি শিখি—সুশিক্ষা ভিন্ন প্রতিভা কখন পূর্ণ ফলপ্রদা হয় না।

ঈশ্বরচন্দ্রের স্মৃতিশক্তি বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত প্রখর ছিল। একবার যাহা

শুনিতেন, তাহা আর ভুলিতেন না। কঠিন সংস্কৃত ভাষার দুর্ব্বোধ্য শ্লোকসমূহের ব্যাখ্যা একবার শুনিয়াই তাহা অবিকল কবিতায় রচনা করিতে পারিতেন।

ঈ ... মৃত্যুর পর তাঁহার একজন বাল্যসখা, ১২৬৬ সালের ১লা বৈশাখের সংবাদ প্রভাকরে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—

"ঈশ্বর বাবু দুগ্ধপোষ্যাবস্থার পরই বিশাল বুদ্ধিশালিতা ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করেন। যৎকালীন পাঠশালায় প্রথম শিক্ষায় অতি শৈশবকালে প্রবর্ত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহা অপেক্ষা অধিকবয়স্ক বালকেরা পারস্য শাস্ত্র পাঠ করিত। তাহাতেই যে দুই একটি পারস্য শব্দ শ্রুত হইত, তাহার অর্থ শ্রুতি মাত্রেই বিশেষ বিদিত হইয়া, বঙ্গ শব্দের সহিত সংযোজনা করিয়া, উভয় ভাষায় মিলিত অথচ অর্থবিশিষ্ট কবিতা অনায়াসেই প্রস্তুত করিতেন। ১১।১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই অভ্রমে অত্যল্প পরিশ্রমে ঈদৃশ মনোরম বাঙ্গালা গান প্রস্তুত করিতে পারগ হইয়াছিলেন যে, সখের দলের কথা দূরে থাকুক, উক্ত কাঞ্চনপল্লীতে বারোইয়ারী প্রভৃতি পূজোপলক্ষে যে সকল ওস্তাদী দল আগমন করিত, তাহাদের সমভিব্যাহারী ওস্তাদলোক উত্তর গান ত্বরায় প্রস্তুত করিতে অক্ষম হওয়াতে ঈশ্বর বাবু অনায়াসে অতি শীঘ্রই অতি সুশ্রাব্য চমৎকার গান পরিপাটী প্রণালীতে প্রস্তুত করিয়া দিতেন।"

লেখক পরে লিখিয়া গিয়াছেন, "ঈশ্বর বাবু অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থাতেই ইংরাজি বিদ্যাভ্যাস এবং জীবিকান্বেষণ জন্য কলিকাতায় আগমন করেন। আমার সহিত সন্দর্শন হইয়া প্রথমতঃ যখন তাঁহার সহিত প্রণয় সঞ্চার হয়, তখন আমারও পঠদ্দশা, তিনি যদিও আমার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বয়স্ক ছিলেন, তথাপি উভয়েই অপ্রাপ্তবয়স্ক, কেবল বিদ্যাভ্যাসেই আসক্ত ছিলাম। আমি সে সময় সর্ব্বদা তাঁহার সংসর্গে থাকিতাম, তাহাতে প্রায় প্রতিদিনই এক একটি অলৌকিক কাণ্ড প্রত্যক্ষ হইত। অর্থাৎ প্রত্যহই নানা বিষয়ে অবলীলাক্রমে অপূর্ব্ব কবিতা রচনা করিয়া সহচর সুহৃৎসমূহের সম্পূর্ণ সন্তোষ বিধান করিতেন। কোন ব্যক্তি কোন কঠিন সমস্যা পূরণ করিতে দিলে, তৎক্ষণাৎ তাহা যাদৃশ সাধু শব্দে সম্পূরণ করিতেন, তদ্রূপ পূর্ব্বে কদাপি প্রত্যক্ষ হয় নাই।"

উক্ত বাল্যসখা শেষ লিখিয়া গিয়াছেন, "ঈশ্বর বাবু যৎকালীন ১৭।১৮ বর্ষবয়স্ক, তৎকালীন দিবা রাত্রি একত্র সহবাস থাকাতে আমার নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। অনুমান হয়, এক মাস কি দেড় মাস মধ্যেই মিশ্র পর্য্যন্ত এককালীন মুখস্থ ও অর্থের সহিত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। শ্রুতিধরদিগের প্রশংসা অনেক শ্রুতিগোচর আছে, ঈশ্বর বাবুর অদ্ভুত শ্রুতিধরতা সর্ব্বদাই আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে। বাঙ্গালা কবিতা তাঁহার স্বপ্রণীতই হউক বা অন্যকৃতই হউক, একবার রচনা এবং সমক্ষে পাঠ মাত্রই হৃদয়ঙ্গম হইয়া, একেবারে চিত্রপটে চিত্রিতের ন্যায় চিত্রস্থ হইয়া চিরদিন সমান স্মরণ থাকিত।"

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর-বংশের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের মাতামহ-বংশের পরিচয় ছিল। সেই সূত্রে ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়াই ঠাকুর বাটীতে পরিচিত হয়েন। পাথুরিয়া-ঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রমোহন

ঠাকুরের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ সখ্য জন্মে। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার নিকট নিয়ত অবস্থানপূর্ব্বক কবিতা রচনা করিয়া সখ্য বৃদ্ধি করিতেন। যোগেন্দ্রমোহন, ঈশ্বরচন্দ্রের সমবয়স্ক ছিলেন। লেখা পড়া শিক্ষা এবং ভাষানুশীলনে তাহার অনুরাগ ও যত্ন ছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের সহবাসে তাঁহার রচনাশক্তিও জন্মিয়াছিল। যোগেন্দ্রমোহনই ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবী সৌভাগ্যের এবং যশকীর্ত্তির সোপানস্বরূপ।

ঠাকুর বাটীতে মহেশচন্দ্র নামে ঈশ্বরচন্দ্রের এক আত্মীয়ের গতিবিধি ছিল। মহেশচন্দ্রও কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। মহেশের কিঞ্চিৎ বাতিকের ছিট থাকায় লোকে তাঁহাকে "মহেশা পাগলা" বলিত। এই মহেশের সহিত ঠাকুর বাটীতে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রায়ই মুখে মুখে কবিতা-যুদ্ধ হইত।

ঈশ্বরচন্দ্রের যৎকালে ১৫ বর্ষ বয়স, তৎকালে গুপ্তীপাড়ার গৌড়হরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

দুর্গামণির কপালে সুখ হইল না। ঈশ্বরচন্দ্র দেখিলেন, আবার মেকি! দুর্গামণি দেখিতে কুৎসিত! হাবা! বোবার মত! এ ত স্ত্রী নহে, প্রতিভাশালী কবির অর্দ্ধাঙ্গ নহে—কবির সহধর্ম্মিণী নহে। ঈশ্বরচন্দ্র বিবাহের পর হইতে আর তাহার সঙ্গে কথা কহিলেন না।

ইহার ভিতর একটু Romanceও আছে। শুনা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র, কাঁচরাপাড়ার একজন ধনবানের একটি পরমা সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হয়েন। কিন্তু তাঁহার পিতা সে বিষয়ে মনোযোগী না হইয়া, গুপ্তীপাড়ার উক্ত গৌরহরি মল্লিকের উক্ত কন্যার সহিত বিবাহ দেন। গৌরহরি, বৈদ্যদিগের মধ্যে একজন প্রধান কুলীন ছিলেন, সেই কুল-গৌরবের কারণ এবং অর্থ দান করিতে হইল না বলিয়া, সেই পাত্রীর সহিতই ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা পুত্রের বিবাহ দেন। ঈশ্বরচন্দ্র পিতার আজ্ঞায় নিতান্ত অনিচ্ছায় বিবাহ করেন, কিন্তু বিবাহের পরই তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি আর সংসারধর্ম্ম করিব না। কিছু কাল পরে ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মীয় মিত্রগণ তাঁহাকে আর একটি বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি বলেন যে, দুই সতীনের ঝগড়ার মধ্যে পড়িয়া মারা যাওয়া অপেক্ষা বিবাহ না করাই ভাল।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী হইতে আমরা এই আর একটি মহতী নীতি শিক্ষা করি। ভরসা করি আধুনিক বর কন্যাদিগের ধনলোলুপ পিতৃমাতৃগণ এ কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিবেন।

ঈশ্বর গুপ্ত, স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ না করুন, চিরকাল তাঁহাকে গৃহে রাখিয়া ভরণ-পোষণ করিয়া, মৃত্যুকালে তাঁহার ভরণ-পোষণ জন্য কিছু কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলেন। দুর্গামণিও সচ্চরিত্রা ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, দুর্গামণি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

এখন আমরা দুর্গামণির জন্য বেশী দুঃখ করিব, না ঈশ্বরচন্দ্রের জন্য বেশী দুঃখ করিব? দুর্গামণির দুঃখ ছিল কি না তাহা জানি না। যে আগুনে ভিতর হইতে শরীর পুড়ে, সেই আগুন তাঁহার হৃদয়ে ছিল কি না জানি না। ঈশ্বরচন্দ্রের ছিল—কবিতায় দেখিতে পাই। অনেক দাহ করিয়াছে দেখিতে পাই। যে শিক্ষাটুকু স্ত্রীলোকের নিকট পাইতে হয়, তাহা তাঁহার হয় না। যে উন্নতি স্ত্রীলোকের সংসর্গে হয়,

স্ত্রীলোকের প্রতি স্নেহ ভক্তি থাকিলে হয়, তাঁহার তাহা হয় নাই। স্ত্রীলোক তাঁহার কাছে কেবল ব্যঙ্গের পাত্র। ঈশ্বর গুপ্ত তাহাদের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া হাসেন, মুখ ভেঙ্গান, গালি পাড়েন, তাহারা যে পৃথিবীর পাপের আকর তাহা নানা প্রকার অশ্লীলতার সহিত বলিয়া দেন—তাহাদের সুখময়ী, রসময়ী, পুণ্যময়ী করিতে পারেন না। এক একবার স্ত্রীলোককে উচ্চ আসনে বসাইয়া কবি যাত্রার সাধ মিটাইতে যান—কিন্তু সাধ মিটে না। তাঁহার উচ্চাসনস্থিতা নায়িকা বানরীতে পরিণত হয়। তাঁহার প্রণীত "মানভঞ্জন" নামক বিখ্যাত কাব্যের নায়িকা ঐরূপ। উক্ত কবিতা আমরা এই সংগ্রহে উদ্ধৃত করি নাই। স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় কথা বড় অল্পই উদ্ধৃত করিয়াছি। অনেক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত স্ত্রীলোক সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিদিগের ন্যায় মুক্তকণ্ঠ—অতি কদর্য্য ভাষায় ব্যবহার না করিলে, গালি পূরা হইল মনে করেন না। কাজেই উদ্ধৃত করিতে পারি নাই।

এখন দুর্গামণির জন্য দুঃখ করিব না, ঈশ্বর গুপ্তের জন্য? ভরসা করি, পাঠক বলিবেন, ঈশ্বর গুপ্তের জন্য।

১২৩৭ সালের কার্ত্তিক মাসে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা হরিনারায়ণের মৃত্যু হয়।

মাতার মৃত্যুর পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া, মাতুলালয়ে থাকিয়া, ঠাকুর বাটীতেই প্রতিপালিত হইতেন। পিতার মৃত্যুর পর অর্থোপার্জ্জন আবশ্যক হইয়া উঠে। জ্যেষ্ঠ গিরিশচন্দ্র এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ শিবচন্দ্র পূর্ব্বেই মরিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের লালন পালন ভার ঈশ্বরচন্দ্রের উপরই অর্পিত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—কর্ম্ম

প্রবাদ আছে, লক্ষ্মী সরস্বতীতে চিরকাল বিবাদ। সরস্বতীর বরপুত্রেরা প্রায় লক্ষ্মীছাড়া; লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা সরস্বতীর বিষনয়নে পতিত। কথাটা কতক সত্য হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে লক্ষ্মীর বড় অপরাধ নাই। বিক্রমাদিত্য হইতে কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত দেখিতে পাই লক্ষ্মীর বরপুত্রেরা সরস্বতীর পুত্রগণের বিশেষ সহায়। লক্ষ্মী, চিরকাল সরস্বতীকে হাত ধরিয়া তুলিয়া খাড়া করিয়া রাখিতেন; নহিলে বোধ হয়, সরস্বতী অনেক দিন, বিষ্ণুপার্শ্বে অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিয়া, ঘোর নিদ্রায় নিমগ্ন হইতেন—তাঁহার পালিত গর্দ্দভগুলি সহস্র চীৎকার করিলেও উঠিতেন না। এখন হয়ত সে ভাবটা তেমন নাই। এখন সরস্বতী কতকটা আপনার বলে বলবতী; অনেক সময়েই আপনার বলেই পদ্মবনে দাঁড়াইয়া বীণায় ঝঙ্কার দিতেছেন দেখিতে পাই। হয়ত দেখিতে পাই, দুই জনে একাসনে বসিয়াই সুখ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছেন—সতীনের মত কোন্দল ঝকড়া নাক কাটাকাটি কিছু নাই; অনেক সময়ে দেখি সরস্বতী আসিয়াছেন দেখিয়াই লক্ষ্মী আসিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু যখন ঈশ্বর গুপ্ত সরস্বতীর আরাধনায় প্রথম প্রবৃত্ত, তখন সে দিন উপস্থিত হয় নাই। লক্ষ্মীর একজন বরপুত্র তাঁহার সহায় হইলেন। লক্ষ্মী সরস্বতীকে হাত ধরিয়া তুলিলেন।

যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্বশক্তি এবং রচনাশক্তি দর্শনে এই সময়ে

অর্থাৎ ১২৩৭ সালে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি সংবাদপত্র প্রচার করিতে অভিলাষী হয়েন। ইহার পূর্ব্বে ৬ খানি মাত্র বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়াছিল।

(১) "বাঙ্গালা গেজেট"—১২২২ সালে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশ হয়। ইহাই প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র। (২) "সমাচার দর্পণ"—১২২৪ সালে শ্রীরামপুরের মিশনারিদিগের দ্বারা প্রকাশ হয়। (৩) ১২২৭ সালে রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে —"সংবাদ-কৌমুদী" প্রকাশ হয়। (৪) ১২২৮ সালে "সমাচার চন্দ্রিকা", (৫) "সংবাদ তিমিরনাশক" এবং (৬) বাবু নীলরত্ন হালদার কর্ত্তৃক "বঙ্গদূত" প্রকাশ হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র, যোগেন্দ্রমোহনের সাহায্যে, উৎসাহে এবং উদ্যোগে সাহসী হইয়া সন ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘে "সংবাদ প্রভাকর" প্রচারারম্ভ করেন। তৎকালে প্রভাকর সপ্তাহে একবার মাত্র প্রকাশ হইত।

ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে প্রভাকরের জন্ম-বিবরণ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, "৺বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সম্পূর্ণ সাহায্যক্রমে প্রথমে এই প্রভাকর পত্র প্রকটিত হয়। তখন আমাদিগের যন্ত্রালয় ছিল না। চোরবাগানে এক মুদ্রাযন্ত্র ভাড়া করিয়া ছাপা হইত। ৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে পূর্ব্বোক্ত ঠাকুর বাবুদিগের বাটীতে স্বাধীনরূপে যন্ত্রালয় স্থাপিত করা যায়। তাহাতে ৩৯ সাল পর্য্যন্ত সেই স্বাধীন যন্ত্রে অতি সম্ভ্রমের সহিত মুদ্রিত হইয়াছিল।"

কিঞ্চিদধিক ১৯ বর্ষবয়স্ক নবকবি-সম্পাদিত নব প্রভাকর অল্প দিনের মধ্যে সম্ভ্রান্ত কৃতবিদ্য সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। কলিকাতার যে সকল সম্ভ্রান্ত ধনবান এবং কৃতবিদ্য লেখক, সাপ্তাহিক প্রভাকরের সহায়তা করেন, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে তাঁহাদিগের নামের নিম্নলিখিত তালিকা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—

"শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, ৺বাবু নন্দলাল ঠাকুর, ৺বাবু চন্দ্রকুমার ঠাকুর, ৺বাবু নন্দকুমার ঠাকুর, ৺বাবু রামকমল সেন, শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ৺হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন, শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, বাবু নীলরত্ন হালদার, বাবু ব্রজমোহন সিংহ, ৺কৃষ্ণচন্দ্র বসু, বাবু রসিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু ধর্ম্মদাস পালিত, বাবু শ্যামাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত নীলমণি মতিলাল ও অন্যান্য। শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ যিনি এক্ষণে সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধ্যাপক, তিনি লিপি বিষয়ে বিস্তর সাহায্য করিতেন। তাঁহার রচিত সংস্কৃত শ্লোকদ্বয়* অদ্যাবধি প্রভাকরের শিরোভূষণ রহিয়াছে। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয় অনেক উত্তম গদ্য পদ্য লিখিয়া প্রভাকরের শোভা ও প্রশংসা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।"

এই প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্ত্তি। মধ্যে একবার প্রভাকর মেঘে

---

* সতাং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ।
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসম্বাদনবপ্রভাকরঃ॥
নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষিন্দীবরেষু কচিদভ্রামংভ্রামমতান্দ্রমীষদমৃতং পীত্বা ক্ষুধাকাতরাঃ।
অদ্যোত্তবিমল প্রভাকরকরপ্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং দিবসে পিবন্তু চতুরাঃ স্বান্তদ্বিরেফা রসং॥

ঢাকা পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু আবার পুনরুদিত হইয়া অদ্যাপি কর বিতরণ করিতেছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য এই প্রভাকরের নিকট বিশেষ ঋণী। মহাজন মরিয়া গেলে খাতক আর বড় তার নাম করে না। ঈশ্বর গুপ্ত গিয়াছেন, আমরা আর সে ঋণের কথা বড় একটা মুখে আনি না। কিন্তু এক দিন প্রভাকর বাঙ্গালা সাহিত্যের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। প্রভাকর বাঙ্গালা রচনার রীতিও অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া যান। ভারতচন্দ্রী ধরণটা তাঁহার অনেক ছিল বটে—অনেক স্থলে তিনি ভারতচন্দ্রের অনুগামী মাত্র, কিন্তু আর একটা ধরণ ছিল, যা কখন বাঙ্গালা ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাঙ্গালার ভাষা তেজস্বিনী হইয়াছে। নিত্য নৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়। আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষপার্ব্বণ, আজ মিশনরি, কাল উমেদারি, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন। আর ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কীর্ত্তি ছাড়া প্রভাকরের শিক্ষানবিশদিগের একটা কীর্ত্তি আছে। দেশের অনেকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একজন। বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর একজন। শুনিয়াছি, বাবু মনোমোহন বসু আর একজন। ইহার জন্যও বাঙ্গালার সাহিত্য, প্রভাকরের নিকট ঋণী। আমি নিজে প্রভাকরের নিকটে বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন।

১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন প্রাণত্যাগ করায়, সংবাদ প্রভাকরের তিরোধান হয়। ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, "এই সময়ে (১২৩৯ সালে) জগদীশ্বর আমাদিগের কর্ম্ম এবং উৎসাহের শিরে বিষম বজ্র নিক্ষেপ করিলেন, অর্থাৎ মহোপকারী সাহায্যকারী বহুগুণধারী আশ্রয়দাতা বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় সাংঘাতিক রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কৃতান্তের দন্তে পতিত হইলেন। সুতরাং ঐ মহাত্মার লোকান্তরগমনে আমরা অপর্য্যাপ্ত শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া এককালীন সাহস এবং অনুরাগশূন্য হইলাম। তাহাতে প্রভাকর করের অনাদররূপ মেঘাচ্ছন্ন হওন জন্য এই প্রভাকর কর প্রচ্ছন্ন করিয়া কিছু দিন গুপ্তভাবে গুপ্ত হইলেন।"

প্রভাকর সম্পাদন দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র সাধারণ্যে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার কবিত্ব এবং রচনাশক্তি দর্শনে আন্দুলের জমীদার বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক, ১২৩৯ সালের ১০ শ্রাবণে "সংবাদ রত্নাবলী" প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পাদক হয়েন।

১২৫৯ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্গালা সংবাদপত্রসমূহের যে ইতিবৃত্ত প্রকাশ করেন, তন্মধ্যে এই রত্নাবলী সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, "বাবু জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের আনুকূল্যে মেছুয়াবাজারের অন্তঃপাতী বাঁশতলার গলিতে "সংবাদ রত্নাবলী" আবির্ভূত হইল। মহেশচন্দ্র পাল এই পত্রের নামধারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার কিছু মাত্র রচনাশক্তি ছিল না। প্রথমে ইহার লিপিকার্য্য আমরাই নিষ্পন্ন করিতাম। রত্নাবলী সাধারণ সমীপে সাতিশয় সমাদৃত হইয়াছিল। আমরা তৎকর্ম্মে বিরত হইলে, রঙ্গপুর ভূম্যধিকারী সভার পূর্ব্বতন সম্পাদক ৺রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সেই পদে নিযুক্ত হয়েন।"

ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র, ১২৬৬ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, "ফলতঃ গুণাকর প্রভাকর কর বহুকাল রত্নাবলীর সম্পাদকীয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন না, তাহা পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ প্রদেশে শ্রীক্ষেত্রাদি তীর্থ দর্শনে গমন করিয়া, কটকে পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত শ্যামামোহন রায় পিতৃব্য মহাশয়ের সদনে কিছু দিন অবস্থান করিয়া, একজন অতি সুপণ্ডিত দণ্ডীর নিকট তন্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। এবং তাহার কিয়দংশ বঙ্গভাষায় সুমিষ্ট কবিতায় অনুবাদও করিয়াছিলেন।"

১২৪৩ সালের বৈশাখ মাসে ঈশ্বরচন্দ্র কটক হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়াই প্রভাকরের পুনঃ প্রচার জন্য চেষ্টিত হয়েন। তাঁহার সে বাসনাও সফল হয়। ১২৫৩ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র, প্রভাকরের পূর্ব্ববৃত্তান্ত প্রকাশ সূত্রে লিখিয়া গিয়াছেন, "১২৪৩ সালের ২৭এ শ্রাবণ বুধবার দিবসে এই প্রভাকরকে পুনর্ব্বার বারত্রয়িক রূপে প্রকাশ করি, তখন এই গুরুতর কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারি, আমাদিগের এমত সম্ভাবনা ছিল না। জগদীশ্বরকে চিন্তা করিয়া এতৎ অসমসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে পাতুরেঘাটানিবাসী সাধারণ-মঙ্গলাভিলাষী বাবু কানাইলাল ঠাকুর, এবং তদনুজ বাবু গোপাললাল ঠাকুর মহাশয় যথার্থ হিতকারী বন্ধুর স্বভাবে ব্যয়োপযুক্ত বহুল বিত্ত প্রদান করিলেন, এবং অদ্যাবধি আমাদিগের আবশ্যক ক্রমে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা সাধ্যমত উপকার করিতে ত্রুটি করেন না। এ কারণ আমরা উল্লিখিত ভ্রাতাদ্বয়ের পরোপকারিতা গুণের ঋণের নিমিত্ত জীবনের স্থায়িত্ব কাল পর্য্যন্ত দেহকে বন্ধক রাখিলাম।"

অল্পকালের মধ্যেই প্রভাকরের প্রভা আবার সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। নগর এবং গ্রাম্য-প্রদেশের সম্ভ্রান্ত জমীদার এবং কৃতবিদ্যগণ এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে যথেষ্ট সহায়তা করিতে থাকেন। কয়েক বর্ষের মধ্যেই প্রভাকর এত দূর উন্নতি লাভ করে যে, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ় হইতে প্রভাকরকে প্রাত্যহিক পত্রে পরিণত করেন। ভারতবর্ষের দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে এই প্রভাকরই প্রথম প্রাত্যহিক।

প্রভাকর প্রাত্যহিক হইলে, যে সকল ব্যক্তি লিপি সাহায্য এবং উৎসাহ দান করেন, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৪ সালের ২রা বৈশাখের প্রভাকরে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন,—

"প্রভাকরের লেখকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রভাকরের পুরাতন লেখকদিগের মধ্যে যে যে মহোদয় জীবিত আছেন, তাঁহাদের নাম নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম;—

শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ, রাধানাথ শিরোমণি, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, বাবু নীলরত্ন হালদার, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, ব্রজমোহন সিংহ, গোপালকৃষ্ণ মিত্র, বিশ্বম্ভর পাইন, গোবিন্দচন্দ্র সেন, ধর্ম্মদাস পালিত, বাবু কানাইলাল ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীশম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর, হরিমোহন সেন, জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক।"

"সীতানাথ ঘোষ, গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, হরনাথ মিত্র, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, গোপালচন্দ্র দত্ত, শ্যামাচরণ বসু, উমানাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনাথ শীল, এবং শম্ভুনাথ পণ্ডিত ইঁহারা কেহ তিন চারি বৎসর পর্য্যন্ত প্রভাকরের লেখক বন্ধুর শ্রেণী মধ্যে ভুক্ত হইয়াছেন।"

"শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আমাদিগের সম্প্রদায়ের এক জন প্রধান সংযুক্ত বন্ধু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদকের ন্যায় তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, অতএব ইঁহাদিগের বিষয় প্রকাশ করা অতিরেক মাত্র। বিশেষতঃ শেষোক্ত ব্যক্তির শ্রমের হস্তে যখন আমরা সমুদয় কর্ম্ম সমর্পণ করি, তখন তাঁহার ক্ষমতা সকলেই বিবেচনা করিবেন।"

"রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্মদ্দিগের সংযোজিত লেখক বন্ধু, ইঁহার সদ্গুণ ও ক্ষমতার কথা কি ব্যাখ্যা করিব! এই সময়ে আমাদিগের পরম স্নেহান্বিত মৃত বন্ধু বাবু প্রসন্নচন্দ্র ঘোষের শোক পুনঃ পুনঃ শেল স্বরূপ হইয়া হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। যেহেতু ইনি রচনা বিষয়ে তাঁহার ন্যায় ক্ষমতা দর্শাইতেছেন, বরং কবিত্ব ব্যাপারে ইঁহার অধিক শক্তি দৃষ্ট হইতেছে। কবিতা নর্ত্তকীর ন্যায় অভিপ্রায়ের বাদ্য তালে ইঁহার মানস্বরূপ নাট্যশালায় নিয়ত নৃত্য করিতেছে। ইনি কি গদ্য কি পদ্য উভয় রচনা দ্বারা পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন।"

"ঠাকুরবংশীয় মহাশয়দিগের নামোল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র, যেহেতু প্রভাকরের উন্নতি সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি যে কিছু তাহা কেবল ঐ ঠাকুরবংশের অনুগ্রহ দ্বারাই হইয়াছে। মৃত বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথমতঃ ইহাকে স্থাপিত করেন। পরে বাবু কানাইলাল ঠাকুর ও গোপাললাল ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, নন্দলাল ঠাকুর, বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, মৃত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, বাবু মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু মথুরানাথ ঠাকুর, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাদিগের আশার অতীত কৃপা বিতরণ করিয়াছেন, এবং ইঁহাদিগের যত্নে অদ্যাপি অনেক মহাশয় আমাদিগের প্রতি যথোচিত স্নেহ করিয়া থাকেন।"

"এই প্রভাকরের প্রতি বাবু গিরিশচন্দ্র দেব মহাশয়ের অত্যন্ত অনুগ্রহ জন্য আমরা অত্যন্ত বাধ্য আছি। বিবিধ বিদ্যাতৎপর মহানুভব বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাকরের প্রতি অতিশয় স্নেহ করতঃ ইহার সৌভাগ্যবর্দ্ধন বিষয়ে বিপুল চেষ্টা করিয়া থাকেন। বাবু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, বাবু মাধবচন্দ্র সেন, বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ী, বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বৈকুণ্ঠনাথ চৌধুরী, রায় হরিনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাদিগের পত্রে সমাদর করিয়া, উন্নতিকল্পে বিলক্ষণ যত্নশীল আছেন।"

প্রভাকরের বর্ষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখক এবং সাহায্যকারী সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত জমীদার এবং কলিকাতার প্রায় সমস্ত ধনবান এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তি প্রভাকরের গ্রাহক ছিলেন। মূল্যদানে অসমর্থ অনেক ব্যক্তিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিনামূল্যে প্রভাকর দান করিতেন। তাহার সংখ্যাও ৩।৪ শত হইবে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানের প্রবাসী বাঙ্গালীগণও গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া নিয়ত স্থানীয় প্রয়োজনীয় সংবাদ পাঠাইতেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে সেই সকল সংবাদদাতা সংবাদ প্রেরণে প্রভাকরের বিশেষ উপকার করেন। প্রভাকর এই সময়ে বাঙ্গালার সংবাদপত্রসমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া লয়।

১২৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র "পাষণ্ডপীড়ন" নামে একখানি পত্রের সৃষ্টি করেন। ১২৫৭

সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন, "১২৫৩ সালের আষাঢ় মাসের সপ্তম দিবসে প্রভাকর যন্ত্রে পাষণ্ডপীড়নের জন্ম হইল। ইহাতে পূর্ব্বে কেবল সর্ব্বজন-মনোরঞ্জন প্রকৃষ্ট প্রবন্ধ পুঞ্জ প্রবটিত হইত, পরে ৫৪ সালে কোন বিশেষ হেতুতে পাষণ্ডপীড়ন, পাষণ্ডপীড়ন করিয়া. আপনিই পাষণ্ড হস্তে পীড়িত হইলেন। অর্থাৎ সীতানাথ ঘোষ নামক জনৈক কৃতঘ্ন ব্যক্তি যাহার নামে এই পত্র প্রচারিত হয়, সেই অধার্ম্মিক ঘোষ বিপক্ষের সহিত যোগদান করতঃ ঐ সালের ভাদ্র মাসে পাষণ্ডপীড়নের হেড চুরি করিয়া পলায়ন করিল, সুতরাং আমাদিগের বন্ধুগণ তৎপ্রকাশে বঞ্চিত হইলেন। ঐ ঘোষ উক্ত পত্র ভাস্করের করে দিয়া পাতরে আছড়াইয়া নষ্ট করিল।"

সম্বাদ ভাস্কর-সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের অনেক দিন হইতেই মিত্রতা ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ২রা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, "সুবিখ্যাত পণ্ডিত ভাস্কর-সম্পাদক তর্কবাগীশ মহাশয় পূর্ব্বে বন্ধুরূপে এই প্রভাকরের অনেক সাহায্য করিতেন, এক্ষণে সময়াভাবে আর সেরূপ পারেন না।"

১২৫৪ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র পুনরায় লেখেন, "ভাস্কর-সম্পাদক ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইক্ষণে যে গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, তাহাতে কি প্রকারে লিপি দ্বারা অস্মৎ পত্রের আনুকূল্য করিতে পারেন? তিনি ভাস্কর পত্রকে অতি প্রশংসিত রূপে নিষ্পন্ন করিয়া বন্ধুগণের সহিত আলাপাদি করেন, ইহাতেই তাঁহাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করি। বিশেষতঃ সুখের বিষয় এই যে, সম্পাদকের যে যথার্থ ধর্ম্ম, তাহা তাঁহাতেই আছে।"

এই ১২৫৪ সালেই তর্কবাগীশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্রের বিবাদ আরম্ভ এবং ক্রমে প্রবল হয়। ঈশ্বরচন্দ্র "পাষণ্ডপীড়ন" এবং তর্কবাগীশ "রসরাজ" পত্র অবলম্বনে কবিতাযুদ্ধ আরম্ভ করেন। শেষে নিতান্ত অশ্লীলতা, গ্লানি, এবং কুৎসাপূর্ণ কবিতায় পরস্পরে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে থাকেন। দেশের সর্ব্বসাধারণে সেই লড়াই দেখিবার জন্য মত্ত হইয়া উঠে। সেই লড়াইয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের জয় হয়।

কিন্তু দেশের রুচিকে বলিহারি! সেই কবিতা-যুদ্ধ যে কি ভয়ানক ব্যাপার, তাহা এখনকার পাঠকের বুঝিয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই। দৈবাধীন আমি এক সংখ্যা মাত্র রসরাজ একদিন দেখিয়াছিলাম। চারি পাঁচ ছত্রের বেশী আর পড়া গেল না। মনুষ্য-ভাষা যে এত কদর্য্য হইতে পারে, ইহা অনেকেই জানে না। দেশের লোকে এই কবিতা-যুদ্ধে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বলিহারি রুচি! আমার স্মরণ হইতেছে, দুই পত্রের অশ্লীলতায় জ্বালাতন হইয়া, লং সাহেব অশ্লীলতা নিবারণ জন্য আইন প্রচারে যত্নবান ও কৃতকার্য্য হয়েন। সেই দিন হইতে অশ্লীলতা পাপ আর বড় বাঙ্গালা সাহিত্যে দেখা যায় না।

অনেকের ধারণা যে, এই বিবাদ সূত্রে উভয়ের মধ্যে বিষম শত্রুতা ছিল। সেটি ভ্রম। তর্কবাগীশ গুরুতর পীড়ায় শয্যাগত হইলে, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহাকে দেখিতে গিয়া বিশেষ আত্মীয়তা প্রকাশ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র যে সময়ে মৃত্যুশয্যায় পতিত হন, তর্কবাগীশও সে সময়ে রুগ্নশয্যায় পতিত ছিলেন, সুতরাং সে সময়ে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রকে

দেখিতে আসিতে পারেন নাই। ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তর্কবাগীশ সেই রুগ্নশয্যায় শয়ন করিয়া ভাস্করে যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা দেওয়া গেল,—

"প্রশ্ন। প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কোথায় ?

উত্তর। স্বর্গে।

প্র। কবে গেলেন ?

উ। গত শনিবার গঙ্গাযাত্রা করিয়াছিলেন, রাত্রি দুই প্রহর এক ঘণ্টাকালে গমন করিয়াছেন।

প্র। তাঁহার গঙ্গাযাত্রা ও মৃত্যুশোকের বিষয়, শনিবাসরীয় ভাস্করে প্রকাশ হয় নাই কেন ?

উ। কে লিখিবে ? গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য শয্যাগত।

প্র। কত দিন ?

উ। এক মাস কুড়ি দিন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এই দুইটি নাম দক্ষিণ হস্তে লইয়া বক্ষঃস্থলে রাখিয়া দিয়াছেন, যদি মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান, তবে আপনার পীড়ার বিষয় ও প্রভাকর-সম্পাদকের মৃত্যুশোক স্বহস্তে লিখিবেন, আর যদি প্রভাকর-সম্পাদকের অনুগমন করিতে হয়, তবে উভয় সম্পাদকের জীবন বিবরণ ও মৃত্যুশোক প্রকাশ জগতে অপ্রকাশ রহিল।"

তর্কবাগীশ মহাশয়, ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর ঠিক এক পক্ষ পরেই অর্থাৎ ১২৬৫ সালের ২৪এ মাঘ প্রাণত্যাগ করেন।

পাষণ্ডপীড়ন উঠিয়া যাইলে, ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে ঈশ্বরচন্দ্র "সাধুরঞ্জন" নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। এখানিতে তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীর কবিতা ও প্রবন্ধ সকল প্রকাশ হইত। "সাধুরঞ্জন" ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল।

অল্প বয়স হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা এবং মফস্বলের অনেকগুলি সভায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভা, টাকীর নীতিতরঙ্গিণী সভা, দর্জ্জিপাড়ার নীতিসভা প্রভৃতির সভ্যপদে নিযুক্ত থাকিয়া মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা, প্রবন্ধ এবং কবিতা পাঠ করিতেন। তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে তিনি আজিকার দিনে বাঁচিয়া নাই ; তাহা হইলে সভার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইতেন। রামরঙ্গিণী, শ্যামতরঙ্গিণী, নববাহিনী, ভবদাহিনী প্রভৃতি সভার জ্বালায়, তিনি কলিকাতা ছাড়িতেন সন্দেহ নাই। কলিকাতা ছাড়িলেও নিষ্কৃতি পাইতেন, এমন নহে। গ্রামে গেলে দেখিতেন, গ্রামে গ্রামরক্ষিণী সভা, হাটে হাটভঞ্জিনী, মাঠে মাঠসঞ্চারিণী, ঘাটে ঘাটসাধনী, জলে জলতরঙ্গিণী, স্থলে স্থলশায়িনী, খানায় নিখাতিনী, ডোবায় নিমজ্জিনী, বিলে বিলবাসিনী, এবং মাচার নীচে অলাবু-সমপহারিণী সভা সকল সভ্য সংগ্রহের জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছে।

সে কাল আর এ কালের সন্ধিস্থানে ঈশ্বর গুপ্তের প্রাদুর্ভাব। এ কালের মত তিনি নানাসভার সভ্য, নানা স্কুল কমিটির মেম্বার ইত্যাদি ছিলেন—আবার ও দিকে কবির দলে, হাফ আখড়াইয়ের দলে গান বাঁধিতেন। নগর এবং উপনগরের সখের কবি এবং হাফ আখড়াই দলসমূহের সংগীতসংগ্রামের সময় তিনি কোন না কোন পক্ষে নিযুক্ত

হইয়া সংগীত রচনা করিয়া দিতেন। অনেক স্থলেই তাঁহার রচিত গীত ঠিক উত্তর হওয়ায় তাঁহারই জয় হইত। সখের দলসমূহ সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই হস্তগত করিতে চেষ্টা করিত, তাঁহাকে পাইলে আর অন্য কবির আশ্রয় লইত না।

সন ১২৫৭ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্র একটি নূতন অনুষ্ঠান করেন। নববর্ষে অর্থাৎ প্রতি বর্ষের ১লা বৈশাখে তিনি স্বীয় যন্ত্রালয়ে একটি মহতী সভা সমাহূত করিতে আরম্ভ করেন। সেই সভায় নগর, উপনগর, এবং মফস্বলের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক এবং সে সময়ের সমস্ত বিদ্বান ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইতেন। কলিকাতার ঠাকুরবংশ, মল্লিকবংশ, দত্তবংশ, শোভাবাজারের দেববংশ প্রভৃতি সমস্ত সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা সেই সভায় উপস্থিত হইতেন। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির ন্যায় মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই সভায় মনোরম প্রবন্ধ এবং কবিতা পাঠ করিয়া, সভাস্থ সকলকে তুষ্ট করিতেন। পরে ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহাদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইত, তাঁহারা তাহা পাঠ করিতেন। যে সকল ছাত্রের রচনা উৎকৃষ্ট হইত, তাঁহারা নগদ অর্থ পুরস্কার স্বরূপ পাইতেন। নগর ও মফস্বলের অনেক সম্ভ্রান্তলোক ছাত্রদিগকে সেই পুরস্কার দান করিতেন। সভাভঙ্গের পর ঈশ্বরচন্দ্র সেই আমন্ত্রিত প্রায় চারি পাঁচ শত লোককে মহাভোজ দিতেন।

প্রাত্যহিক প্রভাকরের কলেবর ক্ষুদ্র, এবং তাহাতে সম্পাদকীয় উক্তি এবং সংবাদাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রদান করিতে হইত, এজন্য ঈশ্বরচন্দ্র তাহাতে মনের সাধে কবিতা লিখিতে পারিতেন না। সেইজন্যই তিনি ১২৬০ সালের ১লা তারিখ হইতে এক একখানি স্থূলকায় প্রভাকর প্রতি মাসের ১লা তারিখে প্রকাশ করিতেন। মাসিক প্রভাকরে নানাবিধ খণ্ড কবিতা ব্যতীত গদ্য-পদ্যপূর্ণ গ্রন্থও প্রকাশ করিতে থাকেন।

প্রভাকরের দ্বিতীয় বার অভ্যুদয়ের কয়েক বর্ষ পর হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র দৈনিক প্রভাকর সম্পাদনে ক্ষান্ত হয়েন। কেবল মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিতেন এবং বিশেষ রাজনৈতিক বা সামাজিক কোন ঘটনা হইলে, তৎসম্বন্ধে সম্পাদকীয় উক্তি লিখিতেন। সহকারী সম্পাদক বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেন। মাসিক পত্র সৃষ্টির পর হইতে ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ পরিশ্রম করিয়া, তাহা সম্পাদন করিতেন। শেষ অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্রের দেশপর্য্যটনে বিশেষ অনুরাগ জন্মে। সেই জন্যই তিনি সহকারীর হস্তে সম্পাদনভার দান করিয়া, পর্য্যটনে বহির্গত হইতেন। কলিকাতায় থাকিলে, অধিকাংশ সময়ে উপনগরের কোন উদ্যানে বাস করিতেন।

শারদীয়া পূজার পর জলপথে প্রায়ই ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। তিনি পূর্ব্ববাঙ্গালা ভ্রমণে বহির্গত হইয়া, রাজা রাজবল্লভের কীর্ত্তিনাশ দর্শনে কবিতা প্রণয়নপূর্ব্বক প্রভাকরে প্রকাশ করেন। আদিশূরের যজ্ঞস্থলের ইতিবৃত্তও প্রকাশ করিয়াছিলেন। গৌড় দর্শন করিয়া তাহার ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে কবিতা রচনা করেন। গয়া, বারাণসী, প্রয়াগ প্রভৃতি প্রদেশ ভ্রমণে বর্ষাধিক কাল অতিবাহিত করেন। তিনি যেখানে যাইতেন, সেইখানেই সমাদর এবং সম্মানের সহিত গৃহীত হইতেন। যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন না, তাঁহারাও তাঁহার মিষ্টভাষিতায় মুগ্ধ হইয়া আদর করিতেন। এই ভ্রমণসূত্রে স্বদেশের

সকল প্রান্তের সম্ভ্রান্ত লোকের সহিতই তাঁহার আলাপ পরিচয় এবং মিত্রতা হইয়াছিল। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া মফস্বলের ধনবান জমীদারগণ মহানন্দ প্রকাশ করিতেন এবং অযাচিত হইয়া পাথেয়স্বরূপ পর্য্যাপ্ত অর্থ এবং নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্য উপহার দিতেন। যাঁহার সহিত একবার আলাপ হইত, তিনিই ঈশ্বরচন্দ্রের মিত্রতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতেন। মিষ্টভাষিতা এবং সরলতার দ্বারা তিনি সকলেরই হৃদয় হরণ করিতেন। ভ্রমণকালে কোন অপরিচিত স্থানে নৌকা লাগিলে, তীরে উঠিয়া পথে যে সকল বালককে খেলিতে দেখিতেন, তাহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া, তাহাদিগের বাটীতে যাইতেন। তাহাদিগের বাটীতে লাউ, কুমড়া প্রভৃতি কোন ফল মূল দেখিতে পাইলে চাহিয়া আনিতেন। ইহাতে কোন হীনতা বোধ করিতেন না। বালকদিগের অভিভাবকগণ শেষে ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচয় প্রাপ্ত হইলে, যথাসাধ্য সমাদর করিতে ত্রুটি করিতেন না। ভ্রমণকালে বালকদিগকে দেখিতে পাইলে, তাহাদিগকে ডাকিয়া গান শুনিতেন এবং সকলকে পয়সা দিয়া তুষ্ট করিতেন।

প্রাচীন কবিদিগের অপ্রকাশিত লুপ্তপ্রায় কবিতাবলী, গীত, পদাবলী এবং তৎসহ তাঁহাদিগের জীবনী প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র ক্রমাগত দশবর্ষকাল নানা স্থান পর্য্যটন, এবং যথেষ্ট শ্রম করিয়া শেষ সে বিষয়ে সফলতা লাভ করেন। বাঙ্গালীজাতির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রই এ বিষয়ের প্রথম উদ্যোগী। সর্ব্বাদৌ ১২৬০ সালের ১লা পৌষের মাসিক প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র বহুকষ্টে সংগৃহীত রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও তৎপ্রণীত "কালীকীর্ত্তন" ও "কৃষ্ণকীর্ত্তন" প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি লুপ্তপ্রায় গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে প্রতি মাসের প্রভাকরে রামনিধি সেন (নিধুবাবু), হরঠাকুর, রাম বসু, নিতাইদাস বৈরাগী, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, রাসু ও নৃসিংহ এবং আর কয়েক জন প্রাচীন খ্যাতনামা কবির জীবনচরিত, গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। সেগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

মৃত কবি ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনী এবং তৎপ্রণীত অনেক লুপ্তপ্রায় কবিতা এবং পদাবলী বহুপরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া, সন ১২৬২ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠের প্রভাকরে প্রকাশ করেন। সেই সনের আষাঢ় মাসে তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম পুস্তক প্রকাশ।

১২৬৪ সালের ১লা বৈশাখের প্রভাকরে "প্রবোধ প্রভাকর" নামে গ্রন্থ প্রকাশারম্ভ হইয়া, সেই সনের ১লা ভাদ্রে তাহা শেষ হয়। পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন সেই পুস্তক প্রণয়ন কালে তাঁহার বিশেষ সহায়তা করেন। উক্ত সনের ১লা চৈত্রে "প্রবোধ প্রভাকর" স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ হয়।

তৎপরে প্রতি মাসের মাসিক প্রভাকরে ক্রমান্বয়ে "হিতপ্রভাকর" এবং "বোধেন্দু-বিকাশ" প্রকাশ ও সমাপ্ত করেন। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার অনুজ বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত পরে পুস্তকাকারে "হিতপ্রভাকর" ও "বোধেন্দুবিকাশে"র প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন। তিনখানি পুস্তকেরই দ্বিতীয় খণ্ড অপ্রকাশিত আছে।

কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস এবং নীতিবিষয়ক অনেকগুলি কবিতা "নীতিহার" নামে প্রভাকরে প্রকাশ করেন।

১২৬৫ সালের মাঘ মাসের মাসিক প্রভাকর সম্পাদনের পর ঈশ্বরচন্দ্র শ্রীমদ্ভাগবতের বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। মঙ্গলাচরণ এবং পরবর্ত্তী কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ করিয়াই তিনি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন।

অবিশ্রান্ত মস্তিষ্ক চালনাসূত্রে মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইত। সেই জন্যই মধ্যে মধ্যে জলপথে এবং স্থলপথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। ১২৬০ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্রের শ্রম বৃদ্ধি হয়। মাসিক পত্র সম্পাদন এবং উপর্য্যুপরি কয়খানি গ্রন্থ এই সময় হইতে লিখেন। কিন্তু এই সময়টিই তাঁহার জীবনের মধ্যাহ্নকালস্বরূপ সমুজ্জ্বল।

১২৬৫ সালের মাঘের মাসিক প্রভাকর সম্পাদন করিয়াই ঈশ্বরচন্দ্র জ্বররোগে আক্রান্ত হয়েন। শেষ তাহা বিকারে পরিণত হয়। উক্ত সনের ৮ই মাঘের প্রভাকরের সম্পাদকীয় উক্তিতে নিম্নলিখিত কথা প্রকাশ হয়;—

"অদ্য কয়েক দিবস হইতে আমাদিগের সর্ব্বাধ্যক্ষ কবিকুলকেশরী শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় জ্বরবিকার রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাগত আছেন। শারীরিক গ্লানি যথেষ্ট হইয়াছিল, সদ্গুণযুক্ত গুণযুক্ত এতদ্দেশীয় বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়েরা চিকিৎসা করিতেন। তদ্দ্বারা শারীরিক গ্লানি অনেক নিবৃত্তি পাইয়াছে। ফলে এক্ষণে রোগ নিঃশেষ হয় নাই।"

ঈশ্বরচন্দ্রের রোগের সংবাদ প্রকাশ হইবামাত্র দেশের সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত লোকেরা এবং মিত্রমণ্ডলী দুঃখিতান্তকরণে ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখিতে যান। অনেকে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট অবস্থান, তত্ত্বাবধান এবং চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ দান করিতে থাকেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের পীড়ায় সাধারণকে নিতান্ত উদ্বিগ্ন এবং বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখিয়া, পরদিনের অর্থাৎ ৯ই মাঘের প্রভাকরে তাঁহার অবস্থার ও চিকিৎসার বিবরণ প্রকাশিত হয়।

তৎপরদিন অর্থাৎ ১০ মাঘের প্রভাকরে তাহার পর বৃত্তান্ত লিখিত হয়। পীড়ায় সকল মনুষ্যেরই দুঃখ সমান—সকল চিকিৎসকেরই বিদ্যা সমান এবং সকল ব্যাধিরই পরিণাম শেষ এক। অতএব সে সকল কিছুই উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন দেখি না।

১০ই মাঘ শনিবারে ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনাশা ক্ষীণ হইয়া আসিলে, হিন্দুপ্রথামত তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রা করান হয়। ১২ই মাঘ সোমবারের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র লেখেন,—

"সংবাদ প্রভাকরের জন্মদাতা ও সম্পাদক আমার সহোদর পরমপূজ্যবর ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহোদয় গত ১০ই মাঘ শনিবার রজনী অনুমান দুই প্রহর এক ঘটিকা কালে ৺ভাগীরথীতীরে নীরে সজ্ঞানে অনবরত স্বীয়াভিষ্টদেব ভগবানের নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক এতন্মায়াময় কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরলোকে পরমেশ্বর সাক্ষাৎকারে গমন করিয়াছেন।"

এক্ষণে ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ করিব। ঈশ্বরচন্দ্রের ভাগ্য তাঁহার স্বহস্তগঠিত।

তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া, অনুজ রামচন্দ্রের সহিত পরান্নে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। একদা সেই সময়ে রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "ভাই! আমাদিগের মাসিক ৪০৲ টাকা আয় হইলে, উত্তমরূপে চলিবে।" শেষ প্রভাকরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের দৈন্যদশা বিদূরিত হইয়া, সম্ভ্রান্ত ধনবানের ন্যায় আয় হইতে থাকে। প্রভাকর হইতেই অনেক টাকা আসিত। তদ্ব্যতীত সাধারণের নিকট হইতে সকল সময়েই বৃত্তি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতেন। একদা অনুজ রামচন্দ্রকে অর্থোপার্জ্জনে উদাসীন দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি এক দিন ভিক্ষা করিতে বাহির হইলে, এই কলিকাতা হইতেই লক্ষ টাকা ভিক্ষা করিয়া আনিতে পারি, তোর দশা কি হইবে?" বাস্তবিক ঈশ্বরচন্দ্রের সেইরূপ প্রতিপত্তি হইয়াছিল।

অর্থের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র মমতা ছিল না। পাত্রাপাত্র ভেদ জ্ঞান না করিয়া সাহায্যপ্রার্থী মাত্রকেই দান করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ প্রতিনিয়তই তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন, ঈশ্বরচন্দ্রও তাঁহাদিগকে নিয়মিত বার্ষিক বৃত্তি দান ব্যতীত সময়ে সময়ে অর্থসাহায্য করিতেন। পরিচিত বা সামান্য পরিচিত ব্যক্তি, ঋণ প্রার্থনা করিলে, তৎক্ষণেই তাহা প্রদান করিতেন। কেহ সে ঋণ পরিশোধ না করিলে, তাহা আদায় জন্য ঈশ্বরচন্দ্র চেষ্টা করিতেন না। এই সূত্রে তাঁহার অনেক অর্থ পরহস্তগত হয়। সমধিক আয় হইতে থাকিলেও তাহার রীতিমত কোন হিসাবপত্র ছিল না। ব্যয় করিয়া যে সময়ে যত টাকা বাঁচিত, তাহা কলিকাতার কোন না কোন ধনী লোকের নিকট রাখিয়া দিতেন। তাহার রসিদপত্র লইতেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর অনেক বড়লোক (!!) সেই টাকাগুলি আত্মসাৎ করেন। রসিদ অভাবে তদীয় ভ্রাতা তৎসমস্ত আদায় করিতে পারেন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাটীর দ্বার অবারিত ছিল। দুই বেলাই ক্রমাগত উনুন জ্বলিত, যে আসিত, সেই আহার পাইত। তিনি প্রায় মধ্যে মধ্যে ভোজের অনুষ্ঠান করিয়া, আত্মীয় মিত্র এবং ধনী লোকদিগকে আহার করাইতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র প্রতি বৎসর বাঙ্গালার অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট হইতে মূল্যবান শাল উপহার পাইতেন। তৎসমস্ত গাঁটরি বাঁধা থাকিত। একদা একজন পরিচিত লোক বলিলেন, "শাল গুলা ব্যবহার করেন না, পোকায় কাটিবে, নষ্ট হইয়া যাইবে কেন; বিক্রয় করিলে, অনেক টাকা পাওয়া যাইবে। আমাকে দিউন, বিক্রয় করিয়া টাকা আনিয়া দিব।" ঈশ্বরচন্দ্র তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া কয়েক শত টাকা মূল্যের এক গাঁটরি শাল তাহাকে দিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি আর টাকাও দেয় নাই, শালও ফিরিয়া দেয় নাই, ঈশ্বরচন্দ্রও তাহার আর কোন তত্ত্বও লয়েন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাল্যকালে যদিও উদ্ধত, অবাধ্য এবং স্বেচ্ছানুরক্ত ছিলেন, বয়োবৃদ্ধি-সহকারে সে সকল দোষ যায়। তিনি সদাই হাস্যবদন; মিষ্ট কথা, রসের কথা, হাসির কথা নিয়তই মুখে লাগিয়া থাকিত। রহস্য এবং ব্যঙ্গ তাঁহার প্রিয় সহচর ছিল। কপটতা, ছলনা, চাতুরী জানিতেন না। তিনি সদালাপী ছিলেন। কথায় হউক,

বক্তৃতায় হউক, বিবাদে হউক, কবিতায় হউক, গীতে হউক, লোককে হাসাইতে বিলক্ষণ পটু ছিলেন। সামান্য বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলের সহিত সমান ব্যবহার করিতেন। শত্রুরাও তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইত।

চরিত্রটি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিল না। পানদোষ ছিল। প্রকাশ আছে যে, যে সময়ে তিনি সুরাপান করিতেন, সে সময়ে লেখনী অনর্গল কবিতা প্রসব করিত। যে কোন শ্রেণীর যে কোন পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তি যে কোন সময়ে তাঁহাকে যে কোন প্রকার কবিতা, গীত বা ছড়া প্রস্তুত করিয়া দিতে অনুরোধ করিত, তিনি আনন্দের সহিত তাঁহাদিগের আশা পূর্ণ করিতেন। কাহাকেও নিরাশ করিতেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র পুনঃ পুনঃ আপন কবিতায় স্বীকার করিয়াছেন, তিনি সুরাপান করিতেন।—

এক (১) দুই (২) তিন (৩) চারি (৪) ছেড়ে দেহ ছয় (৬)।
পাঁচেরে (৫) করিলে হাতে রিপু রিপু নয়॥
তঞ্চ ছাড়া পঞ্চ সেই অতি পরিপাটি।
বাবু সেজে পাটির উপরে রাখি পাটি॥
পাত্র হোয়ে পাত্র পেয়ে ঢোলে মারি কাটি।
ঝোলমাখা মাছ নিয়া চাটি দিয়া চাটি॥

তিনি সুরাপান করিতেন, এজন্য লোকে নিন্দা করিত। তাই ঈশ্বর গুপ্ত মধ্যে মধ্যে কবিতায় তাহাদিগের উপর ঝাল ঝাড়িতেন। ঋতু কবিতার মধ্যে পাঠক এই সংগ্রহে দেখিতে পাইবেন।

যখন ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয়, তখন আমি বালক, স্কুলের ছাত্র, কিন্তু তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত আমার স্মৃতিপথে বড় সমুজ্জ্বল। তিনি সুপুরুষ, সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট ছিলেন। কথার স্বর বড় মধুর ছিল। আমরা বালক বলিয়া আমাদের সঙ্গে নিজে একটু গম্ভীরভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন—তাঁহার কতকগুলা নন্দীভৃঙ্গী থাকিত—রসাভাসের ভার তাহাদের উপর পড়িত। ফলে তিনি রস ব্যতীত এক দণ্ড থাকিতে পারিতেন না। স্বপ্রণীত কবিতাগুলি পড়িয়া শুনাইতে ভাল বাসিতেন। আমরা বালক হইলেও আমাদিগকেও শুনাইতে ঘৃণা করিতেন না। কিন্তু হেমচন্দ্র প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার আবৃত্তিশক্তি পরিমার্জ্জিত ছিল না। যাহার কিছু রচনাশক্তি আছে, এমন সকল যুবককে তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কবিতা রচনার জন্য দীনবন্ধুকে, দ্বারকানাথ অধিকারীকে এবং আমাকে একবার প্রাইজ দেওয়াইয়াছিলেন। দ্বারকানাথ অধিকারী কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র—তিনিই প্রথম প্রাইজ পান। তাঁহার রচনাপ্রণালীটা কতকটা ঈশ্বর গুপ্তের মত ছিল—সকল স্বচ্ছ—দেশী কথায়, দেশী ভাব তিনি ব্যক্ত করিতেন। অল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। জীবিত থাকিলে বোধ হয় তিনি একজন উৎকৃষ্ট কবি হইতেন। দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু, ঈশ্বরচন্দ্র, সকলেই গিয়াছেন—তাঁহাদের কথাগুলি লিখিবার জন্য আমি আছি।

---

(১) কাম, (২) ক্রোধ, (৩) লোভ, (৪) মোহ, (৬) মাৎসর্য্য, (৫) মদ। "রিপু রিপু নয়" অর্থাৎ "মদ" শব্দ এখানে রিপু অর্থে বুঝিবে না।

সুরাপান করুন, আর পাঁটার স্তোত্র লিখুন, ঈশ্বরচন্দ্র বিলাসী ছিলেন না। সামান্ত বেশে, সামান্য ভাবে অবস্থান করিতেন। যথেষ্ট অর্থ থাকিলেও ধনী ব্যক্তির উপযোগী সাজসজ্জা কিছুই করিতেন না। বৈঠকখানায় একখানি সামান্ত গালিচা বা মাদুর পাতা থাকিত, কোন প্রকার আসবাব থাকিত না। সম্ভ্রান্ত লোকেরা আসিয়া তাহাতে বসিয়াই ঈশ্বরের সহিত আলাপ করিয়া তৃপ্ত হইয়া যাইতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—কবিত্ব

ঈশ্বর গুপ্ত কবি। কিন্তু কি রকম কবি?

ভারতবর্ষে পূর্ব্বে জ্ঞানীমাত্রকেই কবি বলিত। শাস্ত্রবেত্তারা সকলেই "কবি"। ধর্ম্মশাস্ত্রকারও কবি, জ্যোতিষশাস্ত্রকারও কবি।

তার পর কবি শব্দের অর্থের অনেক রকম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। "কাব্যেষু মাঘঃ কবিঃ কালিদাসঃ" এখানে অর্থটা ইংরেজি Poet শব্দের মত। তার পর এই শতাব্দীর প্রথমাংশে "কবির লড়াই" হইত। দুই দল গায়ক জুটিয়া ছন্দোবন্ধে পরস্পরের কথার উত্তর প্রত্যুত্তর দিতেন। সেই রচনার নাম "কবি"।

আবার আজকাল কবি অর্থে Poet, তাহাকে পারা যায়, কিন্তু "কবিত্ব" সম্বন্ধে আজকাল বড় গোল। ইংরেজিতে যাহাকে Poetry বলে, এখন তাহাই কবিত্ব। এখন এই অর্থ প্রচলিত, সুতরাং এই অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত কবি কি না আমরা বিচার করিতে বাধ্য।

পাঠক বোধ হয় আমার কাছে এমন প্রত্যাশা করেন না যে, এই কবিত্ব কি সামগ্রী, তাহা আমি বুঝাইতে বসিব। অনেক ইংরেজ বাঙ্গালী লেখক সে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের উপর আমার বরাত দেওয়া রহিল। আমার এই মাত্র বক্তব্য যে সে অর্থে ঈশ্বর গুপ্তকে উচ্চাসনে বসাইতে সমালোচক সম্মত হইবেন না। মনুষ্য-হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত, অস্ফুট ভাবগুলি ধরিয়া তাহাকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। সৌন্দর্য্যসৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার সৃষ্টিই বড় নাই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ইঁহারা সকলেই এ কবিত্বে তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রাচীনেরাও তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতচন্দ্রের ন্যায় হীরামালিনী গড়িবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না; কাশীরামের মত সুভদ্রাহরণ কি শ্রীবৎসচিন্তা, কীর্ত্তিবাসের মত তরণীসেন বধ, মুকুন্দরামের মত ফুল্লরা গড়িতে পারিতেন না। বৈষ্ণব কবিদের মত বীণায় ঝঙ্কার দিতে জানিতেন না। তাঁহার কাব্যে সুন্দর, করুণ, প্রেম, এ সব সামগ্রী বড় বেশী নাই। কিন্তু তাঁহার যাহা আছে, তাহা আর কাহারও নাই। আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা।

সংসারের সকল সামগ্রী কিছু ভাল নহে। যাহা ভাল, তাও কিছু এত ভাল নহে যে, তার অপেক্ষা ভাল আমরা কামনা করি না। সকল বিষয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা উৎকর্ষ আমরা কামনা করি। সে উৎকর্ষের আদর্শ সকল, আমাদের হৃদয়ে অস্ফুট রকম থাকে। সেই আদর্শ ও সেই কামনা, কবির সামগ্রী। যিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহাকে গঠন দিয়া শরীরী করিয়া, আমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন, সচরাচর তাঁহাকেই

আমরা কবি বলি। মধুসূদনাদি তাহা পারিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা পারেন নাই বা করেন নাই, এই জন্য এই অর্থে আমরা মধুসূদনাদিকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া, ঈশ্বরচন্দ্রকে নিম্নশ্রেণীতে ফেলিয়াছি। কিন্তু এইখানেই কি কবিত্বের বিচার শেষ হইল? কাব্যের সামগ্রী কি আর কিছু রহিল না?

রহিল বৈকি। যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য্য নাই? আছে বৈকি। ঈশ্বর গুপ্ত, সেই রসে রসিক, সেই সৌন্দর্য্যের কবি। যাহা আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্য-দেশের কবি। এই সমাজ, এই সহর, এই দেশ বড় কাব্যময়। অন্যে তাহাতে বড় রস পান না। তোমরা পৌষ পার্ব্বণে পিটাপুলি খাইয়া অজীর্ণে দুঃখ পাও, তিনি তাহার কাব্যরসটুকু সংগ্রহ করেন। অন্যে নববর্ষে মাংস চিবাইয়া, মদ গিলিয়া, গাঁদাফুল সাজাইয়া কষ্ট পায়, ঈশ্বর গুপ্ত মক্ষিকাবৎ তাহার সারাদান করিয়া নিজে উপভোগ করেন, অন্যকেও উপহার দেন। দুর্ভিক্ষের দিন, তোমরা মাতা বা শিশুর চক্ষে অশ্রুবিন্দু-শ্রেণী সাজাইয়া মুক্তাহারের সঙ্গে তাহার উপমা দাও—তিনি চালের দরটি কষিয়া দেখিয়া তার ভিতর একটু রস পান।

মনের চেলে মন ভেঙ্গেচে
ভাঙ্গা মন আর গড়ে না কো।

তোমরা সুন্দরীগণকে পুষ্পোদ্যানে বা বাতায়নে বসাইয়া প্রতিমা সাজাইয়া পূজা কর, তিনি তাহাদের রান্নাঘরে, উনুন গোড়ায় বসাইয়া, শাশুড়ী ননদের গঞ্জনায় ফেলিয়া, সত্যের সংসারের এক রকম খাঁটি কাব্যরস বাহির করেন;—

বধূর মধুর খনি, মুখশতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায়, চক্ষু ছল ছল।

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাঁটায়, রান্নাঘরের ধুঁয়ায়, নাটুরে মাঝির ধবজির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁটার অস্থিস্থিত মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর রস ছাড়া কাব্যরস পান, তপ্‌সে মাছে মৎস্যভাব ছাড়া তপস্বীভাব দেখেন, পাঁটার বোকাগন্ধ ছাড়া একটু দধীচির গায়ের গন্ধ পান। তিনি বলেন, "তোমাদের এদেশ, এ সমাজ বড় রঙ্গভরা। তোমরা মাথাকুটাকুটি করিয়া দুর্গোৎসব কর, আমি কেবল তোমাদের রঙ্গ দেখি—তোমরা এ ওকে ফাঁকি দিতেছ, এ ওর কাছে মেকি চালাইতেছ, এখানে কাষ্ঠহাসি হাস, ওখানে মিছা কান্না কাঁদ, আমি তা বসিয়া বসিয়া দেখিয়া হাসি। তোমরা বল, বাঙ্গালীর মেয়ে বড় সুন্দরী, বড় গুণবতী, বড় মনোমোহিনী—প্রেমের আধার, প্রাণের সংসার, ধর্ম্মের ভাণ্ডার;—তা হইলে হইতে পারে, কিন্তু আমি দেখি উহারা বড় রঙ্গের জিনিষ। মানুষে যেমন রূপী বাঁদর পোষে, আমি বলি পুরুষে তেমনি মেয়েমানুষ পোষে—উভয়কে মুখ ভেঙ্গানতেই সুখ।" স্ত্রীলোকের রূপ আছে—তাহা তোমার মত ঈশ্বর গুপ্তও জানিতেন, কিন্তু তিনি বলেন, উহা দেখিয়া মুগ্ধ হইবার কথা নহে—উহা দেখিয়া হাসিবার কথা। তিনি স্ত্রীলোকের রূপের কথা পড়িলে

হাসিয়া লুটাইয়া পড়েন। মাঘ মাসের প্রাতঃস্নানের সময় যেখানে অন্য কবি রূপ দেখিবার জন্য, যুবতিগণের পিছে পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে তাহাদের নাকাল দেখিবার জন্য যান। তোমরা হয়ত, সেই নীহারশীতল স্বচ্ছসলিলধৌত কম্বিতকান্তি লইয়া আদর্শ গড়িবে, তিনি বলিলেন, "দেখ—দেখি! কেমন তামাসা! যে জাতি স্নানের সময় পরিধেয় বসন লইয়া বিব্রত, তোমরা তাদের পাইয়া এত বাড়াবাড়ি কর!" তোমরা মহিলাগণের গৃহকর্ম্মে আস্থা ও যত্ন দেখিয়া, বলিবে, "ধন্য স্বামিপুত্রসেবাব্রত! ধন্য স্ত্রীলোকের স্নেহ ও ধৈর্য্য!" ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাহাদের হাঁড়িশালে গিয়া দেখিবেন, রন্ধনের চাল চর্ব্বণেই গেল, পিটুলির জন্য কোন্দল বাধিয়া গেল, স্বামীভোজন করাইবার সময়ে শাশুড়ী ননদের মুণ্ড ভোজন হইল, এবং কুটুম্বভোজনের সময় লজ্জার মুণ্ড ভোজন হইল। স্থূল কথা, ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist। ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য, এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।

ব্যঙ্গ অনেক সময় বিদ্বেষপ্রসূত। ইউরোপে অনেক ব্যঙ্গকুশল লেখক জন্মিয়াছেন। তাঁহাদের রচনা অনেক সময়ে হিংসা, অসূয়া, অকৌশল, নিরানন্দ, এবং পরশ্রীকাতরতা-পরিপূর্ণ। পড়িয়া বোধ হয় ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা এক মার পেটে জন্মিয়াছে—দুয়ের কাজ মানুষকে দুঃখ দেওয়া। ইউরোপীয় অনেক কুসামগ্রী এই দেশে প্রবেশ করিতেছে—এই নরঘাতিনী রসিকতাও এদেশে প্রবেশ করিয়াছে। হুতোম পেঁচার নক্সা বিদ্বেষপরিপূর্ণ। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই। শত্রুতা করিয়া তিনি কাহাকেও গালি দেন না। কাহারও অনিষ্ট কামনা করিয়া কাহাকেও গালি দেন না। মেকির উপর রাগ আছে বটে, তা ছাড়া সবটাই রঙ্গ, সবটা আনন্দ। কেবল ঘোর ইয়ারকি। গৌরীশঙ্করকে গালি দিবার সময়েও রাগ করিয়া গালি দেন না। সেটা কেবল জিগীষা—ব্রাহ্মণকে কুভাষায় পরাজয় করিতে হইবে এই জিদ। কবির লড়াই, ঐ রকম শত্রুতাশূন্য গালাগালি। ঈশ্বর গুপ্ত সে "কবির লড়াইয়ে" শিক্ষিত—সে ধরনটা তাঁহার ছিল।

অন্যত্র তাও না—কেবল আনন্দ! যে যেখানে সম্মুখে পড়ে, তাহাকেই ঈশ্বরচন্দ্র তাহার গালে এক চড়, নহে একটা কাণমলা দিয়া ছাড়িয়া দেন—কারণ আর কিছুই নয়, দুই জনে একটু হাসিবার জন্য। কেহই চড় চাপড় হইতে নিস্তার পাইলেন না। গবর্ণর জেনেরল, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর, কৌন্‌সিলের মেম্বর হইতে, মুটে, মাঝি, উড়িয়া বেহারা কেহ ছাড়া নাই। এক একটি চড় চাপড় এক একটি বজ্র—যে মারে, তাহার রাগ নাই, কিন্তু যে খায়, তার হাড়ে হাড়ে লাগে। তাতে আবার পাত্রাপাত্র বিচার নাই। যে সাহসে তিনি বলিয়াছেন,—

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে।

আমাদের সে সাহস নাই। তবে বাঙ্গালীর মেয়ের উপর নীচের লিখিত দুই চরণে আমাদের ঢেরা সই রহিল—

সিন্দুরের বিন্দুসহ কপালেতে উল্কি।
নসী জসী ক্ষেমী বামী, রামী শ্যামী গুল্‌কী।

মহারাণীকে স্তুতি করিতে করিতে দেশী Agitatorদের কাণ ধরিয়া টানাটানি—

তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গোরু,
শিখিনি শিং বাঁকানো,
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস।
যেন রাঙ্গা আমলা, তুলে মামলা,
গামলা ভাঙ্গে না।
আমরা ভুসি পেলেই খুসি হব,
ঘুসি খেলে বাঁচব না॥

সাহেব বাবুরা কবির কাছে অনেক কাণমলা খাইয়াছেন—একটা নমুনা—

যখন আস্‌বে শমন, করবে দমন,
কি বোলে তায় বুঝাইবে।
বুঝি হুট্ বোলে বুট পায়ে দিয়ে
চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে?

এক কথায়, সাহেবদের নৃত্যগীত—

গুড়ু গুড়ু গুম গুম লাফে লাফে তাল।
তারা রারা রারা রারা লালা লালা লাল॥

সুখের বাবু বিনা সম্বলে,—

তেড়া হোয়ে তুড়ি মারে, টপ্পা গীত গেয়ে।
গোচে গাচে বাবু হন, পচাশাল চেয়ে॥
কোনরূপে পিত্তি রক্ষা, এঁটোকাঁটা খেয়ে।
শুদ্ধ হন ধেনো গাঙ্গে, বেনো জলে নেয়ে॥

কিন্তু অনেক স্থানেই ঈশ্বর গুপ্তের ঐ ধরন নাই; অনেক স্থানেই কেবল রঙ্গরস, কেবল আনন্দ। তপ্‌সে মাছ লইয়া আনন্দ—

কষিত কনক কান্তি, কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপদাড়ি, তপস্বীর প্রায়॥
মানুষের দৃশ্য নও, বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা, ননীর শরীরে॥

অথবা আনারসে— লুন মেখে লেবুরস, রসে যুক্ত করি।
চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা, চিনি তায় ভরি॥

অথবা পাঁটা— সাধ্য কার এক মুখে, মহিমা প্রকাশে;
আপনি করেন বাদ্য, আপনার নাশে।
হাড়কাটে ফেলে দিই, ধোরে দুটি ঠ্যাঙ্গ।
সে সময়ে বাদ্য করে, ছ্যাডাঙ্গ ছ্যাড্যাঙ্গ॥
এমন পাঁটার নাম, যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয়, ঝাড়ে বংশে বোকা॥

তবে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, ঈশ্বর গুপ্ত মেকির উপর গালিগালাজ করিতেন। মেকির উপর যথার্থ রাগ ছিল। মেকি বাবুরা তাঁহার কাছে গালি খাইতেন, মেকি সাহেবেরা গালি খাইতেন, মেকি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা "নস্যলোসা দধি চোসার" দল, গালি খাইতেন। হিন্দুদের ছেলে মেকি খ্রীষ্টীয়ান হইতে চলিল দেখিয়া তাঁহার রাগ সহ্য হইত না। মিশনরিদের ধর্ম্মের মেকির উপর বড় রাগ। মেকি পলিটিক্সের উপর রাগ। যথাস্থানে পাঠক এ সকলের উদাহরণ পাইবেন, এজন্য এখানে উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম না।

অনেক সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা এই ক্রোধসম্ভূত। অশ্লীলতা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার একটি প্রধান দোষ। উহা বাদ দিতে গিয়া, ঈশ্বর গুপ্তকে Bowdlerize করিতে গিয়া, আমরা তাঁহার কবিতাকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছি। যিনি কাব্য-রসে যথার্থ রসিক, তিনি আমাদিগকে নিন্দা করিবেন। কিন্তু এখনকার বাঙ্গালা লেখক বা পাঠকের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কোনরূপেই অশ্লীলতার বিন্দুমাত্র রাখিতে পারি না। ইহাও জানি যে ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা, প্রকৃত অশ্লীলতা নহে। যাহা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থ বা, গ্রন্থকারের হৃদয়স্থিত কদর্য্যভাবের অভিব্যক্তি জন্য লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা। তাহা পবিত্র সত্যভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে। ঋষিরাও এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতেন। সেকালের বাঙ্গালীদিগের ইহা এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। আমি এমন অনেক দেখিয়াছি, অশীতিপর বৃদ্ধ, ধর্ম্মাত্মা, আজন্ম সংযতেন্দ্রিয়, সভ্য, সুশীল, সজ্জন এমন সকল লোকও, কুকাজ দেখিয়াই রাগিলেই "বদ্‌জোবান" আরম্ভ করিতেন। তখনকার রাগ প্রকাশের ভাষাই অশ্লীল ছিল। ফলে সে সময়ে ধর্ম্মাত্মা এবং অধর্ম্মাত্মা উভয়কেই অশ্লীলতায় সুপটু দেখিতাম—প্রভেদ এই দেখিতাম, যিনি রাগের বশীভূত হইয়া অশ্লীল, তিনি ধর্ম্মাত্মা। যিনি ইন্দ্রিয়ান্তরের বশে অশ্লীল তিনি পাপাত্মা। সৌভাগ্যক্রমে সেরূপ সামাজিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে।

ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম্মাত্মা, কিন্তু সেকেলে বাঙ্গালী। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা অশ্লীল। সংসারের উপর, সমাজের উপর, ঈশ্বর গুপ্তের রাগের কারণ অনেক ছিল। সংসার, বাল্যকালে বালকের অমূল্য রত্ন যে মাতা, তাহা তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল। খাঁটি সোনা কাড়িয়া লইয়া, তাহার পরিবর্ত্তে এক পিতলের সামগ্রী দিয়া গেল—মার বদলে বিমাতা। তার পর যৌবনের যে অমূল্যরত্ন—শুধু যৌবনের কেন, যৌবনের, প্রৌঢ় বয়সের, বার্দ্ধক্যের তুল্যরূপেই অমূল্যরত্ন যে ভার্য্যা, তাহার বেলাও সংসার বড় দাগা দিল। যাহা গ্রহণীয় নহে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা লইলেন না, কিন্তু দাগাবাজির জন্য সংসারের উপর ঈশ্বরের রাগটা রহিয়া গেল। তার পর অল্প বয়সে পিতৃহীন, সহায়হীন হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র অন্নকষ্টে পড়িলেন। কত বানরে, বানরের অট্টালিকায় শিকলে বাঁধা থাকিয়া ক্ষীর সর পায়সান্ন ভোজন করে, আর তিনি দেবতুল্য প্রতিভা লইয়া ভূমণ্ডলে আসিয়া, শাকান্নের অভাবে ক্ষুধার্ত্ত। কত কুক্কুর বা মর্কট বরুষে জুড়ী জুতিয়া, তাঁহার গায়ে কাদা ছড়াইয়া যায়, আর তিনি হৃদয়ে বাগ্দেবী ধারণ করিয়াও খালি পায়ে বর্ষার কাদা

ভাঙ্গিয়া উঠিতে পারেন না। দুর্ব্বল মনুষ্যে হইলে এ অত্যাচারে হারি মানিয়া, রণে ভঙ্গ দিয়া, পলায়ন করিয়া দুঃখের অন্ধকার গহ্বরে লুকাইয়া থাকে। কিন্তু প্রতিভাশালীরা প্রায়ই বলবান।

ঈশ্বরগুপ্ত সংসারকে সমাজকে, স্বীয় বাহুবলে পরাস্ত করিয়া, তাহার নিকট হইতে ধন, যশ, সম্মান আদায় করিয়া লইলেন। কিন্তু অত্যাচারজনিত যে ক্রোধ তাহা মিটিল না। জ্যেঠা মহাশয়ের জুতা তিনি সমাজের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন সমাজকে পদতলে পাইয়া বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিতে লাগিলেন। সেকেলে বাঙ্গালীর ক্রোধ কদর্য্যের উপর কদর্য্য ভাষাতেই অভিব্যক্ত হইত। বোধ হয় ইহাদের মনে হইত, বিশুদ্ধ পবিত্র কথা, দেবদ্বিজাদি প্রভৃতি যে বিশুদ্ধ ও পবিত্র তাহারই প্রতি ব্যবহার্য্য—যে দুরাত্মা, তাহার জন্য এই কদর্য্য ভাষা। এইরূপে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় অশ্লীলতা আসিয়া পড়িয়াছে।

আমরা ইহাও স্বীকার করি যে, তাহা ছাড়া অন্যবিধ অশ্লীলতাও তাঁহার কবিতায় আছে। কেবল রঙ্গদারির জন্যে, শুধু ইয়ারকির জন্য এক আধটু অশ্লীলতাও আছে। কিন্তু দেশ কাল বিবেচনা করিলে, তাহার জন্য ঈশ্বরচন্দ্রের অপরাধ ক্ষমা করা যায়। সে কালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না। যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরসবলিয়া গণ্য হইত না। যে কথা অশ্লীল নহে, তাহা সতেজ বলিয়া গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল কাব্যই অশ্লীল। চোর, কবি, চোরপঞ্চাশৎ দুই পক্ষে অর্থ খাটাইয়া লিখিবেন—বিদ্যাপক্ষে এবং কালীপক্ষে—দুই পক্ষে সমান অশ্লীল। তখন পূজা পার্ব্বণ অশ্লীল—উৎসবগুলি অশ্লীল—দুর্গোৎসবের নবমীর রাত্র বিখ্যাত ব্যাপার। যাত্রার সঙ অশ্লীল হইলেই লোকরঞ্জক হইত। পাঁচালি হাফআখড়াই অশ্লীলতার জন্যই রচিত। ঈশ্বর গুপ্ত সেই বাতাসে জীবন প্রাপ্ত ও বর্দ্ধিত। অতএব ঈশ্বর গুপ্তকে আমরা অনায়াসে একটুখানি মার্জ্জনা করিতে পারি।

আর একটা কথা আছে। অশ্লীলতা সকল সভ্যসমাজেই ঘৃণিত। তবে, যেমন লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি দেশভেদেও রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। এমন অনেক কথা আছে, যাহা ইংরেজেরা অশ্লীল বিবেচনা করেন, আমরা করি না। আবার এমন অনেক কথা আছে, যাহা আমরা অশ্লীল বিবেচনা করি, ইংরেজেরা করেন না। ইংরেজের কাছে, প্যানটালুন বা উরুদেশের নাম অশ্লীল—ইংরেজের মেয়ের কাছে সে নাম মুখে আনিতে নাই। আমরা ধুতি, পায়জামা বা উরু শব্দগুলিকে অশ্লীল মনে করি না। মা ভগিনী বা কন্যা কাহারও সম্মুখে ঐ সকল কথা ব্যবহার করিতে আমাদের লজ্জা নাই। পক্ষান্তরে স্ত্রীপুরুষে মুখচুম্বনটা আমাদের সমাজে অতি অশ্লীল ব্যাপার। কিন্তু ইংরেজের চক্ষে উহা পবিত্র কার্য্য—মাতৃপিতৃ সমক্ষেই উহা নির্ব্বাহ পাইয়া থাকে। এখন আমাদের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরা দেশী জিনিষ সকলই হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি, বিলাতী জিনিষ সবই ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। দেশী সুরুচি ছাড়িয়া আমরা বিদেশী সুরুচি গ্রহণ করিতেছি। শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেন, যে তাঁহাদের পরস্ত্রীর মুখচুম্বনে আপত্তি নাই,

কিন্তু পরস্ত্রীর অনাবৃত চরণ! আলতাপরা মলপরা পা! দর্শনে বিশেষ আপত্তি! ইহাতে আমরা যে কেবলই জিতিয়াছি এমত নহে। একটা উদাহরণের দ্বারা বুঝাই। মেঘদূতের একটি কবিতায় কালিদাস কোন পর্ব্বতশৃঙ্গকে ধরণীর স্তন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বিলাতী রুচিবিরুদ্ধ। স্তন বিলাতী রুচি অনুসারে অশ্লীল কথা। কাজেই এই উপমাটি নব্যের কাছে অশ্লীল। নব্যবাবু হয়ত ইহা শুনিয়া কানে আঙ্গুল দিয়া পরস্ত্রীর মুখচুম্বন ও করস্পর্শের মহিমা কীর্ত্তনে মনোযোগ দিবেন। কিন্তু আমি ভিন্ন রকম বুঝি। পৃথিবী আমাদের জননী। তাই তাঁকে ভক্তিভাবে, স্নেহ করিয়া "মাতা বসুমতী" বলি ; আমরা তাঁহার সন্তান ; সন্তানের চক্ষে মাতৃস্তনের অপেক্ষা সুন্দর, পবিত্র, জগতে আর কিছুই নাই—থাকিতে পারে না। অতএব এমন পবিত্র উপমা আর হইতে পারে না। ইহাতে যে অশ্লীলতা দেখে, আমার বিবেচনায় তাহার চিত্তে পাপচিন্তা ভিন্ন কোন বিশুদ্ধ ভাবের স্থান হয় না। কবি এখানে অশ্লীল নহে,—এখানে পাঠকের হৃদয় নরক। এখানে ইংরেজি রুচি বিশুদ্ধ নহে—দেশী রুচিই বিশুদ্ধ।

আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি, এইরূপ বিলাতী রুচির আইনে ধরা পড়িয়া বিনাপরাধে অশ্লীলতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। স্বয়ং বাল্মীকি কি কালিদাসেরও অব্যাহতি নাই। যে ইউরোপে মসুর জোলার নবেলের আদর, সে ইউরোপের রুচি বিশুদ্ধ, আর যাঁহারা রামায়ণ, কুমারসম্ভব লিখিয়াছেন, সীতা শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাদের রুচি অশ্লীল! এই শিক্ষা আমরা ইউরোপীয়ের কাছে পাই। কি শিক্ষা! তাই আমি অনেকবার বলিয়াছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প শেখ। আর সব দেশীয়ের কাছে শেখ।

অন্যের ন্যায় ঈশ্বর গুপ্তও হাল আইনে অনেক স্থানে ধরা পড়েন। সে সকল স্থানে আমরা তাঁহাকে বেকসুর খালাস দিতে রাজি। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, যে আর অনেক স্থানেই তত সহজে তাঁহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া যায় না। অনেক স্থানে তাঁহার রুচি বাস্তবিক কদর্য্য, যথার্থ অশ্লীল, এবং বিরক্তিকর। তাহার মার্জ্জনা নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের যে অশ্লীলতার কথা আমরা লিখিলাম, পাঠক তাহা এ সংগ্রহে কোথাও পাইবেন না। আমরা তাহা সব কাটিয়া দিয়া, কবিতাগুলিকে নেড়া মুড়া করিয়া বাহির করিয়াছি। অনেকগুলিকে কেবল অশ্লীলতাদোষ জন্যই একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। তবে তাঁহার কবিতার এই দোষের এত বিস্তারিত সমালোচনা করিলাম, তাহার কারণ এই যে এই দোষ তাঁহার প্রসিদ্ধ। ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব কি প্রকার তাহা বুঝিতে গেলে, তাহার দোষ গুণ দুই-ই বুঝাইতে হয়। শুধু তাই নয়। তাঁহার কবিত্বের অপেক্ষা আরেকটা বড় জিনিষ পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে কি ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ মাত্র—তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির কীর্ত্তি—তাহা ত আমাদের হাতেই আছে—পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি প্রকারে, এই কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে

হইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনাদত্ত প্রধান শিক্ষা ও জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীতে আমরা অবগত হইয়াছি যে, একজন অশিক্ষিত যুবা কলিকাতায় আসিয়া, সাহিত্য ও সমাজে আধিপত্য সংস্থাপন করিল। কি শক্তিতে? তাহাও দেখিতে পাই—নিজ প্রতিভা গুণে। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই যে, প্রতিভানুযায়ী ফল ফল নাই। প্রভাকর মেঘাচ্ছন্ন। সে মেঘ কোথা হইতে আসিল? বিশুদ্ধ রুচির অভাবে। এখন ইহা এক প্রকার স্বাভাবিক নিয়ম, যে প্রতিভা ও সুরুচি পরস্পর সখী—প্রতিভার অনুগামিনী সুরুচি। ঈশ্বর গুপ্তের বেলা তাহা ঘটে নাই কেন? এখানে দেশ, কাল, পাত্র বুঝিয়া দেখিতে হইবে। তাই আমি দেশের রুচি বুঝাইলাম, কালের রুচি বুঝাইলাম, এবং পাত্রের রুচি বুঝাইলাম। বুঝাইলাম যে পাত্রের রুচির অভাবের কারণ, (১) পুস্তকদত্ত সুশিক্ষার অল্পতা, (২) মাতার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৩) সহধর্ম্মিণী, অর্থাৎ যাঁহার সঙ্গে একত্রে ধর্ম্ম শিক্ষা করি, তাঁহার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৪) সমাজের অত্যাচার, এবং তজ্জনিত সমাজের উপর কবির জাতক্রোধ। যে মেঘে প্রভাকরের তেজোহ্রাস করিয়াছিল এই সকল উপাদানে তাহার জন্ম। স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র যখন অশ্লীল তখন কুরুচির বশীভূত হইয়াই অশ্লীল, ভারতচন্দ্রাদির ন্যায় কোথাও কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া অশ্লীল নহেন। তাই দর্পণতলস্থ প্রতিবিম্বের সাহায্যে প্রতিবিম্বধারী সত্তাকে বুঝাইবার জন্য আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অশ্লীলতা দোষ এত সবিস্তারে সমালোচনা করিলাম। ব্যাপারটা রুচিকর নহে। মনে করিলে, নমঃ নমঃ বলিয়া দুই কথায় সরিয়া যাইতে পারিতাম। অভিপ্রায় বুঝিয়া বিস্তারিত সমালোচনা পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।

মানুষটাকে আর একটু ভাল করিয়া বুঝা যাউক—কবিতা না হয় এখন থাক। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা বলিয়াছি ঈশ্বর গুপ্ত বিলাসী ছিলেন না। অথচ দেখিতে পাই, মুখের আটক পাটক কিছুই নাই। অশ্লীলতায় ঘোর আমোদ, ইয়ারকি ভরা—পাঁটার স্তোত্র লেখেন, তপ্‌সে মাছের মজা বুঝেন, লেবু দিয়া আনারসের পরমভক্ত, সুরাপান* সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠ—আবার বিলাসী কারে বলে? কথাটা বুঝিয়া দেখা যাউক।

এই সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে পাঠক ঈশ্বর গুপ্ত প্রণীত কতকগুলি নৈতিক ও পারমার্থিক বিষয়ক কবিতা পাইবেন। অনেকের পক্ষে ঐগুলি নীরস বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু যদি পাঠক ঈশ্বর গুপ্তকে বুঝিতে চাহেন, তবে সেগুলি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবেন। দেখিবেন সেগুলি ফরমায়েশি কবিতা নহে। কবির আন্তরিক কথা তাহাতে আছে। অনেকগুলির মধ্যে ঐ কয়টি বাছিয়া দিয়াছি—আর বেশী দিলে রসিক বাঙ্গালী পাঠকের বিরক্তিকর হইয়া উঠিবে। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে পরমার্থ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গদ্যে পদ্যে যত লিখিয়াছেন, এত আর কোন বিষয়েই বোধ হয় লিখেন নাই। এ গ্রন্থ

* সুরাপানের মার্জ্জনা নাই। মার্জ্জনার আমিও কোন কারণ দেখিতে ইচ্ছুক নহি। কেবল সে সম্বন্ধে পাঠককে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবির এই উক্তিটি স্মরণ করিতে বলি—

একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষিবাঙ্কঃ।

পদ্যসংগ্রহ বলিয়া, আমরা তাঁহার গদ্য কিছুই উদ্ধৃত করি নাই, কিন্তু সে গদ্য পড়িয়া বোধ হয়, যে পদ্য অপেক্ষাও বুঝি গদ্যে তাঁহার মনের ভাব আরও সুস্পষ্ট। এই সকল গদ্য পদ্যে প্রণিধান করিয়া দেখিলে, আমরা বুঝিতে পারিব, যে ঈশ্বর গুপ্তের ধর্ম্ম, একটা কৃত্রিম ভান ছিল না। ঈশ্বরে তাঁর আন্তরিক ভক্তি ছিল। তিনি মদ্যপ হউন, বিলাসী হউন, কোন হবিষ্যাশী নামাবলীধারীতে সেরূপ আন্তরিক ঈশ্বরে ভক্তি দেখিতে পাই না। সাধারণ ঈশ্বরবাদী বা ঈশ্বরভক্তের মত তিনি ঈশ্বরবাদী ও ঈশ্বরভক্ত ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরকে নিকটে দেখিতেন, যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেন, যেন মুখোমুখী হইয়া কথা কহিতেন। আপনাকে যথার্থ ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরকে আপনার সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান পিতা বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। মুখামুখী হইয়া বাপের সঙ্গে বচসা করিতেন। কখন বাপের আদর খাইবার জন্য কোলে বসিতে যাইতেন, আপনি বাপকে কত আদর করিতেন —উত্তর না পাইলে কাঁদাকাটা বাধাইতেন। বলিতে কি, তাঁহার ঈশ্বরে গাঢ় পুত্রবৎ অকৃত্রিম প্রেম দেখিয়া চক্ষের জল রাখা যায় না। অনেক সময়েই দেখিতে পাই, যে মূর্ত্তিমান ঈশ্বর সম্মুখে পাইতেছেন না, কথার উত্তর পাইতেছেন না বলিয়া, তাঁহার অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে, বাপকে বকিয়া ফাটাইয়া দিতেছেন। বাপ নিরাকার নির্গুণ চৈতন্য মাত্র, সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান বাপ নহেন, এ কথা মনে করিতেও অনেক সময়ে কষ্ট হইত।*

কাতর কিঙ্কর আমি, তোমার সন্তান।
আমার জনক তুমি, সবার প্রধান॥
বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান্।
একবার তাহে তুমি, নাহি দাও কান॥
সর্ব্বদিকে সর্ব্বলোকে, কত কথা কয়।
শ্রবণে সে সব রব, প্রবেশ না হয়॥
হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হোয়ে, তুমি হলে কালা॥
মনে সাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া।
অধীর হ'লেম ভেবে, বধির জানিয়া॥

এ ভক্তের স্তুতি নহে—এ বাপের উপর বেটার অভিমান। ধন্য ঈশ্বরচন্দ্র! তুমি পিতৃপদ লাভ করিয়াছ সন্দেহ নাই। আমরা কেহই তোমার সমালোচক হইবার যোগ্য নহি।

ঈশ্বরচন্দ্রের ঈশ্বরভক্তির যথার্থ স্বরূপ যিনি অনুভূত করিতে চান, ভরসা করি তিনি এই সংগ্রহের উপর নির্ভর করিবেন না। এ সংগ্রহ সাধারণের আয়ত্ত ও পাঠ্য করিবার জন্য ইহা নানা দিকে সঙ্কীর্ণ করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কতকগুলি গদ্য পদ্য প্রবন্ধ মাসিক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই ঈশ্বরচন্দ্রের অকৃত্রিম ঈশ্বরভক্তি বুঝিতে পারিবেন। সেগুলি যাহাতে পুনর্ম্মুদ্রিত হয়, সে যত্ন পাইব।

---

* কবিতাসংগ্রহের ৫৭ পৃষ্ঠার কবিতাটি পাঠ কর।

বৈষ্ণবগণ বলেন, হনুমানাদি দাস্যভাবে, শ্রীদামাদি সখ্যভাবে, নন্দযশোদা পুত্রভাবে, এবং গোপীগণ কান্তভাবে সাধনা করিয়া ঈশ্বর পাইয়াছিলেন। কিন্তু পৌরাণিক ব্যাপার সকল আমাদিগের হইতে এত দূর সংস্থিত, যে তদালোচনায় আমাদের যাহা লভনীয়, তাহা আমরা বড় সহজে পাই না। যদি হনুমান্, উদ্ধব, যশোদা বা শ্রীরাধাকে আমাদের কাছে পাইতাম, তবে সে সাধনা বুঝিবার চেষ্টা কতক সফল হইত। বাঙ্গালার দুই জন সাধক, আমাদের বড় নিকট। দুই জনই বৈদ্য, দুই জনই কবি। এক রামপ্রসাদ সেন, আর এক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ইঁহারা কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না, কেহই ঈশ্বরকে প্রভু, সখা, পুত্র, বা কান্তভাবে দেখেন নাই। রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ মাতৃভাবে দেখিয়া ভক্তি সাধিত করিয়াছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র পিতৃভাবে। রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প।

তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত ত্রিসংসার।
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার তোমার॥
পিতৃ নামে নাম পেয়ে, উপাধি পেয়েছি।
জন্মভূমি জননীর কোলেতে বসেছি॥
তুমি গুপ্ত আমি গুপ্ত, গুপ্ত কিছু নয়।
তবে কেন গুপ্ত ভাবে ভাব গুপ্ত রয়?

পুনশ্চ—আরও নিকটে—

তোমার বদনে যদি, না সরে বচন।
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন॥
আমি যদি কিছু বলি, বুঝে অভিপ্রায়।
ইসেরায় ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তায়॥

যার এই ঈশ্বরভক্তি—যে ঈশ্বরকে এইরূপ সর্ব্বদা নিকটে, অতি নিকটে দেখে—ঈশ্বর-সংসর্গতৃষ্ণায় যাহার হৃদয় এইরূপে দগ্ধ—সে কি বিলাসী হইতে পারে? হয় হউক। আমরা এরূপ বিলাসী ছাড়িয়া সন্ন্যাসী দেখিতে চাই না।

তবে ঈশ্বর সন্ন্যাসী, হবিষ্যাশী বা অভোক্তা ছিলেন না। পাঁটা, তপ্‌সে মাছ, বা আনারসের গুণ গায়িতে ও রসাস্বাদনে, উভয়েই সক্ষম ছিলেন। যদি ইহা বিলাসিতা হয়, তিনি বিলাসী ছিলেন। তাঁহার বিলাসিতা তিনি নিজে স্পষ্ট করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন;—

লক্ষ্মীছাড়া যদি হও, খেয়ে আর দিয়ে।
কিছুমাত্র সুখ নাই, হেন লক্ষ্মী নিয়ে॥
যতক্ষণ থাকে ধন, তোমার আগারে।
নিজে খাও, খেতে দাও, সাধ্য অনুসারে॥
ইথে যদি কমলার, মন নাহি সরে
প্যাঁচা লয়ে যান মাতা, কৃপণের ঘরে।

শাকান্নমাত্র যে ভোজন না করে, তাহাকেই বিলাসী মধ্যে গণনা করিতে হইবে, ইহাও আমি স্বীকার করি না। গীতায় ভগবদুক্তি এই—

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য সুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ
স্নিগ্ধারস্যাস্থিরাহৃদ্যাঃ আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ।

স্থূল কথা এই, যাহা আগে বলিয়াছি—ঈশ্বর গুপ্ত মেকির বড় শত্রু। মেকি মানুষের শত্রু, এবং মেকি ধর্ম্মের শত্রু। লোভী পরদ্বেষী অথচ হবিষ্যাশী ভণ্ডের ধর্ম্ম তিনি গ্রহণ করেন নাই। ভণ্ডের ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া তিনি জানিতেন না। তিনি জানিতেন ধর্ম্ম ঈশ্বরানুরাগে, আহার ত্যাগে নহে। যে ধর্ম্মে ঈশ্বরানুরাগ ছাড়িয়া পানাহারত্যাগকে ধর্ম্মের স্থানে খাড়া করিতে চাহিত—তিনি তাহার শত্রু। সেই ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ-বশতঃ পাঁটার স্তোত্র, আনারসের গুণগানে, এবং তপ্‌সের মহিমা বর্ণনায় কবির এত সুখ হইত। মানুষটা বুঝিলাম, নিজে ধার্ম্মিক, ধর্ম্মে খাঁটি, মেকির উপর খড়্গহস্ত। ধার্ম্মিকের কবিতায় অশ্লীলতা কেন দেখি, বোধ হয় তাহা বুঝিয়াছি। বিলাসিতা কেন দেখি, বোধ হয় তাহা এখন বুঝিলাম।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার কথা বলিতে বলিতে তাঁহার ব্যঙ্গের কথায়, ব্যঙ্গের কথা হইতে তাঁহার অশ্লীলতার কথায়, অশ্লীলতার কথা হইতে তাঁহার বিলাসিতার কথায় আসিয়া পড়িয়াছিলাম। এখন ফিরিয়া যাইতে হইতেছে।

অশ্লীলতা যেমন তাঁহার কবিতার এক প্রধান দোষ, শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তা তেমনি আর এক প্রধান দোষ। শব্দচ্ছটায়, অনুপ্রাস যমকের ঘটায়, তাঁহার ভাবার্থ অনেক সময়ে একেবারে ঘুচিয়া মুছিয়া যায়। অনুপ্রাস যমকের অনুরোধে অর্থের ভিতর কি ছাই ভস্ম থাকিয়া যায়, কবি তাহার প্রতি কিছুমাত্র অনুধাবন করিতেছেন না—দেখিয়া অনেক সময়ে রাগ হয়, দুঃখ হয়, হাসি পায়, দয়া হয়, পড়িতে আর প্রবৃত্তি হয় না। যে কারণে তাঁহার অশ্লীলতা, সেই কারণে এই যমকানুপ্রাসে অনুরাগ দেশ কাল পাত্র। সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় হইতে যমকানুপ্রাসের বড় বাড়াবাড়ি। ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ব্বেই—কবিওয়ালার কবিতায়, পাঁচালিওয়ালার পাঁচালিতে, ইহার বেশী বাড়াবাড়ি। দাশরথি রায় অনুপ্রাস যমকে বড় পটু—তাই তাঁর পাঁচালি লোকের এত প্রিয় ছিল। দাশরথি রায়ের কবিত্ব না ছিল, এমন নহে, কিন্তু অনুপ্রাস যমকের দৌরাত্ম্যে তাহা প্রায় একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে; পাঁচালিওয়ালা ছাড়িয়া তিনি কবির শ্রেণীতে উঠিতে পান নাই। এই অলঙ্কার প্রয়োগ-পটুতায় ঈশ্বর গুপ্তের স্থান তার পরেই—এত অনুপ্রাস যমক আর কোন বাঙ্গালীতে ব্যবহার করে না। এখানেও মার্জ্জিত রুচির অভাব জন্য বড় দুঃখ হয়।

অনুপ্রাস যমক যে সর্ব্বত্রই দূষ্য এমন কথা আমি বলি না। ইংরেজিতে ইহা বড় কদর্য্য শুনায় বটে, কিন্তু সংস্কৃতে ইহার উপযুক্ত ব্যবহার অনেক সময়েই বড় মধুর। কিছুরই বাহুল্য ভাল নহে—অনুপ্রাস যমকের বাহুল্য বড় কষ্টকর। রাখিয়া ঢাকিয়া, পরিমিত ভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে বড় মিঠে। বাঙ্গালাতেও তাই। মধুসূদন দত্ত মধ্যে মধ্যে পদ্যে অনুপ্রাসের ব্যবহার করেন,—বড় বুঝিয়া সুঝিয়া, রাখিয়া ঢাকিয়া, ব্যবহার করেন—মধুর হয়। শ্রীমান্ অক্ষয়চন্দ্র সরকার গদ্যে কখন কখন,

দুই এক বুঁদ অনুপ্রাস ছাড়িয়া দেন—রস উছলিয়া উঠে। ঈশ্বর গুপ্তেরও এক একটি অনুপ্রাস বড় মিঠে—

বিবিজান চলে জান লবেজান করে।

ইহার তুলনা নাই। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময় অসময় নাই, বিষয় অবিষয় নাই, সীমা সরহদ্দ নাই—একবার অনুপ্রাস যমকের ফোয়ারা খুলিলে আর বন্ধ হয় না। আর কোন দিগে দৃষ্টি থাকে না, কেবল শব্দের দিকে। এরূপ শব্দ ব্যবহারে তিনি অদ্বিতীয়। তিনি শব্দের প্রতিযোগীশূন্য অধিপতি। এই দোষ গুণের উদাহরণস্বরূপ দুইটি গীত বোধেন্দুবিকাশ হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

কে রে, বামা, বারিদবরণী,
তরুণী, ভালে, ধরেছে তরণি,
কাহারো ঘরণী, আসিয়ে ধরণী, করিছে দনুজ জয়।
হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অনুপ রূপ, নাহি স্বরূপ,
মদননিধনকরণকারণ, চরণ শরণ লয়॥
বামা, হাসিছে ভাষিছে, লাজ না বাসিছে,
হুহুঙ্কাররবে, বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ, হয়। ১
বামা, টলিছে ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে,
সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে,
কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময়॥ ২
কে রে ললিতরসনা, বিকটদশনা,
করিয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা,
হয়ে শবাসনা, বামা বিবসনা, আসবে মগনা রয়। ৩

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

কে রে, বামা, ষোড়শী রূপসী,
সুরেশী, এ যে, নহে মানুষী,
ভালে শিশুশশী, করে শোভে অসি, রূপমসী, চারু ভাস।
দেখ, বাজিছে ঝম্প, দিতেছে ঝম্প,
মারিছে লম্ফ, হতেছে কম্প,
গেল রে পৃথ্বী, করে কি কীর্ত্তি, চরণে কৃত্তিবাস॥ ১
কে রে, করাল-কামিনী, মরালগামিনী,
কাহার স্বামিনী, ভুবনভামিনী,
রূপেতে প্রভাত, করেছে যামিনী, দামিনীজড়িত-হাস। ২
কে রে, যোগিনী সঙ্গে, রুধির-রঙ্গে,
রণতরঙ্গে, নাচে ত্রিভঙ্গে,
কুটিলাপাঙ্গে, তিমির-অঙ্গে, করিছে তিমির নাশ। ৩

আহা, যে দেখি পর্ব্ব, যে ছিল গর্ব্ব,
হইল খর্ব্ব, গেল রে সর্ব্ব,
চরণসরোজে, পড়িয়ে শর্ব্ব, করিছে সর্ব্বনাশ। ৪
দেখি, নিকট মরণ, কর রে স্মরণ,
মরণহরণ, অভয় চরণ
নিবিড় নবীন নীরদবরণ, মানসে কর প্রকাশ। ৫

ঈশ্বর গুপ্ত অপূর্ব্ব শব্দকৌশলী বলিয়া, তাঁহার যেমন এই গুরুতর দোষ জন্মিয়াছে, তিনি অপূর্ব্ব শব্দকৌশলী বলিয়া তেমনি তাঁহার এক মহৎ গুণ জন্মিয়াছে—যখন অনুপ্রাস যমকে মন না থাকে, তখন তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোন বিকার নাই—ইংরেজনিবিশীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না—সরল, সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই—আর লিখিবার সম্ভাবনা নাই। কেবল ভাষা নহে—ভাবও তাই। ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথা—দেশী ভাব প্রকাশ করেন। তাঁর কবিতায় কেলা কা ফুল নাই।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা প্রচারের জন্য আমরা যে উদ্যোগী—তাহার বিশেষ কারণ তাঁহার ভাষার এই গুণ। খাঁটি বাঙ্গালা আমাদিগের বড় মিঠে লাগে—ভরসা করি পাঠকেরও লাগিবে। এমন বলিতে চাই না যে, ভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে বাঙ্গালা ভাষার কোন উন্নতি হইতেছে না বা হইবে না। হইতেছে ও হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে জাতি হারাইয়া ভিন্ন ভাষার অনুকরণ মাত্রে পরিণত হইয়া পরাধীনতা প্রাপ্ত না হয় তাহাও দেখিতে হয়। বাঙ্গালা ভাষা বড় দোটানার মধ্যে পড়িয়াছে। ত্রিপথগামিনী এই স্রোতস্বতীর ত্রিবেণীর মধ্যে আবর্ত্তে পড়িয়া আমরা ক্ষুদ্র লেখকেরা অনেক ঘুরপাক খাইতেছি। একদিগে সংস্কৃতের স্রোতে মরা গাঙ্গে উজান বহিতেছে— কত "ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রাড়্‌বিবাক্ মলিম্লুচ" গুণ ধরিয়া সেকেলে বোঝাই নৌকা সকল টানিয়া উঠাইতে পারিতেছে না—আর একদিগে ইংরেজির ভরা গাঙ্গে বেনোজল ছাপাইয়া দেশ ছারখার করিয়া তুলিয়াছে—মাধ্যাকর্ষণ, যবক্ষারজান, ইবোলিউশন, ডিবলিউশন প্রভৃতি জাহাজ, পিনেস, বজরা, ক্ষুদে লঞ্চের জ্বালায় দেশ উৎপীড়িত; মাঝে স্বচ্ছসলিলা পুণ্যতোয়া কৃশাঙ্গী এই বাঙ্গালা ভাষার স্রোতঃ বড় ক্ষীণ বহিতেছে। ত্রিবেণীর আবর্ত্তে পড়িয়া লেখক পাঠক তুল্যরূপেই ব্যতিব্যস্ত। এ সময়ে ঈশ্বর গুপ্তের রচনার প্রচারে কিছু উপকার হইতে পারে।

ঈশ্বর গুপ্তের আর এক গুণ, তাঁহার কৃত সামাজিক ব্যাপার সকলের বর্ণনা অতি মনোহর। তিনি যে সকল রীতি নীতি বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা অনেক বিলুপ্ত হইয়াছে বা হইতেছে। সে সকল পাঠকের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে, ভরসা করি।

ঈশ্বর গুপ্তের স্বভাব বর্ণনা নবজীবনে বিশেষ প্রকারে প্রশংসিত হইয়াছে। আমরা ততটা প্রশংসা করি না। ফলে তাঁহার যে বর্ণনার শক্তি ছিল তাহার সন্দেহ নাই। তাহার উদাহরণ এই সংগ্রহে পাঠক মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইবেন। "বর্ষাকালের নদী", "প্রভাতের পদ্ম" প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে তাহার পরিচয় পাইবেন।

স্থূল কথা তাঁর কবিতার অপেক্ষা তিনি অনেক বড় ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কবিতায় নাই। যাঁহারা বিশেষ প্রতিভাশালী তাঁহারা প্রায় আপন সময়ের অগ্রবর্ত্তী। ঈশ্বর গুপ্ত আপন সময়ের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। আমরা দুই একটা উদাহরণ দিই।

প্রথম, দেশবাৎসল্য। বাৎসল্য পরমধর্ম্ম, কিন্তু এ ধর্ম্ম অনেক দিন হইতে বাঙ্গালা দেশে ছিল না। কখনও ছিল কি না বলিতে পারি না। এখন ইহা সাধারণ হইতেছে, দেখিয়া আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে, ইহা বড়ই বিরল ছিল। তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ, আপন আপন জাতি, বা আপন আপন ধর্ম্মকে ভালবাসিত, ইহা দেশবাৎসল্যের ন্যায় উদার নহে—অনেক নিকৃষ্ট। মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্ব্বগামী। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদের মত ফলপ্রদ না হইয়াও তাঁহাদের অপেক্ষাও তীব্র ও বিশুদ্ধ। নিম্ন কয় ছত্র পদ্য ভরসা করি সকল পাঠকই মুখস্থ করিবেন,—

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

তখনকার লোকের কথা দূরে থাক, এখনকার কয়জন ইহা বুঝে? এখনকার কয়জন লোক এখানে ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ? ঈশ্বর গুপ্তের, কথায় যা কাজেও তাই ছিল। তিনি বিদেশের ঠাকুরদিগের প্রতি ফিরিয়াও চাহিতেন না, দেশের কুকুর লইয়াও আদর করিতেন। ২৮৪ পৃষ্ঠায় মাতৃভাষা সম্বন্ধে যে কবিতাটি আছে, পাঠককে তাহা পড়িতে বলি। "মাতৃসম মাতৃভাষা," সৌভাগ্যক্রমে এখন অনেকে বুঝিতেছেন, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে কে সাহস করিয়া এ কথা বলে? "বাঙ্গালা বুঝিতে পারি," এ কথা স্বীকার করিতে অনেকের লজ্জা হইত। আজিও না কি কলিকাতায় এমন অনেক কৃতবিদ্য নরাধম আছে, যাহারা মাতৃভাষাকে ঘৃণা করে, যে তাহার অনুশীলন করে, তাহাকেও ঘৃণা করে, এবং আপনাকে মাতৃভাষা অনুশীলনে পরাঙ্মুখ ইংরেজিনবীশ বলিয়া পরিচয় দিয়া, আপনার গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা পায়। যখন এই মহাত্মারা সমাজে আদৃত তখন এ সমাজ ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ হইবার অনেক বিলম্ব আছে।

দ্বিতীয়, ধর্ম্ম। ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম্মেও সমকালিক লোকদিগের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। তিনি হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তখনকার লোকদিগের ন্যায় উপধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্ম বলিতেন না। এখন যাহা বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেই গৃহীত করিতেছেন,

ঈশ্বর গুপ্ত সেই বিশুদ্ধ, পরম মঙ্গলময় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম কি, তাহা অবগত হইবার জন্য, তিনি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ হইয়াও অধ্যাপকের সাহায্যে বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্য্যহেতু সে সকলে যে তাঁহার বেশ অধিকার জন্মিয়াছিল, তাঁহার প্রণীত গদ্যে পদ্যে তাহা বিশেষ জানা যায়। এক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত ব্রাহ্ম ছিলেন। আদিব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন, এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন। ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে সমবেত হইয়া বক্তৃতা, উপাসনাদি করিতেন। এ জন্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন এবং আদৃত হইতেন।

তৃতীয়। ঈশ্বর গুপ্তের রাজনীতি বড় উদার ছিল। তাহাতেও যে তিনি সময়ের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন, সে কথা বুঝাইতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়, সুতরাং নিরস্ত হইলাম।

এক্ষণে এই সংগ্রহ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া আমি ক্ষান্ত হইব। ঈশ্বর গুপ্ত যত পদ্য লিখিয়াছেন, এত আর কোন বাঙ্গালী লেখে নাই। গোপাল বাবুর অনুমান, তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছত্র পদ্য লিখিয়াছেন। এখন যাহা পাঠককে উপহার দেওয়া যাইতেছে, তাহা উহার ক্ষুদ্রাংশ। যদি তাঁহার প্রতি বাঙ্গালী পাঠকসমাজের অনুরাগ দেখা যায়, তবে ক্রমশঃ আরও প্রকাশ করা যাইবে। এ সংগ্রহ প্রথম খণ্ড মাত্র। বাছিয়া বাছিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলি যে ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি, এমন নহে। যদি সকল ভাল কবিতাগুলিই প্রথম খণ্ডে দিব, তবে অন্যান্য খণ্ডে কি থাকিবে?

নির্ব্বাচনকালে আমার এই লক্ষ্য ছিল, যে ঈশ্বর গুপ্তের রচনার প্রকৃতি কি, যাহাতে পাঠক বুঝিতে পারেন, তাহাই করিব। এজন্য, কেবল আমার পছন্দ মত কবিতাগুলি না তুলিয়া সকল রকমের কবিতা কিছু কিছু তুলিয়াছি। অর্থাৎ যত রকম রচনা প্রথা ছিল, সকল রকমের কিছু কিছু উদাহরণ দিয়াছি। কেবল যাহা অপাঠ্য তাহারই উদাহরণ দিই নাই। আর "হিতপ্রভাকর", "বোধেন্দুবিকাশ", "প্রবোধ-প্রভাকর" প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কিছু সংগ্রহ করি নাই। কেন না সেই গ্রন্থগুলি অবিকল পুনর্মুদ্রিত হইবার সম্ভাবনা আছে। তদ্ভিন্ন তাঁহার গদ্য রচনা হইতে কিছুই উদ্ধৃত করি নাই। ভরসা করি, তাহার স্বতন্ত্র এক খণ্ড প্রকাশিত হইতে পারিবে।

পরিশেষে বক্তব্য, যে অনবকাশ—বিদেশে বাস প্রভৃতি কারণে আমি মুদ্রাঙ্কন-কার্য্যের কোন তত্ত্বাবধান করিতে পারি নাই। তাহাতে যদি দোষ হইয়া থাকে, তবে পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।

Bengali Selections

Appointed by the Syndicate of the Calcutta University for the Entrance Examination, 1895.

PREFACE

One of the objects kept in view in this compilation has been to place before the student as great a variety of style as is possible in a small volume like the present. I have admitted on this ground, a few short extracts from the older poets, whose quaint and now antiquated style is as superior to that of their modern successors in vigor and raciness, as it is inferior to it in elegance and refinement.

I have also taken care that the matter should be equally varied, and should enable the young student to form some idea of ancient as well as modern Hindu thought and culture. The passage specially translated from the *Mahabharata*, Pandit Iswar Chandra Vidyasagar's beautiful renderings from Kalidasa, Babu Bhudeb Mukherjee's masterly studies of modern Bengali life, and Babu Rajkrishna Mukherjee's lucid expositions of the most advanced European thought in his singularly charming style, will present the student with reading as varied as useful, and with instruction which, although almost indispensably necessary to him, he cannot expect to obtain from his English text-books. There are many who do not accept the views put forward in some of these extracts, but it is impossible to find anything in Bengali literature, or in any literature, to which all parties will subscribe. The best way of training the minds of young men is not to restrict them to any particular groove of thought. Among the results of education, scarcely anything is more valuable than the capacity to consider questions that arise from different and even opposite points of view. I have not therefore thought it proper to confine the extracts to what will meet universal acceptance, to the exclusion of what will best benefit the student.

A word about Grammar. Bengali Grammar is still in some respects in an unsettled state. Purists insist on a rigid adherence to the rules of Sanskrit Grammar in all cases to which they can be made applicable, while others contend that whatever is sanctioned by the usage of the best writers is admissible. In the present volume I have

allowed each writer to retain his own Grammar, confining my own duty as Editor to the correction of obvious errors and misprints.

I have admitted extracts from my own writing with some reluctance. They had a place in all previous selections ; their exclusion now for the first time would have required some explanation, and I had none to offer.

The student will probably find the present volume of selections more difficult than any of its predecessors. But students who do not take the trouble of acquiring a classical language must be prepared to give to their own vernacular, more time and attention than they have hitherto done. They have hitherto enjoyed an unfair advantage over those who take up a classical language, and they must not complain now that the balance is sought to be redressed.

BANKIM CHANDRA CHATTERJEE

বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান

['লুপ্তরত্নোদ্ধার'-এর ভূমিকা]

সাত আট বৎসর হইল, মৃত মহাত্মা প্যারীচাঁদ মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র বাবু নগেন্দ্রলাল মিত্রকে আমি বলিয়াছিলাম যে, তাঁহার পিতার সকল গ্রন্থগুলি একত্র করিয়া পুনর্ম্মুদ্রিত করা তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য। উক্ত মহাত্মার পুত্রেরা এক্ষণে সেই পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের ইচ্ছাক্রমে বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল।

বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের এবং বাঙ্গালা গদ্যের একজন প্রধান সংস্কারক। কথাটা বুঝাইবার জন্য বাঙ্গালা গদ্যের ইতিবৃত্ত পাঠককে কিছু স্মরণ করাইয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য।

এক জনের কথা অপরকে বুঝান ভাষা মাত্রেরই যে উদ্দেশ্য, ইহা বলা অনাবশ্যক। কিন্তু কোন কোন লেখকের রচনা দেখিয়া বোধ হয়, যে তাঁহাদের বিবেচনায় যত অল্প লোকে তাঁহাদিগের ভাষা বুঝিতে পারে, ততই ভাল। সংস্কৃতে কাদম্বরী-প্রণেতা এবং ইংরাজিতে এমর্সনের রচনা প্রচলিত ভাষা হইতে এত দূর পৃথক্ যে, বহু কষ্ট স্বীকার না করিলে, কেহ তাঁহাদিগের গ্রন্থ হইতে কোন রস পায় না। অন্যে তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া কোন উপকার পাইবে, এরূপ যে লেখকের উদ্দেশ্য, তিনি সচরাচর বোধগম্য ভাষাতেই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া থাকেন। যে দেশের সাহিত্যে সাধারণ বোধগম্য ভাষাই সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেই দেশের সাহিত্যই দেশের মঙ্গলকর হয়। মহাপ্রতিভাশালী

কবিগণ তাঁহাদিগের হৃদয়স্থ উন্নত ভাব সকল তদুপযোগী উন্নত ভাষা ব্যতীত ব্যক্ত করিতে পারেন না, এই জন্য অনেক সময়ে, মহাকবিগণ দুরূহ ভাষার আশ্রয় লইতে বাধ্য হন এবং সেই সকল উন্নত ভাবের অলঙ্কার স্বরূপ পদ্যে সে সকলকে বিভূষিত করেন।* কিন্তু গদ্যের এরূপ কোন প্রয়োজন নাই। গদ্য যত সুখবোধ্য হইবে, সাহিত্য ততই উন্নতিকারক হইবে। যে সাহিত্যের পাঁচ সাত জন মাত্র অধিকারী, সে সাহিত্যের জগতে কোন প্রয়োজন নাই।

প্রাচীন কালে, অর্থাৎ এদেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে, বাঙ্গালায় সচরাচর পুস্তকরচনা সংস্কৃতের ন্যায় পদ্যেই হইত। গদ্য-রচনা যে ছিল না এমন কথা বলা যায় না, কেন না হস্ত-লিখিত গদ্য গ্রন্থের কথা শুনা যায়। সে সকল গ্রন্থও এখন প্রচলিত নাই, সুতরাং তাহার ভাষা কিরূপ ছিল, তাহা এক্ষণে বলা যায় না। মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইলে, গদ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য-লেখক। তাঁহার পর যে গদ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। এমন কি, বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল। একটির নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটির নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা। এস্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে। আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না,—'খদির' বলিতেন; কদাচ 'চিনি' বলিতেন না—'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাঁহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, 'আজ্য'ই বলিতেন, কদাচিৎ কেহ ঘৃতে নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না,—'কেশ' বলিতে হইতে। 'কলা' বলা হইবে না,—'রম্ভা' বলিতে হইবে। ফলাহারে বসিয়া 'দই' চাহিবার সময় 'দধি' বলিয়া চীৎকার করিতে হইবে। আমি দেখিয়াছি, একজন অধ্যাপক এক দিন 'শিশুমার' ভিন্ন 'শুশুক' শব্দ মুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ, শিশুমার অর্থ জানে না, সুতরাং অধ্যাপক মহাশয় কি বলিতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছিল। পণ্ডিতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাঙ্গালা ভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। এরূপ ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে, তাহা তখনই বিলুপ্ত হইত, কেন না কেহ তাহা পড়িত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন শ্রীবৃদ্ধি হইত না।

এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইঁহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্ব্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও

* কবি যদি ভাষার উপর প্রকৃতরূপে প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে মহাকাব্যও অতি প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত হয়। সংস্কৃতে রামায়ণ ও কালিদাসের মহাকাব্য সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এরূপ সুখবোধ্য কাব্যও সংস্কৃতে আর নাই।

কেহ পারে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সর্ব্বজন-বোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিল। সকল প্রকার কথা এ ভাষায় ব্যবহার হইত না বলিয়া, ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্যে ভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে, ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচীন প্রথায় আবদ্ধ এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারিতায় বিমুগ্ধ হইয়া কেহই আর কোন প্রকার ভাষায় রচনা করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্ব্বমত সঙ্কীর্ণ পথেই চলিল।

ইহা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় আরও একটি গুরুতর বিপদ ঘটিয়াছিল। সাহিত্যের ভাষাও যেমন সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সঙ্কীর্ণ পথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরাজির ছায়ামাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজি গ্রন্থের সার-সঙ্কলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারও শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তিবিলাস ইংরাজি হইতে এবং বেতাল-পঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত। অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরাজি একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সকলে তাঁহাদের অনুকারী এবং অনুবর্ত্তী। বাঙ্গালি-লেখকেরা গতানুগতিকের বাহিরে হস্তপ্রসারণ করিতেন না। জগতের অনন্ত ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করিয়া, সকলেই ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন। সাহিত্যের পক্ষে ইহার অপেক্ষা গুরুতর বিপদ্ আর কিছুই নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় বাবু যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সময়ের প্রয়োজনানুমত, অতএব তাঁহারা প্রশংসা ব্যতীত অপ্রশংসার পাত্র নহেন; কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালি-লেখকের দল সেই একমাত্র পথের পথিক হওয়াই বিপদ্।

এই দুইটি গুরুতর বিপদ্ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালির বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালি কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থপ্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক "আলালের ঘরের দুলাল" নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। "আলালের ঘরের দুলাল" বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন, কিন্তু "আলালের ঘরের দুলালে"র দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে আর কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ।

আমি এমন বলিতেছি না যে "আলালের ঘরের দুলালে"র ভাষা আদর্শ ভাষা। উহাতে গাম্ভীর্য্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাব সকল, সকল সময়ে, পরিস্ফুট করা যায় কি না সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্ব্বজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ

রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয়, এবং যে সর্ব্বজন-হৃদয়-গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। এই কথা জানিতে পারা বাঙ্গালি জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে, এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল"। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু "আলালের ঘরের দুলালে"র পর হইতে বাঙ্গালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়-ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র, আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।

আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্ত্তি এই যে, তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,—তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি "আলালের ঘরের দুলাল"। প্যারীচাঁদ মিত্রের এই দ্বিতীয় অক্ষয়-কীর্ত্তি।

অতএব বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ। এই কথাই আমার বক্তব্য। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ সকলের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আমার অবসর নাই।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী

প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই জীবিতকালে আপন আপন কৃতকার্য্যের পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অনেকের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। যাঁহাদের কার্য্য দেশ কালের উপযোগী নহে, বরং তাহার অগ্রগামী, তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না। যাঁহারা লোকরঞ্জন অপেক্ষা লোকহিতকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না। যাঁহাদের প্রতিভার এক অংশ উজ্জ্বল, অপরাংশ ম্লান, কখন ভস্মাচ্ছন্ন কখন প্রদীপ্ত, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না; কেন না অন্ধকার কাটিয়া দীপ্তির প্রকাশ পাইতে দিন লাগে।

ইহার মধ্যে কোন্ কারণে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়* তাঁহার জীবিতকালে, বাঙ্গালা

* ইঁহার প্রকৃত নাম সঞ্জীবনচন্দ্র, কিন্তু সংক্ষেপানুরোধে সঞ্জীবচন্দ্র নামই ব্যবহৃত হইত। প্রকৃত নামের আশ্রয় লইয়াই এই সংগ্রহের নাম দিয়াছি, সঞ্জীবনী সুধা।

সাহিত্যসভায় তাঁহার উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা এ জীবনী পাঠে পাঠক বুঝিতে পারেন। কিন্তু তিনি যে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে আপনার উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা যিনিই তাঁহার গ্রন্থগুলি যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিবেন, তিনি স্বীকার করিবেন। কালে সে আসন প্রাপ্ত হইবেন। আমি বা চন্দ্রনাথ বাবু এক এক কলম লিখিয়া, তাঁহাকে এক্ষণে সে স্থান দিতে পারিব, এমন ভরসায় আমি উপস্থিত কর্ম্মে ব্রতী হই নাই। তবে আমাদের এক অতি বলবান্ সহায় আছে। কাল, আমাদের সহায়। কালক্রমে ইহা অবশ্য ঘটিবে। আমরাও কালের অনুচর; তাই কালসাপেক্ষ কার্য্যের সূত্রপাতে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার সহোদর। আমি ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ তাঁহার জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই। আমি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের জন্য যাহা করিয়াছি, আমার অগ্রজের জন্য তাহাই করিতেছি। তবে ভ্রাতৃস্নেহসুলভ পক্ষপাতের পরিবাদ ভয়ে তাঁহার গ্রন্থ সমালোচনার ভার আমি গ্রহণ করিলাম না। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার ও আমার পরমসুহৃদ্ বিখ্যাত সমালোচক বাবু চন্দ্রনাথ বসু এই ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে ও পাঠকবর্গকে বাধিত করিয়াছেন।

জীবনী লিখিবারও আমি উপযুক্ত পাত্র নহি। যাঁহার জীবনী লেখা যায়, তাঁহার দোষ গুণ উভয়ই কীর্ত্তন না করিলে, জীবনী লোকশিক্ষার উপযোগী হয় না—জীবনী লেখার উদ্দেশ্য সফল হয় না। সকল মানুষেরই দোষ গুণ দুই থাকে; আমার অগ্রজেরও ছিল। কিন্তু তাঁহার দোষ কীর্ত্তনে আমার প্রবৃত্তি হইতে পারে না; আমি তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিলে লোকে বিশ্বাস করিবে না, ভ্রাতৃস্নেহজনিত পক্ষপাতের ভিতর ফেলিবে। কিন্তু তাঁহার জীবনের ঘটনা সকল আমি ভিন্ন আর কেহ সবিশেষ জানে না—সুতরাং আমিই লিখিতে বাধ্য।

লিখিতে গেলে, তাঁহার দোষ গুণের কথা কিছুই বলিব না, এমন প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা যায় না, কেন না কিছু কিছু দোষ গুণের কথা না বলিলে, ঘটনাগুলি বুঝান যায় না। যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার দোষে, বা তাঁহার গুণে ঘটিয়াছিল। কি দোষে কি গুণে ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতে হইবে। তবে যাহাতে গুণ দোষের কথা খুব কম বলিতে হয়, সে চেষ্টা করিব।

অবসাথী গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণীর ফুলিয়া কুলীনদিগের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার বাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো। তাঁহার বংশীয় রামজীবন চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্ব্বতীরস্থ কাঁটালপাড়া গ্রাম নিবাসী রঘুদেব ঘোষালের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয় প্রাপ্ত হইয়া কাঁটালপাড়ায় বাস করিতে লাগিলেন। সেই অবধি রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় সকলেই কাঁটালপাড়ায় বাস করিতেছেন। এই ক্ষুদ্র লেখকই কেবল স্থানান্তরবাসী।

সেই কাঁটালপাড়া, সঞ্জীবচন্দ্রের জন্মভূমি। * তিনি কথিত রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের প্রপৌত্র পরমারাধ্য যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। ১৭৫৬ শকে বৈশাখ মাসে

* জীবনী লিখিবার অনুরোধে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেও কেবল সঞ্জীবচন্দ্র বলিয়া লিখিতে বাধ্য হইতেছি। প্রথাটা অত্যন্ত ইংরাজি রকমের, কিন্তু যখন আমার পরম সুহৃদ্

ইঁহার জন্ম। যাহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত তাহাদের কৌতূহল নিবারণার্থ ইহা লেখা আবশ্যক, যে তাঁহার জন্মকালে, তিনটি গ্রহ, অর্থাৎ রবি, চন্দ্র, রাহু তুঙ্গী, এবং শুক্র স্বক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে লগ্নাধিপতি ও দশমাধিপতি অস্তমিত। দেখিবেন, ফল মিলিয়াছে কিনা।

সে সময়ে গ্রাম্য প্রদেশে পাঠশালার গুরু মহাশয় শিক্ষামন্দিরের দ্বাররক্ষক ছিলেন; তাঁহার সাহায্যে সকলকেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিতে হইত। অতএব সঞ্জীবচন্দ্র যথাকালে এই বেত্রপাণি দৌবারিকের হস্তে সমর্পিত হইলেন। গুরু মহাশয় যদিও সঞ্জীবচন্দ্রের বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি হাট বাজার করা ইত্যাদি কার্য্যে, তাঁহার মনোভিনিবেশ বেশী ছিল, কেন না তাহাতে উপরি লাভের সম্ভাবনা। সুতরাং ছাত্রও বিদ্যার্জ্জনে তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না। লাভের ভাগটা গুরুরই গুরুতর রহিল।

এই সময়ে আমাদিগের পিতা, মেদিনীপুরে ডেপুটি কালেক্টরী করিতেন। আমরা সকলে, কাঁটালপাড়া হইতে তাঁহার সন্নিধানে নীত হইলাম। সঞ্জীবচন্দ্র মেদিনীপুরের স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন। কিছুকালের পর আবার আমাদিগকে কাঁটালপাড়ায় আসিতে হইল। এবার সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী কালেজে প্রেরিত হইলেন। তিনি কিছু দিন সেখানে অধ্যয়ন করিলে আবার একজন "গুরু মহাশয়" নিযুক্ত হইলেন। আমার ভাগ্যোদয়-ক্রমেই এই মহাশয়ের শুভাগমন; কেন না আমাকে ক, খ, শিখিতে হইবে, কিন্তু বিপদ্ অনেক সময়েই সংক্রামক। সঞ্জীবচন্দ্রও রামপ্রাণ সরকারের হস্তে সমর্পিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আট দশ মাসে এই মহাত্মার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মেদিনীপুর গেলাম। সেখানে, সঞ্জীবচন্দ্র আবার মেদিনীপুরের ইংরেজি স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন।

সেখানে তিন চারি বৎসর কাটিল। সঞ্জীবচন্দ্র অনায়াসে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রদিগের মধ্যে স্থান লাভ করিলেন। এইখানে তিনি তখনকার প্রচলিত Junior Scholarship পরীক্ষা দিলে, তাঁহার বিদ্যোপার্জ্জনের পথ সুগম হইত। কিন্তু বিধাতা সেরূপ বিধান করিলেন না। পরীক্ষার অল্পকাল পূর্ব্বেই আমাদিগকে মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইল। আবার কাঁটালপাড়ায় আসিলাম। সঞ্জীবচন্দ্রকে আবার হুগলী কালেজে প্রবিষ্ট হইতে হইল। Junior Scholarship পরীক্ষায় বিলম্ব পড়িয়া গেল।

এই সকল ঘটনাগুলিকে গুরুতর শিক্ষাবিভ্রাট বলিতে হইবে। আজি এ স্কুলে, কাল ও স্কুলে, আজি গুরু মহাশয়, কালি মাষ্টার, আবার গুরু মহাশয়, আবার মাষ্টার, এরূপ শিক্ষাবিভ্রাট ঘটিলে কেহই সুচারুরূপে বিদ্যোপার্জ্জন করিতে পারে না। যাঁহারা

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় এই প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তখন মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা। বিশেষ তিনি আমারই "দাদা মহাশয়", কিন্তু পাঠকের কাছে সঞ্জীবচন্দ্র মাত্র। অতএব দাদা মহাশয়, দাদা মহাশয়, পুনঃ পুনঃ পাঠকের রুচিকর না হইতে পারে।

গবর্ণমেণ্টের উচ্চতর চাকরি করেন, তাঁহাদের সন্তানগণকে প্রায় সচরাচর এইরূপ শিক্ষা-বিভ্রাটে পড়িতে হয়। গৃহকর্ত্তার বিশেষ মনোযোগ, অর্থব্যয়, এবং আত্মসুখের লাঘব স্বীকার ব্যতীত ইহার সদুপায় হইতে পারে না।

কিন্তু ইহাও সকলের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, দুই দিকেই বিষম সঙ্কট। বালক বালিকাদিগের শিক্ষা অতিশয় সতর্কতার কাজ। এক দিগে পুনঃ পুনঃ বিদ্যালয় পরিবর্ত্তনে বিদ্যাশিক্ষার অতিশয় বিশৃঙ্খলতার সম্ভাবনা; আর দিগে আপনার শাসনে বালক না থাকিলে বালকের বিদ্যাশিক্ষায় আলস্য বা কুসংসর্গ ঘটনা, খুব সম্ভব। সঞ্জীবচন্দ্র প্রথমে, প্রথমোক্ত বিপদে পড়িয়াছিলেন, এক্ষণে অদৃষ্টদোষে দ্বিতীয় বিপদেও তাঁহাকে পড়িতে হইল। এই সময়ে পিতৃদেব বিদেশে, আমাদিগের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহোদরও চাকরি উপলক্ষে বিদেশে। মধ্যম সঞ্জীবচন্দ্র বালক হইলেও কর্ত্তা—

Lord of himself, that heritage of woe!

কাজেই কতকগুলা বিদ্যানুশীলনবিমুখ ক্রীড়াকৌতুকপরায়ণ বালক—ঠিক বালক নহে, বয়ঃপ্রাপ্ত যুবা, আসিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিল।

সঞ্জীবচন্দ্র চিরকাল সমান উদার, প্রীতিপরবশ। প্রাচীন বয়সেও আশ্রিত অনুগত ব্যক্তি কুস্বভাবাপন্ন হইলেও তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিতেন না। কৈশোরে যে তাহা পারেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। কাজেই বিদ্যাচর্চ্চার হানি হইতে লাগিল। নিম্নলিখিত ঘটনাটিতে তাহা কিছুকালের জন্য একেবারে বন্ধ হইল।

হুগলী কালেজে পুনঃপ্রবিষ্ট হওয়ার পর প্রথম পরীক্ষার সময় উপস্থিত। এক দিন হেডমাষ্টর গ্রেব্‌স সাহেব আসিয়া কোন্ দিন কোন্ ক্লাসের পরীক্ষা হইবে, তাহা বলিয়া দিয়া গেলেন। সঞ্জীবচন্দ্র কালেজ হইতে বাড়ী আসিয়া স্থির করিলেন, এ দুই দিন বাড়ী থাকিয়া ভাল করিয়া পড়া শুনা করা যাউক, কালেজে যাইব না, পরীক্ষার দিন যাইব। তাহাই করিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহাদিগের ক্লাসের পরীক্ষার দিন বদল হইল—অবধারিত দিবসের পূর্ব্বদিন পরীক্ষা হইবে স্থির হইল। আমি সে সন্ধান জানিতে পারিয়া, অগ্রজকে তাহা জানাইলাম। বুঝিলাম, যে তিনি পরীক্ষা দিতে কালেজে যাইবেন। কিন্তু পরীক্ষার দিন, কালেজে যাইবার সময় দেখিলাম, তিনি উপরিলিখিত বানর সম্প্রদায়ের মধ্যে এক জনের সঙ্গে সতরঞ্চ খেলিতেছিলেন। বিদ্যার মধ্যে এইটি তাহারা অনুশীলন করিত, এবং সঞ্জীবচন্দ্রকে এ বিদ্যা দান করিয়াছিল। আমি তখন পরীক্ষার কথাটা সঞ্জীবচন্দ্রকে স্মরণ করাইয়া দিলাম। কিন্তু বানর সম্প্রদায় সেখানে দলে ভারি ছিল; তাহারা বাদানুবাদ করিয়া প্রতিপন্ন করিল যে আমি অতিশয় দুষ্ট বালক, কেন না লেখা পড়া করার ভান করিয়া থাকি, এবং কখন কখন গোইন্দাগিরি করিয়া বানর সম্প্রদায়ের কীর্ত্তি কলাপ মাতৃদেবীর শ্রীচরণে নিবেদন করি। কাজেই ইহাই সম্ভব যে, আমি গল্পটা রচনা করিয়া বলিয়াছি। সরলচিত্ত সঞ্জীবচন্দ্র তাহাই বিশ্বাস করিলেন। পরীক্ষা দিতে গেলেন না। তৎকালে প্রচলিত নিয়মানুসারে কাজেই উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন না। ইহাতে এমন ভগ্নোৎসাহ হইলেন যে, তৎক্ষণাৎ কলেজ পরিত্যাগ করিলেন, কাহারও কথা শুনিলেন না।

তখন পিতাঠাকুর বর্দ্ধমানে ডেপুটি কালেক্টর। তখন রেল হয় নাই; বর্দ্ধমান দূরদেশ। এই সংবাদ যথা কালে তাঁহার কাছে পৌঁছিল। তাঁহার বিজ্ঞতা অসাধারণ ছিল, তিনি এই সংবাদ পাইয়াই পুত্রকে আপনার নিকট লইয়া গেলেন। তাঁহার স্বভাব চরিত্র বিলক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিলেন, যে ইহাকে তাড়না করিয়া আবার কলেজে পাঠাইলে এখন কিছু হইবে না, যখন স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যোপার্জ্জন করিবে, তখন সুফল ফলিবে।

তাহাই ঘটিল। সহসা সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভা জ্বলিয়া উঠিল। যে আগুন এত দিন ভস্মাচ্ছন্ন ছিল হঠাৎ তাহা জ্বালাবিশিষ্ট হইয়া চারি দিক আলো করিল। এই সময়ে আমাদিগের সর্ব্বাগ্রজ ৺শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বারাকপুরে চাকরি করিতেন। তখন সেখানে গবর্ণমেন্টের একটি উত্তম ডিষ্ট্রিক্ট স্কুল ছিল। প্রধান শিক্ষকের বিশেষ খ্যাতি ছিল। সঞ্জীবচন্দ্র Junior Scholarship পরীক্ষা দিবার জন্য প্রথম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন। পরীক্ষায় জন্য তিনি এরূপ প্রস্তুত হইলেন, যে সকলেই আশা করিল যে তিনি পরীক্ষায় বিশেষ যশোলাভ করিবেন। কিন্তু বিধিলিপি এই, যে পরীক্ষায় তিনি চিরজীবন বিফলযত্ন হইবেন। এবার পরীক্ষার দিন তাঁহার গুরুতর পীড়া হইল; শয্যা হইতে উঠিতে পারিলেন না। পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

তার পর আর সঞ্জীবচন্দ্র কোন বিদ্যালয়ে গেলেন না। বিনা সাহায্যে, নিজ প্রতিভা বলে, অল্পদিনে ইংরেজি সাহিত্যে, বিজ্ঞানে এবং ইতিহাসে অসাধারণ শিক্ষা লাভ করিলেন। কালেজে যে ফল ফলিত, ঘরে বসিয়া তাহা সমস্ত লাভ করিলেন।

তখন পিতৃদেব বিবেচনা করিলেন যে এখন ইহাকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। তিনি সঞ্জীবচন্দ্রকে বর্দ্ধমান কমিশনারের আপিসে একটি সামান্য কেরানিগিরি করিয়া দিলেন। কেরানিগিরিটি সামান্য, কিন্তু উন্নতির আশা অসামান্য। তাঁহার সঙ্গে যে যে সে আপিসে কেরানিগিরি করিত, সকলেই পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিল। ইনিও হইতেন, উপায়ান্তরে হইয়াও ছিলেন। কিন্তু এ পথে আমি একটা প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিলাম। তিনি যে একটি ক্ষুদ্র কেরানিগিরি করিতেন ইহা আমার অসহ্য হইত। তখন নূতন প্রেসিডেন্সি কলেজ খুলিয়াছিল; তাহার "Law Class" তখন নূতন। আমি তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। তখন যে কেহ তাহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারিত। আমি অগ্রজকে পরামর্শ দিয়া কেরানিগিরিটি পরিত্যাগ করাইয়া ল ক্লাসে প্রবিষ্ট করাইলাম। আমি শেষ পর্য্যন্ত রহিলাম না; দুই বৎসর পড়িয়া চাকরি করিতে গেলাম। তিনি শেষ পর্য্যন্ত রহিলেন, কিন্তু পড়া শুনায় আর মনোযোগ করিলেন না। পরীক্ষায় সুফল বিধাতা তাঁহার অদৃষ্টে লিখেন নাই; পরীক্ষায় নিষ্ফল হইলেন। তখন প্রতিভা ভস্মাচ্ছন্ন।

তখন উদারচেতা মহাত্মা, এ সকল ফলাফল কিছুমাত্র গ্রাহ্য না করিয়া কাঁটালপাড়ায় মনোহর পুষ্পোদ্যান রচনায় মনোযোগ দিলেন। পিতা ঠাকুর মনে করিলেন, পুত্র পুষ্পোদ্যানে অর্থব্যয় করা অপেক্ষা, অর্থ উপার্জ্জন করা ভাল। তিনি যাহা মনে করিতেন, তাহা করিতেন। তখন উইল্‌সন সাহেব নূতন ইনকমটেক্স বসাইয়াছেন। তাহার অবধারণ জন্য জেলায় জেলায় আসেসর নিযুক্ত হইতেছিল। পিতাঠাকুর

সঞ্জীবচন্দ্রকে আড়াই শত টাকা বেতনের একটি আসেসরিতে নিযুক্ত করাইলেন। সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী জেলায় নিযুক্ত হইলেন।

কয়েক বৎসর আসেসরি করা হইল। তার পর পদটা এবলিশ হইল। পুনশ্চ কাঁটালপাড়ায় পুষ্পপ্রিয়, সৌন্দর্য্যপ্রিয়, সুখপ্রিয় সঞ্জীবচন্দ্র আবার পুষ্পোদ্যান রচনায় মনোযোগ দিলেন। কিন্তু এবার একটা বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠাগ্রজ, শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অভিপ্রায় করিলেন, যে পিতৃদেবের দ্বারা নূতন শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করাইবেন। তিনি সেই মনোহর পুষ্পোদ্যান ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহার উপর শিবমন্দির প্রস্তুত করিলেন। দুঃখে সঞ্জীবচন্দ্রের ভস্মাচ্ছাদিতা প্রতিভা আবার জ্বলিয়া উঠিল—সেই অগ্নিশিখায় জন্মিল—"Bengal Ryot."

এই পুস্তকখানি ইংরেজিতে লিখিত। এখনকার পাঠক জানেন না, যে এ জিনিষটা কি? কিন্তু একদিন এই পুস্তক হাইকোর্টের জজদিগেরও হাতে হাতে ফিরিয়াছে। এই পুস্তকখানি প্রণয়নে সঞ্জীবচন্দ্র বিস্ময়কর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। প্রত্যহ কাঁটালপাড়া হইতে দশটার সময়ে ট্রেনে কলিকাতায় আসিয়া রাশি রাশি প্রাচীন পুস্তক ঘাঁটিয়া অভিলষিত তত্ত্ব সকল বাহির করিয়া সংগ্রহ করিয়া লইয়া সন্ধ্যাকালে বাড়ী যাইতেন। রাত্রে তাহা সাজাইয়া লিপিবদ্ধ করিয়া প্রাতে আবার কলিকাতায় আসিতেন। পুস্তকখানির বিষয়, (১) বঙ্গীয় প্রজাদিগের পূর্ব্বতন অবস্থা, (২) ইংরেজের আমলে প্রজাদিগের সম্বন্ধে যে সকল আইন হইয়াছে, তাহার ইতিবৃত্ত ও ফলাফল বিচার, (৩) ১৮৫৯ সালের দশ আইনের বিচার, (৪) প্রজাদিগের উন্নতির জন্য যাহা কর্ত্তব্য।

পুস্তকখানি প্রচারিত হইবা মাত্র, বড় বড় সাহেব মহলে বড় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রেবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটরী চাপ্‌মান্ সাহেব স্বয়ং কলিকাতা রিবিউতে ইহার সমালোচনা করিলেন। অনেক ইংরেজ বলিলেন যে, ইংরেজও এমন গ্রন্থ লিখিতে পারে নাই। হাইকোর্টের জজেরা ইহা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ঠাকুরাণী দাসীর মোকদ্দমায় ১৫ জন জজ ফুল বেঞ্চে বসিয়া প্রজাপক্ষে যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, এই গ্রন্থ অনেক পরিমাণে তাহার প্রবৃত্তিদায়ক। গ্রন্থখানি দেশের অনেক মঙ্গল সিদ্ধ করিয়া এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, তাহার কারণ ১৮৫৯ সালের দশ আইন রহিত হইয়াছে; Hills *vs.* Iswar Ghose মোকদ্দমার ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে। এই দুই ইহার লক্ষ্য ছিল।

গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া লেফটেনাণ্ট গবর্ণর সাহেব, সঞ্জীবচন্দ্রকে একটি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটি পদ উপহার দিলেন। পত্র পাইয়া সঞ্জীবচন্দ্র আমাকে বলিলেন, "ইহাতে পরীক্ষা দিতে হয়; আমি কখন পরীক্ষা দিতে পারি না; সুতরাং এ চাকরি আমার থাকিবে না।"

পরিশেষে তাহাই ঘটিল, কিন্তু এক্ষণে সঞ্জীবচন্দ্র কৃষ্ণনগরে নিযুক্ত হইলেন। তখনকার সমাজের ও কাব্যজগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র দীনবন্ধু মিত্র তখন তথায় বাস করিতেন। ইঁহাদের পরস্পরে আন্তরিক, অকপট বন্ধুতা ছিল; উভয়ে উভয়ের প্রণয়ে অতিশয় সুখী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের অনেক সুশিক্ষিত মহাত্মব্যক্তিগণ তাঁহাদিগের নিকট সমাগত হইতেন; দীনবন্ধু ও সঞ্জীবচন্দ্র উভয়েই কথোপকথনে অতিশয় সুরসিক

ছিলেন। সরস কথোপকথনের তরঙ্গে প্রত্যহ আনন্দস্রোত উচ্ছলিত হইত। কৃষ্ণনগর বাসকালই সঞ্জীবচন্দ্রের জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা সুখের সময় ছিল। শরীর নীরোগ, বলিষ্ঠ; অভিলষিত পদ, প্রয়োজনীয় অর্থাগম, পিতামাতার অপরিমিত স্নেহ; ভ্রাতৃগণের সৌহৃদ্য, পারিবারিক সুখ, এবং বহু সৎসুহৃদসংসর্গসঞ্জাত অক্ষুণ্ন আনন্দপ্রবাহ। মনুষ্যে যাহা চায়, সকলই তিনি এই সময়ে পাইয়াছিলেন।

দুই বৎসর এইরূপে কৃষ্ণনগরে কাটিল। তাহার পর গবর্ণমেণ্টে তাঁহাকে কোন গুরুতর কার্য্যের ভার দিয়া পালামৌ পাঠাইলেন। পালামৌ, তখন ব্যাঘ্র ভল্লুকের আবাসভূমি, বন্য প্রদেশ মাত্র। সুহৃদ্‌প্রিয় সঞ্জীবচন্দ্র সে বিজন বনে একা তিষ্ঠিতে পারিলেন না। শীঘ্রই বিদায় লইয়া আসিলেন। বিদায় ফুরাইলে আবার যাইতে হইল, কিন্তু যে দিন পালামৌ পৌঁছিলেন, সেই দিনই পালামৌর উপর রাগ করিয়া বিনা বিদায়ে চলিয়া আসিলেন। আজিকার দিনে, এবং সে কালেও এরূপ কাজ করিলে চাকরি থাকে না। কিন্তু তাঁহার চাকরি রহিয়া গেল, আবার বিদায় পাইলেন। আর পালামৌ গেলেন না। কিন্তু পালামৌয়ে যে অল্প কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন বাঙ্গালা সাহিত্যে রহিয়া গেল। "পালামৌ" শীর্ষক যে কয়টি মধুর প্রবন্ধ এই সংগ্রহে সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা সেই পালামৌ যাত্রার ফল। প্রথমে ইহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। প্রকাশ কালে, তিনি নিজের রচনা বলিয়া ইহা প্রকাশ করেন নাই। "প্রমথ নাথ বসু" ইতি কাল্পনিক নামের আদ্যক্ষর সহিত ঐ প্রবন্ধ-গুলি প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার সম্মুখে বসিয়াই তিনি এগুলি লিখিয়াছিলেন, অতএব এগুলি যে তাঁহার রচনা তদ্বিষয়ে পাঠকের সন্দেহ করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

এবার বিদায়ের অবসানে তিনি যশোহরে প্রেরিত হইলেন। সে স্থান অস্বাস্থ্যকর, তথায় সপরিবারে পীড়িত হইয়া আবার বিদায় লইয়া আসিলেন। তার পর অল্প দিন আলিপুরে থাকিয়া পাবনায় প্রেরিত হইলেন।

ডিপুটিগিরিতে দুইটা পরীক্ষা দিতে হয়। পরীক্ষা বিষয়ে তাঁহার যে অদৃষ্ট তাহা বলিয়াছি। কিন্তু এবার প্রথম পরীক্ষায় তিনি কোনরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। কর্ম্ম গেল। তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার মার্ক তাঁহার হইয়াছিল। কিন্তু বেঙ্গল অফিসের কোন কর্ম্মচারী ঠিক ভুল করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার অনিষ্ট করিয়াছিল। বড় সাহেবদিগকে একথা জানাইতে আমি পরামর্শ দিয়াছিলাম; জানানও হইয়াছিল কিন্তু কোন ফলোদয় হয় নাই।

কথাটা অমূলক কি সমূলক তাহা বলিতে পারি না। সমূলক হইলেও, গবর্ণমেণ্টের এমন একটা গলৎ সচরাচর স্বীকার করা প্রত্যাশা করা যায় না। কোন কেরানি যদি কৌশল করে, তবে সাহেবদিগের তাহা ধরিবার উপায় অল্প। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ কথার আন্দোলনে যেরূপ ব্যবহার করিলেন, তাহা দুই দিক্ রাখা রকমের। সঞ্জীবচন্দ্র ডিপুটিগিরি আর পাইলেন না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তুল্য বেতনের আর একটি চাকরি দিলেন। বারাসতে তখন একজন স্পেশিয়াল সবরেজিষ্ট্রার থাকিত। গবর্ণমেণ্ট সেই পদে সঞ্জীবচন্দ্রকে নিযুক্ত করিলেন।

যখন তিনি বারাসতে তখন প্রথম সেন্‌সস্ হইল। এ কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব Inspector General of Registration এর উপরে অর্পিত। সেন্‌সসের অঙ্ক সকল ঠিক্ ঠাক্ দিবার জন্য হাজার কেরানি নিযুক্ত হইল। তাহাদের কার্য্যের তত্ত্বাবধান জন্য সঞ্জীবচন্দ্র নির্ব্বাচিত ও নিযুক্ত হইলেন।

এ কার্য্য শেষ হইলে পরে, সঞ্জীবচন্দ্র হুগলীর Special Sub-Registrar হইলেন। ইহাতে তিনি সুখী হইলেন, কেন না তিনি বাড়ী হইতে আপিস করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে হুগলীর সবরেজিষ্ট্রারী পদের বেতন কমান গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় হওয়ায়, সঞ্জীবচন্দ্রের বেতনের লাঘব না হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি বর্দ্ধমানে প্রেরিত হইলেন।

বর্দ্ধমানে সঞ্জীবচন্দ্র খুব সুখে ছিলেন। এইখানে থাকিবার সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ্য সম্বন্ধ জন্মে। বাল্যকাল হইতে সঞ্জীবচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনায় অনুরাগ ছিল। কিন্তু তাঁহার বাল্য রচনা কখন প্রকাশিত হয় নাই, এক্ষণেও বিদ্যমান নাই। কিশোর বয়সে শ্রীযুক্ত কালিদাস মৈত্র সম্পাদিত শশধর নামক পত্রে তিনি দুই একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রশংসিতও হইয়াছিল। তাহার পর অনেক বৎসর বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে বড় সম্বন্ধ রাখেন নাই। ১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ আমি বঙ্গদর্শন সৃষ্টি করিলাম। ঐ বৎসর ভবানীপুরে উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল। কিন্তু ইত্যবসরে সঞ্জীবচন্দ্র কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে একটি ছাপাখানা স্থাপিত করিলেন। নাম দিলেন বঙ্গদর্শন প্রেস। তাঁহার অনুরোধে আমি বঙ্গদর্শন ভবানীপুর হইতে উঠাইয়া আনিলাম। বঙ্গদর্শন প্রেসে বঙ্গদর্শন ছাপা হইতে লাগিল। সঞ্জীবচন্দ্রও বঙ্গদর্শনের দুই একটা প্রবন্ধ লিখিলেন। তখন আমি পরামর্শ স্থির করিলাম যে, আর একখানা ক্ষুদ্রতর মাসিক পত্র বঙ্গদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হওয়া ভাল। যাহারা বঙ্গদর্শনের মূল্য দিতে পারে না, অথবা বঙ্গদর্শন যাঁহাদের পক্ষে কঠিন, তাঁহাদের উপযোগী একখানি মাসিক পত্র প্রচার বাঞ্ছনীয় বিবেচনায়, তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম যে তাদৃশ কোন পত্রের স্বত্ব ও সম্পাদকতা তিনি গ্রহণ করেন। সেই পরামর্শানুসারে তিনি ভ্রমর নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। পত্রখানি অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল; এবং তাহাতে বিলক্ষণ লাভও হইত। এখন আবার তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভা পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। প্রায় তিনি একাই ভ্রমরের সমস্ত প্রবন্ধ লিখিতেন; আর কাহারও সাহায্য সচরাচর গ্রহণ করিতেন না। এই সংগ্রহে যে দুটি উপন্যাস দেওয়া গেল, তাহা ভ্রমরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এক কাজ তিনি নিয়মমত অধিক দিন করিতে ভাল বাসিতেন না। ভ্রমর লোকান্তরে উড়িয়া গেল। আমিও ১২৮২ সালের পর বঙ্গদর্শন বন্ধ করিলাম। বঙ্গদর্শন এক বৎসর বন্ধ থাকিলে পর, তিনি আমার নিকট ইহার স্বত্বাধিকার চাহিয়া লইলেন। ১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৯ সাল পর্য্যন্ত তিনিই বঙ্গদর্শনের সম্পাদকতা করেন। পূর্ব্বে আমার সম্পাদকতার সময়ে, বঙ্গদর্শনে যেরূপ প্রবন্ধ বাহির হইত, এখনও তাহাই হইতে লাগিল। সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনের গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিল। যাঁহারা পূর্ব্বে বঙ্গদর্শনে লিখিতেন, এখনও তাঁহারা লিখিতে লাগিলেন। অনেক নূতন লেখক—যাঁহারা এক্ষণে খুব প্রসিদ্ধ,

তাঁহারাও লিখিতে লাগিলেন। "কৃষ্ণকান্তের উইল," "রাজসিংহ," "আনন্দমঠ," "দেবী চৌধুরাণী" তাঁহার সম্পাদকতাকালেই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনি নিজেও তাঁহার তেজস্বিনী প্রতিভার সাহায্য গ্রহণ করিয়া, "জাল প্রতাপচাঁদ", "পালামৌ," "বৈজিকতত্ত্ব" প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু বঙ্গদর্শনের আর তেমন প্রতিপত্তি হইল না। তাহার কারণ, ইহা কখনও সময়ে প্রকাশিত হইত না। সম্পাদকের অমনোযোগে, এবং কার্য্যাধ্যক্ষতার কার্য্যের বিশৃঙ্খলতায়, বঙ্গদর্শন কখনও আর নির্দ্দিষ্ট সময়ে বাহির হইত না। এক মাস, দুই মাস, চারি মাস, ছয় মাস, এক বৎসর বাকি পড়িতে লাগিল।

বর্দ্ধমানেরও স্পেসিয়াল সবরেজিষ্ট্রীর বেতন কমিয়া গেল। এবার সঞ্জীবচন্দ্রকে যশোহর যাইতে হইল। তাঁহার যাওয়ার পরে, বার্টন নামা এক জন নরাধম ইংরেজ কালেক্টর হইয়া সেখানে আসিল। যে কালেক্টর, সেই মাজিষ্ট্রেট, সেই রেজিষ্ট্রর। ভারতে আসিয়া বার্টনের একমাত্র ব্রত ছিল—শিক্ষিত বাঙ্গালী কর্ম্মচারীকে কিসে অপদস্থ ও অপমানিত করিবেন বা পদচ্যুত করাইবেন, তাহাই তাঁহার কার্য্য। অনেকের উপর তিনি অসহ্য অত্যাচার করিয়াছিলেন। সঞ্জীবচন্দ্রের উপরও আরম্ভ করিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র বিরক্ত হইয়া বিদায় লইয়া বাড়ী আসিলেন।

বাড়ী আসিলে পর, আমাদিগের পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিলেন। এতদিন তাঁহার ভয়ে, সঞ্জবিচন্দ্র আপনার মনের বাসনা চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। পিতৃদেবের স্বর্গারোহণের পর আমরা দুই জনের দুইটি সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিলাম। আমি কাঁটালপাড়া ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় উঠিয়া আসিলাম—সঞ্জীবচন্দ্র চাকরি ত্যাগ করিলেন। সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয় ও কার্য্যালয় কলিকাতায় উঠাইয়া আনিলেন।

কিন্তু আর বঙ্গদর্শন চলা ভার হইল। বঙ্গদর্শনের কোন কোন কর্ম্মচারী এমন ছিল, যে, তাহাদিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক ছিল। পিতাঠাকুর মহাশয় যত দিন বর্ত্তমান ছিলেন, তত দিন তিনি সে দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে কাহার শস্য কাহার গৃহে যাইতে লাগিল, তাহার ঠিক নাই। যিনি মালিক, তিনি উদারতা ও চক্ষুলজ্জা বশতঃ কিছুই দেখেন না। টাকা কড়ি "মুগুরিবাঁটা" হইতে লাগিল। প্রথমে ছাপাখানা গেল—শেষে বঙ্গদর্শনের অপঘাত মৃত্যু হইল।

তার পর সঞ্জীবচন্দ্র, কাঁটালপাড়ার বাড়ীতে বসিয়া রহিলেন। কয়েক বৎসর কেবল বসিয়া রহিলেন। কোন মতে কোন কার্য্যে কেহ প্রবৃত্ত করিতে পারিল না। সে জ্বালাময়ী প্রতিভা আর জ্বলিল না। ক্রমশঃ শরীর রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। পরিশেষে ১৮১১ শকে বৈশাখ মাসে, জ্বরবিকারে তিনি দেহত্যাগ করিলেন।

তাঁহার প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে (১) মাধবীলতা, (২) কণ্ঠমালা, (৩) জাল প্রতাপচাঁদ, (৪) রামেশ্বরের অদৃষ্ট, (৫) যাত্রা সমালোচন, (৬) Bengal Ryot, এই কয়খানি পৃথক্ ছাপা হইয়াছে, অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি প্রকাশ করিতে আমি প্রবৃত্ত হইলাম। "রামেশ্বরের অদৃষ্ট" এক্ষণে আর পাওয়া যায় না, এজন্য তাহাও এই সংগ্রহভুক্ত হইল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অভ্যাসার্থ

৩। নীচের লিখিত বিশেষ্যের সঙ্গে উপযুক্ত বিশেষণ যোগ কর।

সমুদ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, হস্তী, বন, সংসার, স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, বালিকা, দেশ, রাত্রি, আসন, পুতুল, হংস।

৪। নীচের লিখিত বিশেষণের পর উপযুক্ত বিশেষ্য যোগ কর।

নশ্বর, পবিত্র, দীন, অযোগ্য, কষ্টসাধ্য, গুণবতী, সুলভ, সদাচার, শান্ত, পরিষ্কার, অজ্ঞাত।

তৃতীয় পাঠ

"ফলবান্ বৃক্ষ", "বলবান্ পুরুষ", "নির্ম্মল আকাশ", "বেগবতী নদী" বলিলে বাক্য সম্পূর্ণ হইল না। "ফলবান্ বৃক্ষ" সম্বন্ধে কি বলিতেছ? "বলবান্ পুরুষ" সম্বন্ধে কি বলিতে চাও? এখানে "ফলবান্ বৃক্ষ", বলবান্ পুরুষ" বিষয়; কিন্তু বক্তব্য কই? বক্তব্য লিখিলে তবে বাক্য সম্পূর্ণ হইবে। যেমন—

ফলবান্ বৃক্ষ কাটিও না।	নির্ম্মল আকাশ দেখিতে সুন্দর।
বলবান্ পুরুষ সাহসী হয়।	বেগবতী নদী বহিতেছে।

অভ্যাসার্থ

৫। নীচের লিখিত বিষয়ে বক্তব্য যোগ কর।

দয়াময় ভগবান্।	স্নেহময়ী মাতা।
অবোধ শিশু।	অন্নহীন ভিক্ষুক।
নিষ্ফল কার্য্য।	স্বচ্ছ সরোবর।
সহজ কাজ।	মজবুত বাঁশ।
অন্ধকার রাত্রি।	পাকা আটচালা।

"ফলবান্ বৃক্ষ", "বলবান্ পুরুষ" বলিলে বাক্য সম্পূর্ণ হয় না বটে, কিন্তু যদি বলি "বৃক্ষ ফলবান্", "মনুষ্য বলবান্", তাহা হইলে বাক্য সম্পূর্ণ হয়। তাহার কারণ সহজে বুঝিতে পারিবে। "ফলবান্ বৃক্ষ" বলিলে, "ফলবান্ বৃক্ষ"ই বিষয় হইল, বক্তব্য নাই। কিন্তু "বৃক্ষ ফলবান্" বলিলে বৃক্ষ বিষয় হইল—ফলবত্তা তাহার বক্তব্য। "বৃক্ষ ফলবান্" এ কথায় এই বুঝায় যে, বৃক্ষে ফল হয়। "মানুষ বলবান্" বলিলে বুঝাইবে, "মানুষের বল আছে।"

দেখ, দুই রকমে এক বক্তব্য প্রকাশ করা যায়। যথা—

{ বৃক্ষ ফলবান্। বৃক্ষে ফল হয়। }	{ মনুষ্য বলবান্। মানুষের বল আছে। }
{ আকাশ নির্ম্মল। আকাশের নির্ম্মলতা আছে। আকাশ নির্ম্মল হইয়াছে। }	{ নদী বেগবতী। নদীর বেগ আছে। }

"আছে" "হয়" হইয়াছে" এইগুলিকে ক্রিয়া বলে। যাহাতে একটা কাজ বুঝায়, কিম্বা অবস্থান্তরপ্রাপ্তি বুঝায়, তাহাকেই ক্রিয়া বলে। ধরিল, থাকিল, যাইল, শয়ন করিল, ভক্ষণ করিল, নিবেদন করিল—এ সব ক্রিয়া।

অতএব বক্তব্য দুই প্রকারে প্রকাশ করা যায়, এক প্রকার বিশেষণ দ্বারা, যেমন "বৃক্ষ ফলবান্" ; আর এক প্রকার ক্রিয়া দ্বারা, যেমন—"বৃক্ষে ফল হয়।"

অভ্যাসার্থ

৬। নীচের লিখিত বাক্যগুলির বক্তব্য বিশেষণের দ্বারা বল।

বাঙ্গালির বুদ্ধি আছে। সন্দেশের স্বাদ ভাল লাগে।
ইংরেজের বিদ্যা আছে। বসন্তের বাতাস আস্তে বয়।
মৎস্যে খারাপ গন্ধ পাওয়া যায়। জলে ভিজিলে পীড়া হয়।

৭। নীচের লিখিত বাক্যগুলিতে বক্তব্য ক্রিয়ার দ্বারা প্রকাশ কর।

পৃথিবী ঘূর্ণামান। তাহার স্বর গম্ভীর।
সূর্য্যকিরণ অসহ্য। মাতাল চিরদুঃখী।
ব্যাঘ্র মাংসাশী।

চতুর্থ পাঠ

বিশেষণের আবার বিশেষণ হয়, যেমন—

অতিশয় ভারী। প্রচণ্ড তেজস্বী। প্রগাঢ় অন্ধকার।

ইহাতে বিশেষ্য যোগ করা যায় ; যথা—

অতিশয় ভারী লোহা। প্রচণ্ড তেজস্বী অগ্নি। প্রগাঢ় অন্ধকার রাত্রি।

অথবা,

লোহা অতিশয় ভারী। সূর্য্য প্রচণ্ড তেজস্বী। বর্ষার রাত্রি প্রগাঢ় অন্ধকার।

আবার ক্রিয়ারও বিশেষণ আছে, যেমন—

মৃদু হাসিতেছে। দারুণ জ্বলিতেছে।
শীঘ্র যাইতেছে। ভালরূপে মেরামত করিতেছে।

পঞ্চম পাঠ

এখন বিষয়, বক্তব্য, বিশেষণ, ক্রিয়ার বিশেষণ, এই সকল লইয়া বাক্য রচনা করিতে শিখ।

একটা বিষয় লও। "রাক্ষস"। বক্তব্য—তাহার বিনাশ। বাক্য এইরূপে লিখিতে হইবে।

"রাক্ষস বিনষ্ট হইল।"

এখন বিশেষণ যোগ কর। প্রথম বিষয়ের বিশেষণ লেখ।

"পাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা বিনষ্ট হইল।"

তার পর ক্রিয়ার বিশেষণ লেখ।

"পাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা নিঃশেষে বিনষ্ট হইল।"

তার পর ইচ্ছা করিলে, "পাপিষ্ঠে" বিশেষণের বিশেষণ দিতে পার।

"চিরপাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা নিঃশেষে বিনষ্ট হইল।"

পরীক্ষার্থ

নিম্নলিখিত বিষয় ও বক্তব্য লইয়া বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ যোগপূর্ব্বক বাক্য রচনা কর।

বিষয়	বক্তব্য
পুত্র	পিতামাতার উপকার করা।
রাজা	প্রজাপালন করা।
স্ত্রী	স্বামীর সেবা করা।
বিদ্যা	অভ্যাসের অধীন।

ষষ্ঠ পাঠ

কখন কখন বাক্য সম্পূর্ণ হইলেও, আরও কিছুর আকাঙ্ক্ষা থাকে। "চিরপাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা নিঃশেষে বিনষ্ট হইল" এই বাক্যটি সম্পূর্ণ বটে, কিন্তু ইহাতে কিছু আকাঙ্ক্ষা রহিল। কর্ম্ম আছে কিন্তু কর্ত্তা নাই। রাক্ষসেরা বিনষ্ট হইল, আমরা জানিতেছি; কিন্তু কে তাহাদের বিনষ্টকারী, তাহা জানিতে পারিতেছি না। অতএব আকাঙ্ক্ষা পূরণ কর। যথা :—

"বানরের দ্বারা চিরপাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা নিঃশেষে বিনষ্ট হইল।" আবার বানরের বিশেষণ দিতে পার, যথা :—

"দুর্দ্দান্ত বানরের দ্বারা চিরপাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা বিনষ্ট হইল।"

আবার দুর্দ্দান্তেরও বিশেষণ দেওয়া যায়।

কখন কখন আকাঙ্ক্ষা পূরণ না করিলে বাক্যই সম্পূর্ণ হয় না, যেমন—

"যদি আমি সেখানে যাই।"

"তুমি এমন কথা বলিয়াছিলে।"

এ সকল বাক্য সম্পূর্ণ নহে। সম্পূর্ণ করিতে গেলে, বলিতে হইবে,

"যদি আমি সেখানে যাই, তবে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও।"

"তুমি এমন কথা বলিয়াছিলে যে, তুমি আমাকে কিছু টাকা দিবে।"

পরীক্ষার্থ

নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া বাক্য সম্পূর্ণ কর।

হাতীর গায়ে যে বল আছে,

রামধন এমন দাম্ভিক,

রাজা দশরথ বিজ্ঞ ছিলেন বটে,

সাঁতার জানিয়াও যে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়,

যদি তোমার এতই অভিমান যে, রাজার দান গ্রহণ করিবে না,

তামাকু যদি এমন অস্বাস্থ্যকর,

সপ্তম পাঠ

এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য রচনা করিতে শিখিয়াছ। এখন একটি বিষয় লইয়া তৎসম্বন্ধে দুই তিনটি বাক্য রচনা করিতে অভ্যাস কর।

একটি বিষয় লও, যথা—অশ্ব। অশ্ব সম্বন্ধে দুই তিনটি বাক্য লেখ। যথা :—

"অশ্ব চতুষ্পদ। অশ্ব বড় দ্রুতগামী। মনুষ্য অশ্বের উপর আরোহণ করে।"

এখানে তিনটি বাক্যের বিষয় একই অশ্ব, কিন্তু বক্তব্য তিনটি। যথা—১। চতুষ্পদত্ব। ২। দ্রুতগমন। ৩। মনুষ্যগণের তদুপরি আরোহণ। এই জন্য তিনটি পৃথক্ বাক্য হইল। এইরূপ এক বিষয়ে অনেকগুলি বাক্যকে একত্র করিলে প্রবন্ধ বা বক্তৃতা হইল।

আর একটি বিষয় লও "পৃথিবী"।

"পৃথিবী গোলাকার। পৃথিবীতে জল ও স্থল আছে। পৃথিবী সূর্য্যকে সংবেষ্টন করে।"

পরীক্ষার্থ

হস্তী, কুক্কুর, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, বিদ্যা, মাতাপিতা, রাগ, সাহস, শিক্ষক, দয়া।

অষ্টম পাঠ

অনেক বালককে প্রবন্ধ লিখিতে বলিলে তাহারা খুঁজিয়া পায় না যে, কি লিখিতে হইবে। যদি বলা যায় যে, অশ্ব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখ; তাহারা খুঁজিয়া পায় না যে, অশ্ব সম্বন্ধে কি প্রবন্ধ লিখিবে। এই সকল বালকের সাহায্য জন্য কতকগুলি যুক্তি বলিয়া দিতেছি।

১। প্রথমে বিষয়টি কি তাহা বর্ণনা করিবে।

২। তার পর তাহার জাতিভেদ বা প্রকারভেদ বা সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলে তাহা বুঝাইবে।

৩। তাহার দোষগুণের বা কার্য্যের বিচার করিবে।

৪। কিসে সেই বিষয়ে মনুষ্যের উপকার বা উন্নতি হইতে পারে, তাহার বিচার করিবে।

অশ্বের উদাহরণে ইহা বুঝাইতেছি।

১। বর্ণনা

অশ্ব চতুষ্পদ জন্তু বিশেষ।

২। জাতিভেদ

অশ্ব অনেক জাতীয় আছে।—যথা আরবী, কাবুলী, তুরকী, ওয়েলর, টাট্টু ইত্যাদি।

৩। গুণ দোষ বিচার

৩। অশ্ব, পশুজাতি মধ্যে বিশেষ বলবান ও দ্রুতগামী। অশ্বের আরও গুণ এই যে, অশ্ব সহজে মনুষ্যের বশ হয়। এজন্য মানুষ অশ্ব হইতে অনেক উপকার পায়।

তার পর ইচ্ছা করিলে, "পাপিষ্ঠে" বিশেষণের বিশেষণ দিতে পার।

"চিরপাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা নিঃশেষে বিনষ্ট হইল।"

পরীক্ষার্থ

নিম্নলিখিত বিষয় ও বক্তব্য লইয়া বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ যোগপূর্ব্বক বাক্য রচনা কর।

বিষয়	বক্তব্য
পুত্র	পিতামাতার উপকার করা।
রাজা	প্রজাপালন করা।
স্ত্রী	স্বামীর সেবা করা।
বিদ্যা	অভ্যাসের অধীন।

ষষ্ঠ পাঠ

কখন কখন বাক্য সম্পূর্ণ হইলেও, আরও কিছুর আকাঙ্ক্ষা থাকে। "চিরপাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা নিঃশেষে বিনষ্ট হইল" এই বাক্যটি সম্পূর্ণ বটে, কিন্তু ইহাতে কিছু আকাঙ্ক্ষা রহিল। কর্ম্ম আছে কিন্তু কর্ত্তা নাই। রাক্ষসেরা বিনষ্ট হইল, আমরা জানিতেছি; কিন্তু কে তাহাদের বিনষ্টকারী, তাহা জানিতে পারিতেছি না। অতএব আকাঙ্ক্ষা পূরণ কর। যথা:—

"বানরের দ্বারা চিরপাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা নিঃশেষে বিনষ্ট হইল।" আবার বানরের বিশেষণ দিতে পার, যথা:—

"দুর্দ্দান্ত বানরের দ্বারা চিরপাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা বিনষ্ট হইল।"

আবার দুর্দ্দান্তেরও বিশেষণ দেওয়া যায়।

কখন কখন আকাঙ্ক্ষা পূরণ না করিলে বাক্যই সম্পূর্ণ হয় না, যেমন—

"যদি আমি সেখানে যাই।"

"তুমি এমন কথা বলিয়াছিলে।"

এ সকল বাক্য সম্পূর্ণ নহে। সম্পূর্ণ করিতে গেলে, বলিতে হইবে,

"যদি আমি সেখানে যাই, তবে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও।"

"তুমি এমন কথা বলিয়াছিলে যে, তুমি আমাকে কিছু টাকা দিবে।"

পরীক্ষার্থ

নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া বাক্য সম্পূর্ণ কর।

হাতীর গায়ে যে বল আছে,

রামধন এমন দাম্ভিক,

রাজা দশরথ বিজ্ঞ ছিলেন বটে,

সাঁতার জানিয়াও যে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়,

যদি তোমার এতই অভিমান যে, রাজার দান গ্রহণ করিবে না,

তামাকু যদি এমন অস্বাস্থ্যকর,

সপ্তম পাঠ

এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য রচনা করিতে শিখিয়াছ। এখন একটি বিষয় লইয়া তৎসম্বন্ধে দুই তিনটি বাক্য রচনা করিতে অভ্যাস কর।

একটি বিষয় লও, যথা—অশ্ব। অশ্ব সম্বন্ধে দুই তিনটি বাক্য লেখ। যথা :—

"অশ্ব চতুষ্পদ। অশ্ব বড় দ্রুতগামী। মনুষ্য অশ্বের উপর আরোহণ করে।"

এখানে তিনটি বাক্যের বিষয় একই অশ্ব, কিন্তু বক্তব্য তিনটি। যথা—১। চতুষ্পদত্ব। ২। দ্রুতগমন। ৩। মনুষ্যগণের তদুপরি আরোহণ। এই জন্য তিনটি পৃথক্ বাক্য হইল। এইরূপ এক বিষয়ে অনেকগুলি বাক্যকে একত্র করিলে প্রবন্ধ বা বক্তৃতা হইল।

আর একটি বিষয় লও "পৃথিবী"।

"পৃথিবী গোলাকার। পৃথিবীতে জল ও স্থল আছে। পৃথিবী সূর্য্যকে সংবেষ্টন করে।"

পরীক্ষার্থ

হস্তী, কুক্কুর, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, বিদ্যা, মাতাপিতা, রাগ, সাহস, শিক্ষক, দয়া।

অষ্টম পাঠ

অনেক বালককে প্রবন্ধ লিখিতে বলিলে তাহারা খুঁজিয়া পায় না যে, কি লিখিতে হইবে। যদি বলা যায় যে, অশ্ব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখ; তাহারা খুঁজিয়া পায় না যে, অশ্ব সম্বন্ধে কি প্রবন্ধ লিখিবে। এই সকল বালকের সাহায্য জন্য কতকগুলি যুক্তি বলিয়া দিতেছি।

১। প্রথমে বিষয়টি কি তাহা বর্ণনা করিবে।

২। তার পর তাহার জাতিভেদ বা প্রকারভেদ বা সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলে তাহা বুঝাইবে।

৩। তাহার দোষগুণের বা কার্য্যের বিচার করিবে।

৪। কিসে সেই বিষয়ে মনুষ্যের উপকার বা উন্নতি হইতে পারে, তাহার বিচার করিবে।

অশ্বের উদাহরণে ইহা বুঝাইতেছি।

১। বর্ণনা

অশ্ব চতুষ্পদ জন্তু বিশেষ।

২। জাতিভেদ

অশ্ব অনেক জাতীয় আছে।—যথা আরবী, কাবুলী, তুরকী, ওয়েলর, টাটু ইত্যাদি।

৩। গুণ দোষ বিচার

৩। অশ্ব, পশুজাতি মধ্যে বিশেষ বলবান ও দ্রুতগামী। অশ্বের আরও গুণ এই যে, অশ্ব সহজে মনুষ্যের বশ হয়। এজন্য মানুষ অশ্ব হইতে অনেক উপকার পায়।

৪। উপকার

মনুষ্য অশ্বকে বশ করিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক যথেচ্ছা ভ্রমণ করে। যে পথ অনেক বিলম্বে যাইতে হইত, অথবা শ্রমাধিক্যবশতঃ যাওয়াই যাইত না, অশ্বের সাহায্যে তাহা অল্প সময়ে যাওয়া যায়। মনুষ্য গাড়ি প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে অশ্বযোজন করিয়া, সুখে আসীন হইয়া বিচরণ করে। যুদ্ধকালে অশ্ব, যোদ্ধার বিশেষ সহায়। ইহা ভিন্ন অনেক দেশে অশ্বের দ্বারা ভারবহন ও হলাকর্ষণ কার্য্যও নির্ব্বাহ হয়।

এই যে উদাহরণ দেওয়া গেল, ইহা সংক্ষিপ্ত। ইচ্ছা করিলে ইহার সম্প্রসারণ করিতে পার। যথা, বর্ণনায়—"অশ্ব চতুষ্পদ জন্তু বিশেষ" লেখা গিয়াছে। কিন্তু চতুষ্পদ জন্তু, কেহ মাংসাহারী, কেহ উদ্ভিজ্জাহারী, কেহ উভয়াহারী। অতএব অশ্ব ইহার কোন্ শ্রেণীভুক্ত, তাহা লেখা উচিত। যথা—

"অশ্ব উদ্ভিজ্জ মাত্র খায়, মাংস খায় না।" কিন্তু আরও অনেক চতুষ্পদ আছে যে, তাহারা কেবল উদ্ভিজ্জ খায়। যথা, গোমহিষাদি। অতএব আরও বিশেষ করিয়া লিখিতে পার যে, "যে সকল চতুষ্পদ উদ্ভিজ্জাহারী, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির শৃঙ্গ আছে, কতকগুলির শৃঙ্গ নাই। অশ্ব দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে।"

এইরূপ আরও সম্প্রসারণ করা যায়।

এইরূপ (২) জাতিভেদ, (৩) দোষ-গুণ, (৪) উপকার—এ সকলেরও সম্প্রসারণ করা যায়।

পরীক্ষার্থ

নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে এইরূপ সম্প্রসারিত প্রবন্ধ লেখ।

হস্তী, কুক্কুর, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, বিদ্যা, মাতাপিতা, রাগ, সাহস, শিক্ষক, দয়া।

ইহাও স্মরণ রাখিবে যে, সকল বিষয়েই প্রবন্ধকে ঐরূপ চারি ভাগে বিভক্ত করা যায় না। কখন কোনটি ছাড়িয়া দিতে হয়। যথা, চন্দ্র সূর্য্যের জাতিভেদ নাই—উহা ছাড়িয়া দিবে; তবে চন্দ্র সূর্য্য সম্বন্ধে লোকের মতভেদ আছে, পার ত, তাহা লিখিবে। আর এই চারটি ভাগ ছাড়া আর যাহা কিছু বক্তব্য লিখিতে চাও তাহাতে আপত্তি নাই। বিশেষ কোন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে গেলে পূর্ব্বগামী লেখকদিগের মত সঙ্কলন করা প্রথা আছে; আবশ্যক মতে তাহা করিতে পার। ভাল বুঝিলে তাহার প্রতিবাদ করিতে পার।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পাঠ—বিশুদ্ধি

রচনার চারিটি গুণ বিশেষ করিয়া শিখিতে হইবে। এই চারিটির নাম (১) বিশুদ্ধি, (২) অর্থব্যক্তি, (৩) প্রাঞ্জলতা, (৪) অলঙ্কার।

প্রথমে বিশুদ্ধি। রচনার ভাষা শুদ্ধ না হইলে সব নষ্ট হইল। বিশুদ্ধির প্রতি সর্ব্বাগ্রে মনোযোগ করিতে হইবে। বিশুদ্ধি সর্ব্বপ্রধান গুণ।

যাহা বিশুদ্ধ নহে, তাহা অশুদ্ধ। কি হইলে রচনা অশুদ্ধ হয়, তাহা বুঝিলেই, বিশুদ্ধি কি তাহা বুঝিবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মৌখিক রচনা যেরূপ, লিখিত রচনাও সেইরূপ ; তবে কিছু প্রভেদ আছে। লিখিত রচনা কতকগুলি নিয়মের অধীন, মৌখিক রচনা সে সব নিয়মের অধীন নয়। অথবা অধীন হইলেও মৌখিক রচনায় সে সকল নিয়ম লঙ্ঘনে দোষ ধরা যায় না। লিখিত রচনায় যে সকল নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে দোষ ধরিতে হয়, সেই সকল নিয়ম লঙ্ঘিত হইলেই রচনা অশুদ্ধ হইল। সেই সকল দোষের কথা এখন লিখিতেছি।

১। বর্ণাশুদ্ধি। মুখে সকলেই বলে, "পষ্ট" "মেগ" "শপত" "শট" "বাঁদ" "দুব্বল" "নেত্য" কিন্তু লিখিতে হইবে "স্পষ্ট, মেঘ, শপথ, শঠ, বাঁধ, দুর্ব্বল, নৃত্য।"

২। সংক্ষিপ্তি। মুখে বলি, "কোরে" "কচ্চি" "করব" "কল্লুম" "কচ্ছিলুম" কিন্তু লিখিতে হইবে, "করিয়া" "করিতেছি" "করিব" "করিলাম" "করিতেছিলাম" ইত্যাদি।

৩। প্রাদেশিকতা। বাঙ্গালার কোন প্রদেশের লোকে বলে, "কল্লুম", কোন প্রদেশে, "কল্লেম", কোথাও, "কল্লাম", কোথাও "কল্লু"। কোন প্রদেশবিশেষেরই ভাষা ব্যবহার করা হইবে না—যাহা লিখিত ভাষায় চিরপ্রচলিত, তাহাই ব্যবহৃত হইবে।

অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা রাজধানীর ভাষাই সমধিক পরিচিত। অতএব রাজধানীর ভদ্রসমাজে যে ভাষা চলিত তাহা লিখিত রচনায় ব্যবহৃত হইতে পারে। কোন দেশে বলে "ছড়ি" কোন দেশে বলে "নড়ি"। "ছড়ি" কলিকাতার ভদ্রসমাজে চলিত। উহা ব্যবহৃত হইতে পারে। "লগি" "লগা" "চৈড়"—ইহার মধ্যে লগিই কলিকাতায় চলিত, উহাই ব্যবহৃত হইতে পারে। অপর দুইটি ব্যবহৃত হইতে পারে না।

৪। গ্রাম্যতা। কেবল ইতর লোক বা গ্রাম্য লোকের মধ্যে যে সকল শব্দ প্রচলিত, তাহা ব্যবহৃত হইতে পারে না। "কৌশল্যার পো রাম," "দশরথের বেটা লক্ষ্মণ", এ সকল বাক্য গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্ট।

নাটক ও উপন্যাস গ্রন্থে, যে স্থানে কথোপকথন লিখিত হইতেছে, সেখানে এই চারিটি দোষ অর্থাৎ বর্ণাশুদ্ধি, সংক্ষিপ্তি, প্রাদেশিকতা ও গ্রাম্যতা থাকিলে দোষ ধরা যায় না। কেন না মৌখিক রচনা এ সকল নিয়মের অধীন নহে বলিয়াছি। কথোপকথন মৌখিক-রচনা মাত্র। কবিতা রচনাতেও অনেক স্থানে এ সকল নিয়মে ব্যতিক্রম দেখা যায়।

৫। ব্যাকরণ-দোষ। রচনায় ব্যাকরণের সকল নিয়মগুলি বজায় রাখিতে হইবে। ব্যাকরণের সকল নিয়মগুলি এখানে লেখা যাইতে পারে না—তাহা হইলে এইখানে একখানি ব্যাকরণের গ্রন্থ লিখিত হয়। কিন্তু উদাহরণস্বরূপ দুই একটা সাধারণ নিয়ম বুঝাইয়া দেওয়া যাইতেছে।

সন্ধি। সংস্কৃতের নিয়ম, সন্ধির যোগ্য দুইটি বর্ণ একত্রে থাকিলে সকল স্থানেই সন্ধি হইবে। কিন্তু বাঙ্গালার নিয়ম তাহা নহে, বাঙ্গালায় সমাস ব্যতীত সন্ধি হয় না। যে দুইটি শব্দে সমাস হয় না, সে দুইটি শব্দে সন্ধিও হইবে না।

সহজ উদাহরণ ;—"সঃ অস্তি," সংস্কৃতে, "সোঽস্তি" হইবে ; কিন্তু বাঙ্গালায় "তিনি আছেন" "তিন্যাছেন" হইবে না। "অঙ্গুলি" "উত্থিত" এই দুইটি শব্দ সংস্কৃতে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, মধ্যে আর কিছু না থাকিলে, "অঙ্গুল্যুত্থিত" হইয়া যাইবে,

কিন্তু বাঙ্গালায় যদি বলি, "তিনি অঙ্গুলি উত্থিত করিলেন," সে স্থলে "তিনি অঙ্গুল্যুত্থিত করিলেন," এরূপ কখনই লিখিতে পারিব না। কেন না এখানে সমাস নাই।

বাঙ্গালায় সন্ধির দ্বিতীয় নিয়ম এই যে, সংস্কৃতে ও অসংস্কৃতে কখন সন্ধি হইবে না। "আমার অঙ্গুলি" বলিতে হইবে, "আমারাঙ্গুলি" হয় না। সন্ধি করিতে হইলে, 'মমাঙ্গুলি'' বলিবে, সেও ভাল বাঙ্গালা হয় না—কেন না সমাস নাই। ''মড়াহারী পক্ষী" বলা যায় না; ''শবাহারী" বলিতে হইবে। ''গাধাকৃত পশু'' বলা যায় না; ''গর্দ্দভাকৃত'' বলিতে হইবে। সকলেই ''মনান্তর'' বলে, কিন্তু ইহা অশুদ্ধ। কেন না ''মন'' বাঙ্গালা শব্দ; সংস্কৃত মনস্, প্রথমায় মনঃ, এজন্য, ''মনোদুঃখ'', 'মনোরথ'' শুদ্ধ।

তৃতীয় নিয়ম। যদি দুইটি শব্দ অসংস্কৃত হয়, তবে কখনই সন্ধি হইবে না। যথা, ''পাকা আতা'' সন্ধি হয় না।

সমাস। সমাসেরও নিয়ম ঐরূপ; সংস্কৃতে এবং অসংস্কৃতে সমাস হয় না। যেমন, ''মহকুমাধ্যক্ষ''; ''উকীলাগ্রগণ্য''; ''মোক্তারাদি'' এ সকল অশুদ্ধ। অথচ এরূপ অশুদ্ধি এখন সচরাচর দেখা যায়।

উভয় শব্দ সংস্কৃত হইলেও সমাস করা না করা লেখকের ইচ্ছাধীন। "অধরের অমৃত" বলিতে পার, অথবা "অধরামৃত" বলিতে পার। "অধরামৃত" বলিলে সমাস হইল, "অধরের অমৃত'' বলিলে সমাস হইল না। সন্ধি করা না করাও লেখকের ইচ্ছাধীন। কেহ লেখেন "অধরামৃত", কেহ লেখেন "অধর অমৃত"।

বাঙ্গালায় সন্ধি সমাসের বাহুল্য ভাল নহে। সহজ রচনায় উহা যত কম হয়, তত ভাল।

প্রত্যয়। প্রত্যয় সম্বন্ধে সংস্কৃতের যে নিয়ম, বাঙ্গালা রচনায় সংস্কৃত প্রত্যয় ব্যবহারকালে সেই সকল বজায় রাখিতে হইবে। "সৌজন্যতা" ''ঐক্যতা'' এ সকল অশুদ্ধ। ''সৌজন্য'' ''ঐক্য'' এইরূপ হইবে।

সংস্কৃত শব্দের পরে অসংস্কৃত প্রত্যয় ব্যবহার হইতে পারে না। ''মূর্খামি'' বলা যায় না, কেন না ''মূর্খ'' সংস্কৃত শব্দ, ''মি'' সংস্কৃত প্রত্যয় নহে; ''মূর্খতা'' বলিতে হইবে। ''অহম্মুখ'' সংস্কৃত শব্দ; এজন্য 'আহাম্মুখি'' অশুদ্ধ, ''অহম্মুখতা'' বলিতে হইবে।

স্ত্রীত্ব। সংস্কৃতে এই নিয়ম আছে যে, বিশেষ্য যে লিঙ্গান্ত হইবে, বিশেষণও সেই লিঙ্গান্ত হইবে। যথা, সুন্দরী বালিকা, সুন্দর বালক; বেগবান্ নদ, বেগবতী নদী।

বাঙ্গালায় এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হওয়া লেখকের ইচ্ছাধীন। অনেকেই সুন্দরী বালিকা লেখেন; কিন্তু সুন্দর বালিকাও বলা যায়। বিশেষতঃ বিশেষণ বিশেষ্যের পরে থাকিলে ইহাতে কোন দোষই হয় না। যথা, ''এই বালিকাটি বড় সুন্দর।'' ''রামের স্ত্রী বড় মুখর।'' অনেক সময়ে বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গান্ত হইলে বড় কদর্য্য শুনায়। যথা, ''রামের মা উত্তমা পাচিকা'' এখানে ''উত্তম পাচিকা'' বলিতে হইবে।

বাঙ্গালা রচনায় স্ত্রীত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম প্রবল ;—

১। স্ত্রীলিঙ্গান্ত বিশেষ্যের বিশেষণকে পুংলিঙ্গান্ত রাখিতে পার। যেমন সুন্দর

বালিকা, উর্ব্বর ভূমি। কিন্তু পুংলিঙ্গান্ত বা ক্লীবলিঙ্গান্ত বিশেষ্যের বিশেষণকে কখন স্ত্রীলিঙ্গান্ত করিতে পার না। "পঞ্চমী দিবস" "মহতী কার্য্য" "সুবিস্তৃতা জনপদ" এ সকল অশুদ্ধ।

২। স্ত্রীলিঙ্গান্ত বিশেষ্যের বিশেষণকে ইচ্ছামত স্ত্রীলিঙ্গান্ত না করিলে, না করিতে পার; কিন্তু যদি কতকগুলি বিশেষণ থাকে আর তাহার একটিকে স্ত্রীলিঙ্গান্ত কর, তবে আর সকলগুলিকেও স্ত্রীলিঙ্গান্ত করিতে হইবে। "সুন্দর বালিকা" বলিতে পার, কিন্তু "সুসজ্জিতা সুন্দর বালিকা" বলিতে পার না,"সুসজ্জিতা সুন্দরী বালিকা" বলিতে হইবে। "প্রখর নদী" বলিতে পার, কিন্তু "কূলপ্লাবিনী প্রখর নদী" বলিতে পার না; এখানে "প্রখরা" বলিতে হইবে।

৩। বিশেষণ হইলে সংস্কৃত শব্দই স্ত্রীলিঙ্গান্ত হয়, অসংস্কৃত বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গান্ত হয় না। যথা "একটা বড় বাঘিনী" ভিন্ন "একটা বড়ী বাঘিনী" বলা যায় না; "ঢেঙ্গা মেয়ে" ব্যতীত "ঢেঙ্গী মেয়ে" বলা যায় না। "ফুটো কৌড়ি," "ফুটী কৌড়ি" নহে। হিন্দীর নিয়ম বিপরীত। হিন্দীতে "ফুটী কৌড়ি" বলিতে হইবে।

৪। অসংস্কৃত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গান্ত বিশেষণ ভাল শুনায় না। "গর্ভবতী মেয়ে" না বলিয়া "গর্ভবতী কন্যা" বলাই ভাল। "সুশীলা বউ" না বলিয়া "সুশীল বউ" বা "সুশীলা বধূ" বলা উচিত। "মুখরা চাকরাণী" না বলিয়া "মুখরা দাসী" বলিব।

কারক। সকল বাক্যে কর্ত্তা ও কর্ম্ম যেন নির্দ্দিষ্ট থাকে। বাঙ্গালায় এ বিষয়ে ভুল সর্ব্বদা হয়। "আমাকে মারিয়াছে।" কে মারিয়াছে তাহার ঠিক নাই। "বুঝি দেশে রহিতে দিল না।" কে রহিতে দিল না তাহার ঠিক নাই।

দ্বিতীয় পাঠ

অর্থব্যক্তি

তোমার যাহা বলিবার প্রয়োজন, রচনায় তাহা যদি প্রকাশ করিতে না পারিলে, তবে রচনা বৃথা হইল। অর্থব্যক্তির বিশেষ কোন নিয়ম নাই, তবে দুই একটা সঙ্কেত আছে।

যে কথাটিতে তোমার কাজ হইবে, সেই কথাটি ব্যবহার করিবে। তাহা শুনিতে ভাল নয়, কি বিদেশী কথা, এরূপ আপত্তি গ্রাহ্য করিও না। এক সময়ে লেখকদিগের প্রতিজ্ঞা ছিল যে, সংস্কৃতমূলক শব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করিবে না। কিন্তু এখনকার উৎকৃষ্ট লেখকেরা প্রায়ই এ নিয়ম ত্যাগ করিয়াছেন। যে কথাটিতে মনের ভাব ঠিক ব্যক্ত হয়, তাঁহারা সেই কথাই ব্যবহার করেন।

একটি উদাহরণ দিতেছি। তুমি কোন আদালতের ইশ্‌তিহারের কথা লিখিতেছ। আদালত হইতে যে সকল আজ্ঞা, সকলের জানিবার জন্য প্রচারিত হয়, তাহাকে ইশ্‌তিহার বলে। ইহার আর একটি নাম "বিজ্ঞাপন"। "বিজ্ঞাপন" সংস্কৃত শব্দ, ইশ্‌তিহার বৈদেশিক শব্দ, এজন্য অনেকে "বিজ্ঞাপন" শব্দ ব্যবহার করিতে চাহিবেন। কিন্তু বিজ্ঞাপনের একটু দোষ আছে, তাহার অনেক অর্থ হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থ লিখিয়া গ্রন্থের পরিচয় জন্য প্রথম যে ভূমিকা লেখেন তাহার নাম "বিজ্ঞাপন"।

হইলে তুমি তাহার কথার মর্ম্ম কিছু বুঝিতে পারিবে না, হয়ত তাহাকে পাগল মনে করিবে। কিন্তু সে যদি নিজ বাক্যের সম্প্রসারণ করিয়া বলে, "যে যে বৎসর কম বর্ষা হইয়াছে, সেই সেই বৎসর বেশী শীত হইয়াছে দেখা গিয়াছে। এ বৎসর কম বর্ষা হইয়াছে, অতএব এ বৎসর বেশী শীত হইবে।" তাহা হইলে বুঝিবার কষ্ট থাকে না।

ন্যায়শাস্ত্রে ইহাকে "অবয়ব" বলে। ন্যায়শাস্ত্রে অবয়বের এইরূপ উদাহরণ দেয়, যথা—

"পর্ব্বতে আগুন লাগিয়াছে,
কেন না পর্ব্বতে ধুঁয়া দেখিতেছি।"
যেখানে যেখানে ধুঁয়া দেখা গিয়াছে, সেইখানে সেইখানে আগুন দেখা গিয়াছে।
এই পর্ব্বতে ধুঁয়া দেখা যাইতেছে,
অতএব ইহাতে আগুন লাগিয়াছে।

অনেক সময়ে এইরূপ লিখিলে রচনা বড় পরিষ্কার হয়।

চতুর্থ পাঠ

অলঙ্কার

অলঙ্কার ধারণ করিলে যেমন মনুষ্যের শোভা বৃদ্ধি পায়, অলঙ্কার ধারণ করিলে রচনারও সেইরূপ শোভা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অলঙ্কার প্রয়োগ বড় কঠিন। আর, সকল প্রকার রচনায় অলঙ্কারের সমাবেশ করা যায় না ; বিশেষ, যাহারা প্রথম রচনা করিতে শিখে, তাহাদিগের পক্ষে অলঙ্কার প্রয়োগ বিধেয় নহে। অতএব অলঙ্কার সম্বন্ধে কিছু লেখা গেল না।

তৃতীয় অধ্যায়

পত্রলিপি

পত্র লিখিতে জানা, সকলেরই পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অন্য প্রকার রচনার ক্ষমতা, অনেকের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু পত্র লিখিবার ক্ষমতা সকলের পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই জন্য পত্র লেখার পদ্ধতি বলিয়া দিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় লিখিলাম। পত্র লেখা অতি সহজ। বাঙ্গালায় পত্র লেখার কয়েক প্রকার পাঠ প্রচলিত আছে।

পূজ্য ব্যক্তি, যাঁহাকে প্রণাম করিতে হয়, তাঁহাকে "সেবক" ও "প্রণাম" পাঠ লিখিতে হয়। যথা—

সেবক শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মণঃ প্রণামাঃ শতসহস্রনিবেদনঞ্চ বিশেষং। এই "দেবশর্ম্মণঃ" শব্দ সম্বন্ধে একটা কথা বুঝিবার আছে। ব্রাহ্মণেরা সকলেই আপন নামের পর "শর্ম্মা" বা "দেবশর্ম্মা" লিখিতে বা বলিতে পারেন। রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, মহাশয়ের নাম কি? তিনি উত্তর করিতে পারেন, "আমার নাম

শ্রীরমানাথ শর্ম্মা" অথবা "শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মা"। কিন্তু দেখিবে পত্রের পাঠে লিখিত হইল "দেবশর্ম্মণঃ"—"দেবশর্ম্মা" নহে। ইহার কারণ এই যে, আসল শব্দটি "শর্ম্মণ্"। প্রথমায় ইহা শর্ম্মা হয়—"শর্ম্মণঃ" ষষ্ঠ্যন্ত। শব্দ ষষ্ঠ্যন্ত হইলে সম্বন্ধ পদ হয়। অতএব "শর্ম্মণঃ" কি "দেবশর্ম্মণঃ" বলিলে "শর্ম্মার" ও "দেবশর্ম্মার" বুঝায়। উপরে যে পাঠ লেখা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে "আপনার সেবক শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মার শতসহস্র প্রণাম ও নিবেদন।" ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতীয় লেখক হইলেও লেখকের নামটি ঐরূপ ষষ্ঠ্যন্ত হইবে, যথা—

"সেবক শ্রীরমানাথ দাস ঘোষস্য প্রণামাঃ শতসহস্রনিবেদনঞ্চ বিশেষং"।

"সেবক শ্রীরামচন্দ্র সেন গুপ্তস্য প্রণামাঃ" ইত্যাদি।

"সেবক শ্রীরামনিধি দাস বসোঃ প্রণামাঃ" ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণকন্যারা সকলেই আপনার নামের পর "দেবী" লিখিতে পারেন, শূদ্রকন্যা-দিগকে "দাসী" লিখিতে হয়। "দেবী" শব্দ ষষ্ঠ্যন্ত হইলে "দেব্যাঃ" হয়; "দাসী" শব্দ "দাস্যাঃ" হয়। এজন্য মোক্ষদা দেবী কি কৃষ্ণপ্রিয়া দাসী পত্র লিখিতে গেলে, পাঠ লিখিবে,—

"মোক্ষদা দেব্যাঃ প্রণামাঃ" ইত্যাদি, "কৃষ্ণপ্রিয়া দাস্যাঃ প্রণামাঃ" ইত্যাদি।

এইরূপ ষষ্ঠ্যন্ত পদ পত্রের ভিতরে লিখিত হয় বলিয়া এ দেশের লৌকিক আচারে একটা ঘোরতর ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে। লোকের বিশ্বাস হইয়াছে যে স্ত্রীলোকের নামই বুঝি "দেব্যাঃ" ও "দাস্যাঃ"। সাধারণ লেখকেরা, কর্ত্তৃকারকেও "দেব্যাঃ" লেখেন, কর্ম্মকারকেও "দেব্যাঃ" লেখেন, অপাদান, সম্প্রদান, করণ, অধিকরণ, সর্ব্বত্রই "দেব্যাঃ" ও "দাস্যাঃ"। ইহা বড় ভুল। "দেব্যাঃ" অর্থ "দেবীর"; "দাস্যাঃ" অর্থ "দাসীর"। সংস্কৃত ভিন্ন বাঙ্গালা লেখায় উহা ব্যবহৃত হইতে পারে না। পত্রের পাঠ সংস্কৃত, এই জন্য সে স্থানে ইহা ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃতেও সম্বন্ধ না বুঝাইলে ব্যবহৃত হইবে না।

সেইরূপ, "দেবশর্ম্মণঃ"। আজিও এমন অনেক মূর্খ ব্রাহ্মণকুমার আছে যে, নাম বলিতে গেলে বলে, "আমার নাম শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ।" ইহা ভুল। ইহার অর্থ "আমার নাম শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মার।" নাম বলিতে হইবে, "আমার নাম শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা।

এখন সেই "সেবক" পাঠ পুনর্ব্বার পড়িয়া দেখ—

"সেবক শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মণঃ

প্রণামাঃ শতসহস্রনিবেদনঞ্চ বিশেষং"—এখন তোমার বিশেষ নিবেদন কি, তাহা সহজ বাঙ্গালায় লিখিবে, যথা—

"মহাশয়ের আজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হইয়া শিরোধার্য্য করিলাম। আপনি যেরূপ লেখা পড়া ও আহারাদির নিয়ম বলিয়া দিয়াছেন, আমি সেই নিয়মানুসারেই চলিব। আমি জ্বরে কিছু কষ্ট পাইতেছি। চিকিৎসা করাইতেছি। ইতি, তারিখ সন ১২৮২। ২৭শে শ্রাবণ।"

এই "ইতি" শব্দের অন্বয়, উপরে যে "নিবেদনঞ্চ বিশেষং"— লিখিয়াছ, তাহার সঙ্গে। "নিবেদনঞ্চ বিশেষং ইতি", অর্থাৎ "এই আমার বিশেষ নিবেদন।"

উপরে লেখকের নাম আছে, পত্রের নীচে আর তোমার নাম লিখিতে হইবে না। কিন্তু অনেকে শেষে নাম লেখেন। তাঁহারা সেবক পাঠ উপরে না লিখিয়া নীচে লেখেন। যথা—

"প্রণামাঃ শতসহস্রনিবেদনঞ্চ বিশেষং—

মহাশয়ের আজ্ঞাপত্র পাইয়া" ইত্যাদি লিখিয়া শেষে লেখেন, "ইতি, তারিখ সন ১২৮২। ২৭শে শ্রাবণ।

সেবক শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মণঃ।"

উপরে "নিবেদনং" পদ আছে, এজন্য "দেবশর্ম্মণঃ" লেখা হইল, "দেবশর্ম্মার নিবেদন" বুঝাইল। নহিলে "দেবশর্ম্মা" লিখিতে হইত।

এক্ষণে পত্র সমাপ্ত হইল। এখন পত্র মুড়িয়া তাহার উপরে শিরোনাম লিখিতে হইবে। যেমন পত্রের পাঠ আছে, তেমনই শিরোনামেরও পাঠ আছে। পূজ্য ব্যক্তি, যাঁহাকে সেবক পাঠ লিখিতে হয়, তাঁহাকে শিরোনামে "পরমপূজনীয়" লিখিতে হয়। নামের পর "শ্রীচরণেষু" বা "শ্রীচরণকমলেষু" কি এইরূপ অন্য কোন সম্মানসূচক পদ লিখিতে হয়। যথা

"পরমপূজনীয়,
শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র ঘোষাল
মাতুল মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু।"

নীচে পত্রের ঠিকানা লিখিয়া দিবে, যথা—দেয়, (বা দেনা) মোং বর্দ্ধমান।

পূজ্য ব্যক্তিকে "প্রণাম" করিতে হয়, তুল্য ব্যক্তিকে "নমস্কার" করিতে হয়। এই জন্য তুল্য ব্যক্তিকে যে পত্র লেখা যায়, তাহার পাঠের সঙ্গে "নমস্কার" পাঠ। যথা—

"সবিনয় নমস্কারাঃ নিবেদনঞ্চ বিশেষং" অথবা বাঙ্গালায়—

"বিনয় পূর্ব্বক নমস্কার নিবেদন।" অনেকে সংক্ষেপে করিয়া শুধু লেখেন—

"নমস্কার নিবেদন।"

আগে রীতি ছিল, লেখকের নাম পত্রের প্রথমে থাকিত, যথা—

"আজ্ঞাকারী শ্রীরমানাথ দেবশর্ম্মণঃ"। কিন্তু এখন "সেবক" পাঠ ভিন্ন সে পদ্ধতি প্রায় অপ্রচলিত হইয়াছে। ইংরাজী পত্রের নিয়মানুসারে, নাম শেষে লেখা হয়। শিরোনামে পূর্ব্বরীত্যনুসারে "মদেকসদয়" বা "প্রেষ্টবর" কি এমনই একটি ঘনিষ্ঠতাসূচক পদ ব্যবহৃত হইত। এখন সে সকল পদ তত ব্যবহৃত হয় না। "মান্যবর" কি "বিজ্ঞবর" কি এমনই অপর কোন নিঃসম্বন্ধ পদ ব্যবহৃত হয়। যথা—

"মান্যবর
শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়মাধব মিত্র
মহাশয় সমীপেষু।"

তবে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, "শ্রীযুক্ত বাবু" শিরোনামে এখনকার দিনে কখনও পরিত্যাগ করা যায় না। কেবল অধ্যাপক, গুরু, পুরোহিত প্রভৃতিকে লিখিতে "বাবু"

শব্দ ত্যাগ করিতে হয়। স্ত্রীলোককে লিখিতে গেলে, সধবা বা কুমারীকে "শ্রীমতী" লিখিতে হয়। যথা—

"পরমপূজনীয়া

শ্রীমতী কৃষ্ণমোহিনী দেবী

মাতুলানী মহাশয়া শ্রীচরণকমলেষু।"

বিধবাকে "শ্রীযুক্তা" লেখা যায়।

মুসলমানকেও বাবু লেখা নিষিদ্ধ। মুসলমানকে "মৌলবী" বা "মুন্সী" লিখিতে হয়। নামের পর "সাহেব" লিখিতে হয়। যথা—

"মান্যবর

শ্রীযুক্ত মৌলবী লতাফাৎ হোসেন খাঁ

সাহেব বরাবরেষু।"

যাঁহাদের কোন উপাধি আছে, যথা রাজা, মহারাজা, রায় বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর ইত্যাদি, তাঁহাদের সে উপাধি শিরোনামে লিখিতে হইবে। যথা—

"মহারাজাধিরাজ শ্রীলশ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি

মহাতাপচন্দ বাহাদুর

প্রজাপালকবরেষু।"

"মহামান্য শ্রীযুক্ত অনরেবল সর্ আশ্‌লী ইডেন্, K. C. S. I.

বরাবরেষু।"

তার পর, যাহারা সম্বন্ধে ছোট, তাহাদিগকে "আশীর্ব্বাদ" পাঠ লেখা যায়। আশীর্ব্বাদ পাঠ অনেক প্রকার আছে, যথা—

"পরমশুভাশীর্ব্বাদ" ইত্যাদি

"শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু।"

কিন্তু অনেকেই এ সকল পরিত্যাগ করিয়াছেন। আত্মীয় ব্যক্তি হইলে, তাঁহারা "প্রিয়তমেষু" "প্রিয়বরেষু" এইরূপ লেখেন; বিশেষ আত্মীয়তা না থাকিলে শুধু "কল্যাণবরেষু" লিখিয়া থাকেন। শিরোনামে, "পরমকল্যাণীয়" বা "কল্যাণীয়" পাঠ লিখিতে হয়। শেষে কিছু আশীর্ব্বাদ বাক্য থাকা চাই। সকল স্থলে "শ্রীযুক্ত" পরিবর্ত্তে "শ্রীমান্" শব্দ ব্যবহৃত হয়। যথা—

"পরমকল্যাণীয়

শ্রীমান্ বাবু রাধানাথ দাস

বাবাজীউ চিরজীবেষু।"

"কল্যাণীয়

শ্রীমান্ নিশিকান্ত ঘোষ

ভাইজীউ মঙ্গলাস্পদেষু।"

শূদ্রকে পত্র লিখিতে গেলে, ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ পাঠ লেখাই উচিত। ব্রাহ্মণকে পত্র লিখিতে হইলে শূদ্রের প্রণাম পাঠ লেখাই কর্ত্তব্য। কিন্তু এখন অনেক শূদ্র ইহা মানেন না।

স্থূল কথা, এখন অনেক ইংরাজি পত্র লেখার প্রথানুসারে লিখিতে হয়। তাহার দুই একটি উদাহরণ দিয়া ক্ষান্ত হইব।

১। "প্রিয়বর,

তোমার পত্র পাইলাম। যে টাকা পাঠাইয়াছি, তাহা সাবধানে খরচ করিও। তোমার বিষয়কর্ম্ম কিরূপ চলিতেছে সবিশেষ লিখিও। শারীরিক কুশলবার্ত্তা লিখিতে ত্রুটি করিও না। ইতি, তারিখ ১৮৮৩ সাল, ৭ই মার্চ্চ।

নিতান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীরাধানাথ ঘোষ।"

২। "পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বিদ্যারত্ন,

মহাশয় অশেষগুণালঙ্কৃতেষু।

পণ্ডিতবর,

আপনার প্রণীত নূতন গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া যার পর নাই পরিতোষ লাভ করিয়াছি। ভরসা করি, আপনি নিত্য নূতন গ্রন্থ প্রচার পূর্ব্বক স্বদেশকে চরিতার্থ করিবেন। ইতি, তারিখ ১২৮২ সাল, ২৭শে শ্রাবণ।

একান্ত বশংবদ
শ্রীহরিদাস দত্ত।"

সম্পাদকের নিবেদন

বঙ্কিম শেষ জীবনে দুখানি পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন—"সহজ রচনাশিক্ষা" আর "সহজ ইংরেজী শিক্ষা"। "সহজ রচনাশিক্ষা"-র ২য় ৩য় ও ৪র্থ সংস্করণ যথাক্রমে ১৮৯৪, ১৮৯৬ ও ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংস্করণের পাঠ চতুর্থ সংস্করণের অনুগামী। ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—

It is a standing reproach against the educated Bengali that he cannot write in his mother tongue. The reproach has perhaps an application still more forcible in the case of those who receive only an elementary education in the vernacular schools than in the case of their more educated brethren turned out of the colleges. But the Bengali student labours under a serious disadvantage in this respect; there exist no rules for his guidance, none at least which an ordinary teacher is able to prescribe for his study. The compiler of this little primer on *Composition* has endeavoured to collect in it some rules derived from the practice of the

best writers in the language and from his own experience in Bengali composition. He has tried to render it suited to the capacity of beginners and to be as brief as well as clear as possible.

The first chapter of this primer seeks nearly to teach the beginners to form words into sentences and then to collect sentences into little essays. In the second chapter he has explained the existing practice of the best writers under three heads, (1) Correctness, (2) Precision, and (3) Perspicuity. He has entered into no elaborate discussions, but has simply laid down rules easily understood. In the third chapter he has explained the existing practice regarding that particular species of composition, with which, of all others, every person, in whatever rank of life, is required to be most conversant—I mean letter-writing, the most useful of all forms of composition. He wished to add a chapter teaching the drawing up of ordinary legal instrument, such as leases and bonds. But he prefers to wait to see the reception which the little work meets with, before adding further to its bulk. The same consideration, *viz.*—a wish to avoid adding to the size and therefore to the cost of a primer which ought to be in every beginner's hand, has led him to content himself with a limited number of illustrations and examples under each head. More can be easily supplied by the teacher

In conclusion he begs to say that this little primer is based on no English model, and that the only two terms used by English writers on the subject which he has rendered into Bengali are *Subject* (বিষয়) and *Predicate* (বক্তব্য)।

"সহজ ইংরেজী শিক্ষার" কোনো সংস্করণ এ পর্যন্ত উদ্ধার করা যায় নি। তবে এইটুকু জানা যায়, তার ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সালের ডিসেম্বরে।

সম্পাদক, ব. র. স.

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কিন্তু পুস্তকাকারে অগ্রথিত কয়েকটি প্রবন্ধ

জাতিবৈর

ভারতবর্ষীয় যে কোন ইংরেজি সম্বাদপত্র (ইংরেজি সম্বাদপত্র অর্থে ইংরেজের দ্বারা সম্পাদিত সম্বাদপত্র) আমরা হস্তে গ্রহণ করি না কেন, সন্ধান করিলে অবশ্যই দেখিব যে, তাহার কোন স্থানে না কোন স্থানে দেশীয় লোকদিগের উপর কিছু গালি—কিছু অন্যায় নিন্দা আছে। আবার যে কোন বাঙ্গালা সম্বাদপত্র পড়ি না কেন, সন্ধান করিলে তাহার কোন অংশে না কোন অংশে—ইংরেজের উপর ক্রোধ প্রকাশ—ইংরেজের নিন্দা—অবশ্য দেখিতে পাইব। দেশী পত্র মাত্রেই ইংরেজের অন্যায় নিন্দা থাকে, ইংরেজি পত্র মাত্রেই দেশী লোকের অন্যায় নিন্দা থাকে। বহুকাল হইতে এইরূপ হইতেছে—নূতন কথা নহে।

সম্বাদপত্রে যেরূপ দেখা যায়, সামাজিক কথোপকথনেও সেইরূপ। ইহা জাতিবৈরের ফল। এতদুভয় জাতির মধ্যে যে বিদ্বেষ ভাব, তাহাকেই জাতিবৈর বলিতেছি। প্রায় অধিকাংশে সদাশয় ইংরেজ ও দেশীয় লোক এই জাতিবৈরের জন্য দুঃখিত। তাঁহারা এই জাতিবৈরকে মহা অশুভকারী মনে করিয়া ইহার শান্তির জন্য যত্ন করেন। যে সকল সম্বাদপত্রে এই জাতিবৈরের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতেই আবার ইহার নিবারণার্থ নানাবিধ কূটার্থ, অলঙ্কারবিশিষ্ট, প্রবন্ধ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহার নিরাকরণার্থ অনেক দ্বিজাতীয়, সমাজ, সভা, সোসাইটি, এসোসিয়েশন স্থাপিত হইয়া, শ্বেতকৃষ্ণ উভয় বর্ণে রঞ্জিত হইয়া সতরঞ্চের ছকে দৃশ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার শমতা জন্য কত ইউনিয়ন ক্লব সংস্থাপিত হইয়া সূপকার এবং মদ্যবিক্রেতাকুলের আনন্দ বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু কিছুতেই এ রোগের উপশম হইল না, এ বিষ নামিল না। দুঃখের বিষয় যে, কেহ কখন বিবেচনা করিয়া দেখিল না যে, এই জাতিবৈর শমিত করিয়া, আমরা উপকৃত হইব কি না ? আর উপকৃত হই বা না হই, বাস্তবিক ইহার শমতা সাধ্য কি না ?

ইংরেজরা যে এ দেশের লোকের অপেক্ষা সাধারণতঃ শ্রেষ্ঠ, তাহা আত্মগৌরবান্ধ ব্যক্তি ব্যতীত কেহই অস্বীকার করিবেন না। ইংরেজেরা আমাদের অপেক্ষা বলে, সভ্যতায়, জ্ঞানে, এবং গৌরবে শ্রেষ্ঠ। কোন এক জন ইংরেজের অপেক্ষা, কোন একজন বাঙ্গালীকে শ্রেষ্ঠ দেখা যাইতে পারে, কিন্তু সাধারণ বাঙ্গালীর অপেক্ষা, সাধারণ ইংরেজ যে শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। যেখানে এরূপ তারতম্য, সেখানে যদি শ্রেষ্ঠ পক্ষ নিস্পৃহ, হিতাকাঙ্ক্ষী এবং শমিতবল হইয়া থাকিতে পারেন, তবেই উভয়ে প্রীতির সম্ভাবনা। যে নিকৃষ্ট হইয়া, বিনীত, বশ্য এবং ভক্তিমান না হইবে, শ্রেষ্ঠ তাহার উপর কাজে কাজেই বিরক্ত হইবেন। আর যে শ্রেষ্ঠ হইয়া বল প্রকাশ এবং অনিষ্টকারী হইবে, নিকৃষ্ট সুতরাং তাহার উপর রাগ করিবেন। অতএব ইংরেজেরা যদি আমাদিগের

প্রতি নিস্পৃহ, হিতাকাঙ্ক্ষী এবং শমিতবল হইয়া আচরণ করিতে পারেন, আর আমরা যদি তাঁহাদিগের নিকট নম্র, আজ্ঞাকারী, এবং ভক্তিমান হইতে পারি, তবে জাতিবৈর দূর হইতে পারে। কিন্তু ইংরেজেরা জেতা, আমরা বিজিত। মনুষ্যের স্বভাবই এমত নহে যে, বিজিত হইয়া জেতার প্রতি ভক্তিমান হয় অথবা তাহাদিগকে হিতাভিলাষী, নিস্পৃহ মনে করে; এবং জেতাও কখন বল প্রকাশে কুণ্ঠিত হইতে পারেন না। আজ্ঞাকারী আমরা বটে, কিন্তু বিনীত নহি এবং হইতেও পারিব না। কেননা আমরা প্রাচীন জাতি; অদ্যাপি মহাভারত রামায়ণ পড়ি, মনু যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবস্থা অনুসারে চলি, স্নান করিয়া জগতে অতুল্য ভাষায় ঈশ্বর আরাধনা করি। যত দিন এ সকল বিস্মৃত হইতে না পারি তত দিন বিনীত হইতে পারিব না, মুখে বিনয় করিব, অন্তরে নহে। অতএব এই জাতিবৈর, আমাদিগের প্রকৃত অবস্থার ফল—যত দিন দেশী বিদেশীতে বিজিত-জেতৃ সম্বন্ধ থাকিবে, যত দিন আমরা নিকৃষ্ট হইয়াও পূর্ব্বগৌরব মনে রাখিব, তত দিন জাতিবৈরের শমতার সম্ভাবনা নাই।

এবং আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যত দিন ইংরেজের সমতুল্য না হই, তত দিন যেন আমাদিগের মধ্যে এই জাতিবৈরতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে। যত জাতিবৈর আছে, তত দিন প্রতিযোগিতা আছে। বৈরভাবের কারণই আমরা ইংরেজ-দিগের কতক কতক সমতুল্য হইতে যত্ন করিতেছি। ইংরেজদের নিকট অপমানগ্রস্ত, উপহসিত হইলে, যত দূর আমরা তাহাদিগের সমকক্ষ হইবার যত্ন করিব, তাহাদিগের কাছে বাপু বাছা ইত্যাদি আদর পাইলে তত দূর করিব না—কেন না সে গায়ের জ্বালা থাকিবে না। বিপক্ষের সঙ্গেই প্রতিযোগিতা ঘটে—স্বপক্ষের সঙ্গে নহে। উন্নত শত্রু উন্নতির উদ্দীপক—উন্নত বন্ধু আলস্যের আশ্রয়। আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদিগের জাতিবৈর ঘটিয়াছে।

যদি শুভানুধ্যায়ীদিগের যত্ন সফল হইয়া, সম্প্রতি জাতিবৈরিতার উপশম ঘটে, তাহা হইলে আমরা যে মানসিক সম্বন্ধের কথা উপরে বলিয়াছি, তাহা অবশ্য ঘটিবে; জাতিবৈর উচ্ছিন্ন হইলেই নিকৃষ্ট জাতি উৎকৃষ্টের নিকট বিনীত, আজ্ঞাকারী এবং ভক্তিমান হইবে,—কেন না সে অবস্থা না ঘটিলে জাতিবৈর যাইবে না। এইরূপ মানসিক অবস্থা, উন্নতির পথরোধক। যে বিনীত, সে আত্মক্ষমতায় বিশ্বাসশূন্য,—যে পরের আজ্ঞানুকারী, সে আত্মানুবর্ত্তিতাশূন্য, এবং যে প্রভুর প্রতি ভক্তিমান্ সে প্রভুর প্রতি সকল ভার অর্পণ করিয়া আত্মকার্য্যে বিমুখ হয়। যখন বাঙ্গালী ইংরেজের তুল্য না হইয়াও ইংরেজের প্রতি জাতিবৈরশূন্য হইবে, তখন বাঙ্গালী আত্মোন্নতির সম্ভাবনায় বিশ্বাস করিবে না, তাহার চেষ্টাও করিবে না, আত্মচিত্তবৃত্তিকে স্ফূর্ত্তি দিবে না, আত্মরক্ষায় যত্ন করিবে না। তখন ভাবী উন্নতির মূল এককালীন উৎপাটিত হইবে। সে দুরবস্থা কখন না ঘটুক! জাতিবৈর এখনও বহুকাল বঙ্গদেশে বিরাজ করুক।

অতএব জাতিবৈর স্বভাবসঙ্গত, এবং ইহার দূরীকরণ স্পৃহণীয় নহে। কিন্তু জাতিবৈর স্পৃহণীয় বলিয়া, পরস্পরের প্রতি দ্বেষভাব স্পৃহণীয় নহে। দ্বেষ মনের অতি কুৎসিত অবস্থা; যাহার মনে স্থান পায় তাহার চরিত্র কলুষিত করে। বাঙ্গালী

ইংরেজের প্রতি বিরক্ত থাকুন, কিন্তু ইংরেজের অনিষ্ট কামনা না করেন; ইংরেজ বাঙ্গালীর প্রতি বিরক্ত থাকুন, কিন্তু বাঙ্গালীর অনিষ্ট কামনা না করেন। জাতিবৈরের ফলে প্রতিযোগিতা ভিন্ন বিদ্বেষ ও অনিষ্ট কামনা না ঘটে। অনেক স্থানে তাহা ঘটিতেছে।—'সাধারণী', ১১ কার্ত্তিক ১২৮০।

সূচনা ['প্রচার']

আমাদিগের এই মাসিক পত্রখানি অতি ক্ষুদ্র। এত ক্ষুদ্র পত্রের একটা বিস্তারিত মুখবন্ধ লেখা কতকটা অসঙ্গত বোধ হয়। বড় বড় এবং ভাল ভাল এত মাসিক পত্র থাকিতে আবার একখানি এমন ক্ষুদ্র পত্র কেন? সেই কথা বলিবার জন্যই এই সূচনাটুকু আমরা লিখিলাম।

এ কথা কতকটা আমরা বিজ্ঞাপনেই বলিয়াছি। পৃথিবীতে হিমালয়ও আছে, বল্মীকও আছে। সমুদ্রে জাহাজও আছে, ডিঙ্গীও আছে। তবে ডিঙ্গীর এই গুণ, জাহাজ সব স্থানে চলে না, ডিঙ্গী সব স্থানে চলে। যেখানে জাহাজ চলে না, আমরা সেইখানে ডিঙ্গী চালাইব। চড়ায় ঠেকিয়া বঙ্গদর্শন-জাহাজ বানচাল হইয়া গেল—প্রচার ডিঙ্গী, এ হাঁটু জলেও নির্ব্বিঘ্নে ভাসিয়া যাইবে ভরসা আছে।

দেখ, ইউরোপীয় এক একখানি সাময়িক পত্র, আমাদের দেশের এক একখানি পুরাণ বা উপপুরাণের তুল্য আকার;—দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, গভীরতা এবং গাম্ভীর্য্য বহুকাল-জীবী মার্কণ্ডেয় বা অষ্টাদশ পুরাণ-প্রণেতা বেদব্যাসেরই আয়ত্ত বলিয়া বোধ হয়। আমরা যদি মনে করিতে পারিতাম যে, রাবণ কুম্ভকর্ণ মেগেজিন পড়িতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কন্টেম্পোরারি বা নাইন্টীন্থ সেঞ্চুরি পড়িতেন সন্দেহ নাই। ইউরোপে বা লঙ্কায় সে সব সম্ভবে, ক্ষুদ্র-প্রাণ বাঙ্গালীর দেশে, সে সকল সম্ভবে না। ক্ষুদ্র-প্রাণ বাঙ্গালী বড় অধ্যয়নপর হইলেও ছয় ফর্ম্মা সুপার-রয়ল মাসে মাসে পাইলে পরিতোষ লাভ করে। তাহাতেও ইহা দেখি যে, মাসে মাসে অল্পলোকই ছয় ফর্ম্মা সুপার-রয়ল আয়ত্ত করিতে পারেন। যাহাদিগকে শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিয়া দিনপাত করিতে হয়, অর্থচিন্তায় এবং সংসারের জ্বালায় শশব্যস্ত, মহাজনের তাড়নায় বিব্রত,—এক মাসে ছয় ফর্ম্মা পড়া তাঁহারা বিড়ম্বনা মনে করেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই টাকা দিয়া বা না দিয়া ছয় ফর্ম্মার মাসিক পত্র লইয়া দুই এক বার চক্ষু বুলাইয়া তক্তপোষের উপর ফেলিয়া রাখেন। তারপর সেই জ্ঞানবুদ্ধিবিদ্যারসপূর্ণ মাসিক পত্রখণ্ড ক্রমে ক্রমে গড়াইতে গড়াইতে তক্তপোশের নীচে পড়িয়া যায়। ক্ষয়মান দীপতৈল তাহাকে নিষিক্ত করিতে থাকে। বুভুক্ষু পিপীলিকা জাতি তদুপরি বিহার করিতে থাকে। এবং পরিশেষে বালকেরা তাহা অধিকৃত করিয়া কাটিয়া, ছাঁটিয়া, ল্যাজ বাঁধিয়া দিয়া, ঘুড়ী করিয়া উড়াইয়া দেয়; হেম বাবু, রবীন্দ্রবাবু, নবীন বাবুর কবিতা, দ্বিজেন্দ্র বাবু, যোগেন্দ্র বাবুর দর্শনশাস্ত্র; বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস, চন্দ্র বাবুর সমালোচন, কালীপ্রসন্ন বাবুর চিন্তা সূত্রবদ্ধ হইয়া পবনপথে উত্থানপূর্ব্বক বালকমণ্ডলীর নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতে থাকে। আর যে খণ্ড সৌভাগ্যশালী হইয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ

করিল, তাহার ত কথাই নাই। উনন ধরান, মশলা বাঁধা, মোছা, মাজা, ঘষা প্রভৃতি নানাবিধ সাংসারিক কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, সে পত্র নিজ সাময়িক জীবন চরিতার্থ করে। এমন হইতে পারে যে, ইহা সাময়িক পত্রের পক্ষে সদ্গতি বটে, এবং ছয় ফর্ম্মার স্থানে তিন ফর্ম্মার আদেশ করিয়া 'প্রচার' যে গত্যন্তর প্রাপ্ত হইবেন, এমন বোধ হয় না; গত্যন্তরও বেণের দোকান ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না। তবে তিন ফর্ম্মা এই ভরসা করা যাইতে পারে যে, ছেলের ঘুড়ী হইবার আগে, বাপের পড়া হইতে পারে; এবং পাকশালের কার্য্যনির্ব্বাহে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে, গৃহিণীদিগের সহিত প্রচারের কিছু সদালাপ হইতে পারে।

তারপর টাকার কথা। বৎসরে তিন টাকা অতি অল্প টাকা—অথচ সাময়িক পত্রের অধিকারী ও কার্য্যাধ্যক্ষগণের নিকট শুনিতে পাই যে, তাহাও আদায় হয় না। সাহিত্যানুরাগী বাঙ্গালীরা যে স্বভাবতঃ শঠ বঞ্চক এবং প্রতারক, ইচ্ছাপূর্ব্বক সাময়িক পত্রের মূল্য ফাঁকি দেন, ইহা আমাদিগের বিশ্বাস হয় না, সুতরাং আমরা ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছি যে, তিন টাকাও সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের ক্ষমতাতীত। সকলের তিন টাকা জোটে না, এই জন্য দেন না, দিতে পারেন না বলিয়াই দেন না। যাঁহারা তিন টাকা দিতে পারেন না, তাঁহারা দেড় টাকা দিতে পারিবেন এমত বিবেচনা করিয়া, আমরা এই নূতন সাময়িক পত্র প্রকাশ করিলাম।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, যদি লোক পড়েই না, টাকাই দেয় না, তবে এত ভস্মরাশির উপর আবার এ নূতন ছাইমুঠা ঢালিবার প্রয়োজন কি? সাময়িক সাহিত্য যদি আমরা ছাই ভস্মের মধ্যে গণনা করিতাম, তাহা হইলে অবশ্য আমরা এ কার্য্যে হাত দিতাম না। আমাদের বিবেচনায় সভ্যতা-বৃদ্ধির এবং জ্ঞানবিস্তারের সাময়িক সাহিত্য একটি প্রধান উপায়। যে সকল জ্ঞানগর্ভ এবং মনুষ্যের উন্নতিসাধক তত্ত্ব, দুষ্প্রাপ্য, দুর্ব্বোধ্য এবং বহু পরিশ্রমে অধ্যয়নীয় গ্রন্থ সকলে, সাগর-গর্ভ-নিহিত রত্নের ন্যায় লুক্কায়িত থাকে, তাহা সাময়িক সাহিত্যের সাহায্যে সাধারণ সমীপে অনায়াসলভ্য হইয়া সুপরিচিত হয়। এমন কি, সাময়িক পত্র যদি যথাবিধি সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে সাময়িক পত্রের সাধারণ পাঠকের অন্য কোন গ্রন্থ পড়িবার বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। আর সাময়িক পত্রের সমকালিক লেখক ও ভাবুকদিগের মনে যে সকল নূতন তত্ত্ব আবির্ভূত হয়, তাহা সমাজে প্রচারিত করিবার সাময়িক পত্রই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। তাহা না থাকিলে লেখক ও ভাবুকদিগকে প্রত্যেকে এক একখানি নূতন গ্রন্থ প্রচার করিতে হয়। বহু সংখ্যক গ্রন্থ সাধারণ পাঠক কর্ত্তৃক সংগৃহীত এবং অধীত হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব সাময়িক পত্রই প্রাচীন জ্ঞান এবং নূতন ভাব উভয় প্রচারপক্ষেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। এই জন্যেই আমরা সর্ব্ব-সাধারণ-সুলভ সাময়িক পত্রের প্রচারে ব্রতী হইয়াছি। আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই সময়ে, "নবজীবন" নামে অত্যুৎকৃষ্ট উচ্চদরের সাময়িক পত্রের প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। আমরা সেই মহদ্দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া এই ব্রত পালন করিতে যত্ন করিব। 'সত্য, 'ধর্ম্ম' এবং 'আনন্দের' প্রচারের জন্যই আমরা এই সুলভ পত্র প্রচার করিলাম এবং সেই জন্যই ইহার নাম দিলাম "প্রচার।"

যখন সর্ব্বসাধারণের জন্য আমরা পত্র প্রচার করিতেছি, তখন অবশ্য ইহা আমাদিগের উদ্দেশ্য যে, প্রচারের প্রবন্ধগুলি সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হয়। আমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী সম্পাদকেরা এ বিষয়ে কত দূর মনোযোগী হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না—আমাদের এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ থাকিবে ইহা বলিতে পারি। কাজটি কঠিন, কৃতকার্য্য হইতে পারিব, এমন ভরসা অতি অল্প। তবে সাধারণপাঠ্য বলিয়া আমরা বালকপাঠ্য প্রবন্ধ ইহাতে সন্নিবেশিত করিব না। ভরসা করি, প্রচারে যাহা প্রকাশিত হইবে, তাহা অপণ্ডিত ও পণ্ডিত উভয়েরই আলোচনীয় হইবে। অনেকের বিশ্বাস আছে যে, যাহা অকৃতবিদ্য ব্যক্তি পড়িবে বা বুঝিবে বা শুনিবে, তাহা পণ্ডিতের পড়িবার বা বুঝিবার বা শুনিবার যোগ্য নয়। আমাদিগের এ বিষয়ে অনেক সংশয় আছে। আমরা দেখিয়াছি, মহাভারতের ব্যাখ্যা পণ্ডিতে ও মূর্খে তুল্য মনোভিনিবেশপূর্ব্বক শুনিয়াছেন। ভিতরে সর্ব্বত্রই মনুষ্য-প্রকৃতি এক। আমরা কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করিলে, অজ্ঞানীকে যতটা ঘৃণা করি, বোধ হয়, ততটার কোন উপযুক্ত কারণ নাই। অজ্ঞ এবং জ্ঞানী উভয়ে কান পাতিয়া শুনিতে পারেন আজকার দিনে এ বাঙ্গালা দেশে এমন অনেক বলিবার কথা আছে।

এ শিক্ষা শিখাইবে কে? এ পত্রের শিরোভাগে ত সম্পাদকের নাম নাই। থাকিবারও কোন প্রয়োজন দেখি না। সম্পাদক কে, পাঠকের জানিবারও কোন প্রয়োজন নাই; কেন না পাঠকেরা প্রবন্ধ পড়িবেন, সম্পাদককে পড়িবেন না। সম্পাদকের এমন কোন দাবি দাওয়া নাই যে, তিনি আত্মপরিচয় দিয়া পাঠকদিগের সম্মুখীন হইতে পারেন। তাঁহার কাজ, যাঁহারা বিদ্বান্, ভাবুক, রসজ্ঞ, লোকহিতৈষী এবং সুলেখক, তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধ সকল সংগ্রহ করিয়া পাঠকদিগকে উপহার প্রদান করেন। এ কাজ তিনি পারিবেন, এমন ভরসা করেন। আমরা মনুষ্যের নিকট সাহায্যের ভরসা পাইয়াছি। এক্ষণে যিনি মনুষ্যের জ্ঞানাতীত, যাঁহার নিকট মনুষ্য-শ্রেষ্ঠও কীটাণুমাত্র, তাঁহার সাহায্যের প্রার্থনা করি। সকল সিদ্ধিই তাঁহার প্রসাদমাত্র এবং সকল অসিদ্ধি তাঁহার কৃত নিয়মলঙ্ঘনেরই ফল।—'প্রচার', শ্রাবণ ১২৯১, পৃঃ ১-৬।

আদি ব্রাহ্ম সমাজ ও "নব হিন্দু সম্প্রদায়"

বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রতি একটি বক্তৃতা করেন। তাহা অগ্রহায়ণের ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রস্তাবটির শিরোনাম, "একটি পুরাতন কথা।" বক্তৃতাটি শুনি নাই, মুদ্রিত প্রবন্ধটি দেখিয়াছি। নিম্নস্বাক্ষরকারী লেখক তাহার লক্ষ্য।

ইহা আমার পক্ষে কিছুই নূতন নহে। রবীন্দ্র বাবু যখন ক, খ, শিখেন নাই, তাহার পূর্ব্ব হইতে এরূপ সুখ দুঃখ আমার কপালে অনেক ঘটিয়াছে। আমার বিরুদ্ধে কেহ কখন কোন কথা লিখিলে বা বক্তৃতায় বলিলে এ পর্য্যন্ত কোন উত্তর করি নাই। কখন উত্তর করিবার প্রয়োজন হয় নাই। এবার উত্তর করিবার একটু প্রয়োজন পড়িয়াছে। না করিলে যাহারা আমার কথায় বিশ্বাস করে, (এমন কেহ থাকিলে থাকিতে পারে) তাহাদের অনিষ্ট ঘটিবে।

কিন্তু সে প্রয়োজনীয় উত্তর দুই ছত্রে দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্র বাবুর কথার উত্তরে ইহার বেশী প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্র বাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎস্বভাব, এবং আমার বিশেষ প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণবয়স্ক। যদি তিনি দুই একটা কথা বেশী বলিয়া থাকেন, তাহা শুনাই নীরবে আমার কর্ত্তব্য।

তবে যে এ কয় পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ, এই রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি। রবীন্দ্র বাবু আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক। সম্পাদক না হইলেও আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ, তাহা বলা বাহুল্য। বক্তৃতাটি পড়িয়া আমার আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্বন্ধে কতকগুলি কথা মনে পড়িল। আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকদিগের নিকট আমার কিছু নিবেদন আছে। সেই জন্যই লিখিতেছি। কিন্তু নিবেদন জানাইবার পূর্ব্বে পাঠককে একটা রহস্য বুঝাইতে হইবে।

গত শ্রাবণ মাসে, "নবজীবন" প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহাতে সম্পাদক একটি সূচনা লিখিয়াছিলেন। সূচনায়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রশংসা ছিল, বঙ্গদর্শনেরও প্রশংসা ছিল। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তত্ত্ববোধিনীর অপেক্ষা বঙ্গদর্শনের প্রশংসাটা একটু বেশী ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছিল।

তার পর সঞ্জীবনীতে একখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইল। পত্রখানির উদ্দেশ্য নবজীবন-সম্পাদককে এবং নবজীবনের সূচনাকে গালি দেওয়া। এই পত্রে লেখকের স্বাক্ষর ছিল না, কিন্তু অনেকেই জানে যে, আদি ব্রাহ্ম সমাজের এক জন প্রধান লেখক, ঐ পত্রের প্রণেতা। তিনি আমার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র এবং শুনিয়াছি, তিনি নিজে ঐ পত্রখানির জন্য পরে অনুতাপ করিয়াছিলেন, অতএব নাম প্রকাশ করিলাম না। যদি কেহ এই সকল কথা অস্বীকার করেন, তবে নাম প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব।

নবজীবন-সম্পাদক অক্ষয় বাবু, এ পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু নবজীবনের আর এক জন লেখক এখানে চুপ করিয়া থাকা উচিত বোধ করিলেন না। আমার প্রিয় বন্ধু বাবু চন্দ্রনাথ বসু ঐ পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন; এবং গালাগালির রকমটা দেখিয়া "ইতর" শব্দটা লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন।

তদুত্তরে সঞ্জীবনীতে আর একখানি বেনামী পত্র প্রকাশিত হইল। নাম নাই বটে, কিন্তু নামের আদ্য অক্ষর ছিল,—"র"। লোকে কাজেই বলিল পত্রখানি রবীন্দ্র বাবুর লেখা। রবীন্দ্র বাবু ইতর শব্দটা চন্দ্র বাবুকে পাল্‌টাইয়া বলিলেন।

নবজীবনের পনর দিন পরে, প্রচারের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রচার, আমার সাহায্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়। নবজীবনে আমি হিন্দু ধর্ম্ম—যে হিন্দু ধর্ম্ম আমি গ্রহণ করি—তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়মক্রমে লিখিতেছিলাম। প্রচারেও ঐ বিষয়ে নিয়মক্রমে লিখিতে লাগিলাম। সেই ধর্ম্ম আদি ব্রাহ্ম সমাজের অভিমত নহে। যে কারণেই হউক, প্রচার প্রকাশিত হইবার পর আমি আদি ব্রাহ্ম সমাজ-ভুক্ত লেখকদিগের দ্বারা চারি বার আক্রান্ত হইয়াছি। রবীন্দ্র বাবুর এই আক্রমণ চতুর্থ আক্রমণ। গড় পড়তায় মাসে একটি। এই সকল আক্রমণের তীব্রতা একটু পরদা পরদা উঠিতেছে। তাহার একটু পরিচয় আবশ্যক।

প্রথম। তত্ত্ববোধিনীতে "নব্য হিন্দু সম্প্রদায়" এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধে আমার লিখিত "ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা" সমালোচিত হয়। সমালোচনা আক্রমণ নহে। এই লেখক বিজ্ঞ, গম্ভীর, এবং ভাবুক। আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা সব শুনিয়া, যদি প্রথম সংখ্যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া, তিনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তবে তাঁহার কোন দোষই দিতে পারিতাম না। তিনি যদি অকারণে আমার উপর নিরীশ্বরবাদ, প্রভৃতি দোষ আরোপিত না করিতেন, তবে আজ তাঁহার প্রবন্ধ এই গণনার ভিতর ধরিতে পারিতাম না। তিনি যে দয়ার সহিত সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আমার ধন্যবাদের পাত্র। বোধ হয় বলায় দোষ নাই যে, এই লেখক স্বয়ং তত্ত্ববোধিনী-সম্পাদক বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দ্বিতীয়। তত্ত্ববোধিনীর ঐ সংখ্যায় "নূতন ধর্ম্মমত" ইতিশীর্ষক দ্বিতীয় এক প্রবন্ধে অন্য লেখকের দ্বারা প্রচার ও নবজীবনের প্রথম সংখ্যায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার যে সকল মত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা—সমালোচিত নহে—তিরস্কৃত হয়। লেখকের নাম প্রবন্ধে ছিল না। লেখক কে তাহা জানি না, কিন্তু লোকে বলে, উহা বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর লেখা। তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি। উহাতে "নাস্তিক" "জঘন্য কোমৃত মতাবলম্বী" ইত্যাদি ভাষায় অভিহিত হইয়াছিলাম। এই লেখক যিনিই হউন, বড় উদার-প্রকৃতি। তিনি উদারতা প্রযুক্ত, ইংরেজেরা যাহাকে ঝুলির ভিতর হইতে বিড়াল বাহির করা বলে, তাহাই করিয়া বসিয়াছেন। একটু উদ্ধৃত করিতেছি।

"ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা"-প্রবন্ধলেখক তাঁহার প্রস্তাবের শেষে বলিয়াছেন "যে ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানে অধিক সত্য, উপাসনা যে ধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তশুদ্ধিকর এবং মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তিদায়ক, যে ধর্ম্মের নীতি সর্ব্বাপেক্ষা ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির উপযোগী, সেই ধর্ম্মই অবলম্বন করিবে। সেই ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হিন্দুধর্ম্মের সার ব্রাহ্মধর্ম্মই এই সকল লক্ষণাক্রান্ত। আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক যে সকল শ্লোক আছে, সকলই সত্য। ব্রহ্মোপাসনা যেমন চিত্তশুদ্ধিকর, ও মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্ত্তিদায়ক, এমন অন্য কোন ধর্ম্মের উপাসনা নহে। ঐ ধর্ম্মের নীতি যেমন ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির উপযোগী, এমন অন্য কোন ধর্ম্মের নীতি নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মই বঙ্গদেশের শিক্ষিত লোক মাত্রেরই গ্রহণযোগ্য। তাহাতে জাতীয় ভাব ও সত্য উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। উহা দেশের উন্নতির সঙ্গে সুসঙ্গত। উহা সমস্ত বঙ্গ দেশের লোক গ্রহণ করিলে বঙ্গ দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।" (তত্ত্ববোধিনী—ভাদ্র, ৯১ পৃষ্ঠা)। ইহার পরে আবার নূতন হিন্দুধর্ম্ম সংস্কারের উদ্যম, নবজীবন ও প্রচারের ধৃষ্টতার পরিচয় বটে।

তৃতীয়। তৃতীয় আক্রমণ, তত্ত্ববোধিনীতে নহে, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বিচারেও নহে। প্রচারের প্রথম সংখ্যায় "বাঙ্গালার কলঙ্ক" বলিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিত হয়। নব্যভারতে বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ নামে একজন লেখক উহার প্রতিবাদ করেন। তত্ত্ববোধিনীতে দেখিয়াছি যে, ইনি আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক। শুনিয়াছি জোড়াসাঁকোর পণ্ডিতমহাশয়দিগের এক জন ভৃত্য—সাএব কি কি আমি ঠিক জানি

না। যদি আমার ভুল হইয়া থাকে, ভরসা করি, ইনি আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। ইনি সকল মাসিক পত্রে লিখিয়া থাকেন, এবং ইঁহার কোন কোন প্রবন্ধ পড়িয়াছি। আমার কথার দুই এক স্থানে কখন কখন প্রতিবাদ করিয়াছেন দেখিয়াছি। সে সকল স্থানে কখন অসৌজন্য বা অসভ্যতা দেখি নাই। কিন্তু এবারকার এই প্রবন্ধে ভাষাটা সহসা বড় নাএবি রকম হইয়া উঠিয়াছে। পাঠককে একটু উপহার দিতেছি।

"হে বঙ্গীয় লেখক! যদি ইতিহাস লিখিতে চাও, তবে রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন কর। আবিষ্কৃত শাসনপত্রগুলির মূল শ্লোক বিশেষরূপে আলোচনা কর—কাহারও অনুবাদের প্রতি অন্ধভাবে নির্ভর করিও না। উইলসন, বেবার, মেকস্‌মূলার, কনিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণের পদলেহন করিলে কিছুই হইবে না। কিম্বা মিওর, ভাউদাজি, মেইন, মিত্র, হাণ্টার প্রভৃতির কুসুম-কাননে প্রবেশ করিয়া তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিও না। স্বাধীন ভাবে গবেষণা কর। না পার গুরুগিরি করিও না।"* নব্যভারত—ভাদ্র, ২২৫ পৃষ্ঠা।

এখানে, এই লেখকের কথা উত্থাপন করার আমার এমন উদ্দেশ্য নাই যে, কেহ বুঝেন, প্রভুদিগের আদেশানুসারে ভৃত্যের ভাষার এই বিকৃতি ঘটিয়াছে। তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহকারী সম্পাদক বলিয়াই, তাঁহার উল্লেখ করিলাম।

চতুর্থ আক্রমণ, আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকের দ্বারা হইয়াছে। গালিগালাজের বড় ছড়াছড়ি, বড় বাড়াবাড়ি আছে। আমরা প্রায়ই দেখিয়াছি, গালিগালাজে প্রভুর অপেক্ষা ভৃত্য মজবুত। এখানে বলিতে হইবে, প্রভুই মজবুত। তবে প্রভু, ভৃত্যের মত মেছোহাটা হইতে গালি আমদানি করেন নাই; প্রার্থনা-মন্দির হইতে আনিয়াছেন। উদাহরণ—"অসাধারণ প্রতিভা ইচ্ছা করিলে স্বদেশের উন্নতির মূল শিথিল করিতে পারেন, কিন্তু সত্যের মূল শিথিল করিতে পারেন না।" আরও বাড়াবাড়ি আছে। মেছোহাটার ভাষা এত দূর পোঁছে না। পাঠক মনে করিবেন, রবীন্দ্র বাবু তরুণবয়স্ক বলিয়াই এত বাড়াবাড়ি হইয়াছে। তাহা নহে। সুর কেমন পরদা পরদা উঠিতেছে, তাহা দেখাইয়া আসিয়াছি। সমাজের সহকারী সম্পাদকের কড়ি মধ্যমের পর, সম্পাদক স্বয়ং পঞ্চমে না উঠিলে [সুর] লাগাইতে পারিবার সম্ভাবনা ছিল না।

রবীন্দ্র বাবু বলেন যে, আমার এই মত যে, সত্য ত্যাগ করিয়া প্রয়োজন মতে মিথ্যা কথা বলিবে। বরং আরও বেশী বলেন; পাঠক বিশ্বাস না করেন, তাঁহার লিপি উদ্ধৃত করিতেছি, পড়ুন।

"আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্য ভাবে, অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে, অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন। সাকার নিরাকারের উপাসনা ভেদ লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছেন, কিন্তু অলক্ষ্যে ধর্ম্মের ভিত্তিমূলে যে আঘাত পড়িতেছে, সেই আঘাত হইতে ধর্ম্মকে ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ

* কৈলাস বাবুর প্রবন্ধেই প্রকাশ আছে যে, তিনি জানিয়াছেন যে প্রবন্ধ আমার লিখিত এবং আমিই তাঁহার লক্ষ্য। ২২৫ পৃষ্ঠা প্রথম স্তম্ভের নোট এবং অন্যান্য স্থান পড়িয়া দেখায় ইহা যে আমার লেখা তাহা অনেকেই জানে, এবং কোন কোন সম্বাদপত্রেও সে কথা প্রকাশিত হইয়াছিল।

দণ্ডায়মান হইতেছেন না। এ কথা কেহ ভাবিতেছেন না যে, যে সমাজে প্রকাশ্য ভাবে কেহ ধর্ম্মের মূলে কুঠারঘাত করিতে সাহস করে, সেখানে ধর্ম্মের মূল না জানি কতখানি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চালিত না হইত, তাহা হইলে, কি আমাদের দেশের মুখ্য* লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্দ্ধা সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করেন?" ইত্যাদি ইত্যাদি। (ভারতী—অগ্রহায়ণ, ৩৪৭ পৃঃ)।

সর্ব্বনাশের কথা বটে, আদি ব্রাহ্ম সমাজ না থাকিলে আমার হাত হইতে দেশ রক্ষা পাইত কি না সন্দেহ। হয়ত পাঠক জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কবে এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিল। কবে আমি পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া, স্পর্দ্ধা সহকারে, লোক ডাকিয়া বলিয়াছি, "তোমরা ছাই ভস্ম সত্য ভাসাইয়া দাও—মিথ্যার আরাধনা কর" কথাটার উত্তর দিতে পারিলাম না। ভরসা ছিল, রবীন্দ্র বাবু এ বিষয়ে সহায়তা করিবেন, কিন্তু বড় করেন নাই। তাঁহার কুড়ি স্তম্ভ বক্তৃতার মধ্যে মোটে ছয় ছত্র প্রমাণ প্রয়োগ খুঁজিয়া পাইলাম। তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

লেখক মহাশয় একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন, "তিনি যদি মিথ্যা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণ পূর্ব্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।"

প্রমাণ প্রয়োগ এই পর্য্যন্ত; তার পর আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক বলিতেছেন, "কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না; শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।"

আমি বলিলেও মিথ্যা সত্য না হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও না হইতে পারে, কিন্তু বোধ করি, আদি ব্রাহ্ম সমাজের কেহ কেহ বলিলে হয়। উদাহরণস্বরূপ "একটি আদর্শ হিন্দুকল্পনা" সম্পাদক মহাশয়ের মুখ-নিঃসৃত এই চারিটি শব্দ পাঠককে উপহার দিতেছি।

প্রথম "কল্পনা" শব্দটি সত্য নহে। আমি আদর্শ হিন্দু "কল্পনা" করিয়াছি, এ কথা আমার লেখার ভিতর কোথাও নাই। আমার লেখার ভিতর এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে এমন অনুমান করা যায়। প্রচারের প্রথম সংখ্যায় হিন্দু ধর্ম্ম শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কথাটা রবীন্দ্র বাবু তুলিয়াছেন। পাঠক ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিবেন যে, "কল্পনা" নহে। আমার নিকট পরিচিত দুই জন হিন্দুর দোষ গুণ বর্ণনা করিয়াছি। এক জন সন্ধ্যা আহ্নিকে রত, কিন্তু পরের অনিষ্টকারী। আদি ব্রাহ্ম সমাজের কেহ যদি চাহেন, আমি তাঁহার বাড়ী তাঁহাদিগকে দেখাইয়া আনিতে পারি। স্পষ্টই বলিয়াছি যে, আমি ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়াছি। ঐ ব্যক্তির পরিচয় দিয়া বলিয়াছি, "আর একটি হিন্দুর কথা বলি।" ইহাতে কল্পনা বুঝায় না, পরিচিত ব্যক্তির পরিচয় বুঝায়।

তার পর "আদর্শ" কথাটি সত্য নহে। "আদর্শ" শব্দটা আমার উক্তিতে নাই। ভাবেও বুঝায় না। যে ব্যক্তি কখন কখন সুরা পান করে, সে ব্যক্তি আদর্শ হিন্দু বলিয়া গৃহীত হইল কি প্রকারে?

* বক্তৃতার সময়ে শ্রোতারা এই শব্দটা কিরূপ শুনিয়াছিলেন?

এই দুইটি কথা "অসত্য" বলিতে হয়। অথচ সত্যের মহিমা কীর্ত্তনে লাগিয়াছে। অতএব কৃষ্ণের আজ্ঞায় মিথ্যা সত্য হউক না হউক, আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকের বাক্যবলে হইতে পারে।

প্রয়োজন হইলে এরূপ উদাহরণ আরও দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্র বাবুর সঙ্গে এরূপ বিচারে আমার প্রবৃত্তি নাই। আমার যদি মনে থাকিত যে, আমি রবীন্দ্র বাবুর প্রতিবাদ করিতেছি, তাহা হইলে এতটুকুও বলিতাম না। এই রবির পিছনে যে ছায়া আছে, আমি তাহারই প্রতিবাদ করিতেছি, বলিয়া এত কথা বলিলাম।

এখন এ সকল বাজে কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক। স্থূল কথার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। "যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়"—এ কথার কোন অর্থ আছে কি? যদি বলা যায়, "একটা চতুষ্কোণ গোলক"—তবে অনেকেই বলিবেন, এমন কথার অর্থ নাই। যদি রবীন্দ্র বাবু আমার উক্তি তাই মনে করিতেন, তবে গোল মিটিত। তাঁহার বক্তৃতাও হইত না—আমাকেও এ পাপ প্রবন্ধ লিখিতে হইত না। ইহা অর্থযুক্ত বাক্য বটে, এবং তিনিও ইহাকে অর্থযুক্ত বাক্য মনে করিয়া, ইহার উপর বক্তৃতাটি খাড়া করিয়াছেন।

যদি তাই, তবে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তিনি এমন কোন চেষ্টা করিয়াছেন কি, যাহাতে লেখক যে অর্থে এই কথা ব্যবহার করিয়াছিল, সেই অর্থটি তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয়? যদি তাহা না করিয়া থাকেন, তবে গালিই তাঁহার উদ্দেশ্য—সত্য তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। তিনি বলিবেন, "এমন কোন চেষ্টার প্রয়োজনই হয় নাই। লেখকের যে ভাব, লেখক নিজেই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন—বলিয়াছেন, যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।" ঠিক কথা, কিন্তু এই কথা বলিয়াই আমি শেষ করি নাই। মহাভারতীয় একটি কৃষ্ণোক্তির উপর বরাত দিয়াছি। এই কৃষ্ণোক্তিটি কি, রবীন্দ্র বাবু তাহা পড়িয়া দেখিয়াছেন কি? যদি না দেখিয়া থাকেন, তবে কি প্রকারে জানিলেন যে, আমার কথার ভাবার্থ তিনি বুঝিয়াছেন?

প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্র বাবু বলিতে পারেন, "অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত সমুদ্রবিশেষ, আমি কোথায় সে কৃষ্ণোক্তি খুঁজিয়া পাইব? তুমি ত কোন নিদর্শন লিখিয়া দাও নাই।" কাজটা রবীন্দ্র বাবুর পক্ষে বড় কঠিন ছিল না। ১৫ই শ্রাবণ আমার ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার পর, অনেক বার রবীন্দ্র বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রতিবার অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা হইয়াছে। কথাবার্ত্তা প্রায় সাহিত্য বিষয়েই হইয়াছে। এত দিন কথাটা জিজ্ঞাসা করিলে আমি দেখাইয়া দিতে পারিতাম, কোথায় সে কৃষ্ণোক্তি। রবীন্দ্র বাবুর অনুসন্ধানের ইচ্ছা থাকিলে, অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতেন।

ঐ কৃষ্ণোক্তির মর্ম্ম পাঠককে এখন সংক্ষেপে বুঝাই। কর্ণের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যুধিষ্ঠির শিবিরে পলায়ন করিয়া শুইয়া আছেন। তাঁহার জন্য চিন্তিত হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুন সেখানে উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির কর্ণের পরাক্রমে কাতর ছিলেন, ভাবিতেছিলেন, অর্জ্জুন এতক্ষণ কর্ণকে বধ করিয়া আসিতেছে। অর্জ্জুন আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কর্ণ বধ হইয়াছে কি না। অর্জ্জুন বলিলেন, না, হয় নাই। তখন যুধিষ্ঠির রাগান্ধ হইয়া, অর্জ্জুনের অনেক নিন্দা করিলেন, এবং অর্জ্জুনের গাণ্ডীবের অনেক নিন্দা করিলেন। অর্জ্জুনের একটি প্রতিজ্ঞা ছিল—যে গাণ্ডীবের নিন্দা করিবে, তাহাকে

তিনি বধ করিবেন। কাজেই এক্ষণে "সত্য" রক্ষার জন্য তিনি যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে বাধ্য—নহিলে "সত্য"-চ্যুত হয়েন। তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের বধে উদ্যত হইলেন—মনে করিলেন, তার পর প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, আত্মহত্যা করিবেন। এই সকল জানিয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, এরূপ সত্য রক্ষণীয় নহে। এ সত্য-লঙ্ঘনই ধর্ম্ম। এখানে সত্যচ্যুতিই ধর্ম্ম। এখানে মিথ্যাই সত্য হয়।

এটা যে উপন্যাস মাত্র, তাহা আদি ব্রাহ্ম সমাজের শিক্ষিত লেখকদিগকে বুঝাইতে হইবে না। রবীন্দ্র বাবুর বক্তৃতার ভাবে বুঝায় যে, যেখানে কৃষ্ণ নাম আছে, সেখানে আর আমি মনে করি না যে, এখানে উপন্যাস আছে—সকলই প্রতিবাদের অতীত সত্য বলিয়া ধ্রুব জ্ঞান করি। আমি যে এমন মনে করিতে পারি যে, এ কথাগুলি সত্য সত্য কৃষ্ণ স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলেন নাই, ইহা কৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্ম্মের কবিকৃত উপন্যাসযুক্ত ব্যাখ্যা মাত্র, ইহা বোধ হয়, তাঁহারা বুঝিবেন না। তাহাতে এখন ক্ষতি নাই। আমার এখন এই জিজ্ঞাস্য যে, তিনি আমার কথার অর্থ বুঝিতে কি গোলযোগ করিয়াছেন, তাহা এখন বুঝিয়াছেন কি? না হয়, একটু বুঝাই।

রবীন্দ্র বাবু "সত্য" এবং "মিথ্যা" এই দুইটি শব্দ ইংরেজি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সেই অর্থেই আমার ব্যবহৃত "সত্য" "মিথ্যা" বুঝিয়াছেন। তাঁহার কাছে সত্য, *Truth*, মিথ্যা, *Falsehood*। আমি সত্য মিথ্যা শব্দ ব্যবহার কালে ইংরেজির অনুবাদ করি নাই। এই অনুবাদপরায়ণতাই আমার বিবেচনায়, আমাদের মৌলিকতা, স্বাধীন চিন্তা ও উন্নতির এক বিঘ্ন হইয়া উঠিয়াছে। "সত্য" মিথ্যা" প্রাচীনকাল হইতে যে অর্থে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, আমি সেই অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। সে দেশী অর্থে, সত্য Truth, আর তাহা ছাড়া আরও কিছু। প্রতিজ্ঞা-রক্ষা, আপনার কথা রক্ষা, ইহাও সত্য। এইরূপ একটি প্রাচীন ইংরেজি কথা আছে—"*Troth*"। ইহাই *Truth* শব্দের প্রাচীন রূপ। এখন, *Truth* শব্দ *Troth* হইতে ভিন্নার্থ হইয়া পড়িয়াছে। ঐ শব্দটিও এখন আর বড় ব্যবহৃত হয় না। *Honour*, *Faith*, এই সকল শব্দ তাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এ সামগ্রী চোর ও অন্যান্য দুষ্ক্রিয়াকারীদিগের মধ্যেও আছে। তাহারা ইহার সাহায্যে পৃথিবীর পাপ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যাহা *Truth*—রবীন্দ্র বাবুর Truth তাহার দ্বারা পাপের সাহায্য হইতে পারে না।

এক্ষণে রবীন্দ্র বাবুর সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের মতে আপনার পাপ-প্রতিজ্ঞা (সত্য) রক্ষার্থ নিরপরাধী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করাই কি অর্জ্জুনের উচিত ছিল? যদি কেহ প্রাতে উঠিয়া সত্য করে যে, আজ দিবাবসানের মধ্যে পৃথিবীতে যত প্রকার পাপ আছে—হত্যা, দস্যুতা, পরদার, পরপীড়ন,—সকলই সম্পন্ন করিব—তাঁহাদের মতে কি ইহার সেই সত্য পালনই উচিত? যদি তাঁহাদের সে মত হয়; তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তাঁহাদের সত্যবাদ তাঁহাদেরই থাক্, এদেশে যেন প্রচারিত না হয়। আর তাঁহাদের মত যদি সেরূপ না হয়, তবে অবশ্য তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, এখানে সত্যচ্যুতিই ধর্ম্ম। এখানে মিথ্যাই সত্য।

এ অর্থে "সত্য" "মিথ্যা" শব্দ ব্যবহার করা আমার উচিত হইয়াছে কি না, ভরসা

করি, এ বিচার উঠিবে না। সংস্কৃত শব্দের চিরপ্রচলিত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, ইংরেজি কথার অর্থ তাহাতে লাগাইতে হইবে, ইহা আমি স্বীকার করি না। হিন্দুর বর্ণনার স্থানে যে খ্রীষ্টীয়ানের বর্ণনা করিতে হইবে, তাহাও স্বীকার করি না।

রবীন্দ্র বাবু, "সত্য" শব্দের ব্যাখ্যায় যেমন গোলযোগ করিয়াছেন, লোকহিত লইয়াও তেমনি—বরং আরও বেশী গোলযোগ করিয়াছেন। কিন্তু আর কচকচি বাড়াইতে আমার ইচ্ছা নাই। এখন আর আমার সময়ও নাই। প্রচারে আর স্থানও নাই। বোধ হয়, পাঠকের আর ধৈর্য্যও থাকিবে না। সুতরাং ক্ষান্ত হইলাম।

এখন রবীন্দ্র বাবু বলিতে পারেন যে, "যদি বুঝিতে পারিতেছ যে, তোমার ব্যবহৃত শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া, আমি ভ্রমে পতিত হইয়াছি—তবে আমার ভ্রম সংশোধন করিয়াই তোমার ক্ষান্ত হওয়া উচিত ছিল—আদি ব্রাহ্ম সমাজকে জড়াইতেছ কেন?" এই কথার উত্তরে যে কথা সাধারণ পাঠ্য প্রবন্ধে বলা রুচিবিগর্হিত, যাহা Personal, তাহা বলিতে বাধ্য হইলাম। আমার সৌভাগ্যক্রমে, আমি রবীন্দ্র বাবুর নিকট বিলক্ষণ পরিচিত। শ্লাঘাস্বরূপ মনে করি,—এবং ভরসা করি, ভবিষ্যতেও মনে করিতে পারিব যে, আমি তাঁহার সুহৃজ্জন মধ্যে গণ্য হই। চারি মাস হইল প্রচারের সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই চারি মাস মধ্যে রবীন্দ্র বাবু অনুগ্রহপূর্ব্বক অনেকবার আমাকে দর্শন দিয়াছেন। সাহিত্য বিষয়ে, অনেক আলাপ করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গ কখনও উত্থাপিত করেন নাই! অথচ বোধ হয়, যদি ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া রবীন্দ্র বাবুর এমন বিশ্বাসই হইয়াছিল যে, দেশের অবনতি, এবং ধর্ম্মের উচ্ছেদ, এই দুইটি আমি জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছি, তবে যিনি ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত, আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক, এবং স্বয়ং সত্যানুরাগ প্রচারে যত্নশীল, তিনি এমন ঘোর পাপিষ্ঠের উদ্ধারের জন্য যে সে প্রসঙ্গ ঘুণাক্ষরেও উত্থাপিত করিবেন না, তার পর চারি মাস বাদে সহসা পরোক্ষে বাগ্মিতার উৎস খুলিয়া দিবেন, ইহা আমার অসম্ভব বোধ হয়। তাই মনে করি, এ উৎস তিনি নিজে খুলেন নাই, আর কেহ খুলিয়া দিয়াছে। এক্ষণে আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকদিগের কাজ, গোড়ায় যাহা বলিয়াছি, পাঠক তাহা স্মরণ করুন। আদি ব্রাহ্ম সমাজকে জড়ানতে, আমার কোন দোষ আছে কি না, বিচার করুন।

তাই, আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকদিগের কাছে আমার একটা নিবেদন আছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজকে আমি বিশেষ ভক্তি করি। আদি ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা এ দেশে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি সিদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে জানি। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সমাজের নেতা, সে সমাজের কাছে অনেক শিক্ষা লাভ করিব, এমন আশা রাখি। কিন্তু বিবাদ বিসম্বাদে সে শিক্ষা লাভ করিতে পারিব না। বিশেষ আমার বিশ্বাস, আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকদিগের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের অতিশয় উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে। সেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কার্য্যে আমরা জীবন সমর্পণ করিয়াছি। আমি ক্ষুদ্র, আমার দ্বারা এমন কিছু কাজ হয় নাই, বা হইতে পারে না, যাহা আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকেরা গণনার মধ্যে আনেন। কিন্তু কাহারও আন্তরিক যত্ন নিষ্ফল হয় না। ফল যতই অল্প হউক, বিবাদ বিসম্বাদে কমিবে বই বাড়িবে না। পরস্পরের আনুকূল্যে ক্ষুদ্রের দ্বারাও বড় কাজ

হইতে পারে। তাই বলিতেছি, বিবাদ বিসম্বাদে, স্বনামে বা বিনামে, স্বতঃ বা পরতঃ, প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে, বিবাদ বিসম্বাদে তাঁহারা মন না দেন। আমি এই পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইলাম, আর কখন এরূপ প্রতিবাদ করিব এমন ইচ্ছা নাই। তাঁহাদের যাহা কর্ত্তব্য বোধ হয়, অবশ্য করিবেন।

উপসংহারে, রবীন্দ্র বাবুকেও একটা কথা বলিবার আছে। সত্যের প্রতি কাহারও অভক্তি নাই, কিন্তু সত্যের ভানের উপর আমার বড় ঘৃণা আছে। যাহারা নেড়া বৈরাগীর হরিনামের মত মুখে সত্য সত্য বলে, কিন্তু হৃদয় অসত্যে পরিপূর্ণ, তাহাদের সত্যানুরাগকেই সত্যের ভান বলিতেছি। এ জিনিস, এ দেশে বড় ছিল না,—এখন বিলাত হইতে ইংরেজির সঙ্গে বড় বেশী পরিমাণে আমদানি হইয়াছে। সামগ্রীটা বড় কদর্য্য। মৌখিক "Lie direct" সম্বন্ধে তাঁহাদের যত আপত্তি—কার্য্যতঃ সমুদ্রপ্রমাণ মহাপাপেও আপত্তি নাই। সে কালের হিন্দুর এই দোষ ছিল বটে যে, "Lie direct" সম্বন্ধে তত আপত্তি ছিল না, কিন্তু ততটা কপটতা ছিল না।* দুইটিই মহাপাপ। এখন ইংরেজি শিক্ষার গুণে হিন্দু পাপটা হইতে অনেক অংশে উদ্ধার পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু ইংরেজি পাপটা বড় বাড়িয়া উঠিতেছে। মৌখিক অসত্যের অপেক্ষা আন্তরিক অসত্য যে গুরুতর পাপ, রবীন্দ্র বাবু বোধ হয় তাহা স্বীকার করিবেন। সত্যের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে গিয়া কেবল মৌখিক সত্যের প্রচার, আন্তরিক সত্যের প্রতি অপেক্ষাকৃত অমনোযোগ, রবীন্দ্র বাবুর যত্নে এমনটা না ঘটে, এইটুকু সাবধান করিয়া দিতেছি। ঘটিয়াছে, এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু পথ বড় পিচ্ছিল, এজন্য এটুকু বলিলাম, মার্জ্জনা করিবেন। তাঁহার কাছে অনেক ভরসা করি, এই জন্য বলিলাম। তিনি এত অল্প বয়সেও বাঙ্গালার উজ্জ্বল রত্ন—আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হইয়া আপনার প্রতিভার উপযুক্ত পরিমাণে দেশের উন্নতি সাধন করুন। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।—'প্রচার', অগ্রহায়ণ ১২৯১, পৃ. ১৬৯-১৮৪।

লর্ড রিপণের উৎসবের জমা খরচ

এ উৎসবে আমরা পাইলাম কি? হারাইলাম কি? যে সঞ্চয়ী লোক, সে সকল সময়ে আপনার জমা-খরচটা খতাইয়া দেখে। আমাদের জাতীয় জমা-খরচটার মধ্যে মধ্যে কৈফিয়ৎ কাটিয়া দেখা ভাল। আগে দেখা যাউক, আমাদের লাভের অঙ্কে কি?

প্রথমতঃ, আমরা এ উৎসবে লাভ করিয়াছি রাজভক্তি। অনেকে বলিবেন, আমাদের রাজভক্তি ছিল বলিয়াই, উৎসব করিয়াছি। সকলেই বুঝেন যে, ঠিক তাহা নহে; অন্য কারণে এ উৎসব উপস্থিত হইয়াছে। উৎসবেই আমাদের রাজভক্তি বাড়িয়াছে। রাজভক্তি বড় বাঞ্ছনীয়। রাজভক্তি জাতীয় উন্নতির একটি গুরুতর কারণ। রাজভক্তির জন্য ইহা প্রয়োজনীয় নহে যে, রাজা স্বয়ং একটা ভক্তির যোগ্য মনুষ্য হইবেন। ইংলণ্ডের এলিজাবেথ্ বা প্রুশিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেড্রিক, এতদুভয়ের কেহই ভক্তির যোগ্য ছিলেন না। এরূপ নৃশংস-চরিত্র নরনারী পৃথিবীতে দুর্লভ। কিন্তু এলিজাবেথের প্রতি জাতীয়

* দেবী চৌধুরাণীতে প্রসঙ্গক্রমে ইহা উত্থাপিত করিয়াছি—১৩০ পৃষ্ঠা দেখ।

রাজভক্তি ইংলণ্ডের উন্নতির একটি কারণ ফ্রেড্রিকের প্রতি জাতীয় রাজভক্তি প্রুষিয়ার উন্নতির একটি কারণ।

আমাদের দ্বিতীয় লাভ, জাতীয় ঐক্য। এই বোধ হয়, ঐতিহাসিক কালে প্রথম সমস্ত ভারতবর্ষ এক হইয়া একটা কাজ করিল। আমরা এই প্রথম বুঝিলাম যে, আমাদের মধ্যে ঐক্য ঘটিতে পারে। আমরা এই প্রথম বুঝিলাম, ভারতবর্ষীয়েরা একজাতি।

তৃতীয় লাভ, রাজকীয় শক্তি। রাজকীয় শক্তি কতকটা ঐক্যের ফল বটে, কিন্তু ঐক্য থাকিলে যে শক্তি থাকে, এমত নহে। সকল সমাজেই, সমাজই রাজা। রাজা সমাজ শাসন করেন বটে, কিন্তু সে সমাজের প্রতিনিধিস্বরূপ। সমাজ রাজার উপর আবার রাজা। কেবল সমাজ রাজার দণ্ড পুরস্কারের কর্ত্তা। যে সমাজ রাজাকে দণ্ডিত বা পুরস্কৃত করিয়া থাকে, সেই সমাজেরই রাজনৈতিক শক্তি আছে। প্রকৃত রাজদণ্ড সেই সমাজেরই হাতে। আজ, লর্ড রিপণকে সুশাসনের জন্য পুরস্কৃত করিয়া ভারতবর্ষীয় সমাজ সেই রাজদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে। ইহাই স্বাধীনতা।

আমাদের চতুর্থ লাভ,—এটুকু কেবল বাঙ্গালার লাভ;—সমাজের কর্ত্তৃত্ব ভূম্যধিকারীদের হাত হইতে এই প্রথম মধ্যবিত্ত লোকের হাতে গেল। অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব, ধনের হাত হইতে বুদ্ধিবিদ্যার হাতে গেল। এখন হইতে বাঙ্গালায় ধনবানেরা আর কেহই নহেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ই কর্ত্তা। ইহা সমাজের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলকর, উন্নতির লক্ষণ, এবং উন্নতির সোপান। এখনকার নূতন সমাজ নেতৃগণের নিকট আমাদের নিবেদন, তাঁহারা সমাজ ধীরে ধীরে সুপথে চালাইলে, বিপ্লব না ঘটে।

এই গেল লাভের অঙ্ক জমা। এক্ষণে খরচটা দেখা যাউক।

আমাদের প্রথম ক্ষতি এই যে, এ উৎসবে দ্বেষক ইংরেজ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈরিতা বড় বাড়িয়া উঠিল। মুখে যিনি যাহা বলুন, তাঁহারা এ উৎসব কখন মার্জ্জনা করিবেন না। তাঁহাদের সঙ্গে আর গোল মিটিবে না। ইহাতে সময়ে সময়ে আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

আমাদের দ্বিতীয় ক্ষতি এই যে, কিছু "ষ্টীম" ছাড়া হইয়াছে, সে সঞ্চিত বলে সমাজ-যন্ত্র দ্রুতবেগে চলিবে, তাহার কিছু ব্যয় হইয়াছে। সেটা নিতান্ত মন্দও হয় নাই। বড় বেশী ষ্টীম জমিলে বিপ্লব উপস্থিত হয়।

আমাদের তৃতীয় ক্ষতি এই যে, গলাবাজির দৌরাত্ম্যটা বড় বাড়িয়া গেল। কথার ছড়াছড়ি বড় বেশী হইয়া গিয়াছে। সেটা কুশিক্ষা। একে ত বাঙ্গালী সহজেই কেবল বাক্য বাহাদুর, তার উপর বক্তৃতা নামে বিলাতি মালের আমদানি হইয়াছে। সোণা বলিয়া সোহাগা বিক্রয় হইতেছে। আমাদের ভয়, পাছে আপনাদের বাক্‌জালে আপনারাই জড়াইয়া পড়ি, কথার কুয়াশায় আর পথ দেখিতে না পাই; তুবড়ী বাজির মত মুখে সোঁ সোঁ করিয়া ফাটিয়া যাই।

সে যাহাই হোক, খরচের অপেক্ষা জমা যে বেশী, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। খরচগুলি ছোট ছোট, লাভগুলি বড় বড়। উৎসবে আমরা মুনাফা করিয়াছি, এখন রেখে ঢেকে চালাইতে পারিলেই হয়। তবে লাভ কি, লোক্‌সান কি তাহা না

বুঝিয়া, "বেড়ে হয়েছে। বেড়ে হয়েছে।" বলিয়া বেড়ান জাতীয় শিক্ষার পক্ষে ভাল নহে। 'প্রচার', পৌষ ১২৯১, পৃ. ২১৮-২২০।

আগামী বৎসরে প্রচার যেরূপ হইবে

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাহা সঙ্কল্প করা যায়, তাহা সকল সময়ে সম্পন্ন হয় না। যখন প্রচার প্রথম প্রকাশ হয়, তখন আমাদের এমন অভিপ্রায় ছিল না যে, প্রচার কেবল ধর্ম্ম বিষয়ক পত্র হইবে। কিন্তু প্রচারের লেখকদিগের রুচির গতিকে, বিশেষতঃ প্রধান লেখকের অভিপ্রায় অনুসারে, ইহাতে এক্ষণে ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ ভিন্ন আর কিছু থাকে না।

ইহাতে প্রচারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানের মধ্যে ধর্ম্মজ্ঞানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু অন্যান্য জ্ঞান ভিন্ন ধর্ম্মজ্ঞানের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হয় না। বিশেষ মনুষ্যজীবন বিচিত্র ও বহুবিষয়ক; এজন্য জ্ঞানের বৈচিত্র্য ও বহুবিষয়কতা চাই। যাহা বিচিত্র ও বহুবিষয়ক নহে, তাহা সাধারণের নিকট আদরণীয় হইতে পারে না। সাধারণের নিকট আদরণীয় না হইলে ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধেও সফলতা ঘটে না। অতএব আগামী বৎসরে যাহাতে প্রচার বিচিত্র ও বহুবিষয়ক হয়, আমরা তাহা করিবার উদ্যোগী হইয়াছি। প্রচারের প্রধান লেখকেরাও এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

কিন্তু প্রচারের বর্ত্তমান ক্ষুদ্রাকার থাকিলে, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। আমরা ধর্ম্মালোচনা পরিত্যাগ করিতে পারি না, অথবা তাহার অল্পতা করিতে পারি না। কাজেই প্রচারের কলেবর বৃদ্ধি করিতে হইবে। কলেবর বৃদ্ধি করিয়া, আমরা নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে প্রচার সম্পাদিত করিতে পারিব।

১। ধর্ম্মবিষয়ক প্রবন্ধ এক্ষণে যেরূপ প্রকাশিত হইতেছে সেইরূপ হইতে থাকিবে। এখন যাঁহারা তাহা লিখিতেছেন, তাঁহারাই তাহা লিখিবেন।

২। স্থানাভাবপ্রযুক্ত আমরা উপন্যাস বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। এক্ষণে স্থানাভাব থাকিবে না। অতএব উপন্যাস পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইবে। "সীতারাম" বন্ধ হওয়ায়, অনেক পাঠক দুঃখ বা অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব আগামী শ্রাবণ মাস হইতে "সীতারাম" পুনঃ প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

৩। এতদ্ভিন্ন সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক, এবং অন্যান্য প্রবন্ধ ও রহস্য প্রকাশিত হইবে।

এই সকল পাঠকদিগের অনুমোদিত না হইলে, সিদ্ধ হইবে না। কেন না পত্রের কলেবর বৃদ্ধি করিলে কাজেই মূল্য বৃদ্ধি হইবে। এই জন্য দুই মাস অগ্রে পাঠকদিগকে সম্বাদ দিলাম। পত্রের কলেবর এবং মূল্য কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে, তাহা পাঠকেরা বিজ্ঞাপনে দৃষ্টি করিবেন।—'প্রচার', জ্যৈষ্ঠ ১২৯১, পৃ. ৩৬১-৬২।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাময়িক পত্রে প্রকাশিত কিন্তু পুস্তকাকারে অগ্রথিত আরও কয়েকটি প্রবন্ধ পরবর্তী খণ্ডে প্রকাশিত হবে। সম্পাদক।

নির্বাচিত পত্রাবলী

[কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লিখিত]

সুহৃদ্বরেষু—

আপনার পত্রগুলির যে উত্তর দিতে পারি না, তাহার অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি কারণ এই যে, তাহার উত্তর অদেয়। আপনি যাহা লেখেন তাহা এত মধুর যে উত্তর যাহাই দিই না কেন তাহা কর্কশ হইবে। আপনার পত্রের উত্তর দেওয়া, আর অমৃত পান করিয়া ধন্বন্তরিকে মূল্য দেওয়া সমান বলিয়া বোধ হয়। আপনার পত্রের উত্তর না দেওয়াই ভাল—কোকিলকে Thanks দিয়া কি হইবে? আপনার নববর্ষ প্রভৃতি দিবসের সম্ভাষণ সম্বন্ধে এই কথা বিশেষ খাটে। আপনি নিজে পীড়িত; চক্ষের যন্ত্রণায় লিখিতে অসমর্থ, তথাপি আমাদের মঙ্গল আন্তরিক কামনা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। আপনার তুল্য মনুষ্য অতি দুর্লভ। আপনাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, আপনি অচিরাৎ সুস্থ হইয়া স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতে থাকুন।

স্যার আশলি ইডেনের স্বদেশ গমন উপলক্ষে কলিকাতায় হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। কেহ বলে, গোবর জল ছড়া দাও। কেহ বলে, "অরে নিদারুণ প্রাণ! কোন পথে... যান, আগে যা রে পথ দেখাইয়ে।" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের লাভের মধ্যে দুই একটা সমারোহ দেখিতে যাইব।

আমার দৌহিত্রটি এ পর্য্যন্ত আরোগ্য লাভ করিতে পারে নাই, তবে পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছে। আর ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, কুবের প্রভৃতি দিক্‌পালগণ পূর্ব্বমত দিক্‌পালন করিতেছেন—চন্দ্রের মধ্যে মধ্যে পূর্ণোদয় হয়, মধ্যে মধ্যে অমাবস্যা। এখন কালী প্রসন্ন হইলেই আনন্দমঠ বজায় হয়। ইতি তাং ৪ বৈশাখ। [১২৮৯ সাল]
[১৬ এপ্রিল, ১৮৮২]

'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন'] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

[কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লিখিত]

সুহৃদ্বরেষু—

আপনার অনুগ্রহ পত্র পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম।

আমি যখন প্রথম এখানে আসি, তখন দুই এক মাসের জন্য আসিতেছি এরূপ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট শুনিয়াছিলাম। এজন্য একাই আসিয়াছি। বিশেষ পরিবার আনিবার স্থান এ নহে। এক্ষণে জানিলাম ইহার ভিতর অনেক চক্র আছে। *** সেই মন্থরার দল আমাদের স্বদেশী স্বজাতি, আমার তুল্য পদস্থ; আমার ও আপনার বন্ধুবর্গের মধ্যে গণ্য। আমিই বা আনন্দমঠ লিখিয়া কি করিব, আপনিই বা তাহার মূলমন্ত্র বুঝাইয়া কি করিবেন? এ ঈর্ষাপরবশ, আত্মোদরপরায়ণ জাতির উন্নতি নাই। বল, "বন্দেউদরং"।

বৈশাখের "বান্ধব" পাইয়াছি। এবং "মূলমন্ত্র" "জাতীয় সঙ্গীত" এবং অন্যান্য প্রবন্ধ পড়িয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি।

আপনিও "শাপেনাস্তং গমিতমহিমা," শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তবে আপনি মহৎ কর্ত্তব্যানুরোধেই এ দশা প্রাপ্ত, কাজেই তাহা সহ্য হয়, কিন্তু আমি যে কি জন্য বৈতরণীসৈকতে পড়িয়া ঘোড়ার ঘাস কাটি তাহা বুঝিতে পারি না। যে ব্যক্তি লিখিয়াছিল "যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী" সে ব্যক্তি নিশ্চিত জানিত উড়িষ্যার বৈতরণীপারেই যমদ্বার বটে।

দশমহাবিদ্যার কিয়দংশ হস্তলিপি হইতে হেম বাবুর মুখেই শুনিয়াছিলাম। সেটুকু আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। বোধ হয় সেটুকু আপনিও গ্রন্থকারের মুখে শুনিয়া থাকিবেন। অবশিষ্টাংশ এখনও ভাল করিয়া পড়ি নাই। যেটুকু পড়িলাম তাহাতে বুঝিলাম যে গ্রন্থকারের মুখে না শুনিলে গ্রন্থের সকল রসটুকু পাওয় যায় না। বিশেষ তাঁহার ছন্দ নূতন—আমার আবৃত্তির সম্পূর্ণ আয়ত্ত নহে। এ জন্য স্থির করিয়াছি, যদি কখন রজনী প্রভাত হয়, তবে তাঁহারই মুখে অবশিষ্টাংশ শুনিয়া হৃদয়ঙ্গম করিব।

আনন্দমঠে বিস্তর ছাপার ভুল দেখিলাম। অনুগ্রহ করিয়া মার্জ্জনা করিবেন। ইতি ২৩শে পৌষ [১২৮৯] [৬ জানুয়ারী ১৮৮৩]

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী

"ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন'] শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত]

প্রিয়তমেষু

আমি হাঁপানির পীড়ায় অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় তোমার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়াছে।

গেজেটে তোমার appointment দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। ভরসা করি শীঘ্রই চাকরী চিরস্থায়ী হইবে।

"পদরত্নাবলী" পাইয়াছি। কিন্তু সুখ্যাতি কাহার করিব? কবিদিগের না সংগ্রহকারদিগের? যদি কবিদিগের প্রশংসা করিতে বল, বিস্তর প্রশংসা করিতে পারি। আর যদি সংগ্রহকারদিগের প্রশংসা করিতে বল, তবে কি কি বলিব আমায় লিখিবে, আমি সেইরূপ লিখিব। তুমি এবং রবীন্দ্রনাথ যখন সংগ্রহকার, তখন সংগ্রহ যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহা কেহই সন্দেহ করিবে না এবং আমার সার্টিফিকেট নিষ্প্রয়োজন। তথাপি তোমরা যাহা লিখিতে বলিবে, লিখিব।

কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছ, পত্রে তাহার উত্তর সংক্ষেপে দিলেই চলিবে। আমি যাহা লিখিয়াছি (নবজীবনে ও প্রচারে) ও যাহা লিখিব, তাহাতে এই দুইটি তত্ত্ব প্রমাণিত হইবে।

১। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছাক্রমে কদাপি যুদ্ধে প্রবৃত্ত নহেন।

২। ধর্ম্মযুদ্ধ আছে। ধর্ম্মার্থেই মনুষ্যকে অনেক সময় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয় (যথা

William the Silent)। ধর্ম্মযুদ্ধে অপ্রবৃত্তি অধর্ম্ম। সে সকল স্থানে ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে কখনও প্রবৃত্ত নহেন।

৩। অন্যে যাহাতে ধর্ম্মযুদ্ধ ভিন্ন কোন যুদ্ধে কখন প্রবৃত্ত না হয়, এ চেষ্টা তিনি সাধ্যানুসারে করিয়াছিলেন।

মনুষ্যে ইহার বেশী পারে না। কৃষ্ণচরিত্র মনুষ্যচরিত্র। ঈশ্বর লোকহিতার্থে মনুষ্য-চরিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণনগরে কবে যাইবে? ইতি তাং ২৫শে আশ্বিন [১২৯২] [১০ অক্টোবর ১৮৮৫]

'প্রদীপ'] শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

[জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত]

[১৮৮৭ সনে সঞ্জীবচন্দ্রের একমাত্র পুত্র জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেহেরপুরে পুলিস-ইন্‌স্পেক্টরের পদে নিয়োগের পর চাকরিতে পাকা হয়ে পুলিসের চাকরি কিভাবে নির্ব্বাহ করবেন, সেই উপদেশ চেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে এক পত্র দিয়েছিলেন। এর উত্তরে নিম্নলিখিত উপদেশ-সম্বলিত পত্র বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে লেখেন।]

প্রিয়তমেষু

তুমি বোধ করি পূজার সময় বাড়ী গিয়াছিলে, এতদিনে ফিরিয়া আসিয়া থাকিবে।

আমার নিকট উপদেশ চাহিয়াছিলে, আমি এই পত্রের মধ্যে সাতটি উপদেশ লিখিয়া পাঠাইলাম। ঐ সাতটি *Golden rule* বিবেচনা করিবে। বিশেষ প্রথম পাঁচটি। উহার অনুবর্ত্তী হইলে সর্ব্বত্র মঙ্গল ঘটিবে। এখানকার সমস্ত মঙ্গল। ভরসা করি এই মাস হইতে তুমি সংসারের ভার লইতে পারিবে। ইতি ১৩ আশ্বিন।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিশেষ উপদেশ

I. প্রথম প্রয়োজনীয় কথা। সত্য ভিন্ন কখন মিথ্যা পথে যাইবে না। কলমের মুখে কখন মিথ্যা নির্গত না হয়। তাহা হইলে চাকরি থাকে না। নিতান্ত পক্ষে কর্ত্তৃপক্ষের অবিশ্বাস জন্মে। অবিশ্বাস জন্মিলে আর উন্নতি হয় না।

II. দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় কথা। পরিশ্রম। বিনা পরিশ্রমে কখন উন্নতি হয় না। কখন কোন কাজ পড়িয়া না থাকে।

III. উপরওয়ালাদের আজ্ঞাকারী, তাঁহাদিগের নিকট বিনীতভাব। চাকরি রাখার পক্ষে এবং উন্নতির পক্ষে ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। তর্ক করিও না।

IV. আপনার কাজের Rules & Laws বিশেষরূপে অবগত হইবে।

V. কাহারও উপর অত্যাচার করিবে না। পুলিসের লোকে আসামীর উপর বড় অত্যাচার করে। অনেকের বিশ্বাস যে তা নহিলে কাজ চলে না। তাহা ভ্রান্তি। না চলে সেও ভাল। ইহা নিজে কখন করিবে না, বা অধীনস্থ কাহাকে করিতে দিবে না। ইহার কারাদণ্ড আছে।

VI. সকলের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিবে। অধীনস্থ ব্যক্তিদিগকে ব্যবহার দ্বারায় বশীভূত করিবে। কেহ শত্রু না হয়। কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধে অনেকের অনিষ্ট করিতে হয়। তাহার উপায় নাই। দোষীর অবশ্য দণ্ড চাই।

VII. নিষ্কারণে ভীত হইবে না।

'প্রবাসী', শ্রাবণ ১৩৫৮]

[কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবকে লিখিত]

অশেষ গুণসম্পন্ন শ্রীযুক্ত কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব
আশীর্ব্বাদ ভাজনেষু

আপনি আমাকে যে কয়েক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ীরাই তাহার উপযুক্ত উত্তর দিতে সক্ষম। আমি ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী নহি, এবং ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তার আসন গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত নহি। তবে সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে যে আন্দোলন উপস্থিত, তৎসম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিবার আমার আপত্তি নাই।

প্রথমতঃ—শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন প্রকার সমাজ সংস্কার যে সম্পন্ন হইতে পারে, অথবা সম্পন্ন করা উচিত, আমি এমন বিশ্বাস করি না। যখন মৃত মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ নিবারণ জন্য শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিয়া আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, তখনও আমি এই আপত্তি করিয়াছিলাম, এবং এখনও পর্য্যন্ত সে মত পরিবর্ত্তন করার কোন কারণ আমি দেখি নাই। আমার এরূপ বিবেচনা করিবার দুইটি কারণ আছে। প্রথম এই যে, বাঙ্গালী সমাজ শাস্ত্রে বশীভূত নহে,—দেশাচার বা লোকাচারের বশীভূত। সত্য বটে যে, অনেক সময়ে লোকাচার শাস্ত্রানুযায়ী, কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় যে, লোকাচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ। যেখানে লোকাচার এবং শাস্ত্রে বিরোধ, সেখানে লোকাচারই প্রবল।

উপরিউক্ত বিশ্বাসের দ্বিতীয় কারণ এই যে, সমাজ সর্ব্বত্র শাস্ত্রের বিধানানুসারে চলিলে সামাজিক মঙ্গল ঘটিবে কি না সন্দেহ। আপনারা সমুদ্রযাত্রার সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধানসকল অনুসন্ধান দ্বারা বাহির করিয়া, সমাজকে তদনুসারে চলিতে পরামর্শ দিতে ইচ্ছা করিতেছেন; কিন্তু সকল বিষয়েই কি সমাজকে শাস্ত্রের বিধানানুসারে চলিতে বলিতে সাহস করিবেন? ধর্ম্মশাস্ত্রের একটি বিধি এই, ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের ধর্ম্ম। বাঙ্গালার শূদ্রেরা কি সেই ধর্ম্মাবলম্বী? শাস্ত্রের ব্যবস্থা এখানে চলে না। আপনারা কেহ চালাইতে সাহসী হয়েন কি? চেষ্টা করিলেও এ ব্যবস্থা চালান যায় কি? হাইকোর্টের শূদ্র জজ জজিয়তি ছাড়িয়া, বা সৌভাগ্যশালী শূদ্র জমিদার জমিদারের আসন ছাড়িয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রের গৌরবার্থ লুচিভাজা ব্রাহ্মণের পদ সেবায় নিযুক্ত হইবেন কি? কোন মতেই না। বাঙ্গালী সমাজ প্রয়োজন মতে ধর্ম্মশাস্ত্রের কিয়দংশ

মানে ; প্রয়োজন মতে অবশিষ্টাংশ অনেককাল বিসর্জ্জন দিয়াছে। এবং সেইরূপ প্রয়োজন বুঝিলে, অবশিষ্টাংশ বিসর্জ্জন দিবে। এমন স্থলে ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা খুঁজিয়া কি ফল ? আমার নিজের বিশ্বাস যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং নীতি সম্বন্ধে সামাজিক উন্নতি (Religious and moral regeneration) না ঘটিলে, কেবল শাস্ত্রের বা গ্রন্থ বিশেষের দোহাই দিয়া, সামাজিক প্রথা বিশেষ পরিবর্ত্তন করা যায় না। আমার প্রণীত কৃষ্ণচরিত্র বিষয়ক গ্রন্থে, ইহা আমি সবিস্তারে বুঝাইয়াছি। আমি উপরে বলিয়াছি যে, সমাজ দেশাচারের অধীন,—শাস্ত্রের অধীন নহে। এই দেশাচার পরিবর্ত্তন জন্য ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় এবং নীতি সম্বন্ধীয় সাধারণ উন্নতি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই সাধারণ উন্নতি কিয়ৎ পরিমাণে ঘটিয়াছে বলিয়াই এই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই উন্নতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে, সমুদ্রযাত্রায় সমাজের কাহারও কোন আপত্তি থাকিবে না, কাহারও আপত্তি থাকিলেও সে আপত্তির কোন বল থাকিবে না। কিন্তু যতদিন না সেই উন্নতির উপযুক্ত মাত্রা পরিপূর্ণ হয়, ততদিন কেহই সমুদ্রযাত্রা সাধারণে প্রচলিত করিতে পারিবেন না।

তবে ইহাও বক্তব্য যে, সমুদ্রযাত্রার পক্ষে বাঙ্গালী সমাজ বর্ত্তমান সময়ে কতদূর বিরোধী, তাহা এখন আমাদের কাহারও ঠিক জানা নাই। দেখিতে পাই যে, যাঁহার অর্থ ও অবস্থা সমুদ্রযাত্রার অনুকূলে, তিনিই ইচ্ছা করিলে ইউরোপ যাইতেছেন। সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া কেহ কেহ যে যান নাই, ইহা আমার দৃষ্টিগোচরে কখনও আসে নাই। তবে ইহা স্বীকার করিতে আমি বাধ্য যে, যাঁহারা ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এক প্রকার সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আছেন, কিন্তু তাঁহাদের দোষে কি আমাদের দোষে, তাহা ঠিক বলা যায় না। তাঁহারা এ দেশে আসিয়াই সাহেব সাজিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক বাঙ্গালী সমাজের বাহিরে অবস্থিতি করেন। বিদেশীয় পরিচ্ছদ, বিদেশীয় ভোজন প্রথা এবং বিদেশীয় ব্যবহার দ্বারা আপনাদিগকে পৃথক্ রাখেন। যাঁহারা ইউরোপ হইতে আসিয়া সেরূপ আচরণ না করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অনায়াসে হিন্দুসমাজে পুনর্ম্মিলিত হইয়াছেন। ইউরোপ হইতে প্রত্যাগত মহাশয়েরা সকলেই দেশে ফিরিয়া আসিয়া হিন্দুসমাজসম্মত ব্যবহার করিলে, সাধারণতঃ তাঁহারা যে পরিত্যক্ত হইবেন, একথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

পরিশেষে আমার এই বক্তব্য, সমুদ্রযাত্রা হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত কি না, তাহা বিচার করিবার আগে দেখিতে হয় যে, ইহা ধর্ম্মানুমোদিত কি না ? যাহা ধর্ম্মানুমোদিত কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহা কি ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া পরিহার্য্য ? অনেকে বলিবেন যে, যাহা ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত, তাহাই ধর্ম্ম, যাহা হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহাই অধর্ম্ম। এ কথা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। হিন্দুদিগের প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ কথা পাই না। মহাভারতে কৃষ্ণোক্তি এইরূপ আছে।

ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্দ্ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণ প্রযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।

কর্ণপর্ব্ব একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়, ৫৯ শ্লোক।

ধর্ম্ম লোক সকলকে ধারণ (রক্ষা) করেন, এই জন্য ধর্ম্ম বলে। যাহা হইতে লোকের রক্ষা হয়, ইহাই ধর্ম্ম নিশ্চিত জানিবে।

যদি মহাভারতকার মিথ্যা না লিখিয়া থাকেন, যদি হিন্দুদের আরাধ্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া সমাজে পূজিত কৃষ্ণ মিথ্যাবাদী না হন, তবে যাহা লোকহিতকর তাহাই ধর্ম্ম। এই সমুদ্রযাত্রা পদ্ধতি লোকহিতকর কি না? যদি লোকহিতকর হয়, তবে ইহা স্মৃতি-শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও কেন পরিত্যাগ করিব?

আমি এইরূপ বুঝি ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহাই আছে, তাহাই হিন্দুধর্ম্ম নহে। হিন্দুধর্ম্ম অতিশয় উদার। স্মার্ত্ত ঋষিদিগের হাতে—বিশেষতঃ আধুনিক স্মার্ত্ত রঘুনন্দনাদির হাতে—ইহা অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। স্মার্ত্ত ঋষিগণ হিন্দুধর্ম্মের স্রষ্টা নহেন,—হিন্দুধর্ম্ম সনাতন—তাঁহাদিগের পূর্ব্ব হইতেই আছে। অতএব সনাতন ধর্ম্মে এবং এই ধর্ম্মশাস্ত্রে বিরোধ অসম্ভব নহে। যেখানে এরূপ বিরোধ দেখিব, সেখানে সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত। ধর্ম্মে এবং হিন্দুধর্ম্মে কোন বিরোধ আমি স্বীকার করিতে পারি না। ধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের যদি কোন বিরোধ থাকে, তবে হিন্দুধর্ম্মের গৌরব কি? উহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলিব কেন? এরূপ বিরোধ নাই। সমুদ্রযাত্রা লোকহিতকর বলিয়া ধর্ম্মানুমোদিত। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহাই থাকুক, সমুদ্রযাত্রা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত।

কলিকাতা, ২৭ জুলাই, ১৮৯২ আপনার একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী,
'হিতবাদী।'] শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত

নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন

আপনার যাহা বক্তব্য তাহা কাল বৈকালে মুখে মুখেই বলিতে পারিতেন, তথাপি পত্রখানি যে নিজে হাতে করিয়া আনিয়াছিলেন, ইহা আমার বিশেষ সৌভাগ্য, কারণ মুখের কথা তখনই অন্তর্হিত হইত, কিন্তু পত্রখানি যত্ন করিয়া রাখিলে শত বৎসর থাকিতে পারে। আমি উহা যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিব এবং আমার মৃত্যুর পর, ঐরূপ যত্ন করিয়া তুলিয়া রাখিবার জন্য আমার দৌহিত্রদিগকে বলিয়া যাইব। কারণ উহাতে আপনি আমাকে বলিয়াছেন যে "আপনার সম্মানে বঙ্গবাসী মাত্রেরই সম্মান করা হইয়াছে ও সম্মানও সম্মানিত হইয়াছে"। অন্যে এ কথা বলিলে, তাহার মূল্য যাহাই হউক, আপনি সত্যবাদী ও সমাজের শিরোভূষণ স্বরূপ, অতএব আপনার এই উক্তি আমার বংশে চিরস্মরণীয় ও চিররক্ষণীয়।

যখন বিষবৃক্ষ অনুবাদিত হইয়া প্রথম পরিচিত হয় তখন একখানি ইংরেজি সংবাদপত্র (Scotsman) বলিয়াছেন যে, ঐ গ্রন্থ সংস্কৃত Epic কাব্যের Episodeগুলির সহিত তুলনীয়, এবং একজন বলিয়াছেন যে, Sophocles প্রণীত Antigone চরিত্রের পর আর ইহার তুল্য স্ত্রী চরিত্র কোন সাহিত্যে সৃষ্ট হয় নাই। এই সকল কথা আমি বড় গৌরবের কথা মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার উক্তি আমার পক্ষে তদপেক্ষা অধিকতর গৌরবের হইয়াছে। ইতি ১৯ পৌষ ১৩০০ [২ জানুয়ারি ১৮৯৪]

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সৌজন্যে] শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পরিশিষ্ট—১

বঙ্কিমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

১৮৩৮, ২৬শে জুন (১৩ই আষাঢ়, ১২৪৫ বঙ্গাব্দ)	কাঁটালপাড়ায় জন্ম
১৮৪৪	মেদিনীপুরে শিক্ষারম্ভ (মেদিনীপুরে শিক্ষাকাল—১৮৪৮ পর্যন্ত)
১৮৪৯	১ম বিবাহ (স্ত্রী ৫ বৎসরের: মৃত্যু ১৮৫৯-এর শেষদিকে)
১৮৪৯, ২৩ অক্টোবর	হুগলী কলেজে প্রবেশ—ত্যাগ ১৮৫৬
১৮৫২	'সংবাদ প্রভাকরে' প্রথম (?) কবিতা ও প্রথম গদ্যরচনা প্রকাশ
১৮৫৩	'ললিতা ও মানস' রচনা—প্রকাশ ১৮৫৬ খ্রীঃ
১৮৫৪-৫৬	জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম ; ১৮৫৬ সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম। উভয় পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ।
১৮৫৬	প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন ক্লাশে ভরতি (১৮৬৯ বি-এল পাশ, ১ম বিভাগে তৃতীয়, চাকরিকালে)
১৮৫৭	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রবর্তিত এনট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ।
১৮৫৮	ক. বি. র প্রথম বি-এ পরীক্ষায় প্রথম (দ্বিতীয় বিভাগে অন্যতর উত্তীর্ণ ছাত্র যদুনাথ বসু, দ্বিতীয়)।
১৮৫৯	ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডিপুটি কালেক্টর নিযুক্ত, যশোহরে কার্যে যোগদান (২৩শে আগস্ট), দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়।
১৮৬০	মেদিনীপুরের নেগুয়াঁয় বদলি, হালিশহরের চৌধুরীবাড়ির রাজলক্ষ্মী দেবীর (১২ বর্ষীয়া) সহিত বিবাহ। নেগুয়াঁয় 'কপালকুণ্ডলা'র বীজ।
১৮৬০	খুলনায় বদলি। (১৮৬৪, মার্চ পর্যন্ত খুলনায় অবস্থান) Rajmohan's Wife ও দুর্গেশনন্দিনীর রচনারম্ভ।
১৮৬৪, মার্চ	বারুইপুরে বদলি ; ১৮৬৯-এর ৪ঠা ডিসেম্বর পর্যন্ত অবস্থান। দুর্গেশনন্দিনীর প্রকাশ। পিতার উইলে কাঁটালপাড়ার ভদ্রাসন থেকে বঞ্চিত।
১৮৬৬	কপালকুণ্ডলার প্রকাশ (বৎসরের শেষ দিকে)।
১৮৬৯, নভেম্বর	মৃণালিনীর প্রকাশ।
১৮৬৯, ডিসেম্বর	বহরমপুরে বদলি ; ১৮৭৪-এর ৩রা মে পর্যন্ত অবস্থান। ইংরেজি প্রবন্ধাদি (৪টি) রচনা।
১৮৭২, এপ্রিল	'বঙ্গদর্শন' কলিকাতা ভবানীপুর থেকে প্রকাশিত। ১৮৭৩-এ কাঁটালপাড়ায় বঙ্গদর্শনের ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত।

১৮৭২-১৮৭৬-এর মার্চ	বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, চন্দ্রশেখর, যুগলাঙ্গুরীয় প্রভৃতি এবং লোকরহস্য, বিজ্ঞানরহস্য, কমলাকান্তের দপ্তর, প্রভৃতির প্রকাশকাল। (গ্রন্থাকারে প্রকাশ। গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য)
১৮৭৪	ক্যান্টন্‌মেন্টের কম্যাণ্ডিং অফিসার কর্নেল ডাফিনের দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র প্রহৃত। মামলা। ডাফিনের প্রকাশ্য আদালতে ক্ষমা প্রার্থনা।
১৮৭৪-৭৫	বারাসতে বদলি, মালদহে বদলি—স্বাস্থ্যভঙ্গে ছুটি।
১৮৭৫, জুন	জুন থেকে ৯ মাস ছুটিতে কাঁটালপাড়ায় অবস্থান। কৃষ্ণকান্তের উইলের রচনাকাল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকার।
১৮৭৬	হুগলীতে বদলি (কাঁটালপাড়ায় অবস্থিতি); বঙ্গদর্শন বন্ধ (১৮৭৬-এর মার্চ), কবি নবীনচন্দ্রের সঙ্গে কাঁটালপাড়ায় সাক্ষাৎ।
১৮৭৭	পারিবারিক বিরোধ। চুঁচুড়ায় জোড়াঘাটের বাড়িতে ১৮৮০ পর্যন্ত বাস; এপ্রিলে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় কাঁটালপাড়ায় বঙ্গদর্শন প্রকাশ (বন্ধ ১৮৮৩, মার্চ); আনন্দমঠের রচনাকাল (?)
১৮৮১	হাবড়ায় বদলি (ম্যাজিস্ট্রেট সি. ই. বাকল্যাণ্ডের সহিত সাময়িক বিরোধ)।
সেপ্টেম্বর	কলিকাতায় বাস। বউবাজার স্ট্রীটে সাহিত্যিক বৈঠক। (৪।৫ মাসের জন্য বাঙলা সরকারের অস্থায়ী সেক্রেটারি, পরে পুনরায় ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট)।
১৮৮২	আলিপুরে বদলি (২৪ পরগনায়); ধর্মতত্ত্ব ও হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্যাদি বিষয়ে আলোচনা। রবীন্দ্রনাথের প্রায়শঃ যাতায়াত। ১৬ই ফেব্রুয়ারি—ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কমলাকান্তের জোবানবন্দী রচনা। আগস্টে জাজপুরে (কটক) বদলি। নভেম্বরে স্টেটস্‌ম্যান পত্রে জেনারেল অ্যাসেম্ব্লির অধ্যক্ষের সহিত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে বাদানুবাদ।
১৮৮৩	অক্টোবরে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শনে'র প্রকাশ, এবং ১৮৮৪, ফেব্রুয়ারিতে বন্ধ।
১৮৮৪, জুলাই	জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মুখে রেখে 'প্রচার' প্রকাশ। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'নবজীবন', ১৫ দিন পূর্বে প্রকাশিত। (প্রচার বন্ধ হয়—১৮৮৯ মার্চ।) প্রচারে সীতারাম, কৃষ্ণচরিত্র এবং নবজীবনে ধর্মতত্ত্ব-অনুশীলন (ধারাবাহিক) চলে। প্রচার ও নবজীবনের সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার বিতর্ক—বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্ববোধিনীর আড়ালস্থ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিতর্ক।
১৮৮৫-১৮৮৮	ভদ্রক, হাবড়া, মেদিনীপুর ইত্যাদি নানাস্থানে বদলি। ১৩ মাসের ছুটি গ্রহণ। ১৮৮৫তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সভ্য নিযুক্ত। (সীতারাম, বিবিধ প্রবন্ধ আদি প্রকাশ—গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য)।

১৮৮৭	জানুয়ারি থেকে কলিকাতায় প্রতাপ চাটুজ্জে লেনের বাড়িতে বাস। মে মাসে পশ্চিমে গমন।
১৮৮৮	আলিপুরে বদলি। ধর্মতত্ত্ব। প্রথম ভাগ। (অনুশীলন) প্রকাশিত।
১৮৯১,১৪ সেপ্টেম্বর	চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ। কলিকাতায় বাস। নানা পুস্তকের প্রকাশ।
১৮৯২	রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার হেরফের'—(শিক্ষায় বাঙলা ভাষা প্রচলনের স্বপক্ষে) প্রবন্ধ প্রকাশ—বঙ্কিমচন্দ্রের তৎসমর্থনে মতামত প্রকাশ (সাধনা, চৈত্র, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ।
১৮৯৪, মার্চ	সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ংম্যান (এখনকার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট)-এর সাহিত্যশাখার স্থায়ী সভাপতিরূপে ইংরেজিতে বৈদিক সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা।
৮ই এপ্রিল	মৃত্যু (২৬শে চৈত্র, ১৩০০)।

পরিশিষ্ট-২

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থপঞ্জী

১৮৫৬	ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস
১৮৬৫	দুর্গেশনন্দিনী (প্রথম উপন্যাস)
১৮৬৬	কপালকুণ্ডলা
১৮৬৯	মৃণালিনী
১৮৭৩	বিষবৃক্ষ
১৮৭৩	ইন্দিরা (১৮৯৩-এ পরিবর্তিত সংস্করণ)
১৮৭৪	যুগলাঙ্গুরীয়
১৮৭৪	লোকরহস্য (১৮৮৮তে পরিবর্তিত সংস্করণ)
১৮৭৫	বিজ্ঞানরহস্য (১৮৮৪-এ ২য় সংস্করণ)
১৮৭৫	চন্দ্রশেখর
১৮৭৫	কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৮৫-এ 'কমলাকান্ত' নামে পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ, ১৮৮৯তে ঐ নামে ৩য় সংস্করণ)
১৮৭৬	[বিবিধ সমালোচন]
১৮৭৭	রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ('দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী'র সহিত প্রকাশিত)
১৮৭৭	রজনী
১৮৭৭	[উপকথা (ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী একত্রে)]
১৮৭৮	কবিতাপুস্তক ('গদ্যপদ্য'—১৮৯১)

১৮৭৮	কৃষ্ণকান্তের উইল
১৮৭৯	[সাম্য]
১৮৭৯	[প্রবন্ধপুস্তক]
১৮৮২	রাজসিংহ (১৮৯৩-এ 'পুনঃপ্রণীত')
১৮৮৪	আনন্দমঠ
১৮৮৪	মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত
১৮৮৪	দেবীচৌধুরাণী
১৮৮৫	[ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস (দ্র. উপকথা)]
১৮৮৬	কৃষ্ণচরিত্র—প্রথম ভাগ
১৮৮৭	সীতারাম
১৮৮৭	বিবিধ প্রবন্ধ। প্রথম ভাগ
১৮৮৮	ধর্মতত্ত্ব। প্রথম ভাগ। অনুশীলন
১৮৯২	বিবিধ প্রবন্ধ। দ্বিতীয় ভাগ
?	সহজ রচনাশিক্ষা (১৮৯৪-এ ২য় সং)
?	সহজ ইংরেজীশিক্ষা (১৮৯৪-এ ৩য় সং)
১৯০২	শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা
১৯৩৫	Rajmohan's Wife
১৯৩৮-৪২	দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম

দ্রষ্টব্য : প্রথম প্রকাশকাল প্রদর্শিত হলেও স্মরণীয়—পরবর্তী সংস্করণে বহু লেখার অনেক পরিবর্তন হয়েছে; কোনো কোনো পুস্তকের প্রথমকার নাম উঠে গিয়েছে অন্য-নামীয় লেখা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায়—এখন রচিত মূল গ্রন্থ (গদ্য পদ্য, বাল্যরচনা, পাঠ্যপুস্তক, ও গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনাগুলি ব্যতীত,—কিন্তু সাম্য, শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম প্রভৃতি গণনা করে): উপন্যাসজাতীয় ১৪ খানা + অন্যজাতীয় ১১ খানা = মোট ২৫ খানা।

পরিশিষ্ট—৩

উনবিংশ শতাব্দীর সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী

(বঙ্কিমচন্দ্রের বাতাবরণ)

[বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪) উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জাগরণের অন্যতম প্রধান পুরুষ—রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কালের মধ্যভাগে তাঁর জীবন। সাধারণভাবে সেই কাল একশত বৎসর বিস্তৃত,—ধর্মে, সমাজে, শিক্ষায়, সৃষ্টিতে, ভাবনায় প্রায় অর্ধশত কৃতী বাঙালীর আবির্ভাবে এ যুগ বাঙলাদেশে ও ভারতবর্ষে অতুলনীয়। মোটামুটি হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠায় (১৮১৭) বাঙলায় আধুনিক শিক্ষিত বাঙালীর রবোত্তোগ লাভ, এবং প্রভাব বিস্তার; প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪—১৯১৮) শেষে ভারতীয়

জীবনে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব-গ্রহণে (১৯১৯—২০) এ যুগের পট-পরিবর্তন। সাধারণ-ভাবে কয়েকটা বিশেষ পর্বে এ যুগকে ভাগ করা চলে।

প্রথম পর্ব—প্রস্তুতি-পর্ব : শতাব্দীর প্রথমার্ধ খ্রী ১৮০০তে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙলা গদ্যপুস্তক প্রকাশ, খ্রী ১৮৫৮ সিপাহী যুদ্ধের শেষ, ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের বাঙলা সাহিত্যে প্রবেশ, বঙ্কিমেরও কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ—এরই মধ্যে রামমোহনের কাল (১৮১৫—১৮৩২), ইয়ং বেঙ্গলের কাল (১৮৩৩—১৮৪১) ও তত্ত্ব-বোধিনীর কাল (১৮৪১—১৮৫১) পড়ে।

দ্বিতীয় পর্ব—প্রকাশের পর্ব : মোটামুটি তা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও বিংশ শতকের প্রথম দুই দশক পর্যন্ত বিস্তৃত। এইটিই বিশেষ করে সৃষ্টির যুগ—সৃষ্টির প্রথম উল্লাস', মধুসূদন ও বঙ্কিম সৃষ্টির 'উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন'—রবীন্দ্রনাথ (১৮৯৪তে বঙ্কিমের বিয়োগ থেকে)। স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৪ থেকে ১৯১৪) ও তারপর (১৯২০—১৯৪৭) ভারতীয় জীবনে স্বাধীনতার সংগ্রাম ও অন্তর্বিরোধ আর বাঙালী জীবনে সেই সঙ্গে বিশেষ করে সংকট ও সংঘাত (রবীন্দ্রনাথের দানে তথাপি উজ্জ্বল)।

এই বাতাবরণে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন (১৮৩৮—১৮৯৪) অতিবাহিত হয়, দ্বিতীয়ার্ধের 'প্রথম উল্লাসে' সৃষ্টিতে ও ভাবনায় তিনিই মধ্যমণি।

বাতাবরণ ছেড়ে 'পরিপ্রেক্ষিত' স্থির করতে হলে আরও অনেক জিনিস স্মরণ রাখতে হয়—যথা, প্রথমত আধুনিক যুগধর্ম (ইউরোপের রিনাইসেন্স, রিফর্মেশন ও ফরাসী বিপ্লবের ফলে সমুদ্ভূত বুর্জোয়া যুগে সমাজে ও রাষ্ট্রে এবং ভাবজগতে বিপুল বিপ্লব,) দ্বিতীয়ত, ভারতবর্ষে ও বাঙলার বিশেষ ক্ষেত্রে উনিশ শতকে, ব্রিটিশবাহিত বুর্জোয়া সভ্যতার দুই রূপ—বাস্তবে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা, আধুনিক ভাবধারার সংঘাত, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদিতা এবং মানবাধিকার ও জাতীয়তা প্রভৃতি ধারণা ও ব্যবস্থার অনুপ্রবেশ। তৃতীয়ত, ভারতের ও বাঙলার (প্রাচীন ও মধ্যযুগীয়) গতানুগতিক সভ্যতায়—ধর্মে ও সমাজে—দ্বিমুখী চেষ্টা—আত্মরক্ষার ও আত্মসংস্কারের ; শিক্ষিত-শ্রেণীর দ্বিমুখিতা (dichotomy)। এক কথায়, ভারতবর্ষের পক্ষে এই শতকের ঐতিহাসিক প্রয়োজন ছিল—ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা অপসারিত করে আধুনিক (বুর্জোয়া) যুগধর্মকে জীবনে স্বাঙ্গীকৃত করা।

বঙ্কিম-পাঠে সামান্য করে হলেও অন্তত মনে রাখা দরকার—১৭৯৩ হতে ১৮৯৪ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ভারতে ও বাঙলায় ব্রিটিশ প্রবর্তিত শাসনতন্ত্র, (কোম্পানির ও মহারানীর রাজত্ব) আইন-কানুন, রাজস্ব ব্যবস্থা (বিশেষ করে ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী ভূমি-ব্যবস্থা), ডাক, রেল, তার প্রভৃতি যোগাযোগের ব্যবস্থা, আধুনিক শিক্ষার প্রসার, শিক্ষার হেরফের, ব্রিটিশ প্রবর্তিত সার্ভে অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়াস। ধর্মচিন্তা ও সংস্কৃতিতে সংস্কার ও সমাজ সংস্কার (খ্রীষ্টীয় প্রচার ও খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ; রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, বিদ্যাসাগর, আর্যসমাজ, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রভৃতির অভ্যুদয় এবং ওহাবী, ফরাজী, স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ প্রবর্তিত মুসলিম আয়োজন) ; ভারততত্ত্বচর্চার উদ্ভব, প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতেতিহাসের গবেষণা ও জিজ্ঞাসার প্রসার, বাঙলা গদ্যরচনা ও বাঙলা-

সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনা—প্রভৃতি প্রধান প্রধান আন্দোলন ও আয়োজনগুলি। সেরূপ পাঠের সহায়তার জন্য ১৮০০—১৯০০ পর্যন্ত নিম্নের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী উল্লেখিত হল।

(সম্পাদক, ব. র. সংগ্রহ)]

১৭৯৩ বঙ্গে বিহারে চিরস্থায়ী ভূমিব্যবস্থা (জমিদারি প্রথা)।

১৭৮৪ স্যর উইলিয়ম জোন্‌সের নেতৃত্বে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা (প্রাচ্যবিদ্যা ও ভারতবিদ্যার গবেষণারম্ভ)।

১৮০০ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (ইংরেজ কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য) প্রতিষ্ঠা। উইলিয়ম কেরির (১৭৬১-১৮৩৪) এই কলেজে বাঙলা শিক্ষার ভারগ্রহণ।

১৮০১ রামরাম বসু-কৃত প্রথম বাঙলা গদ্যগ্রন্থ 'প্রতাপাদিত্য চরিত' প্রকাশ। কেরি-রচিত 'কথোপকথন' প্রকাশ।

১৮১২ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জন্ম (মৃত্যু ১৮৫৯)

১৮১৪ রামমোহন রায়ের (জন্ম ১৭৭২/মতান্তরে ১৭৭৪, মৃত্যু ১৮৩৩) স্থায়িভাবে কলিকাতায় বাসস্থাপন (কলিকাতায় বাস—১৮৩০ পর্যন্ত)।

১৮১৫ রামমোহন রায়ের 'আত্মীয়সভা' স্থাপন, বেদান্তগ্রন্থ (অনুবাদ ও ভাষ্যসহ) প্রকাশ।

১৮১৭ ২০শে জানুয়ারি কলিকাতায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা।

১৮১৮ ২৩শে মে শ্রীরামপুরে প্রথম বাঙলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণে'র প্রকাশ। ১৪ই মে কলকাতায় গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের 'বেঙ্গল গেজেটি'র প্রকাশ।

১৮২১ ১৫ই জুলাই অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম।
২৬শে সেপ্টেম্বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম।
৪ঠা সেপ্টেম্বর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশ।
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জন্ম। হেদুয়ায় দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রামমোহন রায়ের অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল স্থাপন।

১৮২৫ কলিকাতায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্ম (মৃত্যু ১৮৯৪)।

১৮২৬ ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত (ইয়ংবেঙ্গল-এর প্রেরণালাভ)।
রামমোহন রায়ের 'ব্রহ্ম উপাসনা সভা' বা 'ব্রহ্মমন্দির' স্থাপন।
৪ঠা ডিসেম্বর বেন্টিঙ্কের 'সতীদাহ' প্রথা বেআইনী ঘোষণা। রক্ষণশীল হিন্দুদের 'ধর্ম্মসভা' স্থাপন।

১৮৩০ ১৩ই জুলাই আলেকজেণ্ডার ডফ্‌-এর স্কুল প্রতিষ্ঠা।
২৯শে নভেম্বর রামমোহন রায়ের বিলাত-যাত্রা।

১৮৩১ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক 'সম্বাদ প্রভাকর' প্রকাশ (পরে সাপ্তাহিক থেকে দৈনিকে উন্নীত—১৮৩৯)
বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু প্রভৃতির কবিতা প্রকাশ (১৮৫৩-৫৪)।

১৮৩১-৩২ তিতুমীরের বিদ্রোহ ও ধ্বংস।

১৮৩৪ ঝামাপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের (গদাধর চাটুজ্জের) জন্ম। (মৃত্যু ১৮৮৬)

১৮৩৫ কলিকাতায় মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা।

১৮৩৮ ১৬ই মে জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার প্রতিষ্ঠা। ২৬শে জুন কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪) জন্ম। ১৯শে নভেম্বর কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম। আইন আদালতে ফার্সির স্থলে বাঙলার প্রবর্তন।

১৮৩৯ ৬ই অক্টোবর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠা।

১৮৪১ ২৯শে ডিসেম্বর বিদ্যাসাগরের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে যোগদান।

১৮৪৩ মধুসূদন দত্তের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা ও মাইকেল নাম গ্রহণ।
২০শে এপ্রিল বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির প্রতিষ্ঠা।
২১শে ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণ।

১৮৪৭ শিবনাথ শাস্ত্রীর জন্ম।

১৮৪৮ [ইউরোপের বহুদেশে বিপ্লব-চেষ্টা, মার্কস-এঙ্গেলস-এর কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর প্রচার, ব্রিটেনে চার্টিস্ট আন্দোলন (১৮৩৮-১৮৪৮)]

১৮৪৯ ৭ই মে বেথুন স্কুল ('হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়') স্থাপিত।
বঙ্কিমচন্দ্রের হুগলী কলেজে শিক্ষারম্ভ (শিক্ষাকাল—১৮৫৬ পর্যন্ত)।
১৮ই ডিসেম্বর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর জন্ম।

১৮৫১ ৩১শে অক্টোবর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন-এর প্রতিষ্ঠা। (১৮৬৩-৭১ 'সভার' সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সংযোগকাল)।
ডিসেম্বর 'বেথুন সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা।

১৮৫৪ উডের শিক্ষাবিষয়ক ডেসপ্যাচ্।
'কুলীন কুল সর্বস্ব' নাটকের প্রকাশ (প্রথম অভিনয় ১৮৫৭)।
'হিন্দু পেট্রিয়টে'র প্রকাশ (বিলোপ ১৯০০?)।

১৮৫৬ ১৬ই জুলাই বিধবা-বিবাহ আইন পাশ।

১৮৫৭ কলিকাতায় আইনানুযায়ী প্রথম বিধবাবিবাহ। জানুয়ারি মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা (এপ্রিল মাসে এনট্রান্স পরীক্ষা—বঙ্কিমচন্দ্রাদির পরীক্ষা পাশ)। সিপাহী যুদ্ধ (বিদ্রোহ-সূচনা—মার্চ; যুদ্ধকাল—১৮৫৭/৫৮)।

১৮৫৮ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ. পরীক্ষা। উত্তীর্ণ দুইজন (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু)।
৬ই আগস্ট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ। [সরকারী কার্য হতে অবসর গ্রহণ—১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯১] টেকচাঁদ

ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রকাশ। 'দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় 'সোমপ্রকাশে'র প্রকাশারম্ভ।

৩রা নভেম্বর বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ।

১৮৫৯ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু।

নীলবিদ্রোহের কাল (১৮৫০-১৮৬০)।

মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রকাশ ও বাঙলা সাহিত্যে উদয়।

দীনবন্ধু মিত্রের নাটক 'নীলদর্পণে'র প্রকাশ।

[ডারুইনের 'ওরিজিন্ অব্ স্পিসিস'-এর প্রকাশ।]

১৮৬০ কালীপ্রসন্ন সিংহের 'মহাভারতে'র অনুবাদের প্রকাশারম্ভ (প্রকাশকাল ১৮৬০-১৮৬৬)।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র প্রকাশ।

১৮৬১ 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র প্রকাশ।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক হরিশ মুখুজ্জের মৃত্যু।

কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে যোগদান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম (৮ই মে, ১৮৬১—৭ই আগস্ট, ১৯৪১)।

১৮৬৩ 'স্বামী বিবেকানন্দে'র (নরেন্দ্রনাথ দত্ত) জন্ম (মৃত্যু ১৯০২)।

সিভিল সার্ভিস-এ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর উত্তীর্ণ।

[উত্তর আমেরিকায় দাস প্রথা অবসানের যুদ্ধ (১৮৬৩-১৮৬৫)]

১৮৬৪ ['প্রথম আন্তর্জাতিক' প্রতিষ্ঠা]

১৮৬৫ বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর প্রথম প্রকাশ।

(ইংরেজিতে Rajmohan's Wife উপন্যাসের ধারাবাহিক প্রকাশ ১৮৬৪)।

১৮৬৬ ১১ই নভেম্বর কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপিত।

১৮৬৭ এপ্রিল (বৈশাখ) হিন্দুমেলা'র প্রথম অধিবেশন।

[কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিটাল' প্রথম খণ্ডের প্রকাশ]

১৮৬৮ ২০শে ফেব্রুয়ারি শিশিরকুমার ঘোষের সম্পাদনায় যশোর থেকে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রকাশারম্ভ।

[জাপানে মেইজি যুগ—আধুনিক যুগের সূচনা]

১৮৬৯ ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার কর্তৃক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠার আয়োজন ও প্রতিষ্ঠা (১৮৬৯-৭০)।

১৮৭০ [ফ্রাঙ্কো-প্রুশীয় যুদ্ধ]

১৮৭১ [প্যারি কমিউন]

১৮৭২ এপ্রিল বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক বঙ্গদর্শনের প্রকাশারম্ভ।

নভেম্বর ন্যাশনাল থিয়েটারের (প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চ) সূচনা।

অসবর্ণ বিবাহের আইন (অ্যাক্ট) পাশ।

১৮৭৩ বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রথম দেশীয় নেতৃত্বে কলেজ স্থাপনা (মেট্রোপলিটন কলেজ)।

কবি মধুসূদন দত্তের মৃত্যু।

১৮৭৫ স্বামী দয়ানন্দ (১৮২৪-১৮৮৩) কর্তৃক আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠা (কাঠিয়াবাড়ে)। স্যর সৈয়দ আহ্‌মদের উদ্যোগে আলিগড়ে অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজের প্রতিষ্ঠা।

১৮৭৬ ২৬শে জুলাই ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েশন (ভারত সভা) প্রতিষ্ঠা।

১৮৭৭ বিপ্লবী গুপ্ত সমিতির (হামচু-পামচু হাফ্) প্রতিষ্ঠা।

১৮৭৮ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা। লর্ড লিটনের 'ভার্ন্যাকুলার প্রেস অ্যাক্ট'।

১৮৮১ নভেম্বর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাৎ

১৮৮২ 'আনন্দমঠে'র প্রকাশ।

১৮৮৩ ইলবার্ট বিল, তৎসম্পর্কিত আন্দোলন।
২৮-৩০শে ডিসেম্বর কলিকাতায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রথম ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের অধিবেশন।

১৮৮৫ মীর মশার্‌রফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু'র প্রকাশ।
২৫-২৭শে ডিসেম্বর বোম্বাইতে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন্।

১৮৮৬ স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ (১৮১৭-১৮৯৮)-এর কংগ্রেসের প্রতি বিরূপতা (১৮৮৫), পেট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন (১৮৮৮) ও আপার ইণ্ডিয়া মহমেডান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৯৩) প্রতিষ্ঠা—পৃথক মুসলিম আন্দোলনের সূচনা।

১৮৯০ রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' প্রকাশ।
সরকার কর্তৃক সরকারী কর্মচারীদের কংগ্রেসে যোগদান নিষিদ্ধ।

১৮৯১ ২৯শে জুলাই বিদ্যাসাগরের মৃত্যু।
নভেম্বর 'সাধনা'র প্রকাশ (সম্পাদক—সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

১৮৯২ ইণ্ডিয়ান্ কাউনসিল অ্যাক্ট্—জাতীয়তার চেতনা।

১৮৯৩ শিকাগো ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দের সাফল্য।

১৮৯৪ ৮ই এপ্রিল (২৬শে চৈত্র, ১৩০০) বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু। অরবিন্দের (ইন্দুপ্রকাশ-এ) ভারতীয় জাতীয় জাগরণে বঙ্কিমের আনন্দমঠের ভূমিকা সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ।